গল্প-সমগ্র

রমাপদ চৌধুরী

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

প্রকাশক : ফণিভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক : দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
আনন্দ প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
পি-২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম নং ৬ এম
কলিকাতা ৫৪

প্রচ্ছদ : সমীর সরকার
অলংকরণ : সুধীর মৈত্র

পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৬৮

রণক্ষেত্রের দামামা বেজে উঠলো। লক্ষ লক্ষ সিপাহী, সান্ত্রী, অশ্বারোহী সৈনিক ছুটে এলো উন্মত্ত আক্রোশে। বিপরীত দিক থেকেও ঝাঁপিয়ে পড়লো লক্ষ লক্ষ যোদ্ধা। এক দেশের সঙ্গে আরেক দেশের যুদ্ধ, এক জাতির সঙ্গে আরেক জাতির। ঔপন্যাসিক তখন কোনো মিনারের চূড়ায় উঠে নোটবুকে টুকে নেবেন সমস্ত দৃশ্যটা। রাজার অঙ্গে লাল মখমলের পরিচ্ছদ, মাথার মুকুটে মণিমুক্তোহীরের জ্যোতি, সেনাপতির দুঃসাহসিক অভিযান, সৈন্যদের চিৎকার, এসবের একটা কথাও বাদ দেবেন না ঔপন্যাসিক। লিখে নেবেন কতগুলো হাতি, কত ঘোড়া এ যুদ্ধে যোগ দিলো। খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি বর্ণনা ইনিয়েবিনিয়ে লিখে যাবেন তিনি। যুদ্ধ জয়ের পর সৈন্যদল দেশে ফিরবে যখন, তখনও পিছনে পিছনে ফিরবেন ঔপন্যাসিক। শঙ্খধ্বনি আর সমারোহের আনন্দ ছিটিয়ে আহ্বান জানাবে গ্রামীণা আর নগরকন্যার দল। তাও লিখবেন ঔপন্যাসিক, বর্ণনা দেবেন তাদের, যারা উলুধ্বনির আড়ালে কলরব করে উঠলো। তারপর? তারপর হঠাৎ তিনি ছোটগল্প-লেখককে দেখতে পাবেন, পথের ধারে, একটি গাছের ছায়ায় বসে আছেন উদাস দৃষ্টি মেলে। এ কোন্ ঔপন্যাসিক লেখক?—মনে মনে ভাববেন ঔপন্যাসিক। কোনো মিনারের চূড়ায় উঠলো না, দেখলো না যুদ্ধের ইতিবৃত্ত, শোভাযাত্রার সঙ্গ নিলো না, এ কেমনধারা সাহিত্যিক! হয়তো এমন কথা বলবেনও তিনি ছোটগল্পের লেখককে। আর তখন, অত্যন্ত দীর্ঘ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ চেয়ে তাকাবেন ছোটগল্পের লেখক, বলবেন হয়তো, না বন্ধু, এসব কিছুই আমি দেখিনি। কিছুই আমার দেখার নেই। শুধু একটি দৃশ্যই আমি দেখেছি। পথের ওপারের কোনো গবাক্ষের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করবেন তিনি, সেখানে একটি নারীর শঙ্কাকাতর চোখ সমগ্র শোভাযাত্রা তন্নতন্ন করে খুঁজে ব্যর্থ হয়েছে, চোখের কোণে যার হতাশার অশ্রুবিন্দু ফুটে উঠেছে—কে যেন ফেরেনি, কে একজন ফেরেনি। ছোটগল্পের লেখক সেই ব্যথাবিন্দুর, চোখের টলোমলো অশ্রুর ভেতর সমগ্র যুদ্ধের ছবি দেখতে পাবেন, বলবেন হয়তো, বন্ধু হে, ঐ অশ্রু-বিন্দুর মধ্যেই আমার অনন্ত সিন্ধু।

রমাপদ চৌধুরী

এই লেখকের উপন্যাস

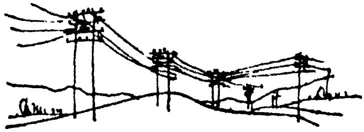
রূপ · বীজ · হৃদয় · লজ্জা · খারিজ

এখনই · পিকনিক · বনপলাশির পদাবলী

পরাজিত সম্রাট · লালবাঈ · এই পৃথিবী পান্থনিবাস

দ্বীপের নাম টিয়ারঙ · প্রথম প্রহর

যে যেখানে দাঁড়িয়ে · অ্যালবামে কয়েকটি ছবি



উদয়াস্ত

বিষ্ণুরামের মন বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে। এই জীবনের স্বপ্নই কি সে গড়েছিলো বিশ বছর আগে! এ. এস. এম., মালবাবু আর চেকার—বিষ্ণুরাম ব্যতীত এরাই স্টেশনের জনবল। বিষ্ণুরাম এদের প্রত্যেকের চেয়েই বয়সে বড়, তবু এরাই তার বন্ধু, উপদেশের জন্যে ছুটতে হয় এদেরই কাছে। পৃথিবীতে যে আরও মানুষ আছে তা মনে পড়িয়ে দেয় 'আপ' আর 'ডাউন' ট্রেন দুখানা। অগণিত নরনারী উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ছোট্ট স্টেশন-ঘরটির দিকে—দু-একটি ছোকরা যাত্রী অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি ফেলে তার কোয়ার্টারের জানলায়। বিষ্ণুরামের জীবনে আছে শুধু অপেক্ষা—সূর্যোদয় মনে পড়িয়ে দেয় সন্ধ্যার কথা, আর সন্ধ্যা—রাত্রির।

না, এর একটা শেষ চাই।

একখানা মালগাড়ি হুইস্‌ল্‌ দিতে দিতে চলে যায়। বিষ্ণুরাম ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে, ঘুমের চোখে কুলুঙ্গি থেকে পকেট-ঘড়িটা টেনে নিয়ে সময় দেখে। সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে—এ. এস. এম. শিবু বেচারা সমস্ত রাত নাইট ডিউটি দিয়েছে, তাড়াতাড়ি গিয়ে তাকে ছেড়ে দিতে হবে।

—কই গো, তোমার চা হলো?

সাবিত্রী রান্নাঘর থেকেই উত্তর দেয়ঃ এই যে, জল ফুটে এসেছে।

বিষ্ণুরামের বিরক্তিভরা মন বিচলিত হয়ে ওঠে। বলে, আর হয়ে এসেছে! বলি, স্টেশনে যেতে হবে না?

আঁচল দিয়ে কেটলিটা ধরে নিয়ে সাবিত্রী সেটা সশব্দে মেঝেতে নামিয়ে রাখে। ঢাকনিটা খুলে এক মুঠো চায়ের পাতা কেটলিতে ফেলে দিয়ে সাবিত্রী বেশ একটু গম্ভীর হয়েই বলে, কি হলো কি, সকাল থেকে খিঁচিয়ে রয়েছো যে? বিষ্ণুরামও বলে, সে জ্ঞান কি তোমার আছে! শিবুকে রিলিভ করতে হবে না?

—ওঃ, প্রাণ গলে গেল শিবুর দুঃখে, আর আমি যে এদিকে রাতভোর ঘুমুতে পাই না, সেটা আর খেয়ালই হয় না, না? আমার বেলায় ভোর চারটেয় চা চাই!

বিষ্ণুরাম আশ্চর্য হয়ে বলে, তুমি আবার রাত্তিরে ঘুমুতে পাও না?

—তা আর জানবে কি করে, ষাঁড়ের মতো নাক ডাকিয়ে ঘুমোও, মনে করো সবাই তোমার মতো মনের সুখে ঘুমুতে পায়। বলি রাত্তিরে তিনবার করে কাঁথা বদলানো, গৌতম-গোরাকে নিয়ে কলঘরে দাঁড়ানো—এসব তুমি করো! কাচের গ্লাসে চা ঢেলে স্বামীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, নাও। অ্যাদ্দিন ধরে বলছি গার্ডকে সিলির হাট থেকে ছাঁকনি এনে দেবার জন্যে বলতে, তা আর পারলে না!

বিষ্ণুরামও বলে, হ্যাঃ, সাহেব গার্ড আজকাল, তা জানো? তাকে বলবো ছাঁকনি আনতে?

সাবিত্রী ফোঁস করে ওঠে, রেখে দাও তোমার সায়েব, আমার মতো গায়ের রঙ, সে আবার সাহেব! বলেই দেখো না একদিন। পরক্ষণে সাবিত্রী নিজেই বলে, না-হয়, বরফআলাটাকে বলে দিও, সে তো যায় সিলি পর্যন্ত।

—আইস-ভেণ্ডারকে? বেশ বলেছো। তার চেয়ে বলো না একটা ছুরি কিনে দিয়ে তার সামনে গলাটা বাড়িয়ে দিই। ছুরি—ছুরি, জানো সাবু, একেবারে ছুরি বসিয়ে দেবে। ওসব লোককে বিশ্বাস নেই—ছোটলোক ক্লাস, পাঁচ আনায় কিনে বলবে, ছ আনা—আবার পুজোর সময় বকশিশ চাইবে।

কোনরকমে গরম চাটুকু ঢকঢক করে গিলে নিয়ে একটা বিড়ি ঠোঁটের ফাঁকে গুঁজে দিয়ে রান্নাঘরে ঢোকে। সাবিত্রী চিমটে দিয়ে একটা জ্বলন্ত কয়লা তুলে ধরে। বিষ্ণুরামও বিড়িটা

ধরিয়ে নেয়।

সাবিত্রী বলে, কয়লা আর শেষ হয়ে এলো, কয়লার গাড়ি কবে আসবে?

বিষ্ণুরাম বলে, কয়লার গাড়ি আর এখন যাবে না, মালগাড়ির ইঞ্জিন থেকে নাবিয়ে নিতে হবে। আজকাল মিলিটারির ঠেলায়—। বলে বিষ্ণুরাম পিঁড়িটা টেনে নিয়ে বসতে যাচ্ছিলো, সাবিত্রী বলে ওঠে, যাও, যাও, বসতে হবে না, তাড়াতাড়ি সেরে এসো, আবার ছেলেগুলো উঠলে দরজায় ধাক্কা দিতে শুরু করবে। তোমার তো আবার দরজায় ধাক্কা দিলে—। বলেই সাবিত্রী হেসে ফেলে।

বিষ্ণুরাম চলে যায়, সাবিত্রী গিয়ে দাঁড়ায় খিড়কির দরজায়। গ্রাম্য অপরিষ্কার একটি বিলাসপুরী মেয়ে চলেছে মেঠো পথ ধরে—চেকারবাবুর বাড়িতে সে বাসন মাজে। লুধিয়া তার নাম, কিন্তু লোকে ডাকে—'রয়তাইন'।

সাবিত্রী ডাকে, এ রয়তাইন, দেখ্, রাস্তেমে রামদীনসে মিলনেসে জলদি ভেজ্ দেনা, হাঁ?

—কাহে বাঈ?

—সুরয কাঁহা দেখ্ তো? অভিতক্ নাহি আয়া, ইসকা বাদ গাইয়া দুহনে হোগা, ঝারু-আরু লাগানে হোগা। যা, জল্দি যাকে বোল দেনা।

বিষ্ণুরাম গাড়ুটা রেখে গামছায় পা মুছতে মুছতে এসে হাজির হয়, বলে, দেখ সাবু, আমি এই পঁচিশ বছর এখানে রয়েছি, তবু হিন্দী বলতে পারি না, আর তুমি এই সাত বছরের মধ্যে পাকা হিন্দুস্থানী হয়ে গেলে?

সাবিত্রী একমুখ হেসে বলে, শিবুকে রিলিফ দেবার কথা ভুলে গেলে?

একখানা হলদে মোটা পাবনার গেঞ্জি মাথায় গলিয়ে দিয়ে গলার বোতাম আঁটতে আঁটতে চিৎকার করে, ও সাবু, কোথায় গেলে গো, কোটটা দিয়ে যাও। সাবিত্রী রেলের কালো কোটটা নিয়ে এসে হাজির হয়, বলে, কোট আনতেই গিয়েছিলাম। তুমি গেঞ্জি পরেই চলে যেতে পারো, কিন্তু আমার মনে থাকে, বুঝলে?

বিষ্ণুরাম কোটটা গেঞ্জির উপরই পরে নেয়। তারপর চটিটা টানতে টানতে স্টেশনের দিকে যায়।

সাবিত্রী চিৎকার করে বলে দেয়, মাছ চালান-টালান থাকলে দু-একটা এনো।

রুটিন-বাঁধা জীবন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত 'টরে টক্কা'—সংবাদ আদান-প্রদান, আর পয়েণ্টসম্যানকে দু-একটা অবাঙালী অশ্লীলতা-মাখানো আদেশ। এই তো তার জীবন।

—বাবুজী, বাফুরমে তো অভি তিন শো সাঁয়তিশ নম্বর কা চুনাকা গাড়ি হায়, খালি নাই হুয়া।

—সে কি রে? এক হপ্তা হয়ে গেল, ডেমারেজ লাগবে যে! বলে দিস ব্রিজলালকে এবার আর ডেমারেজ বাঁচাতে পারবো না, এম্‌প্‌টি ফেরত পাঠাবার অর্ডার এসে গেছে।...খেলে যা, টু আপের 'তার' আসেনি এখনও? যা তো, শিবুর কাছে জিজ্ঞেস করে আয় 'ইনিংসে' পেয়েছে কি না, পেয়ে থাকলে কোথায় রেখেছে খোঁজ নিয়ে আসিস।—কেয়া মাংতা? হাঁ, গাড়ি অভি আয়গা।...নেই, ডেহরা কামরেকা টিকিট নেই হায়, থার্ড ক্লাস হায়।...বাবুজী, মাল বুক করেগা, না ব্ল্যাঙ্ক টিকিট বানায়গা?...ঠিক বাত্, টিকিটকা কুছ দরকার নাই হায়, হাম টি. সি.-কো বোল দেগা। হাঁ, পান খানেকা পয়সা তো মিলনাই চাহিয়ে।...অরে ও রামদীন, ফ্ল্যাগ দেখাবি যা, গাড়ি ইন করছে।

হুস্ হুস্ শব্দে আপ ট্রেনখানা এসে পেঁছয়।—সোডা লেমনেড, সোডা লেমনেড। ওই একটি মাত্র শব্দ—ফেরিওয়ালার অনুপস্থিতি বিষ্ণুরামের অভ্যেস হয়ে গেছে।

—এই পানিপাঁড়ে, পানিপাঁড়ে!

মাস্টারমশায়কে দেখতে পেয়েই যাত্রীটি চিৎকার করে, মাস্টার সাব, পানিপাঁড়েকো জেরা—

—অভি দেতা বুলাকে। মাস্টার সাব হনহন করে গার্ডের গাড়ির দিকে ছোটে—খাতা মিলিয়ে মাল নামিয়ে নিতে হবে। মনে মনে বলে, শালা যেন হাওড়া স্টেশন পেয়েছে, পানি-পাঁড়ে! সে ব্যাটা যদি তোকে জল দিতে আসবে তো আমার বাটনা বাটবে কে?

—হ্যাঁ, সব ঠিক আছে। অল রাইট স্যার।

গাড়ি হুইস্‌ল্‌ দিয়ে চলে যায়—গার্ডের সবুজ পতাকাটা তখনও দেখা যায়। চিরন্তন ক্লান্তির ছাপটা স্টেশনের বুকে নেমে আসে। নিস্তব্ধ নিঃশব্দ প্রান্তর।

—মাস্টারবাবু, আমাদের মাছ এসেছে?

—হ্যাঁ, এসেছে বইকি, পাঠালে আবার আসে না!

—ডেলিভারিটা দিয়ে দিন না একটু তাড়াতাড়ি।

—তা দিচ্ছি, কিন্তু আমাকে কিছু মাছ আজ দিতেই হবে।

—আজ্ঞে, সে কি করে হয়, ওজন-করা মাল।

—না-হয় দাম দেবো রে বাপু।

—বারো আনা সের—বলুন কত চাই?

—বেশ বাপু, তাই দে, এক সের আন্দাজ একটা।

—খুচরো আছে? এক টাকার নোট বের করলে হবে না।

চেকারবাবু এসে হাজির হয়।

—কি মাস্টারমশায়, গরিবের একটি মাছ মেরে দিলেন তো?

বিষ্ণুরাম আশ্চর্য হয়ে বলে, মেরে দিলাম কি হে সত্যেন? নগদ বারো আনা পয়সা দিচ্ছি, তাও খুচরো।

চেকারবাবু কপট ক্রোধে বলে, আপনার কাছে পয়সা নিচ্ছে? সত্যিই তা'লে কাল ফুরিয়ে এসেছে, চেতাবনীর কথাই ফললো দেখছি।

বিষ্ণুরাম ক্যাশ থেকে খুচরা বারো আনা পয়সা বার করে দিতে যাচ্ছিলো, চেকারবাবু বলে ওঠে, পয়সা কি দিচ্ছেন, আগে ওজন দেখুন?

মৎস্য-ব্যবসায়ীটি চেকারবাবুর দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকায়। ওজন দেখা হয়, এক মণ পঁয়ত্রিশ সের।—ঠিক আছে। ভলিয়ুম মেপে দেখুন তো। দেখা যায় ভলিয়ুম অনেক বেশী।

চেকারবাবু বলে, হুঁ হুঁ, হুইচেভার ইজ গ্রেটার। এবার বাছাধন? হয় মাছটি দাও, না-হয় দু টাকা দশ আনা এক্সট্রা দাও।

—সে কি মাস্টারবাবু? সেখান থেকে ভাড়া দিয়ে পাঠিয়েছে, বেশী লাগলে তো সেখানেই চার্জ করতো।

বিষ্ণুরাম বিরক্ত হয়ে বলে, আইন শেখাতে হবে না, যা বললাম কর্‌, পরে রিপোর্ট করিস না-হয়।

চেকারবাবুও এ কথায় সায় দেয়। সাবিত্রীর ভাগ্যে আমিষ জুটে যায়।

মিলিটারী স্পেশালটা আসতে কত দেরি, খেলারি থেকে তারে সে খবরটা নিয়ে বিষ্ণুরাম বাড়ি আসে। সাবিত্রী বিষ্ণুরামের কোটটা খুলে নিয়ে আলনায় টাঙিয়ে রাখে। বিষ্ণুরাম গেঞ্জিটা খুলে একটা টুল টেনে নিয়ে বসে, ঘর্মাক্ত লোমশ বুকটায় হাত বোলাতে থাকে। সাবিত্রী রান্নাঘরে পাখার সন্ধান করতে গিয়ে দেখে গোরা পাখাটার ডাঁটে করে একটা জ্বলন্ত কয়লা তোলবার চেষ্টা করছে। সাবিত্রী রাগে ফেটে পড়ে।

—হারামজাদা ছেলের কাণ্ড দেখো! পইপই করে তোকে বারণ করেছি না, পাখা পোড়াতে নেই?

—পোড়ালাম আবার কই? গৌরাঙ্গ মুখ কাচুমাচু করে উত্তর দেয়।

—পোড়ালাম আবার কই! আগুনে ঠেকালে পোড়ানো হলো না?

বিষ্ণুরাম শ্রান্ত বিরক্ত মুখে এসে হাজির হয়। স্টেশন-মাস্টারের একঘেয়ে জীবনের মাঝে যদি বাড়িতে এসেও একটু শান্তি না পাওয়া যায়, তবে আর মানুষের বেঁচে কি লাভ?

বলে, কি হলো কি, এত চিৎকার করছো যে?

সাবিত্রী ক্রোধান্বিত হয়েই উত্তর দেয়, হবে আবার কি? আমি একটু হাওয়া করবো বলে পাখা খুঁজে মরছি, আর ছেলে এদিকে সেটা আগুনে পোড়াচ্ছে।

বিষ্ণুরাম বিনাবাক্যে গোরার হাত থেকে পাখাটা কেড়ে নিয়ে তার পিঠে ঘা কয়েক বসিয়ে

দেয়।

বিষ্ণুরাম স্নান সেরে খেতে বসে; সাবিত্রী মাছি তাড়ায়। সাবিত্রী বলে, রামদীনকে বলে বলে তো পারলাম না। আজ এখনও কুয়ো থেকে জল তুলে দিয়ে যায়নি।

রামদীনের ডাক পড়ে। সে উঠনে এসে দাঁড়ায়।

বিষ্ণুরাম গম্ভীর গলায় বলে, এতক্ষণ কি করছিলি? জল তুলতে হবে না?

—জী, ভোজন করছিলাম। এখনি তুলে দিচ্ছি।

বিষ্ণুরাম রামদীনের কথায় হো-হো করে হেসে ফেলে।

—তুই ব্যাটা ভোজন করছিলি কি রে? ভোজন করবে বর্ধমানের মহারাজা, আমি করবো আহার, তুই ব্যাটা খাবি।

সাবিত্রীও হাসে। বিষ্ণুরাম এখনও শুষ্কং কাষ্ঠং হয়ে যায়নি!

আহারের পর আবার সেই স্টেশন। টরে টক্কা—টরে টক্কা—টরে টরে। মিলিটারী স্পেশাল-খানা চলে যায়। টি. এস.-এর মোটর-ট্রলিখানা বিদ্যুদ্‌বেগে চলে যায়। তারপর আসে 'ডাউন' ট্রেনখানা। মিনিট কয়েকের হইচই। পুনরায় সেই অসহ্য নীরবতা নেমে আসে সন্ধ্যার আবছায়া-অন্ধকারে। বিষ্ণুরাম তার কোটের পেতলের বোতামটা আঙুলে ঘষতে ঘষতে বাড়ি ফেরে।

—গৌতমটা গেল কোথায়?

সাবিত্রী বলে, খেলতে গেছে, এখনি আসবে।

বিষ্ণুরাম ঈষৎ ক্রোধে বলে, সে ব্যাটার কিস্‌সু হবে না, বললাম টেলিগ্রাফিটা শিখে রাখতে, একটা এ. এস. এম.-এর চাকরি হবে, তা না, কেবল টো-টো করে ঘুরে বেড়ানো।

সাবিত্রী একটা থালায় করে দুখানা রুটি আর কিছু আলুভাজা নিয়ে এসে বিষ্ণুরামের সামনে নামিয়ে রেখে যায়। গোরা ওরফে গৌরাঙ্গ মায়ের পেছনে পেছনে এসে জলের গ্লাসটা বিষ্ণুরামের হাতে তুলে দিয়েই সরে পড়ে। ও-বেলার প্রহারটা তার এখনও মনে আছে।

জলযোগ সেরে বিষ্ণুরাম বের হয় শিবুর বাসার উদ্দেশে—তাসের আড্ডায়।

রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। গৌতম, গৌরাঙ্গ—এরা ঘুমিয়ে পড়েছে, সাবিত্রী ছোট মেয়েটাকে কোলে বসিয়ে বিষ্ণুরামের অপেক্ষা করে। বালতি বালতি তরল অন্ধকার যেন গড়িয়ে পড়ছে পৃথিবীর বুকে—সাবিত্রীর মনে হয়, অন্যদিন তো এত দেরি হয় না; জাফরির ফাঁকে চোখ রেখে লাইনের ও-পারে শিবুর বাসার দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে সে দাঁড়িয়ে থাকে। বহুদূরে একটা কালো ছায়া দেখতে পেয়ে আশান্বিত হয়ে ওঠে, পরক্ষণেই বুঝতে পারে তার ভুল—বিষ্ণুরাম নয়, ওয়াচ অ্যান্ড ওয়ার্ডের পাহারাওয়ালা লাইন দেখে বেড়াচ্ছে। কোলের ঘুমন্ত মেয়েটা চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। সাবিত্রী তাকে নিয়ে সরে আসে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে তাকে স্তন দেয়। কান উদ্‌গ্রীব থাকে একটা পরিচিত পদশব্দের আশায়।

শিকল নাড়ার শব্দে সাবিত্রী চমকে ওঠে। ঘুমের চোখেই ছুটে গিয়ে খিল খুলে দেয়।

বিষ্ণুরাম ঘরে ঢুকেই বলে, তোমাকে আর বলে বলে পারলাম না। বলেছি না, আগে গলার সাড়া নিয়ে তবে দরজা খুলবে?

সাবিত্রী নিজের দোষ ঢাকা দেবার চেষ্টায় বলে, তোমার পায়ের শব্দ পেলেই আমি বুঝতে পারি, সাড়া নিয়ে দরকার?

বিষ্ণুরাম প্রগাঢ় আগ্রহে সাবিত্রীকে বুকের কাছে টেনে নেয়, সাবিত্রীর মুখটা ঘুরিয়ে ধরে তার নিজের মুখের দিকে। সাবিত্রীও মুহূর্তের জন্যে নিজেকে ছেড়ে দেয় স্বামীর হাতে; পরক্ষণেই বিষ্ণুরামের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়। বলে, লজ্জা করে না তোমার! বুড়ো হতে চললে—এখনও ওইসব? কপট ক্রোধে সে চলে যায় ভাত বাড়তে। বিষ্ণুরাম এখনও অভুক্ত।

বিষ্ণুরামের মুখে হাসি দেখা যায়—অতি দুঃখের হাসি। সমস্ত বুকটা তার মোচড় দিয়ে ওঠে। তার বয়স হয়েছে? হ্যাঁ, সত্যই তো সে এখন বৃদ্ধ। দোষ আর কারও নয়, দোষ তার বয়সের। আজ তাই ছেলেরা তাকে মানে না, তার প্রতি সাবিত্রীর আর-কোনো আকর্ষণ নেই।

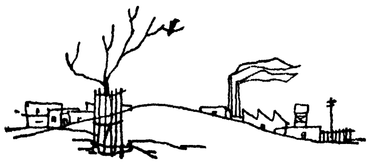
বিষ্ণুরামের যৌবনের কথা মনে পড়ে। সাবিত্রীর একটা চিঠির উত্তর তার আজও মনে আছে। সাবিত্রী লিখেছিলো, 'চিঠির শেষে তুমি যা চেয়েছো, তা কি চিঠিতে দেওয়া যায়, একদিন এখানে এসে নিয়ে যেয়ো।' বিষ্ণুরাম ভাবে সেই জীবন আর এই জীবন—কত পার্থক্য।

কোলের খুকীটার কান্নায় তার তন্ময়তা ভেঙে যায়। একটা বিশ্রী দুর্গন্ধ এসে নাকে ঠেকে। সাবিত্রী খুকীটার পিঠে ঘা কয়েক বসিয়ে দিয়ে কাঁথাটা টেনে নিয়ে চলে যায়।

বিষ্ণুরাম ভাবে, এ সংসারে থাকা অপেক্ষা তার স্টেশন-ঘর অনেক ভালো—টরে টক্কা—টরে টক্কা—টরে টরে।

সেখানে আনন্দ না থাকতে পারে, অশান্তি তো নেই।

[১৩৫০



রত্নকূট

মেয়ে অবশ্যই আছে মোহনলালের। একটি নয়, দুটি। বড় মেয়ে অবন্তীর বিয়ে দিয়েছেন বছর দুই আগে। জামাই হয়েছে লোকের কাছে গর্ব করার মতো। অনেকগুলি পাশ করেছে, দেশী-বিদেশী ডিগ্রী আছে একগাদা। বিলেতেই কাটিয়েছে সাত বছর। অবন্তী সুখী, বড়-লোকের বাড়ির রাজকন্যের মতো দুপুরটা ফাঁকা যায় না তার, এক বছরের একটি মেয়ে আছে। মোহনলাল মনে মনে আঁকছেন, নাতনীর নাম রাখবেন ভক্তি। হঠাৎ কেমন করে যেন মাথায় ঢুকেছে নামটা, সবার অলক্ষ্যে মনে মনে, কখনও বা আস্তে আস্তে ঠোঁট নেড়ে নামটা আওড়েছেন। বেশ ভালো লেগেছে তাঁর। মোহনলাল প্রৌঢ়, স্ত্রী মারা গেছেন অলকার জন্মের মাস কয়েক পরেই। তাই অবন্তী থাকে বাবার কাছেই। বাবার নিঃসঙ্গ জীবনটা যদি এতে একরত্তিও রাসিয়ে তুলতে পারে সে।

ছেলে শোভন বিলেতে থেকে কোন-একটা ফার্মে পাবলিসিটি শিখছে। পথটা মোহন-লালের মনঃপূত হয়নি, তবু ছেলের শখ যখন হয়েছে বাধা দেবার তিনি কে। কিন্তু শোভন অন্য কিছু পড়লেই পারতো, বিজ্ঞাপন দিতে হলে আবার ইস্কুলে পাঠ নিতে হয় নাকি? তাহলে পাঁজিগুলো এত মোটা হতো না।

ভাবনা নেই, তবু ভাবতে ভালো লাগে তাঁর আর-একজনের জন্যে। কন্যাকন্যা অলকা, মোহনলালের ছোট মেয়ে। বিয়ের ভাবনা ভাববার অবশ্য বয়স হয়নি তার। ফ্রকের পাড় নাচিয়ে বেণী লটপটিয়ে খেয়ালখুশিতে নেচে বেড়ায়। মোহনলালের অতৃপ্ত চোখ চেয়ে চেয়ে দেখে, একটি অফুট ফুলের মতো ছোট মেয়ে অলকা তিল তিল করে ষোল কলা পূর্ণ হবার দিকে এগিয়ে চলেছে।

মা-মরা মেয়ে অলকা, বাপ ছাড়া অন্য পুরুষ চেনেনি। তাই তার কথাটাই বিশেষ করে বিচলিত করে তোলে মোহনলালকে। অলকা জীবনে কখনও চোখের জল ফেলবে ভাবতে পারেন না তিনি।

অফিসঘরের সাড়ে তিন হাত জানালার ফাঁক-ফাঁক গরাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন মোহন-লাল। হাতের চুরুট থেকে ধোঁয়া উঠছে দুলে দুলে, কুণ্ডলী পাকিয়ে। কারখানাটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। দেহের প্রতিটি স্নায়ু নিঙড়ে যেন তৈরী করেছেন এই অপূর্ব সৃষ্টি—

লোহালক্কড়ের এক টুকরো কবিতা।

করোগেটেড টিনের শেড ঢেউ খেলিয়ে এগিয়ে গেছে বহুদূর অবধি। পাঁচিলে ঘেরা এই বিরাট কারখানা আজ হাজার হাজার মুখে অন্ন তুলে ধরছে। ঘণ্টায় সতেরোখানা ওয়াগন মাল-বোঝাই হয়, তারপর সাইডিং-এর স্লিপার পিষে বিভিন্ন দিকে সরে পড়ে। মানচিত্রের ওপর তাদের গতায়াতের রেখা টানলে একটা মাকড়সার জটিল জাল ফুটে উঠবে। মেশিনঘরে মিনিটে সাত শ' নরম গরম নাটবল্টু ভরা-চৌবাচ্চায় ছিটকে পড়ে জলতরঙ্গের বোল ফোটায়, হাজার বাঈজীর নূপুর-নিক্কণ যেন থমকে চমক ভাঙে। আঠারোজন অ্যাকাউণ্টস্ ক্লার্ক আট মাস ধরে কাগজে খসখস করে আঁক কষে যায়, ইনকাম ট্যাক্সের অংক নির্ধারণ করে। এই স্থূলাংক আয়কর দেবার মধ্যে ত্যাগের গর্ব আছে প্রচুর। এই আত্মগরিমাটুকু থেকে মোহনলাল বঞ্চিত নন, কারণ সৌদামিনী আয়রন ওয়ার্কসের একক অধিপতি হচ্ছেন স্যার মোহনলাল।

এ-হেন স্যার মোহনলালের হঠাৎ কেমন যেন ভালো লেগে গেছে অমলেন্দুকে। চালাক চতুর, ছিমছাম, মিষ্টি ব্যবহার, কড়া সাহস ; বুদ্ধির বিদ্যুতে কালো মেঘের বুকে ছুরি বসাতে এতটুকু কিন্তু করে না। বেশ ছেলেটি, মোহনলাল ভাবেন। তবে, তাকে জামাই করার কথা ভুলেও ভাবেন না তিনি, সমাজে তাঁর আসন যে অনেক উঁচুতে সে সম্বন্ধে সদাসচেতন তিনি। জানেন, অমলেন্দুর মতো ছেলেদের মানুষ করে তুলতে, বড় করতে ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু কাছে টেনে আনা যায় না।

অমলেন্দুর কাছে উপকারটুকুই যথেষ্ট, তার চেয়ে বেশী কিছু চায়ও না সে। উপস্থিত চার্জহ্যাণ্ড থেকে অ্যাসিস্টেণ্ট ফোরম্যান, ব্যস্। আশি টাকা থেকে এক শ' পঁচিশ।

মোহনলাল যে তাকে বড় করে তুলতে চান তা তাঁর হাবভাবেই টের পেয়েছিলো অমলেন্দু। তবু, কারও ওপর একান্তভাবে নির্ভর করে নিজের প্রসপেক্টের ভেলায় ভেসে বেড়াবার পাত্র সে নয়। নিজেই উঠেপড়ে লেগেছিলো, পাঁচরকম সাজেসন দিতে, আবিষ্কারের লটারী খেলতে।

এইসব কারণে আজকাল ঘন ঘন ডাক পড়ে অমলেন্দুর। স্বয়ং মোহনলালের ডাক, কম সম্মানের নয়। সমপদস্থরা হাসিঠাট্টা করে, কুলী-মিস্ত্রীর দল আড়ালে খিস্তি ছড়ায়।

এমনি একটা ডাক পড়লো সেদিন।

দু-মানুষ উঁচু ঝকঝকে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা সৌদামিনী আয়রন ওয়ার্কসের একটেরে স্যার মোহনের খাসকামরা। ফারনেসের তাতানি মেখে বাতাস ভারী হয়ে ওঠে সারা কারখানার, হাঁপানির ধাতে গড়া ফাঁপালো চেহারার বাণিজ্য-চালক মোহনলাল সে হাওয়া বরদাস্ত করতে পারেন না। তাই টেলিফোনের লাগাম কষে রথখানাকে কারখানা থেকে দূরে বানিয়েছেন তিনি।

দু-দুবার ফোন করেও জবাব না পেয়ে তক্‌মা-আঁটা ভারিক্কি চালের চাপরাসীর মারফত রোলিং মিলের চার্জহ্যাণ্ড অমলেন্দু হাজরাকে সেলাম পাঠালেন স্যার মোহন। ক্রমশ বিরক্তি বোধ করছিলেন তিনি, মনটা ভালো নেই ইদানীং। ইনসমনিয়া নেই, তবু রাতে ঘুম হয় না। কেমন যেন লাগে, ফাঁকা-ফাঁকা। অন্ধকার হলেই কে যেন বুকের ভেতর থেকে এক মুঠো মাংস টেনে বের করে নেয়, কেমন যেন ফুসফুস ফেঁপে ওঠে। একা মনে হয় নিজেকে, ছটফট করেন, বিছানায় গড়াগড়ি দেন এধার থেকে ওধার পর্যন্ত। ফুলের মতো নরম বিছানা, তবু শুয়ে অস্বস্তি লাগে। মৃত মহালক্ষ্মীকে মনে পড়ে, স্ত্রীর প্রেতাত্মাটা যেন তাঁর চারপাশে চক্র কাটে। ধরা দেয় না। মাঝে মাঝে মোহনলাল মনে করেন, তাঁর ভুল হয়েছে। মহালক্ষ্মীর আসনটা আর কাউকে না দিয়ে জীবনটা ব্যর্থ করে তুলেছেন। কিন্তু। লজ্জা হয় যে! অবন্তী, অলকা, শোভন। কি করে মুখ দেখাবেন তিনি সমাজে? সন্ধ্যার সময় গাড়ি হাঁকিয়ে যখন ফেরেন মোহনলাল তখন যা-কিছু দেখেন রাতের নিঃসঙ্গতার মাঝে সব মনে পড়ে যায়। এনামেল-করা কয়েকটা মুখ—ফিকে আলোয়। হঠাৎ মনের ভেতর থেকে একটা ছি-ছি ঠেলে ওঠে। অবন্তী, অলকা। অলকা হয়তো ওর মায়ের মতোই হবে!

মোহনলালের তন্ময়তা ছুটে গেল।

হেড মিস্ত্রীকে গোটা কয়েক চুটকি উপদেশ দেয়া বাকী ছিলো, তাই দেরি হলো অমলেন্দুর। হাতের কাজ খসিয়ে রেখে পুরুসোল জুতোর শব্দ উঁচিয়ে প্রোপ্রাইটার মহারাজের কামরায় ঢুকলো অমলেন্দু।

ম্যাক্‌রোপোলোর চুরুটপর্ণী চুরুটিকায় একটি সূক্ষ্মতম টান দিয়ে চোখ তুললেন স্যার

মোহন। কড়া তামাকের ধোঁয়ায় ঝাঁঝিয়ে দিলেন বাতাস।

অতিপুষ্ট অধরোষ্ঠের মেকী হাসিতে বিদ্রুপের ঝিলিক ছড়িয়ে বললেন, সময় হলো ছোটসাহেবের?

—আজ্ঞে, হাতের কাজটা সেরে আসতে—

কথা শেষ করতে দিলেন না মোহনলাল।—এ দরখাস্তটা তোমার? ফাইল থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে ছুঁড়ে দিলেন অমলেন্দুর দিকে। একটু স্নেহের চোখে দেখেন বলে বড় বেশী অরিজিন্যালিটি দেখাবার শখ ছোকরার। একটু তড়পে দেবার ইচ্ছায় কড়া করে প্রশ্ন করলেন আবার, দরখাস্তটা তোমার?

হাজরার হাঁটু দুটো হকচকিয়ে ঠোকা খেলো।—আজ্ঞে হ্যাঁ। বিনিয়ে বিনিয়ে বললে সে, এই নতুন মেশিনটা বসালে প্রোডাকশন বাড়বে হুহু করে, আর লোকও লাগবে কম।

—আর সে লোকগুলো চাকরি ছেড়ে খাবে কি শুনি?

ধোপদুরস্ত ইকনমিস্ট হলে উত্তর যোগাতো অমলেন্দুর মুখে। তার বদলে সে শুধু ভাবলে, সর্বাঙ্গে রাজতিক বিষ মেখে বসে থাকলেও আসলে মোহনলালের উদার-চিন্তা-দিগন্তে সোনালী রেখাটা কি স্পষ্ট আর কি উজ্জ্বল!

স্যার মোহনের নুন খেয়েও যারা তাঁর গুণ গাইতে নারাজ মিঃ ওঝা তাদেরই একজন। তাই অমলেন্দুর মুখে তাঁর দারিদ্র্য-প্রীতির বর্ণনা শুনে বাঁকা ব্যঙ্গের হাসি হাসলে সে।

ওঝা বললে, সাবাস হাজরা। বুদ্ধি বটে তোমার। এমনি যা মাল বেরুচ্ছে তারই মার্কেট মিলছে না—

—কিন্তু যুদ্ধ তো আবার লাগলো বলে।

—লাগলে তো ভালোই, কম মাল তৈরী হলে উঁচু রেট পাবেন। আর যুদ্ধ লাগবে ধরে নিয়ে লাখ পাঁচেক টাকা খরচ করে একটা মেশিন আনানোর রিস্ক নেবেন কেন উনি? যুদ্ধের সময় তো সবই আনসার্টেন। কিন্তু কারখানা বাড়িয়ে শেষে যুদ্ধের পরে যদি সরকার থেকে সাবসিডি না দেয়? তখন যে সৌদামিনী আয়রন ওয়ার্কসের গণেশ মাথায় দাঁড়াতে বাধ্য হবে, সেটা ভাবো।

পাঠক কিন্তু বললে, আসলে কি জানো হাজরা, আমাদের দেশে যাদের টাকা আছে, বিশেষ করে তোমাদের বাঙালীদের মধ্যে, তারা অনেক আঁটঘাট বেঁধে বড় জোর একটা মিঠাইয়ের দোকান বানায়। আমেরিকা নয় যে জুতো থেকে জুয়েলারী অবধি সব কারবারেই মাথা গলাবে। একটা গাইয়ের দুধ বেচে যে আর-একটা গাই কি মোষ কেনা যায় তা এরা জানে না। সাবধানে পা ফেলেন মোহনলাল, আজকের লাভ পেলেই যথেষ্ট মনে করেন, কালকের চিন্তা নিয়ে মাথা ঘামান না।

ওদের মুখের ওপর কিছু বলতে পারলো না অমলেন্দু। বোকা ছাগলের মতো মার খেয়ে ফিরে এলো। কিন্তু মনে মনে সমর্থন করতে পারলো না। মোহনলাল তো ঠিক কাজটাই করছেন। এত টাকার রিস্ক নেয়ার কোনো মানে হয়? কত জানেন তিনি, প্রচুর ব্যবসায়-বুদ্ধির একটি জীবন্ত এনসাইক্লোপেডিয়া যেন! তা না হলে এত বড় হতে পারে কেউ!

বিগত সন্ধ্যার অন্ধকারে মোহনলাল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের চারপাশে সাতপাকের মোটরবিহার সেরে বাড়ি ফিরছিলেন! খুব ধীরে ধীরে একটা ছোট গলি পার হচ্ছিলো তাঁর মোটর। হঠাৎ চোখ পড়লো একটা বাড়ির রকে। দোতলার জানালায় রাখা একটা হারিকেন লণ্ঠনের টিমটিমে আলোর খানিকটা এসে পড়েছে রকের ওপর। গুটি তিন-চার মেয়ে অপেক্ষমাণা অভিসারিকার মতো প্রহর গুনছে। রংদার শাড়ি, আঁখির কোণে সুর্মা আঁকা। নরম হাতে গাছ-কয় করে কেমিকেল সোনার চুড়ি। ওদেরই মধ্যে একজনের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন মোহনলাল।

আঠারো বছরের সোহাগীর দিকে চোখ পড়েছিলো মোহনলালের। বাচ্চা বয়েস। করমচা-কাঁচ মুখ, কপালে একটা বড় আকারের কালো টিপ! সোহাগীর মনে বেশ একটু লোভ চাগিয়ে উঠছিলো, এমন মোটর, জাঁকজমকের পোশাক-পরা ড্রাইভার, সোনার মোটা

চেন মোহনলালের বুক-পকেটে। এসব লোক খুচরো খদ্দের হয় না, বেশ কিছুদিনের ভাবনা-চিন্তা মিটিয়ে দিতে পারে। শুধু চোখের ইশারায় হলো না, হাত নেড়ে এক পা এগিয়ে গেল সোহাগী। মুখে কি যেন বললেও আস্তে আস্তে।

মোহনলাল হাঁক ছাড়লেন, এই বাহাদুর, গাড়ি রোখো।

শাড়ি ঠিক করে নেবার ভঙ্গীতে সোহাগী আঁচলটা খুলে ভাঁজ করে নিলো, সরু আকারের আঁচলের রেখাটা টানটান করে বুকের মাঝখান দিয়ে চালিয়ে দিলো তারপর।

মোহনলাল গাড়ি থেকে নামলেন। পা বাড়াতে যাচ্ছিলেন সোহাগীর দিকে। বাধা পেলেন।

বাহাদুর মনে মনে ভক্তি করে মোহনলালকে। তার বারো বছরের কর্মজীবনে মোহনলালের পদস্খলন কখনও দেখেনি সে। আজ সব শ্রদ্ধা মাটি হতে বসেছে দেখে সে আর নিজেকে সামলাতে পারলে না।

—সাহাববাবু, কাঁহা যাতে হেঁ সাহাববাবু।

চমকে ফিরে তাকালেন মোহনলাল। তারপর দ্রুত গাড়িতে চড়ে দেহ এলিয়ে দিয়ে মোটর হাঁকাতে বললেন জোরে। লজ্জায় মুখ তুলতে পারছিলেন না তিনি। ছি ছি, বাহাদুর কি ভাবলে! আর তিনিই বা গাড়ি থেকে নেমে ওদিকে যাচ্ছিলেন কি করে। একটা আত্মধিক্কার পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠছিলো তাঁর পাঁজরে। অবন্তী, অলকা, ছি ছি, অলকা যদি কোনরকমে জানতে পারে এ কথা, মোহনলাল মুখ দেখাবেন কি করে! ভাগ্যিস বাহাদুর ডাক দিলে। নাঃ, লোকটাকে কিছু বকশিশ দিতে হবে, মুখটাও বন্ধ করা যাবে সেই তালে। না, ও পথে আর কোনো দিন যাবেন না মোহনলাল। এসব জানলে কি অলকা তাঁর সামনে আসবে আর। কচি খুকীটি নয় সে, অনেক কিছু শিখেছে, নিজেকে লোকের চোখে বড় প্রমাণ করার জন্যে ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছে।

অনেকদিন পরের এক দুপুরে অফিসঘরে বসে বসে সেদিনের কথাই ভাবছিলেন মোহনলাল। ভেবে দেখলেন দোষ তাঁরই। মহালক্ষ্মীর মৃত্যুর পর সে আসনটা আর কাউকে না দিয়ে বড় ভুল করেছেন।- বয়স যত বাড়ছে, বিরক্তি তত জেঁকে আসছে। হাজার রকম ঝঞ্ঝাট জুটছে। অবন্তী সাবধানবাণী জানিয়ে দিয়েছে, অলকা নাকি বড় লাফালাফি শুরু করেছে। স্কুল থেকে ফিরতে বড় বেশী দেরি করে, অনেক রাত পর্যন্ত ঘরে আলো জ্বলে অলকার। তা ছাড়া ভক্তির আয়াটা নাকি জানিয়েছে অবন্তীকে, কি-একটা চিঠি অলকা—। যাক্, সে কথা। এদিকেও হাঙ্গামা কম নয়। যুদ্ধ লেগেছে আর সঙ্গে সঙ্গে বুনো জাল গুটিয়ে এসে তাঁর সমগ্র মন আচ্ছন্ন করে ফেলছে। লোহার বাজার কুয়াশার মতো দুলছে। জ্বরো রুগীর মতো ডেলিরিয়ামে তড়কাচ্ছে জিনিসের দর। শ্রমিকদের পক্ষ থেকে মিঃ ওঝা শাসিয়ে গেছে, মাইনে বাড়াতে হবে। শেফিল্ডে একটা নতুন মেশিনের জন্যে লাখখানেক টাকা অ্যাডভান্স পাঠানো হয়ে গেছে, শত্রু-সাবমেরিনের চোখে ধোঁকা দিয়ে মালের জাহাজ এসে পেঁছিলে হয়। স্যার মোহনের ব্যক্তিগত গোপন-সচিব এখনো ক্যালকুলেটারে আঙুল টিপছে, হিসেব কষে বের করতে হবে মিলিটারীর নাট আর বোল্টের চাহিদা মেটাতে কতর টেণ্ডার দেয়া প্রয়োজন। এই সব হাজারো চিন্তা তাঁর মগজে।

এমন সময় অমলেন্দু এসে ঢুকলো। বসতে বললেন মোহনলাল।

কাজের কথা শেষ করে প্রশ্ন করলেন, হ্যাঁ হে, তুমি নাকি জয়েন্টের নতুন কি-একটা ডিজাইন এক্সপেরিমেণ্ট করছিলে শুনেছিলাম, কি হলো সেটার?

—আজ্ঞে, সাকসেসফুল হয়েছে, তবে পেটেণ্ট করাইনি। আপনার কারখানার সাহায্য নিয়েই তো করেছি, ওটা আপনাকেই উপহার দিতে চাই।

অ্যাশ্-ট্রে থেকে জ্বলন্ত চুরুটটা তুলে নিয়ে আবার নামিয়ে রাখলেন স্যার মোহনলাল। বললেন, বেশ বেশ।

কোনো বিদেশী ব্যবসাদারকে ডিজাইনের পেটেণ্টটা বিক্রি করে মোটা রকমের থোক টাকা পাবার সম্ভাবনা বোধ হয় ছিল, অথচ এমন কথাটা কি করে যে বলে ফেললে সে, অমলেন্দু নিজেই বুঝে উঠতে পারলে না।

স্যার মোহনলালও অসম্মতি জানালেন না, শ্রদ্ধার অর্ঘ্য কখনও ফিরিয়ে দেন না তিনি।

প্রবঞ্চিত প্রেয়সীর মতো নিজের মনকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করলে অমলেন্দু। এর ফলে লিফ্‌ট্‌ হয়তো মিলতে পারে একটা।

স্যার মোহন পুনরায় বললেন, তোমার ইনটেলিজেন্স আছে, জীবনে উন্নতি করবে তুমি, দেখে রেখো।

হাত কচলাতে কচলাতে বিনয়ে গলে পড়লো অমলেন্দু।—আজ্ঞে অত আশা করি না। তবে—

—দেখে নিও হে, দেখে নিও। ন্যু ইয়র্কের ওয়াল স্ট্রীটে শেয়ার নিয়ে মারামারি লেগে যায় আমার ফোরকাস্টের গুণে। আর আমার কথার দাম নেই বলতে চাও? আত্মগর্বের আনন্দে আপ্লুত হয়ে হাসলেন মোহনলাল।

—হ্যাঁ, আর একটা কথা, কাল আমার ছোট মেয়ে অলকার জন্মদিন, তোমার নেমন্তন্ন রইলো সন্ধ্যেয়। আমার বড় মেয়ে তোমাকে দেখতে চায়। আমার কাছে প্রায়ই শোনে কিনা তোমার কথা।

অমলেন্দুর প্রতিটি দেহাঙ্গ নেচে উঠলো আনন্দে। ঘুঙুরের বোল ফুটলো মনের অলি-গলিতে। স্যার মোহনের বাড়িতে নিমন্ত্রিত হবার সৌভাগ্যটা কম নয়। বিশ্বাসের আওতা ঢেকে এই ক্ষুদ্র অনুগ্রহের ওপর প্রকাণ্ড এক মহীরুহ গজিয়ে তুলতে হবে।

রোলিং মিলের একজন চার্জহ্যাণ্ডের পক্ষে যন্ত্রপতির প্রাসাদে ঢুকতে পাওয়ার গর্ব আছে বইকি। চারিদিকের বাতাসে কথাটা না রটিয়ে থাকতে পারলে না অমলেন্দু। কারখানার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অবধি একটা মধুপগুঞ্জন শুরু হয়ে গেল।

ফোরম্যান সান্যাল পিঠ চাপড়ে বললে, শোনো তা'লে একটা গোপন খবর দিই তোমাকে। গোটা কয়েক ছোকরাকে বাজিয়ে নিচ্ছিলেন স্যার এম. এল.। জামাই পদের শিকে ছিঁড়লো শেষ পর্যন্ত তোমারই ভাগ্যে। ওঁর বড় ছেলে শোভনটা তো একটা স্কাউণ্ড্রেল, মেম বিয়ে করে বিলেতে বসে আছে। আর বড় জামাইটা বিদ্বান হলে হবে কি, একেবারে পাঁড় মাতাল। কারখানা-টারখানা সব-কিছুরই চার্জ দিতে হবে ছোট জামাইকে। তাই কাজের লোক খুঁজছেন উনি।

কথাটা অবিশ্বাস্য বলে হেসে হালকা করে দিলো অমলেন্দু। তবু বিশ্বাস করতে কেমন যেন ভালোও লাগে। অদ্ভুত এক পুলক বয়ে যায় সমগ্র স্তিমিত চেতনার স্তরে স্তরে। অলকা, এই কারখানা, ঐ বিরাট সৌধ। তার ইঙ্গিতে চলবে হাজারো শ্রমিক। গ্যাস ফারনেস, ক্রেন, ট্রলি, বয়লার টিউবের সারি, জয়েস্ট অ্যাঙ্গেলের স্তূপ, এমন কি মাটিচাপা ঐ নাটগুলো পর্যন্ত কেউ সরাতে পারবে না তার আদেশ না নিয়ে। এমন দিন একটা আসতে পারে সত্যই! আর অলকা? অলকাকে সুখী করবে সে সমস্ত প্রাণ দিয়ে, এতটুকু দুঃখের আঁচ লাগতে দেবে না তার গায়।

দূরসম্পর্কের এক মামার বাড়িতে নেমন্তন্ন ছিলো অমলেন্দুদের। মোহনলালের বাড়িতে না গেলেই নয়, তাই মা-বোনকে যথাস্থানে পেঁ'ছে দিলো একটু সময় থাকতে। হঠাৎ এতদিন পরে মামার ডাক পেয়েই উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিলো সে। তাঁরই কোনো অবিবাহিতা আত্মীয়াকে হয়তো সামনে এসে বসে বসে ঘামতে হবে, আর অমলেন্দুকে মতামত দিতে হবে। কাজেই সে ধরনের কিছু একটা ঘটলে মা যাতে কোনো প্রতিশ্রুতি না দিয়ে বসে সেজন্য বারবার সাবধান করে দিয়ে অমলেন্দু চলে এলো।

স্যার মোহন অতিথি আপ্যায়নে ব্যগ্র হয়ে ছুটে এলেন। আর তাঁর পিঠে মুখ ঢেকে বেণীজোড়া লটপটিয়ে লঘু পদক্ষেপে এগিয়ে এলো অলকা। নিশ্চিন্ততার আতিশয্যে চোখ ভরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলে অমলেন্দু। সদ্য শৈশবোত্তীর্ণা তন্বীর রূপ যেন আজই প্রথম চোখে পড়লো তার।

স্টেজ বাঁধা হয়েছে একটা বিরাট হল-ঘরে। হাজার-বাতির জৌলুসে চোখে ধাঁধা লাগে অমলেন্দুর। চীনেলণ্ঠনের বর্ণবৈচিত্র্যে মনটা কেমন যেন খাপছাড়া আনন্দে উদাস হয়ে ওঠে। ঘোলাটে খুশির জোয়ার আসে। চাঁদের আলোয় আর বৈদ্যুতিক জ্যোৎস্নায় রঙবেরঙের শাড়ি খেলছে অগণিত তরুণী-অঙ্গে। সুসজ্জিত ঘরের কিনারায় কিনারায় রামধনু ফেটে পড়ছে।

অলকার জন্মদিন। কিউরিও থেকে গজদন্তের ওপর কাজ-করা একটা মূর্তি নিয়ে গিয়েছিলো অমলেন্দু। সংযুক্তাকে বুকে চেপে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে পৃথ্বীরাজ। উপহারটা অলকার হাতে দিয়ে আহারান্তে বাড়ি ফিরলো সে।

বড় বিশ্রী একটা স্বপ্ন দেখেছেন স্যার মোহনলাল। গত রাত্রে একা একা বিছানায় পড়ে অস্থিরতায় কাতরাতে কাতরাতে হঠাৎ কখন শ্রান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তারপরই স্বপ্নটা দেখে ঘুম ভেঙে যায়। কি একটা কাজ শেষ করে ফাইলটা ঠেলে সরিয়ে রেখে মনে মনে রোমন্থন করতে শুরু করলেন। কি অর্থ এই স্বপ্নটার? একটা খুব উঁচু পাহাড় বেয়ে তিনি যেন উপরে উঠছিলেন, হঠাৎ চোখে পড়লো তাঁর মাথার উপরেই ঘোরানো পাহাড়ে রাস্তা বেয়ে অপূর্ব সুন্দরী একটি মেয়ে হেঁটে চলেছে। মেয়েটির কাঁখে একটি ঘড়া, মোহরে মোহরে ভর্তি। ভোরের আলো পড়ে মোহরগুলো সোনালী দিগন্তের রঙে রঙে মিশে চিকচিক করছে। কেমন করে যেন অকস্মাৎ পা পিছলে পড়ে গেল মেয়েটি, তারপর গড়াতে গড়াতে নীচে পড়ে যেতে লাগলো। মোহনলালের কাছাকাছি আসতেই দু-হাত বাড়িয়ে তিনি মোহরের ঘড়াটা ধরে ফেললেন। এক হাতে সেটাকে ধরে রেখে অন্য হাতটি বাড়িয়ে মেয়েটিকে বাঁচাতে গেলেন. কিন্তু তখন আর উপায় নেই। মেয়েটি অনেক নীচে চলে গেছে। একটা খাদের মধ্যে সশব্দে পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনলেন তিনি। ঘুম ভেঙে গেল।

রিভলভিং কেদারাটা দুবার দুলিয়ে নিয়ে শরীরে আয়েশের প্রাচুর্য আনবার জন্য কসরত করে আরামে বসলেন তিনি। চেহারাটা মোহনলালের দেখবার মতো। মোটা হয়েও অদ্ভুত স্মার্ট, চশমা খুলে কথা বলেন। শোভন জন্মেছে চব্বিশ বছর আগে, তবু মোহনলালকে দেখলে মনে হয় যেন যুবক। কিন্তু প্রথম দর্শনে সাধারণে তাঁর বয়সের যে আন্দাজটা করবে, সেটা আসলের অন্তত পনেরো বছর কম। আশ্চর্য! এত খেটেও কি করে যে এমন চেহারা রেখেছেন! মোহনলাল মানুষও মন্দ নন। তিনটে ফ্রি কিচেন খুলে দিয়েছিলেন দুর্ভিক্ষের শেষের দিকে। দেশের কঙ্কালসার মানুষগুলো না খেতে পেয়ে মরছে দেখে তাঁর চোখেও জল আসতো।

অমলেন্দু এসে ঘরে ঢুকলো। অলকার বিবাহ সম্বন্ধে গুটিকতক কথা আছে এই জানিয়ে ফোনে ডেকে পাঠিয়েছিলেন তিনি। আগ্রহ. আনন্দের রোমান্স বুকে চেপে ধীরে ধীরে সামনে এসে দাঁড়ালো অমলেন্দু।

অ্যাশ্-ট্রে থেকে চুরুটটা তুলে নিয়ে আবার নামিয়ে রাখলেন স্যার মোহন।

বললেন, মূর্তি রিটায়ার করায় এ-এফের পোস্টটা খালি হলো। ইচ্ছা ছিলো তোমাকে দেবো, কিন্তু ভেবে দেখলাম অন্য সবাই হয়তো ক্ষুণ্ণ হবে সিনিয়র ক্যান্ডিডেটদের চান্স না দিয়ে তোমাকে দিলে।

অমলেন্দু একটু ধাক্কা খেলো। বললে, কিন্তু আমার চেয়ে কোয়ালিফায়েড তো কেউ নেই।

—হ্যাঁ, সে তো নিশ্চয়ই। তাই তোমারও আত্মসম্মানে যাতে না লাগে. তাই বাইরে থেকে একটি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ছোকরাকে আনাচ্ছি।

নিরুপায় অমলেন্দু তথাস্তু-সূচক মাথা নীচু করলে।

—হ্যাঁ. আর-একটা কথা। নড়ে-চড়ে বসলেন বঙ্গীয় বাণিজ্যপতি। বললেন, অলকার বিয়ে এই দিন-বিশেকের মধ্যে। তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।

শুনে সাদা হয়ে গেল অমলেন্দুর মুখ। আকস্মিক ব্যর্থতার ভাপে বুকটা ফেঁপে উঠলো। এতদিন কল্পনার রঙ বুলিয়ে যে স্বপ্নসৌধ গড়ে তুলছিলো সেটা আশা-আশঙ্কার হাওয়ায় দুলে উঠতো মাঝে মাঝে. কিন্তু এমন হঠাৎ-ঝড়ের দাপটে যে কোনদিন চুরমার হয়ে যাবে তা ঘুমের ফাঁকেও কোনদিন মগজে ঢোকেনি। বোকামির চূড়ান্ত করেছে। লজ্জায় মাথা তুলতে পারছিলো না সে। পুরনো দিনের স্বেচ্ছাকৃত ভুলটা নতুন করে মনে পড়লো। ডিজাইনের পেটেন্টটা নিঃস্বার্থভাবে দান করা উচিত হয়নি তার, কোনো বিদেশী ফার্মকে উচিত মূল্যে বিক্রি করাই ভালো ছিলো।

অমলেন্দুকে চুপ করে থাকতে দেখে স্যার মোহনলাল বললেন, কি হে, পারবে না করতে?

মিয়ানো মুড়ির মতো কাদা হয়ে হাত কচলাতে কচলাতে বললে সে, আজ্ঞে তা আর পারবো না কেন? কি কাজ বলুন?

—আমার হবু-জামাইটিকে সঙ্গে করে বিয়ের বাজার করতে হবে তোমাকে।...আর বিয়ের তত্ত্বটা তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। সে অবশ্য পরের কথা, এখন এই বাজারটুকু করে দাও। গাড়ি যাবে, অলকাও যেতে পারে হয়তো।

অমলেন্দু ঘাড় হেঁট করে বললে, আজ্ঞে তা আর পারবো না কেন!

রাত মজে এসেছে। এত দেরিতে বাড়ি ফেরা মোহনলালের বিপত্নীক জীবনে এই প্রথম বোধ হয়। মনটা কেমন উসখুস করে তাঁর। কিছু ভালো লাগে না যেন। দু দিন মাত্র বাকী, তারপরই শুভ লগ্ন দেখে অলকা একটি অপরিচিত অধ্যায় পড়তে শুরু করবে। অলকা চলে যাবে। এইবার মোহনলালের জীবনে সত্যিকারের একটি ক্লান্তি নেমে আসবে। সংসারে নিজেকে একা মনে হবে। অবন্তীই বা কতদিন! শোভন হয়তো আর ফিরবেই না। এতদিন তবু কোনরকমে দিন কাটিয়েছেন, অলকা চলে গেলে মহালক্ষ্মীর অভাব ভালো বুঝতে পারবেন। মহালক্ষ্মী বেঁচে থাকলে আজ এমন ছন্নছাড়া হতে পারতেন না তিনি। জীবনে বিতৃষ্ণা আসতো না।

হাজারো কথা ভাবতে ভাবতে আবছা আঁধারে পিছনের দিকে যে পেঁচানো পেঁচানো সিঁড়ি আছে, সেইটে বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করলেন স্যার মোহন। টেনিস খেলোয়াড়ের মতো স্মার্ট চেহারার মোহনলালও হাঁপিয়ে উঠছিলেন। এখনও হাড়ের গায়ে এমন কিছু চর্বি জমেনি, তবু এই ঘোরানো ঘোরানো স্পাইরেল সিঁড়ির ক্ষুদে ক্ষুদে ধাপ ভেঙে উপরে উঠতে কষ্ট হচ্ছিলো তাঁর। মনে এদিকে অপরিসীম বিরক্তি। হাতের জ্বলন্ত চুরুটটায় টান দেবার আগে আনমনে ভুল করে ছাই ঝেড়ে ফেললেন স্যার মোহন। একটা পাতলা টান দিলেন তিনি।

চুরুটটা দূরে ছিটকে ফেলে দিয়ে অস্ফুটে বলে উঠলেন, ধুৎ!

ওপরে উঠে নিজের ঘরে এসে বিছানার ওপর বসলেন। স্যুটটা খোলবার মতো শক্তিও যেন আর নেই। হঠাৎ কি খেয়াল হলো, পা টিপে টিপে উঠে এলেন। অলকার ঘরে আলো জ্বলছে! আস্তে একটু ধাক্কা দিতেই কপাটটা খুলে গেল। ভেতরে ঢুকলেন স্যার মোহন। দেখলেন অলকা ঘুমুচ্ছে। চোখের পাপড়ি দুটি ফাঁক করে ঘুমোয় অলকা, চিরদিনের অভ্যাস তার। নীল তারা দুটি একটুখানি উঁকি মারছে, অন্য কেউ দেখলে মনে করবে জেগে আছে। নিজের মনেই একটু হাসলেন তিনি। অকস্মাৎ তাঁর মনে হলো নিশীথতন্দ্রা ছুটে যাওয়ার রাত্রে মহালক্ষ্মীকেও তিনি ঠিক এমনিভাবেই শুয়ে থাকতে দেখেছেন। টেব্‌ল লাইটটা নিবোতে ভুলে গেছে হয়তো, স্পীডে ঘুরছে টেব্‌ল ফ্যান। কি একখানা বই পড়ছিলো, তারই ওপব ডান হাতটা লুটিয়ে পড়েছে। আরামে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে ঘুমুচ্ছে অলকা। কোনো সুখস্বপ্ন উপভোগ করছে হয়তো! মোহনলালের শরীরে শিরা-উপশিরাগুলো যেন কেঁপে উঠলো। অলকা এত সুন্দর! মহালক্ষ্মীর চেয়েও সুন্দর! অথচ চোখে পড়েনি তাঁর? বহুক্ষণ ধরে একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখলেন তিনি। তারপর আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

পাশের ঘরে আয়ার কাছে ঘুমুচ্ছে ভক্তি। পা টিপে টিপে ঢুকলেন এ ঘরেও। দোলনায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে ভক্তি, তন্দ্রার ঘোরে চুষিটা ঠোঁট দিয়ে চাটছে মাঝে মাঝে। আয়াটা ঘুমুচ্ছে অকাতরে।

ক্রমে ক্রমে ঘামের ফোঁটা সারি বেঁধে ফুটে উঠলো তাঁর কপালে। আস্তে হাত বাড়িয়ে ভক্তির গাল দুটো হাতের মুঠোর মধ্যে চাপলেন। তারপর বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন, ভক্তি চুষি চুষছে তন্দ্রার ঘোরে। হঠাৎ নিদ্রিতা আয়াটার দিকে চোখ পড়লো তাঁর! ভক্তির হাত থেকে চুষিটা কেড়ে নিতে ইচ্ছে হচ্ছিলো। কিন্তু কাঞ্চনী আয়ার দিকে চোখ পড়তেই সেদিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। পাহাড়ী মেয়ে এই আয়া। আপেল-লুকানো গাল, সুস্থ

আর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহ। লাবণ্য টলমল করছে গালে। ঘুমের ঘোরে বসন হয়েছে শিথিল। আঁচল খসে পড়েছে বুক থেকে, লাল গুলবাহার আঁট আঙিয়ার বাঁধন চোখ ঝলসে দেয়। স্যার মোহনলাল চোখ ফেরাতে পারলেন না। আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলেন তিনি।

চকিতে কাঞ্চনীর ঘুম ভেঙে গেল। চোখ চেয়েই বিস্মিত হলো সে, ভয়ে আশঙ্কায় একটা অস্ফুট শব্দ বের হলো তার মুখ থেকে। মোহনলালকে দুটি কোমল হাতে ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করলে। তারপর, কি মনে করে আলস্যের ভঙ্গিতে ছেড়ে দিলে নিজেকে মোহনলালের হাতে। স্যার মোহনলাল, লক্ষপতি মোহনলাল এসেছেন! জয়ের অভিব্যক্তি ফুটে উঠলো তার মুখে চোখে। লজ্জিত হাসি চেপে চোখ বুজে নিশ্চুপ পড়ে রইলো কাঞ্চনী।

[১৩৫২



সহযোগ

রেলের কলোনী। পাহাড় ফাটিয়ে টানেল কেটে এগিয়ে গেছে রেলের লাইন। জঙ্গল সাফ করেছে, জাঙ্গাল বেঁধেছে। রূপনারায়ণ আর মহানদী, কংসাবতী আর মধুমাটির মতো হাজারো ছোটবড় নদী। তন্বী শ্যামার শীর্ণ দেহ কোনোটির, আর কোনোটি বা স্তনিত তরঙ্গিণী।

অর্থপিপাসু প্রয়োজনের মন কিন্তু রসাহরণ করতে ছাড়েনি। বিশালদর্শন লোহার থাম, বড় বড় টি আর জয়েন্ট, অ্যাঙেগল আর স্টিলের পাত দিয়ে মুড়ে দিয়েছে নাগরাশ্লেষী নদীর বুক। ইস্পাতের আঁট-কাঁচুলির চাপে থেমে থিতিয়ে গেছে অধীর স্পন্দন! নাগরী নদী অ্যানিকাটের জানালা দিয়ে লুকিয়ে সাগর দেখে। শাড়ির পাড়ের মতো এক জোড়া রেল লাইন ব্রিজের ওপর। এসে ঢুকেছে কলোনীর স্টেশনে।

পুবের প্লাটফর্ম থেকে দূর-পশ্চিমের ওয়ার্কশপ অবধি লম্বা লাল কাঁকরের রাস্তা। খানিকটা সোজা গিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়েছে একটা ভাঙা পাহাড়ের গায়ে। তারপর ট্রলি লাইনের গা ঘেঁষে ঢুকে গেছে কারখানার ভেতর।

দক্ষিণ পাড়াটা অফিসারদের। এদিকটা লাল কাঁকর নয়, পিচ-ঢালা চিকচিকে মেটাল রোড। ভোর সকালে হোসপাইপের জলের ফুরফুরি লেগে স্নিগ্ধ আর কমনীয় হয়ে ওঠে দেওদারের সবুজ পাতা। অ্যাভিন্যু গোছের সড়ক, দু-পাশে দেবদারু আর অর্জুন গাছ। অশোক আর আমলকী দাঁড়িয়ে আছে মাথা উঁচিয়ে। স্পঞ্জের মতো নরম হলদে মুচকুন্দের পাপড়ি।

শেষ-দক্ষিণের সবচেয়ে বড় বাংলোখানাই কর্নেল জনসনের।

বিরাট বাগান বাংলোর সামনে। কত রকম-ধরনের ফল আর ফুল। রাঙা লতা আর রঙিন পাতা। চওড়া ফটক থেকে পর্চের নীচে অবধি একটা ছোট্ট সরু রাস্তা। নুড়ি-পাথরের রাস্তাটার দুধারে ঝাউয়ের সারি। গুঁড়ির চারপাশে চক্রাকারে সাজানো মার্বেলের মালা। দিনের রোদ রুখতে দোতলার বারান্দাটায় টাঙানো থাকে সবুজ চিকের পর্দা।

বিস্তৃত বাগিচায় পাতা আছে সবুজ ঘাসের জাজিম। কাঁটাবেড়ার পাশে পাশে সাদা ধবধবে অটল অনড় ইউক্লিপটাসের গুঁড়ি। ক্রিসেন্থিমাম আর কাঠগোলাপ। মৌসুমী ফোটে মৌসুম বুঝে। ছোট ঝরনার মতো পাহাড়ী নদী পিয়ালীর ওপর কংক্রিটের সাঁকো। জনসনের জনশূন্য হারেম দেখা যায় সেখান থেকে।

এত বড় বাড়িটায় একা থাকেন কর্নেল জনসন। একা, সম্পূর্ণ একা। স্ত্রী নেই, পুত্র নেই, নেই কন্যারত্ন। কোনো আত্মীয়-অনাত্মীয়রও টিকি দেখা যায়নি এ-বাড়িতে।

চীফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার কর্নেল জনসন। কলোনীর লোকের চোখে অদ্ভুত এক গোপন রহস্য। একে ঘিরেই অনাবিষ্কৃত এক আশঙ্কার ছাপ প্রতিটি বাসিন্দার বুকে। বাবুলডিহির ডিরেক্টর এই কর্নেল জনসন।

জনসন কর্নেলের ধাপ অবধি উঠেছিলেন মহাযুদ্ধে। মেসোপটেমিয়ার এক ট্রেঞ্চ-ফাইটে বেয়নেটের খোঁচা লেগে গলে গিয়েছিলো বাঁ চোখের তারা। লণ্ডনের একটা পাইপ-অ্যাক্সিডেণ্টে জখম হয়ে ডান হাতটা কেটে বাদ দিতে হয়েছে কাঁধ থেকে। লোকে বলে বসন্ত, তা নয়, যৌবনের অ্যাক্‌নি ভালগারিসের দাগ সমস্ত মুখে। ডান দিকের কোটের হাতাটা লটপট করে, বাঁ চোখের ঝিমিয়ে-পড়া পাতা দুটোর মাঝখানে খানিকটা লালচে মাংস। মুখে সব মিলে একটা বীভৎসতার ছাপ রেখে গেছে।

জনসনের জরু ছিলো কি না তাই নিয়ে মাতামাতি করে বুড়োরা। অনেকের ধারণা মিসেস জনসনও ছিলো একজন। সে বোধ হয় কোনো আমেরিকান ডলারপতির সঙ্গে পালিয়েছে। বাংলো-পিওন চোখেলাল নাকি দেখেছে, জনসন রোজ সন্ধ্যার সময় একগোছা ফটোগ্রাফ নিয়ে নাড়াচাড়া করেন। সময়ে সময়ে তাঁর ডান চোখ বেয়ে নাকি ঝরঝর করে জল পড়ে। ওয়াগন শপের ফোরম্যান উত্তম সিং দেখেছে হুইলার থেকে সংস্কৃত গীতা কিনতে। ওয়াচ অ্যান্ড ওয়ার্ডের গুরখা প্রহরী একজন বলেছিলো, রাতের বেলায় জনসন নাকি ছদ্ম-বেশে লেবার কোয়ার্টার্স দেখে বেড়ান। তাদের দুঃখ-দুর্দশা ছলছল চোখে তাকিয়ে দেখে ফরফরিয়ে বের করে দেন পাঁচ-দশ টাকার নোট, ট্রাউজারের পকেট থেকে।

বাঁ হাতে নামসই থেকে সাত পাতা ড্রাফ্‌ট অবধি করতে পারেন জনসন সাহেব—বাঁ হাতে। বাবুলডিহির পার্কে পার্টিতে, ক্লাবে কনফারেন্সে সবচেয়ে বেশী সম্মান জনসনের। ডোরা-ডরোথীদের ভয়ভক্তি সাজশ্রদ্ধা শুধু জনসনকে ঘিরে। কটা আর কালো, ট্যান কালার আর টানা চোখের চাপা বুকে যে ন্যাশনাল অ্যান্থেমের সুর বাজে, সে গানের কিং হলেন কর্নেল জনসন। জনসন কিন্তু নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখেন এসব থেকে। চার্চে তিনি অলটারের সামনে গিয়ে বসেন। পারফিউমড চুলের সুবাসেও মুখ ফেরান না।

এ-হেন কর্নেল জনসনের বাড়ি এটা।

জোর কদমে ফিরে আসছিলো শিবনাথ।

জংশন স্টেশনের অসংখ্য জোড়া জোড়া লাইন গড়িয়ে গেছে। লেবেল ক্রসিং-এর দুধারে এক্‌সপ্যাণ্ডেড মেট্যালের গেট। ওভারব্রিজ দিয়ে পার হতে সময় লাগে, তাই বিপদ অগ্রাহ্য করে হেঁটে চললো শিবনাথ। মনটা আজ তার ফুর্তিতে ভরে আছে।

লম্বা কোয়ার্টারের রেঞ্জ। টালির ছাদ, খান তিনেক ঘর, জলের কল। এই ধরনের গায়ে-গা-লাগানো দশখানা কোয়ার্টার নিয়ে এক-একটা ইউনিট। দাঁত-বের-করা ইটের দেয়াল, পয়েণ্টিং-এর সুরকি খসে গেছে বহুদিন। ছোট ছোট গরাদে জানালা, আর কাঠের জাফরিতে ঘেরা বারান্দা। অন্য দিন হলে বেকার শিবনাথ কয়েকটি বিশেষ জানালায় অনুসন্ধানী দৃষ্টি ছড়াতো। আজ আর প্রয়োজন নেই, খোরাক জুটে গেছে।

গির্জেটার পাশ দিয়ে এগিয়ে চললো শিবনাথ। মনে মনে রোমন্থন করছিলো সদ্য-দেখা ঘটনাটা। রানীকে বলতে হবে আজই।

কোল ভিল ওঁরাও আর মুণ্ডা, যারা মাত্র একপুরুষ হলো যীশুর বাণী শুনেছে মিশনারীদের মুখে, না খেতে পেয়ে টাকার মর্ম বুঝেছে এবং বুঝে অন্ধকার থেকে আলোকে এসে সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে, তাদের জন্যে রেল কোম্পানী বানিয়ে দিয়েছে অভ্রংলিহ বনস্পতির মতো এক বিরাট গির্জে। ক্রিস্টমাসের সময় ইণ্ডিয়ান ক্রিশ্চানদের এই গির্জে সাজাতে কোম্পানী থেকে খরচ স্যাংশন করে বারো হাজার টাকা। অথচ, ছোট ছোট কোয়ার্টারের ফাটা ছাদে পিচ-ডামরের পটি লাগাবার জন্যে এ-বর্ষায় দরখাস্ত করলে ও-বর্ষায় আলকাতরার তুলি বুলিয়ে দিয়ে যাবে। তা হোক, গির্জেটার কোথাও নেই এতটুকু

খুঁত, পুরোদস্তুর ফ্যাশনেবল।

গির্জে থেকে আশি গজ ব্যবধান রেখে শুরু হয়েছে কেরানীবাবুদের কোয়ার্টার। কয়েকটি বাঙালী পরিবার এই কসমোপলিটান আবহাওয়ার মধ্যে দিন কাটায়।

কি মনে করে খিড়কির দিকে দ্রুত এগিয়ে গেল সে। চকিতে দেখলে শাড়ির আঁচল দুলিয়ে কে যেন ঘরে ঢুকলো। দ্রুতপায়ে ভেতরে ঢুকলো শিবনাথ। শব্দ শুনে ফিরে তাকালো রানী, মুহূর্তে বিবর্ণ হয়ে গেল তার মুখ।

চাপা স্বরে ধমকে দিলো শিবনাথ।

—কোথায় গিয়েছিলে?

মুখ নামিয়ে রানী ভাঙা-ভাঙা করে উত্তর দিলে।—তেল ছিলো না।

—কোথায় গিয়েছিলে, কোথায়?

—অমিতাদির কাছে। এবারেও মাথা তুলতে পারলে না রানী।

—হুঁ। গুম হয়ে রইলো শিবনাথ কিছুক্ষণের জন্যে। সন্দেহের বিষবাষ্পে জ্বলে উঠলো ওর সারা শরীর।

বললে, অমিতাদি! বীরেনবাবুর শালী হবার এত শখ!

প্রতিবাদের রুদ্ধ চোখে একবার চকিতে চাইলো রানী, তারপর নিঃশব্দে নিজের কাজে চলে গেল।

মিথ্যে সন্দেহ? কে জানে! শিবনাথ নিজেকে কোনো দিনই বুঝে উঠতে পারেনি। এ কি নিজেরই দুর্বলতা, না পারিপার্শ্বিকের প্রভাব? কে জানে।

বিয়ের পরও বছরখানেক বেশ আনন্দেই কাটিয়েছে দুজনে। তারপর আগমন ঘটলো এই বীরেনের। পাশের কোয়ার্টারে বউ অমিতাকে নিয়ে এসে কায়েমী আসন গাড়লো ওরা। ছিমছিমে চালাক-চতুর বউ, কোনো দিক থেকেই বীরেনকে অসুখী মনে করার কারণ নেই। তবু, তবু কেমন যেন একটা জাতক্রোধ গজিয়ে উঠেছে শিবনাথের মনে—রানীকে কোনোদিন বীরেনের সঙ্গে কথা বলতে দেখেনি, তবু।

প্রথম প্রথম একটা বোবাকান্নার ব্যথা পেতো শিবনাথ। সন্দেহ হতো, অথচ বলতে পারতো না লজ্জার খাতিরে। সন্দেহটা কি সত্যিই মিথ্যে? তা হলে কথায় কথায় শিবনাথকে বীরেনের সঙ্গে তুলনা করতো কেন রানী!—জানো, বীরেনবাবু বয়সে তোমার চেয়ে বড় বই ছোট নয়, তবু ওঁর তুলনায় তুমি যেন বুড়িয়ে যাচ্ছো। একদিন বলে ফেলেছিলো রানী।—জানো, বীরেনবাবু নাকি বি এ পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিলেন! বি এ পরীক্ষায় প্রথম তো অনেকেই হয়, বীরেনের প্রথম হওয়াটাই কি রানীর কাছে সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের ব্যাপার!—বীরেনবাবুর প্রমোশন হয়েছে, তিরানব্বই টাকা মাইনে হলো, শুনেছো? বাকীটা নিজের মনেই ভেবে নিতো শিবনাথ। হয়তো রানী বলতে চায় যে, তুমি এখনও একটা চাকরিই জোটাতে পারলে না।

কথাটা অবশ্য অন্যায় নয়। যক্ষ্মায় ভুগছেন শিবনাথের বাবা, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড থেকে 'লোন'-নেয়া টাকায় সংসার চলছে। শিবনাথের এবার একটা চাকরি না করলেই নয়। অথচ, চাকরি পায় কোথায় বেচারা।

নিজের ক্ষুদ্রতাটুকু যত ঢাকবার চেষ্টা করে শিবনাথ, রানী ততই যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চায়।

শেষ অবধি আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলে না শিবনাথ। পষ্টাপষ্টি বলেই ফেললো একদিন। রাতের অন্ধকারে রানীর কানের পাশটা লাল হয়ে উঠেছিলো কিনা দেখতে পায়নি সে।

—পাশের বাড়ির সঙ্গে অত দহরম-মহরম ভালো নয়। একটু কুৎসিতভাবেই বলেছিলো কথাটা। নিষেধ সত্ত্বেও আজ আবার পাশের কোয়ার্টারে যেতে দেখে তাই সন্দেহটা ঘনীভূত হলো।

সকালের ঘটনাটা ভাবতে ভাবতে কান্না পাচ্ছিলো রানীর। পুরুষমানুষ মাত্রেই কি

এমনি অমানুষ হয়? চোখ ঠেলে জল আসছিলো ওর।

একটা টুলে বসে রুগ্ন শ্বশুরের যন্ত্রণাকাতর মুখটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছিলো রানী।

রাত গভীর হয়ে আসছে। দূরের গির্জেয় ঢং ঢং করে বারোটা বেজে গেল। কারখানার চিমনি থেকে আকাশে ছিটিয়ে পড়েছে খানিকটা জাফরানী আগুনের হলকা। পৃথিবী নিঃঝুম।

মালগাড়ির শাণ্টিং আর ইঞ্জিন-শেডের দু-একটা টুকরো বাঁশির কাতরানি ভেসে আসে। ডেঞ্জার হুইস্‌ল্‌ আর ইস্পাতের লাইনে গাড়ির গড়গড়ানি।

শিবনাথের বাবার অসহ্য চিৎকার। মাঝে মাঝে শিউরে উঠছিলো রানী। বুড়োর চোখের কোণে ফোঁটা ফোঁটা জল জমে ওঠে। নিশ্বাস টানতে কষ্ট হয়। সজল চোখে তাকিয়ে দেখছিলো রানী।

কাছের কোনো-একটা বাড়িতে ঝন্‌ঝন্‌ করে কাঁসার শব্দ বেজে উঠলো। হয়তো হাত ছিটকে পড়ে গেছে বাটি আর ঝিনুক। ককিয়ে কেঁদে উঠলো একটা ছিঁচকাঁদুনী মেয়ে। শিবনাথের ঘুম ভেঙে গেল। অন্ধকারেই বিছানার চারপাশে হাত বাড়িয়ে রানীর খোঁজ করলে। ধক্‌ করে উঠলো ওর বুকের ভেতরটা। একটা দেশলাইয়ের কাঠি জেবলে তন্নতন্ন করে দেখলে চারপাশ। না! কোথাও নেই। তবে কি—

হঠাৎ মনে হলো হয়তো বাবার অসুখ বেড়েছে। পা টিপে টিপে এসে দেখে গেল। হাঁ, রানী বসে আছে বাবার কাছে। স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচলো। ব্যর্থতার ব্যথাও পেলো একটু। যা সন্দেহ করেছিলো তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে যেন ব্যর্থতা এনে দিলো ওর মনে। যদি কোনরকমে সন্দেহটা সত্যি হতো!

পা টিপে টিপে ফিরে এসে ঘুমোবার চেষ্টা করলে শিবনাথ।

বুড়ো বাপ কাশতে শুরু করেছে আবার।

পিকদানির জলটা লাল হয়ে উঠলো! ভয়ে আঁতকে উঠলো রানী।

কাশি থামিয়ে গোঙাতে শুরু করলে বুড়ো। শ্বশুরের কষ্ট আর সহ্য হচ্ছিলো না রানীর। মুখের দিকে তাকালেই বুকটা ব্যথিয়ে ওঠে। দূরে কম্বলের ওপর শুয়ে ঘুমুচ্ছে শাশুড়ী আর ননদ। তাদের দিকে একচোখ তাকিয়ে নিয়ে পিকদানিটা সাফ করতে বেরিয়ে গেল রানী। একটু পরেই পিকদানিটা রেখে দিয়ে শিবনাথকে ঠেলে ওঠাতে গেল পাশের ঘরে। সকলে ঘুমিয়ে আছে, কেমন যেন গা ছমছম করে, ভয় করে।

বার কয়েক ঠেলা দিতেই শিবনাথ চোখ চাইলে।

—কি ঘুম বাপু তোমার!

—তা বলে কি রাত জেগে আমাকেও মরতে হবে নাকি। খেঁকিয়ে উঠলো শিবনাথ। ধাক্কা খেয়ে চুপ করে গেল রানী। তারপর আস্তে আস্তে বললে, যাও, ডাক্তারবাবুকে একবার ডেকে নিয়ে এসো।

—ফি দেবার টাকা আছে? তুমি বরং যাও, তোমার চাঁদমুখ দেখলে হয়তো মন গলতে পারে রাজেন ডাক্তারের।

রানী চটলো না। বললে, যাও লক্ষ্মীটি, একবারটি যাও আজ। তোমার পায়ে পড়ি।

উত্তর না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে পড়লো শিবনাথ।

পাশের কোয়ার্টারে দুনিয়ার দুঃখ ভুলে ঘুমোচ্ছিলো বীরেন আর অমিতা। এক জোড়া লিকলিকে সাপ যেন নরম লেপের উষ্ণ আস্বাদে আত্মহারা। বাইরের বিঘ্নে তাদের আরাম-নিদ্রা ভাঙে না।

এত আরামের গোড়ায় আছে তিরানব্বই টাকার চাকরি। মাসের শেষে টাকা ক'টা রীতিমতো উপার্জন করে বীরেন। তিন বছর আগে তিরিশ টাকায় ঢুকে তিরানব্বই টাকায় প্রমোশন পেয়ে গেছে ইতিমধ্যে। ফুর্তিতে আর ফুরসতে কাটিয়ে দেয় বারোমাস। অমিতার নীল চোখের তারায় তারায় আনন্দের ফোয়ারা ছুটিয়ে দেয়। খুশিয়াল রাতের স্তব্ধতা

ভেঙে খিলখিল করে হেসে ওঠে যখন অমিতা, মনে হয়, পৃথিবীতে বাস করার কায়েমী দাবি আছে যেন একমাত্র ওদেরই।

শিবনাথের বাবার চীৎকার আর কাশি গা-সওয়া হয়ে গেছে। কানে ঢোকে না আর। ব্যবধান শুধু দশ ইঞ্চি ইঁটের দেয়াল, তবু ঘুম ভাঙে না।

আজ কিন্তু চাদরটা কোমরে ঠেলে দিয়ে উঠে বসলো অমিতা।

—কি হলো?

—আজ যেন বড় বেশী গোঙাচ্ছে বুড়ো।

হঠাৎ গোঙানি থামলো। নিশ্চুপ কাটলো খানিক। কান পেতে পেতে শুনলে অমিতা। একটা টিকটিকিও টিকটিক করে না, একটা ঝিঁঝিও ডাকে না। গুডস্ ট্রেনের শান্টিং গেছে থেমে। নিঃশব্দতার মাঝে একা জেগে বসে থাকে সে। বীরেন হয়তো আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে অমিতা।

একটু পরেই হইচই করে কেঁদে উঠলো সকলে।

তারপর শুরু হলো কঁকিয়ে কঁকিয়ে, বিনিয়ে বিনিয়ে, সুর করে করে কান্না, রানী কাঁদছে, শিবনাথের মা কাঁদছে, শিবনাথের বোন কাঁদছে।

কেমন যেন বিশ্রী আর বিরক্তিকর ঠেকে অমিতার।

বীরেনকে একটা চিমটি কেটে অমিতা বললে, শুনছো?

—কি?

—পটল তুললো বোধ হয়।

—হুঁ! বালিশে গোঁজা মুখটা হয়তো হাসলো একবার।

—হাঁকডাক করলে সাড়া দিও না যেন।

—পাগল হইনি তো।

—হওনি, হতে কতক্ষণ। না, সত্যি বলে দিচ্ছি, এই বৃষ্টি-বাদলের দিনে শ্মশানে-টশানে যাওয়া চলবে না।

—বেচ্ গো বেচ্, ছোও দিনি একন।

চাদরের ভেতর থেকে বাঁ হাতটা বের করে অমিতার নরম হাতটা টিপে দিলে বীরেন। সরু কোমরে হাতের একটা পাক দিয়ে সজোরে জড়িয়ে ধরে টেনে শুইয়ে দিলে অমিতাকে।

খালি পা, গায়ে একটা উড়নি, মাথা নেড়া। শিবনাথ বেড়াতে বেরিয়েছিলো। প্রতিদিন ভোরে অন্ধকারে বেড়াতে আসে সে এদিকে। একটা নেশা তার।

মদের নেশা ছাড়া যায়, কিন্তু এ যে দেখার নেশা। পুবের আকাশ রাঙা হবার আগেই সিরসিরে বাতাস গায়ে মেখে বেড়াতে আসে সে। একটা দিন না আসতে পারলে মনে হয় যেন কত ক্ষতি হয়ে গেল।

দক্ষিণের লতাপাতায় ঘেরা কুঞ্জগুলো ছাড়িয়ে কর্নেল জনসনের বাংলোর একটু দূরে কংক্রিটের সাদা সাঁকোটার ওপরে এসে বসলো সে। ভোরের আলো মেখে যেন দূরের সার্চ-লাইটটা মিইয়ে গেছে। ডিস্ট্যান্ট সিগন্যালের লাল আলোটা থমকে সবুজ হয়ে গেল। ঐ দিকেই তাকিয়ে ছিলো শিবনাথ।

—আরে শিবনাথবাবু যে!

এতখানি অন্যমনস্ক কখনও হয় না শিবনাথ। যে নেশার টানে এখানে আসে সে, সে নেশা চরিতার্থ করতে হলে মুহূর্তের জন্যও অন্যমনস্ক হওয়া চলে না।

চমকে ফিরে তাকালো শিবনাথ। বীরেন আর বীরেনের স্ত্রী অমিতা। চকিতে চোখা-চোখি হয়ে গেল অমিতার সঙ্গে। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি দুলিয়ে দিলে অমিতা। কি সুন্দর স্নিগ্ধ নীলিমা ওর চোখে, কৃষ্ণসারিণীর চটুল চোখকেও যেন হার মানায়। কি এক অপূর্ব জাগরম্লানিমা ওর চোখের কোলে।

—আপনিও মর্নিং ওয়াকে বেরোন নাকি? প্রশ্ন করলে বীরেন।

—হ্যাঁ। উদ্দেশ্য ঢাকবার জন্য বোকার মতো হাসলে শিবনাথ।

—চলুন না একসঙ্গেই ফিরি। আড়চোখে তাকিয়ে অমিতা বললে।

শিবনাথের ইচ্ছা ছিলো না মোটেই! আরো কিছুটা অপেক্ষা করলে হয়তো পুরস্কার মিলতে পারে। কিন্তু অমিতার গুচ্ছ গুচ্ছ সুবাসিত চুলের রাশ কি এক চুম্বকের আকর্ষণী ছড়িয়ে দিলো শিবনাথের সারা অঙ্গে।

বলতে হলো, বেশ চলুন।

অমিতার দিকে আর একবার তাকালে শিবনাথ। ঠোঁটে গত সন্ধ্যার রাঙির ফিকে আমেজ এখনও। ভোরবেলাকার সোনালী রোদের মতোই স্বতঃস্ফূর্ত ওর কথা। মুখে ভোরের আকাশের মতো ক্লান্তিশেষের ছাপ।

মনে মনে অমিতার পাশে রানীকে দাঁড় করিয়ে নিজের ওপরই ঘৃণা হলো শিবনাথের। আধ হাত ঘোমটা আর এগারো হাত শাড়িতে ঢাকা জবুথবু গোছের গ্রাম্য মেয়ে রানী। আর অমিতা!

দিনরাত পাঠ পড়ালে অবশ্য ময়নার মুখেও বুলি শোনা যায়। সাহস হয় না তবু শিবনাথের। এমনিই তো তৃষ্ণার্ত চাতকীর মতো খাঁচার ফাঁকে চোখ রাখতে দেখলে আশঙ্কা হয়, সন্দেহ হয় রানীর ওপর।

কিন্তু অদ্ভুত একটা মোহ ক্রমশ যেন গ্রাস করে ফেলেছে শিবনাথকে। ক্ষণিকের দর্শনে তৃপ্তির স্তিমিত অভিব্যক্তি ফোটে তার চোখে। পাওয়ার আনন্দে এতদিন সে যেন বুঝতেই পারেনি যে কিছুই পায়নি সে। স্তোকবাক্যের কুয়াশায় তাকে ভুলিয়ে রেখেছিলো রানী। কত সহজ সারল্য অমিতার কথায়, অমিতা কত সুন্দর।

এ বাসা ছেড়ে উঠে যেতে ইচ্ছা হয় না শিবনাথের। অথচ উপায় নেই। প্রায় এক মাস হতে চললো বাপ মারা গেছে, বাসা ছাড়ার নোটিস আসবে এইবার। উঠে যেতে হবে নতুন-বাজারের দিকে। বাপের উপার্জনের উচিছষ্টতে বেশী দিন আর চলবে না। চাকরি চাই। বোন সুকুমারী এবার পনেরোয় পা দিয়েছে।

অমিতার লোভনীয় আকর্ষণ ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হয় না। তবু যাওয়া ভালো, বীরেনের কাছ থেকে রানীকে দূরে রাখতে হবে।

মদের নেশা ছাড়া যায়, কিন্তু দেখার নেশা ছাড়া যায় না।

ভোর হতে তখনও কিছুটা বাকী। হালকা পায়ে এগিয়ে চললো শিবনাথ। কর্নেল জনসনের রহস্যপুরীর দিকে। জনসন—বাবুলাডিহির ডিরেক্টর জনসন। যার একটা কলমের খোঁচায় আট শ' টাকা বেতনের অফিসারের চাকরি বরখাস্ত হয়ে যায়, খেয়ালের মাথায় যে ষাটকে সাত শ' করতে পারে, কামধেনুর মতো যা কিছু মঞ্জুর করতে পারে যে। বাবুলাডিহির উই-পিঁপড়েগুলোও জানে, উপকার না হোক অনিষ্ট কতখানি করতে পারে চীফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার কর্নেল জনসন। কোন সাত সাগরের নীচে পাতালপুরীর গুপ্তগৃহে পড়ে আছে অজস্র মণিমুক্তা চন্দ্রহারের হাট, তার গোপন সুড়ঙ্গপথ দেখতে পেয়েছে শিবনাথ। বহু দিন থেকেই দেখে আসছে। কিন্তু ঐ বীভৎস-দর্শন দৈত্যটাকে তার বড় ভয়।

গন্তব্যে পেঁৗছে গেল শিবনাথ। পিয়ালী নদীর বুকে কংক্রিটের সাঁকো। পাশেই সিমেন্টের বেদী। হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়লো শিবনাথ। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো জনসনের বাড়ির দোতলার বারান্দার দিকে।

অপেক্ষা করতে করতে ক্রমশ অধৈর্য হয়ে উঠলো।

নদী পিয়ালীর জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে আকাশে উঠে গেল এক জোড়া জলপিপি। একটা মাছরাঙা ট্যাঁ-ট্যাঁ করে ডাক ছাড়লো। কুলকুল করে পিয়ালীর জল বয়ে চলেছে। ক্ষীণস্রোতা জলের আঘাত লেগে জলতরঙ্গের বোল ফুটছে নুড়ি-পাথরের মুখে। ভোরের রুপালী আলোয় মাছের আঁশের মতো চিকচিক করছে করোগেটের স্রোত।

পেছনে চাঁদমারির ময়দান অন্ধকারের বোরকা তুলে ধরেছে। একটা বিরাট ঢিবির ওপর সারি দিয়ে সাজানো কতগুলো টিনের চাকতি। এক দুই তিন অজস্র নম্বর লেখা রয়েছে তার গায়ে। সাহেব-বাচ্চারা টার্গেট প্রাক্‌টিস করে এই শুটিং গ্রাউন্ডটায়।

ভোরের আলো রঙিন হয়ে ঠিকরে পড়লো ময়দানে। স্বচ্ছতোয়া পিয়ালীর সলিলস্রোত সোনালী হয়ে উঠলো। স্পষ্ট হয়ে উঠলো ময়দানের ওপরে গথিক ছাঁদে গড়া বাড়িখানা। এখানকার বিচারালয় ছিলো ওটা এককালে, এখন রাজ-বন্দীদের আটক রাখা হয়। ওদিকে তাকালেই ভয়ে বুকটা দুলে ওঠে শিবনাথের। এই বনেই নাকি কপালকুণ্ডলার দেখা পেয়েছিলো নবকুমার। বঙ্কিমের কাপালিক আজও বেঁচে আছে। অপশক্তির সামনে আজও রয়েছে নরবলির রেওয়াজ।

চোখ ফেরালো শিবনাথ। কর্নেল জনসন ঐ দোতলার বারান্দাতেই শুয়ে থাকেন। এখনও ওঠেননি, নেটের সাদা মশারিটা তোলা হয়নি এখনও। পিতলের পালঙ্ক গিল্টির চমক দিচ্ছে। তৃষ্ণাতুরের মতো তাকিয়ে রইলো শিবনাথ। অনেক দেখেছে, আজও দেখবে সে।

একদিন দেখেছে, ফড়েদের একটি মেয়েকে।

ছত্রিশগড় নাগপুরের রোদে তাতানো মেয়ে! উস্কুখুস্কু চুল, রাত্রির চাঞ্চল্যে। কপালে উল্কির টান, টানা-টানা চোখ। রসোদ্দীপ্ত যুবতীদেহ। একখানা মোটা লালপাড় দেহাতী শাড়ি সুস্পষ্ট দেহের নিম্নভাগ থেকে ওপরে উঠেছে ঘোরানো সিঁড়ির মতো। দেহের প্রতিটি লোলুপ বক্র। দোতলার বারান্দায় বিদ্যুৎ-আলোর স্পর্শ লেগে অপরূপ মনে হয়েছিলো তাকে। নিরাশঙ্ক অকুণ্ঠিতার মতোই সদর্পে হেঁটে বেরিয়ে এসেছিলো মেয়েটি। তারপর মৃদু সুরে কি একটা হিন্দী গান ভাঁজতে ভাঁজতে রাস্তা ধরে চলে গিয়েছিলো।

আর একদিন দেখেছে শিবনাথ।

হালকা ঢেউ-খেলানো চুল। বব-ছাঁটা সোনালী রঙের চুল। কানে স্যাফায়ারের দুল। গলায় কোরালের মালা। লাল সিল্কের ঢিলে গাউন স্বাস্থ্যবতীর দেহে। গাউনের গলাটা বুকের মাঝ অবধি কাটা। কাঁধ অবধি অনাবৃত বাহু। সুডোল আর সুশুভ্র। কলার-বোনের নীচে তরঙ্গায়িত কোমলতা। আইভরির মূর্তির মতো নিখুঁত সৌন্দর্য। লিপস্টিকের আগুন মিইয়ে গেছে। ক্লান্তির ছাপ নেমেছে চোখের সবুজ অ্যামেথিস্টে। ফটকের সামনে একখানা মোটর এসে দাঁড়ালো। দুবার হর্ন বাজালো ছোকরা সাহেব। খিলখিল করে হেসে জনসনকে কি একটা বললে, নাইটস মিস্ট্রী লেডী। কাঠবিড়ালীর মতো ক্ষুদে কদমে খুটখুট করে বেরিয়ে এলো সে।

আরামে বসে নিয়ে হাসতে হাসতে সশব্দে বন্ধ করে দিলো গাড়ির দরওয়াজা। স্খলিত তারার মতো মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এ দেখার নেশা, মদের নেশা নয়। কিছুতেই ছাড়তে পারে না শিবনাথ। বহু দিন ধরে এমন অনেক অনেক রূপসীর অবসাদী সৌন্দর্য দেখে আসছে সে।

আর একদিনও তো দেখেছে।

কোথায় লাগে সেই মমতাজ, যার প্রেমের আগুনে শাহানশাহ্ শাহ্জাহাঁ চোখের জল শুকিয়েছিলেন। বাগদাদের কোনো খুবসুরত বেগম বুঝি বা! আনারের দানার মতো লাল গাল। সাপের মতো নীল বেণীতে জড়ানো সলমা-চুমকির-কাজ-করা মসলিনের ওড়না। সাদা বেগমবাহার গুলাব হয়ে ওঠে গোলাপী দেহের ছোঁয়া পেয়ে। দিল্-জখম-করা চোখে চোখ রাখলে দুনিয়া না-মঞ্জুর হয়ে যায়। খুনী ঠোঁটের ফাঁকে মোতির মালা দেয় হাসির ঝিলিক। মতলবী আঙিয়া মোহব্বতের মেহেরবানি মাগে মাসুকের কাছে।

—আরে!

সেদিনের সেই বোধহয়-বাঈজীর কথা ভাবতে ভাবতে কোন কুক্ষণে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলো শিবনাথ। দৃষ্টি সরে গিয়েছিলো পিয়ালী নদীটার দিকে।

হঠাৎ তাকিয়ে বিস্মিত হলো সে। অস্ফুটে বলে ফেললো—আরে!

অমিতার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই বিবর্ণ হয়ে গেল অমিতার মুখ। কেন কে জানে। মৃদু হাসলে শিবনাথ তাকে দেখে, অমিতা কিন্তু অন্য দিনের মতো প্রতিহাস্যের জবাব দিলো না। কানের পাশটা তার লাল হয়ে উঠলো যেন মুহূর্তের জন্য। তরতর করে এগিয়ে চলে গেল অমিতা।

চোখ ফিরিয়ে শিবনাথ দেখলে মাথা হেঁট করে এগিয়ে আসছে বীরেন, পাংশু মুখে। কাছাকাছি আসতেই শুকনো হাসি হাসলে বীরেন।

খানিক কিন্তু-কিন্তু করে বললে, অমিতা...মানে সি-এম-ইর বাগানে ফুল তুলতে ঢুকেছিলো, আর জনসনেরও যেন দুটি ফুলে কত লোকসান হয়ে যেতো। অমনি ডেকে পাঠিয়ে ধমক দিলে আমাদের। তা নইলে আর বাংলোয় ঢুকবো কেন।

একটু চুপচাপ থেকে বীরেন আবার বললে, প্লীজ, কাউকে এ কথা বলবেন না যেন। এই অবাঙালীর দেশে, জানেন তো কত রকমের লোক...অন্য কিছু একটা ভাবতে পারে। মানে, অমিতা সঙ্গে ছিলো শুনলে...প্লীজ...শেষের দিকে শিবনাথের হাত দুটো অনুরোধের আতিশয্যে চেপে ধরলে বীরেন।

কি যেন ভাবতে ভাবতে ধীরে ধীরে হাঁটছিলো শিবনাথ। হয়তো চাকরির কথা। হয়তো বা অমিতার কথা। হঠাৎ নিজের মনে হেসে শব্দ করে একটা তুড়ি দিয়ে ফেললো সে।

[১৩৫২



বনবাতাস

একটা লম্বা পাহাড়ের রেঞ্জ চলে গেছে রাঁচী থেকে রামগড়। জমাট-বাঁধা কালো কালো পাহাড়। আর তারই সানুদেশ ঘিরে ঘন বনানীর বন্যা। এক পাহাড় আর আরেক পাহাড়ের মাঝে ছোট ছোট উপত্যকা। দেশী-বিদেশী মানুষের বসতি সেখানে। দেহাতী গাঁও। ডেরা আর ডিহি। রেলপথের রাস্তাটা নয়। রাঁচী থেকে পালামৌ হয়ে ঘুরে এসেছে সড়কটা। মহুয়ামিলন, লাপরা, রায় হয়ে। পাহাড় ডিঙিয়ে, পাহাড় কেটে, পাহাড়ের গায়ে চক্র দিয়ে।

মহুয়ামিলনের ভেতর দিয়েও গেছে এই সড়ক। সড়কের গায়ে হেলানো ভগ্নশৃঙ্গ অণুপর্বত। মহুয়া-মাদার আর আমলকী-ইউকেলিপটাসের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দেয় বাংলো টাইপের বাড়ি। উঁচু প্লিনথের ওপর সিমেন্টের রোয়াক আর টালির ছাদ।

এরই মধ্যে সবচেয়ে জাঁকালো বাংলোটির বারান্দায় প্রতি সন্ধ্যায় যে ভদ্রমহিলা বসে থাকেন, তিনিই আরতি দেবী। আজও ক্যানভাসের কেদারায় বসে জাফরি-কাটা রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে উদাস চোখে তাকিয়ে ছিলেন তিনি। এ সময়টা চুপ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে বেশ লাগে। বেশ নিরুপদ্রব শান্তিতে কাটানো যায় এটুকু অবসর।

আজ কিন্তু বিরক্তি বোধ করছেন আরতি দেবী। ঠিক বিরক্তি নয়। এক বিরাট শূন্যতা যেন জেঁকে বসছে তাঁর মনে। ক্রমশ তাঁর কাছে দুনিয়ার সমস্ত আনন্দ-উচ্ছ্বাস যেন নিরর্থক হয়ে উঠছে। স্বামীকে ভালোবাসতে পারেননি বলে দুঃখ ছিলো না তাঁর। বরং গর্ব ছিলো। সামাজিক প্রয়োজনের অঙ্গ ভেবে মেনে নিয়েছিলেন তাকে। অথচ আজ আবার নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। আশ্চর্য মানুষের মন। একটা লোকের অভাব, বিশেষ করে যে স্বামীকে ভালোবাসেননি কোনো দিন, সেই স্বামীর অভাব গভীরভাবে অনুভব করতে হচ্ছে। মনোতোষের মৃত্যুতে এমনভাবে নিঃস্ব হয়ে যাবেন তিনি—আশঙ্কারও অতীত ছিলো।

বাতাস নীলচে হয়ে আসছে। আর একটু পরেই চাঁদ উঠবে, অজস্র তারাও। নীলাভ রেশমী শাড়িতে জ্বলবে অগণিত রুপালী চুমকি। দূরের পাহাড়ী বনটায় হয়তো ছুটে আসবে মৃগমাতৃকার দল। চিত্রিতা হরিণীর সারি সরল সারঙ্গ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখবে আকাশ-আলোর বন্যা। ছলছলিয়ে উঠবে টুংরী নদীর জল।

গায়ের চাদরটা ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে নড়ে-চড়ে বসলেন আরতি দেবী।

বহুক্ষণ থেকে একটা করুণ সুর কেঁপে কেঁপে ভেসে আসছে। অবিরাম গতিতে ছন্দিত

হচ্ছে বাঁশের বাঁশির মিঠে মেঠো সুর। ক্লান্ত নটীর নূপুর-নিকণের মতো সে সুর ককিয়ে ককিয়ে ভেঙে পড়ছে।

হঠাৎ ভেঁপু আর ঢোলক বেজে উঠলো উদ্দাম হয়ে। আগুন জ্বলছে। আগুন জ্বালিয়ে জলসা জমাচ্ছে ওঁরাও আর মুণ্ডার দল। ওরা নাচবে, গাইবে। মনমাতালের দল মহুয়া রসের দেহাতী হাঁড়িয়া খেয়ে নেশায় চুর হয়ে থাকবে। মাতলামি করবে।

কালো মেঘের বোরকা তুলে স্পষ্ট হয়ে উঠছে ঘষামাজা রেকাবিখানা। জ্যোৎস্নার প্লাবন নামছে। জোয়ার উথলে পড়ে আলোয় পৃথিবী ভাসিয়ে দেবে এখনি। অনতিপ্রস্থ টুংরী নদীর ওপর কংক্রিটের সাঁকোটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

এক জোড়া তরুণ-তরুণীর ঝাপসা চেহারা চোখে পড়লো আরতি দেবীর। অনু আর সুস্মিতা। অবাধ আনন্দে মশগুল হয়ে বিশ্রম্ভালাপে মেতে রয়েছে ওরা। সাঁকোর শেষে বেদীটার ওপর বসে আছে দুজনে। সুস্মির বুকে মাথা এলিয়ে দিয়েছে অনু। সিল্যুটের ছবির মতো ঝাপসা হলেও বুঝতে পারলেন আরতি দেবী।

কথার ফাঁকে ফাঁকে খিলখিল করে হেসে উঠছে সুস্মি। দু-এক টুকরো হাসির রেশ ছিটকে কানে আসছে। সশব্দ হাসি। খুব তীক্ষ্ম আর খুব গভীর। মাঝরাতে কাঁচ ভাঙার মতো ধারালো আওয়াজ। ভালো লাগে না আরতি দেবীর। এ হাসি কোনো দিনই ভালো লাগেনি তাঁর।

মনে পড়ে। তাঁর কুমারী-জীবনেও এ হাসি শুনেছেন তিনি। আজকের মতো অসুখী ছিলেন না সেদিন। তবু ভালো লাগেনি এ হাসি। বিবাহপূর্ব জীবনে প্রতিবেশী নব-দম্পতির ঠিক এমনি ধরনের উচ্ছকিত হাসি সহ্য করতে পারতেন না তিনি। আজও পারেন না।

অনুকে আর আপন ভাবতে পারেন না আরতি দেবী। আর সুস্মিতা—সুস্মি অসহ্য। যেন জাতবৈরী। ওদের উল্লাস, আমুদে-আহ্লাদ অপমানের বিষ ঢুকিয়ে দেয় তাঁর মনে। মন বিষিয়ে তোলে। অথচ এই অনুকে নিজের হাতে মানুষ করেছেন তিনি। না। অনেক ভেবেছেন, অনেক জাগর রাতের চিন্তাক্রান্ত চোখে ভবিষ্যৎ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। না। এভাবে এদের সৌভাগ্যের মাঝে টিকতে পারবেন না। পাগল হয়ে যাবেন কোনদিন। এই সুখাতি-শয্যের পরিপার্শ্ব শোককাতর করে তুলছে তাঁকে। অসহ্য। রাত বেড়ে চলেছে, এখনো ফেরবার নাম নেই ওদের।

যাক্। যখন হোক ফিরবে ওরা। আর অপেক্ষা করতে পারেন না।

কেদারা ছেড়ে উঠে পড়লেন। ধীরে ধীরে বিছানার ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন।

দেয়ালের বড় আয়নায় অনেকক্ষণ ধরে নিজের প্রতিচ্ছবিটা দেখলেন আরতি দেবী। যৌবন এতটুকুও ক্ষয় হয়নি এখনো। সমাপ্তি ঘটেনি সৌন্দর্যের। নিজেকে, নিজের দেহকে বড় বেশী ভালোবাসেন আরতি দেবী।

মনোতোষ মারা গেছে। বিধবা হয়েছেন। বেশ কয়েক মাস কেটেও গেল। কিন্তু থান কাপড়ের কাপটা দিয়ে নিজের মনকে ছদ্মবেশ পরাতে পারেন না তিনি। না, সৌন্দর্য নষ্ট করা চলবে না। এমনি সাদাসিধে কালোপাড় শাড়ি অন্তত পরবেন জীবনভোর। ব্যক্তি-বিশেষের মৃত্যুর জন্য নিজের সমস্ত ইচ্ছা-অনিচ্ছার মৃত্যু ঘটানো চলবে না।

তৃপ্তি নেই। শান্তি পান না আরতি দেবী। মনোতোষকে তো কোনো দিনই ভালো-বাসতে পারেননি। তবু, কেন জানি নিজেকে বড় বেশী ব্যর্থ মনে হয় আজ। নিঃস্ব মনে হয়। চারিদিক ফাঁকা। পৃথিবী ফাঁকা। সমগ্র বিশ্ব যেন ফাঁকা।

বিছানার ওপর শুয়ে পড়লেন আরতি দেবী। সাটিনের কালো চাদরটা আঁকড়ে গুটিয়ে ধরলেন দু হাতে। দু হাত এলিয়ে দিয়ে বিছানার স্পর্শ নিলেন। বড় ঠান্ডা আর বড় নরম। বাঁ হাতের ঝাঁকানি দিয়ে শিয়রের জানালাটা খুললেন। এক দমকা জ্যোছনা ঢুকলো ঘরে। সারা দেহে তাঁর রুপালী রঙ মাখিয়ে দিলো। চোখ বুজলেন। মুদিত চোখেই দু'পাশে হাত বাড়িয়ে কি যেন খুঁজলেন।

একান্ত একা। প্রেম, ভালোবাসা? ভালো নাই-বা বাসলেন মনোতোষকে। অভ্যাসের অভিসারে নিজের ব্যথিত জীবনকে রসিয়ে তুলতে তো পেরেছিলেন। তা ছাড়া আনন্দও

ছিলো। একটা অদ্ভুত আনন্দ। আত্মগর্বের জয়-সঙ্কেত। ভালো না-বাসার গর্ব ছিলো নিজের মনে। ভালোবাসা পাওয়ার ছদ্মবেশ দেখাতে পারতেন বাইরের জগৎকে। অকম্পেয় সুখের মুখোশ ছিলো মুখে। আশ্চর্য খুশির আমেজ, হোক্ ভান।

উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠতে ইচ্ছে হয়। দেহের প্রতিটি শিরা উপশিরা যেন উন্মুখ আগ্রহে বিদ্রোহের পল গোনে। তৃপ্তিকামী উন্মাদ শিহরন। ভয়, আশঙ্কা। হয়তো অপবাদ কুড়োতে হবে সেই ভয়।

নিজের মনেই হাসলেন আরতি দেবী। আজ অপবাদের ভয় হয়! অথচ একদিন নিঃশঙ্ক চিত্তে স্ব-ইচ্ছার অনুসরণ করেছিলেন।

তখন বয়স ছিলো কম। কিন্তু বয়সের অনুপাতে দুর্নাম জমেছিলো অনেক বেশী। অবশ্য কারণ ছিলো তার পিছনে। কারণ—তাঁর রূপের ঝিলিক, তাঁর চোখের ঝলসানি! চোখের তারায় তারায় আশ্চর্য এক জলুস—ভাঙা বিদ্যুতের মতো এক চাঞ্চল্যে ঝিকিয়ে ওঠে। পদ্মপল্লবের মতো চোখের পাপড়ি নয়, নয় মৃগ-নয়নতুল্য টানা-টানা চোখ। আসলে তাঁর চোখের দৃষ্টিটা ছিলো সে বয়সে বড় চপল। নীল নয়, নিকষ কালো। পুরুষের চোখে চমকে উঠতো লোভের ইশারা। হয়তো আজও ওঠে।

ষোলো বছর পূর্ণ হতেই অঙ্গবৈভব ষোলোকলায় পূর্ণ হয়েছিলো। চমৎকার গলা ছিলো তাঁর গানে। পুরুষের মনে ব্যথা দিতো তাঁর গানের মিঠে সুর। চোখের আবিষ্ট চাউনি আর গানের অপূর্ব রেশ যেন সমান তালে চমকে দিতো মানুষকে। আত্মদানের ভঙ্গিমা প্রতিটি ব্যবহারে। বিলুপ্তির নিশ্চিত নিশানা। মনে হতো, পুরুষকে বাধা দেবার মতো শক্তি বা ইচ্ছা কোনোটাই বোধ হয় ছিলো না তাঁর।

এ-হেন আরতি দেবীর বিয়ে হলো মনোতোষের সঙ্গে। রাঁচীতে মস্ত কারবার। চেহারা বাঙালী পুরুষের মধ্যে সুলভ নয়। বিয়ে সে এর আগেও একবার করেছিলো। বছর আষ্টেক আগে একটি পুত্রসন্তান রেখে স্ত্রী মারা যায় মনোতোষের। তারপর থেকে মনের গহনে স্বর্গীয়া স্ত্রীর স্মৃতি পুষে দিন কাটাচ্ছিলো মনোতোষ। অনুকে মানুষ করার ব্রত নিয়ে আটটা বছর কাটিয়ে এসে হঠাৎ একদিন মর্জি বদলে গেল তার। আরতি দেবীর বিয়ে হলো এ-হেন মনোতোষের সঙ্গে।

প্রথম যেদিন এখানে আসেন আরতি দেবী—আজও মনে পড়ে তাঁর।

আজ অতিপরিচয়ে নীরস হয়ে উঠলেও মহুয়ামিলনের ঐ ছোট প্ল্যাটফর্ম অপরিচয়ের চোখে অনেক, অনেক রোমাঞ্চের সৃষ্টি করেছিলো।

পূবে পশ্চিমে চলে গেছে এক জোড়া রেললাইন। কে যেন বিছিয়ে রেখেছে একখানা শাড়ি, আর দিনের আলোয় ঝকমকিয়ে উঠেছে দু'পাশের রূপালী জরির জমাট পাড়।

মহুয়ামিলন। বিস্ময়ে-বিস্ফারিত চোখে চেয়ে চেয়ে দেখেছিলেন আরতি দেবী। নাম সার্থক করে নব-উন্মেষিত উপনিবেশের গায়ে গজিয়ে উঠেছে অঢেল অফুরন্ত মহুয়ার বন। রসের বাতাস তখন সাঁঝের ঘোমটা টেনে দিচ্ছে পশ্চিমের রক্তমেঘে। আর লাল কাঁকরের সর্পিল রাস্তা বেয়ে ছুটে চলেছে মনোতোষের গাড়ি। আরতি দেবীর পাশে মনোতোষ। অদ্ভুত এক শিহরন জাগছে নববধূর মনে। নতুন এক অভিজ্ঞতা।

বনে বনান্তে শ্যামলিমার ছাউনি ফেলেছে অজস্রপল্লব মহুয়ার ভিড়। চারপাশের আবহাওয়ায় ভেসে আসছে উচ্ছ্বাসের স্রোত। চাঁপা রঙের মহুয়া জমেছে গাছে গাছে। নেশার আমেজ, মিঠে সুগন্ধ। রসালাপে আনন্দবিভোর মত্তমধুপের গুঞ্জন। ক্ষীণতটা টুংরীর ক্ষয়িষ্ণু স্রোতে নুড়িতে নুড়িতে লাগে স্পর্শ। জলোচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে স্তিমিত সঙ্গীত। টুংরীর বুকে কংক্রিটের সাঁকো। মাদলমৃদঙ্গের তালে তালে ওঁরাও মুণ্ডাদের নাচ আর গান।

আরতি দেবীর আজো মনে পড়ে।

বাড়ির সামনে লাল সিমেণ্টের উঠোনে পাশাপাশি দুখানা বেতের কেদারায় বসে ছিলেন তাঁরা। মোহমুগ্ধ চোখে নবপরিণীতা স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ছিলো মনোতোষ। আর আরতি দেবীর ঠোঁটে কৌতুকের হাসি। অনভ্যাসের কৌতুক। হাসি পেয়েছিলো আরতি দেবীর। মনোতোষের চোখেমুখে কৃতজ্ঞতার ইঙ্গিত দেখে। সবেতেই যেন আরতি দেবীকে সন্তুষ্ট

করার চেষ্টা। ভালোবাসা, প্রেম—কত কি স্বপ্ন বুনতে শুরু করেছিলো হয়তো। অথচ আরতি দেবী সেদিনও জানতেন, এই মনোতোষই আট বছর ধরে প্রথম পক্ষের মৃত সহ-ধর্মিণীর স্মৃতি পুষে কাটিয়েছে। হাসি পেয়েছিলো তাঁর, তবু চোখের দৃষ্টিতে মোহমুগ্ধ সুতৃপ্তির প্রলেপ এ'টে রেখেছিলেন।

আজো মনে পড়ে আরতি দেবীর।

আয়ার সঙ্গে বেড়িয়ে ফিরলো অনু। আট বছরের ছেলে অনু।

আয়া পুরনো কর্তা ও নতুন কর্ত্রীঠাকরুনকে সেলাম জানিয়ে অনুকে তাদের সামনে রেখে চলে গেল। ছেলেকে কাছে টেনে আনলে মনোতোষ।

লজ্জার হাসি হেসে বললে, এই অনু।

উল্লসিত আনন্দে তাকে কোলে টেনে আনলেন আরতি দেবী। বললেন, এসো অনু, তুমি আমার কাছে এসো।

উঠে দাঁড়িয়ে দু হাতে জড়িয়ে ধরলেন অনুকে। আট বছরের কিশোর অনু নেহাত ছেলেমানুষ নয়। অনভ্যস্ত আদরে লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো সে। মুহূর্ত কয়েকের মধ্যেই আরতি দেবী বিপর্যস্ত করে তুললেন তাকে। কোলে বসিয়ে, অনুকে বুকের কাছে চেপে ধরে, তার রেশমের মতো পাতলা চুলের ভেতর ধীরে ধীরে আঙুল চালিয়ে, তার গাল টিপে অস্থির করে তুললেন তাকে। আট বছরের অনু লজ্জায় মাথা নীচু করে সব অত্যাচার সহ্য করে গেল।

আরতি দেবী হেসে উঠে বললেন, লজ্জা করছে, না অনু? এর পর কিন্তু লজ্জা করলে চলবে না। কেমন?

অনু মাথা নেড়ে সম্মতি জানালে। চোখ তুলতে পারলে না।

—আমি তোমার কে জানো তো?

অনু উত্তর দিলে না। এত আদর পাওয়ার পর আন্দাজে বলতে গিয়ে একটু ভুল সম্বন্ধ বলে ফেলার আশঙ্কাতেই হয়তো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

—কে বলো, আমি তোমার কে?

পায়ের নখ দিয়ে মাটিতে আঁচড় কাটতে কাটতে অতিষ্ঠ হয়ে অনু বললে, খুব আস্তে আস্তে বললে, মাসীমা।

সশব্দে হেসে উঠলেন আরতি দেবী। অনুকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে তার চুলে চুমু খেয়ে বললেন, দূর বোকা ছেলে। আমি তোমার মা, নতুন মা। বুঝলে?

চমকে চোখ তুলে তাকালে অনু।

হঠাৎ নিজেকে সামলে নিলেন আরতি দেবী। মনোতোষের কাছে অভিনয়টা হয়তো অভিনয় বলেই মনে হবে। তাঁর ব্যবহার, তাঁর স্নেহাতিশয্য, তাঁর কথা হয়তো বিসদৃশ ঠেকবে মনোতোষের চোখে। অপরিচিত অনুর সঙ্গে এতটা অন্তরঙ্গতা যে নেহাত মায়ের উপদেশ মানার ফল তা হয়তো বুঝতে পারবে সে।

আরতি দেবীর আজো মনে পড়ে।

আশ্চর্য। সেদিন মোটেই মনে হয়নি যে পরবর্তী জীবনের নির্জন মধ্যাহ্নগুলো একমাত্র অনুই তাঁর কাছে সজীব করে তুলবে। আর মনোতোষ? ভালোবাসতে পারেননি সত্যি, কিন্তু অভ্যাসের আওতায় পরের পরের দিনগুলোতে মনোতোষকে ভালো লেগেছিলো তাঁর নিঃসন্দেহে।

একটা দিন।

খাটের ওপর নরম বিছানায় শুয়ে ছিলেন আরতি দেবী। মনোতোষ হাসতে হাসতে এগিয়ে এলো। আরতি দেবীর পিঠে আলগোছে হাত রেখে কি যেন বলছিলো মনোতোষ। সেই শায়িত অবস্থাতেই আঁচল টেনে মুখ ঢাকা দেবার চেষ্টা করেছিলেন আরতি দেবী।

—ভারি লাজুক তুমি। মনোতোষ বলেছিলো। মুখের ওপর থেকে আঁচল সরিয়ে দিয়ে বলেছিলো, তাকাও তুমি, আমার মুখের দিকে তাকাও।

মনোতোষের চোখে চোখ ফেলার চেষ্টা করে অপূর্ব এক হাসি হেসেছিলেন আরতি দেবী। লজ্জা-রঙিন হাসি। চোখের ওপর হাত আড়াল রেখে ঠোঁট টিপে টিপে হেসেছিলেন।

মনোতোষ তাঁকে কতখানি অধিকার করে ছিলো, আজ তার মৃত্যুর পর বুঝতে পারেন আরতি দেবী।

সে ছিলো কাজের মানুষ। বেশির ভাগ সময় থাকতো বাড়ির বাইরে। সে নির্জনতা সহ্য করতে পারতেন না আরতি দেবী। ক্রমে অনুর ওপর তাঁর স্নেহের পরিমাণ বাড়তে শুরু করলো। শেষে একদিন দেখলেন অনুর প্রতি তাঁর মায়া-মমতা সম্পূর্ণ নিখাদ। নিজের ছেলেকে মানুষ যতখানি ভালোবাসতে পারে অনুকেও তিনি ততখানি ভালোবাসতে পেরে-ছিলেন। শুধু তাঁরই তত্ত্বাবধানে আট বছরের অনু আজ বাইশ বছরের পূর্ণযৌবন অনুতে পরিণত হয়েছে। চোদ্দ বছরের সেবা আর যত্ন মাখিয়ে গড়ে তুলতে হয়েছে, তারপর সুস্মিতাকে খুঁজে বের করেছেন নিজে। অনুর বিয়ে দিয়েছেন। দিনগুলো তখন সুখে টইটম্বুর। জীবনের চারিধার থেকে সমস্ত আনন্দকণিকাগুলো যেন জমাট বেঁধে পেয়ালা ভরিয়ে তুলছে। খুশিতে উথলে পড়ছে পেয়ালা।

এমন সময় মনোতোষ মারা গেল।

একটা সজোর ধাক্কা লাগলো আরতি দেবীর নরম বুকে। এতদিন নিজেকে অসন্তুষ্ট আর অসুখী মনে করে এসেছেন, সত্যিকারের দুঃখকষ্টের স্বাদ পেতে শুরু করলেন এবার। সরলরেখার মতো জীর্ণ দিনের গতিশীল অভ্যাস যেন অকস্মাৎ মোড় ঘুরিয়ে দিলো জীবনের। সমস্ত পৃথিবীর আলো আর হাওয়া টেনে নিঙড়ে বের করে নিয়ে গেছে মনোতোষ। তাই আরতি দেবীর চোখে বিশ্বসংসার হয়ে উঠেছে বোবা আর ফাঁকা। একটা সান্ত্বনা ছিলো এতদিন। আরতি দেবী যে অসুখী তা জানতে পারেনি কেউ। আজ যেন নিজের কাছেই ধরা পড়ে গেছেন তিনি। আজ যে শুধু খুশী হবার উপায় নেই তাই নয়, খুশীর ছদ্মবেশ আঁটবারও উপায় নেই।

মাঝে মাঝে বিগত দিনের ইচ্ছাটা জেগে ওঠে। জেগে ওঠে বিবাহ-পূর্বের সেই তরুণী। উচ্ছৃঙ্খলতার আগুন তাতানি লাগায় সমগ্র স্তিমিত চেতনার স্তরে স্তরে।

অনুভব করেন। অথচ কেমন যেন অবোধ্য।

চোদ্দ বছরের বিবাহিত জীবনে এক দিনও তো কই যৌবন এমনভাবে তাঁর শিরায় রোমাঞ্চ ছড়িয়ে দেয়নি। বোধ হয় যৌবন নির্বাসিত হতে চলেছে তাঁর দেহ থেকে। গ্রহণ-পূর্ব রাতের চাঁদের ঔজ্জ্বল্য হয়তো এটা। কে জানে প্রৌঢ়ত্বের এলাকায় পা দিতে চলেছেন কিনা। কে জানে।

রক্তে দোলা লাগে, রক্ত নেচে ওঠে, মাতিয়ে তোলে দেহ আর মন। বিদ্রোহ করতে ইচ্ছা করে—বাঁধা-ধরা নিয়মের বিরুদ্ধে, রীতিনীতির বিরুদ্ধে। আর আহ্লাদী সুস্মির সৌভাগ্যের বিরুদ্ধে।

কিন্তু বিশেষ একটা সংস্কার ক্রমাগত আঘাত করছে তাঁর ইচ্ছার দেওয়ালে। মাসানু-মাসিক অভ্যাস বাসা বেঁধেছে তাঁর মজ্জায়। নিস্তার নেই।

যৌবনারম্ভের বিপ্লবী রক্ত সামাজিক বন্ধনের মধ্যে এতদিন কাটিয়ে এসে আজ সম্পূর্ণ ঢিলে দিয়েছে। তাই সুস্মির আনন্দ দেখে বিরক্তি আর বিতৃষ্ণায় বিষিয়ে ওঠে মগজের প্রতিটি তন্ত্রী, মনের প্রতিটি রন্ধ্র।

সবে তখন সকালী রোদের তেজ বাড়ছে।

ঘরে নির্জনে বসে বসে আরতি দেবী কয়েকখানা ফাইল ঘাঁটছিলেন। ম্যানেজার সদ্য দিয়ে গেছে। ব্যবসা-সংক্রান্ত কাগজপত্তর তেমন ভালো বোঝেন না। তবু মাঝে মাঝে দু-একটা ছুটকো প্রশ্ন আর লম্বা সই টেনে ভড়ং রাখতে হয় মস্ত বড় বাণিজ্যচালকের। ম্যানেজার অন্তত জানুক যে তার কাজের ওপর দৃষ্টি আছে আরতি দেবীর। চুরির পরিমাণটা হয়তো কমাবে তা হলে।

লাইম ফ্যাক্টরীটার একমাত্র স্বত্বাধিকারী ছিলো মনোতোষ। তাই আজ সব কাজই দেখতে হয় আরতি দেবীকে।

কাজ শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন এবার।

ভিতরের উঠোনে ঢুকলেন আস্তে আস্তে। স্নান করতে হবে। ভোরবেলায় স্নান করা এ বাড়ির রীতি।

ক্লান্ত বোধ করছিলেন আরতি দেবী। আজকাল সামান্য কাজেই ক্লান্ত হয়ে পড়েন।

চৌবাচ্চা-ঘর থেকে সদ্য স্নান সেরে এসেছে অনু। উঠোনের এক পাশে দাঁড়িয়ে দেখলেন আরতি দেবী। জলে ভাসছে সুগন্ধি সাবানের সাদা ফেনা। তোয়ালে বুলিয়ে গায়ের জল মুছছিলো অনু। আরতি দেবী দাঁড়িয়ে দেখলেন। আপনা থেকেই তাঁর ঠোঁটের কোণে দুলে উঠলো এক ফালি মিষ্টি হাসি। সম্পূর্ণ চোখে তাকিয়ে দেখলেন। অনুর সুন্দর দেহ। পেশীবহুল হাত। কাঁধের কাছটা কি মসৃণ! চওড়া বুক আর বিস্তৃত কপালে ক্ষুদকুঁড়োর মতো বিন্দু বিন্দু জল। শীকরসিক্ত পুরুষদেহের অপরূপ সৌন্দর্য দেখছিলেন আরতি দেবী। মোহময় দৃষ্টি তাঁর চোখে। গর্বের ফল্গু বইছিলো তাঁর মনের অন্তস্তলে।

হঠাৎ চোখ ফেরাতেই চোখাচোখি হয়ে গেল সুস্মির সঙ্গে। সুস্মিও দেখছিলো অনুকে। তার লোভাতুর ঈষৎ অবনত তির্যক চাহনিতে লজ্জিত হাসি। চোরা চাউনিতে দেখতে গিয়ে আরতি দেবীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল তার। লজ্জায় গাল রাঙিয়ে ছুটে পালালো সে।

সুস্মির ওপর মনটা বিষিয়ে উঠলো আরতি দেবীর। বিদ্বেষের বাষ্প ঠেলে উঠলো পাঁজরে পাঁজরে। ঈর্ষা? নিজের মনেই হেসে ফেললেন আরতি দেবী। অনু তারই হাতে গড়া মানুষ, চোদ্দ বছর অক্লান্ত সেবায় মানুষ করেছেন অনুকে। রতিপরিমাণ স্নেহ-ভালোবাসাও পুঁজি রাখেননি বুকের কোণে লুকিয়ে। সেই অনুর নবপরিণীতা স্ত্রী সুস্মি। অথচ—

এইভাবে দিনরাত অনু আর সুস্মিকে আমোদে মশগুল হয়ে থাকতে দেখলে গা জ্বলে যায় তাঁর। এদের মধ্যে সামান্য একটু ব্যবধান আনতে পারলেও যেন মনে মনে খুশী হয়ে উঠতে পারেন।

অন্য দিন সুস্মিই কাছে বসে স্বামীর খাওয়ার সময়। পরিবেশনের ভার থাকে তারই ওপর। আজ তাকে অন্য কাজ বাতলে দিয়ে পাখা হাতে কাছে এসে বসলেন আরতি দেবী।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন অনু দেখলে আরতি দেবী ওঠবার নাম করছেন না, তখন অতিষ্ঠ হয়ে বললে, কেন কষ্ট করছো মা, ওকে ডেকে দাও। দুপুরবেলাতেও তুমি যদি একটু বিশ্রাম না নাও—

আরতি দেবী বুঝতে পারলেন। বুকটা ব্যথিয়ে উঠলো। যে অনুকে চোখের সামনে তিল তিল করে গজিয়ে উঠতে দেখেছেন, সেই অনুর কাছে আজ আর তাঁর স্নেহ সেবা যত্নের কোনো মূল্যই নেই। আট বছরের অনু বদলে গেছে।

উঠে এলেন আরতি দেবী।

আহার সেরে অনু ঘরে ঢুকতেই ঈষৎ গম্ভীর গলায় বললেন, শোনো, কথা আছে তোমার সঙ্গে।

বেশ রূঢ় ভাষাতেই কিছু-একটা বলবার ইচ্ছা ছিলো, তবু কি এক অসামান্য দুর্বলতা তাঁর অনুর প্রতি, কিছুতেই কঠিন হতে পারেন না। অনুকে পাশে বসিয়ে তার পিঠে হাত রেখে ধীরে ধীরে কয়েকটা উপদেশ দিলেন। হাসিমুখে।

বললেন, তোমার তো আর এভাবে হইহই করলে চলবে না বাবা। অনেক দিন তো হয়ে গেল উনি মারা গেছেন। এবার তোমাকেই সব দেখতে-শুনতে হবে, ম্যানেজারের ওপর বিশ্বাস করে বেশী দিন আর ফেলে রাখা কি উচিত?

অনু হালকা হয়ে বললে, বেশ তো মা, কি করতে হবে বলো না।

আদরের স্বরে আরতি দেবী বললেন, কারখানায় বেরুতে হবে তোমাকে। খাতাপত্তর দেখা, কাজকর্ম দেখা—

—বেশ তো। খাতাপত্তর দেখার কাজ আমাকে শিখিয়ে দিতে হবে কিন্তু। কর্মচারীদের কাছে শিখতে পারবো না আমি। অনু বললে।

হেসে ফেললেন আরতি দেবী।—কেন, লজ্জা করে বুঝি?

আবদারে গলে পড়ে মাথা হেঁট করলে অনু।

আরতি দেবী সান্ত্বনা দিলেন।—বেশ, আমিই শেখাবো যতটা পারি। কিন্তু সব তো

আমিও বুঝি না ভালো। বুদ্ধিমান ছেলে তুমি, ম্যানেজারের কাছে একটু দেখেশুনে নিলেই সব শিখে যাবে।

সম্মতি জানালে অনু। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এলো সে, ধীরে ধীরে।

মনে মনে অদ্ভুত একটা তৃপ্তি পেলেন আরতি দেবী। মুখে চোখে ফুটলো জয়ের অভিব্যক্তি। না, আজও সুস্মির মিষ্টিমধুর হাসি অনুর কাছে তাঁর অস্তিত্ব ভুলিয়ে দিতে পারেনি।

উত্তরের জানালাটা খুলে দিগন্তের দিকে চোখ মেলে তাকালেন তিনি। বকের পালকের মতো সুশুভ্র আকাশ। খানিকটা ঠান্ডা রোদ্দুর পড়েছে বারান্দায়। দূরে পাহাড়ের পর পাহাড়, লম্বা চলে গেছে লাইমরেঞ্জ। দিক্‌চক্রবালে মিশে গেছে। মহুয়ার কাঁচা পাতা, সবুজ ছোপ লেগেছে পৃথিবীতে। মাঝে মাঝে অনুর্বর উলঙ্গ পাহাড়ের অঙ্গ। নীলগাইয়ের মসৃণ দেহের মতো দেখায়। নীলচে রঙ—চাপা বেগুনী আভা ঐ নীলাভ পাথরের গায়ে। চুনের পাহাড়।

লাল পাথুরে জমিতে আমলকীর বন। সিরসিরে বাতাসে পাতা নড়ে। প্রজাপতির মতো। রোদে চিকচিক করে সুপুষ্ট সুগোল আমলকী।

দুপুরের ভোঁ বেজে গেছে।

ক্যাঙারুর মতো পা ফেলে ফেলে দ্রুত এগিয়ে চলেছে যত দেহাতী কুলিকামিন, রেজা আর রোজমজুরের দল। ওরা মধ্যাহ্নে আহার সেরে আবার কাজে চলেছে। একটু পরেই কারখানার সাবধানী-ঘণ্টা বেজে উঠবে। ডিনামাইট পাথরের চাঙড় খসাবে। ভাঁটায় পুড়িয়ে সাদা করে দেবে নীল পাথর, মেশিনে ফেলে গুঁড়ো করে দেবে। তারপর ঘণ্টায় সাতটা ওয়াগন ভর্তি হয়ে সরে পড়বে এদিকে-ওদিকে।

দূরের পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে দেখেন আরতি দেবী।

মনোতোষের সৃষ্টি। মৃত স্বামীর বুকের সুর দিয়ে গাঁথা এক টুকরো অপূর্ব গীতিকা। নিপুণ শিল্পীর হাতের যুগসুন্দর চিত্রনিদর্শন। প্রাণ ভরে তাকিয়ে দেখেন আরতি দেবী। বহু নির্জন মধ্যাহ্নে বেদনাব্যথিত চোখ মেলে দেখেছেন। আর প্রতিদিনই মনে হয়েছে এ দৃশ্য যেন চিরনূতন।

মনোতোষকে ভালোবাসতে পারেননি আরতি দেবী। মনোতোষের সৃষ্টিকে ভালো-বেসেছেন।

নিয়মিত কারখানায় যাতায়াত শুরু করে দেয় অনু।

সত্যিই। নিষ্কর্ম মধ্যাহ্নগুলো চুপ করে শুয়ে বসে সুন্দরী স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করে কাটাতে রুচিতে বাধতো তার। কাজ পেয়ে বেঁচে গেল। সকাল আটটা থেকে বারোটা অবধি, মাঝে দু ঘণ্টা বিশ্রাম। দুটো থেকে বিকেল পাঁচটা অবধি আবার কারখানা। কাজ করার মধ্যে ডুবে গেল অনু।

তা বলে আনন্দালাপে পূর্ণচ্ছেদ পড়েনি।

অনেক রাত অবধি নানা দিকে দুজনে ঘুরে বেড়ায় বনবাদাড়ে, নদীর তীর ধরে ধরে। দিনের অপ্রাপ্তিটা পুষিয়ে নেয়। কস্তুরীমাতাল হরিণীর মতো লাল মেঘের দিকে, সাদা চাঁদের দিকে ছুটে বেড়ায় সুস্মিতা। অনুর পিছনে পিছনে।

একটা ছোট ক্যামেরা কিনেছে অনু। বিকেলে দুজনে যখন বেড়াতে বেরুলো, একখানা পুরোনো খবরের কাগজে সেটা মুড়ে মায়ের চোখ ফাঁকিয়ে নিয়ে এলো অনু। পর পর অনেক-গুলো ছবি তুললো সুস্মির, নানারকম ভঙ্গির। কখনো দাঁড় করিয়ে, কখনো বসিয়ে, কখনো সুস্মি যখন ছুটোছুটি লাফালাফি করছে তখন।

তারপর যখন ক্লান্ত বোধ করলে তখন সবুজ দূর্বা ঘাসের জাজিমে দেহ এলিয়ে দিলে ওরা।

রাত হয়ে আসে। আকাশে দেখা দেয় সোহাগী চাঁদ। ক্ষীণতটা টুংরীর ক্ষীণ সুরতরঙ্গ ভেসে আসে। সোঁ-সোঁ করে খানিকটা ঝড়ো হাওয়া ঘূর্ণির মতো পাক দিয়ে দিয়ে আকাশে

উঠে শুকনো পাতা ছড়িয়ে ছুঁড়ে দেয়। ক্রমশ দমকা বাতাসের বেগ বেড়ে চলে। ধুলোয় ধুলোয় চারিদিক কুয়াশা-ভোরের মতো ঝাপসা হয়ে ওঠে। জ্যোছনার গায়ে ময়লা ধরে।

কপট শঙ্কার ছাপ পড়ে সুস্মির মুখে। কাছে সরে আসে সে, অনুর গায়ে গা ঘেঁষে।

—ভয় করছে? সবল হাতটা সুস্মির পিঠের ওপর রেখে অনু প্রশ্ন করে।

উত্তর দেয় না সুস্মি। কান পেতে ঝড়ের শব্দ শোনে। বিভ্রান্ত চোখে চেয়ে দেখে ঝড়ের প্রলাপ।

—কি, ভয় করছে? আবার প্রশ্ন করে অনু।

—হ্যাঁ। অনুর চোখের ওপর দুটি গভীর শান্ত চোখ ফেলে মাথা নাড়ে সুস্মি।

—তবে চলো বাড়ি ফিরি।

—না।

দুজনেই হেসে ফেলে। সশব্দে।

ঝড়ের মত্ততা আসে কমে। এক ফালি রাতের ছায়া এসে পড়ে ওদের ওপর। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে কালো-কাজল মেঘে ঢেকে গেছে চাঁদের মুখ। সাদা আকাশের গায়ে আরো অনেক কালো মেঘ জমে ওঠে। সুরতাশ্রিত হস্তিনীর মতো যেন গড়িয়ে নেমে আসছে মাটিতে।

বৃষ্টি নামবে হয়তো এখনি। জলো বাতাসের শীতলস্পর্শে দেহমন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। সুস্মিকে বুকের কাছে টেনে নেয় অনু।

প্রতিদিনের মতো আজও লাইমরেঞ্জের সার্চলাইটটা ক্রমশ ঘুরে চলেছে অবিরত। দূরে বৃষ্টি নেমেছে। গুঁড়ি গুঁড়ি জলের ফোঁটা। ঝকঝকে বরফের কুচির মতো। কৃত্রিম ফোয়ারার শীকরবিন্দুর মতো ঝিরঝিরে জলের ফোঁটা চমক দেয়। সার্চলাইটের বিদ্যুৎ-আলোর ঝিলিক মেখে অজস্র জোনাকির মতো দেখায়। আকাশ থেকে ঝরে পড়ে।

বৃষ্টি আসছে। ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসছে।

পালাবার সময় পেলো না ওরা। ইচ্ছাও ছিলো না হয়তো। মুহূর্তে ভিজিয়ে দিলো দুজনকে। ভিজে সপসপে শাড়ি লেপটে গেল সুস্মির দেহে। মোহমদির দেহরেখা হয়ে উঠলো সুস্পষ্ট।

ক্যামেরার কেসটা ভিজে গেল। সেটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে হাতে হাত দিয়ে বাড়ির পথ ধরলে দুজনে। এভাবে পাশাপাশি ভিজতে পায়নি তারা কোনো দিন। আজ তাই চমৎকার লাগছে ওদের। এক অপূর্ব অনুভূতি।

এদিকে, মনে মনে সুস্মির ওপর চটছিলেন আরতি দেবী।

ইদানীং অনুর চেহারা খারাপ হয়ে আসছে, লক্ষ করেছেন তিনি। চোখ দুটো বসে গেছে। মুখখানা যেন রোগে ভুগে শুকিয়ে গেছে। তাঁর চোখের অণুবীক্ষণ দৃষ্টিতে মনে হয়েছে, কি যেন এক গভীর বিষাদের ছায়া লুকিয়ে থাকে অনুর চেষ্টাকৃত ম্লান হাসির আড়ালে। জীবনের মাধুর্যে টলমল করতো যে পেয়ালা, তাকে নিঃস্ব করে ছাড়বে সুস্মি।

একবার দুর্গাপুজোয় দরিদ্র-ভোজন দেখেছিলেন আরতি দেবী। ছোটবেলায়। একটা কাঙালীকে খেতে দেখেছিলেন দু'বার করে, গোগ্রাসে। তা বলে সুস্মিতা কি এতদিন কাঙাল ছিলো নাকি? নিজেকে খুব ভালো করে চেনেন বলেই নিজের জাতকে বিশ্বাস করেন না তিনি।

শব্দ শুনে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলেন আরতি দেবী। তাঁরই চোখের সামনে দিয়ে ভিজতে ভিজতে ফিরলো অনু আর সুস্মি। মসৃণ ঘাড়টা চিকচিক করছে সুস্মির। বুকের ভাঁজে সাপটে লেগে আছে ভিজে শাড়ি। না, সুস্মিতা সুন্দরী নিঃসন্দেহ। সুঠাম সুডৌল নারীদেহ। এমন রূপসী পুত্রবধূকে তিনি নিজে খুঁজে বের করেছেন। মনে মনে গর্ব অনুভব করেন আরতি দেবী। এ সৌন্দর্যের বিনিময়ে একজনকে ধ্বংস করে কি আত্মতৃপ্তি পাবে সুস্মিতা! সুস্মির বিরুদ্ধে বিতৃষ্ণা চাগিয়ে ওঠে তাঁর মনে।

ডাকলেন তিনি সুস্মিকে।

বললেন, তোমাদের কি এতটুকু ভয়ডর নেই? বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়ায় এত রাত অবধি?

হাসবার চেষ্টা করে সুস্মি বললে, ভয় কেন হবে মা? অপাঙ্গে একবার সে তাকিয়ে নিলে

অনুর দিকে। হয়তো বোঝাতে চাইলে যে অনুর মতো একজন সুপুরুষ ব্যক্তি যখন তার দেহরক্ষী, তখন আর ভয় কিসের।

—গাছে গাছে মহুয়া পাকতে শুরু হয়েছে। দিনরাত মৌমাছি ভনভন করছে তা দেখেছো?

—বাঃ রে, মৌমাছিকেও ভয় করতে হবে! নাকী সুরে আবদারে গলে পড়লো সুস্মি।

ফিক করে হেসে ফেলেই গম্ভীর হলেন আরতি দেবী।—তোমার যেমন বুদ্ধি। মৌমাছি নয়, গাছে গাছে মৌচাক বাঁধছে এখন। মহুয়া পাকলেই গাছে গাছে মৌচাক বাঁধে। আর এইবার দেখবে সন্ধ্যে হলেই বনজঙ্গল থেকে ভালুক আসবে দলে দলে। মধু খেতে।

—ওঃ ভালুক। তা আমরা তো অত দূর যাই না, মা।

ধৈর্য হারালেন আরতি দেবী। বললেন, দূর-অদূর বুঝি না আমি, তোমার খুশি হয় যেও, অনুকে যেতে দেবো না আমি কাল থেকে। এই তো আজ ভিজে এলো, এর পর ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করুক একটা। দিন-কে-দিন কি চেহারা হচ্ছে!

মাথা নীচু করে সুস্মি বললে, বলছিলো আজকাল নাকি কাজ বেড়েছে—

তাকে কথা শেষ করতে দিলেন না আরতি দেবী।—অনুই আজ প্রথম কাজে বেরুচ্ছে না। উনি অনেক বেশী খাটতেন, দিনরাত ব্যবসা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। রাতে ঘুমোননি তবু একদিন একটু শরীর খারাপ হতেও তো দেখিনি।

সুস্মি মাথা নীচু করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো চুপচাপ, তারপর ধীরে ধীরে সরে গেল তাঁর সামনে থেকে।

ঘরে আলো জ্বাললেও যে জানালাটা অন্ধকারে ঢেকে থাকে, তারই পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন আরতি দেবী। নির্জনে একটু ভাবতে চান।

জানালার পাল্লাটা ঈষৎ খুলে দিয়ে দাঁড়ালেন। মুখে-চোখে এসে লাগলো রেতো-বর্ষার ছাট। শীকরসিঞ্চনে উত্তপ্ত মুখটা ঠাণ্ডা হয়ে এলো। গরাদের ফাঁকে গাল দুটো চেপে আরো একটু বৃষ্টির জল মাখতে ইচ্ছা হলো। আঃ, সুস্মির মতো আজো তিনি যদি হইহই করে ছুটে বেড়াতে পারতেন! সুস্মির মতো যদি বনে-বনান্তরে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে ঘুরে বেড়াতে পারতেন! মঙ্গলগ্রহের লাল অরণ্যের ভেতর দিয়ে কত স্বপ্নভ্রমণের প্রহর কাটিয়েছেন একদিন। হাউইয়ের মতো ছুটতে চেয়েছিলেন, তারার পিছনে তারার মতো। অথচ। অনেক ঝাপসা মুখ মনে পড়ে। বিয়ের পরেও হয়তো তাঁর কল্পরাজ্য সার্থক হতে পারতো। কিন্তু, মনোতোষ ছিলো রীতিমতো কাজের মানুষ।

তারপর। মনোতোষও মুছে গেছে। বড় নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছেন আরতি দেবী। অনু, সুস্মি। আঃ, তাঁর দুঃখের এতটুকু যদি এরা বুঝতো। তা হলে, তা হলে এতখানি নির্দয় হয়তো হতো না। অভিমানে চোখ ঠেলে জল আসে। কাঁদতে ভালো লাগে আরতি দেবীর। অন্ধকার আকাশের দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে থাকেন। গাল বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ে। নিস্তব্ধ কান্না গড়িয়ে পড়ে তাঁর চোখ বেয়ে। মনে মনে হাঁপিয়ে ওঠেন আরতি দেবী।

হাতের মুঠোর মধ্যে, গালের দু'পাশে ঠাণ্ডা গরাদের স্পর্শটা বেশ লাগে।

এদের কাছ থেকে যদি এতটুকু সহানুভূতি পেতেন! এত তীব্রভাবে তাঁর চোখের সামনে নাই-বা প্রকট করে তুললো ওদের সুখের উল্লাস। আজ যদি মনোতোষ বেঁচে থাকতো—সুখ না হোক, সুখের ছদ্মবেশ তো রাখতে পারতেন সারা দেহে।

মনটা হালকা হয়ে এলো। আঁচলে চোখমুখ মুছে ঘুরে দাঁড়ালেন এবার। না, কেউ লক্ষ করেনি এতক্ষণ। তাঁর দুর্বল মুহূর্তগুলো ধরা পড়েনি। শুকনো হাসি হাসলেন আরতি দেবী। তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকাবার সময় আছে নাকি ওদের।

উঁকি মেরে দেখলেন, বারান্দার ডেকচেয়ারটায় বসে কি একটা পত্রিকার পাতা ওলটাচ্ছে অনু।

পা টিপে টিপে পাশের ঘরে ঢুকলেন আরতি দেবী।

বেশ পরিবর্তন করছিলো সুস্মি। এখনো ভিজে শাড়িটা জড়িয়ে রয়েছে তার দেহে। চোখের নীচে দুটি সজল রেখা—সেও বোধ হয় কাঁদছিলো এতক্ষণ।

আরতি দেবী একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। আয়নার মধ্যবর্তিতায় চোখাচোখি হতেই লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো সুস্মি, পালাবার পথ খুঁজলে।

—শোনো।

ফিরে দাঁড়াতে হলো।

—ছোট ঘরের খাটখানা কাল আমার ঘরে ঢুকিয়ে দিতে বোলো। কাল থেকে তুমি আমার কাছে ও ঘরে শোবে।

কথা শেষ করে এক মুহূর্তও দাঁড়ালেন না আরতি দেবী। খাবার হয়েছে কিনা খোঁজ নিতে গেলেন।

অনেকক্ষণ অবধি ঘুম আসেনি তাঁর। অনেক দুশ্চিন্তা ঘুরছে মাথায়।

আয়নায় দেখেছেন নিজের চেহারা। দেখে নিজেই আঁতকে উঠেছেন। এ কি! দুটো গহ্বরের মধ্যে কাচের মার্বেলের মতো ঝাপসা চোখ। তাঁর সেই পুরুষ-মনোহারী চোখ জোড়া আজ এমন হয়ে গেছে? যেন তেজ নেই, আনন্দ নেই, জীবন নেই।

ভাবতে ভাবতে কখন বিছানায় লুটিয়ে পড়েছিলেন। ঘুমিয়ে পড়েছিলেন কখন।

মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল আরতি দেবীর।

বিছানায় উঠে বসলেন। কেমন যেন একটা নিঃস্ব বাতাস থেকে থেকে ধাক্কা দিচ্ছে বুকে। বুকের ব্যথা ফেনিয়ে উঠতে চায়। কিছু একটা ভাবতে ইচ্ছা করে। কিন্তু কিছুই যেন মনে পড়ে না। ছটফট করতে ইচ্ছা হয়। ছুটে বেড়াতে চান উন্মাদের মতো। সমস্ত বুকটা যেন ফাঁপা হয়ে গেছে। বুকের ভেতর থেকে কে যেন এক মুঠো মাংস তুলে নিয়েছে। অসহায়, নিঃস্ব, নিঃশেষিত। বালিশের ওপর মুখ গুঁজে ঠান্ডা উপাধানের পরশ নেন। এপাশ ওপাশ করেন। ঘুম আসছে না আর, ঘুম আসছে না।

চোখ বুজে কল্পনা করেন, পাশেই মনোতোষ শুয়ে আছে। হাত বাড়িয়ে একটা বালিশ চেপে ধরেন। কল্পনা করেন, পাশে শুয়ে আছে মনোতোষ। ওষ্ঠে ওষ্ঠ ছুঁইয়ে পাতলা কণ্ঠে কানে কানে কি যেন বলছে। ভালোবাসা, প্রেম—আরো কত কি। বুঝলে, স্বর্গেও সুখ পাচ্ছি না আমি, তোমাকে ছেড়ে এসে। সত্যি, ভালোবাসা? আচ্ছা, তোমার খুব কষ্ট হয়, না! চলে এসো, চলে এসো লক্ষ্মীটি। আরো কাছে, আমার বুকের মধ্যে। অদ্ভুত আনন্দে শিউরে উঠলেন।

চোখ চেয়ে উঠে বসলেন আবার। খাঁ-খাঁ করে উঠলো বুকটা। না, স্বপ্ন রোমন্থন করে লাভ নেই। যা হারিয়েই গেছে, ফিরে পাবার উপায় নেই।

বিছানা ছেড়ে উঠে এলেন আরতি দেবী।

বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন আস্তে আস্তে। বৃষ্টি শেষ হয়ে গেছে বহুক্ষণ। আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। আকাশে জ্বলছে কোটি কোটি তারা। ভাঙা চাঁদ চমক দিচ্ছে। কল্লোলিনী টুংরীর মিহি আওয়াজ আসছে ভেসে। কবরস্থানের মতো নিশ্চুপ পড়ে আছে সারা বিশ্ব, কোথাও নেই এতটুকু আওয়াজের লেশ। শুধু টুংরী নদীর টুংটুং আওয়াজ। সম্মার্জনীর মতো অন্ধকার মুছছে সার্চলাইটটা। অবিরত ঘুরছে।

আস্তে আস্তে বিছানায় এসে বসলেন আরতি দেবী। নিজের মনেই পা দোলাতে লাগলেন।

মনোতোষ। ভালোবাসেননি কোনো দিন, তবু এত বাঞ্ছনীয় মনে হচ্ছে কেন আজ? অভ্যাসের তাগিদে? কে জানে।

কালো সাটিনের চাদরে হাতের উলটো পিঠটা ঘষতে থাকেন আরতি দেবী। একটা ঠান্ডা কিছু স্পর্শ করতে ইচ্ছা করে। একটা শিশির-শীতল আবরণী যদি তাঁর দেহের উষ্ণতা ঢেকে দিতে পারতো! একটা সুমিষ্ট সুরের বাঁশি যদি এমন সময় তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে দিতো!

আবার বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন আরতি দেবী। ঔৎসুক্য আর আগ্রহ জেগে উঠেছে। পা টিপে টিপে এগিয়ে এলেন। খুব আস্তে। নিঃশব্দে।

অনুর ঘরের জানালাটার কাছে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। অন্ধকারে মুখ দুকিয়ে জানালার ফাঁকে উঁকি মারলেন এবার। পরমুহূর্তেই লজ্জায় কানের কাছটা ছমছম করে উঠলো। চট্ করে সরে এলেন।

উষ্ণতায় জ্বালা করে উঠলো চোখের কোণ দুটো। আরতি দেবীর কালো কুরঙ্গনয়নে এক লোভার্ত আনন্দের আধিক্য চকচক করে উঠলো।

ধীরে ধীরে নিজের বিছানায় এসে লুটিয়ে পড়লেন আরতি দেবী।

পরের দিন আরতি দেবী যখন ঘুম থেকে উঠলেন বেলা তখন অনেক। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলেন রোদ বেড়ে উঠেছে। পূবের পথ অনেকখানি অতিক্রম করে এসেছে সজীব সূর্য।

তাড়াতাড়ি উঠে এসে মুখহাত ধুলেন আরতি দেবী। তারপর বাইরের বারান্দায় ডেক-চেয়ারটা খুলে বসলেন। ছোট্ট টুলের ওপর 'দৈনিক' দুখানা পড়ে ছিলো। দেয়ালঘড়িটার দিকে তাকালেন। শহর কোলকাতা নয় এটা, খবরের কাগজ আসে এখানে অনেক বেলায়। আরতি দেবী নিজেই বিস্মিত হলেন। লোক্যাল ট্রেনটা কখন চলে গেছে, ঘুমের ঘোরে টের পাননি।

বাংলা কাগজখানা টেনে নিয়ে চোখ বোলাতে শুরু করলেন। বাচ্চা চাকরটা চায়ের ট্রে নিয়ে এসে রাখলো। রেখে, ভেতরে চলে গেল সে। পরক্ষণেই অনু আর সুস্মি এলো। সামনের কেদারাটায় বসলো অনু। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা পরিবেশন করলে সুস্মি।

কাগজ থেকে চোখ তুলে তাকালেন আরতি দেবী।—তোমরা চা খাওনি এখনো?

অনু ইংরেজী সংবাদপত্রটি তুলে নিতে নিতে বললে, তুমি ঘুমোচ্ছিলে যে।

আরতি দেবী হাসলেন।—চোখ দেখে মনে হচ্ছে তুমিও খুব বেশী আগে ওঠোনি।

সুস্মি ভিজে চুলের রাশিটা মুঠো করে সামনে তুলে ধরে বললে, আমার কিন্তু অনেকক্ষণ স্নান হয়ে গেছে।

—তা'লে আর চা খাওয়ার প্রয়োজন নেই বলো।

সুস্মি বললে, বাঃ রে, স্নান করে বুঝি চা খেতে নেই।

আরতি দেবী সহাস্যে বললেন, বেলা এগারোটার সময় খায়, না!

—আমরা এখনই উঠলাম তাই।

সুস্মি বাংলা কাগজটার একটা বিজ্ঞাপনের দিকে আঙুল দেখালে। দেখুন না, বলছে বেলা এগারোটায় এক কাপ চা হলে—

মৃদু হাসলেন আরতি দেবী। চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিয়ে অনুকে প্রশ্ন করলেন, কাজে যাবে না আজ?

—যাবো, উঠতে যে দেরি হয়ে গেল।

ওরা তিনজনে বসে কিছুক্ষণ আবোল-তাবোল বকে গেল। তারপর একসময় অনু উঠে গেল, সুস্মিরও সংসারের কাজে ডাক পড়লো। ভাঁড়ারের চাবি নিয়ে চলে গেল সেও।

খানিক পরেই আরতি দেবী দেখলেন, অনু বেরিয়ে গেল। অপসিয়মাণ তৈলযানটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন।

আস্তে আস্তে, এবার কেদারা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন আরতি দেবী। স্নান সেরে নিতে হবে।

অনেক বেলা অবধি বিছানায় পড়ে থাকার দরুন কেমন যেন অসুস্থ বোধ করছিলেন আরতি দেবী। তাই বহুক্ষণ ধরে ঠাণ্ডা জলে স্নান করলেন। তারপর কাপড় বদলে ঘরে ঢুকলেন ধীরে ধীরে।

মুহূর্তে প্রতিটি শিরা যেন জ্বলে উঠলো। ছুঁচ ফুটলো মগজের ভেতর।

দেয়ালে টাঙানো অনুর সুন্দর আবছা ফোটোগ্রাফটার দিকে অনিমেষ নয়নে সুস্মি তাকিয়ে রয়েছে। হতচেতন তন্ময় ভাব তার চোখে-মুখে। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি।

গা জ্বালা করে উঠলো আরতি দেবীর। প্রেম তিনিও করেছেন, ভালোও বেসেছেন। তাঁরও স্বামী ছিলো একদিন। আর সে স্বামীর ভালোবাসাও পেয়েছিলেন। কিন্তু কোনো দিন ক্ষণিকের অনুপস্থিতিতে বিরহযাপন তো অসহ্য হয়ে ওঠেনি! সুস্মির এই স্বামীর প্রতি অতিরিক্ত অনুরক্ত হওয়াটা স্ত্রৈণ পুরুষের ব্যবহারের মতো ক্লেদপঙ্কিল মনে হয় তাঁর।

সহ্য করতে পারেন না।

গত সন্ধ্যার আদেশটা তাই আবার মনে পড়ে গেল তাঁর।

চাকরটাকে ডেকে সুস্মির সামনেই বাড়তি সিংগল-বেড খাটখানা তাঁর নিজের ঘরে আনালেন। সুস্মিকে বললেন, এখন থেকে তোমার বিছানাপত্তর আনিয়ে ব্যবস্থা করে রাখো।

আর কিছু বলতে হলো না। সুস্মি বুঝতে পারলো।

দুপুরে অনু যখন আহারে বসলো, অনেক চেষ্টা করেও লজ্জায় নবব্যবস্থার কথাটা বলতে পারলো না সে। সন্ধ্যার সময়ও সুযোগ পেয়েছিলো, অনুর সঙ্গে নিরালা সঙ্গ পেয়েছিলো, তবু বলতে পারেনি। রাত্রিতে সুস্মি যখন আরতি দেবীর ঘরে শুতে এলো, তখন আরতি দেবী দেখলেন সুস্মি আঁচল চাপা দিচ্ছে চোখে।

আনন্দ পেলেন, শান্তি অনুভব করলেন আরতি দেবী। জয়ের অভিব্যক্তি ফুটলো তাঁর মুখে-চোখে।

খানিক পরে সুস্মি টের পেলো আরতি দেবী ঘুমিয়ে পড়েছেন। ওর ইচ্ছে হলো নিঃশব্দে এ ঘর থেকে পালিয়ে যেতে। অনুর কাছে ছুটে যেতে ইচ্ছে হলো। কিন্তু সাহস হলো না। চুপ করে বিছানায় পড়ে পড়ে ভাবতে লাগলো। ঘুমোবার চেষ্টা করলে। অন্ধকারে চোখ চেয়ে পড়ে রইলো।

অনুরও ঘুম আসছিলো না। পাশের ঘরে একাকী শুয়ে শুয়ে ছটফট করছিলো সে। ঘুম আসে না, বিছানায় ছটফট করে আর ভাবে তার নীরস ভাগ্যের কথা। নিয়তির চাকা ঘুরতে ঘুরতে যেন দুঃখের ত্রিশূলফলাটা অনুরই বুকে এসে খোঁচা দিচ্ছে। এ যেন ঝড়ের আগে কালো মেঘ গুটিয়ে আসছে ক্রমশ।

নির্বিষ অভিমানের কুয়াশা আচ্ছন্ন করে ফেলে তার সমগ্র চেতনা। পাঁজরে পাঁজরে গুমরে মরে বৈপ্লবিক আক্রোশের নিষ্ফলতা। অভিশাপের ছোঁয়াচ লেগে নিঃস্ব হয়ে আসে টলমল সুখের পেয়ালা। নিঃশেষিত হয়ে আসছে তার উচ্ছ্বসিত আনন্দের উৎসস্রোত।

স্তব্ধ নিশীথের অন্ধকারে বালিশে মুখ চেপে বহুক্ষণ ভাবলে অনু। ক্রমশ তার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে সুস্মি।

আজ অনেক রাত অবধি আশায় আশায় ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছে সে। শেষে আন্দাজে এবং অনুভবে টের পেয়েছে, পাশের ঘরে আরতি দেবীর কাছে শয্যা নিয়েছে সুস্মি। অভিমানে চোখ ছেপে জল আসছে তার। মার আদেশ? কিন্তু সুস্মি জানায়নি কেন তাকে।

তারপর। বহু চেষ্টা করেছে অনু। ঘুম আসেনি। শুধু অপেক্ষা করেছে। হয়তো সুস্মি আসবে। রাতের অন্ধকারে হয়তো লুকিয়ে চলে আসবে সুস্মি। অধীর আক্ষেপে প্রতীক্ষা করেছে সে।

কপাটের খিলটা খুলে রেখে দীর্ঘ দীর্ঘ প্রহর অতিক্রম করে চলে অনু।

অনেক রাত অবধি জেগে কাটিয়েছে সুস্মি। আড়-চোখে তাকিয়ে দেখেছে সে আরতি দেবীর নিদ্রিত মুখের দিকে। নিঃসন্দিগ্ধ হয়েছে। ইচ্ছে হয়েছে ছুটে চলে আসতে, তবু পারেনি। সাহস হয়নি। ভয়, আশঙ্কা! শঙ্কিত বুকের স্পন্দন গুনে গুনে রাত কাটিয়েছে সে, কিন্তু আসতে পারেনি অনুর কাছে। ভয় হয়েছে। যদি জেগে ওঠেন আরতি দেবী। আর লজ্জা। তার অযাচিত অভিসার দেখে অনু কি মনে করবে। সারা রাত্রি অপেক্ষা করেছে অনুর দিক থেকে কোনো শব্দের ইঙ্গিত ইশারা পাবার আশায়। রাত জেগেছে। কিন্তু অনু নিশ্চুপ, অনু নিঃশব্দ। জাগররাত্রি তার ব্যর্থ হয়েছে। ব্যথিত চিন্তায় কোন ফাঁকে ঘুমিয়ে পড়েছে সে।

ভোর হয়ে এসেছে। কাচের শার্সি ভেদ করে ঢুকেছে এক ঝলক রুপালী আলো।

কিসের একটা শব্দে চমকে জেগে উঠলো সুস্মি। ঘুম টুটে গেল।

একটা তীক্ষ্ম হাসির আওয়াজ। সকালবেলাকার নিঃশব্দতা ভেঙে গমকে উঠছে কাঁচ ভাঙার আওয়াজ। বাতাস চিরে চিরে একটা উন্মাদ হাসির ঝলক।

চকিতে ফিরে তাকালে সুস্মি। পরমুহূর্তেই বালিশে মুখ ঢেকে পড়ে রইলো সে। ঘুমের ভান করে পড়ে রইলো। চোখ বুজে স্তম্ভিত বিস্ময়ে বোবা হয়ে রইলো সুস্মি।

ভোর হয়েছে। ঠাণ্ডা বাতাস আসছে কেঁপে কেঁপে। আর সাদা আকাশ। শিশিরভেজা

শ্বেতকমলের মতো সাদা আকাশ। সমুদ্রের ফেনার মতো ফুটফুটে ফর্সা আকাশ। গলানো সোনার মতো এক মুঠো রাঙা মেঘ পুবের নীচু নভোদিগন্তে। আঁকাবাঁকা টুংরী নদীর জল। চমক দিচ্ছে সূর্যের কিরণ লেগে। যেন এক ফালি ভাঙা বিদ্যুৎ। পাকা মহুয়ার মিঠে সুগন্ধ আনছে নেশার আমেজ। আমলকীর শাখায় শাখায় কচি সবুজ পাতার ঝালর। লাইমরেঞ্জের কুয়াশার ফাটা ফাটা চাদর ঝুলছে।

রসপিপাসু অনু তাকিয়ে থাকুক সেদিকে।

রতিবিলাসাকাঙ্ক্ষী কৃষ্ণসারিণীর মতো তন্ময় বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন আরতি দেবী। দেয়ালের বড় আয়নাটায় নিজের বিস্রস্ত রূপ দেখছেন। আর হাসছেন। হাসির প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যাচ্ছে নেচে নেচে। মাতালের হাসি! উন্মাদের হাসি!

[১৩৫২



কুসীদাশ্রিত

পার্কটার দক্ষিণ দিকে এক সারি বড় বড় ম্যানসন দেখতে পাচ্ছো? ঐ যে কার্নিসের কোলে কার্নিস, ভেণ্টিলেটারের ভুরুতে ভেণ্টিলেটার দেওয়া বাড়িগুলো—ওরই মাঝখানে দেখো আরেকখানি ক্ষুদে অট্টালিকা। হ্যাঁ, দু'পাশের বাড়ির বিরাটত্ব এ বাড়িখানার মহিমা কমিয়ে দিয়েছে সত্যি। কিন্তু, বিচার করে দেখো তো, দেখো না একটু চোখ চেয়ে, একটু ভালো করে, তোমাদের চোখে দু-বেলা যেসব প্রাসাদ দৃষ্টির প্রসাদ পাচ্ছে তাদের চেয়ে কি এখানি অনেক বড় নয়? নয় অনেক বেশী সুন্দর, আর সৌষ্ঠবে নয় কি সার্থক?

চিক দিয়ে ঘেরা বাড়িখানা একটু রহস্যজনক, একটু অবোধ্য বুঝি? তা তো বটেই। এ-পাড়ায়—এ-পাড়ার বুকে যেন বেমানান। অলজ্জ স্বাধিকারের জোরে এ-পল্লীর মেয়েরা সোজা হয়ে চলে, শীতের রাতেও পরে হাতকাটা জ্যাকেট। অর্গ্যাণ্ডি, মলমল, আদ্দি। জড়োয়া নয়, জড়ায় জরির কাজ করা হাওয়াই শাড়ি। কিংবা পাতলা রেশমের জামদানি। হোক না শীতের সন্ধ্যা, থাক না বাতাস-বসন্ত। কি আসে-যায়, সামান্য একটু রোমশিহরনের শীত-যন্ত্রণায়, কথালাপ আর কৃষ্টির রোমাঞ্চ তো নষ্ট হয় না। তাই এরা শাড়ির আঁচলটা টেনে দেয় বুকের মাঝ দিয়ে, শাড়িটা সাপটে থাকে দেহের লালিত্যে, বাঁকা আর ভাঙা দেহরেখায় লেগে থাকে বাসনার আবরণ।

এরা হাসে সশব্দে, গান গায় গলা ছেড়ে, সিনেমায় যায় পুরুষবন্ধুদের সঙ্গে। রঙিন শাড়ির আগুন ছড়ায়, এসেন্সের আমেজ ধরায়। শ্যাম্পু-করা চুল ফুরফুর করে, নীল রুমালের বাঁধন ওড়ে। নেচে বেড়ায়, ছুটে বেড়ায়, রেকর্ড বাজায়, রেডিও শোনে। সাদা মলমলে কি গোলাপী গালের ছায়া? না লুকোনো দেহের পাটলবর্ণের প্রতিচ্ছবি?

কিন্তু—

কিন্তু এদের মাঝখানে ও-বাড়িখানার মুখে পড়লো কি করে চিকের আড়াল! ঘোমটার অন্তরালে ওরা কারা?

যেই হোক, ও-বাড়ির লোক মিশতে চায় না এদের সঙ্গে। সাগর আর নদীর মাঝে দূরত্বটা কম হতে পারে, কিন্তু মাঝখানে যদি দাঁড়ায় অভেদ্য পাহাড়—মিলবে কি করে! হ্যাঁ,

ওদের মাঝখানে ঐশ্বর্যের অনৈক্য না থাকতে পারে, আছে সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য।

ঐ সাদা গোল বাড়িটার অর্ধেকটা জ্যোতিষবাবুর দখলে। বাকী অর্ধেক বাড়িওলার। কোলকাতায় প্রথম যখন বদলি হয়ে এলেন, জ্যোতিষবাবু বুঝতে পারেননি পাড়াটার গুণ-গরিমা। ইদানীং টের পাচ্ছেন, আর মনে মনে চটে উঠছেন। কড়া হুকুম দিয়েছেন, পর্দা সরাবে না, চিক তুলবে না।

ষাট টাকায় ঢুকেছিলেন চাকরিতে, আজ জ্যোতিষবাবু পাচ্ছেন পনেরো শ। সময় এবং স্বর্ণমুদ্রার সঙ্গে তাল রেখে চলেছেন, ছ-আনা দামের টাই ছেড়ে টুটাল ধরেছেন বহু দিন। বড় ছেলেকে ঢুকিয়েছিলেন মফস্বলের কলেজে, ছোটকে পড়িয়েছেন সেণ্ট জেভিয়ার্সে। কিন্তু মেয়েদের এতটুকু উড়তে দেননি।

ছেলেদের নাম বদলেছে উন্নতির ধাপে ধাপে। বড়র নাম লক্ষ্মীনাথ, মেজ ছেলে অতুল, ছোট সুর্যেন্দু। মেয়েদের নামও মার্জিত হয়েছে। বড় রাধারানী, মেজ নির্মলা, সেজ মেয়ের নাম নমিতা, আর সমিতা হলো ছোট। বড় আর মেজর বিয়ে দিয়েছেন বছর কয়েক আগে। নমিতারও বিয়ের সময় হয়ে এলো।

কিন্তু জ্যোতিষবাবু ভাবছেন অন্য কথা। তাঁরও যে সময় হয়ে এলো। আর মাত্র পাঁচ বছর বাকী। তারপরই রুটিন-বাঁধা জীবনে যতি পড়বে। থেমে যাবে তাঁর দৈনন্দিন কর্ম-ব্যস্ততা। শীতের সকালে স্নান করতে হবে না, ন'টার সময় সারতে হবে না অনিচ্ছুক আহার।

চাকরি থেকে পাঁচ বছর পরেই অবসর নেবেন জ্যোতিষবাবু।

তারপর? সেই কথাই ভাবছিলেন। সারাটা জীবন ভাড়াটে বাসায় কাটিয়ে এসেছেন। আজ কোলকাতা, কাল রংপুর, তারপর রাজসাহী, নয় তো মালদহ। বিক্রমপুরে কাটিয়েছেন দু বছর; বাঁকুড়োতেও নেহাত কম দিন নয়।

জ্যোতিষবাবুর জন্মস্থান কিন্তু বর্ধমানে। বৃদ্ধ হয়ে আসছেন, বয়স বাড়ছে। জনারণ্যের জঞ্জাল তাই আর সহ্য হয় না।

জ্যোতিষবাবু ঠিক করেছেন, আর ভাড়াটে বাড়িতে নয়। এবার একটা নিজস্ব বাড়ি চাই। নিজের বাড়ি। যেখানে উত্তর-অবসরের দিনগুলি আনন্দে কাটিয়ে দিতে পারবেন। শহর নয়, গ্রাম। ধোঁয়া আর ধাঙড়ের দেশে নয়, ধ্যান আর ধানের দেশে। দেশের ভিজে মাটি তাঁর মন টানছে।

ছেলেবেলাটা কাটিয়েছেন গ্রামের বিশ্রামে। সব মানুষই তো ফেলে-আসা শৈশবের রোমাঞ্চ রোমন্থন করে জীবনের শেষ দিন অবধি। কৈশোরের দিনগুলি তাঁর চোখে রমণীয় বলেই কৈশোরের মাটিটাও এত মধুর মনে হয়। সে-কথা জ্যোতিষবাবু বুঝতে পারেন না। তাঁর ধারণা, সোনালী ধানের সুগন্ধ আঘ্রাণ আজো বুঝি তেমনি মিঠে আর মনোহর।

বড় ছেলে লক্ষ্মী গ্রামের ওপর বীতশ্রদ্ধ। সে বাধা দেয় যুক্তির সংযুক্তিতে। বলে, পাড়াগাঁয়ের মতো অপরিচ্ছন্ন জায়গায় বাস করে না কেউ। উপায় যার নেই, সে থাকুক গ্রামে, কিন্তু শখ করে টাকা নষ্ট করার মতো জায়গা নয় পাড়াগাঁ।

জ্যোতিষবাবুর অনেক সুমধুর স্বপ্নে বোনা গ্রাম। যুক্তি কি বিশ্বাসকে টলাতে পারে! জ্যোতিষবাবু বলেন, নালা-টালাগুলো স্রেফ বাঁধিয়ে দেবো সিমেণ্ট দিয়ে। কাঁদরের ওপর দিয়ে কংক্রিটের একটা পুল করে দেবো, গাড়ি যাবে একেবারে বাড়ির দরজায়।

—পুকুর আর পানা?

—সে খরচও নয় আমি দেবো। রোজগার করেছি, খরচ করবো।

স্ত্রী বীণাবতী বলেন, টাকাগুলো ঐ করেই ওড়াবে আর-কি!

জ্যোতিষবাবু সে কথায় কর্ণপাত করেন না।

মাঠের মাঝখানে একটা পুকুর আছে, দীঘিও হয়তো বলা চলে। নাম, স্নিগ্ধবাস। নাম-সার্থক-করা পুকুরই বটে। চারপাশের জমি থেকে পুকুরের পাড়গুলো অনেক উঁচু। জ্যোতিষবাবু ঠিক করেছেন, স্নিগ্ধবাসেরই উত্তর পাড়ে বেশ বাংলো টাইপের একখানা বাড়ি করবেন।

এর আগেও বহুবার আঁকজোক কেটেছেন তিনি। এখনো সে-প্ল্যান শেষ হয়নি। দিনের

পর দিন কাগজ পেন্সিল নিয়ে ঘরের ছক কেটে চলেছেন। কোন্ দিকে কপাট হবে, ক'টা জানালা। রান্নাঘর দূরে, না—

বাধা এলো হঠাৎ সেজ মেয়ের কাছ থেকে। জ্যোতিষবাবুর আঁকা প্ল্যান দেখে ভুরু কুঁচকে গেল নমিতার। বললে, তার চেয়ে রামপুরের ডাঙায় একটা তাঁবু খাটিয়ে থাকলেই হয়!

অর্থাৎ বাড়ির প্ল্যানে খরচের দিকটা একটু সংক্ষেপ করেছিলেন জ্যোতিষবাবু। দুখানি ঘর, রান্নাঘর। এক ইঁটের দেয়াল।

তাঁর আর দোষ কি? খরচ বাড়াও তো ছেলেরা চটে, খরচ কমাও তো মেয়েরা চটে। শেষে মাঝামাঝি একটা সুরাহা হলো। দোতলা হবে, ওপরে দুখানি ঘর।

স্ত্রী বীণাবতী এদিকে বেঁকে বসলেন। কোলকাতায় চার বছর ধরে থেকে ইতিমধ্যেই শহরটার ওপর তাঁর মায়া পড়ে গেছে। আরো পাঁচ বছর ধরে সে মায়াকে ঘনীভূত করার পর কি গ্রামে যেতে ইচ্ছে হবে তাঁর!

জ্যোতিষবাবুর মতে কোলকাতা একটা জঘন্য জায়গা। ভদ্রলোক বাস করে না এখানে। কথাটা বলেই ঘৃণায় নাক কুঁচকে চিকের ফাঁক দিয়ে পাশের বাড়ির দিকে তাকালেন তিনি।

ছেলেরা বললে, গ্রামেও বাস করা যায় না, দূর থেকে কতই ভালো।

জ্যোতিষবাবু চটে উঠলেন।—এক ছটাক খাঁটি দুধ খেতে পাও এখানে? টাটকা মাছ পাও? শাকসবজি পাও ইচ্ছেমতো? গ্রামে তোমার গোয়ালে গরু, কত দুধ চাই খাও না। পালঙ শাক নিজের হাতে কেটে আনবো, পুকুর থেকে তুলবো কলমি। জাল ফেললেই মাছ।

—কিন্তু ম্যালেরিয়া?

—টি বি কলেরা পক্স নেই এখানে? বছরে বছরে টিকে নিচ্ছো না?

—অপরিষ্কার জল।

—তা তো হবেই, সিওয়ারের পাশ দিয়ে জলের পাইপ যায়নি যে সেখানে। খানিক থেমে বললেন, আর তা ছাড়া টিউবওয়েল তো করবোই।

না, কোনো কিছুতেই হার মানবেন না জ্যোতিষবাবু।

শেষে, শেষ বাণ ছুঁড়লো সেজ মেয়ে।—গ্রামে বাস করবে? তার চেয়ে 'পল্লীসমাজ' বইটা পড়ে দেখো। কেবল ঝগড়া, মারামারি, মামলা-মকদ্দমা।

অতএব স্নিগ্ধবাস বাতিল।

স্রোত আর সময় কারো মুখ চেয়ে অপেক্ষা করে না।

বাড়ি তৈরির জল্পনাকল্পনা চলে, বছরও কেটে আসে। ইতিমধ্যে সেজ মেয়ের বিয়ে হয়েছে, রাঁচির কাছে এক ছোট্ট স্টেশনে আছে সে। স্বামীর চাকরিস্থলে। বড় ছেলে ডাক্তার, বিয়ে দিয়েছেন মাসখানেক আগে।

বড় ছেলে লক্ষ্মীনাথ ঠিক করেছে চাকরি নয়, ডাক্তারি করবে সে। কোলকাতায় নয়, এখানে পাত্তা পাওয়া দুষ্কর। কোনো মফস্বলে।

ছোট ছেলে ল' পাস করে বেঁকে দাঁড়িয়েছে, চাকরি করবে না সেও। ছোটবেলা থেকে সাহিত্যবাতিকটাই ওর মাথা খেয়েছে, জ্যোতিষবাবু জানেন। বড় মেয়ে যাবার আগে সাবধান করে দিয়ে গেছে। সূর্যেন্দুর নাকি কোন একটা বে-জাতের মেয়ের সঙ্গে ভাব হয়েছে। তাকেই বিয়ে করবে বলে গোঁ ধরেছে।

সূর্যেন্দু এসবের সাতেও নেই পাঁচেও নেই।

ও শুধু বুঝেছে কিছু দিনের মধ্যে ও ত্যাজ্যপুত্র হবেই এবং তা নাও যদি হয় তো জ্যোতিষবাবুকেই হতে হবে ত্যাজ্যপিতা। আসলে সংসারের কোনো মানুষটার সঙ্গেই নিজেকে খাপ খাইয়ে চলতে পারে না ও। ওর মনের কেন্দ্রে একক আধিপত্য হলো স্বয়ং ওরই, স্বাধীন স্বাতন্ত্র্য নিয়ে বাঁচতে চায় ও।

তাই জ্যোতিষবাবু সূর্যেন্দুর অভিমত চাইলেন।

বললেন, আর তো চার বছর বাকী, একটা বাড়ি-টাড়ি করতে হয় এবার। বর্ধমানেই

যদি করি তো কেমন হয়?

—মন্দ কি। এর বেশী উত্তর দিলো না সুর্যেন্দু।

একটু আহত বোধ করলেন জ্যোতিষবাবু।

স্ত্রী বীণাবতীকে ডাকলেন।—শুনছো, বর্ধমানেই নয় পাঁচ কাঠা জায়গা কিনি?

—বর্ধমান? আকাশ থেকে পড়লেন বীণাবতী।

সত্যি, বছর দশেক আগে একবার শহরটা দেখে এসেছেন তিনি। বিশ্রী জায়গা। শহর না হাতি।

জ্যোতিষবাবু বোঝাবার চেষ্টা করলেন, আরে না না, ব্রজেন, আমাদের আপিসের ব্রজেন বলছিলো আজকাল নাকি উন্নতি হয়েছে শহরটার।

বীণাবতী বিরক্ত হয়ে ওঠেন।—উন্নতি না কাঁকুড়। বছরে দুবার করে বানে ভাসতে পারবো না আমি। তার চেয়ে গলসীর জলার মাঠে হোগলার ছাউনি করে থাকলেই হয়!

—দামোদরে তো বাঁধ দেওয়া হচ্ছে।

—তুমি যেমন মানুষ, সে কথা আর বিশ্বাস করবে না। মনে নেই, সেদিন হাবুমামা কি বলে গেল? কনট্রাক্টরি নিয়ে কি করে টাকা করছে ওরা? দামোদরের বাঁধ তো ওরাই দিচ্ছে, কংক্রিট দিয়ে ভরাট করার কথা, করছে বালি দিয়ে।

জ্যোতিষবাবু বলেন, তোমার হাবুমামা তো। মামাশ্বশুর হন তাই বলি না। যা খুশি করলেই হলো, ইন্সপেক্টর নেই, দেখছে না তারা?

—ঘুষ বলে একটা জিনিস আছে।

জ্যোতিষবাবু নিরুত্তর হয়ে গেলেন। কথা পালটিয়ে বললেন, কিন্তু সেখানেও তো মানুষ আছে, আর লক্ষ্মী তো বলছে মফস্বলেই ডাক্তারি করবে। বউমাকে নিয়ে গিয়ে সংসার তো পাতবেই, তবে আর ভাড়া গুনতে যাবে কেন? নিজের বাড়ি থাকলে—

লক্ষ্মীনাথ কাছেই কোথায় ছিলো। সে বলে বসলে, রোজগার যদি করতে পারি তো তিরিশ চল্লিশ টাকা ভাড়া দিতে গায়ে লাগবে না। আর, প্রাক্‌টিস না জমলে তো চাকরিই করতে হবে, তখন কোথায় থাকবো তার ঠিক কি।

অর্থাৎ, বিয়ের পরই নিরিবিলিতে নববধূকে নিয়ে সংসারের স্বপ্ন কে না দেখে! কে টানতে চায় পিতামাতার যত্নের যন্ত্রণা!

জ্যোতিষবাবু তবু বলেন, কিন্তু বাড়ি তো আমাকে করতেই হবে কোথাও না কোথাও।

সমিতা ছোট মেয়ে। জ্যোতিষবাবুর উন্নতির শেষ শিখরে ওর জন্ম। তাই ইস্কুলে যেতে পায় ও একা। চিকে চোখ রাখতে পায়। মিশতে পায় সতীর্থদের সঙ্গে। ও যাদের সঙ্গে মেশে, তাদের সকলেরই নিজস্ব বাড়ি আছে, অতএব সেদিক থেকে সমিতার মনের একটা কোণে কিছুটা ক্ষোভও আছে।

ও বললে, বাড়ি যদি করতেই হয় তো কোলকাতায়। খরচ তো একই, যা জমির দামটা একটু বেশী।

বীণাবতী বললেন, তা সমু সত্যি কথাই বলেছে বাপু।

—পাঁচ-সাত হাজারও তো কম লাগে বর্ধমানে। জ্যোতিষবাবু বলেন।

মেজ ছেলে অতুল বললে, কিন্তু এখানে রিটার্ন পাবেন বেশী। আধখানা ভাড়া দিলে মাস গেলে দেড় শো টাকা ভাড়া পাবেন।

—বাড়ি কি ভাড়া দেবো নাকি?

সে যাই হোক, বর্ধমানে হতে পারে না।

নির্ঝর নিস্তব্ধ হবে না তোমাকে নিরীক্ষণ করে। নোঙর ফেলবে না সময়।

জ্যোতিষবাবুর চিন্তা চাপা পড়ে যায় সংসার-সংগঠনের নীচে।

হঠাৎ একদিন হইচই। মেজ ছেলে অতুল কি যেন করে বসেছিলো। জোর করে ধরে বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। বয়সটা খারাপ, সময় থাকতে বিয়ে দিলে শুধরে যেতে পারে। তা না হলে আবার কবে কি করে বসবে! পাড়াটাও খারাপ, লজ্জা তো নেই, হয়তো থানা-পুলিস

অবধি করবে।

হিসেবে একটু ভুল হয়ে গেছে।

মেজ বউমা দেখতে সুবিধের নয়। একটু সুন্দর দেখে বউ আনলেই হতো। লক্ষ্মীর বেলায় তো টাকার লোভ ছিলো না, অতুলের বেলাও লোভটা সংবরণ করলে ভালো হতো।

হয়তো বাপের ওপর চটে গেছে। বউমাকেও তো চিঠিপত্তর দেয় বলে মনে হয় না। নাগপুরে কি একটা কাজ নিয়ে চলে গেছে। চিঠি লিখলেও উত্তর দেয় না।

জীবনের শেষ পরিচ্ছেদে সুখের স্বপ্ন বুনতেন জ্যোতিষবাবু। কিন্তু আজ দেখছেন সন্ধ্যা যত ঘনিয়ে আসছে, আনন্দ ততই যেন উবে যাচ্ছে। শেষের দিনগুলির জন্যে হয়তো অনেক দুঃখ জমা হয়ে আছে।

না, আর মাত্র তিন বছর বাকী। স্থায়ী আসনের ব্যবস্থা করতে হবে সময় থাকতে। ছেলেরা কেউ এক বেলাও হাসিমুখে ভাত দেবে না। নিজের ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে।

বাড়ি চাই। বাড়ি একটা করতেই হবে।

গীতার পাতা ওলটাতে ওলটাতে হঠাৎ কেন জানি বারাণসীর দিকে মন চলে গেল। স্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন।

বীণাবতী আঁচলে হাত মুছতে মুছতে এসে দাঁড়ালেন।—বলো।

—বলছিলাম কি, যে আর তো বছর তিনেক মোটে বাকী! তা একটা বাড়ির ব্যবস্থা তো দেখতে হয়।

—তোমার ঐ ভাবা পর্যন্তই, বাড়ি আর হবে না কোনো দিন।

—হবে না কেন, করলেই হয়।

কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন জ্যোতিষবাবু। তারপর বললেন, তা দেখো, বুড়ো বয়সে কি আর কোলকাতা-টোলকাতা ভালো লাগে। বলছিলাম শেষ দিন ক'টা কাশীবাস করে কাটিয়ে দিলে কেমন হয়? ধরো কাশীতে যদি একটা বাড়ি করি?

বীণাবতী উল্লসিত হয়ে উঠলেন।—সে তো ভালোই, তাই করো।

—ধরো গঙ্গার ধারেই ছোট্ট দেখে একখানা বাড়ি, দু-বেলা গঙ্গাস্নান, বিশ্বনাথের মন্দির। কাশীতে শাকসবজি কত সস্তা। এক-একটা বেগুন আধ সের, এক আনা কি ছ পয়সা সের। মটরশুঁটি, কপি, তারপর তোমার রাবড়ি, প্যাঁড়া।

উদরোন্মুখ জ্যোতিষবাবুর কথায় বীণাবতী না হেসে থাকতে পারেন না। বুড়ো বয়সেও খাওয়ার চিন্তা।

তবু গম্ভীরভাবেই বললেন, না, সে ভালোই, কাশীতেই হোক।

কাগজ-কলম নিয়ে বসে গেলেন জ্যোতিষবাবু। আচ্ছা, কাশীতে জমির দাম কত করে? আন্দাজ? আন্দাজ কি এত দূর থেকে পাওয়া যায়। হ্যাঁ, নৃপেনবাবুর খুড়শ্বশুর থাকেন কাশীতে, তাঁকে চিঠি লিখে জানতে হবে। নৃপেনবাবুকে বলতে হবে একখানা চিঠি লিখতে।

বাড়িখানা অবশ্য একটু বড় দেখেই করতে হবে। দেশ থেকে, এখান থেকে যারা যাবে, তাদের তো আর ধর্মশালায় উঠতে দেওয়া যায় না, ছেলে-মেয়েরাও তো যাবে মাঝে মাঝে।

দোতলা তো নিশ্চয়; ওপরে খান পাঁচেক ঘর, নীচে খান পাঁচেক। রান্নাঘর, ভাঁড়ার, পায়খানা, আর চৌবাচ্চা—ওপরেও হবে, নীচেও হবে।

রাস্তার ওপর, কিংবা গঙ্গার ধারে জমি নিতে হবে। মন্দির থেকে বেশী দূর হলে চলবে না। অবশ্য তাতেও কিছু এসে-যায় না, এক পয়সা মাইলে এক্কা ছুটবে—শেয়ারে।

সারনাথের দিকে হলে দোষ কি? আর নয়তো রামনগর কি চুনার? না। সে তা হলে কাশীবাস হলো না।

কাগজের ওপর ছক কাটতে শুরু করেন জ্যোতিষবাবু। কোথায় কোন্ ঘর হবে, কোন্ দিকে দরজা আর কোন্ দিকে জানালা।

সব প্রায় সমাধা করে এনেছেন, নৃপেনবাবুকে দিয়ে চিঠিও লিখিয়েছেন, এখন কেবল উত্তরের অপেক্ষায়।

বাইরের দেয়ালগুলো পয়েন্টিং না প্লাস্টার, কি করবেন? ভেতরের দেয়াল বাফ রঙে ডিসটেম্পার করিয়ে নেবেন। আরো কত কি কল্পনা করছিলেন।

সব ভেঙে গেল হঠাৎ। নৃপেনবাবুর খুড়শ্বশুরের চিঠিতে। কাশীধাম নাকি বদলে গেছে। কাশী আর সে কাশী নেই। ভদ্রলোকের বাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছে।

তা ছাড়া বেরিবেরি থেকে শুরু করে পঞ্চাশরকম রোগ। জমিও ভালো পাওয়া যায় না। যা আছে তা শহরের বাইরে।

অতএব, কাশী বাতিল।

বোশেখ থেকে বোশেখ। আরেকটা বছর কেটে গেল।

এই একটা বছরে অনেকখানি বুড়ো হয়ে গেছেন জ্যোতিষবাবু। অম্বলের রোগ ধরেছে। বার্লি খেয়ে আপিস করেন।

বড় ছেলে শ্রীরামপুরে প্রাকটিস জমিয়েছে, মাঝে মাঝে চিঠিপত্তর দিয়ে খোঁজ-খবর নেয়। মেজ ছেলে অতুল পুজোর সময় একবার বাড়ি এসেছিলো। তারপর থেকে আর কোনো চিঠি দেয়নি।

সূর্যেন্দুর সঙ্গে ভাব-হওয়া মেয়েটি এসেছিলো একদিন। সূর্যেন্দুই নিয়ে এসেছিলো। মেয়েটি দেখতে অবশ্য সুন্দরী—সে-কথা জ্যোতিষবাবু একশোবার বলবেন, কিন্তু স্বজাত তো নয়। সূর্যেন্দু বলে, এ-যুগের জাত হলো টাকায়, আর মঞ্জুশ্রী সেদিক থেকে অনেক উঁচু জাতের। ধনী পিতার একমাত্র মেয়ে সে।

কিন্তু সূর্যের ব্যবহারটা তাঁর ভালো লাগে না। কেমন যেন নির্লজ্জ। মঞ্জুশ্রী যখন প্রণাম করলো, মেয়েটিকে চিনতে না পেরে বিস্মিত হয়েছিলেন জ্যোতিষবাবু। কিন্তু আরো বিস্মিত হলেন সূর্যেন্দুর কথায়।

মঞ্জুশ্রীর দিকে তাকিয়ে বলেছিলো, বাবা। তারপর তাঁর দিকে তাকিয়ে, মঞ্জুশ্রী। আপনার ভাবী বউমা। কথাটা অত্যন্ত গম্ভীরভাবেই বলেছিলো সূর্য, কিন্তু জ্যোতিষবাবুর চোখে ব্যাপারটা কেমন ঘৃণ্য লাগে।

মেয়েটির ব্যবহার কিন্তু খুব ভালো লেগেছে তাঁর। কলেজে-পড়া মেয়েদের মধ্যেও যে এতখানি শীলতা থাকে জ্যোতিষবাবু কল্পনাও করতে পারেননি এর আগে। মঞ্জুশ্রী বেশ ভালো মেয়ে, পুত্রবধূ হবার উপযুক্ত তো বটেই, বরং বলা চলে সূর্যেন্দুই ওর যোগ্য নয়।

কিন্তু না, বিয়ে তিনি দিতে পারবেন না। এতদিনের সংস্কার, কৌলীন্য, সুনাম, বংশ-গৌরব—নষ্ট করতে পারবেন না।

আহারের পর গ্লাসে যোয়ানের আরক ঢালতে ঢালতে ভাবেন। ভাবেন, সূর্যেন্দুকে এখনো হয়তো ফেরাবার উপায় আছে।

মাসখানেকের ছুটি নিয়ে চেঞ্জে যাবেন ঠিক করেছেন। সূর্যেন্দুকেও সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। যেতে কি চাইবে? ওকে বোঝাতে হবে ওর সাহিত্যচর্চা একেবারে হচ্ছে না, বাইরে গেলে কিছু হতে পারে।

আসলে, সূর্যেন্দুকে অত্যন্ত ভালোবাসেন জ্যোতিষবাবু। একটু দুর্বলতা, তাই কিছু বলতে পারেন না।

সূর্যেন্দু 'না' বললে না। তাঁর সঙ্গে মধুপুরে সেও গেল।

কেন জানি মধুপুর জায়গাটা জ্যোতিষবাবুর খুব ভালো লেগে গেল। মনে মনে হিসেব করে দেখলেন, আর মাত্র দু বছর বাকী। চাকরি থেকে অবসর নিতে আর মাত্র দু বছর। বাড়ি একটা বানাতেই হবে, অতএব, মধুপুরই বা নয় কেন।

দু-বেলা ভ্রমণের ফাঁকে জমি খুঁজে বেড়ান জ্যোতিষবাবু।

বাড়িতে কাউকে কিছু বলবেন না। এর আগে তিন-তিনবার বলে ঠকেছেন। একটা-না-একটা বাধা ওরা দেবেই। বিশেষ কেউ অবশ্য সঙ্গে আসেনি। ভয় স্ত্রী বীণাবতী আর ছোট মেয়ে সমুকে। সূর্যেন্দু তো নির্বিকার। তবু বললেন না কাউকে।

প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা ঘুরে ঘুরে জমি খোঁজেন জ্যোতিষবাবু। পছন্দমতো জমি পেলেই দরদস্তুর করে আসেন। শেষে পছন্দসই একটা জমির খোঁজ পেলেন জ্যোতিষবাবু। দামও বেশী নয়।

কিন্তু। জমিটা কেনবার আগে প্ল্যান একটা এ'কে ফেলতে হবে। কাগজ-কলম নিয়ে বসে পড়েন। আঁকজোক কাটেন। ঘরের সংখ্যা, বারান্দার দৈর্ঘ্য।

সব শেষ করে কথাটা খুলে বললেন বীণাবতীকে।

—জমি তো ঠিক করেছি এই মধুপুরেই।

—তা বেশ তো।

—এই দেখো বাড়ির প্ল্যান।

—ও ছাই বুঝি না, বলো দোতলা না একতলা, ক'খানা ঘর?

—করি তো দোতলাই করবো।

—তা করো না এখানেই, মন্দ কি। জমিটা কোথায়?

কিন্তু জমিটা কোথায় তা আর বলতে হলো না। তার আগেই সমিতা বেণী দুলিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে বললে, ম্যাগো। মধুপুরে আবার মানুষ বাস করে শখ করে? এখানে সবাই চেঞ্জেই আসে জানি।

—তা আমারও তো চেঞ্জ দরকার।

সমিতা বললে, জানতাম না তাই আসতে দিয়েছি তোমাকে। বিকেলে বেড়াতে যাই, দু'পাশে শুধু খুক্‌খুক্‌ কাশি। অম্বল সারাতে এসে শেষে একটা বড় রোগ ধরুক আর কি।

সূর্যেন্দু বেশী কথা বলে না। বললে, সামনের বাড়ির গাড়িবারান্দার কাছে রেডোক্সেনের একটা ভাঙা অ্যাম্পিউল দেখছিলাম কাল।

অতএব, মধুপুর হতে পারে না।

আশ্চর্য! চার বছর ধরে হাওয়ায় হাট বসাবার কল্পনাই করেছেন, কাজ এগোয়নি এতটুকু। কেবল জল্পনা-কল্পনা, কেবল জরিপ আর নকশা, কাঠ আর কংক্রিটের স্বপ্ন।

বুড়ো হয়ে আসছেন। আসছেন? এর মধ্যেই তো পাক ধরেছে পনেরো আনা চুলে, দু-দিন পরেই চাকরি থেকে অবসর নেবেন। তারপর?

তারপর।

আয় কমবে। মাসে দেড় শো টাকা ভাড়া গুনতে পারবেন আর? কোথায় যাবেন তখন, কে দেবে বিনামূল্যের বসতি? স্থায়ী সুখ আর অফুরন্ত অবসর পেতে হলে নিজের বাড়ি চাই। নিজস্ব বাড়ি। যেখানে জলের পাম্প নিয়ে দু-বেলা ঝগড়া করতে হবে না বাড়িওলার সঙ্গে। যেখানে 'ভাড়াটে' অপবাদ সইতে হবে না। যেখানে থাকবে শান্তি আর শৃঙ্খলা।

না, কোলকাতাতেই একটা বাড়ি বানাবেন।

বাড়িওলার সঙ্গে ইদানীং প্রায়ই মনোমালিন্য ঘটছে। তাকে দেখাতে হবে যে, তিনিও পারেন শহর কোলকাতার বুকে একখানা বিরাট বাড়ি হাঁকাতে। সে সঙ্গতি তাঁর আছে। আছে তো সত্যিই। অতএব এত কি গরব দেখায় বাড়িওলা! না-হয় বাড়িই করেছে একখানা, জ্যোতিষবাবু ইচ্ছে করলে এর চেয়ে অনেক ভালো বাড়ি করতে পারেন।

ইচ্ছে করলে কেন, বাড়ি তো করবেনই। এই শহর কোলকাতার বুকেই বাড়ি তৈরি করবেন।

এবার আর নিজের প্ল্যান নয়। রীতিমতো আর্কিটেক্ট ডাকিয়ে উপদেশ চাইলেন। কন্ট্রাক্টরের সঙ্গে চলতে লাগলো ফোনালাপ, ঘোরাফেরা করতে লাগলো ব্লু প্রিন্টের রাশি।

কিন্তু কোনোটাই জ্যোতিষবাবুর মনঃপূত হয় না।

এমন সময় বীণাবতী মনে পড়িয়ে দিলেন, ছোট মেয়ে সমিতার বিয়ে দিতে হবে। ষোলোয় পা দিয়েছে সে। শুধু কি তাই? রাতে আলো জ্বলে কেন তার ঘরে? নীল কাগজের চিঠির প্যাড কিনেছে কেন সমু? ডাকলে শুনতে পায় না কেন, কথা বললে উত্তর দেয় না কেন?

সমিতার ভাবনা জ্যোতিষবাবুকে বিচলিত করেনি।

হঠাৎ একটা ধাক্কা খেলেন তিনি সূর্যেন্দুর কাছ থেকে।

"ধনী পিতার একমাত্র কন্যা হয়েও যে সব কিছুর মায়া ত্যাগ করে চলে আসতে পারে, তোমাদের সম্মতির আশায় মিছে অপেক্ষা করে করে তো তার জীবনটা নষ্ট করতে পারি না। তাই, তোমাদের কাছ থেকে সরে এলাম। আশা রাখবো জীবনের শেষ দিন অবধি যে, তোমরা

একদিন না একদিন ক্ষমা করবার সুযোগ পাবে।

"মঞ্জু হয়তো তোমাকে আর মাকে একদিন প্রণাম করতে যাবে। একাই। আমার ওপর তোমাদের যত ক্রোধ তা যেন সে বেচারীর ওপর না পড়ে।

"মা ও তুমি আমার প্রণাম নিও। ইতি—

সুর্যেন্দু।"

এদিকে মেয়ের বিয়ের জন্যে তাড়া দিচ্ছেন বীণাবতী।

কথায় কথায় বলেন, তখনই বলেছিলাম, পাস করেছে এবার বিয়ে দিয়ে দাও। তা না, তখন হলো রোজগার করুক। এমন সোনার চাঁদ ছেলে সুর্যেন্দু—

কথা শেষ হয় না, বীণাবতীর চোখের কোণে জল দুলতে থাকে।

জ্যোতিষবাবু ব্যস্ত হয়ে বলেন, সমুর বিয়ে তো, তা ব্যবস্থা করছি, ব্যবস্থা করছি। ঐ তো আসানসোলের সেই ছেলেটির খোঁজ নিতে লিখেছি রাধুকে।

এইভাবে সুর্যেন্দুর জন্যে শোক আর সমিতার জন্যে স্বামীর ভাবনা ভাবতে ভাবতে কোথা দিয়ে যে একটা বছর কেটে গেল টের পেলেন না জ্যোতিষবাবু। হঠাৎ একদিন দেখলেন—দেখলেন কেন, আবিষ্কার করলেন যে, তিনি বেকার।

ছেলেবেলায় পড়াশুনো শেষ করে একবার বেকার হয়েছিলেন, আজ কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়ে জ্যোতিষবাবু আবার বেকার হয়ে পড়লেন।

চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী ন'টায় স্নান সেরে, ভাতের জন্যে তাড়া দিলেন। বীণাবতীর খেয়াল ছিলো না। আপিসের পোশাক পরে মা-কালীর ছবিটাকে প্রণাম করে জ্যোতিষবাবু বেরুতে যাচ্ছেন, হঠাৎ তাঁর নিজেরই মনে পড়ে গেল যে গত কাল সব চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে এসেছেন তিনি।

তবু আপিসে বেরিয়ে গেলেন। লজ্জায় ভাঙতে পারলেন না কথাটা স্ত্রীর কাছে। যাক্, সকলের সঙ্গে একটু গল্প-গুজব করে আসা যাক্। ফিরে এসেই আবার বাড়ি তৈরির চিন্তায় ডুবে গেলেন জ্যোতিষবাবু। অনেক ভাবলেন। ভেবে ঠিক করলেন, না, বাড়ি তৈরি করে কাজ নেই।

—সে কি! বাড়ি না করলে, থাকবে কোথায়? বীণাবতী বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন।

জ্যোতিষবাবু থেমে থেমে বললেন, একটা বাড়ি তৈরি করতে যাওয়া, মানে পঁচিশ-তিরিশ হাজার কম করে। তার চেয়ে টাকাটা ব্যাঙ্কে রাখলে, বেশ কিছু সুদ পাওয়া যাবে বসে বসে। পেনসন তো নেই, চালাবো কিসে? তার চেয়ে সুদের টাকায় বেশ বেড়ানো যাবে, আজ গয়া, কাল বৃন্দাবন। পুরীটাও যাওয়া হয়নি বহু দিন।

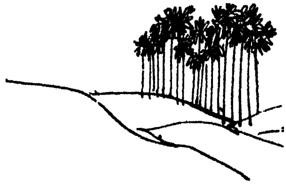
বীণাবতীও ভেবেচিন্তে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তা ঠিক।

এর পরও দুটো বছর কেটে গেছে। বাড়ি তৈরির কল্পনা নিয়ে আর কোনো দিন বিভোর হয়ে ওঠেননি।

দিব্যি সুখেই দিন কাটাচ্ছেন। সমিতার বিয়েও হয়েছে সুপাত্রে। ভাড়াটে বাড়িতে থাকেন, মাঝে মাঝে ঘুরে আসেন তীর্থে তীর্থে। বড় ছেলে আর মেজ ছেলের কাছেও যান কখনো-সখনো।

সুর্যেন্দু প্রায় ত্যাজ্যপুত্র। মঞ্জুশ্রী মেয়েটি খুব ভালোই, কিন্তু স্বজাতি তো নয়। মাঝে মাঝে সুর্যেন্দুর জন্যেই একটু ব্যথা পান। তা না হলে জ্যোতিষবাবুকে সুখীই বলা চলতো।

[১৩৫২



চন্দ্রভস্ম

শীত-নিষুতির কালো কালো মাটিতে নেই এতটুকু আওয়াজের লেশ। ঘামতেলে মাজা চকচকে সড়কটা সিধে আঁধারের বুকে মুখ লুকিয়েছে। মুখ লুকিয়ে ছুটে গেছে আলো-ঝলমল শহর অবধি।

ঠাণ্ডা বাতাসের ঠোঁটের কাঁপনে বেজে উঠছে না এক ফোঁটা ভাঙা শিস। ঘাসের ডগায় নিশীথ-কীটও নিশ্চুপ। নেই ঝিঁঝির ডাক, নেই ঝড়ের দাপট।

কিন্তু একটু আগেই এ-পল্লীর এই ছোট দুনিয়াটাকে থমকে দিয়েছে পর পর কয়েকটা শব্দের ঝাঁকানি। যুগ্মমণির দীপ্তি নিবিয়ে হর্ন বাজিয়ে পাঁচিলে গা ঢেকেছে দুখানা মোটর বাস। খানিকটা চিৎকার, খানিক হাসি আর ফটক বন্ধ হওয়ার আওয়াজ। হট্টগোল একটু রোজই হয় এমন সময়, তারপর ঝিমিয়ে পড়ে সবাই।

তন্দ্রাক্রান্ত পাতালপুরীর মতো ঝিমিয়ে পড়ে ঐ পাঁচিল-ঘেরা বস্তিটা।

পাঁচিলের ওপাশটা দেখবে? নিজের চোখে দেখতে চাও ওদের দৈনন্দিন জীবনের চলচ্চিত্র? ভাষা সংযত করো। ঠিক ওদেরই মতো রসহীন, ঘা খাওয়া আর ঘেয়ো রুগীর ছবি ফোটাও তোমার ভাষায়। চাঁদ ওরাও দেখে—তা জানি। আকাশের কোণে শুক্লপক্ষের রাতে যে চাঁদ ভেসে ওঠে, আলোর প্রলেপ মাখানো বরফের চাকতির মতো সাদা চাঁদ—ওরাও দেখে। কিন্তু বুড়ো রুখন তার পায়ের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখেছে, দেখেছে ওর পায়ের পাতার শ্বেতকুষ্ঠের চাকাগুলো আরো সাদা আর চকচকে। তাই বলছি, মর্মরশুভ্র মোমবাতির আলোয় যদি যুবতী মাংনার মুখ দেখতে চাও, আপত্তি করবো না। কিন্তু দোহাই তোমার, ওর চোখের তারা দুটো যেন তোমার চোখের নীল কাচের ভেতর দিয়ে দেখতে চেষ্টা কোরো না।

বাস থামলো। লোহার ফটক পেরিয়ে গিয়ে। উথলে পড়লো এক ঝলক গোলমেলে চিৎকার। যাত্রীরা নেমে গেল একে একে। এই দিনযাত্রীর দলে নতুনের আগমন ঘটে খুব কম। পুরোনো দলের কেউ কেউ হয়তো ছিটকে অনুপস্থিত থেকে যায় কোনো দিন। তেওয়ারীর কাছে দুটো কিলচড়, বিরতিবিহীন পাঁচ মিনিটের অশ্রাব্য কটূক্তি আর ধারালো ধমক জমা থাকে পরের দিনের জন্যে। তবু তারা ফিরে আসে।

গ্যারেজে বাস রেখে ড্রাইভার দুজন চলে যায় ছেঁড়া কোটের কলারে কান ঢেকে। বিড়ি টানতে টানতে। সশব্দে ফটক বন্ধ করে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে আসে তেওয়ারী। আর খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে গজল্লা করে ওরা। অনেক অনেক মেয়ে-মরদ, কচি ছেলে আর কানা বুড়োর দল জটলা পাকিয়ে গুলতান করে। মেয়েগুলোর হাসি থামে না। বুড়োদের মুখে অশ্লীল মন্তব্য শুনে অশ্লীলতর জবাবের দেমাক দেখিয়ে হেসে ওঠে তারা। তা বলে কলহাস্যের তুফান ওঠে না। ওদের গায়ে যে ছেঁড়া চট আর নোংরা কানি। কালো রঙ মাখানো শণের নকল চুলের মতো জট পাকিয়ে আছে মাথার ঝুঁটি। কাকলি নয়, ওদের কণ্ঠস্বরে সুরের কলঙ্ক। তবু। ওরা হাসাহাসি করে। হাসি-রঙ্গ, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ। হাসে না কেবল বাচ্চাগুলো। চোখ জড়িয়ে আসা ঘুম হটিয়ে ক্ষিদেয় ট্যাঁ-ট্যাঁ করে। পুরুষগুলো রেগে চেঁচিয়ে ওঠে, ধমক দেয়। হ্যাঁ পুরুষই, জোয়ান না হোক, মরদ ওরা একশোবার। জোয়ারের বীজ আর জলো ডাল খেয়ে তো আর জোয়ান হওয়া যায় না।

তেওয়ারীর হাঁক শুনে সারি বেঁধে দাঁড়ায় ওরা। এটুকু নিয়মানুবর্তিতা মজ্জায় ঢুকেছে

ওদের।

একটু পরেই বাঙালীবাবু জহর এসে হাজির হয়।

—ভিখুরাম।

—হাজির, দশ আনা।

নোটবই দেখে নাম ডাকতে শুরু করে জহর।

—তাহের আলি।

—হাজির, এক রুপিয়া ছ পয়সা।

—পণ্ডা।

—হাজির, সাড়ে বারো আনা।

পর পর নাম ডেকে যায় জহর। ওরা একে একে সামনে এসে হাজিরা দেয়। মুদ্রার অংকটা জানিয়ে তেওয়ারীর হাতে ' দেয় গুনে গুনে। জহর প্রত্যেকের নামের পাশে চিহ্ন দিয়ে টাকা-পয়সার পরিমাণটা লিখে রাখে। ক্ষুদ্রাকার ভিস্তির মতো একটা চামড়ার থলেতে পয়সাগুলো জমা করে তেওয়ারী।

এবার মেয়েদের নাম ডাকা হয়।

—সন্কা।

—হাজির গো।

—কত? একটু রুখেই জিজ্ঞেস করে জহর। হোক মেয়েমানুষ, ঠিকুজি মিলিয়ে বয়সের দৌলতে হলোই বা যুবতী, তা বলে ভদ্রবংশজাত শিক্ষিত জহর ওদের কথার সরস উন্মাদনাটুকু সহ্য করবে কোন্ রুচিতে! জহর তাই চটে ওঠে। ওদের হালকা রসিকতা আর কথা বাড়াবার প্রয়াসের মধ্যে জহর দেখতে পায় একটা অতি কুৎসিত অসম্মানের লোলুপতা।

তাই কঠোর স্বরে প্রশ্ন করে, কত? •

গুনে তো দেখি নাই গো, দাঁড়াও দেখি। নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে ওঠে সন্কা, তারপর আস্তে আস্তে গুনতে থাকে হাতের পয়সাগুলো।

বলে, ছ আনা দেড় পয়সা।

তিরিক্ষি মেজাজে চেঁচিয়ে ওঠে জহর, এত কম?

—কম হচ্ছে তো করবো কি!

নাকের ভেতর দিয়ে শুধু একটা শব্দ করে জহর।

তেওয়ারী বলে, কাল ফির কোম হোবে তো খানা বন্ধ হোবে।

উত্তর দেয় না সন্কা, ঠোঁট টিপে ভেংচি কেটে সরে পড়ে।

রুখন দিয়েছে মোট তিন আনা, তবু অবিশ্বাস করেনি জহর। দু-এক পয়সা হয়তো চুরি করে। অমন সবাই করে। সে আর তেওয়ারীও তো রোজই কিছু-না-কিছু মারে ভাগাভাগি ক'রে। যা জমা হয়, তার সবটাই তো আর তুলে দেয় না মূলচাঁদ মারোয়াড়ীর হাতে। কিন্তু মেয়েগুলোকে বিশ্বাস নেই। পুকুর চুরি করে ওরা। কমবয়েসী মাংনা মেয়েটা, দেখতে নেহাত খারাপ নয়। এক নোংরা, এ ছাড়া হাতে-পায়ে কোথাও নেই এতটুকু ঘা-ফোড়। লোকে অন্তত দুবার ফিরে তাকাবে ওর দিকে। অথচ কোনো দিন পাঁচ-ছ আনার বেশী জমা দিলো না। সন্কা, রাউতী, মাংনা—ওদের কোনোটাকেই বিশ্বাস করে না জহর। তবু উপায় তো কিছু নেই। তেওয়ারীর মারফত দুটো বাক্‌বকুনি দিয়ে থেমে যেতে হয়। বেশী সন্দেহ ঘটলে তেওয়ারী নিজেই মেয়েগুলোর কোমরের ঘুনসিতে হাত বুলিয়ে দেখে নেয়। একদিন ছেঁড়া কাপড়টাই টেনে খুলে নিয়েছিলো মাংনার, মেয়ে-মরদ সবার সামনে। ঝেড়ে-ঝুড়ে কাপড়ের খুঁটগুলো যখন দেখছিলো তেওয়ারী, তখন লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিলো জহর। অথচ মাংনা শুধু হেসে ফেলে কাপড়টা কেড়ে নিয়েছিলো তেওয়ারীর হাত থেকে। আড়চোখে একবার তাকিয়ে দেখেছিলো জহর, তারপর নিজেরই ওপর ঘেন্নায় বিষিয়ে উঠেছিলো তার মন। চাকরিটা ছেড়ে দিতে ইচ্ছে হয়েছিলো সেদিনই। কিন্তু মূলচাঁদ মারোয়াড়ীর কাছ থেকে মাসের শেষে মাসোহারা, অদূরে নি-ভাড়া টালির ঘর, আর পর্যাপ্ত উপরির মায়া তো কম নয়।

মোম গলে গলে পিরিচ ভরে উঠেছে তোমার। দীর্ঘ সুশুভ্র মোমবাতিটা খাটো হয়ে এসেছে অনেকখানি। মিছেই তিল তিল করে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে তুলেছো ওকে। দাও, নিবিয়ে দাও বাতিটা। লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোয় দেখতে পাবে দেড় শো ছায়াশরীর এগিয়ে চলেছে আবছা আঁধারে। মাটি-গোবরের ছিটে-দেওয়া চাঁচর আর চিকের প্রাসাদে ঢুকছে ওরা।

লম্বা উঠোনের মাটির মেঝেতে পাতা পড়ে গেছে সারি সারি। হলুদের ভ্যাপসা গন্ধ। চচ্চড়ির মতো কি যেন দিয়ে যায় হাতা ভরে। মুলচাঁদ মারোয়াড়ীর হয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানায় ওরা। লোকটার মায়া-দয়া আছে, পেট ভরে খেতে দেয়। যত খুশি খেতে পারে ওরা।

পেট ভরে খাচ্ছিলো রাউতী। মাংনার মানা না শুনেই খাচ্ছিলো। হঠাৎ সারা গা তার কেমন-কেমন করে উঠলো। বুক থেকে গলার নলি অবধি একটা বাষ্পগোলক যেন ওঠানামা করলো বারবার। পেট থেকে পেঁচিয়ে উঠলো একটা বিশ্রী দুর্গন্ধ। নিজের নাকেই টের পেলো রাউতী। অম্লকষায় অনুভব করলে জিভ আর মাড়ির পাশে। পাতের পাশেই বমি করে ফেললে যা-কিছু খেয়েছিলো। মাংনা বসে ছিলো পাশেই। তার গায়েও লাগলো খানিকটা। তবু চটলো না সে। এমন তো প্রায়ই হয়।

একটু সহানুভূতির স্বরে বললে, খা রাক্ষুসী খা, পাঁচ-মেসো পেট নিয়ে গিলতে তো ছাড়বি না।

রাউতী জবাব দিলে না, সে তখন নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করছে।

—আ মলো, বললাম বলে মাগীর আবার কান্না।

মাংনার কথায় ফিরে তাকিয়ে হেসে ফেললো রাউতী। আসলে বমি করতে গিয়ে এমন এক-আধ ফোঁটা জল আসেই চোখে। মাংনা তাই দেখে ভেবেছে রাউতী বুঝি-বা কাঁদছে।

—কাঁদিনি লো কাঁদিনি। হেসে জবাব দিলে রাউতী। তারপর পিঠের নোংরা কাঁথাটায় চোখ মুখ নাক ঝেড়ে নিলে সে। উঠে গিয়ে মুখ ধুয়ে এলো চৌবাচ্চার জলে। এসে সেই পাতাটাই পরিষ্কার করে বসলে।

—আবার খাবি নাকি? মাংনা জিজ্ঞেস করলে।

বিস্ময়ের স্বরে রাউতী বললে, খাবো নি? যা খেইছিলাম, তা তো উল্টি হয়ে গেল।

—মাগী, মরবি তুই মরবি। খানিক থেমে মাংনা আবার বললে, ছেলেটাকেও মারবি হতচ্ছাড়ী।

প্রথমে কথাটায় হেসে উঠেছিলো রাউতী, তারপর হঠাৎ থমকে গেল যেন। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো সে মাংনার দিকে।

বললে, তু এমোন কথা বললি মাংনা?

মুখের গ্রাস থামিয়ে মাংনা বললে, বলেছি বেশ করেছি। তারপর কি ভেবে সান্ত্বনার স্বরে বললে, ও মরবার জাত লয় রে।

রাউতী ক্রোধে ভেংচিয়ে উঠলো, উ মরবার জাত লয় রে! তু বলবি কেনে?

মাংনা হাসতে হাসতে বললে, বেশ, আর বলবো নি।

রাউতী হয়তো এত সহজে ছাড়তো না, কিন্তু ওদিকে তখন তুমুল ঝগড়া শুরু হয়েছে তাহির আলি আর রুখনের মধ্যে। খিচুড়ি-মাখা হাতেই হাতাহাতি শুরু করে দিয়েছে দুজনে। ওদের ঝগড়া থামাবার জন্যে কেউ একটা কথাও বলছে না। এমন প্রায়ই হয় কিনা।

শুধু সনকা তাহিরের উদ্দেশে বললে, থামা দাও মিঞা ছায়েব, অ লাগরের সাথে নড়তে লারবে। উ আমাদের তালপাতার ছেপাই।

কিছুক্ষণ পরে আপনা থেকেই তারা হাতাহাতি ছেড়ে বাক্‌যুদ্ধে নেমে এলো, তারপর অভুক্ত খাদ্যের দিকে মন দিয়ে ক্রমে ক্রমে চুপ করে গেল।

একে একে খাওয়া হয়ে গেল সকলের। নিজের নিজের পাতা হাতে করে এক কোণে জমা করে রেখে চৌবাচ্চার জলে হাত-মুখ ধুয়ে নিলো। খেয়েও নিলো সেই জল। তারপর লম্বা লম্বা কপার্টবিহীন ঘরের মাটিতে ছেঁড়া চাটাই পেতে শুয়ে পড়ে সকলে। এই স্বল্প সময় নিদ্রাশান্তির লোভে একে একে গা এলিয়ে দেয় তারা। ছেঁড়া কাঁথা নয়তো কাপড়ের খুঁট গায়ে জড়িয়ে শুয়ে পড়ে। জবাই-করা মুর্গির মতো নেতিয়ে থাকে দেড় শো ছায়াশরীর।

চোখে ঘুম আসে না শুধু পণ্ডার। ও জানতো ওর চোখে আজ ঘুম আসবে না।
আর একজন। ঘুমিয়ে ছিলো, এখনই জেগে উঠেছে। তাহির আলি।

—কি মিঞা, নিদ্ আসছে নাই?

ফিরে না তাকিয়েই তাহির একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, না।

—কেন ছাহেব?

—শালার ঘায়ে রস কাটতিছে ভাই, বড় চুলুক-চুলুক করতিছে। ঘা বাঁচিয়ে আস্তে আস্তে সুড়সুড়ি দিতে থাকে তাহির। হাঁটু থেকে কুঁচকি অবধি দগদগে ঘা। শেয়ালে-খাবল-মারা খরগোশের মতো লাল-লাল মাংস ঝুলছে ঘা থেকে। পরনের ময়লা কাপড়টা ঘায়ের ওপর বুলিয়ে রস আর রক্ত চুপসে নেবার চেষ্টা করছে তাহির।

এদিকে পণ্ডা মনে মনে চটছিলো তাহিরের ওপর।

বিফল মনে এবার চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করলে সে। খানিকক্ষণ পড়ে রইলো চুপ করে। খসখস শব্দ হলো কিসের। চোখ চেয়ে তাকালে পণ্ডা। দেখলে একটা মেয়েলী চেহারা এগিয়ে আসছে তাহিরের দিকে। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইলো পণ্ডা। সে যে জেগে আছে, তা কি টের পায়নি মেয়েটা?

—কি গো, জ্বালানপোড়ান লাগতিছে?

—হুঁ।

—শোও দিনি মানিক, আমি হাত বুলিয়ে দিছি।

তাহির চটে উঠলো এবার। নিজের জ্বালায় মরছে বেচারা, সে সময় সোহাগ ভালো লাগে না।

বললে, যা যা ভাগ। মানকামি করতি হবে নি তোরে।

সন্কা কিন্তু শুনলে না সে কথা। আস্তে আস্তে তাহিরের মাথাটা টেনে নিলে নিজের কোলের ওপর। তারপর তাহিরের ঘায়ের চারপাশে হাত বোলাতে বোলাতে বললে, ঘুমাও মিঞা, ঘুমাও, রাত কেটে এলো।

পণ্ডা এই ফাঁকে হামাগুড়ি দিয়ে সরে এলো। কুকুরকুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে আছে একটা থুড়থুড়ে বুড়ী। গাল বেয়ে লালা পড়ছে তার। ল্যাললেলে হয়ে উঠেছে মাথার পুঁটুলির একপাশ। তাকে ডিঙিয়ে পণ্ডা সটান চলে এলো মাংনার কাছে।

পেটের ভেতর হাঁটু সেঁধিয়ে শুয়ে আছে সে। পরনের কাপড়টা খাটো স্বল্পতার জন্যে শরীরের অনেকখানি অনাবৃত, তাই শীতে ঠকঠক করে কাঁপছে মাংনা। ঘুমের মাঝে কাঁপছে।

বুকের ওপর বরফের মতো একটা ঠাণ্ডা হাতের হঠাৎ-স্পর্শে ঘুম ভেঙে গেল তার। চমকে চোখ চেয়ে চাপা গলায় বলে উঠলো, কে?

—আমি পণ্ডা। ফিসফিস করে উত্তর দিলে সে।

—কি?

এ কথার জবাব নেই। মাংনার বুকের ওপর থেকে হাতখানা তুলে নিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

মাংনার ঘুমটা ইতিমধ্যে ভালোভাবেই ছেড়ে গেছে। পণ্ডার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে মিষ্টি করে বললে সে, কি, বলছিস কি?

ভ্যাবাচাকা খেয়ে মাথা নেড়ে পণ্ডা শুধু বললে, না।

চুপচাপ বসে রইলো সে বহুক্ষণ। তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করলে, তোর নাম মাংনা কেন হলো রে?

ক্ষেপে গেল মাংনা। মাঝরাতে ঘুম ভাঙিয়ে আর বলবার মতো কথা পেলো না মনষে!

বললে, তোর নাম পণ্ডা কেন?

—বাপ দিয়েছিলো তাই। মুখ কাচুমাচু করে বললে পণ্ডা।

মাংনা বললে, আমারও তাই।

নিরুপায় হয়ে পণ্ডা উঠে দাঁড়ালো।

নিজের মনেই ঠোঁট টিপে হাসলে মাংনা। তারপর হঠাৎ উঠে বসে পণ্ডার হাত ধরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে পাশে বসিয়ে দিলে তাকে।

বললে, মাগনায় পেয়েছিলো কিনা আমায়, তাই মা নাম রেখেছিলো মাংনা।

পণ্ডার সাহস বাড়লো। বললে, ইখানটা বেশ গরম তো।

কি, রুচিতে বাধছে তোমার? এখানকার এই ছোট্ট পৃথিবীটা ঘৃণ্য মনে হচ্ছে? মনটাকে একটু সজীব করে তোলো, দেখবে এদের এই ছোট দুনিয়াটা তোমার পৃথিবীর চেয়ে কম লোভনীয় নয় এদের কাছে, আরাম আর আনন্দ এরাও পায় শীতের রাতের উষ্ণতায়। এদের আকাশেও ওঠে চাঁদ, যে চাঁদ ঢেলে দেয় ইন্দ্রনীলার জ্যোতি তোমার শিয়রে। অজস্র-তারকা আকাশের দিকে তাকিয়ে এরাও রোমাঞ্চ অনুভব করে। কিন্তু তোমার মতো আলস্যের গ্রন্থিতে হাত বেঁধে পড়ে থাকতে পায় না। পূর্বদিগন্তে রূপালী রশ্মির আলো চমক দেবার আগেই উঠে পড়ে ওরা।

মোটর বাসের হর্ন বাজছে।

ধড়মড় করে উঠে পড়ে সকলে। হাতের চেটোয় চোখ কচলায়। অন্ধকার ঘোচেনি তখনও। ওরা চিৎকার আর হল্লা করতে করতে বেরিয়ে আসে। ড্রাইভার দুজন মোটা কম্বলের কোটে গা ঢেকে বসে আছে নিজের নিজের গাড়িতে। কমফর্টার জড়িয়ে কান আর মাথা ঢেকেছে। কোটের লম্বা হাত থেকে দুটো আঙুল বের করে বিড়ি টানছে। এদিকে তেওয়ারী আর বাঙালীবাবু জহরও এসে হাজির।

একে একে খাতা দেখে নাম মিলিয়ে দেড় শো কঙ্কালসার ছায়াশরীরকে তুলে দিলো তারা মোটরে। গা ঝাড়া দিয়ে নড়েচড়ে যাত্রা শুরু করলে দুখানি বাস। লম্বা পিচঢালা পথ ধরে শহরের দিকে এগিয়ে চললো তারা।

ভোরের রাতের দূর-শহরে গ্যাসদীপের কৃত্রিম জোছনা। আর অজস্র-আলো বিজলী বাতির ফাঁকে ফাঁকে দু-এক টুকরো সাঙ্কেতিক নীলিমা, সড়কের মোড়ের মাথায় রেড লাইটের সাবধানী।

পথের কোণে নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্টসংখ্যক লোক নেমে যায়। এই বিরাট শহরের অতি-চঞ্চল জনারণ্যের মাঝে মাঝে। পথে পার্কে, দোকানের সামনে আর সিনেমার দরজায়, কলেজের গেটে আর মন্দিরে দরগায় মুলচাঁদ মারোয়াড়ীর দেড় শো জীবন্ত মুদ্রাচুম্বক নেমে যায়।

ষোলো বছর বয়স হলো পিলুয়ার। অথচ চেহারা দেখে মনে হয়, এমন দশটা শীতও যায়নি ওর ওপর দিয়ে। মাথায় একটা ভেলভেটের লাল টুপি, নর্দমার ময়লা লেগে একটা দিক কালো হয়ে গেছে। ওপরের ঠোঁট কাটা, জিভ দিয়ে চাটে বারবার। এ-হেন পিলুয়া নামে সকলের আগে। সঙ্গে থাকে তার চারচাকায় বসানো কাঠের একটা ট্রলি, তার ওপর বসে আছে কিংবা শুয়ে আছে কিংবা দাঁড়িয়ে আছে একটি সজীব মাংসপিণ্ড। মাথাটা সুবৃহৎ, কাঁধটা চওড়া, বুকটা যে-কোনো ব্যায়ামবীরের সমান। কিন্তু ব্যস্, ঐ অবধি। কোমরের নীচে থেকে পা পর্যন্ত সরু আর লিকলিকে। পাঁচ মাসের শিশুর চেয়েও সরু পা তার। পক্ষাঘাত বা অন্য কোনো কারণে নিম্নাঙ্গ সম্পূর্ণ অবশ। তাই জীবটিকে কাঠের ট্রলিতে বসিয়ে গলি গলি টেনে নিয়ে বেড়ায় পিলুয়া। একটা বিশ্রী আর্তনাদ করতে করতে পিলুয়া ভিক্ষে করে।

শহরের কলিজার মধ্যে সবচেয়ে সচ্ছল অংশটিতে মাংনা দাঁড়ায় তার দেহের লোভানি মেলে। রুখন ভিখুরাম তাহির পণ্ডা সকলেরই এক-একটা বাঁধা জায়গা আছে, সন্‌কা রাউতী সাবিয়া—তাদেরও আছে বাঁধা জায়গা। সবাই ভিক্ষে করে, কেউ কানা চোখ আর ভাঙা পা দেখিয়ে, কেউ বা তাজা চোখ মাজা মুখ দেখিয়ে।

সিধু দপ্তরীর গলিতে একটা সরাইখানা আছে মুলচাঁদ মারোয়াড়ীর। যখন মাঝ-আকাশে উঠবে দিনের সূর্য, খানিকটা বা ঢলে পড়বে পশ্চিমের দিগন্তে, তখন খাবার সময় হবে

ওদের। একে একে এসে সরাইখানায় জড়ো হবে, গলার নম্বরি চাকতি দেখিয়ে খেতে পাবে ডাল আর ভাত।

সরাইখানায় বিনিপয়সায় খানা খেয়ে আবার যে যার জায়গায় ফিরে যায়। ভিক্ষে করে সেই রাত দশটা অবধি। তারপর আসে মোটর বাস, নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে হর্ন বাজায়। ওরা আগে থেকে তৈরী হয়ে থাকে। বার তিনেক হর্ন বাজিয়ে যার পাত্তা মেলে না, সে পড়ে থাকে পিছনে। মোটর বাস আর সেদিন অপেক্ষা করে না তার জন্যে।

পিলুয়া তাই পিছনে পড়ে রইলো সেদিন। বাস ধরতে পারলো না। ফুটপাথের পাশে একটা ময়রার দোকানের বড় উনুনটা বেশ নিবে গেছে তখন। হাতড়ে হাতড়ে ভেতরের ছাইগুলো দেখলে পিলুয়া। না, হাত-পা পুড়ে যাবার ভয় নেই। বড় উনুনটার মুখে ছাইয়ের গাদায় বেশ আরাম করে কুকুরকুণ্ডলী পাকিয়ে শোয়া যাবে। ব্যাঙাচি আর ব্যাঙাচির কাঠের ট্রলি টেনে তুললো রোয়াকের ওপর। তারপর শুয়ে শুয়ে পরদিন তেওয়ারীর কাছে প্রাপ্য চড়চাপড়ের আতঙ্ক অনুভব করতে শুরু করলে। কি কুক্ষণেই বায়োস্কোপের নেশা ধরেছিলো তার! কাছের বায়োস্কোপটার। একটা পার্কের কোণে মাটি খুঁড়ে চুরির পয়সা জমা করে রাখছিলো এতদিন। আজ কয়েক আনা জমেছে দেখে ছবিটা দেখতে গিয়েছিলো পিলুয়া। তাই মোটর ধরতে পারেনি।

পর্দার গল্পটা এখনো ঘুরপাক খাচ্ছে তার মাথায়। ওর চেয়ে বছরখানেকের বড় ছেলেটা কি কেরামতিই না দেখালে! একটা পুল উড়িয়ে দিলে বোমা দিয়ে, ট্রেন লুঠ করলে, ঝাঁপ দিলো তিনতলা থেকে, বুড়োটাকে খুন করে তার মেয়েকে নিয়ে পালালো। সাবাস্, সাবাস্। সকলের সঙ্গে পিলুয়াও হাততালি দিয়েছে ঘন ঘন।

ওদের মধ্যে বায়োস্কোপের নেশা ধরেছে আর একজনের। পণ্ডা। একটা ইংরেজী সিনেমার সামনে রঙিন ছবি একটি মেয়ের—নেশা ধরিয়ে দিয়েছে পণ্ডার। যেমন করে হোক পয়সা বাঁচিয়ে দেখবেই সে। পোস্টারের ছবিটা দেখেছে সে। পরীর দেশের ছবি, পরীদের চেয়েও সুন্দরী এক মেমসাহেব, শুধু বুকে কোমরে এক টুকরো মলমল। ও-ছবিটা দেখবে পণ্ডা দিন কয়েকের মধ্যেই। টিকিটঘরটা কোথায়, জেনে নিতে হবে। পিলুয়াটা জানে ওসব। পণ্ডা খুঁজছিলো তাই পিলুয়াকে, কিন্তু নাম ডাকের সময় দেখলে পিলুয়া ফেরেনি।

—কি রে, খুঁজছিস কোন্ পেয়ারের মাগীকে? কথার শেষে হেসে উঠলো মাংনা।

চমকে ফিরে তাকিয়ে পণ্ডা বললে, তুমাকে লয় গো, তুমাকে লয়।

হাজরি খতম হয়ে গেছে তখন। রাউতীকে ইশারায় দূরে ডেকে নিয়ে গেল বাঙালীবাবু জহর। আড়চোখে দেখে হাসলো মাংনা। আসুক আজ মুখপুড়ী, দেখবে সে এক চোট। এতদিন লুকিয়ে রেখেছিলো তার কাছে?

খাবার সময় পাশে এসে রাউতী বসলো। মাংনা একটা ঠেলা দিলে তার গায়ে।

—কি বললে রে তোর লাগর?

—কে?

—কেন, ঐ হাজ্‌রেবাবু, জানি না নাকি কিছু?

প্রতিবাদ করে উঠলো রাউতী, না, মাইরি না। ও অন্য কথা কইছিলো।

—কি কথা?

ফিসফিস করে একে একে সব খুলে বললে রাউতী। ও যে আসন্নপ্রসবা তা মুলচাঁদ মারোয়াড়ীর কানেও নাকি রটে গেছে। বাঙালীবাবু জহর জানিয়েছে তাকে, সে যদি এখন থেকে রোজ এক টাকা করে জমা দিতে পারে, তা হলে বাকী যা লাগবে মুলচাঁদই দেবে—দিয়ে তার ছেলেকে মানুষ করবে তারা। লেখাপড়া শেখাবে। ভদ্রলোকের জায়গায় ভালোভাবে থাকতে খেতে দেবে, অনেক বড় চাকরি করে দেবে তার ছেলের। বড় হবে তার ছেলে, ভদ্রলোক হবে।

রাউতীর কথা শুনতে শুনতে মাংনার চোখেও স্বপ্ন নামলো। সেও যদি এমনি একটা ছেলে পেতো, তাকেও হয়তো লেখাপড়া শেখাতো। সেও বড় হতো, মানুষ হতো। আহা, ঠিক ঐ হাজরিবাবুর মতো যদি দেখতে হয় তার ছেলেকে। পণ্ডা? না, অমন কাঙালীর মতো চেহারা না হওয়াই ভালো।

মাংনা বললে, পারবি তুই রোজ এক টাকা করে দিতে?

—খু-উ-ব। টেনে টেনে মিটমিটে হাসি হেসে বললে রাউতী।

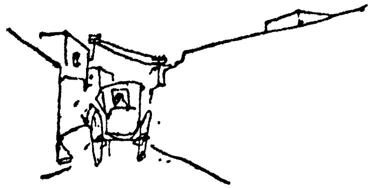
সত্যি করেই পরের দিন থেকে এক টাকা করে জমা দিতে শুরু করলে রাউতী। মাঝ থেকে চুরিটা বন্ধ হলো এই যা। তা হোক, কি-ই বা দরকার? পয়সা জমিয়ে করবেই বা কি সে! একদিন তো খেতে না পেয়ে এখানে এসেছিলো, যা দু-চার পয়সা পেয়েছে, তাই জমা দিয়েছে। তার জন্যে এক হাতা কম খিচুড়ি তো খেতে হয়নি কোনো দিন। অসময়ে মুলচাঁদ মারোয়াড়ী সরে দাঁড়াবে না। ঠিক খেতে দেবে। মিঠাইয়ের দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়াতে হবে না। শীতের কাঁপুনি আর বর্ষার জল সহ্য করে ফুটপাথে পড়ে থাকতে হবে না। আর, আর ছেলে বড় হবে। মানুষ হবে।

মোমবাতিটা আবার জ্বেলেছো? ভাবছো, কাহিনী আমার শেষ হয়ে গেছে? না, এর পর আছে ওদের জীবন-নাট্যের শেষ অঙ্ক। শেষ দৃশ্যটা দেখতে চাও তো চলো, এগিয়ে চলো। দুটো বছরকে রাখো পিছনে ফেলে। ওদের ঘুম ভেঙে যাবে, আস্তে পা টিপে-টিপে এসো, দেখবে এসো। রাউতীর ঘুম ভাঙিও না। একবার জেগে উঠলে আর ঘুম নামবে না ওর চোখে। ভাববে, তার ছেলের কথা। কোন্ সুদূরে নাকি মানুষ হচ্ছে তার ছেলে। বহুবার বাঙালীবাবু জহরের পা জড়িয়ে ধরে কেঁদেছে সে। তার ছেলেকে শুধু একটিবার চোখের দেখা দেখতে চেয়েছে। প্রায় ছ মাস হলো তার দেড় বছরের ছেলেকে নিয়ে গেছে তারা। মানুষ করবে তাকে, জহর বলেছে। রাউতী বিশ্বাস করেছে সে কথা। তা বলে তুমি যেন বিশ্বাস কোরো না। চলো, দেখবে চলো। ঐ যে তেওয়ারীর কুঠরি থেকে খানিক দূরে আর একখানা ঘর, ওখানে কেউ যেতে পায় না। এই ছোট দুনিয়ার নিষিদ্ধ দেশ ওটা। দেখতে পাচ্ছো, কপাটে ঝুলছে একটা তালা? ও-তালার চাবি আছে এক তেওয়ারীর কাছে। ওখানে ঢুকতে পায় শুধু মুলচাঁদ মারোয়াড়ীর অর্থপুষ্ট কয়েকজন উড়ে চাকর। কি আছে জানো ওর ভেতর? খোলা জানালায় উঁকি মারো, মোমবাতিটা তুলে ধরো গরাদের পাশে। কি, ভয়ে পিছিয়ে আসছো কেন? ওরা মানুষ হচ্ছে। হাঁড়ির আকারের বড়ো বড়ো জালার ভেতরে বসে রয়েছে ওরা। হাঁড়ির কানাটা চেপে রয়েছে প্রত্যেকের কোমরে। কোমরের ওপর থেকে সমস্ত শরীরটা বেড়ে উঠেছে ওদের নিয়মিত পানাহারে। শুধু কোমরের নীচের অংশটার নেই পরিবর্ধন। বারো বছর পরেও ওদের পা দুখানা থাকবে বারো মাসের শিশুর। লিকলিকে। অবশ নিম্নাঙ্গের জন্যে ওরা বসতে পারবে না, শুতে পারবে না, দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু পথিকের করুণা উদ্রেক করতে পারবে।

ভবিষ্যতের অনেক অনেক পিলুয়ার কাঠের ট্রলিতে ব্যাঙাচির অভাব হবে না।

আর। মুলচাঁদ মারোয়াড়ীর চামড়ার থলিটা জলভরা ভিস্তির মতো ফেঁপে ফুলে উঠবে।

[১৩৫২



শিশুমেধ

রোগীদের বিদায় দিয়ে অন্দরমহলে ঢুকলো সুকোমল। ঘরের রোগীটিকে এবার দেখতে হবে।

প্রায় মাসখানেক ধরে কলিকে ভুগছে সুষমা। বেশ থাকে সাধারণ মানুষের মতো, খায়-দায় দিবানিদ্রা দেয় ঠিক আর-আর মেয়েদের মতোই। রাঁধুনী বামুনের সঙ্গে ঝগড়া করে, ঝিকে বকে, চাকরদের ধমক দেয়। সন্ধ্যার সময় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ায় সযত্নে, কবরী বাঁধে, সিঁথিতে টানে চওড়া সিঁদুরের রেখা, কপালে পরে খয়েরের টিপ। রাঙি রঞ্জনী—হ্যাঁ, তাও ওর প্রসাধনের টেবিলে স্থান পায়। ঝকঝকে রঙিন শাড়ি পরে, সাঁওতালী দোসুতী কাপড়ের পাড় আঁটা ব্লাউজ পরে। হেসে কথা কয়, গুনগুন করে গান গায় কখনো-সখনো, রসিক চোখে স্বামীর সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় করে আবদার ধরে, সিনেমায় যাবো।

সাধারণ মানুষের মতোই দিন কাটায় সুষমা। আবার হঠাৎ কখনো মাঝদুপুর কি মাঝরাত সে হিসেব নেই, চিৎকার করে ওঠে যন্ত্রণায়। লোকজন ছুটে আসে, ছুটে আসে ছোট বোন সুশীলা। দু হাতে পেটটা টিপে পিঠের সঙ্গে লাগাবার জন্যে কসরত করে, মাথাটা কোলের ভেতর গুঁজে যন্ত্রণায় ছটফট করে। লাফিয়ে বিছানা থেকে নেমে পড়ে, জবাই-করা মুর্গির মতো ছটফট করে ওঠে, কুঁজো হয়ে সারা ঘরটায় ছুটোছুটি করে। নুন আর গরম জল খেয়ে যতক্ষণ না বমি করে ফেলে ততক্ষণ শান্তি পায় না।

চোখের সামনে এসব যখন দেখে সুকোমল, তখন তারও চোখে জল আসে। সুষমার কষ্টটা সেও যেন অন্তরে অন্তরে বোধ করে। সুষমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, পাখার বাতাস করে, হট ওয়াটারের ব্যাগ ধরে কাটিয়ে দেয় সারা রাত।

কিন্তু সকালের সুষমাকে দেখো। একেবারে অন্য মানুষ। ভোরবেলাকার ফুলের মতো যদিও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে না, তবু ওর শ্রান্তিস্নাত রূপটাকে তুলনা করা চলে শিশির-ধোয়া সোনালী সকালের জুঁই ফুলের সঙ্গে। ঘুমজাগা বিহঙ্গের মতো কথার কাকলি ফোটে ওর মুখে।

আসলে স্বামীর ভালোবাসাই সুষমাকে এখনো টিকিয়ে রেখেছে। কিংবা কে জানে স্বামীর ভালোবাসা নয়, স্বামীর প্রতি ভালোবাসাই হয়তো।

ওর সুস্নাত চোখে আনন্দের অশ্রু চমক দেয় বেতফলের গায়ে শিশিরের মতো। এক-তারা সাঁঝের আকাশের মতো। খরগোশের মতো নরম চোখ জুড়ে আসে অপার আনন্দে, মন জুড়িয়ে যায়। চন্দনের জ্বালাহর প্রলেপে যেমন ব্যথিত বিস্ফোটক শীতল হয়ে আসে।

আর, বোন সুশীলা?

ঝরনার স্রোতের মতো, বন্যার ঢেউয়ের মতো তড়িৎবেগে গাড়ি ছুটছিলো। সুশীলার মন ছুটছিলো আরো আগে। মাটির পৃথিবী ছেড়ে কোন্-এক স্বর্গপুরীর দিকে যেন যাত্রা করেছে ওরা। কোন্-এক রত্নদ্বীপের সন্ধানে ছুটে চলেছে। হাওয়ায় উড়ে চলেছে যেন। বাতাস-বিপরীতে ক্ষণে ক্ষণে সুশীলার আঁচল খসে পড়ছিলো, পাড় কাঁপছিলো। ও একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলো অজয়ের দিকে। কামরাঙার শিরার মতো ধারালো নাকের ওপর অজয়ের তীক্ষ্ণ আর তীব্র চোখের স্থির অচঞ্চল দৃষ্টি ভেসে চলেছে পিচঢালা পথের ওপর দিয়ে।

শান্ত সমুদ্রের জাহাজের মতো সুশীলার মন বাতাসে ভাসতে থাকে আলাদীনের উড়ন্ত শতরঞ্জির মতো।

ও তাকিয়ে ছিলো অজয়ের কপালের দিকে। কিঞ্চিৎ তামাটে ধরনের কয়েকটি খুচরো হালকা চুল স্প্রিং-এর মতো কুঁকড়ে কপাল কামড়ে পড়ে আছে। পূর্ণযৌবন বলিষ্ঠ পুরুষের পাশে বসলে সব মেয়েরই মনে রোমাঞ্চ জাগে, চোখে স্বপ্ন নামে, প্রাণে অজস্র আনন্দের বোল ফোটে। সুশীলার মনের ওপরও একটা জ্বালাহর শীতল শান্তির আস্তরণ পড়লো।

—এই, স্পীড কমাও, বাব্বা, গাড়ি চালাচ্ছে না ঝড় বইছে। স্পীড কমাও।

গাড়ি থামলো শহর-ছোঁয়া আধাগ্রাম শহরতলির মাঠে।

সুশীলা বললে, চলো একটু হেঁটে বেড়িয়ে আসি। ঐ পুকুরধারে।

অর্থাৎ শরবন আর কাশঝোপের পাশ দিয়ে, গাঙশালিকের দল যেখানে জলো শামুকের সন্ধান করছে।

পশ্চিমের আকাশে তখন মাটির পৃথিবী যেন কোন্-এক অসূর্যম্পশ্যাকে হঠাৎ ধরে চুমু খেয়েছে। সূর্যের লাল গাল তাই লজ্জায় আরো লাল হয়ে উঠেছে। আর পুবের বাতাস হয়ে উঠেছে কালো। কিংবা কালো নয়, নীল আকাশের স্পর্শ লেগে নীলাভ হয়ে উঠেছে বাতাস। বাড়ন্ত মেয়ের আঙুলের মতো ফাঁপালো শরের বন, সাদা ফুলের শিষ, আর তার ওপর দিয়ে বয়ে যায় হালকা হাওয়ার হিল্লোল। মেঠো খরগোশ তড়কে ওঠে ওদের প্রতিধ্বনিতে। খয়েরী রঙের শঙ্খচিলের দল শূন্যে চক্র দিয়ে ফেরে।

হঠাৎ ওদের চোখে পড়লো এক জোড়া শালিক দম্পতির প্রেমালাপ।

অজয় আর সুশীলা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে মৃদু হাসলো।

ওদের নিঃশব্দ হাসিতে গাঙশালিকও বুঝি লজ্জা পেলো। পাখা ঝটপট করে উড়ে পালালো দুজনে দু দিকে। পরিরম্ভাশ্রিত প্রেমিকযুগল যেমন অভিসার-রাতে হঠাৎ ধরা পড়ে ছুটে পালায়।

ঘাটের কাছে ভাঙা পুরোনো কবেকার একটা বাঁধানো বেদী—কে জানে, আজ এটা মাঠের পুকুর হয়ে দাঁড়িয়েছে, হয়তো একদিন ছিলো এরই চারপাশে সুসমৃদ্ধ সবুজ গ্রাম, সোনার ধান আর সোনার গ্রাম হয়তো ছিলো এর চারপাশে, আসতো নবীনা প্রবীণা রসিকা আর গম্ভীরার দল, কাঁখে কলসী অথবা ক্রোড়ে কন্যার শান্তি তাদের চোখে। হঠাৎ হাতছানি দিতো শিশুতরঙ্গের সারি, কচি চাঁদ আর তন্দ্রাক্রান্তা সূর্য একসঙ্গে দিতো সাঁঝের ডাক, আকাশ তার নিঃশব্দতায় জানাতো অপেক্ষার অধর-কম্পন। গ্রামীণার দল ছুটে চলতো ঘাটের দিকে। তাদের পায়ের শব্দে চমকে চোখ ঢেকে লুকিয়ে পড়তো মেঠো নেউলের দল—পাশের সফল ধানের জমিতে।

শূন্যাকাশের শঙ্খচিল যেমন অবিরাম চক্র দিয়ে ফিরছে, তেমনি অজয় আর সুশীলাও চক্র দিয়ে ফিরলে পুকুরের ধারে। শহর কোলকাতার মানুষ ওরা। তাই হয়তো শহরতলির মধ্যে ওরা খুঁজে পেয়েছে রোমান্সের রস। ওদের কল্পনার বিশ্রাম নেই। একের স্বপ্ন আরেকজনের কথায় সম্পূর্ণতা পায়। চপলা নাগরীর ক্লান্তির মতো সুশীলার চোখে তৃপ্তি নামে।

অদ্ভুত! শহর কোলকাতার বাণিজ্য-ব্যস্ততার মাঝে কে জানতো এই রোমান্স-রাজত্বের ঠিকানা।

আরেকটা পাক দিয়ে এসে ওরা বসলে সেই ভাঙা ঘাটের ক্ষয়িষ্ণু বেদীর ওপর। পাশাপাশি। পাশাপাশি বসলে ওরা গায়ে গা লাগিয়ে। অজয়ের কোলের ওপর লুটিয়ে পড়লো সুশীলার হাত। সুশীলার নরম মখমলের মতো হাতটা নিজের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে চমকে উঠলো অজয়।

—এ কি, এত গরম কেন তোমার হাত? জ্বর হয়েছে নাকি?

—দূর। সুশীলা লজ্জায় চোখ সরায়।

—কাঁপছো কেন এমন করে।

খিলখিল করে হেসে ওঠে সুশীলা।

—কি, হাসছো যে?

—তুমি......। কথা শেষ করতে পারে না সুশীলা, আবার খিলখিল করে হেসে ওঠে।—তুমি, তুমি সত্যি বড় বোকা।

—তা হবে।

সুশীলা কপট গাম্ভীর্যে বললে, সত্যি জ্বর হয়েছে নাকি আমার? দেখো তো কপালটা গরম কি না?

নিজেই সে অজয়ের মাথাটা টেনে এনে তার গালে কপালে স্পর্শ করায়। সুতৃপ্তিতে তার চোখের পাতা নেমে আসে সন্ধ্যার অন্ধকারের মতো। ধীরে।

দুজনে আরো ঘনিষ্ঠ হয়।

—এইখানে, এই চমৎকার—সত্যি এখানে এলে মনে হয় যেন পৃথিবী সত্যিই নীরস আর একঘেয়ে নয়। বড় খাপছাড়া কথা বলে অজয়।—মনে হয় এখানেই থেকে যাই।

সুশীলা বললে, সত্যি, রাতে ঘুম আসে না আমার।

রুগ্না স্ত্রীর মতো দুর্বলতায় লুটিয়ে পড়লো সে অজয়ের কোলের ওপর।

সুশীলার নরম দেহটা তুলে ধরে অজয় বললে, আমারও।

তারপর চুপচাপ পাশাপাশি বসে রইলো ওরা। ভুলে গেল যে, এই স্বপ্নসৌধে বসে বসে বাতাসে কাসেল রচনা করলে ওদের চলবে না। ফিরতে হবে বাস্তবের আঘাত যেখানে বাণিজ্য-ব্যস্ততায় মানুষকে করে তুলেছে যন্ত্র। যন্ত্রের যন্ত্রণা যেখানে মানুষের বুকে দেয় অসহ্য অধীরতা।

নীরবতা নেমে এলো ওদের মাঝখানে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। নীলচে বাতাসে কালো রঙ ধরলো। এলো অন্ধকার। দূরের তাল আর শিরীষ আর অর্জুন গাছের মাথায় জমলো মেঘ, জমলো ময়লা বাতাস। দু-একটা করে তারার দীপ্তি দেখা দিলো আকাশের কোণে। অজয় আর সুশীলা তবু বসে রইলো নিশ্চুপ।

কি-একটা অজানা পাখি যেন ট্রী-ট্রী করে ডাক দিচ্ছে। পাখা ঝটপট করছে কাছের গাছের শাখায়, হয়তো কোনো মিথুনাবলম্বী প্রণয়ী বিহঙ্গ।

অজয় আর সুশীলা বসে থাকে নিশ্চুপ। পাশাপাশি, দেহে দেহের উষ্ণতা সঞ্চার করে।

দূরে কোথায় যেন বাঁশি বাজছে। সাঁওতালী বাঁশের বাঁশির সুর কঁকিয়ে কঁকিয়ে বেজে উঠছে, ভেসে আসছে মিঠে সুরের নিভাষ গান। বাঁশি বাজছে দূরে কোথায়।

আদরে গলে পড়ে সুশীলা হঠাৎ বললে, আমি যাবো না। ফিরতে ইচ্ছে করছে না আমার।

আর সুকোমল?

পরিচিতেষু,

সুকোমল, আজ সাত বছর পরে তোমাকে লিখছি এই চিঠি। কে জানে, চিঠির পায়ে যে নামটা লেখা আছে, সে নামের মানুষটাকে তুমি আজো মনে রেখেছো কি না। আজ খ্যাতি তোমাকে জনারণ্যের মধ্যে টেনে নিয়েছে, আর যেটুকু বিশ্রাম আছে, জানি বিশ্রামের পরিধি তোমার অল্প, তবু যেটুকুও বা আছে, তাও আজ দখল করে বসেছেন তোমার স্ত্রী।

একটু সময় কি তোমার হবে না, সময় হবে না আমার এই অনেক চিন্তা, অনেক ভয় আর অনেক আশঙ্কায় লেখা চিঠিখানি পড়বার? সুকোমল, দোহাই তোমার, আজ আর রাগ করে ছিঁড়ে ফেলে দিও না এ চিঠি, তোমার বাজে কাগজের ঝুড়িতে। প্রতিশোধ যদি নিতে চাও, তার তো অন্য উপায় আছে; শাস্তি যদি দিতে চাও, মাথা পেতে নেবো।

আচ্ছা, ভেবে দেখো সেদিন কি আমি খুব ভুল করেছিলাম? গরিবের মেয়ে আমি, তাই জানতাম মাটিতে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়ানো যায়, কিন্তু চাঁদকে ছোঁয়া যায় না; কোনো দিন দেখাইনি যে, তোমাকে মনেপ্রাণে ভালোবাসি। যতবার তুমি এসেছো আমার কাছে, ভিক্ষুকের ভর্ৎসনাই জুটেছে তোমার কপালে। সে কি আমার প্রাণের অবজ্ঞা? তা নয়, আমি তোমাকে নীচে নামাতে চাইনি। বারবার উপেক্ষা করে গেছি, অজস্র অনুরাগ মেশানো তোমার কথাগুলো হেসে উড়িয়ে দিয়েছি। কেন? তুমি হয়তো আজ মনে ভাবো, তোমার জন্যে এতটুকু দরদ ছিলো না আমার, এতটুকু প্রেম আর ভালোবাসা ছিলো না; তখন তুমি বলেছিলে, আমার কাছ থেকে সামান্যতম ভালোবাসা

প্রেমের একটা ক্ষুদ্র কণিকাও যদি পাও, তা হলে নাকি তুমি পাবে নতুন উদ্দীপনা, শক্তির জোয়ার আসবে তোমার দেহে। কিন্তু বিশ্বাস করো তুমি, আমি জানতাম তোমাকে বড় হতেই হবে, আর সেই বড় হওয়ার পথ বাধায় বাধায় বন্ধুর হয়ে উঠবে যদি আমার জীবনকে জড়িয়ে দিই তোমার জীবনের সঙ্গে।

অনেক বাজে কথা তো লিখে যাচ্ছি, এদিকে ভয় হচ্ছে, আমার নামটাও তুমি হয়তো ভুলে বসে আছো।

দেখো তো, তবু আশা ছাড়তে পারছি নে। হয়তো বোকা মেয়ে বলে মনে করবে তুমি আমাকে, হয়তো ভাববে কে এই 'ঈষিতা' যে তার উদ্ধত গর্ব নিয়ে বসে আছে আজো, ভাবছে আজো বুঝি তাকে আমি মনে করে রেখেছি। দেখো তো, তবু আশা ছাড়তে পারছি নে। কেবলই মনে হচ্ছে, তুমি আজো আমাকে ভুলতে পারোনি, মনে হচ্ছে আজো যদি তোমার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ি, তা হলে হয়তো ক্ষমা পাবো তোমার কাছ থেকে।

দোহাই তোমার সুকোমল, তোমার মনের কোণে যদি এতটুকুও স্থান আমার জন্যে নির্বিবাদে পড়ে থাকে, ইচ্ছে করে আমাকে অপমান কোরো না, ভুলে যাবার ভান কোরো না।

নির্লজ্জ ভাবছো হয়তো তুমি আমাকে, ভাবছো এ কোন্-দেশী মেয়ে, যে সাত বছর পরে আবার বিবাহিত প্রেমিকের কাছে প্রেম নিবেদন করতে আসে। ওগো, এই সাত বছরে বুঝেছি তুমি না হলে আমার চলবে না, আমার জীবনের বিষাদ ঘুচবে না তোমার কথা, তোমার কণ্ঠস্বর না শুনলে।

ভয় নেই, তোমার কাছে যা পেতে পারতাম, তা আর চাইবো না, চাইবো না অনেক কিছু, শুধু বন্ধুত্বটুকু, দূরের বন্ধুত্ব নয়, নিকট বন্ধুত্বটুকু দাও, আর কিছু চাইবো না আমি। মাঝে মাঝে শুধু তোমার দেখা পাওয়াতেই আমার পরম তৃপ্তি।

তোমার চিঠির আশায় রইলুম। লজ্জায় আজ চিঠির পূর্বরাগ পাঠাতে হচ্ছে, ইচ্ছে ছিলো আজই ছুটে যাই তোমার দোরে। তা হলে কি আর ফেরাতে পারবে তুমি?

ওগো, সত্যি করে চিঠির উত্তর দিও, দেরি কোরো না আর, আর কষ্ট দিও না। ভালোবাসা জেনো।

ইতি—ঈষিতা

পুঃ—দিন পনেরোর মধ্যেই কোলকাতা রওনা হবো, তার আগেই যেন চিঠির উত্তর পাই।

নিজের মনেই হেসে ফেললে সুকোমল। বোকা মেয়ে। চিঠিখানা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দিলে জানালা গলিয়ে, তারপর মৃদু পদক্ষেপে অন্দর-মহলে ঢুকলো।

সুষমা বললে, তুমি কি বলো তো, এমনি করে শরীর নষ্ট করবে? দু-চারটে কেস না-হয় কমই নিলে, কিংবা ফি-টা বাড়িয়ে দাও না, হাঙ্গামা অনেক কমে, তোমার টাকার আকাঙ্ক্ষাটাও চরিতার্থ হয়।

সুকোমল বুঝতে না পেরে বললে, কেন, কি হলো?

—কি হলো? ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখো তো, এর পর কখনই বা স্নান করবে আর কখনই বা খাবে?

সুকোমল আত্মস্খালনের জন্যে করুণ রসের সঞ্চার করে সুষমার মনে।

—জানো সুষমা, যে ডেলিভারী কেসটায় গিয়েছিলাম না, তার যন্ত্রণা দেখে সত্যি আমার মতো ছুরিকাঁচি-চালানো ডাক্তারের চোখেও জল এলো।

সুষমা বললে, সত্যি? আহা!

—মাত্র ষোলো বছরের মেয়ে, এর চেয়ে—

সুষমার চোখ ছলছল করে ওঠে। একটা ব্যথাও জাগে, আজ এতদিন বিয়ে হয়েছে তার, এখনো কোনো সন্তানের মুখ দেখলো না। মাতৃত্বের গর্ব বোধ হয় তার কপালে জুটবে না। তার ব্যথা-বেদনার ইতিহাস জানতে পারলে স্বামীও কম দুঃখ পাবে না।

তাই আবার মুখে হাসি ফিরিয়ে আনলে সুষমা।

মুখে হাসি টেনে আনার চেষ্টা করে বললে, অন্য মেয়েদের জন্যে তোমার এত দরদ, তার এতটুকুও যদি আমার জন্যে থাকতো।

—কেন, তোমার ওপর নৃশংসতাই বা কি করলাম, মনে তো পড়ছে না।

—না, ক'দিন ধরে বলছি, একটা ভালো ডাক্তার দেখাও, আমার কলিকের যন্ত্রণাটা যেন কিছুই নয়।

—আমার ডাক্তারির ওপর অবিশ্বাস কেন, বাইরের লোকের কাছে তো আমিই বড় ডাক্তার। একেই ইংরেজীতে বলে ভ্যালেটের কাছে হিরো হওয়া যায় না।

—অবিশ্বাস হবে না কেন, তোমার এলাকার মধ্যে তো নয় এ-রোগ। এ পেটের ব্যথা, প্রসূতির ব্যথা নয়।

না, যে কথাটা লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করছিলো সুষমা, সেটা প্রকাশ না করেও যেন শান্তি পায় না।

—বেশ, আজ আনাবো সুধীরকে, এসব দিকে ওরই একটু হাতযশ আছে।

—বেশ, সে পরের কথা পরে, এখন যাও তো চট করে স্নানটা সেরে এসো।

সুকোমল কাঁধে তোয়ালে ফেলে চুলে তেল ঘষতে ঘষতে কলঘরে ঢুকলো। একটু পরেই গা মুছতে মুছতে বেরিয়ে এলো।

সুষমা বললে, হয়ে গেল তোমার কাকস্নান?

সুশীলা কোথায় ছিলো, সামনে এগিয়ে এসে গালে হাত দিয়ে নাটুকে ভঙ্গিতে বললে, ও মা, কাকের ঐরকম মোমের পুতুলের মতো রঙ নাকি?

সুষমা বলে ওঠে, তুই চুপ কর সুশী।

সুশীলা বললে, বেশ। অপ্রিয় সত্য তো তোমার সহ্য হয় না।

সুকোমল বললে, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, অপ্রিয় সত্য বলিও না। ভগবান-টগবানগুলোর কথা একটু মেনে চলাই ভালো।

ইতিমধ্যে চুল আঁচড়ানো হয়ে গেছে সুকোমলের।

আসন পেতে জলের গ্লাস এনে দিলো সুশীলা। সুষমা এলো ভাতের থালা হাতে। সামনে পাখা হাতে বসলে আহারের তত্ত্বাবধান করতে।

সুশীলা চলে যাচ্ছিলো, সুকোমল তার হাতটা ধরে টেনে কাছে বসিয়ে বললে, বলেছি না মেয়েরা সামনে না বসলে আমার খাওয়া হয় না।

সুশীলা হেসে বললে, একজন তো রয়েছেন।

সুকোমল বললে, উনি তো অন্য মানুষ নন, অর্ধাঙ্গিনী, অতএব আমারই অর্ধেক।

সুষমা চটে উঠলো, তোমার কি লজ্জা-শরম বলে কিছু নেই, ঐ বাচ্চা মেয়েটার কাছে যা নয় তাই বলবে।

সুশীলা ঠোঁট ফুলিয়ে বললে, ওঃ ভারি তো দিদি, তিন বছরের বড়। সত্যি জামাইবাবু, মেয়েরা বিয়ে হলেই যেন মনে করে কত বড় হয়ে গেছে!

—তোমার তো বড় হবার দিনটা খুব বেশী দূরে নয়।

সুশীলা লজ্জায় মুখ নামায়।

সুষমা বলে, বাঃ রে, শোনোনি বুঝি? অজয় যে কি একটা স্কলারশিপ পেয়েছে বিলেত যাবার। দু বছর থাকবে অক্সফোর্ডে, ফিলজফি না কি পড়বে যেন।

সুকোমল—তাই নাকি? তা হলে তো সুশীর আর ঈর্ষা হবে না বলো, ডাক্তার না হোক ডক্টর স্বামী তো হবে।

সুশীলা—ওঃ, ডাক্তারটা যেন কত বড় জিনিস, যত নোংরা ঘেঁটে বেড়ায়। আর দিন নেই রাত নেই কেবল ছোটাছুটি। প্রফেসরদের ন মাস ছুটি, তা জানো?

সুকোমল আর সুষমা দুজনেই হাসলে।

অজয়ের বিলেত থেকে লেখা প্রথম চিঠিখানা পড়া শেষ করে সুষমাকে দেবার জন্যে ভেতরে যাচ্ছিলো সুকোমল। হঠাৎ বেয়ারা বললে, সাহাব, এক বাবু আপনার মোলাকাত মাংছে। বহুৎ জরুরী।

ঘড়িটার দিকে তাকালে সুকোমল। রাত এগারোটা। তবু যেতে তাকে হবে। বেয়ারাকে বললে, নার্সকে রেডি হতে বলো। যন্ত্রপাতি আর ওষুধের সরঞ্জামগুলো নিজেই গোছালে। ফরসেপটার এক জায়গায় মরচে ধরছে মনে হচ্ছে।

—নতুনটা বের করুন মিস্ ডাট্।

ভদ্রলোক এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন, এবার বললেন, নার্সের দরকার নেই, শুধু আপনাকে যেতে বলেছে। গাড়ি এনেছি।

সুকোমল—পেন ওঠেনি এখনো?

—না।

—তবে আজ থাক না, কাল সকালে যাবো।

—না, দয়া করে চলুন, আপনি না গেলে তার কান্না থামবে না।

—বেশ চলুন।

নবাগতের পিছনে পিছনে গাড়িতে এসে বসলে সুকোমল।

গাড়িটা রাতের কোলকাতায় নিঃশব্দে এগিয়ে এসে দাঁড়ালো একটা ছোট্ট গলির মধ্যে। রাত্রে সুকোমল ঠাওর করতে পারলে না জায়গাটা কোথায়।

চারিদিক নিঝুম, শুধু গ্যাসপোস্টগুলো দাঁড়িয়ে আছে মাথায় মণি জ্বালিয়ে। পিচ-ঢালা রাস্তাটা চকচক করছে। দূরে কোথায় যেন দুটো প্যাঁচা ডেকে উঠলো। খুব আস্তে আস্তে দরজায় টোকা দিলেন ভদ্রলোক। কপাট খুললো। একটা বাচ্চা চাকর সেলাম করে পাশে দাঁড়ালো।

সুকোমল ভদ্রলোকের পিছনে পিছনে ওপরে উঠলো। ওপরের ঘরের দরজাটা খুলে ধরে তিনি বললেন, ভেতরে যান।

চৌকাঠ পেরিয়ে খানিকটা গেছে, হঠাৎ দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। সুকোমল বুঝতে পারলে বাইরে থেকে ভদ্রলোক কপাটে চাবি লাগিয়ে দিলেন। বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে রইলো সে।

—এসো সুকোমল, সময়মতো দরজা আপনিই খুলে যাবে।

চমকে ফিরে তাকালো সুকোমল। চারিদিকে তাকিয়ে প্রথমটা ঠিক করতে পারলো না নারীকণ্ঠের অভ্যর্থনাটা কোত্থেকে আসছে। তারপরই ওর চোখে পড়লো কুশনের হেলানির ওপর এক গোছা মেয়েলী চুল।

বিস্ময় তখনো কাটেনি সুকোমলের। স্বপ্ন দেখছে, না, সত্যিকারের কোনো ডিটেকটিভ গল্পের নায়ক হতে চলেছে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ জাগলো ওর মনে। তবু ভয় আর আশঙ্কা যখন সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখনই দেখা যায় মানুষের সাহস বাড়ে। সুকোমলের তাই হলো। অস্তগামী সূর্যের লালিমা বেশী, শেষ রাতের চাঁদের ঔজ্জ্বল্য সন্ধ্যাকালের চাঁদের চাকচিক্য ম্লান করে দেয়। বন্যার বেগে মানুষ যখন অসম্ভব রকমের নিষ্কর্মণ্য হয়ে যায়, তখন—প্রবাদ যাই বলুক—খড়কুটো ধরে বাঁচতে চেষ্টা করে না। সে তখন নিজেই বিস্মিত হয়ে বুঝতে পারে যে, সাঁতার না জেনেও সে সাঁতার কেটে চলেছে। ভয় আর আশঙ্কা যখন সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখনই দেখা যায় দুর্জয় সাহস জুটছে বুকে। সুকোমলেরও তাই হলো।

ধীরে ধীরে সে শ্রুত স্বর আর চঞ্চল চুলের রাশ লক্ষ করে এগিয়ে এলো।

কুশনখানা তার দিকে পিছন ফেরানো ছিলো। একটু ঘুরে গিয়ে মেয়েটির সামনে দাঁড়ালো সুকোমল। চোখে তার উদ্ধত ক্রোধ।

হাতের পত্রিকাখানি ছোট্ট তেপায়াটার ওপর রেখে মৃদু হেসে মেয়েটি মুখ তুললো।—বোসো, দাঁড়িয়ে কেন?

অজগরের চোখের সামনে নাকি হরিণী বশ খায়, আর মোহগ্রস্ত মৃগীর পালাবার পথ থাকে না। শোনা কথা, রূপক হয়তো। কিন্তু সুকোমল যেভাবে মেয়েটির কথায় ধীরে ধীরে গিয়ে কেদারাটার উপরে বসে পড়লো তার তুলনা ঐ অজগর আর হরিণী।

অদ্ভুত আর অচেনা এই মেয়েটির দিকে স্থির চোখে তাকালে সুকোমল। সুন্দর? হ্যাঁ, সুন্দরী নিশ্চয়। নিকষ কালো একখানা শাড়িতে সারা শরীর তার ঢাকা। মেয়েটি যখন নড়েচড়ে বসলে, সাদায় কালোয় কল্কা-তোলা পাড়টা কেঁপে উঠলো, আর সুকোমলের মনে হলো যেন এক ঝড়ো রাতের বিদ্যুতের আলোয় তার চোখ ধাঁধিয়ে গেল।

হ্যাঁ, অদ্ভুত সুন্দরী নিঃসন্দেহে।

মেয়েটি তাকালে শান্ত আর গম্ভীর হাসি-মাখানো দুটি চোখ মেলে। বললে, চিনতে পারো?

ওর কথার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটির কানে হীরের দুল জোড়া নেচে উঠলো। বিজলী বাতির আলো লেগে হীরে জোড়া ঝকমক করে উঠলো। ধনীর দুলালী কেউ! সুকোমল তাকিয়ে দেখলে। কবজি থেকে কনুই ঠেসে এসেছে চুড়ি আর কঙ্কণের শ্রেণী। গলায় সোনার রুদ্রাক্ষমালা। হাতের দুটো আঙুলে বড় বড় মুক্তো বসানো আংটি। তারই একটা সে বার-বার খুলছিলো আর পরছিলো।

মেয়েটি বিচিত্র হাসি হেসে প্রশ্ন করলো, কি, চিনতে পারো?

হ্যাঁ, চেনা-চেনাই মনে হচ্ছিলো সুকোমলের। খুব বেশী চেনা, যেন এককালে অনেক অন্তরঙ্গ ছিলো এ মুখ।

মেয়েটি বললে, কথা বলছো না যে! নিজের থেকে আসবে না বলেই না ধরে আনতে হলো তোমাকে, মিথ্যার অভিনয় করে।

এতক্ষণে চিনতে পেরেছে সুকোমল। কিন্তু বিস্মিত হলো সে। মেয়েটির সিঁথিতে চওড়া সিঁদুর। এ-কথা তো কোনো দিন তার মনে হয়নি। ওর তো কোনো দিন মনে হয়নি, ওর এই অনেক-চেনা মেয়েটি বিবাহিতা। তারও স্বামী আছে, সংসার আছে, সমাজ আছে।

মেয়েদের এই একটি মাত্র চিহ্ন কত কথাই ভাবিয়ে তোলে।

তা হোক, সুকোমলের মনে হলো, এমন নির্লজ্জ মেয়ে কখনো দেখেনি। তবু, বিস্ময়ের ঘোর কাটছিলো না তার। যা ঘটছে আর যা ঘটেছে, তার কয়েকটা পরিচ্ছেদ যেন অবান্তরই নয়, অবোধ্য মনে হলো তার।

একটু রূঢ় হবার চেষ্টা করলে সুকোমল, কেন ডেকে এনেছো আমায়?

—বললুম তো, নিজের থেকে আসতে না, তাই।

—কিন্তু নষ্ট করবার মতো সময় আমার নেই।

—নষ্ট করার মতো জীবনও আমার নেই।

—কি চাও তুমি?

—তোমাকে। খিলখিল করে মেয়েটি হেসে উঠলো। ধীরে ধীরে উঠে এসে সুকোমলের কেদারাটার হাতলের ওপর বসলে। চোখে হাসির ঝিলিক ছড়িয়ে তাকালে সুকোমলের দিকে, একটা হাত সুকোমলের কাঁধে রাখলে হালকা করে।

সুকোমলের সমস্ত শরীর যেন অবশ হয়ে এলো। ওর ইচ্ছে হলো না, কিংবা সাহস হলো না পিঠ থেকে হাতটা সরিয়ে দিতে।

—তাকাও আমার দিকে, আমি কি আগের মতো সুন্দর নেই?

সুকোমল জবাব দিলে না।

হঠাৎ সুকোমলকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে অজস্র চুমোতে সুকোমলের মুখটা ঢেকে দিলো সে। বুকের কাছে সুকোমলকে টেনে নিয়ে তার চুলে, কপালে, চোখে আর ঠোঁটে অজস্র চুম্বনে বিব্রত করে তুললে।

মেয়েটির ক্ষুধার্ত গ্রাস থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সুকোমল উঠে দাঁড়ালো। তারপর অনুশীলনী অণুবীক্ষণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সে মেয়েটির দিকে।

ক্রমে। অনেকটা সময় কাটার পর ক্রমে যেন চেতনা ফিরলো সুকোমলের। একটা মস্ত বড় সত্য তার চোখে ধরা দিলো। স্থির দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার পাঁচ বছরের ডাক্তারী অভিজ্ঞতায় ধরা পড়লো একটা অত্যন্ত রূঢ় সত্য। সুকোমল দেখলে তার ফাঁপালো চেহারায় যেন শ্রান্তির আতিশয্য নেমেছে। উগ্রতাটা জোর করে আনা, আসলে তার চেহারায় এসেছে পরিপূর্ণতা। কাজলের প্রলেপ নয়, চোখের কক্ষে ক্লান্তির ছাপ। মাতৃত্বের সূচনা দেখতে পেলো সুকোমল।

বললে, ভুল করেছো তুমি, সম্বন্ধ বজায় রাখার এতটুকু ইচ্ছে আমার নেই। ইচ্ছে নেই নয়, ঘৃণায় আমি নিজেকে অশুচি মনে করছি।

কপাটের দিকে পা বাড়ালো সে।

—আমার আদেশ ভিন্ন বেরোনো সম্ভব নয় তোমার।

—আদেশ? ঘৃণার চোখে ফিরে তাকালো সুকোমল।

—হ্যাঁ। শোনো, এখানে এসো। আদেশের সুরেই সে বললে। তারপর চুপ করে রইলো।

অনেক পরে বললে, কাজের জন্যেই তোমাকে ডাকা হয়েছে। যার প্রতিদানে তোমার কাছে ভিক্ষে চাইতে এসেছিলাম, তা তুমি চাও না বুঝতে পেরেছি, তা হলে সত্যি কথাটা শোনো। ভালো তোমাকে আমি কোনো দিনই বাসিনি। আজ সাত বছর পরে দায়ে পড়ে ভালোবাসার অভিনয় করতে হয়েছে।

সুকোমল অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে।—কি, কি কাজ আমার কাছে?

—কাজ? মৃদু হাসলে মেয়েটি।—বুঝতে পারোনি এখনো, কি কাজ? সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনে যে লজ্জা আমাকে বয়ে বেড়াতে হবে, তার থেকে তুমি আমাকে রক্ষা করো।

সুকোমল বিব্রত বোধ করে।—লজ্জা? কেন?

—আমার স্বামী আজ দু বছর নিরুদ্দেশ। সম্প্রতি চিঠি পেয়েছি, আর মাস খানেকের মধ্যেই নাকি তিনি ফিরবেন।

যে ঘটনার ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদগুলো অবান্তর অবোধ্য ঠেকছিলো, সুকোমলের চোখে তা স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

সুকোমল প্রতিবাদ করে উঠলো, না, না। এ অন্যায়। এ অন্যায়। পারবো না আমি। জীবন গেলেও না।

—পারতে হবে তোমাকে। ধমক দিয়ে উঠে দাঁড়ালো মেয়েটি।

—না।

—টাকা পাবে। কত টাকা চাও তুমি? হাজার, দশ হাজার, কত টাকা চাও?

—টাকার লোভে অন্যায় আমি করতে পারবো না।

—অন্যায়? ঘৃণার চোখে তাকালো সে সুকোমলের দিকে।—হোক ন্যায়, হোক অন্যায়, তোমাকে ছাড়বো না আমি। কত টাকা চাও তুমি, বলো, বলো তুমি, কত টাকা চাও? যে টাকা সারা জীবনে পাবে না, যে অঙ্কের স্বপ্নও তুমি দেখোনি—কত টাকা চাও তুমি?

আবার প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলো সুকোমল। কিন্তু হঠাৎ সুবুদ্ধির উদয় হলো তার। এখান থেকে পরিত্রাণ পেতে হবে। আর প্রতিবাদের ভেতর দিয়ে সে পরিত্রাণ মিলবে না।

বললে, কত টাকা তুমি দিতে পারো?

—রানীবাঁধের বধূরানী আমি, টাকার অভাব হবে না যার কোনো দিন। টাকা, টাকা। এত অজস্র ঐশ্বর্যের একমাত্র অধিকারী বলেই আজ স্বামী সংসার সমাজ ভাসিয়ে চলে যেতে পারছি না। তা না হলে আজ তোমাকে ডাকতাম না।

সুকোমল বললে, বেশ, আমি রাজী।

—ন্যায়-অন্যায়ের বিচার কোথায় গেল তোমার এখন?

ধীরে ধীরে সে এগিয়ে এলো কপাটের দিকে। নির্লজ্জের মতো স্থির চোখে সুকোমলের দিকে তাকিয়ে দৃপ্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, কবে?

—এ সপ্তাহেই। লোক পাঠিও।

—আচ্ছা।

বাইরে থেকে কপাটের চাবি ঘুরলো।

খোলা আকাশের নীচে হালকা বাতাসের মাঝে নেমে এলো সে। গাড়ি ছুটলো আবার বাড়ির দিকে। সুকোমল দেখলে, তার সর্বাঙ্গে ঘাম ঝরছে।

ভয় আর আশঙ্কায় সারা রাত ঘুম হলো না তার।

টাকা, টাকা, টাকা। অজস্র টাকা, যা তুমি স্বপ্নেও ভাবতে পারো না!

অন্যায়, আইনবিরুদ্ধ।

টাকা, টাকা, টাকা। অজস্র টাকা, যা তুমি সারা জীবনেও রোজগার করতে পারবে না।

নীতি, ধর্ম, সমাজ, সংসার।

টাকা, টাকা, টাকা। রানীবাঁধের বধূরানী আমি, টাকার অভাব হয় না যার কোনো দিন।

ন্যায়, চরিত্র, সরল জীবন। নিষ্কলঙ্ক।

না, টাকা চায় না সুকোমল। টাকা চায় না। চায় বিশ্রাম, চায় শান্তি, চায় স্বস্তি। টাকা? প্রয়োজনমতো টাকা তো সে পেয়ে যাচ্ছে। ভাগ্যে থাকে, টাকা অনেক হবে তার। কিন্তু অন্যায়? না, একবার করলে সারা জীবনেও তা মুছে যাবে না।

সারা রাত ঘুম হলো না তার। অন্ধকার ঘরে পায়চারি করতে লাগলো। সারা শরীর তার কাঁপছে। ঘুম আসছে না, ঘুম আসবে না, ঘুম আসবে না তার চোখে।

মাসখানেক বাইরে ঘুরে এলো সুকোমল। ভয় আর আশঙ্কাটা অনেকখানি কেটে গেছে। ঈষিতার স্বামী নিশ্চয়ই ফিরে এসেছে ইতিমধ্যে। চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। চেম্বারে বসে চুরুট টানতে টানতে ভাবছিলো সুকোমল। চিঠির বাণ্ডিলটা টেনে নিলে। অজয়ের চিঠিখানা পড়লে। আরো খানকয়েক চিঠির ওপর চোখ বোলালে। একটা মেডিক্যাল জার্নালের পাতা ওলটালে কিছুক্ষণ। আরেকখানা চিঠি। নাম নেই। শুধু এক লাইনের চিঠি। চোখ বুলিয়েই স্তম্ভিত হয়ে গেল সুকোমল। সত্যি?

সুইসাইড? আত্মহত্যা? না কোনো অর্থপিশাচ চিকিৎসকের অপকীর্তি! কে জানে! নিজের মনেই সুকোমল বলে উঠলো, ডেড? আত্মহত্যা, না কোনো স্বল্পজ্ঞানী অস্ত্রবিদের অনাচার? মাথাটা আবার ঝিমঝিম করে উঠলো সুকোমলের। একদিন তো ঈষিতাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিলো সে, এইটুকু উপকার করলে কিই-বা ক্ষতি হতো?

না। ন্যায়, নীতি, ধর্ম। সমাজ, সংসার, আইন। না।

চুরুটটা ট্রের ওপর নামিয়ে রেখে ধীরে ধীরে অন্দরমহলের দিকে পা বাড়ালে। চারিদিক অন্ধকার। আলো জ্বলেনি কেন এখনো?

আস্তে আস্তে অজয়ের চিঠিখানা হাতে নিয়ে শয্যাঘরে ঢুকলো সে। সুইচ টিপে আলো জ্বাললে।

—এ কি, অন্ধকার ঘরে বসে রয়েছো কেন?

কথা বলার পরক্ষণেই লক্ষ করলে কালো ছায়া পড়েছে সুষমার মুখে। গম্ভীর মুখে তার কিসের ছাপ? লজ্জা, ক্রোধ, বিস্ময়, ভীতি। থরথর করে কাঁপছে সুষমা, সুকোমল দেখতে পেলো।

আর। আর নত লজ্জিত মুখে নির্বাক বসে রয়েছে সুশীলা। সুকোমলের কথা শুনেও মুখ তুললো না সে।

—ওগো! ডুকরে কেঁদে বিছানায় লুটিয়ে পড়লো সুষমা।

সুশীলা ধীরে ধীরে তেমনি মাথা হেঁট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

—কি, কি হয়েছে কি?

কথার জবাব দেয় না সুষমা। সশব্দ কান্না বাতাস কাঁপিয়ে ফেটে পড়ে।

—ওগো! আবার কেঁদে ডুকরে ওঠে সুষমা।

অনেকক্ষণ। অনেকক্ষণ পরে উঠে বসে সে।

সুকোমল চোখ চেয়ে দেখে, অশ্রুতে ধুয়ে গেছে তার দু গাল। কান্না বাঁধ মানছে না তার। কান্নার গলায় কথা বলার চেষ্টা করে সুষমা।—আমি, আমি মুখ দেখাবো কি করে?

—কি হয়েছে বলো না।

—সুশী, সুশী, নিজের মুখ পুড়িয়েছে, আমাদেরও পোড়ালে।

—কেন, কি হয়েছে?

—এ কলঙ্ক আমি কেমন করে বইবো গো? এর চেয়ে মরলো না কেন, মরলো না কেন ও? গলায় দড়ি দিলো না কেন?

সুকোমল চুপ করে থাকে।

—আমি বাঁচবো না, এত লজ্জা নিয়ে আমি বাঁচতে পারবো না। মুখপুড়ীকে তখুনি বলেছিলাম সাবধান হতে।

সুকোমলের বুকের ওপর একটা ভারী বোঝা যেন নেমে আসছে।

—যেখানে-সেখানে বসে আর ঘুমিয়ে পড়ে, তখুনি বুঝেছিলাম আমি।

সুকোমল এগিয়ে আসে। সান্ত্বনা দেবার জন্যে হাতটা নিয়ে গেল কিন্তু সেটা আর সুষমার পিঠে রাখতে পারলো না।

সুষমার কান্না থামে না। ডুকরে কেঁদে ওঠে ও।

অনেকক্ষণ। অনেকক্ষণ কেটে যায়।

আস্তে আস্তে সুকোমল হাতটা সুষমার পিঠে রাখে। আদরের ভঙ্গিতে বলে, ওঠো। কাঁদে না। ওঠো।

তারপর। তারপর নিশ্চুপ কাটে কিছুক্ষণ।

হঠাৎ সুকোমল বলে, ভয় কি সুষমা, আমি তো রয়েছি।

বলেই চঞ্চল পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে সুকোমল। বাইরের ঠাণ্ডা আকাশ, বাইরে চমৎকার চাঁদ।

ন্যায়, নীতি, ধর্ম? আইন, সমাজ, সংসার?

ধ্যুৎ।

। ১৩৫৩



বাবুই

ওপোর্টোর সঙ্গে এক সূত্রে বাঁধা পোর্ট গোয়া।

এদিকে কাম-বে, ওদিকে মান্নার উপসাগর। উত্তরে কঙ্কণ আর দক্ষিণের মালাবার কোস্ট লাইন এসে মিশেছে এখানে। পশ্চিমের ঢেউ এসে পড়ে জাহাজঘাটায়, সিগন্যাল টাওয়ারের সার্চলাইটের জোছনায় এক হয়ে মিশে যায় আরব সমুদ্রের ফেনিল শুভ্রতা।

মর্মুগাঁওয়ের এই বন্দরে এসে নোঙর ফেলতে হলো অক্ষয়কে।

বনের মধ্যে শিকারী আর গ্রামের বুকে বনচর—উভয়েরই দুঃসাহসের তুলনা নেই। স্বদেশ থেকে সুদূরে এসে ভিন্-সমাজে আর ভিন্-রুচি গোয়ানিজদের মধ্যে যেদিন বাসা বাঁধলে অক্ষয়, সেদিন ওর মনের চারপাশেও ঘিরে ছিলো এমনি এক দুর্জয় নির্ভয়তার বর্ম।

শিশুবোধ ভূগোল আর মানচিত্রের দৌলতে ভারতের পশ্চিমঘাট পর্বতমালা নামে যে দীর্ঘ ঋজু রেখাটির সঙ্গে পরিচয় ছিলো অত্যন্ত ক্ষীণ, যার সম্বন্ধে তার ধারণা ছিলো অস্পষ্ট, তারই মাঝে সাগরচুম্বী বন্দরের কন্দরে এসে হাজির হলো সে। উপার্জনের আশায় বাঁধলে সান্ত্বনার নীড়। আত্মীয় আর বন্ধুর অভাব বোধ করলে না। শান্তি আর স্বস্তি তো মিলেছে! মিলেছে দু শো টাকা মাইনের নিশ্চয়তা। কোলকাতার মাটি কামড়ে পড়ে থাকলেও যা তার বরাতে জুটতো না কোনো দিন।

—ঢের ভালো। কপালে খয়েরের টিপ আঁকতে আঁকতে নীলিমা বললে, কোলকাতার এঁদো গলির চেয়ে এ ঢের ভালো।

বেণীর বাঁধন থেকে চুলগুলোকে মুক্তি দিয়ে মাথায় চিরুনি টানতে টানতে অণি বললে, ভালো না আরো কিছু। যাই বল্, এর চেয়ে তোর শ্বশুরবাড়ির বাসুন্দি গাঁ অনেক ভালো লাগে আমার।

শিবু মন্তব্য করে, মাসীমার শুধু বাসুন্দি আর বাসুন্দি। আমার কিন্তু সমুদ্দুর দেখতে—

—ছ নম্বরের কোয়ার্টার শুধু চারজন পেয়েছে, তার মধ্যে আমি একজন। আত্মগর্বের উচ্ছ্বাস অক্ষয়ের কথায়।

এবং কথাটাও মিথ্যে নয়। পোর্ট ব্যারাকের ওপাশে বাবু-লাইনের এক প্রান্তে মাঝারি সাইজের একটি ছোট বাংলো পেয়েছে অক্ষয়। কাঠের জাফরি দিয়ে ঘিরেছে সামনের ছোট বারান্দাটা, বাঁশের বাতা দিয়ে বাগান। পড়শীর মুর্গি এসে না জ্বালাতন করে, পুঁইশাকের

কাঁচ ডগায় না শুয়োরে মুখ দেয়।

সেখান থেকেই দেখা যায় গোয়ার একমাত্র রেলপথ—বন্দর থেকে মরগাঁও হয়ে চলে গেছে বেলগাঁওয়ের দিকে।

পরিচ্ছন্ন পাড়াটাকে নোংরা করেছে পোর্টের কুলি আর রেলের পোর্টাররা। একটু যদি চেষ্টা করে, একটু চোখ রাখে তো ঝকঝকে হয়ে উঠবে। সারি বেঁধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লাল কাঁকরের রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে একই টাইপের কোয়ার্টার। ইঁটের উলঙ্গ দেয়াল, পয়েণ্টিং-এর নির্ভুল ছক আর টালির ছাদ। পথের দু'পাশে কণ্টকীলতার ঘন-নিবিষ্ট রেখা এক জোড়া, দূর-দিগন্তে মিশে গেছে। সমান্তরাল রেল লাইনটার মতো। মসীলিপ্ত জামিয়ারের মতো শুধু এখানে ওখানে জমা হয় জঞ্জাল। কপির পাতা, পেঁয়াজের খোসা, মাছের আঁশ। গৃহবরাহের উৎপাতে ছত্রাকার হতে সময় লাগে না।

অণি মাঝে মাঝে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। বলে, ভদ্রলোক এ পাড়ায় থাকতে পারে না।

অক্ষয় পরমাত্মীয়ার প্রতি কটাক্ষ করে বলে, পাশের বাড়িতে একটি সুদর্শন চেহারার বাঙালী ভদ্রলোক থাকলে অণিমা দেবীর চোখে এইটেই হতো ভদ্রপাড়া, নয় কি?

কপট বিতৃষ্ণায় ঠোঁট ওলটায় অণি।—মাগো!......বাঙালীই হোক আর কাঙালীই হোক, এখানে যে বাস করে, তাকে আমি বিয়ে করতে পারবো না।

নীলিমা মৃদু হেসে বলে—যাই বলিস্, বাসাটা মন্দ নয়, একটু সাজিয়ে গুছিয়ে নিলেই হবে।

অতএব, ঘর সাজানোর চেষ্টা চলে।

কাগজকলম নিয়ে হিসেব কষে অক্ষয়। দুখানা ডবল-বেড পালঙ্ক—মেহগনি কাঠ, এখানে জলের দরে পাওয়া যায়। গোটা কয়েক কেদারা, অণিমার জন্যে একটা বুক-কেস আর শিবুর পড়ার টেবিল।

টাকার অঙ্কটা ফেঁপে ওঠে। যাক্, এখনকার মতো শাল-সেগুনের পুরনো আসবাবেই চলবে। একটু দেখেশুনে সাজিয়ে নিলেই হবে।

কোমরে আঁচল জড়িয়ে অণি আর নীলা দুজনে দাঁড়ায় দু কোণে। হাত দুখানা পিছনে রেখে তন্নতন্ন করে দেখে ঘরের প্রতিটি সামগ্রী, সৌন্দর্যের অপঘাত হয়েছে কিনা কোথাও!

না। বাইরের দিকের জানালাটায় রঙিন পর্দা দেওয়া চলবে না। বাড়িতে মেয়েছেলে আছে বোঝা যাবে। সাদা পর্দাই ওখানে থাকবে। দু বোন চোখাচোখি করে হাসে।

না। তেপায়াটার ওপর ফুলদানিটা রাখা চলবে না, পেয়ালা-পিরিচের জায়গা থাকে না। অক্ষয়ও সায় দেয়।

আপিস থেকে ফিরে অক্ষয় দেখে জানালায় এসেছে গোলাপী পর্দা, টিপয়ে ফুলদানি।

বলে, তোমাদের কি রোজ এগুলো অদল-বদল করতে ভালো লাগে?

নীলিমা হেসে বলে, সময় কাটাতে হবে তো।

সময় আপনি কেটে চলে। দিনের পর দিন। সংসারের কাজ আর স্বপ্ন-সৃজনের মধ্যে দিয়ে ওদের দিনগুলো কেটে যায়। মিশনারী ইস্কুলে ভরতি হয়েছে শিবু, তাকে ইস্কুলে পাঠিয়ে দিয়ে পায় অফুরন্ত বিশ্রাম। মাদ্রাজী পরিবারের সঙ্গে গল্পগুঞ্জনে করে অবসন্ন অবসর যাপন। সরস্বতী আর মাদুরামী দেশ আর দেহাতের কথা কয়ে নির্জন দুপুরকে করে আনে ছোট। গোয়ানিজ মেয়েরাও আসে। লিজা, মারিয়া, আনা বৈকালিক ভ্রমণের সময়, পেরাম্বুলেটর ঠেলতে ঠেলতে যাবার সময় শুভ সংবাদ দিয়ে যায়, নিয়ে যায়।

বিদেশে এসে সকল সংকীর্ণতা ভুলে গেছে নীলিমা। তামিলতনয়া আর ক্রিশ্চান গোয়াবাসিনী উভয়ের কেউই অস্পৃশ্য নয় আর। নিজেকে এতদিনে সুখী বোধ করছে নীলিমা। বর্তমানের বৈশিষ্ট্য আর ভবিষ্যতের ভরসা ওর চোখে। দৃষ্টির দূরত্বে রঙিন রামধনুকের বর্ণাভা। একটি ছোট শিশু—সবল আর সুস্থ। ক্রোড়ত্যাগী শিবুর পরিবর্তে আরেকটি সন্তানের কামনা উঁকি মারে নীলিমার মনে। জানালার পর্দা সরিয়ে নিঃসীম আকাশের কোলে শঙ্খচিলের চঙ্ক্রমণ দেখে সে। চিন্তার চোখে উদাস তৃপ্তি।

অণিমাও সুখসুপ্ত। স্বপ্ননীল খুশি-খেয়ালের মধ্যে ওরও দিন কাটে। শ্রমশ্রান্ত কমনীয়তা আঁকে লুপ্তলাবণ্যের রেখা, ওর বাঁকা ভুরুর প্রান্তে। ক্রমশ যেন সজীব হয়ে

ওঠে। শুধু হঠাৎ হয়তো কোনো দিন হাতের উল আর কাঁটা থেমে মন ছুটে যায় অনেক দূরে, মুক্ত বাতায়ন ফেলে ছুটে যায় অনেক পিছনে। ব্যথানম্র স্মৃতির নিপীড়নে হয়তো বা কখনো সজল হয়ে আসে চোখ। দূর-শহর কোলকাতার একটি অন্ধ গলির ভেতর ওর ব্যর্থ বেদনা গুমরে মরে।

তিনটি বছর ধরে ওরা পরস্পর চোখের ভাষায় অনেক অনেক দিনান্ত আর দ্বিপ্রহর কাটিয়ে এসেছে নির্বাক আলাপে। ঘনিষ্ঠতর পরিচয় ইঙ্গিতে আর অনুভবে। দীর্ঘ তিনটি বছরের ফাঁকে একটি মুহূর্তেও পায়নি নিকটবিশ্রম্ভের দুঃসাহস। স্বল্পধারা স্রোতের মতো তা মাঝপথেই শুকিয়ে গেছে। কিন্তু বাতাসে এখনো তার স্মৃতিটুকু বাষ্প হয়ে দুলতে থাকে, ক্ষণে ক্ষণে বুকফাটা বৈরাগ্যের সূর্যালোকে আকাশে দেখা দেয় রঙ-ঝলমল অভিরাগের মরীচিকা।

অক্ষয় সত্যিকারের পুরুষ। বর্তমানকে ও জেনেছে সত্য বলে, ভবিষ্যৎ ওর কাছে প্রয়োজনীয়। অতীতকে তাই অক্ষয় ছেঁটে ফেলতে পেরেছে। বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে ওর আশি টাকা মাইনের আহত গৌরব। সাফল্যের ফসল তাই নতুন মানুষ করে গড়ে তুলছে ওকে। তবু কখনো-সখনো হয়তো বাসুন্দি গ্রামের নির্জন নদীর তটে আপন পদধ্বনি শুনতে পায়, শৃঙ্গারনটীর দূর নূপুরনিক্কণের মতো বেজে ওঠে কর্ণবতীর তরঙ্গোচ্ছ্বাসের চূর্ণ শব্দ। গ্রন্থি বেঁধে বেঁধে পিছনের ইতিহাস খুঁজে বের করার সময় পায় না।

নতুন বন্ধুর আগমন ঘটে।

কোলাস। গোয়ার বন্দর আপিসে ওরা সহকর্মী। অক্ষয় আর কোলাস। অটলায়তন দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, সামর্থ্যের প্রকাশ প্রতিটি অঙ্গে। গলায় লাল রেশমের স্কার্ফ। গোলাপী কামিজের আস্তিন গোটানো থাকে সর্বদা। জাতে গোয়ানিজ, আচারে মাদ্রাজী, মণিবন্ধে কালো ফিতেয় বাঁধা একটা রুপোর ক্রস—কিন্তু কথায়-বার্তায় ওর ইসলামের প্রভাব। গোয়া আর কারওয়ার সীমান্তের কাছে কাঙ্কলিম আর লোলিয়েমের মাঝামাঝি জায়গায় তার বাড়ি, একটা পাকা রাস্তাও নেই গোয়া আসবার। সাঙ্গুয়েমের লোকদের মতো ডিঙি ভাসিয়েও আসতে পারে না।

তাই বোধ হয় লোকটার মন সাদা, মেজাজ মিশুকে। বলে, আমার বায়েলের সঙ্গে তোমার বাড়ির মেয়েদের আলাপ করিয়ে দাও।

—একদিন নিয়ে এলেই তো পারো তাকে।

—আচ্ছা, আনবো একদিন। তোমার সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দেবো। দেখবে, তোমাদের বাংলাদেশেও এমন চমৎকার মেয়ে হয় না।

অক্ষয় হেসে বলে, রোজই তো বলো নিয়ে আসবে, নিয়ে এলেই তো পারো।

কোলাস কৌতুকের হাসি হেসে বলে, আসতে চায় না। নতুন কোথাও আসতে ইজ্জতে বাধে ওর। কিন্তু যাই বলো, এমন চমৎকার ব্যবহার, এমন সুন্দর চেহারা মেয়েদের বড় একটা থাকে না।

—তা, আপিসের কি খবর বলো।

বিবি থেকে বন্দরে নিয়ে আসতে চায় অক্ষয়। লোকটা বউ বলতে অজ্ঞান। শুরু করলে আর শেষ করতে চায় না।

অক্ষয়ের কথা শুনেই বললে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, কালের সঙ্গে দেখা হলো, বললে—

—কালে কে?

হো-হো করে হেসে উঠলো কোলাস।—কালেকে চেনো না? লীডার আমাদের, এখানকার পোর্টের বড় অফিসার, আর সেই সঙ্গে লেবার ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট। চলো, চলো, এখনি আলাপ করিয়ে দেবো। অক্ষয়ের হাত ধরে টেনে তুললে সে।

অনন্যোপায় হয়ে কোলাসের সঙ্গে বেরুতে হলো অক্ষয়কে। লোকটার এই এক দোষ, রয়ে-বসে কাজ করতে জানে না।

বাঁশের ফটকটা বন্ধ করে দিয়ে অক্ষয় জিজ্ঞেস করলে, কালে কি বললে বলছিলে?

—ও হ্যাঁ, ধর্মঘট হতে পারে।

—কেন?

—খোদা জানে।

জানে সে সবই, কিন্তু এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চায় না। হাজার হোক, নতুন লোক অক্ষয়। কখন কোন্ দিকে চলবে বলা যায় না। গত স্ট্রাইকের পর জয়েন করেছে। ওর মধ্যে ইস্পাত আছে কি না, সে পরীক্ষা তো হয়নি এখনো!

অক্ষয় বললে, চলো বরং একটু ঘুরে আসি। আরো দু-পাঁচজনের সঙ্গে আলাপ করে আসি।

—সে কি! এতদিন হয়ে গেল এখনো আলাপ হয় নি?

—না। তোমাদের ভাষাটাই যে এখনো রপ্ত করতে পারিনি ভালো করে।

—কালে, মুর্তি—এরা তো সব হিন্দুস্থানীতে কথা বলে, আর তা ছাড়া আমার মতো হিন্দীও অনেকেই জানে।

—বেশ তো। চলো কালেসাহেবের সঙ্গেই আলাপ করে আসি আজ।

—চলো।

দুজনে বেরিয়ে পড়লো। হাঁটতে শুরু করল্লো লাল কাঁকরের সড়ক ধরে।

পর্তুগীজদের এই ছোট্ট উপনিবেশটির মাঝে আরও ছোট এই পোর্ট কলোনী। গুডস্ ট্রেনের মতো লম্বা একটানা বাড়ির সারি দু'পাশে। প্রত্যেকটি কোয়ার্টারের সামনে হাত কয়েকের ছোট বাগিচা। উদ্যান নয়, কীচেন গার্ডেন। ধনে, শুষনি, পুঁই। রাঙা আলু আর পেঁয়াজের কলি। সব বাড়িতেই দু-চারটে বে-আইনী তামাকের গাছ। কাঁচা তামাক চিবিয়ে খাওয়ার রেওয়াজ এদিকে।

অক্ষয় প্রশ্ন করে, এত তামাক খাও কেন বলো তো তোমরা?

কোলাস সশব্দে হেসে ওঠে,—দোস্ত, একটা কথা মনে রাখবে। আজও বন্দরে যাদের ঝাণ্ডা উড়ছে. তিন শো বছর আগে তারাই প্রথম আমাদের দেশকে তামাক খেতে শিখিয়েছিলো।

অক্ষয় হেসে বলে, গর্ব করার কিছু নেই, তারা আবার শিখে এসেছিলো রেড ইণ্ডিয়ানদের কাছ থেকে।

ইতিমধ্যে কালের কোয়ার্টারের সামনে পেঁাছে গেছে ওরা। ডাক শুনেই হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলো কালে। অক্ষয়কে লক্ষ না করেই বলতে শুরু করলে, দেখে নিও, এবার দেখে নিও, তোমাদের ঐ ডা এলভাসের ভুঁড়ি না ফাটিয়ে ছাড়বো না।

কপালে রক্তচন্দনের তিলক, কানে মাকড়ি, দেহে বিদেশী পরিচ্ছদ। ঢিলে ট্রাউজারটা টেনে কোমরে তোলবার বৃথা চেষ্টা করতে করতে কালে বললে, ইণ্ডিয়া ফ্রি হয়ে গেল, আর গোয়া থাকবে পর্তুগীজদের অধীনে? আজ পোর্ট বিল্ডিংসে ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ ওড়াবো আমরা। গোয়ার পিপল ক্ষেপে গেছে, অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের আপিস চড়াও করবে তারা।

অক্ষয় হেসে বললে, দেখে তো মনে হচ্ছে পিপলের চেয়ে আপনিই ক্ষেপেছেন বেশী।

অপরিচিত স্বর শুনে চমকে উঠলো কালে। জিজ্ঞাসু চোখে তাকালে কোলাসের দিকে।

—ইনি মিস্টার এ কে বোস। বাঙালী। পোর্টের হাওয়া অপিসের ছোটবাবু। কোলাস পরিচয় দিলে।

—বেংগল? বেংগলের লোক আপনি? প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকালে কালে। বললে, বাঙালীদের আমি পুজো করি মনে মনে। এমন মানুষ হয় না, এমন আরেকটা প্রভিন্স নেই সারা ইণ্ডিয়ায়।

অক্ষয় বলে, বড় বেশী প্রশংসা করছেন আপনি।

—মোটেই না। কালে উত্তর দিলে—দে মেক্ দি গ্রেটেস্ট পেট্রিয়টস অ্যাণ্ড দি ওয়র্স্ট্ ট্রেটরস। দু দিকেই আপনারা চরম। যাক্। কদ্দিন এসেছেন এখানে? এতদিন দেখিনি তো।

—ছিলাম ইসাবেলা রোডের একটা মেসে। সম্প্রতি বাসা পেয়েছি এ-পাড়ায়, ফ্যামিলি নিয়ে এসেছি।

—বেশ করেছেন। আসুন. বসবেন আসুন।

হাত ধরে অক্ষয়কে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেল কালে।

বললে, মাঠ্যা খাবেন, মাঠ্যা? আমার নিজের গরু আছে, বাড়িতে বানাই।

শীত পড়ার আগেই সোয়েটারটা শেষ করে ফেলতে হবে। কিন্তু কিছুতেই যেন কাজে মন লাগে না অণিমার। জানালার পর্দা সরিয়ে আনমনা তাকিয়ে থাকে। ডেকচেয়ারে হেলান দিয়ে ঝকঝকে মুক্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ বড় ব্যর্থ আর অসহায় মনে হয় নিজেকে। হাত দুটোয় যেন কোনো শক্তি নেই।

অতীত জীবনের দিনগুলি ছায়াছবির মতো ভেসে যায়। বাঙালীর ঘরের বাপ-মা-হারা মেয়ে হয়েও তৃপ্তির আশ্রয় পেয়েছিলো অণিমা। দিদির সযত্ন স্নেহে মানুষ হতে পেয়েছে সে। আর—। শহর কোলকাতার সেই অন্ধ গলির অন্ধকারে এক টুকরো ভাঙা চাঁদের আলো।

শূন্যতার শোকেই বোধ হয় সাহস জুটেছিলো সুরজিতের বুকে। বিচ্ছেদের শেষ সায়াহ্নে সেই খুচরো আলাপ। প্রথম প্রহসন। বিদায়পূর্বের শেষ সাক্ষাৎ।

অণিমা গিয়েছিলো সুরজিতের মা আর বোনের সঙ্গে দেখা করে আসতে। সিঁড়ির পথে হলো কথালাপ।

মুহূর্ত কয়েক নিশ্চুপ দুজন দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

তারপর, সুরজিতের প্রশ্নের রেশ রোমাঞ্চ জাগালো তার মনে।

—ভুলে যাবে না তো?

উত্তর দিতে পারেনি অণিমা। শুধু, লজ্জাতুর আনত দৃষ্টি প্রকাশ করেছিলো তার অন্তরের কথা। না। হোক না নির্বাক, হোক না স্পর্শবিহীন, তবু এই দীর্ঘ দিনের চোখের পরিচয়ই কি তুচ্ছ! না, ভুলতে সে পারবে না। ভুলবে না কোনো দিন।

কিন্তু।

দীর্ঘ তিনটি বছর যদি স্তব্ধতার মধ্যেই কেটে গেল, কি প্রয়োজন ছিলো শেষ দিনের ঐ ছোট কথার দাঁড় টেনে স্নিগ্ধ স্রোতের বুকে উন্মাদনার তরঙ্গ তোলার? স্তব্ধ বাতাসকে কেন মুখর করে তোলা?

নির্মেঘ আকাশের দিকে তাকিয়ে অতীত রোমন্থন করতে থাকে অণিমা। হঠাৎ কখন অজান্তে একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দে নিজেই চমকে ওঠে।

হাতের কাজে মন দেয় আবার।

—ডা এলভাস লোকটার ওপর এরা এত চটা কেন বলো তো?

নীলিমা আর অণি দুজনেই ফিরে তাকায় অক্ষয়ের কথায়। ডিটেকটিভ বইটার ভেতর আঙুল গুঁজে রেখে অক্ষয় একটু চিন্তিতভাবেই বলে, লোকটাকে আমার তো বেশ ভালোই লাগে!

নীলিমা কৌতুকের হাসি হেসে বলে, তা আর লাগবে না! স্টেশন থেকে নিজে গাড়ি করে নিয়ে আসে, দু-দুবার নেমন্তন্ন করে রূপসী মেয়ের হাতে কোকো খাওয়ায়, সে লোককে ভালো লাগবে না?

অণিমা ও-কোণ থেকে ফোড়ন কাটে, দেখিস দিদি, কপালে শেষকালে না ঐ খ্রীষ্টান সতীন জোটে।

ওদের এ নিরর্থক রসিকতা কিন্তু অক্ষয়ের সহ্য হয় না। না, কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যেই কি এলভাসকে পছন্দ হয় তার? তা নয়। শান্তি চায় অক্ষয়, স্বস্তি চায়। তার যাযাবরের জীবনে ডেরা মিলেছে। কোন্ ছোট বয়সে গ্রাম ছেড়েছে অক্ষয়। তারপর, ক্রমাগত চলেছে ঘর-ভাঙা আর ঘর-গড়ার কাজ। দু দণ্ড নিশ্চিন্ত বিশ্রামের সময় পায়নি। ঘানির বলদের মতো গলার ঘণ্টি থামার সঙ্গে সঙ্গে আঘাত এসেছে, চলতে হয়েছে তাকে নতুন করে। ক্লান্ত পথচারীর মতো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে চলেছে, শুধু মাঝে মাঝে দেখেছে ক্ষণিকের পান্থশালা।

বিশ্রাম চায় অক্ষয়। চায় সকল বিঘ্ন আর ব্যাঘাত থেকে দূরে সরে থাকতে।

প্রথম দিকের একটা দিনের কথা মনে পড়ে যায়।

মিটিরিওলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের টেবিলে মাথা রেখে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে বসে ছিলো অক্ষয়। ভাবছিলো, ভাবছিলো অনেক কিছু। ঘরের কথা, দূর জন্মভূমির কথা। নীলিমা, শিবু, মা আর পিসীমা। আর অণি। ইসাবেলা রোডের ক্লেদাক্ত ঘরের বিজন মনের বাসনা, না-নিদ নিশীথের একাকিত্বের অভিশাপ।

মচমচ করে জুতোর শব্দ এলো ওর কানে।

মাথা তুললে না। হয়তো অ্যাসিস্ট্যান্ট, হয়তো আর কেউ।

ওর পিছনে কে যেন দাঁড়িয়েছে। অপেক্ষা করছে। পরক্ষণেই, হঠাৎ অনুভব করলে ওর পিঠের ওপর একখানা সহানুভূতির কোমল স্পর্শ।

ফিরে তাকালো অক্ষয়। ডা এলভাস! ডা এলভাস স্বয়ং। সসম্মানে উঠে দাঁড়াতে গেল ও।

—বোসো তুমি, বোসো।

ডা এলভাস পাশের টুলটা টেনে নিয়ে বললো, কি ভাবছিলে এত?

অক্ষয় জবাব দিতে পারলে না।

ডা এলভাস মৃদু হেসে বললে, তুমি না পুরুষমানুষ? ইয়ং ম্যান তুমি, এ ডন্।

অক্ষয় চুপ করে রইলো। মাথা হেঁট করে। যেন তথাগতের বাণী শুনছে কোনো বৌদ্ধ ভিক্ষু।

ডা এলভাস আবার বললে, আমার দিকে তাকিয়ে দেখো।......আমার মেয়ের নাম রেখেছি টেগাস, কেন জানো? পর্টুগালে টেগাস নদীর ধারে আমার বাড়ি, সেখানেই ওর জন্ম। এখনো আমার মা বাবা স্ত্রী এবং অন্যান্য ছেলেমেয়েরা পড়ে আছে সেখানে। সব ছেড়ে এতগুলো সমুদ্র পার হয়ে এসেছি।

ডা এলভাসের কথায় যেন একটা আন্তরিকতার করুণ সুর বেজে উঠলো। চমকে চোখ তুলে তাকালে অক্ষয়। বন্দরপতির সুগঠিত দীর্ঘ দেহের দৃঢ়তা আর কাঠিন্য ছাপিয়ে আর-একটা দিকে নিজেকে প্রকাশ করার জন্যে হয়তো বা ব্যগ্র। ডা এলভাসের সতর্ক দৃষ্টিতে ধরা পড়লো অক্ষয়ের বিস্মিত মনের জিজ্ঞাসা।

নিজেকে সামলে নিয়ে ডা এলভাস বললে, ভুলে যেও না, তুমি একজন ডন্। মনের চেয়ে মান বড় তোমার কাছে।

সেদিনের সেই ঘটনাটি বড় বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আজ অক্ষয়ের চোখে। দূরস্মৃতির দুঃসহ শোক ছাড়াও আরও কি যেন ছিলো ডা এলভাসের কথায়।

কিন্তু।

কালের কথাগুলিও বড় বেশী তীব্র।—সারা ইন্ডিয়া ফ্রি হয়ে গেল, আর আমাদের গোয়া থাকবে পর্তুগীজদের অধীনে? হৃদয়াবেগের হাওয়াই নয়, যুক্তির জাঁকও কম নেই কালের খেদোক্তিতে।

বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে কালিকটরাজ সমরিনের ভুল। দীর্ঘ চার শো বছর আগে কালিকটের অক্ষমতায় ভিত গেড়েছিলো লিসবনের লোলুপতা। রাঙা প্রবাল আর রক্তবস্ত্রের লোভে হাত বাড়িয়েছিলো ভারতবর্ষ, বিদেশী দস্যু লবঙ্গ আর মরিচ, দারুচিনি আর এলাচের সঙ্গে সঙ্গে চাইলে সাম্রাজ্যের অধিকার। তারপর? তারপর শতবর্ষের ইতিহাস নতুন ধারায় গড়ে উঠলো, জম্বুদ্বীপের কঙ্কাল বেয়ে আনাগোনা করলো হাজারো বিদেশী, রুধিরপায়ী কীটের দল। গোয়ার গরিমায় তৃপ্ত হলো লিসবনের লালসা।

তাই কোচিনের কবর স্মরণ করে গির্জার প্রাঙ্গণে ফুলের তোড়া জমা হয় আজও। বিশে মে তারিখে মর্মুগাঁওয়ের বন্দরে ওড়ে পর্টুগালের ঝান্ডা। পর্তুকেজাকো বাঁওটো। হয়তো ওপোর্টোর সমুদ্রসৈকতেও।

মন ভালো নেই আজ অক্ষয়ের। অত্যন্ত বিচলিত বোধ করছে। বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছে বিভিন্ন চিন্তায়। ভোরের দিকে ঘুমের ফাঁকে দেখেছে বিশ্রী এক স্বপ্ন।

জাফরির দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলো অক্ষয়। সুঠাম-দেহ একটি গোয়ানিজ ফুলওয়ালী চলেছে ফুল ফেরি করে, এই ভোর সকালে। কেয়াফুলের সুরভিচ্ছটায় মনটা খুশী হয়ে উঠলো।

ডাকলে ফুলওয়ালীকে। প্রীতিনম্র চোখে এগিয়ে এলো সে। স্পষ্ট করে তাকিয়ে দেখলো অক্ষয়। সক্ষম দেহলতার প্রতিটি অঙ্গে পুষ্টতার চিহ্ন। মোমের পুতুলের মতো মসৃণ

মাধুর্য। পিঠের ওপর এক ঝাঁক নরম চুলের রাশ। অনাবৃত কাঁধ আর অসমতল বক্ষে চিকচিক করছে লাল পুঁতির মটরমালা। লাল রেশমের রক্তবস্ত্রের আবরণ উন্নত পয়োধরে। নিম্নাঙ্গে নানা বর্ণের ফুল আর পাখি আর লতাপাতা আঁকা পীতাভ নিচোল। সমুদ্রের মতো নীল চোখে, প্রভাত-উচ্ছ্বাসী ঝিনুকের মতো মুখে ঝকঝকে কৌতুকের হাসি।

দূরের পাহাড় থেকে উঠছে ভোরের সূর্য। বৃহৎ সূর্যের পীতচক্রের পটভূমিতে গোয়ানিজ ফুলওয়ালীটিকে মনে হলো হঠাৎ যেন উঠে এসেছে অন্ধকার ভেদ করে, কোনো-এক অজানা দেশের অপ্সরী।

এক ঝাঁক রজনীগন্ধা আর দু গোছা কেয়াফুল কিনলো অক্ষয়। নীলিমা আর অণির কেশবিলাসের জন্যে।

সুপটু নটীর মতো হেসে হেসে তালে তালে পা ফেলে চলে গেল মেয়েটি।

বাঁধভাঙা স্রোতের নির্ঝরনিক্কণ ভেসে এলো বাতাসের পুষ্পসৌরভে—ফুল চাই, ফুল!

মনটা খুশিতে ভরে গেল।

ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে এলো অক্ষয়। রাস্তার মাঝে।

পাহাড়ের পিঠে পাহাড়। শৃঙ্গশীর্ষে স্বচ্ছ কুয়াশার ওড়না, ঘন বনের শ্যামলিমা ভেদ করে আলোর চমক। নাতিপ্রস্থ একটি পাহাড়ী রাস্তা এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে দূরের দিগন্তে, দিক্‌চক্রবালের অন্তরে মিশে গেছে। এখানে-ওখানে পাহাড়ের গায়ে গায়ে ছড়িয়ে আছে কয়েকটি বাড়ি। লাল মাটির উপত্যকায় সবুজ ফসল। এদিকে ভাটিয়ালী সঙ্গীতের সহযোগী সঙ্গতধ্বনির মতো তালে তালে পড়ছে নিকট-সমুদ্রের তরঙ্গতীব্রতা।

পোর্ট কলোনী থেকে বেরিয়ে এসে শহরের সড়কে নামলো অক্ষয়। সী-বীচের দিকে হাঁটতে শুরু করলো। জাহাজঘাটাকে দূরে রেখে, সিগন্যাল টাওয়ারকে অনেক দূরে ফেলে।

ক্রমবর্ধিষ্ণু সাগর-গর্জনে নতুন এক উন্মাদনা জাগলো অক্ষয়ের রক্তে, নতুন বাতাসের স্বাদ পেলো।

জুতো হাতে নিয়ে বালির ওপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে জলের দিকে এগিয়ে চললো অক্ষয়।

দীর্ঘ একটা ছায়াশরীর দাঁড়িয়ে আছে তীরের কাছে। দ্রুত পায়ে সেদিকে এগিয়ে গেল অক্ষয়। হ্যাঁ, কোলাসই তো!

—কি খবর?

—ভোরের সূর্যোদয় দেখতে এসেছি।

হ্যাঁ। দেখবার মতো দৃশ্য নিঃসন্দেহে।

দুজনে পা ছড়িয়ে বসলো পাশাপাশি। নির্বাক চেয়ে রইলো। উভয়ের কারোরই মুখে কথা নেই।

বালিতটের ওপর আছড়ে পড়ছে আরবসাগরের ঢেউ। তট আর তরঙ্গের সঙ্ঘর্ষে ফুলের মতো ফেটে পড়ছে নীল সমুদ্রের ফেনিল জলরাশি। অশান্ত বাতাসে কি যেন গুমরে মরে।

মাঝে মাঝে দু-একটা ঢেউ এগিয়ে আসে। ফাটা ফেনায় পা ভিজে যায় ওদের।

—আমার নাম এন্‌তনিউ। এন্‌তনিউ আরকজু কোলাস।

অক্ষয় হেসে বলে, তা তো জানি।

—হ্যাঁ, আজ তুমি জানো আর জানে আমার বায়লান। এর পর সারা গোয়ার লোক জানবে।

—কেন, কি হলো? অক্ষয় প্রশ্ন করলে।

হঠাৎ ফিরে তাকালো কোলাস। অনুসন্ধিৎসু চোখে লক্ষ করলো অক্ষয়কে। তারপর বললে, তোমরা বাঙালীরা ভাবো, এক তোমরাই দেশ স্বাধীন করতে জানো। আমি দেখাবো, গোয়ানিজরা শুধু কুজনেরের জাত নয়, তারা রান্না ছাড়াও কাজ জানে।

বড়সাহেবের পিঠ-চাপড়ানির ভাষায় অক্ষয় বললে, নিশ্চয়। আমরাও মানুষ, তোমরাও মানুষ।

কোলাস খুশী হয়ে উঠলো। মৃদু হেসে বললে, আমার বায়লানের মতো মেয়ে তুমি পাবে না। সে কি বলে জানো?

—কি?

—বলে, দেশের জন্যে আমি যদি মারা যাই, তা হলেও সে চোখের জল ফেলবে না।

—হুঁ। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো অক্ষয়।

'সারা ইণ্ডিয়া আজ ফ্রি।'—কালের কথাটা কানে বাজলো আবার। হঠাৎ একটা অপ্রকাশ্য আনন্দের আহ্বান অনুভব করলে অক্ষয়। বুক ভরে মুক্তির নিশ্বাস নিলো।

গতশ্রম শ্রমিকের মতো দূরের জাহাজঘাটায় ঠেস দিয়ে ক্লান্তি দূর করছে এস এস শিবসমুদ্রম। সুউচ্চ নিশানা-সৌধে লিসবনের জয়তিলক। পর্তুগীজ পতাকা উড়ছে সিগন্যাল টাওয়ারের ওপর।

হঠাৎ আহত বোধ করলো অক্ষয়। সহস্র মানুষের ধৈর্য আর ত্যাগের রুধিরে কেনা স্বাধীনতার গরিমা মাটিতে মিশে গেল। অক্ষম আর নিঃসহায় মনে হলো নিজেকে। সারা ভারতের মানচিত্রখানা শতচ্ছিদ্র কুম্ভের রূপ নিলো। বাইরের অজগর-আবেষ্টনই নয়, নয় শুধু স্বজাতিসৃষ্ট অভিশাপের আশ্লেষ। অসংখ্য অন্তরের ক্ষত চোখে পড়লো অক্ষয়ের—পণ্ডিচেরী, কারিকল, ইউনান আর গোয়া, মাহী, দমন, দিউ। আরও। গঙ্গার পাড়ে চটকলের চিমনিতে ধোঁয়া কালো-কালো। লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জের মসলার বেসাতি। আসামের চা-বাগান, দাক্ষিণাত্যের কোকো আর কফির নেশা।

আর একবার ফিরে তাকালো সে।

আকাশে অস্বস্তির সূর্য। তপ্ত সূর্যকে আড়ালে রেখে হালকা হাওয়ায় দুলে দুলে উঠছে কইমা ক্যাডিজ, করোনা আর হুয়েলভার আধিপত্য।

—ধর্মঘট চালিয়ে যাবো আমরা।

দৃঢ়তার দম্ভ কোলাসের কথায়।

অক্ষয় বললে, কিন্তু শুধু শুধু পোর্ট আপিসে স্ট্রাইক চালিয়ে কি লাভ হবে?

গলার লাল স্কার্ফটা ঠিক করতে করতে কোলাস বললে, সমুদ্রের নীচে রূপোর কৌটোয় লুকোনো থাকে রাক্ষসের প্রাণ, এ গল্প শুনেছো? পর্তুগীজ ইণ্ডিয়ার প্রাণও তেমনি এই পোর্ট।

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো কোলাস।

বললে, গোয়ার পোর্ট খোঁড়া করে দাও, পর্টুগীজ ইণ্ডিয়ারও টেংরি ভেঙে যাবে।

সিটি অ্যাডমিনস্ট্রেটরের ঘরে মজলিস বসেছে। কোকোর টেবিলে নিমন্ত্রণ জুটেছে অনেকের। কালে, কোলাস, নয়লি। শাসন-সচিবের উপদেশকমণ্ডলীর নির্বাচিত কয়েকজনও এসেছে।—র‍্যামোজ, মিস লুইসা, নারায়ণা। আর অক্ষয়।

গোল টেবিলটা ঘিরে বসেছে সকলে। অ্যাডমিনস্ট্রেটরের মেয়ে আনা, আর ডা এলভাস-তনয়া টেগাস এসেছে সুবেশ সৌন্দর্য আর প্রসাধনের প্রাচুর্য নিয়ে। অনেক অনেক চেনা-অচেনা মহিলার ভিড়। লীনা, লালিতা, রোমোলা। নামের মাধুর্য যেন সবুজ বাংলার বাতাস ডেকে আনে।

কিন্তু। সেদিকে কান নেই অক্ষয়ের। মনের নেই অবকাশ। ও ভাবছে আজকের এই সম্মেলনের গুরুত্ব কতখানি। নিষ্কর্ম নীতিযুদ্ধের তৃতীয় দিন আজ। বন্দরের কেরানী আর কর্মীরাই নয়, দু শো কুলিও যোগ দিয়েছে, সাড়া দিয়েছে।

এস এস শিবসমুদ্রম্ আজও বন্দর ছেড়ে যেতে পারেনি। দরিয়ার দুরন্তপনা যেন হঠাৎ থমকে থেমে গেছে ইউনিয়নের লীডার কালের অঙ্গুলিনির্দেশে। মাল বোঝাই করবার লোক মেলেনি। লোক জোটেনি মাল নামাবার। খবর এসেছে, যাত্রিবাহী জাহাজ 'অবগৎ এলিজা' ভিড়েছে বোম্বাইয়ের কূলে। নোঙর তোলার নিষেধ পৌঁছে গেছে দক্ষিণ আফ্রিকার বন্দরে। মাঝসমুদ্রের তিনখানা জাহাজ আসবার দিন এগিয়ে আসছে। তাই। তাই বিচলিত হয়ে উঠেছে কর্তৃপক্ষ। ডা এলভাস চিন্তিত, আগাস্তিনো দুশ্চিন্তায় মগ্ন। না। তার চেয়েও বেশী উৎকণ্ঠা বাণিজ্যপতিদের। মূলচাঁদ, কাজিসাহেব, রতনলাল। চোখে ঘুম নেই এদের। এসটাডো ডা ইণ্ডিয়ার ওপর দিয়ে হাউইয়ের মতো ছুটোছুটি করছে কয়েকখানা মোটর। কোলাপুরের নম্বর-মারা।

কিন্তু এসবই আজকের এই জলুসের নীচে চাপা পড়ে গেছে। পৃথিবী ভুলে গেছে সকলে।

চারদিকের দেয়ালে রংবাহার লীনেন কাগজ। সিলিং-এর চার কোণে দুলছে নরম আর রঙীন জ্যোৎস্না। জানালার উড়ন্ত পর্দার ওপরে ছোট আকাশ। কুয়াশার মতো নিঝুম অন্ধকার ভেঙে পড়ছে সার্চলাইটের আলোয়। বাইরের বাগানে কৃত্রিম ঝর্না থেকে জল পড়ছে অবিরত, মিহি আর মিঠে অপূর্ব এক সঙ্গতের রেশ আসছে ভেসে। পেয়ালা-পিরিচের টুকরো টুকরো ভাঙা আমেজ। এদিকে কোকোর কাপে বাষ্পায়িত কুণ্ডলী আনছে নেশার আমেজ। তন্দ্রাতুর তারুণ্য। রাঙা আপেলের টুকরো, আর আঙুরের মতো কোমল হাতে দ্রাক্ষা বিতরণ করছে ডোনা টেগাস আর ডোনা আনা। পেস্ট্রির পাত্র ঘুরিয়ে নিয়ে যায়।

নেশার ঘোর কেটে গেল মুহূর্তে। গোয়ার বন্দরকে যেন ভুলে গেছে সকলে। বার্সি-লোনার দ্রাক্ষা-উৎসবের উল্লাস, না, লিসবনের ললিতলাস্যের লহরী?

—গোয়া, পোর্ট গোয়া।

অগাস্তিনোর গম্ভীর কণ্ঠনির্ঘোষে চমকে উঠলো সকলে।

গোয়ার অ্যাডমিনস্ট্রেটর অগাস্তিনো ফ্রানসিসকো র‍্যামোজ। জ্ঞানবৃদ্ধের নির্বাক দৃষ্টিতে এতক্ষণ লক্ষ্য রেখেছিলেন অতিথিদের দিকে। এবার বাঙ্ময় হতে হলো। পুরাতন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করে বললেন, কত দীর্ঘ একটা ইতিহাস রয়েছে বন্দরের পিছনে, কত বড় একটা ট্র্যাডিশন। সাড়ে চার শো বছর আগে ভারতবর্ষের মাটিতে পা ফেলেছিলেন একজন বিদেশী বন্ধু। ভাস্কো ডা গামা। বিশে মে তারিখে তাই আজও তাঁর প্রথম পদার্পণের দিনটিকে উজ্জ্বল করে রাখবার জন্যই পোর্টে প্রাসাদে তোলা হয় পতাকা—গোয়ার মানুষকে অপমান করবার জন্য নয়।

অক্ষয় ঠিক করে এসেছিলো শেষ অবধি ও চুপ করে থাকবে। গোয়ানিজ আর পর্তুগীজদের বিরোধের মাঝে ও তৃতীয় পক্ষ। নিরপেক্ষ। এই ধারণা নিয়েই এসেছিলো অক্ষয়। তবু, কোথায় যেন একটা যোগসূত্র আবিষ্কার করলো, নিজেকে মিশিয়ে ফেললো ওদের সঙ্গে।

তাই অগাস্তিনোকে বাধা দিয়ে বললে, পতাকা যদি তুলতেই হয় তো তোলা হোক এ-দেশের পতাকা, পর্তুগালের নয়।

কোলাস ঘাড় নেড়ে সমর্থন করলো।—দেশাচো বাঁওটো।

পাশের কেদারায় ছিলো ডা এলভাস। কোলাসের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে, সামান্য একটা পতাকা নিয়ে বিবাদ করে কি ফল হবে? নেহাত সরকারের গোলাম আমরা, তা না হলে আপত্তি করতাম না।

অগাস্তিনো সহাস্যে বললে, তা ছাড়া গোয়ার সব কিছুই তো তোমাদের হাতে। পাঁচ বছরের একটা চেড়ওয়াও জানে সমুদ্রে যে জাহাজগুলো ভেসে আসে আর ভেসে যায়, তা চালায় এই গোয়ানিজ তারতির দল।

মিস লুইয়া মৃদু হেসে নরম স্বরে বলে, কি চান আপনারা তাই বলুন? বেতনবৃদ্ধি? ইলেকশন? কম খাটুনি?

অধৈর্য হয়ে ওঠে সকলে।

সমস্বরে চীৎকার করে, সুটকায়।

কোলাস বলে, সুটকায়।

কালে সমর্থন করে, সুটকায়।

—সুটকায়—প্রতিধ্বনি তুললে মূর্তি আর নয়লি।

অক্ষয় উঠে দাঁড়ালো। হ্যাঁ, স্বাধীনতা চাই। স্বাধীনতা—ফ্রিডম্।

বাইরে বেরিয়ে এলো ওরা। রাতের রাস্তায় ভিড় করে কর্মপন্থা ঠিক করে ফেললো। এ পথে আপস নেই। আপস চাই না।

সকলকে বিদায় দিয়ে কালে আর অক্ষয় বাসার পথ ধরলো। কোলাস চলে গেল তার ডেরার দিকে।

বোশেখী মেঘের মতো কালো অন্ধকার নেমেছে পৃথিবীর বুকে। ঘন হয়ে। রাতের আকাশে দু-চারটে চিকচিকে তারা। আর ঝাপসা চাঁদ। নিঃশব্দতার মাঝে শুধু সমুদ্রের

গম্ভীর নিনাদ।

দূরের পাহাড়ে আগুনের হলকা। অক্ষয়ের চোখ গেল সেদিকে। বহ্নিশিখার ফুলঝুরি দুলে দুলে উঠছে আকাশের দিকে। দূরের বনে আগুন লেগেছে।

এমন প্রায়ই হয়। হয়তো আপনা থেকে জ্বলে উঠেছে। হয়তো বা কাঠকয়লা চালান দেবার সময় এসেছে। কালের কিন্তু ওদিকে লক্ষ্য নেই। পাশাপাশি হেঁটে চলেছে ওরা।

কালে হঠাৎ বললে, ভয় হয় কোলাসকে। শেষ-তক না বিগ্রে করে বসে। কুলিকামিনদের ওপর ওর ইনফ্লুয়েন্স কম নয়।

অক্ষয় বললে, সে ভয় নেই। লোকটা অত্যন্ত সিনসিয়র। তা ছাড়া ওর স্ত্রীও একজন ট্রু পেট্রিয়ট।

—স্ত্রী? চমকে উঠলো কালে—কার স্ত্রী?

—কেন, কোলাসের স্ত্রী। শুনেছি তার মতো মেয়ে নাকি বড় একটা হয় না। খুব ভালো, কোলাসের ভাষায়, খোদামাফিক। আর এই স্ত্রী নাকি কোলাসকে বলেছে যে, দেশের জন্যে কোলাস যদি মৃত্যু বরণ করে, তা হলেও নাকি সে চোখের জল ফেলবে না।

হো-হো করে হেসে উঠলো কালে।

বললে, পাগলামি তা হলে যায়নি ওর?

—বুঝলাম না কথাটা।

—দেখোনি ওর স্ত্রীকে? ফুল বিক্রি করে যায় আমাদের পাড়ায়। সে তো এখন তোমাদের নারায়ণার সঙ্গে......যাক গে সে কথা। নমস্তে, চললাম আমি।

বাকি পথটা একাই হেঁটে আসতে হলো অক্ষয়কে।

বয়স্থা বারাঙ্গনার প্রসাধিত রূপের মতো নতুন মডেলের ঝকঝকে একখানা স্টুডিবেকার স্খলিত তারার বেগে চোখ ঝলসে দিয়ে গেল কোয়ার্টারের সামনে দিয়ে। অক্ষয়ের মনে পড়লো এই মোটরটিরই পুচ্ছে আর পুরোভাগে দেখেছিলো সে কোলাপুরের নম্বর। মূলচাঁদের গাড়ি।

একটু পরেই ডাক এলো। কালের বাড়িতে। গিয়ে দেখা পেলো সকলের। কোলাসও এসে জুটেছে।

মূলচাঁদ বললে, বাবুজী, স্ট্রাইক মিটিয়ে নিতে হবে আপনাদের।

—কক্ষনো না। কোলাস চিৎকার করলো।

—মাথা গরম করবেন না, শুনুন। আমিও এ-দেশের লোক, গোয়ার স্বাধীনতা আমিও চাই। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন টাকার।

কেউ কোনো বাধা দিলো না মূলচাঁদের কথায়।

মূলচাঁদ আবার শুরু করলো।—এস এস ফার্নাণ্ডিজ এসে পেঁছবে দু-এক দিনের মধ্যেই। জাহাজ ভরতি হয়ে আসছে আমার লক্ষ লক্ষ টাকার মাল। হুইস্কি, জিন, শ্যাম্পেন—আমার তিন লাখ টাকার মদ তেরো লাখ টাকায় বিক্রি হবে, যদি এক সপ্তাহের মধ্যে ডেলিভারী পেয়ে যাই।

—আপনার প্রফিট কষে আমাদের আদর্শ বিসর্জন দিতে হবে নাকি শেঠজী? কালে হেসে ওঠে।

—না। মূলচাঁদ গম্ভীর হয়ে বলে—না, তা বলি না আমি। কিন্তু বিদেশী সরকারের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হলে রুপেয়ার দরকার। লাখ লাখ রুপেয়া লেবার ফাণ্ডে দান করবো আমি, সাত দিনের মধ্যে স্ট্রাইক মিটিয়ে নিলে। এস এস ফার্নাণ্ডিজ থেকে মাল খালাস করে দিয়ে আবার স্ট্রাইক করুন আপনারা। আমি আপনাদের পিছনে থাকবো।

সেলফিশ। শুধু একটা কথাই বেরুলো অক্ষয়ের মুখ থেকে।

বিদ্রূপের হাসি হাসলে কালে আর কোলাস।

অপমানে রাগে উঠে দাঁড়ালো মূলচাঁদ।

বললে, মাথাপিছু দশটা করে টাকা দিলে কালই দেখবে দু শো কুলিই কাজে জয়েন করেছে।

রাগে দপদপ করে পা ফেলে স্থূল দেহটা টেনে তুললো গাড়িতে। দ্রুত বেগে অদৃশ্য

হলো সেটা চোখের সামনে থেকে।

অনেকক্ষণ কেটে যাবার পর পকেট থেকে একখানা কাগজ বের করে কালে বললে, ডা এলভাস সার্কুলার পাঠিয়েছে। কাল আপিসে হাজ্‌রে না দিলে চাকরি যাবে।

তিনজনেই সমস্বরে আবার হেসে উঠলো। বেপরোয়ার হাসি।

পাশের ঘরের জানালার আধখানা কপাট খুলে গেছে হালকা বাতাসে। রাস্তার লাইট-পোস্ট থেকে এক ফালি স্তব্ধ আলো এসে পড়েছে অণির মুখের ওপর। পাঁচ বছরের শিবুকে কোলে জড়িয়ে নিশ্চিত নিদ্রার আমেজ অনুভব করছে।

এ-ঘরেও নীলিমার চোখে ঘুমের ঘনিষ্ঠতা।

খাটের এক কোণে চুপ করে বসে রইলো অক্ষয়।

আশ্চর্য!

পরম বিশ্রামে এরা ঘুমিয়ে আছে। নির্ভাবনায়। এতটুকু চিন্তা নেই, আশাভঙ্গের বেদনা ছাপ ফেলেনি মুখে চোখে।

অনেক টুকরো-টুকরো দৃশ্য চোখে পড়ছে অক্ষয়ের। কিন্তু গ্রন্থি বেঁধে বেঁধে এগিয়ে এসেও নাটকের শেষ অংকটা খুঁজে পাচ্ছে না।

নিজের দীর্ঘশ্বাসে নিজেই চমকে উঠলো সে।

নীলিমার দিকে ফিরে তাকালো। নিদ্রিতা নীলিমার লাবণ্যে মালিন্য নেই, ক্লান্তি নেই।

সে রাত্রির একটা দুর্বোধ্য দৃশ্য মনে পড়লো অক্ষয়ের। লাল কাঁকরের রাস্তায় পথ-মর্মরের ধ্বনি ফুটিয়ে ছুটে গিয়েছিলো স্টুডিবেকার গাড়িখানা।

নীলিমার অন্তর্বাসহীন তনুদেহে ঘিরেছে কালোপাড় সাদা শাড়িখানা। আঁচলের ঈষৎ আবরণ চিবুকের ওপর। অধরে ওষ্ঠে মৃদু হাস্য। বালিশের ওধারে লুটিয়ে পড়েছে দীর্ঘ কালো কেশের কৌতুক। নীলিমার নরম চুলের রাশে হাত রেখে অনেকক্ষণ কাটালো অক্ষয়। কোমল আর ঠান্ডা চুলের স্পর্শে কেমন যেন নিঃসহায় মনে হলো নিজেকে।

সেই রাতেই আরও কি যেন দেখেছিলো অক্ষয়। দূর কলোনীর কোলে শ্রমিক-বস্তিতে একটি একটি করে আলোর কণিকা জমা হতে দেখেছিলো। বহু মানুষের জনতার চাপা স্বরে কান পাতার অভিপ্রায়েই যেন সাগরপারের চঞ্চল হাওয়াও হঠাৎ নিস্তরঙ্গ নিশ্চুপ হয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিলো।

শিয়রের জানালাটা ঠেলে খুলে দিলো অক্ষয়। এক দমকা ঠান্ডা বাতাস আর এক ফালি জ্যোৎস্না এসে ঢুকলো ঘরে।

ও-ঘরে ঘুমের ঘোরে অণিমার ঠোঁটে ফুটেছে কৌতুক-স্বপ্নের হাসি।

সুগম্ভীর ডমরুবাদ্যের মতো সাগরগর্জন ভেসে আসছে। আর কাছের গাছে কোনো এক নিশাচর দম্পতির পাখা ঝটপটানি। নির্জীব পাহারাদারের মতো নিশ্চল লাইট-পোস্টের নীচে ক্ষীণনম্র নিশীথালোক।

দুর্ভাগ্যানিপীড়িতের ঠিকুজির মতো ডা এলভাসের সার্কুলারখানা চোখের সামনে ভেসে উঠলো। কালের প্রখর দৃষ্টিতে অটল দৃঢ়তা। ফাইট দেম অ্যাট্ এনি কস্ট্। কালের গম্ভীর কণ্ঠস্বরটা আবার নতুন করে শুনতে পেলো অক্ষয়।

জবাবটা লিখে দিন বাবুজী! ডা এলভাসের পত্রবাহক বলেছিলো। আর অক্ষয় চেয়েছিলো স্বার্থের অন্ধত্ব থেকে মুক্তি পেতে। ওর শিক্ষিত জীবন শুধু একটি কথাই নির্ভুল লেখবার মতো জ্ঞান দিয়েছিলো। একটি কথা। 'না'।

বিস্মৃত স্বপ্নের মতো মন থেকে সবই যেন মুছে যাচ্ছে।

ভোর হয়ে আসছে এদিকে। পুবের পাহাড়ে শ্যামল বনান্তে রাঙা আলোর আভাস দেখা দিয়েছে। বিক্ষিপ্ত বিহঙ্গের কলকাকলি শোনা যায়।

ধীরে ধীরে নীলিমার গায়ে হাত রাখলো অক্ষয়।

—সময় হয়ে এসেছে।

পিছন হেঁটে ফিরে চললো অক্ষয়। হাজারো নগর আর নদী আর গ্রাম পিছনে ফেলে।

চোখের সামনে সুবিস্তৃত সবুজ মাঠ। বাত্যাবিধ্বস্ত ফসলভরা মাঠ আর ময়দান ভেঙে নুয়ে পড়েছে। বিনয়ে ঢলে পড়েছে আকাশের গায়ে।

জলে কাদায় টলতে টলতে এগিয়ে চলেছে গরুর গাড়িটা। আহত কুকুরের মতো ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ করে। দীঘিটার পাড় ঘেঁষে।

এক পাশে হেলে পড়েছে পাড়ের তালগাছটা। ঝড়ের ঘায়ে ঝরাপাতার জঞ্জাল জমেছে ওখানে।

—ওখানে পড়ে রয়েছে ওটা কি রে ছিদাম? অণিমা প্রশ্ন করলে।

—ও আজ্ঞেন বাবুয়ের বাসা।

—এঃ, বাচ্চা দুটো একেবারে থেঁতলে গেছে—নীলিমা বললো।

—হুঁ বউমা। বড্ড ঝড়-বৃষ্টি গেছে কিনা।

অক্ষয় কিন্তু কোনো সাড়া দেয় না। দূর দিগন্তের দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে আছে ও। ঝড়তুফানের পরে যেন আবার নতুন করে পৃথিবী জেগে উঠছে, প্রথম সৃষ্টির দিনের মতো নতুন সূর্যোদয় পূবের আকাশে। তবু অক্ষয় যেন কি খুঁজছে। শেষ দৃশ্যটা খুঁজে পাচ্ছে না ও। চোখে তাই উদাস দৃষ্টি। প্রতিহত হয়ে ফিরে আসছে সাগরচুম্বী বন্দরের কন্দর থেকে।

ওপোর্টোর সঙ্গে এক সূত্রে বাঁধা পোর্ট গোয়া। এদিকে কাম্‌বে, ওদিকে মান্নার উপ-সাগর। উড়ন্ত পাখির পক্ষ-বিলাসের মতো উত্তরে কঙ্কণ আর দক্ষিণে মালাবার কোস্ট্‌ লাইনের ঢেউ কেঁপে কেঁপে সরে যাচ্ছে। পশ্চিমের ফেনিল শুভ্রতা ফেটে পড়ছে জাহাজ-ঘাটার প্রাঙ্গণে।

পোর্ট আপিসের প্রাচীরে প্রতিধ্বনি তুলছে সাতটার বাঁশি।

কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কদমে কদমে হেঁটে চলেছে সকলে। ভিন-সমাজ আর ভিন-রুচি গোয়ানিজ পুরুষ আর মেয়ে মজুরদের জনতা এগিয়ে চলেছে। তালে তালে। পোর্ট ডকের দিকে এগিয়ে চলেছে তারা। উচ্চ-নীচ প্রতিটি কর্মী আর কর্মচারী হেঁটে চলেছে। একজনকে শুধু খুঁজে পাচ্ছে না অক্ষয়। তন্নতন্ন করে অনুসন্ধানী দৃষ্টি চালিয়েও একজনের দেখা মিলছে না। স্বার্থতুষ্ট জনতা সকল আদর্শ বিসর্জন দিয়ে কাজে যোগ দিতে চলেছে। নেই শুধু কালে। ডকের উঁচু পাঁচিল অবধি সব কিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে অক্ষয়। প্রলুব্ধির পদধ্বনি বেজে চলেছে।

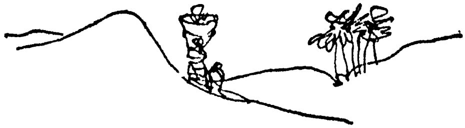
কিন্তু।

না, কালে নেই।

হঠাৎ একটা কাকুতি-ভরা কাকলিতে চমকে উঠলো অক্ষয়। তন্ময়তা ভেঙে গেল। সামনে চেয়ে দেখলে, দুটো খড়কুটো ঠোঁটে চেপে একটা বাবুইপাখি উড়ে গেল। নতুন একটা গাছের সন্ধানে।

অক্ষয়ের মনের চোখে হঠাৎ ধরা পড়লো পাঁচিলের ওপাশটা। কোকোর টেবিলে কে কে যেন বসে রয়েছে। র‍্যামোজ, ডা এলভাস, মূলচাঁদ। লক্ষ টাকার দ্রাক্ষারসের বেসাতি যার। আর—আর কালে।

[১৩৫৫



তিন তারা

কাঠের জাফরিটা চিকের পর্দা দিয়ে ঢাকা। দড়িটা ধরে টান দিলে চিকটা গুটিয়ে গুটিয়ে ওপরে উঠতে থাকে। সকালে ওঠে, দুপুরে নামে। বিকেলে তোলা হয়, সন্ধ্যেবেলায় নামানো।

তখন সুয্যি উঠেছে। ভোর-ভোর ঠাণ্ডা বাতাস ঢোকে এ-সময়। সামনে টুকরো ছোট বাগানের খুচরো ফুলের স্নিগ্ধ সুগন্ধে ঘর ভরে যায়! সারা বাগানে ফুল বলতে যদিও ওই একটি শিউলি ফুলের ঝাড়।

প্রাতঃস্নানে কাবেরীর নেশা। এই ভোর সকালে স্নান সেরে এসেছে ও। মুখের ওপর ভিজে গামছাটা আর একবার বুলিয়ে নিয়ে শাড়ি বদলাতে বদলাতে আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালো। চটপট চুলটা আঁচড়ে নিলে, আঁচলটা গুছিয়ে।

ও-ঘর থেকে ডাক এলো।—আঁচটা ধরেছে কাবু?

—কোন্ সকালে। জল বসিয়ে দিয়েছি। পেয়ালা-পিরিচগুলো ঠিক করতে করতে কাবেরী উত্তর দিলে।

ওদিকে জাফরি-ঢাকা চিকের পর্দাটা টেনে তুলে দিলেন রাজেনবাবু। জাফরির গায়ে গিঁট মেরে এঁটে দিলেন দড়িটা। তারপর কপাট খুলে বাইরের বাগানের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। দূরের রেললাইনটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। জরিপাড় জামদানির মতো সমান্তরাল এক জোড়া রেখা খানিকটা এগিয়ে গিয়ে বাঁক ঘুরেছে। মোড়ের মাথায় লম্বা-হাত সংকেত। সিগন্যালের পাখনাটা ঝুলে পড়েছে। প্যাসেঞ্জার ট্রেনটা আসবার সময় হয়ে গেছে বোধ হয়।

রাজেনবাবু বাইরে থেকেই হাঁক দিলেন কাবেরীকে।—ছোট কুঠুরির তাকে দাঁতনের কাঠি আছে, দিয়ে যা তো কাবু।

—যাই বাবা। কাবেরী উত্তর দিলে ভিতর থেকেই।

হালকা বাতাসে জানালার পর্দাটা উড়ছে পতপত করে।

বাইক চালিয়ে লাল কাঁকরের সড়ক মাড়িয়ে কে যেন আসছে। মাথায় ঝুঁটি ঝোলানো লাল টুপি।

—আজ কি বেরুবে নাকি?

স্ত্রীর কথায় ফিরে তাকালেন রাজেনবাবু। তার হাত থেকে নিলেন দাঁতন-কাঠিটা। তারপর বললেন, আমি এক দিন না বেরুলেও খেতে পাবো, কিন্তু রুগীদের কি হাল হবে?

চায়ের পেয়ালা হাতে কাবেরী এসে হাজির হলো।—চা যে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে!

—ও, আচ্ছা দে চা-টা, খেয়েই নিই।

কোনো এক পুরোনো দিনের জের টেনে ব্যঙ্গের স্বরে কাবেরীর মা বললেন, সেই ভালো, দাঁত পরে মাজলেও চলবে।

চায়ের পেয়ালাটা হাতে নিয়ে আন্‌মনা চুমুক দিলেন রাজেনবাবু, স্ত্রীর ব্যঙ্গোক্তি কানে গেল না। মনে মনে তখন হয়তো রুগীদের তালিকা তৈরি করছেন। কোত্থেকে কোথায়, কার বাড়ি থেকে কার বাড়ি।

আরগাডা কোলিয়ারীর ডাক্তার রাজেন বসু।

হাতযশ যথেষ্ট। যুদ্ধের বাজারে যখন কোথাও এতটুকু সত্যিকারের ওষুধ মিলতো না, রুগীরা যখন জেনেশুনেই নিয়ে যেতো শুদ্ধি-জল আর চিরেতার গুঁড়ো মেশানো ময়দা, তখনও রুগীরা ওঁর বিদ্যেকে বাহবা দিয়েছে।

ওঁর ওপর অটল বিশ্বাস সাঁওতাল কুলিকামিনদের।

তারা বলতো, তুঁই বাবু গুণ করতে জানিস, উদেঁর মতন খুন করিস্ না তুঁই।

—হয়েছে হয়েছে! টাকাটা দে দিকিন। আর ওষুধের দাম সাড়ে ছ' আনা। রাজেনবাবু

একটু রূঢ় হবার চেষ্টা করেই বলতেন।

শুধু আধাবুনো মেয়ে-মরদরাই নয়, অ্যাংলো মেয়ে আর বাঙালীবাবুদের মধ্যেও ওঁর প্রশংসা ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগেনি।

হাবেভাবে দেখাতে চান, উনি শুধু টাকাই চান, গুণগান নয়। কিন্তু টাকার চেয়ে সুনামটাই তাঁর কাছে বড়। সুনাম পেয়েছেনও সবার কাছে, এক অমিতাভ ছাড়া আর সকলের কাছেই।

কাবেরীর মামা অমিতাভ, অর্থাৎ রাজেনবাবুর শ্যালক। থাকে কাছাকাছি, কাছের স্টেশন বরকাকানার এ-এস-এম সে। চেনাজানা কারও জীপ একখানা হয়তো আসছে এদিকে, অমিতাভ চড়ে বসলো। হপ্তায় এমন দু-এক দিন আসবেই সে, দিদির খোঁজখবর নিতে।

খোঁজখবর নিতে, না ঝগড়া করতে।

অপরে যেটুকু বা গুণগান করে, উপেক্ষা করে যায় অমিতাভ। বলে, ভগ্নীপতি হিসেবে ইউ আর এ ফাইন ম্যান, তা বলতেই হবে। কারণ, বাবার বুদ্ধি কম ছিলো এ-কথা তো বলতে পারি নে। তবে, ডাক্তার হিসেবে....ফুঃ।

রাজেনবাবু বলেন, ইংরেজীতে বলে বাটলারের কাছে হিরো হওয়া যায় না। তা 'শালা' কথাটারই ইংরেজী হলো বাটলার।

কাবেরীও মাঝে মাঝে মামার ওপর চটে যায়। অমিতাভর কথাবার্তা ওর মোটেই ভালো লাগে না।

হঠাৎ হয়তো অমিতাভ কোনো দিন এসে প্রথমেই জিগ্যেস করে, তোর বাবা আজকাল রোগ সারাচ্ছে, না রুগী সরাচ্ছে রে কাবু?

হাসি পায়, রাগও হয়। কাবেরী বলে, মালগাড়ি থেকে জিনিস সরানোই কাজ কিনা তোমার!

যে যাই বলুক, কাবেরী জানে, এ তল্লাটের রাউত রয়তাইন থেকে সাহেবসুবো অবধি সবাই রাজেন ডাক্তারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। রাঁচী আদালতের জজসাহেবও 'বাসিনী মার্ডার কেসে' রায়ের ফাঁকে বলেছিলেন, ডক্টর আর এন বোসের কথা স্টার্লিঙের চেয়ে খাঁটি।

দারোগা রামশরণ পাণ্ডে সর্বেরি তলবে যাবার পথে খোঁজ নিয়ে যায় প্রায়ই—নমস্তে ডগ্‌দারসাব। তবিয়ত ভালো তো!

একটু খোশামোদ করতেই হয়, চলতে হয় একটু ওঁর খেয়ালখুশি মাফিক। খুনজখম হলে চাপাচুপি তো দিতে হয় প্রায়ই, তখন রামশরণ আগেভাগে রাজেনবাবুকে নিয়ে যায় রামগড় নয়তো রায় স্টেশনের কোথাও। দেহাতী ভায়ের অসুখের নাম করে। ফাঁকতালে ছোট দারোগা হাতুড়ে অ্যাসিস্টেন্ট আয়ারকে নিয়ে যায় ডেথ সার্টিফিকেটের জন্যে। 'ডেথ ফ্রম হাই ফিবার উইথ হেপাটিক ইন্‌সাফিসিয়ান্স'—রিপোর্ট লিখে নীচে সই মারে কে এস্‌ কে আয়ার, এল্‌ এম্‌ এফ্‌, অ্যাসিস্টেন্ট সার্জেন, আরগাডা কোলিয়ারী হস্‌পিটাল।

দারোগা রামশরণের সঙ্গে রাজেনবাবু ফিরে আসেন রুগী দেখে।

দূরের শ্মশানে চিতার আগুন তখন জ্বলে শেষ হয়ে এসেছে। ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে দুলে দুলে। সেদিকে তাকিয়ে মৃতের খবর জিগ্যেস করেন রাজেনবাবু। উত্তর আসে, দ্যাট কুল্‌লি গারেল বিলাসিয়া। ডায়েড অফ ফিবার্‌রো।

লাতেহারের পশ্চিমে বুনো পাহাড়ের রেঞ্জ। দীর্ঘশীর্ষ একক পালামৌ পাহাড়কে ঘিরে অজস্র পাহাড়িকার হাট। নৃমুণ্ডমালিনীর কণ্ঠমালার মতো। শ্যামলিমায় ঢাকা দূরের দিক্‌চক্রবাল টেনেছে শাল-শিরীষের ঘনবন ঘনিষ্ঠতা, পাহাড়ে পাহাড়ে। সুকেশী তরুণীর সুপুষ্ট দৃষ্টিতে দেখায় যেন কোনো এক প্রাগৈতিহাসিক ঐরাবতের আশ্লেষে ঘুমন্ত অজগরের কঙ্কাল।

ঝিরঝির শব্দের নূপুর বাজিয়ে জলের স্রোত নেমে আসছে। ঘুঙুরের বোলের মতো বেদনাবাদন বেজে ওঠে নুড়িতে নুড়িতে ঠোকা খেয়ে। জলতরঙ্গের চূর্ণ শব্দের নিক্কণ শোনা যায়, পাথরের গায়ে জলের ঘা বাজে। অনেক দূর থেকে কলহাস্যে ভেসে আসা

মুখর কাকলির মতো কলধ্বনি তুলে নেচে নেচে আসে রূপাঝিলের স্রোত। শৃঙ্গারনটীর ভীতচকিত কৌতুকের লাস্য ফুটিয়ে।

নীচের কালভার্টে দাঁড়িয়ে দেখলে মনে হবে এক পাল কুমির নেমে আসছে। হ্যাঁ, বছরে আট মাস এক পাল কুমির রূপাঝিলের জলে গা ভাসায়।

কুমির নয়, কাঠ।

ছিটে বেড়ার পাশে আঙিনায় বসে বসে কাঁচা তামাকের বিড়িতে টান দেয় শাঁওন। আর দেখে, সারি সারি লোক চলেছে জঙ্গলের দিকে, মাঝাং পাহাড়ের পথে।

ঘাসের বিঁড়েতে মুগীর ডিম সাজাতে সাজাতে লখিয়া বলে, যাও না একবার তাঁবুর দিকে। কামধাম মিলে যেতে পারে।

নিরুৎসাহের হাসি হাসে শাঁওন। বলে, শালা ডরপুকের দল, দাগী আসামীর নাম শুনলে ভয় পায়।

—তবু একটু তদবির করেই দেখো না একবার।

—তগদীর থাকলে তদবির লাগে না লখিয়া। উত্তর দেয় শাঁওন।

লখিয়া চটে যায়।—তগদীর আর তগদীর! ভগবান কি তোমায় ছপ্পর ফেড়ে দৌলত দিয়ে যাবে নাকি?

শাঁওন উত্তর দেয় না। হাসে। আর তাকিয়ে থাকে ওর কুঠির সামনে দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে যে সর্পিল মেঠো রাস্তার রেখাটি, তার দিকে। কাঁধে লাঠি উঁচিয়ে, লাঠির ডগায় সংসার বেঁধে ক্যাঙারুর মতো কুঁজিয়ে কুঁজিয়ে ছুটে চলেছে সকলে। রূপাঝিলের দিকে, রূপাঝিল ছাড়িয়ে বুনো পাহাড়ের বাঁকা রাস্তা ধরে শাল-শিমুলের বনের পথে।

নীচের উপত্যকা নীচে ফেলে রেখে, পাহাড়ের ওপরে, আরো ওপরে উঠলে মিলবে কুলিকামিনদের কণ্ঠকাকলি। নীল গাইয়ের খুরের শব্দ আর চিতাবাঘের চিৎকার থেমে গেছে সেখানে। মধুলোভী ভালুকের দল হয়তো অভিমানী জড়বৃদ্ধের মতো কুঁজো হয়ে দূরে সরে চলেছে ভীত ত্রস্ত দু' পায়ে ভর দিয়ে। ঘাসে মুখ লুকিয়েছে খরগোশের সারি, ঝোপের আনাচে-কানাচে তিতির আর বুনো হাঁস। কাক চিল শালিকের পাখা ঝটপটানি থমকে দিয়েছে হাজারো রোজমজুরের দল।

জঙ্গল সাফ করতে নয়, গাছ কাটতে এসেছে ওরা। কাঠ কাটতে।

মাঝাং পাহাড়ের জঙ্গল ইজারা নিয়েছে এবার ব্রিজলাল। আরগাডার কয়লাখনিতে কুলি যুগিয়ে এসেছে যে এতদিন, আজ তার কুঠির ফটকে পড়েছে কাঠের ফলক! গোটা গোটা হরফে লেখা নামটার নীচে স্পষ্টাক্ষরে খোদাই করা দুটো ছোট্ট কথা। টিম্বার মার্চেণ্ট।

তিন হাজার টাকা সেলামী আর বছরে বারো হাজার টাকা বনকরের বিনিময়ে পেয়েছে সে মাঝাং পাহাড়ের ইজারা। শাল আর শিশু, আমলকী আর মহুয়া গাছের ভিড় বনে বনান্তরে। সেদিকে চোখ রেখে লক্ষ টাকা মুনাফার স্বপ্ন দেখেছে সে। বেওয়ারিশ বনস্পতির গায়ে এঁকেছে আপন শর্ত, পেয়েছে রত্নগুহার সন্ধান।

শুধু ব্রিজলাল নয়, আরো অনেকে। দৃষ্টির দিগন্তে তারা দেখতে পেয়েছে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তাদের বহুবর্ণী রঙবীন চোখে!

ডেরাতে ডিহিতে খবর পাঠিয়েছে ব্রিজলাল। ডুগডুগি বাজিয়ে জানিয়ে দিয়েছে ওঁরাও আর মুণ্ডাদের আড্ডায়।

কুলি চাই। জঙ্গলের গাছ কাটতে, চেরাইয়ের কাজ করতে। আর ভার বইতে। কাটা গাছের গুঁড়ি বয়ে নিয়ে এসে ছেড়ে দিতে হবে রূপাঝিলের জলে। মহুয়া-মিলনের পোলের নীচে বাঁধা আছে তারের জাল। কুমিরের মতো পিঠ ভাসিয়ে নেমে আসবে কাঠের স্তূপ। সেখান থেকে লরীতে বোঝাই হয়ে আসবে লাতেহারের সাইডিং-এ। তারপর, কোলকাতা করাচী, মাদ্রাজে মালাবারে।

কুলি চাই। চাই জনমজুর।

দিনে বারো আনা মজুরী আর আধ সের চাল নয়তো গম। বছরে এক জোড়া কাপড়, একখানা দোসুতি গামছা। মেয়েরা পাবে আট আনা।

মরা গাঙে জোয়ার ডাকলো যেন। দেহাতীদেব মনেও। কাজের মতো কাজ জুটেছে।

এবার আর যেতে হবে না দূরের কোলিয়ারীতে। কে'চোর মতো মুখ গ‘ুজতে হবে না কাদায় আর জলো মাটিতে। নামতে হবে না পাতালের গহ্বরে।

সুস্থ সুখোজ্জ্বল চোখে ছুটে চলে ওরা। এক দলের পর আরেক দল। ম্যানেজারের তাঁবুর দিকে। পুরুষ আর মেয়ে, বাচ্চা আর বড়।

শাঁওনের কিন্তু সেই এক কথা। নিজে নড়েচড়ে বসবে না, কোসিস করবে না, কসুর অন্যের। খুনীর খুন যার শিরায় সে যাবে ওই বাঙালীবাবুর খোশামোদ করতে। দুব্‌লা আওরাতের মতো খুশামদ ওর ধাতে নেই।

—দুব্‌লা আওরাত। লখিয়ার হাতের চাপে একটা তাজা ডিম ভেঙে গ‘ুড়িয়ে যায়। বলে, যেতে হবে না তোমাকে, রোজের কাজ নেবো আমি, হাত দুটো তো এখনো ভগ্‌বান ছিনিয়ে নেয়নি।

বাধ্য হয়েই যেতে হয় শাঁওনকে। হাজির হতে হয় ম্যানেজারের তাঁবুতে। কাঁধের টাঙিটা টেবিলের ওপর দুম্‌ করে ফেলে দিয়ে ঝাঁকড়া চুলের ফাঁকে লাল চিরুনিটা শক্ত করে বসাতে বসাতে বলে, নোকরি চাই মানজারবাবু।

হাতের কলমটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে একটা সিগারেট ধরালে অনুপম। তারপর শাঁওনের দিকে তাকিয়ে বললে, ক'খানা গাছ কাটতে পারিস দিনে? কাঠ কাটতে পারবি, মাটি কোপাতে?

—ছোঃ। কি যে বলিস মানজারবাবু। ও কাজ করবে ওই ওঁরাও আর মুণ্ডারা। আমি সান্তাল নই, জংলী নই। ছত্তিশগড়ের রাউত আমি।

অনুপম হেসে বলে, তা হলে কাজটা কি করবি? গাছ কাটতে পারবি না, মাটি কোপাতে পারবি না।

শাঁওন বললে, কত আদমীর জান নিয়ে এলাম, গর্দান কুপিয়ে নিয়ে এলাম আমি, আমাকে বলিস মাটি কোপাতে? আমার নাম শাঁওন গাঙাট।

—ও, তুই বুঝি সেই গুণ্ডা-সর্দার? কয়েদ থেকে ছাড়ান পেলি কবে?

শাঁওন হেসে ওঠে। বীভৎস হাসি।

বলে, শালার লাশ তো গুম্‌ করে দিয়েছিলাম। তখন শালা লালপাগড়ি বললে, চোর, দারু চুরি করেছিস ধনীরামের ভাঁটি থেকে!

অনুপম বললো, চৌকিদারের কাজ করবি?

—চৌকিদার?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, জঙ্গলের পাহারাদার।

—চোরকে চৌকিদার? হো-হো করে হেসে ওঠে শাঁওন, বলে, লিখে নে তুই মানজারবাবু, করবো কাজ।

শাঁওনকে বিদায় দিয়ে ছুটি পায় অনুপম। হাত-পা ছড়িয়ে একটু বিশ্রাম নেবার চেষ্টা করে। কাজ শেষ হয়েছে, আরগাডায় ফিরতে পাবে সে আজ। দুটো দিনের কর্মক্লান্ত অবসাদে শরীর আর মন বিষিয়ে আছে। টেবিলটার ওপর পা দুটো তুলে দিয়ে নিশ্চুপ পড়ে থাকে কিছুক্ষণ। মনে মনে সুখস্মৃতির টুকরো নাড়াচাড়া করে বারবার। কাবেরী বোধ হয় পর পর দু দিন ব্যর্থ আশা নিয়ে দাঁড়িয়েছে বাড়ির বাঁকে। অপেক্ষা করেছে। কাবেরী, কাবেরী। চমৎকার মিঠে নাম, কি যেন এক অজ্ঞাত মোহ আছে নামটার মধ্যে। ব্রিজলালের ওপর বিরক্ত হয়ে ওঠে হঠাৎ! এত তাড়াহুড়ো না করে, একটু সময় থাকতে বলে না কেন লোকটা। কাবেরীকে একটা খবর দিয়ে আসতে পারতো তা হলে।

কাবেরী আজও ছুটে এসেছিলো। ভোরের ভোঁ বাজার সঙ্গে সঙ্গে। এই যে অনুপম যায় তার আরগাডার আপিসে। কোলিয়ারী আপিসের গায়ে ব্রিজলালের গদি। সেখানে। তাই প্রতিদিন এ সময়টায় ঘন ঘন ছুটে আসে কাবেরী। দেখতে আর দেখা দিতে। ফুরসত পেলে দু-চারটে কথাও বলে নেয়।

শিবলিঙ্গের মতো গোল আর মসৃণ একটা একক পাহাড়। তারই পাশ দিয়ে ওঠে

সকালের সূর্য। রাঁচী হাজারীবাগ, লাপ্‌রা আরগাড়ার সেই বিরল সূর্য-সৌরভ দেখা দেয়। আর লাল মাটির প্রান্তর—পায়ের তলা থেকে পিছলে গিয়ে মেশে মেঘের চিবুকে। লম্বা মাঠ, গেরুয়া মাটির মাঠ। আর মাঝে মাঝে শস্যশ্যামল সবুজের দ্বীপ। ভুট্টার ক্ষেতে ভুখা বাচ্চার কান্না। নয়নারাম সবুজের স্বপ্নে ঘেরা মাঠ, আর তারও ওপারে বনশ্যামলী। মাদার আর মহুয়ার গাছ। শাখার ফাঁকে সূর্যশল্ল। ওপরে আকাশ মখমল। সাটিনের চাঁদোয়ায় রক্তবর্ণ এক লালের রেকাবি।

এত যে চিত্তচমৎকারী পৃথিবীর রূপ তা দেখবার সুযোগ মেলে না কাবেরীর বরাতে। যত কাজ তার এই সময়টিতে। এক টুকরো অবসর, এতটুকু অবকাশ যদি মেলে তো কাবেরী ছুটে আসে খিড়কির উঠোনে। রূপ দেখতে। পৃথিবীর? কে জানে, হয়তো বা রূপ দেখাতে।

অনুপমের দেখা মিলছে না কেন? কাবেরী উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। ইচ্ছে হয় সদর দরজার দিকে গিয়ে দাঁড়াতে। হয়তো কাবেরীর চোখ এড়িয়ে অনুপম কোন্‌ ফাঁকে পার হয়ে যাবে খিড়কির দিকের মোড়টা। সদরে দাঁড়ালে তবু অনেকখানি পথ চোখে পড়ে, এত অল্প সময়ের মধ্যে উধাও হয়ে যেতে পারে না। কিন্তু সদর আগলে বসে আছেন কাবেরীর বাবা।

চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে এ সময়ে এসে বসবেন তিনি বাগানে। হ্যাঁ, প্রতিদিন। বাঁশের বাতা দিয়ে ঘিরে ছোট্ট এক টুকরো বাগিচা রচনা করেছেন রাজেন ডাক্তার। মধুমল্লিকা বা রজনীগন্ধার রসমাধুর্য উপভোগ করার জন্যে এ বাগানের উৎপত্তি নয়। হ্যাঁ, কোণের দিকে একটা শিউলি গাছ আছে বটে। তবু কুমড়ো, ঢ্যাঁড়স, বেগুন আর টমাটোর চাষ করেছেন রাজেনবাবু এই ছোট্ট বাগানে। ফুলকপির চারা লাগিয়ে দেখেছেন, পোকায় খেয়ে দেয়।

রাজেনবাবুর চোখে মাধবীমালঞ্চের চেয়ে বার্তাকু-উপবনটা আরও বেশী মোহনীয়। তাই প্রতিদিন ভোর সকালে দাঁতে নিমকাঠি ঘষতে ঘষতে এসে বসেন তিনি এখানে। বাগানের মাঝখানটায় একখানা ভাঙা বেতের চেয়ার টেনে নিয়ে।

পাহাড়ের পাশে রেললাইনের শেষ দিগন্তে যেখানে ইস্পাতের চকচকে লাইন দুখানা গিয়ে মিশেছে একটি বিন্দুতে, যেখানে উড়ছে মেটে-পাখনা শঙ্খচিলের সারি, যার ওপাশে উঠছে লাল—না, এতক্ষণে পীতাভ হয়ে এসেছে সূর্য, ছোট হয়ে এসেছে—সেদিকে তাকিয়ে ঠাওর করতে পারলেন না রাজেনবাবু, ডিসট্যাণ্ট সিগন্যালটা নেমে পড়েছে কি না। হঠাৎ-রোদে চোখ ধাঁধিয়ে গেল।

কেদারাটা টেনে বসতে যাচ্ছিলেন, ডাক শুনে চমকে ফিরে তাকালেন।—কে ইদ্রিস? কি খবর?

কালো ঝুঁটি ঝোলানো লাল টুপিটা এক হাতে ধরে বাইকটা বেড়ার গায়ে রেখে খামে মোড়া চিঠিটা দিলো ইদ্রিস।

চিঠিটা পড়ে বললেন, আচ্ছা। যাবো একটু পরে।

ইদ্রিস চলে গেল।

কাচা কাপড়টা তারে মেলে দিতে দিতে কাবেরীর মা বললেন, চেয়ারের হাতলে একটা শাড়ির পাড়ছেঁড়া বাঁধা রয়েছে দেখতে পেয়েছো?

—হ্যাঁ, এখানটা ভেঙে গেছে বলে বেঁধে রেখেছি।

—বেশ করেছো, ওটা ফেলে দিয়ে এসো।

—কেন?

—ওকে ছুঁয়ে চিঠি নিলে না?

আর কথা বাড়াবার সাহস হলো না রাজেনবাবুর। পাড়টা খুলে ফেন্‌সিং-এর ওদিকে ফেলে দিয়ে এসে বসলেন।

—মঞ্জুর সঙ্গে একবার দেখা করে আসতে হবে, মনে আছে তো?

—সময় পাই তো যাবো।

—সময় পাই তো মানে? কতটুকু সময় লাগবে দেখা করে আসতে? সংসারের এটুকু কাজও হবে না তোমাকে দিয়ে?

—সংসারের কাজ না হাতি। কে না কে, মামার মেসোর ভাইঝি—

কথাটা শুনে চটে গেলেন কাবেরীর মা। দুমদুম করে পা ফেলে ভেতরে চলে গেলেন। মনে মনে হাসলেন রাজেনবাবু। আরেক দিন ঠাট্টা করে বলেছিলেন চন্দ্রনলিনী নাম না রেখে তোমার নাম রাখা উচিত ছিল অসুরদলনী। আজ আর সে বিদ্রূপের পুনরুক্তি করতে সাহস পেলেন না।

সময় হয়ে আসছে এদিকে। ওঠবার ইচ্ছেও রয়েছে। কিন্তু আবার চোখাচোখি হতে পারে স্ত্রীর সঙ্গে। তাই বসে রইলেন রাজেনবাবু।

কাবেরীর ডাক এলো একটু পরেই।—বাবা, চান করে নাও।

সাড়া দিলেন না রাজেনবাবু, শুধু গামছাটা কাঁধে ফেলে জলঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

—জলখাবার হয়েছে? স্নান করতে করতে জিজ্ঞেস করলেন কাবেরীকে।

—হয়ে এলো বলে। তুমি চানটা সেরে আসতে আসতে হয়ে যাবে। কাবেরী উত্তর দিলে।

মাথায় গামছা ঘষতে ঘষতে বেরিয়ে এলেন রাজেনবাবু।

—শিবুটা গেল কোথায়, পড়তে বসেনি এখনো?

কাবেরী উত্তর দিলো, ওঝাবাবুদের বাড়িতে গেছে, চিনি চেয়ে আনতে। দেখি এলো কি না।

ফুটন্ত সুজিতে খুন্তিটা দুবার নেড়ে দিয়ে বাইরে এলো কাবেরী, শিবুর খোঁজে। এমনি একটা-না-একটা ফিকির খুঁজছে ও। দু মিনিট অন্তর একবার করে উঁকি মেরে দেখে যাবে, অনুপম এলো কি না।

ফিরে আসতেই অনুযোগ শুনলে কাবেরী।—চিনি ফুরিয়ে গেছে বলিসনি কেন?

মুখচোখ ঘুরিয়ে কাবেরী বললে, বা-রে। কাল থেকে মা বলছে তো। তোমার কিচ্ছু মনে থাকে না বাবা।

—ও। তা সুখলালকে একবার পাঠিয়ে দিলেই তো পারিস, বরকাকানায় তোর মামার কাছে।

—আজ পাঠাবো।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, পাঠিয়ে দিস। বস্তা ফুটো করে দু-চার সের চিনিই যদি না যোগাড় করতে পারলো তা হলে আর এ-এস-এম কিসের! মুচকি হেসে রাজেনবাবু বললেন।

কথাটা কাকে খোঁচা দেবার জন্যে বললেন, নিজেই হয়তো বুঝলেন না। অনুপস্থিত অমিতাভের উদ্দেশে, না স্ত্রীকে চটাবার জন্যে?

ওদিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হানলেন কাবেরীর মা। আড়চোখে মা-র মুখের দিকে একবার, বাবার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে কাবেরী না হেসে পারলো না।

শিবু ইতিমধ্যে সিগারেটের টিনে এক কৌটো ধার করে আনা চিনি হাতে এসে হাজির হয়েছে। তার হাত থেকে কৌটোটা নিয়ে কাবেরী মা-র উদ্দেশে বললে, মামা তো নিজেই বলে গেল সেদিন, তবে আবার চটছো কেন?

—চুরি করে, বলেছে তোকে?

—বাবাও তো যোগাড় করার কথা বললো, চুরি বলেনি।

জলখাবারের ব্যবস্থা করে দিয়ে সবে খিড়কির চৌকাঠ ডিঙিয়েছে কাবেরী, অমনি বাধা পড়লো।

—আবার চললি কোথায়? হুট্‌হাট্‌ করে কেবল বাইরে বেরুস কেন ঘর থেকে?

কাবেরী অভিমান করে ফিরে এলো।—বেশ, যাবো না তবে। দীনভজনটা পালাক এই ফাঁকে, আমার কি।

—ও। তা যা, সত্যিই পালাবে হয়তো।

—পারবো না আমি, তুমি যাও না।

—মেয়ের আবার অভিমান হলো। বলে গেলেই তো পারিস। মৃদু হেসে মেয়ের অভিমান ভাঙাবার চেষ্টা করেন কাবেরীর মা।—তোর ভালোর জন্যেই বলি মা, বিদেশ-বিভুঁই জায়গা, হাজার রকমের সব লোক—

রাজেনবাবু বললেন, কুটোটি কেটে তো দুটো করতে পারবে না, মেয়েটা খেটে খেটে হয়রান হয়ে গেল, তার সঙ্গে একটু ভালোভাবে কথা বলবে, তা নয় দিনরাত খিটিমিটি।

উত্তর আসে।—বকিয়ো না মেলা। অমন বয়সে আমি বারোটা মনিষের ভাত রেঁধেছি। শাশুড়ী-ননদের খোঁটা খেয়েছি দিনরাত।

—তাই শোধ নিচ্ছো মেয়ের ওপর?

—কি বললে, শোধ নিচ্ছি? পেটের মেয়ের ওপর শোধ নিচ্ছি আমি?

—তাই তো দেখছি। অথচ মেয়ের বিয়ের ভাবনা ভেবে ভেবে তো রাতে ঘুমুতে দাও না।

—তবে? কেন ভাবি, কেন? মেয়ের ভালোর জন্যে নয়?

রাজেনবাবু এতক্ষণে বুঝলেন গলাটা তাঁর একটু চড়া হয়ে গিয়েছিলো। মুখে তাই হাসি টেনে আনার চেষ্টা করে বললেন, সেই কথাই তো বলছি। কাবেরীর জন্যে তুমি যা ভাবো, ওকে তুমি যতখানি ভালোবাসো তার এক আনাও আমি হয়তো পারি না। তবু কেন যে মেয়েটাকে খোঁটা দাও।

—শাসন না করলে মানুষ করা যায় না, তা তুমি কি করে জানবে। সে চোখই কি আছে তোমার!

রাজেনবাবু উত্তর দেন, শাসন করবে বইকি, তা বলছি না। মানে এই তেপান্তরে এসে পড়ে রয়েছে বেচারী, একটা বন্ধু নেই বান্ধব নেই, ইস্কুলের মুখ দেখতে পেলো না—

কাবেরীর মা-র মনও নরম হয়ে আসে, ভিজে গলায় বলেন, সত্যি, একটা পিঠোপিঠি বোন থাকলেও মন খুলে কথা বলবার লোক পেতো!

বাবা-মা তর্ক করুক না, কাবেরী এদিকে অনেকক্ষণ আগেই খিড়কির দোর পেরিয়ে উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে। ও বোঝে, অভিমান করে ক্ষতি ওরই হবে। এই ফাঁকে হয়তো—দীনভজন নয়—অনুপম পালাবে সুড়ুৎ করে।

উন্মুক্ত আকাশের নীচে, বিস্তৃত প্রাঙ্গণের প্রান্তে এসে দাঁড়ালো কাবেরী। রোজই তো অনুপম যায় এ পথ দিয়ে। অন্য দিনের একটা কথা মনে পড়লো। মনে পড়ে কৌতুক বোধ করলে কাবেরী। দূরের কালভার্টটা অবধি গম্ভীর মুখে হেঁটে যায় অনুপম, যেন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড রসাতলে গেল এমনি চিন্তার রেখা ফোটে তার কপালে। কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই যেন। তারপর দক্ষিণের তেমাথার বাঁক ফেরবার সময় চট্ করে একবার পিছন ফিরে তাকায়। হঠাৎ কোনো ডাক শুনে বা শব্দ শুনে আচম্কা যেভাবে মানুষ ফিরে তাকায় সেইভাবে। ঠিক এই মুহূর্তটিতে কাবেরীর চোখ থেকে অনুপমের চোখ অবধি এক জোড়া অদ্ভুত রহস্যময় সমান্তরাল রেখা টানা হয়ে যায়। পরস্পর পরস্পরের কাছে হয়ে ওঠে অত্যন্ত নিকট। কাবেরীর চোখে অনুরাগ উছলে ওঠে। তারপর, তারপরই অনুপমকে আর দেখা যায় না। ওয়াচ অ্যান্ড ওয়ার্ডের কুঠিটায় আড়াল পড়ে সে। আর কুয়াশার মতো এক ক্লান্তির গভীরতা নামে কাবেরীর বুকে।

স্তব্ধ সমুদ্রের ছায়া পড়ে কাবেরীর মনে। দূরের সমুদ্রে নীলাভ দ্বীপের মতো ঝাপসা হয়ে আসে তার স্বপ্নসজল দৃষ্টি। প্রভাতী পুজোর ঘণ্টাধ্বনি ভেসে আসছে। কিন্তু আজও অনুপমের দেখা নেই।

হপ্তায় একটা দিন ওই কাছের শিবমন্দিরে দেখা হয় দু'জনের, সারা সপ্তাহের আশা-আকাঙ্ক্ষায় বাঁধা প্রতীক্ষার প্রহর আসবে আগামী কাল। চোখের পরিচয়কে ঘনিষ্ঠতর করে তোলে ক্ষণবিশ্রম্ভের আলাপ। কিন্তু, আজও দেখা নেই অনুপমের। ব্যথাতুর চিন্তায় সব ভুলে গিয়েছিলো কাবেরী। হঠাৎ টিন পেটানোর আওয়াজ শুনে চমকে ফিরে তাকালো।

দীনভজন চলেছে সরকারী কুয়োর দিকে। ঘাড়ে বাঁক, দু'পাশে দুলছে দুটো ফাঁকা টিন—কেরোসিনের। হাতের কাঠিটায় টিনটা বাজাতে বাজাতে চলেছে।

কাবেরী ডাক দেয়।—দীনভজন, দু' ভার জল দিয়ে যাও আগে।

—মাস্টারবাবুর বাড়ি হয়ে গেলেই দিয়ে যাবো, মাঈজী।

—না না, আগে দিয়ে যাও। আসতে অনেক দেরি হবে তোমার, কাজ পড়ে থাকে তোমার জন্যে।

—আচ্ছা, মাঈজী। এক ভার পানি আগেই দিয়ে যাবো।

দীনভজন চলে যায় কুয়োর দিকে। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে কাবেরী ফিরে আসে। বলে, দীনভজনটা কি বলো তো মা? এত মানা করি তবু মাঈজী আর মাঈজী! দিদি

বললেই তো পারে।

স্নেহাতুর চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে কৌতুকের হাসি হাসেন কাবেরীর মা। দূর ভবিষ্যতের কোন-এক সানাই-রাগিণীর সুর ভেসে আসে যেন। স্বপ্নসায়রে যেন দীনভজনের সম্বোধনটুকু সার্থকতায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। উদাস হয়ে ওঠে মন। দৃষ্টিহীন চোখ অনেক দূর পর্যন্ত ভেসে যায়। সামনের পাহাড় ডিঙিয়ে, দূরের দিক্‌চক্রবাল ভেদ করে। আনন্দে উত্তেজনায় চোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। সত্যি, কাবেরী বড় ভালো মেয়ে।

দূরের সীমান্ত থেকে চোখ ফিরে এলো, আঁচলে চোখের জল মুছতে গিয়ে আনন্দের হাসিতে ভরে উঠলো সারা মুখ। বারান্দায় বেরিয়ে এলেন ঘরের জানালা ছেড়ে। উনুনের গরমে কাবেরীর মুখ লাল হয়ে উঠেছে, ঘাম ঝরছে কপাল থেকে। তবু একমনে রান্না করছে বসে বসে। সমস্ত বুক ভরে কাবেরীকে দেখলেন, যেন বুকের মধ্যে কাবেরীর শরীরটা টেনে নিলেন কল্পনার আলিঙ্গনে, স্নেহে, প্রীতিতে, আশিস-অশ্লেষে। সুন্দর, অদ্ভুত সুন্দর মনে হলো। দেহের প্রতিটি শিরায় যেন স্বাস্থ্যের জোয়ার এসেছে।

না, আর দেরি করা উচিত হচ্ছে না। এ বয়সটাকে, এই রূপের প্রাচুর্যকে ভয় করতে হয়। আর, আর এই নোংরা কৌরব রাজত্বকে আরো বেশী ভয়।

ছত্রিশটা জাতের মানুষ দিনরাত চলাফেরা করছে বাড়ির আনাচে-কানাচে। সুতোকাটা ঘুড়ির মতো বেপরোয়া উড়ে উড়ে বেড়ায় ছেলেগুলো, কেউ শিস দেয়, কেউ বা চিৎকার করে কানে-আঙুল-দেওয়া কথা বলে। ভদ্রলোক তো নয় যে, সম্মান-অসম্মানের কথা ভাববে। বাপ-মাগুলোও যেমন সব ছন্নছাড়া! কেউ বেজাতে বিয়ে করেছে, কেউ বা বিয়ে করেছে কি না তাই সন্দেহ। ছেলেগুলো দেখে শিখছে, ভালো হবে কোত্থেকে।

আর, ওদেরই বা দোষ কি। কুলিমজুর থেকে কেরানীবাবুরাও তো নকল করছে ওই সাহেবসুবোদের।

ছি ছি ছি! মনে পড়তেও ঘেন্নায় মন বিষিয়ে যায়। প্রথম প্রথম ছেলেমেয়েদের নিয়ে সাহেবপাড়া দিয়ে বেড়াতে যেতেন, কিন্তু ওই একটা দিনের পরই ওদিকে বেড়ানো বন্ধ করে দিয়েছেন। ভাগ্যিস ছেলেমেয়েদের চোখে পড়েনি! হায়ালজ্জা বলে কি নেই কিছু ওদের?

না, দেশে হলে কাবেরীর বিয়ে দু' বছর পিছিয়ে গেলেও ভয় পেতেন না, ভাবনা হতো না। এখানে এই পাপের রাজত্বে কোন্ ভরসায় থাকবেন।

কিন্তু দলবল নিয়ে তারা যে মেয়ে দেখে গেল, কই তাদের চিঠিও তো এলো না এখনো।

এক হয়ে মিশে গেছে সকলে।

যন্ত্রের যন্ত্রণা। অক্টোপাসের অজস্র বাহুর বন্ধন যেন এক গোষ্ঠীতে বেঁধে ফেলেছে সকলকে। দেহাতী ওঁরাও, ছত্রিশগড়ের রেজারোজমজুর। ব্যাঙ্গালোরের অ্যাংলো আর কাথিয়াবাড়ের সওদাগর। অন্ধ্রবাসী করণিক আর আলিগড়ের খালাসী। সব জাতের আর সব ধাতের মানুষ এসে মিলেছে এখানে। মিশে গেছে।

সাহেবপাড়াটা একটু তফাত হয়ে চলে, একটু কাঁধ বাঁচিয়ে। কৌলীন্য বজায় রেখে। শুধু দু-চার দিন দু-চার মুহূর্তের জন্যে এক স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়।

হ্যাঁ। ব্রিজলাল আসতে পেয়েছে আজকের মজলিসে। আর অনুপমও। তার কারণ, এ জলসার খরচ এসেছে ব্রিজলালের সিন্দুক থেকে।

ছোটসাহেব স্যামুয়েল বলেছিলো, শুধু ডালি পাঠালেই কাজ হয় না ব্রিজলাল। তোমার সে আগেকার ম্যানেজার যে এখন ব্যাগ আর ব্যাগেজ নিয়ে এডেন পেরিয়ে গেছে। নতুন ম্যানেজার বড় কড়া লোক, ইন্‌জাসটিস দেখতে পারে না।

ব্রিজলাল হেসে বলেছিলো, কোসিস করলে সাব তুমিই করে দিতে পারো।

—ব্রিজলাল, দ্যাট ওয়াজ এ রেজিং কন্‌ট্রাক্‌ট অ্যান্ড দিস ইজ—

—টিম্বার সাপ্লাই। অনুপম পূরণ করে দেয়।

শেষকালে নাছোড়বান্দা ব্রিজলালকে উপদেশ দিয়েছিলো স্যামুয়েল, একটা ভালোরকমের পার্টি দিতে। হ্যাগিন্স যাতে বোঝে যে, ব্রিজলাল একজন সলিড বিজনেসম্যান। তারপর

আঙুর আপেল আখরোটের তলায় আধ ডজন হোয়াইট হর্স নয়তো ব্ল্যাক লেবেল আর তার তলায় পার্চমেণ্টে ছাপা হিজ ম্যাজেস্টির ছবি দেখলে—

কথা শেষ করেনি স্যামুয়েল। ওর অর্থপূর্ণ হাসিই বক্তব্য ফুটিয়ে তুলেছিলো।

তাই। তাই আজকের এই পার্টিতে আসার ছাড়পত্র পেয়েছে ব্রিজলাল। আর অনুপম।

কোলিয়ারীর ইনস্টিটিউট হল আজ আলোয় ঝলমল করে উঠেছে।

রঙ আর রূপের আতিশয্য, আলো আর উন্মাদনা।

—জুডি গার্লাণ্ড একজন রিয়াল লেডী হয়ে উঠেছে।

—আমাদের ব্ল্যাক ডায়মণ্ড ক্লাব হকিতে হেরে গেল রেলওয়ের সঙ্গে?

—ম্যাক্‌টা দিন-কে-দিন বড় ইউকজোরিয়াস হয়ে উঠছে কেন?

ইনস্টিটিউট বিল্‌ডিঙের সামনে বিস্তৃত ঘাসের লন। ওপর থেকে দেখলে চক্রগোল উদ্যানটিকে দেখায় যেন স্টিয়ারিঙের মতো।

হ্যাগিন্স বসে আছে নিশ্চুপ। আর, ওর স্থিরনিবদ্ধ চোখ পড়েছে ফার এণ্ডের ঘাসের পাখার আড়ালে আর এক জোড়া কৌতুকী চোখের ওপর।

ব্রিজলাল আর অনুপম চরকির মতো ঘুরছে। তত্ত্বাবধানের ভার যে ওদেরই ওপর। শুধু মাঝে মাঝে এসে দাঁড়াচ্ছে বিনয়াবনত মস্তকে, হ্যাগিন্সের পিছনে। স্যামুয়েলের ইশারায় কাজ করে চলেছে।

নেশার ঘোর হ্যাগিন্সের চোখে। উঠে দাঁড়ালো ও। ধীরে ধীরে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। গোল থামটার পাশে।

একে একে আলো নিবে আসছে। যেন বাসরযামিনী মিইয়ে এলো ক্রমশ। আলোর আনন্দ, হাসির হঠকারিতা, রঙের রঞ্জনী নিস্তব্ধ হয়ে এলো।

সবুজ ঘাসের লনে পায়চারি করছে হ্যাগিন্স আর স্যামুয়েল। আর পিছনে পিছনে ছায়ার মতো এ'টে আছে ব্রিজলাল।

স্যামুয়েল বললে, ব্রিজলাল ওর ফরেস্টে যেতে ইনভাইট করছে একদিন।

—ফরেস্ট? হাসলে হ্যাগিন্স।—কি আছে সেখানে? ওক্‌স অ্যাণ্ড পাইন্‌স, বার্ডস অ্যাণ্ড বীস্টস? আমি পোয়েট নই, মিস্টার স্যামুয়েল।

স্যামুয়েল বললে, হাণ্টিঙে তো যেতে পারেন।

—ইয়েস। হাণ্টিং—চমৎকার। আই উড রাদার।

—চলুন না একদিন ফরেস্টে, সব কিছু ব্রিজলাল অ্যারেঞ্জ করে দেবে।

হ্যাগিন্স চমকে চোখ তুললে।—কি আছে সেখানে, কি পাওয়া যাবে?

—বাঘ ভালুক হরিণ। পর্কুপাইন গিনিপিগ, ওয়াইল্ড বোরস্‌ সবই আছে।

সশব্দে হেসে উঠলো হ্যাগিন্স।—অ্যানিমেল্‌স? ওসব আমার হবি নয়।

—পাখি?

—রিয়াল ইণ্ডিয়ান মেয়ে আছে সে জঙ্গলে? লাইভ্‌লি গরম রক্তের মেয়ে আছে?

ব্রিজলালের মোটরখানাকে পাশ কাটিয়ে যাবার রাস্তা করে দিলেন রাজেনবাবু। বাইক থেকে নেমে।

ব্রিজলালও গাড়ি থামাতে বললে কিষণলালকে।

—ডাগদারসাব যে। রুগী দেখতে চলেছেন?

—না। রুপেয়ার খোঁজে।

ব্রিজলাল হাসলে। মাহাৎমাজীও বলতেন, আমি বেনিয়া। পাঁচ পাঁচ রুপেয়া না দিলে দস্ত্‌খত মিলতো না।

রাজেনবাবু খুশী হলেন যেন একটু! বিদায় নেবার জন্যে বললেন, চলি শেঠজী। কাজ আছে অনেক।

—দশ হাজার বিশ হাজার টাকায় কি শেঠ হওয়া যায় ডাগদারসাব। শেঠজী বলবেন না আমাকে। ব্রিজলাল হেসে বললে। তারপর আত্মগর্বে আপ্লুত হয়ে হঠাৎ মনে পড়েছে

এমনি মুখের ভাব এনে বললে, তবে হ্যাঁ, মাঝাং পাহাড়ের জঙ্গলটা ইজারা নিয়েছি। ভগ্‌বান কিরপা করলে শেঠ বনতেও পারি।

—তাই নাকি? ভালো ভালো। লক্ষ্মী তো আপনাদের ঘরেই বাঁধা শেঠজী!

রাজেনবাবু বাইকে উঠলেন। কৃত্রিম হাসি হেসে।

ব্রিজলাল বললে, চলুন না এক রোজ ডাগদারসাব, শিকার-উকারের শোখ থাকে তো। মানিজার হ্যাগিন্স সাহাবও যাচ্ছেন, আগে হপ্তায়। আপনার লেড়কিদেরও নিয়ে চলুন না, বহুত খুশী হবে বাচ্চারা।

প্যাডেল করতে করতে রাজেনবাবু বললেন, আচ্ছা ভেবে দেখি।

এদিকে তখন বাঁধানো বেদীটার ওপর দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে কাবেরী। সোলার হ্যাট আর সাইকেলের চলন্ত চাকা একটা ছোট্ট কালোর বিন্দুতে মিশে গেল। পিছনে লাল ধুলো উড়িয়ে গেল নীল রঙের মোটরখানা।

তন্ময়তা ভাঙলো কাবেরীর। হাতের ভিজে কাপড়টা মেলে দিতে দিতে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস উঠলো বুক নিঙড়ে।

—দিদি! শিবু ছুটে এলো।

কাবেরী সস্নেহে তার দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলে, কি রে?

ঠোঁটজোড়ার ওপর কচি অনামিকার চাপ পড়লো আড়াআড়িভাবে। ইশারায় আর চোখ-মুখের সযত্ন সতর্কতায় শিবু জানালে, চু-প্।

কাবেরী দ্রুত নেমে এসে শিবুকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

ফিসফিস করে বললে, আচ্ছা দাঁড়া। চট্ করে ঘরের ভেতর থেকে ঘুরে এসে কাবেরী জানালে, নেই। বল কি বলছিলি।

—অনুপমদা এসেছে।

কাবেরী হেসে বললে, কোথায়? তোর সঙ্গে দেখা হলো?

—হ্যাঁ, তোমাকে মন্দিরে যেতে বললে।

—আচ্ছা, বল গে যা একটু দাঁড়াতে। যাবো এখনি।

কাবেরীর স্বরটা একটু হয়তো স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো, শিবু সাবধান করে দিলো—স্‌শ্। আস্তে, মা শুনতে পাবে।

কাবেরী হাসলে।—ডেঁপো ছেলে!

শিবু ছুটে চলে যাচ্ছিলো, কাবেরী আবার ডাকলে।—শোন। ঘরে ঢুকলে কাবেরী। পুজোর উপচারে সাজানো রেকাবিখানা তুলে মা-র উদ্দেশে বললে, মন্দিরে চললাম মা। পুজোটা দিয়ে আসি।

ভেতর থেকে জবাব এলো, শিবুকে সঙ্গে নিয়ে যা।

—হ্যাঁ, নিয়ে যাচ্ছি। আয় শিবু। শিবুর উদ্দেশে ডাক দিলে।

চৌকাঠ ডিঙোবার সময় বললে, ডালটা চাপিয়ে গেলাম মা, দেখো যেন পুড়ে না যায়। আর দীনভজন এলে বোলো চৌবাচ্চাটা পরিষ্কার করে দিতে।

—আচ্ছা, দেরি করিস নে যেন। মা উত্তর দিলো।

তর্‌তর্ করে দ্রুত পায়ে কাবেরী এসে পৌঁছলো মন্দিরে। এতটা ঘোরপ্যাঁচ রাস্তা, দু মিনিট সময় লাগলো না তার। তাল রাখতে পারলে না শিবুও।

দূর থেকে চোখাচোখি হলো অনুপমের সঙ্গে। ফিক্ করে হেসে ফেলে পরক্ষণেই আবার গম্ভীর হয়ে এলো কাবেরীর মুখ। না, এত সহজে ভোলবার মতো ঠুনকো মেয়ে নয় ও। ঠান্ডা প্রকৃতি বলে কি রাগ থাকবে না শরীরে?

হিন্দুস্থানী পুরোহিতের সামনে রেকাবিটা রেখে শিবুকে অপেক্ষা করতে বললে।—খবরদার, উঠো না কিন্তু এখান থেকে। যতক্ষণ না আসি বসে থাকবে।

শিবু ঘাড় নেড়ে মার্বেলের মেঝেতে বসে পড়লো।

কাবেরী সরে এলো মন্দিরের পিছনে, সারা অঙ্গে সিঁদুর মেখে হনুমানজীর মূর্তিটি

যেখানে জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে আছে, তার আড়ালে।

কাছে আসতেই অনুপম বললে, বাব্বা, পাকা দু'টি ঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছি।

অভিমানের ভান করে রইলো কাবেরী। চোখ তুললে না। শুধু আস্তে আস্তে বললে, কথা বলবো না আমি তোমার সঙ্গে।

—সে কি? অনুপম হাসলে।

—হ্যাঁ, কোনো সম্পর্ক নেই তোমার সঙ্গে।

—যারা দেখতে এসেছিলো, চিঠি দিয়েছে বুঝি পছন্দ হয়েছে বলে?

ক্রুদ্ধ চোখ তুলে অনুপমের দিকে তাকালে কাবেরী, উত্তর দিলে না।

অনুপম বললে, হপ্তায় একটা দিন দশ মিনিটের জন্যে কথা বলতে পাই, তাও যদি মুখ ভার করে থাকো, চলে কি করে বলো তো?

—বেশ তো, না এলেই পারো।

—রাগ করেছো, না? কিন্তু দোষটা কি করলাম, তা বলো?

এইবার অভিমানে ফেটে পড়লো কাবেরী।—দোষটা কি করলাম! এ দু' দিন ছিলে কোথায় শুনি?

অনুপম ওর কাঁধের দু'পাশে দুটো হাত রেখে ওকে কাছে টেনে আনলে। আঁচলটা তুলে কাবেরীর মাথায় ঘোমটা টেনে দিতে দিতে বললে, বউ হলে তোমাকে ভারি সুন্দর মানাবে কিন্তু।

ফিক্ করে হেসে ফেলেই দাঁতে ঠোঁট চাপলে কাবেরী। কাঁধ থেকে অনুপমের হাতটা নামিয়ে দিলো কপট রাগে।

কাবেরীর নাকটা ঈষৎ টেনে দিয়ে অনুপম বললে, আহা চটছো কেন, শোনোই না কি হয়েছিলো।

—কি হয়েছিলো? বলো, একটা কিছু তো তৈরি করেই এসেছো।

—না গো না। সত্যি বলছি, দু' দিন ধরে জ্বর হয়ে পড়ে ছিলাম।

—মিছে কথা।

—বেশ তো, তোমার বাবাকেই জিজ্ঞেস করে দেখো। সত্যি বাপু, তোমার বাবার মতো এমন ডাক্তার দেখিনি। ঠিক একটি দাগ ওষুধ খেতে না খেতে—

কাবেরী হেসে ফেললে। বললে, এতও মন যুগিয়ে চলতে জানো। যাই বলো, আমি বিশ্বাস করছি না তোমাকে।

—সত্যি কি না টের পাবে দু-এক দিনের মধ্যেই। ভয় দেখানোর স্বরে বললে অনুপম।

—কেন? কি করে টের পাবো?

—জ্বরের ঘোরে তোমার বাবার সামনেই যে তোমার নাম ধরে প্রলাপ বকেছি।

আশঙ্কায় চোখ তুলে তাকালে কাবেরী।—সত্যি? বাবার সামনে?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ।

—ছি ছি ছি। বাবা কি মনে করবে বলো তো! আর মা যদি শোনে—

—ঠেঙিয়ে পা খোঁড়া করে দেবেন তোমার, না?

—হাসছো তুমি? তুমি কি বলো তো? ছি ছি ছি, লজ্জায় আমি—

অনুপম হেসে বললে, ভয় নেই, প্রলাপ বকেছিলাম সত্যি, তবে তোমার বাবার সামনে নয়। একা একা।

—জ্বরের ঘোরে বুঝি জ্ঞান থাকে? কি করে বুঝলে বাবা ছিলো কি না-ছিলো?

—তাও তো বটে!

কাবেরী খিলখিল করে হেসে উঠলো এবার।—পাজী। সব মিছে কথা তোমার।

অনুপমও কৌতুকের হাসি হাসলে।

রোদ বাড়ছে। দুপুরের আগুনে সব যেন কেমন ঝিমিয়ে পড়েছে। সাড়াশব্দ নেই, জনমনুষ্য নেই যেন কোথাও। শুধু কয়েকটা কাককোকিলের নিঃস্ব চিৎকার উষ্ণ হালকা

হঠাৎ-ঝড়ের বাতাসে। দীর্ঘশ্বাস যেন। আর পায়ের তলায় বাঁধানো পাথরের আঙিনাও যেন জ্বরাতুর। উষ্ণ। শঙ্কিত অভিসারিকার মতো ব্যর্থ স্পন্দন বাতাসের বুকে। আর ভয়ার্ত নিঃশ্বাস।

মন্দিরের পিছনেই একটা মহুয়া গাছ। পাশেই আরেকটা। তার পাশে আরেকটা। ওদের পায়ের শব্দে একটা মেঠো খরগোশ ছুটে পালালো। একটা গাছের তলায় এসে বসলো ওরা দুজনে। অনুপম আর কাবেরী। লতাপাতার ঝোপের ভিতর থেকে একটা বহুরূপী একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে ওদের দিকে।

—কি ভাবছো?

হেসে চুপ করলো কাবেরী, উত্তর দিলো না।

—দুপুরটা বড় একা একা কাটে, না? অনুপম আবার প্রশ্ন করলো।

উদাস চোখ মেলে কাবেরী উত্তর দিলো, আগুন জ্বালাতেই জানো।

একটা ঘাষের শিষ তুলে দাঁতে কাটলে অনুপম।—চাকরি ভালো লাগে না।

—চলো উঠি।

—বোসো না আরেকটু। থাক্, চলো।

উঠলো না কেউই। বসে রইলো।

বসে থাকলে চলে না লখিয়ার। শাঁওনের বসে থাকাই কাজ। পাহাড়ের গা বেয়ে ভাঙা পাথরের বাধা ঠেলে ঠেলে নেমে আসছে রূপাঝিলের স্রোত। মাঝাং পাহাড়ের আশ্লেষী স্বপ্ন বুকে বুনে ঢলে পড়ছে রূপাঝিল। আর প্রতি পদক্ষেপে তার টুকরো পাথরের পুরুষালী বাধা। পরিরম্ভবিভ্রমার মতো কেঁপে নামছে নির্ঝরতরঙ্গ। সম্ভ্রমালিঙ্গিতা তটিনীর অকস্মাৎ আত্মসমর্পণ যেন। দোসরের খোঁজে দয়িতা ছুটেছে। পথের বাঁকে বাঁকে ত্রস্তগমনার ত্রস্তবসনে অচিন পুরুষের আকর্ষণকে আঘাতে উপেক্ষা করে ছুটে নেমে আসছে রূপাঝিল।

ঝর্না যেখানে নদী হয়েছে। মাঝাং পাহাড়ের গায়ে ডেরা বেঁধেছে শাঁওন।

আগে কখনও হয়তো এখানে একটা শ্মশান ছিলো। এক ইঁটের দেওয়ালে ঘেরা ক'খানা ঘর, টালিতে ছাওয়া একটুখানি চবুতরা।

কোণের দিকের ঘরখানা চৌকিদারের। শাঁওন আর লখিয়া বাসা বেঁধেছে সেখানে। আর আর ঘরগুলো, চত্বরের চারিপাশ নতুন করে গড়ে তুলেছে ব্রিজলাল। বনপতির আপিস আদালত আবাস সব কিছু। হপ্তায় দু' দিন অনুপমকে এসে থাকতে হয় এখানে। তাই ওর জন্যেও আছে একখানা।

মাসে তিন টাকা উপরি শাঁওনের। ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখার ভার লখিয়ার ওপর। পরিচ্ছন্নতা ভালোবাসে ও, তাই নিজের খুশিতেই করতো কাজটা। আর সেই সুযোগে উপরি তিন টাকার কথা চেপে গিয়েছিলো শাঁওন। লখিয়াকে জানতে দেয়নি।

আজ নাকি ব্রিজলাল আসবে। জঙ্গল দেখতে। সঙ্গে আসবে ব্রিজলালের বন্ধু-বান্ধব, বাঙালীবাবু আর কোলিয়ারীর ম্যানেজার হাগিন্স সাহেব। অনুপম খবর পাঠিয়েছে আগে থেকে।

শাঁওন হাতের লাঠিটা ছুরি দিয়ে চেঁচে সমান করতে করতে বললে, লখিয়া, মানজার-বাবুর কোঠি সাফ করে রেখেছিস?

ল্যাজে-পা-দেওয়া সাপের মতো ফোঁস করে উঠলো লখিয়া। ঘাড় ফিরিয়ে তাকালে শাঁওনের দিকে।

ঝাঁঝিয়ে উঠে বললে, কেন? কেনা গোলাম নাকি আমি মানজারবাবুর? আমাকে কি তঙ্খা দেবে হর মহিনা, যে ঝাড়ু লাগাবো ওদের ঘরে?

—নিমকহারাম!

—নিমক খাই আমি মানজারবাবুর?

—তো চাউল কেনবার রূপেয়া কে দেয়? ভাজিতরকারি কিনিস কোন্ টাকায়?

—চৌকিদারির জন্যে দেয়, ঝাড়ুদার নাকি আমি?

—বক্‌বক্‌ করিস না লখিয়া। ঘরগুলো সাফ করবি কি না বল?

—না। বিবি না বাঁদী আমি তোর, যে হুকুম তামিল করবো?

রাগে দপদপ করে উঠলো শাঁওনের কপালের শিরাটা।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠলো।—চুপ বদমাশ কাঁহাকা।

লখিয়া হাসলে।—চোর আর ডাকু বদমাশ নয়?

ব্যাস। পরমুহূর্তেই অস্ফুট একটা শব্দ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো লখিয়া।

চুপ করে বসে রইলো শাঁওন, চৌকিটার ওপর। লখিয়াকে তোলবার চেষ্টা করলো না। ইচ্ছে হলো না লাঠিটা কুড়িয়ে আনবার। লখিয়ার গোঙানিতেও টললো না। মরুক, মুর্দা টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেবে রূপঝিলের জলে।

কিন্তু মরবার মেয়ে নয় লখিয়া, শাঁওনের হাতে এমন অনেক অত্যাচার সহ্য করেছে সে এর আগেও। চোটের দাগ শুকুতে লেগেছে দু-চার দিন, ফাটা-কাটার ব্যথা যেতে।

তিন বছরের সংসার ওদের। ভালোবাসতেও যেমন উদ্দাম, বাসা ভাঙতেও তেমনি সময় লাগে না লখিয়ার। অদ্ভুত ধাতের মেয়ে।

বিয়ে হয়েছিলো লখিয়ার দলের সর্দার বুড়ো রতনলালের সঙ্গে। তারপর রতনলালের সঙ্গেই বিলাসপুর ছেড়ে এসে রেজার কাজ নিয়েছিলো রেলের কারখানায়। শাঁওনের সঙ্গে প্রথম পরিচয় ওর সেইখানেই। পালিয়ে এলো রাঁচী। লোহারডাগায় তখন নতুন লাইন খোলার কাজ হচ্ছে। তারপর। তারপর আরগাডা। কয়লাখনির অন্ধকার গহ্বর থেকে কয়েদখানার নিঝুম নিস্তব্ধতা।

ভাবতে বসলে সব ভালো করে মনেও পড়ে না লখিয়ার।

চুল্লিতে কাঠের জ্বাল বাড়িয়ে দিতে দিতে একবার উঁকি মেরে দেখলে। শাঁওন নেই কাছেপিঠে। সকালে সেই যে বেরিয়েছে ফেরে নি এখনো। হয়তো অনুশোচনা হয়েছে।

নিজের মনে হাসে লখিয়া। ও যে আগেভাগেই ঘরদোর সাফ করে রেখেছিলো, শাঁওনের বলার আগেই—এ-কথা শুনলে কি ভাববে শাঁওন? হয়তো দুঃখ হবে তার, ভাববে মানজার-বাবুর সঙ্গে পেয়ার হয়েছে তার। ভাবলে ভালোই। তাই চায় লখিয়া। কেনা বাঁদী নাকি ও শাঁওনের, না বিয়ে-করা জরু।

ফুটন্ত জলের ডেক্‌চিটা দু' হাতে ধরে চবুতরায় গিয়ে হাজির হলো লখিয়া।

আধ ডজন কেদারা পেতে বসে আছে ওরা। ব্রিজলাল, অনুপম, হ্যাগিন্স সাহেব। আরো কয়েকজন! চেনা আর অচেনা।

—গরম পানি। অনুপমের চোখে চোখ রেখে লখিয়া বললে।

আর লখিয়ার যৌবনোচ্ছল দেহের দিকে মোহগ্রস্ত চোখে তাকিয়ে হ্যাগিন্স হঠাৎ বলে উঠলো, হিয়ার্স এ গেম ফর মি।

—আমার কুঠরিতে রাখবি যা। অনুপম বললে।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আচ্ছা চল্‌, আমিও যাচ্ছি।

লখিয়ার পিছনে পিছনে এলো অনুপম। ডেক্‌চিটা মেঝের ওপর নামিয়ে রেখে লখিয়া বললে, চায় বানাবি বাবু?

—হুঁ, এগুলো ধুয়ে এনে দে তো, জল আছে ঐ বাল্‌তিতে।

লখিয়া মৃদু হেসে পেয়ালাগুলো ধুতে শুরু করলে।

এক ফাঁকে পিছন ফিরে অনুপমকে বললে, শাদি কর বাবু, খুবসুরত একটা জরু নিয়ে আয়, সে করবে এ কাজ।

অনুপম বললে, জরু আনতে হলে যা জরুরত তা যে নেই। রুপেয়া কোথায়?

—মানজারবাবুর রুপেয়া নেই? খিলখিল করে অবিশ্বাসে হেসে উঠলো লখিয়া।

—করবো শাদি, একটা ভালো মেয়ে এনে দে।

—কোন্‌ কিসমের মেয়ে? মেমসাব না বাদশার বেগম?

—না, সুন্দর হবে, এই ধর্‌—

—লখিয়ার মতো? নিজের কথায় নিজেই হেসে উঠলো লখিয়া। তারপর চট্‌ করে উঠে

পড়লো।

অনুপম হেসে বললে, হ্যাঁ, তোর মতো।

লখিয়া ফিরে দাঁড়ালো। বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বললে, খুনী আসামীর ঘর করি আমি।

অনুপম সহজ হবার চেষ্টা করে বললে, চা খাবি না?

লখিয়া উত্তর দিলে না! তরতর করে দ্রুত পায়ে চলে গেল!

একটু পরেই এলো ব্রিজলাল। একমুখ হেসে বললে, সব ঠিক হয়ে গেল অনুপমবাবু।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালে অনুপম।

—রুপেয়া লাগবে থোড়াবহু। আর—

—আর?

হাসলে ব্রিজলাল।—দু' দিন বাদ, এত জল্‌দি কিসের। হাঁ, পান্‌ শো রুপেয়া ইনাম মিলবে তোমার। কাজ হাসিল করলে।

কৃষ্ণপক্ষের রাত।

জানালা খুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো অনুপম। চোখ ছুঁড়ে দিলে বাইরের দুনিয়ায়। না-নিদ্‌ নিশীথের অন্ধকার আসমানে। দূরে কোথায় একটা ময়না না মুনিয়া শিস দিচ্ছে মেকী সুরে। আর ঠাণ্ডা বাতাস। দেওয়ালের গা ঘেঁষে উঠেছে একটা কিশোর আমলকী গাছ। সিরসির করে নড়ছে পাতাগুলো। নির্বাতি রাত। শব্দ নেই, নেই এতটুকু আওয়াজের লেশ। না, দূরের রেললাইনে একটা মালগাড়ির শাণ্টিং ধ্বনি তুলছে। ঝনঝন ক্যাঁচকোঁচ নানারকমের ভাঙা টুকরো শব্দ। হঠাৎ-জাগা কঙ্কালের প্রতি-অঙ্গের ঠকঠক আওয়াজ উঠলো যেন।

লণ্ঠনটা জেবলে টেবিলে রাখা টাইমপীসটার দিকে তাকালে অনুপম। না। সময় হয়নি এখনো।

হুসহুস শব্দ করে ইঞ্জিনটা এগিয়ে গেল। ছোঁ-মারা চিলের মতো দ্রুত। মাটিতে পা পড়ে না যেন।

ধোঁয়া দেখা গেল না। শুধু খুচরো কয়েকটা স্ফুলিঙ্গ বিপরীত বাতাসে উড়ন্ত আঁচলের মতো পিছনে দুলতে দুলতে নিবে গেল।

কুঁজোটা উপুড় করে তুলে ধরে ঢকঢক করে খানিকটা ঠাণ্ডা জল খেলো অনুপম।

জংশন-স্টেশন ছোটামুরীর বিশ্রামঘরে ব্রিজলাল হয়তো ঘুমের ঘোরে নাক ডাকাচ্ছে এতক্ষণে। আর শাঁওন? না, বিশ্বাসঘাতক নয় ও। জেগে বসে পাহারা দিচ্ছে ব্রিজলালের জিনিসপত্তর। লাতেহার থেকে দূরে, আরগাড়া থেকে দূরে। হ্যাঁ, লখিয়ার কাছ থেকে অনেক দূরে।

রেলের স্লিপার পাসিং অফিসার এসেছে ইন্‌স্পেকশনে। নতুন ঠিকাদারির লোভে ছায়ার মতো তার পিছনে পিছনে ঘুরছে ব্রিজলাল আর ব্রিজলালের পিছনে শাঁওন।

—খুনী আসামী ও।

লখিয়ার কথাটা মনে পড়লো। একটা কেমন যেন ব্যথা বোধ করলে অনুপম। মায়া, মমতা, মোহ।

না। তার চেয়ে বড় টান বোধ করছে অনুপম। অন্য দিকে। কর্তব্য অপেক্ষা করছে তার পথ চেয়ে। রাত গভীর হয়ে আসুক। নিস্তব্ধ হয়ে যাক সারা দুনিয়া। তারপর!

কাবেরীর চোখে অশ্রুর কণা চকচক করছে। কাবেরী, কাবেরী! কি এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ, আস্বাদ-অনভ্যস্ত অপূর্ব এক মিষ্টতা। কাবেরী, কাবেরী।

বিছানায় শুয়ে পড়লো অনুপম। ঘুম নামছে না তার চোখে। না, ঘুম চায় না ও, ঘুমকে সরিয়ে রাখতে চায় আজ।

শার্টের বুকে লেগেছিলো দু' ফোঁটা চোখের জল। বুকের ওপর লুটিয়ে পড়ে অনুপমকে আঁকড়ে ধরে থরথর করে কেঁপে উঠেছিলো কাবেরী! কান্না রোধ মানাতে পারেনি।

অশ্রু দু' ফোঁটা শুকিয়ে গেছে, তখনই হয়তো শুকিয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু। হ্যাঁ, আজও

যেন বুকের সেই জায়গাটায় তপ্ত অশ্রুর আর্দ্র স্পর্শটুকু অনুভব করছে সে।

বুকের ওপর ভেঙে পড়ে কাবেরী জানিয়েছিলো, তার সুখের দিন শেষ হতে চলেছে। অনুপমকে উদ্ধারের পথ খুঁজে বের করতে অনুরোধ জানিয়েছিলো সে। না, না—এমন অনাকাঙ্ক্ষিত বিবাহমিলনের ভার যদি তার কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হয়, তা হলে—না, কাবেরী বাঁচতে পারবে না।

অনুপম ভরসা দিয়েছিলো, ভয় কি!

কাবেরীর সজল চোখ খুশিতে ভরে উঠেছিলো। আরো, আরো কিছু শোনবার আশায় মুখ তুলে তাকিয়েছিলো কাবেরী।

—সব ছেড়েছুড়ে চলে যেতে পারি, সব লোকসান সয়ে। কিন্তু, কোথায় যেতে চাও কাবেরী?

—যেখানে খুশি তোমার, যেদিকে ইচ্ছে। শুধু অনেক, অনেক দূরে।

আর ভাবতে পারে না। ক্রমশই অধৈর্য হয়ে উঠছে অনুপম।

ধীরে ধীরে ঘড়িটার কাছে সরে এলো অনুপম। কান পেতে পরীক্ষা করলে ঘড়িটা চলছে কি না। টিকটিক টিকটিক শব্দ শুনে সন্দেহ দূর হলো।

লখিয়াটা হয়তো ভীতু ভাববে অনুপমকে। হয়তো মনে মনে বলবে, মরদ নও তুমি,. জেনানার জান তোমার ছাতির নীচে।

বুকের একটা কোণে কেমন যেন খচখচ করে লাগে।

—ছত্তিশগড়ের রয়তাইন আমি, মাটির পুতলি নই।

তপ্ত নারীদেহের সক্ষম আলিঙ্গন অনুভব করছে যেন অনুপম, বুকের কাছে। তার সারা দেহ অবশ হয়ে পড়েছে, মুখের ওপর যেন নেমে আসছে উত্তপ্ত নিঃশ্বাসের মদির নেশা।

কিন্তু। লখিয়া নয়, কাবেরী। দেহ নয়, মনের ভিখারী সে।

লখিয়া দুঃখ পাবে। তা পাক, কাবেরী এতক্ষণে হয়তো উঠে বসেছে। হয়তো একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ঘড়ির কাঁটার দিকে।

কাবেরী। অনেক অনেক দূরে কোন-এক অজানা দেশে নতুন ঘর বাঁধবে অনুপম। জানা শহরেও যেতে পারে। জনতার জঞ্জালে মিশে গিয়ে সংসার বাঁধবে।

আচ্ছা, লখিয়া কি ব্যথা পাবে? সত্যিই কি অনুপমকে ভালোবেসেছে লখিয়া? ভালোবাসা! মনে মনে হাসলে অনুপম, এমন উদ্ভট কল্পনাও তার মন জুড়ে বসতে পারে! পাহাড়ী নুড়ির মতো এখানে-ওখানে ঘা খেয়ে অনেক পথের স্পর্শ কুড়িয়ে নীচে গড়িয়ে পড়াই যার জীবন, সেও ভালোবাসবে! আর তাও কিনা অনুপমের মতো সরল পথের পান্থকে!

ভুল! অনুপমেরই মনের ভুল!

জারার আগুন ওর চোখের তারায়, বুকে অরণ্যতুফান। শুধুই চলার উন্মাদনা, জীবনের উন্মাদনায় মানুষ লখিয়া। মুক্তির নেশাতেই ওর ঘর ভাঙা। পৃথিবীতে আরো মানুষ আছে, আরো বন্ধন, তা যদি জানতো লখিয়া। ও যেন একাই দুনিয়ার সম্রাজ্ঞী। ওর ইচ্ছাই যেন আকাশ, মাটি, আলো। নাকি রোদ, বর্ষা, জনারের ক্ষেতে তাদের প্রাণস্পন্দনের তিল তিল দিয়ে গড়ে তুলেছে লখিয়ার তিলোত্তমা মন? বেড়া মানে না, বাঁধ মানে না। কোনো ঝুটা কানুন, কোনো মিথ্যার জালে জড়িয়ে পড়বার মতো লাক্ষার কীট নয় ও। জালে জানালা বন্ধ হবার আগেই পায়ের সুতো কেটে ফেলতে ভয় পায় না, মুছে ফেলতে সময় লাগে না স্মৃতির পদচিহ্ন।

মাঝাং পাহাড়ের জঙ্গল বুঝি বা লখিয়ার মনকে ইজারা নিয়েছে। আরণ্যক আদিম-কন্যা লখিয়ার শরীরে শুধুই জীবনের উত্তাপ, মনের শোণিতশিরায় শুধুই প্রাণস্পন্দন।

তবু কোথায় যেন একটা কোমল কামনার আশ্লেষ বোধ করছে অনুপম। লখিয়া। মধুর নয়, মনোরম নয় এ নাম। কি এক কঠিন দৃঢ়তা এই নামটিতে, কি এক অফুরন্ত যৌবনের ডাক।

—বাবুজী, বড় বেদর্দী মানুষ এই শাঁওন। ওর কাছ থেকে আমাকে নিয়ে চল্ বাবুজী,

ওর হাতে আমাকে একদিন-না-একদিন জখম হতে হবে হয়তো। চুল্লিতে বড় বড় ভিজে কাঠের জাল ঠেলতে ঠেলতে বলেছিলো লখিয়া। আর সারা মুখ ওর ধোঁয়ায় আবছা হয়ে গিয়েছিলো বলেই সেদিন লখিয়ার চোখের জলকে চিনতে পারেনি অনুপম।

বলেছিলো, আমাকেও তো একদিন এমনি ছেড়ে পালাবি, হয়তো হ্যাগিন্সের সঙ্গেই।

—আফসোস! সুর টেনে টেনে বলেছিলো লখিয়া, তারপর চোখেমুখে কৌতুকের হাসি ছিটিয়ে বলেছিলো, ডেরা বাঁধার আগেই ডর লাগার মেয়ে নই আমি। গাছ থেকে শর্বতী তোলবার আগেই খাট্টা হবে কিনা ভয়? সারা শরীরে হিল্লোল তুলে হেসেছিলো লখিয়া।

—কোলিয়ারীর ওই হ্যাগিন্স সাহেবটার যে নজর পড়েছে তোর ওপর।

—সে আর সমঝাতে হবে না, পয়লা দিনেই টের পেয়েছি আমি। মরদ লোকের দিল তার চোখের শিশায় দেখতে পাওয়া যায়।

অনুপম ঠাট্টার সুরে বলেছিলো, মেয়েদের চোখে কিন্তু আয়না নেই, আছে দিল-জখমী বল্লমের ভালা।

—তবে আর ভয় কি, তেমন ইরাদা থাকলে না-হয় ভালার খোঁচাতেই কয়লাসাহাবকে খতম করে দেবো। উত্তর দিয়েছিলো লখিয়া, চোখে বিদ্যুতের চমক দেখিয়ে।

হেসেছিলো অনুপম। ওর কথায়। বলেছিলো, মতলব বদলাতে কতক্ষণ। আমার মতো কৌপীন ফকির কি ও? দৌলতওয়ালা হ্যাগিন্স সাহেবের সঙ্গে কি পেরে উঠবো মোহব্বতের খেলায়?

উনুনে ফুঁ দিতে দিতে হঠাৎ কথাটা শুনে পিছন ফিরে তাকিয়েছিলো লখিয়া, তারপর মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত মুখে তার একটা অদ্ভুত অবোধ্য কাঠিন্যের ছায়া পড়েছিলো।

—পিয়ারের আদমির সঙ্গে ভাগতে ভয় পাই না আমি। তা বলে রুপেয়ার লালচ্ আছে ভেবো না। মোহর নয়, মোহব্বত। পিয়ার। বলেছিলো লখিয়া।

নাঃ, এসব কি ভাবছে অনুপম? ঘড়ির কাঁটার দিকে আরেকবার তাকালে সে। কাবেরী হয়তো এতক্ষণ উঠে দাঁড়িয়েছে। এইবার নিঃশব্দ পায়ে হয়তো বেরিয়ে আসবে। মনে মনে শেষ বিদায় জানাবে সকলকে। তারপর ধীরে ধীরে এসে দাঁড়াবে বাইরের ফাঁকা বাতাসে।

কাঁপতে কাঁপতে ভয়চকিত পায়ে এসে দাঁড়াবে কাবেরী। ওয়াচ অ্যান্ড ওয়ার্ডের গার্ড-পোস্টের আড়ালে এসে তারপর শুরু হবে ওদের যুগ্ম-যাত্রা।

—পান শো রুপেয়া ইনাম! কি আশ্চর্য, এখনো লোভের ইশারা ভাসছে ওর চোখের সামনে? নিজের মনেই হাসলে অনুপম। এত সস্তায় শয়তানের কাছে নিজেকে বিক্রি করবে ও, ভাবলো কি করে ব্রিজলাল। লখিয়ার যৌবনের মূল্য দিতে পারলো না, এই তো একমাত্র দুঃখ অনুপমের। হ্যাগিন্স আর লখিয়ার মধ্যে ঘৃণ্য যোগসূত্র হবে ও? বদ্ধ উন্মাদ ব্রিজলালটা।

কিন্তু, বড় ক্লান্তি বোধ করছে অনুপম।

তা হোক। কাবেরী অপেক্ষা করছে, কর্তব্য পথ চেয়ে অপেক্ষা করছে। ঐশ্বর্য চায় না ও, চায় প্রেম।

অনুপম উঠে দাঁড়ালো।

মিঠে রাগিণীতে সান্ধ্যসানাইয়ের সুর ভেসে চলেছে। অবিরাম কেঁদে চলেছে বিরহী বাঁশির সুর। সানাই বেজে চলেছে।

বাড়ির দক্ষিণে, বাগানের ওপাশে খানিকটা মাঠ ঘেরা হয়েছে তেরপলে। লাল শালুতে মোড়া বিবাহমণ্ড। কারবাইডের আলোয় ঝলমল করে উঠেছে সারা মণ্ডপ। লাল মেঘের উন্মাদনা এনেছে রক্তবস্ত্রের আচ্ছাদন। ওপরে মখমলের চাঁদোয়া। একটা বিরাট চক্র রঙ বদলে বদলে কেন্দ্রবিন্দুতে মিলিয়ে গেছে ঠিক মাথার ওপর। এদিকে-ওদিকে ঝুটা মোতির ঝালর।

সানাইয়ের সুর থামছে না, দূরবন্ধু চক্রবাকীর কণ্ঠকাকলির মতো ককিয়ে কেঁদে উঠছে যেন।

কাবেরীর চোখের জল শুকিয়ে গেছে। কান্না নেই, দুঃখ নেই। যেন সব চিন্তা, সকল ব্যর্থতার ব্যথা চাপা পড়ে গেছে আজকের এই উজ্জ্বল জ্যোছনায়। আনন্দের উন্মত্ততায় এক দল মেয়ে উঠেপড়ে লেগেছে কাবেরীকে সাজিয়ে তুলতে। বেনারসী শাড়ির ফাঁবে কাবেরীর সুন্দর মুখখানা কেমন মৌন বিষাদে ভরা। তবু, কত অপরূপ রূপের প্রকাশ চন্দনের ফোঁটায় সাজানো ছোট মুখখানা নেড়েচেড়ে দেখছে মেয়েরা। কৌতুকহাস্যে নয়তো নিজেদের রসিকতায় নিজেরাই লুটিয়ে পড়ছে।

খুশিতে অধীর যেন সকলে।

শুধু রাজেনবাবুর গলার স্বর ভারি হয়ে আসছে। ক্ষণে ক্ষণে চশমার কাচ মুছছেন। আর কাবেরীর মা চেষ্টা করছেন সকলের সঙ্গে হেসে কথা কইবার।

অমিতাভ হঠাৎ বললে, করেছিস কি দিদি! এ যে রাজসিক ব্যাপার। এত দানসামগ্রী এই বাজারে?

রাজেনবাবু কাছেই ছিলেন। বললেন, আমার একটা পোজিশন্ আছে তো। না করলে চলবে কেন? আমার খ্যাতি সুনাম বংশগৌরব—

বাধা দিয়ে অমিতাভ বললে, খরচটার দিকেও তো একটু চোখ রাখতে হয়। টাকা জিনিসটা থাকলেই যে জলে ফেলে দিতে হবে, তা তো নয়।

রাজেনবাবু মৃদু হাসলেন। কাপড়ের খুঁটটা চোখে রগড়ে নিলেন, যেন কি একটা পড়েছে এমনি ভান করে। তারপর বললেন, সবচেয়ে বড় সম্পত্তি আমার কাবু-মাকেই যখন—

কথা শেষ করতে পারলেন না তিনি। কি যেন কাজ মনে পড়ায় ছুটে গেলেন।

মা-র দীর্ঘশ্বাসটা শুনতে পেলো কাবেরী।

ওর চিবুকটা নরম করে তুলে ধরে কাবেরীর মা বললেন, ছিঃ মা, কাঁদতে নেই আজ। কাঁদতে নেই, চোখ মোছো। বলে নিজেই চোখ মুছলেন।

কাবেরীর হঠাৎ মনে হলো, মাকে সে কত ভালোবাসে। মা, বাবা—সকলকে।

হ্যাঁ। আর একজনের কথা মনে পড়ছে। অনুপম কি ওকে ক্ষমা করতে পারবে? কে জানে। একটা অসহনীয় গভীর দুঃখের মোচড় অনুভব করে কাবেরী, তার ছোট্ট বুকে উথলে ওঠে ব্যর্থতার বাষ্প।

সেদিন হয়তো সারা রাত কাবেরীর অপেক্ষায় কাটিয়ে দিয়েছে অনুপম। কে জানে। কাবেরী মনে মনে বললে, আমাকে ক্ষমা করো তুমি। এ ছাড়া যে উপায় ছিলো না। ক্ষমা করো তুমি!

লাল বেনারসী, প্রসাধিত রূপ। কপালে চিত্রচন্দন, সিঁথিতে মুক্তোর সিঁথিমউড়। অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে কাবেরীকে। নতুন ফোটা গোলাপের মতো।

ধীরে ধীরে উঠে এসে পুবের খোলা জানালায় দাঁড়ালো কাবেরী। ঠাণ্ডা গরাদের ফাঁকে গাল দুটো চেপে। তারপর একবার হঠাৎ তাকালে ওপরের আকাশে।

একটা বড় তারা উঠেছে আকাশের কোণে।

—আমার খ্যাতি, সুনাম, বংশগৌরব।

রাজেনবাবুর কথাটা, হ্যাঁ, কথাটা কেমন যেন পুরোনো ঠেকলো কাবেরীর কানে। অনেক, অনেক পুরোনো। তবু, কেমন যেন নতুন মনে হয়।

দূরের অন্ধকারে এগিয়ে আসছে এক জোড়া জ্বলজ্বলে চোখ। একখানা মোটর ছুটে আসছে এদিকে। কাবেরী সরে এলো।

না। কাবেরীর দিকে ওদের চোখ নেই।

তুফানের বেগে ছুটে চলেছে ব্রিজলালের নীল রঙের মোটরখানা। হাউই থেকে খসে পড়া ফুলকির মতো দ্রুত বেগে।

হ্যাগিন্স সাহেবের বাংলোর পথে ছুটে চলেছে।

অকস্মাৎ-সানাইয়ের শব্দে চমকে উঠলো অনুপম। দূরের মণ্ডপ থেকে ঝলমলে আলোর কয়েকটা সূক্ষ্ম রশ্মি এসে পড়েছে বাইরের মাঠে। সানাই বেজে চলেছে।

নিজেরই অজান্তে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে অনুপম। লখিয়া চমকে তন্দ্রাজড়িত চোখ

তুলে তাকালে অনুপমের দিকে। তারপর ঘুমের ঈষৎ ঘোরে মৃদু হেসে আরো কাছে সরে এলো। আরো নিবিড় করে আঁটলে আপন আলিঙ্গনে, অনুপমের কাঁধের ওপর মাথা ঢলে পড়লো। বেহুঁশ হয়ে। তাড়ির নেশায়।

কাবেরী হয়তো কাঁদছে। সত্যি, এত আন্তরিক ভালোবাসার কোনো প্রতিদান দিতে পারলে না অনুপম। দিতে পারলে না কাবেরীর বিশ্বাসের মর্যাদা। তা হোক্! এই ভালো। শুধু একটা মুহূর্তের ভুলে কি না হতে পারতো!

সেদিন রাত্রের কথা মনে পড়লো। দরজা খুলে বেরিয়ে আসতো অনুপম আর একটু হলেই। তারপর?

কাবেরীর জন্যে অনুপম দুঃখের মোচড় অনুভব করে। হয়তো, কে জানে, হয়তো সেদিন সারা রাত্রি নিস্তব্ধ নিশীথের অন্ধকারে প্রতীক্ষার প্রহর গুনে গুনে কাটিয়েছে কাবেরী। অনুপমের দেখা পায়নি। ব্যর্থতার বিরহ বুকে নিয়ে হয়তো ফিরে গেছে শেষ রাতে।

চলন্ত মোটর থেকে দূরের আকাশের দিকে তাকালে অনুপম।

আকাশের কোণে একটা বড় তারা উঠেছে।

পান্ শো রুপেয়া ইনাম আর ব্রিজলালের বেসাতিতে এক আনা অংশ। হ্যাগিন্স সাহেবের বাংলো বেশী দূরে নেই আর।

হেডলাইটের আলোটা চোখে পড়লো হ্যাগিন্সের। চমক ভাঙলো যেন তার।

স্বপ্নাবিষ্ট চোখের পাতা জড়িয়ে আসছে যেন। চেষ্টা করে চোখ তুলে তাকালে হ্যাগিন্স অদূরে চলন্ত মোটরের আলোর প্লাবন পড়েছে যেদিকে। তারপর দৃষ্টিটা ঘুরে এলো ঘরের ভেতর। সার্চলাইটের মতো চোখ বুলিয়ে গেল সে ঘরের প্রতিটি কোণে, প্রতিটি সামগ্রীর ওপর।

ছোট্ট গোল টেবিলটার ওপর হুইস্কির বোতল জমে উঠেছে। বোতলে ডিকেণ্টারে ঠোকা লেগে ঠুং করে আওয়াজ হলো একটা।

আরামকেদারায় এলিয়ে বসেছিলো হ্যাগিন্স। হঠাৎ টলে ঝুঁকে পড়লো গোল টেবিলের ওপর। কনুইয়ে ভর দিয়ে।

সুরার নেশায় সব কিছু ভুলে গেছে হ্যাগিন্স। ঘামে ভেজা কপালের ওপর খুচরো কয়েকটা তামাটে চুল স্প্রিং-এর মতো পাক খেয়ে লেপটে আছে। চোখে অদ্ভুত এক আকাঙ্ক্ষার উন্মাদনা।

হ্যাগিন্স চুপ করে বসে রইলো কিছুক্ষণ। একদৃষ্টে নিঃশেষ বোতলটার দিকে চেয়ে। বিড়বিড় করে কি যেন বললে নিজের মনে।

—রীচেস্? ওয়েল্থ? নিজের মনকে যেন প্রশ্ন করলে হ্যাগিন্স।

হঠাৎ একটা হাতের ঝটকা টানে ফেলে দিলে ফাঁকা বোতলগুলো। ঝনঝন শব্দ তুলে কাচের টুকরোগুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল।

—রেস্পেক্টেবিলিটি? ডিগনিটি? অনার?

কিছুক্ষণ তন্দ্রাতুর নেশার চোখে চেয়ে দেখলে কাচের টুকরোগুলোর দিকে। নিঃশব্দে নিশ্চুপ তাকিয়ে রইলো। অনেক দূর থেকে, বহু দূর থেকে কি যেন মিঠে মিউজিকের সুর ভেসে আসছে থেকে থেকে। বাতাসের গমকে আশ্চর্য এক মনমাতানো অর্কেস্ট্রার অনুরণন বেজে উঠেছে।

সুরে সুর মিলিয়ে শিস দিতে দিতে উঠে এলো হ্যাগিন্স। জানালার ধারে ঠেস দিয়ে তাকালে বাইরের পৃথিবীর দিকে। নিঃসীম অন্ধকারের দিকে। আকাশের দিকে।

ইউকেলিপটাস গাছের সাদা গুঁড়িটার পাশে একটা বড় তারা উঠেছে।

হঠাৎ একটা গানের কলি ভেঁজে উঠলো হ্যাগিন্স।

—ফর মাই লাভ, ফর মাই লার্ভলি ইয়াং লে-ডি।

পাশের বাংলোর রেডিওতে বিলিতী গান বেজে উঠলো।—ডে-জি, ডে-জি।

পৃথিবীর আকাশে তখন কৃষ্ণপক্ষের বিলম্বিত চাঁদ হয়তো দেখা দেবে। আর এক কোণে

তিনটে বড় বড় তারা। হয়তো রাত আরো বাড়বে। ঘুমিয়ে পড়বে সারা দুনিয়া। রাজেন ডাক্তার, ব্রিজলাল, হাগিন্স। কাবেরী, অনুপম, শাঁওন। আরও অনেকে। সবাই ঘুমিয়ে পড়বে। শুধু জেগে থাকবে আকাশের প্রান্তে তিনটে বড় বড় তারা।

খ্যাতি, ঐশ্বর্য, প্রেম।

[১৩৫৫



স্বর্ণমারীচ

ভয় করছিলো বাসনার।

নিঝুম অন্ধকার, আর তার মাঝে টিকটিক করে ধীর মন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছে ঘড়ির কাঁটা।

নিস্তব্ধ নিশীথের মাঝে একঘেয়ে শব্দটা অধৈর্য করে তোলে বাসনাকে। আশা-আকাঙ্ক্ষায় বুক বেঁধে অপেক্ষা করে সে। চোখ বুজে চুপ করে পড়ে থাকে বিছানায়। প্রতীক্ষার প্রহর গুনে চলে।

স্বামীর নিদ্রিত নিশ্বাসের আওয়াজ আসছে কানে। স্বামীর কথা মনে পড়তেই বুকটা দুলে উঠলো তার। ভয় আর আশঙ্কায়। আজ বিশ্বনাথকে ভয় পায় বাসনা। অথচ। সেদিন স্বামীকে ভালোবাসতে না পারলেও ভয় করতো না।

স্বপ্ন নয়। অতিবাস্তব কয়েকটা ক্ষুদ্র দিনের ইতিহাস আজ স্পষ্ট মনে পড়ে তার।

সুখী সে হয়নি সেদিনও। বৃদ্ধকে পতিত্বে পেয়ে সুখী হতে পারে না কোনো যুবতী। কিন্তু আজকের মতো মনের কোণে ঘৃণা-বিদ্বেষের জন্ম হয়নি সেদিন। বরং লাল বেনারসীর আগুন ছড়িয়ে যেদিন বিশ্বনাথ ঘটকের প্রাসাদে ঢুকেছিলো, সেদিন ঐশ্বর্যের জলুসে চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিলো বাসনার। আগামী দিনের নিরানন্দকে মন থেকে সরিয়ে ফেলে যৌবনের সখীর সামনে প্রমাণ দেখিয়েছিলো, বিশ্বনাথ বৃদ্ধ নয়। স্বামীকে প্রৌঢ়ত্বে নামিয়েও যেন তৃপ্ত হয়নি।

টিকটিক টিকটিক করে এগিয়ে চলেছে ঘড়ির কাঁটা। ওটা যেন বাসনার অতীত রোমন্থনের ছন্দ রেখে চলেছে। নিরিবিলি দ্বীপের বুকে গীটার-বাদ্য যেমন ডেকে আনে পাখির ঝাঁক, তেমনি বিগত দিনের ছবিগুলো ভেসে আসে।

স্বামীর সম্বন্ধে আশঙ্কা কম ছিলো না। ছোটবেলা থেকে স্বর্ণ-স্বামীদের সম্বন্ধে কত কি রটনাই তো শুনে এসেছিলো। রত্নপতিরা নাকি লম্পট অসচ্চরিত্র অসংযমী হয়, গণবধূ আর জনি ওয়াকার হয় তাদের সহবাসী। অথচ, বিয়ের পর পরিচয় পেলো বিশ্বনাথের। সত্যি। অদ্ভুত নিষ্কলঙ্ক চরিত্র। আর, আর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী বাসনাকে সুখী করার জন্যে কি প্রাণপণ প্রচেষ্টা। সুখী না হোক, খুশিতে ভরা ছিলো তার মন।

তৃপ্তি না থাক, ছিলো শান্তি।

একটি দিন।

মধুচন্দ্রিকার রাত। ছোট্ট নদীর জল চাঁদ   তখন। আকাশের কোণে শ্বেতদুধার

লোমের মতো পুঞ্জ-পুঞ্জ সাদা মেঘ। রাতের আকাশে পাহারা দেয় নীলাভ আলোর প্লাবনী পাহাড়। নীলার পাহাড় আর তার এক কোণে তৃতীয়ার চাঁদ। বকের বুকের মতো সাদা ধবধবে দুধেলা বীথির দু'পাশে হীরের ফুল ছড়ানো নীল ডানা। কোন্ দূর দিগন্তে যেন উড়ে চলেছে, কোন্ দূর দিগন্তে।

আকাশ দেখলেই বাসনার কল্পনা ডানা পায়। শিশু স্রোতস্বতীর ধারে ঠাণ্ডা বালির ওপর দেহ বিলিয়ে পরম আয়েশে স্বপ্ন দেখে বাসনা। শীতল শ্রান্তি নয়, কামনার তপ্ত বাষ্প তার রক্তে।

অনুরাগের আবেগ বোধ করে বাসনা।

মন চায় একটা সক্ষম বুকের ওপর লুটিয়ে পড়তে। দেহ চায় উন্মাদ আগ্রহের আচ্ছুরিতক আলিঙ্গন। উদ্দাম সুখের অধীরতায় তার কুসুমকোমল শরীর চায় অত্যাচারের আনন্দ।

আড়চোখে বিশ্বনাথের দিকে তাকায় বাসনা। ভালো করে তাকিয়ে দেখে। বিশ্বনাথকে বৃদ্ধের কোঠায় ফেলতে মন চায় না। ঠিকুজি মিলিয়ে বয়সের দৌত্যেই মানুষের যৌবন নয়। তার দুর্ভাগ্যের জন্যে বিবাহের দিনেও চোখের জল ফেলতে দেখেছে সে অনেককে। কিন্তু বাসনার মনে হলো পৃথিবীতে তার মতো সুখী আর কেউ নেই।

লজ্জা চেপে ধীরে ধীরে বিশ্বনাথের হাতের ওপর হালকা করে তার হাতখানা রাখে সে। বিশ্বনাথ চকিতে ফিরে তাকিয়ে আবার উদাস দৃষ্টিতে অন্য দিকে চোখ চায়। তারপর আস্তে আস্তে বলে, আজকের দিনে তোমাকে একটা উপহার দিতে চাই।

বাসনা স্পষ্টবাক। শরমে মরে যাবার মতো মেয়ে নয় সে। তাই ঠোঁটে মৃদু হাসি দুলিয়ে বললে, আজকের দিনটাই তো তোমার সব থেকে বড় উপহার।

বাসনা স্বচ্ছন্দ। কিন্তু অমন ঘষামাজা কথা ফোটে না বিশ্বনাথের মুখে। সাবলীল হতে পারে না সে। বাসনা বুঝতে পারে লজ্জা কাটিয়ে উঠতে পারছে না বিশ্বনাথ। পুরুষ-মানুষ অত লাজুক হয়! স্বামীর লজ্জাধিক্যে কৌতুক বোধ করে বাসনা। ঠোঁট টিপে কৌতুকের হাসি চাপে।

নিরুত্তর বিশ্বনাথ জ্বলজ্বলে হীরের কণ্ঠহারটা পরিয়ে দেয় বাসনার গলায়। কাঁপা হাতে। নিঃশব্দে। অন্য দিকে চোখ রেখে প্রশ্ন করে, তুমি...তুমি সুখী হয়েছো বাসনা?

আশ্চর্য!

ঐ ছোট ক'টি কথায় বাসনা সেই প্রথম টের পেয়েছিলো বিশ্বনাথের একটা দিক কত দুর্বল। মায়া হয়। বিবাহ-পরের কয়েকটি দিনের কথা ভেবে আজ স্বামীর ওপর মায়া হয় বাসনার।

টিকটিক টিকটিক করে হেঁটে চলেছে ঘড়ির কাঁটা। আজ অপেক্ষার আক্ষেপে সময়কে মনে হয় শ্লথগতি। অথচ সে আনন্দের দিনগুলি যেন মুহূর্তে মিলিয়ে যেতো।

মনে পড়ে বাসনার।

নিজেকে কেন জানি চঞ্চল বোধ করে সে। বিশ্বনাথ কি সত্যই ঘৃণা পাওয়ার যোগ্য? নীচের হলঘরের দেয়াল-ঘড়িতে টং করে একটা ঘণ্টা বাজলো। চমকে উঠলো বাসনা। আরো কিছুক্ষণ কাটাতে হবে। তারপর—

হঠাৎ বিশ্বনাথের মুখটা দেখতে ইচ্ছে হলো তার। কেন কে জানে! রেশমী চাদরটা পায়ের দিকে ঠেলে দিয়ে বিছানার ওপর উঠে বসলো সে। নিশ্চুপ কাটালে কয়েক মিনিট। না, বিশ্বনাথ জাগেনি। ধীরে ধীরে বেডসুইচ টিপে পালঙ্ক-শিয়রের নীল আলোটা জ্বাললে। তারপর নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকালো তার মুখের দিকে। স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো সে অনেকক্ষণ।

আলোটা নিবিয়ে দিয়ে বিছানায় বসে বসে কি যেন ভাবতে শুরু করলে বাসনা।

বিদ্বেষ নয়। মায়া হয়। তাই বোধ হয় সেদিন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলো, স্বামীকে সুখী করবে মনপ্রাণ দিয়ে। সতর্ক থাকবে যাতে কোনোরকম আঘাত না দিয়ে ফেলে স্বামীর

দুর্বলতার স্থানে।

—চট্ করে একবার সেজেগুজে এসো তো লক্ষ্মী।

কথাটা ভোলেনি সে আজও। সবে পিয়ানোর ডালাটা খুলেছে এমন সময় বিশ্বনাথ এসে বললে।

নিজের অভিনয়নৈপুণ্যে নিজেই চমৎকৃত হয়ে যায় বাসনা। চকিত মরালের মতো গ্রীবা বেঁকিয়ে আহ্লাদের স্বরে সুর করে প্রশ্ন করে, কেন?

—চলো না একটু বেড়িয়ে আসি, ডায়মণ্ড হারবারের দিকে।

ধনুকের মতো বাঁকা ভুরুটি বিস্ময়ে কপালে তুলে প্রতিপ্রশ্ন করে সে।—ডায়মণ্ড হারবার? তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে মিষ্টি হাসি দুলিয়ে বলে, জী হুজুর।

ধীরে ধীরে আসন ছেড়ে বেশ বদল করতে গেল বাসনা।

ডায়মণ্ড হারবারের দিকে মোটর-বিহার করার মতো মনের অবস্থা তখন নয়। তবু 'কিন্তু' করলে না সে। বিরক্তি চাপা দিলে মুখে হাসি টেনে। তারপর প্রসাধন-প্রকোষ্ঠে ঢুকে টেনে বের করলে সাজসজ্জা।

সুন্দর করে সাজালে সে নিজেকে। হাফ-গিনির আকারে একটা সিঁদুরের টিপ জ্বালিয়ে দিলে কপালে। লোভাতুর বুক বন্দী হলো রক্তরেশম ব্লাউজে। স্পাইরেলের মতো পাক দিয়ে নিলে লাল বেনারসীখানা। দীর্ঘশিখা লকলকে আগনের মতো ঝলকে উঠলো তার লম্বা ছিমছিমে শরীরটা। গলায় প্রবালের মালা, রক্তচুনির দুল দোলালে কানে। বাম হস্তের মণিবন্ধে লাল মখমলের স্ট্র্যাপের মাথায় ছোট্ট হাতঘড়ি। অলঙ্কারের কলঙ্ক রাখলে না দু হাতে। শুধু সূক্ষ্মতম সাদা শাঁখা জোড়া ওর দেহের লালিমা দিলো বাড়িয়ে। ভেলভেটের নাগরায় পা গলিয়ে দেয়ালের বড় আয়নাটায় নিজের রূপ দেখে নিজেই মুগ্ধ হয়ে যায় বাসনা। আগুন, ঠিক আগুনের শিখার মতো দেখায় তাকে। একগাছ পলাশের মতো উজ্জ্বল।

ইচ্ছা করেই স্বামীর গায়ে গা লাগিয়ে বসলে বাসনা। ঢালা পিচের রাস্তায় গড়িয়ে চললো বিশ্বনাথের বিশহাজারী ক্যাডিলাক। তিরিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট।

—স্পীড বাড়া রে বাহাদুর, স্পীড বাড়া। ক্রমাগত স্পীড বাড়াতে বলে বিশ্বনাথ।

আশ্লেষতৃষিতা বাসনার মনেও উন্মাদনা আসে। গতির সুরা যেন বাসনার আত্মোৎসাদনাকাঙ্ক্ষী মনকে করে তোলে উন্মত্ত।

দিক্চক্রবাল ভেদ করে আরো অনেক দূরে ছুটে চলে তার দৃষ্টি। পার্শ্বোপবিষ্ট বিশ্বনাথকে ভুলে গেছে সে। মেটাল রোডের চিকন মসৃণতায় দৃষ্টি পিছলে পড়ে তার। মনও।

অর্ধবিস্মৃত একটি মুখ মনে পড়ে। সুমুখের দিগন্ত পার হয়ে ছুটে চলেছে তার চোখ, মন ধাওয়া করে পিছন-পথে। পিছনের ইতিহাস মনে পড়ে বাসনার। প্রাক্বিবাহ যুগের সুমধুর শান্তি নামে তার স্বপ্নালু চোখে।

—কি ভাবছো?

চমকে ফিরে তাকায় বাসনা।—কই, কিছু না তো।

না, অভিমান নয়। ফিরবার পথে বারবার আড়চোখে তাকিয়ে দেখলে বাসনা। বুঝতে পারলে, লজ্জায় মুখ ফেরাতে পারছে না বিশ্বনাথ। গোপন লজ্জা।

মানসিক দারিদ্র্য হয়তো বা। মায়া হয়।

বিস্মৃতির অতল থেকে অতীত দিনের ইতিহাস উদ্ধার করতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছে বাসনা। স্বেদাক্ত হয়ে উঠেছে তার সারা শরীর। শাড়ির আঁচলে বুক পিঠ মুছে নেয় বাসনা। দেয়ালের সুইচবোর্ডের দিকে হাত বাড়িয়ে রেগুলেটার ঘোরায়। ধীরে ধীরে পাখাটা ঘুরতে আরম্ভ করে। স্বেদস্নাতা বাসনা যেন এতক্ষণে একটু আরাম বোধ করে। খানিক চুপ করে বসে থাকে অন্ধকারে, তারপর শুয়ে পড়ে।

টিকটিক আওয়াজ। সিলিং-পাখার মাথায় স্পার্ক দিচ্ছে মাঝে মাঝে। স্পার্কের সবুজাভা অন্ধকারে চমকে উঠছে। সেদিকে চোখ দিয়ে শুয়ে থাকে বাসনা।

অদ্ভুত। বাসনাকে সুখী করবার জন্যে বিশ্বনাথের কি অপরিসীম চেষ্টা! তবু সুখী

হতে পারেনি সে। প্রাক্‌বিবাহ যুগে কি ছিলো তার এমন আরাম-শয্যা? চাবি টিপলে জ্বলতো না আলো, ঘুরতো না পাখা। দক্ষিণা বাতাসের দাক্ষিণ্যে দিন কাটাতে হতো তখন। তাকে সুখী করার জন্যে কত আগ্রহ বিশ্বনাথের! তার কাছে বিশ্বনাথ যেন শিশুর মতো সরল হয়ে যায়।

সেদিনটা মনে পড়ে বাসনার।

সহাস্য চিৎকারে বাসনাকে ডাকতে ডাকতে ওপরে উঠে এলো বিশ্বনাথ।

পিছনে বাহাদুর ড্রাইভারের হাতে একরাশ জিনিস-পত্তর।

টেবিলের ওপর জিনিসগুলো রেখে বাহাদুর সেলাম জানিয়ে চলে গেল।

বিশ্বনাথ সলজ্জ হাসি হেসে বললে, মার্কেটে গিয়েছিলাম।

—তা তো দেখতেই পাচ্ছি। দোকানে আর কিছু রেখে আসোনি বোধ হয়। মৃদু হেসে বাসনা বললে।

প্যাকেটগুলোর তেলা পেপারের ঢাকা খুলতে খুলতে বিশ্বনাথ বললে, দেখো পছন্দ হয় কি না!

জিনিসগুলো নেড়েচেড়ে দেখে সানন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো বাসনা।—সত্যি, চমৎকার তো।

—পছন্দ হয়েছে?

—নিশ্চয়। এমন সেট মিলিয়ে জিনিস পাওয়া যায়, কাপড় গয়না?

—কষ্ট করে খুঁজলেই পাওয়া যায়। আত্মগর্বে হাসলে বিশ্বনাথ।

—খুঁজলেই কি হয়, চোখ থাকা চাই। বাসনা বললে। একটু থেমে।—তুমি ছোটবেলায় ছবি আঁকতে, না?

স্মিতহাস্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো বিশ্বনাথ। নম্র স্বরে অনুরোধ জানালে সে, এখনি একবার পরে আসতে হবে লক্ষ্মী, দেখবো কেমন মানায় তোমায়।

প্রসন্ন মনে বেশ বদল করতে গেল বাসনা।

শ্বেত মলমলে ঢাকলে বুকের তপ্তোল্লাস। সাদা জর্জেটখানা আধ পাক দিয়ে টেনে দিলে বুকের মাঝ দিয়ে। শুভ্র বসনে ঢাকা সুপুষ্ট মসৃণ পিঠের ওপর দুলিয়ে দিলে মোটা বেণীটা। প্ল্যাটিনামের দুল দোলালে কানে। গলায় আইভরির হাঁসুলি। হাতের কব্জিতে গজদন্তের চুড়ি আর কঙ্কণ। সাদা সোয়েডের উঁচু-হীল জুতোর স্ট্র্যাপটা বেঁধে নিয়ে আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালে সে। নিজের চোখেই নিজেকে অদ্ভুত সুন্দর দেখালো। সাদা ধবধবে দিগন্ত-বলাকার মতো। কৈলাসগামী ভারলুপ্ত মরালীর মতো। ভোরের শিশিরে ভেজা শ্বেতপদ্মের মতো সুন্দর দেখালো। রাতের জোছনা-মাখা দুধসাগরের মতো।

মুখে আত্মতৃপ্তির মৃদু ঝিলিক ছড়িয়ে ঘরে ঢুকলো বাসনা।

বললে, চলো, আজ কোথাও বেড়াতে যাই।

চমকে ফিরে তাকালে বিশ্বনাথ।

বাসনা লক্ষ করলে, দুশ্চিন্তার কুঞ্চিত রেখা ফুটেছে তার কপালে।

আর একবার চকিতে বাসনার দিকে তাকিয়ে নিয়ে জানালাটার কাছে সরে গেল বিশ্বনাথ।

—পর্দাটা কে সরালে? প্রশ্ন করলে বিশ্বনাথ, মুখ না ফিরিয়েই।

তারপর রাস্তার দিকে, অদূরের জানালায়, দূরের কোনো-এক বাড়ির ছাদে দৃষ্টিটা সার্চলাইটের মতো ঘুরিয়ে নিয়ে পর্দাটা ভালো করে টেনে দিলে সে।

সন্দেহদুর্বল মন। দুঃখের হাসি হাসলে বাসনা। মায়া হয়।

প্রাণস্পন্দন দ্রুত হয়ে ওঠে বাসনার। নিজের কানেই শুনতে পায় সে।

ঘড়ির কাঁটাটাও যেন গতিবেগ বাড়িয়ে দিয়েছে। টিকটিক করে দ্রুত তালে হেঁটে চলেছে। চঞ্চল হয়ে ওঠে বাসনা। পাখার ছিদ্রে স্পার্কের সবুজাভা এখনো জ্বলে উঠছে থেকে থেকে।

ঠিক বোঝা গেল না। টং করে একটা ঘণ্টাধ্বনি হলো যেন নীচের হলঘরে। পাখার স্পীড বাড়িয়ে দিলে বাসনা।

মায়া, মমতা? মায়া-মমতার ব্যথার চেয়েও তার অন্তরের বেদনাটুকু যেন আরো অনেক গভীর।

কত মিষ্টি দুপুর আর দুরন্ত রাতের স্বপ্ন বুনতো সে। কে জানতো মৌচাকের মক্ষিরানীর কপালে জুটবে না এক ফোঁটা মধু। বাতাসে কাসেল রচনার দিন থেমে থিতিয়ে যাবে তার জীবনে, কে জানতো।

কত গভীর প্রেমের আকর্ষণ ছিলো তাদের পরস্পরের প্রতি। সেই বিবাহপূর্ব দিনে অনেক বিনিদ্র রজনীর একাকিত্বে তার মনে হয়েছে, প্রেমের পাত্রকে ছেড়ে বাঁচতে পারবে না সে একটা দিনও। অথচ আজ কি সত্যিই সে মরে গেছে? হয়তো। জীবনধারণ করাকেই তো আর বাঁচা বলে না।

অতীত দিনের স্বপ্নমন্থন করতে করতে জানালাটার কাছে এসে দাঁড়ায় সে। পর্দাটা সরাতে গিয়ে হাতটা থেমে যায়। বিশ্বনাথের সেই সন্দেহদুর্বল ব্যবহার মনে পড়ে। তবু। তবু জোর করে সরিয়ে দেয় সে পর্দাটা। অন্ধকূপের নিপীড়ন অসহ্য ঠেকে। না, নিশ্ছিদ্র সিন্দুকের রত্নহার হয়ে থাকতে পারবে না বাসনা।

পর্দাটা হিংস্র উত্তেজনায় সরিয়ে দিলে সে সজোরে, তারপর পিপাসী চোখ ছেড়ে দিলে মুক্ত আকাশের গায়ে। বুকটা তার ব্যথায় টনটনিয়ে উঠলো।

পান্থশালার প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলো প্রেমিকের কাছে। উপেক্ষা করে এসেছে সে। নিশুল্ক প্রেমের প্রতিদানে দিয়েছে সে অবিশ্বাস। আজ স্বামীর ব্যবহারে রাগ হয় তার, অথচ বিগত দিনের অনুরাগকেও তো কই আস্থার চোখে দেখেনি। কে জানে, আজো হয়তো বাসনার স্মৃতি বুকে চেপে দুঃখের রাত্রি যাপন করে চলেছে সে। তার মুখটা আজ ছায়ার মতো ভেসে ওঠে বাসনার চোখে।

প্রোষিতদয়িতের কল্পিত দুঃখের কথা ভেবে ভারাক্রান্ত মন লঘু হয়ে আসে বাসনার। আত্মনিপীড়নে অদ্ভুত এক আনন্দ পায়। কল্পনায় সজীব করে তোলে কয়েকটি মিথ্যা মুহূর্ত। কৃপা আর করুণার মানদণ্ডে নিজেকে যাচাই করে। কল্পনায় দীর্ঘায়িত করে তাদের বিস্মৃত বিশ্রম্ভালাপ। চোখে জল আসে, মনে আসে শান্তি।

চিন্তাক্লিষ্ট চোখ নেমে আসে পথের দিকে। তাকিয়ে তাকিয়ে পথের জনতা দেখে বাসনা। বাঁশের মই কাঁধে করে চলেছে লোকটা—হয়তো গ্যাসবাতি জ্বালাতে। বছর বারোর একটি সুন্দর কিশোর ছুটে চলেছে। সাদা হাফপ্যাণ্ট নীল টাওয়েল গেঞ্জি, হাতে ব্যাড-মিণ্টন র‍্যাকেট। যতক্ষণ দেখা যায় তার দিকে তাকিয়ে থাকে বাসনা। পেরাম্বুলেটর ঠেলতে ঠেলতে চলেছে একটি আয়া। সাহেবদের একটি ছোট্ট ফুটফুটে শিশু। তার হাতের বেলুনটা ফেটে গেল শব্দ করে।

হঠাৎ চোখ গেল বাসনার সামনের রেস্তরাঁটির দিকে।

অভদ্র!

তৃষ্ণার্ত চোখে বাসনার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে একটি ছোকরা। সামনের টেবিলে তার একরাশ বই। কোনো কলেজের ছাত্র হয়তো। কিন্তু অমন অভদ্রের মতো তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কেন ও! বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে গেল বাসনার। ক্রোধে অপমানে রি-রি করে উঠলো সারা শরীর। কঠিন দৃষ্টিতে তাকালো বাসনা, অপ্রতিভ হয়ে মুখ ফেরালে ছেলেটি। তবু রাগ গেল না।—ধরে চাবুক লাগানো যায় না ছোকরাটিকে!

—কি দেখছো?

সন্দেহবাতিকগ্রস্ত অতি-দুর্বল অনুসন্ধিৎসু মনের প্রশ্নটা কর্কশ ঠেকলো বাসনার কানে। চকিতে ফিরে তাকিয়ে বাসনা দেখলো রুগ্ন সিংহের মতো অকর্মণ্য হিংসার তেজ বিশ্বনাথের চোখে। বাসনা সরে গেল।

কপালে হাত দিয়ে দেখে বাসনা। হ্যাঁ, গরম হয়ে উঠেছে কপালটা, রাগে শিরা দুটো দপদপ করছে।

সমস্ত শরীর থেকে উষ্ণতা ঠিকরে বের হচ্ছে।

পাখার গতি কমিয়ে দেয় বাসনা। ঝড়ো বাতাসে হাঁপিয়ে উঠছে যেন।

টিকটিক শব্দটা শোনা যায় আবার। প্যারালিটিক পা টেনে টেনে এগিয়ে চলেছে ঘড়ির

কাঁটা।

রেশমী চাদরটা গলা অবধি টেনে ঢাকা দেয় বাসনা, তারপর আলো জেবলে তাকায় ঘড়ির দিকে। না, এখনো অনেক দেরি। প্রতীক্ষার প্রহর শেষ হয়নি এখনো। আড়চোখে একবার তাকায় নিদ্রিত বিশ্বনাথের দিকে। বিশ্বনাথ অচেতন। ঘুম ভাঙেনি তার।

মাথার বালিশটা বুকে চেপে বিছানায় মুখ গংুজে শুয়ে থাকে বাসনা। টিকটিক টিকটিক শব্দ করে ঘড়িটা।

তৃষ্ণা অনুভব করে বাসনা। গলাটা শুকিয়ে এসেছে। কিন্তু উঠতে ইচ্ছা হয় না তার। বিছানায় পড়ে পড়ে ভাবতে চেষ্টা করে।

বাসনা বুঝতে পারেনি, কেমন করে বিশ্বনাথের ওপর তার সমস্ত মায়া-মমতা উবে গেল একে একে। শুধু অনুভব করে, ক্রমশ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে সে। হিংস্র নির্যাতনের মধ্যে আর দিন কাটাতে পারে না বাসনা। তার মেয়েলী বুকে অপমান লুকিয়ে রাখতে পারে না।

পাগল হয়ে যাবে বাসনা। আত্মহত্যাকে চিরকাল ভয় করে এসেছে। আজ কিন্তু ইচ্ছা-মৃত্যুর বিভীষিকা অমৃত মনে হয়। ব্যথায় খাঁ-খাঁ করে ওঠে বুকটা। কান্না গুমরে মরে ওর বুকে।

যদি জীবনে থাকতো শান্তি। যদি এতটুকু শান্তি থাকতো তার জীবনে। জীবনের আশা থাকলে যৌবন উপেক্ষা করতে পারতো বাসনা।

কপাটে খিল দিয়ে এসে বিছানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো সে। অস্থির দেহটা নরম বিছানায় ডুবিয়ে দিলে। তবু। তবু শীতল শয্যাটা যেন উষ্ণ মনে হলো বাসনার।

বহুক্ষণ ধরে পড়ে পড়ে কাঁদলে সে। মনোদুঃখের অসহনীয়তাকে আর যেন চেপে রাখতে পারে না। মৌমাছির মতো হুল উঁচিয়ে রয়েছে বহু দিনের সঞ্চিত ব্যথার সারি। বুক জবালিয়ে শব্দ হয়ে প্রকাশ পেতে চায়। এখন যদি কাউকে সে কাছে পেতো। যে-কোনো একজনকে যদি শোনাতে পারতো তার বেদনার ইতিহাস।

সহানুভূতি পাবার জন্যে কাঙাল হয়ে ওঠে মন।

ছোট্ট শিশুর মতো কেঁদে ককিয়ে ওঠে সে।—না, না, পারবো না আমি, বাঁচতে পারবো না। অসহন ব্যথায় চিৎকার করে ওঠে বাসনা।

ঝনঝন করে কড়া নাড়ার শব্দ বেজে ওঠে পরক্ষণেই।

সাড়া দেয় না বাসনা।

—কপাট খোলো, শিগগির কপাট খোলো। বিশ্বনাথের স্বরে আদেশের সুর।

আঁচলে চোখমুখ মুছে কপাট খুলে দিলো বাসনা। তারপর বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকালে বিশ্বনাথের দিকে। আগুনের ফুলকি ছড়ানো চোখ জোড়া নতুন ঠেকলো।

—কথা বলছিলে কার সঙ্গে? হৃদয়হীন কাঠিন্যের ধাক্কা দিয়ে বিশ্বনাথ বললে।

—কথা? বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেল বাসনা।

বিশ্বনাথ ততক্ষণে তল্লাশী চোখে খুঁজতে শুরু করেছে। খাটের তলায়, আলনার পাশে, আলমারির পিছনে। একজন কেউ কোথাও লুকিয়ে আছে নিশ্চয়। তাকে খুঁজে বের করবে সে। তার সন্দেহ যে অকারণ নয় প্রমাণ করবেই।

নিচের ঠোঁটটা দাঁতে কামড়ে বিছানার উপর উঠে বসলো বাসনা। ঘামে ভিজে গেছে তার সারা শরীর। চোখের কোণ দুটো জবালা করছে। হাতের উলটো পিঠে উষ্ণ নিঃশ্বাসের উত্তাপ অনুভব করলে সে। অন্ধ উত্তেজনায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে।

শিথিল বসন সামলে নিয়ে বেডসুইচ টিপে পালঙ্ক-শিয়রের নীল আলোটা জবালালো আবার। বিশ্বনাথের স্পর্শ বাঁচিয়ে খাট থেকে নীচে নামলে। ঘড়িটার দিকে তাকালে একবার। টিকটিক করে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে ঘড়ির কাঁটা। জলো হাঁসের মতো ধীর পায়ে। সময় শেষ হবার নাম নেই। প্রতীক্ষার প্রহর যেন আর শেষ হয় না।

কাঁপা হাতে জানালায় রাখা কুঁজোটা থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে নিলে সে। ঢকঢক করে খেয়ে বাকিটা চোখে-মুখে ছিটিয়ে দিলে। আঁচলটা ভিজিয়ে নিয়ে প্রলেপ দিলে কানে

কপালে।

নিদ্রিত বিশ্বনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে বিতৃষ্ণায় ভরে গেল তার মন। বিশ্বনাথ এত কুৎসিত?

না। এ নারকীয় পাতালপুরীর বন্দী-জীবনকে ত্যাগ করে যাবে সে, সহ্য করবে না অকারণ নির্যাতন।

আলোটা নিবিয়ে দিয়ে আরামকেদারায় বসলে এবার। আর শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করে না। ঘৃণায় সংকুচিত হয়ে উঠলো বাসনা। আশ্চর্য। ঐ কুৎসিত লোকটার পাশে কি করে কাটিয়েছে সে এতদিন!

নীচের হলঘরের দেয়ালঘড়িতে ঢং করে একটা ঘণ্টা বাজলো। কিছুক্ষণ, আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে তাকে।

প্রতিহিংসার আগুন জ্বলেছিলো হয়তো তার চোখে। প্রতিশোধ নেবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলো সেদিন।

বিশ্বনাথের ক্যাডিলাক বিচিত্র ধ্বনি তুলে ফটক পার হতেই দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়ালো সে। চিকের পর্দাটা তুলে দিয়ে রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়ালো। চকিতে চারপাশ দেখে নিলে অণুবীক্ষণ দৃষ্টিতে। তারপর চঞ্চল চোখ চেয়ে তাকালে গলি-রাস্তাটার দিকে।

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো তার বিষাদী মন। প্রতিদিনের মতো বসে আছে ছেলেটি। তারই দিকে তাকিয়ে। বাসনাও তাকিয়ে রইলো। আজ আর তাকে চাবুক মারতে ইচ্ছে হলো না। কেমন যেন দয়া হলো। অসহায় ব্যর্থতা বুকে করে এখনো অপেক্ষা করছে সে। দিনের পর দিন আশা আঁকড়ে অপেক্ষা করছে। হাসি পায়। কৌতুকের হাসি চমকে যায় বাসনার মনে।

ভালো করে তাকিয়ে দেখলে। চমৎকার যৌবনসুলভ চেহারা। চেষ্টা করে তার দিকে চোখ রেখে মৃদু হাসলে। তরুণটির মুখেও উদ্ভাসিত হলো এক টুকরো অনুরাগ-সুখহাস্য।

মুগ্ধ মোহে তাকিয়ে রইলো বাসনা। ভুলে গেল লোকলজ্জা। উচিতানুচিতের বালাই ধুয়েমুছে গেল। অভূতপূর্ব একটা খুশির রেশ যেন জলতরঙ্গের বোল ফুটিয়ে গেল মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে।

তারপর হঠাৎ সেখান থেকে ছুটে পালালো বাসনা।

এতক্ষণ যেন চেতনা হারিয়ে ফেলেছিলো সে। আত্মস্থ হতেই অত্যন্ত লজ্জা বোধ করলো। কান লাল করে পালিয়ে এলো। একটা ছিছি-কার ঠেলে উঠলো তার বুক থেকে। কেন, এতদিনের সক্ষম বাঁধনে বাঁধা মনের গ্রন্থিটা হঠাৎ আজ এত ঢিলে দিলো কেন? মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে বাসনা, বারান্দায় দাঁড়াবে না সে কোনো দিন, তুলবে না আর চিকের পর্দাটা, তাকাবে না জনপথের দিকে।

প্রতিজ্ঞা টিকলো না তবু।

পরের দিন বিশ্বনাথ চলে যেতেই চিকের পর্দাটা তুলে দাঁড়ালো সে। চকিতে চোখা-চোখি হলো। একরাশ বই বগলে করে কোথায় যেন চলেছে ও। বাসনাকে দেখেই থমকে দাঁড়ালো পথের মাঝে। সরে যেতে ইচ্ছে হলো না বাসনার। শুধু ঈষৎ লজ্জায় চোখ ফেরালে অন্য দিকে। মনে মনে চাইলে তরুণটির সামনে তার যৌবন সম্পূর্ণ করে প্রকাশ করতে। কৌতুকে হাসলে।

তারপর দিনে-দিনে লিপির দৌত্যে পরিচয় হলো প্রগাঢ়। এলো আমন্ত্রণ। এসেছে সুযোগ।

না, আর বোধ হয় বেশী দেরি নেই। সময় ঘনিয়ে আসছে।

বাসনা অনুভবে বুঝতে পারে, সময় যত ঘনিয়ে আসছে ততই ভয় বাড়ছে তার।

না। দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। অধৈর্য হবে না। আর কিছুক্ষণ পরেই তো শুরু হবে তার অভিসারযাত্রা। জীর্ণ বস্ত্রের মতো পরিত্যাগ করবে বিশ্বনাথকে। তারপর দয়িতের কাঁধে ভর দিয়ে ছুটে ছুটে বেড়াবে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে। স্খলিত তারার মতো। হাউইয়ের ফুলের মতো জীবন-ভোর ফুটে ফুটে পড়বে অজস্র-সুখ খুশিয়াল অনন্ত মুহূর্ত। ওদের যুগ্মযৌবন-দিনের আকাশ জুড়ে প্রহরী থাকবে রঙিন রামধনু, রাতের আকাশে পাহারা

দেবে রূপালী পাহাড়।

আগামী সুখের স্বপ্ন চঞ্চল করে তোলে বাসনাকে।

ধীরে ধীরে পা টিপে টিপে কপাটের কাছে এলো সে। খিলটা খুললে খুব আস্তে। খুট্ করে একটা শব্দ হলো। ভয়ে বুকটা দুলে উঠলো তার। নিঃশ্বাস চেপে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। না, বিশ্বনাথের ঘুম ভাঙেনি।

বাইরে বেরিয়ে এলো সে এবার। দ্রুত পায়ে এসে দাঁড়ালে বারান্দায়। তুলে ধরলো চিকের পর্দাটা।

চারপাশে তাকিয়ে দেখলে ভালো করে।

বৃষ্টি হয়ে গেছে একটু আগেই। ঝকঝকে ইস্পাতের পাতের মতো চমক দিচ্ছে পিচের রাস্তা। ক্লান্ত পৃথিবী নিঝুম ঘুমে ঢুলছে, কোথাও নেই এতটুকু আওয়াজের লেশ। নিঃশব্দ। নিশ্চুপ। গলির মোড়ের গ্যাসবাতিটাও যেন জলুস হারিয়েছে।

মিনিট কয়েক সময় আছে আর হাতে। এখনি এসে পড়বে ও। তার আগে—

হোক্ চুরি, তার অজস্র বসন ভূষণ রত্নালংকারের কিছু সে সঙ্গে নেবেই।

পর্দাটা নামিয়ে দিয়ে প্রসাধন-কক্ষের দিকে পা বাড়ালো সে। হঠাৎ চোখ গেল তার অন্ধকার বারান্দাটার দিকে। ভয়ে শিউরে উঠলো। সুদীর্ঘ বারান্দাটা অন্ধকারে ছমছম করছে। থামের পর থাম, কার্নিসের কোলে কার্নিস ডুবে আছে অন্ধকারে।

সেদিকে তাকিয়ে বিস্ময় বোধ করলো বাসনা। বাড়িটা এত বড়, এমন বিরাট আকার বাড়িটার!

কিসের একটা শব্দ হলো যেন। চট্ করে সরে এসে কপাটে কান পাতলে সে। অপেক্ষা করলে অনেকক্ষণ। না, ঘুম ভাঙেনি বিশ্বনাথের।

বহু দূরে একটা মোটরের হর্ন বাজলো। বিশ্রী লাগলো শব্দটা। ক্যাডিলাকখানা এমন বিশ্রী আওয়াজ করে না, ভাবলে বাসনা। পরক্ষণেই হাসি পেলো তার। বাড়ি গাড়ি এসবকে এখনো নিজের ভাবছে সে?

এর পর কি আর গাড়ির দরওয়াজা খুলে বিনয়নম্র সেলাম জানাবে বাহাদুর? নাই বা জানালে সম্মান, নাই বা পেলো সে ফাঁকা মাহাত্ম্য। সুখী তো হতে পারবে।

ধীরে ধীরে সাজঘরে ঢুকে সুইচ টিপে আলো জ্বাললে বাসনা।

পরমুহূর্তেই চোখ ঝলসে গেল তার।

হঠাৎ বাতাসের বুক চিরে শিস বেজে উঠলো।

কিন্তু। মাথা ঝিমঝিম করছে বাসনার। পা টলছে।

এত ঐশ্বর্য তার? এ সমগ্র ঐশ্বর্য তারই?

দেয়ালের চারপাশের আয়নাগুলো ঝকমক করছে বিজলীবাতির জ্যোৎস্না লেগে।

বিস্ফারিত চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইলো বাসনা।

দুধের মতো সাদা জর্জেট। লাল বেনারসী। অ্যামেথিস্টের আভা রেশমী বেগমবাহারের গায়ে। নীলার অশ্রু দিয়ে রাঙানো নীলাম্বরী। চম্পাবরন কড়িয়াল।

প্রত্যেকটির স্পর্শ নেয় বাসনা। ত্বরিত হাতে খুলে ফেলে তার ভাঁজ, মেলে ধরে উজ্জ্বল আলোকের সামনে। তৃষাতুর চোখ তার দৃষ্টি দিয়ে রস আহরণ করে।

কাচের আলমারিটার দিকে ফিরে তাকায় বাসনা। উন্মাদনা নেচে ওঠে তার সুরাক্ত শোণিতে। অজস্র রত্নালংকারের উজ্জ্বল ঝলসানি। আইভরির হাঁসুলি, প্ল্যাটিনামের দুল। হীরের কণ্ঠহার, মুক্তোর সিঁথিমউড়, প্রবালের মালা, সোনার কঙ্কণ।

এত ঐশ্বর্য তার? এর একক সম্রাজ্ঞী সে?

হঠাৎ যেন এক গোপন সুড়ঙ্গপথের কপাট খুলেছে, বাসনার মনে হয়, আর চোখের সামনে ঝলসে উঠেছে প্রবাল, প্ল্যাটিনাম, হীরে-জহরত, মণিমুক্তা চন্দ্রহারের হাট।

ভোরের সূর্যের মতো! শারদ রামধনুর মতো ফুটে পড়ছে অপূর্ব রঙ আর রত্নের সমাবেশ। দিনের আলোয় তার দেহের অন্তরঙ্গ পরিচয় পেয়েছে এরা, কিন্তু উচিত মূল্য পায়নি বাসনার চোখে।

অদ্ভুত।

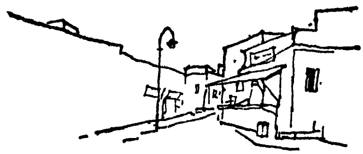
না, এর একটা কানাকড়িও ফেলে যেতে ইচ্ছে হয় না।

স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থাকে বাসনা। মাথা ঝিমঝিম করে তার।

বাতাস চিরে আর একটা শিস বেজে উঠলো।

বাসনা তখনও বিমূঢ় স্থির। না, না, এসব ফেলে যেতে পারবে না সে। এসব ফেলে—যেতে পারবে না।

[১৩৫৫



আতসী উজ্জ্বল

শহর-দক্ষিণের এ অংশটা যুদ্ধের সময় ছিলো মার্কিনদের মিলিটারি হাসপাতাল। তারপর সেই সাজসরঞ্জাম, বাড়িবাগান জুড়ে দেশী রুগীদের শুশ্রূষার ব্যবস্থা হলো। গড়ে উঠলো একটা নতুন ডাক্তারি কলেজ। আর হাসপাতাল।

দোতলা বিরাট প্রাসাদের মতো বাড়িখানা এলো সরমাদের জিম্মায়। এক-একখানা ঘরে দু-দুজন নার্স। সারা ম্যানসনটায় কম করে পঞ্চাশজন সেবিকার আবাস।

মানসী বয়সে ওর চেয়ে বেশী বড় না হলেও বেতনে এবং বিদ্যায় নিশ্চয়। গা-ছোঁয়া হাসপাতালটার মেট্রন ও। তাই আর-আর সিস্টারদের মনের কোণে ওর প্রতি যেটুকু ভালোবাসা আছে তা ভেজালে মেশানো। সরমা কিন্তু সত্যি বেশ আপন হয়ে উঠেছে মানসীর। অন্তরঙ্গ। তাই দখিন-খোলা মাঝের সেরা ঘরখানাই হয়েছে মানসী আর সরমার কুমারীকুঠি।

ছোট্ট ঘর। দু দিকের দেয়াল ঘেঁষে দুখানা একক পালঙ্ক। একটা কম-দামী ড্রেসিং টেবিল। চিঠি লেখবার একখানা ক্ষুদে মেজ, সবুজ রঙ করা। আর খান দুই তেপায়া। সারা ঘরটায় ঐশ্বর্যের ছাপ নেই কোথাও। দারিদ্র্যের আছে হয়তো। তবু কত পরিচ্ছন্ন। পরিপাটি। বাফ্ রঙের ডিস্টেম্পার করা দেয়ালের গায়ে কোনো-এক নাম-করা ওষুধ কোম্পানীর ক্যালেণ্ডার।

সহজ কথায় সরমা আজ সুখী।

খাওয়া-পরার খরচ চালিয়েও বেশ কিছু টাকা হাতে থাকে ওর। কিন্তু সব টাকাই মা-কে পাঠাতে পারে না। ইচ্ছে হয় বইকি। ছোট্ট বোন আর ছোট ভাই দুটি। তিনজনেই ইস্কুলে পড়ছে। মার অসুখ আর পুজো-পার্বণও যেন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। যে ক'টা টাকা পাঠায় ও, চারজনের পক্ষে তা কতটুকু! ইস্কুলের মাইনে, বই কেনার টাকা, ওষুধের দাম, মা কালীর মানত। আরো কিছু যদি পাঠাতে পারতো!

ব্যয়ের অঙ্ক ও অনেকখানি সংক্ষেপ করেছে, রুচির হানি ঘটিয়েও। এ বোর্ডিং-এর আর পাঁচজনের মতো দু জোড়া জুতো অবধি রাখেনি। রঙিন শাড়ির সঙ্গেও ঐ সাদা জুতোটাই চালিয়ে দেয়। প্রসাধনের পায়ে প্রণামী দেয় না, সিনেমা দেখে ক্বচিৎ কখনো।

ফুরসত পায় ছুটির দিনে। ফুর্তির ফোয়ারায় গা ডুবিয়ে দেয় সেদিনটা। সারা সকালটা হইচই করে। এর-ওর ঘরে ঢোকে, কারো বাক্সপ্যাঁটরা খোলে, কারো বা চিঠিতে চোখ আঁটে। এ-দরজায় টোকা দেয়, ও-দরজার ফাঁকে ছুঁড়ে দেয় দু-এক কলি ভাঙা গানের সুর, কাউকে টিটকারি দেয়, কাউকে সহানুভূতি।

সারা দুপুর এদিকে দল বেঁধে রাস্তায় টো-টো। নিউ মার্কেটের ফলের দোকান,

হোয়াইটাওয়ের শো-কেস। সিনেমার স্থির ছবির উইনডো, ওদিকে হ্কার্স-কর্নার। দশ-বারোজন মিলে এখানে-ওখানে জবরদস্তি দেখাবার চেষ্টা করে। বাস-ট্রামের সামনে হাত তুলে দাঁড়ায়, চাপা দাও নয়তো থামো। ব্লাউজের ছিটের দর কষাকষি করে, হিন্দীতে ধমক দেয়। তারপর ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসে।

আর-আর দিনগুলো একঘেয়ে। একঘেয়ে হলেও বিরক্তির নয়। সারা দিনের খাটুনিতে যা কিছু শ্রমাতুর ভাব তা সান্ধ্য রোমাঞ্চের বাতাস ওর কপাল থেকে মুছে নেয়।

বিকেলের মেঘের রক্ত যখন জমে কালো হয়ে যায়, হলুদ-রঙা বাতাসের তাপ কমে, তখন স্নানান্তের স্নিগ্ধ সৌরভ মেখে সামনের বারান্দায় এসে বসে সরমা। এদিকে আকাশের প্রথম তারারা যেন হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকে। সাড়া না দিয়ে পারে না ও।

সারিবাঁধা কৃষ্ণচূড়ার পাতা নড়ে ওঠে। সন্ধ্যার সুগন্ধি বাসী বাতাসকে টেনে নিয়ে যায়। আর নরম ঘাসের বীথিপথের ওপর হালকা পায়ে পায়চারি শুরু করে সরমা। এক-একবার আচমকা মাথা তোলে, চোখের দৃষ্টি ছুঁড়ে দেয় অনেক অনেক অন্ধকারের দূরত্বে। আবছা আলোর ফিকে রোশনাই আর আরো দূরের জমাট অন্ধকার। অ্যাভেন্যুর দু'পাশে ল্যাম্পপোস্টের সারি। প্রহরী-আলোর আমেজটুকুও দূরে গিয়ে দিক হারিয়েছে। ফিকে হয়ে গেছে জনতার ভিড়। তবু এগিয়ে যায় সরমা। তারপরই হঠাৎ হয়তো চোখে পড়ে একটি ছায়া-পুরুষ। প্রতীক্ষাসফল আনন্দের হাসি উছলে ওঠে ওর চোখের নীলায়।

অমানিশার অন্ধকারই থাক্ বা শুক্লাজ্যোৎস্নার জোয়ারই জাগুক আকাশে, নিরালা পৃথিবীর মাঝে, বন-কৃষ্ণচূড়ার আঁধারের চাঁদোয়ায় ঢাকা নিরালোক পৃথিবীর মাঝে এসে নামে ওরা। পাশাপাশি। একটি নির্দিষ্ট বেঞ্চিতে এসে বসে ওরা দুজনে।

রাত গভীর হয়ে আসে। আর মন। তারপর, একসময়ে যতি পড়ে ওদের মুগ্ধ মনের কথালাপে। একক শূন্যতার মাঝে ফিরে আসে সরমা। কুমারী-পালঙ্কের নরম শয্যায় শরীর ছড়িয়ে রেখে চোখের পাতায় ঘুম নামাবার মন্ত্র পড়ে।

ওদিকের রোগা খাটে মানসী।

তন্দ্রাবেশে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে সরমা। তবু ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে বলতে হয়, ওর দৈনন্দিন রোমাঞ্চের ইতিহাস শোনাতে হয় মানসীকে। নিস্তব্ধ, নিশ্চুপ হয়ে আসে সারা দুনিয়া। শব্দহীন। শুধু ওদের দুজনের টুকরো টুকরো হালকা কথা। কাচের গেলাসে গুঁড়ো বরফের কুচির মতো ঠাণ্ডা, ভাঙা-ভাঙা।

মানসীর কাছে কিছু লুকোতে চায় না সরমা। লুকোতে পারে না। বুক উজাড় করে অদ্ভুত একটা আনন্দ পায় ও। ভরসাও।

কিন্তু—হ্যাঁ, মানসীর কাছ থেকেও একটা দিনের কাহিনী গোপন রেখেছে সরমা। শুধু একটি দিন।

বিকেল পাঁচটার ঘণ্টা পড়লো। আর অন্যান্য দিনের মতোই সেদিনও কি এক অবোধ্য অস্বস্তি এসে ঢুকলো সরমার বুকে।

রোজই এমন হয়।

লম্বা ওয়ার্ড। দু'পাশে সারিবাঁধা রোগশয্যা। মাঝখানে সরু একটা প্যাসেজ। সমস্ত ঘরখানায় একটা পরিচ্ছন্নতার প্রলেপ। শান্ত আর নিঃশব্দ। প্রতিটি লোহার খাটে শ্বেত-শুভ্রতার বিছানা বিছানো। আর রুগীদের শিয়রের কাছে টাঙানো এক-একটি গ্রাফ-আঁকা চার্ট। হাসপাতালের সুদীর্ঘ ওয়ার্ড—এ দরজা থেকে ওদিকের ফটক অবধি যেতে পাঁচ মিনিট অন্তত লাগবে। অথচ সারাটা দিন সরমা অক্লান্ত।

কপালে ওর ঘাম ফোটে, হয়তো বা শ্রমোজ্জ্বল রক্তিমাভা। কিন্তু চোখে শ্রান্তির আবেশ দেখা দেয় না। রুগীরা কেউ সহজ, কেউ বা আড়চোখে লক্ষ করেছে। লক্ষ করে। হাসপাতাল ছেড়ে যাবার বহু দিন পরেও হয়তো ওদের মনের পটে ভেসে ওঠে এখানকার দৃশ্যটুকু।

সরমা। নাতিশীর্ণ দেহ জড়িয়ে যার একখানি সাদা ফুটফুটে শাড়ি, পায়ে সাদা জুতো, মাথায় কালো কেশের কোমল প্রাচুর্য ঢেকে শুশ্রূষকের শ্বেতচিহ্ন। সবে মিলে অদ্ভুত

সুন্দর দেখায় ওকে। জীবন্ত যৌবন। একটি ভ্রমরাকাঙ্ক্ষী রজনীগন্ধার অন্ধ কলির মতো। উদ্দাম আর চঞ্চল। উন্মাদনা আর চপলতা। হ্যাঁ। খুটখুট করে ফ্ল্যাট-হিল্ জুতোর হালকা আওয়াজ চেপে চেপে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে সারাটা দিন। তখনই থার্মোমিটার দিচ্ছে এর জিভের নিচে, জ্বরতরঙ্গের গ্রাফ আঁকছে চার্টের গায়ে। আর তখনই হয়তো ওর ঠোঁটের কাছে ধরেছে ওষুধের গ্লাস। দুটো হালকা হাসি এর দিকে, ওকে দুটো সান্ত্বনা, আরেক-জনকে হয়তো বা তর্জনী-তোলা ধমক।

সত্যি। সারাটা দিন ও অক্লান্ত। কিন্তু পাঁচটার ঘণ্টা শুনতে পেলেই চঞ্চল হয়ে ওঠে ও। ছুটির ডাক শুনতে পায়, দিনান্তের রোদো বাতাস ওর মদো রক্তকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে শুরু করে।

জানালার ফাঁক দিয়ে বাইরের পৃথিবী দেখা যায়। হাসপাতালের দক্ষিণের দেয়াল ছুঁয়ে গেছে চওড়া সড়ক। দু'পাশে একপথো বীচের রাস্তা, মাঝখানে ঘাসের জাজিম। আর পথ বড় হলেও এদিকটায় গাড়িঘোড়ার উৎপাত নেই। বেশ ঠান্ডা চুপচাপ। পোড়া পেট্রোলের গন্ধ আসে না নাকে, হর্নের হঠকারিতা নেই।

পাঁচটার ঘণ্টা ওদিকে, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বাইরের পৃথিবী থেকে ছিটকে এলো চঞ্চল বাতাস। সান্ধ্যভ্রমণাদের ভিড়-ভিড় গুঞ্জন কানে এলো সরমার।

আর একটি ঘণ্টা। তারপরই ছুটি।

হঠাৎ ঘরের আলো কাঁপলো। ভাঙলো নিঃশব্দতা। কারও কণ্ঠে উচ্চকিত স্বর, কারও চোখে বিষণ্ন হাসি। টুকরো টুকরো কথার কাকলিতে ঘর কেঁপে উঠলো।

হ্যাঁ। প্রতিদিনই, ঠিক এই সময়টায় রুগীদের আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধবরা এসে হাজির হয়। দৈনন্দিন সাক্ষাতের জন্যে।

আর অনিচ্ছা সত্ত্বেও বারবার ওর চোখ যায় এক শো বাষট্টি নম্বর বেডের দিকে। খাটের পাশের টুলটিতে এসে বসে সে। রোগশয্যায় শায়িত বন্ধুকে সাক্ষাতের সান্ত্বনা দিতেই আসে। কিন্তু, চোখ থাকে তার সরমার দিকে। প্রথম প্রথম কৌতুক বোধ করতো সরমা। নিজেরই অজান্তে ঠোঁটের কোণে ওর হাসি দুলে উঠতো, তারপর সচেতন হতেই ঠোঁট টিপে হাসি চাপতো।

মন মদির হতো না সত্যি, কিন্তু হাসিটা মধুর। তাই হয়তো অন্য কোনো অর্থ পেয়েছিলো লোকটি, ভুল ভেবেছিলো। ফলে সাহস বেড়ে গেল তার। যা ছিলো মোম-বাতির আলোর মতো ঠান্ডা মোহময় দৃষ্টি, আশার আগুনে তা জ্বলে উঠলো।

অসহ্য লাগলো সরমার। অস্বস্তি বোধ করলো ও। মানসীর কাছে অনুযোগ করলো। উত্তর এলো বিদ্রুপের হাসি। শুশ্রূষকের জীবন বেছে নিলে এমন অনেক কিছুই নাকি সয়ে যেতে হয়।

সরমা প্রতিবাদ করলে, তা বলে অমন বিশ্রীভাবে তাকিয়ে থাকবে কেন?

মানসী হাসলে।—ও তো শুধু তাকিয়েই থাকে।

সরমা মনে-মনে চটে। বেশ। ও নিজেই এর ব্যবস্থা করবে।

সেদিন কিছু একটা বলবে বলেই লোকটির দিকে এগিয়ে গেল সরমা। ভর্ৎসনার স্থির-দৃষ্টিতে তার দিকে কিছুক্ষণ লক্ষ করে এগিয়ে গেল।

—শুনুন।

না। সরমা নয়। ও কিছু বলবার আগেই লোকটি ডেকে বসলো। সরমা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালে, কথা জুটলো না ওর মুখে।

দুখানা দশ টাকার নোট ধরলে লোকটি ওর চোখের সামনে।—এ'র জন্যে কিছু ফলমূল আনাবার ব্যবস্থা করে দেবেন? এই টাকা ক'টা—

রুগীদের জন্যে ফলমূলের ব্যবস্থা নেই। টাকার বিনিময়ে সে ব্যবস্থা হয়। কিন্তু সাধারণত সেটা করে হাসপাতালের জমাদার বেয়ারার দল। দু-পাঁচ টাকা বকশিশের লোভে। তা বলে, সরমাকে? তবু হয়তো ক্ষমা করতো ও, কিন্তু লোকটির সুবোধ্য হাসি আর টাকার পরিমাণ—এ দুটো মিলিয়ে কি এক অর্থ পেলো সরমা। রাগে রি-রি করে উঠলো সারা শরীর।

মানসীকে বললে, এর পরও লোকটার আসা বন্ধ করবে না?

মানসী হাসলে।—এত সহজ ভাবিস?

—তবে ডিউটি বদলে দাও আমার। অন্য ওয়ার্ডে দাও।

উত্তর এলো, বোকা মেয়ে!

গোলাপী টার্কিশ টাওয়েলটা ওড়নার মতো বুকে কাঁধে জড়িয়ে হাতে সাবানের কৌটোটা তুলে নিয়ে সান্ধ্য স্নানের জন্যে পা বাড়াচ্ছিলো সরমা। পেছন থেকে ওর আঁচলটা টেনে ধরলো মানসী।

—এত তাড়াহুড়ো করে যাচ্ছিস কোথায় শুনি?

সরমা মৃদু হেসে বললে, বেশ যা হোক্। দিলে তো যাত্রাটা মাটি করে। গিয়ে দেখবো বাথরুমে পাম্পের জল নেই।

—খনার বচন পড়িসনি? আগে হতে পিছে ভালো যদি ডাকে মা-য়।

—দিদি, মা নও। বয়সটা একটু বেশী হলে নয়—

—উ'হু, তা হলে কি আর তোর প্রেমের গল্প শুনতে পেতাম।

—দেখো মানুদি, গল্প-গল্প বোলো না বলছি।

—ওঃ, চটেই লাল হয়ে আছে মেয়ে। মান-অভিমান দেখাতে হয় তার কাছে দেখিও। গম্ভীরভাবে বললে মানসী। পরক্ষণে হেসে ফেললে।—চুপ করে বসে আগে তোর উপাখ্যানটা বলে যা।

—বাঃ! কাল রাতে তো বললাম।

—উ'হু। দ্বিতীয় প্রেমিকটির কথা। ঐ হাসপাতালের ভদ্রলোক।

—ভদ্রলোক! কথাটার ওপর অস্বাভাবিক জোর দিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করলে সরমা। লোকটার কথা ভাবতেও আমার গা ঘিনঘিন করে।

—তবে, প্রথম প্রেমিকের কথাই বল্।

সরমা হাসলে, কি বলতে বাকি রেখেছি?

সত্যি। কিছুই বাকী নেই। এর আগে কতবার যে বলেছে তার ইয়ত্তা নেই। তবে, ঘুমন্ত তো নয়। জাগর প্রেম। দিনে দিনে ঘটে নতুন সংযোজনা। আরো কথা। আরো কামনা।

ব্যাপার হলো এই যে, সঞ্জীব আর সরমা দুজনে মন দেওয়া-নেওয়া করেছে।

আত্মীয়স্বজন নয়, পাড়াপড়শী নয় এরা কেউ। অতএব সে-খবরে মানসীর এত উৎসাহ কেন? কেন কে জানে। তবে ঔৎসুক্য মানুদির চেয়ে কারও কম বলে তো মনে হয় না। আজ আর সঞ্জীব-সরমা উপাখ্যান কারও অজানা নয়। সরমার ডাকনাম যে 'ঠাণ্ডা' তা যেমন জানতে বাকী নেই কারও।

একজনই দিয়েছে এ নাম, আর একজনেরই ডাকবার কথা এ নাম ধরে। কিন্তু মানুদির জ্বালায় কি কিছু গোপন রাখবার জো আছে। দু মাস হয়নি ও এ বোর্ডিংটায় এসেছে। অথচ ইতিমধ্যেই এমন অবস্থা যে তিনজন এক জায়গায় হয়েছে কি দুজনের কথা—সঞ্জীব আর সরমা।

দোষই বা কি! ছ'টার ছুটি হতে না-হতে এসে ঢুকবে ও স্নানের ঘরে। তারপর মানসীর পাউডারের কৌটোটা টেনে নিয়ে পাফ্টা দু গালে বুলিয়ে নেবে। চুলটা আঁচড়ে, শাড়ি ব্লাউজ ঠিক করে নেবে চটপট। তারপর এক পীস পাঁউরুটি আর এক কাপ ঠাণ্ডা চা। বোর্ডিং-এর নেপালী ঝি গৌরীমায়া চায়ের পেয়ালাপিরিচ সরিয়ে নিয়ে যাবার আগেই সরমা রাস্তায় নেমে পড়েছে।

এ যেন নেশার ডাক, নিশীথের ডাক।

ড্রেসিং টেবিলটার সামনে বে'টে টুলটায় বসে চুল আঁচড়াচ্ছিলো সরমা। আর গুনগুন করে গাইছিলো কি একটা গানের কলি। স্নানের পর বেশবাস বদলাতে, প্রসাধন-সাধনে এত সময় কোনো দিনই দেয় না সরমা।

তাই মানসী জিজ্ঞেস করলে, কি ব্যাপার, ডিউটি দিতে যাবি না বুঝি?

সরমার এই সন্ধ্যের অভিসারকে 'ডিউটি' বলে ঠাট্টা করে সবাই। শুনে শুনে অভ্যেস হয়ে গেছে সরমার। বললে, না।

—কেন? অভিমান না অনিচ্ছা?

সরমা হাসলে।—আসবে না আজ।

তারপর চট করে উঠে এসে মানসীর খোঁপাটা ঠিক করে দিতে দিতে বললে, চলো মানুদি। ঘুরে আসি।

কিন্তু না। মানসী এ ব্যতিক্রমে রাজী নয়। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এই দেয়ালঘেরা ঘরের বদ্ধ বাতাসে কাটিয়ে দিয়েছে, এই বিজলী-বাতির চোখ-ধাঁধানো তিমিরের গভীরতায়। খোলা আকাশ, খোলা বাতাস সহ্য করতে পারে না ও।

অগত্যা একাই বেরিয়ে পড়লো সরমা।

দু ধারে ল্যাম্পপোস্টের কনভয়। মাঝখানে নরম ঘাসের জনপদ।

সবুজ নয়, অন্ধকারে কালো দেখায়। যেন একটা সুস্থযৌবন সাঁওতাল পুরুষের গলার মুক্তোর মালা।

লঘু পায়ে হাঁটতে শুরু করে সরমা। কৃষ্ণচূড়া আর অমলকী, হিজল আর হরিতকী গাছের আড়ালে ঢাকা আধা-চাঁদের ছায়ার দিকে।

রাস্তার এপাশে ফ্লোরেসেণ্ট আলোয় ঝলমল একটা পানের দোকান। উঁচু হাসি আর তীক্ষ্ণ তর্কের বুলি কানে আসতেই ফিরে তাকালো সরমা। চকিত চোখে।

সে। এক শো বাষট্টি নম্বর বেডের পাশের এক জোড়া চোখ। হাতে একটা জ্বলন্ত সিগারেট।

চোখাচোখি হলো। তারপর, তারপর আরেকবার ফিরে তাকাতে ইচ্ছে হলো সরমার। তবু পারলো না। যেমন হেঁটে চলেছিলো, হেঁটে চললো। পায়ের গতি হয়তো বা একটু দ্রুত হলো। কে জানে!

জনহীন ঘনবনের নিঃশব্দতায়, পথের পাশের ল্যাম্পপোস্টগুলো যেখান থেকে ফিরে এসেছে, তারও ওপারের অন্ধকারে ডুব দিয়ে হাঁপ ছাড়লো সরমা।

নির্জন। নির্জন আর অন্ধকার।

প্রতিদিনের মতোই সেই নির্দিষ্ট বেঞ্চিটাতে এসে বসলো সরমা। একা। কি একটা রাতপাখি পাখা ঝটপট করে উড়ে গেল।

নিশ্চুপ বসে রইলো সরমা। আপন চিন্তার গভীরতায় ডুবে রইলো।

হঠাৎ।

কাছের গাছের আড়ালে চোখ গেল। একটা ছায়াশরীর। মুখ দেখা যায় না। শুধু সাদা পরিচ্ছদটা চোখে ভাসে। একটা দেশলাই জ্বালার শব্দ হলো। সিগারেট ধরালো কে যেন, দু হাতের তালুতে আগুনের শিখাটা আড়াল করে। কিন্তু ঐ সামান্য আলোতেই চিনতে পারলে ও।

ভয়ে আশঙ্কায় উঠে দাঁড়ালো সরমা। তারপর দ্রুত পায়ে বোর্ডিং-এর পথ ধরলে। পিছনের উচ্চকিত হাসির শব্দ কানে এসে পৌঁছলো। ধাক্কা দিলো বুকের ভেতর।

মানসী প্রশ্ন করলে, কি, এত তাড়াতাড়ি ফিরলি যে?

সরমা হাসবার চেষ্টা করে বললে, এমনি।

পরে অবশ্য সেদিনের কথাটা মানসীকে বলেছিলো সরমা। আর দুজনেই প্রচুর হেসেছে। সরমা নিজেই বিস্মিত হলো ভেবে, এত ভয় করবার মতো কি ছিলো? মানসী বললে, গেঁয়ো! এখনও শহুরে হলি না তুই। এখানে আসবার টিকিট দিয়েছিলো কে তোকে? সরমা হেসে বললে, কেন, স্টেশনের টিকিটঘরেই তো কিনেছিলাম। মানসী বললে, সেই তো সুবিধে হয়েছে তোদের। এখানে আসবার যোগ্যতা আছে কি না তা দেখে না, পয়সা দিলেই ট্রেনে চড়তে পাওয়া যায়।

সঞ্জীবও হেসেছে হো-হো করে—ভারি ভীতু তো তুমি! তাই বুঝি আসোনি এ দু দিন?

ঠোঁটে হাসি টিপে রেখে মাথা নীচু করেছে সরমা। আঙুলে শাড়ির পাড়টা জড়াতে জড়াতে বলেছে, না, ভয় করবে না! একা একা এই অন্ধকারে......

—এখন আর ভয় করছে না তো?

—হ্যাঁ, করছে। একা একা ভালো লাগে তোমার?

সঞ্জীব হাসলে।

সরমা বললে, হাসছো তুমি। কথা বলবার একটা লোক পর্যন্ত নেই।

—সে কি, অত লোক তোমাদের বোর্ডিং-এ। মানুদি রয়েছেন!

—কথা ঘুরিও না।

—এতদিন তো সবুর করলে। আর কয়েকটা দিন সবুর করো।

—কেন?

সঞ্জীব চুপ করে রইলো।

অনুযোগ করলে সরমা, উত্তর না পেয়ে।—তোমার কাছে আমি একটা কথাও লুকিয়ে রাখি না, অথচ তুমি......

কথা খুঁজে না পেয়ে সঞ্জীব পকেট থেকে নতুন কেনা ফাউণ্টেন পেনটা বের করলে—এই নাও তোমার কলম। কোন্ ভাগ্যবানকে চিঠি লিখবে কে জানে।

—মনে আছে যা হোক্। বাঃ, বেশ ছোটখাটো তো। কত দাম?

পরের অংশের বিদ্রূপটা যেন কানেই গেল না ওর।

—উপহারের বিচার কি দাম দিয়ে করবে নাকি?

সরমা হাসলে।—তা নয়। বুঝেসুঝে হিসেব করে চলবার উপদেশ দিতাম।

—এখন থেকেই?

—এখনই আমার কথায় কান দাও না, পরে বড় শুনবে!

সরমার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে সঞ্জীব বললে, শুনবো গো শুনবো।

—এতও পারো। সরমা হাসলে।

তারপর দুজনেই চুপচাপ।

এদিকে রাত বাড়ে। হিম পড়তে শুরু করে। তবু, চমৎকার একটা আমেজ, কত কত তারায় ভরা আকাশ। বাতাস ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডা আর নরম। রেশমের মতো। আর ঘুম-ঘুম রোমাঞ্চ। দয়িতস্পর্শের শিহরন। আমলকীর পাতা নড়ে। কৃষ্ণচূড়ার পাতা নড়ে। শিমুল আর শিশু গাছের চন্দ্রছায়া কেঁপে ওঠে।

—চলো উঠি।

—নাই বা ফিরলে।

—সে কি! সঞ্জীব হাসলো।—সারা রাত এইখানে থাকবে?

সরমা খিলখিল করে হেসে উঠলো, উঠে দাঁড়ালো।

সঞ্জীব বললে, পৌঁছে দিয়ে আসবো?

—এটুকু পথ আমি একাই যেতে পারবো।

সরমার কণ্ঠস্বরে অভিমান ফুটে উঠলো। সঞ্জীব হয়তো বুঝতে পারলো না।

তবু বললে, চলো না, পৌঁছে দিয়ে আসি।

—তোমাকে তো এমনিতেই এতটা পথ হাঁটতে হবে।

অর্থাৎ দুজনের গন্তব্য দু মুখে। একজন পুবে, অন্যের পথ পশ্চিমে।

সঞ্জীব বললে, বেশ যাও তা হলে।

—তুমি যাও, আমি যাবো এখন।

কেউ আর কি আগে যেতে চায় না। শেষে সঞ্জীবই নিজের পথ ধরলো। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ফিরে তাকালো। সরমা তখনও দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে। ওর দিকে চোখ রেখে।

সঞ্জীব হাসলো—কি হলো, যাবে না?

সরমাও হেসে ফেললে। কিন্তু নড়লো না।

সঞ্জীব কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলো। তারপর ধীরে ধীরে গাছগুলির জমাট

অন্ধকারের মধ্যে ডুব দিলো। নিশ্চল, নিশ্চুপ ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে সেদিকে তাকিয়ে রইলো সরমা। অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ। একেবারে নিঃশেষে যতক্ষণ না মিলিয়ে গেল সঞ্জীব। তারপর। গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস।

বোর্ডিং-এর পথ ধরবার জন্যে পিছন ফিরতে যাচ্ছিলো সরমা।

কিন্তু।

তার আগেই এক জোড়া সবল হাত ওকে বোবা করে দিলো। ভয়ে বিস্ময়ে চোখ চাইবার চেষ্টা করলে সরমা। আশংকায় অক্ষম পা দুখানা টললো। মুখে কথা যোগালো না। ওর শরীরের আপাত্তি নিস্তেজ হয়ে পড়লো।

একটি দিন। শুধু একটি দিনের ইতিহাস ও বলতে পারেনি মানসীকে। সঞ্জীবকে তো নয়ই।

কত দিন কত মুহূর্ত এসেছে। মনে মনে নিজেকে দৃঢ় করেছে সরমা। না, সঞ্জীবের কাছ থেকে অন্তত ওর জীবনের কোনো অন্ধকারকেই চেপে রাখবে না। কিন্তু শেষের ক্ষণে সাহস হারিয়েছে ও। ভরসাও। ভেবেছে, মিলনের ভিত আরো গভীর হোক—তারপর, তারপর।

মানসীর চোখে পড়েছে কখনো কখনো। ওর মুখের বিষণ্ণ ব্যথার প্রলেপ, ওর চোখের মাটি-হারানো উদাস দৃষ্টি।

প্রশ্ন করেছে মানসী।—কি এত ভাবিস?

—না, কিছু না তো।

মানসী ভাবতো ওদের প্রেমের স্বচ্ছন্দ গতিতে বুঝি যতি পড়েছে। তবু কিছু বলতো না, প্রশ্ন করতো না।

মানসী সেদিন তখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। চাদরটা সারা গায়ে জড়িয়ে পড়ে আছে।

সরমা টুথব্রাশ ঘষতে ঘষতে সামনের ছোট বারান্দাটায় বেরিয়ে এলো।

হোস-পাইপের জলের ফুরফুরি আছড়ে পড়ছে পিচের রাস্তায়। ঝিরঝির করে চমৎকার একটা শীকরোৎক্ষেপের শব্দ বাজছে। আর পুবের আকাশে হলদে বড় সূর্য। চমৎকার ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। ভোরবেলাকার ঠাণ্ডা বাতাস।

সরমা মুখহাত ধুয়ে আসতেই নেপালী ঝি গৌরীমায়া।—ঠাণ্ডাদি, নীচের বাকাসে চিঠী ছিলো।

—দেখি।

সরমা চিঠিটা পড়লো। আনন্দ আর খুশির হাসিতে ভরে উঠলো ওর মুখ। বুকে সুর বেজে উঠলো।

ছুটে গিয়ে ঘুমন্ত মানসীর পাশে বসলে। একটা ঠেলা দিয়ে ডাকলে।—মানুদি।

—উঁ।

হাসি-হাসি মুখে সরমা মানসীর পাশেই শুয়ে পড়লো। মানসীকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে বললো, ওঠো ওঠো। কতক্ষণ আর ঘুমোবে।

—কেন জ্বালাচ্ছিস। ঘুমন্ত চোখ না খুলেই মানসী বললে।

—ওঠো ; সুখবর আছে।

ব্যাপারটা হলো এই যে, সরমা লিখেছিলো, মা, সেবারে ছোটমাসীমার বাড়িতে সঞ্জীবকে তো তুমি দেখেছিলে। তোমার মত জানিও।

মা উত্তর দিয়েছেন, মা সরো, তুমি এতদিন যা বুঝেছো তাই তো করে এসেছো। কোনো দিন খারাপ ফল তো হয়নি।

মানসী উঠে বসতেই চিঠিটা দেখালে সরমা।

বিকেলে সঞ্জীবকে।

তারপর!

হইচই ধুমধাম হলো না। রোশনচৌকি বাঁধা হলো না ফটকের মাথায়। নহবত বাজলো

না, সুর ধরলো না সন্ধ্যার শানাই। লাল শালু আর সাটিনের চাঁদোয়া নয়। খুব ঠাণ্ডা-ভাবেই বিয়েটা হয়ে গেল! বাসর জাগলো, বাসর কাটলো।

তারপর, ফুলশয্যার রাত।

আনন্দে উচ্ছল ওরা দুজনে। মর্ত্যের সংবিৎ যেন হারিয়ে ফেলেছে।

নানা ফুলে সাজানো হয়েছে ঘরখানা। ফুলেরই শয্যা যেন।

চম্পা-চামেলির সুবাসে স্নিগ্ধ, মালা-মল্লিকার মোহ। খাটের বাজুতে রজনীগন্ধা আর নাম-না-জানা কি একটা রঙিন লতা জড়ানো। পুষ্পসুরভির স্নান। কোণের ভাসটায় এক জোড়া শ্বেতকমল।

সঞ্জীব আপত্তি করেছিলো প্রথমে। কিন্তু, সুধা দেবী আপত্তি শুনলেন না।

বললেন, এটুকু না করলে চলে না।

—কেন?

—সত্যিকারের ফুলশয্যে তো তোমাদেরই ঠাকুরপো। অর্থপূর্ণ হাসি হাসলেন সুধা দেবী। তারপর বললেন, চললাম ভাই, আর বিরক্ত করবো না। মনে মনে তো এর মধ্যেই গালাগালি দিচ্ছো, আধখানা রাত বউদিই মাটি করে দিলে।

সরমা ঠোঁট টিপে হাসলে ঘোমটার আড়ালে। খাটের ওপর যেমন বসে ছিলো তেমনি বসে রইলো। নড়লো না।

বউদি চলে যেতেই কপাটে খিল দিয়ে এসে বিছানার ওপর বসলো সঞ্জীব।

সরমা চাপা কণ্ঠে বললে, উঁকিঝুঁকি দিচ্ছেন না তো?

—দিলেই বা।

সরমাও হয়তো সাহস পেলো সঞ্জীবের কথায়। এক টানে ঘোমটা খুললে—বাবা, ঘেমে নেয়ে গেছি। বলে বিছানা থেকে নামতে গেল। চট্ করে ওর হাতটা ধরলে সঞ্জীব।—কোথায় যাচ্ছো?

—ভয় নেই, পালাচ্ছি না। ছাড়ো।

—হাত ছেড়ে দিলো সঞ্জীব।

সরমা উঠে এসেই সুইচ টিপে আলোটা নিবিয়ে দিলো। আর সেখান থেকেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে বললে চাপা স্বরে, এসো না কিন্তু।

সঞ্জীব সাড়া দিলো না। হয়তো হাসলো, সরমা দেখতে পেলো না। আলো জ্বেলে খাটের ওপর দেহ ছড়িয়ে দিলে সরমা। চোখ বুজলো।

—ও কি! শুয়ে পড়লে যে!

আবদারে শিশুর মতো ঢলা গলায় সরমা বললে, ঘুম পাচ্ছে আমার।

—আমার যে ঘুম পাচ্ছে না।

—তবে জেগে জেগে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকো। আমি ততক্ষণ ঘুমিয়ে নিই। বলেই মুখ ফেরালে সরমা, হাসতে হাসতে। চোখ চাইলে।

বুকের নীচে একটা বালিশ টেনে নিলো সঞ্জীব। তারপর সরমার মুখের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে একখানা হাত টেনে নিয়ে সরমার অনামিকায় আংটিটা পরিয়ে দিলো।

মৃদু হেসে আংটির পাথরটার দিকে তাকালে সরমা মুগ্ধ চোখে।

প্রশ্ন করলে, কি পাথর এটা?

—আতসী। এর আরেক নাম হলো চন্দ্রকান্তমণি। চাঁদের কিরণে চকমক করে, সূর্যের কিরণে আগুন জ্বালানো যায়। বেশ কাব্য করে বললে সঞ্জীব।

আর সরমার মনে পড়ে গেল আরেকটা কথা।—চাঁদের জ্যোৎস্নাটা মিথ্যে মায়া, মন ভোলাতেই পারে। সূর্য সত্য। জীবনকে জীবন্ত করে তোলে। সত্য মায়া নয়, মিথ্যের মতো অনিষ্ট করে না সে। মারা যাবার আগে সরমার বাবা উপদেশ দিয়েছিলেন মেয়েকে। ইস্কুলের মাস্টার ছিলেন, সংস্কৃত সাহিত্য নিয়ে জীবন কাটিয়ে গেছেন। ছেলেমেয়েদের আজীবন শুধু উপদেশই দিয়ে গেছেন। আর কিছু নয়।

সম্প্রদানের সময় মা-র চোখের জল দেখে বাবাকে মনে পড়েছিলো সরমার। তারপর হাসি-হল্লা, রহস্য-রসিকতার মাঝে ভুলে গিয়েছিলো।

সঞ্জীবের কথার সঙ্গে বাবার উপদেশটার কোথায় যেন একটা ক্ষীণতম যোগসূত্র আছে। রঙধনুকের আবেশবৈচিত্র্যে দৃষ্টি হারিয়ে গিয়েছিলো ওর, আবার যেন চোখ ফিরে পেলো। রামধনুর আড়ালে স্পষ্ট আর গভীর একটা কালো দাগ। কলঙ্কের অলঙ্কার।

খচ্ করে বুকের মাঝে এসে বিঁধলো এক টুকরো বিস্মৃত ছবি।

একটা দিন। শুধু একটা দিনের ইতিহাস বলতে পারেনি ও। না মানসীকে, না সঞ্জীবকে। বহু দিন, বহুবার চেষ্টা করেছে। অবোধ্য এক অস্বস্তিতে নিজেই জ্বলেছে। ভয় আর আশঙ্কা। হয়তো তাল কাটবে, সুর হারাবে। সুস্থ ছন্দে গড়া ওদের মুগ্ধস্রোত জীবনের ঘুঙুর হয়তো বা বেতালা বেজে উঠবে।

এই আশঙ্কাতেই বলি-বলি করেও বলে উঠতে পারেনি।

শুশ্রূষকের চাকরিতে ইস্তফা দেয়নি সরমা। সঞ্জীবের কিছুটা অমত ছিলো, তবু বুঝিয়ে রাজী করালো তাকে। বাবা ক'টা টাকাই বা রেখে গেছেন! আর জামাইয়ের টাকায় তো সংসার চালানো যায় না। তাই, ক'টা মাস অপেক্ষা করতে বলেছে সরমা। ছোট ভাই সোমেন আই. এস-সি. পাস করেছে—চেষ্টাও করছে চাকরির। তখন আর হাসপাতালের চাকরি রাখবে না। না, একেবারে ছেড়ে দেবে কেন! যথেষ্ট অর্থ আর উদ্দীপনা খরচ করে নার্সিং শিখতে হয়েছে ওকে।

সেদিন হাসপাতাল থেকে ফিরে বেশ বদল করতে করতে সঞ্জীবের কণ্ঠস্বর কানে এলো ওর। তা হলে এর মধ্যেই ফিরে এসেছে! কিন্তু একা নয়। আরো কে যেন রয়েছে। গলা শুনতে পেলো সরমা।

হাতে মুখে জল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে সরমা এসে দাঁড়ালো আয়নাটার সামনে। গতক্লম শ্রান্তির স্বেদবিন্দু সারা দেহে। চোখের কোণে সাময়িক লুপ্ত-লাবণ্যের রেখা। চম্পাবরন একখানা শাড়ি বের করে পরলো সরমা। আর হাঁসুলি-গলা ব্লাউজ—রঙ মিলিয়ে। সুরভিবিন্দু ছিটিয়ে নিলে এখানে-ওখানে। নিজের প্রসাধন-প্রসাধিত রূপ দেখলে কিছুক্ষণ।

তারপর, খাটের ওপর বালিশে ঠেস দিয়ে বসলে দু সেকেন্ড। ওদিকের কেদারাটায় উঠে গেল। টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে বই-কাগজগুলো উলটে দেখতে শুরু করলো। অকারণে শব্দ করলে, কখনো পেয়ালা-পিরিচের, কখনো বা হাত থেকে বই ফেলে। চাবির থোকাটা ঝনঝন করলো, দরজার খিলটা একবার লাগালো, একবার খুললো। শুকনো কাশি কাশলো। শেষে চিৎকার করে ঝি দুখীর মাকে ডাক দিলো।

একটু পরেই সঞ্জীব উঠে এলো বাইরের ঘর থেকে।

—একজন বন্ধু এসেছে। বাইরে গিয়েছিলো, ক-মাস পরে ফিরেছে। বিয়ের সময়ে তো আসতে পারেনি, তাই আজ এখানে ফিরেই এসেছে আমার সঙ্গে দেখা করতে। আজ বোধ হয় আর সিনেমায় যাওয়া হলো না।

সরমা অনুযোগ করলে।—সারা দিন খেটেখুটে এসেও তোমার দেখা পাওয়া যায় না। বন্ধু! অন্য সময়ে যেন আসতে পারে না।

—আহা, ওর কি দোষ হলো। সঞ্জীব বোঝাতে চাইলো।

সরমা উত্তর দিলে, আজই তো প্রথম নয়। রোজই তো তোমার একটা-না-একটা লেগেই আছে।

সঞ্জীব হাসলে।—কি করবো বলো! বন্ধুবান্ধবরা তা নইলে যে বউ-পাগলা বলবে। এমনিতেই তো বলে, আমাকে নাকি তুমি আঁচলে বেঁধে রেখেছো।

সরমাও হেসে ফেললো। বললে, বলুক গে। সকালে তো দু মিনিট কথা বলবার সময় পাই না। দুপুরে তুমিও বেরিয়ে যাও, আমিও বাইরে থাকি। একা-একা চুপচাপ বসে থেকে আমি বাপু হাঁপিয়ে উঠি।

—কেন, বউদির সঙ্গে তো গল্প করে কাটাতে পারো।

সরমা চটে গেল।—বেশ তাই যাচ্ছি। সন্ধ্যেবেলাটাও যদি তোমার বন্ধুদের না হলে—

—চটছো কেন?

—আমি তার চেয়ে আবার বোর্ডিং-এ ফিরে যাবো। সেখানে তবু পাঁচজনের সঙ্গে কথা বলে সময় কাটে।

সঞ্জীব হেসে হাতটা চেপে ধরলো সরমার। বললে, এখন চলো তো, হিমাংশুর সঙ্গে দেখা করে আসবে।

প্রথমটা আপত্তি করে সরমা। মুখে বলে, চিড়িয়াখানার জীবজন্তু তো নই যে রোজ-রোজ একজন করে দেখতে আসবে।

মনে মনে আর কি লজ্জা পায়। তা ছাড়া ভালোও লাগে না।

শেষকালে রাজী হয় ও। সঞ্জীবের পিছনে পিছনে নীচের বসবার ঘরে গিয়ে ঢোকে। কি একটা পত্রিকার পাতায় চোখ ছিলো হিমাংশুর। শব্দ শুনে মাথা তুললে। নমস্কারের ভঙ্গিতে হাত। মুখে মৃদু হাসি। পরক্ষণেই হিমাংশুর মুখের হাসিটা মিলিয়ে গেল। হাত আর উঠলো না।

সরমাও চমকে উঠেছিলো। সঞ্জীব লক্ষ করলো না, নয়তো সরমার সাদা চাদরের মতো রক্তহীন মুখটা দেখতে পেতো।

আলাপ করিয়ে দিলো সঞ্জীব। কিন্তু ওরা দুজনেই বড় অস্বস্তি বোধ করলো। রেহাই পেলেই যেন বাঁচে। তারপর একসময় হিমাংশু চলে গেল বিদায় নিয়ে।

সরমা ভাবলে, ও বোধ হয় আর কোনো দিন আসবে না।

ভুল!

দিন কয়েক পরেই আবার এলো হিমাংশু। আসতে শুরু করলো।

প্রথম প্রথম সরমার চোখে জাগতো একটা ভয়ার্ত ভাব। শঙ্কার শিহরন। ক্রমশ ঘৃণা আর বিরক্তি বোধ করলে সরমা। কারণে অকারণে জেদ ধরে কেন সঞ্জীবের কাছে, সরমাকে ডেকে আনায় কেন। কখনো বলে, চলুন বেড়িয়ে আসি ; কখনো সিনেমায়। টুকিটাকি দু-চারটে জিনিস কিনতে যাবে হয়তো সরমা আর সঞ্জীব, হিমাংশু এসে জোটে।—চলুন আমিও যাই। আর ক্ষণে ক্ষণে চোরা চোখে তাকাবে সরমার দিকে সেই কুৎসিত অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে।

সেদিন সঞ্জীব ফেরেনি তখনও। হিমাংশু এসে হাজির হলো।

সরমা ওর দিকে না তাকিয়েই বললে, উনি আসেননি এখনও।

—তা হলে একটু অপেক্ষা করি, কি বলো? হিমাংশু হাসলো। একটু থেমে বললে, আপত্তি নেই তো তোমার। শেষের শব্দটার ওপর অতিরিক্ত জোর দিয়েই বললে।

চমকে ফিরে তাকালো সরমা। ক্রোধে ফেটে পড়লো যেন। বেশ স্পষ্ট আর দৃঢ় গলায় বললে, হ্যাঁ, আপত্তি আছে আমার। বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান আপনি এখান থেকে! নির্লজ্জের মতো কোনো দিন আর আসবেন না এখানে।

অপ্রতিভ হয়ে উঠেছিলো হিমাংশু প্রথমটা। তারপর হো-হো করে হেসে উঠলো।

বললে, ভুল করছো সরমা। বেরিয়ে যদি যাই—

অসমাপ্ত কথার নিঃশব্দতাই যেন ভয় দেখালো।

বিস্ময়ে ক্রোধে হিমাংশুর মুখের দিকে তাকালো সরমা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অপমান আর ব্যর্থতার আগুনে জ্বলছে তার চোখ দুটো! প্রতিহিংসার আগুনে।

আর এক মুহূর্তও দাঁড়াতে পারলে না সরমা। পালিয়ে এলো ঘরের ভেতর। বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়লো। সমস্ত বুক যেন ফাঁকা-ফাঁকা। মাথা ঝিমঝিম করে। কি একটা বিপর্যয়ের জন্যে যেন থমকে থেমে গেছে পৃথিবী। দুনিয়ার কলরোল যেন হঠাৎ চুপ করেছে। শুধু অসহ্য বাতাস শিস দেয় ফিসফিস করে।

অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ পড়ে রইলো সরমা। নিশ্চুপ, নিথর।

সঞ্জীব ফিরে এসেছে। গলার স্বর শুনতে পাচ্ছে সরমা। আর হাসির শব্দ। হিমাংশু আর সঞ্জীব হাসাহাসি করছে।

মনকে শক্ত করে উঠে দাঁড়ালো সরমা।

লাল, গাঢ় লাল রেশমী রঙের শাড়িখানা জড়ালে শরীরে। যৌবন-দেহের প্রতিটি রেখা সুস্পষ্ট করে ফুটিয়ে তুললে। পুরুষের মন ভোলাবার যা কিছু ছলাকলা! রেশমের আঁট

ব্লাউজের আবরণকে নিরাবরণের রূপ দিলো। মুখে মাখলো শুভ্র রেণু, চোখে কাজল টানলো। রাঙির চাকতি বুলিয়ে নিলো গালে, আর পাতলা ঠোঁটে বহ্নিশিখা জ্বালিয়ে দিলো। হাতে পরলো আইভরির রুলি আর স্বর্ণকঙ্কণ। গলায় দোলালে বুকছোঁয়া লাল প্রবালের মালা।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইলো। নিজের রূপে নিজেই মোহিত হয়ে গেল।

তারপর ঠোঁটে স্নিগ্ধ হাসির আবেশ এঁকে পা বাড়ালে সরমা।

সঞ্জীবের দিকে তাকিয়ে বললে, চলো বেড়িয়ে আসি।

আর হিমাংশুর চোখে অপরূপ মোহাবেশের চোখ রেখে মৃদু হেসে বললে, চলুন, আপনিও চলুন। একটু বেড়িয়ে আসি। সন্ধ্যের সময় ঘরের ভেতর হাঁপিয়ে উঠি আমি।

তিনজনেই পথে বেরিয়ে পড়লো।

রাতের বুকে জ্বলন্ত মশালের মতো সরমাই যেন পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে।

কত হাসি, কত রসিকতা। ফুর্তিতে-আনন্দে যেন নেচে উঠেছে সরমা। চোখের কোণ ওর খুশিতে ভরে উঠেছে।

ধীরে ধীরে হেঁটে চললো ওরা। আর সরমার মুখে অনর্গল কথা। কথা, কথা, কথা। আর উচ্ছল হাসির তুফান। কখনো সঞ্জীবের গায়ে ঢলে পড়ছে, কখনো হিমাংশুর গায়ে।

পশ্চিমাকাশের জাফরানের বন ক্রমশ নীলাভ হয়ে এলো। নমলো ধূসর অন্ধকার। শিশু-সন্ধ্যার বাতাস কালো হয়ে এলো। একটা, দুটো, অনেক অনেক তারার ফুল ফুটেছে আকাশের বাগিচায়। চুপেচুপে চাঁদ এলো একলাটি। ভিড়-ভিড় সান্ধ্যভ্রমণাদের জনতায় এসে মিশে গেল ওরা। জনতাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল।

সবুজ ঘাসের জাজিম পাতা রয়েছে পায়ের নীচে। দু'পাশে ল্যাম্পপোস্টের সারি। আলোর মালা। দূর-দূর গাছগাছালির শ্যামল অন্ধকারের বুকে দিগন্ত দিক হারিয়েছে যেন। কৃষ্ণচূড়া আর আমলকী গাছের নীচে চাঁদের ছায়া পড়েছে। আলো নেই, আওয়াজ নেই।

সরমাকে উৎফুল্ল দেখায়। হাসি আর হাসি। কথা আর কথা। হঠাৎ যেন আনন্দে মাতাল হয়ে উঠেছে ও। ওর মদো রক্তে নতুন করে যেন উন্মাদনা জেগেছে। ঘুঙুরের মিহি মিঠে বোল বেজে চলেছে যেন ওর বুকের ভেতর।

কখনো ঢলে পড়ছে হিমাংশুর গায়ে, কখনো সঞ্জীবের হাতটা জড়িয়ে ধরছে।

—জানো, হাসপাতালে একটা লোক না এমন তাকিয়ে থাকতো আমার দিকে যেন গিলে খাবে। সশব্দে হেসে উঠলো সরমা।

সঞ্জীবও হাসলো।

—জানেন হিমাংশুবাবু, সরমার কথা আটকে যায় হাসির তোড়ে, লোকটা একদিন না...... আবার হেসে ওঠে সরমা।

—কি ব্যাপারটা তাই বলো। সঞ্জীবও না হেসে পারে না।

—লোকটা না একদিন আমার পেছনে পেছনে এখান অবধি ধাওয়া করেছিলো। খিলখিল করে হেসে ওঠে আবার!

সস্মিত হাসি হেসে সঞ্জীব প্রশ্ন করে, তারপর?

—ঐ যে গাছটা দেখছো, একদিন তুমি চলে গেলে, তারপর দাঁড়িয়ে আছি......আবার হেসে গড়িয়ে পড়লো সরমা।

—জানেন হিমাংশুবাবু—

কিন্তু কোথায় হিমাংশুবাবু! চারিদিকে তাকিয়ে দেখলো সঞ্জীব।

হিমাংশু! হিমাংশু?......কোথায় গেল হিমাংশু? সঞ্জীব চিন্তিত হয়ে উঠলো।

আর সরমা সশব্দে হেসে জড়িয়ে ধরলো সঞ্জীবকে। আরেকটু হলেই হয়তো পড়ে যেতো ও।

হাসতে হাসতে বললে, পালিয়েছে।

—মানে?

সরমার মুখ থেকে হাসি অন্তর্হিত হলো। বললে, শোনো। তোমার কাছ থেকে কোনো কথাই কোনো দিন লুকিয়ে রাখিনি আমি। একটা দিন, শুধু একটা দিনের কথা তোমাকে

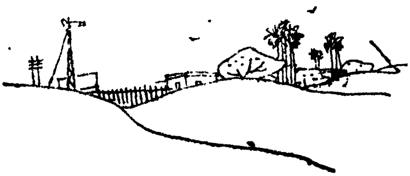
বলতে পারিনি।

সপ্রশ্ন চোখে তাকালে সঞ্জীব। সরমার দিকে তাকিয়ে রইলো।

অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে সরমাকে। সমস্ত মুখখানা যেন ওর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ভোরের সূর্যের মতো রক্তিমাভা ফুটে উঠেছে ওর সারা দেহে। নিষ্কলুষ আগুনের মতো উজ্জ্বল। অনামিকার আংটিতে বাঁধা আতসী পাথরটাও যেন জ্বলে উঠেছে।

পুবের আকাশে ওটা চাঁদ নয়!

[১৩৫৫



তীর-ধনুক

তখন বাবুলডিহির দেহেই শুধু শহুরে ছাপ ছিলো, মনটা ছিলো গেঁয়ো। ইস্কুল লাইব্রেরী, ওমনিবাস ইলেকট্রিসিটি। ছিলো না কি? সিনেমা হাউস থেকে সিমেট্রি অবধি সব কিছুই ধোপদুরস্ত, ঝকঝকে। বিরাট কারখানা। বড় বড় দোকানে সাজানো শো-কেসের প্রলুব্ধ, ফিরিঙ্গী মেমের প্ররোচনা। ছিলো সব, ছিলো না জীবন। থামা ইঞ্জিনের মতো হুইস্‌ল দিতো, ধোঁয়া ছাড়তো, কিন্তু এক পা এগিয়ে যাবার সামর্থ্য ছিলো না শহরটার।

শান্তনু ফিরে এসে দেখলে নতুন নগর বাবুলডিহি জেঁকে উঠেছে, জমে উঠেছে। নেশা ঘুচেছে, এসেছে উন্মাদনা। বাঁচতে শিখেছে মানুষগুলো।

স্টেশন থেকে বাইরে যাবার আন্ডারওয়ের সুড়ঙ্গপথে সেই মিহি আলোর কণিকা নিবে গেছে, এসেছে ফ্লোরেসেন্টের রোশনাই। কারখানার সেই আকাশছোঁয়া চিমনির ভোঁ-এ ভাটা পড়েছে, ককিয়ে কাঁদে এখন সাইরেন। খরচ কম, বাজন জোর। লুডোর ছকের মতো বাঁধা রাস্তা। পাথর আর পিচের চওড়া মেটাল রোড। একটা অতিকায় কুমির যেন রোদ নয়, ছায়া পোয়াচ্ছে। দু'পাশে হিজল আর হরিতকী গাছ। দেওদার আর আমলকী। এখানে-ওখানে ঘাসের জাজিমে আধো-শুকনো মুচকুন্দের হলুদ-রঙ পাপড়ি। দুপুরের রোদের ছায়া-ছায়া বাতাসে ভাসে মিঠে সৌরভের স্নিগ্ধতা। সারিবাঁধা বাংলোর বাগানে পাম আর পাতাবাহার দুলছে ঈষৎ হাওয়ায়। পেরাম্বুলেটারে কুকুরের বাচ্চাটাকে বসিয়ে হাসাহাসি খেলা করছে কয়েকটা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ছেলেমেয়ে।

ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ করতে করতে একটা সাইকেল-রিক্‌শা এগিয়ে আসছে। কালো শাড়ি, রুপালী জরির পাড়, ফর্সা মুখ। চেনা গেল না তবু! মালগাড়ির শান্টিং-এর আওয়াজ শুনে ওদিকে তাকালো শান্তনু। শেডের ওপাশে আরেকটা ইয়ার্ড বেড়েছে।

—শান্তদা!

চমকে ফিরে তাকালে শান্তনু।

অনুপমার মুখে হাসি উছলে উঠলো।—কখন এলে শান্তদা? এই তো আজই দুপুরে গিয়েছিলাম তোমাদের বাসায়। মাঝে মাঝে কি আসতে নেই? উঃ, ভাগ্যিস মাসীমারা বদলি হয়ে এলেন আবার, তা না হলে তো তোমার সঙ্গে দেখাই হতো না আর এ জন্মে। কেমন আছো? কথা বলছো না যে?

প্রথমটা একটু কথা খুঁজতে কষ্ট হচ্ছিলো শান্তনুর। চিনতে তো পারেনি চট্‌ করে। নেহাত সমিতা বলছিলো বলেই বুঝতে পারলো। অনুপমা। এই সেই অনুপমা? কিন্তু

ঠিক যেমনটি আশা করেছিলো তেমন তো নয়।

—কি, কথা বলছো না যে!

শান্তনু হেসে বললে, কথা বলার সুযোগ দিলে কই?

অনুপমা হেসে উঠলো খিলখিল করে।—চিনতেই পারোনি তাই বলো। আর নয়তো ভুলে গেছো আমাদের।

—বোধ হয় চিনতেই পারিনি! কারণ, যাকে মনে পড়েছে সে কাউকে 'শান্তদা' বলবে, 'তুমি' বলবে বলে তো মনে হয় না।

অনুপমা এবার রিক্‌শা থেকে নামতে নামতে বললে, এই তো লক্ষ্মী ছেলের মতো কথা বেরুচ্ছে। সমি বলেছিলো বটে, শান্তদা একেবারে বদলে গেছে। তা এত বদলে যাবে ভাবতে পারিনি। সত্যি, সেই বোকা-বোকা ছেলেটি বড় হয়েছে, বুদ্ধিমান হয়েছে দেখেও 'দাদা' বলবো না, 'তুমি' বলবো না?

অনুপমা আবার হেসে উঠলো সশব্দে।

দুপুরে যখন ফেন্সিং-এর ফটকে নাম দেখতে দেখতে বাড়ি খুঁজছিলো ও, অনুপমাকে তখন দেখেছিলো, ওদের বাসা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে দলবল নিয়ে। তখন চিনতে পারেনি। এখন যেন আরো অপরিচিত মনে হচ্ছে।

সমিতা খুশিতে চোখ নাচিয়ে বলেছিলো, আর দু মিনিট আগে আসতে পারলে না শান্তদা!

—কেন রে? মা হেসে প্রশ্ন করেছিলেন।

—বাঃ রে, অনুরা এসেছিলো যে!

—অনু? একটু আশ্চর্য হয়েই জিগ্যেস করেছিলো শান্তনু।

—ও মা, ভুলে গেছো? অনু, অনু, অনুপমা।

—ও।

না, ভুলে যায়নি শান্তনু। ভুলে যেতে চায়। ছোট বয়সের অন্তরঙ্গ, ভুলবে কেন! কিন্তু না, অনুপমার সঙ্গে দেখা না হওয়াই ভালো। কি করে দাঁড়াবে ও তার সামনে। চোখ তুলে কি তাকাতে পারবে। কথা! কি কথা বলবে! দুজনে হয়তো নীরস দুটো খুচরো প্রশ্ন করবে। উত্তর শোনবার জন্যে নয়। ভদ্রতার খাতিরে। দুজনেই হয়তো চুপচাপ বসে থাকবে কিছুক্ষণ। মাথা নিচু করে। তারপর সেই শুকনো গলায় বলবে, চলি। চলে যাবে সে ব্যথার ছাপ রেখে। এই তো জানা ছিলো শান্তনুর।

অনুপমার আর কি রূপই বা ও ভাবতে পারে।

রং-ঝলমল ফ্রক-পরা সেই বছর দশেকের ছোট্ট মুখখানি। ফর্সা ধবধবে গালে তিনটে নীলাভ শিরা ফুটে উঠেছে। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে আছে অভিমানে, বিরক্তিতে বঁড়শির মতো বেঁকে গেছে নাকটা। মিনিটে মিনিটে ছুটছে পোশাক বদলাতে, প্রসাধন সারতে। রঙিন কাচের জলচুড়ি, চুলের রিবন—দিনে আটবার বদলানো চাই।

সেই অনুপমাকে ও নতুন পোশাকে দেখতে চায় না।

সমিতা বললে, তোমার আসবার কথা আছে আজ সে কথা কিন্তু বলিনি আমি। অনু জানেও না।

ভালোই হয়েছে, শান্তনু ভাবলে। নিরাভরণ রূপ অনুপমার, একটা সাদা থান কাপড় ছাড়া ওর সারা দেহে থাকবে না কোনো অলঙ্কার, মুখে আর ঠোঁটে থাকবে না সেই পুরোনো দিনের প্রসাধনের নেশা—এ যেন কল্পনা করতে পারে না শান্তনু।

আশ্চর্য। কে বলবে অনুপমা বিধবা।

বিয়ের পর ফুর্তি আর ফুরসতে ভরা তিনটি মাস। রামধনু-চোখের ছোট অবকাশ। আরাম আর আনন্দে কেটে গেল অবসরের বাসর। তারপর। তারপর হঠাৎ একদিন জ্যোৎস্না-রাতের পাপড়ি গেল খসে, অনেক অনেক তারার ফুল শুকিয়ে গেল।

সেসব দিনের কথা যেন অনুপমা ভুলে গেছে। বনবিহারীবাবুও যেন ভুলতে পারলে বাঁচেন। স্ত্রী রত্নমালাকে বলেন, একমাত্র সন্তান অনুপমা, ওকে মেয়ে না ভেবে ছেলেই ভাবো না। এক বউ মারা গেলে কি আবার বিয়ে দিতে না ছেলের? অনুপমার আবার বিয়ে

দেবো আমি।

—কি যে বলো। রত্নমালা উত্তর দেন বটে, কিন্তু ঠিক প্রতিবাদের জোর পান না। সাহস নেই, এই যা। মনে মনে ভাবেন, উনি আরো শক্ত হয়ে বলেন না কেন। বললেই তো পারেন, কে কি বললো না-বললো, যায় আসে না। রত্নমালার আপত্তিটুকুও কেন ধমক দিয়ে চেপে দেন না। কই, আরো পাঁচটা ব্যাপারে তো রত্নমালার কথা টেঁকে না। নিজের ইচ্ছেতেই তো চলেন।

তবু, নরম স্বরে বনবিহারীবাবু বড় জোর বলবেন, এই বয়সে জীবনটাও খুইয়ে বসে থাকবে এই চাও?

কত কি-ই তো বুঝতে পারেন বনবিহারীবাবু, বিয়ের পর থেকে আজ অবধি একটা কথাও কি গোপন রাখতে পেরেছেন রত্নমালা? তবে অনুর বেলায় মুখ ফুটে না বললে বুঝতে পারেন না কেন?

রঞ্জন মারা গেল। ঠিক বিয়ের তিন মাস পরেই। কান্না পেয়েছিলো অনুপমার। বুকের ভেতর একটা ফাঁপা ব্যথা। ফাঁকা-ফাঁকা। হঠাৎ যেন বাড়ি খালি হয়ে গেল, মায়া-মমতার শেষ রাতটা অবধি ফেলে রেখে। ফাঁকা নির্জন বাড়িতে একা নিকাজ রাত কাটাবার মতো দুঃসহ।

তারপর আবার ফিরে এলো অনুপমা। আয়নার সুমুখে। সাজলো সযত্নে। হাসলো প্রাণ খুলে। বললে কথা। কথা, কথা, কথা।

জীবনের কোথাও যেন ফাঁকা নেই। হাসি আর হাসি। ছেলেমানুষের মতো তুচ্ছ কৌতুকে হেসে উঠবে সশব্দে! লাল রেশমের হিল্লোল ছড়িয়ে হেলেদুলে হাঁটবে। নয়নারাম ভঙ্গিমায় পটুনৃত্যের মুদ্রাময় আবেশে হাসিতে ঢলে ঢলে চলবে। ললিত কৌতুকলাস্যে। লাবণ্যের বন্যায়। খুশির জোয়ারে যেন ভেসে চলে। কথা। বিশ্রম্ভাতুর বিহঙ্গের মতো কামনা-কাকলির স্রোত। মিষ্টিমধুর সুরেলা কণ্ঠস্বর। অনর্গল কথা বলে চলে, কথা কথা। আর মনমাতানো গানের ফাঁকে সংগতের তালের মতো হাসি ছিটিয়ে দেয় কথার ফাঁকে। হঠাৎ গেয়ে ওঠে একটা গানের কলি নিজের মনেই। থমকে থমকে হেসে ওঠে।

—তাকিয়ে দেখছো কি হাঁ করে?

হ্যাঁ, অনিমেষ চোখেই তাকিয়ে দেখতে হয়। দুরন্ত হাসি দিয়ে আঁকা ঠোঁট, চোখের কালো তারায় চকিত চাঞ্চল্য। সাদা পাতাবাহারের মতো গালের ওপর নীল শিরার সম্মোহন। লাল রেশমী শাড়ি জড়িয়ে আছে স্বাস্থ্যের প্রাচুর্যে ভরা দেহ। ডান দিকের কাঁধে একটা কালোর ছোপ। পিঠের সঙ্গে এঁটে আছে কালো মলমলের ব্লাউজটা। শ্বেতপাথরের মতো সাদা ধবধবে ঘাড়ের কাছ থেকে পা অবধি ঢলে পড়েছে সোনালী জরির নকশা-কাটা আঁচল। আর পিঠ বেয়ে দুলছে সুস্পষ্ট বেণীর লুব্ধতা।

—শান্তদাটা কি বল তো সমি! অনুপমা হেসে উঠলো আবার।

সমিতাকে বললে, বলিসনি বুঝি কিছু? চলো শান্তদা, হিজলির দিকে বেড়াতে যাবো। হাঁ করে রয়েছো যে, বুঝতে পারছো না। তুমি না এলেও যেতাম। অন্য দিন চাঁদমারি অবধি যাই, আজ তোমার মতো একটা বীরপুরুষ বডিগার্ড রয়েছে যখন, হিজলি অবধি যাবো। খিলখিল করে হেসে উঠলো আবার অনুপমা।

তারপর সমিতার দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।—হুঁ। কি ব্যাপার রে সমি, এত সাজগোজ করেছিস যে! হিজলির নাম শুনেই? আবার হেসে উঠলো অনুপমা।—আজকাল তো ওখানে চাঁদমুখ ডেটিনিউরা নেই।

কি হচ্ছে! চোখের ধমক দিলো সমিতা। কিন্তু, ওই অবধি।

অনুপমা যা খুশি তা বলবে, নিজের দিকে না তাকিয়েই। অথচ অনুপমাকে কিছু বলতে হলে ভেবেচিন্তে বলতে হবে। ঠাট্টাবিদ্রূপ করতে কষ্ট হয়, আঘাত দেওয়া যায় না। অনুপমা নিজেই যে শুধু ভুলে আছে তা নয়, ওরাও ভুলে যাবার ভান করে। তবু হিরণ্ময়ী ভুলতে পারেন না শান্তনু তাঁর ছেলে।

সমিতাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে যান।—কি হচ্ছে সমি?

ভয় পায় সমিতা।

শান্তর সঙ্গে তোদের এত হইহই কিসের? রঙিন কাপড়চোপড় পরে বলেই কি কচি খুকী নাকি অনু? আর তোরা হাসিঠাট্টা আমোদ-আহ্লাদ কর, মানে হয়। শান্তকে তার মধ্যে টেনে নিয়ে আসা কেন? হাজার হোক, অনু হিন্দু ঘরের বিধবা।

—বাঃ রে, শান্তদার ছোটবেলার বন্ধু ও। ক্ষীণ প্রতিবাদ সমিতার।

ঝাঁঝালো গলায় উত্তর আসে।—ন্যাকামি করিস না সমি।

অভিমানের স্বরে সমিতা বলে, বেশ, অনুকে আসতে বারণ করে দেবো।

—তাই বলছি? কথাবার্তা বলবে না কেন, বলবে। সত্যি দোষ নেই মেয়েটার। এই বয়সেই কপাল পুড়েছে। যতটা ভুলে থাকতে পারে। তা বলে ওর ওই আইবুড়ী মেয়ের মতো চালচলন আমার ভালো লাগে না।

সমিতা বলে, মনে ওর কোনো পাপ নেই বলেই সাজগোজ করতে পারে।

—আজকালকার মেয়েদের সঙ্গে কে কথায় পারবে বাপু।

—শান্তদার তো পনেরো দিন কেটেই গেল, আর তো সাতটা দিন। সাত দিনেই নষ্ট হবার মতো ছেলে নয় তোমার শান্তদা।

—তোর ওই কাটা-কাটা কথার জন্যেই তোর মা কাছে রাখতে চায় না, বুঝতে পারছি এখন।

সমি হেসে ওঠে।—ঠিক বলেছো। এবার তুমিও তাড়াতে চাইবে তো?

হিরণ্ময়ী না হেসে পারেন না। আর পরমুহূর্তেই অনুপমাকে হাসি-মাখানো মুখে ফেন্সিং-এর ফটক পেরিয়ে আসতে দেখে সব রাগ উবে যায়। সত্যি বড় ভালো মেয়েটা।

মৌসুমী ফুলের বাগানের মাঝ দিয়ে সরু লাল কাঁকরের আর্চওয়ে, দু'পাশে নুড়ি পাথরের মালা। মরমর মরমর শব্দ হয় অনুপমার জুতোর চাপে। হেলেদুলে হাসতে হাসতে এগিয়ে আসে অনুপমা।

সমিও এগিয়ে যায় সবুজ বেতের চেয়ারটা ঠেলে দিয়ে।—কি রে, লোক পাঠালুম সকালে, এলি না যে?

—এমনি। শরীরটা ভালো ছিলো না।

তাই কি? না। সকালে অনুপমার সারা দেহে মনে একটা ঝড় বয়ে গেছে। অনেক চেষ্টায় শক্তি এনেছে শান্তনুর সামনে এসে দাঁড়াবার।

—তুই আসবি না ভেবে শান্তদা গেল কোন্ বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে।

—ও।

বেতের কেদারাটা টেনে নিয়ে বসলো অনুপমা, মুখে চোখে একটু স্বস্তি ফুটলো। যাক্, শান্তনু নেই।

হিরণ্ময়ী বললেন, তোরা থাক তা হলে বাসায়, আমি যাই, অনুর মায়ের সঙ্গে দেখা করে আসি।

হিরণ্ময়ী চলে গেলেন। অনুপমা ঠোঁট টিপে হাসলে একবার, সমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে।—মাসীমা তোকে ধমক দিচ্ছিলেন মনে হলো, কেন রে?

সমিতাও হাসলে।—না রে, ধমক নয়। বলছিলো আমার কাটা-কাটা কথার জন্যেই নাকি মা কাছে রাখতে চায় না আমায়, এখানে পাঠিয়েছে।

—হুঁ। পাশের বাড়ির ছেলেটির জন্যে, না কাটা-কাটা কথার জন্যে ভগবান জানে! বিদ্রূপের দীর্ঘশ্বাস ফেললে অনুপমা।

মুখোমুখি বারান্দায় বসে রইলো ওরা দুজনে। বাংলো-পিওন বিশ্বনাথকে ডেকে একবার বললে চিক দুটো তুলে দিতে। তারপর মোটা মোটা থামের ফাঁকে যতখানি গেছো আকাশ দেখা যায়, তাকিয়ে রইলো। কথা নেই। সমিতার হাতে শুধু পুলির দড়ি জোড়া। পাখা-টাকে টেনে একবার এদিক আনছে, আবার পাঠাচ্ছে ও-কোণে।

পাশের বাংলোর বাগানে মিসেস রবিনসন বাগিচা তদারক করে বেড়াচ্ছে, বাচ্চা ছেলেটার হাত ধরে ঘুরতে ঘুরতে।

পাঁউরুটির প্যাঁটরা মাথায় লোকটা চলে গেল। সাইকেলের ক্লিং ক্লিং শব্দ করে এসে দাঁড়ালো ডেয়ারি ফার্মের লোকটা। দুধের বোতল দুটো নামিয়ে রেখে সেও চলে গেল।

ধোপদুরস্ত কালোপাড় শাড়ি পরে আয়াটা সার্ভেণ্টস-কোয়ার্টার্সের দিকে যাচ্ছে। সেদিকে চোখ গেল সমিতার।

বললে, এত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বড় চোখে লাগে। জমাদারনীটা অবধি রোজ কাপড় বদলায়।

অনুপমা হাসলে।—হুঁ।

—কথা বলছিস না যে। কি হলো তোর?

—না, কিছু না। এমনি।

—শান্তদা দেখলে তো—জানিস, শান্তদা কি বলে? সমিতা হেসে উঠলো। বললে, তুই নাকি দিনে পাঁচ কোটি পঁচাত্তর লক্ষ কথা বলিস। হো-হো করে হেসে উঠলো সমিতা।

অনুপমাও একটু মুচকি হাসলে। তারপর আবার চুপ করে রইলো।

পশ্চিমের মেঘটা এদিকে ক্রমশ লাল হয়ে আসছে। লাল আর হলুদ মেশানো একটা জাফরানী আলো এসে পড়েছে। ফুলের পার্পাড়গুলোর রঙ গেছে বদলে, চিকচিক করছে। সামনের পিচের রাস্তাটাও। সমাহিত শান্তিতে পৃথিবীটা যেন হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। নিঃস্ব।

—কি এত ভাবছিস বল তো? সমি প্রশ্ন করে।

—কিছু না।

কিছু কি নয়? না। সত্যি কিছু ভাবছে না অনুপমা। তবু অনেক, অনেক কিছু ভাবার চেয়েও যেন গভীর। ভাবনা-চিন্তার শেষ সীমানার না-ভাবা।

মনে মনে রোমন্থন করে অনুপমা। সকালের সেই দৃশ্যটা।

—ওই যে, শান্তদা। সাইকেল-রিক্‌শাটা গেট পার হতেই সমিতা বলে উঠলো। বেশ কিছুটা স্বস্তি পেলো যেন।

খুশী-খুশী চোখে এগিয়ে এলো শান্তনু।—যাক্, অনুও এসে গেছে।

—কি ব্যাপার? সমিতা প্রশ্ন করলে।

—তোদের সিনেমা হাউসটার কিছু উন্নতি হয়েছে কি না দেখবার ইচ্ছে হলো। তাই টিকিট কিনে আনলাম তিনখানা। তারপর অনুপমার দিকে তাকিয়ে বললে, তোমার আবার অমত নেই তো?

কথা বললে না অনু, ঘাড় কাত করে সম্মতি জানালে। ঠিক যেন প্রশ্নের উত্তর নয়। অনিচ্ছার সম্মতি।

সমিতা বলে উঠলো, মাসীমা যে নেই! ক'টা বাজলো?

—এখুনি বেরুতে হবে যে। মা নেই?

—অনুদের বাড়ি।

—সুখিয়াকে দিয়ে চাবিটা পাঠিয়ে দে না।

তা নয়। মাসীমার কথাগুলো তখনো মনের মধ্যে পাক খাচ্ছে সমিতার। চট করে কিছু উত্তর দিতে পারলো না। কি করে তুলবে ও আসল কথাটা। যাক, আরেকবার নয় বকুনি খাবে।

কিন্তু মাসীমার কথাগুলো হয়তো মিথ্যে নয়।

সিনেমা-ঘরে পেঁছে অনুর পাশে বসতে যাচ্ছিলো শান্তনু, একরকম ঠেলে সরিয়ে দিলে সমি।

—এই সরো, আমি মাঝখানে বসবো।

দুটো দীর্ঘ দীর্ঘ ঘণ্টার একটা মুহূর্তও উপভোগ করতে পারলো না শান্তনু। কেমন যেন তালকাটা নাচের মতো। সুর ভুলের গান। অনুপমা হঠাৎ বদলে গেছে কি! সেই সশব্দ খুশখেয়ালের হাসি নেই, নির্বাক। চুপচাপ বসে আছে। ছোট ছোট উত্তর। নেহাত অনিচ্ছার সাড়া।

ছবি দেখবে কি, একটা নতুন চেতনার আভাস, ভাসছে অনুপমার মনে। বারবার শুধু মনে পড়ছে সেই কয়েকটা টুকরো কথা।

পর্দার আড়ালে ছিলো অনুপমা। হঠাৎ ঘরের ভেতর গলার স্বর শুনতে পেলো। মা আর বাবা কথা বলছে! সরে আসতে যাচ্ছিলো, নিজের নামটা শুনে থমকে দাঁড়াতে হলো অনুপমাকে।

—এইভাবে মেয়েটাকে মেরে ফেলতে চাও? গলার স্বর ভারি হয়ে এলো বনবিহারীবাবুর।

রত্নমালার কণ্ঠেও কান্নার আভাস।—আমারই কি কষ্ট হয় না ভাবো?

—অনুর বিয়ে দেবো আমি আবার।

রত্নমালা নিশ্চুপ।

—হেসেখেলে বেড়ায় বলে কি বুঝতে পারি না। ওর ভেতরটা—

—চুপ করো তুমি। এসব আর শুনিও না আমাকে। সত্যি করেই হয়তো রত্নমালা আঁচল চাপলেন চোখে।

বাপের দীর্ঘশ্বাসের শব্দটা স্পষ্ট কানে এলো অনুপমার।

—শান্তনুকে বেশ লাগলো আমার। বনবিহারীবাবু বললেন।

রত্নমালার কণ্ঠস্বরে আনন্দের চমক।—সত্যি, চমৎকার ছেলেটি।

—ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে মানুষ।

মৃদু হাসির রেশ বাজলো রত্নমালার গলায়।—কি ঝগড়াই ছিলো, শান্ত এসে আমার কাছে লাগাচ্ছে অনুর নামে, অনু গিয়ে লাগাচ্ছে হিরণদির কাছে।

—ক'দিন থেকে দেখছি, ওদের দুটিতে বেশ ভাব।

—হবেই তো।

—তা নয়। দুজনের মধ্যে—

কথাটা শেষ করতে বাধো-বাধো ঠেকলো হয়তো।

রত্নমালা উত্তর দিলেন, ও তোমার মনের ভুল। কিংবা কি জানি!

—শান্তনুর সঙ্গে বিয়ের চেষ্টা করলে কেমন হয়?

ব্যাস্। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি অনুপমা। পা টলছিলো ওর। সোজা চলে এসেছিলো ও শোবার ঘরে। দরজায় খিল এঁটে বিছানায় লুটিয়ে পড়েছিলো। বুকভরা ব্যথা নিয়ে। শান্তনু! শান্তনুকে কি ও ভালোবেসে ফেলেছে? হয়তো। বাবা তো ভুল করে না। বারবার শান্তনুদের বাড়ি যেতে ইচ্ছে হয় কেন। আগেকার মতো কই সময়টা একঘেয়ে লাগে না তো। অপেক্ষার ঘড়ির কাঁটা খুঁড়িয়ে চলে কেন। শান্তদার সঙ্গে কথা কয়ে, বেড়িয়ে কত সময় কেটে যায়, অথচ মনে হয় কেন এত ছোট সময়, অল্প সময়।

শান্তনুর কি অনুপমাকে ভালো লাগে? কে জানে?

আরো কয়েকটা দিন। একটু একটু করে সহজ হয় অনুপমা।

প্রতিটি কথায় সংযত বাঁধুনি। আশঙ্কার ধীরতা ভাবে-ভঙ্গিতে। নেই সে হাসির হঠকারিতা! নেই সে মুগ্ধালাপের প্রলাপ।

নিঃশব্দে এগিয়ে চললো দুজনে।

চাঁদমারির মাঠের পাশ দিয়ে। দেওদার পাতার চাঁদোয়ার নীচে লম্বা পিচের সড়ক। নির্জন। শান্ত স্তব্ধ। সন্ধ্যার বিষণ্ণ আলোছায়া ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। ইস্পাতের পাতের মতো চকচকে রাস্তায়। কাঁটাবেড়ার কচি পাতায় নরম রোদের ঝিলিক, বাতাসে ঠাণ্ডা আমেজ।

কালভার্টের পাশে সিমেন্টের বাঁধানো বেদীতে বসে ছিলো এক জোড়া অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান তরুণ-তরুণী। ছেলেটির সুপুষ্ট হাতখানা আদরে জড়িয়ে আছে মেয়েটির কটিদেশ। চোখে সোহাগের দৃষ্টি দুজনেরই।

পিছনে বেদীর গায়ে ঠেস দিয়ে আছে বাইকটা।

হঠাৎ উঠে পড়লো ওরা, শান্তনু আর অনুপমা কাছে এসে পড়েছে তখন। মেয়েটিকে বাইকের সামনে বসিয়ে উধাও হলো। শান্তনু মৃদু হেসে তাকালো অনুপমার মুখের দিকে। অনুপমা কিন্তু মুখ ফেরালো না, আড়চোখে একবার তাকিয়েই অন্যমনস্ক হলো।

কোনো কথা বললে না শান্তনু, সম্মতি ভিক্ষে করলে না অনুপমার কাছে। ধীরে ধীরে বেদীটার দিকে পা বাড়ালে।

—শান্তো-দা।

চেঁচিয়ে টেনে টেনে ডাক দিলে সমিতা।

পিছন ফিরে তাকালে দুজনই। দু'পাশের গাছগুলো ঝুঁকে রয়েছে রাস্তাটার ওপর, মাঝখানে সরু আর লম্বা মসৃণ পথ ছুটে গেছে অনেক, অনেক দূর অবধি। চোখ যায় না। সমিতা কিন্তু খুব বেশী দূরে নেই। হাতের পাতা জোড়া মুখের কাছে চোঙার মতো করে আরেকবার চেঁচিয়ে ডাকলে সমিতা ছুটতে ছুটতে। তারপর থেমে পড়ে জুতোর স্ট্র্যাপ বাঁধায় মন দিলে।

দুবার হাতছানি দিয়ে বেদীটায় এসে বসলে শান্তনু, আর পাশেই অনুপমা। বেশ কাছাকাছি। সমিতার আসতে কয়েক মিনিট লাগবে। অথচ। শান্তনুর মদো রক্তে হঠাৎ মাতাল হাওয়া দুলে উঠলো। ইচ্ছে হলো এখনি, এই মুহূর্তে—ভালো করে তাকিয়ে দেখলে শান্তনু। কামনারাঙা লোভাতুর চোখে। অনুপমার দেহের যৌবন-রেখার দিকে। শাড়ির আঁচলটা কাঁধের পাশে। অন্য দিকে তাকাবার ভান করে অপাঙ্গে তাকালে শান্তনু। অনুপমার অধীর উন্মাদনা প্রকাশ পাচ্ছে ওর প্রতিটি নিঃশ্বাসের সঙ্গে। থরথর কাঁপছে অনুপমা। কণ্ঠহারের চকচকে লকেটও। শ্বেতপাথরের সুডোল বাহু। সমিতার জুতোর আওয়াজ আসছে খুটখুট করে। কিন্তু পাশাপাশি তিনটি মোটা গুঁড়িতে ঢাকা পড়ে আসে সমিতা।

শান্তনুর উষ্ণ হাতের স্পর্শে চমকে উঠলো অনুপমা। চিবুকের ওপর অনুভব করলে তপ্ত নিঃশ্বাসের প্রলেপ।

অবশ দেহটা আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করলে অনুপমা। দুর্বল চেষ্টায়।

একটু পরেই সমিতাকে দেখা গেল।

—এই সরো, আমি মাঝখানে বসবো।

সমস্ত রাত্রি ঘুম এলো না অনুপমার চোখে। সমস্ত শরীরে তার কে যেন আগুন ছিটিয়ে দিয়েছে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ছটফট করলে অনুপমা। গাল দুটো চেপে রইলো বালিশে। হাতের আঙুলগুলো উলটে রাখলো চাদরের ওপর! অসহ্য একটা যন্ত্রণা। ঘুম আসে না, ঘুম আসে না তবু। টেনে টেনে হাতটা ঘষলে বিছানার উপর।

কেমন একটা লজ্জা। অস্বস্তি। ভোর হলো, রোদ বাড়লো। তবু শান্তনুর উদ্দেশ্যে পা বাড়াতে পারে না। বিষাক্ত একটা সাপের টুঁটি চেপে ধরে আছে যেন। নিজেকে বড় অসহায় বোধ করছে অনুপমা।

আহারের পর এসে বসলো সে। বারান্দার ডেকচেয়ারে।

হিরণ্ময়ী এসেছেন। শান্তনুর মা। ভাসা-ভাসা কথালাপের আওয়াজ আসছে কানে। টুকরো টুকরো ভাঙা-ভাঙা কথা।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো অনুপমা। চুপ করে অপেক্ষা করলে কিছুক্ষণ। তারপর চলতে শুরু করলে।

ওপাশের ফটকটা দিয়ে ঢুকলে অনুপমা। সামনাসামনি এতখানি পথ হেঁটে যেতে কি এক অস্বস্তি। দূরে থেকে শান্তনু তাকিয়ে থাকবে তার দিকে। মাথা নিচু করে এতখানি যেতে পারবে না অনুপমা। তার চেয়ে ওপাশের ফটকটাই ভালো। হঠাৎ গিয়ে হাজির হবে একেবারে শান্তনু আর সমিতার পিছনে।

কিন্তু কই! কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। শান্তনু নেই, সমিতা নেই। পা টিপে টিপে এগিয়ে এলো অনুপমা। ধীরে ধীরে পর্দাটা সরিয়ে এক পা ভিতরে দিয়েই—

আসতে যেটুকু সময় লেগেছিলো, ফিরতে অনেক কম। দ্রুত পায়ে বাড়ির পথ ধরলে অনুপমা।

বিয়ের ঠিক তিন মাস পরেই রঞ্জন মারা গিয়েছিলো। বুক ঠেলে উঠেছিলো ব্যথা! চোখে নিঃস্বতার অশ্রু নেমেছিলো। কপাটে খিল দিয়ে গুমরে গুমরে কেঁদেছিলো অনুপমা।

আজ আবার কাঁদলে। বিছানায় লুটিয়ে পড়ে। অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ। রত্নমালা হয়তো একবার ডাকাডাকি করে ফিরে গেলেন। আস্তে আস্তে উঠে বসলো অনুপমা। ঘরের কোণে ঢুকেছে আবছা অন্ধকার। দুপুরের রোদ সোনা হারিয়েছে। নেমেছে নীলাভ কুয়াশা। সন্ধ্যার আকাশে ব্যর্থ বিহঙ্গের কান্না। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলো অনুপমা।

রঞ্জন মারা যাবার পরেও আয়নার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলো অনুপমা।

আজ আবার দাঁড়ালো।

রূপ? বিতৃষ্ণার হাসি চমক দিলো ঠোঁটে।

গলার হারটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো। খুললে হাতের কঙ্কণ, সারা দেহের অলঙ্কার। খুঁজে বের করলে সেই পুরোনো দিনের সাদা ধবধবে থান কাপড়। নিপাড় মোটা সুতোর শুভ্রতায় নিজেকে ঢাকলে। পায়ের নীচে ফেললে রেশমী অঙ্গবাস, লোহিত লালিত্য। রঙের রোশনাই নিবে গেল। পাপড়ি খুললো একটি রজনীগন্ধার অন্ধ কলি।

আয়নার দিকে, নিজের প্রতিচ্ছবির দিকে তাকিয়ে রইলো অনুপমা। পূর্ণযৌবন শ্বেত-শিউলির চোখের কোণে অশ্রুবিন্দুটা হেসে উঠলো হঠাৎ।

ভাবলে, চাঁদমারির ময়দানকে পাশে ফেলে লম্বা পিচের সড়ক ধরে আজও হয়তো চলেছে শান্তনু। হিজল-হরিতকীর সাঁঝের ছায়ায়। নির্জন পথ। কালভার্টের পাশে সেই সিমেণ্টের বাঁধানো বেদীটায় শান্তনু গিয়ে বসবে। সমিতাও।

মাঝখানে নয়।

।১৩৫৫



অঙ্গপালি

মাস আষ্টেকের একটি ছোট্ট শিশুকে কোলে নিয়ে ফিরে এলো সবিতা। ফিরে আসতে হলো। এক যুগ পরে। হিসেবে হয়তো বেশী দিন নয়, দেড় বছর কি আরো কম সময়। অথচ এই সংক্ষিপ্ত সময়টুকুর মধ্যেই ঘটে গেল কত পরিবর্তন।

কালো আকাশের অন্ধকার চিরে হঠাৎ একদিন আগুন জ্বলে উঠেছিলো দিকে দিকে। আর চিৎকার। রক্তপায়ীদের কোলাহল আর অসহায় মানুষের আর্তনাদ ভেসে উঠেছিলো আকাশে বাতাসে। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো সবিতার। হঠাৎ-জাগা চোখে ভয় নেমে-ছিলো ওর। বাবা মা ভাই বোন সকলের মুখের ওপর দেখতে পেয়েছিলো ও শঙ্কিত বিস্ময়ের ছাপ! ধোয়া চাদরের মতো ফ্যাকাশে মুখে অপেক্ষা করেছিলো ওরা। অপেক্ষা, অপেক্ষা। তারপর। পশুর মতো চোখে আর প্রেতের মতো শরীর নিয়ে এগিয়ে এসেছিলো তারা। সেই ছায়া-কালো-কালো মানুষগুলো। বাইরে শুধু অন্ধকার আর কালির বৃষ্টি, কিন্তু বৃষ্টির রিমঝিম রিমঝিম ছাপিয়ে ভেসে আসছিলো ক্রুদ্ধ জনতার মদো রক্তের চিৎকার। ওরা এগিয়ে এলো। কারো হাতে মশাল, কেউ বা কৃপাণপাণি। তারপর কি যেন ঘটেছিলো। ভালো করে মনেও পড়ে না সবিতার। হয়তো বা চেতনা হারিয়ে ফেলেছিলো ও। বোবা আর বোকা চোখ চেয়ে অসহায় দৃষ্টি মেলে দেখছিলো। রক্ত আর রক্ত।

বাবা, মা, ভাই, বোন। কত দিন, কত কর্মহীন বিষণ্ণ দুপুর কাটিয়েছে ও ভেবে ভেবে, কত না নিঘুম রাত! তারা কি বেঁচে আছে? সবিতার জীবন থেকে অন্তত মুছে গেছে

তারা। কে জানে, ওকে বাদ দিয়েই হয়তো নানা রঙে রঙিন হয়ে উঠেছে ওদের সংসার। বংশের সাদা ফুটফুটে পাখনাটার ওপর যে কালির চিহ্ন পড়েছিলো সেটুকু মুছে ফেলে আবার হয়তো সংসার গড়ে তুলেছে ওরা। সবিতাকে ভুলে গেছে। সবিতাও ভুলতে চেষ্টা করেছিলো ওদের। কি হবে মিথ্যে দুঃখ করে। ব্যর্থ অনুশোচনায়। হঠাৎ একদিন ও আবিষ্কার করলে, মাতৃত্বের স্নিগ্ধাবেশে ওর দেহ ভরে উঠেছে। চোখে মধুময় ক্লান্তি। অবাঞ্ছিত, অযাচিত হতে পারে। স্নেহ আর ভালোবাসা নয়, ঘৃণা আর বিদ্বেষের বিনিময়ে পাওয়া সন্তান। তবু। সব অপরাধ যেন ক্ষমা পেলো সবিতার কাছে। ওর আপন দেহের রক্তমাংসে-গড়া সন্তানকে বুকের দুধ দিয়ে বড় করে তোলবার চেষ্টা করলে ও, স্বপ্ন দেখতে শুরু করলো।

এমন সময় ডাক এসে পেঁছিলো। পুলিসের সাহায্যে কারা যেন উদ্ধার করলো ওকে।

তারপর।

আট মাসের শিশুকে কোলে নিয়ে ফিরে এলো সবিতা।

ক্লান্ত বিষণ্ণ দেহ নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো সবিতা। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। পাথরের মূর্তির মতো।

ধুলো উড়িয়ে ঝড়ের মতো সশব্দে চলে গেল পুলিসের গাড়িখানা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে একবার চোখ তুলে তাকালো ও মা-র মুখের দিকে। পরক্ষণেই মাথাটা ঝুঁকে পড়লো ওর. চোখ নিবদ্ধ হলো পায়ের দিকে। মুখ তুলতেও কেমন এক অস্বস্তি।

—আয়।

ছোট্ট একটি অভ্যর্থনার ডাক। হয়তো আন্তরিক, হয়তো বা উপায়হীন। সবিতা ঠিক বুঝে উঠতে পারলো না। আরেকবার চকিতে চোখ তুলে তাকালো। হ্যাঁ, মা-র চোখে চাপা কান্নার অশ্রু।

সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলো মা-র শরীরের বেশবাসের দিকে তাকিয়ে। নেই? বাবা নেই? দীর্ঘশ্বাস ফেলে পা টিপে টিপে একটু এগিয়ে গেল সবিতা।

কপাটে ঠেস দিয়ে ভয়-ভয় চোখে তাকিয়ে আছে ছোট বোন কবিতা। এগারো বছর বয়সের মেয়ে, কিছুই চেনে না, কিছুই বোঝে না, তবু কেমন এক অস্বস্তির ভাব ফুটে উঠেছে ওর চোখে। ওর দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ হাসি হাসলে সবিতা।

কথা খুঁজে পাচ্ছে না ও। কি বলবে, কি-ই বা প্রশ্ন করবে? তার চেয়ে একেবারে চুপচাপ থাকা ভালো। কথা বললেই তো পাশ থেকে একটা কথাই খোঁচা দেবে। মনে পড়বে, মনে পড়িয়ে দেবে ওর অতীতের গ্লানির দিনগুলোকে।

মা বললে, বোস্ এখানে। আর নয়তো যা কলঘর থেকে হাতমুখ ধুয়ে আয়। জিরিয়ে নে একটু। আমি জলখাবারের ব্যবস্থা করি গে।

নিজের মনেই হাসলে সবিতা। উত্তর দিলো না। লজ্জা আর অস্বস্তি ওর একার নয়। মা ওর চোখের সামনে থেকে সরে যেতে চায়, সরে থাকতে চায়।

মা চলে যেতেই কবিতাকে কাছে ডাকলে ও।

মৃদু হেসে ওর কাঁধের ওপর একটা হাত রাখলো।—কেমন আছিস?

কবিতা ঘাড় নাড়লে, অর্থাৎ ভালোই।

—দাদা?

ছোট্ট একটি কথা। কি অর্থ ওর? যে-কোনো অর্থ ধরতে পারে কবিতা। দাদা কোথায়, দাদা কেমন আছেন! কিংবা, দাদা আছেন কি?

চমকে চোখ তুললে কবিতা। সবিতা বিষণ্ণ হাসি হাসলে।—ও!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার প্রশ্ন করলে, বকু? বকুও নেই?

—ছোড়দা কলেজে গেছে।

যাক। আছে তা হলে।

হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলো সবিতা। জোর করে হাসলে, খুশিতে নেচে ওঠবার চেষ্টা করলে। মিলেমিশে যেতে হবে। ঠিক আগের দিনের মতোই। হয়তো অস্বাভাবিক মনে হবে

ওর ব্যবহার, চোখে লাগবে। তবু, মাঝখানের দেয়ালটা সরিয়ে ফেলতে হবে। দূরে দূরে থাকলে দূরের মানুষ হয়ে যাবে ও। সে আরো কষ্টকর, অসহ্য।

হাসিখুশী মুখে কোলের শিশুর গাল টিপে আদর করলে সবিতা, চুমু খেলো।

হাসতে হাসতে বললে, ড্যাবড্যাব করে দেখছিস কি দুষ্টু? চিনিস, একে চিনিস তুই?

কবিতাও হেসে হাত বাড়ালে। ওর কোলে ছেড়ে দিলো ও ছেলেটাকে। তারপর ছেলেকে আদর করতে করতে কবিতাকে জড়িয়ে ধরলো। যেন ওর ছেলেকেই আদর করছে সবিতা। বাঁ হাতটা কবিতার কাঁধের ওপর দিয়ে গিয়ে শিশুর চুলে বিলি দিতে শুরু করলে। কবিতার পিঠের ওপর বুকের চাপ পড়লো ওর। কবিতা বুঝলো না। ছোট ছেলেপিলে দেখলেই মেতে ওঠে ও। এ তো দিদির ছেলে! সবিতার কিন্তু ইচ্ছে হচ্ছিলো, খুব ইচ্ছে করছিলো কবিতাকে জড়িয়ে ধরতে। বুকের কাছে টেনে আনতে চায় ও কবিতাকে। এতদিন পরে আবার আপন করে, অন্তরঙ্গভাবে ফিরে পেয়েছে ও ছোট্ট বোনটিকে! খুশিতে চঞ্চল হয়ে উঠতে ইচ্ছে করে তাই।

হঠাৎ মা-র পায়ের শব্দে মুখের হাসিটা ওর থমকে গেল। চট করে ছেলেকে কোলে তুলে নিলো ও। এত রঙ, এত রসিকতা, এত আনন্দ হয়তো মা-র চোখে দৃষ্টিকটু লাগবে।

মা এসে দাঁড়ালো একটু পরেই।

শিশুর দিকে হাত বাড়িয়ে কবিতা বললে, কি সুন্দর চোখ দুটো, দেখো মা। কেমন দুষ্টুমির হাসি দেখছো?

খুশির ছোঁয়াচ লাগলো হয়তো, মাও হাসলো।

কবিতা জিগ্যেস করলে, কত বয়স হলো দিদি এর?

সবিতা উত্তর দিলো না প্রথমবারে। মা-র সামনে ওর কেমন এক অস্বস্তি।

কবিতা আবার প্রশ্ন করলে।

উত্তর এলো, শুকনো উত্তর।—আট মাস।

—ও মা। মাত্র আট মাস! কি ভারি বাবা, কোলে রাখা যায় না। কেমন নাদুসনুদুসটি হয়েছে, না মা? আমি ভেবেছিলাম এক বছর দেড় বছর হবে।

মা বা দিদির কাছ থেকে কোনো কথা যে শুনতে পেলো না ও, কবিতার সেদিকে লক্ষ্যই নেই। ও কথার পর কথা বলে চলেছে।

—কি নাম রেখেছো দিদি?

—নাম নেই। শুকনো গলায় উত্তর দিলো সবিতা।

অর্থাৎ নাম যেটা আছে, সেটা বলা চলে না।

কবিতা এদিকে বিস্ময়ে চোখ গোল করলে, নাম দাওনি এখনো? কেমন হাসিখুশী দেখছো মা। আচ্ছা, কি নাম দেবে বলো তো? হয়েছে, ও-বাড়ির বউদি নাম দিয়েছে হাসি, এর নাম দেবো খুশি। খিলখিল করে হেসে উঠলো কবিতা।

তারপর শিশুর দিকে তাকিয়ে বললে, হাসির সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবো বুঝলে খুশি? রাঙা টুকটুকে দেখতে। কাল আনবো, দেখো।

সবিতা গম্ভীর থাকবার চেষ্টা করছিলো। তবু পারলে না। ক্রমে ক্রমে একটা হাসি ফুটে উঠছিলো ওর চোখে।

মা বললে, যা সবি, হাত-মুখ ধুয়ে আয়।

কবিতা হঠাৎ ফিরে তাকিয়ে বললে, কেমন দিদিমা বাপু তুমি, নাতিকে কোলে নিলে না সেই থেকে!

মা হেসে হাত বাড়ালো।

কলঘরের দিকে পা বাড়িয়েছিলো সবিতা। দোরের আড়াল থেকে ফিরে তাকিয়ে দেখলে, মা কোলে নিলো ওকে।

সবিতার বুক থেকে একটা ভার নেমে গেল। ঘুঙুরের বোল ফুটলো বুকের মধ্যে।

স্নান সেরে এসে সবিতা দেখলে খুশি তখনো মা-র কোলে। কবিতা কাড়াকাড়ি করছে, কিন্তু না, মা কিছুতেই দেবে না।

ঠোঁট টিপে টিপে হাসলে সবিতা। চোখ ভরে, প্রাণ ভরে দেখলে।

মাকে ওর ভয় ছিলো। মা-র শুচিবাই ওর অজানা নয়! তাই আশঙ্কা ছিলো। পুলিস যখন ওকে উদ্ধার করতে যায়, হাত-পা ধরে অনুনয় করেছিলো ও। বলেছিলো, আমি তো বেশ সুখেই আছি, ফিরে যেতে চাই না। আর, আর ফিরে গেলেই বা মা-বাবা আমাকে ফিরে নেবেন কেন? আমার জাত নেই, ধর্ম নেই। আমি তাঁদের কাছে অস্পৃশ্য হয়ে গেছি।

ওরা শোনেনি। আইন—আইনের দোহাই পেড়েছিলো। মা-বাবা গ্রহণ না করলেও, অনাথ আশ্রম আছে, সে ভরসা দেখিয়েছিলো।

সে কথা ভেবে সবিতার হঠাৎ মনে হলো মাকে সে চিনতো না। আজই প্রথম চিনলো যেন।

মানুষ কত বদলে যায়। সবিতা ভাবলে। মনে পড়লো ছোটবেলার কথা। ইস্কুল থেকে ফিরে কাপড় না ছাড়লে মাকে ছুঁতে পেতো না ও, ঘরের জিনিসপত্তরে হাত দিতে পেতো না!

সবিতা এবার মুখ খুললো।—একটু চা করে দিবি কবি?

মা ফিরে তাকালো।—বোস্, খাবার নিয়ে আসছি।

মা চলে গেল খাবার আনতে।

বিকেলের রোদ কমে এসেছে তখন। রাতের ছায়া নামছে ধীরে ধীরে। বই বগলে বকু ফিরে এলো।—দিদি, তুই?

—হ্যাঁ, আমি। সবিতা হাসলে। বললে, ভূত ভেবেছিলি বুঝি?

বকুও হাসলো। বললে, আমরা ভেবেছিলাম, তুই মরে গেছিস।

—তা হলেই ভালো হতো, না?

—দূর। মরে কোনো আরাম নেই।

সবিতা হেসে বললে, পড়াশুনা করছিস আজকাল, না আগের মতোই?

বকু উত্তর দিলে, এ তো আর ইস্কুল নয়। কলেজে ভরতি হয়েছি। না পড়লে চলে?

—তাই বুঝি? সবিতা হাসলে।

কবিতা ফোড়ন কাটলে, পড়ে না ছাই। শান্তদার সঙ্গে আড্ডা দেয় দিনরাত।

—দিই তো দিই। কবিতাকে ভেংচি কেটে বই রাখতে গেল বকু।

আর জলযোগ সেরে বারান্দার ডেকচেয়ারটাতেই শুয়ে পড়লো সবিতা। সারা দিনের ক্লান্তি আর অবসাদে সারা শরীর টনটন করছে। তা ছাড়া ঘুমে জড়িয়ে আসছে চোখ। একটু ঘুমোবার চেষ্টা করলে সবিতা। চোখ বুজে পড়ে থাকতে থাকতে ঘুমে ঢলে পড়লো।

সন্ধ্যা নামলো। বাতাস থামলো। তারাজ্বলা অন্ধকারের আকাশে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠলো চাঁদ। কৃষ্ণচূড়ার ডালপালার ফাঁকে কোথায় একটা কাক বসে পাখা ঝটপট করছে। চিঁচিঁ শব্দ তুলে কয়েকটা চামচিকে উড়ে গেল।

সবিতা শুনতে পেলো না। দেখতে পেলো না। ঘুমের ঘোরে ওর মাথাটা কাঁধের ওপর ঝুলে পড়েছে।

বার কয়েক এসে ফিরে গেল কবিতা আর বকু। বসে বসে গল্প করবার সাধ ওদের। অনেক অনেক কথা শোনবার আছে। বলবার আছে। দেড়টা বছর যেন একটা যুগ। কত কি ঘটে গেল, কত কি বদলে গেল। সেসব কি শুনবে না ওরা, বলবে না? কিন্তু। না, শ্রান্ত দেহমন সবিতার। ঘুমুক ও। ঘুম ভাঙাবে না ওরা। ঘুম তো ভাঙবেই, নিজের থেকেই জেগে উঠবে একসময়।

কি একটা শব্দে চোখ খুললে সবিতা। উঠে বসলো।

রাত ঘন হয়ে এসেছে। নির্জন নিশ্চুপ রাত। সামনের রাস্তাটার দিকে তাকালে সবিতা। দূরের আর অদূরের বাড়িগুলোর দিকে। আকাশের দিকে।

চাঁদের গায়ে কুয়াশার মতো স্বচ্ছ মেঘের ওড়না। নীচের রাস্তাটা চকচকে ইস্পাতের মতো পড়ে আছে নির্জন। এ-বাড়ি ও-বাড়ির দু-একটা জানালায় এখনো আলো জ্বলছে।

উঠে দাঁড়ালো সবিতা। গলাটা শুকিয়ে গেছে।

ও নিজেই কি গিয়ে জল গড়িয়ে নেবে? না, কবিতাকে ডাকবে?

হালকা পায়ে একটু পায়চারি করলে সবিতা। বারান্দাতেই খুশি হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। বুকটা সিরসির করছে যেন। দুধ খাওয়ানো হয়নি খুশিকে। নাকি, বোতলের দুধ খাইয়েছে ওরা।

আস্তে আস্তে বাড়ির ভেতর পা বাড়ালে ও।

সবগুলো অন্ধকার। ভেতরের উঠোনে এক ফালি আলো।

খানিকটা এসেই থমকে দাঁড়ালো। অন্ধকারে কপাটের আড়ালে।

ভিজে কাপড়ে মা দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর বকু।

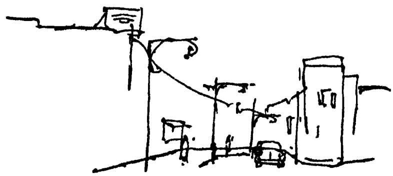
বকু বললে, এমনি অসুখ তোমার, আবার এত রাতে চান করলে?

মা লজ্জিত হয়ে বললে, কি করবো বল্। সারাটা দিন ছেলেটাকে নিয়ে মাখামাখি করলাম।

—করলেই বা। অবোধ্য অভিমান বকুর গলায়।

মা মুখে বললে, কোলে করে মানুষ করছে বলে তো আর আমাদের ছেলে নয় বাপু।

[১৩৫৬



জবালাহর

নিষুতি রাত নয়, রাত সাড়ে দশটা, কিংবা কে জানে এগারোটাও হতে পারে, যখন আর কি সব বাড়ির আলো নিবে যায়, চারিদিক চুপচাপ, ল্যাম্পপোস্টগুলো ঘুমে ঢুলতে থাকে, থেমে যায় উঠোন ধোয়ার সপসপ শব্দ, অসাবধানী ঝিয়ের হাতের বাসন গোছানোর ঠুংঠাং বা ঝনঝনানি আর বাজে না, যখন কচি ছেলের মা কাঁচা ঘুমের কান্না থামাতে ছেলেকে ঘুম-ঘুম চোখে দুধ খাওয়ায়, বুকের নয়তো বোতলের, যখন কিনা অনেক অন্ধকারের ওড়নায় পৃথিবীর মুখ ঢাকা পড়ে, আতঙ্কিত কালো রাতের পথে অজানা রহস্যের পদধ্বনিটুকুও শোনা যায় না, ছাদের কার্নিসের আর রাস্তার মোড়ের শিশুগাছের আড়ালে চোরা বিশ্রম্ভের অভিসার-আলাপ ফিসফিস করে না, যখন আশ্লেষশয়না নবদম্পতির অধরে ওষ্ঠে ঘটে মিলন, রাত মজে আসে যখন, তখন হয়তো কাঁকুলিয়ার সড়ক ধরে যেতে যেতে আপনি মেয়েলী কণ্ঠের একটি তীব্র আর্তনাদ শুনতে পেয়েছেন।

সমস্ত নিস্তব্ধতা ভেদ করে একটি নরম কণ্ঠের ব্যথাহত চিৎকার হয়তো শুনেছেন আপনি। এ পথের যে-কোনো হঠাৎ-পথিকের কানেই এ কান্না বেজে ওঠে। বাতাস থমকে থেমে পড়ে এই মুহূর্তে, রাস্তার আলোর সারিও হয়তো চমকে চোখ তোলে, আর একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস একটি মেয়ের সারা বুক নিঙড়ে বেরিয়ে আসে।

সেদিন দূরের ট্রাম ডিপোর ঘণ্টা তখনো এগারোটা বাজার সংকেত জানায়নি। আর পড়শীদের চোখে তন্দ্রা ঘন হয়ে ঘুম হয়নি।

হ্যাঁ। চাঁদ ঢলে পড়েছিলো। বাতাস বিলি দিচ্ছিলো গাছগাছালির গায়ে। পাড়ার শেষ-জাগরী পরীক্ষার পড়া-পড়ুয়া মেয়েটাও আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়েছে তখন।

জানালার পর্দাটা সরিয়ে গরাদের ফাঁকে গাল চেপে অপেক্ষা করছিলো শ্যামলী। থমথমে

দোতলার জানালা থেকে দেখতে পায় শিউলি। আবছা অন্ধকারের রাস্তায় টলতে টলতে আসছে ইন্দ্রনাথ।

কপাট খুললো, কপাট বন্ধ হলো। ভয়ে আশঙ্কায় বুক দুলে উঠলো শিউলির। চোখ ঠেলে কান্না এলো। ওর হাত কাঁপছে, পা টলছে। রাগে, ব্যথায়, দুঃখে। তবু। তবু তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো শিউলি। তারপর মাঝপথেই থমকে দাঁড়িয়ে রইলো।

সপসপ করে দুবার শব্দ হলো। বেতের? শ্যামলীর নরম পিঠের ওপরই কি পড়লো নাকি? হ্যাঁ, আবার বাতাস চিরে ভেসে উঠলো শ্যামলীর কান্না। কান্না, কান্না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, না কান্না চাপা দেবার চেষ্টা করছে?

—চুপ। ইন্দ্রনাথ গর্জন করে উঠলো।

আর সত্যিই চুপ করে গেল শ্যামলী।

কিন্তু ইন্দ্রনাথের গলার স্বর শুনতে পেলো শিউলি।—চুপ হারামজাদী। দিদির কাছে গিয়ে লাগাবি আর?

রাগে ফোঁসফোঁস করছে ইন্দ্রনাথ, শিউলি শুনতে পেলো।

শুনতে পেলো ইন্দ্রনাথ বলছে, আমি নেশা করি? আমি মারধোর করি?

আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না শিউলি! ছুটে ওপরে উঠে এলো। এক ছুটে। এসেই বিছানায় লুটিয়ে পড়লো।

শ্যামলীর উপকার করতে গিয়ে এ কি করে বসেছে সে!

সকালে ওপরের বারান্দা থেকে শিউলি দেখতে পেলো শ্যামলীর পিঠের ওপর আড়া-আড়িভাবে দুটো কালশিটের দাগ। বেতের আঘাতে দুটো বেগনী রেখা ফুটে উঠেছে। পিঠের কাপড় সরিয়ে কি যেন লাগাচ্ছিলো শ্যামলী, শিউলি দেখতে পেলো।

না। আর কোনো দিন কিছু বলবে না সে ইন্দ্রনাথকে।

শেফালী আর শ্যামলী। দু বোন, বন্ধুও। আদরে আহ্লাদে ক্রোধে কান্নায় একসঙ্গে মানুষ হয়েছে। কৈশোরের ঘনিষ্ঠ বন্ধন। যৌবনের চঞ্চলতা। হ্যাঁ, ওদের একজনের প্রথম যৌবনের উৎসুক আবেশ আর ব্যর্থ বিহ্বলতা আরেকজনের কাছে গোপন থাকেনি।

রেলিং-এর থামটায় ঠেস দিয়ে ভাবছিলো শিউলি। ভাবতে বসলেই কত কথা মনে পড়ে যায়!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উদাস চোখ চেয়ে তাকালো শিউলি। দূরের আকাশের দিকে।

বিকেল ঝরে পড়ছে। পাড়াটা এমনিতেই নির্জন, নিস্তব্ধ। আজ যেন আরো নিশ্চুপ, আরো জনহীন মনে হলো। ছোট ছোট বাড়ির সারি, পথের পাশে পাশে নাম-না-জানা গাছের ছায়া। শালিকের ডাক, চড়ুই পাখির হঠাৎ পাখা নাড়ার আওয়াজ। আর আকাশে মিইয়ে আসা রোদের ঝিকিমিকি। কেমন একটা ক্লান্ত বিষণ্ণ হাওয়া দুলছে। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস যেন পৃথিবীর পাঁজরের তলায় চমকে চুপ করে গেছে।

চোখের মতো মনটাও উদাস হয়ে যায় শিউলির। খেয়াল থাকে না, কখন নিজেরই অজান্তে ছোট মেয়েটাকে কোলে তুলে নিয়েছে। তিন বছরের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মেয়ের দেহ-ভারটুকুও টের পায় না।

ঠাণ্ডা মেয়ে খুশি। তবু কতক্ষণ আর চুপচাপ থাকতে পারে। মা-র বুক নিয়ে কিছু-ক্ষণ খেলা করলে নিজের মনেই। তারপর কি যেন বললে। শিউলির কানে গেল না।

ও তখন ভাবছে ছোটবেলাকার কথা। শিউলির সেই অসুখের সময়। কতই বা বয়স তখন ওর। শিউলির হাতে ইন্‌জেকশনের ছুঁচটা ফোটাতে দেখে আঁতকে কেঁদে উঠেছিলো শ্যামলী। যেন ওরই হাতে ফুটলো ছুঁচটা। সেদিন ওর ভয় দেখে হেসেছিলো শিউলি! তারপর। অনেক দিন। রোগশয্যায় পড়ে পড়ে শিউলি বুঝি ভাত খাবার বায়না ধরতো! তাই শ্যামলী এক দিন লুকিয়ে ওর জন্যে মাছ আর ভাত নিয়ে এসে দিয়েছিলো।

বলেছিলো, দিদি, খেয়ে নে। মা ছাদে গিয়েছে, জানতে পারবে না।

মনে পড়লে হাসি পায় আজ।

শিউলির হাতে একটা ফোড়া হয়েছিলো একবার। শ্যামলীরই বয়স তখন পনেরোর কাছাকাছি। ফোড়াটা কাটানোর সময় শ্যামলী কাছেই ছিলো। হঠাৎ, শুধু রক্ত দেখেই কি

অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলো শ্যামলী?

অনেক, অনেক কথা মনে পড়ে শিউলির। দূরের দিগন্ত থেকে উদাস চোখ আর ফিরে আসতে চায় না। চোখে আর নাকে খুশির নরম হালকা হাতের স্পর্শে তন্ময়তা ভেঙে যায়। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে খুশির মুখটা গালের ওপর চেপে ধরে।

আদর পাবার মতো, আদর করবার মতো শ্যামলীর কোলেও যদি একটা কেউ থাকতো! শিউলির ভুলের জন্যেই হয়তো চটে আছে শ্যামলী। খুশিকে নিতে আসেনি আজ আর। কৌতুকের হাসি হেসে খুশিকে কোলে নিয়েই তরতর করে নীচে নেমে যায় শিউলি। তারপর শ্যামলীর পিঠের ওপর ওকে ঝুপ করে নামিয়ে ধরে বলে, মাসী মাসী করে সারা হলো ও, আর মাসীর সাড়াই নেই।

শ্যামলীও হেসে ওকে কোলে তুলে নেয়।

কিছু সময় খুশিকে নিয়েই কেটে যায় শ্যামলীর। আদর করে, শাসন করে।

কিন্তু একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেই কেমন যেন বিষণ্ণ দেখায় ওকে। চোখের তারায় ভেসে ওঠে কেমন এক ধোঁয়াটে দৃষ্টি।

তারপর। তারপর শিশুসন্ধ্যা ক্রমশ রাত হয়। রাত গভীর হয়। এপাশের ওপাশের বাড়ির আলো নিবে যায়। আওয়াজের দমক মিইয়ে আসে। আবার সেই নির্জন, নিস্তব্ধ রাত্রি। ঈষৎ হাওয়ায় জানালার পর্দা ভাঙে, শুকনো পাতার শব্দ ভাসে। কালো কালো পিচের রাস্তা, কালো কালো গাছের গুঁড়ি। আর চাঁদের ছায়ায় ভেজা নির্জীব ইট-কাঠ-কংক্রিটের তাঁবুগুলো পড়ে থাকে নিঃশব্দে। আকাশের কোণে হয়তো মেঘ জমে, চাঁদ আড়াল পড়ে। তারাজ্বলা দুধেলা বীথিটাও নিষ্প্রভ হয়। শুধু দু-একটা রেতো বাদুড়ের ডাক শোনা যায়। আর দূরের ক্বচিৎ ট্রামের ঘণ্টি।

জানালার গরাদ ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে শ্যামলী। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে থাকে ওর দৃষ্টি। অন্ধের মতো। কোনো কিছুর দিকেই যেন চোখ যায় না ওর। আশা আর আকাঙ্ক্ষায় বুক বেঁধে অপেক্ষা করে।

সিল্যুটের ছবির মতো একটা সুদৃঢ় চেহারা দেখা যায়। অসংযত পদক্ষেপে দ্রুত এগিয়ে আসছে ইন্দ্রনাথ। শ্যামলী দেখতে পায়। আর পরমুহূর্তেই ছুটে যায় দরজা খুলতে।

ইন্দ্রনাথ ঘরে ঢোকে। কপাটে খিল লাগিয়ে ঘুরে দাঁড়ায় শ্যামলী। আর ইন্দ্রনাথের চোখের দিকে তাকিয়েই ভয়ে থরথর করে কেঁপে ওঠে। সেই অতিপরিচিত নৃশংস দৃষ্টি ইন্দ্রনাথের চোখে। অন্ধকারে যেন অগ্নিকুণ্ড জ্বলে উঠলো ধক করে। রক্তলোলুপ বাঘের চোখের মতো হিংস্র উত্তেজনা সে দৃষ্টিতে। শ্যামলীর চুলের মুঠির দিকে হাত বাড়ালে ইন্দ্রনাথ।

আর পরমুহূর্তেই বাতাস চিরে চিরে ভেঙে পড়লো একটা ভীতিবিহ্বল নারীকণ্ঠের চিৎকার।

চমকে চোখ তুললে শ্যামলী। বিস্ময়ের চোখ তুলে তাকালে দোতলার দিকে। ইন্দ্রনাথের চোখেও বিমূঢ় দৃষ্টি। অবোধ্য বিস্ময়ে এদিকে ওদিকে তাকালে ও।

শিউলির কণ্ঠস্বর। ওরা দুজনেই বুঝলো। দোতলার দিকে অণুবীক্ষণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলো। না, একটা ছায়াও দেখা গেল না।

শুধু সেদিনই নয়। প্রতি দিন।

ঠিক ঐ মুহূর্তটিতে। বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পায় ও। শিউলির চিৎকার। কান্নাভরা চিৎকার। কিন্তু কেন? কেন, কে জানে!

মায়া হয়। বেদনা বোধ করে ইন্দ্রনাথ। শিউলির জন্যে। আর সুরঞ্জনের ওপর ক্রোধ।

হঠাৎ মোড় ফিরে গেল ইন্দ্রনাথের জীবনে। বিকেলে আপিসের ছুটির পরই ফিরে আসে ইন্দ্রনাথ। সারা সন্ধ্যাটা শ্যামলীর সঙ্গে গল্প করে। টুকিটাকি সাহায্য করে শ্যামলীকে, তার কাজে। কাজ বাড়ায় তার চেয়ে বেশী। শ্যামলীকে টেনে বসায় নিজের কাছে। কখনো বা ওর হাত থেকে এটা-ওটা কেড়ে নিয়ে চটিয়ে তোলে। শ্যামলী তবু

খুশী। হঠাৎ যেন ওর মনে হয়, ও নতুন করে জীবন ফিরে পেয়েছে।

রাত ঘন না হতেই দুজনে শুয়ে পড়ে খাওয়াদাওয়া সেরে। কিন্তু ঘুম নামে না শ্যামলীর চোখে। ও অপেক্ষা করে। প্রতি দিনই অপেক্ষা করে থাকে ও যতক্ষণ না শিউলির চিৎকারটা শুনতে পায়।

তারপর। একটা দীর্ঘশ্বাস।

অন্ধকারেই বিছানায় শুয়ে শুয়ে স্তনবাস আর অন্তরাবরণ খুলে রাখে শ্যামলী। তারপর হালকাভাবে একটা হাত রাখে ইন্দ্রনাথের পিঠের ওপর। তন্দ্রার ঘোর কাটে ইন্দ্রনাথের। আরো ঘনিষ্ঠ করে কাছে টেনে নেয় ও শ্যামলীকে। খুশিয়াল এক জোড়া সাপের মতো আনন্দের আবেশে ডুবে যায় ওরা। শুধু কোথায় একটা মনের কোমল কোণে খোঁচা লাগে একটু। শিউলির চিৎকারটা বড় অসহায় করে তোলে শ্যামলীকে।

ঠিক ওদের সেই পুরোনো জীবনটাই যেন শিউলিকে ছুঁয়েছে। ঠিক ইন্দ্রনাথের মতোই তো হাসিখুশী থাকে সুরঞ্জন। সারাটা দিন দেখে মনেই হবে না শিউলির জীবনে কোথাও কোনো খেদ আছে। কোনো ছন্দপতন!

শ্যামলী মনে মনে ঠিক করলে, সুরঞ্জনকে ও বাধা দেবে। অত্যাচার নিজে সহ্য করে এসেছে ও এতদিন। তাই জানে, ব্যথাটা কোথায়। ও আজ বাধা দেবেই সুরঞ্জনকে।

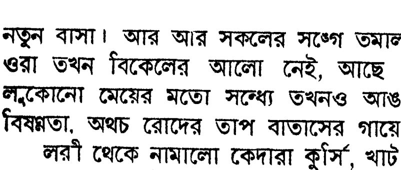
পা টিপে টিপে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল শ্যামলী, নিঃশব্দে। তারপর শিউলির ঘরের দিকে পা বাড়ালে। আর, ঠিক সেই মুহূর্তে চিৎকার করে উঠলো শিউলি।

ছুটে গিয়ে জানালায় উঁকি দিলো শ্যামলী। পরমুহূর্তেই বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল ও। দেখলে খিলখিল করে হাসছে শিউলি।

হঠাৎ কানে গেল শ্যামলীর—সুরঞ্জন বলছে, কি ছেলেমানুষি করো!

শিউলি হেসে উত্তর দিলো, শ্যামলী তো সান্ত্বনা পায়।

[১৩৫৬



অভিসার রঙ্গনটী

নতুন বাসা। আর আর সকলের সঙ্গে তমালও এসে উঠলো নতুন বাসায়। যখন পৌঁছলো ওরা তখন বিকেলের আলো নেই, আছে বাতাস। বিকেলী বাতাস। আধ-কপাটে মুখ লুকোনো মেয়ের মতো সন্ধ্যে তখনও আঙুলে আঙুল ভাঁজছে। আলোর গালে ধোঁয়াটে বিষণ্ণতা, অথচ রোদের তাপ বাতাসের গায়ে।

লরী থেকে নামালো কেদারা কুর্সি, খাট আলমারি। সামনের বারান্দায় স্তূপাকার করে মালপত্রগুলো নামিয়ে দিয়ে লরী দুটো সরে পড়লো। জিনিসপত্তর গোছগাছের দিকে মন দিলো সবাই। ভাড়াটে কুলিদের হই-হল্লা, চাকরবাকরদের খবরদারি, ঠুকঠাক ধুপধাপ আওয়াজ।

সবাই ব্যস্ত। নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ নেই যেন। কোমরে কাপড় জড়িয়ে বেণী দোলাতে দোলাতে এ-ঘর ও-ঘর শুরু করলো কাঞ্চনা। বুলু, রুণু, তিমির—ওরাও হুমকি দেয়, হুকুম দেয়।

দায়দায়িত্ব নেই শুধু তমালের। কাজ চাপালেও খসে পড়ে। হাঁস-পালকের জলের মতো। চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ করছিলো তমাল। কাজ যা করছে তা ঐ ভাড়াটে কুলির দল। বাচ্চাগুলো হয় এটা ফেলছে, নয় ওটা ভাঙছে। কেউ বা শুধু ধমক দিচ্ছে। না, তমালের কোনো প্রয়োজন নেই এখানে।

সিঁড়ির আলোটা জেবলে ওপরে উঠে এলো ও। একেবারে দোতলার বারান্দায়।

ইতিমধ্যে অন্ধকার আরো খানিকটা জমেছে, বাতাসে আকাশের ছায়া। বারান্দার রেলিং ছুঁয়ে দাঁড়ালো তমাল। তাকালো। শিশিরে মুখ মুছলো বুঝি, রজনীগন্ধার বনে নিঃশ্বাস টানলো। আপনা থেকেই কেমন মনটা খুশী হয়ে ওঠে। রোমে রোমাঞ্চ জাগে।

কিন্তু আরো কি যেন খুঁজছে তমাল। আরো কি যেন চায়।

অবাঙালীর দেশে অর্ধেক যৌবন কাটিয়ে এই প্রথম এসেছে ও বাংলার শহরে। এই মহানগরকে ঘিরে কত জাগর-স্বপ্ন উঁকি মেরে গেছে ওর মনের কোণে। সারাটা পথ কল্পনার ডানা উড়িয়েছে। রাত-কাঁপানো ট্রেনের তালে তালে কত না ঘুমন্ত কামনার শিষ দুলে উঠেছিলো। সে শিষ বুঝি শুকিয়ে যায়।

চমকে উঠলো তমাল। না, নিজেরই দীর্ঘশ্বাস। হতাশা। হতাশ্বাস। সমস্ত দেহ আর মন দৃষ্টির হাত বাড়িয়ে কিসের যেন স্পর্শ চায়।

মুখ। একটি সুন্দর মুখ।

কিন্তু এ পৃথিবীতে বুঝি বা মানুষ নেই। মুখ নেই মন হারাবার মতো, চোখ নেই চিত্ত চঞ্চল-করা। শুধু ধূসর অন্ধকার, আর দলছুট জোনাকির মতো এখানে-ওখানে দু-চার টুকরো আলোর ফুলকি। গুঁড়ো-গুঁড়ো মেঘ-মেশানো ফিকে জ্যোৎস্নার রেশ, ছায়া-ছায়া আবছা আলো।

এপাশে ওপাশে বাড়ির সারি। নিশ্চুপ নির্জন। নতুন বাসিন্দে এলো পাড়ায়, অথচ একজনও অনুসন্ধানে উন্মুখ নয়। কে এলো, কোত্থেকে এলো, কেন এসেছে—এসব প্রশ্ন মুখর হয়ে কোনো হাসি-হাসি মুখ দেখা দিলো না। উঁকি মারলো না কোনো চপল চোখের চাউনি। শুধু এপাশের বাড়ির শার্সির ওপাশে এক টুকরো হলদে আলো। আর সামনে পথের ওপারে শুধু অন্ধকার। মাঠ বোধ হয়। কিংবা কে জানে, পার্কও হতে পারে। রেলিং দিয়ে ঘেরা যখন। হ্যাঁ, রেলিং—দূর-দূর মিঠে আলোয় এটুকু অন্তত বোঝা যায়।

পার্কই। আর পার্কের গা ঘেঁষে একটা উঁচু ঢিপির সুদীর্ঘ রেখা। সটান চলে গেছে পুব-পশ্চিমে। এক সারি ক্ষুদে পাহাড়ের মাথা ছেঁটে যেন নামানো হয়েছে এক সমতলে। তা নয় অবশ্য। আসলে ওটা একটা রেলপথ। মাটি থেকে গজ পনেরো ওপরে ওই লম্বা আর উঁচু মেটে রাস্তা বেয়ে চকচক করছে এক জোড়া রেল-লাইন।

বাড়িটার পশ্চিমে, পার্কটার পশ্চিমে, বেশ খানিকটা দূরেই একটা চওড়া রাস্তা উত্তর আর দক্ষিণ, দু মুখে ছুটেছে। প্রচুর আলো। গ্যাসলাইট, বিদ্যুৎ, নিওন, ফ্লুরোসেন্ট। জনতার জঞ্জালও। দু-একটা কথা-কৌতুকও ভেসে আসে। চাপা আলাপের শব্দ। চকিতে ছুটে যায় ট্রাম আর বাস। ঘুঙুরের মতো ট্রামে ঘণ্টি বাজে কখনো, কখনো বা নিঃশব্দে পিছলে পড়ার ফিসফিসানি। হুস্‌স্‌। একটানা দীর্ঘনিঃশ্বাসের মতো।

দেড় সেকেণ্ডের ছুটকো টানেলের মতো একটা সুড়ঙ্গপথ রেল-লাইনের নীচে—রেল-লাইনের উঁচু ঢিপিকে ভেদ করে গেছে। তারই ভেতর দিয়ে ট্রামের যাওয়া-আসা। দূর থেকে, বিশেষ করে ফিকে জ্যোৎস্নার রাতে, রহস্যময় সাঁকোর মতো দেখায়।

সেই দিকেই তন্ময় হয়ে তাকিয়ে ছিলো তমাল। হঠাৎ সশব্দ হাসির ঢেউ ছড়িয়ে পড়লো। অদ্ভুত হীরেঝরা হাসি, ধারালো হাসি। চমকে চোখ ফেরালো তমাল। পাশের বাড়ির সেই হলদে আলোর জানালায় একটি সুন্দর মুখ। হাসি উছলে-পড়া একটি মেয়েলী মুখ। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তমালের দিকে। অবোধ্য চোখের তারায় কোনো-এক কামনা-সফল কৌতুক—রহস্যময়। তমালের সমস্ত শরীরে যেন রোমাঞ্চের শিহরন বয়ে গেল। উন্মাদ? কে জানে।

বন্ধু জুটলো দিন কয়েকের মধ্যেই। আর তারাই জানালো তমালকে। নতুন খবর। কিন্তু তমাল যা জানতে চায় তার সন্ধান ওরা কেউই জানে না।

তমাল একটু আশ্চর্য হলো।—অ্যাদ্দিন এ-পাড়ায় বাস করছেন, অথচ ও-বাড়ির সঙ্গে আলাপ নেই আপনার!

সহাস্যে উত্তর এলো, কে কার তোয়াক্কা রাখে এখানে! নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত সবাই। তা ছাড়া, এ-পাড়ার সকলকে এড়িয়ে চলতে চায় ওরা। মেলামেশা পছন্দ করে না হয়তো।

তমালের প্রশ্ন প্রশ্নই থেকে যায়। ক'জন মানুষ ও-বাড়িতে? কারা থাকে? পুরুষের সংখ্যা কত? নারীর? কি করে, কোথায় যায়, এমন এক অবোধ্য রহস্যের জালেই বা ঘিরে রেখেছে কেন বাড়িটাকে!

মানুষ? অনেক। অনেক মুখই তো দেখা যায়। চেনা আর অচেনা। ঐশ্বর্যের আওতায় জড়ানো প্রতিটি পদক্ষেপ। দুখানা গাড়ি, বুইক আর হিল্‌ম্যান। মোটর ছাড়া যেন চলে না, হাঁটতে দেখা যায়নি এক পা। চোখাচোখি হলেও কথা বলে না।

অদ্ভুত! কি যেন এক রহস্য আছে বাড়িটায়, তমালের বিশ্বাস।

ওরা হাসে।—রহস্য ও-বাড়িতে নয়, রহস্য আপনাদের বাড়িটায়।

তমালও না হেসে পারে না। বলে, শুনেছি সে কথা। ভুতুড়ে বাড়ি এই তো? কিন্তু কয়েকদিন তো কাটলো, দেখতে পেলাম না একজন মহাপ্রভুকেও।

হ্যাঁ, এ কথা অনেকে অনেকবার বলেছে ওদের, কিন্তু বিশ্বাস করেনি কেউ! বাড়িআলার সঙ্গে পাড়াপড়শীর বিরোধ থাকলে বাড়িটার ভুতুড়ে হতে সময় লাগে না। এ খবর ওদের জানা।

তাই তমাল বিরক্তি চেপে বললে, প্রমাণ আছে কিছু?

—প্রমাণ কি ভূতেরা রেখে যায়?

তমাল হেসে হালকা করার চেষ্টা করে ব্যাপারটা, জিজ্ঞেস করে, বিশেষত্ব আছে নিশ্চয় কিছু একটা?

—আছেই তো। এক বছরের মধ্যে তিনটি ভাড়াটে পরিবার পালিয়েছে এ-বাড়ি ছেড়ে।

—ব্যাস, এই? তমাল রীতিমতো একটা গল্প শুনতে না পেয়ে হতাশ হয়।

উত্তর আসে, না, এই শেষ নয়। প্রত্যেকটি পরিবারের একজন করে পাগল হয়ে গেছে এ-বাড়িতে আসার পর। আপনার বয়সের একজন পুরুষ।

—পুরুষ? হেসে উঠলো তমাল। বললে, কোনো পেত্নীটেত্নীর কাণ্ড তা হলে। তবে, এ কথা মানছি যে, যতরকমের ভূতের কথা শুনেছি তার মধ্যে এইটেই সব চেয়ে অদ্ভুত।

হেসে উড়িয়ে দিয়ে এলো তমাল, হেসে হারিয়ে দিয়েছে সব তর্ক। তবু, সংস্কারমুক্ত মন তো নয়, তাই ভুলতে পারেনি একেবারে। হঠাৎ কখনোসখনো হয়তো মনে পড়েছে ওদের সাবধানি, আর অমনি, বিস্ময়ে উদাস হয়েছে ওর মন।

সেদিনও বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এ কথাই ভাবছিলো ও।

সবে সকাল হয়েছে তখন। সুমুখের নীচের রাস্তায় হোসপাইপের ফুলঝুরি। দুটো গরু হাঁকাতে হাঁকাতে গয়লাটা গিয়ে ঢুকলো পাশের বাড়ির পাঁচিলের ভেতর, হাতের বালতিতে একটা কাঠি বাজাতে বাজাতে।

হঠাৎ চোখ তুলে তাকালো তমাল। ও-বাড়ির দোতলার জানালায়। চোখে চোখ পড়লো, মৃদু মিষ্টি একটা হাসি ফুটে উঠলো মেয়েটির মুখে।

সদ্য ঘুম থেকে উঠে এসে দাঁড়িয়েছে। আঙুলে আঙুলে জড়ানো হাত দুটো পিঠের পিছনে টান-টান হয়ে বেঁকে রইলো, মিনিট কয়েকের জন্যে। ঘুম-ভাঙা মুখে, ঘামে-ভেজা মুখে ভোর আবেশের শৈথিল্য বুঝি বা। শরীরের জড়তা ভাঙালো যেন, সমস্ত দেহে নূপুরের ছন্দ বাজিয়ে। মুজ্‌রা শুরু হবার আগে এ যেন নৃত্যনটীর পায়ে কাঁপা কাঁকনের ঝঙ্কার। যৌবনের কুঁড়িতে লোভানির পাপড়ি ফুটে ওঠা। নিদ্রামলিন সাদা শাড়ির আড়ালে লঘু কোমলতা।

স্পষ্ট চোখে তাকিয়ে ছিলো তমাল তন্ময় হয়ে।

আর এক টুকরো মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে দিয়ে চলে গেল মেয়েটি।

তমাল চোখ সরাতে পারলো না তবু। তাকিয়ে রইলো ও। অধীর অপেক্ষায়। আসবে, ও আবার আসবে এই আশায়।

পনেরো মিনিটও হয়তো কাটেনি। সেই মিষ্টি মুখ, সেই সুন্দর মুখের ওপর চোখ পড়লো তমালের। ছাদের আলসের ধারে দাঁড়িয়ে আছে সে। সারা অঙ্গ ঘিরে বাতাসে ফুর-ফুর করে উড়ছে লাল রেশমের শাড়ি। সুস্পষ্ট আগুনের শিখার মতো। কিন্তু বড় অন্যমনস্ক দেখায় ওকে, চঞ্চল চোখ জোড়া অন্য কোনো আকর্ষণে নিবদ্ধ যেন।

অপেক্ষা, অপেক্ষা।

ধীরে ধীরে ওর দৃষ্টিটা চারিদিক ঘুরে এসে পড়লো তমালের মুখের ওপর। সন্তুষ্টির হাসি হাসলে তমাল। আর সঙ্গে সঙ্গে বিরক্তির চাবুক কষিয়ে দিয়ে সরে গেল মেয়েটি।

লজ্জিত বোধ করলো তমাল। আহত বোধ করলো।

কিন্তু পাঁচটা মিনিটও হয়তো কাটেনি, বিমূঢ় বিস্ময় নামলো তমালের চোখে। হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে আসছিলো তমাল, তবু শেষবারের মতো আশার দৃষ্টিতে তাকালো ও, ছাদের দিকে, জানালার দিকে। অদ্ভুত! ছাদে নয়! দোতলার জানালায় দাঁড়িয়ে রয়েছে মেয়েটি। লাল রেশমের আগুন নয়, সাদা শাড়ির নির্মল মাধুর্য তার দেহে। ঠিক তেমনি মোহময় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে সে, তমালের চোখে চোখ রেখে।

নিজের ভুল বুঝতে পেরে হেসে ফেললো তমাল। না, যমজ বোনেদের মধ্যেও এতখানি সাদৃশ্য দেখেনি ও কখনও। যমজ কি ওরা দুজন? কে জানে! কিন্তু কি আশ্চর্য মিল, দেহের কোথাও যেন এতটুকু ভিন্নতার রেখা নেই। মুখে নেই একটা কালো তিলের চিহ্নভেদ।

শুধু দেখে আর দেখা দিয়ে শুরু হলো পূর্বরাগ। সব সুস্থ মনের, সবল মনের অন্তরঙ্গ অভিভাব যেমন করে শুরু হয়, ঠিক সেই পথে—সেই একই পথে। একজনের চোখের তারা আরেকজনের চপল নীলায় আখর আঁকে, ছবি ফোটায়। স্বপ্ন বোনে, রঙ ছড়ায়। পরস্পরের বোবা চোখ কথা কয়। চলে মন দেওয়া-নেওয়ার পর্ব। পালা ফুরোয় না তবু।

কিন্তু বড় অস্বস্তি, বড় অধৈর্য হয়ে ওঠে তমাল। মন চায়, মেয়েটির কাছে যেতে, ছোঁয়া পেতে, অফুরন্ত কথা—কথা—কথার তরঙ্গে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে। কান পেতে শুনতে চায় ও অনর্গল মিঠে শব্দের কাকলি। সমুদ্রের ফেনার মতো নরম আর স্নিগ্ধ কথা, অপ্রয়োজনীয় শব্দের সারি, আলাপী আন্তরিকতার রিমঝিম।

—কিন্তু উপায় তো নেই। কি করা যায় বল্ তো? তমাল প্রশ্ন করেছিলো ওর কলেজের এক অন্তরঙ্গ বন্ধুকে।

সে সাহস জাগিয়ে দিলো—আলাপ করলেই তো পারিস।

—ভয় করে যে! হেসেছিলো তমাল।—কার সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে কাকে ডেকে ফেলবো ঠিক কি? অ্যাদ্দিন ধরে দেখছি, তবু চিনতে পারি না দুজনকে।

বন্ধুটি হাসলো।

তমাল বললে, হাসছিস তুই। কি বিভ্রাটে পড়েছি তা যদি জানতিস! হয়তো সবুজ শাড়ি দেখে ভাবলাম ইনি নন, অতএব একেবারে অন্যমনস্কের মতো চোখ ফেরালাম পার্কের দিকে, যেন দেখতেই পাইনি ওঁকে—ব্যাস, তিন দিন আর পাত্তা পাওয়া যাবে না। অভিমান।

বন্ধুর উত্তর এলো, দুজনের দিকে সমান দৃষ্টি দিলেই তো হয়।

তমাল হেসে ফেললে, হুঁ। দ্বিতীয়টির চোখ তো দেখিসনি, যেন আগুনের ফুলকি। পাঁচ সেকেন্ড তাকিয়েছো কি মনে হবে নেমে এলো বুঝি ঘুষি বাগিয়ে।

সত্যি। এমনি এক দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে কাটছিলো ওর দিনগুলো। কখনো কটাক্ষের ধমক, কখনো অভিমান, আর বাকী সময়টা হাসিখুশি, অর্থভরা চাউনি আর কামনার ইঙ্গিত।

এইভাবে চলছিলো ইতিহাস। তবু কাহিনী জমছিলো না।

ভুল আর ভুল। মাথাটা ঝিমঝিম করে ওঠে তমালের। কত ঘুমভাঙা রাত অসহ্য মনে হয়েছে। সমস্ত শরীরে জ্বালা ধরেছে, বাসনাতুর দেহের অধীরতা সারা অঙ্গ কাঁপিয়ে তুলেছে।

এ কি রহস্য? এ কি অবোধ্য বিস্ময়? এক বছরের মধ্যে তিনজন পুরুষ নাকি পাগল হয়ে গেছে এ-বাড়িতে। হঠাৎ কোনো-এক নির্জন রাতে মনে পড়েছে তমালের। অস্থির হয়ে

উঠেছে ও। আশ্চর্য! তমালও কি পাগল হয়ে যাবে নাকি?

সমস্ত দেহের উষ্ণ রক্ত যেন ওর মগজে চক্র কাটতে শুরু করে। মদো রক্তের উদ্দামতায় ছটফট করে তমাল। ইচ্ছে হয়, ছুটে যায় ওর কাছে, ঐ মেয়েটির কাছে। কথা বলে। অনুরোধের আশ্লেষে ওকে জড়িয়ে ধরে বলে, একটা চিহ্ন দাও, অভিজ্ঞান দাও, তোমার দেহের, তোমার মুখের একটি বিভেদ-চিহ্ন দেখিয়ে দাও। একটি ছোট্ট কালো তিল, একটা সামান্য কাটা দাগ। ছুরির আঘাতে এমন একটা চিহ্ন কি ও নিজেই সৃষ্টি করতে পারে না?

কিংবা, একটা ছুরির আঘাতে সব রহস্যের সীমারেখা টানা যায় না?

না, মনকে সংযত করবে ও।

একটা হপ্তা মেয়েটিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এলো তমাল। একবারও এসে দাঁড়ালো না নির্দিষ্ট বারান্দায়, তাকালো না চোখ মেলে। কেন মিছে এই বৃথা ব্যর্থতা ডেকে আনবে? তার চেয়ে পার্কের হিমেল ঘাসের সবুজে গা ডুবিয়ে নিশ্চিন্তে নক্ষত্র গোনা অনেক আরামের।

তাই বাতাসের গায়ে রোদের তাপ কমতেই বেরিয়ে এলো তমাল। এসে বসলো সামনের পার্কে একটা ন্যাড়া গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে। অদূরে ঝিলটার জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে দু-এক দমক ঠাণ্ডা বাতাস এলো। আকাশে তারা ফুটলো, চাঁদ উঠলো। ভরা জ্যোছনার চাঁদ।

এমন চমৎকার নির্জনতা। এমন শান্ত একাকিত্ব।

চুপচাপ বসে রইলো তমাল। বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ চোখ গেল ওর—নেশায়-পাওয়া সেই বাড়িটার দিকে। আর পরক্ষণেই চমকে উঠলো ও। নিজের চোখকেও যেন বিশ্বাস করতে পারলো না।

চোখে চোখ হয়তো পড়েনি। ছায়া-ছায়া অন্ধকারে স্পষ্ট বুঝতে পারলো না তমাল। কিন্তু মেয়েটি যেন স্থির চোখে ওর দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। আধখোলা লোহার ফটকে একটা হাত রেখে। কি দেখছে ও? কি ভাবছে অমন অচঞ্চল দৃষ্টিতে তমালকে লক্ষ করে? আসছে। মেয়েটি এগিয়ে আসছে। সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠলো তমালের। বহুপ্রতীক্ষিত স্বপ্ন-সাফল্যের আশায়, না দুর্বল আবেগে? নির্জীবের মতো বসে রইলো তমাল। উৎকণ্ঠায়, উন্মুখ আগ্রহে। কাছে, আরো কাছে এগিয়ে আসছে ও। ফিকে আলোর আড়ালে শুধু এক মেয়েলী শরীরের ছায়ামূর্তি। তন্বীদেহের লীলাচপল গতি। সিল্যুটের ছবির মতো ঝাপসা।

অপেক্ষা, অপেক্ষা। চোখ সরাতে পারে না তমাল। বড় অসহায়, বড় বেশী নিস্তেজ মনে হয় নিজেকে।

ওর ছড়ানো পায়ের কাছে এসে দাঁড়ালো ছায়াশরীরটা। লাফিয়ে উঠে পড়লো তমাল। হঠাৎ কোত্থেকে যেন এক মুঠো সাহস এসে জুটলো ওর হাতের মুঠোয়।

—এসেছো, এসেছো তুমি? আমি ভীষণ ভীতু, তাই এগিয়ে যেতে পারিনি এতদিন।

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে ফেললো তমাল। এতদিনের জমা হওয়া উচ্ছ্বাসের রাশ যেন এক মুহূর্তে নিঃশেষ হয়ে গেল। ব্যাকুল আবেগে মেয়েটির হাত দুটো জড়িয়ে ধরবার জন্যে এগিয়ে গেল তমাল।

কিন্তু তড়িৎস্পৃষ্টের মতো পিছিয়ে গেল মেয়েটি। পরমুহূর্তেই খিলখিল করে হেসে উঠলো।

স্তম্ভিত বিস্ময়ে হাত গুটিয়ে নিলো তমাল। লজ্জায়, আশঙ্কায়।

আবার ঠোঁট টিপে হাসলো মেয়েটি।—রাঙাদি এই চিঠিটা দিলো।

বুঝলো কি বুঝলো না, তমাল হাত বাড়িয়ে নিলো চিঠিখানা।

—কাল ঠিক এই সময় আসবো। উত্তর দেবেন। বলেই তরতর করে দ্রুত পায়ে চলে গেল মেয়েটি। ছায়াশরীর ছায়ায় মিলিয়ে গেল।

চোখ থেকে চিঠিতে নামলো। আকর্ষণ থেকে অনুরাগ। রহস্যের কপাট খোলা যায় না তবু। মধুকন্যা কৃষ্ণা আর দয়িতাদূতী কাবেরী। দুই বোন। যমজই হয়তো ওরা। কিন্তু সামান্যতম কোনো পার্থক্য যদি থাকতো! কে জানে, হয়তো বা আছে। নিকট আলাপে হয়তো সে চিহ্ন ধরা পড়বে। হয়তো কাবেরী বলতে পারে। কিন্তু প্রেমের গভীরে পৌঁছে

এ-প্রশ্ন করা যায় না।

কৌতুকের ছলে এক দিন বলেছিলো তমাল, তুমি আর তোমার রাঙাদি কিন্তু একেবারে একরকম দেখতে, একটু তফাত নেই।

কাবেরী হেসে উঠেছিলো।—আপনার চোখেও?

তমাল লজ্জিত হয়ে বলেছিলো, না, দূর থেকে মনে হয়। কাছে এলে নিশ্চয় চিনতে পারবো, কে কৃষ্ণা, কে কাবেরী।

কাবেরী হেসে উঠেছিলো খিলখিল করে।—অর্থাৎ চিঠির আলাপ আর ভালো লাগছে না, এই তো? ভয় নেই, কালই দেখা হবে আপনাদের।

—কখন? আসবে, কৃষ্ণা আসবে কাল? উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে তমাল।

ঠোঁট টিপে টিপে হাসে কাবেরী।—হ্যাঁ, আসবে। রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর, ন'টার সময়। ঐ বেঞ্চটায় থাকবেন। সামনের বেঞ্চটা দেখিয়ে দেয় কাবেরী।

সেই বেঞ্চটাতেই এসে বসলো তমাল। পরের দিন। ন'টা বাজতে তখনও হয়তো কিছু দেরি আছে।

কৃষ্ণা আর কাবেরী। মনে মনে ভাবছিলো তমাল। একক অপেক্ষায় বসে বসে।

পাড়াপড়শীদের কথাটা মনে পড়লো হঠাৎ। এক বছরের মধ্যে তিনটি পুরুষ পাগল হয়ে গেছে এ-বাড়িতে। রহস্যময় বাড়ি এটা। তাই কি! তমাল পাগল হয়ে যাবে নাকি? সত্যি, মাঝে মাঝে হঠাৎ ঘুমছাড়া রাতের নিঃশব্দতায় কখনো কখনো ভয় পেয়েছে তমাল। ওর মাথার ভেতর কি এক চাবি-হারানো রহস্য? ভালোবাসি, অথচ ভালোবাসার পাত্রীকে চিনতে পারি না। তবে কি ওর ভালোবাসায় মিথ্যের খাদ আছে? কেন এমন হয়?

একটা ধারালো ছুরির আঘাতে কৃষ্ণার কপালে যদি একটা কাটাদাগের চিহ্ন আঁকা যেতো।

হঠাৎ তন্ময়তা ঘুচে গেল তমালের। দূরের বাড়িটার লোহার ফটকে কৃষ্ণাকে দেখা গেল। আলো থেকে অন্ধকারে নেমে এলো কৃষ্ণা। ছায়াশরীরের অস্পষ্ট আভাস। এগিয়ে আসছে ক্রমশ। লজ্জায় যেন মাথা নুয়ে পড়েছে। চোখ লুকোনোর ব্যাকুলতা।

পার্কের ঘাসে পা ভিজিয়ে আরো কয়েকজন মেয়েপুরুষ পায়চারি করছে তখনও। ভেসে আসছে দু-চার টুকরো ভাঙা-ভাঙা শব্দ। সহসা-থামা মিষ্টি হাসির রেশ।

আনন্দ আর খুশিতে দুলে উঠলো তমাল। তবু কেমন যেন এক অস্বস্তি। এমনি এক লজ্জা আর শরমে কৃষ্ণার গতিও হয়তো লঘু হয়ে গেছে। এত ধীরে ধীরে আসছে কেন ও!

কৃষ্ণা আসবে, সামনে এসে দাঁড়াবে। চোখ চাইবে, বলবে কথা। হয়তো, হয়তো পাশে বসবে ওর, দুজনে দুজনের অন্তরঙ্গ স্পর্শ পাবে।

কিন্তু, কি বলবে তমাল? কেমন করে বলবে! কত বিভোর ভোর, কত না-লুকোনো বিকেলী বাতাসকে করে তুলেছে মুখর! কত ফিকে জ্যোৎস্নার রাতে বোবা চোখ হঠাৎ কথা পেয়েছে খুঁজে, না-বলা কথার জোয়ারে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে!

কৃষ্ণা। ঘন তিমিরের ছায়াবরণে শরীর লুকিয়ে এগিয়ে এলো কৃষ্ণা। দাঁড়ালো। একেবারে তমালের সামনে। পায়ের নখে চোখ এঁটে।

বেঞ্চের একপাশে সরে গেল তমাল। মুখে কথা যোগালো না। চোখের সেই অনুচ্চারিত কথার অনর্গল স্রোত কোথায় গেল? দিনের পর দিন চিঠির দৌত্যে যে প্রগল্‌ভতার উচ্ছ্বাস বইয়ে এসেছে, কোথায় চাপা পড়লো তার রেশ?

বেশ কয়েক সেকেন্ড বোবা হয়ে থেকে অস্ফুটে শুধু বললে, বোসো।

বসে পড়লো ও।

হয়তো মুচকি হাসলো। চোখ তুলে অপাঙ্গে তাকালো তমালের দিকে।

—কৃষ্ণা! গাঢ় স্বরে ডাকলে তমাল।—এতদিন কেন আড়ালে আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলে বলো?

মৃদু হাসি চেপে চকিতে চোখ তুলে তাকালো ও, তমালের দিকে। উত্তর দিলে না।

—কথা বলো কৃষ্ণা, কথা বলো। আবেগের কণ্ঠে তমাল বলে উঠলো। মুঠোর মধ্যে ওর একটা হাত চেপে ধরে বললে, লজ্জা কিসের, এখনো লজ্জা তোমার?

না, তমালের সব কথাটুকু হয়তো শেষ হয়নি। তার আগেই সশব্দে হেসে গড়িয়ে পড়লো

কাবেরী। হেসে ঢলে পড়তে পড়তে বললে, লজ্জা আপনারই হওয়া উচিত। সুর করে করে ব্যঙ্গের স্বরে বললে, এত চোখ-চাওয়াচাওয়ি চিঠি-লেখালেখি, অথচ মানুষ চিনতে পারেন না, ভালোমানুষ পেয়ে রাঙাদিকে খুব ঠকাচ্ছেন আপনি, ওকে এতটুকুও ভালোবাসেন না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তমাল।

কাবেরী হেসে প্রশ্ন করলে, কি হলো?

—সত্যি কাবেরী, তোমরা দুজনে সত্যিই আমাকে পাগল করে দেবে।

—উঁহু। পাগল হতে হবে না। চলুন, রাঙাদি বাড়িতে অপেক্ষা করছে ; আপনাকে নিয়ে যেতে বললে। এত লাজুক, কিছুতে আসতে রাজী হলো না।

তমাল একটু বিস্মিত হলো।—বাড়িতে?

—ভয় নেই, সব সিনেমা দেখতে গেছে ন'টার শো-এ। হেসে উঠলো কাবেরী।

একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো তমাল।—চলো।

চলতে চলতে কাবেরী বললে, সামনাসামনি দেখা হওয়ার পরও যদি চিনতে না পারেন তা হলে কিন্তু রাঙাদি বলেছে এইখানেই ইতি।

তমাল কোনো কথা বললে না। কাবেরীর পিছনে পিছনে এসে ঢুকলো ওদের বাড়ির ভেতর।

পাঁচ ধাপ উঁচুতে বাড়িটার প্লিন্থ। পাঁচ ধাপ সিঁড়ি ভাঙার পর মার্বেলের লম্বা করিডর। করিডরটা আবছা অন্ধকারে ঢাকা। রহস্যময় মনে হয়। গা ছম্‌ছম্‌ করে ওঠে তমালের। প্রায়ান্ধকার করিডরের দু'পাশে সারি-সারি ঘর। ঘর নয়, কপাটের সারি। আর অন্য প্রান্তে দূর-সম্মুখে নীল আলোর ক্ষীণাভা। একটা ভারি পর্দা ঝুলছে দরজায়। আর তারই ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে শুক্লাতিথির সমুদ্রের মতো নীলাভ আলোর ছায়া।

সমস্ত বাড়িটা নিশ্চুপ। নিঃশব্দ। এতটুকু আওয়াজের লেশ নেই কোথাও। যেন জন-মানবহীন কোনো পরিত্যক্ত প্রাসাদের রোমাঞ্চ চেপে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। যেন রূপকথার কোনো নিদ্রিত পুরীতে আচমকা এসে উপস্থিত হয়েছে তমাল। বরফের দেশের মতো শব্দ-হীন নিস্পন্দ।

পৃথিবীও হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে।

সমস্ত বাড়িটার অসহ্য নীরবতাকে ব্যঙ্গ করে দু জোড়া জুতোর শব্দ ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল সামনের নীল আলোর ঘর অবধি। পর্দার সামনে গিয়ে থামলো দুজনে।

পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকলো কাবেরী। বললে, আসুন।

পা থেকে চপ্পল খসিয়ে রেখে তমালও ঘরে ঢুকলো। বুকের মধ্যে অসহ্য এক স্পন্দন। হৃৎপিণ্ডের আওয়াজটাও যেন কানে আসছে ওর। সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে। ভয় আর আশঙ্কায়। আনন্দে উত্তেজনায়।

ঘরে ঢুকে চোখ চেয়ে তাকালে তমাল। নির্জন। দেয়ালের গায়ে একটা বিরাট পেণ্টিং। বলদৃপ্ত চেহারার একজন পুরুষ, সামরিক পোশাকে বিভূষিত। হাতে তলোয়ার, চোখের তারা যেন জীবন্ত রঙিন, আর নরম কার্পেটে ঢাকা মেঝের ওপর মাত্র তিন টুকরো সোফার কুশন। পাশের জানালায় পিতলের ভাসে কয়েক গোছা তারা ফুলের রাশ।

কাবেরী ধীরে ধীরে বললে, বসুন তমালদা। তারপর সেখানে থেকেই চাপা স্বরে ডাকলে, রাঙাদি, রাঙাদি!

কোনো জবাব এলো না।

কাবেরী নিজের মনেই যেন বললে, যা লাজুক! যাই দেখি, পাঠিয়ে দিই। আপনি একটু বসুন।

কাবেরী চলে গেল। একটু পরেই তমাল শুনতে পেলো কাবেরী বলছে, যা, তমালদা বসে আছে। লজ্জা কি, যা না।

বেশ একটু কৌতুক বোধ করলে তমাল। সাহস পেলে। কৃষ্ণা যে ওর চেয়েও বেশী লজ্জিত হয়ে পড়েছে তা জেনে অনেকখানি অস্বস্তি কেটে গেল।

চুপচাপ বসে রইলো তমাল। হয়তো দু মিনিট, হয়তো তিন মিনিট। অধৈর্য হয়ে উঠলো ও। বসে থাকতে পারলো না। কৃষ্ণা এখনো আসছে না কেন? কাবেরীই বা কি

করছে? পাশের ঘরেই তো ছিলো ওরা। জানালাটা খোলা রয়েছে, উঁকি মেরে দেখবে নাকি? দেখলেই বা। নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে গেল তমাল। উঁকি মেরে দেখলে।

—বাব্বা, বিয়ের কনেটি সাজা হচ্ছে! যা রাঙাদি, তমালদা কখন এসেছে বল্ তো?

—যাচ্ছি বাপু, যাচ্ছি। তুই কিন্তু উঁকি দিস্ না, তোর চেয়ে এক ঘণ্টার বড় আমি, মনে থাকে যেন।

শুনতে পেলো তমাল। দেখলো যা কিছু দেখবার, আর সঙ্গে সঙ্গে সশব্দ হাসিতে ফেটে পড়তে ইচ্ছে হলো ওর। হো-হো করে হেসে ওঠার ভয়ে একরকম ছুটে বেরিয়ে এলো ও। ছুটে বেরিয়ে এলো একেবারে রাস্তায় করিডর পার হয়ে, লোহার ফটক পার হয়ে।

তারপর, পরের দিন।

প্রতিদিনকার মতো পার্কে পা ছড়িয়ে ঘাসে বসে ছিলো তমাল। ন্যাড়া অর্জুন গাছটার গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে। আর গত রাত্রের কথা ভাবতে ভাবতে নিজের মনেই হাসছিলো।

সন্ধ্যে ঘন হয়ে এসেছে তখন বেশ খানিকটা। হঠাৎ চোখ পড়লো তমালের সেই সামনের ছায়াশরীরটার দিকে। সেই বহুপরিচিত ছায়ামূর্তিটা এগিয়ে আসছে।

উঠে দাঁড়িয়েই পিছন ফিরে হাঁটতে শুরু করলে তমাল।

—তমালদা! তমালদা! ডাক শুনতে পেলো তমাল, তবু পিছনে তাকালো না। লঘু পায়ের ভিজে ঘাস আর শুকনো পাতা মাড়ানোর আওয়াজ এলো। ছুটে আসছে হয়তো।

—তমালদা! কাঁধের উপর একটা নরম হাতের স্পর্শ।

ফিরে তাকাতে হলো।

—কাল না বলে পালিয়ে এলেন যে! রাঙাদি ভীষণ চটে গেছে কিন্তু।

তমাল বিস্ময়ে চোখ কপালে তুললো। —কি বলছেন? ভুল করেছেন, আমি তো...

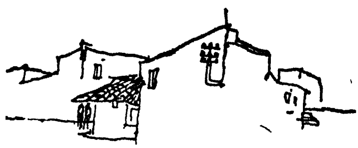
—বাঃ রে, বেশ অভিনয় করতে পারেন তো তমালদা! হেসে হেসে বললে ও।

তমাল তখনো বিস্মিত। যেন কিছুই বুঝতে পারছে না ও। তারপর বললে, তমাল? ও রাঙাদার কথা বলছেন? রাঙাদা তো বাড়িতে আছে।

চমকে চোখ তুললে কাবেরী। পরস্পর পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলো বিস্ময়ের দৃষ্টিতে। কিছুক্ষণ। তারপর, তারপর দুজনেই সশব্দে হেসে উঠলো। পরস্পর পরস্পরের কাছে ধরা পড়ে যাওয়ার সহজ আর সরল হাসি।

হাতে হাত জড়িয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল দুজনে। কাছের চাঁদভাঙা কালো জলের ঝিলটার দিকে।

[১৩৫৬



তমোগাহন

কালা ঘটক আসলে কালা নয়, কালো।

কর্পোরেশনের খাতায় যে নামই থাক, রামী ধোপানীর গলি বললে যে-কেউ দেখিয়ে দিতে পারতো। এ-পাড়ার যে-কেউ। সরু আর নোংরা একটা কানা গলি, বড় রাস্তা থেকে নেমে মেজ সেজ নানান পথ ঘুরে ঢুকতে হয় গলিটায়, আর বেরুতে হলেও সেই একই মুখে। কারণ আর একটা দিক পুরোনো পচাধসা একটা বাড়ির দেয়াল চাপা পড়ে বোবা

হয়ে গিয়েছিলো।

গলিতে ঢুকতেই পর পর গোটা কয়েক চালাঘর, ধোপাদের আড্ডা। ময়লা আর ধোপ-দুরস্ত কাপড়ের রাশ থেকে ভেসে আসতো একটা বিশ্রী ভ্যাপসা গন্ধ। চালার বাইরে সারি-দেওয়া গোটা কয়েক বড় বড় উনোন, আগুন থাক বা না থাক, তার ওপর সদাসর্বদা চাপানো থাকতো আধ ডজন ইস্ত্রি। এনামেলের থালায় গোটা গোটা শুকনো ভাতের রাশ, আর নয়তো এটা-ওটা নিয়ে জটলা পাকিয়ে বসতো ছেলেবুড়োর দল। বুড়োগুলো বসে বসে ধুঁকতো, হুঁকোতে টান দিতে গিয়ে কেশে উঠতো খুক্‌খুক্‌ করে। ছেলেগুলো চেঁচাতো, নয়তো ঝগড়া করতো।

তবু, এসবের দিকে কারও চোখ পড়তো না, এমন কি অন্য অন্য মেয়েদের দিকেও না। এ গলিতে যে ঢুকতো, এ গলি থেকে যে যখন বেরুতো, চোখ মেলে দেখতো সে শুধু রামীকে। রামী অবশ্য নাম নয়। অন্য কি যেন। তবু ওর টানা-টানা চোখ, ডাবের মতো কাঁচ আর নিটোল মুখ, আফোটা পদ্মের মতো শরীর, আর সত্যিমিথ্যে কিছু একটা পেছনের ইতিহাস—এইসবের জন্যেই ওর নামকরণ হয়েছিলো রামী। তা থেকে রামী ধোপানীর গলি।

পাঁচটা বাড়ি পার হয়ে একটা পচা ইটের পাঁজা। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে ভেঙে গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে গেছে, কোনো-কোনোটার গায়ে আধ ইঞ্চি পুরু শেওলা। শুধু ইটের রাশ নয়, একটা ডাস্টবিন আবার পাশেই। মরা ইঁদুর, পচা ভাত, মাছের আঁশ, নোংরা কাপড়। যতখানি কদর্য হতে পারে। এরই পাশে একটা মান্ধাতার আমলের মেসবাড়ি। বাড়ি নয়, অন্ধকূপ। না ঢোকে বাতাস, না আলো। তবু তেতলার একটা ছোট্ট ঘরের ভাড়া সাড়ে তিন টাকা। সে কি আজকের কথা। তখন যে-কোনো গ্র্যাজুয়েট ছেলে চাকরি পেয়েও তিরিশ থেকে তেত্রিশে ওঠবার স্বপ্ন দেখতো।

কালা ঘটক বলতো সে কথা।—আলো আর বাতাস তো বাপু মিনিমাগনা পাবার হক্ আমাদের, সবাই পায়। আর সাড়ে তিন-তিনটে টাকা দিয়েও...

বিদ্রুপের হাসি হাসতো অন্য অন্য বাসিন্দেরা। বলতো, আপনি যদি এমন শখ করে থাকেন ঘটকমশাই, আলোবাতাস পাবেন কি করে? অত কঞ্জুসের মতো না খেয়ে না দেয়ে হরদম টাকা জমাবেন!

কালা ঘটক চটে যেতো।—তোমরা তো আমাকে কঞ্জুসই বলবে। বলে দু-বেলা খাবার খরচ জোটাতে পারি না, টাকা জমাবো!

কেউ বিশ্বাস করতো না তবু। বিশ্বাস করবার কথাও নয়। এ তল্লাটে একটা বাড়িও ছিলো কিনা সন্দেহ, যে বাড়িতে শাঁখ বেজেছে, উলু পড়েছে কালা ঘটক তার লাল খেরোর খাতা নিয়ে হাজির হবার আগে। হাফ-রাজা থেকে শুরু করে মাতাল বোম্বেটে অবধি যে-কোনো লোকের বাড়িতে ছেলেমেয়ে বিয়ের যুগ্যি হয়ে উঠেছে কি, গিয়ে হাজির হয়েছে ও। কতশত মেয়ের মুখে হাসি ফুটিয়েছে, প্রথম ছেলের অন্নপ্রাশনে সোনাটা রুপোটা সম্মানী পেয়েছে। দু-একটা পাপকাজও অবশ্য না করেছে এমন নয়। বকাটে বেকার ছোঁড়াকে সোনার চাঁদ বলে বড়লোকের আদুরে মেয়ের হাতে হাত জুড়ে দিয়ে গোপনে ভাগাভাগি করে নিয়েছে পণের টাকা। মনকে প্রবোধ দিয়ে বলেছে, প্রজাপতির নির্বন্ধ, এ কি আর আমি করলাম! যার যেখানে হবার সব ঠিক হয়ে আছে। বিয়ের মাস কয়েক পরেই হয়তো রঙিন শাড়ি বিলিয়ে দিতে হয়েছে কোনো মেয়েকে—কালা ঘটক চোখ মুছে বলেছে, নিয়তি। তবু, বিয়ের পর ছেলেমেয়েদের সুখী দেখতে পেলে খুশী হয়ে উঠেছে ও। অনুভব করেছে এক অপার্থিব আনন্দ।

ওর জীবনের একটা দিক হয়তো বড় বেশী অর্থলোলুপ। টাকা ও ভালোবাসে, হয়তো কৃপণের মতোই ভালোবাসে। স্নেহ, প্রীতি, মায়া, মমতা সব ধুয়ে মুছে যায়, ন্যায়-অন্যায়ের বিচারে ভুল হয় অনেক সময়। কারণ স্বার্থই ওর কাছে একমাত্র মাপকাঠি, উচিতানুচিতের মানদণ্ড বেঁকে যায় শুধু টাকার লোভে। হয়তো নৃশংস মনে হবে, হয়তো বা অমানুষিক মনে হবে ওর এই ব্যবহার। তবু, তবু একটা দিক ওর বড় বেশী দুর্বল। করুণ কান্নার রেশ সে দিকটায়, ব্যর্থতার ব্যথায় ভরা।

নতুন বিয়ের পর কৌতুক আর কথালাপের অনুরাগ ওর চোখে পড়েছে হয়তো, নবদম্পতির

হাসি আর আনন্দ মন ভরে দিয়েছে। মনে মনে বলেছে, এ তো আমারই হাতে গড়া, এ সুখাবেশ আমিই সৃষ্টি করেছি। তাই পথে যেতে যেতে কোনো দিন কোনো পরিচিত স্বামী-স্ত্রীকে হয়তো দেখতে পেয়েছে দোতলার বারান্দায়, রেলিং-এর পাশে, হয়তো ঘনিষ্ঠতার আবেশ দেখেছে তাদের মুখে চোখে, আর সারা পথ তন্ময় বিহ্বলতার সুর বেজেছে ওর মনে।

কিন্তু, তার চেয়েও ওর ভালো লাগে হাস্যমুখর সুন্দর আর স্বাস্থ্যবান শিশুর মুখ। বিয়ের দু-পাঁচ বছর পরেও নানা অছিলায় গিয়ে হাজির হয়েছে কোনো বাড়িতে, তরুণী মায়ের ঈষৎ-শিথিল বুকের কোমলতায় সোহাগে আঁকড়ে ধরা শিশুসন্তানের এতটুকু প্রগল্ভ হাসি দেখবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে। ও নিজেই বুঝতে পারে না, কমনীয় মাতৃত্বের ডানায় ঘেরা একটি ছোট্ট শিশুর হাসি দেখবার জন্যে কেন ও চঞ্চল হয়ে ওঠে। এ এক অদ্ভুত তৃপ্তি, অবোধ্য এক নেশা। কিন্তু কেন? কেন তা ও নিজেই জানে না। কে জানে, হয়তো আত্মগর্ব। এই সরল আর সহজ মাতৃত্ব, এমন অপরূপ সৃষ্টির মূলে হয়তো নিজেরই বিবাহ-দৌত্যের সফলতা দেখতে পায়। তাই।

শিশু দেখলেই কোলে টেনে নিতে ইচ্ছে হয় ওর। ইচ্ছে হয় আদরে আদরে ডুবিয়ে দিতে।

কিন্তু। ও জানে ওর এই দুর্বল দিকটার জন্যে এতটুকু সহানুভূতি নেই কারো। ওকে অপয়া ভাবে সকলে, ওর বীভৎস চেহারাটাকে ভয় পায়। বিয়ের পর সবাই যেন এড়িয়ে চলতে চায় ওকে। অথচ বিয়ের আগে কন্যাপক্ষ ওকে ভগবানের আশীর্বাদ মনে করে সাদর আহ্বান জানায়।

সে কথা মনে পড়লেও হাসি পায় কালা ঘটকের। লজ্জায়, ক্ষোভে, অপমানে চোখের জল মুছে প্রতিজ্ঞা করে, না, আর কোনো দিন কোনো বাড়িতে গিয়ে হাজির হবে না। অপরের শিশুকে দেখে কি এমন আনন্দ, কিসের তৃপ্তি!

তবু খবর পেয়ে চুপ করে থাকতে পারে না। চঞ্চল হয়ে ওঠে ছুটে যাবার জন্যে। ঘুমোতে পারে না সারা রাত।

পর পর তিন দিন নিজেকে বেঁধে রাখলে। কে যেন খবর দিয়েছিলো, হারান চাটুজ্যের মেয়ে বুলু এসেছে। একটি সুন্দর ছেলে কোলে নিয়ে ফিরে এসেছে। আসুক, ওদের সঙ্গে সব সম্পর্ক তো বিয়ের পরই শেষ হয়ে গেছে। প্রাপ্য পারিশ্রমিকও পেয়ে গেছে। কেন যাবে ও আবার? না, প্রতিজ্ঞা ভাঙবে না।

কিন্তু প্রতিজ্ঞা টিকলো না। মনকে প্রবোধ দিলে, আমার আবার লজ্জা অপমান! আর তা ছাড়া কে বলতে পারে, রক্ষিতদের মেয়ের মতো বুলুও হয়তো খুশী হয়ে হাতের চুড়িই এক গাছা দিয়ে দেবে।

এমনি সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে বেরিয়ে পড়লো কালা ঘটক। হাতে লম্বা আর মোটা খেরোর খাতাটা নিতে ভুললো না। পুরোনো ছেঁড়া ছাতাটা বগলদাবায়।

—কই মা বুলু, ছেলে দেখতে এলাম তোমার। বুলু মা!

চটি চট-চট করতে করতে একেবারে দোতলায় উঠে হাঁক দিলো।

ছোট্ট সরল মুখের মেয়ে বুলু, বয়েসে হয়তো ষোলোও শেষ হয়নি। তেমনি বোকা-বোকা চোখ মেলে একটা ডাঁসা পেয়ারা কামড়াতে কামড়াতে বেরিয়ে এলো বুলু। পর-মুহূর্তেই হেসে মাথায় ঘোমটা তুলে দিলে একটু।

—ও মা, আপনি? আসুন।

পান-খাওয়া কালো কালো দাঁত বের করে সশব্দে হেসে উঠলো কালা ঘটক। বললে, কই, ছেলে কই? শুনেই ছুটে এলাম, আমার বুলু মা-র ছেলে দেখতে আসবো না?

—বসুন, আনছি। একটা চেয়ার এগিয়ে দিলো বুলু। পরক্ষণে বললে, দেখি আবার সে দস্যি ছেলে কোথায় গেল। হামা দিতে শেখার পর থেকে কি আর রক্ষে আছে। কখন কোথায় গিয়ে ঘুপটি মেরে বসে থাকে, সারা বাড়ি খুঁজে পাত্তা পাওয়া যায় না।

—যেখানেই থাক্ খুঁজে নিয়ে এসো। তোমার ছেলে না দেখে নড়ছি না আমি।

—না, না। বসুন, এক্ষুনি আনছি। বলে বেরিয়ে গেল বুলু।

মিনিট কয়েক পরেই ফিরে এলো, কোলে একটি হাসি-হাসি মুখ সুদর্শন শিশুকে নিয়ে। বললে, কি দুষ্টু ছেলে বাবা, সিঁড়ির তলায় লুকিয়ে লুকিয়ে ঝিয়ের সঙ্গে মুড়ি খাচ্ছিলো।

কালা ঘটক হাসলো ওর কথায়। ভালোও লাগলো।

বললে, বাঃ, বেশ সুন্দর হয়েছে। একেবারে বাপের মতো গোলগাল মুখ, আর মায়ের মতো রাঙা টুকটুকে গায়ের রঙ। বেশ নাদুসনুদুসটি হয়েছে কিন্তু।

—না, ক-মাস হলো একটু রোগা হয়ে গেছে। বুলু প্রতিবাদ করলে।

কালা ঘটক নিজের ভুল বুঝতে পারলো। ছোট ছেলে মোটাসোটা হলেও নাকি তা বলা উচিত নয়। চোখ লাগে। রোগা হয়ে যায়।

তাই শুধরে নিয়ে বললে, হ্যাঁ, একটু রোগা-রোগা মনে হচ্ছে বটে। তবে খুব সুন্দর দেখতে হয়েছে বুলু মা। আর হবে না-ই বা কেন, এ তো এলোমেলো বিয়ে নয়, রীতিমতো রাজযোটক করে বিয়ে দিয়েছিলো এই শর্মা। হুঁ-হুঁ।

বুলু লজ্জার হাসি হাসলো। আরো চেপে ধরলো ছেলেকে বুকের কাছে।

কালা ঘটক হাত বাড়ালে হঠাৎ—এসো খোকা, আমার কোলে এসো। এসো, আমার কাছে এসো, রাঙা টুকটুকে বউ এনে দেবো, ঠিক তোমার মতন। নিজের রসিকতায় নিজেই হাসলো ও, চেয়ার ছেড়ে হাত বাড়িয়ে কাছে এগিয়ে গেল।

শিশু এতক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলো কালা ঘটকের দিকে ভীত সন্ত্রস্ত চোখে। ও কাছে এগিয়ে যেতেই ভয়ে আশঙ্কায় সশব্দে কেঁদে উঠলো! কাঁদতে কাঁদতে ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো।

ছেলেকে সরিয়ে নিয়ে গেল বুলু। ওকে রেখে এসে দেখলে ধুতির খুঁটে চোখ মুছছে কালা ঘটক। কি হলো। কে জানে, এমনিই হয়তো।

বললে, দিদিমার কোলে গিয়ে তবে ঠাণ্ডা হলেন ছেলে, কি পাজি যে হয়েছে।

হেসে সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করলে কালা ঘটক। বললে, ভয় পেয়েছে।

ভয় সত্যিই পেয়েছিলো। সকলেই ভয় পায়। এমন বীভৎস আর কুৎসিত চেহারা দেখে বড়রাই ভয় পায়। এতটুকু কোলের ছেলে কেঁদে উঠবে না? গায়ের রঙ শুধু কালো নয়, চকচকে। আর বিচ্ছিরি লম্বা, রোগা। বাজপড়া গাছের মতো পুড়ে ঝলসে গেছে যেন সারা শরীর। চোখের নীচে দুটো হাড় উঁচু হয়ে আছে চোয়ালের চেয়েও। বসন্তের দাগে সমস্ত মুখখানা ভরে গেছে, এমবস্ করা কালো রেক্সিনের মুখোশ পরে আছে যেন। আর তার মাঝে দুটো ধকধকে বড় বড় চোখ—ঘোলাটে লাল চোখ। ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো মনে হয়। এমন বীভৎস চেহারার একটা লোক কাছে এগিয়ে এলে কেঁদে ককিয়ে উঠবে না ছোট ছেলেরা? কালা ঘটক নিজেও তা জানে। তাই, প্রতিজ্ঞা করেছিলো ও, যাবে না কারো ছেলে দেখতে। কোলে নেবার জন্যে হাত বাড়াবে না আর। তবু, ঠিক সময়টিতেই ভুলে যায় ও।

বুলুও লজ্জিত হয়েছিলো! হাজার হোক, স্বামিপুত্রে সুখী হয়েছে ও। তাই কালা ঘটকের ওপর হয়তো কিছুটা সহানুভূতি ছিলো।

সান্ত্বনার সুরে তাই বললে, যা ছিঁচকাঁদুনে ছেলে, কারো কোলে যেতে চায় না।

কালা ঘটকের কালো মুখখানা আরো কালো হলো। বললে, না মা, দোষ তোমার ছেলের নয়, দোষ আমার। ছোট ছেলেমেয়েরা আমাকে দেখলেই ভয় পায়। তবু কি যে হয়, কিছুতেই স্বভাবটা শুধরোতে পারি না, মনে থাকে না কিছুতেই।

—না, না, সে কি! দূর, তা না, দাঁড়ান নিয়ে আসছি ওকে, ভয় পাবে কেন।

ছুটে চলে গেল বুলু।

কালা ঘটক শুনতে পেলে বুলু বলছে, দাও মা, ওকে নিয়ে যাই, দেখিয়ে আনি।

উত্তর এলো—না, না, ঐ ভালুকটার কাছে ওকে নিয়ে যেতে হবে না। ছেলে যা ভয় পেয়েছে, শেষে অসুখবিসুখ একটা হোক আর কি। যা, যা, ওকে যেতে বলে দে, অত আদিখ্যেতা দেখাতে হবে না।

একটা গল্প তৈরি করে বুলু ফিরে এলো। কিন্তু কালা ঘটককে আর দেখতে পেলো না। আহত, লজ্জিত বোধ করলো বুলু। ছুটে গেল রেলিং-এর ধারে, অনুসন্ধানী চোখে তাকালে

পথের দিকে। দেখতে পেলো দ্রুত পায়ে গলির মোড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল কালা ঘটক। চোখের জল মুছতে মুছতে ছুটে গিয়ে মা-র কোল থেকে কেড়ে নিলো ছেলেকে, রাগে আর ক্ষোভে তার পিঠে একটা চড় বসিয়ে দিলো সজোরে।

ও যে কতখানি কুৎসিত, কতটা কদর্য ওর চেহারা, তখন অবধি জানতো না ও। কালা ঘটক নাম হয়নি তখনো। যেদিন জানলো সেদিনই বুঝলো যে পিতৃদত্ত নামটাও ওকে ব্যঙ্গ করে।

শ্যামসুন্দর।

কুড়ি বছর বয়েসের বুদ্ধিতে শ্যামসুন্দর এটুকু বুঝেছিলো যে ওর চেহারার সঙ্গে এ নামটা একেবারেই খাপ খায় না। কুড়ি বছর বয়সের শ্যামসুন্দর! সেসব দিনের কথা আজ আর মনে পড়ে না ওর। অনেক কাল ভুলে গেছে, ভুলে যেতেই চেয়েছে।

কলমিপুর গ্রামের ইস্কুলে তিন-তিন বছর ধরে একই ক্লাসে পড়ে থাকতে দেখে হরিধন ঘটক ঠিক করলেন ছেলের বিয়ে দেবেন। সংসারী হয়ে সময় থাকতে থাকতে যদি বাপের বিদ্যেটা শিখে নিতে পারে তো কোনোরকমে ভাতকাপড়টা জুটে যাবে।

বিঘে দশ-বারো জমি, আর একটা ছোট কুঁড়ে। চাষবাস দেখে কিছুটা সুরাহা হবে, বাকিটা পুষিয়ে নিতে পারবে ঘটকালির ব্যবসায়। তাই ছেলের বিয়ে ঠিক করে ফেললেন তিনি গ্রামেরই বৃন্দাবন বাঁড়ুজ্যের মেয়ে উমার সঙ্গে। ন' বছরের মেয়ে, মোটামুটি নাক মুখ চোখে শ্রী আছে। অন্তত কুৎসিত নয়। গায়ের রঙটা একটু কালো, সেদিক থেকে অবশ্য আপত্তি ছিলো না, ছেলেও তাঁর কন্দর্প নয়।

কিন্তু পাঁজিপুঁথি দেখে বিয়ের দিন-তারিখ ঠিক করে হরিধনও উঠলেন আর উমাও গিয়ে ঘরে খিল আঁটলো। বাপ-মায়ের সাধাসাধি অনুনয়বিনয় ভয় দেখানো সব বিফল হলো। সেই যে বিছানায় পড়ে কাঁদতে শুরু করলে উমা, সন্ধ্যে অবধি আর উঠলো না।

উমার মা শেষকালে আদরে আবদারে মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে জিগ্যেস করলেন, কি হয়েছে বল্। কাঁদছিস কেন?

ন' বছরের উমা মায়ের বুকে লুটিয়ে পড়লো আবার। কাঁদো-কাঁদো রাগত স্বরে বললে, ও যমদূতকে আমি বিয়ে করবো না।

শ্যামসুন্দর শুনলো। গ্রামসুদ্ধ সকলে শোনালো ওকে, হাসতে হাসতে বললে, হায় রে শ্যাম, কালপেঁচীর মতো মেয়ে উমা, সেও বলে যমদূতকে আমি বিয়ে করবো না।

চেনা-অচেনা কেউ ব্যঙ্গ করতে ছাড়লো না। লজ্জায় অপমানে বাড়ির লোকের সঙ্গেও কথা বন্ধ করলো শ্যামসুন্দর। মুখ তুলে তাকাতেও কষ্ট হতো ওর। রাত্রে ঘুম আসতো না। সারা রাত এপাশ-ওপাশ করতো। লুকিয়ে আয়নায় নিজের চেহারা দেখতো, আর ইচ্ছে হতো চোখ দুটোকে উপড়ে ফেলতে।

শ্যামসুন্দরের মা বুঝতেন। হঠাৎ রাত্রে ঘুম ভেঙে গেল এক দিন, শুনতে পেলেন শ্যামসুন্দর ছট্‌ফট্ করছে বিছানায়। ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে ডেকে তুললেন ছেলেকে, মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, কি হয়েছে তোর? ন' বছরের এক ফোঁটা একটা মেয়ে কি বললে, তাতে কাঁদতে আছে, ছিঃ। সবাই কি সুন্দর হয় নাকি, সুন্দর তো লাখে একটা মেলে। অনেক ভালো মেয়ে নিয়ে আসবো আমি আমার ঘরে।

মা-র সহানুভূতির স্পর্শে সত্যিই কেঁদে ফেললো শ্যামসুন্দর।

কিন্তু হরিধন ঘটক নিজের ছেলের জন্যে পাত্রী যোগাড় করতে পারলেন না। পাঁচ-পাঁচবার সব ঠিকঠাক হয়ে ছেলে দেখতে এসে বিয়ে ভেঙে যায়।

শ্যামসুন্দরের মা বললেন, ভালো ঘর অনেক দেখা হয়েছে, ভালো মেয়ে দেখো। সব চাষা, চামার সব। আমার ঘর চাই না, ভালো মেয়ে চাই।

প্রথম আঘাতটা সয়ে গিয়েছিলো শ্যামসুন্দরের, ভুলেও যেতো হয়তো। কিন্তু তারপরেই এলো আরেকটা আঘাত।

ছাব্বিশ বছর বয়সে বিয়ে হলো শ্যামসুন্দরের। কলমিপুর থেকে মাইল আঠারো দূরের

এক গ্রামে। সত্যিকারের সুন্দরী একটি মেয়ের সঙ্গে। রূপে যৌবনে একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো মেয়ে। হয়তো বংশে কোনো কলঙ্ক ছিলো, হয়তো বা তার বিধবা মায়ের সতীত্বে সন্দেহ ছিলো, তাই বিয়ে হচ্ছিলো না মেয়েটির। তারই সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল শ্যামসুন্দরের, বাসর কেটে গেল। তবু শুভদৃষ্টির পর আর একটিবারের জন্যেও তার মুখ দেখতে পেলো না ও, পেলো না একটা কথারও উত্তর। প্রথম ওকে দেখলো, ওর মুখ দেখতে পেলো বাসররাত্রির শেষে আলো-আঁধারির ভোরে। কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে কাঞ্চনা। সুন্দর মুখখানা নীল হয়ে গেছে, ফেনা জমে আছে ঠোঁটের ফাঁকে ফাঁকে।

লোকে কাঞ্চনার চরিত্রে দোষারোপ করলো। বুড়োরা বললে, প্রণয় যদি ছিলোই কারো সঙ্গে তো বিয়ের আগে বললেই পারতো। বুড়ীরা বললে, যেমন মা তার তেমনি মেয়ে হবে তো।

কিন্তু শ্যামসুন্দর কিছুই বললো না। ও জানে, দোষ কাঞ্চনার নয়।

শুভদৃষ্টির সময় চোখ তুলেই কাঞ্চনা শিউরে উঠেছিলো কেন, তা জানে ও। কাঞ্চনার সমস্ত মুখে কিসের ছায়া পড়েছিলো তা শ্যামসুন্দর দেখেছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কাঞ্চনার সে মুখে হতাশা, আতঙ্ক, ঘৃণার ছায়া কেঁপে উঠেছিলো।

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসের পিছনে পিছনে শ্যামসুন্দরের চোখ ঠেলে জল গড়িয়ে পড়তে চাইলো। মাথার ভেতর অসহ্য এক ঝিমঝিমানি, ভারি-ভারি ঠেকে সমস্ত মাথাটা। অথচ বুকের ভেতরটা যেন একেবারে খালি হয়ে গেছে, অসহ্য এক শূন্যতায় বুক ভেঙে পড়তে চায়। শরীরের সবটুকু শক্তি যেন হারিয়ে গেছে, এতটুকু রক্ত নেই, তেজ নেই।

কাঞ্চনার মৃতদেহের ওপর আছড়ে পড়ে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠেছিলো কাঞ্চনার মা। আর সেই কান্নার ফাঁকে ফাঁকে কয়েকটা কথা কানে এসেছিলো ওর। সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে হয়েছিলো ওর নিজের মুখখানা যেন হঠাৎ চুপ্সে এতটুকু হয়ে গেছে। ঘর থেকে ছুটে পালিয়েছিলো শ্যামসুন্দর। চোরের মতো, খুনী আসামীর মতো ঝোপে ঝোপে লুকিয়ে কাটিয়েছে সারাটা দিন। যত দূরেই হোক, মানুষ দেখলেই ভয় পেয়েছে, পায়ের শব্দে গলার স্বরে চমকে উঠেছে। সমস্ত দিন, অর্ধেক রাত্রি ধরে লুকিয়ে লুকিয়ে মাঠের পর মাঠ পার হয়েছে হেঁটে, আঠারো মাইল দূরের গ্রাম কল্মিপুর, কল্মিপুরে এসে পেঁাছেছে। তবু বাড়ি ঢুকতে পারেনি। এক দিকে লজ্জা আর আত্মগ্লানি, অন্য দিকে প্রচণ্ড ক্ষিদে আর ক্লান্তি। কিন্তু নিজের বাড়িতে ঢুকতেও সাহস হয়নি ওর। সারা রাত বাড়ির চারপাশে ঘুরঘুর করেছে, ছোট্ট এতটুকু একটা মেঠো তিতিরের ডাকে চমকে উঠেছে।

তারপর একসময় ক্ষিদেয় অবসন্ন হয়ে দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলো!

ভোরের দিকে ঘুম ভেঙে গেল ওর। দু কাঁধের ওপর দুটো কোমল স্নেহের স্পর্শে। ওকে ডেকে তুলে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলেন ওর মা। ঘুম ছুটে গিয়েছিলো ওর চোখ থেকে, তবু চোখ বুজে রইলো। চোখ তুলে তাকাতে পারলো না। শুধু অনুভবে বুঝলো, সস্নেহে, সমবেদনার অশ্রু লুকিয়ে মা পাখার বাতাস করছেন এক হাতে, আর অন্য হাতের নরম জ্বালাহর আঙুলগুলো কাঁকুইয়ের মতো ওর রুক্ষ চুলে বিলি দিচ্ছে।

চুপ করে পড়ে রইলো ও, শান্তিতে সান্ত্বনায়। টপ্ করে এক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু পড়লো ওর কপালে, আর সঙ্গে সঙ্গে চোখ চেয়ে তাকালো ও স্নেহ প্রীতি ভালোবাসায় ভরা মুখখানির দিকে। মাকে দু হাতে জড়িয়ে ধরলে, কোলে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

শ্যামসুন্দরের বাবা ইতিমধ্যেই ফিরে এসেছিলেন, সব কিছু শুনেছিলেন শ্যামসুন্দরের মা।

মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন শুধু, তোর আর দোষ কি বাবা। গরিবের ঘরে জন্মেছিস, দুঃখ তো পেতেই হবে।

দিন কয়েক পরে ঐ একই কথা শুনতে পেলো ও। পাশের ঘরে বাবা বলছেন, কপাল গো, সবই কপাল। তা না হলে আমার মতো গরিবের ঘরে জন্ম হবে কেন।

মা বুঝি উত্তর দিলেন, বাপের টাকার জোরে কত কালপেঁচীর বিয়ে ঘটিয়েছো তুমিই কত সোনার চাঁদ ছেলের সঙ্গে, তা কি আর দেখিনি!

শ্যামসুন্দরের বাবাও হয়তো এই আঘাতেই মৃত্যুর দিনটা কাছে টেনে আনলেন। শ্যামসুন্দরের মা তারপরেও দু বছর বেঁচে ছিলেন, কিন্তু ছেলের বিয়ের কথা কোনো দিন ভুলেও মনে আনেননি।

শ্যামসুন্দর মুক্তি পেলো। জমিজমা, বাড়িঘর বিক্রি করে দিয়ে শুধু বাপের লাল খেরো-বাঁধানো খাতাটি নিয়ে চলে এলো কোলকাতায়। রামী ধোপানীর গলির এই মেসবাড়িতে।

সকাল-সন্ধ্যে ঘুরে বেড়াতো এ-বাড়ি থেকে ও-বাড়ি। বগলে ছাতা, হাতে পৌনে এক গজ লম্বা লাল খাতা, আর পায়ে চটি। এই নিয়ে সারা শহর টহল দিয়ে বেড়াতো হেঁটে হেঁটে। হয়তো অত্যধিক লম্বা আর রোগা চেহারার জন্যে, হয়তো বা সম্ভবের অতিরিক্ত হাঁটার ফলেই একটু কুঁজো হয়ে পড়লো ও। এমন এক বিচিত্র চেহারা হলো যা দু শো গজ দূর থেকে দেখেও চেনা যায়। খ্যাতি আর প্রতিপত্তি দুই-ই জুটলো, সঙ্গে সঙ্গে একটা উপাধিও। কালা ঘটক। শ্যামসুন্দর নামটাও অনেকে ভুলে গেল।

কিন্তু প্রতিপত্তি যা বাড়লো তা শুধু পোস্ট আপিসের খাতায়, সেভিংসের পাস-বইয়ে। ঐ পচা নোংরা মেসবাড়িটা ও বদলালো না। পোশাক-পরিচ্ছদেও এলো না কোনো পারিপাট্য। ওসবে বুকের গভীরের ক্ষতচিহ্নটা হয়তো লুকোনো যায় অপরের চোখের আড়ালে, কিন্তু নিজের কাছ থেকে নিজেকে লুকোবে কি করে! কালো কারে বাঁধা চ্যাপটা দোয়াত আর শরের কলমটাকে শুধু বিদায় দিলো ও। একটা কমদামী ভাঙা ফাউণ্টেন পেন, মাথার হারানো ক্যাপটার বদলে মোটা কণ্ঠি ফোঁপরা করে নিয়ে কাজে লাগানো। এ ছাড়া আর কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না। না চেহারায়, না ব্যবহারে।

এই পচা নোংরা গলির ভাঙা মেসে থাকার অবশ্য একমাত্র কারণ ওর কার্পণ্য নয়। আর-আর বাসিন্দেরা হয়তো তাই ভাবতো! আসলে যেতে আসতে গলির মুখে চোখ পড়তো রামীর ওপর। বছর পনেরো বয়সের ধোপাদের মেয়ে রামী, গোলগাল টুলটুলে মুখ, মিষ্টি দুখানি ডাগর চোখ মেলে তাকাতো রামী। আর সেটুকু দেখবার লোভেই মেস বদল করতো না শ্যামসুন্দর। কিন্তু এই টুকরো ভালো লাগাও ওর কপালে ছিলো না বোধ হয়। প্রতি দিন সকালে আর সন্ধ্যায় একবার করে রামীকে দেখতে পাওয়ার, দেখা পাওয়ার অধিকার ছিলো এ গলির সবারই, সব বাসিন্দেরই!

সমস্ত দিনের মধ্যে একটি মাত্র রোমশিহরন। শুধু দৃষ্টির রোমাঞ্চ।

তবু। তবু মাঝে মাঝে অব্যক্ত এক ব্যথার দীর্ঘশ্বাস ফেলতো ও। হাহাকার ঠেলে উঠতো বুক থেকে। একটি নারীর সঙ্গ-কামনার স্বপ্ন আঁকতো সারা রাত। একটি নিটোল মুখ, একটি কমনীয় কোমল শরীরের স্পর্শ পাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠতো ও কখনো-সখনো।

কাজের মধ্যে তৃপ্তি খুঁজতো শ্যামসুন্দর। তৃপ্তির আবেশে কাজ ভুলে যেতো।

লম্বা খেরোর খাতায় হাজারো পরিবারের খুঁটিনাটি লিখে রাখতো, কত কত ছেলে আর মেয়েদের নানান বৃত্তান্ত। আর, আর বিবাহযোগ্যা কন্যাদের নাম ধাম ঠিকুজির পাশে পাশে এঁটে রাখতো তাদের ফটো।

কোনো কোনো রাতে মোমবাতি জেলে খাতা লিখতে লিখতে হঠাৎ কখনো হয়তো থেমে যেতো শ্যামসুন্দর। কোনো একটি ফটোর দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকতো! আবার হয়তো পাতা উলটে প্রত্যেকটি ফটো খুঁটিয়ে দেখতো লোভাতুর চোখে, অদ্ভুত এক রসরোমন্থনের আনন্দে।

শুধু কি ছবি! রক্তমাংসের শরীরের ছোঁয়া নিতেও কসুর করতো না, তৃপ্তির স্পর্শ নিতো নানা অছিলায়।

ঘন ঘন যাতায়াতে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে হয়তো কোনো পরিবারের সঙ্গে। সপ্তদশী কি অষ্টাদশী যুবতী কন্যার সঙ্গে রসিকতা করে জিগ্যেস করেছে, কি চাস রে খুকী, ঘর চাস, না বর চাস?

খুকী হয়তো লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে গেছে, কিংবা তেমন তুখোড় মেয়ে হলে বলে উঠেছে, দুই-ই চাই। আর অমনি তার হাতে চিমটি কেটে বা চিবুকে হাত দিয়ে ও বলে উঠেছে, ভারি তো রূপ—দুই-ই চাই। নির্জনে পেলে দু-একটা আধা-অশ্লীল প্রশ্নও করতে

ছাড়েনি শ্যামসুন্দর। জিগ্যেস করেছে, বরের চেহারা কেমন হবে শুনি? ইয়া ষণ্ডাগুণ্ডা ষাঁড়ের মতো, না কচি বকনা বাছুরের মতো?

আর এ প্রশ্নেও যদি উত্তর এসেছে, 'রাজপুত্তুরের মতো', তো চট করে হাত বাড়িয়ে তার নরম হাতখানা ধরে ফেলেছে শ্যামসুন্দর, টিপে টিপে দেখেছে কনুই অবধি নরম আর সুগোল মসৃণ হাতখানা। বলেছে, ইঃ, এমনি শক্ত খটখটে হাত, রাজপুত্তুর বিয়ে করবে! পছন্দ করবে কেন শুনি? তারা নরম তুলতুলে শরীর না হলে বিয়ে করতে রাজীই হবে না।

অপর কারো হাতটা কাছে টেনে নিয়ে চিমটি কেটে বলেছে, দেখি লাল টুকটুকে হয় কি না, রঙটা যে নকল নয় তা জানতে হবে তো আগে।

মেয়েরা হেসেছে, কৌতুকে গড়িয়ে পড়েছে। কেউ বা হয়তো লজ্জায় অধোবদন রয়ে গেছে। তবু এইটুকু স্পর্শসুখ, এই ক্ষণরোমান্সের মধ্যে আনন্দ পেয়েছে শ্যামসুন্দর। এতটুকু রোমশিহরনেই সন্তুষ্ট থাকতে চেষ্টা করেছে।

কিন্তু এই রসিকতা আর কৌতুকের ফাঁকে কেউ হয়তো প্রশ্ন করেছে, আচ্ছা ঘটকমশাই, আপনি বিয়ে করেননি কেন?

হেসে হালকা হয়েছে শ্যামসুন্দর।—করিনি, কি হবে বিয়ে করে।

কেউ ব্যঙ্গের স্বরে বলেছে, উঁহু। নিশ্চয়ই আপনার যোগ্য রূপসী মেয়ে পাননি, তাই।

শ্যামসুন্দর হেসে উঠেছে হো-হো করে।

হয়তো শ্যামসুন্দরেরই কোনো অশিষ্ট প্রশ্নের উত্তরে, অন্য কেউ হাসি চাপতে চাপতে প্রশ্ন করেছে—আচ্ছা ঘটকমশাই, আপনি কখনো প্রেমে পড়েছিলেন বুঝি?

আরেকজন জুড়ে দিয়েছে, জানিস না বুঝি? ঘটকমশাই মেয়েটার প্রেম প্রত্যাখ্যান করায় মেয়েটা আত্মহত্যা করে, তাই তার দুঃখুতে ঘটকমশাই আর পাণিগ্রহণ করেননি কারো।

মেয়েরা হেসেছে, হেসে লুটোপাটি খেয়েছে, আর শ্যামসুন্দর যোগ দিয়েছে সে হাসিতে। কিন্তু কেউ লক্ষ করে দেখেনি, শ্যামসুন্দরের সশব্দ হাসির পিছনে কতখানি ব্যথার বাষ্প লুকিয়ে আছে।

হ্যাঁ। ব্যথা আর বেদনার অশ্রু টলমল করে ওর ঘোলাটে রক্তচক্ষুর কোণে। ওর ফাঁকা আর ফাঁপা বুকে শুধু দীর্ঘশ্বাস থমকে আছে। তবু একটা দিনের জন্যে, একটি মুহূর্তের জন্যেও তো একবার রোমে রোমাঞ্চ জেগেছিলো ওর!

সেদিনের কথা মনে পড়লে অসহ্য একটা ব্যথা মোচড় দিয়ে ওঠে ওর বুকে। সারা রাত বিছানায় ছটফট করে কাটাতে হয়। ঘুম নামে না শ্যামসুন্দরের চোখে। শুধু স্বপ্ন দেখে, কল্পনার ডানা মেলে উড়ে যেতে ইচ্ছে হয়।

শুধু একটি দিন। ক্লান্তিময় দিনের গায়ে একটি মাত্র স্নিগ্ধ সকাল যেন। রাঙতায় মোড়া রাতের মতো উজ্জ্বল আর রোমাঞ্চমধুর। অতিরোমন্থনে তাও যেন মিলিয়ে গেছে স্বপ্ন হয়ে। শুধু একটা ভুলে-যাওয়া গানের রেশ বেজে ওঠে ওর কানের পাশে, থেমে-যাওয়া নৃত্যনূপুর বুঝি বা বুলি বুলোয় থেকে থেকে।

তখন সবে এ শহরের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে শ্যামসুন্দরের। গলিঘুঁজি হালচাল তখনো ঠিকমতো জানা হয়নি। লাল শালুতে বাঁধানো লম্বা খাতাখানার মাত্র কয়েকটা পাতায় কালির আঁচড় পড়েছে।

মালার মতো সরু মরাগাঙের বুকে ছোট্ট একটা সাঁকোর মতো ব্রিজ, পার হবার আগেই ডান দিকে একটা গলি। প্রস্থে স্বল্প হলেও দৈর্ঘ্যে সীমানা নেই। কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে কে জানে। গঙ্গার ধারে ধারে এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে রাস্তাটা। ছোট আঁকাবাঁকা রাস্তা, জলে কাদায় নোংরা হয়ে থাকে সর্বক্ষণ, পিচের আবরণ আছে কি নেই বোঝা-ই যায় না। মাঝে মাঝে খোলা হাইড্রেণ্ট থেকে ফুটন্ত কেৎলির মতো জল উছলে পড়ছে অনর্গল, দু-চারটে কাদামাখা মোষ আর ঠেলাগাড়ি বেওয়ারিশের মতো পড়ে পড়ে রোদ পোয়াচ্ছে। গঙ্গার ধারে ইটের পাঁজা, চুন-সুরকির দোকান। বাঁশ কাঠ আর করগেটের গুদাম। রাস্তার এপারেও কয়েকটা টিনের শেড, তারপর বাখারি দিয়ে ঘেরা একটা বস্তি—ছিটেবেড়ার দেয়াল, লম্বা গেলাসের মতো মেঠো টালির ছাদ।

বগলে ছাতা আর হাতে খাতা নিয়ে হনহন করে হেঁটে চলেছিলো শ্যামসুন্দর। হঠাৎ,

কোথাও কিছু নেই, নামলো তুমুল বৃষ্টি। মেঘে মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল। শেষ-ভাদ্রেই কাঁচা সোনার রোদ মুছে গেল হঠাৎ, বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ঝরনার তোড়ে শুরু হলো ধারা-বর্ষণ। আর ঝড়। এদিকে প্রবল বৃষ্টি, অন্য দিকে ঝড়ের দাপট। তার উপর বিদ্যুতের চমক আর মেঘের নিনাদ। ছাতাটা খুলে কয়েক পা এগিয়েছে শ্যামসুন্দর, অমনি দমকা বাতাসে ছাতাটা হলো হাতছাড়া। রাস্তার পাশেরই একটা খোলা দরজার দিকে ছুটে গেল শ্যামসুন্দর। সঙ্গে সঙ্গে কাদায় পিছলে গিয়ে পড়লো একেবারে মেয়েটির গায়ের ওপর। তার আগে হয়তো লক্ষও করেনি শ্যামসুন্দর, নরম গলার ধমক শুনে চোখ তুলে তাকালো। সুসজ্জিতা একটি মহিলার গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে ও, এ কথা বুঝতে পেরে অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো শ্যামসুন্দর। কিন্তু তার আগে চিৎকার শুরু হয়ে গেছে। ভীত সন্ত্রস্ত চোখে ক্ষমা চাইবার চেষ্টা করলে শ্যামসুন্দর। কিন্তু প্রৌঢ়াটির চিৎকার যেন আরো বেড়ে গেল। লোক জমা হয়ে গেল ক্রমশ। তারপর, তারপর আর বিশেষ কিছু মনে পড়ে না শ্যামসুন্দরের। শুধু প্রচণ্ড প্রহারের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে কাতর অনুনয়-বিনয় করেছিলো ও, হাতে পায়ে ধরেছিলো প্রত্যেকের। কিন্তু এতটুকু দয়াও কেউ দেখায়নি। কপালের রক্ত লেগেছিলো ওর হাতে, আর সেই রক্ত দেখেই সংবিৎ হারিয়ে ফেলেছিলো ও।

জ্ঞান হওয়ার পর চোখ মেলে তাকিয়েই দুটি ব্যথাকাতর সজল চোখ দেখতে পেলো শ্যামসুন্দর। সমস্ত শরীরে ওর অসহ্য যন্ত্রণা, মাথাটা ভার-ভার। কপালে হাত দিয়ে দেখলে কাটা জায়গাটা কাপড় দিয়ে বাঁধা। বিস্ময়ে চোখ মেলে তাকালো শ্যামসুন্দর।

একটি সুন্দর মুখ। চিকন কালো মুখ, নিটোল গালে লাবণ্যের আভা। আর সেই নিকষ কৃষ্ণছায়ার মাঝে দুটি গভীর কালো চোখের মাধুরী। বেদনার্ত, স্নেহস্নিগ্ধ। আরো ভালো করে তাকিয়ে দেখলে শ্যামসুন্দর, অনুভবের দৃষ্টিতে তাকালো। সাদা ধবধবে একটা শাড়ি পরেছে মেয়েটি, কালো দেহের কালিমা যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আরো। তবু কি প্রশান্তি, কতখানি মুগ্ধ মমতার আবেশ ঐ চোখে।

মাথার কাছে বসে পাখা নেড়ে বাতাস করছিলো মেয়েটি।

শ্যামসুন্দর বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে প্রশ্ন করলে, তুমি—তুমি কে?

স্নিগ্ধ বিষণ্ণ হাসির সঙ্গে উত্তর দিলো মেয়েটি, অত্যন্ত সহজ স্বরে।—আমি রাঙি। মাথায় ব্যথা লেগেছে আপনার? যন্ত্রণা হচ্ছে?

অভিভূতভাবে শ্যামসুন্দর বললে, না তো!

আবার সেই সুমিষ্ট হাসি হাসলে মেয়েটি। শ্যামসুন্দরের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বাঁ হাতের আঙুলগুলো ওর চুলের ভেতর নাড়াচাড়া করতে করতে বললে, চোখ বুজুন, চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করুন। কিছু হয়নি, এখনি সেরে যাবে।

সত্যিই চোখ বুজলো শ্যামসুন্দর। রাঙির প্রত্যেকটি কথা যেন আদেশ মনে হলো ওর কাছে। চোখ বুজে পড়ে রইলো ও, জীবনে এতখানি আরাম বুঝি কখনো পায়নি।

একসময় শ্যামসুন্দর অনুভবে বুঝলে, রাঙি উঠে গেল।

ক্ষণপরেই ফিরে এলো আবার। পায়ের শব্দে টের পেলো শ্যামসুন্দর। তবু চোখ খুললে না।

—নিন, এই দুধটুকু খেয়ে নিন।

কাঁধের ওপর একটা নরম হাতের স্পর্শও পেলো।

চোখ চেয়ে রাঙির হাত থেকে বাটিটা নিয়ে এক চুমুকে দুধটা খেয়ে ফেললে ও। তারপর বালিশে ভর দিয়ে একটু উঠে বসে তাকালে রাঙির দিকে, আর সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলো শ্যামসুন্দর।

শাড়ি নয়। শাড়ি বলে ভুল হয়েছিলো ওর। কালো পাথর কুঁদে তৈরী একটি ছোট-খাট অপূর্ব দেহ, চোখে মুখে পনেরো বছরের মেয়ের সরলতা। অমন কমনীয় রূপ, শরীরের এমন কোমলতা এর আগে বুঝি বা চোখে পড়েনি শ্যামসুন্দরের। অনেক বনেদী ঘরের রূপসী কন্যার যৌবন চোখে পড়েছে শ্যামসুন্দরের, দেখেছে অভিজাত তরুণীর রেশমাবৃত দেহের প্রসাধন। চোখ ঝলসে দেবার মতো সৌন্দর্য দেখেছে ও, দেখেছে নববধূর চন্দন-

চিত্রলেখার মাধুর্য। কিন্তু এমন নিবিড় স্নিগ্ধতা দেখেনি।

তবু। তবু, ওর দেহ ঘিরে সাদা ফুটফুটে থান কাপড়খানা যেন এ রূপকে ব্যঙ্গ করছে। ওর ওই বৈধব্যের শুচিতা যেন সমস্ত রূপ হরণ করে নেবার জন্যে ব্যগ্র। তন্ময় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো শ্যামসুন্দর।

—এখন আর তেমন কষ্ট হচ্ছে না, না? মৃদু হেসে রাঙি প্রশ্ন করলে।

—না। শ্যামসুন্দর মাথা নাড়লে।

—তা হলে কাপড়টা বদলে ফেলুন। ভিজে চপচপ করছে, তা ছাড়া রক্ত কাদা লেগে একেবারে বিচ্ছিরি হয়ে গেছে।

একখানা ধুতি রেখে দিয়ে বেরিয়ে গেল রাঙি। বেশ কিছুক্ষণ পরে ফিরে এলো একটা গেঞ্জি হাতে নিয়ে।

জামাটাও বদলে ফেললে শ্যামসুন্দর। ভিজে ময়লা জামা আর কাপড়খানা তুলে নিয়ে রাঙি বললে, ওরা কি মানুষ, না কি বলুন তো? শুধু শুধু আপনাকে...

বিষণ্ণ হাসি হাসলে শ্যামসুন্দর।—তুমি না থাকলে...

কি যেন বলতে গেল শ্যামসুন্দর, তার আগেই রাঙি বলে উঠলো, ও কি, উঠলেন কেন?

শ্যামসুন্দর বললে, অনেক তো করেছো, আর কষ্ট দেবো না। যাই...

—কষ্ট? জলে ভিজে গেল ওর চোখের কোণ দুটো।—একটা মানুষকে মিছিমিছি একদল গুন্ডা এসে মারবে আর—কথা শেষ করতে পারলো না ও, গলার স্বর আটকে গেল, গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়লো কয়েক ফোঁটা অশ্রু। কাপড়ে চোখ মুছে বললে, না, না, এত রাতে যাওয়া হবে না, কাল যাবেন।

রাঙির চোখে জল দেখে শ্যামসুন্দরের চোখেও জল এলো। অনেকক্ষণ মাথা নীচু করে থেকে বললে, রাত হয়ে গেছে নাকি? আর সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ করলে, দিনের আলো নেই, লণ্ঠনের আলো কাঁপছে ঘরের কোণে। আর জানালার ওদিকে ঘন অন্ধকার, অবিশ্রান্ত বৃষ্টির শব্দ। বিদ্যুৎ চমক দিচ্ছে মাঝে মাঝে।

রাঙি ঠোঁট টিপে হাসলে। চোখ তখনো ছলছল করছে ওর। চোখের জল চাপা দেবার জন্যে হয়তো হঠাৎ খিলখিল করে সশব্দে হেসে উঠলো ও।

—কি, হাসছো যে?

কাপড়ের এক প্রান্তে মুখ লুকিয়ে কৌতুকের চোখে রাঙি প্রশ্ন করলে, বউ ভাবছে বুঝি? তাই ছটফট করছেন বাড়ি যাবার জন্যে, না?

শ্যামসুন্দর হাসলো, দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

তারপর ধীরে ধীরে বললে, মা মারা যাবার পর এই তোমার কাছেই প্রথম সেবা পেলাম, সহানুভূতি পেলাম। মনে হচ্ছে, ওদের কাছ থেকে পাওয়া এত লজ্জা, এত অপমান, সব যেন সার্থক হয়েছে। আমি যদি অজ্ঞান হয়ে পড়ে না থাকতাম তা হলে...

বিস্ময়ের চোখে তাকিয়ে রইলো রাঙি।—বিয়ে করেননি আপনি?

আত্মবিদ্রূপের হাসি হাসলো শ্যামসুন্দর। বললে, চেহারাটা দেখতেই পাচ্ছো, মেয়েরা আমাকে দেখলে ভয় পায়, ছেলেরা ঘৃণায় কাছে আসে না। তা ছাড়া গরিবের ছেলে আমি, না আছে ভদ্রগোছের চেহারা, না আছে টাকাকড়ি। আর গুণের মধ্যে তো জানি শুধু ঘটকালির বিদ্যে। কে বিয়ে করবে আমাকে?

—সে কি, নিজে বিয়ে দিয়ে বেড়ান পৃথিবীসুদ্ধ লোকের, আর... কথাটা বলতে গিয়েই থেমে গেল রাঙি। ভাবলে, কথাটা বলা হয়তো উচিত হবে না।

শ্যামসুন্দর শুধু হাসলো।

সে রাত্রে কিন্তু চলে আসতে পারলো না ও। আরো অনেক রাতে ফিরে এলেন রাঙির বাবা। বৃদ্ধ। কাঁচাপাকা চুলের রাশ মাথায়। মুখে একটা সৌম্য ভাব। কাঁধে চাদর আর চোখে পুরু কাচের চশমা। চটির শব্দে সচকিত হয়ে তাকালো শ্যামসুন্দর।

রাঙি বললে, দেখেছো বাপী। কপালটা একেবারে ফেটে গিয়েছে, দেখোনি তো, জামাটা রক্তে লাল হয়ে গেছে। আবার যেন চোখ ছলছল করে উঠলো রাঙির।

রাঙির বাবাও সহানুভূতির স্বরে বললেন, বেশ করেছিস মা, যেতে দিসনি ভালোই

করেছিস। এই অবস্থায় কি কাউকে যেতে দেওয়া যায়।

শ্যামসুন্দরকে বললেন, আজকের রাতটা থেকে যাও বাবা, এ তো তোমারই বাড়ি। বাড়ি-ঘর কি আর আলাদা আলাদা হয়, সুবিধের জন্যে আমার বাড়ি তোমার বাড়ি করে ভাগ করা হয়েছে। আসলে সব বাড়িই তো সকলের বাড়ি। লজ্জাই বা কিসের, আপত্তিই বা কেন?... কিন্তু রাঙি, তুইও আশ্চর্য লাগিয়ে দিলি আমায়...কি বলো বাবা?—এক ফোঁটা মেয়ে তুই এত সব একা একা করলি? সস্নেহে আত্মগর্বে মেয়ের মাথায় হাত রাখলেন।

রাঙি লজ্জায় আনন্দে মাথা নীচু করে রইলো।

—ভগবান শুধু তোর দাম বুঝলো না মা।

—তুমি খাবে চলো, রাত হয়েছে অনেক। রাঙি বললো।

তারপর। তারপর সেই নিঃশব্দ রাত। বাইরে অবিরল বৃষ্টির রিমঝিম। দু-একটা বজ্রপাত, ঘন ঘন বিদ্যুতের চমক। গভীর রাতের জমাট অন্ধকারে ঢাকা একটি বিচিত্র রাত্রি। আর সেই রাতের বুকে এক নিঘুম ক্লান্তি। দুটি নরম পায়ের হালকা আওয়াজ। কাপড়ের খসখসানি। একটি ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শ। অন্তরঙ্গ দেহালাপ।

তারপর অন্ধকারের বুকে একটি কোমল কণ্ঠের ফিসফিসানি।

—একটা কথা মনে রাখবেন?

—কি?

—সব মেয়ে আপনাকে ভয় পায় না। সব মেয়ে আপনাকে ঘৃণা করে না।

এর পর শ্যামসুন্দরের নিজেরই দীর্ঘশ্বাস।

—আরেকটা অনুরোধ।

—কি?

—আর কোনো দিন আসবেন না।

বিস্ময়!

চিরকাল এ এক বিস্ময় শ্যামসুন্দরের কাছে। বুঝতে পারেনি, বুঝতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভাঙেনি ও। কোনো দিন এ পথে আর আসেনি শ্যামসুন্দর। জীবনে একটি মাত্র মধুর দিন এসেছিলো, একটি মাত্র রোমাঞ্চশিহরন। ওর আকাশে রামধনু রচনা করেছিলো যে, এক দিনও তার অনুরোধ উপেক্ষা করতে ইচ্ছে হয়নি শ্যামসুন্দরের।

রাঙির বাবা বিহারীবাবু ঠিকানা নিয়ে রেখেছিলেন শ্যামসুন্দরের। মাঝে মাঝে এসেছেন তিনি রামী ধোপানীর গলির এই মেসবাড়িতে। দেখাসাক্ষাৎ করে গেছেন, অনুরোধ জানিয়েছেন শ্যামসুন্দরকে যাবার জন্যে, কিন্তু রাঙির কথা মনে পড়তেই চুপ করে গেছে ও, বিহারীবাবুর প্রশ্ন এড়িয়ে গেছে।

তারপর বিহারীবাবুর আসা-যাওয়ায় যতি পড়েছে একসময়। কাজের নেশায় ডুবে গেছে শ্যামসুন্দর, অর্থোপার্জনের নেশায় বিভোর হয়ে দিন, মাস, বছর কেটে গেছে।

বছর তিনেক পরে হঠাৎ এমন একটা অঘটন ঘটবে শ্যামসুন্দর জানতো না।

এই ছোট গলিটা খুঁজে বের করেছিলো ও পথ সংক্ষেপ করবার জন্যে। ছোট সরু গলি, একটা বাড়ির দেয়ালে পিঠ ঘষতে ঘষতে যেতে হয়। মাঝখানে খানিকটা ফাঁকা জায়গা, তিন পাশে ছোট ছোট কয়েকখানা বাড়ি, আর ভাঙা পাঁচিলটা পার হলেই বড় রাস্তা।

প্রতি দিনই এ পথ দিয়ে যেতো ও। বগলে ছাতা, হাতে খেরোর লাল খাতা, আর পায়ে চটি।

হঠাৎ পিছনে পিছনে একটি ছোট্ট ছেলে দৌড়ে এলো।—ও মশাই, ও মশাই।

সেদিনও হনহন করে হেঁটে যাচ্ছিলো ও।

চমকে ফিরে দাঁড়ালো শ্যামসুন্দর।

—আপনাকে ডাকছে যে! ভয়ে ভয়ে ছেলেটি বললে।

সন্ত্রস্ত চোখে তাকালো ও।—কে?

—ঐ ও-বাড়ির রাঙিমাসীমা।

—কে? কে রাঙিমাসীমা? নামটা ভুলে যায়নি ও, কিন্তু ঠিক এই পল্লীতে রাঙিকে হয়তো আশা করতে পারেনি। তাই, ভেবেছিলো কেউ হয়তো ছেলেমেয়ের বিয়ের জন্যেই ওকে ডাকছে।

ছেলেটির আঙুল লক্ষ করে চোখ ফেলতেই রাঙিকে দেখতে পেলো ও। ভিজে ভাঙা কপাটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে রাঙি। কপাল অবধি ঘোমটায় ঢাকা।

কাছে এগিয়ে এলো শ্যামসুন্দর। রাঙির চোখ যেন ওকে হাতছানি দিচ্ছে। ঘোমটাটা আরো একটু টেনে দিয়ে ঘরে ঢুকলো রাঙি, পিছনে পিছনে শ্যামসুন্দরও। আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলো ও, ভেবেছিলো রাঙি হয়তো ভুলে গেছে, একটি রাত্রের ভুল মুছে ফেলেছে ওর জীবন থেকে।

শ্যামসুন্দরের মনে হলো রাঙি যেন অনেক বড় হয়েছে, বয়েস বেড়ে গেছে যেন বছরের হিসেব পার হয়েও। সেই শুচিশুভ্র বৈধব্যের বেশবাস তুচ্ছ করে কোথায় যেন একটা প্রাচুর্যের ছন্দ দোল খাচ্ছে।

চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে পড়েছিলো শ্যামসুন্দর। ভাবছিলো, তন্ময় হয়ে কি যেন ভাবছিলো। হঠাৎ একটা শব্দে চোখ তুললে। পরক্ষণে বিস্ময়ে চমকে উঠলো ও।

রাঙি। ফিরে এসে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে রাঙি। কোলে তার একটি বছর দুয়েকের ছোট্ট শিশু। মিটিমিটি ঠোঁট টিপে হাসলো রাঙি। মাতৃত্বের স্নেহে আঁকড়ে ধরলো ছেলেকে।

আশ্চর্য।

হঠাৎ যেন একটা ধাক্কা খেলো শ্যামসুন্দর। এত কুৎসিত, এমন বীভৎস চেহারার কোনো শিশু ও দেখেনি এর আগে।

পুরোনো দিনের কয়েকটা দৃশ্য ভাসা-ভাসা মনে পড়লো। চোখের সামনে ফুটে উঠলো না, মনের কোণে উঁকি দিলো না কোনো স্পষ্ট আভাস। তবু, ভালো-লাগা আর ভুলে-যাওয়া কোনো গানের সুরের মতোই অনুভূতির তারে কি এক ক্ষীণ অনুরণনের রেশ যেন। রাঙি। সেই মুগ্ধ আর মোলায়েম চোখ, সেই অশ্রু-টলমল নিটোল মুখের নিকষ কৃষ্ণতা, শীর্ণকটি শরীরের প্রতিটি রেখাতরঙ্গে যৌবনের পূর্ণিমা। হ্যাঁ, ঠিক তেমনি স্নিগ্ধসুন্দর। হয়তো বা আরো সুপ্রকাশিত, আরো স্বতঃসম্পূর্ণ।

কিন্তু ঐ শুচিশুভ্র বৈধব্যের শ্বেতাবরণ, ঐ অপার্থিব রূপকে যেন ব্যঙ্গ করছে একটি কুৎসিত শিশুর মসীময় কৃষ্ণাঙ্গ।

প্রথম দৃষ্টিতেই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠলো শ্যামসুন্দর। শৈশবের আয়নায় নিজেকে দেখলো যেন ও। মুখে চোখে আকস্মিকতার ছায়া নেমেছিলো ওর, সেটুকু চাপা দেওয়ার জন্যে মুখে হাসি আনলো। রাঙির স্মিতহাস চোখের পাতা বুজে এলো, ঠোঁট টিপে খুশিতে হেসে উঠলো ও।

একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো শ্যামসুন্দর।

ক্রমশ। ক্রমশ শ্যামসুন্দরের মনে হলো—না, কুৎসিত নয়, এ শিশুও সুন্দর। ওকে কোলে নেবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠলো শ্যামসুন্দরের হাত দুটো, চঞ্চল হয়ে উঠলো ও।

অনেকগুলো ঘটনা পর পর মনে পড়ে গেল শ্যামসুন্দরের। মনে পড়ে গেল, ও নিজে কুৎসিত, ওর বীভৎস চেহারা দেখে ছেলে-মেয়েরা ভয় পায়। 'ঐ অপয়াটার কাছে ছেলে নিয়ে যেতে হবে না' : 'ঐ ভালুকের মতো চেহারা দেখলে ভয় পাবে না এক ফোঁটা মেয়ে'! না, অনেকবার প্রতিজ্ঞা করেছে শ্যামসুন্দর, প্রতিজ্ঞা ভুলে যাওয়ার জন্যে আঘাত পেয়েছে প্রতিবারই। আর ভুল হবে না, ভুলে যাবে না ও।

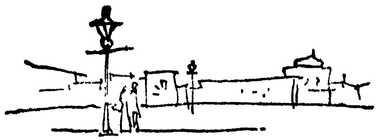
কিন্তু, এ যে ওর নিজের ব্যর্থ জীবনের একমাত্র রোমাঞ্চময় সৃষ্টি। কোলে নেবে না? বুকে টেনে নেবে না ওর প্রাণাংশকে, স্মৃতিচিহ্নকে!

নিজের অজান্তেই হাত বাড়ালে শ্যামসুন্দর। শিশুকে কোলে নেবার জন্যে হাত বাড়ালে। আর সঙ্গে সঙ্গে প্রগল্‌ভ হাসিতে খিলখিল করে কৌতুকে গড়িয়ে পড়লো ছেলেটি। তারপর, তারপর ছোট ছোট দুটি নরম হাত বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো শ্যামসুন্দরের কোলে। আনন্দে উন্মাদনায় সশব্দে হেসে উঠলো শ্যামসুন্দর, সজোরে আঁকড়ে ধরলো। সবল আর দৃঢ় আলিঙ্গনে বুকে জড়িয়ে ধরলো।

এ যেন স্বপ্ন দেখছে শ্যামসুন্দর, কল্পনার রঙে রামধনু আঁকছে যেন। বিশ্বাস হয় না, বিশ্বাস হবার নয়।

ওর চোখের হাসি ধীরে ধীরে রাঙির চোখে তৃপ্তির শিহরন দিলো। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সে, শ্যামসুন্দরের তৃপ্তিময় চোখের দিকে, আপন সন্তানের দিকে।

[১৩৫৭



বাসুকি বসুন্ধরা

নাম জানতো না ওরা। তাই নাম একটা তৈরি করে নিয়েছিলো। বধূমাতা। কেউ বা অপভ্রংশ করে বলতো, বউমা! অবশ্য অন্তরঙ্গ আলোচনায়। আলাপে উল্লেখে তন্ময় হয়ে যেতো সবাই। কখনো বা উচ্ছ্বসিত। এমন মিঠে সৌন্দর্য, মোহ জড়ানো হাসি। নিলাজ চাপল্য, অশঙ্ক চলন। দেহ আর দেহবাস সমান ছিমছাম, আভিধানিক অর্থে সত্যিকারের তন্বী। ফিতেপাড়ের ক্ষুদে ঘোমটা থাকে কি থাকে না। চকিত-চাঞ্চল্যে তখনই খসে পড়ে, তখনই টেনে দেয়।

ট্রাম ডিপোর সামনেই একটা স্টপ! কৃষ্ণচূড়ার ছায়ায় ভেজা টালির ছাউনি। গুমটি-ঘর। নানান মানুষ, মানানসই শাড়ি-জ্যাকেটের কত না মেয়ে। আসে যায়, থমকে থামে। কেউ ছোটাছুটি করে, কারো হয়তো প্রতীক্ষার পদচারণ। কত লোক আসে, কত লোক যায়। তবু চোখ পড়ে না।

সকালে, ন'টা প'য়ত্রিশ মিনিটে এসে দাঁড়ায় ও। প্রতি দিনের মতো।

আর সংযত সমস্বরে ওরা বলে ওঠে, বধূমাতা!

চঞ্চল হয়ে উঠি, চোখ বাড়াই। ওকে দেখবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠি আমিও।

গুমটিঘরের সামনে, ট্রাম লাইন আর পিচের রাস্তা পার হয়েই একটা চায়ের দোকান। গুমটিঘরের মুখোমুখি। মুখোমুখিই বসে ওরা এই দোকানটায়। আড্ডা, তর্ক, মীমাংসা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়। ফুটপাতের পথচারী আর অপেক্ষমাণা ট্রাম-যাত্রিণীদের সম্বন্ধে দু-চারটে টীকাটিপ্পনী। হাসাহাসি, রসিকতা নিজেদের মধ্যেই। লঘু দৃষ্টি ছুঁড়ে দেয় সকলের দিকেই। সিনেমার ছবির মতো প্রতি মুহূর্তে মিলিয়ে যায়, মুছে যায় মন থেকে। সমস্ত দিনের মধ্যে শুধু একটি আনন্দঘন মুহূর্ত। ন'টা প'য়ত্রিশ মিনিট। এ ছবি মোছে না, এ ছাপ স্পষ্ট!

এতদিন শুনেই আসছি ওদের কাছে। ওদের উদ্‌ভ্রান্ত বর্ণনায় বধূমাতার ছবি এঁকে নিয়েছিলাম নিজের মনে। এতদিনে সুযোগ ঘটলো। দেখলাম চোখ চেয়ে, নিজের চোখে দেখলাম।

না, মুখটা তখনো দেখতে পাইনি। ছোটখাট হালকা চেহারা, সাদা ধবধবে শাড়ির প্রান্তে ইঞ্চিখানেক চওড়া রুপালী পাড়, ভেলভেটের মতো পালিশ করা। বাঁ কাঁধ থেকে দুলছে একটা গাঢ় নীল রঙের চামড়ার ব্যাগ। বাঁ হাতে ঝুলছে পাট-করা আসমানী রঙের ওয়াটার-প্রুফ। ফিকে নীল, গাঢ় নীল। ছোঁয়া লেগে কিংবা ছায়া লেগে রুপালী পাড়েও কেমন একটা নীলাভা। চোখের তারাতেও হয়তো দেখা যেতো।

কিন্তু মুখ দেখিনি তখনো। চোখ দেখতে পাইনি।

খুটখুট করে হালকা পায়ে এগিয়ে এলো ও। গ্রীসিয়ান মূর্তির পায়ে যেমন দেখা যায় তেমনি লাল সবুজ সাদার রঙ মেশানো স্ট্র্যাপবাঁধা স্যান্ডেল ওর পায়ে। একটু খাপছাড়া, একটু বেশী উজ্জ্বল। হয়তো চোখকে পায়ে নোয়াবার জন্যেই। কে জানে। কিন্তু, প্রয়োজন হয়তো ছিলো না। এমনিই শ্রদ্ধায় নুয়ে পড়ে।

—সহেলী? কি ভাষায় কথা বলছিস? ওরা প্রশ্ন করে।

অভিভূত ভাবটা কেটে যায়।

টালির ছাউনিটার নীচে এসে দাঁড়িয়েছিলো ও। ট্রামের অপেক্ষায়। মুখোমুখি দেখতে পেয়েছিলাম ওকে, স্পষ্ট চোখে। আর সংগে সংগে নিজেরই অজান্তে মুখ থেকে অস্ফুটে বেরিয়ে পড়েছিলো একটি শব্দ।

—সহেলী।

ওকে এভাবে দেখবো, এতদিন পরে, ভাবতেই পারিনি।

চেয়ার ছেড়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলাম। একটু সন্দেহ। ভুল হয়নি তো? না, এ মুখ ভুল হবার নয়, ভোলবার নয়।

ওর চোখ তখন অনেক দূরে! ট্রাম লাইনের সমতলে মিশে আছে বুঝি বা। ট্রামের আভাস পাওয়া যায় কি না খুঁজছে।

সামনে এসে দাঁড়ালাম। ডাকলাম।—অনুরাধা!

চমকে চোখ ফেরালো ও। বিস্মিত হলো। হয়তো চিনতে পারেনি প্রথম দৃষ্টিতে। পরক্ষণেই পাহাড়-ভাঙা ঝরনার মতো উচ্ছল আর সহজ হাসি। চকচক করে উঠলো ওর চোখের তারা। অনুভব করলাম, আমার দু কাঁধের ওপর দুটি নরম হাতের ঝাঁকুনি।

—তুমি? চন্দনদা তুমি?

ওয়াটারপ্রুফটা ওর হাত থেকে খসে পড়েছিলো, কুড়িয়ে তুলে দিলাম ওর হাতে। তাকিয়ে দেখলাম ভালো করে। খুশিতে ওর মুখ সহাস, চোখ সজল। তরল হীরের মতো দুটো বিন্দু ফুটে উঠলো ওর চোখে।

বললাম, খুব রোগা হয়ে গেছিস।

—তাই বুঝি? খুব বিচ্ছিরি দেখতে হয়েছি, না? সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করলে।

বললাম, না। রোগা হয়েছিস, কিন্তু অনেক সুন্দরও।

ঠোঁট টিপে লাজুক হাসি হাসলে ও। তবু যেন বিশ্বাস করলে না। জিগ্যেস করলে, সত্যি?

ঘাড় কাত করে জবাব দিলাম। বললাম, তারপর? কি খবর তোদের?

আঙুলে আঙুল জড়ালে ও। —উঃ, কদ্দিন পরে দেখা বলো তো? কি খবর বলবো, কোনো খবরই তো জানো না।

বললাম, কাজের তাড়া আছে বুঝি? থাক তবে, পরে শুনবো।

অনুরাধা বাধা দিলো।—মরুক গে কাজ। চলো, অনেক, অনেক কথা আছে। তোমার খবরও তো কিছু জানি না ছাই। কি করছো..চাকরিবাকরি? বিয়ে করেছো? চলো, কোথায় যাই বলো তো? কোথাও বসি গে চলো, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি কথা বলা যায়?

কোথায় যাওয়া যায় ভাবলাম। খুঁজে পেলাম না। ও-ই হদিস দিলে শেষকালে।

বললে, পার্কের ওই বেঞ্চটা খালি আছে।

আমার সম্মতির জন্যে অপেক্ষা করলে না। পা বাড়ালে পার্কের দিকে। পাশে পাশে আমিও এলাম। এসে বসলাম বেঞ্চটায়।

বর্ষাতিটা ধুপ করে ফেললে একপাশে, কাঁধের ব্যাগটাও খুলে রাখলে কোলের ওপর। চোখে চোখ রেখে বললে, তারপর? তোমার কথা আগে শুনি।

শোনাবার কথা শোনালাম।

কাদা-মাখা কয়েকটা ছেলে ফুটবল খেলছে, সেদিকে উদাস চোখ মেলে তাকিয়ে রইলো ও। শুনলো আমার সব কথা।

একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে, ঘাসগুলো ভিজে ভিজে। শিরীষ গাছটা থেকে টুপটুপ করে মোটা জলের ফোঁটা ঝরে পড়ছে। ফিকে হলুদ রোদের আভাস দেখা দিলো আকাশে।

আরো সুন্দর দেখালো অনুরাধাকে। তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইলাম ওর সুডৌল হাত দুটোর দিকে, সরু সরু লম্বা আঙুলগুলোর দিকে। একটু যেন বিচলিত, একটু বা চঞ্চল মনে হলো।

হঠাৎ প্রশ্ন করলে আবার।—তবু, বিয়ে করলে না কেন?

হাসলাম।—এই বাজার, আর এই রোজগারে?

—দুঃখকষ্ট তো আছেই। তা বলে সরে পালাবে? তুমিও শেষে এ কথা বলবে চন্নদা?

উত্তর দিতে পারলাম না। কি উত্তর দেবো? বললাম, তোর খবর বল্, কিছুই তো বললি না।

—খবর? খিলখিল করে হেসে উঠলো অনুরাধা।—খবর নয় চন্নদা, রীতিমতো উপন্যাস। লেখো না তুমি, আমাকে নিয়ে একটা উপন্যাস লিখতে পারো না? ছেড়ে দিয়েছো বুঝি?

বললাম, আগে শুনি তো।

বলতে শুরু করলো ও। উপন্যাসই। রীতিমতো একটা কাহিনী।

কে জানতো আবার মনে পড়বে, আবার দেখা হবে অনুরাধার সঙ্গে। সহেলীর সঙ্গে। কংসবতীর পাড়ে মেঠো ময়না আর গাংশালিকের বাসা। তার পাশেই নতুন-জাগা উপনিবাস। আরো দূরে, মাইল পাঁচেক ব্যবধানে তখন গড়ে উঠছে নতুন শহর, রেল কলোনীর উপনিবেশ। আর সেই দূর শহরে জল যোগাবার জন্যে এই স্টেশন, সম্প্রকূপ ওয়াটার-ওয়ার্কস। খান সাত-আট কোয়ার্টার—টালির ছাদ, এক-ইটের দেয়াল। সঙ্গে বাঁশের বাতা দিয়ে ঘেরা ছোট-ছুটকো বাগান। কলার ঝোপ আর কুমড়োর ফুল। এটা-ওটা।

পাশাপাশি থাকতাম আমরা। কতই বা বয়েস তখন। বারো-তেরো বছরও নয়। দেখাতো আরো ছোট। বেঁটেখাটো চেহারা ছিলো আমার, তার ওপর করমচার মতো কচি মুখ। শুনেছি তো নিশ্চয়ই, অনেকের কাছে, তা ছাড়া আয়নাতেও দেখতে পেতাম।

না, শুধু তাই নয়। লাজুকও ছিলাম একটু বেশী-বেশী। বন্ধু ছিলো শুধু অনুরাধা। ভালো লাগতো অনুরাধাকেই। মিশতামও ওরই সঙ্গে।

আধো-আধো আদুরে কথা, চন্নদা, চন্নদা।

'চন্দন' বেরুতো না ওর মুখ দিয়ে! অথচ বয়েসে ছিলো প্রায় সমবয়েসী।

ভোর হয়তো তখনো হয়নি। আবছা আবছা অন্ধকার জমে রয়েছে গাছের পাতায়, ঘাসের ডগায়। কাশঝোপ আর শরবনে হয়তো ফিকে রূপালী আলোর চমক দেখা দিয়েছে। অমনি দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ।

জাফ্‌রির ফাঁকে মুখ রেখে, চন্নদা, চন্নদা।

বিহারী চাকর ছিলো মঙ্গল। সে-ই ডেকে তুলতো আমাকে।

—খোকাবাবু, এ খোকাবাবু, সহেলী বুলা রহি। মঙ্গল চেঁচিয়ে বলতো।

জিগ্যেস করতাম, সহেলী আবার কি? সহেলী বলিস কেন, ও তো অনু, অনুরাধা। মঙ্গল হাসতো, বোঝাবার চেষ্টা করতো 'সহেলী' শব্দের অর্থ। বুঝতাম না।

দিদিকে এক দিন জিগ্যেস করেছিলাম। খুব ভালো হিন্দী জানতো দিদি।

বললে, 'সহেলী' জানিস না, সহেলী মানে 'সই'।

অনুরাধা তো হেসে লুটোপুটি। —ও মা, ছেলেতে-মেয়েতে আবার সই হয় নাকি? সই তো মেয়েতে মেয়েতে হয়। না বাপু, তার চেয়ে মাস্টারমশায় বলবো আমি। কি সুন্দর অঙ্ক বুঝিয়ে দেয় চন্নদা।

ছেঁড়া ময়লা, ছোপ ছোপ কালি লাগানো খাতাটা বের করে মাদুরের ওপর বসতো ও। শুরু হতো পড়াশুনোর ভান। তারপর আড়চোখে তাকাতে তাকাতে এক ফাঁকে সুড়ুৎ করে দুজনে বেরিয়ে পড়তাম ঘুড়ি-লাটাই হাতে নিয়ে।

এমনি করে চলছিলো জনবিরল আধা-শহুরে জীবন। বয়স যে বাড়ছে টের পাইনি।

হঠাৎ এক দিন বাড়তি বয়সের একজনকে দেখলাম।

ছেলের নাম নয়নমণি। হো হো করে হেসেছিলাম দুজনেই। আর কি চেহারার ছিরি।

প্যাঁকাটির মতো লম্বা আর রোগা। শুধু কালো নয়, জমকালো। অনুরাধা হেসে বলেছিলো, উঁহু যম-কালো, যমের মতো কালো। খিলখিল করে হেসে লুটিয়ে পড়তো ও নয়নমণির কথা উঠলেই।

নতুন ওভারসিয়ার বদলি হয়ে এসেছেন, তাঁরই ছেলে।

বীরবাবটি খুঁজতে বেরিয়েছি সেদিন। বর্ষাকালে ঘাসের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় ভেলভেটের মতো নরম আর লাল পোকা! শিশিতে সিঁদুর আর ঘাস রেখে তার ভেতর ভরে রাখতাম। কখনো-সখনো হাতের পাতায় নিয়ে মন্ত্র আওড়াতাম। এমনিতে কুঁকড়ে পড়ে থাকে, আর ছড়া কাটা শেষ না হতেই সুড়সুড় করে চলতে শুরু করে। এই সিঁদুর মখমলের বীরবাবটি খুঁজতে বেরিয়েছি দুজনে।

পোর্টারখুলি, অর্থাৎ কুলী-খালাসীদের লাইনবন্দী নোংরা খুপরির সারি পার হয়ে এসে পড়লাম টুকরো এক ফালি ধেনো জমির ওপর। মাঠে মাঠে কাটা ধানের গেঁড়ো, পায়ে লাগে পথ চলতে। আঁকাবাঁকা আল ধরে চলতে গেলেও পা পিছলে পড়ে ভিজে মাটির কাদায়।

রেল লাইনের পাশে পাশে বিছানো আছে দুর্বাঘাসের সবুজ গালিচা। অনুরাধার নির্দেশে সেই পথই ধরতে হলো। অনেক ঘোরাঘুরির পর ব্যর্থ মনে আর ক্লান্ত পায়ে ফিরছি তখন।

ঘড়ির কাঁটায় রাত বেজে গেল। তবু অন্ধকার তেমন ঘন হলো না। কোনো শুক্লা তিথির চাঁদ-ঝরা রুপোয় হয়তো মৌন নিশীথ মাটিতে মুখ লুকিয়ে রইলো। শরমে সম্ভ্রমে।

মিষ্টি মিষ্টি জ্যোৎস্না, গাছ আর পাতার ভাঙা ভাঙা ছায়া। দূরের অন্ধকারে স্টেশন-ঘর আর ওয়াটার-ওয়ার্কসের খুচরো আলোর জোনাকি।

দ্রুত পায়ে ফিরছিলাম। দুজনে। দুজনেই থমকে দাঁড়ালাম। কে যেন বাঁশি বাজাচ্ছে। মন উজাড়-করা কাঁপা সুর। করুণ কান্নার রেশ যেন। বোবা বাঁশির মুখে এত স্পষ্ট কাকলি শুনিনি। পাইনি মন-ছোঁয়া এ গানের আবেশ।

রেল লাইনের তলা দিয়ে গেছে একটা ক্যানালের নালা। পোলের পাশেই সিমেণ্টে বাঁধানো কালভার্ট। আর তার ওপর বসে আপন মনে বাঁশি বাজাচ্ছে সিল্যুট-শরীর একটি পুরুষ। নয়নমণি।

বাড়ির কাছাকাছি পেঁছে গেছি তখন। অনু, অনুরাধা তখন অবধি একটাও কথা বলেনি!

বললাম, কি রে, কথা বলছিস না যে?

খিলখিল করে হেসে উঠলো ও।—কালোমানিক বেশ বাঁশি বাজায় কিন্তু, না চন্নদা?

ওর হাসিতে বিদ্রূপ ছিলো, প্রশংসা নয়। তবু ভালো লাগলো না। এ যেন আমার অধিকারের ওপর অন্য কারো অকারণ হস্তক্ষেপ! মনে মনে চটে গেলাম নয়নমণির ওপর।

নয়নমণি আর অনুরাধার মাঝে যত উঁচু আর যত বড় সম্ভব পাঁচিল গাঁথলাম। কিন্তু ফল হলো না। লুকিয়ে লুকিয়ে নয়নমণির গান শুনতে যেতো ও, বাঁশি শিখতে। ওর মা আপত্তি করতেন, মেয়েছেলের আবার বাঁশি বাজানো কি? আমি নিষেধ করতাম। শুনতো না।

তবু, রোজ এসে বলতো নয়নমণির কথা।—কালোমানিক যখন মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে গান গায়, চন্নদা...হেসে লুটিয়ে পড়তো ও।

আমার সামনেই এক দিন সরল সহজ মেয়েটির মতো বোকা-বোকা চোখে বললে, নয়নদা, তুমি বুঝি আলকাতরার কারখানায় কাজ করতে?

বেচারীর কালো মুখখানা আরো কালো হয়ে গেল, অথচ এতটুকু দয়া দেখালে না অনু। ওর সামনেই হেসে লুটোপুটি খেলো।

এমনিভাবেই চলছিলো দিন, বছর কাটছিলো।

কলকাতায় এলাম কলেজে পড়তে। দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ হলো। তবু চিঠিপত্র লিখতাম মাঝে মাঝে। কবিতা লিখতাম, লিখে পাঠাতাম ওকে। গান জানি না, বাঁশি বাজাতে পারি না, তবু আরেকটা গুণ তো আমার আছে। অনুরাধাও লিখতো চিঠি, যার একখানাও যদি নয়নমণি পড়তো তো আত্মহত্যা করতো সে। তবু ঈর্ষা দূর হতো না মন থেকে।

হঠাৎ আমাদের পত্রালাপে যতি পড়লো। খবর শুনলাম। অনুরাধাকে পাওয়া যাচ্ছে না।

কলেজের ছুটিতে ফিরে গেলাম। শুনলাম, আরো একজনকে পাওয়া যাচ্ছে না। নয়নমণিকে।

—শেষকালে কালোমানিকের সংগে পালাবো তুমি বোধ হয় ভাবতেই পারোনি, না চন্নদা? খিলখিল করে হেসে উঠলো অনুরাধা, যেন কত বড় একটা রসিকতা।

কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করলাম। সহেলী, অনুরাধা। সেদিনের সেই সহজ সারল্য, আজকের এই আনন্দ-উজ্জ্বল মুখ। এ মুখে যেন কথাগুলো বেখাপ্পা শোনালো।

বললাম, এখনো কালোমানিক বলিস নাকি? সিঁথির সিঁদুরের রেখাটার দিকে চকিতে চোখ ফেলে বললাম, স্বামী না তোর?

সশব্দে হেসে উঠলো ও। পরমুহূর্তেই বিষণ্ণ ছায়া নামলো ওর চোখে।

—তখন আর না পালিয়ে উপায় ছিলো না, তাই। তা ছাড়া, কালো—, ফিকে হাসি হেসে বললে, তোমার আবার আপত্তি আছে বুঝি, তা নয়নদা কিন্তু সত্যি বড় বোকা, বড় বেশী ভালোবাসতো আমাকে, বিশ্বাস করতো।

বললাম, পুরুষরা যখন ভালোবাসে তখন বিশ্বাসও করে।

নীল চামড়ার ব্যাগটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলো ও। জীপ ফাস্‌নারটা একবার খুলছিলো, আবার বন্ধ করছিলো।

হঠাৎ ব্যাগ থেকে একটা ফটো বের করে বললে, কেমন দেখতে বলো।

একটি সুন্দরকান্তি পুরুষের ছবি। বললাম, সুন্দর নিশ্চয়ই।

—আমার স্বামী। হাসলো ও।

চট্‌ করে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো আমার বিস্মিত মুখের ওপর।

বললে, নয়নদার গান আমাকে ভুলিয়েছিলো, ভুল পথে নিয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু, কি জানো চন্নদা, তোমার সেই কবিতা লেখা কিংবা নয়নদার গান এসব হলো খ্যাতির জন্যে। নাম করবে পাঁচজনে। যেমন ধরো পরীক্ষায় পাস করা বা ব্যবসাদারী বুদ্ধি থাকা এসব হলো টাকা রোজগারের জন্যে। তেমনি রূপ বা সৌন্দর্য না থাকলে ভালোবাসা যায় না।

বললাম, এসব জ্ঞান কবে থেকে হলো?

মুখটা ফ্যাকাশে হলো যেন ওর, আমার কথায় ঠাট্টার সুরটা ধরতে পেরেই হয়তো। খানিক মাথা নীচু করে চুপ করে রইলো ও, তারপর আস্তে আস্তে খুব স্পষ্ট আর শান্ত গলায় বললে, ছেলেটা মারা গেল হাসপাতালে। এদিকে নয়নদার রোজগারও ছিলো কম, তাই টাইপ ইস্কুলে ভরতি হলাম। এমনিতেই ওকে সাহায্য করতে পারতাম না, টাইপটা শিখে নিয়ে যখন বুঝলাম চাকরি-বাকরি একটা চেষ্টা করলেই পাবো তখন এক দিন হঠাৎ উধাও হলাম। একেবারে কলকাতা।

চমকে উঠলাম। বলে কি?

ও হাসলে।—কখনো কিছুতে ভয় পেতে দেখেছো আমাকে?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

ও আবার হেসে উঠলো।—তারপর আপিসেরই একজন, মিঃ আয়ার, বিয়ে করতে চাইলেন। রাজী হয়ে গেলাম। ফটো তো দেখলে, কি সুন্দর নয় চেহারাটা?

একটা প্রশ্ন করবার ইচ্ছে হলো, নয়নমণির সংগে ওর বিয়ে হয়েছিলো কি না। কিন্তু মুখে এলো না। কেমন বাধো-বাধো ঠেকলো। শুধু বললাম, বাঙালী নন? চেহারা দেখে তো বাঙালীই ভেবেছিলাম!

লাজুক হাসি হাসলে অনু।—আজকাল বেশ বাঙলা বলতে পারে। শিখে নিয়েছে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম দুজনে।

বললাম, সুখেই আছিস তা হলে। সুখে থাকবি তাই চেয়েছিলাম।

কথাটা শুনলো না ও, কিংবা শুনতে পেলো না। হঠাৎ বললে, একটা কাজ করবে চন্নদা?

—কি?

অনুরাধার চোখ জোড়া যেন চকচক করে উঠলো।—নয়নদা যাদবপুরে আছে, হাসপাতালে। টি বি-তে ভুগছে।...যাও না এক দিন, দেখা করে এসো। পুরোনো লোক দেখলে একটু শান্তি পাবে হয়তো।

বিস্ময় চাপা দিয়ে ঠিকানাটা জেনে নিলাম।—যাবো এক দিন!

—আমার ঠিকানাটাও রাখো। এক টুকরো কাগজে লিখে দিলে ও। বললে, যে-কোনো দিন সন্ধ্যে সাতটার পর। আসবে তো?

সম্মতি জানালাম।

ট্রামে উঠতে উঠতে বললে, রোববারেও তো আসতে পারো। যখন হোক।

ঘাড় নেড়ে বললাম, যাবো।

সত্যি বলতে কি, অনুরাধার ওই কমনীয় রূপ, ওর হাসির নির্মালিন নির্ঝর আমার মনের কোণে নূপুর বাজিয়ে গিয়েছিলো সেদিন। কয়েক মুহূর্তের জন্যে হলেও, সে ঘুঙুরের বোল বুলবুলির সুরের মতোই ছন্দোময় আর স্পষ্ট। তবু খুশী হতে পারিনি। উপন্যাস বুনতে বলেছিলো অনুরাধা, ওর জীবনের কাহিনীকে ঘিরে, অথচ আমার মনে হয়েছিলো, ওর জীবনের বৃত্ত থেকে গড়ে উঠতে পারে শুধু অপন্যাস।

অর্থাৎ, মনে মনে ক্ষমা করতে পারিনি ওকে।

কিন্তু, ওর হাসিতে বুঝি মোহ ছিলো, চটুল চোখের চাউনিতে কোনো নেশার আমেজ। আর ভোরবিহঙ্গের কণ্ঠকাকলি ওর গলার স্বরে।

তাই, সত্যি এক দিন গিয়ে হাজির হলাম ওর বাসায়, ঠিকানা খুঁজে খুঁজে।

গলিটা কানা আর নোংরা। একটা ডাস্টবিন বাড়ির সামনে। পচা ভাত, কলার পাতা। চিংড়ির খোসা, মরা ইঁদুর, ভাঙা হাঁড়ি আর সরা। সবে মিলে গলিটাকে নোংরাই করে তোলেনি, কিছুটা বীভৎসও। আর বাড়িটাও পুরোনো। ভাঙা ছাদের জলের ট্যাঙ্ক থেকে জল গড়িয়ে গড়িয়ে দেয়ালের ইট অবধি ক্ষয়ে গেছে! তারই ভেতর এক কোণের দুখানি ঘর।

তবু পরিচ্ছন্ন। সাজানো গোছানো।

একটা ডেকচেয়ারে শুয়ে ছিলেন কৃষ্ণকান্ত্ আয়ার। অনুরাধা আলাপ করিয়ে দিলো।

দুটো হাত তুলে নমস্কার করবার চেষ্টা করলেন, পারলেন না। বছর চারেক হলো জীবনের রস হারিয়ে ফেলেছেন, গাঢ় দুঃখের স্বরে বললেন কৃষ্ণকান্ত্। দেহের বাঁ দিকটা প্যারালিসিসে পড়ে গেছে।

আমার নাম বলে আলাপ করিয়ে দিলে অনু।—আমার ছোটবেলাকার বন্ধু।

কৃষ্ণকান্ত্ হাসলেন।—আপনার নাম রাধার মুখে আমি শুনিনি কিন্তু কখনো।

বছর আট-নয়ের একটি ফুটফুটে সুন্দর মেয়ে, আর দুটি ছেলে। সামনে এনে হাজির করলে অনুরাধা। বললে, প্রণাম করো। মামা হন।

ওরা প্রণাম করলো এক কথায়। কাছে টেনে নিলাম একজনকে।

আর কৃষ্ণকান্তের সঙ্গে গল্প করতে করতে লক্ষ করলাম অনুরাধাকে। কি চঞ্চল আর কি তৎপর। এই কি ওর স্বাভাবিক রূপ? সত্যি, আশ্চর্য হলাম।

সাদাসিধে একটা লালপাড় শাড়ি। আলুথালু চুল। অতি ব্যস্ততায় কপালে ঘাম, কপোলে রক্তিমাভা। এক ফাঁকে এসে ঘরটা ঝাঁট দিয়ে গেল, ময়লা কাপড় গুছিয়ে রাখলে আলনায়। আবার তখনই ছুটলো, যাই উনুনটা ধরলো কি না দেখি।

মেয়ের ফ্রক পালটে দিলে, চিবুক ধরে চুল আঁচড়ে দিলে। ফ্রকটা দেখিয়ে বললে, নিজের হাতে করেছি, কেমন হয়েছে বলো তো চন্নদা?

আমি কিছু বলবার আগেই জুড়ে দিলে, নিজের হাতে সেলাই কিন্তু, মেশিনে নয়। হানিকুম্বটা ভালো হয়নি?

কবরেজী তেলটা নিয়ে এসে কৃষ্ণকান্তের হাতেপায়ে মালিশ করতে করতে গল্প শুরু করলে আবার।

কৃষ্ণকান্ত্ অপাঙ্গে হাসলেন।—রাধার মতো মেয়ে কিন্তু আপনি আর একটিও পাবেন না। ইউ হ্যাড মিস্ড হার, মিস্ড অ্যান আইডিয়েল ওয়াইফ। ছোটবেলাতেই যখন অপারচুনিটি পেয়েছিলেন...

অনুরাধার চোখে কপট ভর্ৎসনা।

না হেসে পারলাম না।

কৃষ্ণকান্ত্ হেসে বললেন, হাসি নয়। পড়ে আছি প্যারালিসিসে, একটা পয়সা রোজগার

নেই। অ্যান্ড দি হোল বার্ডেন ইজ অন্ রাধা।

বাকিটা শুনলাম অনুরাধার কাছে, বললে, কি আর এমন শক্ত কাজ। চাকরি তো দশটা পাঁচটা। সকালে এক ঘণ্টা একটি মেয়েকে সেলাই শেখাই, রাত্রে দু ঘণ্টা গানের মাস্টারি।

তারপর হঠাৎ হেসে উঠে বললে, দোহাই তোমার, গল্পটল্প লেখো কি না জানি না। লিখলে, আর সকলের মতো সেই একই গল্প লিখো না। বিশ্বাস করো, পাপের পথে না গিয়ে কাজ করেও রুগ্ন স্বামীর সেবা করা যায়, সংসার-খরচের টাকা, ছেলেমেয়েকে ইস্কুলে পড়ানো —এসব ভার নেওয়াও অসম্ভব নয় মেয়েদের পক্ষে।

চলে আসছিলাম। ও আবার ডাকলে।

—যাবে নাকি এক দিন, নয়নদাকে দেখতে?

বললাম, যাবো তো নিশ্চয়ই। তুইও চল না সঙ্গে।

ও বিব্রত হয়ে উঠলো।—না, না। ছিঃ, তাই কি চলে? ভালোও দেখায় না, উচিতও নয়।

ইচ্ছে হয়তো সত্যিই ছিলো না। তবু এক দিন গেলাম হাসপাতালে, নয়নমণিকে দেখতে।

কলার ঝোপ আর জলো নালার পচানি, এরই মাঝ দিয়ে গেছে ভাঙাচোরা কাঁচা রাস্তা। আর মোটরবাসে তেমনি ভিড়। তবু গেলাম। দেখতে, দেখা করতে।

দেখলাম শহরতলির অপরূপ সায়াহ্ন। শান্তি। মহানিমের ছায়া, মাঝে মাঝে জাহাজের মাস্তুলের মতো দীর্ঘ মসৃণ ইউক্যালিপটাসের সাদা গুঁড়ির পরিচ্ছন্নতা। আড়ালে লুকোনো ছায়ায় ভেজা হাসপাতাল। ঠাণ্ডা, শান্ত, নিঃশব্দ। বরফের দেশের মতো, বরফের ঘরের মতো। চুপচাপ। ফিসফিস। সূর্যের তেজ নেই, শব্দের তীক্ষ্ণতা নেই।

বারো-দরজার লম্বা লম্বা ঘর পার হয়ে ওয়ার্ড খুঁজে পেলাম। বেড নম্বর সতেরো। ঠাণ্ডা নিঝুম। সমস্ত ঘরখানায় সারি সারি সরু সরু লোহার খাট। ধবধবে ফরসা চাদরে ঢাকা। দেয়ালের গায়ে, বিছানা-বালিশের শুভ্রতায়, কর্মচঞ্চল নার্সের বসনভূষণে মহাশান্তির শ্বেতাভা যেন। কেমন এক করুণাকোমল আবহাওয়া সারা ঘরের বাতাসে।

শুয়ে শুয়ে পড়ছিলো নয়নমণি! নার্স একটা টুল টেনে দিলো ওর পায়ের কাছে। বসতে বললে আমাকে সহাস অনুরোধে। নয়নমণি বিস্ময়ে চোখ তুলে তাকালে আমার দিকে। বিস্মিত হলো। দোষ কি ওর, চিনতে না পারারই কথা।

সব শুনে ম্লান হাসিতে উজ্জ্বল হবার চেষ্টা করলে ও।

দু-তিনখানা ঘরের ওপার থেকে কার ভাঙা গলার কাশির শব্দ আসছে, আর নার্সের জুতোর খুটখুট খুটখুট শব্দ। চঞ্চল পায়ে ঘোরাফেরা করছে সারা ঘরময়। আরো কারা যেন অন্য অন্য রুগীদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

হাতের বইটা বুকের ওপর রেখে নয়নমণি বললে, অনেক বড় হয়েছো, মাথাতেও লম্বা হয়েছো অনেকটা, তাই চিনতে পারিনি প্রথমে।

বললাম, অনুরাধাও প্রথমে চিনতে পারেনি। ওর কাছেই খবর পেলাম আপনার। খবর পেলাম বলবো না, ও-ই একরকম জোর করে পাঠালো আমাকে।

নয়নমণিকে আমি কোনো দিন পছন্দ করিনি। কেন জানি না, মন বলতো ও আমার শত্রু। তবু ওর দুঃখ, ওর ব্যথা-বেদনার ছোঁয়া পেলাম যেন। এই অসহায় রোগশয্যা। তিলে তিলে ক্ষয়ে যাওয়া, প্রবঞ্চনার গভীর ক্ষত, অনুরাধার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ প্রতারণা। হঠাৎ কেমন যেন বড় আপনার জন বলে মনে হলো নয়নমণিকে। বড় অন্তরঙ্গ মনে হলো।

ওকে খুশী করবার জন্যেই হয়তো বললাম, অনু প্রায়ই আপনার কথা বলে।

বিষণ্ণ হাসি হাসলে ও।—একটা দিন, কয়েক মিনিটের জন্যেও কি ও দেখা দিতে পারে না একবার। বড় দেখতে ইচ্ছে হয়। কত কথা বলবার ছিলো।

দীর্ঘশ্বাস ফেললে নয়নমণি!

আশ্চর্য। একবারও ভাবিনি, এক মুহূর্তের জন্যেও মনে হয়নি যে অনুরাধা আমাকে আসতে বলেছে বারবার, অথচ নিজে এক দিনের জন্যেও আসেনি, দেখতে বা দেখা দিতে।

মনটা বিষিয়ে উঠলো অনুরাধার ওপর। মনে হলো, নয়নমণির এ অবস্থার জন্যে অনুরাধাই দায়ী, একমাত্র অনুরাধাই দায়ী।

তবু বললাম, সকাল-বিকেল মাস্টারি করা, দুপুরে চাকরি, তার ওপর ঘর-সংসার দেখা-শোনা। সময় পায় না বেচারী!

আবার একবার দীর্ঘশ্বাস ফেললে নয়নমণি। বড় বেশী ফ্যাকাশে দেখালো ওর মুখখানা। চোখের তারা দুটো যেন জ্যোতি হারিয়েছে। সিলিং-এর দিকে চোখ রেখে শুয়ে রইলো চুপ করে।

তারপর হঠাৎ বললো, বাঁচবো না আর বেশী দিন। আর বেঁচে থেকে মিছিমিছি কষ্ট দেওয়া।

বুঝলাম না কথাটা। চুপ করে রইলাম।

ও আবার বললে, সারাটা জীবন শুধু ওকে দুঃখই দিলাম। জানো ভাই চন্দন, অনুরাধার মতো মেয়ে আর একটাও দেখতে পাবে না। এত ভালো মেয়ে, এত সাহস আর ধৈর্য!

বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে।

নয়নমণি হাসলো।—কেউ জানলো না, শুনলো না। চন্দনভাই, তুমি অন্তত জেনে রাখো, অনু সাধারণ মানুষ নয়। সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক, অনেক ওপরে ও। প্রথম যেদিন আমার মুখ দিয়ে রক্ত উঠলো, সেদিন একটা পয়সা রোজগার নেই আমার। এক হপ্তা পরেই অনুও হলো নিরুদ্দেশ। ভেবেছিলাম রোগের ভয়ে বুঝি পালিয়েছে। সশব্দে হেসে উঠলো নয়নমণি।

অনুরাধার কথাটা মনে পড়লো।—রূপ না থাকলে কি ভালোবাসা যায় চন্নদা!

নয়নমণি বললে, আরো অনেক কিছু ভেবেছিলাম সেদিন। অথচ আমাকে বাঁচাবার জন্যেই চলে এসেছিলো ও। চাকরি করে টাকা রোজগার করবার জন্যে, ভালো ডাক্তার দেখিয়ে আমার চিকিৎসা করাবার জন্যে।

এক তাড়া চিঠি বের করলে নয়নমণি, বিছানার নীচে থেকে।

—এই যে, এই চিঠিটা পড়ো, অনুরাধা লিখেছিলো।

চিঠিখানার ওপর চোখ বুলিয়ে গেলাম, পড়া হলো না। নয়নমণির কথা শোনবার জন্যে সমস্ত মন তখন উদ্‌গ্রীব।

—অনেক চেষ্টায় বেড যোগাড় করলে, পেণ্ড্রা রোড থেকে আনলে এখানে। এই রাজসিক রোগ, জানো তো কত খরচ, সব খরচ চালিয়ে এসেছে অনু, অনুরাধা। গত সপ্তাহেও চিঠি দিয়েছে, আমি ভালো হয়ে গেছি, ও নাকি স্বপ্নে দেখেছে।

হেসে উঠলো নয়নমণি।—বোকা মেয়ে, এত সরল বিশ্বাস ওর। আমি আবার ভালো হবো, আমি আবার ফিরে যাবো! কিন্তু ও আসে না কেন এক দিন, একবার কি দেখা করতে পারে না?

বললাম, আমি ফিরে গিয়ে বলবো, নিশ্চয়ই নিয়ে আসবো এক দিন।

নয়নমণি ম্লান হয়ে গেল হঠাৎ।—না, না, ও আসবে না। আসবে না ও।

বাধা দিলাম না। প্রতিশ্রুতি দিলাম না। হয়তো সত্যিই আসবে না অনুরাধা।

আরো কিছুক্ষণ কাটালাম। সেই ছোটবেলাকার কত কথা, কত গল্প। একসময় উঠে এলাম বিদায় নিয়ে। বেরিয়ে এলাম।

অনুরাধাকে এসে বললাম, অনেকগুলো প্রশ্ন আছে, জবাব দাও।

কেন জানি না, ওকে আর আগের মতো 'তুই' সম্বোধন করতে বাধলো।

ও হাসলো।—বলো, কি তোমার প্রশ্ন।

—নয়নমণিকে তুমি সত্যি ভালোবাসতে, ভালোবাসো। তবু, একটা দিনের জন্যেও কেন দেখা করতে যাওনি। তোমাকে দেখলে ও হয়তো কিছুটা শান্তি পেতো। আরাম পেতো।

অনুরাধা হেসে উঠলো।—ভালোবাসতাম? ভালোবাসি? খিলখিল করে হেসে উঠলো ও আবার।—কালোমানিকের বুঝি তাই ধারণা?

রাগ হলো, বিরক্তিও বোধ করলাম। বুঝলাম, উত্তর ও দেবে না এ প্রশ্নের।

বললাম, আরেকটা প্রশ্ন, কৃষ্ণকান্তকে তুমি বিয়ে করলে কেন?

—বিয়ে না করে জীবনটা নষ্ট করলেই বুঝি ভালো হতো?

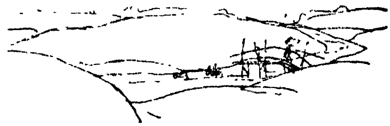
অতিষ্ঠ হয়ে বললাম, একটা কথা বলো, তুমি কাকে ভালোবাসতে, ভালোবাসো? নয়নমণি না কৃষ্ণকান্ত্। না কি দুজনকেই?

আবার খিলখিল করে হেসে উঠলো অনুরাধা।—যদি বলি তোমাকে?

এত রাগেও হাসি পেলো, বললাম, তা হলে নয়নমণিকে সারিয়ে তোলার জন্যে রক্ত জল করতে না আর প্যারালিটিক কৃষ্ণকান্তের সংসারেও মায়া থাকতো না তোমার।

কোনো উত্তর দিলো না অনুরাধা। চকিতে একবার তাকালো আমার মুখের দিকে। পরমুহূর্তেই চলে গেল চা তৈরি করতে। যখন ফিরে এলো, মনে হলো, চোখেমুখে যেন জলের ঝাপটা দিয়ে এসেছে ও।

[১৩৫৭



বুড়ী ডিহিঙের সাঁকো

অয়েল-টাউন ডিগবয় এখান থেকে মাইল কয়েক দূরে। ওদিকে লিদু আর বড় গোলাই—খনি-শহর। আর তারও ওপারে লামডিং চা-বাগান। এদিকে ডিগবয়, ডিগবয় পার হয়ে বোগাপানির গার্ডেনস্। মাঝখানে এই মার্ঘেরিটা, খনি-শহরের আপিস-আদালত, বাণিজ্যের দপ্তর। সারা শহরটার এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে ছোট-বড় ঢিবি-ঢাবা, পাহাড় আর টিলা। বাতাসে-ওড়া রুপোলী রিবনের মতো এঁকেবেঁকে নেমে গেছে ব্রহ্মপুত্রের শাখা-নদী, বুড়ী ডিহিং। আর এই বুড়ী ডিহিং-এর বুকে কংক্রিটের সাঁকো বাঁধবার জন্যে গাঁথনি উঠছে ধীরে ধীরে। উপেক্ষিত পৃথিবীর বুকে ছোট্ট এক টুকরো বসতি, গড়ে উঠেছে নতুন-জাগা এক উপনিবেশ।

খোলিহামারি থেকে লামডিং অবধি একটা ঘুরন্তি রাস্তা। পাহাড়ের গা বেয়ে, পাহাড়কে পাশ কাটিয়ে। কাঁচা-পাকা পাথুরে পথ, কোথাও কাদা কাঁকর, কোথাও বা চিকন অ্যাসফল্টের চকমকি। কিন্তু বুড়ী ডিহিং-এর বাঁকে মুখ ঘোরাতে হয় মোটর লরিকে, দু-চার মিনিট জিরিয়ে নেবার লোভে যতি পড়ে বাস আর ট্রাকের গতিতে।

তাই একটা চায়ের দোকান গজিয়ে উঠেছে এখানে। ছিটে-বেড়ার দেয়াল, টালির ছাদ। গত বৃষ্টিতে হয়তো ধসে পড়েছে একটা দিক, কাঠের কপাটে আগল আঁটে না ঠিকভাবে। লোক-চলাচলে সামনের উঠোন কাদা চপচপ করে। তবু তারই ওপরে দুটো কাঠের বেঞ্চ আর একটা চেয়ার পাতা আছে। টিনের চেয়ারটা খালি থাকলেও কেউ বসে না। ওটার অধিকারী একমাত্র আব্রাহাম লখিন্দর কাঁকই। এ-তল্লাটের নাম-করা গাইয়ে, কবিয়াল। রুক্ষ বাবরি চুল ঘাড় অবধি, কালো পাঁশুটে রঙ, কপালে একটা দাগ। লম্বা আর রোগা। গায়ে থাকে একটা নীল ডুরে-কাটা ফতুয়া, পায়ের ট্রাউজার ভাঁজাভাঁজিতে দোনলা হয়ে গেছে বহু দিন। কিছুই বদলায় না লখিন্দরের, না চেহারা, না বেশবাস। বদল হয় শুধু হাতের যন্তরটির। কোনো দিন থাকে ব্যাঞ্জো, কোনো দিন বা গীটার।

গানের গলা ওর বংশগত, বাজাতে শিখিয়েছিলো ডিগবয় মিশন ইস্কুলের মাস্টার আর্থার মলোনি। গীটার আর ব্যাঞ্জো ও-দুটোই আইরিশ চার্চের পাদ্রী রেভারেণ্ড ওয়াটকিংসের

দান। খ্রীষ্টান হওয়ার পর দুটো বছর পাহাড়ী গির্জায় স্যাবাথ ডে-র গানে সুর ঢেলে এসেছে ও।

আজ পাঁচ বছর ধরে বুড়ী ডিহিং-এর জল কাঁপছে ওর গীটারের বোলে। আর মার্ঘেরিটার বাতাস দুলে ওঠে ওর গলার সুরে। দূরে-দূরে টিলার কপালে কুয়াশা জমা হয়। আর, আর সামনে মাধবীলতা জড়ানো বাঁশের ব্যাখারি-বাঁধা ফটকে হাত রেখে দাঁড়ায় যজ্ঞেশ্বর, যজ্ঞেশ্বর বেজবড়ুয়ার মেয়ে দময়ন্তী। গগইদের ছোট মেয়ে রুক্মিণী আর কুঞ্জ চালিয়াও কখনো-সখনো সঙ্গে থাকে। টুকিটাকি কিছু একটা কিনতে এসে কাজ ভুলে যায় ওরা।

দোকানটা শুধু চায়ের নয়। ছোটখাট একটা মনোহারী দোকানও। খানা হোটেলের ব্যবস্থাও আছে। নেই শুধু রাত কাটাবার ঘর। যেটা আছে সেটা শুধু লখিন্দরের। দেয়ালে তার কালি দিয়ে লেখা অপটু হাতের বিজ্ঞপ্তি—এহানে চা পাওয়া যায়। আর কাঠকয়লায় লেখা আঁকাবাঁকা অক্ষরের একটা সাইনবোর্ডই বলতে হয়। নীচে একটা ছাপা পোস্টার—এচপ্রো জ্বর আরু বিষ গুচায়। কিন্তু ওরা বলে, জ্বর আর বিষ যদি কেউ ঘোচায়, তো তা ঐ আব্রাহাম লখিন্দরের ব্যাঞ্জোবাদন, ওর সুরেলা হাতের গীটারের মিঠে বুলি।

সত্যি! লখিন্দর যখন গীটার বাজায়, ওর নিজের বাঁধা গানের কলিতে সুর ঢালে, তখন লোক জমা হয়ে যায় দোকানের সামনে। স্তব্ধ হয়ে কান পেতে শোনে সবাই। যত দূরেই থাক, দময়ন্তীও ছুটে আসে। পিছনে পিছনে রুক্মিণী আর কুঞ্জ! মাতাল খাসিয়া ছোকরা তিনটেও জুয়ার ঘুঁটি চালতে গিয়ে থমকে থামে।

লখিন্দর গান গায়, গীটার বাজায়। আর চোখ থাকে ওর দময়ন্তীর দিকে। দময়ন্তী! ষোলো বছরের সমর্থ শরীর ঘিরে পূর্ণ-জোয়ার যৌবনের উচ্ছ্বাস। সারা দেহে লাল মেঘের ঈষৎ লালিমা। টানা-টানা চোখ জোড়ায় অসহায় সারল্য, আর আপেল-লুকোনো গোলগাল নিটোল গাল। করমচার মতো কচি আর গোলাপী মুখ। তিন রঙের দেহবাস, তিনটি পৃথক স্পষ্ট রঙের দেহাবরণ যেন আরো উজ্জ্বল করে তোলে ওকে। আরো কমনীয়। গায়ে কোমরে টান-টান করে বাঁধা কমলা রঙের আঁচলি। হাঁটুর নিচে সুডৌল এক জোড়া পায়ের চঞ্চলতা। বুকের পূর্ণিমা গোলাপী মলমলের কাঁচুলি দিয়ে বাঁধা। লম্বা আর সুস্পষ্ট কালো চুলের বেণী দুটোকে ঘিরে বুকে এসে পড়েছে আসমানী ওড়না। ফিকে নীল ওড়নার ছায়া ওর চোখে, চোখের তারা নীলার মতো নীল। আর নারেঙ্গী ঘাগরার নীচে দুটি নরম আর সুশুভ্র পায়ে রক্তকমলের আভা।

এমনি এক অপরূপ দেহের সহজ সারল্য নিয়ে এসে দাঁড়ায় দময়ন্তী। চিক আর চাঁচরে ঘেরা ছোট ছুটকো বাগান, বাগানের মুখে বাঁশের বাতা আর বাখারির ফটক। মাধবীলতায় ঢাকা পড়ে গেছে একটা দিক। সেখানে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে দময়ন্তী, বাঁশের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে। তন্ময় চোখ মেলে গান শোনে লখিন্দরের।

দিন কাটছিলো এমনিভাবেই। লখিন্দর গান গায় আর দেখে, দময়ন্তী দেখা দেয় আর গান শোনে। এমন সময় হঠাৎ এক দিন বাধা পড়লো। আব্রাহাম লখিন্দর কাকই, এ-তল্লাটে সেরা গাইয়ে আর কবিয়াল, আশি মাইল দূর থেকেও অধিকারীরা যার কাছে ছুটে আসে যাত্রার পালা লিখিয়ে নিতে, সেই লখিন্দরের সুর ভুল হলো, তাল কেটে গেল গানের।

লামডিং-এর ওপারে, টিকক পাহাড় থেকে তখন নেমে আসছে নাগাদের দল। টিকক পাহাড়ের নাঙ্গা নাগার দল। আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ বেয়ে পিলপিল করে নেমে আসছে ওরা, সমতলের দিকে, উপত্যকার নীচু মাটিতে লক্ষ্য রেখে। দূর থেকে পিঁপড়ের সারির মতো দেখায়। এক পাল পঙ্গপালের মতো।

খবর পেঁৗছে গিয়েছিলো এখানে। আর দু-চার দিনের মধ্যেই সারা শহরটা ছেয়ে যাবে উলঙ্গশরীর নাগা নারী-পুরুষে। হাতির দাঁতের টুকিটাকি, মোষের শিঙের রামশিঙা, নীল গাইয়ের খুর, কালো হরিণের চামড়া, চিকন চামরের রাশ নিয়ে পথে পথে হেঁকে বেড়াবে ওরা, হাট বসাবে।

প্রতিবারেই তাই এ সময়টায় ডিগবয় থেকে কয়েকটা আমদানি-রপ্তানির আপিস উঠে আসে এখানে। মাল কিনতে। দেহাতী অহোমদের মধ্যেও সাড়া পড়ে যায়।

ব্যবসা জেঁকে ওঠে।

নাগারা নেমে আসছে এ-খবর রটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবুদেরও ভিড় জমলো এ-শহরে। এখানে-ওখানে দেখা গেল দু-চারটে সুন্দর সুন্দর পুরুষ মুখ, শোনা গেল দু-একটা দুর্নামী রটনা।

লখিন্দরের কিছু যায়-আসে না তাতে। রূপসই দময়ন্তীর শীতল চোখের মধ্যেই ওর পৃথিবীর শেষ। ওর যা-কিছু স্বপ্ন, যত কল্পনা সব ঐ দময়ন্তীকে ঘিরে।

কিন্তু। কে জানতো লখিন্দরের সুর ভুল হবে, গীটারের তাল কাটবে!

প্রতি দিনের মতোই টিনের সবুজ চেয়ারটায় শরীর এলিয়ে ব্যাঞ্জো বাজাচ্ছিলো লখিন্দর। আর মাধবীলতার ফটকে হাত রেখে দাঁড়িয়ে ছিলো দময়ন্তী। এপাশে-ওপাশে কুঞ্জ আর রুক্মিণী, দুই সখির ফিসফিসানির কৌতুকে লাজুক হাসি হাসছিলো ঠোঁট টিপে-টিপে। এমন সময় ক্রিং-ক্রিং করে সাইকেলের ঘণ্টি বাজলো। ফটকের সামনে ঝপাং করে নামলো একটি ছোকরাবাবু। ঠেলে ঠেসিয়ে রাখলে বাইকটা, বেড়ার গায়ে। দ্রুত আর চঞ্চল ভঙ্গি। গায়ে নীল রঙের একটা হাফশার্ট, ট্রাউজারের প্রান্ত গোড়ালিতে ক্লিপ দিয়ে আঁটা। বাইকটা রেখেই চট করে এগিয়ে এলো, দময়ন্তীর পিঠে হালকা করে হাত রেখে পথ করে নিলো। ঢুকলো ভেতরে, দ্রুত মার্জিত পদক্ষেপ। কিনলে দু প্যাকেট সিগারেট। খুচরো ফিরতি পয়সাগুলো হাতে বাজাতে বাজাতে মেয়ে তিনটের দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে দৃষ্টি স্থির করলো দময়ন্তীর মুখের ওপর। একটু চটুল অর্থপূর্ণ হাসি হেসে আঙুলের টোকায় একটা আধুলি ছুঁড়ে দিলে দময়ন্তীর গায়ে, তারপর শিস দিতে দিতে বড় বড় পা ফেলে বেরিয়ে গেল। বাইক চালিয়ে দিলে পরমুহূর্তেই।

দময়ন্তী তখনো বোকা-বোকা চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। পায়ের কাছে গড়িয়ে-পড়া আধুলিটার দিকে ওর চোখ নেই দেখে টুপ করে সেটা তুলে নিলো কুঞ্জ, তারপর একেবারে আঙিয়ার ফাঁকে রেখে দিয়ে এক ছুট।

মেয়েগুলো কেউ কিছু বুঝলো কি বুঝলো না, কে জানে। শুধু ওদিক থেকে কে একজন বললে, ঘরত ভাত নাই, এহানে এসে ফুটানি মারছে।

আব্রাহাম লখিন্দর কাঁকই কিছু বললো না, কিছু শুনলো না। শুধু তাকিয়ে রইলো। সুর কেটে গেল, তাল ভুল হলো তার।

দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে সন্ধ্যের সময় ডিবেটা জ্বালছে মাধব, এমন সময় দময়ন্তী এলো আবার। কিছু একটা কিনতে হয়তো।

লখিন্দর ডাকলে হঠাৎ।—দময়ন্তী!

লজ্জায় থরথর করে কাঁপতে-কাঁপতে কাছে এলো দময়ন্তী।

—বোসো। চৌকির একটা পাশে বসতে বললে লখিন্দর।

জড়োসড়ো হয়ে এক কোণে বসে পড়লো দময়ন্তী।

একটু চুপ করে থেকে লখিন্দর বললে, ও বাবুদের কাছে যাস্ না দময়ন্তী, ওদের মনে শুধু পাপ।

লজ্জায় নুয়ে পড়লো দময়ন্তী। নখে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে বললে, থাক্ ওসব কথা, একটা গান শোনাও বরং।

কথা পেয়ে যেন বেঁচে গেল লখিন্দর। অস্বস্তি কেটে গেল। বললে, গান শিখবে দময়ন্তী? বাজাতে শিখবে?

হাসি চেপে ঘাড় কাত করলে ও। লখিন্দরও খুশী হয়ে উঠলো।

গীটারটা হাতে তুলে দিলো ও দময়ন্তীর। বললে, এসো, এখানে এসো।

আরো কাছে এসে বসলে। দময়ন্তীর কোলের ওপর রাখলে গীটারটা। তারপর ওর নরম হাত দুখানা ছুঁয়ে দেখিয়ে দিলো কিভাবে বাজাতে হয়। আঙুলের কাঁটাগুলো খুলে খুলে পরিয়ে দিলে দময়ন্তীর নরম আঙুলের ডগায়। অদ্ভুত এক স্পর্শানুভূতিতে টলে উঠলো ওর মন। সামান্য একটু স্পর্শে এতখানি রোমাঞ্চ! লখিন্দরের হাতও যেন কেঁপে উঠলো। গীটারের কাঁটা নয়, এ মন দেওয়া-নেওয়ার অঙ্গুরী পরিয়ে দিলে ও দময়ন্তীর

আঙুলে। গীটারের ভ্যাম্পে এক-একটা বেতালা টঙ্কার দেয় দময়ন্তী, আর হেসে লুটোপুটি খায়। বাঁ হাত চালাতে পারে না, প্রতিবারই খসে পড়ে নিকেলের পাতটা। এত ভারি আর এত মসৃণ, হাতে থাকে কখনো! দময়ন্তী অনুযোগ করে। বলে, দু হাত দু-রকম কাজ করে না। কেন করবে না? হেসে জিজ্ঞেস করে লখিন্দর। দময়ন্তী মাথা হেঁট করে লজ্জায়, দুটা মনের মানুষ তুমি, আমার মন এক দিকেই।

মুখে ওড়না চাপা দিয়ে হঠাৎ খিলখিল করে হেসে ওঠে দময়ন্তী।

—হাসছো কেন?

হাসি চেপে দময়ন্তী বলে, তুমি বিয়ে করোনি কেন, সুন্দর বউ মেলেনি বুঝি?

লখিন্দর হেসে উত্তর দেয়, তোমার অপেক্ষাতেই তো আছি, তুমি রাজী হলে তবে তো।

লজ্জায় জড়িয়ে যায় দময়ন্তী, কথা পালটায়।—গান শোনাও একটা।

এমনি করেই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলো দুজনে। বিস্ময়ের দৃষ্টি দূর হলো দময়ন্তীর। এলো অন্তরঙ্গ আবেশ। সকালে যখন সবুজ টিনের চেয়ারে বসে লখিন্দর গান গায়, তখন আর আগের মতো দূরে সরে থাকতে পারে না দময়ন্তী। কাছে এগিয়ে আসে, এসে দাঁড়ায় লখিন্দরের পাশে নয়তো পিছনে। মাথা নেড়ে নেড়ে গান গায় লখিন্দর, গীটার বাজায় আর মাঝে মাঝে হাসি ছড়ায় দময়ন্তীর শরম-নরম চোখে। দময়ন্তীও হাসে। গান থেমে যায় লখিন্দরের। কিশোর-কৌতুকে, কখনো অর্থহীন চোখে তাকিয়ে থাকে দময়ন্তীর দিকে। লজ্জায় কান লাল হয়ে ওঠে দময়ন্তীর, আশপাশের লোকদের সশব্দ হাসি আরো লজ্জিত করে তোলে ওকে। উপায় খুঁজে পায় না ও, চাপা হাসির মুখে ঝুঁকে পড়ে লখিন্দরের পিঠের ওপর, নিজেই দু-একটা টঙ্কার দেয় গীটারের তারে। বলে, থামলে কেন, বাজাও না।

মাথা নাড়ে লখিন্দর।—উঁহু। মন ভালো নাই আজ।

এমনিভাবেই দিন কাটছিলো, দিন কাটতোও হয়তো।

বুড়ী ডিহিং-এর সাঁকোর পাশে বালির বালিয়াড়িতে দেখা হয় ওদের।

লখিন্দরের সকালের কীর্তি স্মরণ করিয়ে দেয় দময়ন্তী। বলে, লজ্জা-শরম তোমার কি একেবারেই নেই?

লখিন্দর মাথা নাড়ে। না, নেই। শুধু কি তাই, দময়ন্তীরই বা লাজলজ্জা থাকবে কেন ওর কাছে। দময়ন্তীকে কাছে টেনে নিলো লখিন্দর, ওর মুখের ওপর মুখ নামালে।

—লখিন্দর ভাই!

চমকে ফিরে তাকালো ওরা দুজনেই। কিন্তু কুঞ্জ ততক্ষণে তরতর করে দূরে সরে গেছে।

আশঙ্কায় বিবর্ণ হয়ে যায় দুজনের মুখ।

কুঞ্জ। কুঞ্জ কি প্রতিশোধ নিতে ছেড়ে দেবে। ওর চোখে এক দিন আগুন দেখেছিলো লখিন্দর, সে কামনার আগুন আজ প্রতিশোধের রূপ নিয়ে দেখা দেবে নিশ্চয়। দময়ন্তী যখন লজ্জায় দূরে-দূরে থাকতো, কিছুতেই কাছে এগিয়ে আসতে পারতো না, তখন এই কুঞ্জ এসে আদরে-আহ্লাদে গড়িয়ে পড়তো ওর গায়ে। ওর রুক্ষু চুল এলোমেলো করে দিয়েছে কুঞ্জ, কাঁধ-ঝাঁকানির কপট কৌতুকে দেহের স্পর্শ দিতে চেয়েছে, কানে-কানে ফিসফিস করে কিছু একটা বলতে এসে গালের পাশে গাল নামিয়ে এনেছে। তাই বড় ভয় ছিলো লখিন্দরের, কুঞ্জকে ভয় পেতো ও।

সে আশঙ্কা বুঝি সত্যি হলো।

পরের দিন, তার পরের দিন, তার পরের আরো অনেকগুলো দিন কেটে গেল। কিন্তু দময়ন্তীর দেখা পেলো না লখিন্দর। ভোর না হতেই কিসের নেশায় টিনের চেয়ারটায় এসে বসে লখিন্দর, আশায়-আশায় পথ চেয়ে থাকে, কিন্তু দময়ন্তীর দেখা মেলে না।

কুঞ্জ অনুরোধ করে, গাও না লখিন্দর ভাই, গাও না একটা গান।

গান গায় না তবু লখিন্দর। শুধু জিজ্ঞেস করে, দময়ন্তী আসে না কেন কুঞ্জ?

খিলখিল করে হেসে ওঠে ও।—দময়ন্তী। ঐ বাবুটার সঙ্গে পীরিত হয়েছে ওর। কুঞ্জ বলে।

মনে-মনে হাসে লখিন্দর। ভাবে, হিংসে হয়েছে কুঞ্জর।

কিন্তু মিথ্যে নয় ওর কথা, একেবারে মিথ্যে নয়।

কুঞ্জর কাছ থেকে সব শুনেছিলো যজ্ঞেশ্বর। যজ্ঞেশ্বর বেজবড়ুয়ার কাছ থেকে শুনলো দময়ন্তীর মা জৈন্তা দেবী। সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে দময়ন্তী, বেজবড়ুয়া ঘরের মেয়ে। আর লখিন্দর, আব্রাহাম লখিন্দর পাদ্রীর জল নিয়েছে মাথায়, গির্জেতে গিয়ে ধর্ম বদলেছে। খ্রীষ্টান ও। তা ছাড়া, কি আছে লখিন্দরের? না রূপ, না রূপো। জানে শুধু বাউল-ভাটিয়ালদের মতো গান গাইতে। তাও যদি যাত্রার পালা লেখার দিকে মন থাকতো, পেতো দু পয়সা। না, এ কখনো হতে পারে না। দময়ন্তীর মাকে সাবধান করে দিলো যজ্ঞেশ্বর ; জৈন্তা দেবী সতর্ক করলেন মেয়েকে। মাধবের দোকানে যেতে পাবে না ও, শুনতে পাবে না লখিন্দরের গান।

দময়ন্তী হয়তো কাঁদলো ; হয়তো লজ্জায় কুঁকড়ে গেল ও। কিন্তু দময়ন্তীর সহজ চোখে কামনার কাজল এঁকে দিয়েছিলো লখিন্দর। ওর মেয়ে-মনকে জাগিয়ে দিয়েছিলো নরম ছোঁয়ার মোহাবেশ। তাই, নিষেধ উপেক্ষা করে ছুটে আসতে চেয়েছে দময়ন্তী, ফিকির খুঁজেছে একটিবারের জন্যে, একটি মুহূর্তের জন্যে লখিন্দরকে কাছে পাবার আশায়। কিন্তু এতখানি পথ লুকিয়ে চলে আসা কি সম্ভব?

তবু সাহসে ভর করে এক নির্জন দুপুরে পথে বেরিয়ে পড়লো ও। আঁকাবাঁকা লম্বা কাঁকরের রাস্তা চলে গেছে সিধে, মাধবের দোকান অবধি। শুধু বাঁয়ে বাঁক নিয়েছে আরেকটা রাস্তা, বুড়ী ডিহিং-এর তীরের দিকে।

দ্রুত পায়ে তরতর করে হেঁটে চলেছিলো দময়ন্তী। এপাশে-ওপাশে চোরা চোখে তাকাতে তাকাতে। না, কেউ কোথাও নেই। এ দুপুর রোদে কে বেরুতে যাবে পথে, এক দময়ন্তী ছাড়া!

দ্রুত পায়ে হেঁটে যেতে-যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো দময়ন্তী, পিছনে সাইকেলের ক্রিং-ক্রিং শব্দ শুনে।

সেই ছোকরাবাবু। বাইক থামিয়ে একটা পা মাটিতে ছুঁইয়ে কাত হয়ে দাঁড়ালো লোকটি। একেবারে দময়ন্তীর পাশে।

মুচকি হেসে বললে, কোথায় যাবি রে মেয়ে? চল্ পেঁছে দেবো তোকে। কোথায় যাবি?

ভীতিবিহ্বল বড়-বড় চোখ মেলে তাকালে দময়ন্তী।

ঠোঁটের ফাঁকে হাসলে লোকটি ওর ভয়-কাতর মুখের দিকে তাকিয়ে, তারপর হাত বাড়িয়ে এক ঝটকায় ওকে কাছে টেনে আনলে। একেবারে বাইকের সামনে টেনে তুললে ওকে। ভয়ে-লজ্জায় থরথর করে কাঁপছে তখন দময়ন্তী। অভিভূতের মতো উঠে বসলো ও, কথা বলতে পারলো না।

—কোথায় যাবি? চল্ পেঁছে দেবো।

—মাধবের দোকান। কাঁপা-কাঁপা ঠোঁটে অস্ফুটে বললে দময়ন্তী। মনে ভাবলে, ভালোই তো, তাড়াতাড়ি পেঁছে যাবো। আর মনকে সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া উপায়ও ছিলো না তখন।

কিন্তু মাধবের দোকানে পেঁছতে পেলো না দময়ন্তী। বাঁ দিকের রাস্তায় বাঁক নিয়ে দ্রুত বেগে বাইকটা এসে থামলো নদীর পাড়ে। নামলো দময়ন্তী। লজ্জায় আর আশঙ্কায় ঠোঁট কাঁপছে তখন ওর থরথর করে! অনুনয়ের আবেগে ভেঙে পড়লো ও, চোখ ঠেলে জল এলো। শুধু অস্ফুটে বললে, মাধবের দোকান, মাধবের দোকান যাবো।

ওর কথায় কান দিলো না লোকটি। বাইকটা বালির ওপর ফেলে রেখে পকেট থেকে বের করলে কয়েক গাছা রঙিন কাচের জলচুড়ি। একখানা সবল সমর্থ হাতে দময়ন্তীর কোমর জড়িয়ে ধরে ওকে কাছে, বুকের একান্তে টেনে নিয়ে চুড়িগুলো পরিয়ে দিতে গেল।—না, না। দু হাত নেড়ে শঙ্কিত প্রতিবাদ জানালে দময়ন্তী। হাত লেগে কয়েকটা চুড়ি ভেঙে গেল বুঝি বা। তবু ঘন আশ্লেষে কাছে টেনে এনে ওর চোখের কাছে মুখ নামিয়ে আনলে লোকটি।

ফিসফিস করে বললে, নাম কি তোর?

জবাব দিলো না দময়ন্তী, ঝড়ো পাখির মতো পাখা ঝাপটালে ছাড়া পাবার আশায়।

লোকটি ফিসফিস করে ওর কানের পাশে বললে, এত সুন্দর মেয়ে তুই, আর পথে-পথে ঘুরে বেড়াস্ এখনো? তোকে রানী করবো আমি, বিয়ে করবো আমি তোকে, তুই আমার রানী হবি। কি নাম তোর?

—দময়ন্তী। আধো-আধো স্বরে বললে ও।

—দময়ন্তী? বাঃ, বেশ মিষ্টি নাম তো। আমি তোকে বিয়ে করবো, বুঝলি? তোকে নিয়ে যাবো আমাদের দেশে। অনেক বড় বাড়ি, অনেক জামা-কাপড় পাবি। গয়না দেবো সোনার। যাবি তো?

দময়ন্তী আবার পাখা ঝটপট করলে।

লজ্জায়, আত্মগ্লানিতে কয়েকটা নির্ঘুম রাত কাটলো দময়ন্তীর। যে মন লখিন্দরের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছিলো, সে মন আবার যেন পৃথক হয়ে যায়। লখিন্দরের কাছে যেতে পায় না ও, পথে বের হবার ভরসা পায় না। সেই একটি বিভ্রান্ত মুহূর্তের কথা মনে পড়ে যায়। সমস্ত দেহ শিউরে ওঠে, অশুচি মনে হয় নিজেকে।

তা ছাড়া, লোকটা এখনো মাঝে-মাঝে ঘুরে বেড়ায় ওদের বাড়ির আশেপাশে। হাতছানি দিয়ে, কখনো বা চোখের ইশারায় ডাক দেয় দময়ন্তীকে। কপাটের আড়াল থেকে, জানালার ফাঁক থেকে দেখে সরে এসেছে দময়ন্তী। বাগানে গাছের চারায় ঝাঁঝরির জল ছিটোতে ছিটোতে হঠাৎ দেখতে পেয়ে ছুটে পালিয়ে এসেছে ঘরের ভিতর। ভয়-আশঙ্কায় থরথর করে কেঁপেছে ওর নরম বুক।

রাত্রির গভীরতায়, নিঃশব্দ অন্ধকারে পড়ে-পড়ে কতদিন রোমাঞ্চ এসেছে ওর দেহে। এক দিকে একটি ছোট গ্লানিময় ইতিহাস মনে পড়েছে, নিঃসহায় আত্মধিক্কারে মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে হয়েছে ওর। অন্য দিকে মনে পড়েছে, লখিন্দরের গানের সুর ভেসে এসেছে ওর কানে, গীটারের মিঠে বোল শুনেছে জাগর-স্বপ্নের অনুভূতিতে। উৎসাদন উত্তেজনায় শরীর চঞ্চল হয়ে উঠেছে ওর, উষ্ণ রক্তের উত্তাপে জ্বালা ধরেছে ওর দেহের প্রতি অঙ্গে। অভিমানে আক্রোশে ফেটে পড়েছে ও লখিন্দরের ওপর। চোখের জল মুছে ভেবেছে, লখিন্দর কাপুরুষ, লখিন্দর ভীতু। ঐ ছোকরাবাবুর মতো সাহসে ভর করে কেন এগিয়ে আসে না লখিন্দর, আচ্ছুরিতক আলিঙ্গনে কেন বুকে টেনে নেয় না ওকে।

বিহুপরবের দিন এগিয়ে আসছে তখন। দিন কয়েক পরেই শুরু হবে উৎসব। ঐ দূরের মাঠে ঘর তৈরী হচ্ছে। ও-ঘর আগুনে জ্বলে উঠবে বিহুপরবের দিনে। আকাশ ছুঁয়ে দুলে উঠবে আগুনের শিখা। সমস্ত পল্লীটা গভীর নিশীথের অন্ধকারেও রাঙা হয়ে উঠবে আগুনের রক্তিমাভায়। আর সারা শহরের অহোম মেয়েপুরুষ নাচবে-গাইবে ঐ আগুনকে ঘিরে। হাততালি দিয়ে গান গাইবে, নাচবে। আর চক্র দেবে ঐ আগুনকে। দেহের প্রতিটি অঙ্গে লীলাচপল যৌবনের ছন্দ বাজবে, নাচবে, প্রতিটি ভঙ্গিতে বাজবে কামনার নূপুর। সেদিন, সেদিন হয়তো দেখা হবে লখিন্দরের সঙ্গে। ওর গীটারের তারে বিহুপরবের সুর ঢালবার জন্যে হয়তো লখিন্দর আসবে। একান্তে মিলতে পাবে ওরা দুটি প্রাণী। কল্পনার কথালাপ আর মিলনের স্বপ্নে বিভোর হয়ে যায় দময়ন্তী। আনমনে বিছানা ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়ায়। একেবারে চাঁদধোয়া বাগানের শীতলতায়।

ফরসা আকাশ আর তারাদের ঝিকিমিকি। শুক্লাতিথির আলোয় অন্ধকার ফিকে হয়ে গেছে। নিঃশব্দ, নিস্তব্ধ রাত ; শুধু একটা ময়নার ডাক আসছে থেকে থেকে।

আব্রাহাম লখিন্দর। হঠাৎ মনে পড়ে গেল দময়ন্তীর, লখিন্দর খৃষ্টান। আশার বেলুনটা হঠাৎ যেন চুপসে গেল। তা হলে কি বিহুপরবের দিনেও দেখা পাবে না লখিন্দরের? গান গাইতে দেবে না লখিন্দরকে? কে জানে।

দময়ন্তীর ইচ্ছে হলো এই রাতে, এই অসতর্ক ঘুমের ফাঁকে ছুটে যায় ও। ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে লখিন্দরের বুকে। আনন্দে, হতাশায়।

হঠাৎ সামনের পথটার দিকে চোখ গেল ওর। কি একটা শব্দ। আর সঙ্গে সঙ্গে গাছের নীচে দাঁড়ানো মূর্তিটার ওপর দৃষ্টি পড়লো। গাছের গুঁড়িতে বাইকটা ঠেস দিয়ে রেখে

দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। হাতছানি দিয়ে ডাকছে প্রতি দিনের মতোই।

কিন্তু। ভয়ে কেঁপে উঠলো দময়ন্তী। অথচ অদ্ভুত এক রোমশিহরন জেগে উঠলো ওর সারা দেহে। এই রাতের নিঃসঙ্গতায় বুঝি উপেক্ষা করা যায় না ও হাতছানি।

লোকটা কি যেন বলে উঠলো হঠাৎ।

নিজের অজান্তেই ঠোঁটের ওপর আঙুল চাপলে দময়ন্তী।—চুপ।

নতুন-আসা আপিসগুলো নেমে গেল ডিগবয়ে। নাগাদের দলও একে-একে টিকক পাহাড়ের দিকে রওনা হলো। নতুন-মুখ বাবুগুলোর দেখা মেলে না আর। জন-কল্লোলে জেগে-ওঠা মার্ঘেরিটা আবার যেন মিইয়ে পড়লো আগের মতো।

জৈন্তা দেবী হঠাৎ এক দিন বুঝতে পারলেন অনভিজ্ঞ-যৌবন মেয়ের জীবনে অভিশাপ নেমেছে।

ক্রোধে ফেটে পড়লেন জৈন্তা দেবী। যজ্ঞেশ্বর বুঝলো, বেজবড়ুয়াবংশে কলঙ্কের কালিমা পড়েছে। কিন্তু প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেও কোনো উত্তর পেলেন না জৈন্তা দেবী। নীরব নিরুত্তর দাঁড়িয়ে রইলো দময়ন্তী, উদাস চোখ মেলে। ওর বড়-বড় ব্যথাকাতর চোখ বেয়ে শুধু ব্যর্থতার অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। কোনো উত্তর দিতে পারলো না ও।

জৈন্তা দেবী তবু প্রশ্ন করেন, কে এ অভিশাপ আনলে। কার কাছে শিখেছিস এ পাপ?

দময়ন্তী নিরুত্তর। সব কথা যেন হারিয়ে গেছে।

কি বলবে ও, কি বা বলবার আছে? শেষে জৈন্তা দেবী নিজেই উত্তর দিলেন, বুঝেছি, লখিন্দর! কুঞ্জ আগেই বলেছিলো।

যজ্ঞেশ্বর ভাবলো, লখিন্দরই বুঝি দায়ী!

মাধবের দোকানের আঙিনায় দাঁড়িয়ে ছিলো লখিন্দর। মাটি-ঝলসানো দুপুর রোদে বাতাস কাঁপছে তখন। চোখে চিড়িক লাগে। আঙিনার ঠান্ডা ছায়ায় দাঁড়িয়ে মাঠের দিকে তাকিয়ে ছিলো। শান্ত নির্জন দুপুর। শুধু ফটকের বাইরে পিঠে ছেলে নিয়ে বসে আছে নাগা মেয়েটা। আর উলঙ্গ-শরীর পুরুষটা বাঁশের চোঙায় চা নিয়ে কাঠি নেড়ে নেড়ে আফিং মেশাচ্ছে। সেদিকেই তন্ময় হয়ে তাকিয়ে ছিলো ও।

হঠাৎ দেখলে, যজ্ঞেশ্বর আর পিছনে পিছনে কুঞ্জ এগিয়ে আসছে।

লখিন্দরের সামনে এসে দাঁড়ালো যজ্ঞেশ্বর। ক্রোধে ফেটে পড়লো না, কোনো অনুনয়-বিনয় করলো না। শুধু গম্ভীর স্বরে বললো, দময়ন্তীকে বিয়ে করতে হবে তোমাকে।

বিস্মিত হয়েছিলো লখিন্দর, তবু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো। অবোধ্য চোখে চেয়ে রইলো শুধু।

যজ্ঞেশ্বর চলে যাবার পরও কুঞ্জ দাঁড়িয়ে রইলো। বললে, না লখিন্দর ভাই। দময়ন্তীকে বিয়ে কোরো না, ও পাপে ডুবে আছে। সেই ছোকরাবাবুটা ওকে পাপ শিখিয়েছে।

লখিন্দর হাসলে, সে হাসির অর্থ বুঝতে পারলো না কুঞ্জ।

বুড়ী ডিহিং-এর জলের মতো স্বচ্ছ মন ছিলো দময়ন্তীর। বিয়ের পর সে মন ঘোলাটে হয়ে গেল। অনভিজ্ঞ কিশোর মন ওর। তার এক দিকে ব্যর্থতা, ভয়, হতাশা। আরেক দিকে অসীম লজ্জা, নিরুপায় দুর্বলতার আতঙ্ক। একটি কথাও বলতে পারলো না ও, প্রতিবাদ করে উঠতে পারলো না।

কুঞ্জ শুধু কানে কানে একবার জানিয়ে গেল, ভয় নেই। লখিন্দর মানুষটা নাকি বড় বোকা।

নিজের রসিকতায় নিজেই হেসেছিলো কুঞ্জ, আর অনুশোচনার দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলো দময়ন্তী।

বিয়ের পরেও সে দীর্ঘশ্বাস মুছে ফেলতে পারলো না ও। চোখের জল চাপতে পারলো না। আগের মতো আর সহজভাবে হাসতে পারলো না, চোখের দৃষ্টিতে রইলো

না সেই সারল্যের ছায়া। সব সময়েই একটা শঙ্কিত সন্ত্রাস। আশঙ্কা আর লজ্জা। বুকে অসম্পূর্ণতার ব্যথা, আত্মধিক্কারের গ্লানি। লখিন্দরের সঙ্গে এমন এক অবাধ মিলনের স্বপ্ন দেখেছে ও কতদিন, কত না জাগর রাত ক্ষয়ে গেছে, চোখে কল্পনার রামধনু এঁকে। অথচ আজ সেই স্বপ্ন-সার্থক মিলনের মাঝেও কি এক অনপসরণীয় বিভেদ, দুর্ভেদ্য এক প্রাচীর মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে যেন হঠাৎ ওদের দুজনের মাঝখানে। ওদের দুজনকে দুই তীরে ছিটকে ফেলে রেখে মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে বুড়ী ডিহিং-এর জল। কৌতুকাশ্লেষের সব মুগ্ধ হাসি যেন বোবা হয়ে গেছে একটি সম্ভব-শিশুর কান্নায়।

দিনের পর দিন কেটে যায়, তবু সহজ হতে পারে না দময়ন্তী। লখিন্দর গান গায়, বোল ফোটায় গীটারের তারে। কিন্তু পুরোনো দিনের সে অনুভব, সে তন্ময়তা যেন হারিয়ে ফেলেছে দময়ন্তী। লখিন্দরের গানে ও শুধু বিরহের ব্যর্থতার সুর খুঁজে পায়। প্রতারিতের, প্রবঞ্চিতের ব্যথা লুকিয়ে আছে যেন সে গানে। দয়িতের বঞ্চনায় ব্যথিত একটি আত্মা যেন অসহায় কান্নায় ফেটে পড়ে। কিংবা কে জানে এ সবই হয়তো দময়ন্তীর কল্পনায় গড়া অনুশোচনার আত্মপীড়ন।

তবু। তবু বড় অশান্ত হয়ে ওঠে দময়ন্তী। শীতল শয্যার স্পর্শেও দেহের জ্বালা মুছে ফেলতে পারে না। নিস্তব্ধ নিশীথে লখিন্দরের ঘুমভাঙা অকস্মাৎ সংবাহনে ভয়ে আশঙ্কায় শিউরে ওঠে দময়ন্তী।

দিনের পর দিন শুধু একটিমাত্র চিন্তা হিংস্র ভিমরুলের মতো ওর চারপাশে ঘুরে বেড়ায়, যে-কোনো মুহূর্তে বুঝি হুল ফোটাবার জন্যে উন্মুখ।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল দময়ন্তীর। কি একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখে। সারা শরীর ওর ঘামে ভিজে গেছে। গলা শুকিয়ে গেছে তৃষ্ণায়। বিছানার ওপরই উঠে বসলো ও, বিছানা থেকে নামলো। হ্যাঁ, লখিন্দর ঘুমিয়ে আছে, নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমিয়ে আছে। শান্তিতে, স্বস্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ওর মুখখানা। স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলো দময়ন্তী। এক ফালি চাঁদের আলো এসে পড়েছে ওর মুখের ওপর।

এই জ্যোৎস্না-ভেজা নিস্তব্ধ রাতেই সব প্রতারণা, সব প্রবঞ্চনা শেষ হয়ে যাক। সমগ্র শরীরে আগুন জ্বলে উঠলো দময়ন্তীর। এ আগুন বুঝি বুড়ী ডিহিং-এর জল ছাড়া আর কেউ নেবাতে পারবে না।

অনেকক্ষণ নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থেকে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এলো দময়ন্তী। একেবারে পথের মাঝে। বুড়ী ডিহিং-এর তীরের দিকে, নতুন-বাঁধা সাঁকোটার দিকে পা বাড়ালো ও।

কিন্তু! লখিন্দরের হয়তো ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো।

দ্রুত অপস্রিয়মাণ দময়ন্তীর ছায়াশরীরটা দেখতে পেলো লখিন্দর।

রাতের আকাশে তখন স্পষ্ট চাঁদ, তারার জোনাকি। নির্জন নিস্তব্ধ পথ। বেরিয়ে এলো লখিন্দর। বিস্ময়ে অনুসন্ধিৎসায় দ্রুত পায়ে অনুসরণ করলে ও দময়ন্তীকে।

বুড়ী ডিহিং-এর জলে পা ছুঁইয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো দময়ন্তী। কিন্তু। বড় ভয় হয়। মায়া হয়। চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটি অনাগত শিশুর হাসি-হাসি মুখ। নিবিড় করে বুকে চেপে ধরতে ইচ্ছে হয়, সোহাগ-মধুর মাতৃত্বের আলিঙ্গনে।

না।

দ্রুত পায়ে সাঁকোটার ওপর উঠলো ও। এখানে-ওখানে জ্যোৎস্নার প্রলেপ মাখানো ধোঁয়াটে টিলা আর পাহাড়ের চূড়া। দূরে দূরে দু-একটা গাছ আর পাতার জানালা। রুপোর পাতের মতো নিথর নিস্পন্দ বুড়ী ডিহিং-এর জল, মাছের আঁশের মতো চিকচিক করছে শিশু-তরঙ্গের সারি। আর নদীর বুকে শীর্ণ সাঁকোর কাঁচুলি।

তরতর করে সাঁকোর ওপর উঠে গেল দময়ন্তী। নীচে তাকিয়ে দেখলে। নীচে, অনেক নীচে বুড়ী ডিহিং-এর জলস্রোত। কালো আর ঠাণ্ডা।

না, মিথ্যে মাতৃত্বের লোভে প্রবঞ্চনার জাল বুনবে না ও।

চোখ বুজে লাফিয়ে পড়লো দময়ন্তী।

তাই কি? না। লখিন্দরের সমর্থ বাহু তার আগে ওকে জড়িয়ে ধরেছে।

স্তম্ভিত বিস্ময়ে তাকালো ও লখিন্দরের মুখের দিকে। মৃদু-মৃদু হাসি লখিন্দরের মুখে!

—মা হয়ে সন্তানকে মেরে ফেলতে চাও, দময়ন্তী?

—না, না। বাঁচতে চাই না আমি, বাঁচাতে চাই না আমি ওকে। কান্নায় ভেঙে পড়লো দময়ন্তী।

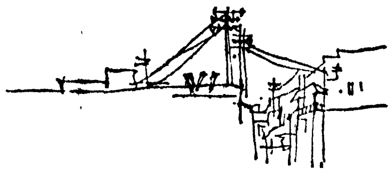
ওদের দুজনের মাঝে এ মিথ্যার প্রাচীর রাখতে চায় না ও। এ ব্যবধান দূরে সরিয়ে রেখেছে ওকে লখিন্দরের কাছ থেকে।

দময়ন্তীর জলে-ভাসা মুখের দিকে তাকালো লখিন্দর। আরো ঘনিষ্ঠ করে বুকের কাছে টেনে নিলো ওকে। প্রাচীর! ব্যবধান।

হাসলে লখিন্দর। আলতোভাবে ওর চিবুক তুলে ধরলে লখিন্দর ওর মুখের কাছে। বললে, এপার আর ওপার মিলিয়ে দিতো কে, সাঁকো না থাকলে? বেজবড়ুয়াদের মেয়ে তুমি, এমন রূপ তোমার! আর আমি? কি আছে আমার? না রূপ, না রুপো। তবে? কে মিলিয়ে দিতো আমাদের?

বিস্ময়ে চোখ তুলে তাকালো দময়ন্তী। তারপর শ্রান্তিতে, শান্তিতে লখিন্দরের বুকে মুখ লুকোলে।

[১৩৫৭



নষ্টনারী

মোগলসরাই স্টেশনে এসে ট্রেনটা যখন পৌঁছলো, রাত দশটা বেজে গেছে। এর পর আর লোকালটার জন্যে অপেক্ষা করা যায় না। 'এ পথটুকু টাঙা নয়তো এক্কাতেই যাওয়া যাক'—করুণাময় বলে।

রাত দশটা বলতে কি বোঝায় স্টেশনের ঝকঝকে আলোয় এতক্ষণ ওরা কেউই ঠাওর করতে পারেনি। টের পেলো আলোর এলাকা পার হয়ে এসে। ওভারব্রিজের এদিকে নামতেই গা-ছমছম অন্ধকার। একটা বিড়ির দোকানে টিমটিমে হ্যারিকেনটা জ্বলছে শুধু, কোলে কুলো নিয়ে বিড়ি পাকাচ্ছে একজন। আর ঘাস চিবোতে চিবোতে পা ছুঁড়ছে ঘোড়াটা, মশার কামড়েই হয়তো।

একটাই টাঙা। শেয়ারে ভাড়া ঠিক করে উঠে পড়লো ওরা। করুণাময় আর নীলা। কোলের ছেলেটাও।

বঁড়শির মতো বাঁক নিয়ে টাঙাটা হঠাৎ ছুটতে শুরু করলো। এমন ঝাঁকানি, শক্ত করে ধরে না বসলে এখনি বুঝি ছিটকে পড়বে রাস্তায়।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই নির্জন আর নিঃঝুম অন্ধকারের মাঠে নামলো টাঙাটা। পিচের পথটুকুর ওপরই যেন রাজ্যের অন্ধকার এসে জমেছে। চারদিক চুপচাপ। কোথাও কোনো শব্দ নেই, কোথাও কোনো আলো নেই। দু'পাশের ঢালু মাঠের মাঝ দিয়ে শুধু শিরদাঁড়ার মতো উঁচু হয়ে আছে লম্বা মেটাল রোড। দু জোড়া খুরের টপাটপ আওয়াজ ছাড়া আর কিছু কানে আসে না।

পথের দু'পাশে গাছের সারি, ছায়াশরীরের রহস্য মেখে নিঃশ্বাস চেপে আছে। স্তব্ধতা ভাঙবার জন্যে মাঝে মাঝে দু-চারটে কথা বলে নীলা, দু-চারটে কথার জবাব দেয় করুণাময়। তারপর আবার সেই নীরবতা। বাচ্চাটাকে এক বুক থেকে আরেক বুকে বদলে নিতেই হাতের চুড়িতে টুংটাং আওয়াজ উঠলো। ভয় হবার কথা বটে, নেই নেই করেও হাতে গলায় কোন্-না হাজার পাঁচেক টাকার সোনা আছে। আর এমন নির্জন রাতের রাস্তায় টাঙাওলাদের গুন্ডামির কথাও শোনা গেছে। লোকটা অবশ্য রোগাসোগা, কিন্তু করুণাময়ই বা কি এমন পালোয়ান! তা ছাড়া রাস্তার কোথাও দলের লোকও যে অপেক্ষা করছে না, তাই বা কে বলতে পারে! করুণাময়ও যেন অনেকক্ষণ চুপচাপ, কথা বলছে না কেন? ভাবতেই কেমন ভয়-ভয় করলো, পিছন ফিরে তাকালো নীলা। না, গঙ্গার পুল এখনো অনেক দূরে। দূরের আলোর সারিও গাছপালায় ঢাকা পড়েছে।

গাড়িটা খাড়াই উঠতে শুরু করেছে ইতিমধ্যে। কিন্তু শব্দ ভেসে আসছে কিসের? টাঙারই ডুমডুমি যেন, ঘোড়ার খুরের টপাটপ টপাটপ আওয়াজ আসছে। ওদের গাড়িটার অনেক আগে আগে আরেকটা টাঙা চলছে বোধ হয়। হ্যাঁ, ঘাড় ফিরিয়ে সামনের পথের দিকে তাকালে নীলা, অনেক আগে এক টুকরো সল্‌তে-পোড়া লণ্ঠন দুলছে মনে হলো।

তারপর হঠাৎ একসময় আলো অদৃশ্য হয়েছিলো, শব্দ শোনা যায়নি। কখন আপনা থেকেই ভয় মুছে গিয়েছিলো নীলার মন থেকে। তন্দ্রায় চোখ জুড়ে আসছিলো একবার, আবার পরমুহূর্তেই চোখ টেনে ঘুম তাড়াবার চেষ্টা করছিলো। আর সেই ফাঁকে কখন সত্যি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছিলো।

হঠাৎ একটা চিৎকারে চমকে জেগে উঠলো নীলা। আর পরক্ষণেই আতঙ্কে শিউরে উঠলো। খোকন কই? যাক, পড়ে যায়নি, করুণাময়ের কোলেই আছে। ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে কখন করুণাময়ের কাঁধে মাথা রেখেছিলো ও, আর সেই ফাঁকে নীলার অজান্তেই খোকনকে কোলে তুলে নিয়েছে করুণাময়।

কিন্তু চিৎকার কিসের? ভালো করে চেয়ে দেখলে নীলা।

এক পাশে একটা টাঙা, আর বিদঘুটে চেহারার একটা লোক দু হাত তুলে ওদের পথ আটকে দাঁড়িয়েছে। লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোয় অস্পষ্ট হলেও লোকটাকে দেখা গেল। বেঁটে আর মোটা। কালোও নিশ্চয়ই। শুধু সাদা ফুটফুটে একটা ধুতি আর পাঞ্জাবি দাঁড়িয়ে আছে যেন। মুখটা অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে, পাঞ্জাবির হাতা দুটোর ভেতর থেকে রক্ত-মাংসের কোনো হাত বেরিয়ে এসেছে বলে মনেই হলো না। কন্ধকাটাও বোধ হয় এতখানি বীভৎস নয়।

আতঙ্কের ঝিমঝিমুনি দূর হতেই চোখ পড়লো আরো একজনের ওপর। দেখলে, টাঙাটার আড়ালে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি মেয়ে। কপাল অবধি ঘোমটায় ঢাকা এক টুকরো ফরসা মুখ। আড়নম্র চোখে হয়তো ওদেরই লক্ষ করছে।

ইতিমধ্যে কি যেন কথা হলো করুণাময় আর ঐ গুণ্ডা-মতো লোকটার সঙ্গে। কি বিশ্রী আর মোটা লোকটার গলার স্বর! আর গায়ে শক্তিও তেমনি। বাক্স-প্যাঁটরাগুলো ও-গাড়ি থেকে এ-গাড়িতে এনে রাখলো এমন অবহেলায় যেন দুটো হালকা সুটকেস আনলো।

—শালার ঝামেলা! বোধ হয় করুণাময়কেই শোনাবার জন্যে বললো, মাঝরাস্তায় চাকা ভেঙে পড়ে রইলেন। আপনারা না থাকলে কি দশাটা হতো বলুন তো? কথার শেষে সশব্দে হেসেও উঠলো লোকটা, আর সঙ্গে সঙ্গে দু পাটি সাদা-সাদা দাঁত ঝকঝক করে উঠলো!

করুণাময় বিরক্তির গলায় বললে, আসুন তাড়াতাড়ি, এমনিতেই রাত অনেক হয়েছে।

হ্যাঁ, তা হয়েছে বইকি। লোকটা একটা তুড়ি বাজালো হাতে, শ্যামু, উঠে পড়ো চটপট।

মেয়েটি এগিয়ে এলো ধীরে ধীরে, টাঙার আড়াল থেকে। ঘোমটাটা টেনে বাড়িয়ে দিলে একটু। তারপর পাদানিতে পা দিয়ে ওঠবার আগেই ওকে টুপ করে দু হাতে শূন্যে তুলে ধরলো লোকটা, বসিয়ে দিলো সামনের আসনে। নিজেও উঠে বসলো।

টাঙা ছেড়ে দিতেই ঝর্‌ঝর্‌ করে ঘাম ঝরে পড়লো। তবু কেমন অস্বস্তি লাগলো নীলার। পিঠোপিঠি বসেছে ওরা, মাঝখানে ইঞ্চিখানেকের একটা কাঠের ব্যবধান থাকলেও ঝাঁকানির চোটে পিঠে পিঠ লাগছে মাঝে মাঝে। আবার তাও ঐ অদ্ভুত লোকটাই বসেছে

ওর পিছনে। করুণাময়ের পিঠে কি ঐ মেয়েটির পিঠ লাগছে? নীলা ভাবলে এক মুহূর্ত, আড়চোখে একবার তাকিয়ে মনে মনেই হাসলে।

গঙ্গার পুলে উঠতেই ওপারের আলো-ঝলমল শহর চোখে পড়লো। ঠাণ্ডা জলো বাতাসের প্রলেপ পড়লো সারা গায়ে। ফিসফিস করে বললে, ধর্মশালার খবরটা নাও না এবার।

করুণাময় খানিক কিন্তু-কিন্তু করে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে, কোথায় যাবেন আপনারা?

—চৌখাম্বা, চৌখাম্বা বাজারের মুখে। নিজের বাড়ি আছে আমার। বিশ-পঁচিশ, হ্যাঁ, বিশ-পঁচিশ বছর হয়ে গেল এখানে। বিশ্বনাথের গলিতে একটা জরির, একটা তামা-পেতলের দোকান আছে আমার। নিবারণ মাইতি—নিবারণ মাইতির জরি-বুটির দোকান বললেই যে-কেউ দেখিয়ে দেবে।

বেঁটে থামের মতো চেহারা লোকটার। অথচ চোখেমুখে কথার খই ফুটছে। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে নীলাকে হাসি চাপতে হবে বুঝি এইবার। ঘাড় ফিরিয়ে লোকটার দিকে তাকালে নীলা, দেখতে পেলো না বিশেষ কিছু। মনে হলো অন্ধকারটা হঠাৎ এক জায়গায় ঘন হয়ে আবছা মূর্তি নিয়েছে শুধু, মানুষ নয়।

করুণাময় কি বলতে চায় সেদিকে হুঁশই নেই নিবারণের, নিজের মনেই অনর্গল আত্ম-কাহিনী আউড়ে যায়। ভদ্রতার খাতিরেও জিজ্ঞেস করে না, কোথায় যাবেন, কোথায় উঠবেন? টাঙাটাও এদিকে গঙ্গার পুল পার হয়ে আলো-উজ্জ্বল শহরে ঢুকছে।

করুণাময় শেষে নিজেই প্রশ্ন করলে, ভালো ধর্মশালা বা হোটেল-টোটেলের খবর দিতে পারেন?

—ধর্মশালা? ভালো অথচ ধর্মশালা? আসল উত্তর এড়িয়ে গিয়ে লোকটা আবার বাক-বকুনি শুরু করলে।—তার চেয়ে বলুন না সোনার পাথরবাটি। হেঁ হেঁ করে নিজের রসিকতায় নিজেই হাসলো লোকটা। বললে, বিশ-পঁচিশ বছর হয়ে গেল মশাই এই কাশীতে, চোখ বেঁধে ছেড়ে দিন চৌখাম্বার বাড়ি থেকে, ঠিক দেখবেন দোকানে পেঁছে যাবো, একটা কলার খোসাতেও পা পড়বে না। আর আপনি-বলেন কিনা—

—না, মানে খবরটা পেলে উপকার হতো।

—খবর আমি না দিলে কে দেবে শুনি! ধর্মশালাই বলুন অধর্মশালাই বলুন, কাশীর সব শালাকেই আমি চিনি। ডালকামুণ্ডিতে চলে যান সিধে, বাঙালীর হোটেল চান তাও পাবেন। তবে পাড়াটা খারাপ, বাঈজী-বেবুশ্যেদের আড্ডা...

কথা পালটাবার জন্যে করুণাময় তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, হোটেলের নামটা কি বলে দিন না?

—মুখুজ্যে, মুখুজ্যের হোটেল বললেই নিয়ে যাবে। আমার পেয়ারের লোক হচ্ছে গিয়ে, বলবেন, নিবারণ মাইতি পাঠিয়ে দিলে। আমার নাম করতে ভুলবেন না যেন। এই রোখো, রোখো...টাঙাওয়ালার উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠলো নিবারণ।

চৌখাম্বার গলির সামনেই টাঙা দাঁড়ালো। ছোটখাট সুন্দর বউটিকে টুপ করে আবার নামিয়ে দিয়ে বোঁচকাবুঁচকিগুলো দু হাতে ঝুলিয়ে টাঙার পিছনে এসে দাঁড়ালো নিবারণ। নীলাকে বললে, আসি মা-লক্ষ্মী, রইলেন তো এখন ক'দিন। যাবেন আমার দোকানে। বিশ্বনাথের গলিতে ঢুকেই বলবেন, নিবারণ মাইতির জরি-বুটির দোকান। তা হলেই দেখিয়ে দেবে। নমস্কারের বদলে কাঁধটা একটু ঝাঁকালে শুধু।—আসি তা হলে।

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে নীলা, আর সঙ্গে সঙ্গে নিবারণের আড়ালে দাঁড়ানো বউটির দিকে চোখ গেল ওর। ঘোমটা খুলে পড়েছে। হঠাৎ যেন মেয়েটির সারা মুখে রক্ত জমে গেছে। বিস্ময়ের দৃষ্টিতে বড়-বড় চোখ মেলে তাকিয়ে আছে করুণাময়ের দিকে। ফিরে তাকালে নীলা। হ্যাঁ, বাজারের ঝলমলে আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেলো নীলা, করুণাময়ের মুখেও অস্বস্তির ছায়া।

—বউ বুঝি?

মেয়েটি এগিয়ে এসে কৌতুকের হাসি হাসলে। তারপর একবার করুণাময়ের দিকে একবার নীলার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে, বউ বুঝি?

—হ্‌ঁ। বলেই করুণাময় অন্য দিকে মুখ ফেরালে।

মেয়েটি তবু নাছোড়বান্দা। করুণাময়ের কোলের শিশুটিকে দেখিয়ে আবার প্রশ্ন করলে, তোমার?

—হ্‌ঁ। আবার সেই গম্ভীর গলার ছোট উত্তর।

—ছেলে না মেয়ে?

করুণাময় উত্তর দিলো না দেখে নীলাই বললে, ছেলে।

মেয়েটি ঠোঁট টিপে হাসলো। তারপর নিবারণের কানে কানে কি যেন বললে।

চমকে উঠলো নিবারণ।—অ্যাঁ! এতক্ষণ বলোনি? আরে মশাই আসুন। আসুন। নেমে আসুন, হোটেলে কোথায় যাবেন?

করুণাময় কোনোরকমে বললে, না, থাক। মুখুজ্যে, না কার...

—হ্যাঁ, মুখুজ্যের হোটেলে যাবেন! শালা এক নম্বরের জোচ্চোর। আসুন, নেমে আসুন। তা ছাড়া, আপনি হলেন গিয়ে সম্বন্ধে আমার...হে-হে করে হাসলো নিবারণ—সবচেয়ে বড় সম্বন্ধ, কি বলেন?

অগত্যা নামতেই হলো ওদের।

নীলা শুধু সকৌতুকে বললে, পরিচয়টা কি এ-জন্মের, না গত জন্মের?

করুণাময় উত্তর দিলো না। পরিচয় তো গত জন্মের নয়, গত জীবনের।

শ্যামলীর সঙ্গে আবার দেখা হবে, এতদিন বাদে হঠাৎ এমনভাবে দেখা হবে ভাবতেও পারেনি করুণাময়। কত বদলে গেছে শ্যামলী, নতুন মানুষ হয়ে গেছে। আর, সারা রাস্তা ওর পিঠের স্পর্শ পেয়েও করুণাময় বুঝতে পারেনি, সন্দেহ হয়নি একবারের জন্যেও। অথচ, এই তো ক'টা বছর আগে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হলে বুঝতে পারতো।

কাছাকাছি বাড়িতেই থাকতো ওরা। করুণাময়ের সঙ্গে বাড়িতে এসে দেখা না করতে পারলেও দেখা দিয়ে যেতো সে প্রতি দিন বিকেলে। রোদ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কান পেতে বসে থাকতো করুণাময়। তারপর ওর বোনের সঙ্গে দুড়দাড় করে কাঠের সিঁড়িতে শব্দ করে ছুটতে ছুটতে ওপরে উঠে আসতো শ্যামলী। দু-একটা সকৌতুক ইশারা-ইঙ্গিত, দু-চারটে ছোট ছুটকো কথা ছাড়া আর কিছু হতো না অবশ্য। তবু নিজের ঘরে বসে বসে ওদের উচ্চকিত হাসি আর কথা শুনতো ও। আবার যখন সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে হালকা পায়ে নেমে যেতো শ্যামলী, তখনো ঠিক বুঝতে পারতো করুণাময়।

শুধু কি তাই! এক দিন ওর অনুপস্থিতিতে ওর ঘরে সারাটা দুপুর কাটিয়ে গিয়েছিলো শ্যামলী। সুধার সঙ্গে গল্প করতে করতে ওর বিছানায় শুয়েও ছিলো হয়তো। একটিমাত্র স্প্রিং-এর মতো কোঁকড়ানো চুল দেখে ধরতে পেরেছিলো ও, টেবিলের ওপর ছড়ানো কাঁচিতে-কাটা কাগজের টুকরোগুলো দেখেই চিনেছিলো কার কাণ্ড।

তারপরেও ওর ঘরে বহুবার এসেছে শ্যামলী। পরিপাটি করে গুছিয়ে রাখা তো দূরের কথা, সব ওলটপালট করে দিয়ে যেতো সে। আলমারি ঘেঁটে এ-থাকের বই ও-থাকে, ও-থাকের বই টেবিলের ওপর এনে রাশ করে রাখতো। কোনো দিন চাদরটা চেয়ারে আর মাথার বালিশ পায়ের দিকে ফেলে দিয়ে গেছে। তবু বেশ লাগতো করুণাময়ের। শ্যামলী এসেছিলো, ওর ঘরের বাতাসে তার স্পর্শ রেখে গেছে, এ কথা ভাবতেও রোমাঞ্চ অনুভব করতো করুণাময়।

ভোর ছ'টার সময় কলেজ বসতো শ্যামলীদের। ছ'টা বাজার আগেই ট্রামে-বাসে, ফুট-পাথের ধারে ধারে, পার্কের রেলিং ঘেঁষে রঙবেরঙের পাখির মতো শাড়ি-জড়ানো মেয়েদের ভিড় দেখা যেতো। ঘুম-ভাঙো-ভাঙো শিশিরে-ধোয়া নরম-শরম চোখ আর হাসিতে-ভেজা ঠাণ্ডা কথার কৌতুক ভেসে উঠতো।

করুণাময়ও এসে দাঁড়াতো এই সময়েই। একটা থামের পাশে থামের মতোই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতো। পুব দিকের রাস্তাটার দু'পাশে উঁচু-উঁচু বাড়ির সারি, তারই ফাঁকে সিঁথির মতো সরু এক ফালি আকাশ দেখা যেতো, রুপো চমক দিতো। ফিকে-ফিকে লোক-

চলাচল শুরু হতো, কাঁধে হোসপাইপ বয়ে নিয়ে জলঝুরি ছিটিয়ে যেতো দুটো লোক।

তারপরই হঠাৎ এ-গলি সে-গলি থেকে এক ঝাঁক পায়রার মতো মিষ্টি মেয়ের দল এসে হাজির হতো এই মোড়টায়। কথা আর হাসিতে বাতাস কেঁপে উঠতো। রাস্তার ধারে ধারে, পার্কের গায়ে গায়ে কলেজের ফটক অবধি তীর্থকন্যাদের ভিড় হতো শুধু।

বাতাসের মতো সোঁ-সোঁ শব্দ করে একটার পর একটা ট্রাম পিছলে এসে থামতো মোড়ের মাথায়। তারপর আরেক দফা দম নিয়ে একেবারে কলেজের গেটে। পাখা ঝটপট করে বেরিয়ে আসতো ওরা সবাই, একজন ছাড়া।

শ্যামলী। কলেজ পেঁছবার আগেই শ্যামলী নেমে পড়তো। একটা স্টপেজ আগে, মোড়ের মাথায় ট্রাম থামতেই একরাশ মোটা-মোটা বইখাতা বুকে চেপে টুপ করে নেমে পড়তো ও। ছোটখাট একহারা শরীর, চটুল চোখ, চতুর দৃষ্টি। আর মুখের হাসির মতোই চঞ্চল, স্বতঃস্ফূর্ত। বাঁ হাতে বইপত্তর, পিছনে রবারের টুকরো লাগানো একটা হলদে পেন্সিল ডান হাতে।

ট্রাম থেকে নেমেই শাড়ির আঁচলটা ঘুরিয়ে এনে পিঠ ঢাকতো, পাড়ের কোনাটা দাঁতে চেপে গালে পেন্সিল বাজাতে বাজাতে এগিয়ে আসতো ও। দূরে দাঁড়ানো করুণাময়ের দিকে।

শ্যামলীকে নামতে দেখে ট্রামের জানালায়-বসা মেয়েরা ঠোঁট টিপে হাসতো, আলাপী দু-চারজন টীকাটিপ্পনী ছুঁড়তে কসুর করতো না। ঘাড় না ফিরিয়েও শ্যামলী বুঝতে পারতো, শুনতে পেতো, হাসতো করুণাময়ের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই।

আর ট্রামটা চলে যেতেই ধুপ করে বই-খাতাগুলো করুণাময়ের হাতের ওপর ফেলে দিতো ও।

—বাঃ রে, তোমার বই-খাতা রোজ রোজ আমি বইতে যাবো কেন? অনুযোগ করতো করুণাময়।

শ্যামলী তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে উত্তর দিতো, ও মা, দু-দিন পরে আমাকেই বইতে হবে, বই-খাতাতে আপত্তি এখন থেকে?

তারপর, কোনো দিন ফাঁকা মাঠের নির্জনতায় পার্কের ঘাসে, গাছের ছায়ায় ছায়ায় কিংবা পথে পথে ঘুরেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেতো। পা ছড়িয়ে গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসতো ওরা, আর চিনেবাদামের খোসার স্তূপ জমে উঠতো ওদের পাশে।

সেদিনও এসে বসলো ওরা নির্জন পার্কের কোণে, পুরোনো বেঞ্চটায়। কিন্তু কিছুতেই যেন সহজ হতে পারলো না করুণাময়। ভালোবাসা যতই গভীর হয়, মনের গোপনে ভয়ের বেলুন ততই হয়তো ফেঁপে ওঠে। ভালোবাসা হারাবার ভয়। ভয় থেকে সন্দেহ। শ্যামলীকে এত কাছে পেয়েও যেন কাছে পাচ্ছে না করুণাময়, এত মন-জানাজানির পরেও যেন দূরে সরে যাচ্ছে শ্যামলী।

প্রলাপের মতো নিরর্থক কথা আর কথা।

শ্যামলীর পিঠের ওপর হাত রাখলে করুণাময়। আরো কাছে টেনে আনতে চাইলে ওকে। আর সঙ্গে সঙ্গে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকালে শ্যামলী। ধীরে ধীরে করুণাময়ের হাত সরিয়ে দিলে ওর পিঠের ওপর থেকে।

এমন ঘটনা নতুন নয়। করুণাময়ের কাছে অজানা কোনো বিস্ময় নয় শ্যামলীর এ ব্যবহার। মনের কপাট খুলে রেখেও স্পর্শ বাঁচিয়ে চলতে চায় যেন শ্যামলী। কিন্তু কেন?

সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পায়নি করুণাময়। শুধু অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে কখনো-সখনো, আঘাত পায়নি।

সেদিনও আহত বোধ করলো না করুণাময়, কিংবা এত বেশী আঘাত পেলো যে, অনুভবের চেতনাও হারিয়ে ফেললো।

ঠিক অন্য-অন্য দিনের মতোই শ্যামলী ওর হাতটা সরিয়ে দিতেই করুণাময় বললে, আমি জানতাম।

—কি জানতে? কপালে ভ্রূ তুলে স্মিতহাস্যে প্রশ্ন করলে শ্যামলী।

ওর হাসি দেখে ক্রোধে ফেটে পড়লো করুণাময়।—হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা কোরো না। এ-চিঠি তোমারই লেখা।

পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে ছুঁড়ে দিলো করুণাময়। 'প্রেম নয় রে বোকা মেয়ে, ও আমার সময় কাটাবার সঙ্গী শুধু।'—কোনো বান্ধবীকে লেখা শ্যামলীরই চিঠি। বিশ্বাস করে একান্ত গোপনে যে চিঠি ও লিখেছিলো, তা যে করুণাময়কেই পাঠিয়ে দিয়ে কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, তা কি ও ভেবেছিলো কোনো দিন। শ্যামলী কি করে বোঝাবে যে লজ্জা বাঁচাবার জন্যে, সত্য ঢাকবার জন্যে অনেক মিথ্যেই মেয়েদের বলতে হয়।

—তোমার কাছে এতদিন যা বলেছি, তার কোনো দাম নেই, যা লিখতে বাধ্য হয়েছি, সেইটুকুই সত্যি হলো? দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে চোখে জল এলো শ্যামলীর।

তারপর কিছুদিন চলেছে না দেখার, না দেখা দেওয়ার অভিমান। আবার ভুল ভেঙেছে, সন্দেহ দূর হয়েছে। বিরহশেষের উন্মাদনায় মিলনের দিনকে কাছে টেনে আনবার আকাঙ্ক্ষা জানিয়েছে করুণাময়।

ভয়ে আনন্দে থরথর করে কেঁপে উঠেছে শ্যামলী, অনুরোধের স্বরে বলেছে, না, না, বাবার অমতে কিছু করতে বোলো না আমায়। কখনো কৌতুকে হেসে উঠেছে শ্যামলী।—ইস্কুলের মেয়ের মতো পালিয়ে যাওয়া, না, মরে গেলেও তা পারবো না আমি।

তবু চুপিচুপি এক দিন ওর দিদির কাছে খুলে বলেছে সব কথা। মাকে অনেক ছোটবেলাতেই হারিয়েছে, তা নইলে মাকেও বলতে বাধতো না হয়তো। কিন্তু সব স্নেহ-মমতা উপেক্ষা করেছেন শিবব্রতবাবু। না, এ অনাচার তিনি হতে দেবেন না, এমন অসামাজিক ঘটনা তাঁর বংশে ঘটতে পারে না। মা-হারা মেয়েকে মানুষ করেছেন তিনি, জীবনে কোনো আঘাত দেননি মেয়েদের, কিন্তু, কিন্তু এ অবৈধ বিবাহ তিনি সমর্থন করতে পারবেন না।

মেয়ের ইচ্ছায় বাধা দেননি কখনো, কলেজে পড়তে দিয়েছেন, স্বাধীনতা দিয়েছেন প্রচুর। কিন্তু, না, এ হতে দেবেন না শিবব্রতবাবু।

বলেছেন, শ্যামলীকে কলেজে যেতে হবে না আর, বলে দিও।

বলেছেন, শ্যামলীর ওপর একটু চোখ রেখো চামেলি।

তাই, করুণাময়ের সঙ্গে দেখাসাক্ষাতেও যতি পড়েছে এক দিন। আর অন্ধ আক্রোশে বাবার ওপর গুমরে মরেছে শ্যামলী, বিছানায় পড়ে পড়ে কেঁদেছে, কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে শুধু।

তারপর।

তারপর হঠাৎ এক দিন উঠে দাঁড়িয়েছে ও। হিংস্র আনন্দে নিজের মনেই হেসে উঠেছে।

ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন শিবব্রতবাবু। পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকালেন।—এসেছো! গম্ভীর গলায় বললেন শুধু।

ধীরে ধীরে পাইপটা তেপায়ার ওপর নামিয়ে রেখে করুণাময়ের আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে গেলেন একবার।—স্কাউন্ড্রেল! চিৎকার করে উঠলেন হঠাৎ।

—তুমি শিক্ষিত? তুমি ভদ্রসন্তান? গর্জে উঠলেন শিবব্রতবাবু।

করুণাময় উত্তর দিলো না কোনো। কি উত্তর দেবে ও? ও নিজেই জানে না কেন এ ক্রোধ, এ অপমানোক্তি! শিবব্রতবাবুর কাছে এমন ব্যবহার প্রত্যাশা করে ও আসেনি।

—ইডিয়ট! শিবব্রতবাবু আবার মন্তব্য করলেন।

—বাবা! বড় মেয়ে চামেলি এসে দাঁড়ালো তাঁর ঘাড়ে হাত দিয়ে। শিবব্রতবাবুর চুলে আঙুল ঢুকিয়ে ধীরে ধীরে বললে, বাবা! ডাক্তার না তোমাকে জোরে কথা বলতে নিষেধ করেছে?

ডাক্তারের নিষেধ নয়। চুলে আঙুলের স্পর্শটুকুই যেন ফিসফিস করে বললে, রাগলে ক্ষতি হবে বাবা। অপমান কোরো না ওঁকে।

—হুঁ! দীর্ঘশ্বাস ফেললেন শিবব্রতবাবু। বললেন, তুমি ভেতরে যাও।

চামেলি ঘরে যেতেই হাত-পা থরথর করে কেঁপে উঠলো শিবব্রতবাবুর। স্বাভাবিক-

ভাবে কথা বলতে পারলেন না। চোখের কোণে জল জমে এলো আবার।

—ফ্যুল। দু-দিন আগে বলতে কি হয়েছিলো? অ্যান্ড উই টু কুড্‌ন্‌ট হ্যাভ ডিটেকটেড বাট ফর দি সিমটমস। গলার স্বর নামিয়ে বললেন।

করুণাময় তখনো বিস্ময়ের চোখে তাকিয়ে আছে।

—শ্যামলীর সঙ্গে তোমার বিয়ে আমি দিতাম না, তোমার মতো স্কাউন্ড্রেলের হাতে মেয়ে দেবার দুর্বুদ্ধি আমার হতো না কোনো দিন...সাচ্‌ অ্যান ইনোসেণ্ট ফ্লাওয়ার...তার সর্বনাশ করতে কনসেন্সে লাগলো না তোমার, ইডিয়ট?

এতক্ষণে খানিকটা রহস্যের হদিস পেলো যেন করুণাময়।

ভয়ে ভয়ে অত্যন্ত ধীর স্বরে বললে, শ্যামলীর কোনো ক্ষতি তো আমি করিনি!

—ক্ষতি করোনি? আবার গর্জে উঠলেন শিবব্রতবাবু!—অ্যান্ড শি ইজ গোয়িং টু বি এ, গোয়িং টু বি এ...। কথা শেষ করতে পারলেন না শিবব্রতবাবু। তবু চমকে উঠলো করুণাময়। উদ্‌ভ্রান্ত অবোধ্য দৃষ্টিতে শিবব্রতবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিজেরই অজান্তে বেতের চেয়ারটায় বসে পড়লো ও। কোনো কথা বলতে পারলো না।

—এই উইকের মধ্যেই ইউ টু মাস্ট গেট ম্যারেড। যাও, মেক্‌ ইওরসেল্‌ফ রেডি।

চেয়ার ছেড়ে উঠলো করুণাময়, বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। 'মেক্‌ ইওরসেল্‌ফ রেডি'। পথ চলতে চলতে হাসলে করুণাময় নিজের মনেই। হ্যাঁ, প্রস্তুত হতে হবে। কিন্তু! আশ্চর্য! আশ্চর্য মেয়েদের মন। সত্যি, শ্যামলীর নিরপরাধ ফুলের মতো সুন্দর মুখের আড়ালে এতখানি কলুষ কি করে লুকিয়ে ছিলো। এমন অর্থহীন খেলা খেলেছে কেন সে এতদিন করুণাময়ের সঙ্গে? আর, আর সব দোষ সব গ্লানি আজ করুণাময়ের ব্যর্থ বুকে কেন ঢেলে দিলো? অদ্ভুত! 'প্রেম নয়, ও আমার সময় কাটাবার সঙ্গী শুধু'। চিঠির সে লাইনটা চোখের সামনে ভেসে উঠলো আবার। কিন্তু, কিন্তু এই সর্বনাশের জন্যে দায়ী কে? আর, এ-সমস্ত অপরাধের ভার করুণাময়ের ওপরই বা চাপিয়ে দিলো কেন শ্যামলী? যদি সত্যিই অন্য কাউকে ও ভালোবেসে থাকে, সমস্ত দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি দিলো কেন তাকে?

চোখের সামনে ওর সমস্ত আলো অন্ধকার হয়ে গেল, পায়ের তলার মাটি যেনো নদীর পাড়ের মতো হঠাৎ যেন ধসে গেল। প্রশ্ন আর প্রশ্ন। হাজারো অবোধ্য প্রশ্ন ঘুরলো ওর মাথায়, অনেক কল্পনা।

একবারও মনে হলো না এ-সবই শ্যামলীর অভিনয়।

দিন কয়েক পরেই আশংকার উত্তেজনায় অধীর হয়ে চামেলি এসে ডাকলো। —শ্যামলী!

চিঠি লেখার নীল প্যাডখানা চাপা দিয়ে সহাস্য মুখ তুলে তাকালো শ্যামলী। পরক্ষণে চামেলির মুখে ব্যর্থতা দেখে বিস্মিত হলো।

—শ্যামলী! ধীরে ধীরে উদাস চোখ মেলে চামেলি বললে, শ্যামলী, করুণাময় নেই।

—নেই? শুধু প্রতিধ্বনি তুললে শ্যামলী।

—চলে গেছে। খবর না দিয়ে চলে গেছে সে।

করুণ-বিষণ্ণ দৃষ্টিতে দিদির মুখের দিকে তাকালে ও। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো এক-দৃষ্টে। তারপর হঠাৎ সশব্দে হেসে উঠলো শ্যামলী। সমস্ত ঘর কাঁপিয়ে যেন হাসি ফেটে পড়লো তার। দেয়ালে দেয়ালে ঘা খেয়ে ঘুরে এলো সে হাসি, সশব্দ হাসির উচ্চকিত রেশ জানালার কাঁচ ভেঙে দিলো যেন। বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়লো শ্যামলী। তবু যেন হাসি চাপতে পারছে না : বাতাস কাঁপিয়ে তুলছে ক্রমাগত।

—পালিয়েছে। পালিয়েছে সে। শ্যামলী বললে, তারপর আবার সশব্দে হেসে উঠলো। পাগলের হাসি যেন। অর্থ নেই, শেষ নেই।

কতগুলো বছর কেটে গেল, তবু সে হাসি আর বন্ধ হলো না। কত ডাক্তার, কত মনস্তত্ত্ববিদ্‌কে দেখানো হলো কিন্তু শিবব্রতবাবু মেয়েকে প্রকৃতিস্থ করতে পারলেন না।

জীবনের শেষ ক'টা দিন সমাজ-সংসার থেকে দূরে সরে কিছুটা নির্বিকার আনন্দে কাটাবার জন্যে এসে উঠলেন এখানে। নিবারণ মাইতির বাড়ির একটা অংশ ভাড়া নিয়ে

বাসা বাঁধলেন নতুন করে। সঙ্গে বড় মেয়ে চামেলিও।

নিবারণ মাইতির ডাক পড়লো সঙ্গ দেবার জন্যে, এটা-ওটা সাহায্য করবার জন্যে। নিবারণও বেঁচে গেল অসহনীয় একাকিত্ব থেকে।

পাশাপাশি বাড়ি, একই বাড়ির পাশাপাশি ঘর বললেও চলে। উত্তরের একখানা কি দেড়খানা ঘর নিয়ে নিবারণ আর তার দোকানের কর্মচারীর যৌথ সংসার। দুজনেই অবিবাহিত। আর পুবের দুখানা ঘর ভাড়া নিলেন শিবব্রতবাবু। বারান্দা ডিঙিয়ে এ-বাড়ি ও-বাড়ি করা চলে যখন খুশি।

তবু প্রথম প্রথম একটু দূরে দূরে থাকতো নিবারণ। শহুরে শিক্ষিত লোক, চলনে-বলনে বিদেশী ঢং ভদ্রলোকের। তার ওপর বেশভূষাতেও সর্বদা কলারহীন শার্ট আর দামী কাপড়ের ট্রাউজার। মুখে পাইপ। এসব দেখে একটু সমীহ করে চলতে হতো নিবারণকে। খুঁটিনাটি সাহায্য করার ইচ্ছে থাকলেও ভয়ে ভয়ে এড়িয়ে চলতো। ভয় কি শুধু শিবব্রত-বাবুকে? মেয়ে দুটিকেও ভয় পেতো নিবারণ। বড়টি ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা, সিঁথিতে সিঁদুর, ব্যবহারেও গৃহিণী। তাই চামেলিকে তেমন ভয় পেতো না নিবারণ, ভয় পেতো শ্যামলীকে। বারান্দায় দাঁড়ালেই কখনো কখনো ওদের জানালার দিকে চোখ যেতো, কখনো বা হাওয়ায় ওড়া পর্দার ফাঁকে কপাটের আড়ালে শ্যামলীর শ্বেতপাথরের পা দুখানি চোখে পড়েছে, অনেক সময় তার ছোট্ট নিটোল মুখের উত্তাপ পেয়েছে।

আশ্চর্য হয়েছে মেয়েটির ব্যবহারে। যদি-বা হঠাৎ কোনো দিন চোখোচোখি হয়েছে অমনি হেসে উঠেছে শ্যামলী, আর নিবারণ ভেবেছে এ বুঝি-বা বিদ্রূপের হাসি, উপহাসের উল্লাস।

তারপর কি করে যেন শিবব্রতবাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে ও, আরো অন্তরঙ্গ পরিচয় পেয়েছে শ্যামলীর। পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হয়েছে।

নিবারণের ঘর থেকে ওদের জলঘরটা দেখা যেতো। এক দিন হঠাৎ লক্ষ করলে নিবারণ, শ্যামলী আঁচাতে এসেই গলায় আঙুল দিয়ে বমি করছে। ঠিক এই ব্যাপারটাই পর পর ক'দিনই লক্ষ করলে ও।

আরেক দিন শিবব্রতবাবুর সঙ্গে বসে গল্প করছে নিবারণ, হঠাৎ শ্যামলী এসে হাজির।

—তেঁতুল আছে, তেঁতুল? দিদি, একটু তেঁতুল দিবি?

চামেলি কাছেই কোথায় যেন ছিলো, ছুটে এসে শ্যামলীর হাত ধরে বললে, চল, ও ঘরে চল।

কথা শুনে প্রথমটা বিস্মিত হয়নি নিবারণ, কিন্তু চোখ তুলেই স্তম্ভিত হয়ে গেল ও। কেমন এক অর্থহীন উদাস দৃষ্টি শ্যামলীর চোখে, প্রকৃতিস্থ মানুষের চোখ নয় যেন। বুকের আঁচল মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে, শরীরে নেই লজ্জার সঙ্কোচ। শুধু উদ্‌ভ্রান্ত চোখ কি যেন খুঁজছে।

চামেলি ওকে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু তার আগেই এক ঝটকা দিয়ে সটান বসলো ও শিবব্রতবাবুর চেয়ারের হাতলে। বাপের গলা জড়িয়ে ধরে বললে, দোলনা দেবে না আমায়, দোলনা কিনে দেবে না?

শিবব্রতবাবু বললেন, চামেলি-মা, ওকে এখান থেকে নিয়ে যাও।

চামেলি আবার টানতে টানতে নিয়ে গেল ওকে, আর কিছুক্ষণ পরেই আবার ফিরে এলো।—দেখেছো বাবা, কি করেছে দেখো।

শিবব্রতবাবু ঘাড় ফিরিয়ে চামেলির হাতের সিল্কের শাড়িখানার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ-শ্বাস ফেললেন।

চামেলি ক্রোধের স্বরে বললে, দেখো, ছিঁড়ে একেবারে কুটিকুটি করেছে, বলে খোকনের জন্যে কাঁথা করবো। কত কাপড় ছিঁড়লো বলো তো?

দুঃখের হাসি হাসলেন শিবব্রতবাবু, বললেন, কি আর করবি মা, জেনেশুনে তো আর করছে না।

তারপর চামেলি চলে যেতেই নিবারণকে উদ্দেশ করে বললেন, কিছু মনে কোরো না নিবারণ, তোমার কাছে ব্যাপারটা গোপন রেখেছিলাম। আমার ছোট মেয়ে শ্যামলীর মাথায়

গোলমাল আছে।

নিবারণও রহস্যের রাস্তায় আলো দেখতে পেলো। আরো কিছু শোনবার জন্যে চোখ তুলে তাকালে ও।

শিবব্রতবাবুর গলার স্বর ভারি হয়ে এলো। বললেন, কত ডাক্তার দেখালাম, কত হাসপাতালে রাখলাম, তবু সারাতে পারলাম না ওর রোগ। ওর ঐ এক পাগলামি, সময়ে সময়েই ঐ এক কথা। 'খোকন আসবে, খোকনের জন্যে কাঁথা সেলাই করতে হবে, দোলনা কিনতে হবে তার জন্যে', আরো কত যে প্রলাপ বকে তার ইয়ত্তা নেই। অথচ যখন ভালো থাকে, শি'জ কোয়াইট ন্যাচারেল।

নিবারণের মনে হঠাৎ একটা প্রশ্ন এলো, এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ও ভাবলে প্রশ্নটা করা উচিত হবে কি না। তারপর বললে, বিয়ের পর পাগল হয়েছে বুঝি? ছেলেপুলে হয়ে মারা গিয়েছিলো?

—না। ছোট্ট একটা উত্তর দিয়ে পাইপ ধরালেন শিবব্রতবাবু। দু-মুখ ধোঁয়া ছেড়ে খবরের কাগজটা তুলে নিলেন হাতে। কয়েকটা কলমের ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেলেন নিঃশব্দে। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, না, বিয়ে হয়নি ওর। তার আগেই হঠাৎ পাগল হয়ে গেল। কখন থেকে যে ও এমন হয়ে গেছে, আমি নিজেও বুঝতে পারিনি।

নিবারণ বিস্মিত কণ্ঠে বললে, সে কি? বুঝতে পারেননি?

—না। তখনো ঠিক এমনি করতো। কেবল বলতো গা বমি-বমি করছে, করতোও মাঝে মাঝে। আচার তেঁতুল এইসব খেতে চাইতো, আর যখন-তখন ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়তো। হাব-ভাব লক্ষ করে হঠাৎ এক দিন চামেলি বললে, বাবা, সর্বনাশ হয়েছে। কেউ বোধ হয় সর্বনাশ করেছে শ্যামলীর। বাপের মন, রাগের মাথায় চুল ধরে এক চড় বসিয়ে দিলাম ঐ এক ফোঁটা মেয়ের গালে। কত ধমক দিলাম, ভয় দেখালাম, একটা কথারও উত্তর দিলে না। চামেলি এত অনুনয়-বিনয় করলে, তবু সাড়া নেই মেয়ের মুখে। তারপর...

কথা বলতে বলতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে থেমে গেলেন শিবব্রতবাবু।

নিবারণ মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে চোখের পাতা ভিজে গেছে শিবব্রতবাবুর। গলার স্বরও যেন আটকে গেছে। নিবারণও বুকের ভেতর অবোধ্য এক ব্যথা অনুভব করলে।

মাথা নিচু করে বললে, থাক, ওসব বলতে কষ্ট হচ্ছে আপনার।

—কষ্ট? হাসলেন শিবব্রতবাবু।—এখন তো সহ্য হয়ে গেছে, কষ্ট পেয়েছিলাম সেদিন, ইট ওয়াজ এ টেরিবল শক। এখন আর পাই না। সব অদৃষ্ট বলে মেনে নিয়েছি।

খানিক চুপ করে থেকে বললেন, শ্যামলী কোনো দিন মুখ ফুটে বলেনি কিছু। তারপর হঠাৎ এক দিন ওর টেবিলে একটি ছোকরার ফটো দেখতে পেলাম, আমার পরিচিত। ডেকে এনে ধমক দিলাম তাকে, বললাম বিয়ে করতে হবে তোমাকে। ঘাড় হেঁট করে ছোকরা চলে গেল, আর ফিরলো না। তারপর এক দিন জানতে পারলাম, আমাদের সব সন্দেহ মিথ্যে, শ্যামলী সত্যিই কোনো দোষ করেনি। আমরাই ভুল বুঝেছিলাম। কিন্তু তখন আর উপায় নেই, তখন থেকেই নতুন কাপড় ছিঁড়ে কাঁথা সেলাই করতে বসে গেছে শ্যামলী, দোলনা-দোলনা করে আবদার ধরেছে। বুঝলাম, কোনো একটা আঘাত পেয়েই এমন হয়ে গেছে ও। ছেলেটিকেও মিছিমিছি গালাগাল দিয়েছিলাম। সে বেচারীরও কোনো দোষ ছিলো না। সে শুধু ভালোই বেসেছিলো, কোনো অপরাধ তার ছিলো না।

বিস্ময়ের পর বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলো নিবারণ। এমন ঘটনা, এমন রহস্যময় কাহিনী কখনো শোনেনি ও। আশ্চর্য, সামান্য একটা আঘাত থেকে কি এমন মনোবিকার ঘটতে পারে? ও বললে, হয়তো প্রথম থেকেই পাগল হয়ে গিয়েছিলো, আপনারা বুঝতে পারেননি।

শিবব্রতবাবু চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, তাও হতে পারে হয়তো। কে জানে! মানুষের মন বড় ঠুনকো জিনিস, কখন যে কি হয়! চামেলি কিন্তু বলে, আমি বিয়েতে মত দেবো না বলেই ও-ধরনের অভিনয় করেছিলো শ্যামলী। ছেলেটিও নির্দোষ, তাই আমার কথা শুনে শ্যামলীকে ভুল বুঝে সরে গিয়েছিলো।

নিবারণ বললে, পৃথিবীটা এক তাজ্জব মনোহারীর দোকান, বুঝলেন না। খুঁজে দেখলে

করুণাময় হেসে বলে, শেষে নিউমোনিয়া ধরিয়ে ছাড়বে।

—তা সত্যি। নীলাও কৌতুকে হাসে। বলে, ভয়ও হয়, আবার ভাবি, বেচারীর কোলে তো আসেনি কেউ, দু-দিনের জন্যে নয় একটু ভুলেই থাকলো।

কিন্তু ক্রমশই যেন উৎসাহে আনন্দে উদ্দাম হয়ে ওঠে শ্যামলী। আর নীলা ভয় পায়। শ্যামলীর কথায় আর ব্যবহারে কি যেন এক রহস্যের ইশারা দেখতে পায় ও, আশঙ্কায় চঞ্চল হয়ে ওঠে।

—আচ্ছা, মেয়েটা কি পাগল নাকি? করুণাময়কে প্রশ্ন করে নীলা। আজ দুপুরে দেখি কি, ওর ঘরে খোকাকে কোলে নিয়ে...কথা শেষ করতে পারে না নীলা, হেসে গড়িয়ে পড়ে। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বলবার চেষ্টা করে, আর পরমুহূর্তে কৌতুকের হাসিতে চাপা পড়ে যায় ওর কথা।

—এত হাসছো কেন? একটু বিরক্ত হয়েই প্রশ্ন করে•করুণাময়।

আবার মুখে আঁচল চেপে নীলা কোনোরকমে বলে, খোকাকে লুকিয়ে লুকিয়ে দুধ খাওয়াচ্ছিলো। খাওয়াচ্ছিলো না...আবার হেসে ওঠে নীলা।

—তাতে হাসবার কি আছে?

—না, না। বোতলের নয়। আবার হেসে ওঠে নীলা।

কিন্তু হাসি মিলিয়ে গেল এক দিন নীলার মুখ থেকে। বিস্মিত হলো ও, চোখ চেয়ে-চেয়ে ভালো করে তাকালো শ্যামলীর দিকে। আশ্চর্য!

—কি বলছো, ঠিক বুঝলাম না ভাই। অনুযোগ করলে নীলা।

শ্যামলী কাঁদো-কাঁদো গলায় বললে, উনিও তো তাই বলেন। সত্যি বলুন, বাড়িতে দোলনা না থাকলে মানায়? বাড়ির শ্রীই থাকে না। আচ্ছা, আপনার বাসায় দোলনা আছে তো?...থাকবেই তো। ওকে এত করে বলি, তবু একটা দোলনা কিনে দিলো না অ্যাদ্দিনেও। কতই বা দাম?

—দোলনার লোক আসুক, তারপর কিনবে এখন। সান্ত্বনার সুরে নীলা বললে।

শ্যামলী ঠোঁট ওলটালে, আপনিও ঐ কথা বললেন? দোলনা থাকলে কত সুন্দর দেখায় বলুন তো। ঠিক হয়েছে, এবার খোকনের জন্যে আনতে বলবো।

নীলা সহাস্যে বললে, তাই বোলো।

কিন্তু লক্ষ করলে, যতই দিন যায়, ততই যেন কি এক পরিবর্তন স্পষ্ট হয়ে ওঠে শ্যামলীর দেহমনে। খোকনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে উদাস হয়ে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কি যেন ভাবে, কিংবা কিছুই যেন ভাবে না।

প্রথম প্রথম বেশ একটা কৌতুক বোধ করতো নীলা। ক্রমশ একটা বিদ্বেষভাব জাগতে শুরু করলো ওর মনে। খোকনকে সত্যিই যেন ছিনিয়ে নিতে চায় শ্যামলী। এক মুহূর্তের জন্যেও নীলার কাছে আসতে দেয় না তাকে। রাত্রে নিজের কাছে নিয়ে শোবার জিদ ধরে।

এমন সময় হঠাৎ এক দিন নীলা বললে, কালই আমরা চললাম ভাই।

—খোকন? খোকন থাকবে তো? উদ্‌গ্রীব হয়ে শ্যামলী জিজ্ঞেস করলে।

ক্রোধ তো দূরের কথা, হেসে ফেললে নীলা। বললে, না, ওকেও নিয়ে যাবো বইকি! ভয় নেই, তোমার কোল আলো করেও খোকন আসবে।

শ্যামলী অর্থহীন উদাস দৃষ্টিতে তাকালো নীলার মুখের দিকে। নীলার কোনো কথাই যেন কানে যায়নি ওর, অর্থ বোঝেনি কোনো কথার। তারপর হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো, না-না, খোকন যাবে না, খোকনকে যেতে দেবো না।

নীলা উত্তর দিলো না। সরে গেল সেখান থেকে। আর কিছুক্ষণ পরেই খোকনের কান্না শুনে করুণাময় আর নীলা দুজনেই ছুটে এলো। শ্যামলীর কোল থেকে খোকন পড়ে গেছে।

নীলা খোকনকে কোলে তুলে নিয়েই শ্যামলীকে কি যেন বললে, ক্রোধের স্বরে।

করুণাময় বললে, কোল থেকে হঠাৎ পড়ে গেছে, দোষ কি ওর?

—পড়ে গেছে। রাগ বেড়ে যায় নীলার।—ডাইনী! ডাইনী ইচ্ছে করে ফেলে দিয়েছে ওকে। না, আর নয়, চলো আজই ফিরে যাবো আমরা।

শ্যামলীর চোখে তখনো উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। আঁচল খসে পড়েছে কাঁধ থেকে। কোনো কিছুই ও যেন দেখতে পাচ্ছে না, বুঝতে পারছে না। শুধু এক জোড়া সজল বড়-বড় চোখ মেলে ও সামনের আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। আর মনে মনে বিড়বিড় করছে, খোকনকে আমি যেতে দেবো না, খোকনকে আমি যেতে দেবো না।

বিদায়ের মুহূর্তেও ঐ একই কথা লেগে রইলো ওর মুখে। সিঁড়ি আগলে দু হাত মেলে বাধা দেবার চেষ্টা করলে নীলাকে।—খোকনকে যেতে দেবো না, খোকনকে আমি যেতে দেবো না।

নিবারণ ওকে সরিয়ে আনবার চেষ্টা করতেই হঠাৎ ক্ষেপে গেল যেন শ্যামলী। রাগে ক্ষোভে মাটিতে লুটিয়ে কাঁদতে শুরু করলে।

করুণাময় নিবারণকে আড়ালে ডেকে বললে, ওকেও স্টেশনে নিয়ে চলুন, তা হলে বাধা দেবে না হয়তো।

শেষে তাই হলো। নিবারণ বললে, না, খোকন যাবে না। চলো স্টেশন থেকে ফিরিয়ে আনবো।

চট্ করে উঠে বসলো শ্যামলী। সমস্ত মুখ খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠলো ওর।—সত্যিই? সত্যি ফিরিয়ে আনবে?

চৌখাম্বার গলিতে আলো ঝলমল করে উঠলো, সন্ধ্যা নামলো শহরের বুকে। তারা-চিক্‌চিক্ গঙ্গার জল কালো হয়ে গেল ক্রমশ। তিমির পিঠের মতো পিচের রাস্তার মসৃণতায় অন্ধকার জমাট বাঁধলো। আর সেই গা-ছমছম অন্ধকার ভেদ করে টাঙা ছুটলো আবার।

সেই পুরোনো রাস্তা ধরে, তেমনি আঁকাবাঁকা মেটাল রোডের ওপর দিয়ে চৌখাম্বার উজ্জ্বল বাজার পার হয়ে টাঙা ছুটলো। গাছের ছায়ায় ছায়ায়, মাঠের নির্জনতা মাড়িয়ে, দীর্ঘশ্বাসের মতো আশঙ্কা-চুপচুপ নিঃশব্দতায় টাঙার ডুমডুমি আর ঘোড়ার খুরের টপাটপ আওয়াজ ভাসলো শুধু। চাঁদ-জ্বলা আকাশের দু-একটা রূপালী স্ফুলিঙ্গ হয়তো বা এখানে-ওখানে, রাস্তার ধারের শাখাপল্লবিত গাছের ফাঁকে উঁকি দিয়ে ঠিকরে পড়ছে। আর সেই চাঁদ-উঁকি-দেওয়া রাস্তার অন্ধকারে ছুটে চললো ওরা।

ঠিক তেমনিভাবেই করুণাময় আর নীলা বসে আছে পাশাপাশি, আর পিঠে পিঠ দিয়ে শ্যামলী আর নিবারণ।

গঙ্গার ব্রিজ এগিয়ে এলো। অতিকায় একটা প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর মতো দেখালো ব্রিজের ইস্পাত-কাঠ-কংক্রিটের আকৃতি। ওপরের পরিচ্ছন্ন আকাশ, আর নীচে গঙ্গার স্রোতে চোখের তারার মতো কালোর গভীরতা। সুমুখে নির্জন নিঃশব্দ পথ।

ঝুমঝুম ঝুমঝুম শব্দ করে পোলের ওপর উঠলো টাঙাটা। দমকে দমকে ঠাণ্ডা বাতাস এসে লাগলো কানে, চুলে, শ্রান্ত মুখের ওপর। আর সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলো শ্যামলী।—আমি খোকনকে ছেড়ে যাবো না, খোকনকে ছেড়ে যাবো না।

নিবারণ হঠাৎ রূঢ় স্বরে একটা ধমক দিলো। চুপ করে গেল শ্যামলী।

ব্রিজের মসৃণ পথ অতিক্রম করে ইতিমধ্যে নীচে নেমে এসেছে টাঙা, সামনেই বঁড়শির মতো একটা বাঁক; আর বাঁক ঘুরতে গিয়ে হঠাৎ একটা ঝাঁকানি দিয়ে টাঙা থেমে গেল।

চাকার দিকে তাকিয়ে টাঙাওয়ালা বললে, যাবে না হুজুর, চাকা টাল খেয়েছে।

যাবে না? লাফিয়ে নীচে নামলো শ্যামলী। তারপর আবার চিৎকার করে উঠলো, না, না, আমি খোকনকে ছেড়ে যাবো না, খোকনকে ছেড়ে যাবো না। আর চিৎকার করতে করতে গঙ্গার দিকে, গঙ্গার ব্রিজের দিকে ছুটে গেল শ্যামলী। রুক্ষ চুল পিঠের ওপর ভেঙে ছড়িয়ে পড়লো, শাড়ির প্রান্ত খসে পড়লো শরীর থেকে, উন্মাদের মতো, উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে গেল শ্যামলী। আর পিছনে পিছনে নিবারণও ছুটে গেল।

মুহূর্তের মধ্যে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল ওরা। শুধু নিঃশব্দ নিঝুম রাতের অন্ধকারে একটা চিৎকার ভেসে এলো বারবার।—আমি খোকনকে ছেড়ে যাবো না, খোকনকে ছেড়ে যাবো না।

আর তার পিছনে নিবারণের কর্কশ গলার ডাক—শ্যামু, ফিরে এসো, শ্যামু, শ্যামলী, ফিরে এসো।

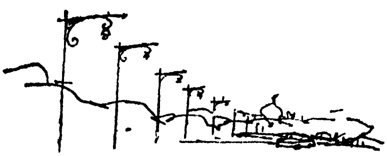
করুণাময় হঠাৎ দেখলে, দূরে, অনেক দূরে চাঁদের আলোয় সিল্যুটের ছবির মতো একটা ছায়াশরীর ঠিক ব্রিজের থামের আড়ালে এসে থমকে থামলো।—শ্যামলী! শ্যামলী! চিৎকার করে উঠলো করুণাময়।

তারপর। তারপর সে ছায়াশরীর অদৃশ্য হলো।

অনেকক্ষণ পরে ব্রিজের থামটার কাছে এসে পেঁাছলো করুণাময়, আর নীলা। তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখলে। না, শ্যামলী নেই। নিবারণ? নিবারণও নেই। শুধু টর্চের তীব্র আলোয় কি যেন চকচক করে উঠলো। আবার সেদিকে আলো ফেললে করুণাময়।

না, শ্যামলী নয়। ব্রিজের একটা বল্টুতে এক ফালি কাপড় লেগে রয়েছে, হাওয়ায় পতাকার মতো উড়ছে পতপত করে। শাড়িছেঁড়া এক টুকরো কাপড় কোত্থেকে উড়ে এসে লেগেছে, কে জানে!

[১৩৫৮



মেকী

এক্সপ্যান্ডেড মেটালের ছোট ছোট জানালাগুলো না থাকলে প্রিজন ভ্যানটার সঙ্গে মালবাহী কোনো অন্ধকূপ বাড়ির পার্থক্য থাকতো কি না সন্দেহ। পার্থক্য অবশ্য আছেই। সফিউদ্দিন আর আরো আঠারোজন রিম্যান্ডের কয়েদীর সঙ্গে তেলের পিপে বা প্যাকিং বাক্সের কোনো তফাত ওদের চোখে না থাকলেও তফাত আছে অন্য দিকে। ক্যাশ আপিসের গাড়ি, নয়তো লাটের লিমোজিনে যেমন বন্দুকধারী সিপাই বসে থাকে ড্রাইভারের পাশে, প্রিজন ভ্যানের সামনের আসনেও তেমনি জন দুই সঙ্গীনধারী গোঁফে চাড়া দিয়ে পথচারীদের বুঝিয়ে দেয় এটা মেটাল বাক্সের গাড়ি নয়, পর্দানশীন ইস্কুলের বোরকা-উঁকি মেয়েরাও নেই জাল-জানালার ওপাশে।

সফিউদ্দিন আর আরো আঠারোজন রিম্যান্ডের কয়েদী কিন্তু হাঁপিয়ে ওঠে বাতাসহীন অন্ধকারের গুমোটে। জাল-জানালায় নাক চেপে পর্দানশীন ইস্কুলের মেয়েদের মতোই পথ দেখে, পথের লোক দেখে। তেষ্টায় ছাতি ফাটছে, ক্ষিদেয় পাক দিচ্ছে পেট, তবু বলবার উপায় নেই। শুনবে না কেউ, শুনলে ধমক, নয়তো ব্যাটনের ঘা। তেমন তেমন হলে বেয়নেটের খোঁচা। তার চেয়ে চোখের তৃষ্ণা মেটানো অনেক সুখের, অনেক আনন্দের।

সত্যি, কতদিন যেন আলো আর হাওয়ার ছোঁয়া পায়নি ওরা। পৃথিবীর এত এত রাস্তাঘাট, লোকজনের মুখ—এসব কিছুই দেখতে পায়নি। থানার হাজতে নোংরা পচা দুর্গন্ধের মধ্যে মাত্র ক'টা দিন, তাও যেন কত বছর মনে হয়। চলন্ত গাড়ির ভেতর রাস্তার আলোবাতাস উঁকি দিতেই নতুন করে নিশ্বাস নিলো যেন সফিউদ্দিন। সফিউদ্দিন আর আরো আঠারোজন রিম্যান্ডের কয়েদী নতুন করে বেঁচে উঠলো।

আশ্চর্য! সফিউদ্দিন মনে মনে ভাবে, হাসি-হাসি মুখ পথচারীদের দিকে তাকিয়ে ঈর্ষায় জ্বলে যায় ওর বুক, অথচ দু-দিন আগে ও নিজে হেসে হেসে ঘুরে বেড়িয়েছে, সাকসেনার মোড়ের দোকান থেকে ধারে পান কিনেছে, বিড়ি ধরিয়েছে দেয়ালের দড়িতে।

আর আজ? জেলের রাস্তাতেই হয়তো বা। কে বলতে পারে। মামলা তদ্‌বিরের লোক নেই যার, টাকা নেই উকিলের পেছনে ঢালবার, তার বিচার তো হয়েই আছে।

অথচ সফিউদ্দিন জানে, এক সফিউদ্দিনই জানে, ও নির্দোষ। পাপ ও অনেক করেছে, অনেকবার করেছে। মাসের প্রথম দিনে বুড়ো কেরানীর পকেট মেরে সারা মাস কাঁদিয়েছে কতবার, অন্ধকার গলিতে প্যারিস্ পিক্‌চার বিক্রির লোভ দেখিয়ে কত বাচ্চা ছেলের সোনার চশমা, গলার বোতাম, হাতের হাতঘড়ি ছিনিয়ে নিয়েছে। কনভেণ্টে পড়া কচি মেমসাহেবের নাম করে আড্ডায় নিয়ে গেছে কত উড়ন্ত পায়রার ছানাকে, কেড়ে নিয়েছে তার নোটের বাণ্ডিল। কই, তখন তো ধরা পড়েনি ও। তখন তো পুলিস ওর হদিস পায়নি।

একেই বলে নসীব। বিসমিল্লায় উতরে গেল, গলদ ধরলো মোল্লায়। সত্যি, মনে মনে হাসিও পায়, দুঃখও হয়। সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে ভালোভাবে জীবন শুরু করলো যখন সফিউদ্দিন, তখনই কিনা পুলিসের হাতে কয়েদী। ঘৃণায় অনুতাপে হাতের ছুরিটা যখন ছুঁড়ে ফেলে দিলো তখনই এসে জুটলো হাতকড়া। নসীব! নসীব একেই বলে! ভগবান যখন ভালো হতে বলবে, দুনিয়াদারি দেবে বাধা। দুনিয়া যদি ভালো হবার পথ বাতলে দেয় তো ভাগ্য বাদ সাধবে!

কি হবে অত ভেবেচিন্তে, কিই বা করতে পারে সফি। তার চেয়ে চুপচাপ নিজেকে ছেড়ে দেবে দুজনেরই হাতে, যে পারে ওকে পথ দেখাক। সেই ভাঙা চার্চের বেঁটে পাদরীটা কি যেন বলেছিলো একবার। কি যেন নামটা—তার কাছে নিজেকে বিক্রি করতে নিষেধ করেছিলো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, শয়তানের কাছে নিজেকে বিক্রি কোরো না। মনে মনে হাসে সফিউদ্দিন। আরে, পৃথিবীর সব ক'টা লোকই শয়তানের কাছে বিক্রি হবার জন্যে তৈরী হয়ে আছে, শয়তান যে ছাই কিনতে চায় না। তা নইলে এমন হাল ওর? বেশ তো ছিলো। পকেট মেরে নয়তো গুণ্ডামি করে আজ যদি ওর জেল হতো, দুঃখ থাকতো না এতটুকু। অথচ কোথাও কিছু নেই, দিব্যি মেহনত করে ভালোভাবে বাঁচবার চেষ্টা করছে, সেই সময় কিনা থানা-পুলিসের হুজ্জত।

কোর্টের ফটকে গাড়ি ঢুকতেই সফিউদ্দিন বললে, ঠিক আছে, শালা আবার শুরু করবো।

পাশের কয়েদীটা হাতকড়া-বাঁধা হাত দুটো বেঁকিয়ে পিঠ চুলকোবার বৃথা চেষ্টা করে বললে, পিঠটা চুলকে দে তো সফি।

ওর পিঠের ওপর হাতকড়াটা ঘষতে ঘষতে সফি বললে, শালা আবার শুরু করবো, বুঝলি?

পাশের কয়েদীটা কি যেন বলতে যাচ্ছিলো, তার আগেই প্রিজ্‌ন ভ্যানের দরজা খুলে গেছে, সঙ্গীন উঁচিয়ে সিপাই দুটো এসে দাঁড়িয়েছে দরজার পাশে।

সফিউদ্দিন আর আরো আঠারোজন কোমরে-দড়ি হাতে-হাতকড়া রিম্যাণ্ডের কয়েদী আদালতের ভিড় ঠেলে এগিয়ে চললো লক্-আপের পাতালপুরীর দিকে। একটা সিপাই আগে আগে, একজন পেছনে খোঁচা দেবার জন্যে।

শেয়ালদার মাছের বাজারেও এত ভিড় দেখেনি সফি। কসাইখানার কার্নিসেও এত কাকের ভিড় থাকে না, যত না কালোকুর্তার ভিড় এখানে। সাদা প্যাণ্ট আর কালো কালো গলাবন্ধ কোট পরা উকিলের ছড়াছড়ি। সবাই ব্যস্ত, সবাই কাজের লোক। সময় নেই যেন এতটুকু। সব ব্যাটা রক্তচোষা বাদুড়, মনে মনে ভাবলে সফি। পাতলুন পরেছে বাবুরা। এদিকে কাদার ছাপ, পানের ছোপ লেগে বাহার যা খুলেছে বলবার নয়। বছরে দুবার ধোপার বাড়ি যায় কি না সন্দেহ, কোটটা যে যায় না সে তো জানাই। ঐ পচা পুরোনো কুর্তা একবার ধোপার কাছে গেলে ফিরবে নাকি আর! তীর্থের কাকের মতো ছোটাছুটিই সার, বিকেলে বাড়ি ফেরবার সময় পকেট ভরে ডুমুর কুড়িয়ে নিয়ে যায়, তাই হাঁড়ি চড়ে। তবু টেনে টেনে ইংরেজী বলে কেমন, যেন সিম্পসন সাহেবের ছোট ছেলে। যেখানে বারো আনার স্ট্যাম্প লাগবে, চেয়ে বসবে বারো টাকা। তারপর একে ঘুষ দিতে হবে ওকে ঘুষ দিতে হবে, ডেমি কেনো, টাইপ করাও—কত কি। নিজের ফি-টাও হাঁকবে কম নয়। আর সারাটা ক্ষণ স্তোক দেবে, খালাস পাবি খালাস পাবি বলে, তারপর এক নিশ্বেসে বলবে, যা ব্যাটা, তোর পাঁচ বছর জেল হলো।

উকিলদের কথা কম শোনেনি ও ছোটবেলা থেকে। একটা কথা ভালো করে শুনবে না, লিখে রাখবে না কাগজে-কলমে, আর হাকিমের এজলাসে গিয়ে উলটো-পালটা বকে আসবে হাত-পা নেড়ে।

না, উকিল দেবে না সফি, তার চেয়ে জেল খেটে আসবে সেও ভি আচ্ছা।

ও যে হাজতে আছে, সাকিনাও হয়তো খবর পেয়েছে। কে জানে কি ভাবছে মেয়েটা। ভাবছে হয়তো সফি সত্যিই এই সব নোংরা ব্যাপারে জড়িয়ে আছে। অনেক করে সাকিনাকে বুঝিয়েছিলো ও, চুরি পকেটমার রাহাজানি সব ছেড়ে দিয়ে শরীফ হবার চেষ্টা করছে। সাকিনা এখন কি আর বিশ্বাস করবে? ওর সঙ্গে নতুন করে ডেরা বাঁধতে রাজী হবে আর?

ঘরে বুড়ী মা আজ মরে কি কাল মরে, মনে রঙিন স্বপ্ন সাকিনাকে নিয়ে ঘর বাঁধবার, তার ওপর ভদ্রঘরের মেয়েকে জোর-জবরদস্তি নিয়ে এসে লুকিয়ে রাখার ব্যাপারটাও মনে মনে ঘেন্না করে সফিউদ্দিন। তাই না ওর এত লজ্জা, এত ভয়। লোকে কি বলবে, লোকে কি ভাববে তা নয়, সাকিনা কি বলবে, সাকিনা কি ভাববে! তাই। তাই ওর মতো অমন চওড়া কাঁধের নওজোয়ান মানুষ, যে কিনা একদিন খুন-জখমে ভয় পেতো না, যার একটা চড় খেয়ে টমি সার্জেণ্ট নালার জলে মুখ থুবড়ে পড়েছিলো, সেও পুলিসসাহেবের পা জড়িয়ে ধরে কেঁদেছিলো!

—আমাকে ছেড়ে দিন হুজুর, আমি এসবের মধ্যে নেই হুজুর।

পুলিসসাহেব হেসে বলেছিলো, তা হলে ছাড়াই পাবি।

—কি করে ছাড়া পাবো হুজুর? আশায় আনন্দে চক্‌চক্‌ করে উঠেছিলো সফির চোখ। আর পুলিসসাহেব মুচকি হেসে বলেছিলো, হাকিমের এজলাসে আইন আছে রে ব্যাটা। হাকিম ধরে নেবে তোর কসুর নেই, আমরা প্রমাণ করবো তুইও আছিস এর মধ্যে।

—তা হলে হুজুর? আশা-ভরসা হারানোর দীর্ঘশ্বাস ফেলে সফি।

উত্তর আসে, তোর দোষ না থাকলে আমরাও তো প্রমাণ করতে পারবো না। তা হলেই খালাস পাবি।

ফুঃ। মনে মনে ঘৃণার হাসি হেসেছিলো সফি। প্রমাণ, প্রমাণ ও অনেক দেখেছে, পুলিসকেও দেখেছে। আর হাকিম? দেখেনি বটে, কিন্তু শুনেছে অনেক। মামলা হয়ে যাওয়ার পর নাকি পুলিসের উকিল কানের কাছে গিয়ে ফিসফিস করে আসে।

বিচার। বিচার হবে ওর। কিসের বিচার? অপরাধ করেছে কি করেনি, তার বিচার? না, টাকার। শুধু টাকার বিচার, তা সে যে পথেই যাক্, যে পথেই ঢালো। হয় টাকায় পুলিসের মুখ বন্ধ করো, তার ডাইরীর পাতা ছিঁড়ে ফেলবে পুলিস, আর তাও যদি না পারে তো এমন ফাঁক রাখবে যে সুড়ুৎ করে পার পেয়ে যাবে তুমি। আর তা যদি না চাও তো টাকা ঢালো অন্য দিকে। নিয়ে এসো বড় আদালতের এমন উকিল-ব্যারিস্টার যাকে দেখে ছোট হাকিম ভয়ে থরথরিয়ে কাঁপবে। কত বড় বড় সাক্ষীসাবুদ তৈরী হয়ে যাবে টাকার জোরে। উকিলের বুদ্ধিতেই যদি হাকিমের রায় এদিক-ওদিক হয়, তা হলে আবার বিচারটা কোথায়? আইনে আসামীকে নির্দোষ ধরে নেওয়ার সার্থকতা কোথায়? মনে মনে এমনি সাতপাঁচ ভাবে সফি।

সফি নিজে তো জানে এ ব্যাপারটায় ওর হাত ছিলো না মোটেই। যা সত্যি, যা জানে ও নিজেই বলবে হাকিমকে। পুলিসের শানানো বানানো কথায় চোরামি আছে কি না, মিথ্যে আছে কি না হাকিম খুঁজে বের করবে, করে বে-কসুর খালাস দেবে ওকে। হ্যাঁ, তবেই বুঝবে বিচার আছে।

পুলিসসাহেব বলেছিলো, হাকিম জিগ্যেস করবে 'গিল্টি', না 'নট গিল্টি'। বলবি, গিল্টি হুজুর, অন্যায় হয়ে গেছে, আর করবো না। তা হলে ফাইন করে ছেড়ে দেবে। তা নইলে—

শুনে হেসেছে সফি। গিল্টি। গিল্টি তো পৃথিবীর সবাই, আসল সোনা কি আর আছে নাকি পৃথিবীতে। কিন্তু অন্যায় হয়েছে, কসুর হয়েছে—এ কথা বলবে কেন ও? ও তো সত্যিই কোনো দোষ করেনি।

মুখে বললে, আমি তো কসুর করিনি কিছু। মাপ চাইবো কেন হুজুর?

উত্তর এসেছিলো ভারি বুটের ঠোক্করে।

তেমনি আরেক ঠোক্কর খেয়ে মন ফিরে এলো সফির। আদালতের হাজতে। হাজতের ফটক অবধি যখন আসতে পেরেছে ও, তখন কি আর বুটের ঠোক্কর না দিলে ভেতরে ঢুকতো না?

যাক্।

সফিউদ্দিন আর আরো আঠারোজন রিম্যাণ্ডের কয়েদী হাজতের নোংরা দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে পড়লো। তারপর তাকালো চারপাশে।

মাটির নীচেও যে ঘর থাকে তা জানতো সফি; আগেও দেখেছে। গুণ্ডা গোসাঁইয়ের আড্ডায় যখন নাম ছিলো ওর, তখন দশেরায়, বখ্রিদে এমনি এক চোরাকুঠরির পাতালপুরীতে সারা রাত চলতো ওদের জুয়ার গুলতানি। তাস আর মদ। আর সস্তা মেয়ের চোখ-কাঁপানো বুক-ঝাঁকানো গান। আবার লুঠের মাল, সাফাই করা সোনাদানা এনে রাখতো সে-ঘরে, ভাগ-বাঁটোয়ারার আওয়াজ পেলেই এসে জুটতো সবাই। কিন্তু সে-ঘর মাটির নীচে সাপের গর্তের মতোই ছোটখাট, কাঁধে-কনুইয়ে ঘেঁষাঘেঁষি হতো সাতটা লোক ঢুকলে, তিনটে মেয়ে আনলে ঠাওর হতো না কে কার কোলে।

এ-ঘর কিন্তু সে-ঘর নয়। কম করে এক শো কয়েদী দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসতে পারে এখানে। আর উঁচুই বা কম কি, জেলের দেয়ালকেও হার মানায়। সুড়ঙ্গের মতো সিঁড়িটা এসে নেমেছে এ-ঘরে, আর ঐ সিঁড়ির মুখে লোহার ফটক আবছা আবছা আলো ছুঁড়ছে। কিন্তু এত আলো তবে আসছে কোত্থেকে? ভালো করে তাকিয়ে দেখলে সফি। হ্যাঁ, একদম মাথার ওপর, পঞ্চাশ হাত ওপরে এ-ঘরের ছাদ, আর সেই ছাদের ঠিক মাঝখানটায় লোহার জাল দিয়ে ঘেরা। তারও বিশ হাত ওপরে আসলি ছাদ। আদালতের তিনতলার জানালায় ঠিকরে যেটুকু আলো ঢুকছে তারই খানিকটা উঁকি মারছে ঐ জালের ছাদ থেকে। হ্যাঁ, জালের চারপাশটা যেন রেলিং দিয়ে ঘেরা, তাই মনে হলো সফির, রেলিং-এ ভর দিয়ে দু-চারটে লোক ওদের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে, সফি দেখতে পেলো।

কেমন যেন গা সিরসির করে উঠলো, নিজেকে ছোট মনে হলো ঐ লোকগুলোর কৌতূহলী চোখের সামনে। অন্য দিকে চোখ ফেরালো সফি। আর দেখলে, আরেকটা সুড়ঙ্গ এদিক দিয়ে উঠে গেছে ওপরে।

পাশের লোকটাও সেদিকে তাকিয়ে ছিলো, নিজের মনেই যেন বললে, এই দিক দিয়ে হাকিমের সামনে যেতে হয়।

—তাই নাকি?—অন্য কে প্রশ্ন করলে অবাক বিস্ময়ে।

—হুঁ! মাথা নাড়লে দাগী সবজান্তা।—হাকিমের ঘরেও আবার এমনি জালের খাঁচা। শালারা আমাদের শের ভাবে, না শয়তান ভাবে?

—পাকিটমারকে জামিন দেবে না; আর শরীফ কেউ খুনী আসামী হলেও পি. আর. দিলিয়ে দেয়। কে যেন বললে।

সফি শুনলো, শুনে হাসলে।—জামিন খাড়া হবার মতো কেউ আছে নাকি আমাদের?

—আছে রে বেটা, আছে।

—কে?

বুড়ো মিঞাসাহেব দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে আকাশের দিকে হাত দেখালে।

সবাই হাসলো ওর কথায়, তারপর ভারি জুতোর মচমচানি শুনে সকলে একসঙ্গে উঠে দাঁড়ালো।

ভারি জুতোর কনস্টেবল গড়গড় করে নাম ডেকে গেল একরাশ, তারপর হাঁক ছাড়লো চাঁছা গলায়, চল সব।

অর্থাৎ ঐ সুড়ঙ্গ ধরে হাকিমের ঘরে চল সব।

সকলের সঙ্গে সফিও সিঁড়ি বেয়ে এসে হাজির হলো হাকিমের ঘরে। আঃ, এত আলো এত বাতাস যেন এই প্রথম দেখতে পেলো ও, স্পর্শ পেলো। ছোট্ট লোহার খাঁচায় ওরা এতগুলি লোক ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে, তবু বুক ভরে নিশ্বাস নিতে পারছে।

হগসাহেবের বাজারে বেতের ঝুড়িতে মোরগ-মুরগীর ঠাসাঠাসি দেখেছে সফি কতবার। আজ নিজেদের ঠিক সেই মোরগের মতো হাল। লোহার জালে মুখ চেপে ভাসা-ভাসা চোখ

মেলে তাকালে ও হাকিমের মুখের দিকে। হাকিমের মেজাজ বোঝবার চেষ্টা করলে। হাকিম হাসলে ওরা স্রেফ খালাস পাবে।

আচ্ছা, এজলাসের সারবন্দী বেঞ্চিতে বসা ঐ উকিলগুলো কি ওদের খুনী আসামী ভাবছে? শুধু কালো-কুর্তা উকিলই নয়, ভদ্রলোকও কয়েকজন রয়েছে পিছনের সারিতে। জালে মুখ চেপে সেদিকে তাকাতে গিয়ে সফির চোখ পড়লো এক কোণে। আরে! সাদাসিধে একখানা ফিরোজা রঙের শাড়ি-পরা অমন মিঠে মুখ এই পিঁজরাপোলে?

সিঁথিতে সিঁদুরের টান, চোখে ক্লান্তি—তবু বড় ভালো লাগলো সফির। কিন্তু ওরও কি এমনি হাল নাকি? কে জানে!

ভালো করে তাকিয়ে দেখলে সফি। গালে কপালে ঘাম ঝরছে মেয়েটির, শাঁখা আর সরু চুড়ির ফাঁকে ফর্সা হাত দুখানা যেন বড় রোগা-রোগা, মনের চিন্তা দেহের অসুস্থতা যেন একজোট হয়ে ওর চোখের পাতা ভারি করে দিয়েছে!

সফির নিজের মন থেকে সব ভাবনা-চিন্তা জেলের ভয় উবে গেল এক নিমেষে। শুধু বুকের ভেতর অনুভব করলে এক অবোধ্য ব্যথা। অচেনা একটি মেয়ের রোগ-পাণ্ডুর মুখের ছায়া যেন সব সময় ঘরখানাকে মেঘ-থমথম বিষণ্ণতায় ডুবিয়ে দিয়েছে।

একটা কি শব্দ হলো। আর সঙ্গে সঙ্গে চমকে ফিরে তাকালো মেয়েটি ওদের জালঘরের দিকে। তন্নতন্ন করে লোকগুলোর মুখের দিকে তাকাচ্ছে মেয়েটি, সফির মুখের আর চোখের ওপর দিয়েও যেন সে চোখের দৃষ্টি ভেসে গেল মুহূর্তের জন্য। সব দুঃখকষ্ট অভিমান মুছে নিয়ে গেল ওর মন থেকে।

আচ্ছা, কি ভাবছে মেয়েটি। ওখান থেকে কেমন দেখাচ্ছে ওদের? চিড়িয়াখানায় লোহার জাল দিয়ে ঘেরা ঘরের ভেতর জানোয়ারের পাল ভাবছে নাকি মেয়েটি?

ও, এইবার বোঝা গেছে। ওপাশের ঐ লম্বা স্যুট-পরা লোকটাই ওর স্বামী। ও লোকটাও আসামী, বেশ বুঝতে পারছে সফি। তবু, আশ্চর্য, লোকটাকে বসতে বললে হাকিম। মানীগুণী লোক হয়তো। কিন্তু আসামী লোকটা তো আসামীই। ওর উকিলের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখেই বোঝা যাচ্ছে ওপরের আদালত থেকে এসেছে। জবর কেস তা হলে নিশ্চয়ই।

কিসের মামলা? কে জানে, জেনেই বা কি হবে সফির। হ্যাঁ, মামলা ওদের আগেই হয়ে গেছে, আজ বুঝি বা রায় বেরুবে। মেয়েটির ঠোঁট জোড়া কাঁপছে নাকি! হয়তো। ভয়ে আশঙ্কায় চোখে কেমন এক উদাস হাওয়া।

ইংরেজীতে কি সব বলাবলি হলো, বুঝলো না সফি। শুধু মনের ভেতর অনুভব করলে কিসের এক ব্যথা। আহা, লোকটা ছাড়া পাক, লোকটা বেঁচে যাক, ভাবলে ও। শুধু ঐ মেয়েটির ক্লান্ত বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে সফি ভাবলে।

অনেকক্ষণ ধরে কি যেন পড়ে চলেছে হাকিম। আর মেয়েটি একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে হাকিমের মুখের দিকে, প্রত্যেকটি কথা শুনছে মন দিয়ে। আশঙ্কায় ভয়ে ক্রমশ যেন রক্ত জমে উঠেছে মেয়েটির মুখে, কপাল বেয়ে ঝরে পড়ছে মুক্তোর মতো বিন্দু বিন্দু ঘাম।

হঠাৎ সমস্ত মুখখানা হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো মেয়েটির। পৃথিবীর সমস্ত হাসি যেন একসঙ্গে এসে জড়ো হয়েছে ওর মুখে, আনন্দে উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালো মেয়েটি। লোকটির মুখের দিকে তাকালে, চোখাচোখি হলো, আর তার মুখেও একটা ফিকে হাসি দুলে গেল।

জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছে মেয়েটি, আর হাসছে, প্রাণ খুলে হাসছে। নতুন-জাগা ঝর্নার মতো, জ্যোৎস্নারাতের সমুদ্রের ফেনার মতো হালকা আর উজ্জ্বল হাসি ছড়িয়ে পড়েছে মেয়েটির সারা মুখে, চোখে চোখে।

খালাস। খালাস পেয়েছে লোকটা। যাক। নিজের কথা ভুলে গেল সফি, পাথর-চাপা বুক ওর হালকা হয়ে গেল। কিন্তু এবার, এবার তো মেয়েটি একবার তাকাতে পারে ওর দিকে। ঐ হাসিভরা চোখ কি একবার সফির মুখের ওপর ফেলতে পারে না। ওর উৎকণ্ঠায় সফিও নিশ্বাস চেপে ছিলো এতক্ষণ। ওর আনন্দে সফির চোখেও খুশি নেমেছে।

—খালাস হো গিয়া। কে যেন বললে।

—ওদের জেল আর খালাস! কে যেন মন্তব্য করলে।

বুড়ো মিঞাসাহেব দাড়িতে হাত বুলিয়ে বুঝিয়ে দিলে ব্যাপারটা। অর্থাৎ জেল হলেও নাকি আরামে থাকতো ও। সাহেবী ওয়ার্ডে থাকতো, মিলতো নবাবী খানাপিনা। আর কাজ? ঘানি ঘোরাতে হতো নাকি ওকে? বসে বসে হিসেব লিখতো দিনে দু-চার ঘণ্টা, আর নয়তো স্রেফ হাসপাতালে গিয়ে পড়ে থাকতো। শালা 'এ কিলাস আসামীরা' তোফা থাকে। জেলখানার ডোরাকাটা শার্ট-পাতলুনও পরতে হতো না।

ওরা সবাই বিস্ময়ে শুনলো কথাগুলো। কেউ বিশ্বাস করলো, কেউ করলো না। কিন্তু বিস্মিত হলো সবাই। সত্যি কি তা হয় নাকি? তবে আর বিচারটা কোথায়? শুধু আদালতেই নয়, জেলখানাতেও সেই টাকার দাম? যার দৌলত আছে তার কয়েদ কয়েদ নয়? কিন্তু মেয়েটি একবারও এদিকে তাকাচ্ছে না কেন? যার জন্যে নিজের ভয়-ভাবনা ভুলে সহানুভূতিতে ভিজে এসেছিলো সফির চোখ, কৃতজ্ঞতায় সে একবারও কি তাকাতে পারে না সফির দিকে?

হঠাৎ নিজের নাম শুনে চমকে ফিরে তাকালো সফি।

—ডু ইউ প্লিড গিল্টি? অর নট গিল্টি? গড়গড় করে বলে গেল লোকটা।

হিন্দীতে অনুবাদ করে দিলো আরেকজন।

লোকটার, তারপর হাকিমের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলে সফি, তারপর হাসতে হাসতেই বললো, গিল্টি।

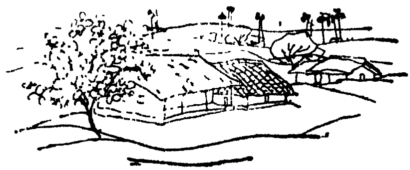
গিল্টিই তো। সারা দুনিয়া গিল্টিতে ছেয়ে গেছে, আসল সোনা কি আর আছে হুজুর। সব গিল্টি, বেবাক গিল্টি সব।

সফি নিজে অন্তত জানে, যে অপরাধে ওকে নিয়ে এসেছে সে অপরাধ ও করেনি। তা বলে সাচ্চা সোনাও তো ও নয়, কেউই তো নয়। আর, আর সাচ্চা সোনার দাম তো দুটো চাঁদির চাকতির কাছে বিকিয়ে গেছে।

সফি আবার একবার আরো জোরে বলে উঠলো, গিল্টি, গিল্টি হুজুর।

হুজুরও গিল্টি, এ কথা আর বললো না।

[১৩৫৮



তিতিরকান্নার মাঠ

অরুণিমা সান্যালের সঙ্গে আমার আবার দেখা হবে। অনেক অনেক মিঠে বসন্তের মাঠ পার হয়ে এসে কোনো-এক আকস্মিকতার আলপথে আবার দেখা হয়ে যাবে অরুণিমার সঙ্গে।

খালারির লাইম হিল থেকে হঠাৎ হুঁশিয়ারি-ঘণ্টার আর্তনাদ ভেসে আসবে, ডিনামাইট ফাটবে, সশব্দে খসে পড়বে পাথুরে চুনের চাঙড়। কিন্তু সে আওয়াজ কি কানে পৌঁছবে আমার?

গাঁটে গাঁটে ঠোকর খাওয়া বেতো বুড়োর মতো বরকাকানার লোক্যালটা রোদজ্বলা আর রঙচটা শরীর নিয়ে ঠুঙঠুঙিয়ে এসে দাঁড়াবে মহুয়ামিলনের প্ল্যাটফর্ম ঘেঁষে। কামরাগুলোর জানলায় উঁকি দেবে সাদা-পাখনা পাখির মতো এক ঝাঁক কনভেণ্টে-ছুটি-পাওয়া অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে। কিন্তু সেদিকে কি চোখ যাবে আমার?

চিউইং গাম আর চকোলেট খাওয়া মুখে বাচ্চা মেয়েগুলো জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করবে, ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ আর ক'টা স্টেশন, ট্রেন কি ল্যেট চলেছে? টিংলিটুডাঙের ল্যাক ফরেস্ট থেকে চোরাই কাচ্চা-গালার মোট কাঁধে নিয়ে নোংরা দেহাতীদের ভিড় ডেড়া-কামরায় ঝামেলা বাধাবে খামকা। কিন্তু আমার মন কি স্পর্শ করবে এসবের কিছু?

তবুও বরকাকানার লোক্যাল ট্রেন এসে থামবে মহুয়ামিলন স্টেশনে। দুপুরের ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুর গায়ে মেখে কুলিকামিন রেজা রোজমজুরদের দুর্গন্ধ ছড়িয়ে। জান্‌কী ডাব্বার পাশে, রাধাকিষণের মন্দির পার হয়ে টিলায় ঘেরা ঘরগুলোর পাশে এসে ট্রেন থামবে।

ডেরা ডিহি, গাঁও দেহাত? না, কিছু নয়। গ্রামের নাম গ্রাম নয়, মাঠ। জলো গাঁয়ের জংলী ভাষার নাম বাংলা করলে দাঁড়ায়—তিতিরকান্নার মাঠ। তিতিরকান্নার মাঠের ধারে মহুয়ামিলন স্টেশন।

টিকিট হাতে নিয়ে ছুটতে ছুটতে স্টেশনে আসবো আমি, দেহাতীদের ভিড় ঠেলে ঠেলে ট্রেনের কামরা খুঁজবো। তারপর—ওর মুখের ওপর দিয়ে আমার চোখ পিছলে সরে যাবে, কিন্তু দু-চার মুহূর্ত পরেই আবার থমকে দাঁড়াবে মন। হয়তো দু-চার পা এগিয়ে গিয়েছি, কিন্তু—মন থেমে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে না হোক, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে পায়ের গতিও থামবে। আরেকবার ফিরে তাকাবো ওর মুখের দিকে, মনে হবে ও-মুখ যেন চেনা-চেনা, অনেক চেনা মনে হবে আমার। মনে পড়বে।

নিজেরই অজান্তে কখন কম্পার্টমেণ্টের সামনে এসে দাঁড়াবো। চোখ মেলে তাকাবো অরুণিমার দিকে। নতুন-কেনা হোল্ড-অল, আর লেবেল-আঁটা স্যুটকেস, কুকুর, ছড়ি, ফ্লাস্ক, বেতের টিফিন বক্স ইতিমধ্যেই প্ল্যাটফর্মের ধুলোয় সাজানো হয়ে গেছে, দেখতে পাবো। আর তার পাশেই সত্যিকারের পোশাকে সাজানো একটি নধরকান্তি পুরুষ চেহারাও চোখে পড়বে। দোহারা শক্তসমর্থ শরীর। ভায়োলেট রঙের কর্ডুরয়ের ট্রাউজার, গোলাপী লিনেনের হাওয়াই শার্ট, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, পায়ে ক্রেপ সোলের দামী জুতো, কাঁধে চামড়ার স্ট্র্যাপে ঝোলানো ক্যামেরা ইত্যাদি সব-কিছুকে ছাপিয়ে স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়বে শুধু দুটো ফাঁপালো আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত চুরুট, চুরুটের ধোঁয়ার ফিতে। সেদিক থেকে দৃষ্টি সরে যাবে ট্রেনের কামরার দিকে, কামরার পা-দানির দিকে। চোখ তুলে তাকাবো ফের, অরুণিমার চোখে চোখ রেখে। না-চেনা ভুরুর ভাঁজে দেখবো দুপুরের ক্লান্ত-কালিমা, ঈষৎ বিরক্তির আভা তার চোখের তারায়, কানে কপালে লুটিয়ে-পড়া উড়ু-উড়ু শুকনো চুলে ট্রেন-জার্নির স্মৃতিচিহ্ন, গলার স্বেদসিক্ত মুক্তোর মালায় আর সবুজ শাড়ির ভাঙা ভাঁজের জড়তায় শ্রান্তির আভাস, বিষণ্ণ মধুর। অরুণিমা। অরুণিমা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে প্ল্যাটফর্মে নামানো জিনিসগুলোর দিকে তাকাবে, হাওয়াই শার্টের দিকে, তারপর বছর তিনেকের একটি ছোট ফুটফুটে ছেলেকে হাত ধরে নামিয়ে আনবে কামরার ভেতর থেকে, টুক্ করে বুকে তুলে নেবে ছেলেটাকে, সাবধান-সাবধান পা ফেলে নেমে আসবে নীচে। আমার মনে তখন শুধু একটাই ইচ্ছে জাগবে, একটাই কামনা। চোখ তুলে কি তাকাবে না অরুণিমা, চিনবে না? কিন্তু ও যেন বড় বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়বে, সময় পাবে না পাশে কে দাঁড়িয়ে আছে দেখবার। না, শেষ অবধি পারবে না অরুণিমা, চোখাচোখি হবে, ঠোঁট কাঁপিয়ে হেসে উঠবে ওর মুখ।

—পারলুম না। মিষ্টি হাসিতে উজ্জ্বল মিঠে কণ্ঠের কাকলি শুনবো।—পারলুম না গম্ভীর হয়ে থাকতে।

—দেখেছো? চিনেছো তা হলে? আমি প্রশ্ন করবো।

চোখে চোখ মেলে অরুণিমা শুধু হাসবে, জবাব দেবে না প্রশ্নের।

তারপর সেই পোশাকে-সাজানো পুরুষটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে অরুণিমা ; কোনো কথায় নয়, উপাধিতে নয়, শুধুমাত্র ঠোঁট আর চোখের কৌতুক-হাস্যে, লজ্জাগর্বের ইশারায়।

আমি বিস্মিত হবো নিশ্চয়ই, কিন্তু বিস্ময় চাপা দিতে হবে আমাকে।

—সুনীতদা, এই আমার সুনীতদা। আমার পরিচয় দেবে অরুণিমা।

—অত্যন্ত খুশী হলাম। গুরুগম্ভীর উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে একটা মাংসল হাত এগিয়ে আসবে। হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমাকে খুশী হতে হবে।

তারপর অরুণিমার কোলের ছেলেকে কোলে তুলে নেবো, বলবো দু-একটা অবান্তর

প্রশংসার কথা, হয়তো বা খোকার মুখশ্রীতে মুগ্ধ হবো, উদ্বেগ দেখাবো অরুণিমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে।

—সত্যি, এত রোগা হয়ে গেছো! বলবো আমি।

—সেইজন্যেই তো আসা। এত জায়গা থাকতে এখানে এলাম কেন, যদি শরীরই ভালো থাকবে। সরল সহজ হাসি ভাসবে ওর কথায়।

ওর কথা! ওর কথা কাজ ভোলাবে, গন্তব্যের ঠিকানা ভুলবো আমি।

—কোথায় যাবে? অরুণিমা প্রশ্ন করবে, না গেলেই কি নয়?

মুখ বলবে, 'কাজ', কিন্তু মন আমার অন্য কথাই বলতে চাইবে।

লটবহর কুলির মাথায় তুলে ওরা তখন চলতে শুরু করবে। কর্ডুরয়ের ট্রাউজার চলবে আগে আগে, আমরা পিছনে। তিন বছরের ছেলেটাই আমাদের মাঝখানে চীনের দেয়াল গেঁথে চলবে।

—এবার চলি আমি। ফিরতে চাইবো আমি, ট্রেনের হুইস্‌ল্‌ শুনতে পাবো আর পর-মুহূর্তেই খপ্‌ করে আমার হাত চেপে ধরবে অরুণিমা, অনুনয়ের দৃষ্টিতে তাকাবে মুখের দিকে।—কত দিন, কত বছর পরে দেখা হলো বলো তো, আর আজই তোমার যত কাজ! অরুণিমার চোখে ব্যথার বিন্দু দেখবো।

উত্তর হারাবো আমি। চুপ করে থাকতে হবে।

ও বলবে, কত কথা, না না, যাওয়া চলবে না তোমার। এই নতুন জায়গা, কত অসুবিধে হবে বলো তো, তুমি না থাকলে!

—আমি আছি জেনে তো আসোনি অরুণিমা। হঠাৎ যদি এমনভাবে দেখা নাই হতো, অসুবিধে কমাবার জন্যে কাকে পেতে তখন?

কপালে ভুরু তুলবে অরুণিমা। বলবে, এত দূর থেকে এখানে শুধু ঝগড়া করতে আসিনি সুনীতদা।

চোখ ছলছল করবে অরুণিমার, আর আমি আশ্চর্য হবো এই ভেবে যে, এমন সুযোগ বুঝে চোখে জল আনতে পারে মেয়েরা?

তবু যাওয়া হবে না আমার। অরুণিমার অনুনয় উপেক্ষা করার মতো শক্তি আমি কোথায় পাবো!

টিংলিটুডাঙের লালাবাবুর বাড়িটা নাকি ওদের জন্যে নতুন করে কলি ফিরিয়ে রাখা হয়েছে, বলবে লালাবাবুর দারোয়ান। তিরিশ সালের ভাঙা ফোর্ডখানার দিকে ইশারা দেখিয়ে বলবে, লালাবাবুর চিঠি পেয়েই গাড়ি নিয়ে এসেছি।

জান্‌কী ডাব্বার পাশ দিয়ে গাড়ি চলবে, টাল খেয়ে খেয়ে, সুরকির রাস্তা জুড়ে পড়ে থাকা হলদে মহুয়া মাড়িয়ে, আমলকী পাতার ঝিকিমিকি ছায়ায় পাগলা-মেম মেরী ওয়াট্‌সনের বাংলোর বাগানের মাঝ দিয়ে, কুণ্টিকড়ুয়া টিলা পাহাড়ী সড়ক ধরে। আঁকাবাঁকা রাস্তার ঝাঁকুনিতে অরুণিমা কখনো আমার দিকে ঢলে পড়বে, কখনো হাওয়াই শার্টের দিকে।

অতখানি পথ, এতটা সময়, তবু একটাও কথা শুনবো না হাওয়াই শার্টের, হাসি দেখবো না ফিকে সানগ্লাসের চোখে, যতক্ষণ না লালাবাবুর কুঠিতে এসে গাড়ি পৌঁছয়।

মোটামুটি সব গোছগাছ হয়ে যাওয়ার পর বাইরের বারান্দায় এসে ডেকচেয়ারে শরীর ঢেলে দেবে ফাঁপালো মানষুটা, চুরুটের বাক্স থেকে একটা চুরুট বের করে ধরাবে, একমুখ ধোঁয়া ছাড়বে ধীরে ধীরে, তারপর প্রশ্ন করবে, কোথায় থাকা হয় আপনার?

উত্তর দেবো। তারপর বহুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকবো দুজনে, কথা খুঁজে পাবো না।

কর্ডুরয়ের ট্রাউজারই নিঃশব্দতা ভাঙবে শেষকালে, দারোয়ানকে বলবে, কুয়ো থেকে জল তুলে দিয়েছো? স্নান করতে গেছেন মেমসাহেব?

আমি উঠে দাঁড়াবো, চলি মিস্টার গুপ্ত। এখানেই তো আছি, আবার আসবো।

শুধু ঘাড় কাত করে সম্মতি জানাবে হাওয়াই শার্ট, আর পরমুহূর্তেই বেতের টিফিন বাক্স থেকে ইংরেজী ছবির কাগজ বের করে মন ফেরাবে।

আমি চলে আসবো। চলে আসতে হবে আমাকে। আর সারা পথ হাঁটতে হাঁটতে ভাববো, অরুণিমা কি ভাববে, স্নান-প্রসাধন সেরে অরুণিমা যখন বেরিয়ে আসবে, তখন কি সুন্দরই

না দেখাবে অরুণিমাকে! অনেক বেশী সুন্দর মনে হবে। ঠিক সেই হারানো দিনের অসহ্য রূপ নিয়ে কি ও বেরিয়ে আসবে? আর বেরিয়ে এসে যখন দেখবে সুনীতদা চলে গেছে, একটাও কথা না জানিয়ে, তখন...

তখন ওর চোখে কিসের ভাষা ফুটবে, ওর মনের বুকে কতখানি দোলা লাগবে, কতটা বিস্ময় জাগবে ওর চোখে, ভাবতে ভাবতে পথ ছোট হয়ে যাবে আমার, সময় পিছলে যাবে।

তারপর কোনো-একদিন গুপ্তসাহেবের মেজাজ ভালো থাকবে না, শরীর বিদ্রোহী, অথচ অরুণিমা আমলকীর বন পার হয়ে সাপের বুকের মতো সরু আর আঁকাবাঁকা চুনাক্কা নদীর ধারে বসে সন্ধ্যার ছায়া-ছায়া ফিকে জোছনার মেঘের দিকে তাকিয়ে আনমনে দাঁতে ঘাস কাটতে চাইবে।

চোখের ইশারায় বিরক্তি প্রকাশ পাবে ওদের দুজনেরই, আর গুপ্তর মনের চারপাশে মনোমালিন্যের কুয়াশা রেখে অরুণিমা বেরিয়ে পড়বে খোকাকে সঙ্গে নিয়ে।

বাধা দেবার চেষ্টা করবো আমি, বলবো, থাক না অরুণিমা, ওঁর শরীর যখন ভালো নেই, তা ছাড়া ওঁকে একা রেখে...

কথা শেষ হবে না, অরুণিমার চোখের দৃষ্টি আমার মুখে হাত চেপে ধরবে। বলবে, চলো তুমি, তোমাকে ভাবতে হবে না অতশত।

খোকার হাত ধরে এগিয়ে যাবে ও, নিশ্চুপ. কথা নেই কথা নেই, শান্ত নিস্তব্ধতায় পাশাপাশি হেঁটে এসে বসবো আমরা চুনাক্কার জলসিঁড়ির পাশে। অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকবো।

তারপর একসময় শুনতে পাবো অরুণিমার দীর্ঘশ্বাস। অরুণিমা বলবে, আশ্চর্য! মানুষের মন কখন যে কি ভাবে!

—কেন? কে কি ভাবলো আবার?

হেসে উঠবে অরুণিমা, সশব্দে।—ও কি ভাবছে জানো! ভাবছে তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা স্বাভাবিক নয়। পুরুষমানুষের মনে কত যে সন্দেহ।

আমাকে হাসতে হবে। ব্যথার হাসি। ভাববো, সত্যিই যদি অরুণিমার সঙ্গে আমার কোনো-একটা সম্পর্ক গড়ে উঠতো! সুযোগ তো এসেছিলো, সময়ও। আর আমার মন জুড়ে সেদিন অরুণিমার মুখই তো ভাসতো শুধু। তবু আশ্চর্য মেয়েদের মন!

আমার কথা শুনে খিলখিল করে কৌতুকে বিদ্রূপে অরুণিমার যে মুখ হেসে উঠেছিলো সেদিন, সেই মুখ আবার লজ্জার ভার নামিয়ে দেবে চোখের পাতায়। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়বে আরেকজনকে। অসীমেন্দুর কথা মনে পড়বে। নিজেই নিজের দীর্ঘশ্বাসে চমকে উঠবো একসময়। বলবো, এমন কেন হলো অরুণিমা?

চোখ ফেরাবে ও, বুঝবে কি বলতে চাই। ধীরে ধীরে মাথা নামাবে, দু হাঁটুর ফাঁকে থুতনি রেখে একটা ঘাসের শিষ ছিঁড়ে নেবে অরুণিমা। হঠাৎ যেন অনেক চেষ্টার পর উত্তর বেরুবেঃ বিশ্বাস করো সুনীতদা, আমার ভুল নয়, আমার ভুল নয়, আমার দোষ নয়।

—কিন্তু অসীম তো তোমার জন্যেই তার সমস্ত জীবন নষ্ট করলো, তার অপরাধটা তুমি কোথায় দেখলে!

মুখ দেখতে না পেলেও বেশ বুঝতে পারবো পুরোনো দিনের কথায় চোখ ছলছল করে উঠছে ওর। ভেজা গলায় ও বলবে, থাক্ সুনীতদা ওসব কথা।

থাক্ বললেই কি রাখা যায়! চাবি হাতে পেয়েও কি বিস্ময়ের ঘর না খুলে থাকা যায়!

ঠিক এমনি এক সন্দেহ এর আগেও হয়েছিলো, এর আগেও একবার অসীমেন্দুর বাড়ি খুঁজে বের করেছি। কলেজে পড়ি তখন, সব আসনেই আমরা তখন পাশাপাশি। হোস্টেলে একই ঘরের দুটো সীট। আমি আর অসীমেন্দু। কলেজে ঢুকে প্রথম একটা মাস কেন জানি ওর কাছ থেকে দূরে দূরে থাকতাম, ওর চালচলন হাবভাব কোনো কিছুই যেন পছন্দ হতো না। তারপর কেমন করে যেন কাছাকাছি এসে গেলাম, একই হোস্টেলে পাশাপাশি সীট নিলাম, নিবিড় হয়ে গেল পরিচয়। চমৎকার স্বাস্থ্যবান চেহারা ছিলো অসীমেন্দুর, আর

খেলাধুলোয় নাম করেছিলো সেই বয়সেই। ব্যস্, পরিচয়ের মধ্যে ঐটুকুই। পোশাক-পরিচ্ছদে একেবারে উন্মাদ বলেই ধারণা হতো। ওর শার্টের কলার কোনো দিন আ-ফাটা দেখিনি, রঙ-বেরঙের পায়জামার কোথাও-না-কোথাও ছেঁড়া বেরুবেই। আর তিন সপ্তাহ যদি পোশাক বদলাতে ভোলে তো তিন মাস ভুলে থাকবে ও চুল কাটার কথা। কখনো মনে হতো ইচ্ছাকৃত, কখনো বা সন্দেহ হতো দারিদ্র্যের আঘাতেই ওর এমন দশা। ওর বাড়ির চেহারাটাও তাই মনে মনে কল্পনা করে নিয়েছিলাম, আর একটা অত্যন্ত অভাবের সংসার চোখে ভেসে উঠতো অসীমেন্দুর কথা ভাবলেই। সন্দেহের ভিত দৃঢ় হতো অসীমেন্দুর তরফ থেকে বাড়ির কথা এড়িয়ে যাবার চেষ্টায়।

এই অসীমেন্দু কলেজের পরীক্ষা শেষ হয়ে যেতেই বেডিং বাক্স বাঁধতে বাঁধতে বাড়ির ঠিকানা দিয়ে বললে, আসিস মাঝে মাঝে।

—সে কি, এখানেই বাড়ি তোর? নিশ্চয়, যাবো তো নিশ্চয়ই। উত্তর দিয়েছিলাম। গিয়েছিলামও।

রাস্তার নাম দেখে প্রথমটা বিস্মিত হয়েছিলাম, আবার ভেবেছিলাম, বড় রাস্তায় কি ছোট রোজগারের মানুষ থাকে না!

কিন্তু নম্বর মিলিয়ে মিলিয়ে যে বিরাট বাগানওয়ালা বড় ফটকের বাড়িটা পাওয়া গেল, তার ভেতর ঢুকতে সাহস হলো না। ভাবলাম, পয়লা এপ্রিল তো অনেক দূরে। অসীমেন্দু কি আমাকে বোকা বানাবার জন্যেই এ ঠিকানা দিয়েছে?

হঠাৎ কাঁধের ওপর একটা ভারি হাতের স্পর্শে চমকে উঠেছিলাম।

—কি রে, বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? চল্। হকি স্টিক দোলাতে দোলাতে ফিরছিলো অসীমেন্দু, গেটের বাইরে আমাকে ঘোরাঘুরি করতে দেখে টেনে নিয়ে গেল ভেতরে।

তারপর যে ঐশ্বর্য, যে পরিবেশ, সংসারের যে পরিচয় পেলাম, তা আমার কল্পনাকে ধূলিসাৎ করে দিলো।

বছর কয়েক পরে আবার ঠিকানা খুঁজে খুঁজে যেতে হলো সেই অসীমেন্দুর কাছে। ওর চিঠিটা পকেট থেকে বের করে গলিটার নামটা মিলিয়ে নিলাম। ভাবলাম, কানা গলির ভেতরেও কি ঐশ্বর্যের প্রাসাদ থাকতে পারে না? না। নোংরা গলি, বাড়িটার বয়েসও শতাব্দী কয়েকের কম নয়। সামনের রোয়াকে আশি বছরের বুড়োর দাঁতের মতো কয়েকটা ভাঙা ইঁট ঝুলছে। দেয়ালে শ্যাওলা, সবুজ-রঙ-করা কাঠের কপাট পচে গেছে এক যুগ আগেই। কপাটের ওপরেই আলকাতরায় লেখা বাড়ির নম্বর।

কপাট ভেজানো ছিলো, তবু কড়া নাড়লাম।

—কে? দরজা খোলা আছে।

মুহূর্ত কয়েক দাঁড়িয়ে ভাবলাম ভেতরে ঢুকবো কি না। এ বাড়ি নিশ্চয়ই অসীমেন্দুর নয়, ধারণা হলো আমার। অমন ঈর্ষার ঐশ্বর্য থেকে নেমে আসতে হবে কেন অসীমেন্দুকে!

—কে? এবার এলো মেয়েলী কণ্ঠে প্রশ্ন। হালকা পায়ে কে যেন এগিয়ে এলো, রঙিন এক টুকরো শাড়ির বিদ্যুৎ উঁকি দিলো কপাটের আড়ালে। তারপর দরজা খুলে দিলো সে, আর পরমুহূর্তেই—

—কে? আরে সুনীতদা, তুমি? এসো, ভেতরে এসো সুনীতদা। বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? তখন থেকে কে কে করছি, সাড়া দিচ্ছো না যে! হাসিতে উচ্ছল হয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল অরুণিমা।

কতটুকুই বা পথ, দেখাবারই বা কি আছে! ছোট একখানা ঘর, সামনে এক ফালি বারান্দা। এক কোণে ইট সুরকি, ভাঙা কাচ, অকেজো লোহার শিক, তারের জাল সব স্তূপাকার হয়ে পড়ে আছে। বারান্দার এক পাশে একটা মোড়ার ওপর বসে টেনিস-র‍্যাকেটে স্ট্রিং আঁটছিলো অসীমেন্দু।

র‍্যাকেটটা দূরে সরিয়ে রেখে একটা সস্তা সিগারেট ধরালো।—আয়। কবে এলি?

বললাম।

—মহুয়ামিলনেই আছো? অরুণিমা প্রশ্ন করলে।

ঘাড় নাড়লাম।

অসীমেন্দুকে বললাম, খেলার নেশা তোর এখনো আছে তা হলে!

ও হাসলো।—কেন, গাটিং করাবার পয়সা নেই বলে বলছিস?

—না, না। বয়সের কথা, এত বয়সেও...

—খেলার আবার বয়স আছে নাকি? অরুণিমার হাসি-চোখে হাসি রাখলো অসীমেন্দু—কোষ্ঠীতে আছে এ-বছর আমার যশোপ্রাপ্তিযোগ, নির্ঘাত বেঙ্গলস্ নাম্বার ওয়ান হচ্ছি এবার।

বললাম, হলে খুশী হবো। কিন্তু কি খবর বল তো, হঠাৎ অ্যাদ্দিন বাদে এমন জরুরী ডাক?

অরুণিমা বাধা দিলো।—ওমা, তাই নাকি! আমি ভাবলাম, অ্যাদ্দিন বাদে বোধ হয় আমাদের কথা মনে পড়েছে। কই, সুনীতদাকে আসতে লিখেছো বলোনি তো আমাকে?

অসীমেন্দু হেসে বললে, সব কথা বলার সময় কই অরুণি?

অরুণিমা কপট অভিমান দেখালে। তারপর—বোসো, গল্প করো তোমরা, আমি বাড়ি থেকে চা করে আনি। বলেই কপাট খুলে বেরিয়ে গেল।

বললাম, কি ব্যাপার বল তো, কেমন যেন রহস্য-রহস্য ঠেকছে। বিয়েটা হয়ে গেছে? অরুণিমা কি এখানেই থাকে?

অসীমেন্দু নিবিয়ে-রাখা সিগারেটটা আবার ধরালো। বললে, না, এখনো হয়ে ওঠেনি। কিন্তু বিয়ে করবো জিদ ধরাতেই এই হাল—ত্যাজ্যপুত্তুর।

জিজ্ঞেস করলাম, আর ওর বাড়ি থেকে?

—হ্যাঁ, আপত্তি তো আছেই। আচ্ছা, বড়লোকের ছেলে না হলে বোধ হয় ত্যাজ্যপুত্র হয় না, কি বলিস? হো-হো করে হাসলে অসীমেন্দু।

বললাম, অনেকটা সত্যি। গরিবের ছেলেরা এমনিই ত্যাজ্য হয়ে থাকে। তারপর প্রশ্ন করলাম, অরুণিমা কি কাছেই থাকে নাকি?

—হ্যাঁ, দুটো বাড়ি পরেই। ও-ই তো জুটিয়ে দিয়েছে ঘরটা। মান্থলি রেণ্ট থার্টি চীপ্স্। তারপর তোর কি খবর বল।

বললাম। মহুয়ামিলন, চুনের কারখানা, অ্যাসিস্টেণ্ট ম্যানেজারি।

—আর পারছি না। দীর্ঘশ্বাস ফেললে অসীমেন্দু। বললে, অরুণিকে বাদ দিয়ে বেঁচে থেকে কি লাভ বল?

—বাদ দিতে বলছে কে?

অসীমেন্দুর মুখে বিষণ্ণতার ছায়া পড়লো।—খেলাটা আমার নেশা, তাই ছাড়তে পারি না। তাও চাঁদাটা ওর কাছে হাত পেতে নিতে হয়।

বললাম, খেলোয়াড়রা তো চেষ্টা করলেই চাকরি পায়, নে না একটা যোগাড় করে। তা হলেই তো সব সমস্যা মিটে যায়।

চুপ করে রইলো ও। উত্তর দিলো না। সিগারেটের শেষটুকু চায়ের পেয়ালায় ফেলে দিয়ে আবার র‍্যাকেটে স্ট্রিং টানতে শুরু করলো। অনেকক্ষণ কোনো কথা বললো না।

তারপর হঠাৎ যেন ব্যর্থতায় ভেঙে পড়লো ও।—লেখাপড়াটাও যদি করতাম তখন। চেষ্টা কি কম করেছি সুনীত, কিন্তু সবাই সার্টিফিকেট দেখতে চায়।

মনে পড়লো। সত্যিই ছেলে তো খারাপ ছিলো না অসীমেন্দু, কিন্তু ওর সারা মন জুড়ে যে তখন শুধু অরুণিমা। শুধু কি ওর? আমারও মনে তখন অরুণিমার নাম গানের কলি হয়ে বাজছে বারবার। অরুণিমা নেশা ধরাতো আমার মনে, ওর কাছে অরুণিমা ছিলো জীবন।

এই তো ভালোবাসা, একেই তো প্রেম বলে। অরুণিমার জন্যে সমস্ত ভবিষ্যৎ নষ্ট করেছে অসীমেন্দু, বঞ্চিত হয়েছে তার উত্তরাধিকার থেকে, বেছে নিয়েছে দারিদ্র্যের পথ, হতাশার পথ। তবু ওদের ভালোবাসায় ভাঙন ধরেনি, বরং জীবন পেয়েছে।

আর আমি? ভুলেই গিয়েছি অরুণিমাকে হয়তো!

অরুণিমা! আমাদের হোস্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের মেয়ে অরুণিমা সান্যাল!

চতুর্দিকে হোস্টেলের চোদ্দটা ওয়ার্ড, মাঝখানে বেশ খানিকটা ফাঁকা সবুজ মাঠ। খেলা-

ধুলোয় প্রতিটি অপরাহ্ণ মুখর হয়ে উঠতো। খেলতো আর ক'জন, কিন্তু দেখতো সকলেই। দোতলা আর তেতলার বারান্দার রেলিং খালি থাকতো না, দু শো নব্বইজন বোর্ডারের অধিকাংশ এসে জড়ো হতো বিকেল না হতেই। আরও একজন, হোস্টেলের পশ্চিম পাখনায়, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রফেসার সান্যালের মেয়ে অরুণিমাও এসে দাঁড়াতো দোতলার বারান্দায়। দু শো নব্বইজন বোর্ডারের নিঃসঙ্গ জনালায় একমাত্র শিশিরবৃষ্টি।

আমি আর অসীমেন্দু যে-কোনো একটা ছুতো পেলেই গিয়ে দেখা করতাম অরুণিমার সঙ্গে। যেমন করে হোক, দুটো কথা বলতে, বলাতে। হাসাতে চাইতাম ওকে, ওর হাসি দেখবার জন্যে।

কোনো দিন হয়তো ছুঁচসুতো চাইতে গেছি আমি, অসীমেন্দু পরের দিনই গিয়েছেঃ শার্টের বোতামটা লাগাতে পারছি না, লাগিয়ে দেবে অরুণিমা? বয়স অরুণিমার তখন কমই, আমাদের অপারদর্শিতায় হেসে লুটিয়ে পড়তো ও। প্রফেসর সান্যালের কাছে টেনে নিয়ে যেতো আমাদের।—তোমার ছাত্তরদের কাণ্ড দেখো বাপী, শার্টের হাতায় কোটের বোতাম লাগিয়েছে।

ও তো আর বুঝতো না, সবই আমাদের ইচ্ছাকৃত। এমনি করে আলাপ গড়ে উঠেছিলো, অরুণিমাকে একটার পর একটা কাজ করে দেওয়ার সুযোগ দিয়ে আর অরুণিমার ছোট ভাইটিকে আদর করে। তখন আমরা দুজন দুজনের বন্ধু। তারপর নিজেদেরই অজ্ঞাতে কখন থেকে যেন আবার পরস্পরকে ঈর্ষা করতে শুরু করলাম। খেলা-খেলা ভাব কখন যেন জীবনের মেখলা হয়ে দেখা দিলো। আমরা পরস্পরকে এড়িয়ে অরুণিমার সঙ্গে দেখা করতে শুরু করলাম। আমার যখন একখানা পোস্টকার্ডের জরুরী দরকার পড়তো, অসীমেন্দুর তখন কিছুতেই টিংচার আইওডিনের দরকার হতো না। অসীমেন্দু যখন কলেজ স্ট্রীটে কেনা আমের ঝুড়িটা বাড়ি থেকে পাঠিয়েছে বলে প্রফেসর সান্যালকে দিতে যেতো, আমার পোকায়-কাটা সার্জের শার্টে রিপু করার কথা কিছুতেই মনে পড়তো না সে-সময়। এমনি করে একজন আরেকজনকে এড়িয়ে অরুণিমার মনের প্রবেশপথ খুঁজে চলেছিলো। আর, কেন, কেমন করে জানি না, আমরা দুজনেই নিজের নিজের মনে ভাবতাম, অরুণিমার প্রেমের ছোঁয়া পেয়েছি আমি, প্রীতির ছোঁয়া পেয়েছে অন্যজন অথচ হাবভাব চলনে-বলনে এতটুকু পার্থক্য আছে বলে মনে হতো না।

ভাবতাম, এর চেয়ে মিষ্টি করে চোখের তারা নাচিয়ে কি অরুণিমা হাসতে পারে, এমন গানের মতো গলায়, সুরের মতো কণ্ঠস্বরে আরো বেশী আন্তরিকতা ঢেলে কি অরুণিমা কথা কয় অসীমেন্দুর সঙ্গে? ওর কাছেও কি এমন কারণে-অকারণে শরীর নাচায় অরুণিমা? ঠিক এতখানি সারল্যের ভান করে কি অসীমেন্দুরও হাত চেপে ধরে ও? অসীমেন্দু যখন ফুটবল ম্যাচের রীলে শুনতে শুনতে কাগজের গ্রাফে বলটা কখন কোথায় দেখিয়ে দেয়, তখনো কি অরুণিমা এমনিভাবেই চেয়ারের কাঁধ ডিঙিয়ে অসীমেন্দুর কাঁধে নরম শরীরের ভর দেয়?

এই বিশ্বাস দৃঢ় হতে হতে ক্রমশ ধৈর্য হারালাম আমি। একদিন, কি বলেছিলাম মনে নেই, কেমন করে বলেছিলাম ভাবতেও লজ্জা হয় আজ। পাগলের মতো হঠাৎ গিয়ে হাজির হয়েছিলাম ওর সামনে, আচমকা ওকে কাছে টেনে নিয়ে অনর্গল উচ্ছ্বাসে কত কি বলেছিলাম! অনেক অনেক রাত-জাগা স্বপ্নের শানানো বানানো কথা নয়, স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাসের কথা। প্রেম। ভালোবাসা যেন!

আর, আর অরুণিমা সে কথা শুনে খিলখিল করে হেসে লুটিয়ে পড়েছিলো। বলেছিলো, পাগল হয়ে গেছো নাকি সুনীতদা? যাও, মাথায় একটু ঠাণ্ডা জল ঢেলে এসো।

ওর প্রত্যাখ্যান, ওর বাঁকা হাসির বিদ্রূপ হয়তো সহ্য হতো, কিন্তু, কিন্তু অসীমেন্দুর কানেও আমার লজ্জার খবর, আমার পরাজয়ের কাহিনী ও যখন পৌঁছে দিলো, তখন আর ক্ষমা করতে পারলাম না।

ঠাস-ঠাস করে দুটো চড় বসিয়ে দিয়েছিলাম অরুণিমার গালে। চোখের জলে আক্রোশের অভিশাপ ঢেলে বলেছিলামঃ এতদিন যে নাটুকেপনা করে এসেছো তাতেই খুশী হওনি, আমার দুর্বলতায় নিজে হেসেই সন্তুষ্ট হওনি, সকলের চোখে আমাকে হাস্যাস্পদ করে

তুলতে চেয়েছো। কিন্তু মনে রেখো অরুণিমা, এর প্রতিশোধ একদিন আমি নেবোই, তোমার অবস্থা দেখেও একদিন প্রাণ খুলে হাসবো আমি।

ঠিক এই কথাই হয়তো নয়, কিন্তু এই ধরনেরই কথা, আরো অভদ্র শব্দের মারফত ওকে শুনিয়েছিলাম সেদিন। আর মনে মনে ভেবেছিলাম, মেয়েরা কত হৃদয়হীন, কত নৃশংস; ওরা যে প্রেমিককে ভালোবাসে তাকেই 'হিরো' ভাবে, আর যে প্রেমিক ভালোবাসা পায় না, ওদের চোখে সেই হয় সার্কাসের ক্লাউন। অথচ দুজনেই তো সমান ভালোবাসে, দুজনের প্রেমই তো সমান নিখাদ!

আশ্চর্য! সময় সব-কিছুই ধুয়ে মুছে নিতে পারে। স্লেটে লেখা নামের মতো সব স্মৃতি, সব অভিমান সময়ের জলে ধুয়ে মুছে গেল একদিন। অসীমেন্দুকে বললাম, ভুল করে-ছিলাম, মাফ করিস তুই। অরুণিমাকে বললাম, দোষ আমার নয়, অপরাধ আমার নির্বুদ্ধিতার। শুধু কি তাই? নতুন-কেনা ক্যামেরায় ওদের দুজনের একটি ছবি তুলে দিয়ে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছিলাম।

সেই অরুণিমা আর অসীমেন্দুর সঙ্গে আবার দেখা হয়েছিলো। কয়েক বছর বাদে বিস্মৃতির সুতোয় সুর বেজেছিলো নতুন করে।

তারপর, যাবার দিন অসীমেন্দু চুপিচুপি বললে, অরুণিকে বলিস না যেন, তোকে আমার এই বিপদের সময় ডেকেছি কেন!

—কেন ডেকেছিস তা তো বুঝলাম না এখনো। বললাম আমি।

বিষণ্ণ হাসি হাসলে ও আমার কথা শুনে। বললে, লাইম ফ্যাক্টরীর অ্যাসিস্টেণ্ট ম্যানেজার তুই। তোর এখন কত প্রতিপত্তি, একটা ব্যবস্থা তুই করে দে সুনীত।

জবাব দিতে পারলাম না আমি, চুপ করে রইলাম।

অসীমেন্দু বললে, যে-কোনো একটা চাকরি, তুই চেষ্টা করলেই হবে, আমি ঠিক জানি। আমাকে শুধু এখান থেকে পালিয়ে বাঁচতে দে সুনীত। আমি আর অরুণি, যেমন করে হোক চালিয়ে নেবো, শুধু আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের উপহাস থেকে আমাকে বাঁচা তুই।

উপহাস! অদ্ভুত শোনালো কথাটা। প্রেমের ব্যর্থতাই তা হলে সবচেয়ে বড় লজ্জা নয়? এর চেয়েও বড় লজ্জা, বড় দুঃখ আছে? অর্থাভাব কি তা হলে আরো গভীর বিদ্রূপ?

বললাম, ভাবিস না তুই। আমি আছি, আমি এখনো তোর বন্ধু।

আশ্বস্ত বোধ করলো যেন অসীমেন্দু আমার কথায়। একটা সশব্দ দীর্ঘশ্বাসে সব ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে বললে, অরুণিমার জন্যে আমি সব-কিছু হারিয়েছি, হারাতে রাজী আছি। কিন্তু অরুণিমার কাছে যেন আমি হেরে না যাই।

অরুণিমা আর অসীমেন্দু যখন ট্রেনে তুলে দিতে এলো, তখনো আশ্বাস দিয়েছিলাম অসীমেন্দুকে।

আর হাসতে হাসতে বলেছিলাম, আবার দেখা হবে অরুণিমা।

তিক্ত ব্যথিত মুখে অরুণিমা বলেছিলো, কে জানে সুনীতদা। হয়তো দেখা না-ও হতে পারে আর।

তবু আমার মন বলেছিলো, দেখা হবে, আবার দেখা হবে অরুণিমার সঙ্গে। খালারির লাইম হিল-এ সেদিনও খবরদারি-ঘণ্টি বেজে উঠবে, বরকাকানার লোক্যাল এসে দাঁড়াবে মহুয়ামিলন স্টেশনে। জান্‌কী ডাব্বাকে পাশ কাটিয়ে, রাধাকিষণের মন্দির পার হয়ে, সুরকির রাস্তা জুড়ে পড়ে-থাকা হলদে মহুয়া মাড়িয়ে, আমলকী পাতার ঝিকিমিকি ছায়ায়, পাগলা-মেম মেরী ওয়াট্‌সনের বাংলোর বাগানের মাঝ দিয়ে, কুণ্টিকড়ুয়া টিলা পাহাড়ী সড়ক ধরে টিংলিটুডাং ল্যাক ফরেস্টের ইজারাদার লালাবাবুর নতুন করে কলি-ফেরানো বাড়িতে এসে উঠবে অরুণিমা, আর অরুণিমার হাওয়াই শার্ট, কর্ডুরয়ের ট্রাউজার, ক্রেপ সোলের জুতো, চোখে মোটা-ফ্রেমের সানগ্লাস পরা ফাঁপালো চেহারার আয়েশী স্বামী।

তারপর একদিন অরুণিমার তিন বছরের ফুটফুটে ছোট্ট খোকাকে কোলে নিয়ে শান্ত বিকেলের ছায়া-থমথম তিতিরকান্নার মাঠ পার হয়ে চুনাক্কা নদীর জলসিঁড়ির ধারে এসে বসবো আমরা, আমি আর অরুণিমা।

পাশাপাশি চুপ করে বসে থাকবো দুজনে। অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা বলবো না

আমরা।

কিন্তু সে অসহ্য নীরবতা ভাঙবার জন্যে আমাকে একসময় বলতেই হবে, এমন কেন হলো অরুণিমা?

—থাক সুনীতদা ওসব কথা। অরুণিমা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলবে।

থাক বললেই কি রাখা যায়? আমি বলবো, তোমাকে সুখী দেখতে চেয়েছিলাম অরুণিমা।

খিলখিল করে হেসে উঠবে ও, বলবে, আমি অসুখী এমন ধারণা কেন তোমার? বরং অসুখী হওয়ার হাত থেকে বেঁচে গেছি আমি।

চমকে চোখ ফেরাবো ওর দিকে, ভাববো, অরুণিমার এ হাসি কি সত্যি—না কাপট্যের প্রলেপ।

—অসীমেন্দুর অনুরোধে নয়, তোমাকে সুখী দেখবার জন্যেই বড়সাহেবকে বলে ওর চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। আর অসীমও চাকরি নিয়েছিলো নিজের সুখের জন্যে নয়, তোমাকে সুখী করবার জন্যে অরুণিমা। তুমি জানো না, ও তোমাকে কত ভালোবাসতো!

—জানি। ঠোঁট কাঁপিয়ে হাসবে অরুণিমা।

—তুমি হাসছো অরুণিমা, কিন্তু—অদূরের লাইম হিলটার দিকে আঙুল দেখিয়ে আমি বলবো, ঐ পাহাড়টার দিকে যতবার তাকাই ততবারই অসীমেন্দুর জন্যে দুঃখ হয় আমার।

চমকে চোখ তুলে পাহাড়টার দিকে তাকাবে অরুণিমা, আর আমি ওর চোখের কোণে সহজ সহানুভূতি খুঁজবো।

বলবো, তোমার কি ধারণা ও অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে?

—অ্যাকসিডেন্ট নয়? বিস্ময়ের কণ্ঠে ও প্রশ্ন করবে।—তুমি তো বলেছিলে অ্যাকসিডেন্ট। অ্যাকসিডেন্ট নয়?

—না অরুণিমা। ফ্যাক্টরীর খাতায় আর পুলিস রেকর্ডে যাই লেখা থাক, আমি জানি অসীমেন্দু অ্যাকসিডেন্টে মারা যায়নি।

—তবে? এবার যেন অরুণিমার চোখের কোণ চকচক করে উঠবে শেষ-বিকেলের রক্তিম আলোয়।

যে কথা কোনো দিন কাউকে জানাবো না ভেবেছিলাম, যে কথা অরুণিমার কানে কোনো দিন পেঁছিতে দেবো না প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, সে গোপন রহস্যের চাবি খুলে দিতে বাধ্য হবো আমি।

বলবো, চাকরিতে যোগ দিয়েই কত স্বপ্ন যে ও দেখতে শুরু করেছিলো, প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমরা দুজনে মিলে ওর বাসা সাজাতাম। তোমার পছন্দমতো আসবাব তৈরি করিয়ে ঘর সাজাতো ও, বিছানার চাদর, জানলার পর্দা সব-কিছুর রঙ বাছতো তোমার পছন্দমতো। সামনের বাগানে ফুলের চারা বসিয়েছিলো, যে ফুল তুমি খোঁপায় পরতে ভালোবাসতে।

আমার প্রত্যেকটি কথা ও শুনবে সজাগ কান পেতে, অথচ চেয়ে থাকবে অন্য দিকে অন্যমনস্কতার ভান করে। তারপর একসময় আমার চোখকে ফাঁকি দিয়ে আঁচলে মুখ মুছবে। কিন্তু মুখ তো নয়, চোখের ওপরই সে আঁচল থমকে দাঁড়াবে অনেকক্ষণ।

ওকে মন হালকা করার একটু সময় দিয়ে আমি বলবো, তারপর চিঠিতে জানিয়েছিলো ও তোমাকে, লিখেছিলোঃ কবে আসছো, ফুলের চারায় জল দেবার ভার কবে থেকে তোমার ওপর পড়বে। লিখেছিলোঃ সুনীতকে তুমি ভুল বুঝেছিলে অরুণি, সুনীতই আমাদের নতুন জীবনের প্রথম ঘর বেঁধে দিলো।

এ কথায় চোখ তুলবে না, দু হাঁটুর ফাঁকে মুখ লুকোবে।

আমি বলবো, তারপর হঠাৎ একদিন ও চলে গেল, তোমাকে নিয়ে আসবার জন্যে। বলে গেল, সানাই বাজাবার ব্যবস্থা করে রাখ। মা ওর হাতে টাকা দিয়ে বললেন, বেনারসী শাড়ি কিনে বউমাকে পরিয়ে নিয়ে এসো অসীম, তোমার মা যেমন করে বরণ করে ঘরে তুলতো তাকে, আমিও তাকে তেমনি করেই ঘরে আনবো।

আমার কথা অসহ্য হবে অরুণিমার, কান্নায় হঠাৎ ভেঙে পড়বে ও, বলবে, থাক সুনীতদা, ওসব কথা আমি শুনতে চাই না।

—কিন্তু আমি যে শোনাতে চাই। আমি বলবো। জিজ্ঞেস করবো, সাত দিন পরে

স্বামী? শব্দটা মনে পড়লেও বিদ্রূপে বেঁকে যায় ওর ঠোঁটের হাসি। তবু সেই অসুর-প্রেমের অযাচিত সন্তানকে মাতৃত্বের স্বীকৃতি দিয়েছিলো, স্নেহে প্রীতিতে।

বাইরের পৃথিবীতে কোথায় কি ঘটছে খবরই রাখতো না অরুন্ধতী। কোনো খবরই এসে পেঁছতো না ওর কাছে। পাতালপুরীর বন্দিনী দুঃখকন্যার মতো সব আশা-ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়ে মনকে শক্ত করবার চেষ্টা করছিলো শুধু। নিজের বলে মনে হয় না এমন এক ছোট্ট ঘরের অন্ধকার কোণে মুখ লুকিয়ে, মন লুকিয়ে।

তারপর হঠাৎ একদিন দারোগা-পুলিস এলো, এক রাজ্যের অন্তরীণ যেন অন্য রাজ্যের খাঁচার কপাট খোলা পেলো। ফিরে এলো অরুন্ধতী, কিন্তু সেই পুরোনো দিনের সুখ-সংসারে নয়। তবু মুহূর্ত কয়েকের জন্যে, রিক্ত বালিয়াড়ির গায়ে কয়েক টুকরো খুশির অভ্র চিকচিক করে উঠলো। না-বোঝা প্রশ্ন চাপা পড়ে রইলো ভাই-বোনের মনে, ফিরে পাওয়ার আনন্দেই ওকে জড়িয়ে ধরলে তারা। মা-র মুখ উজ্জ্বল হলো না সত্যি, কিন্তু বোঝা গেল, অনেক ঝড়-সওয়া ওই পাথুরে মুখ আসলে মিথ্যার মুখোশে ঢাকা। এত বছর বাদে মেয়েকে ফিরে পেয়ে খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে চাইছেন তিনি, কিন্তু অরুন্ধতীর কোলের ছোট্ট এক টুকরো ওই শিশু মা-মেয়ের মাঝখানে মস্ত বড় একটা দেয়াল তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

শুধু কি মা?

পাড়াপড়শীদের কানেও খবর রটতে দেরি হলো না। তবু মজা দেখবার জন্যেই হয়তো, এমন ভাব দেখালে তারা যেন কিছুই জানে না। এমন কপট হৃদ্যতার ভাষায় কথা বললে, যেন অরুণির মা নতুন আসেননি এ-পাড়ায়, নতুন পরিচয় নয় তাদের সঙ্গে।—শ্বশুরবাড়ি থেকে মেয়ে এসেছে বুঝি? সরলতম চোখে প্রশ্ন করলো হয়তো কেউ।

এ প্রশ্নের আর কি-ই বা জবাব দেওয়া যায়। চুপ করে রইলেন অরুন্ধতীর মা। মাথা হেঁট করলেন ম্লান মুখের অস্বস্তি ঢাকবার জন্যে। শেষে অনেক চেষ্টায়, চোখের জল চেপে শুধু বললেন, দাঙ্গায় হারিয়ে গিয়েছিলো।

—ও মা, তাই নাকি? সমবেদনায় সহানুভূতিতে চট করে সবাই চোখ সজল করে তুললো।—কি রক্তখেকো দাঙ্গাই যে লেগেছিলো দিদি! চোখে কাপড়ের পাড় ঘষলো তারা।

কে-একজন বললে, যাক, ভালোয় ভালোয় যে ফিরে পেয়েছেন দিদি, এই খুব।

বিদ্রূপটা বুঝতে পারলেন অরুন্ধতীর মা, কোনো উত্তর দিতে পারলেন না।

অরুন্ধতীও শুনছিলো কপাটের আড়াল থেকে। আর লজ্জায় গ্লানিতে মাটিতে মিশে যেতে চাইছিলো ও! গ্লানি নিজের জন্যে নয়, ও কি করবে, অন্য কোনো পথ ছিলো নাকি ওর সামনে। কিন্তু ওর জন্যে মা মুখ তুলতে পারবে না, এ কথা তো কই কোনো দিন মনে হয়নি।

মনে হয়নি? ভাবেনি কোনো দিন? তা হলে সেদিন দারোগা-পুলিসের পায়ে কেঁদে লুটিয়ে পড়েছিলো কেন? কেন বলেছিলো, ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন না আমাকে, আমি বেশ আছি, সুখে আছি।

এতগুলো অনুনয়ের পিছনে তো একটাই কথা ছিলো, একটাই ভয়। ফিরে গেলেও কি আবার সব ফিরে পাবো? বাবা, মা, ভাই, বোন—সকলেই কি ফিরে নেবে আমাকে?

মনে মনে ঘৃণা আর আক্রোশ পুষে যাকে স্বামিত্বে বরণ করতে বাধ্য হয়েছিলো অরুন্ধতী, তিন বছরের অভ্যস্ত আসঙ্গে সে নিশ্চয়ই এমন কোনো মায়ার শিকড় গাড়েনি তার জীবনে। হ্যাঁ, শুধু একজনকেই সে নিখাদ প্রীতিতে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলো, তার নিজেরই রক্তশিশুকে।

এমন যে হবে তা জানতো অরুন্ধতী। বুকের মমতা যেদিন এই অবাঞ্ছিত সন্তানের সঙ্গে স্নেহ-প্রীতির বন্ধন ছিঁড়ে ফেলতে রাজী হয়নি, সব হারানোর জীবনে এই সামান্য পাওয়ার উজ্জ্বল রামধনুটুকু যেদিন মুছে ফেলতে চায়নি ও, সেদিন থেকেই তা জানে অরুন্ধতী। কিন্তু, মা-র কুণ্ঠিত কণ্ঠস্বর কানে যেতেই যেন সমস্ত শরীর ওর ক্রোধে আক্রোশে জ্বলে উঠলো।

—যাক, ভালোয় ভালোয় যে ফিরে পেয়েছেন দিদি, এই খুব। পড়শী প্রৌঢ়ার এই কথাটাই যেন জ্বালা ধরিয়ে দিলো ওর চোখে।

ছেলেকে কোলে নিয়ে কপাটের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো অরুন্ধতী। দৃঢ় ক্রোধের গলায় বললে, ভালোয় ভালোয় যে আসিনি তার সাক্ষীও এনেছি।

ওমা, তেজ কেন মেয়ের এত, ভাবলে সবাই। পাঁচ বছর ধরে জাতজন্ম খুইয়ে কোলে একটা ছেলে নিয়ে ফিরতে হলো যাকে, কোথায় সব সময় মুখ লুকিয়ে থাকবে, চোখাচোখি হলে মাথা হেঁট করবে, তা নয়—স্পষ্টাস্পষ্টি জবাব! তবু সান্ত্বনা দেবার ভান করে কেউ কেউ বললে, তোমার তো দোষ নয় মা, তুমি কি করবে।

আড়ালে অবশ্য ঠোঁট টিপে ইশারায় হাসাহাসি করলে ওরা। অর্থাৎ, এখন তো বলছে দাঙ্গায় হারিয়ে গিয়েছিলো, দাঙ্গায় না কিসে ভগবান জানেন।

অরুন্ধতীর আর কি করবার আছে, বিছানায় লুটিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদা ছাড়া আর কি উপায় আছে ওর।

দু চোখ ভিজিয়ে অরুণি শুধু কাঁদলো আর কাঁদলো। কোন্ ফাঁকে যে মা এসে তার পাশে বসেছেন, ব্যথায় কাঁপা হাত রেখেছেন ওর মাথায়, ধীরে ধীরে ওর চুলে পিঠে সান্ত্বনার সমবেদনার হাত বুলিয়ে দিতে শুরু করেছেন, তা ও টেরও পায়নি।

—ওঠ্ মা, ওঠ্, কাঁদিস না আর। বলতে গিয়ে গলা কেঁপে গেছে তাঁর, গলা ভারি হয়ে এসেছে। বলেছেন, লোকে কি ভাবলো না-ভাবলো তাতে কি আসে যায় অরু?

ধড়মড় করে উঠে বসেছে অরুন্ধতী। অশ্রুভেজা দু চোখের স্পষ্ট দৃষ্টি ফেলেছে মা-র মুখের ওপর।

বলেছে, তবে তুমি কেন লজ্জা পাও, তুমি কেন সত্যি কথা বলতে ভয় পাও?

—সাধে কি ভয় পাই মা? দু চোখ বেয়ে গড়িয়ে-পড়া জল মুছতে মুছতে মা বললেন, দাঙ্গায় তোকে, তোর বাবাকে, দুজনকেই তো হারিয়েছিলাম মা। তোকে যে ফিরে পাবো ভাবিনি কোনো দিন, ফিরে পাবার জন্যে যে কত মানত করেছিলাম!

অরুন্ধতীর গলার স্বরে অভিমান ফুটে উঠলো। বললে, ভুল করেছিলে। সেইজন্যেই হয়তো বিষ খেয়ে মরতে সাহস পাইনি। মরলে সব জ্বালা চুকে যেতো।

—তোর বাবা যদি বেঁচে থাকতেন! দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মা ; বললেন, উনি থাকলে এত ভয় পেতাম না অরু। কিন্তু একা, এই পাড়াপড়শীদের মাঝে সাহস পাই না একেবারে।

—তা হলে কি করতে হবে আমাকে বলে দাও। কান্নায় ভেঙে পড়লো অরুন্ধতী।

স্পষ্ট করেই বলতে পারলেন অরুন্ধতীর মা।

বললেন, এক কাজ করলে হয় অরু। ছেলেটাকে অনাথ আশ্রমে রেখেও তো আমরা দেখাশোনা করতে পারি।

চমকে চোখ তুললে অরুণি।—কি বলছো মা? তার চেয়ে বলো না এক আছাড় মেরে শেষ করে দিই ওকে, তোমরা শান্তিতে থাকতে পাবে।

কোনো কথা বললেন না মা। আশ্চর্য! অরু তো এমন ছিলো না, এত অবাধ্য হলো ও কি করে? মতে মিলুক না-মিলুক, এটুকুও কি বোঝে না যে, ওর ভালোর জন্যেই তাঁর এত দুশ্চিন্তা? এত চোখ-ঝাঁজানো কথা তাঁকে বলে কি করে অরু? ভুলে যায় কেন যে, যত কিছুই ঘটে থাকুক অরুন্ধতী ওঁরই মেয়ে।

কিন্তু সে-কথা অরুণি বুঝবে কি করে।

কত কান্নাকাটি, কত অনুনয়-বিনয় করে ওর বাপের কাছ থেকে ছেলেটাকে ভিক্ষে চেয়ে এনেছে অরুন্ধতী, তা কি অরুর মা বুঝতে পারছেন? শুনলে হয়তো স্তম্ভিত হয়ে যাবেন, ভাববেন মেয়েটার বুঝি বা মাথার ঠিক ছিলো না।

না, সে-কথা বলে লাভ নেই। অরুন্ধতী শুধু বললে, না মা, তা হয় না।

তবে? এমনিভাবে পাড়াপড়শীর ফিসফিসানি, আড়ালে আড়ালে হাসি-বিদ্রূপ ছড়ানো দেখেও সব সহ্য করে যেতে হবে? তিনি না-হয় চোখ বুজে থাকবেন, কিন্তু অরু কি সে-সব দেখতে পায় না, দেখেও কি মাথা উঁচু করে চলতে পারবে? ভেতরে ভেতরে শুধু শুকিয়ে যাবে দিন-কে-দিন। আর সবচেয়ে বড় কথা, বিজু আর কলি বড় হচ্ছে, ওদের মনও কি এ গ্লানির স্পর্শ পাবে না?

বললেন, তবে অন্য পাড়ায় উঠে যাই মা চল্।

—সব পাড়াই তো সমান। অরুন্ধতী হাসলে।—গায়ে ঘা দেখলে কোন পাড়ায় না মাছি বসে মা।

—সাধ-আহ্লাদ তো তোর শেষ হয়ে গেছে। থেমে থেমে—বেশ বোঝা গেল, ভয়ে ভয়ে—কথা শেষ করলেন মা।—না-হয় একটা থান কাপড়ই পরবি অরু।

অরুণি হেসে উঠলো খিলখিল করে। কত দুঃখে যে মানুষ এমন পাগলের মতো হাসতে পারে, মা বুঝলেন। আশ্চর্য। সধবাই হলো না যে কোনো দিন, তাকে বিধবা হতে বললেন! কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন—জানি না মা, যা ভালো বুঝিস কর।

ভালো বোঝবার আর কি আছে। ভালোর পথ কি আর প্রশস্ত আছে কোথাও? শীর্ণ সড়ক ধরে আঁকাবাঁকা গলিতে আনাগোনা ছাড়া উপায় কই!

তাই মাকেই একদিন বলতে হলো, যে ক'টা টাকা ছিলো, আর আমার খানকয়েক গয়না, যা দিদির কাছে গচ্ছিত ছিলো, তা তো সব শেষ হয়ে এলো অরু। গায়ের গয়নাগুলো ছিলো বলে তবু বিজু আর কলিকে বাঁচাতে পেরেছিলাম। কি করা যায় বল তো?

—কি আর করবে। চাকরির চেষ্টা করি একটা—উত্তর দিলে অরুন্ধতী।

সুতরাং চাকরির চেষ্টাতেই ঘোরাফেরা শুরু হলো অরুন্ধতীর। খবরের কাগজ দেখে চিঠির পর চিঠি লেখা, আর নয়তো বেশ স্পষ্ট পোশাকে মুখে হাসির ঝিলিক ছড়িয়ে বিনয়ের অবতার সব কাঁচা বয়সের ছোটসাহেবদের সঙ্গে দেখা করা।

এমনি কোনো-এক আপিসের সিঁড়ি ভেঙে নামতে নামতে ব্যথায় বিরক্তিতে সমস্ত মন যখন ভরে আছে, পাশের লোকটার সঙ্গে একটা ধাক্কা লাগলেও যখন চোখ ফিরিয়ে দেখতে ইচ্ছে হয় না, এমনি একটা মুহূর্তে অভাবনীয়ভাবে সুবিমলের সঙ্গে ওর আবার দেখা হয়ে যাবে, কে জানতো!

এতদিন বাদে আবার দেখা হলো।

অরুন্ধতীর সারা মনের কোণে পাপড়ি-ফোটানো গুঞ্জন শোনা গেল।

—সুবিমলদা!

সিঁড়ি ভেঙে নামতে নামতে সুবিমলের ওপর চোখ পড়তেই অরুন্ধতী থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছিলো সুবিমল। ও আরো খানিকটা কাছে আসতেই নিঃসন্দেহ হলো অরুন্ধতী, সমস্ত মুখচোখ খুশির ফুলঝুরি জ্বালিয়ে বলে উঠলো, সুবিমলদা, তুমি!

চমকে চোখ তুলে অরুন্ধতীর দিকে তাকালে সুবিমল, কয়েকটা দ্রুত মুহূর্তের জন্যে বিমূঢ় দেখালো সুবিমলকে। তারপর ওর ম্লান বিষণ্ণ মুখ হঠাৎ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।—অরুণি? অরুন্ধতী?

আশেপাশে কে কোথায় আছে না-আছে, কে কি ভাবতে পারে, কিছুই মনে পড়লো না ওর। সুবিমলের একটা হাত চেপে ধরে বললে, ওঃ, কতদিন বাদে দেখা বলো তো সুবিমলদা। তোমার সঙ্গে আবার যে দেখা হবে, ভাবতেই পারিনি। কোথায় আছো? এখানেই তো? মাধু, মাধুরী কোথায়? মাসীমারা ভালো আছেন? বিয়ে করেছো? করোনি তো? মা তোমাকে দেখলে কি খুশী যে হবে!

অনর্গল অগুনতি কথার তোড়ে সুবিমলের উত্তরটুকুও বোধ হয় ভেসে গেল। হাত ধরে তাকে টানতে টানতে নীচে নেমে গেল অরুন্ধতী।

—তারপর? কি খবর বলো সুবিমলদা। চুপ করে আছো কেন? কে কোথায় আছেন কেমন আছেন? কি করছো? চাকরি?

কথার যেন আর শেষ নেই। কত প্রশ্ন, কত কথা। সব জানবার এবং জানাবার কথাগুলো যেন একসঙ্গে ভিড় করে আসে। কোন্‌টা আগে বলবে, কোন্‌টা পরে, কোন্‌ প্রশ্নের পরে কোন্‌ প্রশ্ন—সব-কিছু যেন নিয়ম ভুল করছে। এতদিন বাদে মা-ভাই-বোনদের ফিরে পেয়ে যত না আনন্দ হয়েছিলো, আজ হঠাৎ সুবিমলের দেখা পেয়ে যেন সত্যিই অরুন্ধতীর মনের পাতায় রোদ লাগলো, সবুজ রঙ ধরলো। আর এই উচ্ছলতার ঢেউয়ে নিজেকে সে

এত বেশী ভাসিয়ে ফেললে যে, বহুক্ষণ পরে তবে ওর হুঁশ হলো সুবিমল জবাব দিচ্ছে না ওর কথার।

—আরে, বেশ তো। কথা বলছো না যে! চোখের ভুরু কাঁপালে অরুণি।

টুকরো বিষণ্ণ হাসিতে ম্লান হলো সুবিমল।—কিন্তু আর বলবার কি আছে!

সুবিমলের মুখের দিকে তাকিয়ে আতঙ্কের ছায়া অনুভব করলে অরুন্ধতী।—কেন, কি হয়েছে সুবিমলদা? বলো না।

হাসলে সুবিমল।—কি আর হবে, কি হতেই বা বাকি আছে অরুণি!

অরুন্ধতী বুঝলো, কি যেন ব্যথার ছাপ সুবিমলের মুখে, কি যেন লুকোতে চাইছে সুবিমল। ওর মুখের অনর্গল প্রশ্নে আপনা থেকেই যতি পড়লো।

দুপুরের রোদ থেকে গা বাঁচিয়ে গির্জার ছায়ায় এসে দাঁড়ালো ওরা দুজনে। রাস্তার সশঙ্কিত হর্নের হাত থেকে রেহাই পেতে। শুধু কি তাই? না। দীর্ঘ এক যুগ পরে দুজনের আবার দেখা হলো। অভিশপ্ত আকস্মিকতার দেয়াল যে ঘনিষ্ঠতা, যে অন্তরঙ্গ পরিচয়ের যুগ্ম স্রোতে বাঁধ টেনেছিলো, সে বাধা এতদিন পরে অপসৃত হলো। ঠিকানাহারা দুটো সমান্তরাল ঢেউ নতুন করে পরস্পরকে খুঁজে পেয়ে স্তব্ধ হয়ে রইলো। কথার মতোই পথও খুঁজে পেলো না।

ওরা শুধু অনুভব করলে পরস্পরকে ওরা হারিয়েছিলো, পরস্পরকে আবার খুঁজে পেয়েছে। হ্যাঁ, অনেক কথা জমে আছে মনের কোণে, অনেক, অনেক কথার বরফ গুঁড়িয়ে দিতে না পারলে যেন শান্তি নেই। কত কি শোনবার শোনাবার আগ্রহ দুজনের। কোথায় যাবে, দাঁড়াবে, বসবে, ধীরে ধীরে একটি একটি করে চীনেবাদাম ছাড়ানোর মতো করে কথা বলবে। জানবার এবং জানাবার কথাগুলো যেন সোডার বোতল খোলার মতো একসঙ্গে উপচে আসতে চাইছে। তবু কেউ যেন কোনো কথাই খুঁজে পাচ্ছে না। কোথায় যাবে, দাঁড়াবে, বসবে, বলবে কথা, কথা!

নিতান্ত আজেবাজে অর্থহীন অপ্রাসঙ্গিক দু-এক টুকরো শব্দের সুর, দু-এক ঝলক হীরে-জ্বলা হাসি।

কিন্তু এমন তপ্ত রোদ্দুরে গির্জার পাশে এমন ব্যস্তত্রস্ত জনচাঞ্চল্যের মাঝে কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকা যায়।

অনেক কিছু আশা করেছিলো অরুন্ধতী। ভেবেছিলো, সেই আগের দিনের মতো সুবিমলই পথ বাতলে দেবে। কথার সুতো তুলে দেবে অরুণির হাতে। কিন্তু না, সুবিমলও যেন দিশেহারা।

শেষে অরুন্ধতীকেই বলতে হলো, চলো সুবিমলদা, আমাদের ওখানে। মা যে কি খুশী হবেন তোমাকে দেখে। সত্যি, কে কোথায় যে ছিটকে গেল...এত কষ্ট হয়। একটা চেনা লোকও দেখতে পাইনে।

বিষণ্ণ হাসি হাসলে সুবিমল। বললে, চেনা লোক হয়তো অনেকেই আছে অরুণি, কিন্তু সবাই লুকিয়ে থাকতে চায়।

মুখ তুলে তাকালে অরুন্ধতী, কথাটা বোঝবার চেষ্টা করলে।

বললে, মুখ লুকোবার আর কি আছে বলো। কিন্তু বলে ফেলেই বুকের ভিতরটা যেন কেঁপে উঠলো। ওকে উদ্দেশ্য করেই কি বলেছে নাকি সুবিমল? ওর কলঙ্কের কাহিনী কি সুবিমলেরও জানা?

সুবিমলের ভালোবাসাই ছিলো ওর অলঙ্কার। কলঙ্কের কালিতে সে প্রেম কি মলিন হয়ে গেছে? সব মন কি একই মানুষের?

ভয়ে কাঁপলো অরুন্ধতী। ওর জীবনের যে করুণ পরিচ্ছেদটা ও সদম্ভে আর পাঁচজনকে জানিয়ে মনের আক্রোশ মিটিয়েছিলো, আজ সুবিমলের কাছে তা প্রকাশ হয়ে যাবার আতঙ্কে রুদ্ধশ্বাস কেন অরুন্ধতী!

তবু সুবিমলকে নিয়ে এলো ও। বললে, কলি যে কত বড় হয়ে গেছে দেখবে চলো। বিজু আর মা যে কি খুশী হবে!

সুবিমল এলো ওর সঙ্গে দুপুরের রোদে ঘামতে ঘামতে, ঠিক সেই পুরোনো দিনের

মতো, যখন একরাশ বই বুকে চেপে কলেজ থেকে ফিরতো অরুণি, রোদ্দুরের তাপে ডালিমের ছোঁয়া লাগতো ওর গালে, কপালে ফুটতো স্বেদ-সিক্ত পোখরাজের মালা। অপেক্ষা করতো একটা নির্জন গলির মোড়ে, সুবিমল আসতো, হাসতো, কথা বলতো, প্রথমে ইশারায়, তারপর স্পষ্ট ভাষায়, হাঁটতো পাশাপাশি দুপুরের নির্জন রোদ্দুরের পথে। ওরা দুজনে পাশাপাশি হেঁটে এলো, ট্রাম ধরলো, ট্রাম থেকে নামলো, পিচ-গলা বড় রাস্তা ছেড়ে, ছোট্ট গলির বাঁকে, রোদে ঝলসানো গ্যাসপোস্টের নীচের ডাস্টবিনের চারপাশে ছড়ানো জঞ্জাল লাফিয়ে লাফিয়ে, এপাশের চারতলা বাড়ি আর ওপাশের পাঁচতলা, তারই ফাঁকে সরু গলির চেয়ে আরো সরু মেটে কাদার পথটুকু পার হয়ে, সবচেয়ে কোণের, উপেক্ষিত, নি-বাতাস নিরালা ঘরের কপাটের সামনে এসে দাঁড়ালো দুজনে, কড়া নাড়লো অরুন্ধতী, মা এসে দরজা খুলে দিলেন। হঠাৎ বুঝি খুশী হয়ে উঠলেন তিনি। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর মুখ ম্লান হলো।

স্যাঁতসেঁতে নীচের তলায় ছোট্ট অন্ধকার না-বাতাস না-আলো এক-জানলার ঘরে এসে বসলো সুবিমল। ভাবলে, এ-বাড়ির ছাদে যখন বিকেলে ম্লান হলুদের আলো নামে, এ-ঘরে তখন সন্ধ্যা। শহরে যখন সাইক্লোন, এ-ঘরে শুধুই শব্দ।

তবু। এ-ঘর অরুন্ধতীর ঘর।

মা-র দীর্ঘশ্বাস বললে, কোত্থেকে কোথায় এসেছি দেখে যাও। বললেন, তোমরা তো দেখেছো বাবা সেই বাড়ি বাগান, স্টেশনে নেমে ওঁর নাম বললে লোকে পেঁাছে দিয়ে যেতো। কোথায় এসে উঠতে হয়েছে দেখে যাও।

- সুবিমলের আকাশে তখন নতুন তারা ফুটছে। অরুণির চোখের তারায় ঘন গভীর আলো। কোত্থেকে কোথায় এসেছি দেখে যাও। সুবিমল ভাবলে, অনেক সমুদ্র পার হয়ে নতুন বন্দরে।

অন্ধকার ঘরের ছোট জানলাটার ধারে বসে, কাঁধের ওপর অরুণির ঠাণ্ডা নরম হাতের ছোঁয়ায়, সুবিমল জানলার বাইরে দৃষ্টি ফেললো। সে-চোখ পাশের বাড়ির দেয়ালে চাপা পড়েও অনেক অনেক দূর দিগন্তে পেঁাছে গেল!

অরুণির মন প্রশ্ন করলে, আমাদের সব স্বপ্ন কি মিথ্যে হয়ে গেছে সুবিমলদা?

সুবিমলের মনেও দ্বিধা।—যা হারিয়েছি তা ফিরবে না?

তারপর ওরা যখন পরস্পরকে একান্তে পেলো, সুবিমল অরুন্ধতীর মুখের দিকে মুগ্ধ কৌতুকের দৃষ্টিতে তাকালে, কাছে টানলে অরুন্ধতীকে, ওর হাতের সুপুষ্ট আঙুলগুলোর সঙ্গে অরুণির নরম আঙুলগুলি আঙুরের লতার মতো জড়িয়ে গেল।

ওরা দুজনেই যেন অনেকগুলো আড়াল দেওয়া ব্যর্থ বছরের পিছনে ফিরে এলো।

সুবিমল চোখ মেলে তাকালো অরুন্ধতীর দিকে, সমস্ত শরীর দিয়ে অনুভব করলে অরুণি। দুজনেই যেন বলতে চাইলো, আমাদের মন যখন বদলায়নি, পৃথিবী বদলে গেলেও ক্ষতি নেই।

কিন্তু মনকে কতটুকুই বা বিশ্বাস! ভয়ে কাঁপলে অরুন্ধতী। সব-কিছু জানার পরও কি সুবিমলের মুখে এমনি ভালোবাসার জ্যোৎস্না থাকবে?

মা এসে দাঁড়ালেন। কাঁচ ছেলের দুধে খাজনা বসিয়ে সুবিমলের জন্যে চা নিয়ে এলেন মা কাঁসার গ্লাসে করে। কথা শুরু করলেন সুবিমলের সঙ্গে।

কপাটের আড়ালে গিয়ে ইশারায় মাকে ডাকলে অরুন্ধতী। মা-র হাত দুটো চেপে ধরে ফিসফিস করে বললে, মা! বোলো না। আর কিছু বলতে পারলো না অরুণি।

—দূর বোকা মেয়ে! হেসে ফিরে এলেন তিনি সুবিমলের কাছে।

দেখলেন না, ঝরঝর করে চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো অরুন্ধতীর।

না, এ যেন নিজের কাছেই ছোট হয়ে যাওয়া। অরুন্ধতী ভাবলে, এভাবে সুবিমলের কাছ থেকে লুকিয়ে থাকা, সে আরো লজ্জা। তার চেয়ে মাকে বলবে, নিজে তো আর গুছিয়ে বলতে পারবে না, এবার যেদিন সুবিমলদা আসবে সব স্পষ্ট করে জানিয়ে দিও মা।

এমনি সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে সমস্ত দুপুরের শ্রমক্লান্তি মুছে ফেলবার জন্যে জেটি,

জাহাজ আর সারি সারি নৌকোর দিকে তাকিয়ে, গঙ্গার ঘোলা জলের ধারে ঠাণ্ডা নরম ছায়ায় সুবিমলের পাশাপাশি বসে, বিকেলের বিষণ্ণ রোদ্দুর-মাখা অনেকগুলো মুগ্ধ মুহূর্ত কাটিয়ে অসহন একাকিত্বের ব্যর্থ পথ মাড়িয়ে বাড়ি ফিরলো অরুন্ধতী।

ফিরে এলো।

কিন্তু মা-র মুখের দিকে তাকিয়ে সব কথা ভুলে গেল ও। একটা কপাটে ঠেস দিয়ে ভাবলেশহীন মুখে একটা খাম তুলে ধরলেন অরুন্ধতীর মা।

—কে খুললো চিঠি? আজকের ডাকে এসেছে? কার চিঠি বুঝতে না পেরে অরুন্ধতী প্রশ্ন করলো, কিন্তু উত্তর পাবার জন্যে অপেক্ষা করলো না। দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেল আঁকা-বাঁকা অক্ষরগুলোর ওপর। তারপর ধীরে ধীরে বেদনা-থম্‌থম্‌ মুখে বিছানার ওপর এসে বসলো অরুন্ধতী, চিঠিটা মুঠোর মধ্যে চেপে বালিশের ভিতরে মুখ গুঁজে দিলো।

সে চিঠি লিখেছে অরুন্ধতীকে। চিঠি নয় ; যেন অভিশাপ। আতঙ্কের রাহু যেন।

আশ্চর্য! অরুন্ধতীকে ফিরে চেয়েছে সে। লিখেছে, স্বেচ্ছায় অরুন্ধতী আবার ফিরে আসুক তার কাছে। ফিরে এলে কেউ বাধা দেবে না, এবার আর ছিনিয়ে নিয়ে যাবে না কোনো দারোগা-পুলিস।

অদ্ভুত! যেন অরুণি ওই ঘৃণিত দস্যুর বুকে নিজেকে সমর্পণ করবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। যেন, অরুণির ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাকে কেড়ে আনা হয়েছে।

আশ্চর্য! অরুন্ধতীকে চিঠি লিখেছে সে।

লিখেছে, অরুন্ধতী যদি ফিরতে না চায়, যদি তাদের প্রেম-প্রীতি বর্ষা-রাতের ফানুসের মতো চুপসে গিয়ে থাকে, তা হলে—তা হলে অন্তত তার সন্তানকে যেন অরুন্ধতী ফিরিয়ে দেয়। আপন শিশুর মুখের দিকে তাকিয়ে অরুন্ধতীকে ভুলে থাকবে সে।

আর অরুন্ধতী যদি ফিরে না আসতে চায়, তার সন্তানকে যদি ফিরে না দেয়, তা হলে অন্তত একটি দিনের জন্যে, তার নিজেরই শিশুসন্তানকে যেন দেখতে দেয় অরুন্ধতী। কান্নার অনুনয়ে প্রার্থনা জানিয়েছে সে।

ধীরে ধীরে বিছানা থেকে উঠলো অরুণি, হাতের চিঠিটা ছিঁড়ে কুচিকুচি করে ফেলে দিলো। একটা কুটিল আর হিংস্র হাসির রেশ ফুটে উঠলো ওর ঠোঁট ছুঁয়ে ছুঁয়ে।

সুবিমল আবার এলো আমন্ত্রণ জানাতে। অরুন্ধতী শুনলো, খুশিতে হাসলো, সায় দিলো, বেশবাস প্রসাধন কিছুটা, ছিমছাম শরীরে সুখীয়াল শিহরন, হীরে-জ্বলা হাসি, লজ্জা আর আনন্দে মেশা মুখ, ঠিক সেই পুরোনো দিনের মতোই, হালকা পায়ে বেরিয়ে এলো অরুন্ধতী সুবিমলের সঙ্গে। তারপর, অনেক স্মৃতির মতো একটানা অনেকটা ট্রামের পথ পার হয়ে, শহর-উত্তরের জরাজীর্ণ নির্জনতার ক্লান্ত বিষণ্ণ দারিদ্র্যের ঘরে এসে পৌঁছলো ওরা।

বুকে বাতাস পেলো অরুন্ধতী। চোখে রঙীন রামধনু।

টিনের ছাদ। বাঁশের চিক্‌ দিয়ে বানানো বেড়া। একটু দূরেই মোটর আর যন্ত্রপাতি মেরামতের একটা ক্ষুদে কারখানা। কুলি মিস্ত্রী ধরনের দু-চারজন এখানে-সেখানে। অনেক দূরে চটকলের বাঁশি। লাল ধুলোর রাস্তা। ধুলো ওড়ায় দু-একখানা লরী, শব্দ ছড়ায়। তবু, এই মাটি বাতাস অরুন্ধতীর যেন কত আপন মনে হলো।

—অরুন্ধতী, শোনো। বাঁশের ফটক ঠেলতে ঠেলতে অরুণির মুখের দিকে তাকালো সুবিমল। সুবিমলের চোখ যেন বললো ফিসফিস করে, শোনো অরুণি, শোনো।

অরুন্ধতী তাকালো চোখ তুলে।—বলবে কিছু?

—একটা কথা তোমায় বলতে পারিনি অরুণি।

অরুণির সপ্রশ্ন ভুরুর রেখায় বিস্ময় ফুটে উঠলো।

সুবিমল ঠাণ্ডা ধীর স্বরে বললে, মাধু, মাধুরী নেই অরুণি।

—নেই?

—আছে। কিন্তু, কিন্তু না থাকলেই হয়তো ভালো ছিলো।

মাধু, মাধুরী নেই? জীবনের সেই এক ফোঁটা বয়স থেকে যাকে গভীরতম বন্ধু বলে চিনেছে, সেই অনেক আগ্রহের বন্ধু মাধুরী নেই? রাস্তার বুকে ঘর কেটে দু বন্ধুতে খেলা,

আর অরুন্ধতীর মনে হলো, নীতিবাগীশ কোনো গ্রাম্য টুলো পণ্ডিতের কথা শুনছে সে! বয়সে, পোশাক-পরিচ্ছদে, শিক্ষায়—যত পৃথকই হোক, সব মানুষের বুঝি বা একই মন।

না। তার চেয়ে এমনি অসহ্য আত্মদাহই জীবনের সম্বল হয়ে থাক। সুবিমলের কাছে আর ফিরে যাবে না অরুন্ধতী, ফিরে যেতে পারবে না।

কত কত দিন আর রাত নিঘুম চিন্তার জালে, অশান্ত জ্বালায় কাটিয়ে দিলো অরুন্ধতী। আর তারই ফাঁকে মাঝে মাঝে বুকে এসে বিঁধেছে এক নতুন কাঁটা। বিষাক্ত জ্বালায় জ্বলেছে পুড়েছে অরুন্ধতী, অনুপায় আক্রোশে।

তার চিঠি!

অনুনয় উপরোধের চিঠি। ও শুধু ঘৃণা আর ব্যর্থ ক্রোধ পুষে রেখেছে যার বিরুদ্ধে, যে ওর জীবনের চোখে টেনে দিয়েছে কলঙ্কের কাজল, তার চিঠি। তার প্রার্থনা। কাঁটার মতো এসে বিঁধেছে অরুন্ধতীর বুকে।

অরুন্ধতী ফিরে এসো। ফিরে দাও আমার শিশুকে। অন্তত একটিবারের জন্যে তাকে দেখতে দাও অরুন্ধতী।

অনুনয়! শুধু আক্রোশ আর বিদ্রূপ জমা হয়ে আছে অরুন্ধতীর মনে।

এর চেয়ে কত আন্তরিক উপরোধ ঢেলে দিয়েছিলো অরুন্ধতী সেই নৃশংসতার পায়ে। কত কান্নার সজল চোখ মেলে মন ভেজাতে চেয়েছিলো ও, পাশবিকতার পা জড়িয়ে ধরে ভেবেছিলো সে পায়ের শিরা-উপশিরায় বুঝি বা মানবতার রক্ত আছে।

অরুন্ধতীর ব্যর্থ অশ্রুর স্পর্শে সহানুভূতির পাষাণ একটুও নরম হয়নি সেদিন।

সেইসব দিনের কথা মনে পড়লে আতঙ্কে হিম হয়ে যায় সারা শরীর। দিনের পর দিন অত্যাচার, আঘাত, অপমান। অরুন্ধতীর সমস্ত জীবন ব্যর্থ হয়ে গেছে, সম্মান-সম্ভ্রমের দেয়ালে ফাটল ধরিয়েছে সে, মুখ তুলে কথা বলার সব স্বাধিকার কেড়ে নিয়েছে। তারপরও জানিয়েছে সে অনুনয়ের প্রার্থনা একটার পর একটা।

তারই চিঠি!

মনে মনে আবার হাসলো অরুন্ধতী, হাত বাড়িয়ে নিলো চিঠিটা, কি যেন ভাবলো, পড়লো। সেই একই চিঠি নয়, একই প্রার্থনা নয়।

চিঠি নয়। জানিয়েছে আসবে সে, রাত্রির অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে সে আসবে। একটি মাত্র অনুরোধের হাত বাড়িয়ে সে আসবে। নিজের জন্য এই গোপনতা নয়। অরুন্ধতীর সম্মান আহত হবে এই ভয়ে রাত্রির অন্ধকারে আসবে সে।

অরুন্ধতীকে ফিরে চায় না সে। জানে, অরুন্ধতীকে ফিরে পাবে না।

তার আপন সন্তানকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায় না সে। জানে, ফিরে পাবে না তাকে অরুন্ধতীর কাছ থেকে।

শুধু একটিবারের জন্য, একটি মুহূর্তের জন্য গলির মোড়ের গ্যাসপোস্টের তলায় এসে দাঁড়াবে সে, অপেক্ষা করবে। শুধু একবার দৃষ্টির দু-বাহু জড়িয়ে ধরবে তার আপন শিশুসন্তানকে।

আর কিছু নয়, আর কোনো উপরোধ প্রার্থনা নয়।

তবু উপহাসে কৌতুকে বিষাক্ত হাসি ফুটলো অরুন্ধতীর মুখে।

না, তাকে ক্ষমা করতে পারবে না অরুন্ধতী। সুবিমলকেও নয়।

একজন শুধুই ঘৃণা পেয়েছে অরুন্ধতীর, আরেকজন অরুন্ধতীকেই ঘৃণা করে।

সব ইতিহাস জানা হলে অরুন্ধতীকে দূরে সরিয়ে দেবে সুবিমল। ভালোবাসার, শ্রদ্ধার, সম্মানের আসন ফিরে পাবে না ও।

তবু ও শুধুই পথ খুঁজলো। চিন্তার জালে চোখ হারালো। চঞ্চলতায় মন।

তারপর সেই নির্দিষ্ট দিনের সূর্য আকাশে উঠলো, দিগন্তে ডুবলো, আর অশ্রুতে ভাসলো অরুণির মন। কি আশ্চর্য! সমস্ত দিন, সমস্ত সন্ধ্যা অরুণি শুধু ভাবলো আর ভাবলো।

এতদিনের ব্যর্থ আক্রোশ মেটাবার দিন এসেছে। জীবনের চরম শত্রুকে হাতের মুঠোয় পেয়েছে অরুণি।

প্রতিশোধ নেবার তীব্র অধীরতায় রক্ত অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে যেন। যে শুধু ঘৃণাই পেয়েছে আর যে শুধু ঘৃণাই দিয়েছে অরুন্ধতীকে, আজ এই চরম মুহূর্তে তাদের দুজনকেই যেন হিংস্র আনন্দে ছিঁড়ে ফেলতে চায় ও।

জাফরানী দিন বিকেলে নামলো, লাল বিকেল শিশুসন্ধ্যায়। না-বাতাস না-আলো এক-জানালার নিরালা ঘরের কোণে অন্ধকার গাঢ় হলো, পথ নির্জন। শহরের রাস্তায় ইলেক-ট্রিকের আলোয় আরো আঁধার ঘন হলো, ঘন ধোঁয়া, ধোঁয়া নীল বাঁকা গলির বাঁকে। তারপর লোক এলো, মই কাঁধে। বাতিজ্বালা লোক।

আলো নয়। ছায়া দিলো গ্যাসবাতি। রহস্যের, আতঙ্কের।

রাত্রি বাড়লো। নির্জনতম পথ।

একটি একটি করে চারপাশের জানালার আলো নিবলো, শব্দ থামলো, ঘুম নামলো চাঁদ-ঢাকা পাঁচতলা বাড়ির কার্নিসে কার্নিসে।

দশটা বাজার ঘণ্টা ভেসে এলো দূরের ট্রাম ডিপো থেকে। অধৈর্য হয়ে উঠলো অরুন্ধতী। অপেক্ষার সীমান্তে এসে পেঁছিলো ও এতক্ষণে। সমস্ত বাড়ির ঘুম-নিঝুম মেঝের ওপর পা টিপে টিপে সন্ত্রস্ত চোখে চতুর্দিকে তাকালো অরুন্ধতী। তারপর ঘন গভীর কালো শাড়ির আড়ালে সমস্ত শরীর ঢেকে ফেললো ও, আর কালো ঘোমটার আড়ালে গ্যাসের ফিকে জ্যোৎস্নায় অরুন্ধতীর সুন্দর মুখ আরো সুন্দর দেখালো। আরো বিষণ্ণ করুণ। তবু ওই তীরতীক্ষ্ন চোখের কোণে কোথায় যেন বিষনিশ্বাস।

আপন শিশুকে কোলের কাপড়ের আড়ালে নিয়ে পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলো অরুন্ধতী। মেটে কাদায় অন্ধকার শীর্ণতম পথটুকু পার হয়ে গলির মোড়ে গ্যাসপোস্টের দিকে পা বাড়ালো অরুণি।

দূরের দৃষ্টিতেও তাকে চিনতে পারলো অরুন্ধতী। দেখলো অধৈর্য হয়ে পায়চারি করছে সে। আশায়, হতাশায়।

অরুন্ধতীর কালো ঘোমটার তন্বী শরীরে কি চিহ্ন ছিলো কে জানে, মুহূর্তে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো তার মুখ, এগিয়ে এলো সে।

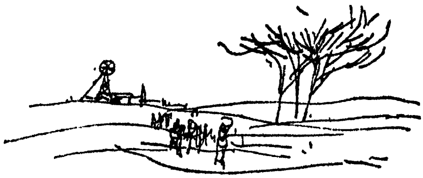
—চলো। স্পষ্ট গলায় বললে অরুন্ধতী, আর বিস্ময়ে হতবাক হয়ে চোখ তুললো সে। কি বলছে অরুন্ধতী? সে শুধু একটি মুহূর্তের দর্শন চায়, তার আপন সন্তানের। আর কিছু নয়।

—চলো। আবার বললে অরুন্ধতী।

—ফিরে যাবে? ফিরে যাবে অরুন্ধতী? অবিশ্বাসের ম্লান মুখ হঠাৎ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ধীরে ধীরে বললে, জানতাম। জানতাম অরুন্ধতী, তুমি ফিরে আসবে।

ফিরে আসবে! বিদ্রূপের হাসি দুললো অরুন্ধতীর চোখে। সে তো ফিরে যেতে চায়নি, সমস্ত পৃথিবীই যে ফিরে চলেছে। পিছনের পথে তাকে, সব মানুষকে ফিরে যেতে বাধ্য করেছে।

[১৩৫৮



দরবারী

বরকাকানার জংশন-স্টেশন তখন সদ্য সদ্য ত্রিবেণী হয়েছে। একটা লাইন গেছে ডাল্টনগঞ্জ ডেরি-অন্-শোনের দিকে, আরেক দিকের রেলপথ ছোটামুরী টাটা হাওড়া। ইস্ট ইন্ডিয়ান আর বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের জয়েণ্ট-স্টেশন বরকাকানা থেকে তিন নম্বর বেণী ঝুললো রায় লাপরা মহুয়ামিলনের দিকে। অন্য দুটোর ওপর কমবেশী দিল্লীর চোখ ছিলো, নতুনটার খাস মালিকানাই নয়, পুরোদস্তুর ম্যানেজমেণ্টও কোম্পানীর। এ আই আর সি এ-র নির্দেশনিয়ম মানছে কি না-মানছে তা দেখবার লোকও ছিলো না।

তাই লাপরার স্টেশন মাস্টার রজনীবাবুর অনুযোগের শেষ ছিলো না, মনে মনে গজরাতেন শুধু, শোনাবার লোক পেলে বলতেন, এমন স্টেশনই ভাগ্যে জুটলো যে দিনরাত কেবল সবুজ বাতিই দেখাতে হয় ট্রেনগুলোকে, সিগন্যাল নেমেই আছে। থামার মধ্যে একটা আপ আর একখানা ডাউন সারা দিনে। রেলকে সবুজ বাতি দেখাই আমি, আর শালার রেল আমার ভবিষ্যতের দিকে তাকায় না, লালবাতি টাঙিয়ে সিগন্যাল তুলেই আছে। ট্রান্সফার বা প্রমোশনের লাইন-ক্লিয়ারটি দেবার নাম নেই।

যারা শুনতো তারা শুধু হেসেই খালাস। বড় জোর দু-একটা সান্ত্বনা জানিয়ে সবুজ ফ্ল্যাগ নাড়তে নাড়তে হুইস্‌ল্ বাজিয়ে ল্যাজের কামরায় লাফিয়ে ওঠা। গার্ড, ব্লকের এল-বি-এস, আর নয়তো আর-এম-এসের সর্টার—এ ছাড়া জনমনিষ্যি ছিলো না কাছে-পিঠে, যার সঙ্গে রয়ে-বসে দু-চারটে সুখদুঃখের কথা বলতে পারেন রজনীবাবু। রয়ে-বসে কথা অবশ্য ওদের সঙ্গেও চলতো না, নেহাত কোনো দিন ট্রেন লেটে না এলে! কিংবা সামনে মালগাড়ি না পড়ে গেলে।

লাপরায় তখন দিনে দু-চারটে যাত্রী নামতো, দু-চারটে প্যাসেঞ্জার টিকিট কাটতো। তাও থার্ড ক্লাসের। স্টেশন থেকে দেড় মাইল দূরে মুণ্ডা অস্পৃশ্যদের একটা ছোট্ট ডিহি। প্যাসেঞ্জার তো দূরের কথা, ছাপা টিকিটই ছিলো না তখন।

এমনি সময় হঠাৎ একদিন সেকেণ্ড ক্লাস কামরা থেকে নামলো এক পাগলা সাহেব। পাগলই মনে হয়েছিলো রজনীবাবুর কথাবার্তা শুনে। আর সাহেবের সঙ্গে ডেড়া কামরা থেকে নামলো এক হিন্দুস্থানী ছোকরা।

পাগলই মনে হোক, আর যাই মনে হোক, প্রথম দর্শনেই হৃৎকম্প হয়েছিলো তাঁর। হঠাৎ এ কৌরব-রাজত্বে পাণ্ডবের আগমন কেন? কোনোরকমে মাথায় টুপিটা লাগিয়ে কালো কোটের বুকে পিতলের বোতাম আঁটতে আঁটতে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন রজনীবাবু। একে সাহেব, তার ওপর রেলেরই কোনো বড় অফিসার কি না কে জানে!

রজনীবাবু সেলাম করতেই সাহেব হলদে দাঁত বের করে একমুখ হেসে একটা সিগারেট ঠোঁটে চেপে চিবিয়ে চিবিয়ে আধো-আধো স্বরে বলেছিলো, স্টেশন মাস্টার টুম? কেয়া নাম?

রজনীবাবু নাম বলার পর তাঁর পিঠে প্যাট করে সাহেব বলেছিলো, টুম হামারা ডোস্ট হোগা—ফ্রেণ্ড, হাম আউর টুম ফ্রেণ্ড।

—ইয়েস স্যার, সার্টেনলি স্যার, ভেরি লাকি স্যার। বিনয়ে গলে গিয়ে, আনন্দে উচ্ছল হয়ে, হাত কচলাতে কচলাতে রজনীবাবু উত্তর দিয়েছিলেন।

আর সাহেব নিজের বুকে মোটা হাতের একটা ফাঁপালো আঙুল ঠুকে বলেছিলো, হাম ম্যাকক্লাস্কি হায়, অ্যাম জোনাথন ম্যাকক্লাস্কি। এ জাগা দেখনে আয়া হাম, ইধার রহেনে মাংটা। ওয়াণ্ট টু মেক এ নাইস লিট্‌ল হোম ফর মি! বহুৎ—সু সু বিউটিফুল প্লেস হায়। ফার্মিং করেগা, আবাদ করেগা।

রজনীবাবু ততক্ষণে নির্ভয় হয়েছেন, খুশী মনে উত্তর দিয়েছেন, ভেরি গুড স্যার, ভেরি গুড সিনারি, বিউটিফুল সয়েল স্যার।

বলেছেন বটে, কিন্তু মনে মনে হেসেছেন। লোকটা বদ্ধ উন্মাদ নাকি? এই পাথুরে জমিতে চাষ করবে? জায়গা খুঁজে পেলো না আর সারা ভারতবর্ষে? এই অজ সাঁওতালী গাঁ. বলে কিনা, বিউটিফুল প্লেস!

দোষ কি! রজনীবাবু নিজেও তো একদিন এই চোখেই দেখেছিলেন জায়গাটাকে। প্রথম যেদিন বদলি হয়ে এসেছিলেন, মনে আছে তাঁর।

দিনদুপুরে হঠাৎ মাঝরাতের অন্ধকার নেমে এসেছিলো ট্রেনটা টানেলের ভেতর ঢুকতেই। গুম্-গুম্ গুম্-গুম্, কেমন একটা পৃথিবী গুমরে ওঠার শব্দ যেন। সমস্ত শরীর তাঁর নতুন এক অভিজ্ঞতায় শিউরে উঠেছিলো। তারপর হঠাৎ আবার আলোয় ফিরে এসেছিলো চোখ। দু-পাশে কাটা পাহাড়ের দেয়াল, দূরে দূরে ঘন অরণ্যের রহস্য, কুয়াশা-জড়ানো ছোট ছোট অগুন্তি পাহাড়। পাহাড়ের পর পাহাড়, আর লাল মাটির দারিদ্র্য। রেল লাইনের পাশে কোথাও বালির ঢিবিতে রোদ-চিকচিক অভ্র, মাইলের পর মাইল নির্জনতার প্রান্তর; নিঃশব্দ বাতাসের গান। রজনীবাবুরও সেদিন রোমাঞ্চ জেগেছিলো।

পাগলা সাহেবের কথা শুনে কিন্তু না হেসে পারলেন না উনি। মনে মনে বললেন, দুটো দিন সবুর করো মিঞা, পালাতে পথ পাবে না।

টেরিটি বাজারের ওয়াট্সন থেকে বার্ডওয়ান রোডের মিসেস কার্ক পর্যন্ত সবাই বলেছিলো, সিলি আইডিয়া। অতএব রজনীবাবু আর হাসবেন না কেন?

কিন্তু পাগলা সাহেব জোনাথন ম্যাকক্লাস্কি সত্যিই একটা পাহাড়ের গায়ে বিঘে কয়েক জমি কিনে বেশ বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি তুলে ফেললে। রাঁচী থেকে যে রাজমিস্ত্রীর দলকে নিয়ে এসেছিলো তাদের কাঠা কয়েক জায়গা দিতে চাইলে জোনাথন সাহেব, কিন্তু এই নির্জন পুরীতে স্বেচ্ছায় কে আর দ্বীপান্তর ভোগ করতে চায়! তারা যেমন এসেছিলো তেমনি ফিরে গেল। রইলো শুধু জোনাথন ম্যাকক্লাস্কি। আর রজনীবাবু।

ছোট্ট স্টেশন। কাঁকর-বিছানো লম্বা টুকরো প্লাটফর্ম। ট্রেনের পাদানি থেকে সাবধানে লাফ দিয়ে নামতে হয়, এত নিচু লেভেল। প্রথম তৈরির সময় সেই যে বেড়া দেওয়া হয়েছিলো, মেরামত হয়নি আর তারপর। ওয়েটিং রুম-টুমের বালাই নেই, স্রেফ একখানা ঘর, একজনই স্টেশন মাস্টার। আরেকজন কর্মচারী ছিলো অবশ্য—কিষণলাল। কিন্তু সে যে কার কর্মচারী বোঝা দায়। সিগন্যাল পোস্টের সিঁড়িতে উঠে আলো জ্বালানো থেকে ট্রেনের সময় ঢং-ঢং করে বার কয়েক ঘণ্টি বাজানো, 'পানিপাঁড়ে' ডাক শুনলে এগিয়ে গিয়ে উবু-হয়ে-বসা দেহাতী কোনো যাত্রীর আঁজলায় জল ঢেলে দেওয়া। ব্যস, তারপর সারা দিন স্টেশনের পিছনেই রজনীবাবুর কোয়ার্টারে মসলা বাটা থেকে শুরু করে 'পায়ের দাবানা' পর্যন্ত। কিষণলালের মা ছিলো রজনীবাবুর বাড়ির বাসন মাজার ঝি। মারা যাবার সময় সাত বছরের কিষণলালকে রজনীবাবুর হাতে তুলে না দিক, পায়ে ঠাঁই দেবার অনুরোধ জানিয়ে যায়। তখন থেকেই সে রজনীবাবুর সঙ্গী, বন্ধু, ভৃত্য, উপদেষ্টা।

স্টেশন-ঘরে বসে টেলিগ্রাফের যন্ত্রণায় আঙুল এ'টে মাঝে মাঝে টরেটক্কা টরেটক্কা করা আর কিষণলালের সঙ্গে গল্প ফাঁদা। সেদিনও এমনিভাবেই কথাবার্তা চলছিলো দুজনের, চলছিলো পাগলা সাহেব জোনাথন সম্বন্ধে। এমন সময় ম্যাকক্লাস্কি নিজেই এসে হাজির। সারা শরীর ভিজে গেছে। লালচে কপালে লেপটে আছে ব্রাকেটের মতো বাঁকা এক গোছা চুল, আর পায়ের গোড়ালি, ট্রাউজারের পায়া কাদা লেগে নোংরা হয়ে গেছে।

ম্যাকক্লাস্কিকে দেখে রজনীবাবুর হুঁশ হলো বাইরে ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে। পাহাড়ী জায়গার বৃষ্টি, যখন শুরু হয় আকাশ ভেঙে বান ডাকে যেন। আবার তখনই খটখটে রোদ্দুর। ঘর থেকে বেরুনোর পর মাঝপথেই বোধ হয় বৃষ্টি নেমেছে, ভাবলেন রজনীবাবু।

যেমন বসে ছিলেন তেমনি বসে থেকে সহাস্যে বললেন, এ কি হাল হয়েছে সাহেব?

বর্ষাতি নিয়ে বেরোওনি?

—দিস ইজ রেন-বাথ। পানিমে আস্নান কিয়া। এক পাটি হলদে দাঁত বের করে হাসলো জোনাথন। তারপর একটা টুল টেনে নিয়ে বসলো।

রজনীবাবু বললেন, বোসো সাহেব, বোসো। জলটা থামুক, চা খাওয়াবো তোমাকে।

—টি? নো। চোখ টিপে ইশারা করে বললে, পিয়েগা আজ।

—বটে? একদিন মহুয়ার মদ গিলেই নেশা লেগে গেছে?

—নাহি নাহি রাজ্‌নীবাবু। বারবার মাথা নাড়লে জোনাথন।...নট্ ওয়াইন। আই লাইক্ দ্যাট ভিলেজ। ও লোককো নাচ আউর গানা চার্মিং, আই লাইক্ দেয়ার ডান্স অ্যান্ড মিউজিক। ডুম ডুম ডুম ডুম...সারা শরীর দুলিয়ে কল্পনার ঢোলক বাজাতে শুরু করলো সে।

রজনীবাবু মনে মনে ভাবলেন, হায় রে। এ ব্যাটাও সাহেব। বউ-ছেলে নেই, তেপান্তরের মাঠে এসে বাড়ি করেছে, দিনরাত গিয়ে পড়ে থাকতে চায় মুণ্ডাদের আড্ডায়, মদ খেয়ে ধেই-ধেই করে নাচতে লেগে যায় তাদের সঙ্গে। লজ্জাশরম, আত্মসম্মানজ্ঞান নেই এতটুকু, এ ব্যাটাও সাহেব!

বললেন, তুমি সাহেব মানুষ। তোমার কি ওদের সঙ্গে তাল দেওয়া উচিত?

—কাহে নেই? চটে গেল জোনাথন।—হাম ভি নেটিভ হো যায়গা। লিখেগা হাম, আ'ল রাইট বুকস্ অ্যাবাউট দেম। নাহি মিল্‌নেসে লিখেগা ক্যায়সে?

উত্তর না দিয়ে রজনীবাবু টরেটক্কা শুরু করলেন মর্সে। বই লিখবেন। লিখবে তো তুমি, পড়বে কে শুনি তোমার মতো পাগলের লেখা? ভাবলেন রজনীবাবু, বলতে তবু সাহস হলো না। এমনিতেই তো চটে গেছে!

খানিক চুপ করে থেকে কিষণলালকে বললেন, দেখ্ তো বৃষ্টিটা ধরলো কি না, সাহেবের জন্যে একটু চা বানিয়ে নিয়ে আয়।

বৃষ্টিটা থেমে গিয়েছিলো। পাহাড়ী জায়গার বৃষ্টি, ঝমঝম করে যেমন আসে, চট্ করে তেমনি থেমেও যায়। কিষণলাল উঁকি মেরে বাইরেটা দেখে নিয়ে আবার ফিরে এলো।

—দু পেয়ালা তো?

—হুঁ। খাতা লিখতে লিখতে রজনীবাবু উত্তর দিলেন।

কিষণলাল চলে যেতেই জোনাথন সরে এসে বসলো রজনীবাবুর পাশে।

—যাওগে রাজ্‌নীবাবু?

রজনীবাবু মুখ তুলে ঘাড় নাড়লেন।—না। তুমিও যেও না সাহেব।

—কাহে?

—ওরা কেউ কেউ রাগারাগি করছে। ওরা হলো মুণ্ডা আর তুমি সাহেব। ওদের মেয়েদের সঙ্গে তুমি হাসাহাসি করো...

—বাট আ'ল ম্যারি হার। হাম তো শাডি করনে মাংতা।

—তুমি তো শাদি করতে চাও, কিন্তু শনিচারীর বাবা টাঙির এক কোপে মাথা উড়িয়ে দেবে এ-কথা শুনলে।

—ও নো নো রাজ্‌নীবাবু। হাসলে জোনাথন।—শোনিয়া টু লাভ্‌স্ মি।

ভালোবাসা? প্রেম? রজনীবাবু কথা বাড়ালেন না আর। মুণ্ডা মেয়ে কিনা প্রেমে পড়বার লোক পেলে না, ভালোবাসলে পাগলা সাহেবকে! হতে পারে! টাকা ছড়ালে কি না হয়। কিন্তু এ লোকটার রুচি বলিহারি, শেষে একটা কালো কুচকুচে সাঁওতালনীকে?

হিসেবে কিন্তু ভুল হয়েছিলো রজনীবাবুর। শোনিয়াকে সত্যিই একদিন বিয়ে করে বসলো জোনাথন, একেবারে আরণ্যক মতে। মুণ্ডা সর্দার প্রথমটা একটু আপত্তি করবার চেষ্টা করেছিলো। কিল্লীর মিল নেই, নাম গোত্র দূরের কথা একেবারে ভিন্ দেশের ভিন্ জাতের লোক, তার সঙ্গে গিতিওড়ার কুমারী মেয়ে শোনিয়ার বিয়ে! কেন, জোয়ানদের গিতিওড়ায় যে আইবুড়ো ছেলেগুলো ঘুমের জন্যে ছটফট করে তাদের একজনকে কি বেছে নিতে পারলো না শোনিয়া? বনজঙ্গল সাফ করবার জন্যে যখন জারা জ্বালানো হয় তখন তো আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়লেও পারতো মেয়েটা।

সিল্লি তামার বুন্ডু বরন্ড রাহে—এই পাঁচ পরগনার মার্নাকি কদম ছত্রীর আখড়ায় গিয়ে বিচার আনলে সর্দার। গিতিওড়ার ঘরে সারা গাঁয়ের কুমারী মেয়েদের সঙ্গে রাত কাটানো যার ধরম, সে যখন নিজের মান রাখে নাই, তখন করুক সে বিয়া। পট্টি পিড়ের মুন্ডারা কেন কাজী করতে যাবে সাহেবের সঙ্গে!

সুতরাং বিয়েটা নির্বিঘ্নে হয়ে গেল মান্ডা পরবের হপ্তা কয়েক আগে। সারা ডিহির মাটি ভিজে গেল মহুয়ার মদে, তিন দিন মদে চুরচুর হয়ে রইলো পট্টির জোয়ান সান্ডিরা। শুধু কি সান্ডিরা? মেয়েরাও খোঁপায় পলাশ গুঁজে মাথায় ঘটি নিয়ে সারি নাচলে, নেশায় ঢললে। টাংরাটোলি আর মোরহাবাদি থেকে মৃধা ডোম এসেছিলো জনকয়েক, তাদেরও ঠোঁট ভিজলো হাঁড়িয়া খেয়ে, সারি ছোঁয়ার আপত্তিটুকুও জানালে না কেউ।

জোনাথন ম্যাকক্লাস্কি বললে, আউর পিও। বখরা লে আও, সবকো গোস্ত রোটি খিলায়গা। মান্ডা পরবকা সব খরচা হাম দেগা।

রজনীবাবুকেও গিয়ে নিমন্ত্রণ জানিয়ে এলো। আর দেশে-বিদেশে যেখানে যত আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব ছিলো সকলকে চিঠি লিখলে, হঠাৎ বিয়ে করে বসেছি, মিসেস ম্যাক-ক্লাস্কির সঙ্গে আলাপ করতে চাও তো নেক্সট ট্রেন ধরে লাপরায় চলে এসো।

চিঠি অনেকগুলোই ছেড়েছিলো, কিন্তু এলো শুধু দু পক্ষ। রাঁচীর ছোট গির্জার রেভারেন্ড ব্রাউন, আজানুলম্বা কালো আলখাল্লা গায়ে, একখানা রেক্সিন-বাঁধাই পুরোনো বাইবেল হাতে, পুরু লেন্সের চশমা আঁটা চোখে, প্লাটফর্মের এদিক-ওদিক তন্নতন্ন করে দেখে গাড়ি থেকে নামলো। আর অন্য একটা কামরা থেকে নামলো আধা-বুড়ী মেম মিসেস ক্যাসল্, আঠারো বসন্তের ফ্লোরা, গুটি দুই হাফপ্যান্ট পরা বাচ্চা।

দু পক্ষই এদিক-ওদিক দেখে বিরক্ত হয়ে পরস্পরের দিকে এগিয়ে গেল।

—মিস্টার ম্যাকক্লাস্কির বাড়িটা কোথায় বলতে পারেন? তারপর দুজনেই বুঝলো যে তারা নবাগত। সুতরাং স্টেশন-ঘরের দিকে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

রজনীবাবুকে সামনে পেয়ে বুড়ী মেম মিসেস ক্যাসল্ বললে, মিস্টার ম্যাকক্লাস্কি নিশ্চয় মোটর পাঠিয়েছেন আমার জন্যে?

'পাগলা সাহেব' 'পাগলা সাহেব' বলে বলে নামটাও ভুলে গিয়েছিলেন রজনীবাবু। প্রথমটা তাই হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। খানিক পরেই বুঝতে পেরে বললেন, না, গাড়ি তো পাঠায়নি।

—দেন? হাউ ফার ইজ ইট...টু মাইলস্? চাপা রাগে বিস্ময় প্রকাশ করলো রেভারেন্ড ব্রাউন।

মিসেস ক্যাসল্ আরো পরিষ্কার ভাষায় বললে, লোক পাঠাও, গাড়ি নিয়ে আসুক। 'কার' না পাঠালে এক পা-ও হেঁটে যেতে পারবো না।

রজনীবাবু সায় দিলেন তার কথায়, কিষণলালকে বললেন খবর দিয়ে আসতে। আর মনে মনে হাসলেন। গাড়িই আসবে বটে। ফুরফুরে শহুরে রাস্তা পেয়েছো কিনা। তোমাদের ম্যাকক্লাস্কি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের মতন বিলিতী সাহেব নেই আর, তা তো জানো না।

জানতে অবশ্য দেরি হলো না। ঘণ্টাখানেক ধরে স্টেশন-ঘরে বসে ঘামলো ওরা। আঠারো বসন্তের মেয়েটা বুকের সবুজ পেখম ভিজিয়ে ফেললে ঘামে, মিনিটে মিনিটে হাতের ভ্যানিটি খুলে খুদে আয়নায় মুখ দেখলে, পাউডার লাগালে, ঠোঁট রাঙালে বারবার, অধৈর্য হয়ে পায়চারি করলে থেকে-থেকে। বাচ্চা দুটো হই-হুল্লোড় করলো কুয়োর পাশের পেয়ারা গাছটায় উঠে। তারপর একসময় কিষণলাল ফিরে এসে বললো, সাহেব এসেছে গাড়ি নিয়ে।

রেভারেন্ড ব্রাউন আর মিসেস ক্যাসল্ ছুটে বেরিয়ে এলো। জোনাথনের দিকে চোখ পড়লো তাদের। আর বিস্ময়ে ঘৃণায় ভুরু কুঁচকে মিসেস ক্যাসল্ বললে, অ্যফুল। রেভারেন্ড ব্রাউন বললো, পরের ট্রেন কখন? আমি ফিরে যাবো এখনই।

কিন্তু ফিরবো বললেই তো ফেরা যায় না। ট্রেন সেই বিকেলে।

গরুর গাড়িটা হাঁকাতে হাঁকাতে ওদের সামনে এসে লাফিয়ে নামলো জোনাথন। খালি গা, লোমশ চওড়া বুক, গরমে লালচে হয়ে উঠেছে সারা শরীর, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। গাড়ি হাঁকাবার পাঁচনটা পায়ে ঠুকতে ঠুকতে জোনাথন বললে, যেতে হয় বিকেলে যাবে,

এখন তো চলো, গাড়ি এনেছি তোমাদের জন্যে। তা ছাড়া মিসেস ম্যাকক্লাস্কির সঙ্গে দেখা করবে না?

মিসেস ম্যাকক্লাস্কি যে ব্যারন-কন্যাই হোন না কেন, আলাপের ইচ্ছা আর ওদের ছিলো না। তবু ঠাসাঠাসি করে গরুর গাড়িতেই উঠতে হলো।

রেভারেণ্ড ব্রাউন দাঁতে দাঁত চেপে বললে, ন্যাস্টি অ্যাফেয়ার।

মিসেস ক্যাসল্ আবার মন্তব্য করলে, অ্যাফুল।

আঠারো বসন্তের উদ্ভিন্নযৌবনা ফ্লোরা কৌতুকে আনন্দে বলে উঠলো, হাউ নাইস!

বাচ্চা দুটো হেসে গড়ালো—সো ফানি। ইজ্‌ন্ট ইট মামি?

ব্যাঙ্ক টিকিটের খাতাটা খুঁজে বের করে রেখেছিলেন রজনীবাবু, পারানি হিসেবের চার্টটাও। তাড়াতাড়িতে তখন হয়তো খুঁজে পাবেন না এই ভয়ে। বুড়োবুড়ীরা যে বিকেলের ট্রেনেই পালাবে এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই ছিলো না তাঁর। গরুর গাড়ি আর জোনাথনের খালি গা দেখেই যাদের চোখ কপালে উঠেছিলো, খাটো কাপড়ের আধা-আবরণ কালো চামড়ার মিসেস ম্যাকক্লাস্কিকে দেখে ওদের যে কি অবস্থা হবে কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। কিন্তু কোথায় তারা? বিকেলের ট্রেন ছেড়ে গেল তবু ফিরলো না কেউ। সন্ধ্যারাতের কৌতুকবিস্ময়ের চাঁদ রজনীবাবুর মনে অনুসন্ধিৎসার ভোর হয়ে দেখা দিলো। রাত কাটলো, সকাল হলো। তবু পাত্তা নেই ওদের। না পাদ্রীসাহেবের, না মিসেস ক্যাসলের। বাচ্চা দুটো 'সো ফানি' কালো মেয়েটার আঁচলের সঙ্গে লেপটে গেল নাকি? না মুণ্ডাদের ব্ল্যাক লেডীর ব্যবহারে মুগ্ধ হলো ওরা?

লেডী? নিজের মনেই হেসে ফেললেন রজনীবাবু। মনে পড়ে গেল, বহু দিন আগে কখন একবার রেলের এক ফিরিঙ্গী সাহেব ইংরেজী ভাষা শিখিয়েছিলো তাঁকে। ট্রেনের কামরা দেখিয়ে বলেছিলো ফার্স্ট আর সেকেণ্ড ক্লাসে মেয়েদের কামরায় লেখা থাকে 'লেডীজ', ডেড়া কামরায় থাকে 'উইমেন', থার্ড ক্লাসে স্রেফ 'ফিমেল'!

আর বুড়োবুড়ীকে আটকে রাখার কৃতিত্ব এই ফিমেলটার কিনা জানবার জন্যে সকালে এক গ্লাস চা খেয়েই বেরিয়ে পড়লেন রজনীবাবু, গিয়ে হাজির হলেন পাগলা সাহেবের বাংলোয়।

ফটকের সামনেই দেখা হলো। গোলাপের গোড়ায় পচা পুঁটির সার দিচ্ছিলো জোনাথন।

—কি ব্যাপার? বন্ধুরা কোথায়? জিজ্ঞেস করলেন রজনীবাবু।

চোখ টিপে হাসলো জোনাথন। —শো রহা হ্যায়! স্লিপিং, বোথ অফ্ দেম্।...কাম ইন্, লেট আস হ্যাভ টি।

বলে এগিয়ে গেল সে, আর রজনীবাবু তাকে অনুসরণ করতে করতে দেখতে পেলেন ফ্লোরা আর বাচ্চা দুটো ওদিকে ফেন্সিং-এ প্রজাপতি ধরার চেষ্টায় হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে।

বাইরের বারান্দায় বসে পাগলা সাহেব মুচকি হেসে একটা রীতিমতো বিলিতী লেবেল মারা বোতল দেখালো।—তিন বোতল পিয়া, টু অফ্ দেম্। বলেই ছিপিটা খুললো, আর এক দমকা দুর্গন্ধ এসে রজনীবাবুকে বুঝিয়ে দিলো, পচাইটা নতুন মার্কার বিলিতী বলে চালিয়েছে ও।

স্টেশন-ঘরে টরেটক্কা করতে করতে সে কথা কিষণলালকে বললেন রজনীবাবু—ও বুড়ো-বুড়ী রস পেয়েছে, এখন থাকলো বোধ হয়।

থাকলো যে, তার প্রমাণও মিললো।

মুণ্ডাপট্টির সর্দার মাণ্ডা পরবের নিমন্ত্রণ জানাতে এসে বলে গেল, সাহেবের দলও নাকি যাবে পরব দেখতে।

তাই মাণ্ডার দিন বিকেলে একটা বাচ্চা এসে যখন বললে, পাগলা সাহেব সেলাম জানিয়েছে, চায়ের নেমন্তন্ন তাঁর বাড়িতে, রজনীবাবু উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, একটা কেলেঙ্কারি না বাধিয়ে বসে, বুঝলি কিষণলাল?

আর সেই ভয়েই যাবো-না যাবো-না করেও যেতে হলো তাঁকে।

কিন্তু গিয়ে বুঝলেন ব্রাউন আর ক্যাসল্ তখনো দোমনা। চা-পান সমাপ্ত হওয়ার পর জোনাথন বললে, এবার তা হলে যাওয়া যাক্।

কালো আলখাল্লার রেভারেণ্ড ব্রাউন হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো—না, কক্ষনো না। হিদেন ফেস্টিভ্যাল দেখতে যাবে একজন ট্রু ক্রিশ্চান? মিসেস ক্যাসল্ বললে, নেটিভদের গায়ের গন্ধে নাকে কার্চিফ দিতে হয়।

রূপবতী ফ্লোরা যৌবনদেহের রেখাগুলি স্পষ্ট হয়েছে কি না আড়চোখে দেখে নিয়ে স্কার্টের ভাঁজ মোলায়েম করলে সুশুভ্র হাতের উলটো পিঠটা ঘষে ঘষে। তারপর একমুখ সমবেদনার হাসি ছড়িয়ে রেভারেণ্ড ব্রাউনের চোখে চোখ রাখলে।—ওদের কি দোষ, আহা, বেচারীদের কেউ তো সিভিলাইজড্ করার চেষ্টা করেনি।

সুতরাং জোনাথনের সঙ্গে সবাই মাণ্ডা পরব দেখতে যেতে রাজী হলো। পিছনে রজনীবাবু ওদের দলকে অনুসরণ করলেন। আর তাঁর পাশে পাশে হাঁটলো শোনিয়া। আড়চোখে শোনিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে রজনীবাবু যেন বুঝতে পারলেন, ফ্লোরার উপস্থিতিতে এক দিকে যেমন শঙ্কিত হয়ে উঠেছে ও, তেমনি ঈর্ষান্বিতও।

কিন্তু ওর মনের দুশ্চিন্তা শেষ অবধি চেপে রাখতে পারলে না শোনিয়া। বললে, উ মেয়েটা কে বটে?

রজনীবাবু হেসে বললেন, তোর সতীন হবে হয়তো!

শোনিয়া কথাটা বুঝতে পারলো না, ভাবলে কোনো কৌতুককর কথা বুঝি, তাই খিলখিল করে হেসে উঠলো ও সারা দেহে হিল্লোল তুলে। তারপর পরবের মাঠে ভোক্তার ভিড় দেখে বললে, হুই যে, রামায়েৎ গোসাঁই বটে! আর যাস্ না বাবুরা, আপনি উদের ইথান থিকে দেখতে বল।

সত্যিই তো, আর এগিয়ে গেলে হয়তো দাঙ্গা লেগে যাবে। তাড়াতাড়ি পিছন থেকে জোনাথনকে থামতে বললেন রজনীবাবু।

সকলেই দাঁড়িয়ে পড়লো সেখানে।

চারপাশের ডিহি থেকে পরবের দল এসে জমেছে মাণ্ডার মাঠে। দলের হাতে একটা করে বিচিত্র চিহ্ন আঁকা পতাকা। রজনীবাবুর মনে পড়লো, একবার দু দলের পতাকায় একই চিহ্ন থাকায় কি খুনোখুনিটাই না হয়েছিলো। সে কথা বুঝিয়ে দিলেন তিনি রেভারেণ্ড ব্রাউনকে।

তাঁর ভুল ইংরেজী আর হাস্যকর উচ্চারণ শুনে ফ্লোরা মুখ আড়াল করে হাসলে।

মাঠের এক কোণে মহাদেবের আস্থান। সেখান থেকে অজস্র পেরেক লাগানো একটা কাঠের পাটা ভক্তিভরে মাথায় করে নিয়ে এলো ভোক্তারা। শোনিয়া দু হাত জোড় করে বুকে ঠেকিয়ে মাটিতে প্রণাম করলে। বললে, ফারতী। অর্থাৎ পার্বতী।

মাঠের মাঝখান থেকে মহাদেবের আস্থান পর্যন্ত ভোক্তার দল সারবন্দী হয়ে মাথা হেঁট করে বসে পড়লো হঠাৎ। আর রামায়েৎ গোসাঁই মাটি না ছুঁয়ে ভোক্তাদের কাঁধে পা দিয়ে দিয়ে আস্থানে গিয়ে পেঁছিলো।

তা দেখে রেভারেণ্ড ব্রাউন বলে উঠলো, হরিবল্!

মিসেস ক্যাসল্ বললে, ইনহিউম্যান!

ফ্লোরা বললে, হাউ স্পোর্টিং!

বাচ্চা দুটো চোখ গোল-গোল করে বললে, ইণ্ডিয়ান সার্কাস।

কিন্তু এর পরেও যে উত্তেজিত হওয়ার দৃশ্য ছিলো, রেভারেণ্ড ব্রাউন তা জানতো না।

কান্ধাইয়া শেষ হয়ে ফুলকুদনা শুরু হতে রাত গভীর হয়ে এলো। অনেকখানি জায়গা জুড়ে কাঠ-কয়লার আগুন ধরানো হলো, চারপাশে ভোক্তারা বসে কুলোর বাতাস দিয়ে গনগনে করে তুললো আগুন। তারপর গোসাঁই এগিয়ে এসে মন্ত্র পাঠ করলে। আর সদ্যোস্নাত ভোক্তারা ভিজে কাপড়ে সারি বেঁধে দাঁড়ালো আগুনের পাশে। একজনের পর আরেকজন ধীরে ধীরে ঐ আগুনের ওপর দিয়ে হেঁটে গেল তারা। রেভারেণ্ড ব্রাউন আর মিসেস ক্যাসল্ স্তম্ভিত, হতবাক। ফ্লোরা শিউরে উঠে জোনাথনের পাশ ঘেঁষে দাঁড়ালো। ভয়ে চিৎকার করে উঠলো বাচ্চা দুটো।

ভোক্তাদের পালা শেষ হলো। এবার ভিজে কাপড়ে সোক্‌থাইন মেয়েরা হাঁটা শুরু করলো আগুনের ওপর দিয়ে। রেভারেন্ড ব্রাউন বললে, আই মাস্ট সী। সত্যি আগুন কি না, সত্যি ওদের পায়ে ফোস্কা পড়েছে কি না!

সন্দেহ দূর হলো তাঁর। সত্যিই আগুন। সত্যিই কোনো ফোস্কা পড়েনি তাদের পায়ে।

ফুলকুদনা শেষ হওয়ার পর মানকির সামনে নাচগান শুরু হলো। উদ্দাম বেগে ঢোলক বেজে উঠলো, ককিয়ে উঠলো বাঁশের বাঁশি। মুখোশ-নৃত্য শুরু হলো। কিন্তু সেদিকে মন রইলো না রেভারেন্ড ব্রাউনের।

বাড়ি ফেরার পথে বারবার বললে, আই মাস্ট ব্রিং লাইট টু দেম। এইসব অশিক্ষিত হিদেনদের অন্ধকার থেকে আলোকে আনতে চাই আমি।

মাস কয়েকের মধ্যেই ছোট একটা গির্জা মাথা তুললো লাপরায়। আর গির্জার বেদীতে দাঁড়িয়ে প্রথম সাম্‌স্‌ পাঠের দিন পাটনা থেকে মিসেস ক্যাসল্‌ আবার এলো ফ্লোরা এবং বাচ্চা দুটোকে নিয়ে। মিস্টার ক্যাসল্‌ হঠাৎ ট্রেন অ্যাকসিডেন্টে মারা যাওয়ায় সংসারে বৈরাগ্য এসেছে তার, তাই যেসাসের পায়ে নিজেকে সমর্পণ করলে। রক্তমাংসের শরীরে যেসাস উপস্থিত হতে না পারায় রেভারেন্ড ব্রাউনের পায়েই স্থান নিলো।

জোনাথন হেসে সে খবর জানালে রজনীবাবুকে। বললে, পায়ে নয়, বুকে। ব্রাউনের বুকে নিজেকে সমর্পণ করেছে মিসেস ক্যাসল্‌।

ব্যাপারটার গভীরতা রজনীবাবুও বুঝলেন, যখন মিসেস ক্যাসল্‌ এসে অনুরোধ জানালে, খানিকটা জমি দেখে দাও আমাকে। এখানেই জীবনের বাকি ক'টা দিন কাটিয়ে দিতে চাই।

মুণ্ডাদের জন্যে একটা মিশনারী ইস্কুলও প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল। এলো জনকয়েক অ্যাংলো মাস্টারনী।

তারপর এক-একটা পাহাড়ের কোল ঘেঁষে এক-একখানা বাংলো উঠতে শুরু হলো। ইনস্টিটিউট, রেস্ট হাউস, দোকানপাট। ক্রমশ লাপরার দেহাতী অঞ্চল একটা রীতিমতো অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান কলোনী হয়ে গেল কয়েক বছরের মধ্যে। শুরু হলো একটা কলোনী অফিস। সারা জীবন চাকরি করে বড়সাহেবরা অবসর-জীবন কাটাবার শেষ বিশ্রাম গড়ে তুললো লাপরার জমিতে।

শুধু মদের দোকানের লাইসেন্স নিয়ে এলো উত্তম সিং, ঠিকাদার বুধন তেওয়ারী তার বাড়ির পাশেই একটা মন্দির বানালে, লাপরা স্টেশনে আরেকজন সহকারী এ-এস-এম জুটলো রজনীবাবুর, কলোনী আপিসের সেক্রেটারী এলেন অমিয় গুপ্ত, আর ডাক্তার হিমাংশু রায়। মুণ্ডা আর অ্যাংলোদের মাঝখানে এই একটাই গোষ্ঠী গড়ে উঠলো।

কিন্তু জোনাথন খুশী হলো কি! ওকে কেউ আর পাগল মনে করলো না, মনে যাই থাক মুণ্ডা মেয়ে মিসেস ম্যাকক্লাস্কিকে দেখে কেউ প্রকাশ্যে নাক বেঁকালো না। বড় ছেলে ম্যাক আর যুবতী মেয়ে ক্লারার দেশী নামকরণেও কেউ আপত্তি তুললো না। মেনে নিলো। এমন কি এ উপনগরের পত্তনদার হিসেবে তার আসন রইলো সম্মানের, শ্রদ্ধার। কলোনীর প্রেসিডেন্ট থেকে ব্যাপটিজমের শিশুর গড ফাদার হওয়ার জন্যে তার কাছেই যত অনুরোধ।

তবু জোনাথন বিমর্ষ মুখে একদিন বললে, হামারা মিশন বরবাদ হো গিয়া রাজ্‌নীবাবু।

—সে কি মিস্টার ম্যাকক্লাস্কি! রজনীবাবুও সম্ভ্রম করে কথা বলতে শুরু করেছেন, তাই বললেন, আপনার মিশনই তো ফুলফিলড্‌ হলো মিঃ ম্যাকক্লাস্কি। এত বড় একটা শহর গড়ে তুললেন আপনি। একদিন আপনাকে গরুর গাড়ি চালাতে দেখে হাসতো ওরা, আজ রাস্তা-ঘাটে সাহেবরা গরুর গাড়িতে চড়ে যাতায়াত করছে, মাটি কোপাচ্ছে খালি গায়ে, চাষ করছে, এমন কি সাজগোজ করাই এতদিন যাদের কাজ ছিলো সেইসব মিসিবাবা মেমসাহেবরাও ক্ষেতে গিয়ে বীজ বুনছে।

জোনাথন হেসে বললে, হামারা মিশন তো এ নাহি থা রাজ্‌নীবাবু। আই অ্যাডমায়ার দি মুণ্ডাজ সোস্যাল সিসটেম। হাম ভি মুণ্ডা হোনে মাংতা থা। ইতনা বড়া কিতাব লিখা হায়, আই হ্যাভ রিটন অ্যাবাউট দেম।

—কিন্তু মুণ্ডারা যে সব ক্রিশ্চান হয়ে গেল মিঃ ম্যাকক্লাস্কি।

জোনাথন আক্ষেপ করলে, ওহি তো বোলতা। আই হ্যাভ বিন ডিফিটেড। আউর হামারা কলোনী-পিপ্‌ল ভি ইণ্ডিয়ান নাহি হুয়া। দে হ্যাভ জাস্ট ইমপোর্টেড এ ব্রিটিশ ভিলেজ হিয়ার ইন ইণ্ডিয়া।

রজনীবাবু সান্ত্বনা দিলেন।—তাতে কি মিস্টার ম্যাকক্লাস্কি, মুণ্ডারা সিভিলাইজড্ হচ্ছে এ তো ভালো কথা।

—সিভিলাইজড্? ডক্টর রয় মে টেল ইউ। ডিজিজ, ইম্‌মর‍্যালিটি, ইনসেস্ট—এহি তো ক্যারেক্টার হায় কলোনী-পিপ্‌লকা। দে আর ক্রিশ্চানস্ ওনলি ইন নেম—দিজ অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানস্। এ লোক সিভিলাইজড্ করনে মাংতা মুণ্ডা লোগকো? মাথায় হাত দিয়ে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়লো জোনাথন।—রেভারেণ্ড ব্রাউন সেজ, আই হ্যাভ ইনসালটেড ক্রিশ্চানিটি।

কিছুক্ষণ পরে মাথা তুলে বললে, অ্যাণ্ড মাই সান ইজ উইথ দোজ হোয়াইট-স্কিন বাগার্স। মুণ্ডা লোগকো ভাগানে মাংতা ও।

রজনীবাবু বিস্মিত হলেন, সে কি মিস্টার ম্যাকক্লাস্কি। ওর মা তো মুণ্ডা?

—সেজ, হি হেটস্ হিজ মাদার।

চোখ কপালে উঠলো রজনীবাবুর। এমন কথা ভূভারতে কেউ কখনো শুনেছে নাকি? ছেলে মাকে ঘৃণা করে? এও কি সম্ভব? জোনাথনের কথায় আহত বোধ করলেন রজনীবাবু। মনে হলো এ যেন তাঁর দেশের অপমান। ম্যাক তার মাকে ঘৃণার চোখে দেখে, মুণ্ডা মায়ের ছেলে ম্যাক? এতদিন রজনীবাবু নিজের গোষ্ঠীটাকে সকলের থেকে পৃথক করে দেখতেন, ভাবতেন। যেন মুণ্ডারা অন্য এক পৃথিবীর মানুষ, যেমন এই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের ভাবতেন অন্য জগতের। সব মেলামেশা, ভদ্রতা, আচার, আপ্যায়ন সত্ত্বেও ওদের সঙ্গে প্রাণের যোগ-সূত্র ছিলো না তাঁর। কিন্তু আজ হঠাৎ সচেতন হলেন, কোন্ অলক্ষ্য মুহূর্ত থেকে নিজেকে মুণ্ডাদের আপন লোক ভাবতে শুরু করেছেন জেনে। মুণ্ডা মায়ের অপমান আজ যেন তাঁর নিজের মাকেও অপমান করা মনে হয়েছে।

ম্যাককে কাছে পেয়েই একদিন তাই মেজাজ দেখিয়ে ফেললেন।—খুব যে সাহেব হয়ে গেছো ছোকরা, তুমি নাকি...

প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিলো ম্যাক। কথা খুঁজে পায়নি। তারপর ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মাথা নিচু করলে। রজনীবাবু স্পষ্ট বুঝতে পারলেন চোখ ছলছল করছে ছেলেটার।

বললেন, কি, হয়েছে কি বলো তো?

এমন কিছুই নয়, কিংবা অনেক কিছুই। ও যেমন মুণ্ডাদের সঙ্গে মিশতো, আপনজন মনে করতো তাদের, তেমনি সাদা চামড়ার মানুষগুলোকেও বন্ধু ভেবেছে চিরকাল। ওর গায়ের রং ব্রাউন বলে কেউ কখনো তো আপত্তি জানায়নি। বরং যে-কোনো ফাংশনে ফেস্টি-ভ্যালে ওর সহযোগিতা কামনা করেছে সবাই। আর তারই ফাঁকে কখন কিভাবে মিস্টার হ্যাগিন্সের মেয়ে ইভাকে ভালোবেসে ফেলেছে ও। ওর আলিঙ্গনের মধ্যে নিজেকে ধরা দিতে কুণ্ঠিত বোধ করেনি ইভা, ঘণ্টার পর ঘণ্টা নির্জনে পাহাড়ী নদীর ধারে বসে এলোমেলো অনেক কথায় অনেক সময় কেটে গেছে, তবু হাসি মিলিয়ে যায়নি কোনো দিন ইভার মুখ থেকে।

সেই ইভা হ্যাগিন্স ওকে প্রত্যাখ্যান করেছে, ওর প্রেম ফিরিয়ে দিয়েছে। সারা কলোনীর ঠাট্টাবিদ্রূপ সহ্য করে ও বাঁচতে পারবে না। তা ছাড়া রেভারেণ্ড ব্রাউন এ বিয়েতে মত দেবে না।

—আমার মাথার ঠিক ছিলো না সেদিন রজনীবাবু। যা মুখে এসেছে মাকে বলে ফেলেছি সেদিন, মনে হয়েছে সব দোষ বুঝি তারই। মুণ্ডাপল্লীতেও এ খবর নাকি রটে গেছে।

মুণ্ডাপল্লীতেও পেঁছেছে এ খবর? তাই কি জারার আগুন ঘিরে প্রতি রাত্রে ওদের জল্পনাকল্পনা চলে? থেকে থেকে উদ্দাম আবেগে ঢোলক বেজে ওঠে ডুম-ডুম ডুম-ডুম, আর শিকারের চিৎকার ওঠে প্রতিদিন, সে কি এইজন্যেই? রজনীবাবুর হঠাৎ খেয়াল হলো। সত্যিই তো, মুণ্ডারা আজকাল আনাগোনা করে সঙ্গে তীরধনুক নিয়ে। কেন? কার ওপর

রাগ তাদের? ম্যাক, না অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের ওপর?

এতদিন নির্বিকার ছিলেন রজনীবাবু, চোখের সামনে লাপরা স্টেশনের স্টপেজ আধ মিনিট থেকে সতেরো মিনিট হয়েছে, গড়ে উঠেছে এত বড় একটি টাউন। কিন্তু এতদিনে সব বুঝি ভেঙে যায়। নষ্ট হয়ে যায় সব-কিছু। তিনিই তো পিটিশনের পর পিটিশন করে ট্রেন থামার সময় বাড়িয়েছেন। ওয়েটিং রুম করতে বাধ্য করিয়েছেন, আনিয়েছেন ইলেকট্রিকের আলো। সব নষ্ট হয়ে যাবে?

মুণ্ডা সর্দারের সঙ্গে দেখা করলেন রজনীবাবু সেই রাত্রেই। কিন্তু ফল হলো না। পুরুষদের গিতিওড়ায় গিয়ে দেখলেন, ঘুমের ঘর যে গিতিওড়া সেখানে সাজ-সাজ রব পড়ে গেছে। আর মদের গন্ধে ভরে গেছে সারা ঘর।

রজনীবাবু ডাকলেন, মানকি!

সর্দার ফিরে তাকালো, রক্তচক্ষু মেলে তাকালো রজনীবাবুর দিকে। তারপর এগিয়ে এসে বললে, তু মানা করিস না মাস্টারবাবু। ইস্টিশনে থাকবি আপুনি। উ সাদা চামদের হামরা কাঁইটা সাফ করবো বটে। পাগলা সাহেবের মুখে থু দিয়েছে উনারা।

রজনীবাবু বোঝাবার চেষ্টা করলেন, ছি ছি, ওসব করিস না মানকি। ওরা রাজার জাত, ওদের মারলে তোদেরই ক্ষতি হবে।

—হোলো। ঘাড় বাঁকালে সর্দার।—ক্ষেতি হোলো। শোনিয়ার বেটার মুখে থু দিয়েছে উনারা। আমরা উদের কাঁইটা সাফ করবো বটে। লছ্মী পূজার দিন মোরগ বলি দিয়ে উদের সাফ করবো।

রজনীবাবু বারবার বোঝাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলেন।

কলোনীতেও তখন সাজ-সাজ রব পড়ে গেছে। বন্দুক ঠিক আছে কি না, টোটার অভাব হবে কি না দেখছে সবাই। জানালা দরজার কাচ সরিয়ে কাঠ লাগানো হচ্ছে ঘরে ঘরে। উত্তেজিত হয়ে উঠছে দু পক্ষই।

রেভারেণ্ড ব্রাউনকে গিয়ে ধরলেন রজনীবাবু।—আপনি বাঁচাতে পারেন, আপনি বন্ধ করুন এসব হাঙগামা। মুণ্ডারাও ক্রিশ্চান, এরাও ক্রিশ্চান—দু পক্ষকেই থামান আপনি।

হাসলে রেভারেণ্ড ব্রাউন।—দি মুণ্ডাজ্ আর ক্রিশ্চানস্ ওনলি ইন্ নেম্। তা ছাড়া কলোনী-পিপ্ল্দের ওপর ওদের কমপ্লেণ্ট কি? ইভা হ্যাগিন্স ম্যাককে বিয়ে করতে চায় না, এতে ওদের কি? আসলে ম্যাকক্লাস্কি ওদের এক্সাইট করছে।

—ইভা হ্যাগিন্স চায়, কলোনী চায় না। বললেন রজনীবাবু।...কারণ ম্যাকের মা মুণ্ডা মেয়ে। এতে মুণ্ডাদের অপমান হয়েছে, বলছে তারা। আপনি নাকি ওদের বুঝিয়েছেন, ক্রিশ্চান হলে সবাই সমান হবে। তবু কেন অপমান সহ্য করতে হয় তাদের, তবু কেন ম্যাককে বিয়ে করতে সাহস পায় না ইভা হ্যাগিন্স?

—ক্রিশ্চান হলেই রাতারাতি তারা হোয়াইটস্ হয়ে যাবে এ কথাও বলেছিলাম নাকি? বিদ্রূপের স্বরে বললে রেভারেণ্ড ব্রাউন।

রজনীবাবু বুঝলেন কাজ হবে না কিছু এভাবে তর্ক করে। স্টেশনে ফিরে এসে বরকাকানায় তার করলেন তিনি, মিলিটারি সাহায্য পাঠাবার জন্যে। থানা এখান থেকে অনেক দূরে, তা ছাড়া একজন দারোগার কর্ম নয়, এ কথাও জানিয়ে দিলেন। কিন্তু পরের দিন সকালের ট্রেনে পুলিস ও মিলিটারির দল এসে পেঁছনোর আগেই সব গোলমাল মিটে গেল। খবর রটে গেল চতুর্দিকে।

গির্জার অলটারের সামনে ভোরের প্রার্থনা জানাতে এসে রেভারেণ্ড ব্রাউন প্রথম আবিষ্কার করলো। ঠিক অলটারের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে দুটো শবদেহ। জোনাথন ম্যাকক্লাস্কি আর মুণ্ডা মেয়ে শোনিয়া। আর অলটার থেকে গির্জার দরজা পর্যন্ত দুটো লম্বা রক্তের রেখা। ওরা দুজনেই নাকি আত্মহত্যা করেছে। হয়তো কলোনীর সমস্ত ঝামেলা থামিয়ে দেবার জন্যেই—বললে রেভারেণ্ড ব্রাউন।

পুলিস তদন্ত করতে চাইলে। বললে, ডেড্ বডি মর্গে পাঠাতে হবে। সুইসাইড কেস যখন।

রেভারেণ্ড ব্রাউন হেসে বললে, আইন শিখে এখানে এসো হে লালপাগড়ি। প্রভু যীশুর

সামনে এই গির্জার মধ্যে যারা শেষ নিশ্বাস ফেলেছে তাদের তদন্ত যেসাসই করবেন। তোমরা ফিরে যাও। বলেই বুকের উপর হাতটা ওপর থেকে নীচে, ডান থেকে বাঁ, ক্রস আঁকলেন বাতাসে।

তারপর বললে, ম্যাকক্লাস্কি যত দোষই করে থাক, হিদেনদের সঙ্গে মেলা-মেশা করলেও তাকে আমি ট্রু ক্রিশ্চান বলেই জানতাম। কলোনীর সকলে তার ফিউনারেলে যেন যোগ দেয়।

সত্যিই ভিড় করে এলো সকলে।

মুণ্ডাপল্লী থেকেও মেয়েপুরুষ ছুটে এলো, পাগলা সাহেব মারা গেছে শুনে। নিঃশব্দ শ্রদ্ধায় মাথা নোয়ালে সকলে, রেভারেণ্ড ব্রাউন বজ্রগম্ভীর স্বরে বাইবেল পাঠ করলো। কফিন নামিয়ে দেওয়া হলো কবরে, পাশাপাশি। জোনাথন ম্যাকক্লাস্কির পাশে শোনিয়া।

তারপর আবার শান্তি ফিরে এলো কলোনীর বাতাসে।

রেভারেণ্ড ব্রাউন আর আরো পাঁচ শো বাসিন্দা পিটিশন পাঠালে, লাপরার নাম বদলে ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ করা হোক। অনুমতি এলো যথাসময়ে।

স্টেশনের বোর্ডে লাপরা নাম মুছে গেল, গোটা গোটা নতুন হরফ বসলো সেখানে। ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ। আর সেদিকে তাকিয়ে ম্যাক বললে, এদের এটুকু কর্তব্যজ্ঞান যে আছে তা দেখে আমি সত্যই সুখী হলাম রজনীবাবু, আ'এম রিয়েলি হ্যাপি।

চোখ ঝাপসা হয়ে এলো রজনীবাবুর।

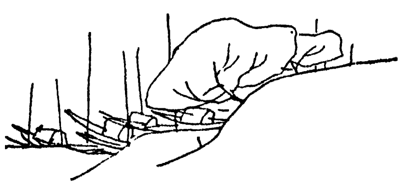
বললেন, জানো না ম্যাক, মিস্টার ম্যাকক্লাস্কির জীবনের সবচেয়ে বড় ডিফিট এইটেই। তিনি নিজে লাপরার মানুষ হতে চেয়েছিলেন, মুণ্ডা হতে চেয়েছিলেন। অথচ শেষ পর্যন্ত লাপরাই বদলে গেল।

কিন্তু গির্জার দরজা থেকে অলটার অবধি দুটো রক্তের রেখা পাশাপাশি কি করে আসতে পারে এ প্রশ্ন কারো মনেই উদয় হলো না।

শান্তির দূত যীশুর গরিমা প্রচারের জন্যেই তো যুগে যুগে হিংস্র ক্রুসেডারদের অভিযান। ঈশ্বরের পুত্র যেসাসের ক্ষমা আর অহিংসার ধর্মকে পবিত্র করে তুলতে রেভারেণ্ড ব্রাউনের হাত কতটুকুই বা লাল হলো। তাঁর বদলে ঈশ্বর লাপরার মাটিকে আলো দেবেন অনেক বেশী।

আমেন।

[১৩৫৮



মদিরেক্ষণা

বাঙালীর ঘরের মেয়ের নাম সীতা! এ দুঃসাহসের জবাব দেবার জন্যেই যেন সীতা মল্লিকের অভিশপ্ত জীবন।

অথচ ওর চোখের হাসি, ঠোঁটের কৌতুক দেখে কোনো দিন সন্দেহ হয়নি, এ-হাসি হাসি নয়, এ-কৌতুক করুণাশ্রিত।

সীতাকে প্রথম যেদিন দেখলাম, সেদিন সীতাকে আমি দেখিনি। ওর কাকা ছিলেন আমাদের আপিসের জর্দাদা। বড়বাবু থেকে বেয়ারাটা অবধি সবাই ডাকতো ঐ নামে। বয়েস বেশী নয়, দেখাতো পঁয়ত্রিশের ডবল। পাঁচ বছর কেরানীগিরি করার পর সকলের ক্ষেত্রেই যেমন বয়সটা রাতারাতি ডবল হয়ে যায়। গলাবন্ধ একটা কোট পরতেন, যে কোটটার দিকে চোখ পড়লেই যে-কেউ তাঁর পায়ের দিকে তাকাতো এবং পায়ের ক্যাম্বিসের জুতো জোড়া দেখতে পেলেই মাথার উত্তর মেরুতে কি যেন খুঁজতো। অর্থাৎ টিকি। শুধু টিকিই নয়, বগলে ছাতাও থাকতো না তাঁর। হিসেব কষে বুঝিয়ে দিতেন তিন দিন জলে ভিজে জ্বর হওয়া এ-বাজারে ছাতা হারানোর তুলনায় রীতিমতো মিতব্যয়িতা। ছাতা ভুলে যাওয়া তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিক না হলেও পানের কৌটো ভুল হওয়া একেবারেই অসম্ভব। পানের কৌটোর চেয়েও কিন্তু জর্দার কৌটোটার ওপরই বেশী দৃষ্টি থাকতো তাঁর। বলতেন, জীবনে একটাই তো বিলাস, এই জর্দা। দামী না হোক, খুঁজে বেছে ভালো কাশীর জর্দা যোগাড় করতেন তিনি, আর আপিসের যে-কোনো লোক, বেয়ারা থেকে বড়বাবু এসে পান চাইতো তাঁর কাছে, জর্দাও। বলতো, সত্যি এমন জর্দা কিন্তু খাইনি কখনো, আর এমন পান সাজতেও পারে না আমাদের গিন্নীরা। জর্দাদা খুশী হতেন, লাল-লাল দাঁতের পাশ দিয়ে হাসি দেখা দিতো আত্মতৃপ্তির। যারা পান জর্দা ছুঁতো না, তারাও এসে হাত পাততো তাঁর কাছে আর জানালা গলিয়ে সেগুলো লুকিয়ে ফেলে দিয়ে এসেও প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতো। হেসে গলে পড়তেন জর্দাদা, বলতেন, 'ঠিক আছে, স্যালারি বিলটা আমি চেক করে দেবো, ইস্ট বেঙ্গলকে দু গোল ঠুসিয়ে দিয়ে এসো।' কিংবা, 'সতেরোর লেজারটায় ফাইন্যাল ফিগার্সগুলো তো? ঠিক আছে, যাও তিনটের মধ্যে না গেলে সেবাসদনে পৌঁছতে পারবে না।' অর্থাৎ পান আর জর্দার প্রশংসা করে জর্দাদাকে সন্তুষ্ট করতো সবাই। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতাম আমরা, জর্দাদা তো নয়, জ্বরদাদা। জ্বরজারি যাই হোক না কেন, বাঁচাবার জন্যে একটিই দাদা আমাদের।

এই জর্দাদার সঙ্গে একদিন এলাম তাঁর বাড়িতে। আর, তাঁর বাড়িতে আসার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ভাবলাম না, কোলকাতা শহরে এমন একটা বাড়ি থাকতে পারে।

জর্দাদার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে সীতা মল্লিক অনেক পিছিয়ে গেছে। কপাটের আড়ালে চলে গেছে সীতা, হয়তো বা স্মৃতিরও। এর পর যদি জর্দাদার বাড়িটার বর্ণনা দিতে বসি তা হলে হয়তো সীতার মতো মেয়ের সঙ্গেও আলাপ করার ইচ্ছে হবে না। আর কি আশ্চর্য, সীতার মতো মেয়েকে দু চোখ মেলে না দেখলে মনে হয় কিছুই যেন দেখা হলো না এ-পৃথিবীর। দু-একটা কথালাপ, তারও যদি সুযোগ না জোটে, তা হলে মনে হবে সংসারমন্থনে শুধু গরল উঠলো।

কিন্তু সীতা মল্লিককে দেখতে হলে জর্দাদার বাড়িটাও দেখতে হবে। কারণ, জর্দাদার বাড়ির মতো বাড়ি না থাকলে সীতা মল্লিকের মতো মেয়ের খোঁজ মিলতো না।

শ্যামবাজারের ট্রাম লাইনের কোনো একটা স্টপে নেমে ডান দিকের একটা রাস্তা ধরে, এবং তারপর অনেকগুলো অলিগলি পার হয়ে দু-পাশে নতুন দুখানা চারতলা বাড়ির মাঝখানে যে পুরোনো একতলা বাড়িখানা—সেটাই জর্দাদার।

জর্দাদার বাড়ি বলতে তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি ভাবার কারণ নেই। ও-বাড়ির একটা অংশের ভাড়াটে তিনি, বাসিন্দে। অর্থাৎ পশ্চিমের অংশটা জর্দাদার বাসা। কিন্তু বাসা আর বাড়ি শব্দ দুটোর পার্থক্য এমনিতেই অনেকে বোঝেন না, তার ওপর ও-পাড়ায় জর্দাদার বাড়ি এতই লোকবিখ্যাত যে, হঠাৎ যদি কাউকে জর্দাদা না বলে তাঁর পিতৃদত্ত নাম উল্লেখ করে প্রশ্ন করেন, ভদ্রলোকের বাসা কোন্‌টা, তা হলে বিমূঢ় দেখাবে লোকটিকে। আর 'জর্দাদার বাড়ি' বলুন, যুধিষ্ঠিরের পথ-প্রদর্শকের মতো মাটির গন্ধ শুঁকে নির্দেশ দিয়ে দেবে গন্তব্যের।

কোলকাতা শহরেই একটি গলির ওপর জর্দাদার বাড়ি। একনাগাড়ে তিরিশ বছর, অর্থাৎ পাঁচ বছর বয়েস থেকে এ-বাড়িতে বাস জর্দাদার। সুতরাং শুধু বর্তমানটাই নয়, অতীতটাও বিংশ শতাব্দীতে পড়ে। কিন্তু জর্দাদার বাড়ির ভেতর ঢুকলে মনে হবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফিরে এলাম। দেয়ালে মহারানী ভিক্টোরিয়ার ছবিটা না থাকলে কোনোক্রমেই অষ্টাদশ

শতাব্দীর পর এক পা-ও বাড়ানো যেতো না।

শুধু শতাব্দীই নয়, শহরটা ভুলতে হয় এ-বাড়ির চৌকাঠ পার হয়ে। বাইরে থেকে এতখানি পচা-ধসা মনে হয় না, কিন্তু সদর আর খিড়কির এই পার্থক্য দেখে হঠাৎ আঁতকে ওঠা অস্বাভাবিক নয়।

একতলা একখানা ছোট বাড়ি। সদরের দেয়ালে খড়ি দিয়ে কত কি লেখা। কতকগুলো বেশ স্পষ্টই পড়া যায়, হাসি পায়, আর কয়েকটা পড়া গেলেও পড়া যায় না। পাড়ার ছেলে-ছোকরাদের কাণ্ড।

জর্দাদার একতলা বাড়ির ছাদে ওঠবার একটা সিঁড়ি আছে, ভাঙা নড়বড়ে একটা চতুর্দিক খোলা কাঠের সিঁড়ি। মই বললে নেহাত বাঁশ বোঝায়, তাই সিঁড়ি বলতে হয়। সিঁড়িটার কিন্তু প্রয়োজন অনেকখানি। বর্ষাকাল ছাড়া অন্য যে-কোনো সময়ে অতিথি-বন্ধুর আগমন ঘটলে তাকে সরাসরি ছাদে নিয়ে গিয়ে বসান জর্দাদা। শুধু ছাদে কেন, সামনেই রাস্তা পড়ার দরুন ঘরের ভেতরও বেশ হাওয়া আর আলো পাওয়া যায় তাঁর বাড়িতে।

বাড়িতে আলো-হাওয়ার বিশেষণ দুটো আছে বলেই যে জর্দাদার বাড়িটা কোলকাতা শহরের বাইরে মনে হয়, বা শতাব্দীটা ঊনবিংশ বলে ভুল করতে হয়, তা নয়।

আসলে কোলকাতা শহরে বোধ হয় এই একখানাই বাড়ি, যে-বাড়িতে কলের জল ঢোকে না, ইলেকট্রিকের আলো নেই, রোগশয্যায় পড়ে পড়ে যন্ত্রণায় কাতরায় না একজনও। এ-বাড়িই জর্দাদার বাড়ি। এ-বাড়িতেই সীতা মল্লিকের মতো মেয়ে থাকতে পারে।

জর্দাদার সঙ্গে গল্প করতে করতে যখন তাঁর বাড়িতে এসে পৌঁছলাম, তখন গলির মোড়ে গ্যাসবাতিটা জ্বলে উঠেছে, আবছা-আবছা অন্ধকার চারপাশে, চারতলা নতুন বাড়ির জানালায় ধরা-বয়সের বউ আয়নায় দাঁড়িয়ে খোঁপার বেণী বাঁধছে, যে-বেণীর দাঁতে-চাপা কালো ফিতে গালের ওপর চেপে বসেছে কানের নীচে থেকে ঠোঁট অবধি, যে-বউয়ের চোখ হাসছে এপাশে-ওপাশে, একতলা বাড়ির ছাদে দাঁড়ানো সীতা মল্লিকের দিকে তাকিয়ে।

কিন্তু তখন জানতাম না ওটাই জর্দাদার বাড়ি, জানতাম না যে ও-বাড়িতে সীতা মল্লিকের মতো মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে না-কার্নিস একতলার ছাদে।

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে, ভয়ে ভয়ে, ধীর পায়ে অনুসরণ করছিলাম জর্দাদাকে, কিন্তু জর্দাদা এতটুকু টলে পড়লেন না, এতটুকু সাবধানে পা ফেললেন না। যত অন্ধকারই হোক, এ-পথ যেন তাঁর নিজের পথ।

কপাটের কড়া নাড়লেন জর্দাদা। খুটখাট কি সব শব্দ হলো। কে যেন এগিয়ে এলো কপাটের কাছে। কোনো প্রশ্ন করলো না, কোনো কণ্ঠস্বর শোনা গেল না। শুধু খুট করে খিলটা খুলে দিয়ে একটা শাড়ির বিদ্যুৎ সামান্য পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। আড়চোখে আমি তাকালাম একবার তার দিকে, কিন্তু আবছা একখানা শাড়ি ছাড়া আর কিছু দেখা গেল না।

বুঝলাম আলো নিয়ে আসা, আলো দেখানো এ-বাড়ির রেওয়াজ নয়। যে যার নিজের নিজের পথ চিনে নেয়। আমার দুর্দশাটা হয়তো জর্দাদার চোখে পড়লো হঠাৎ। বললেন, লণ্ঠনটা নিয়ে আয়।

মেয়েটি এগিয়ে গেল একটু, আর সেদিকে তাকিয়ে দেখলাম, সামান্য এক টুকরো ফাঁকা জায়গায় একটা কুয়ো থেকে জল তুলছেন একজন বর্ষীয়সী মহিলা। কুয়োর ধারে টিমটিম করে জ্বলছে একটা হারিকেন লণ্ঠন।

লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে ফিরে এলো মেয়েটি, আর সেই সুযোগে আমি তার মুখের দিকে তাকালাম। দেখলাম একটি করুণ কালো বিষণ্ণ মুখের ম্লানিমা।

লণ্ঠন হাতে দুলিয়ে আমাদের আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল মেয়েটি। হঠাৎ মাঝ-পথে একবার থমকে দাঁড়ালো। বললে, মেঘ উঠেছে। জর্দাদা একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, হুঁ। এর পরের কথাগুলো বোধ হয় অপ্রয়োজনীয় বলেই কেউ কোনো কথা বললো না। মেয়েটি একটি ছোট্ট ঘরের মধ্যে ঢুকলো ; ঢুকতে বললো যেন আমাকে আলোর ইশারায়। টুলের ওপর নামিয়ে রাখলো লণ্ঠনটা। তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল। জর্দাদার মতো মানুষ না থাকলে এমন বাড়িও থাকতো না, আর জর্দাদার বাড়ির মতো বাড়ি না থাকলে এমন কালো করুণ ম্লান মুখের পরিচয় পেতাম না কোনো দিন। কিন্তু তার চেয়েও বড়

কথা, জর্দাদার বাড়িতে এমন একটি মেয়ে না থাকলে সীতা মল্লিকের মতো মেয়ের খোঁজ পাওয়া যেতো না।

লণ্ঠনটি টুলের ওপর রেখে মেয়েটি যখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, তখন বুঝতে পারলাম, ঘরে আমি একা দাঁড়িয়ে আছি। জর্দাদা আমার পিছন থেকে কখন সরে পড়েছেন। বুঝলাম, যতক্ষণ না জর্দাদা ফিরে আসছেন, সম্ভবত হাত-পা ধুয়ে, ততক্ষণ দাঁড়িয়েই থাকতে হবে। কারণ, ঘরের মেঝেটা পরিষ্কার তকতক করলেও মেঝের ওপরে বসে পড়া চলে না। অথচ বসবার মতো কোনো কিছুই খুঁজে পেলাম না ঘরে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘরটার তল্লাশ নিলাম। এক দিকের দেয়ালে দেখলাম ক্যালেন্ডার-কাটা মহারানী ভিক্টোরিয়ার ছবি, আর এক দিকের ফটোয় একটি বৃদ্ধের মৃতদেহ ঘিরে অনেকগুলি নারীপুরুষের মুখ। এক কোণের কুলুঙ্গিতে লক্ষ্মীর ঝাঁপি, আর-এক কোণে একরাশ বিছানা স্তূপ করা। শাড়ির পাড় জুড়ে বানানো আচ্ছাদন তোরঙ্গের ওপর।

জর্দাদার বাড়ির মতো বাড়ি না থাকলে এমন একখানা ঘরের পরিচয় পেতাম না কোনো দিন, আর এমন একখানা ঘরের পরিচয় না পেলে সীতা মল্লিকের মতো মেয়ের দেখা পেতাম কি করে!

ঘরখানার চতুর্দিকে চোখ বুলিয়ে আনতে দু মিনিটও হয়তো যায়নি, হঠাৎ কপাট খোলার শব্দ হলো। জর্দাদা গামছায় হাত-পা মুছতে মুছতে ঢুকলেন, আর তাঁর পিছনে আবার সেই শাড়ির বিদ্যুৎ। কিন্তু বেশ বুঝলাম, এ-শাড়ি আগের শাড়ি নয়, এ-বিদ্যুৎ হিরণ্য-উজ্জ্বল।

মেয়েটি ঘরে এলো একটি মাদুর হাতে নিয়ে, এক পাশে মাদুরটা বিছিয়ে দিলো, তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল। ইচ্ছে থাকলেও তার মুখের দিকে তাকাতে ভুলে গেলাম। দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে পড়লাম মাদুরের ওপর আর ভাবলাম সীতা মল্লিক নিশ্চয়ই আবার আসবে।

সীতা মল্লিক আসবে, এ-কথা অবশ্য ভাবিনি। কিন্তু তার মুখের দিকে না তাকিয়েও মনে হয়েছিলো, এমন মেয়ে এক জর্দাদার বাড়িতেই থাকতে পারে। আর এমন মেয়ে এক সীতা মল্লিকই হতে পারে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম, উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলাম, কিন্তু দেখা পেলাম না আর।

বাধ্য হয়েই জর্দাদার বাড়িতে আবার আসতে হলো।

দ্বিতীয় দিনে সীতাকে খুব স্পষ্ট চোখে দেখলাম। দুটো কাঁসার গ্লাসে করে চা দিয়ে গেল ও, থালায় মুড়ি আর লঙ্কা। চোখ তুলে সেদিনই আমি প্রথম দেখলাম। দেখলাম অদ্ভুত সুন্দর একখানি মুখের করুণিমা। অথচ সারা দেহে যৌবনজোয়ার। চোখের তারা হরিণের চোখের মতো কালো, শিশুর মতো কৌতুকে উচ্ছল। কিন্তু কোথায় যেন ব্যথাতুর।

জর্দাদা বললেন, এই সীতা। বললেন সীতা চলে যাবার পর।

বললাম, নামটা যেন মুখের ওপরই লেখা রয়েছে! কে হয় আপনার?

—সীতা মল্লিক। কাকা বলে আমাকে, হয় না কেউ।

ব্যস্। চুপচাপ। আর কোনো কথা বললেন না জর্দাদা। আর আমার মনে হলো কোনো কথা বলার প্রয়োজনও নেই।

কিন্তু সীতার সঙ্গে কথা বলবার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠলাম আমি। মনে হলো, সীতার মতো মেয়ের পরিচয় না পেলে, সীতার মতো মেয়েকে না দেখলে জীবন ব্যর্থ হতে পারে, আর সীতার মতো মেয়ের দেখা পেয়েও কথা বলতে না পেলে জীবন দুঃসহ হয়ে ওঠে।

সুতরাং জর্দাদার বাড়িতে ঘন ঘন আসতে শুরু করলাম আমি। আর এই ঘন ঘন আসার ফলে সীতার সঙ্গে খানিকটা ঘনিষ্ঠও হয়ে উঠলাম। বুঝলাম, সীতাকে না দেখে যেমন আমি অধৈর্য হয়ে উঠি, তেমনি সীতাও।

জর্দাদার বাড়িতে ছিলো মান্ধাতা আমলের একখানা পুরোনো গ্রামোফোন। আমি পিন কিনে আনতাম, আর নতুন রেকর্ড। সীতাও রবিবারের দিন শুনতো।

জর্দাদাকে বলতাম কখনো-সখনো।—সত্যি, মেয়েটিকে আমার বেশ লাগে।

—মায়া হয়। জর্দাদা বলতেন। কিন্তু আর কিছু বলতেন না।

সীতা খুব ভালো উল বুনতে পারতো। উল কিনে আনতাম আমি কখনো-সখনো।

উল কেনার পয়সাটা যে কত চেষ্টায় বাঁচাতে হতো তা জানতো না সীতা। আমার জন্যে একটা নতুন সোয়েটার বোনাতেই ওর আনন্দ।

জর্দাদাকে বলতাম, সত্যি, সীতার মতো এমন তাড়াতাড়ি উল বুনতে দেখিনি কাউকে।

—কোনো গুণই তো কাজে লাগলো না। দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন জর্দাদা।

কিন্তু আর কিছুই বলতেন না।

কিছু বলতেন না, কিছু বুঝতেনও না জর্দাদা। কিন্তু জর্দাদার ছোট বোন মালতী, যে প্রথম দিন কপাট খুলে লণ্ঠন দেখিয়ে এসেছিলো ঘর অবধি, সে বুঝতো সবই, বলতো। অবশ্য জর্দাদার অনুপস্থিতিতে।

মালতী মুখ ফুটে যত না বলতো তার চেয়ে হাসতো বেশী, আর ওর হাসি এমন অনেক কথা বলতো, যে কথা মুখ ফুটে বলা চলে না। কোনো-এক রবিবারে হয়তো বিশেষ কোনো কাজে আটকে পড়ে গেলাম, সকালে কিংবা দুপুরে, আর শুনলাম জর্দাদা বাজারে বেরিয়ে গেছেন অথবা থিয়েটারে, দেখতে নয়, রিহার্সালে এবং আমাকে অপেক্ষা করতে বলে গেছেন। অপেক্ষা করার তাগিদটা যত না জর্দাদার তার চেয়ে ঢের বেশী আমার, যত না আমার তার চেয়ে ঢের বেশী সীতা মল্লিকের মতো মেয়ের, আর যত না সীতার, তার চেয়ে অনেক বেশী তাগিদ মনে হতো মালতীর।

হাসিতে শরীরটাকে দোপাটির ঝাড় বানিয়ে, কৌতুকহিল্লোলে রজনীগন্ধা, মালতী এসে মাদুর বিছিয়ে বসতে বলতো। পাতা ওলটাবার জন্যে এনে দিতো বইপত্র, সারাক্ষণ পাশের ঘরে ঠুং-ঠাং আওয়াজ করে সান্ত্বনা জানাতো, বসুন, চা হচ্ছে। কিন্তু একবারও আসতো না এই সময়টায়, কারণ এ-সময় ছিলো সীতা মল্লিকের সময়।

সীতা আসতো, নেহাত যেন কাজের আহ্বানে, ঘরের এদিকে-ওদিকে কি যেন খুঁজতো, ঝিনুক নয়তো চিরুনি, কিছু একটা খুঁজতেই এসেছে যেন, তারপর বিছানার স্তূপগুলো খোঁজাখুঁজি করতো, শাড়ির পাড় দিয়ে বানানো ট্রাঙ্কের ঢাকাটা খুলতো আর লাগাতো এবং হঠাৎ একসময় একটা কোনো কথা বলে ফেলতো আমার উদ্দেশে। সারা ঘরখানা তন্নতন্ন করে সীতা কি খুঁজছিলো তা জানতে বাকি থাকে না আমার, বুঝতে পারি, কথা খুঁজে পাওয়া কত শক্ত ওর পক্ষে। দয়ার শরীর আমার, বিশেষ করে সীতার জন্যে আমার করুণার সীমা নেই। আমি তাই কোনো-কোনো দিন নিজেই কথা ধরিয়ে দিতাম, আর কখনো বা এমব্রয়ডারি-করা এক টুকরো কাপড় এনে সীতা দেখাতো আমাকে, বলতো, কেমন হয়েছে বলুন। আবার কখনো হয়তো সাদা এক টুকরো কাপড় আর পেন্সিল এনে বলতো, একটা কিছু ডিজাইন এঁকে দিন, এমব্রয়ডারির ডিজাইন নেই আমার কাছে। পেন্সিল আর কাপড় নিয়ে শুরু হতো আমার কসরত। শেষ অবধি কিছুই আঁকা হতো না, অর্থাৎ যা আঁকা হতো তা আর সুতো খরচ করে নকশা করার যোগ্য নয়। তাই কাপড়টা চেয়ে আনতাম আমি, বলতাম, 'বাড়িতে বসে বসে আঁকবো ভালো করে এবং কাল জর্দাদাকে দিয়ে দেবো আপিসে।' শুধু আমি কেন, সীতাও জানতো শেষ অবধি আঁকা হবে না, তবু অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা চলতো, হিজিবিজি পেন্সিলের দাগ পড়তো কাপড়ের ওপর।

আমার বাড়ির পাশেই থাকতো একজন আর্টিস্ট বন্ধু, কালীঘাট পার্কের ওপারে সতীশ মুখুজ্যে সড়কে। তাকে না পেলে ঢাকুরিয়ার লেভেল ক্রসিং পর্যন্ত চলে যেতাম, প্রহ্লাদ কেবিনের দোতলায়। যেদিন ভাগ্য অপ্রসন্ন, দুজনই নিখোঁজ, সেদিন যেতে হতো ডি জে কীমারে চাকরি-করা অন্য এক আর্টিস্ট বন্ধুর কাছে। শেষ অবধি যেমন করে হোক ডিজাইনটা আঁকিয়ে এনে নিজের বলে চালিয়ে দিতাম সীতা মল্লিকের কাছে।

তা সত্ত্বেও সীতার সামনেই যে আধ ঘণ্টা ধরে কসরত চলতো, কসরত চালাতাম, আর শেষ অবধি কিছুই আঁকা হবে না জেনেও যে সীতা জিদ ধরতো ওর সামনেই আঁকতে হবে, তার কারণ, এ ছাড়া আমাদের পরস্পরের পাশাপাশি বসার, কাছাকাছি কথা বলার, হঠাৎ হেসে উঠে পরস্পরকে ছোঁয়াছুঁয়ির আর কোনো পথ ছিলো না। ইচ্ছে করলেই পথ করে নেওয়া যেতো, কিন্তু পথ করে নেওয়ার দিকে মন যায়নি কোনো দিন।

আমার কাছে সীতা যে মালতী নয়, এ কথা যেমন প্রকাশ করতাম না কোনোভাবে, তেমনি আমি আর জর্দাদা দুজনে ভিন্ন ব্যক্তি, সীতার হাবভাব ব্যবহার তা স্বীকার করতো না।

তবু আমি মনে মনে ঠিকই বুঝতাম সীতা মল্লিক আমার চোখে সীতাই, মালতী নয়। আর, ওর চোখ প্রকাশ না করলেও, মন নিশ্চয় বুঝিয়ে দিতো ওর চোখকে যে আমি জর্দাদা নই।

আর একজন বুঝিয়ে দিতো আমাদের সম্পর্ক। যতটা না কথায়, হাসিতে তার চেয়ে অনেক বেশী। গ্রামোফোন রেকর্ড লাগাবার সময় মালতী একেবারে গাঁ ঘেঁষে বসতো আমার, আর আড়চোখে দুষ্টু-দুষ্টু হাসতো। বুঝতে পারতাম ও কেন এত গা ঘেঁষে বসতে চায়। অর্থাৎ ও এত কাছাকাছি না বসলে, সীতা কাছে আসতে পারে না, মালতীর গা ঘেঁষে বসার ফলে সীতার সঙ্গে হাত ছোঁয়াছুঁয়িটা নির্লজ্জ দেখায় না।

তারপর মালতী হঠাৎ একসময় উঠে সামনে গিয়ে বসতো, আর সীতার কাঁধ যেখানে আমার বাহুমূল স্পর্শ করেছে সেদিকে স্থির চোখে তাকিয়ে বলতো, 'সীতাদি, সরে বোসো না একটু।' সীতা শুনতো, মালতীর মুখের হাসিতে বুঝতো এ সাবধানি শুধুই দুষ্টুমিতে ভরা, তবু এই স্পষ্ট কথার লজ্জায় সীতার পিঠ বেঁকে যেতো ধনুকের মতো, মাথা এসে ঠেকতে চাইতো মাটিতে।

এমনিভাবে দিন কাটছিলো, কিন্তু তারপর এমন দিন এলো তখন আর দিন কাটতে চায় না। অনেক ভাবলাম, অনেক দিন ধরে ভাবলাম, কিন্তু কূলকিনারা পেলাম না খুঁজে।

শেষে জর্দাদাকে বললাম, সীতার বিয়ে দেবেন না জর্দাদা?

জর্দাদা চমকে চোখ তুললেন। তারপর চোখ ছলছল করলো জর্দাদার, দীর্ঘশ্বাসে ম্লান হলেন।

—কপালপোড়া মেয়ে। দীর্ঘশ্বাসের স্বরে বললেন জর্দাদা।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার জর্দাদা! যদি আপত্তি না থাকে—

জর্দাদা বললেন, কি আর আপত্তি থাকবে! ওর জীবন শেষ করেই এসেছে ও আমার কাছে। বেচারী!

বললাম, সে কি? সীতা বিধবা?

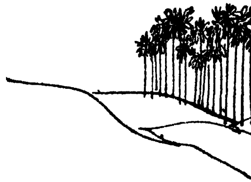
—না রে ভাই। আবার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন জর্দাদা। বললেন, তার চেয়েও বেশী। মেয়েটার কথা ভাবলে বড় কষ্ট হয়, বিধবা হলেও তো খানিকটা শান্তি পায় হতভাগী।

আমি অপেক্ষা করলাম। ভাবলাম, সীতার করুণ ইতিহাসের কিছুটা অন্তত বলবেন জর্দাদা। কিন্তু জর্দাদা কিছুই বললেন না। বললেন, 'থাক। কি হবে ওসব শুনে? শুধু ব্যথা পাবে, দুঃখ হবে ওর জন্যে।' বলে চুপ করে রইলেন।

চুপ করে রইলেন এবং আর কোনো দিন কোনো কথা উল্লেখ করলেন না সীতার সম্বন্ধে। আমিও আর সীতাকে চিনতে পারলাম না, জানতে পারলাম না সীতা মল্লিকের মতো মেয়ের মুখে এমন করুণ বিষণ্ণ ছায়া পড়ে কেন? আর অমন ব্যথা-থমথম সজল চোখে কেনই বা মদির মুগ্ধ দৃষ্টির ঝলসানি দেখা যায় আমার উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে।

শুধু এইটুকুই জানলাম, জর্দাদার বাড়ির মতো বাড়ি এই কোলকাতা শহরেই থাকতে পারে, যে বাড়িতে সীতা মল্লিকের মতো মেয়ের খোঁজ পাওয়া যায়, যে মেয়ের দু চোখে শুধুই জল, কিন্তু তবু মনে সবুজ পাতা ধরতে চায়। আর কি আশ্চর্য, জর্দাদার বাড়ির মতো বাড়ি না দেখলে মালতীর মতো মেয়ের খোঁজ পাওয়া যায় না, আর মালতীর মতো মেয়ের খোঁজ না পেলে জানা যায় না সীতা মল্লিকের মতো মেয়ে থাকতে পারে, আর সীতার মতো মেয়েকে দু চোখ মেলে না দেখলে মনে হয় কিছুই যেন দেখা হলো না এ-পৃথিবীর, আর দু চোখ ভরে দেখার পর সীতার মতো মেয়ের সঙ্গে দু-এক টুকরো কথা না বললে মনে হয় কথার নেই প্রয়োজন, আর কথা বলতে পেয়েও কথার মতো কথা বলতে না পেলে মনে হয় জীবনই দুঃসহ।

[১৩৫৮



রক্তবীজ

নীলিমা মনে মনে ভেবেছিলো চাকরিটা নিশ্চিত হয়ে যাবে। এর আগেও দু-চার দিন এসে দেখা করে গিয়েছিলো ও ছোটসাহেবের সঙ্গে, আভাসে ইঙ্গিতে এটুকু স্পষ্ট করেই জানিয়েছিলো মিস্টার ব্যানার্জি যে, ভ্যাকান্সি যদি হয় আর নীলিমা যদি ইণ্টারভিউ পায় তা হলে চাকরিটা তারই জন্যে তোলা থাকবে। এমন কি, এর আগের সপ্তাহে যখন নীলিমা রুটিনমাফিক মনে পড়াতে এসেছিলো, তখনো ব্যানার্জি বলেছিলো, বেশী দেরি নেই আর, বড়সাহেব মিস্টার গাঙ্গুলী স্বয়ং চেষ্টা করছেন একটা ভ্যাকান্সি তৈরি করবার জন্যে।

কিন্তু কোত্থেকে কি হয়ে গেল! পাঁচ মিনিট আগেও নীলিমা ভাবতে পারেনি, যে চাকরির জন্যে মাসের পর মাস রোদে পুড়ে জলে ভিজে এর-ওর তাঁবেদারি করে বেড়িয়েছে ও, কাউকে ঠাণ্ডা কথায়, কাউকে মিষ্টি হাসিতে আর কখনো বা অনুনয়ে আবদারে মন ভুলিয়ে যে চাকরি পাবার স্বপ্ন দেখেছে ও এতদিন, তারই অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটারটা ও এমনভাবে ছিঁড়ে কুচি-কুচি করে ফেলে দেবে!

যথারীতি সাজগোজ করে কাঁধে ফুটফুটে সাদা চামড়ার ব্যাগ ঝুলিয়ে ও যখন বড়সাহেব মিস্টার গাঙ্গুলীকে নমস্কার করলো, তখন এতটুকু হাত কাঁপেনি ওর, কার্পেট-বিছানো মেঝে পার হয়ে বড়সাহেবের টেবিল অবধি হেঁটে যেতে পা টলেনি একবারও, বেশ সপ্রতিভভাবেই সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলো ও, 'বসতে পারি?' জিগ্যেস করেছিলো মোলায়েম গলায়, আর গাঙ্গুলীসাহেবের 'নিশ্চয়, নিশ্চয়, বসুন আপনি বসুন, মাফ করবেন, কাজের তাড়ায় ভুলেই গিয়েছিলাম' ধরনের উচ্ছ্বাসমুখর ভদ্রতায় ও একটুও বিগলিত না হয়ে প্রত্যেকটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়েছিলো।

তারপর গাঙ্গুলীসাহেব জিগ্যেস করেছিলেন, তা হলে কবে থেকে আপনি জয়েন করতে পারবেন?

নীলিমা হেসে বলেছিলো, যদি বলেন তো আজ থেকেই।

—না, না। আপনাকে তৈরী হয়ে নেবার জন্যে কিছু সময় দিতে হবে তো। আপনি বরং নেক্সট উইক থেকে...

—বেশ তো, তাই আসবো। নীলিমা খুশীমুখেই জানিয়েছিলো।

—কিন্তু আপনার টার্মস্‌গুলো বোধ হয় ঠিক জানেন না। মানে, পোস্টটা আমাকে হেড আপিসে লিখে নতুন করে ক্রিয়েট করতে হলো কিনা, তাই এখন মাইনেটা একটু কম।

নীলিমা বিনীত হবার চেষ্টা করেছিলো—অভাবের সংসারে তবু তো কিছুটা কষ্ট কমাতে পারবো, মাইনে যা হোক্‌।

গাঙ্গুলী তা সত্ত্বেও মুখ কাঁচুমাচু করে বলেছিলো, না, মানে এখন অবিশ্যি পঁচাত্তর টাকা দিচ্ছে, তবে দু-এক মাসের মধ্যেই যাতে অন্তত এক শো হয় তার চেষ্টা আমি করবো। তা ছাড়া আপনার দাদা আমার বন্ধু ছিলেন, তিনি আজ নেই বলেই তো আর সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়নি।

—তার পরিচয় তো আপনি দিয়েছেন। এত ঘোরাঘুরি করে তো দেখলাম, আজকের দিনে চাকরি দেওয়া সহজ নয়। আপনি আমার জন্যে যথেষ্ট করেছেন।

কথা কেড়ে নিয়ে গাঙ্গুলী বলেছিলো, সেই কথাই বলছি। এখন এই মাইনেতে ঢুকলে দু মাসের মধ্যেই একটা লিফ্‌ট্‌ হয়ে যাবে। আর তা ছাড়া আমেরিকান কোম্পানীর আপিস, খেয়াল-খুশি মাফিক মাইনে বাড়ায় ওরা।

—আমার এখন পঁচাত্তর টাকা হলেই যথেষ্ট, না বাড়ালেও ক্ষতি নেই। গাঙ্গুলীকে এত

বেশী লজ্জিত হতে দেখে নীলিমা বলতে বাধ্য হয়েছিলো।

আর গাঙ্গুলী অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা নীলিমার হাতে দিয়ে বলেছিলো, এটা আর পোস্টে পাঠিয়ে কি হবে, ডাকের গোলমালে হারিয়ে যেতে পারে। তা হলে নেক্সট উইক থেকেই। কেমন?

কাগজটা হাতে নিয়ে নমস্কার করে উঠে দাঁড়িয়েছিলো নীলিমা। —আচ্ছা, নমস্কার। আসি তবে।

—হ্যাঁ। নেক্সট উইক থেকে। সোমবারই জয়েন করছেন তা হলে? বেশ। তারপর গাঙ্গুলীও উঠে দাঁড়িয়েছিলো, বলেছিলো, পঁচাত্তর থেকে এক শো করে দেবো বলছি, পাঁচ শোও হয়ে যেতে পারে, কি বলেন? বলে হেসে উঠেছিলো।

বিস্মিত সস্মিত চোখে ফিরে তাকিয়েছিলো নীলিমা।

—বুঝলেন না? যেমন ব্যাপার-স্যাপার দেখছি, আরেকটা যুদ্ধ তো লাগলো বলে, এবার যুদ্ধটা লাগলেই দেখবেন আমাদের সকলেরই বরাত খুলে যাবে। আমেরিকান কোম্পানী, বুঝলেন না, পঁচাত্তর থেকে পাঁচ শো হয়ে যাবে দু দিনে। হো-হো করে প্রাণ খুলে হেসে ওঠে গাঙ্গুলী, আর পরমুহূর্তেই নীলিমার চোখে চোখ পড়তেই হাসি মিলিয়ে যায় তার মুখ থেকে।

দুর্বোধ্য বিস্ময়ে কিছুক্ষণ গাঙ্গুলীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে নীলিমা, আর ক্রমশ ওর চোখের তারায় যেন একরাশ বিরক্তি, ঘৃণা, ক্রোধ ধীরে ধীরে এসে জমা হয়। পিছনে পিছনে, ওর চোখের নরম পাপড়ির আড়ালে আড়ালে দু ফোঁটা অশ্রুও হয়তো!

একদৃষ্টে বহুক্ষণ গাঙ্গুলীর মুখের দিকে ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে নীলিমা, তারপর খুব ধীর-সুস্থির হাতে আস্তে আস্তে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা একবার ভাঁজ করে, ছিঁড়ে ফেলে, আবার ভাঁজ করে, ছিঁড়ে টুকরো করে ফেলে।

তারপর ঠাণ্ডা গলায় বলে, মাফ করবেন আমাকে, এ চাকরি আমি নিতে পারবো না। বলেই দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এসে রাস্তায় নেমে পড়ে। যুদ্ধ, যুদ্ধ—একটা শব্দ বারবার ওর কানের চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। যা ভুলে যেতে চায়, বা মুছে ফেলতে চায়, বারংবার তারই মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। আশ্চর্য!

স্বামী ওষুধ পাবে না, পথ্যি পাবে না। মণ্টুর ছ' বছর বয়েস হলো, এখনো ইস্কুলে ভরতি করা গেল না। রুনির জন্যে নতুন একটা ফ্রক কেনা দরকার, উপায় নেই। দেওর হয়তো ফি দিতে পারবে না পরীক্ষার, আর ধারধোর করে ফি যদি বা জোটে তো সাত মাসের কলেজের বাকি মাইনেটা মেটাতে পারবে না। তা হোক্।

চাকরিটা না নিয়ে ও ভালোই করেছে, ভাবতে ভাবতে বাসায় ফিরলো নীলিমা। বাসাই বটে। ট্রাম-লাইন থেকে পুরো পঁচিশ মিনিট ধরে এ-গলি ও-গলি করে ঊনবিংশ শতাব্দীর স্মৃতিমুখর একটি বিরাট পুরোনো পচা ধসা প্রাসাদের দেয়ালে কাঁধ ঘষে ঘষে সরু একটা জলো গলি পার হয়ে ঘুঁটে-গোবরের নোংরা দুর্গন্ধ সহ্য করে দুটো পরিবারের অন্দর ডিঙিয়ে তবে ওদের ছোট্ট বাসা। এর চেয়ে বস্তির ঘরও হয়তো ভালো ছিলো। ভাড়াও হয়তো কম হতো। কিন্তু যে পথেই পা ফেলতে গেছে নীলিমা সেখানেই একটা বড় হরফের 'কিন্তু' এসে নাক ঢুকিয়েছে। সত্যি, উপকার পাবার মতো, সাহায্য পাবার মতো লোক আজ খুব কমই আছে নীলিমার, তবু এখনো তো পুরোনো দিনের অনেকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়, আত্মীয়-স্বজনদের কেউ এখনো তো হঠাৎ এসে হাজির হয়, খোঁজখবর নেয়। তাই বস্তিতে উঠে যাওয়ার কথা ভাবতেই পারে না নীলিমা। তার চেয়ে...

জুতো-জোড়া খুলে সযত্নে কাগজের বাক্সটায় ভরে কুলুঙ্গিতে তুলে রাখলে নীলিমা, ব্যাগটা ভরলে ভাঙা ট্রাঙ্কের ভেতর, শাড়ি আর ব্লাউজ বদলে, সে দুটো ভাঁজ করে বিছানার বালিশের তলায় রাখলে—তিন মাস আগের ইস্ত্রির পালিশটা যাতে নষ্ট না হয়। ইতিমধ্যেই স্বামীর সঙ্গে দু-একবার দৃষ্টি-বিনিময় হলো নীলিমার, রুগ্ন অসহায় দুটো চোখ কি একটা প্রশ্ন করতে যেন ভয় পাচ্ছে।

—নাঃ, হলো না। ওরা অন্য লোক নিয়েছে। একটু হাসবার চেষ্টা করে স্বামীর পায়ের কাছে এসে বসলো নীলিমা।

মৃন্ময় ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাসে আরো ম্লান হয়ে গেল। বালিশে ভর দিয়ে উঠে বসতে চেষ্টা করলো, পারলো না। পায়ের কাছ থেকে এগিয়ে এলো নীলিমা, মৃন্ময়ের মাথায় হাত রাখলে। সত্যি, এ রোগ-পাণ্ডুর ব্যথা-কাতর মুখের দিকে তাকিয়ে আর কত দিন কাটাতে হবে ওকে? ক্রমশই যে বিছানার সঙ্গে মিলিয়ে যাচ্ছে মৃন্ময়! যাবেই তো। তিন মাস হয়ে গেল, আর তো এক্স-রে নেওয়া হলো না, ডাকা হলো না ডাক্তারকে। ডাক্তারকে খবর দিলে সে আসতো ঠিকই, ফি চাওয়া দূরের কথা, নিজের থেকেই বলতো, টাকা দিতে হবে না। কিন্তু সে তো মৃন্ময়কে বাঁচাবার জন্যে আসতো না, আসতো মৃন্ময়ের আয়ু কমিয়ে দেবার জন্যে। অন্য ডাক্তার ডাকার কথাও ভেবেছে নীলিমা, ফি-এর টাকাও যোগাড় করেছে, কিন্তু—কিন্তু ডাক্তার আর এক্স-রে তো রোগ সারাতে পারে না! রোগ সারাবার ওষুধের দাম কোথায় পাবে ও, এ রোগের পথ্যিই বা জুটবে কোত্থেকে!

মৃন্ময় অনেকক্ষণ চুপ করে পড়ে থেকে হঠাৎ বললে, সানুর তো এমনিই পরীক্ষা দেওয়া হবে না, ও-ই একটা চাকরির চেষ্টা করুক না?

নীলিমা হাসলো।—ঠাকুরপো চাকরি করবে? পনেরো বছরের একটা ছেলেকে কে চাকরি দেবে? আর আমিই যখন পাচ্ছি না, ও পাবে কি করে?

পাশের ঘরে পড়ছিলো সানু, ওদের কথা শুনে বই বন্ধ করেছিলো। এবার উঠে এলো সে। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

নীলিমা হেসে হালকা হবার চেষ্টা করলে।—কি ঠাকুরপো! পরীক্ষার ফি? মন দিয়ে পড়ো ভাই, সময়ে ঠিক যোগাড় করে দেবো।

—না বউদি, পরীক্ষা এবার আর দেবো না। দিলে ফেল করবো। তার চেয়ে টাকাটা নষ্ট না করে আমি বরং একটা ট্যুইশনি নিই। বিজন বলছিলো, ওর এক ভাই ক্লাস থ্রিতে পড়ে...

নীলিমা ধমক দেয়, খুব হয়েছে, তুমি এখন পড়তে যাও তো। পরীক্ষা দিয়ে যা করতে হয় কোরো।

সানু মাথা হেঁট করে সরে যায়, আবার বই নিয়ে বসে।

মৃন্ময় বলে, ও বেচারীকে বকলে কেন? সত্যিই তো, ও যদি কিছু রোজগার করতে পারে।

—হ্যাঁ, রোজগার করবে ঠাকুরপো! আজ দশটা টাকা পেলেই সব সমস্যা মিটবে, নয়? তারপর? ওর ভবিষ্যৎটা ভাবছো না কেন? আর, আমরাও তো ওর মুখ চেয়েই আছি। ভবিষ্যতে ও-ই হয়তো আমাদের সুদিন আনবে।

—ভবিষ্যৎ! বিষন্ন হাসি হাসলে মৃন্ময়।—সত্যি, ভবিষ্যৎ ছাড়া আর গতি কি, কে-ই বা চাকরি দিচ্ছে ওকে! নাঃ, আবার যুদ্ধ-টুদ্ধ না লাগলে আর...

কথা শেষ করতে পারলো না মৃন্ময়। নীলিমা চিৎকার করে উঠলো হঠাৎ, চুপ করো, চুপ করো তুমি।

চমকে উঠলো মৃন্ময়। অর্থহীন ভাসা-ভাসা দু চোখ মেলে ব্যথাহত দৃষ্টিতে তাকালো ও নীলিমার দিকে। দেখলে নীলিমার চোখে আক্রোশের আগুন।—চুপ করো, চুপ করো তুমি। ও কথা কোনো দিন তুলো না তুমি, কোনো দিন না। চিৎকার করে ধমক দিয়ে উঠলো নীলিমা। তারপর মৃন্ময়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে লজ্জায় বিস্ময়ে কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেছে মৃন্ময়, অসহায় শক্তিহীন দু চোখের কোণ বেয়ে অভিমানের অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

লজ্জায় দুঃখে নীলিমার মুখ সাদা হয়ে গেল। ছি ছি! এ কি করলো সে। কত দিন, কত বছর কেটে গেছে এই দারিদ্র্যের মধ্যে, এমনি ব্যর্থতার মধ্যে, কই, কোনো দিন তো ধৈর্য হারায়নি ও? এমন কি গাঙ্গুলীর কথা শুনে ও যখন এমনি আক্রোশে ফেটে পড়েছিলো ভেতরে ভেতরে, তখনো তো বাইরে কোনো চাঞ্চল্য কোনো অধৈর্য দেখায়নি ও? অনেক শান্ত স্বরে জবাব দিয়েছিলো, অনেক ধীর হাতে ফেলে দিয়েছিলো কাগজটা।

অথচ।

আস্তে আস্তে মৃন্ময়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে নীলিমা, মৃন্ময়ের কপালে ঠোঁট ছোঁয়ালে, তারপর হাসবার চেষ্টা করে বললে, রাগ করলে? লক্ষ্মীটি, শোনো, রাগ কোরো না,

চোখ তোলো, তাকাও আমার দিকে, তাকাও তুমি। সত্যি, সারা দিন রোদে রোদে ঘুরে মাথার ঠিক ছিলো না আমার। রাগ করোনি। বলো, রাগ করোনি তুমি?

মৃন্ময় হাসলো।—না, না, রাগ করিনি। ওঠো, মুখের কাছে মুখ এনো না, ছিঃ!

নীলিমা আবদার ধরলে, না, উঠবো না আমি।

—ছিঃ, সরাও, মুখ সরাও। শোনো, মণ্টু রুনির কথাটা ভাবো, ওদের তো বাঁচাতে হবে, ওদের...

নীলিমা জবাব দিলে না, নিঃশব্দে মৃন্ময়ের সারা মুখের ওপর ওর ঠাণ্ডা নরম হাতটা বুলিয়ে দিলে, চোখের জল মুছিয়ে দিলে শাড়ির আঁচলে।

—ঠাকুরপো! মণ্টু আর রুনি ভাত খেয়েছে? তুমি—তুমি খেয়েছো তো? হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় নীলিমা জিগ্যেস করলো।

সানু ঘাড় নাড়লে—আমি আর মণ্টু খেয়েছি বউদি! পোস্তর তরকারিটা যা ফাস্ট ক্লাস হয়েছিলো, মণ্টু আর আমি চেটেপুটে খেয়ে নিয়েছি। হাসতে হাসতে সানু বললে।

নীলিমাও হাসলো।—আমার জন্যে আর রাখোনি নাকি?

—ভাত আছে। পোস্তর তরকারি কিন্তু নেই। আমি কি করবো, মণ্টু যে খেয়ে নিলো।

—বেশ করেছে। আমার ক্ষিদেও নেই। রুনি খেয়েছে, না রাগ করে বেরিয়ে গেছে?

সানু হেসে বললে, না বউদি, ও তো বাসী ভাত খায় না।

—ও! দীর্ঘশ্বাস লুকোলো নীলিমা। বললে, দেখো তো ঠাকুরপো, কোথায় আছে রুনি, ডেকে নিয়ে এসো।

কিছুক্ষণ পরেই রুনিকে টানতে টানতে নিয়ে এলো সানু।

নীলিমা বললে, কি, খাবি না? আয়, খাবি আয়।

—খেয়েছি তো আমি! অভিদাদের বাড়িতে খেয়েছি আমি।

নীলিমা আহত বোধ করলে। অভিদা! সামনের তিনতলা নতুন বাড়িটা ওদের। কিন্তু ওদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় রাখতেও ভয় হয় নীলিমার, ঘৃণা হয়। রুনি আর মণ্টুকে কতবার তাই নিষেধ করেছে নীলিমা, বলেছে, ওরা বড়লোক, ওদের সঙ্গে ভাব রাখা তোমাদের সাজে না।

তবু রুনির মুখে অভিদা আর অভিদা। ঐটুকু বাচ্চা মেয়ে, ও হয়তো অতশত বোঝে না, তফাতটা ভাবে শুধু বাড়ির চেহারায়।

নীলিমা শান্ত স্বরে বললে, তুমি আবার ওদের বাড়ি গিয়েছিলে?

—বাঃ রে, অভিদা যে ডেকে নিয়ে গেল। মাসীমা যে খেতে দিলো আমায়, তাই তো খেলাম।

—না। ওদের বাড়ি যাবে না তুমি, যাবে না কোনো দিন ওদের বাড়িতে। ওরা বড়লোক, আমরা গরিব। ওরা আমাদের ঘেন্না করে, তা জানো?

রুনি চুপ করে রইলো, কোনো কথা বললে না। তারপর হঠাৎ নীলিমাকে জড়িয়ে ধরে বললে, জানো মা! অভিদা বলেছে ওরাও নাকি আমাদের মতো গরিব ছিলো। যুদ্ধের সময় ব্যবসা করে বড়লোক হয়েছে।

না, নীলিমা রাগবে না আর। চটবে না কারো কথায়। কোনো কথা না বলে থালায় ভাত বাড়তে শুরু করলে নীলিমা।

রুনু ডাকলে, মা!

—কি?

—অভিদা বলছিলো, আবার নাকি যুদ্ধ লাগবে। তখন নাকি চেষ্টা করলে আমরাও বড়লোক হতে পারবো।

চমকে চোখ তুলে তাকালে নীলিমা রুনির মুখের দিকে। না, অধৈর্য হবে না নীলিমা, আক্রোশে ফেটে পড়বে না। রুনির মুখের দিকে তাকিয়ে দুঃখের হাসি হাসবার চেষ্টা করলে নীলিমা ; সে-হাসি হাসি নয়, হাসির বিদ্রূপ।

সমস্ত দিন, সমস্ত সন্ধ্যা নীলিমার সারা মন গভীর এক অবসাদ, দুঃসহ বিষাদের ভারে নুয়ে রইলো। আশ্চর্য! যে কথা ভুলে যেতে চায় নীলিমা, যে বিষাক্ত দিনগুলোকে বিস্মৃতির সমুদ্রে ডুবিয়ে দিতে চায় বারবার, পৃথিবীসুদ্ধ সকলেই যেন সেই দৃশ্যগুলোই ওর চোখের সামনে তুলে ধরে, ওর কানের কাছে বারবার একই কান্নার গান বাজায়। সমস্ত কাজের ফাঁকে নীলিমার উদাস ব্যথা কেবলই চমকে ওঠে।

পাশের ছোট্ট ঘরটিতে ওদের বিছানা পেড়ে দেয় নীলিমা, রুনিকে ঘুম থেকে তুলে খাইয়ে দেয়। রান্না ভালো হয়েছে কি না জিগ্যেস করে সানুকে, মণ্টুকে আদর করে ঘুম পাড়ায়, জলের গ্লাস রেখে আসে সানুর মাথার কাছে, মশারি টাঙাবার দাঁড়টা রুনি কোথা নিয়ে গেছে খোঁজাখুঁজি করে। জানালার শিকে, আলনার আঁকশিতে, টেবিলের পায়ায় আর দেয়ালের পেরেকে দড়ি বেঁধে মশারি টাঙিয়ে বিছানার চতুর্দিকে ভালো করে গুঁজে দেয় ধারগুলো, তারপর গরম তেল নিয়ে এসে মৃন্ময়ের বুকে মালিশ করে দিতে দিতে কোন্ ফাঁকে আবার কথাগুলো ওর মনের চারপাশে ভিড় করে আসে।

কত সুখের সংসারেই না ও মানুষ হয়েছিলো! ঐশ্বর্য না থাক, সে সংসারে শান্তি ছিলো, সুখ ছিলো।

দোতলার ফ্ল্যাটে ছোট্ট একটি পরিবার। নীলিমা, নীলিমার মা-বাবা, দাদা সুধাকান্ত আর বউদি, নীলিমার ছোট একটি ভাই শুভকান্ত আর বিধবা দিদি।

ভালো চাকরি করতেন নীলিমার বাবা, বেশ সচ্ছলভাবেই কাটছিলো ওদের দিনগুলো। সংসারে ছিলো শান্তি আর শৃঙ্খলা।

এমনি সময় যুদ্ধের বিষাক্ত নিশ্বাস কলকাতার বাতাস ভারি করে তুললো। এতদিন শুধু দিনে দিনে জিনিসের দাম বাড়ার মধ্যেই যুদ্ধের পরিচয় মিলছিলো। আর খবরের কাগজের পাতায় আলাপে-আলোচনায়। তবু সে যুদ্ধ ছিলো অনেক দূরে, তার অভিশাপ যতখানি, ভুল-চোখ বলতো, আশীর্বাদও ততটাই। ধানের দাম বাড়ছিলো, দেশের লোকের হাতে আসছিলো টাকা। চাকুরে মানুষদের বরাতও যেন খুলে গিয়েছিলো। বেকারদের চাকরি খুঁজতে হতো না, চাকরিই খুঁজে বের করতো বেকারদের। আর মাসে মাসে বেড়ে চলেছিলো এ-ও-তা পাঁচরকমের অ্যালাওয়েন্স।

হ্যাঁ, এরই ফাঁকে একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিলো বটে, দেশজোড়া কাঙালের ভিড় ভেঙে পড়েছিলো শহর কোলকাতার বুকে। কিন্তু নীলিমার দাদা তর্ক করেছে, বাবাও বলতেন, দুর্ভিক্ষ নাকি যুদ্ধের জন্যে নয়। দুর্ভিক্ষ ভগবানের মার, কেউ রুখতে পারে না, বাবার কাছে বহুবার শুনেছে নীলিমা। আর দাদা বলেছে, দেশের লোকের বোকামিই নাকি দুর্ভিক্ষের জন্যে দায়ী।

উঃ! সেসব দিনের কথা মনে পড়লেও ভয়ে শিউরে ওঠে নীলিমা। ফুটপাথে সারি সারি মড়া আর আধ-মরাদের রাশি, ডাস্টবিনের পাশ দিয়ে হাঁটা যায় না নোংরা পচা খাবারের দুর্গন্ধে, ডাস্টবিন ঘিরে কুকুরের দলের মতো ভুখাজানদের কামড়াকামড়ি, লঙ্গরখানার সামনে দেড় মাইল লম্বা কালো কালো কঙ্কালের লাইন, আর—আর সকাল থেকে মাঝরাত অবধি বাড়ির আনাচে-কানাচে ছেলে-বুড়ো মেয়ে-মরদদের 'ফ্যান দে মা' চিৎকারের বিরক্তি।

প্রথম প্রথম নীলিমাও বিরক্ত হতো। মনে হতো ঐ বুভুক্ষু মানুষগুলোই বুঝি বা সব শান্তি, সব স্বস্তি কেড়ে নিয়েছে।

তারপর মানুষগুলো মরে ভূত হয়ে দুর্ভিক্ষের ছায়া সরিয়ে দিলো শহরের বুক থেকে। আর সংগে সংগে যুদ্ধের ছায়া নয়, সশব্দ বিষ-নিশ্বাস শোনা গেল পথে পথে।

অতিকায় হিংস্র জন্তুর মতো বিরাট ট্রাক, লরী, ট্যাঙ্ক, এর্মাফবিয়া পিচের রাস্তা গুঁড়িয়ে ধুলো করে দিলো! কি ভয়ংকর তার গর্জন, দন্তিল চাকায় তার কি ভীষণ অট্টহাস!

নীলিমার মনে আছে। একদিন গভীর রাত্রিতে ঘুম-না-নামা চোখে জানালার গরাদ ধরে পথের দিকে তাকিয়ে ছিলো নীলিমা। আর ওর চোখের সামনে দিয়ে সৈন্যবোঝাই ট্রাকের পর ট্রাক, ট্যাঙ্কের পর ট্যাঙ্ক স্তব্ধ স্তম্ভিত পৃথিবীর বুক বেয়ে সশব্দে গড়িয়ে গিয়েছিলো। ব্ল্যাক-আউটের রাতে যুদ্ধযানের সারিকে আসুরিক ছায়ার স্রোত মনে হয়েছিলো। আর কি ভীষণ শব্দ তার, শান্ত নিস্তব্ধ রাতের বুকে কোন্ প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর উন্মত্ত হুঙ্কার

যেন! যেন বেদনায় গুমরে-ওঠা পৃথিবীর মর্মকান্নার গোঙানি!

কত ভয়ে ভয়ে, আশঙ্কায় উত্তেজনায় পথ চলতে হতো সেদিন। কপাটের এক পা বাইরে যেতেও বুক দুলে উঠতো নীলিমার। মার্কিন আর ব্রিটিশ শ্বেত সৈনিকদের পৈশাচিক উল্লাস, আর পিশাচকায় নিগ্রো সৈনিকের অশ্লীল অট্টহাস!

তারপর। বিদ্রুপের হাসি হাসে নীলিমা আজও, তার পরের ঘটনার কথা মনে পড়লেই। কিন্তু না, সুধাকান্তকে, দাদাকে ক্ষমা করেছে নীলিমা। দোষ দেয় না আজ তাকে। সত্যিই তো, নিজের অন্তর দিয়েই তো মানুষ অপরকে বিচার করে।

প্রতিদিন দাদার কাছে যুদ্ধের গল্প শুনতো নীলিমা। যুদ্ধেরই নয়, যোদ্ধারও। আব্রাহাম ম্যালিওনেস্কা আর স্টিফেন হিউজেস—দুজন মার্কিন সৈন্যের সঙ্গে আলাপ হয়েছিলো সুধাকান্তর। আর খাস আমেরিকান সৈনিকদের সঙ্গে আলাপ হওয়ার গর্বে মাটিতে পা পড়তো না সুধাকান্তর। কখনো আমেরিকা সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, কখনো বা ম্যালিও-নেস্কা আর হিউজেসের ঘরের খবর।

নীলিমা, নীলিমার বউদি, আর বিধবা দিদি অণিমা সকলেই হাসাহাসি করতো সুধা-কান্তকে নিয়ে। পেছনে পকেট-লাগানো গ্যাবার্ডিন না কি যেন, তারই প্যাণ্ট পরতে শুরু করেছে তখন সুধাকান্ত। হাঁটা-চলায় হাবে-ভাবে পুরোদস্তুর আমেরিকান হবার বাসনা যেন। আর দাঁতে চিবিয়ে নাকী সুরে কথায় কথায় ইংরেজী বলার সে কি ধুম! এ নিয়ে কতবার যে ওরা হাসাহাসি করেছে!

বউদি ঠাট্টা করে বলতো, আমার বরাত মন্দ ঠাকুরঝি। দাদাটিকে তোমার ধরে রাখতে বোধ হয় পারলুম না। অমন মার্কিনের পাশে কি আর আমার মতো লংক্লথকে মানায়, জর্জেট চাই।

দিদি অনেক ছোট বয়সে বিধবা হলে কি হবে, বেশ আমুদে, মুখে সব সময়েই হাসি-হাসি ভাব, কথায় রসিকতা। সে বলতো, তা মন্দ হয় না ভাই বউদি, দাদার একটা বিলিতী বউ এলে তবু মনের সুখে ইংরিজী বলতে পাবো দুটো। বাংলা বলতে বড় কষ্ট হয় আমাদের, কত ভেবে-চিন্তে কথা বলতে হয়।

নীলিমা যোগ দিতো এ রসিকতায়; বলতো, সত্যি দিদি, কি মজা বল তো আমেরিকান-দের, নাকী সুরে কথা বললেই ইংরেজী হয়ে বেরোয় কথাগুলো। ওরা এইসব বলাবলি করতো, আর হেসে লুটিয়ে পড়তো এ ওর গায়ে।

সুধাকান্ত কিন্তু চটে যেতো ওদের রসিকতায়। বলতো, এইজন্যেই তো এ-দেশের কিছু হলো না। কারো ভালো দেখবার চোখ তো নেই আমাদের। জানিস আমেরিকার কুলি-মজুররা কত রোজগার করে? বিড়লার সমান।

কখনো বলতো, আমেরিকা? স্বপ্নের দেশ, সোনার দেশ! ওখানে একটা লোকও বেকার নেই, কেউ হাজার টাকার নীচে মাইনে পায় না। কত পয়সা ওদের, বিজনেসে অমন মাথা আর কারো নেই।

অণিমা হাসতো।—তা ঠিক বলেছিস দাদা, ঐ যে এগারো টাকা দিয়ে সিগারেট লাইটারটা কিনলি, তিন দিন গেল না। অমন জোচ্চুরী মাথা অন্য জাতের সত্যি নেই।

সুধাকান্ত রেগে যেতো।—যা জানিস না তা নিয়ে মাথা ঘামাস না, ওরা তিন দিনের বেশী কোনো জিনিস ব্যবহার করে নাকি? সিনেমায় দেখবি, ওরা কাগজের গ্লাসে জল খায়, আর জল খেয়েই গ্লাসটা ফেলে দেয়।

নীলিমার বউদি হেসে গড়িয়ে পড়তো এ কথায়। বলতো, দেখো না, ওর বিয়ের সময় যে মাটির গ্লাসে লোকজন খাওয়ানো হয়েছিলো, সেগুলো তুলে রেখেছে নীলা ঠাকুরঝি নিজের বিয়ের জন্যে।

ঠাট্টা বুঝতে পেরে চুপ করে যেতো সুধাকান্ত। বলতো, যা-ই বলো তোমরা, ম্যালিও-নেস্কার মতো লোক হয় না। কি অমায়িক, কি বিনয়ী, আমাদের দেশের প্রাণ খুলে গুণগান করতে কিন্তু আর কাউকে দেখিনি। ও অবশ্য আসলে লিথুয়ানিয়ার লোক, ওর ঠাকুর্দার বাবা পালিয়েছিলো আমেরিকায়, তখন থেকেই ওরা আমেরিকান হয়ে গেছে। ওর বাড়ির সব ফটো দেখালো আমাকে, ওর বোন নাকি এবার সাঁতারে ফার্স্ট হয়েছে তাদের ক্লাবে।

নীলিমা ঠোঁট টিপে-টিপে হাসি চাপতো।—তা হলে তাকেই বিয়ে করো না দাদা! বেশ মেমসাহেব বউদি হবে আমাদের।

বিরক্ত হয়ে উঠে যেতো সুধাকান্ত, প্রতিজ্ঞা করতো ওদের কাছে আর কোনো দিন ওর আমেরিকান বন্ধুদের কথা তুলবে না।

কিন্তু না বলেও থাকতে পারতো না সুধাকান্ত। কোনো দিন হঠাৎ এসে বলতো, জানিস অণি, হিউজেসের ফিয়াঁসে, ফিয়াঁসে মানে বাগ্‌দত্তা, ভাবী বউ আর কি, তার জন্যে ইণ্ডিয়ান গানের রেকর্ড পাঠালে হিউজেস। আমিও রবীন্দ্র-সংগীতের একটা রেকর্ড উপহার পাঠালাম।

তখন না বললেও, সুধাকান্তর অনুপস্থিতিতে ওরা তিনজন হাসাহাসি করেছে।—কি ভাষা ভাই, ফিয়াঁসে। দাদা যা-ই বলুক, আসল মানে কি জানিস তো দিদি? প্রেম করতে গিয়ে ফেঁসে গেলেই ফিয়াঁসে হয়।

তারপর।—আজ ধুতি পাঞ্জাবি আর চাদর পরে গিয়েছিলাম, ম্যালিওনেস্কা বললে, এমন কুল ড্রেস ও কোনো দেশে দেখেনি।

কোনো দিন।—রবীন্দ্র-সংগীতের রেকর্ড বাজিয়ে হিউজেসের ফিয়াঁসে লিখেছে, ইণ্ডিয়ান গানের মতো সাবলাইম গান ও কখনো শোনেনি।

কখনো।—ম্যালিওনেস্কা বলছিলো, বাঙালী মেয়েদের মতো পোশাক-পরিচ্ছদে এমন চমৎকার টেস্ট কোনো জাতের নেই।

এবং শেষে একদিন।—ম্যালিওনেস্কা আর হিউজেস একদিন আমাদের বাড়িতে ইণ্ডিয়ান ডিশ খেতে চায়, ইনভাইট করবো? বলবি মাকে? বাবা রাগ করবেন না তো?

সুধাকান্তর কাছে শুনে শুনে লোক দুটোর সম্বন্ধে ওদের সকলেরই মনে একটা ঔৎসুক্য জেগেছিলো। কেমন চেহারা ওদের, কিভাবে কথাবার্তা বলে, হাবভাবই বা কেমন। সত্যিই তো, কপাটের আড়াল থেকেই নয় দেখবে। যেচে নেমন্তন্ন চেয়েছে যখন, না বলা কি উচিত?

মা-র কাছে কথা পাড়লে সুধাকান্ত।—জানো মা, ম্যালিওনেস্কার গলায় একটা ফিতেতে বাঁধা লকেট আছে, ওর মায়ের ছবি। ও রোজ ঘুমোবার আগে ওর মা-র প্যারালিসিস সারিয়ে দেবার জন্যে যেসাসের কাছে প্রার্থনা করে।

মা বললেন, আহা বেচারী! মা-রও কি কষ্ট বল তো বাবা! ছেলে জীবন হাতে নিয়ে যুদ্ধ করতে এসেছে, এদিকে মায়ের হয়তো চোখে ঘুম নেই।

মা-ই বাবাকে বললেন, আহা, সুধার বন্ধু, হলোই বা সাহেব। মা-বাপ, ভাই-বোন, ঘর-সংসার ছেড়ে এত দূরে যুদ্ধ করতে এসেছে, দু-মুঠো ভাত খেতে চেয়েছে বন্ধুর বাড়িতে, তাতে তোমার আপত্তি কিসের?

শেষ অবধি তাই মত দিতে হলো।

আর হিউজেসের প্রথম আগমনের দিনটা বেশ স্পষ্ট মনে আছে নীলিমার। বিনয়ী লাজুক-লাজুক মুখ নিয়ে ম্যালিওনেস্কার পেছনে পেছনে ঘরে ঢুকলো ও, চৌকাঠে হোঁচট খেলো, কোথায় বসবে কিভাবে কথা বলবে, ভেবেই যেন সন্ত্রস্ত। নীলিমার বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেই চটি ছুঁয়ে প্রণাম করলে ম্যালিওনেস্কা আর হিউজেস, হেসে বললে, আপনার ছেলে ইণ্ডিয়ান কাস্টম সব শিখিয়ে দিয়েছে আমাদের।

মা আড়াল থেকে চোখ মুছলেন, আর ওরা তিন ননদ-বউদি মুখে আঁচল চেপে হেসে লুটিয়ে পড়লো।

তারপর সহজভাবেই আসা-যাওয়া শুরু হলো ওদের। নীলিমা দেখলে গায়ের রঙ ফরসা হলেও, মুখে ইংরেজী বললেও লোকগুলো ভয় করবার মতো নয়, অসুর নয়। খুব সহজ-ভাবেই পরিবারের সকলের সঙ্গেই কেমন করে যেন মিশে গেল ওরা, বন্ধু হয়ে গেল। নীলিমা, নীলিমার বউদি, এমন কি বিধবা দিদি অণিমাও ওদের সামনে চায়ের বাটি এগিয়ে দিতে সঙ্কোচ বোধ করলে না।

আর লোক দুটোর চোখেও তো কই কোনো দিন অভদ্র ইশারা ধরা পড়েনি?

আশ্চর্য!

সেদিনটার কথা ভোলেনি নীলিমা, ভুলবে না। কিন্তু, কিন্তু সেদিনের কথা মনে পড়লেই যেন ভয়ে শিউরে ওঠে ও। একবার মনে পড়লে সারা রাত ঘুম আসে না ওর চোখে। শরীরের

সমস্ত রক্ত যেন মুহূর্তের মধ্যে চঞ্চল হয়ে ওঠে। উষ্ণ আক্রোশে জ্বালা করে ওঠে চোখের কোণ দুটো।

ম্যালিওনেস্কা আর হিউজেসদের রেজিমেণ্ট পরের দিন ভোরেই নাকি বর্মার যুদ্ধ-প্রাঙ্গণে চলে যাবে।

বিষণ্ণ বিষাদী মুখে ম্যালিওনেস্কা শুকনো হাসি হাসবার চেষ্টা করলে। নীলিমাকে বললে, মিস্, হয়তো ফিরতে পারবো না আর। জীবনের মেয়াদ বোধ হয় শেষ হয়ে এসেছে।

হিউজেসের চোখও যেন ভিজে-ভিজে মনে হয়েছিলো। ও সুধাকান্তকে বলেছিলো, বন্ধু, এই ক্যামেরাটা তোমাকে উপহার দিলাম, তোমার একটা ছবি আমার বোনের কাছে পাঠিয়ে দিও এক মাসের মধ্যে কোনো চিঠি না পেলে। লিখে দিও মৃত্যুর আগে অনেকগুলো শান্তির আর সুখের দিন হিউজেস যার সঙ্গে কাটিয়েছিলো এ তারই ফটো।

মা আশীর্বাদের ইচ্ছায় হাত তুলে বললেন, ষাট, ষাট, যুদ্ধে যাচ্ছো, যুদ্ধ হয়ে গেলেই ফিরে আসবে; আমি আশীর্বাদ করছি। তোমার নিজের মা বেঁচে থাকলে যেমনভাবে আশীর্বাদ করতো, আমি তেমনি করেই আশীর্বাদ করছি বাবা, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি, তোমরা দুজনেই তোমাদের বাঙালী মায়ের কাছে সুস্থ শরীরে ফিরে আসবে।

ওদের মঙ্গলকামনায় পাঁচ সিকে পয়সা লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে মা তুলে রেখেছিলেন মানত করে।

নীলিমার বিধবা দিদি অণিমা এতদিন হাসি-ঠাট্টা করেছে, কত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ। কিন্তু সেদিন সেই শুচিশুভ্র থান কাপড়ের বৈধব্যবেশ সবটুকুই যেন ব্যথায় ম্লান হয়ে গিয়েছিলো। এতটুকু হাসি দেখা দেয়নি তার মুখে; একটা কথাও বলতে পারেনি অনেকক্ষণ। নীলিমার মনে আছে, দিদির চোখ বেয়ে দরদর করে জল গড়িয়ে পড়তে দেখেছিলো সেদিন। কাঁপা-কাঁপা হাতে নমস্কার জানিয়েছিলো, থরথর করে ঠোঁট জোড়াও কেঁপে উঠেছিলো তার, কথা বলতে গিয়ে।

গাঢ় গলায় বলেছিলো, তোমাদের ছোট বোন আমি, আমি বলছি তোমাদের কোনো বিপদ হবে না। সুস্থ শরীরে দেশে ফিরে যাবে তোমরা, মা কালী, রক্ষাকালী তোমাদের বাঁচাবেন। এই নাও, ভক্তি করে এই মাদুলি দুটো রেখে দাও, তোমাদের কোনো বিপদ হবে না।

ম্যালিওনেস্কা আর হিউজেস যখন বিদায় নিয়ে ফিরে গেল, নীলিমার স্পষ্ট মনে আছে, দুজনের চোখেই দেখেছিলো লুকানো অশ্রু।

—I wish she was my own mother, they were my own sisters.

চোখ ছলছল করে উঠেছিলো ওদের দুজনেরই, পরস্পরকে বলেছিলো, উনি যদি আমার নিজের মা হতেন, ওরা যদি আমার নিজের বোন হতো!

সে রাত্রে ঘুম আসেনি নীলিমার চোখে, বহুক্ষণ জানালার ধারে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ার আতঙ্কে ভীতত্রস্ত দুটি জীবনের কথা বারবার তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে।

তারপর। তারপর মধ্যরাত্রির নিস্তব্ধতাকে উপহাস করে অতিকায় জন্তুর মতো বিরাট একটি ট্রাক ছায়া-ছায়া অন্ধকার ভেদ করে, শব্দের হুঙ্কার তুলে এসে দাঁড়িয়েছে ওদের বাড়ির দরজায়। আর ট্রাক-বোঝাই একরাশ সৈন্যের কালো কালো প্রেতছায়া অট্টহাসে বাতাস কাঁপিয়ে তুলেছে। সুরামত্ত মাতালের দল; শ্বেত সৈনিক আর নিগ্রো সৈন্যের দল চিৎকার করে, অর্থহীন গানের কলি আউড়ে, হই-হল্লা করে লাফিয়ে নেমেছে ট্রাক থেকে।

হেডলাইটের ঝকমক আলোয় নীলিমা চিনতে পেরেছে। ম্যালিওনেস্কা আর হিউজেস কাঁধ ধরাধরি করে টলতে টলতে এগিয়ে এসে ওদের বাড়ির কপাট দেখিয়ে দিয়েছে দলবলকে। আর সৈন্যের দল কপাটের ওপর লাথির পর লাথি মেরেছে। কপাট ভেঙে পড়েছে সে আঘাতে।

ভয়ে, বিস্ময়ে, কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে নীলিমা, নীলিমার মা, বাবা, বউদি, দিদি—সবাই। পালাবার কথা, লুকোবার কথাও তখন ভুলে গেছে ওরা। যখন মনে হয়েছে পালানো উচিত, লুকোনো উচিত, তার আগেই মদের গন্ধে সারা ঘর ভরে গেছে। প্রেতের মতো অগুন্তি ছায়া-শরীর ওদের ঘিরে ফেলেছে তখন। বাবা আর দাদা ছুটে গেছে

বাধা দেবার জন্যে। ঐ দানব-শরীরের কাছে ওরা আর কতটুকু? বন্দুকের বাঁটের একটা ঘা কে যেন বসিয়ে দিয়েছে দাদার মাথায়, অজ্ঞান হয়ে ছিটকে পড়েছে দাদা। নিস্তব্ধ রাতের বুকে হঠাৎ একটা পিস্তলের গুলির শব্দ। চিৎকার করে যন্ত্রণায় কাতরাতে-কাতরাতে নিশ্চুপ হয়ে গেছেন নীলিমার বাবা। ছোট ভাই শুভকান্ত কেঁদে উঠেছে সশব্দে, ভয়ে নীলিমার পা জড়িয়ে ধরেছে।

তারপর, তারপর ম্যালিওনেস্কা এগিয়ে এসেছে টলতে টলতে। নীলিমার চোখের সামনে। একটা ক্ষুধার্ত পশুর মতো...

থপথপ করে এগিয়ে এসেছে হিউজেস, সে কি ভীষণ ভয়াল চোখ...

বউদির একটা কান্না-চিৎকার স্তব্ধ হয়ে গেছে হঠাৎ।

আর নীলিমা...কতক্ষণই বা ওর জ্ঞান ছিলো? তবু যতক্ষণ জ্ঞান ছিলো, নীলিমার শুধু মনে পড়ে, একটার পর একটা প্রেতের ছায়া এগিয়ে এসে গ্রাস করেছে।

একটা পুরো দিন অজ্ঞান হয়ে ছিলো নীলিমা। জ্ঞান হয়ে দেখলো ডাক্তার, পাড়া-পড়শীদের অনেকে ভিড় করে এসেছে। লজ্জায় চোখ বুজলে নীলিমা।

কিন্তু কত দিন আর চোখ বুজে থাকা যায়? পিস্তলের গুলিতে বাবা মারা গেলেন। মা আত্মহত্যা করলেন। বউদি অন্তঃসত্ত্বা ছিলো, আঘাতের ফলে এক মাস ধরে অসুখে ভুগে মারা গেল। বিধবা দিদি হঠাৎ হো-হো করে হেসে উঠলো একদিন, উনুন ধরাতে গিয়ে সারা গায়ে ছাই মাখতে শুরু করলে। তারপর কোন্ ফাঁকে কপাট খোলা পেয়ে কোথায় যে চলে গেল, খোঁজ মিললো না।

সুস্থ শরীরে শুধু বেঁচে রইলো নীলিমা, সুধাকান্ত আর শুভকান্ত। চুপচাপ, উদাস, উদ্‌ভ্রান্ত। কারো সঙ্গে একটা কথাও বলতো না সুধাকান্ত। এক মিনিটের জন্যেও বাইরে যেতো না। শুধু অন্যমনস্কভাবে বসে থাকতো সদা-সর্বদা। তারপর মাস দুয়েকের মধ্যে নীলিমার বিয়ের ব্যবস্থা করলো সুধা। আর বিয়ের পরদিনই খবর পাওয়া গেল একটা মিলিটারী ট্রাকে চাপা পড়ে সুধাকান্ত মারা গেছে। সে খবর শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলো নীলিমা। কোনো কথা বলেনি! আনন্দের আবেগ বুনে বাসর কাটায়নি ও, পর-পর এতগুলো মনভাঙা দুর্ঘটনা, এত বড় একটা ঝড় সহ্য করে কেউ সিঁথি-সিঁদুরের রোমাঞ্চ অনুভব করতে পারে? বিষণ্ণ ব্যথার মধ্যেই সেদিন ও নিজেকে সমর্পণ করেছিলো মৃন্ময়ের কাছে, মন্ত্রপাঠের সময় মৃন্ময়ের হাতের মধ্যে ওর হাতখানা কেঁপে উঠেছিলো বারবার। মৃন্ময় ভেবেছিলো, ভয়। ওর চোখের বেদনাশ্রু দেখে ভেবেছিলো, এ বুঝি শৈশবের স্মৃতিতে গড়া মায়ামুগ্ধ ঘর ছেড়ে অনির্দেশে পা দেওয়ার ব্যথায় সজল।

মৃন্ময় জানতো না।

নীলিমার চোখে জল বয়েছিলো একটি আকস্মিকতার অভিশাপকে স্মরণ করে, নীলিমার ভয়-ভীরু হাত কেঁপেছিলো গোপন আত্মগ্লানিতে, জীবনের লুকিয়ে-রাখা একটি আত্ম-ধিক্কারের অধ্যায়কে স্মরণ করে।

তার পরের দিন রাত্রেই সঠিক খবর এলো, নীলিমা যা আশঙ্কা করেছিলো তাই ঘটে গেছে। মিলিটারী ট্রাক চাপা পড়ে মারা গেছে সুধাকান্ত। কে যেন বললে, আজকাল হামেশাই তো হচ্ছে, একটু দেখে-শুনে না চললেই...

কেউ গালাগালি দিলে, মিলিটারীর উদ্দেশে, বিদেশী সৈনিকদের উদ্দেশে।

নীলিমার মন বললে অন্য কথা। দীর্ঘ কয়েকটি মাস প্রতি মুহূর্তে যে কারণে সশঙ্কিত থাকতো নীলিমা, সামান্য শব্দে চমকে চমকে উঠতো যে ভয়ে, একটা মিনিট সুধাকান্ত চোখের আড়াল হলে যে আশঙ্কায় বুক কেঁপে উঠতো ওর, তাই ঘটে গেল। নীলিমা বুঝতে পারলে, কেন এই দীর্ঘদিন ধরে একটিও অতিরিক্ত কথা না বলে, লোকালয় থেকে মুখ লুকিয়ে ঘরের কোণে নিঃসঙ্গ নিশ্চুপ দিনগুলো কাটিয়ে এসেছে সুধাকান্ত! কেন কর্তব্য শেষ করার পর একটা সম্পূর্ণ দিনও বেঁচে থাকবার সাধ জাগলো না সুধাকান্তর?

নিজেকে অত্যন্ত ভীরু, অত্যন্ত অপরাধী মনে হলো নীলিমার। যে লজ্জায়, যে গ্লানির অসহ্য জ্বালায় সকলেই পৃথিবী থেকে পালাবার পথ খুঁজলো, সেই গ্লানি, সে লজ্জা লুকিয়ে রেখে নতুন করে বাঁচবার এ কি দুঃসহ আশা তার!

তবু সব ক্লেদ ধুয়ে-মুছে গেল একদিন। মৃন্ময়ের আদরে সোহাগে মনে হলো, আকাশে এখনো চাঁদ ওঠে, মেঘ এখনো রামধনু আঁকে নতুন নতুন। অতীতের নোংরা কপাট চিরতরে বন্ধ করে দিয়ে আবার জীবন শুরু করতে চাইলো নীলিমা।

কিন্তু, যে পথেই হাঁটতে গেছে নীলিমা একটা মস্ত বড় 'কিন্তু' এসে পথ আগলে দাঁড়িয়েছে।

মৃন্ময়ের সেই আনন্দ-উচ্ছ্বাস-ভরা রঙিন পাখনা থেকে শিশিরের মতো তাকে ঝরে পড়তে হয়েছে এই নোংরা না-আলো না-বাতাস অন্ধ গলির দুর্গন্ধময় ছোট্ট ঘরখানিতে। অভাব, দারিদ্র্য, রোগ-শোক। প্রতিটি মুহূর্তে মৃত্যুর পথ চেয়ে অপেক্ষা করা। অসহায় দুঃখে মৃন্ময়ের চোখে-জল-ঝরানো কষ্টসহিষ্ণুতা, ক্লান্তিতে ভেঙে-পড়া শরীর নিয়ে রাত জেগে জেগে মৃন্ময়ের বুকে হাত বুলিয়ে স্বস্তি দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা।

ব্যর্থই।

ভোর হবার অনেক আগে, অন্ধকার ফিকে হওয়ার আগেই আবার কাশির দমকে-দমকে রক্ত উঠতে শুরু হলো। অসহ্য কষ্টে বুকে হাত চেপে বার কয়েক কাশে মৃন্ময়, আর তার পরই পিকদানিতে ফিনকি দিয়ে কালো কালো রক্ত পড়ে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে ভাবলে নীলিমা। কি করবে ও, কি করা উচিত?

তারপর ধীরে ধীরে পাশের ঘরে নিদ্রিত সানুকে ডেকে তুললে।

—ঠাকুরপো, ডাক্তারবাবুর কাছে যাও একবার, যেমন করে পারো হাতে-পায়ে ধরে নিয়ে এসো একবার।

দাদার মুখের দিকে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত আশঙ্কায় তাকিয়ে দেখলো সানু, তারপর ছুটে চলে গেল। বলে গেল, কিছু ভেবো না বউদি, আমি এক্ষুনি ডেকে আনছি।

মৃন্ময় শুধু বিষণ্ণ চোখে তাকালে নীলিমার দিকে, ইশারায় পাশে বসতে অনুরোধ জানালে।

তারপর ধীরে ধীরে বললে, মিথ্যে চেষ্টা নীলিমা, আমি বুঝতে পারছি।.

নীলিমা কি যেন একটা বলতে গেল, মৃন্ময় বাধা দিলো। বললে, শোনো, একটা কথা তোমাকে বলবো বলেও কোনো দিন বলতে পারিনি, একটা অপরাধ আমি স্বীকার করে যেতে চাই নীলিমা। জানি, সে অপরাধ তুমি ক্ষমা করতে পারবে না কোনো দিন, তবু আমি তো শান্তি পাবো।

নীলিমা বললে, চুপ করো লক্ষ্মীটি, চুপ করো তুমি। ডাক্তারবাবু এলেই তুমি সেরে উঠবে, আমি বলছি, তুমি সেরে উঠবে। এর আগেও তো কতবার এমন হয়েছে, কেন ভয় পাচ্ছো তুমি? কথা বোলো না, চুপ করে থাকো একটু।

মৃন্ময় হাসলে।—এর আগে তো কখনো মৃত্যুকে চোখের সামনে দেখতে পাইনি নীলিমা, বুঝতে পারিনি। এবার যে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি নীলিমা, বলতে দাও, একটা কথা আমাকে বলতে দাও।

নীলিমা চুপ করে রইলো, কোনো বাধা দিলো না, কোনো কথা বললে না। একদৃষ্টে শুধু তাকিয়ে রইলো, আর ওর দু চোখ বেয়ে দরদর করে জল গড়িয়ে পড়লো নিঃশব্দে।

—তোমার ওপর আমি...লজ্জায় আত্মগ্লানিতে সমস্ত মুখ যেন সাদা হয়ে গেল মৃন্ময়ের, বললে, আমি যে অপরাধ করেছি তার ক্ষমা নেই নীলিমা! আমি, আমি আমার অসুখ লুকিয়ে রেখে তোমাকে বিয়ে করেছিলাম।

বিস্ময়ে চমকে উঠলো নীলিমা, মৃন্ময়ের মুখের দিকে দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে তাকালো।

—হ্যাঁ নীলিমা! হঠাৎ একদিন কাশতে কাশতে কয়েক ফোঁটা রক্ত বেরুলো থুতুর সঙ্গে। ভয়ে শিউরে উঠলাম আমি, সমস্ত দিন, সমস্ত রাত মনে হলো, আমি যেন মৃত্যুর মুখো-মুখি দাঁড়িয়ে রয়েছি। মনকে বোঝাতে চাইলাম, হয়তো গলায় ঘা, নয়তো দাঁতের গোড়া থেকে পড়েছে। পরের দিন, তার পরের দিনও রক্ত পড়লো দু ফোঁটা করে, ভোরের দিকে। খাওয়া-দাওয়া ভালো করবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ডাক্তার দেখাতে সাহস পেলাম না।

সত্যিই যদি এ রোগ হয়ে থাকে, ডাক্তার হয়তো সারাতে পারে। কিন্তু অত টাকা কোথায় আমার? আর, আর সেরে যাবার পর কি বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন সকলে ফিরে নেবে আমাকে? কিন্তু তার চেয়েও বড় দুঃখ কি ছিলো জানো নীলিমা!

নীলিমা শুনছিলো ওর কথা, একমনে। হয়তো সব কথা ভালো করে বুঝতেও পারছিলো না। হঠাৎ ভেঙে পড়লো মৃন্ময়ের বুকের উপর।—আগে বলোনি কেন, বিয়ের পরই কেন বলোনি তুমি আমাকে? তা হলে এত দেরি হতো না, হয়তো সেরে উঠতে তুমি। আমি তো ছিলাম, আমি তো তোমাকে ছেড়ে যেতাম না? কেন বলোনি তুমি, কেন?

মৃন্ময় হাসলো। বললে, বুঝবে না নীলিমা, তুমি বুঝতে পারবে না। দিনে দিনে ওজন কমে যাচ্ছে দেখলাম, প্রতিদিন জ্বর হচ্ছে বুঝতে পারতাম। আর কেবল ভয় হতো। ভাবতাম, এমনিভাবে জীবনে কোনো ভালোবাসা না পেয়ে, কোনো মেয়ের স্পর্শ না পেয়ে, অনুতাপ অনুভব না করে মৃত্যু হওয়ার চেয়ে বড় ব্যর্থতা আর নেই। তাই অসুখ গোপন রেখে তোমাকে বিয়ে করলাম, আর বিয়ের পরও তোমার সঙ্গ পাবার জন্যে, তোমাকে হারাবার ভয়ে কোনো দিন বলতে সাহস পাইনি। আজ তোমাকে হারাবার ভয় নেই বলেই দূরে সরে থাকতে বলি, সেদিন পারতাম না।

নীলিমার চোখের জলে জামা ভিজে গেল মৃন্ময়ের। কান্নাচাপা গলায় নীলিমা বললে, ছি ছি, এমনি করে নিজের সর্বনাশ করে, ভেতরে ভেতরে এমনি করে রোগ বাড়িয়েছো তুমি?

মৃন্ময় হাসলে, ব্যথাহত হাসি। সেদিন রোগকে ভয় ছিলো না আমার, মৃত্যুকে ভয় ছিলো না। শুধু মনে হয়েছিলো, মৃত্যু যখন আসছেই, জীবনকে ভোগ করে নিই। মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে মানুষের সব ন্যায়-অন্যায় বোধ উড়ে যায় নীলিমা!

'মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে মানুষের সব ন্যায়-অন্যায় বোধ উড়ে যায় নীলিমা!' কথাটা আবার নতুন করে মনে পড়লো নীলিমার।

মৃন্ময় আবার কিছুটা সুস্থ হলো, ডাক্তার মত দিলো, হয়তো এ যাত্রাটা কোনোরকমে কেটে যাবে। খরচ করে ভালোভাবে চিকিৎসা করলে এখনো হয়তো বাঁচানো যেতে পারে মৃন্ময়কে। কিন্তু নীলিমার কানে এসব কথা পেঁছলো না। জানালার ধারে বসে বাইরের ছোট্ট এক ফালি আকাশের দিকে তাকিয়ে নীলিমা শুধু ভাবলে, 'মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে মানুষের সব ন্যায়-অন্যায় বোধ উড়ে যায়!'

মিথ্যে নয় তা হলে, অপরাধ ক্ষালনের মিথ্যা ভনিতা নয়! আব্রাহাম ম্যালিওনেস্কা আর স্টিফেন হিউজেস! দুজনের কথা মনে পড়লো নীলিমার। মনে পড়লো সেই চিঠির কথা।

বহু দিন আগে হঠাৎ বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে হাজির হয়েছিলো নীলিমা ওদের সেই পুরোনো ফ্ল্যাটে। নতুন বাসিন্দেদের বলেছিলো, ঘুরে ঘুরে বাড়িটা একবার দেখবো, এখানে আমরা ছিলাম কিনা একসময়।

গৃহকর্ত্রী তখন আদর-আপ্যায়ন করে বসিয়েছিলেন ওকে, এনে দিয়েছিলেন একখানা চিঠি।—এ চিঠি কি আপনাদের, অনেক দিন থেকে পড়ে আছে, বুঝতে পারিনি বলে খুলেছিলাম, কিছু মনে করবেন না।

চিঠিটা নিয়ে চলে এসেছিলো নীলিমা। দাদার চিঠি, সুধাকান্তর নাম—ঠিকানার ঘরে। কিন্তু কে লিখেছে এ চিঠি? উলটে-পালটে দেখেছিলো ও, যুদ্ধ ফ্রন্টের অগুন্তি সেন্সারের ছাপ, নম্বর, তার ওপর এখানকার ডাকঘরের সীলমোহর।

চিঠিটা পড়েছিলো নীলিমা। নাম সই ছিলো না, কিন্তু নীলিমা বুঝতে পেরেছিলো, এ চিঠি সেই দুটো অসুরের কোনো একজনের লেখা। ক্ষমা চেয়েছিলো সে সুধাকান্তর কাছে, লিখেছিলো, "বন্ধু, তুমি জানো না, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে বাধ্য হলে মানুষ কতখানি অমানুষ হয়ে যায়। আমাকে তোমরা হয়তো শয়তান ভাবো, কিন্তু আসল শয়তান এই যুদ্ধ। নিজেদের মনুষ্যত্ব আমরা এই ডেভিলের কাছে বিক্রি করে দিয়েছি, তাই আমরাও এক-একটি ক্ষুদে শয়তান হয়ে দাঁড়িয়েছি এই বিরাট শয়তানটার দাপটে। তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। সে রাত্রে প্রকৃতিস্থ হওয়ার পর, আর এই ওয়ার-ফ্রন্টেও কতবার ইচ্ছে হয়েছে সুইসাইড করে আমার অপরাধের গ্লানি মুছে ফেলি। কিন্তু পারিনি, আমি ভীতু, কাপুরুষ। জীবনকে আমি বড় বেশী করে ভালোবাসি। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এ

জীবনকে আরো বেশী করে ভালোবাসতে ইচ্ছে হয়। তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো। তোমার মায়ের আশীর্বাদ, তোমার সেই বিধবা দিদির প্রার্থনা যদি এতদিনে অভিশাপে পরিণত হয়ে না থাকে, তা হলে হয়তো সত্যিই দেশে ফিরে যেতে পারবো আমি জীবন নিয়ে। আজ রাত্রেই আমাদের জাহাজ ছাড়বে, দেশে ফিরে যাবো আমরা। আত্মহত্যা করার সাহস পাইনি আমি সত্যিই, কিন্তু দেশে ফিরে গিয়ে কোনো দিন এই বড় শয়তানটাকে জাগতে দেবো না আমি। ভেবে দেখো, হয়তো চেষ্টা করলে আমাকে ক্ষমা করতে পারবে তুমি, হয়তো পারবে না, কিন্তু যুদ্ধকে কোনো দিন ক্ষমা কোরো না ভাই।"

এ চিঠি পড়ে সেদিন ক্রোধে-আক্রোশে সারা শরীরে জ্বালা অনুভব করেছিলো নীলিমা, দাঁতে দাঁত চেপে এমনভাবে চিঠিটা ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে ফেলে দিয়েছিলো, যেন সেই পৈশাচিক মানুষ দুটোর শরীর ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে ফেলছে সে। অদ্ভুত এক আনন্দে, অসহ্য এক দুঃখে সারা রাত্রি তার চোখে ঘুম আসেনি সেদিন।

তারপর, দিনে দিনে সব বেদনা, সব আক্রোশ স্তিমিত হয়ে গিয়েছিলো। মন বলেছিলো—আমরাও এক-একটি ক্ষুদ্র শয়তান হয়ে দাঁড়িয়েছি এই বিরাট শয়তানটার দাপটে!

মনে পড়ছিলো—মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সব ন্যায়-অন্যায় বোধ উড়ে যায় নীলিমা!

মৃন্ময়ের পায়ের কাছে বসে দেয়ালে ঠেস দিয়ে একমনে ভাবছিলো নীলিমা, মনে পড়ছিলো...

এমন সময় হঠাৎ রুনি এসে দাঁড়ালো তার সামনে। চুপচাপ, চোখে চোখ পড়তেই কি যেন বলতে গিয়ে লজ্জায় চুপ করে গেল। তারপর অনেক চেষ্টা করেই যেন বললে, মা, অভিদার বড়দা এসেছেন, বড় ডাক্তার নিয়ে এসেছেন।

চমকে ধড়মড় করে উঠে পড়লো নীলিমা। দেখলো অভিজিৎ, অভিজিতের দাদা, আর বৃদ্ধ, কুব্জদেহ একটি দীর্ঘ শরীরের সৌম্য বিস্তৃত এক জোড়া চোখ। মুখে বার্ধক্যের হাসি!

নীলিমার মাথায় হাত দিয়ে বৃদ্ধ বললেন, ভয় কি মা, সব সেরে যাবে।

তারপর মৃন্ময়কে ভালো করে পরীক্ষা করে বললেন, এঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে মা, এখানে তো হবে না।

নীলিমা কেঁদে ওঠে।—না, না, হাসপাতালে না।

বৃদ্ধ হাসেন ধীরে ধীরে।—এ এক যুদ্ধ মা, এর নাম জীবনযুদ্ধ! মৃত্যুর সঙ্গে লড়তে হলেও তো অনেক সৈন্যসামন্ত গোলাবারুদ দরকার হয়। একা একা এখানে পারবে কেন?

—কিন্তু, কিন্তু অত টাকা তো আমার নেই? না, না, হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে না, আমার কাছ থেকে নিয়ে যেতে পাবেন না।

বৃদ্ধ ডাক্তার আবার নীলিমার মাথায় হাত রাখেন।—তুমিই বরং ওর কাছে চলো না মা, তুমিও আমাদেরই একজন হও না? আমরা সবাই তোমার স্বামীর জন্যে যুদ্ধ করবো, আর তুমিও, শুধু তোমার স্বামীর জন্যে নয়, সকলের জন্যে যুদ্ধ করবে। সেবা দিয়ে, সাহস দিয়ে আরো অনেককে সারিয়ে তুলবে তুমি।

উৎসাহে আনন্দে খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ডাক্তারের মুখের দিকে তাকায় নীলিমা।—পারবো, পারবো আমি? আমি যে কিছু জানি না।

সস্মিত হাসিতে মুখ ভরে যায় বৃদ্ধের। বলেন, যে একা একা এত বড় যুদ্ধ চালিয়ে এলো, সকলের সঙ্গে এক হয়ে সে লড়তে পারবে না? পারবে মা, পারবে।

নীলিমা তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে এর পর। ওর মন বললে, যুদ্ধকে আমি ভয় পাই না। যুদ্ধ চাই, আমিও যুদ্ধ চাই।

[১৩৫৮

জলরঙ

মুণ্ডা ধাওড়ার মেয়ে রূপমণিকে প্রথম যেদিন দেখেছিলাম, কপালকুণ্ডলার কথা মনে পড়েছিলো। আর ঝর্নাটা দূর থেকে মনে হয়েছিলো, শাল আর শালাই গাছে আড়াল-পড়া কোনো পার্বত্য মন্দিরের চূড়ায় রূপোর পাত মোড়া রয়েছে।

ঝর্নার জলস্রোত পাথরের গায়ে বাধা পেয়ে যেখান থেকে উছলে পড়ছে, শুধু সেই-টুকুই ভোরের সূর্যকিরণে চকচক করছিলো পালিশ-করা রূপোর গম্বুজের মতো, বাকী গতিপথটা ঢাকা পড়েছিলো শাল আর শালাই গাছের আড়ালে।

আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথের দু-ধারে সাজানো শালের সারিকে দূর থেকে মনে হয়েছিলো দীর্ঘাকৃতি ঝাউবন, গুঁড়ির কটিদেশ থেকে ফুলে উঠে শাখা-প্রশাখার রাশি শীর্ণ থেকে শীর্ণতর হতে হতে এমনই নিখুঁতভাবে চূড়ার বিন্দুতে গিয়ে মিলেছে।

হরীতকীর বন আর খয়ের গাছের ঝোপ এড়িয়ে ঐ শালবনের ফাঁকে ফাঁকে উঁচুনীচু অসমতল পথ বেয়ে পাহাড়ে উঠতে উঠতে যার সঙ্গে চোখাচোখি হলো, কে জানতো সেই মেয়েই মুণ্ডা ধাওড়ার মেয়ে রূপমণি।

চোখে চোখ পড়তেই ভীতত্রস্ত ভাব ফুটে উঠলো ওর মুখে। দ্বিতীয়বার অনুসন্ধানের দৃষ্টি ফেললো ও আমার মুখের ওপর, বুঝে নিলো আগন্তুক ফরেস্ট গার্ড নয়, কেড়ে নেবে না পাতার বোঝাটা, চড়চাপড় লাগাবে না, অরণ্য আইন ভাঙার জন্যে চাইবে না কোনো আরণ্যক ঘুষ। মুহূর্ত কয়েক মাত্র। তারপরই পাহাড়ী ঝর্নার স্রোতে হাত ডুবিয়ে এক আঁজলা জল খেয়ে নিলো ও, পাতার বোঝাটা তুলে নিলো মাথায়। আর কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে তরতর করে নেমে গেল দ্রুত পায়ে।

ও চলে যাওয়ার অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ কপালকুণ্ডলার কথা মনে পড়লো। মনে হলো, মুণ্ডা ধাওড়ায় এমন মেয়ে তো দেখিনি কখনো। আরণ্যক সৌন্দর্যের একটা বিশেষ রূপ আছে জানতাম, কিন্তু তা যে এমন নিখুঁত যৌবন নিয়ে দেখা দিতে পারে, ধারণা ছিলো না। কিংবা কে জানে হয়তো পরিবেশ ওকে অত সুন্দর করে তুলেছিলো।

কোলিয়ারির চাকরিতে সেটাই আমার প্রথম দিন। তখনো খাদ চিনিনি, টিপলার কাকে বলে জানতাম না, জলে-ডোবানো এক নম্বর খাদটা দেখে ভেবেছিলাম কোনো প্রাকৃতিক হ্রদ।

ঊর্ধ্বকর্মী আলাপ করিয়ে দিতেই বললাম, কাজ বুঝিয়ে দিন মিশিরজী।

মিশিরজী বললেন, কাজ পরে হবে, পাঁচ নম্বরটা দেখে আসবেন চলুন। আর প্রভান্স খাতা এগিয়ে দিয়ে বললে, তারও আগে সইটা করে যান, অ্যাকসিডেণ্টে মারা গেলে বউ তবু কিছু টাকা পাবে।

বললাম, ও বস্তুটি এখনো সংগ্রহ করে উঠতে পারিনি ভাই।

মিশিরজী হাসলেন, সংগ্রহ হলেই বা লাভ কি হতো। এখানে ম্যানেজার থেকে মুনশী সব ব্যাচেলার, বউ ছেলে ফেলে এসেছে দেশে।

প্রভান্স কিছু একটা ইঙ্গিত করলে, হ্যাঁ, সব ব্যাচেলার, সাণ্ডা সব।

—সাণ্ডা আবার কি দ্রব্য? বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করলাম।

ব্যাপার বিশেষ কিছুই নয়, বোঝালেন মিশিরজী। 'সাণ্ডি' শব্দটার অর্থ 'পুরুষ', তা থেকে 'সাণ্ডা পাল্লা'। সরকারী আইন হয়ে গেছে রাতের শিফ্‌টে মেয়ে রেজাদের কাজ করানো যাবে না। তাই যেসব কুলিদের মেয়ে 'জুড়ি' আছে তারা কাজ করে সকাল কিংবা বিকালের শিফ্‌টে। রাতপাল্লায় কাজ করতে হয় না-জুড়ি মজুরদের। অর্থাৎ সাণ্ডিদের।

শুনছিলাম মিশিরজীর কথাগুলো, আর ধীরে ধীরে হলেজের ট্রলি-লাইন ধরে মন্থর পায়ে খাদে নামছিলাম।

আঁকাবাঁকা বিরাট একটা ব্যর্থ দিঘি। যত দূর চোখ যায় শুধু শাল-শালাই, আমলকী আর মহুয়ার বন। তারও ওপারে পুবে পশ্চিমে একটি সুদীর্ঘ পাহাড়ের তরঙ্গ। আর এই শান্ত নিঃশব্দ অরণ্যের মাঝে বেনিয়া সিন্ডিকেটের লুব্ধ কণ্ঠের চিৎকার ফুটে উঠছে হাজারো শাবল আর গাঁইতির কোলাহলে।

ধাপে ধাপে পৃথিবী যেন নেমে এসেছে নরকের অন্ধকারে। মাটির স্তর নেমে এসেছে অনেকখানি, তারপর একটা সিঁড়ির ধাপের মতো পাথর। তারপর কয়লা বলে ভুল হবার মতো কালো পাথর। নরকের সিঁড়ি শেষ হয়েছে কালো কয়লার অন্ধকারে। কোথাও মাটি, কোথাও বা পাথরের প্লটে কাজ চলছে। মালকাটারি রেজা-কুলিদের কলগুঞ্জন ভেসে আসছে খাদের গভীর থেকে। মাথা তুলে আকাশের দিকেই যেন তাকাতে হলো। লিলিপুটের মতো অসংখ্য ক্ষুদে ক্ষুদে মেয়ে-পুরুষ। কুলিরা গাঁইতির পর গাঁইতি ফেলছে, ছন্দে বাঁধা ধীর পায়ে চলেছে সারি বাঁধা রেজাদের দল। খাড়াই পথ বেয়ে পিঁপড়ের সারির মতো চলেছে তারা, মাথায় পাথর-বোঝাই ঝুড়ি, পুরুষদের বাঁকের দু পাশে দড়ির ঝোড়া। খাদের এক পাশে মাটি পাথর ফেলে ফেলে নতুন একটা পাহাড় গড়ে তুলছে ওরা।

ভাবলাম, এই পাতাল-গভীরতায় যদি থাকে অরণ্যবাসী পুরুষের শক্তির স্বাক্ষর, তা হলে নতুন-গড়া পাহাড়টা সমর্থশরীর মেয়েদের স্বেদসাক্ষী। তন্ময় হয়ে সেদিকে তাকিয়ে দেখছিলাম। হঠাৎ সরে যেতে বললেন মিশিরজী।

দু জোড়া ট্রলি-লাইন নেমে গেছে খাদের গভীরে। ওপরের হলেজ থেকে একটা মোটা তার নেমে এসেছে বাঁ দিকের লাইনের মাঝখান দিয়ে, খাদ থেকে ফিরে গেছে তারটা ডান দিকের ট্রলি-লাইনের মাঝ বরাবর। রোপ-ওয়ের টানে একটার পর একটা কয়লা-বোঝাই বাকেট উঠে আসছে, খালি বাকেট নেমে চলেছে সারি বেঁধে।

মিশিরজী বললেন, সরে চলুন, ক্লিপ খুলে যায় তো হুড়মুড় করে এসে পড়বে ওগুলো, খুঁজে পাওয়া যাবে না আর আপনাকে।

সরে যেতে গিয়ে পা পিছলে গেল বালিতে, প্রভান্সকে ধরে সামলে নিলাম।

প্রভান্স হেসে বললে, আর ওদের দেখুন, কার্নিসে দাঁড়িয়ে পাথর কাটছে। এতটুকু বে-টাল হলেই...

—সান্ডা পাল্লার কুলিদের কথাটা ভাবুন একবার। সারা বছর রাতের পর রাত...একে এখানকার বরফ-জমা শীত, তার ওপর অন্ধকারে এমন বিপজ্জনক কাজ!

বললাম, অন্যায়। আইন মেয়ে রেজাদের যতটুকু বাঁচিয়েছে, না-জুড়ি কুলিদের মেরেছে তার চেয়ে বেশী।

প্রভান্স বললে, খাদে এখন আর রাত-পাল্লার ডিউটি দিতে হয় না বটে মেয়েদের, তবে বাবুদের বাংলোয় এখনো...

—রূপমণির মতো তেজী মেয়েই ফণা গুটিয়ে নিলো। আফসোস করলেন মিশিরজী।

বিস্মিত হয়ে বললাম, রূপমণি কে?

—পাঁচ নম্বর খাদে যে নেমেছে একবার, রূপমণি কে তা তাকে চিনিয়ে দিতে হয় না। গায়ের রঙ দেখলেই মালুম হবে, আর চোখ। লোকে বলে এক আর্মেনিয়ান ঠিকাদার ওর বাপ, আর মতান্তরে এ কোলিয়ারির প্রথম ম্যানেজার ম্যাকাকিং সাহেবের ছেলে জোনাথন। বলে হাসলো প্রভান্স।

চিনিয়ে দিতে হয় না বলেই এপাশে ওপাশে তাকিয়ে খুঁজছিলাম রূপমণিকে। নতুন লোকটিকে বিস্মিত চোখে পরীক্ষা করে নিচ্ছিলো ওরা, কেউ মাথার ঝুড়ি, কাঁধের বাঁক, কেউ বা শাবল গাঁইতি ফেলে রেখে ভাবছিলো নতুন বাবুটি কে বটেক।

মাঝে মাঝে থামছিলেন মিশিরজী, পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন।—নতুন হাজ্‌রিবাবু তোদের। বড় কড়া লোক, দেরি হলেই আধা-হাজ্‌রি!

—আও, দিনসকাল খাটবে আউর আধা-হাজ্‌রি করবে! ফোঁস করে উঠলো একটি মেয়েলী কণ্ঠ।

বহুক্ষণ থেকেই চোখে পড়ছিলো ও। রীতিবিরুদ্ধ একটি খাড়াই পথ বেয়ে ঝুড়ি মাথায় ওপরে উঠছিলো আর নেমে আসছিলো ও অনেক উঁচু থেকে। এরই ফাঁকে কখন অন্যমনস্ক হয়েছি আর ওর লিলিপুট চেহারা কাছে পৌঁছে গেছে, স্বাভাবিক রূপ নিয়েছে।

পাথরের গা থেকে জল পড়ছে চুঁয়ে চুঁয়ে, আর একটা জায়গায় ছোট একটি গর্ত কেটে জল ধরে রেখেছে ওরা। রেজা কুলিরা মাঝে মাঝে তৃষ্ণা দূর করে আসছে সেই জলে। কালি-ঝুলি মাখা এই মেয়েটিকেও একটু আগে এক আঁজলা জল খেয়ে আসতে দেখেছি। ওর হাতের সেই ভঙ্গিমাটুকু ভালো লেগেছিলো, মনে হয়েছিলো এমন ভালো লাগার ছবি হয়তো বা আগেও দেখেছি।

কিন্তু চিনতে পারিনি প্রথমটা। আঁচলে মুখ মুছে নিলো ও, তারপর ঘাড়ের পিছনে দু হাত রেখে কনুই দুটো পাখনার মতো নাড়তে নাড়তে বললে, জঙ্গলে ক্যানে গেলেন তুই ?

বললাম, তুই কেন গিয়েছিলি ? পাতা কেটে এনেছিস, বলে দেবো গার্ডকে।

খিলখিল করে হেসে উঠলো ও, গলায় হারের মতো দোলানো টোকেন-চেনটা নাড়াচাড়া করতে করতে বললে, খাদানে সব আগে চিনা হয়েছিস আমার, টিকিট ভুলে আলি হাজ্‌রি কাটবিন না বাবু।

মিশিরজী হেসে উঠলেন হো-হো করে। বললেন, বাংলা শিখে নিয়েছে রূপমণি, দেখে-ছেন ?

—তুই রূপমণি ? অজ্ঞাতেই মুখে বিস্ময় ফুটে উঠলো।

এক হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে কয়লা কাটছিলো একটা কুলি, এক চোখ ফিরে তাকিয়ে সে হাসলো।—রূপমণি নয়, খাদানের মণি। ধাওড়ার সেরা ছুঁড়ী।

—আধাটা পরী, আধা লুবুড়ী। বললে বছর বারো বয়সের একটা বাচ্চা মেয়ে, মাথার খালি ঝুড়িটা ছুঁড়ে দিয়ে।

অর্থাৎ অর্ধেক পরী, আর অর্ধেক ডাইনী।

বলেই ছুটে পালালো মেয়েটা, রূপমণি তাড়া করে গেল তাকে।

ফিরে আসার পথে মিশিরজী বললেন, রূপমণিকে আপনি ভুলতে পারবেন না কোনো দিন। খাদের রানী ও।

রূপমণি তো দূরের কথা, তার টোকেন নম্বর যে দু শো সাঁইত্রিশ তাও ভুল হতো না।

প্রতিদিনই তো আর দেখা হতো না ওর সঙ্গে, তবু এক্সপ্যান্ডেড মেটালের জাল-জানালার ওপাশে শুধু হাতখানা দেখেই চিনতে পারতাম।

—সর্দারের নাম ?

—গোপী সিং।

—তোর নাম ?

—রূপমণি।

—চাকতির নম্বর ?

—দু শো সাঁইত্রিশ।

এ রীতি আর সকলের ক্ষেত্রে ঘটতো। কিন্তু এমন সওয়াল-জবাবের হাজ্‌রি রূপমণিকে শুধু প্রথম দিনই করতে হয়েছিলো।

সাত দিন অন্তর কাজের শিফ্‌ট বদলে যেতো ওর। আমারও তাই। মাসে সাত দিন, বড় জোর পনেরো দিন দেখা হতো ওর সঙ্গে।

খাদের মুখে ছোট্ট একখানা গুমটি ঘর, অ্যাটেনডেন্স ক্লার্কের আপিস। এক কোণে একটা জলের কুঁজো, জাল-জানালার সামনে তেপায়া একটা ভাঙা টেবিলে একরাশ বড় বড় হাজ্‌রি খাতা, আর জেলেকনাইট-জেলেটিনের একটা প্যাকিং বাক্স হাজ্‌রেবাবুর কেদারা-কুর্সির কাজ করতো।

কুলিকামিনরা হাসাহাসি করে বলতো, বাস্‌কাটো হাটায় দে বাবু, উটা মেজাজ গরম

করে দেয় তোর।

দুপুর বারোটায় আর সন্ধ্যে ছ'টায় যখন 'আওয়াজ' হয়, পাথরের গায়ে বোরিং করে ডিনামাইট দিয়ে প্লটের পর প্লট পাথর ফাটানো হয়, তখন এই কাঠের বাক্স থেকে সাদা সাদা পাউডার ছড়িয়ে দিতে দেখেছে ওরা। যার ছোঁয়া লেগে পাথরই গরম হয়ে ফেটে গুঁড়ো হয়ে যায়, তার বাক্সে বসলে বাবুর মেজাজ গরম হয়ে উঠবে এ আর বেশী কথা কি!

রূপমণি কিন্তু ওসবের পরোয়া করতো না। সামনে এসে দাঁড়াতো, চোখাচোখি হলেই একমুখ হেসে মুখে আঁচল চাপা দিতো। কিছুই জিজ্ঞেস করতাম না। গোপী সিং সর্দারের পাতাটা খুলে হাজুরি করে নিতাম ওর। কিন্তু পিছনে ভিড় জমে গেলেও সরতে চাইতো না ও, আজেবাজে কথার পর কথা বলে যেতো।

খাদে নামতাম যেদিন কোনো বিশেষ কাজে, সেদিনও মাথার ঝুড়ি ফেলে রেখে কাছে এসে দাঁড়াতো ও। দেখাতো হাটে কি রঙিন কাচের জলচুড়ি কিনেছে, কিংবা কানে গড়িয়েছে কোন রুপোর ঝিকিচিল্পি।

—কেমন হয়েছে বল্ বাবু, দাম বেশী নিয়েছে?

কোনো দিন হয়তো বলতাম, বাঃ! বেশ মানিয়েছে, খোঁপায় একটা ফিতে বাঁধ এবার।

—আও! ফোঁস করে উঠতো রূপমণি। বলতো, মাথায় ফিঁতান বান্ধে ঐ কিস্তান মেয়েরা। মরিয়াম, সেবাস্তিনা, মেরী—ওরা ফিঁতান বান্ধে।

ওর গলায় সাতনরী পুঁতির হারটা দেখিয়ে বলতাম, তবে এটাকে বিদেয় দিয়ে একটা রুপোর হাঁসুলি বানা।

—উহুঁ। ও বাপ্‌লার পর আমার ঠিগিয়া আদমিটা দেবেক।

—বিয়ে কবে তোর? ঠিগিয়াটাই বা কে?

—পরিয়াগকে দেখিস নাই আপুনি? সান্ডা পাল্লার মালকাটারি বটেক।

শনিচারীর হাটেও মাঝে মাঝে দেখা হতো ওর সঙ্গে। কখনো এটা-ওটা কিনতে আসতো, কখনো তরিতরকারি, সিমসিমারি, অর্থাৎ মুরগি আর ডিম বেচতে আসতো। দুটো ডিম হাতে দিয়ে বলতো, লিয়ে যা বাবু, দাম দিতে হবেক নাই। কোনো দিন বা বলতো, তিন সের বিলাইতি আছে বেচে দে বাবু, বিলাসপুরীরা দেখলে লুঠ করে লেবেক। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বেচে দিতাম টমাটোগুলো, পয়সা আদায় করে দিতাম ঠিক ঠিক।

এমনিভাবে ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছিলো রূপমণি। বুঝতাম, আর পাঁচজনের চোখে লাগছে, আড়ালে কানাঘুষো করছে অনেকে। ভাবতাম, এবার যদি এসে গায়ে-পড়া ভাব দেখায় কিংবা অমন ভঙ্গিমায় শরীর দুলিয়ে কথা বলে, কড়া করে ধমক দেবো। কিন্তু কাছে এলে আপনা থেকেই কেমন যেন মনটা নরম হয়ে যেতো।

হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, অনুরোধ থেকে দাবিতে এসে পৌঁছেছে। কিন্তু দাবিটাও উপেক্ষা করতে পারলাম না।

বললে, দুটো টাকা দে বাবু।

—কেন? আজ তো শনিবার, হপ্তার মজুরি পেয়েছিস তো?

জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু জিজ্ঞেস করার আগে পকেটে হাত ঢুকলো।

ঠোঁট বাঁকালে রূপমণি।

—মজুরি? ছ' টাকা পেলেন আমি, সাত টাকা পাঞ্জাবীর সুদ লাগবেক।

চুপ করে থাকতে দেখে রূপমণি বললে, দে বাবু, দে, দশ পয়সা সুদ দোবো তোকে হপ্তায়।

—পাঞ্জাবীরা কত নেয়? জিজ্ঞেস করলাম।

—হপ্তায় টাকায় দু আনা লেবে। তিন টাকা লিয়েছিলি পরবের সময়, চল্লিশ টাকা দিয়া হইছে। সুদ বাকী পড়ে সাত টাকা সুদ হইছে।

—খেতে পাস কি তা হলে?

রূপমণির গলা ভার হয়ে এলো, চোখ ছলছল করে উঠলো।—কি করি বল, টাকা না দিলে পাঞ্জাবীরা বেইজ্জত করে। পঞ্চায়েতকে দুটো মুরগি আর এক হাঁড়ি মান্ডি দিয়ে পাপ

ধুয়ে লিয়েছি, আর পাপ করবোন না বাবু।

—না খেয়ে সুদ গুনবি শুধু?

বিষণ্ণ হাসি হাসলে রূপমণি।—পাঞ্জাবীরা রাজা লোক, টাকা করজ্ করেছি, ধাওড়ার লোক আমাকেই দুষী বলবেক।

হয়তো চেষ্টা করলে দুটো টাকাই দিতে পারতাম, তবু কেন জানি না, একটা টাকা দিয়েই বিদেয় করলাম।

ঠিক পরের সপ্তাহে দশটা পয়সা এনে দিলো রূপমণি।

বললাম, সুদ দিতে হবে না, যখন পারবি ফেরত দিস।

ভাবলাম, হাজ্‌রির কুলি অনুপস্থিত থাকলে বে-হাজ্‌রি কুলিকে সেই টোকেনে কাজ করতে দেবার জন্যে ঠিকাদারের কাছ থেকে তো রীতিমতো ঘুষ খাচ্ছি, এটুকু দয়া দেখালামই বা।

রূপমণি হেসে বললে, যা দিচ্ছি লিয়ে লে তুই, টাকা আর ফেরত হবে নাই।

বিস্মিত হয়ে বললাম, কেন?

—চাকতি নম্বর কাড়ে লিয়েছে সর্দার।

তারপর একে একে ব্যাপারটা বর্ণনা করে গেল রূপমণি। দুপুর বারোটার সময় দুটো ঝুড়ি আর একটা শাবল নিয়ে গোপী সিং তার ডেরায় পেঁছে দিতে বলেছিলো রূপমণিকে। যায়নি রূপমণি। তাই কাজ থেকে বরখাস্ত হয়ে গেছে সে।

বললাম, দোষ তো তোরই, কাজ না করলে চটবে না?

রূপমণি ধমক দিয়ে উঠলো যেন। বললে, এতদিন হলো হালচাল বুঝলিন না তুই। এতগুলান কুলি থাকতে রেজাদের ডেরায় যেতে বলে ক্যানে? আর সকল কুড়ীরা যাক্, আমি যাবো নাই।

সমস্ত ব্যাপারটা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। বললাম, ভাবিস না, চাকরি থাকবে তোর। আমি ব্যবস্থা করবো।

ঠিকাদার উপাধ্যায়কে এসে বললাম, আপনার মুনশী গোপী সিং রূপমণির টোকেন কেড়ে নিয়েছে, ওকে কাজে বহাল রাখতে হবে।

উপাধ্যায় হাসলেন।—ওদিকে চোখ দিলে কোলিয়ারির কাজ চলে না বাবুজী। চোর লম্পট জুয়াড়ী, তিন নিয়ে কোলিয়ারি।

তা বলে এমন অনাচার সহ্য করে যেতে হবে?

উপাধ্যায় বললেন, বাবুজী, গোপী সিং-এর মতো মুনশী না থাকলে ঠিকাদারি বন্ধ হয়ে যাবে আমার। আর রূপমণিকে বহাল রাখলে গোপী সিং ইস্তফা দেবে।

উপাধ্যায়ের কথা শুনে জ্বালা ধরে গেল সমস্ত শরীরে; কথা যখন দিয়েছি রূপমণিকে, ব্যবস্থা একটা করতে হবেই। কিন্তু উপায় ভাবতে গিয়ে দেখলাম মিথ্যে ভরসা দিয়েছি রূপমণিকে।

শ্রমিক ইউনিয়নের সেক্রেটারী সুধীনবাবু হাসলেন।—উপাধ্যায়জী আমাদের প্রেসিডেণ্ট।

অ্যাসিস্টাণ্ট ম্যানেজার চোখ কুঁচকে বললেন, আমার কাছে পাঠিয়ে দিন, শী'ল বি সেফ হিয়ার। আর সারা দিন খেটে যা পায় তার বেশীই পাবে। কাজ আর কি, ঘরদোর সাফ করবে মাঝে মাঝে, আর মালীর ঘরটা খালি পড়ে আছে, ওখানেই থাকবে।

বেরিয়ে এসে মনে হলো জীবনে এমন অসহায় কখনো মনে হয়নি।

আর একটাই পথ, একটাই মাত্র উপায় আছে। কিন্তু তাও কি সম্ভব?

আর পাঁচজনের চোখ এড়িয়ে মুণ্ডা ধাওড়ায় গিয়ে হাজির হলাম। ডেকে তুললাম পরিয়াগকে।

বললাম, কাল সকাল থেকে ওয়াগন লাগবে রেল-সাইডিং-এ। পুরো দমে কাজ চলবে আজ রাত্তিরে। কিন্তু কাজ বন্ধ রাখতে হবে সাণ্ডা পাল্লায়, যতক্ষণ না রূপমণি কাজে বহাল হয়।

উত্তেজিত করবার যতরকমের কৌশল জানা ছিলো সব ক'টা একে একে প্রয়োগ করলাম।

বললাম, পরিয়াগ, তুই চেষ্টা করলে হবে, শুধু আমি এর মধ্যে আছি জানতে দিবি না।

পরিয়াগ চুপচাপ শুনলে কথাগুলো, কোনো কথা বললে না। শুধু মাথা কাত করে সায় দিলো, তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো।

চলে এলাম।

রাত দশটার সময় খবর পেলাম, খাদে কি একটা গোলমাল হয়েছে, কাজ করছে না কেউ। তিরিশটা ওয়াগন ফিরে যাবে কাল সকালে, আবার কবে ওয়াগন মিলবে ঠিক নেই। এদিকে টিপলারেও আর জায়গা নেই কয়লা স্টক করবার।

ছুটোছুটি গুঞ্জন শোনা গেল কিছুক্ষণ। উপাধ্যায় আর সুধীনবাবু উত্তেজিতভাবে কি যেন বলতে বলতে ছুটে গেলেন। তারপর সব চুপচাপ।

রাত বারোটায় ভোঁ বাজলো দূরের অন্য কোলিয়ারিতে। চঞ্চল হয়ে উঠলাম। কোনো খবর নেই, কোনো শব্দ নেই।

কি ফল হয়েছে জানবার জন্য উঠে পড়লাম বিছানা ছেড়ে।

অন্ধকার রাত। দূরের টিপলারে শুধু গোটা কয়েক আলো জ্বলছে। আর শীতরাতের ঠান্ডা কনকনে বাতাস। মাথায় উলের বাঁদুরে টুপি আর পায়ে মোজা এ'টে বেরিয়ে এলাম। খবর না জানা পর্যন্ত স্বস্তি নেই।

হাতে টর্চ নিয়ে পিছনের পথ দিয়ে এগিয়ে গেলাম খাদের দিকে। টিলাটার কাছ থেকে বেবি-ক্রেশ অবধি একটা পাহাড়ী সাপ গাছের গুঁড়ির মতো মাঝে মাঝে পথ আটকে পড়ে থাকে জেনেও বিচলিত হলাম না। ভয়ের চেয়ে আগ্রহ বেশী হলে হয়তো সাহস বেড়ে যায়। তাই।

কিন্তু খাদের পাড় থেকে উঁকি মেরে দেখে হতাশ হলাম। দিব্যি কাজ চলছে। হ্যাঁ, পরিয়াগও একমনে গাঁইতির পর গাঁইতি চালিয়ে যাচ্ছে। এত উঁচু থেকে দেখেও পরিয়াগকে চিনতে ভুল হলো না।

রোপ-ওয়ে চলেছে অবিরাম গতিতে। খোলার ছাদে বৃষ্টি পড়ার মতো ঝিরঝির ঝির-ঝির শব্দ হচ্ছে। মালবোঝাই বাকেটগুলো সারি বেঁধে চলেছে রোপ-ওয়েতে ঝুলতে ঝুলতে।

পরের দিন জানতে পারলাম ব্যাপারটা।

খাস ম্যানেজার ডেকে পাঠিয়ে বললেন, চাকরি তো যাবেই, তার চেয়ে রেজিগ্‌নেশন দিয়ে দিন। আর সশরীরে যদি বাঁচতে চান, সরে পড়ুন এখান থেকে।

পরিয়াগকে বললাম, এমন নেমকহারাম তুই? নামটা বলে দিলি?

—আমি? বিস্ময়ে কপালে চোখ তুললো পরিয়াগ।—না বাবু, রূপমণি বলে দিয়েছে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, সান্ডা পাল্লায় আমাদের সামনে এসে রূপমণি বললে, ওর গুনা হয়েছে, গোপী সিং-এর দোষ নাই।

বললাম, তবে? আমাকে কেন বললে ও-কথা?

বিষন্ন হাসি হাসলে পরিয়াগ।—গোপী সিং ওকে নতুন শাড়ি দিয়েছে বাবু, রূপমণি ওর ডেরাতেই থাকবে।

দুপুরের শিফ্‌টে দেখা হলো রূপমণির সঙ্গে। নতুন শাড়ি পরে হেলেদুলে এসে দাঁড়ালো সামনে।

বললাম, শরম নেই তোর?

লজ্জায় মাথা নিচু করলে রূপমণি। তারপর ধীরে ধীরে বললে, মুনশীর কত তাকত বাবু, ঠিকাদার মানজার সকলে ওর কথা শুনে। মুনশী চটলে খাবো কি বল্‌?

রাগে ঘৃণায় চলে এলাম কোনো উত্তর না দিয়ে।

মিশিরজী পিছন থেকে এসে কখন কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, ভাববেন না বাবুজী। লেখাপড়া করেছেন, অন্য কোলিয়ারিতে চাকরি পেয়ে যাবেন।

বললাম, জানি। কিন্তু রূপমণির ব্যাপারটা বুঝলাম না মিশিরজী।

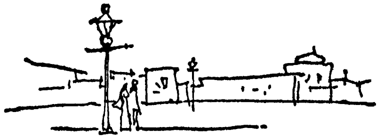
মিশিরজী হাসলেন।—দোষ নেই ওর, ওকে মাফ করবেন আপনি। এ না করলে পরিয়াগকে বাঁচাতে পারতো না ও। ঠিক হয়েছিলো আঠারো নম্বর প্লটে পরিয়াগকে

পাঠিয়ে দিয়ে বিনা ওয়ার্নিং-এ ডিনামাইট ব্লাস্ট করানোর।

চুপ করে থাকতে দেখে মিশিরজী আবার বললেন, আপনার এত মাথাব্যথা কেন প্রশ্ন করাতেই সাণ্ডারা হাসাহাসি করেছিলো, লজ্জায় মাথা নুয়ে গিয়েছিলো পরিয়াগের। তাই পরিয়াগকে লজ্জা থেকে রেহাই দেবার জন্যেই আপনার নাম বলে দিয়েছে রূপমণি।

শুধু প্রভান্স বললে, কে জানে, হয়তো আপনারই দুর্নাম বাঁচাবার জন্যে।

[১৩৫৮



বউরানী

বউরানী একা ফিরলেন না।

সঙ্গে এলো দাসদাসী, বাজার-সরকার অক্ষয়বাবু, কোলে এক বছরের বাচ্চা মেয়ে বেবি।

তবু আমার কেমন যেন মনে হলো বউরানী বুঝি বা একাই ফিরলেন। সত্যি, মেয়েদের জীবনে একজনই শুধু একটি পৃথিবী, আর তাকে হারালেই নিঃসঙ্গ একাকিত্ব।

খবরটা শুনে অবধি আশা-ছোঁয়া অবিশ্বাস পুষে রেখেছিলামঃ হয়তো টেলিগ্রাফের ভাষাটায় কোনো ভুল রয়ে গেছে, হয়তো দুর্জনের রসিকতা।

এদিকে মা-মণির অসুখ তখন বাড়াবাড়ি, ছেড়ে যাওয়া অসম্ভব। এক শো-খানা দশ টাকার নোট বাজার-সরকার অক্ষয়বাবুর হাতে তুলে দিয়েছিলাম গুনে গুনে, বলেছিলাম, এই ট্রেনেই চলে যাও; তবে, আমার বাপু বিশ্বাস হচ্ছে না।

ছোটবাবু নেই...এ কথা ভাবতেও যেন কেমন লাগে।

ছোটবাবু! সেই এক ফোঁটা রাঙা টুকটুকে ছেলে মা-মণির। কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছি। যেবারে ইস্কুলের পড়া শেষ করে পরীক্ষায় পাস দিলো ছোটবাবু, সেদিন কি আনন্দ এই বাড়িতে! কর্তা আমাকেও সঙ্গে নিয়ে গেলেন বাজার করতে, ছোটবাবুর জন্যে কি না কিনলেন সেদিন! মা-মণির জন্যে এক জোড়া লালপেড়ে কড়িয়াল শাড়ি, আর নিজের জন্যে জরির কাজ করা চটি জুতো এক জোড়া। বাড়ি বাড়ি গিয়ে নেমন্তন্ন করে পাঁচ শো লোক খাওয়ানো হলো।

কলেজে ঢুকলেন ছোটবাবু, একটা পাসও দিলেন। তারপর একদিন শুনলাম, ছোটবাবুর বিয়ে।

সিঁদুরগোলা মাখনের টুলটুলে একখানি মুখ, পরীর মতো রূপযৌবন, লক্ষ্মীঠাকরুনের মতো লাজুক-লাজুক চোখ। বউরানী এলেন, রোশনচৌকি বসলো, চিৎপুরের দোকান থেকে ফুলশয্যার সাজ এলো হাজার টাকার এক পাই কম নয়। দরিদ্রনারায়ণের সেবা হলো সামনের উঠোনে, এক হাজার কাপড় বিলি করলাম কাঙালীদের।

কর্তা হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেলেন আমাকে, বললেন, ছেলে-বউকে আশীর্বাদ করে যান নায়েবমশাই।

বললাম, আজ্ঞে ছোটবাবু হলেন রাজপুত্তুর, দু-দিন বাদে উনিই রাজা হবেন, আমি আজ্ঞে আশীর্বাদ করবো, সে কেমন কথা!

মা-মণি বললেন, ও কথা বলবেন না নায়েবমশাই, ছেলের মতো কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছেন আপনি।

তারপর ইশারা করতেই ঢিপ করে একটা প্রণাম করলেন ছোটবাবু আর বউরানী। আর পাশাপাশি যখন গিয়ে বসলো দুজন ঠিক যেন হরগৌরী।

মনে মনে বললাম, দীর্ঘজীবী হও, সুখী হও।

কে জানতো আশীর্বাদের একটাও ফলবে না! কে জানতো মাস কয়েকের মধ্যেই কর্তা সব ভার এই বুড়োর ঘাড়ে চাপিয়ে বৈতরণী পার হবেন!

কর্তা সেদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন, বউ পছন্দ হয়েছে তো নায়েবমশাই?

বলেছিলাম, দুধের সরটুকু তুলে এনেছেন হুজুর, পছন্দ হবে না কেমন কথা!

এতদিন বাদে, বউরানীর দিকে চোখ পড়তেই, সে কথাটা মনে পড়লো আবার।

দুধের সরই বটে।

দামী দামী রঙিন শাড়িতে সর্বদা ঝকমক ঝকমক করে ঘরময় ঘুরে বেড়াতো যে, নাকে হীরের নাকছাবি, কানে হীরের দুল, আর গায়ে এক-গা সোনা ঝলমল করতো যার, হঠাৎ যেন দুধের সরের মতোই সাদা ধবধবে মোটা একখানা থান উঠেছে তার শরীরে।

গাড়ি থেকে নামলেন বউরানী। বউরানী তো নয়, যেন শাপগ্রস্ত কোনো অপ্সরী নেমে এলেন স্বর্গ থেকে।

অন্দরমহলে মা-মণি তখন ডুকরে-ডুকরে কাঁদছেন। আর-আর লোকজন কে কি বলবে, কথা না খুঁজে পেয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে ঘাড় হেঁট করে, শুধু জ্ঞানদা ঝি চোখ মুছছে বারবার।

দুটি ফরসা ধবধবে হাত, এক ফালি চুড়িও নেই সে হাতে, নাক থেকে নাকছাবি, কানের দুল, গলার হার সব সরে গেছে ইতিমধ্যেই। শুধু একখানা সাদা থান বউরানীর অপ্সরীর মতো সুন্দর চেহারায়।

বউরানীর চোখে কিন্তু জল দেখলাম না, মুখে শক্তসমর্থ ভাব। কোথাও এতটুকু ভেঙে পড়ার চিহ্ন নেই। তবু কারো দিকে চোখ তুলে তাকাতেও পারলেন না। মাথা হেঁট করে সটান অন্দরমহলে ঢুকে গেলেন।

বউরানীর চোখে কি কান্না নেই? আমরা সবাই একটু বিস্মিত হলাম। বলা-কওয়া করলাম আমি আর অক্ষয়বাবু।

বিধবা হলেই কি এমন কঠিন হতে হয়? মা-মণিকেও দেখেছি। কর্তা মারা যাওয়ার পরেও দু-চার মাস পাড়ওয়ালা শাড়ি পরতেন। কিন্তু কাঁদতেন দিনরাত।

আর বউরানী ভরা যৌবনের বয়সে বিধবা হয়েই কিনা থান পরতে শুরু করলেন! আবার এদিকে এত কড়া নজর যদি তো কাঁদেন না কেন?

রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে নিজের মনে কাঁদেন কি না বুঝতে পারতাম না আমরা, বুঝতাম শুধু এইটুকুই যে বউরানী আর হাসবেন না।

কাজে অকাজে দেখা করতে হতো বউরানীর সঙ্গে।

মেঘ-থমথম মুখের সামনে বেশীক্ষণ দাঁড়ানো যেতো না, তাই দু-চার কথার পরেই সরে আসতাম।

মা-মণি মাঝে মাঝে সখেদে বলতেন, বউমা বোধ হয় বেশী দিন আর বাঁচবে না নায়েব-মশাই।

দীর্ঘশ্বাসের সায় দিতাম এ কথার। ভাবতাম, এমন কিছু একটা ঘটে না, যাতে আবার মুখে হাসি ফুটে ওঠে বউরানীর? হঠাৎ একদিন এসে হাজির হতে পারেন না ছোটবাবু? বলতে পারেন না, তোমরা কেন এমন মুখ ছমছম করে আছো, আমি তো বেঁচেই আছি।

না। ছোটবাবু যেখানে গেছেন সেখান থেকে মানুষ ফেরে না। ফিরিয়ে আনতেও পারে না কেউ। সে যত বড় সতীসাধ্বীই হোক না কেন। আমি জানতাম। আমরা সবাই জানতাম।

তবে এও জানতাম বউরানীর মুখেও হাসি ফিরে আসতে পারে। আসতে পারে এক অমিয়বাবু এলেই।

কিন্তু ভুল ভেবেছিলাম। বুঝলাম, যেদিন অমিয়বাবু দেখা করতে এলেন বউরানীর সঙ্গে। সেই অমিয়বাবু, যিনি বনেদী জমিদার ঘরের ছেলে ছোটবাবুকে পুরোদস্তুর সাহেব করে তুলেছিলেন।

অমিয়বাবুকে আমরা চিনতাম বউরানীর ভাই হিসেবেই। কিরকম ভাই তা খোঁজখবর নিয়েও বুঝে উঠতে পারিনি। তবে বউরানীর বাপের বাড়িতে তাঁর আদর-আপ্যায়ন কম ছিলো না।

বিয়ের পর অমিয়বাবুর আনাগোনা এ বাড়িতে একটু বেড়েই গিয়েছিলো। আর বউরানী যে সমাজের মানুষ তাতে এটা এমন কিছু দৃষ্টিকটু ছিলো না।

আলিপুরের বেশ ফ্যাশানদুরস্ত বাগানওয়ালা বাড়িটা ছিলো বউরানীর বাপের। বাপ ছিলেন ব্যারিস্টার, ষোলো আনা সাহেবী কায়দা-কানুন তাঁর। মেয়েকে প্রথমে কনভেণ্ট না কি বলে সেখানে পড়িয়েছিলেন। তারপর কোন একটা খ্রীষ্টানী কলেজে। মেয়ে-পুরুষ নাকি একসঙ্গে গায়ে গা ঠেকিয়ে বসতো সে কলেজে। শুনে তো চোখ কপালে উঠতো।

কর্তার সঙ্গে সে একবারই গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি কি, ইয়া এক কুকুর নিয়ে বাগানে পায়চারি করছে একটি মেয়ে। আর যা তার পোশাক, তাকাতে লজ্জা হয়।

প্রথমটা তাই চিনতেও পারিনি।

বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে কাগজ পড়ছিলেন ব্যারিস্টার বেয়াই। আমাদের দেখেই বসতে বলে ডাকলেন, লিলি ডার্লিং!

লিলির মানেও জানতাম না, ডার্লিং কার নাম তাও না।

দেখি কি, সেই ধুমসো কুকুরটাকে টানতে টানতে একমুখ হাসি নিয়ে এগিয়ে এলো মেয়েটি।

চিনতে পারলাম। আমাদের বউরানী।

শ্বশুরকে প্রণাম করা তো দূরের কথা। সামনের চেয়ারটিতে বসে পড়লেন বউরানী। ভাবলাম, বিয়ের পর থেকেই কেন এত মন-কষাকষি বোঝা গেছে। মা-মণিকে জানাতে হবে কর্তার মতিচ্ছন্ন হয়েছে, তাই এমন বাড়িতে বিয়ে দিয়েছেন ছেলের। আর কি আশ্চর্য! এমন মেয়েকে বউভাতের দিন মনে হয়েছে লক্ষ্মীঠাকুরুন!

টেবিলে বসে খানাপিনা। মেয়ে-পুরুষ একসঙ্গে। আমার সামনে বসলেন বউরানী, কর্তার পাশে ছোটবাবুর শাশুড়ী।

কর্তা মারা যাওয়ার আগে অবধি তাই বউরানী আর এ বাড়ির চৌকাঠ মাড়াতে পাননি।

কর্তার মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে ছোটবাবুর শ্বশুর অবশ্য এসেছিলেন। বিলিতী দরজীর তৈরী দামী কোটপ্যাণ্ট পরে। গল্প করতে করতে পকেট থেকে সিগারেট কেস বের করে ছোটবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন।

ফরসা ধবধবে রঙ ছিলো ছোটবাবুর। স্পষ্ট দেখতে পেলাম ছোটবাবুর কান দুটো লাল হয়ে উঠলো। রাগে নয়, লজ্জায়। রাগ ছোটবাবুর শরীরে আদপেই ছিলো কি না সন্দেহ।

দিন কয়েক পরেই বউরানীও এলেন। কোথায় সাহেবিয়ানা? একেবারে কনেবউ, আধ হাত ঘোমটা। পায়ে আলতা।

সবাই খুশী হলাম। অখুশী হলাম ছোটবাবুর ওপর। তার চেয়েও বেশী চটলাম ঐ অমিয়বাবুর হাবভাব দেখে।

গরদ নয় তো আদ্দির পাঞ্জাবি। জরি-পাড় ফিনফিনে ফরাসডাঙা ধুতি আর পায়ে চকচকে পামশু। এই ছিলো ছোটবাবুর পোশাক। হাতে হীরের আংটি ঝলমল করতো। ল্যাণ্ডো ছাড়া এক পা নড়তেন না। আস্তাবলের নামে পেশোয়ারী দানার হিসেব বসাতাম হাজার টাকা বছরে, ঘোড়া দুটোও ছিলো তেজী আর জোয়ান। চকচক করতো কুচকুচে কালো গা, চুমকি-বসানো মখমল দিয়ে ঢাকা থাকতো তাদের পিঠ। আর রাস্তায় যখন এ বাড়ির গাড়ি বের হতো, দু-পাশের লোক চেয়ে থাকতো সেদিক পানে।

অথচ অমিয়বাবু এসে ছোটবাবুর কানে মন্ত্র পড়তেন অন্য। মোটরগাড়ির নামের তো ছড়াছড়ি, সেসব কি জানি ছাই আমি! তবু বুঝতে পারতাম দোতলার দক্ষিণের বারান্দায় বসে বসে কি গল্প হচ্ছে দুজনের। বউরানীও মাঝে মাঝে এসে যোগ দিতেন, হাতে বই নিয়ে বসতেন ওদের সামনে।

মজিলপুর তৌজির গণ্ডগোল মেটাবার চিঠিটা আসতেই ছোটবাবুর কাছে খবর পাঠালাম। মোক্ষদা ফিরে এসে বললো, বউরানী ওখানে নিয়ে যেতে বললেন চিঠিটা।

গেলাম দোতলার বারান্দায়, আর গিয়ে দেখলাম খিলখিল শব্দ করে হাসছেন, যে হাসি এতদিন শুধু দেখাই যেতো, শোনা যেতো না। তাই মনটা মুষড়ে গেল এক মুহূর্তে। কিন্তু তারপর যে কথাটা শুনলাম, সে কথা কোনো দিন শুনতে হবে ভাবিনি।

বউরানী হাসতে হাসতে ছোটবাবুকে বললেন, তোমার ঐ ছ্যাকরা গাড়িটা বিদেয় করো। একটা মার্সেডিজ কেনো ওর বদলে।

কথাটা নতুন শুনলেও বুঝতে বাকী রইলো না ওটা মোটরগাড়ির নাম। মন বিষিয়ে উঠলো তাই।

বললাম, বউরানী, এ বাড়ি হলো রাজবাড়ি। রাজা খেতাবটাই নেই, সম্পত্তির দিক থেকে বনেদিয়ানায় কত রাজা-মহারাজাও চুল বিকিয়ে বসে আছে ছোটবাবুর কাছে। ল্যান্ডো ছেড়ে কি দু'দিনের-টাকা-হওয়া ঠিকেদারদের মতো মোটর চড়তে পারেন ছোটবাবু, ইজ্জতে বাধবে যে।

—ইজ্জত! হাসলেন, না ধমক দিলেন অমিয়বাবু, ঠাহর হলো না। বললেন, ঐ ছ্যাকরা গাড়ির জন্যেই ইজ্জত থাকছে না এ বাড়ির; লোকে কৃপণ ভাবছে।

কৃপণ? একখানা ল্যান্ডোর পিছনে যা খরচ তাতে যে দু-তিনখানা মোটর রাখা যায়! ভাবলাম মনে মনে, বলতে সাহস হলো না। কারণ তার আগেই ছোটবাবু বলে বসলেন, শ' পাঁচেক টাকা দেবেন তো নায়েবমশাই, অমিয়দার সঙ্গে যাবো আজ স্যুটের অর্ডার দিতে।

স্যুট? অর্থাৎ কোটপ্যাণ্ট? তবে আর বলে লাভ কি, ছোটবাবুর মনই যখন ভিজেছে?

দিন কয়েক পরেই শুনলাম ছোটবাবু অ্যাটর্নির পড়া পড়বেন, তারপর হাই কোর্টে বেরুবেন পাস করে।

বললাম, তা হলে জমিজমা বিষয়সম্পত্তি কে দেখবে? আর হাই কোর্টে গিয়ে ডুমুর কুড়োনোর দরকারটাই বা কি ছোটবাবুর?

উত্তর দিলেন বউরানী। বললেন, টাকাটাই সব নয় নায়েবমশাই। শিক্ষা-দীক্ষাটারও দরকার, আর পাঁচজনের সঙ্গে মেশবার জন্যে একটা পরিচয়ও থাকা চাই।

চুপ করে রইলাম। বউরানীর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? পাঁচজনের সঙ্গে মেলা-মেশা করার জন্যে পরিচয়? কর্তার সঙ্গে যে এই বাড়িতেই বসে রাত কাবার করেছে কত জজ-ম্যাজিস্ট্রেট। এই বাড়ির মামলা তদারক করেই তো অর্ধেক উকিল-মোক্তার গ্রাসাচ্ছাদন চালিয়েছে, দোতলা তুলেছে হারু অ্যাটর্নি।

কিন্তু কে শোনে সে কথা! বউরানী যখন পণ করেছেন ছোটবাবুকে ঢেলে সাজাবেন, রুখবে কে?

মাঝে মাঝে সেরেস্তায় এসে বসতেন ছোটবাবু। দু-চারটে গল্পগুজব করতে করতে হঠাৎ হয়তো কোনো দিন বলতেন, আপনাদের বউরানীর মতো শিক্ষিত মেয়ে কিন্তু খুব কমই আছে নায়েবমশাই।

বলতাম, তা তো বটেই। কেমন বাড়ির মেয়ে দেখতে হবে।

ছোটবাবু খুশী হয়ে হাসতেন।—সত্যি, শ্বশুরমশায়ের আদবকায়দা হাবভাব একেবারে সাহেবদের মতো। গভর্নরের সঙ্গেও বন্ধুত্ব। আর আপনার বউরানী সেদিন ইংরেজীতে কথা বললো হাটন সাহেবের সঙ্গে। আমি তো আশ্চর্য। আবার ফরাসী শিখেছিলো নাকি কলেজে পড়বার সময়।

ছোটবাবু গুণগান করতো ও বাড়ির, আর আমি মনে মনে ছোট হয়ে যেতাম। এতদিনের বনেদী বংশ, এমন প্রতিপত্তি—সেসব কিছুই নয়? শোবার ঘরে গায়ে একটা মখমলের আল-খাল্লা চাপানোই সব?

বুঝলাম এর মূলে শুধু বউরানী আর অমিয়বাবু।

ছেলে-বউয়ের হাবভাব দেখে কোণের ঘরে বসে বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন মা-মণি, আর নাম জপ করতেন।

এক-একদিন সখেদে বলতেন, এ বাড়ি যে উচ্ছন্নে গেল নায়েবমশাই, চোখে দেখতে পান না? চোখ ছলছল করতো মা-মণির; আর আমি বলতে পারতাম না যে চোখে দেখতে পেলেও কিছু করবার নেই আমার। মেজদিদিমণি একবার এসেছিলেন পুজোর সময়, বাবার

সময় শুধু ছি-ছি করে গেলেন।

এ বাড়ির হালচাল তখন বদলে গেছে, রেওয়াজ শুরু হয়েছে টেবিলে খাওয়ার। বড় ঘরের দেয়াল থেকে রাজা-রানীর বড় অয়েল পেণ্টিং দুখানা সরে গেছে, তার জায়গায় এসেছে দুখানা বিলিতী ছবি—যার দিকে চোখ তুলে তাকানো যায় না, যে ছবি শুধু কর্তার বাগানবাড়িতেই মানাতো।

মজা এই, বউরানীর পোশাক-পরিচ্ছদও বদলে যাচ্ছিলো, হাবভাব কথাবার্তাও।

ফিরিঙ্গীয়ানার মধ্যে মানুষ হলেও এ বাড়িতে এসেছিলেন তিনি বউরানী হয়ে। গরদের শাড়ি পরলে মানাতো তাঁকে, আরো সুন্দর দেখাতো হীরের দুল পরলে।

কিন্তু ছোটবাবুর মনে তখন নেশা ঢুকেছে। রীতিমতো হাই কোর্টে যাতায়াত শুরু করেছেন। কোটপ্যাণ্ট পরে, মোটরগাড়ি হাঁকিয়ে। ল্যাণ্ডোর চাকায় জং ধরে গেল কি না খোঁজ নিতেন না একদিনও।

বউরানী তো ছোটবাবুকে ঢেলে সাজালেন, তারপর শুরু হলো মনোমালিন্য।

দিনে দিনে এক দিকে যেমন ছোটবাবু বনেদী ঘরের সব চালচলন আচার-বিচার ত্যাগ করে ফিরিঙ্গীয়ানার পিছনে ছুটেছিলেন, তেমনি বউরানী আবার ক্রমশ হয়ে উঠছিলেন পুরোদস্তুর হিন্দু ঘরের বউ। ঘোমটা টানতে টানতে নাক অবধি নামিয়ে ফেলেছেন তখন, আর মা-মণির হাসি-হাসি মুখের উপদেশ শুনে শুনে বউরানীও রীতিমতো শনি-মঙ্গলবার করতে শুরু করেছেন। আজ ব্রত, কাল উপবাস, তার পরদিন মা ষষ্ঠীর পুজো দেওয়া।

অর্থাৎ বাইরে যতই আদবকায়দার চাকচিক্য থাক্ না কেন, বউরানী এটুকু ভুলবেন কি করে যে তিনি শুধু বউ হয়েছেন, মা হননি।

তাই ছোটবাবুর মন যত বাইরে ছুটতে শুরু করলো, বউরানীও ততই অন্দরমহলে ঢুকতে চাইলেন। মা-মণির পুজোর ঘরেই কাটাতে লাগলেন সারাটা দিন। আজ মাদুলি, কাল তাবিজ, তারকেশ্বরে ধরনা দেওয়া লেগেই রইলো। আর তাই নিয়ে খুঁটিনাটি বাধতো ছোটবাবুর সঙ্গে।

ছোটবাবু হয়তো বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কোথাও বেড়াতে যাবার ব্যবস্থা করে ফিরলেন, আর বউরানী বেঁকে বসে বললেন, তুমি যাচ্ছো যাও না, আমি ঘরের বউ কোথায় যাবো হইহই করতে।

ছোটবাবুর শখ হলো সিনেমা দেখতে যাবার, বউরানী বাদ সাধলেন। বললেন, সিনেমা আমার ভালো লাগে না। মা-মণি বলছিলেন, 'অহল্যার অভিশাপ' থিয়েটারটা নাকি খুব ভালো, যদি হয় কোনো দিন জানিও।

শুনে সারা শরীর জ্বলে যেতো ছোটবাবুর, বেশ বুঝতে পারতাম। একদিন বউরানীই ঠাট্টা করতেন ছোটবাবুর থিয়েটার দেখার রোগ নিয়ে, আর আজ বলছে কিনা...

এমনি ধারাই চলছিলো বছরের পর বছর। ছোটবাবুকেই বা দোষ দেবো কি, তাঁরও তো মানুষের শরীর। তাই ফরাসী শেখাবার জন্যে যে কাঁচ বয়সের মেমসাহেবটি আসতো তাঁর কাছে, ক্রমশ কেমন সন্দেহ হতে শুরু হলো তার সঙ্গে যেন বড় বেশী মাখামাখি শুরু করেছেন ছোটবাবু। তা করুক, বনেদী ঘরের জমিদার, যার যা রক্তে সয়। তা বলে দিনে হাজার টাকা চাই বলে হুকুম দিলেই তো হাজার টাকা আসে না। জমিদারি টিকবে কেন তা হলে।

বললাম সে কথা। শুনে কড়া গলায় ধমক দিলেন ছোটবাবু। কোলে-পিঠে করে যাকে মানুষ করেছি সেই কিনা ধমক দেয়। লজ্জায় রাগে মুখ তুলতে পারলাম না।

এদিকে বাইরের সারেঙ্গীখানায় নতুন আসবাবপত্র এলো, এলো সেই ফরাসী মেমের জিনিসপত্তর। তারপর শুনলাম বিদ্যেধরী সেখানেই থাকবেন।

ছোটবাবুকে আগে তবু কোর্ট থেকে ফিরে অন্দরমহলে একবার ঢুকতে দেখতাম, বিদ্যেধরীর আগমনের পর থেকে গাড়ি থেকে নেমেই ছোটবাবু সটান চলে যেতেন সারেঙ্গীখানায়। বেয়ারা, বাবুর্চি সে ঘরের পৃথক, খানাপিনার ব্যবস্থাও। রাত এগারোটার ঘণ্টা বাজতো দেউড়িতে, সেরেস্তার খাতাপত্র গুটিয়ে যখন ঘরের আলো নেবাতো শশী চাকরটা, তখনো টুং-টুং পিয়ানোর শব্দ আসতো মেমসাহেবের ঘর থেকে।

ভাবতাম বউরানী কি এসব দেখেও দেখেন না?

দেখতেন সবই। যেটুকু দেখতে পেতেন সেটুকুও পূরণ করে যেতেন।

আর এই অমিয়বাবুই এসে বললেন একদিন, আপনার চোখের সামনে এসব কি ঘটছে, দেখতে পান না?

বউরানীও শেষ অবধি ডেকে পাঠালেন আমাকে।

আড়াল থেকে বললেন, আপনি শক্ত না হলে যে সব ধসে পড়বে নায়েবমশাই।

আর মা-মণি দাঁড়িয়ে শুধু আঁচলে চোখ মুছলেন।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। কে শোনে কার কথা।

এমনি সময় শুনলাম বউরানী অন্তঃসত্ত্বা। এত-এত মাদুলি, তাবিজ, ধরনা দেওয়ার ফল ফলেছে। আর তাই শুনে বউরানীর বাপ আর অমিয়বাবু এসে জোর করে নিয়ে গেলেন বউরানীকে।

এদিকে সারেঙ্গীখানায় মদের বোতল যা জমেছিলো তাতে সারা বাড়িটায় রেলিং দেওয়া চলে।

এমনিভাবেই দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে চলছিলো। ধরেই নিয়েছিলাম, বউরানী আর এ বাড়িতে ফিরবেন না।

এমন সময় হঠাৎ ডাক পড়লো মা-মণির।

একখানা চিঠি এগিয়ে দিয়ে মা-মণি বললেন, পড়ে দেখুন।

পড়ে দেখতে হলো না, মা-মণির হাসি-হাসি মুখ দেখেই বুঝলাম, সুখবর।

বললেন, বেয়াইমশাই চিঠি পাঠিয়েছেন, মেয়ে হয়েছে।

খুশী হয়ে বললাম, সত্যি? এইবার ছোটবাবুর ঘরের দিকে মন পড়বে, না মা-মণি?

মা-মণি হাসলেন। বললেন, গাড়ি বের করতে বলুন। যাবো না নাতনীকে দেখতে?

ছোটবাবুকে বললাম; গাড়ি জুড়ছে ছোটবাবু, তুমি না গেলে কি চলে?

ছোটবাবু বিরক্তির স্বরে বললেন, আপনাদের বউরানীর মেয়ে হয়েছে? তা তার মেয়ের মুখ দেখবার জন্যে তো অমিয়বাবু আছেন।

কথাটা শুনে চমকে উঠলাম। তা হলে সব-কিছুর মূলে এই সন্দেহ? এত অসন্তোষ, এত মনোমালিন্য অমিয়বাবুকে ঘিরে?

ইচ্ছে ছিলো আভাসে ইঙ্গিতে ব্যাপারটা বউরানীর কানে তুলবো, কিন্তু পারলাম না।

মেয়েকে নিয়ে সে যে কি স্ফূর্তি, কি আনন্দ বউরানীর, বলে বোঝাতে পারবো না। সেই হাসি-হাসি মুখের ওপর কি ব্যথার ছাপ লাগাতে ইচ্ছে হয়!

এসে ছোটবাবুকে বললাম, মেয়ে একেবারে তোমার মতো ছোটবাবু, ছোটবেলায় ঠিক যেমনটি ছিলে। যাও, গিয়ে বউরানীকে নিয়ে এসো, ঘরে লক্ষ্মীশ্রী ফিরে আসুক।

না, ছোটবাবু নয়, অমিয়বাবুই দিয়ে গেলেন বউরানীকে, দিন কয়েক পরেই। বউরানীর মুখে হাসি ফিরে এলো, ফাঁকা বাড়িতে যেন নতুন প্রাণ এলো।

কিন্তু সুখশান্তি দেখবার জন্যে কি আর এ বাড়িতে নায়েব করে পাঠিয়েছেন ভগবান। সারেঙ্গীখানা থেকে ছোটবাবুর কাশির শব্দ ভেসে আসতো মাঝরাতে, শরীরও দেখতাম ভেঙে পড়ছে। তবু সন্দেহ হয়নি কোনো দিন।

হঠাৎ ভোরবেলায় সেদিন বাবুর্চিটা খবর দিলে, মেমসাহেব পালিয়েছে।

সে তো সুখবর। কিন্তু কেন?

কেন? কাল কাশতে কাশতে মুখ দিয়ে এক ঝলক রক্ত উঠেছিলো ছোটবাবুর। আর তাই দেখে রাতারাতি বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে সরে পড়েছে মেমসাহেব।

জীবনে অনেক বড় বড় মামলা-মকদ্দমা চালিয়েছি, আদায়ে বাগড়া দিচ্ছে শুনে মহল তদারকে গিয়েছি নিজেই, জজ-ম্যাজিস্ট্রেট দেখে ভড়কাইনি কোনো দিন। কিন্তু ছোটবাবুর অসুখ শুনে নিজেকে অসহায় মনে হলো।

খবরটা চাপা রইলো না, কি করে বউরানীরও কানে গেল।

আর তাঁর কাছ থেকে শুনলেন অমিয়বাবু।

এতদিন এই অমিয়বাবুকে কেন যে বিষ-নজরে দেখতাম। মানুষ চেনা সত্যিই বোধ হয় সহজ নয়। এতটুকু ভয়ডর নেই, কি অক্লান্ত সেবা। দিন নেই রাত নেই, সব সময় কাছে-কাছে। ডাক্তার ডাকা, ওষুধ খাওয়ানো। সারা দিনের খাটা-খাটুনির পর হয়তো অমিয়বাবু ক্লান্ত হয়ে বসে আছেন আরাম-কেদারায় আর বউরানী এসেছেন ছোটবাবুর কাছে সেবাযত্ন করবার জন্যে, অমনি লাফ দিয়ে উঠেছেন অমিয়বাবু। স্বামীর সঙ্গে দু-একটা কথাবার্তা বলার পরই সরিয়ে দিয়েছেন বউরানীকে।

আমার তখন প্রধান সহায় অমিয়বাবু।

মা-মণিও বলতেন, অমিয়র মতো ছেলে হয় না।

ডাক্তার সেই সময় বললে, ছোটবাবুকে হাওয়া-বদলের জন্যে কোথাও পাহাড়ী জায়গায় নিয়ে যেতে হবে।

কিন্তু কে নিয়ে যাবে সঙ্গে করে। ছোট দিদিমণি, মেজ দিদিমণিকে লিখলাম চিঠি। তাঁরা এসে দিন কয়েকের জন্যে দেখাও করে গেলেন, যাবার আগে কাঁদলেন প্রচুর, কিন্তু ছোটবাবুকে সঙ্গে নিয়ে যাবার কোনো লোক পাওয়া গেল না।

শেষ অবধি ঠিক হলো বাজার-সরকার অক্ষয়বাবু আর বউরানী যাবেন। তবু মন কেমন সায় দিচ্ছিলো না। অক্ষয়বাবু কি আর ডাক্তার ডাকা, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা পারবে ঠিক-মতো।

অমিয়বাবু বললেন, ঠিক আছে, আমিও যাবো।

তারপর আমি আর মা-মণি স্টেশনে গিয়ে তুলে দিয়ে এলাম ওদের। ছোটবাবুর সঙ্গে গেলেন অমিয়বাবু, অক্ষয়, বউরানী আর এ বাড়ির দুটো ঝি।

বেশ কয়েক মাস পরে ফিরলেন বউরানী।

বউরানী একা ফিরলেন না।

সঙ্গে এলো দাসদাসী, বাজার-সরকার অক্ষয়বাবু, কোলে এক বছরের বাচ্চা মেয়ে বেবি।

তবু কেন জানি না, মনে হলো বউরানী বুঝি বা একাই ফিরলেন। বিধবার বেশ, নিঃসঙ্গ একা।

শুনলাম অমিয়বাবুও ফিরেছেন। ফিরে একেবারে বাসায় চলে গেছেন।

বউরানী ফিরে আসার পর সমস্ত বাড়িটার কেমন যেন ছমছমে ভাব। কারো মুখে হাসি নেই, ডুকরে-ডুকরে পুজোর ঘরে অবিরতই কাঁদছেন মা-মণি।

এদিকে অমিয়বাবুও আসেন না, যে আগের মতো হাসিগল্প করে বউরানীর মনের ভার হালকা করে দেবেন।

ছোটবাবুর শেষ দিনগুলোর খবরও ঠিক পেলাম না। সবই ভাসা-ভাসা। ঝি-চাকর, অক্ষয়বাবু বোঝেন কতটুকু যে বলবেন। বউরানী বলতে পারতেন, কিন্তু তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করাও যায় না।

তাই ভাবছিলাম অমিয়বাবুকে খবর দিই একদিন।

অথচ শ্রাদ্ধের তোড়জোড় করতে গিয়ে মনেও থাকে না ঠিক সময়।

হঠাৎ দেখি অমিয়বাবু নিজেই এলেন। এসে অন্দরমহলে যেমন সটান ঢুকে যেতেন তেমনি ঢুকে গেলেন।

আর বিস্মিত হলাম কিছুক্ষণ পরেই অমিয়বাবুকে ফটক পার হয়ে চলে যেতে দেখে।

বেশ মনে হলো অমিয়বাবুর চোখে-মুখে অপমানের ছায়া।

জ্ঞানদা ঝিকে ডেকে বললাম, কি ব্যাপার বল তো?

জ্ঞানদা ফিক করে হেসে ফেলেই আঁচলে মুখ ঢাকলো।

—হাসছিস কেন, কি ব্যাপার বল না?

জ্ঞানদা গম্ভীর হয়ে বললে, বড় বাড়ির কীর্তি, ও আর শুনে কি হবে।

ধমক দিলাম ওকে।—কি যা-তা বলছিস?

—যা-তা নয় গো, যা-তা নয়। বউরানী অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে অমিয়বাবুকে।

তাও কি সম্ভব? ভাবলাম মনে মনে। যে অমিয়বাবু ছোটবাবুর জন্যে এত করলো তাকেই অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে?

জ্ঞানদা বললে, বউরানীকে বাপের বাড়ি নিয়ে যেতে এসেছিলো অমিয়বাবু, বউরানী খেদিয়ে দিয়েছে।

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম, কেন?

জ্ঞানদা আবার ফিক করে হাসলো।

বললে, বিধবা হয়ে সতী হয়েছেন গো।

[১৩৫৮



বোবকরজ

হঠাৎ যদি আপনার কানের পাশে কেউ সে নাম ধরে ডাক দেয়, যদি কোনো দিন তাকে খুঁজে পান, কোনো দূরগামী ট্রেনের রাতের কামরায়, কিংবা কোনো জনারণ্য শহরের অন্ধ গলিতে, আশ্রয়ের সন্ধানে যদি নিশীথপ্রহরের কড়া নাড়ে সে, অথবা ধরুন, দ্বিপ্রহরের ট্রেনে যেতে যেতে কোনো ছোট্ট ইস্টিশানের ধারে প্লাটফর্মের বেড়ায় ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো কোনো মধুম্লান মুখ দেখে হয়তো বা আজকের এই বর্ণনার সঙ্গে মিল দেখতে পেলেনঃ এইটুকু আশা নিয়েই বলছি।

আপনাদের কাছে হয়তো অসম্ভবই মনে হবে, কিন্তু বিশ্বাস করুন, তাকে চোখে দেখার আগে থেকেই মধু-গুনগুন গুজবের ঢেউ উঠেছিলো বাঁশিয়ারার বাতাসে।

মারাং গাড়ার পুল পার হয়ে হরীতকী আর বহেড়ার ঝোপঝাপ। তারই মাঝ দিয়ে সরু সিঁথির মতো সাদা মাটির রাস্তা। দু-পাশে আমাদের কোয়ার্টারের সারিকে কনুইয়ের ঘা দিয়ে দিয়ে গিয়ে পেঁাছেছে সাহেবী এলাকায়।

খাড়িয়া আর ভূম্পি, মুন্ডা আর মাঝিদের ধাওড়াগুলো অনেক দূরে, খাদের ওপাশে। বিলাসপুরীদের ডেরা আরো দু-দশ কদম তফাত। তাদের সঙ্গে দেখা হতো শুধু হাটে আর হাজরির পাল্লায়, যেমন আমাদের সঙ্গে দেখা হতো মোটা মাইনের বাংলোর বাসিন্দেদের। টিলার উঁচু আসনের উপেক্ষিত দিকটায় ছিলো আমাদের কোয়ার্টার, আর কোলিয়ারির আপিস আদালত ডাকঘরকে ঘিরে সীজন্ ফ্লাওয়ার আর পাতাবাহারে সাজানো বাংলোয় থাকতেন ম্যানেজার থেকে জে-পি-ও অবধি ছোট-বড় মাঝারি সাহেবরা। ফাল্গুনের শুধু-ফুল ন্যাড়া পলাশের মতো ছুটির সাইরেন বাজার সঙ্গে সঙ্গে কেরানীকুলের পাতা ঝরিয়ে কৌলীন্য বজায় রাখতো বাংলোবাহার উঁচু দুনিয়া।

আর এই দুনিয়ারই উত্তরের ঢালু গায়ে জলে-ডোবানো এক নম্বর খাদের ধার ঘেঁষে ইটের গাঁথনি শুরু হলো। গুজবের ওপর গুজব গাঁথা হলো।

মারাঠী ম্যানেজারের ফরাসী মেম থাকতেন কোলকাতায়। টিলার ওপর-জগতে নারীত্বের প্রতিনিধি ছিলো শুধু বড় মুনশীর নেপালী আয়া, ঠিকাদার গোপী সিং-এর অসূর্যম্পশ্যা গৃহিণী, আর আর্মেনিয়ান জোশেফ সাহেবের পঙ্গু মেয়ে। ঘর ছিলো আমাদের। ছিলো না ঘরনী। অরণ্যজগতের বিভীষিকা আর কালো কয়লার পাতালরাজ্যের মাঝখানে আমাদের এই ছোট্ট পৃথিবীতে তফাত ছিলো না বিবাহিত আর ব্যাচেলারে। তাই গুঞ্জনে মুখর হয়ে উঠলো সবাই।

জানলাম, হ্রদ বলে ভুল হবার মতো জলে-ডোবানো এক নম্বর খাদের পাশে যে ইটের গাঁথনি শেষ হলো, তা নতুন কোনো ডিনামাইটের ডিপো নয়, জেনারেটরের ঘর নয়, এজেন্ট

সাহেবের ডাকবাংলো নয়।

বেবি-ক্রেচ। আর এই বেবি-ক্রেচের নার্স হয়েই আসছে একজন। আসছে এই ঝরাপাতার অরণ্যে। শুধু সবুজের শোভা নিয়েই নয়, লাল ফাগুনের আগুন ছড়িয়ে।

ভুম্পি আর খাড়িয়ারাও শুনলো সে কথা। আর ওঁরাওদের খিস্টানী মেয়ে মরিয়ম জিজ্ঞেস করলো, বিবি-কঁরজটা কি বটেক বাবু?

বললাম, বিবি-করজ নয় রে, বেবি-ক্রেচ। কামিনরা যখন খাদে যাবে, কোলের বাচ্চাদের রেখে যাবে এখানে। সঠিক উচ্চারণ যে বেবি-ক্রেশ তা কেউই জানতাম না, বলতাম, বেবি-ক্রেচ।

খুশী হলো মরিয়ম, খুশী হলাম আমরা। হাজরির কাজ সেরে খাদে চক্র দিতে গিয়ে প্রায়ই দেখতাম, অসহায় চোখ-তাকানো ছেলেগুলোকে পিঠে জড়িয়ে রেজারা চলেছে ঝুড়ি মাথায়, খাড়াই পথ বেয়ে। আর বোঝার ভারে দু-পাশে চাপ দেওয়া স্প্রিং-এর মতো কুঁচকে গেছে তাদের সমর্থ শরীর। ওভারবার্ডেনের ওপর রোদ্দুর-ঝলসানো বালিতে ছেঁড়া চাটাইয়ে পড়ে পড়ে কখনো বা ছেলেগুলো কাঁদতো খিদেয়। দুটো কাঠিতে জড়ানো এক টুকরো নোংরা কাপড় নৌকোর পালের মতো সূর্য আড়াল করতো। কখনো হয়তো সে আড়াল সরে যেতো বাতাসে, কিংবা তাতানো-তাওয়া বালির ওপর গড়িয়ে পড়ে কেঁদে উঠতো। মুনশীর চোখ আর শরীরের ক্লান্তিকে ফাঁকি দিয়ে কামিন-মা কান্না থামাতো, খিদে মেটাতো শিশুর।

কোলিয়ারি জগতের সেই গ্লানি মুছে নেবার জন্যেই যেন এসে পেঁছলো অনুপমা। খবর রটে গেল মুহূর্তের মধ্যে।

সিণ্ডিকেটের বাস থেকে নামলো অনেকে, এক ঝাঁক হো মুণ্ডা বীড়হড়ের দল। মালপত্র সমেত নামলো মনোহারী দোকানের মালিক গোপীবিলাস, নামলেন মিশিরজী আর উপাধ্যায়, রামগড়ের মিটিং-ফেরত। জনকয়েক হাটুরে, কাপড়ের বাণ্ডিল আর মনোহারীর ঝোড়া নিয়ে। সবশেষে নামলো যে তার বাঁ দিকের বুকে জুঁই-ফুটফুট ছোট্ট একটি মেয়ে। আমরা জন-কয়েক মিলে ধরাধরি করে নামালাম প্যারালিসিসে অবশ-অঙ্গ অনুপমার স্বামীকে। ফুল-ঝুরির মতো একমুখ হেসে নমস্কার জানালো অনুপমা। আর সে ছবি মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে গেল। হাতে নিঃসঙ্গ সাদা শাঁখা, সুন্দর হাসি-হাসি মুখে দু সারি মুক্তোর চমক, চিবুকে মিলিয়ে যাওয়া ক্ষতের দাগ, আর সিঁথিতে সিঁদুর নয়, যেন একটি রক্তপলাশের পাপড়ি।

বনঝোপের পাশ দিয়ে আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে ফিরে এলাম আমরা। আর সারা পথ মনের স্তরে স্তরে গুঞ্জন উঠলো অনুপমাকে ঘিরে। এসেছে একজন, এসেছে এই ঝরাপাতার অরণ্যে। শুধু সবুজের শোভা নিয়েই নয়, লাল পলাশের আগুন ছড়িয়ে।

সে আগুনের আকর্ষণে প্রায়ই বেবি-ক্রেচে গিয়ে হাজির হতাম। দুপুরের সাইরেন বাজার পর খাদের মুখে হাজরি-ঘরের জাল-জানালার কাছে গিয়ে বসতে দেরি হয়ে যেতো রোজ।

এক নম্বর খাদের জলতরঙ্গ দেখতে দেখতে হঠাৎ থেমে পড়তাম, ফিরে আসতাম বেবি-ক্রেচে। একমুখ হাসি নিয়ে অভ্যর্থনা জানাতো অনুপমা। চেয়ার এগিয়ে দিতো। কিন্তু চুপ করে বসে দু-দণ্ড কথা বলার সময় পেতো না ও।

—বসুন, দুষ্টুগুলোর দুধটা হলো কি না দেখে আসি। বলেই চলে যেতো অনুপমা।

বড় হলঘরটায় গোটা কয়েক দোলনা, কয়েকটা ছোটখাট বেবি কট্। মাদুরে বসেও খেলা করতো কালোকুলো ছেলেগুলো।

যাবার সময় দু-একটা দোলনা দুলিয়ে দিয়ে যেতো ও, ভাঙা পুতুলের ঝগড়া মেটাতো, কখনো বা অ্যাটেণ্ড্যাণ্ট মরিয়মকে বলতো কারো ইজের পালটে দিতে, এক ডাকে সাড়া না পেলে নিজেই করতো সে কাজ।

তারপর একসময় লজেন্স চিবোতে চিবোতে নিজের ফুটফুটে মেয়েটিকে কোলে করে এসে দাঁড়াতো। আমার দিকেও গোটা দুই লজেন্স এগিয়ে দিয়ে বলতো, ওদের জিনিসে ভাগ বসাচ্ছি। জানলে চাকরি যাবে কিন্তু।

মিনিট কয়েক আজেবাজে গল্প করেই উঠে পড়তাম, যদিও ওর কাছ থেকে উঠতে ইচ্ছে হতো না। মনে হতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওর হাসি দেখি, কথা শুনি।

কিন্তু অনুপমা নিজেই একসময় মনে পড়িয়ে দিতো, ডিউটির দেরি হয়ে যাবে।

আর চলে আসার সময় ফিসফিস করে বলতো, একটু সময় পান তো কোয়ার্টারটা হয়ে যাবেন, ওকে দেখে যাবেন একটু, বেচারী, নড়তে-চড়তে পারে না।

কোনো-কোনো দিন তাই বেবি-ক্রেচে না গিয়ে চলে যেতাম অনুপমার স্বামীর কাছে। প্যারালিসিসে অবশ শরীরটা একটু বুঝি বা নড়েচড়ে উঠতো, চোখে-মুখে দেখা দিতো ম্লান হাসি।

ছুটির দিনে অনুপমাও থাকতো কাছে কাছে, তার ছোট্ট মেয়ে মুন্নুও। রান্না করতে করতে ছুটে এসে বসতো দু-দন্ড, কখনো বা আলনা গোছাতে গোছাতেই রাজ্যের খবরাখবর বলে যেতো অনুপমা। কোন্ বাচ্চাটা কি দুষ্টুমি করে, কিংবা মরিয়মটা কি বোকা। অথবা মুন্নু বড় হয়ে কি পড়বে, বিলেত যাবে কি না। এইসব আজেবাজে কথাও শুনতে ভালো লাগতো, দেখতে ভালো লাগতো অনুপমার স্বামীর চোখে খুশি-উজ্জ্বল হাসি।

শুধু ভালো লাগতো না জ্যোতির্ময়বাবুকে, কোলিয়ারির এলাকায় যাঁর পরিচয় ছিলো জে-পি-ও সাহেব। ক্রেচে কোয়ার্টারে প্রায়ই অনুপমার সঙ্গে তিনি দেখা করতে আসতেন। কুলিকামিনদের সুখ-সুবিধে দেখাই ছিলো তাঁর কাজ। আর সেই সূত্রে আসতেন অনুপমার কাছে। কোনো দিন বা দেখতাম, বিকেল ঠান্ডা হতেই কাছের পাহাড়টার দিকে বেড়াতে চলেছে অনুপমা। সঙ্গে জে-পি-ও সাহেব। মুন্নুকে কখনো অনুপমা কোলে নিতো, কখনো বা জ্যোতির্ময়বাবু। মারাং গাড়ার জলে পা ডুবিয়ে কোনো দিন হয়তো বসে থাকতে দেখতাম ওদের, কিংবা মান্‌কিবাবার মঠের ঘাস-বাগানে।

ইচ্ছে হলেও কাছে যেতে পারতাম না সে-সময়। কারণ, সত্যি বলতে কি, জে-পি-ও সাহেবকে একটু ভয়ই করতাম আমরা।

তাই যেদিন প্রথম দেখলাম, অনুপমা একাই চলেছে মুন্নুকে সঙ্গে নিয়ে, খুশী হলাম সেদিন।

কিন্তু মরিয়ম বললে, এর পিছনে নাকি ইতিহাস আছে। বললে, জে-পি-ওটা খারাপ লোক আছে রে বাবু। জেনানার ইজ্জতে হাত বাড়ায়।

আর সেই কারণেই নাকি সাবধান করে দিয়েছে অনুপমা। বেবি-ক্রেচের কপাট বন্ধ করে দিয়েছে জে-পি-ওর মুখের ওপর।

শুনে অনুপমার ওপর যত না শ্রদ্ধা হলো, আশঙ্কা উঁকি দিলো তার চেয়ে বেশী। গুঞ্জন উঠলো আমাদের অফিসে, আড্ডায়। জে-পি-ও সাহেবের বিষ-নজর থেকে নিশ্চয়ই রেহাই পাবে না অনুপমা। আমরা শুধু দিন গুনলাম, কবে চাকরির বিদায়-নোটিস আসে অনুপমার নামে।

কিন্তু তার বদলে হঠাৎ একদিন দেখলাম, হাজরি-ঘরের জাল-জানালায় বসে কুলিকামিন-দের চাকতির নম্বর আর ঠিকাদারদের নাম জিজ্ঞেস করতে করতে হঠাৎ দেখলাম, আগের মতোই পিঠে ছেলে বেঁধে কাজ করতে এসেছে রেজার দল।

ছুটির সাইরেন বাজার পর দল বেঁধে গিয়ে হাজির হলো ওরা ম্যানেজার সাঠে সাহেবের বাংলোয়। বললে, বিবি-করজে ছেলে রাখবে না ওরা। বিবি-করজের গিদ্‌রা-আয়ু অনুপমা নাকি নিজের মেয়েকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে। ওদের বাচ্চাগুলো পড়ে-পড়ে কাঁদে। আর নয়তো আফিমের নেশায় ঘুমোয়।

শুনে হাসলাম আমরা। দু-দন্ড রয়ে-সয়ে গল্প করার সময় পায় না যে, সে নাকি ছেলে-গুলোকে আফিম খাইয়ে ঘুম পাড়ায়।

ম্যানেজারকে গিয়ে বললাম সকলে।—সব মিছে কথা স্যার। আপনি নিজে গিয়ে দেখে আসবেন।

ম্যানেজার মাথা নেড়ে বললেন, জে-পি-ওর আগের রিপোর্টও তাই। কিন্তু...

কিন্তু এক দিন কাজ বন্ধ থাকলে টিপলার জমে যাবে। আঠারোটা ওয়াগন ফিরে যাবে। কৈফিয়ত দাবি করবে কোলকাতার দপ্তর, আর হয়তো ম্যানেজার সাঠে সাহেবের কনফিডেন-শিয়াল ফাইলে দুটো বাঁকা মন্তব্য যোগ হবে।

তাই অনুপমাকে ডেকে ম্যানেজার হুকুম দিলেন, তোমার মেয়ের জন্যে বেবি-ক্রেচ নয়। ওকে রেখে আসতে হবে কোয়ার্টারে।

হুকুম শুনে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে অনুপমা।—আমার স্বামীর প্যারালিসিস, উঠতে পারে না। কে দেখবে আমার মেয়েকে? একা পড়ে-পড়ে কাঁদবে যে ও, কি করবো বলুন?

কিন্তু অনুপমার সুখ-সুবিধে দেখা তো ম্যানেজারের কাজ নয়। কোলিয়ারি চালানোই তার কাজ।

সুতরাং চোখের জল মুছে নিয়েই ফিরে আসতে হলো অনুপমাকে। শুধু বললে, কুলি-কামিনদের কে ভুল বুঝিয়েছে আমি জানি।

মাথা নীচু করে বললাম, আমরাও।

কিন্তু জানলেই তো কিছু করা যায় না। বুঝলাম, আমাদের অনুভূতিই আছে, শক্তি নেই।

অনুপমাকে বললাম, কোনো ভয় নেই। মুন্নুর সব দায়িত্ব নিলাম আমরা।

খুশিতে হেসে উঠলো ও, চোখে আঁচল বুলিয়ে বললে, জানতাম।

পালা করে মুন্নুর খোঁজ নিতে যেতাম আমরা। আমি, কম্পাসবাবু, ডাকঘরের অবনী। যে যখন সময় পেতাম, ডিউটিতে যাবার আগে কিংবা দুপুরের অবসরে গিয়ে হাজির হতাম। রুগ্ন অসহায় চোখ মেলে তাকাতেন অনুপমার স্বামী। কথা বলার চেষ্টা করতেন, কিন্তু জিভের জড়তায় জড়িয়ে যেতো কথাগুলো। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসতো মুন্নু, হাত তুলে কোলে উঠতে চাইতো। হাসতাম হাসাতাম, চাঁদা করে তার জন্যে লজেন্স আনাতাম রামগড় থেকে, পুতুল, পোশাক।

দুপুরের সাইরেন বাজতো। ছেড়ে আসতে হতো তাকে। বেবি-ক্রেচের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখতাম, জানালার ধারে দুটি উৎকণ্ঠার চোখ মেলে দাঁড়িয়ে আছে অনুপমা। চোখাচোখি হতো, হেসে ঘাড় নাড়তাম, মুখ ফুটে বলতাম, দেখে এলাম।

—ভালো করে ফটক বন্ধ করেছেন তো? শঙ্কিত স্বরে জিজ্ঞেস করতো অনুপমা। তারপর উত্তর পেয়েই সরে যেতো ও জানালা থেকে।

ভাবতাম, কাজের তাড়ায় এক মুহূর্তও বুঝি দাঁড়াতে পায় না ও।

এমনি নিত্যদিনের রীতির মাঝে হঠাৎ একদিন যতি পড়লো। অনুপমার কোয়ার্টারে পৌঁছে দেখলাম ফটক খোলা। মুন্নু নেই। অনুপমার স্বামী কি যেন বলতে চাইলেন, পারলেন না। হাত তুলতে গিয়ে নামিয়ে নিলেন আবার। শুধু দু চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো তাঁর।

চিৎকার করে ডাকলাম, মুন্নু, মুন্নু! কেউ সাড়া দিলো না খুশির হাসি হেসে। সারা ঘর খুঁজলাম, বাইরেও। আমি, কম্পাসবাবু, ডাকঘরের অবনী, আরো অনেকে।

খবর পেয়ে অনুপমা ছুটে এলো।

মুন্নুকে পাওয়া গেল দিন কয়েক পরে, সাঁওতাল জেলেরা জলে-ডোবানো এক নম্বর খাদে মাছ ধরতে গিয়ে তুলে আনলে মুন্নুকে।

সারা কোলিয়ারির ভিড় ভেঙে পড়লো মুন্নুর ফেঁপে-ওঠা ছোট্ট শবদেহকে ঘিরে।

চোখ তুলে অনুপমা শুধু একবার তাকালো আমার দিকে, কম্পাসবাবুর দিকে, ডাকঘরের অবনীর দিকে। সে চোখ অনুযোগ করলো, কথা দিয়েছিলেন!

আর আমরা চোখ নামালাম, দুঃখে আর লজ্জায়। কথা রাখতে পারিনি।

লজ্জায় ক্ষোভে মুখ দেখাতেও ভয় পেতাম। তাই বেবি-ক্রেচের ধার দিয়ে যাবার সংক্ষিপ্ত রাস্তাটা ছেড়ে রোপ-ওয়ের নীচে নীচে ঘুরপথে যেতাম ডিউটির সময়।

হঠাৎ একদিন ফিরে এলাম সেই পুরোনো রাস্তায়। এসে দাঁড়ালাম বেবি-ক্রেচের জানালার পাশে। না, দুটি উৎকণ্ঠার চোখ এসে দাঁড়ালো না। মিষ্টি হাসির অভ্যর্থনা জানাতে এলো না কেউ। তবু কিসের নেশায় যেন অপেক্ষা করলাম।

অনুপমা নয়, জানালার পাশে এসে দাঁড়ালো ওঁরাওদের খ্রিস্টানী মেয়ে মরিয়ম। বললে, বিবি-করজের গিদ্‌রা-আয়ু চলে গেছে। সকালের ডিউটিতে যখন হাজরির ঘরে বসে ছিলাম, তখনই নাকি চলে গেছে অনুপমা! আর যাবার আগে আমার কথাই নাকি বলেছিলো বারবার, আমারই খোঁজ করেছিলো অনুপমা। বললে মরিয়ম।

চলে এলাম। দীর্ঘশ্বাস বললো, চলে গেছে, চলে গেছে অনুপমা। এই ঝরাপাতার অরণ্য

থেকে সব সবুজের শোভা নিয়ে, সব ফাগুনের আগুন নিয়ে চলে গেছে সে।

আজও বেবি-ক্রেচের ধার দিয়ে যেতে যেতে অনুপমাকে মনে পড়ে, মনে পড়ে জানালায় দাঁড়িয়ে থাকা দুটি উৎকণ্ঠার চোখ, একমুখ ফুলঝুরির হাসি।

আজও সারা মন অনুশোচনার দৃষ্টিতে খুঁজে বেড়ায় অনুপমাকে।

হঠাৎ যদি আপনার কানের কাছে কেউ সে নাম ধরে ডাক দেয়, যদি কোনো দিন তাকে খুঁজে পান, কোনো দূরগামী ট্রেনের রাতের কামরায়, কিংবা কোনো জনারণ্য শহরের অন্ধ গলিতে, যদি চিনতে পারেন তাকে, হাতে তার নিঃসঙ্গ সাদা শাঁখা, ব্যর্থবিষণ্ণ মুখে দু সারি মুক্তোর চমক, চিবুকে মিলিয়ে যাওয়া ক্ষতের দাগ, বাঁ চোখের নীচে ছোট্ট একটি কালো তিল।

যদি খুঁজে পান অনুপমাকে, বলবেন, ভুলিনি, ভুলতে পারিনি আমরা।

বলবেন, আমাদের অনুভূতিই আছে, শক্তি নেই।

বলবেন তাকে যে, অন্ধ কামনার আগুনে একটি ছোট্ট শিশুর প্রাণ পুড়ে ছাই হতে পারে, সে সত্য আমরা জেনেছি।

[১৩৫৯



লাটুয়া ওঝার কাহিনী

মিশিরজী বললেন, লাটুয়া ওঝার কাছে বিষ ঝাড়িয়ে আসুন বাবুজী, কিচ্ছু করতে হবে না।

লাটুয়া ওঝা?

লোকটাকে দেখার আগে যে কতবার শুনেছি নামটা। আপনা থেকেই কেমন একটা ঔৎসুক্য বোধ করছিলাম।

মরিয়ম বললে, এ তল্লাটে নাকি অমন ওঝা আর একজনও নাই। মুর্দার বুকে প্রাণ বসাতে পারে সে, সাপকে মন্ত্র দিয়ে এমন বশ করে যে চুমুক দিয়ে নিজের বিষ নিজেই টেনে নেয়।

ওঁরাওপট্টির লালোয়া কুড়ুখও সায় দিলো।

বললে, বাবুজী, আপাঙের মূলে ফুঁ দিয়ে আপনার হাতে দিয়ে দেবে লাটুয়া ওঝা, কাঁকড়াবিছের গর্তে হাত দিলেও কিচ্ছু হবে না আপনার।

রত্না মাঝিন বললে, লাটুয়া ওঝার মন্ত্রপড়া পাতা দিয়ে মারাং গাড়ায় মাছ ধরি বাবু আমরা। জলে পাতা বিছিয়ে দিলে সব মাছ মরার মতো পড়ে থাকে তার ওপর।

শুধু ডাক্তার সেন হাসলেন তাদের কথা শুনে। বললেন, সব বোগাস। লাটুয়া ওঝার যদি এতটুকু বিদ্যে থাকতো তা হলে আর হাসপাতালে এসে ভিড় করতো না ওঁরাও মুণ্ডা খরিয়া আর ভূম্পিরা।

তবু কেমন যেন বিশ্বাস হলো মরিয়ম, বালোয়া আর রত্না মাঝিনের কথাটাই।

বন্ধুনী ছলছল চোখে বললেন, দেখুন না একবার পরখ করে, এত লোক যখন বিশ্বাস করছে।

ঠিকেদার আত্মীয়টিও বললেন, ইনজেকশন তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না, লাটুয়াকে আগে দেখানোই যাক না।

শুনে উপাধ্যায়জী হাসলেন।—দেখাবেন কি। চোখ আছে নাকি লাটুয়ার। সে তো অন্ধ। অন্ধ সত্যিই।

বনজঙ্গলের ভেতর দিয়ে পাহাড়ী পথ হেঁটে যখন ভুরকুন্ডার সারনা পার হয়ে লাটুয়া ওঝার বাড়ির সামনে পেঁছলাম তখন সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে।

মাথায় এক বোঝা কাঠ নিয়ে ফিরছিলো একটি সাঁওতালী মেয়ে, প্রশ্ন করতেই প্রথমটা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো সে। তারপরে দেখিয়ে দিলো লাটুয়া ওঝার বাড়িটা।

কাদামাটির দেয়াল-দেওয়া এক টুকরো খাপরার চাল। সামনে একটা চবুতরার নীচে হালকা ছোট একটা ঢেঁকি। ঢেঁকি, না ঘানি, ঠিক মনে নেই।

সঙ্গে এসেছিলেন ঠিকেদার আত্মীয়টি, আর মরিয়ম।

মরিয়মই ডাক দিলো লাটুয়ার নাম ধরে। বার কয়েক ডাক দিতেই কপাটের ভাঁজ সামান্য আলগা করে উঁকি দিলো একটি মেয়ে। কপাটের আড়ালে শরীর ঢেকে রাখার চেষ্টা করে।

উদ্দেশ্যের কথা শুনে ভেতরে ডাকলো সে ইশারায়।

ঢুকলাম। অন্ধকূপের মতো ছোট একখানি ঘর। নোংরা। পচাই মদ আর বাসী ভাতের গন্ধ। চাল থেকে দড়িতে বাঁধা অসংখ্য জিনিসপত্তর ঝুলছে বাদুড়ের মতো। হাঁড়ি, কুমড়ো, বাঁশের চোঙা, তামাক পাতা।

প্রথমটা বুঝতে পারিনি। এতক্ষণে দেখতে পেলাম লাটুয়া ওঝাকে। এক কোণে বসে বসে ঢুলছে। মাথার চুল সাদা হয়ে গেছে, দুটি অন্ধ চোখে ঘোলাটে দৃষ্টি। পাশেই একটা বুড়ী, বেশ বুঝলাম—লাটুয়ার বউ, হুঁকোয় গুড়ুক-গুড়ুক টান দিচ্ছে আর খকখক করে কাশছে।

আর ওপাশে দু হাতে বুক ঢেকে যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে, এতক্ষণে বুঝলাম কেন কপাটের আড়ালে শরীর ঢাকার চেষ্টা করছিলো সে।

বাইশ-চব্বিশ বছরের একটি ভরাযৌবন মেয়ে। কালো কুচকুচে রঙের মধ্যেও যে রূপ থাকতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস হতো না। একটি নিটোল কালো পাথরের মূর্তি যেন। টানা-টানা শরমকাতর চোখ, টিকোলো নাক। আর বুকের ওপর আড়াআড়িভাবে রাখা দুটি মসৃণ হাতের আড়ালে উদ্দীপ্ত যৌবনের তরঙ্গ। কোমরের কাছ থেকে হাঁটু অবধি শুধু একখানা শতছিন্ন ময়লা কাপড় তার দেহে। লজ্জায় তাই মুখ তুলতে পারছিলো না মেয়েটি। বাবু দেখলেই ওদের লজ্জা। পাশ থেকে এক টুকরো ময়লা চট তুলে নিয়ে বুক-পিঠ ঢাকলো মেয়েটি, এগিয়ে এলো এবার সপ্রতিভভাবেই।

অন্ধ লাটুয়া ওঝা অনুভবেই বুঝলো কারা যেন ঘরে ঢুকেছে। প্রশ্ন করলো সে।

আর সে প্রশ্ন শুনে বুঝলাম মেয়েটির নাম সুরমণি।

সুরমণি ডাকলো, আপুং।

বাপ লাটুয়া ওঝা সাড়া দিলো।

মরিয়ম আর ঠিকাদার আত্মীয়টি এবার ওদের ভাষাতেই বোঝালো ব্যাপারটা।

আর সুরমণি একমুখ হেসে বললে, আপুং বাংলা জানে গো বটে।

লাটুয়া ওঝাও হাসলো সে কথা শুনে। অন্ধ দুটি চোখ মেলে কি যেন দেখবার চেষ্টা করে বললে, বসেন বাবুরা।

সুরমণি এগিয়ে এলো, দেখতে চাইলো কুকুরে কামড়ানো দাগগুলো। তারপর লাটুয়ার হাতখানা টেনে নিয়ে রাখলো ক্ষতটার ওপর। বেশ টের পেলাম, থরথর করে কাঁপছে বুড়ো। আনন্দে, না আশঙ্কায়, বোঝা গেল না।

হাতটা সরিয়ে নিয়ে লাটুয়া ওঝা বললে, বিশ নখুনে বিষ, আঠারো নখুনে পানি।

কিছুই বুঝতে পারিনি দেখে সুরমণি ব্যাখ্যা করলো। অর্থাৎ কুকুরটার চার পায়ে যদি বিশটা নখ থাকে তা হলে বিষ আছে। আর তা না হলে জল।

সঙ্গী আত্মীয়টি জানালেন, ক'টা নখ তা তো দেখিনি।

অন্ধ লাটুয়া হাসলো সে কথা শুনে। দুটো হাত আন্দাজে আন্দাজে কি যেন খুঁজলো।

—ডুডাং নিখা? প্রশ্ন করলো সুরমণি।

ঘাড় নাড়লো লাটুয়া। সুরমণিও ওপাশে গিয়ে বসলো।

এতক্ষণে লক্ষ করলাম, এক কোণে অসংখ্য ছোটবড় কৌটো, হাঁড়ি, মাটির সরা।

তারই ভেতর থেকে সুরমণি একটা কৌটো এগিয়ে দিলো লাটুয়াকে।

লাটুয়া বললে, ইটা ডুডাং গাছের মূল। চন্দন আর ডুডাং ঘষে তিন দিন লাগাবি কত্তা। বিষ আখন বুকে উঠছে, ডুডাং লাগালি মাটিতে ঝইরবে।

শিকড়টা হাত বাড়িয়ে নিলাম। সুরমণি খানিকটা ঘষতে শুরু করলো। দেখিয়ে দেবে কি করে লাগাতে হয়।

শিকড় ঘষার শব্দে লাটুয়া হেসে বললে, আমার মায়েটাও বড় ওঝা কত্তা, সব ঝাড়ফুঁক শিখ্যে লয়ছে।

শুনে লজ্জার হাসি হেসে মুখ লুকালো সুরমণি, মাথা হেঁট করে কাজে মন দিলো।

চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ প্রশ্ন করলাম, আর কি ওষুধ আছে তোমার কাছে?

বুড়ো হাসলো আমার কথা শুনে। বললে, আমার নাম লাটুয়া ওঝা। সক্কল রোগের দাওয়া আমার ঘরে।

বুড়ী এতক্ষণ হুঁকো টানছিলো, সেটা নামিয়ে রেখে বললে, ডাটুন সাইবের কথাটো ক'ইয়ে দাও উদের।

—হুঁ, ডাটুন সাহেবের কথাটো। মাথা নাড়লো লাটুয়া। তারপর আবার দুটি অন্ধ চোখ মেলে কি যেন হাতড়াতে শুরু করলো।

সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা কৌটো এগিয়ে দিলো সুরমণি।

লাটুয়া কৌটোটা খুলে সামনে ধরলো।

বললে, ইটা কুণ্টি পাথর। নাগবংশী পূজা করে পাইছিলাম। শুনো তবে কথাটো। ডাটুন সাহেবেরে সাপে কাঁটলো সিবার। খবর পইয়া ছুইটলি। কুণ্টি পাথরটা গাড়ার জলে ধুইয়ে লাগায় দিলি সাহেবের গোরে, সাপে কার্টাছলো যিখানে। মন্তর পড়্লি। পাথরটা লাইগা রইলো তবু। ফের মন্তর পড়্লি, পাথর তবু ঝর্য়ো না। তেজী মন্ত্র পড়্লি, পরে পাথর ঝরলো, সব বিষ মাটিতে ঝর্য়ো পড়লো।

সুরমণি বললে, আর আপাংটো?

—হুঁ, ঐ আপাংটো। আবার দু হাত কি যেন খুঁজলো।

একটা মাটির সরা এগিয়ে দিলো সুরমণি।

লাটুয়া বললে, ই হলো আপাং। কাঁকড়াবিছার যম বটে। মুনশীবাবুর বাচ্চারে কাটছিলো বিছায়। আপাং লাগায়ে মন্তর পড়্লি, মাথার বিষ চোক্ষুর পানি হয়ে ঝর্য়ো গেল।

লাটুয়ার থুত্থুড়ে বুড়ী হুঁকোটা আবার তুলে নিয়ে বললে, আর মাংরী মুরমুর উদ্‌রী?

—হুঁ। মনে পড়লো লাটুয়ার, অন্ধ চোখ দুটো আমাদের দিকে ফেলে দুটি হাত তার বাতাসে ঘুরে বেড়ালো।

সুরমণি একটা মাটির হাঁড়ি এগিয়ে দিলো লাটুয়া ওঝার দিকে। আর সেটার স্পর্শ পেয়েই স্বস্তির হাসি দেখা দিলো তার মুখে।

বললে, উদ্‌রীটো শয়তানী রোগ কত্তা, পট্টিতে উ শয়তান ঢুইকলোন তো পট্টি সাফ হ'য়ে যাবে। তো সিবার মাংরী মুরমুর বাপটো ছুট্টে আঁয়লো। বুড়ো কান্দে তো বুড়ার মায়া কান্দে। তো দিইলাম ই কোঁকড়াইনের চোক্ষু আর উদ্‌রী গাছের ঘাম। গাঁ ছাইরে ভাগলো শয়তান। বলে হাঁড়িটা দেখালো লাটুয়া।

সুরমণি আবার কি একটা মনে পড়িয়ে দিচ্ছিলো, বললাম, আজ চলি, ফিরতে রাত হয়ে যাবে। আবার শুনবো একদিন এসে।

সম্মতি জানালো লাটুয়া। বললে, ডুডাংটো তিনবার কইরে লাগাইবি কত্তা। আর তিন দিন পরে আবার আইসবি।

সুরমণিও এলো চবুতরা অবধি। বাইরের আলোয় এতক্ষণে স্পষ্ট দেখতে পেলাম ওকে। দেখলাম রূপ আর দারিদ্র্যের হাত-ধরাধরি। যৌবন আর অলজ্জতা।

কাপড় নয়, টুকরো নোংরা গামছা সুরমণির কোমরে। কিন্তু কালো পাথরের এমন নিটোল মূর্তি এর আগে দেখিনি। কোনো অভিজ্ঞ শিল্পীর হাতে-গড়া নিখুঁত একটি যৌবনবতী নারীদেহ।

পাশাপাশি হেঁটে এলো সুরমণি, আর ওর সমস্ত শরীর ঘিরে যেন নাচের ছন্দ বাজলো।

সুরমণি হাসলো হঠাৎ। বললে, তুয়ারে আগেই দেখছি আমি। মেনছায়েবের সাথ মারাং গাড়ায় বইসেছিলি ওদিন।

—আর তোর সংগে কে ছিলো? হেসে প্রশ্ন করলাম।

—উ আমার ঠিগিয়া পুরুষ বটে, বাপলা হবে উয়ার সাথে।

দুটি রুপোর টাকা গুঁজে দিলাম ওর হাতে। ডুডাং শিকড়ের দাম। তারপর দ্রুত পায়ে কোয়ার্টারের পথ ধরলাম।

কয়েক পা এগিয়ে এসে আবার ফিরে তাকাতে ইচ্ছে হলো। দেখলাম, তেমনি দুটি বড় বড় কৃতজ্ঞতার চোখ মেলে সুরমণি তখনো দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় চুলের জট, কিন্তু স্বাস্থ্যের জোয়ার তার লাবণ্য-ছিটানো মুখে। আর বুকের উদ্দাম তরঙ্গের মাঝখানটিতে দুলছে লাল পুঁথির হার। কানের লাল কুণ্ডল দুটো জ্বলছে রক্তপলাশের মতো।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফিরে এলাম। সুরমণির স্মৃতি নিয়ে।

ঠিকেদার আত্মীয় ছুটলেন সুতপার অ্যালসেশিয়ান কুকুরটির নখের সংখ্যা গুনতে। বিশ নখুনে বিষ, আঠারো নখুনে পানি। বলেছে লাটুয়া ওঝা।

শুনে ডাক্তার সেন হাসলেন। বললেন, সব বুজরুকি। ওঁরাও মুণ্ডা সাঁওতালরা একদিন ডাক্তারের নাম শুনলে মারতে আসতো, আজ হাসপাতালে ভিড় দেখবেন চলুন। লাটুয়ার ওষুধে কাজ হলে ওরা আর আমার কাছে আসতো না।

কম্পাউণ্ডারবাবু হেসে বললেন, ওসব ছেড়ে দিন, রাঁচিতে ফোন করে বারোটা ইনজেকশন আনিয়ে নিন।

বন্ধুনী শুধু ভয়ের চোখে বললেন, না, না। উলটো বিপত্তি হতে পারে ইনজেকশন নিতে গিয়ে; সে আমি দেখেছি, আধ হাত লম্বা ছুঁচ, পেটে দিতে হয়। তার চেয়ে কুকুরটা পাগলা কি না দেখাই যাক না।

ভয় যে আমারও কম ছিলো তা নয়। তাই সুতপার কথাতেই সায় দিলাম।

বললাম, সাঁওতালী ওষুধে এমন সব কাজ হয় যা ভাবা যায় না।

ঠিকেদার আত্মীয়টি ইতিমধ্যে ফিরে এসে জানালেন, বিশও নয়, আঠারোও নয়—উনিশ নখ কুকুরটার পায়ে।

আর ডাক্তার সেন বললেন, ওসব ছেড়ে দিন। পাগলা কুকুরের কামড় বড় ভীষণ জিনিস। নিজের চোখে দেখেছি। জ্বর হবে, ভয়ে চিৎকার করে উঠবে অনবরত। জল দুধ তেল যা দেখবেন মনে হবে কুকুর তাড়া করে আসছে—জলাতঙ্ক রোগ বড় ভীষণ রোগ। ছ মাস পরে হয়তো জানা যাবে, কিন্তু তখন আর উপায় থাকবে না, দশ দিনের মধ্যে সব শেষ।

বন্ধুনী ধমক দিলেন।—কেন ভয় দেখাচ্ছেন মিছিমিছি। কুকুরটা যদি দশ দিনের মধ্যে মারা যায়, তবে তো বুঝবো পাগলা কুকুর।

ডাক্তার সেন সায় দিলেন, হ্যাঁ, তা ঠিক।

সুতরাং লাটুয়া ওঝার চিকিৎসাই চললো। আর তিন দিন পরে যেতে বলেছিলো বলে আবার তুরকুণ্ডার সারনা পার হয়ে এসে দাঁড়ালাম লাটুয়া ওঝার চবুতরার ঢেঁকিটার পাশে।

ডাকলাম সুরমণিকে।

কোনো উত্তর পেলাম না।

বারকয়েক ডেকেও যখন সাড়া পেলাম না, তখন ঝাঁপি খুলে আমি আর মরিয়ম ভিতরে ঢুকবো কি না ভাবছি, হঠাৎ দেখি এক কলসী জল নিয়ে ফিরছে সুরমণি। গাড়ায় স্নান সেরে আসছে মনে হলো। সারা শরীর থেকে বিন্দু বিন্দু জল ঝরছে, আর মুখে খিলখিল হাসি।

—দূর থেঁখে দেইখ্যা ভাবলি খাদানের বাবু বটেন। ছুট্টেঁ আসছি বাবুরে দেইখ্যা।

বলে আরো একমুখ হেসে ঝাঁপি খুলে ধরলো সুরমণি।

ভেতরে ঢুকলাম।

লাটুয়া বসে বসে ঝিমুচ্ছিলো।

বললাম, বিশও নয়, আঠারোও নয়। উনিশ নখের কুকুর।

শুনে আতঙ্ক দেখা দিলো লাটুয়ার মুখে-চোখে।—পাপ্পী কুকুর বটে। সুমগিয়া শয়তান আছে উয়ার বিষে।

বলে তেমনি অন্ধ চোখ দুটো আমাদের দিকে রেখে দু হাত বাড়িয়ে বাতাসে কি যেন খুঁজলো।

সঙ্গে সঙ্গে একটা কৌটো তুলে ধরলো সুরমণি।

বিড়বিড় করে কি এক মন্ত্র পড়লো লাটুয়া, তারপর বললে, ইটা কাঁটাক গাছের মূল বটে। তিন দিন লাগালি সুমগিয়া বিষ খায়ে নিয়ে ভাগবে শয়তানটো।

সুরমণি শিকড়টা নিয়ে ঘষতে শুরু করলো আগের মতোই। আর লাটুয়া বলতে শুরু করলো কোন রোগ কি দিয়ে তাড়িয়েছে ও।

বললে, নাগবংশী পূজা দিয়ে জড়ি পাইলি আমি। খাদানে সাপ উঠলো সিবার, কাম বন্ধ কইরে দিলো কুলিরা।

অন্ধ লাটুয়ার হাত দুটো কি যেন খুঁজলো। খুঁজলো সাপের জড়ি। সুরমণি সঙ্গে সঙ্গে একটা মোড়ক তুলে ধরলো। আর সেটার স্পর্শ পেয়েই স্বস্তির হাসি হাসলো লাটুয়া।

বললে, কুলিদের হাতে বাইন্ধে দিলাম জড়িটো, খাদান থেকে সাপ পালায় গেল। মানজার সায়েব দশটা রুপেয়া দিলি বকশিশ।

মরিয়ম হেসে বললে, হাঁ বাবু, খাদান আপিস হর-মাসে দু রুপেয়া বকশিশ দেয় ওঝারে।

কথা শেষ হতেই বুড়ী মনে পড়িয়ে দিলো, আর মাঝিনদের কথাটো।

—হুঁ। মারাং গাড়ায় সিবার মাছ মিললো না। সান্তালরা ভাবলো বটে পাপ হইছে, তাই মাছ মিলছেক না। তো আমি কইলাম...

ওষুধটা তৈরী হয়ে গিয়েছিলো, নিয়ে বললাম, আজ উঠি, সন্ধ্যে হয়ে যাবে। আবার আসবো।

লাটুয়া প্রথমটা অপ্রতিভ হয়ে পড়েছিলো। তারপর ঘাড় নেড়ে বললে, হুঁ, তিন দিন বাদে নূতন মূল দিব কত্তা।

বাইরে বেরিয়ে এলাম, সুরমণিও এলো।

আগের মতোই হাতে দুটো টাকা গুঁজে দিয়ে বললাম, সুরমণি, কি করে চলে বল্ তো তোদের? আর কেউ আসে ওষুধ নিতে?

মাথা নাড়লো সুরমণি। চোখে-মুখেও কেমন যেন বিষণ্ণতার ছাপ পড়লো তার। না, কেউ আসে না আর লাটুয়া ওঝার কাছে।

—তবে?

চোখ ছলছল করে উঠলো সুরমণির।

বললে, আধা বিঘান ক্ষৌতি আছে, আমি আর জংলো চাষ কইর‍্যা চালাই বাবু।

লজ্জার হাসি হাসলো সুরমণি। আর কৌতুকে হেসে উঠলো মরিয়ম। বোঝালে, জংলোর সঙ্গে নেপা মিলানা হয়েছে ওর। পীরিত হয়েছে।

সুরমণি লাজুক হেসে বললে, হুঁ, ঠিগিয়াটোও হ'য়েছে বাবু।

অর্থাৎ বাপলাও ঠিকঠাক। তাই দুজনে মিলে চাষ করে, আর সেই অন্নেই লাটুয়া আর লাটুয়ার বুড়ীর দিনগুজরান হয়।

বললাম, লাটুয়া এত বড় ওঝা, ওর কাছে আসে না কেন সান্তাল রুগীরা?

শুনে চোখ ছলছল করে উঠলো ওর।

তারপর হঠাৎ কেঁদে ফেললো সুরমণি। বললে, তুই ডাঁক্তারের কাছে যা বাবু, ডাঁক্তারের কাছে যা। ই দাওয়াতে কাম হবেক নাই তুর।

বলে আবার হাতখানা চেপে ধরে টাকা দুটো ফেরত দিতে চাইলো সুরমণি।

বললে, ইটা ফিরায়ে লে বাবু, কাম হবে না তুয়ার, ই দাওয়াই মিছা বটে।

সুরমণি হঠাৎ যে এমন কথা বলতে পারে ঘুণাক্ষরেও মনে হয়নি। দুর্বোধ্য বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম তার দিকে।

টাকা দুটো দিতে চাইলাম, কিন্তু কিছুতেই নিলো না ও।

বললে, আমার পাপ হবে রে বাবু, ই রুপেয়া দুটো তু ফিরিয়ে লে।

তারপর একে একে সব কথা বলে গেল সুরমণি। এতদিনের গোপন কাহিনীটা সহানুভূতির ছোঁয়াচ পেয়ে প্রকাশ করে ফেললো।

সব ছিলো লাটুয়া ওঝার! সব রোগের ওষুধ জানতো ও। ডাইনী যুগিন তাড়াতে পারতো, সাপের বিষ ঝাড়তে পারতো। নাগবংশী পুজো দিয়ে সব শিখেছিলো লাটুয়া ওঝা।

তারপর বুড়ো বয়সে জঙ্গলে মূল খুঁজতে খুঁজতে নাকি রাত হয়ে গেল একদিন।

পাগলের মতো ও তখনো একা একা কি একটা গাছের মূল খুঁজছে। খেয়াল করেনি, কখন একটা ভালুক পিছন থেকে এসে জাপটে ধরেছে ওকে।

জান বেঁচে গেল, কিন্তু ভালুকের থাবার ঘায়ে চোখ দুটো অন্ধ হয়ে গেল লাটুয়ার।

তখন থেকে আর ঘরের বাইরে যায় না ও। কিন্তু গাছের মূল তো আর চিরকাল থাকে না, কবে শেষ হয়ে গেছে সেসব ওষুধ। আর সেসব গাছের নামও জানে না কেউ, চেনেও না।

বুড়ো বাপ দুঃখ পাবে বলে আজেবাজে যা পেয়েছে ঘাস পাতা শিকড় নিয়ে এসে কৌটোগুলোয় সাজিয়ে রেখেছে সুরমণি।

রুগী না এলেও রোজ বসে বসে গল্প করে লাটুয়া, কোন ওষুধে কি কাজ হয়, কোনটা কাকে দিয়েছিলো। আর ভাবে, ওর কাছে শুনে শুনে সুরমণিও বড় ওঝানী হয়ে উঠবে।

কিন্তু লাটুয়া তো জানে না যে সে মূল শেষ হয়ে গেছে। জানে না, চোখ ফিরে পেয়ে গাছগুলো চিনিয়ে না দিলে সুরমণি কিছুই শিখতে পারবে না। তাই দিনের পর দিন শুধু গল্প শোনে সুরমণি। আর গল্প শুনতে শুনতে চোখ ঠেলে কান্না আসে ওর।

তাই রুগীরাও কেউ আসে না আর, লাটুয়া ওঝার ওষুধে কাজ হয় না বলে ডাক্তারের কাছে ছুটে যায়।

সব কথা খুলে বললো সুরমণি।

বললে, তু ডাক্তারের কাছে যায়ে দাওয়াই নিবি বাবু, ই মূল লাগায়ে কাজ হবে নাই।

দীর্ঘশ্বাস লুকোতে পারলাম না। দেখলাম দু চোখ চকচক করছে মরিয়মেরও।

মরিয়ম ফিরে আসার পথে বললে, মেনছায়েবকে বলে জংলোর একটা কাম ঠিক করে দে বাবু। কাম না পেলে উরা বাঁচবে নাই। লাটুয়া ওঝার মায়াটা মরবে, বুড়ীটো মরবে, লাটুয়াও বাঁচবে নাই।

কিন্তু লাটুয়া কি সত্যিই বেঁচে আছে? ফিরে আসতে আসতে বারবার প্রশ্ন জাগলো মনে।

[১৩৫৯



দুধের স্বাদ

আজ ঘড়ির কাঁটা সব ঘর ঘুরে এসে যখন সন্ধ্যার ঈষৎ অন্ধকারকে ক্রমশ নিস্তব্ধ রাত্রির কোলে তুলে দেবার জন্যে তৈরী হবে, দূরের বা দেয়ালের কোনো ঘড়ি একটি নিঃসঙ্গ ঘণ্টাধ্বনি বাজিয়ে জানিয়ে দেবে যে, এখন রাত ঠিক আটটা তিরিশ মিনিট, তখনই নিরুপমা—নিরুদির কথা মনে পড়বে।

হয়তো চেনেন না, হয়তো বা নাম জানেন না তাঁর, কিন্তু নিরুদিকে আপনারাও কখনো-না-কখনো দেখে থাকবেন। ঠিক এই মুহূর্তটিতে নিরুদি কোনো-না-কোনো সিনেমা-হলের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, সিনেমা-হাউসের প্রাঙ্গণে ঘোরাফেরা করছেন কিংবা দেখছেন দেয়ালের কাচে-ঢাকা ছবিগুলো।

বেলেঘাটার একটা দরিদ্র গলিতে পাশাপাশি থাকতাম আমরা। ভাড়া ছিলো সমানই, কিন্তু আমাদের ঘর ছিলো দুখানা, আর নিরুদির দেড়খানা। কলঘর ছিলো একটাই, এক ফালি-বারান্দার মাঝখানে কোমর-উঁচু দেয়ালের পার্টিশন দিয়ে বানানো হয়েছিলো দু তরফের রান্নাঘর।

এত কাছাকাছি ছিলাম বলেই ঘনিষ্ঠতা হতে দেরি হয়নি। দুপুরে হঠাৎ কোনো আত্মীয় অতিথি এসে হাজির হলে নিরুদি পাঠিয়ে দিতেন দু-একটা ঝাল-ঝোল-তরকারি, আর তাঁর বাড়িতে লোক এলে বিনা দ্বিধায় চেয়ে নিয়ে যেতেন আমাদের রেকাবিখানা, চা দেবার জন্যে কাচের গ্লাস কিংবা হঠাৎ প্রয়োজনে দু চামচ চিনি।

এমন মিশুকে মানুষ খুব কমই দেখেছি। সব সময়েই মুখে একটা হাসিখুশী ভাব আর কথা। কথার যেন আর শেষ নেই। আলাপ শুরু করলে আর শেষ হতো না, যতক্ষণ না ডাল পুড়ে যাওয়ার গন্ধ নাকে আসে। আর সে গন্ধ নাকে এলেই ছুটে পালাতেন নিরুদি, কথা শেষ না করেই। ঘামে-ভেজা মুখ, আধময়লা শাড়িতে হলুদের ছোপ, হাতে হয়তো জাঁতি-সুপুরি কিংবা কাপড়-কাচা সাবান, আর কাঁধে গামছা, নয়তো একরাশ ময়লা কাপড়। কিন্তু সন্ধ্যে হতে না-হতেই নিরুদির নিজের চেহারাও বদলে যেতো, যেমন বদলে যেতো তাঁর দেড়-খানা ঘরের চেহারা। তকতকে পরিষ্কার চাদর পড়তো বিছানার ওপর, মেঝের ভাঙা পুরোনো সিমেণ্টও পরিচ্ছন্ন দেখাতো। আর নিরুদি নিজেকেও সাজাতেন পরিপাটিভাবে। দুখানাই রঙিন শাড়ি পাল্টাপাল্টি করে পরতেন, খোঁপায় গুঁজতেন ঘুঙুর-বাঁধা রুপো-রঙের কাঁটা, কপালে সিঁদুরের বড় একটা টিপ, পাতলা আর ফরসা ঠোঁটে পানের ছোপ। নিরুদিকে তখন রীতিমতো সুন্দরী মনে হতো। শুধু সে রূপের আড়াল থেকে উঁকি দিতো লুকনো দারিদ্র্য, গোপন কি একটা ব্যর্থতা।

অরুণাকে প্রায়ই বলতাম সে কথা। বলতাম, নিরুদির জন্যে সত্যি দুঃখ হয় মাঝে মাঝে।

মেঘ-থমথম মুখ করে ও বলতো, অপরের বউয়ের জন্যে তোমার যত দুঃখ, তার এক আনাও যদি নিজের বউয়ের জন্যে থাকতো!

রাগাবার জন্যে বলতাম, অত অভাবের মধ্যেও কেমন হাসিখুশী থাকেন নিরুদি, কেমন সাজানো-গোছানো সংসার। কথায় কথায় তো আর ঠোঁট ফোলায় না তোমার মতো।

রাগে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অরুণা বলতো, ছাই সাজানো-গোছানো। সংসারের ওপর কি ওর কোনো টান আছে নাকি, না স্বামীর ওপরেই আছে?

বলতাম, সন্ধ্যে হলেই যে জানলায় দাঁড়িয়ে স্বামীর পথ চেয়ে থাকে তার আবার টান নেই স্বামীর ওপর?

অরুণা হাসতোঃ বাইরে থেকে তোমরা কতটুকুই বা বোঝো! নিরুদির টান যদি কিছুর ওপর থাকে তো সে হলো সিনেমার ওপর।

কথাটা অরুণা বললেও মানতে বাধ্য হতাম। খানিকটা সন্দেহ আর অবিশ্বাসও উঁকি দিতো মনের মধ্যে। সত্যি কথা বলতে কি, নিরুদির সঙ্গে কথা বলে যত ভালো লাগতো, তত খারাপ লাগতো তাঁর স্বামী বেচারীর অবস্থা দেখে। কোন একটা ছোট্ট আপিসে কাজ করতেন মৃন্ময়বাবু, মাইনে পেতেন কম, কিন্তু অত অল্প টাকা রোজগারেও তো আর পাঁচটা লোক বছরে এক জোড়া নতুন জুতো কিনতে পারে, পুজোর সময় দুটো জামা বানায়। মৃন্ময়-বাবুর চেহারা দেখলেই দুঃখ হতো নিরুদির জন্যে। কিন্তু অরুণা বলতো, আসলে দুঃখ হওয়া উচিত মৃন্ময়বাবুর জন্যেই।

ভদ্রলোক যখন আপিসে বেরুতেন, তখন কোষ্ঠীর বয়সের চেয়ে পাঁচ বছর বেশী মনে হতো, আর ফিরতেন যখন তখন মনে হতো পঁয়ত্রিশ বছরেই নুয়ে পড়েছেন। নিরুদি ফিটফাট থাকতে ভালোবাসেন বটে, কিন্তু তাঁর স্বামীকে পরিষ্কার কাপড় পরতে দেখতাম কদাচিৎ। পায়ে ছেঁড়া জুতো, হাতে তালি-মারা ছাতা, গায়ে একটা মান্ধাতার আমলের গলাবন্ধ কোট।

কোটের নীচে হয়তো একটা গেঞ্জি পরতেন কিংবা তাও পরতেন না মৃন্ময়বাবু।

অরুণা যখন নিরুদির সম্পর্কে অনুযোগ করতো, বলতাম, মৃন্ময়বাবুর চেয়ে তিরিশ টাকা বেশী রোজগার করেও আমাদের অবস্থা তো দেখছো! কি করে চালাবেন বলো?

অরুণা রেগে যেতো এ কথা শুনে। বলতো, তোমাকে আর ওকালতি করতে হবে না নিরুদির হয়ে। মাসে পনেরো দিন সিনেমা দেখতে পারে আর স্বামীর জন্যে এক জোড়া জুতো কেনার পয়সা হয় না?

কথাটা সত্যি। আর ওই একটাই দোষ দেখতে পেতাম নিরুদির। মাঝে মাঝে খুব খারাপও লাগতো।

নিরুদি যে এত এত কথা বলতেন, এত এত হাসি, সবই কিন্তু ওই একটি জিনিসকে কেন্দ্র করে—সিনেমা।

শুধু অরুণাই নয়, পাশাপাশি বাড়ির অন্যান্য মেয়েরাও নিরুদির এই বাড়াবাড়িটা ভালো চোখে দেখতে পারতো না। প্রায়ই চোখে পড়তো আটটার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া সেরে সেজে-গুজে বেরিয়ে যাচ্ছেন নিরুদি। সঙ্গে মৃন্ময়বাবুই যেতেন, কিন্তু পাশাপাশি ওঁদের দেখে কেউ স্বামী-স্ত্রী বলে মনে করতো না—সাজ-পোশাকে এত তফাত।

যখন ফিরতেন টের পেতাম না কোনো দিন, কোনো দিন বা শুনতাম খিলখিল হাসি বা কোনো অভিনেতা সম্বন্ধে আলোচনা, যে আলোচনায় মৃন্ময়বাবু যোগ দিতেন না কিংবা তাঁর মৌনতাই ছিলো যোগাযোগ। সকাল হতে না-হতেই নিরুদি একমুখ হাসি নিয়ে হাজির হতেন, হাতে কোনো একটা নতুন ছবির বই, যে বইগুলো সিনেমার হলে বিক্রি হয়।

পাতলা বারো পাতার চটি বইখানা এগিয়ে দিয়ে নিরুদি জিজ্ঞেস করতেন, দেখেছেন এ ছবিটা? তারপর উত্তর শোনার অপেক্ষা না করেই বলতেন, দেখে এলাম কাল রাত্তিরে। কি চমৎকার যে হয়েছে! যান না অরুণাকে নিয়ে। দেখে আসুন।

পেছন থেকে টিপ্পনী কাটতো অরুণাঃ ভালো লোককেই বলেছেন নিরুদি। উনি নিয়ে যাবেন সিনেমায়, তার আগে সাতবার হিসেবের খাতা নিয়ে বসবেন।

হিসেবের খাতা নিয়ে যে কেন বসতে হয়, নিরুদির মতো রোজ রোজ সিনেমা যাওয়া যে কেন পোষায় না তা অরুণা জানতো। তবু বুঝতাম, অরুণার মনেও এমন দু-একটা সাধ জাগে। তাই, সম্ভব হলে দু-মাসে ছ-মাসে সিনেমা দেখতে যেতাম আমরাও।

নিরুদি কিন্তু দেখে এসেই সন্তুষ্ট হতেন না। এসে দেখাতেন দু আনা দামের সিনেমার বইটা, গল্পটা বলে যেতেন, বলতেন কে কেমন অভিনয় করেছে, কোন্ গানটা ভালো, পেছনের কোন্ অভদ্র লোকটা ওর কাঁধে হাত ঠেকিয়েছিলো। শরীর দুলিয়ে হেসে নেচে অভিনয় করে সব ছবিটুকুই ফুটিয়ে তুলতেন নিরুদি। তারপর একসময় বইটা টুক করে তুলে নিয়ে চলে যেতেন অন্য কোনো পড়শীর বাড়িতে।

অরুণা বলতো, আশ্চর্য মানুষ বাপু, একটা দিন সিনেমা না দেখে স্বামীর একটা ধুতি কিনলেও তো পারে।

পাশের বাড়ির হরেনবাবুও এসে অনুযোগ করতেন।

—আপনাদের ওই নিরুদিটাকে না তাড়াতে পারলে তো নিস্তার নেই মশাই। নিজে যা করে করুক, আমাদের বাড়ির মেয়েগুলোকেও নাচাতে ছাড়ে না।

বলতাম, হ্যাঁ, ওঁর ওই দোষ।

—দোষ! রেগে যেতেন হরেনবাবু, বলতেন, চাকরি-বাকরি তো মশাই আমরাও করি। মাসে একটা সিনেমা দেখলেই তো টানাটানি পড়ে যায়। টাকা পায় কোত্থেকে বলুন তো?

ইঙ্গিতটা কিন্তু খারাপ লাগতো। নিরুদি স্বামীর দিকে চোখ দেন না—এ কথা সত্যি হতে পারে, কিন্তু নিজের দিকেই বা চোখ আছে কই? সেই দুখানা রঙিন শাড়িই তো পাল্টা-পাল্টি করে পরেন। একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা স্বভাব ওঁর, এই যা। কিন্তু সেটা মানুষের পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার, অপরাধ নয় নিশ্চয়ই। আর জীবনের কোনো সাধই যার মেটেনি, একটা নেশায় সে যদি নিজেকে ভুলে থাকতে পারে, কি এমন দোষ!

অরুণাকে সে কথা বোঝাতাম। বলতাম, তোমাদের সময় কাটে ছেলে মানুষ করতেই। নিরুদির সময় কাটাবার কেউ নেই বলেই ছেলেমানুষ থেকে গেছেন।

অরুণা বলতো, মৃন্ময়বাবুও তো একটা ভাইকে মানুষ করছেন, ইস্কুলে পড়াচ্ছেন। উনি পারেন কি করে ওই টাকায়?

বলতাম, চেষ্টা করলে কি আর না হয়?

অরুণা হেসে ফেলতোঃ সেই কথাই তো বলছি, তুমিও কি চেষ্টা করলে পারো না? ইচ্ছে নেই এই যা!

সুতরাং ইচ্ছে করতে হতো কখনো-সখনো। আর সেইজন্যেই একটা নতুন ছবি দেখতে গিয়ে হঠাৎ দেখা হয়েছিলো সেদিন নিরুদির সঙ্গে।

তখন সাড়ে আটটার ঘণ্টা বেজে গেছে। একটা শো শেষ হবার মুখে আর পরের শো শুরু হবার আগেই লোক জমতে শুরু করেছে।

একেবারে আনকোরা নতুন একটা ছবি দেখানো হচ্ছে সেদিন থেকেই। তাই এসেই দেখলাম, টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে সব।

অরুণা বললে, চলো, অন্য ছবি দেখি গে।

বললাম, তাই চলো।

টিকিট-ঘরের সামনে থেকে বেরিয়ে আসছি, হঠাৎ চোখ পড়লো মৃন্ময়বাবুর দিকে। এক কোণে ছাতায় ভর দিয়ে চুপচাপ স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে আছেন, ভ্রূক্ষেপ নেই কোনো দিকে।

মৃন্ময়বাবুকে দেখেই বুঝলাম, নিরুদি নিশ্চয় আছেন কাছোপিঠে। আর তাই রঙ-ঝলমল মেয়েদের মুখের ওপর দিয়ে—শরীরের নয়, এ কথাই বা বলি কি করে—আমার চোখ পিছলে গিয়ে থামলো নিরুদির মুখে। প্রজাপতির মতো ছটফট করে এখান থেকে ওখানে সরে যাচ্ছিলেন নিরুদি। কিন্তু চোখ আঁটা ছিলো তাঁর কাচে-ঢাকা শো-কার্ডের ছবিগুলোর ওপর। খুব তন্ময় হয়ে নিরুদি দেখছিলেন ছবিগুলো, কখনো সরে যেতে গিয়ে অন্য মেয়ের ধাক্কা লাগছিলো হয়তো, আর একমুখ হাসি ছড়িয়ে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছিলেন নিরুদি। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়, রীতিমতো কথা জুড়ে দিচ্ছিলেন তাদের সঙ্গে। কি যেন দেখাচ্ছিলেন ছবিগুলোর দিকে আঙুল তুলে আর হাসছিলেন, সেই সহজ খিলখিল হাসি।

অরুণারও এতক্ষণে চোখ পড়েছিলো।—আরে, নিরুদি যে! বলেই এগিয়ে গেল ও।

আমিও এগিয়ে যেতে বাধ্য হলাম।

অরুণা বললে, কেমন ভাগ্য দেখেছেন নিরুদি! এলাম একদিন, তাও টিকিট পেলাম না। আপনারা পেয়েছেন?

নিরুদি প্রথমটা একটু বিরক্ত হয়েছিলেন বোধ হয়। কিন্তু পরমুহূর্তেই হেসে উঠলেন। বললেন, টিকিট কি ভাই পাওয়া যেতো! ঠিক মুহূর্তে এসে পড়েছিলাম তাই, তিন টাকার টিকিট মাত্র দুখানাই ছিলো।

—তিন টাকা!

শুধু অরুণাই নয়, আমার মুখ থেকেও বোধ হয় অস্ফুট বিস্ময় প্রকাশ পেয়েছিলো। তাই লজ্জা চাপা দেবার জন্যে তাড়াতাড়ি অরুণাকে বললাম, চলো শিগগির অন্য ছবি দেখতে হয় তো।

চলে এলাম তখনই। দেখে এলাম অন্য একটা ছবি। কিন্তু নিরুদির কাছে শোনার পর থেকে অরুণা জিদ ধরলো, তিন টাকার টিকিটে একদিন সিনেমা দেখতে হবে। সুতরাং পুরো এক মাসের জলখাবারের খরচটা সংক্ষেপ করতে হলো। ফলে নিরুদির ওপর চটে গেলাম, হরেনবাবুর ইঙ্গিতটাও বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো।

নতুন একটা ছবি তখন চলছে, মাত্র দু-তিন দিন শুরু হয়েছে হয়তো। তাই অরুণা বললে, চলুন নিরুদি, একসঙ্গে দেখে আসি।

নিরুদি হেসে বললেন, ও ছবি তো কবে দেখেছি, পরশু দিনই। বলে গল্পটা বলে গেলেন নিরুদি। তারপর নাক কুঁচকে বললেন, এমন বাজে ছবি দুবার দেখতে আমার ভালো লাগে না।

এক ছবি একবারই যাদের দেখা হয় না, দুবার দেখার কথা তারা আর বলবে কি করে?

তিন টাকার টিকিটে দেখবার জন্যে কি না জানি না, ছবিটা এত ভালো লাগলো যে, মনে

হলো নিরুদি দুবার দেখলেও পারতেন।

কিন্তু বাড়ি ফেরার পথে যখন মনে পড়লো করকরে ছ'টা টাকা বেরিয়ে গেছে তখন মন খারাপ হয়ে গেল রীতিমতো।

আরো মন খারাপ হলো দিন কয়েক পরেই যখন উচ্ছ্বসিত আনন্দে নিরুদি বললেন, শুনেছেন খবর?

—কি খবর? কই, শুনিনি তো কিছু!

নিরুদি হাসি-হাসি মুখে বললেন, ওঁর মাইনে বেড়েছে অনেক। চাকরিতে উন্নতি হলো।

আর নিরুদি চলে যেতেই অরুণা বললো, শুনেছো খবর?

—কি খবর? মাইনে বাড়া তো?

অরুণা ম্লান মুখে বললে, না, নিরুদি বলছিলেন—ওঁরা এবার নাকি একটা ভালো বাড়িতে উঠে যাবেন।

বললাম, তা তো যাবেনই। পাড়ার লোক তবু সন্তুষ্ট হবে।

ভাবলাম, নিরুদির সম্বন্ধে যা-তা শুনতেও হবে না আর হরেনবাবুর কাছ থেকে।

অরুণা কোনো জবাব দিলো না। বুঝলাম, এতদিন পাশাপাশি থেকে নিরুদির ওপর মায়া পড়ে গেছে ওর। ছেড়ে যাবেন শুনে তাই চোখ ছলছল করছে।

কিন্তু মৃন্ময়বাবুরও চোখ ছলছল করে তা জানতাম না। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা হতো খুবই কম। একটু গম্ভীর নির্বিকার ধরনের মানুষ, তাই চুপচাপ দশটা-পাঁচটা আপিস করতেন, আর নেহাত দায়ে না পড়লে কথা বলতেন না কখনো।

সেই মৃন্ময়বাবুই হঠাৎ একদিন এসে হাজির হলেন। এসে বললেন, একটা উপকার চাইতে এসেছি।

বললাম, উপকার করার সুযোগ আর ক'জন দেয়! বলুন কি ব্যাপার?

মৃন্ময়বাবুর চোখ ছলছল করে উঠলো। বললেন, আমার স্ত্রী আপনাদের কথা খুব মানে, তাই বলছিলাম—

বললাম, বলুন, সঙ্কোচ করবেন না। এতদিনেও যদি আমরা আত্মীয় না হয়ে থাকি, তা হলে বুঝবো আমরা মানুষই নই।

মৃন্ময়বাবু বিষণ্ণ মুখে হাসবার চেষ্টা করলেন। বললেন, মেয়েদের সবচেয়ে বড় সাধ যা তা তো মিটলো না ওর। এতরকমের শখ ওর, কোনোটাই মেটায়নি এতদিন, শুধু টাকা জমিয়েছে। ছেলেকে ভালোভাবে মানুষ করবে, ভালো ইস্কুলে পড়াবে, ছেলের পোশাক দেখে কেউ যেন না ভাবে যে গরিবের ছেলে—এইসব স্বপ্ন দেখেছে বিয়ের পর থেকেই।

একটু থামলেন মৃন্ময়বাবু। দেখলাম, চোখের জল চেপে রাখতে পারছেন না ভদ্রলোক।

বললেন, সিনেমা দেখবার এত শখ ওর, কিন্তু বিয়ের পর থেকে একটা ছবিও দেখতে রাজী হয়নি।

—সে কি! আমিই বিস্মিত হলাম।

মৃন্ময়বাবু বললেন, ছবি তো দেখতো না ও। শুধু সিনেমা-হলের সামনে ঘোরাঘুরি করতো। দেয়ালের ছবিগুলো দেখতো। আর দু আনা দিয়ে একখানা বই কিনে আনতো, ওই যে বইগুলো সিনেমা-হলে বিক্রি হয় সেগুলো।

স্তম্ভিত হয়ে রইলাম মৃন্ময়বাবুর কথা শুনে।

একটু থেমে চোখ মুছে মৃন্ময়বাবু বললেন, এখন তো মাইনে বেড়েছে, বলছি একদিন একটা সিনেমা দেখতে। কিছুতেই রাজী হচ্ছে না। বলছে, তার চেয়ে ছেলের জন্যে টাকাটা জমিয়ে রাখবে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করলেন মৃন্ময়বাবু।

বললাম, কি করতে হবে বলুন?

মৃন্ময়বাবুর হাসিটাও বিকৃত হয়ে গেল কথা বলতে গিয়ে। বললেন, আপনার স্ত্রী যদি একটু বুঝিয়ে বলেন। এত শখ ওর সিনেমা দেখার। একটা দিন যদি সত্যিই দেখে আসে একটা ছবি। আট বছর তো হয়ে গেল, আর ছেলের জন্যে টাকা জমিয়ে কি হবে বলুন?

ভুলে ঘাড় নেড়ে ফেলেছিলাম। শুধরে নিয়ে বললাম, না না, সে কি কথা, সে কি কথা!

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে ছিলাম দুজনে। তারপর একসময়ে উঠে বিদায় নিয়েছিলেন মৃন্ময়বাবু।

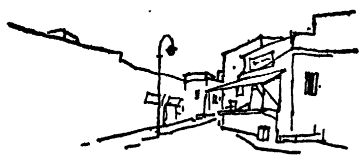
অরুণা সব শুনে কপালে চোখ তুলেছিলো। তারপর অনেক বুঝিয়েছিলো নিরুদিকে। —অন্তত একদিন সিনেমা দেখে আসুন নিরুদি, তা না হলে উনি দুঃখ পাবেন।

নিরুদি হেসে উঠেছিলেন। কিন্তু রাজী হননি। তা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে বেরিয়ে যেতেন আগের মতোই, সিনেমার সেই চটি বই একখানা কিনে আনতেন। কিন্তু আগের মতো অরুণার কাছে এসে গল্প করতেন না কোনো দিন। সকাল হলেই বইটা হাতে নিয়ে চলে যেতেন হরেন-বাবুদের বাড়ি।

তারপর একদিন সত্যিই ও বাড়ি ছেড়ে গেলেন নিরুদিরা। এখনো মাঝে মাঝে সিনেমা-হলের সামনে ঘোরাফেরা করেন, দেয়ালের ছবি দেখেন নিরুদি। কিন্তু সিনেমার টিকিট কাটেন না কোনো দিন।

যে-কোনো রবিবারে রাত সাড়ে আটটার সময়ে খোঁজ করলে কোনো-না-কোনো সিনেমা-হলের সামনে আপনারাও নিরুদির দেখা পাবেন, দেখবেন হয়তো দেয়ালের ছবিগুলো দেখছেন নিরুদি, হাতে দু আনা দামের একখানা চটি বই। আর হয়তো একটু পরেই দেখবেন কোনো-না-কোনো মেয়ের সঙ্গে আলাপ জুড়ে নিরুদি জেনে নিচ্ছেন কে কেমন অভিনয় করেছে. কোন্ গানটা ভালো, ছবির শেষটা কিরকম!

[১৩৬০



খুনী বউ

পাড়ায় নিভাদির নামই হয়ে গিয়েছিলো খুনী বউ। সামনাসামনি ওঁকে 'নিভাদি' বললেও আড়ালে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনায় আমি অনেক সময় 'খুনী বউ' বলে ফেলতাম।

এ নামকরণ হয়েছিলো সেই প্রথম দিন থেকে, যেদিন খবরটা প্রথম দেখলাম খবরের কাগজে। যেদিন সন্ধ্যের সময় নিভাদি এসে উঠলেন মধু স্যাকরা লেনের একতলাটায়।

মধু স্যাকরা লেনে তখন বেশ অন্ধকার নেমেছে। আর গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে অবিরত। দোতলার বারান্দায় নির্জন গলিটার দিকে তাকিয়ে ছিলাম একদৃষ্টে। গলির মোড়ে শুধু একটা বাছুর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছিলো। আর অন্ধকার গলিটার বাঁকে বাঁকে লাঠিতে থুতনি রেখে পাহারাদার সিপাই যেমন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোয়, তেমনিভাবে মাথায় আলোর পাগড়ি বেঁধে গোটা পাঁচেক গ্যাসপোস্ট দূরে দূরে দাঁড়িয়ে ঢুলছিলো। রাস্তায় জমা হাঁটু-জল পার হয়ে ঠুনঠুন করতে করতে এগিয়ে গেল একটা রিক্শা।

বৃষ্টিতে ভেজা পিচের রাস্তাটা গ্যাসের আলোয় চকচক করছিলো। তার ওপর আরো এক-ছটা আলো এসে পড়লো। ফিরে তাকিয়ে দেখলাম ফাঁসুড়ে জজের জানলায় আলো জ্বলছে। রাস্তাটার মতোই জজসাহেবের চকচকে টাকটা চোখে পড়লো। একরাশ বই আর খাতাপত্তরের ওপর ঝুঁকে পড়লো তাঁর মাথা।

ঘটনাক্রমেই বলতে হবে, হঠাৎ শুনলাম, খুনী রতনচাঁদের বিচার হবে ঐ পড়শী জজ-সাহেবের আদালতে, উকিল-মোক্তাররা যার নাম দিয়েছে জল্লাদ, আর অগুন্তি ফাঁসির হুকুম দেবার জন্যে পাড়ার ছেলেরা যার নামকরণ করেছিলো ফাঁসুড়ে জজ। এই জজসাহেবের টাকের

ওপর চোখ রেখে ভাবছিলাম রতনচাঁদের কথা।

এমন সময় ক্যাঁচকোঁচ শব্দ করে গলিতে ঢুকলো একটা ফিটন। জিরজিরে ঘোড়া আর নড়বড়ে গাড়িটা জল ঠেলে ঠেলে এগিয়ে এলো, এসে থামলো রতনচাঁদের একতলাটার সামনে। চারপাশ তার ঢাকা, ভেতরে আরোহী কেউ আছে কি নেই বোঝা দায়।

গাড়ি থামিয়ে কোচোয়ানটা নামলো এক লাফে, সরিয়ে দিলো তেরপলের ঢাকাটুকি। পরক্ষণেই বুড়োগোছের এক ভদ্রলোক নেমে কপাটের তালা খুললেন। ফিরে এসে ভাড়া চুকিয়ে দিলেন ফিটনের, আর সঙ্গে সঙ্গে কেবল একটি বাচ্চা ছেলে নিয়ে যিনি নামলেন, তিনিই নিভাদি। অল্প ঘোমটার আড়ালে ফরসা এক টুকরো মুখ, শ্বেতশঙ্খের মতো মসৃণ সাদা দুখানি হাতে সরু-সরু কয়েক গাছা চুড়ি। এইটুকুই, আর কিছু না। ধীর পায়ে ঘরে ঢুকে আলো জ্বাললেন নিভাদি, জিনিসপত্তর হাতে নিয়ে বুড়ো ভদ্রলোকও চোখের আড়ালে চলে গেলেন, কপাট বন্ধ হলো।

মনে রহস্য পুষে রাত কাটলো। আর ভোরবেলাতেই জবাব পেলাম তার। মুখ-হাত ধুয়ে রাস্তার দিকে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই দেখলাম রতনচাঁদের একতলার জানালায় দাঁড়িয়ে নিভাদি।

দেখলাম উদাস দৃষ্টি মেলে জানালার গরাদে গাল চেপে ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন নিভাদি। চোখ তাঁর ফাঁসুড়ে জজের জানালায়। বিকেলে আপিস থেকে ফেরবার সময়েও অজান্তে চোখ গেল সেদিকে। দেখলাম ছেলেটা হাঁটু জড়িয়ে ধরে কাঁদছে, অথচ খেয়াল নেই নিভাদির! গায়ে আধময়লা একখানা শাড়ি, চুলে চিরুনি পড়েনি, মুখে কেমন একটা বিষাদের ছায়া।

একদৃষ্টে ফাঁসুড়ে জজের জানালার দিকে তাকিয়ে ছিলেন নিভাদি, আমাকে লক্ষ করেননি। এগিয়ে গিয়ে বললাম, এলেন নিভাদি?

মনে হলো যেন একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস লুকিয়ে রাখলেন, চোখে চোখ ফেলতে পারলেন না। শুধু মাথা নেড়ে বললেন, হ্যাঁ।

কথা খুঁজে না পেয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম কিছুক্ষণ। নিভাদি কপাট খুলে শান্ত গলায় বললেন, এসো।

গিয়ে বসলাম ঘরে, আর বসার পর কেবলই ইচ্ছে হলো উঠে পড়তে। কি বলবো, কিভাবে বলবো, কিছুই খুঁজে পেলাম না। চটির শব্দ তুলে ঘরে ঢুকলেন নিভাদির বাবা, আমার দিকে চোখ পড়তেই অস্বস্তিতে এদিক-ওদিক কি যেন খুঁজলেন, তারপর ধীরে ধীরে এসে বসলেন বেতের মোড়াটার ওপর। বললেন, কি যে করবো, কি যে করা যায়!

বুঝলাম দুশ্চিন্তায় কাঁপছেন ভদ্রলোক। জিজ্ঞেস করলাম, ভালো উকিলের ব্যবস্থা করেছেন তো?

বিষণ্ণ হাসি হাসলেন উনি।—ভালো উকিল! যে জজের আদালতে মামলা পড়েছে!

বললাম, উকিলকে বলুন না, অন্য কারও কোর্টে বদলে নিতে।

কথাটা শুনে চকিতে একবার নিভাদির মুখের দিকে তাকালেন উনি, তারপর আবার মাথা নিচু করে রইলেন। খানিক পরে যেমন চটি চটচট করতে করতে এসেছিলেন, তেমনি চলে গেলেন আবার পাশের ঘরে। আর নিভাদি হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, বিশ্বাস হয় তোমার? ও এমন জঘন্য কাজ করতে পারে?

সান্ত্বনা দেবার জন্যেই হয়তো বললাম, কক্ষনো না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিভাদি বললেন, তোমাদের ঐ ফাঁসুড়ে জজের কোর্টে নাকি কেউ কখনো খালাস পায়নি?

মন না রাজী হলেও মুখে হাসি টেনে বললাম, মিছে কথা।

এতক্ষণে একটু ম্লান হাসলেন নিভাদি।—তাই বলো। যদ্দিন না ভাই ও খালাস হয়ে আসছে, ঘুমোতে পারছি না রাত্তিরে, সারা গায়ে কেমন যেন জ্বালা-জ্বালা করছে। ডাক্তার বলছে, খুব ভয় পেলে নাকি এমন হয়।

বললাম, হ্যাঁ, বেশী নার্ভাস হলে জ্বর হয় অনেক সময়।

নিভাদি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। —নিজের কথা তো ভাবছি নে ভাই। নিভাদির গলার স্বরে যেন চোখের জল মিশলো।

বললাম, ভাববেন না নিভাদি, নির্দোষ লোককে কি শাস্তি দিলেই হলো?

নিভাদি আশঙ্কায় চোখ তুলে বললেন, হ্যাঁ ভাই, জজ যদি ভাবে ও সত্যিই দোষী, তা হলে—তা হলে কি ফাঁসি হবে?

হেসে হালকা করার চেষ্টা করলাম। বললাম, ফাঁসি? না, না, ফাঁসি হবে কেন?

বললাম বটে, কিন্তু মনে মনে বেশ জানতাম মিথ্যে সান্ত্বনা দিচ্ছি নিভাদিকে। আর কোনো-কোনো দিন ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে, আপিস থেকে ফেরার সময় অথবা রাত্তিরে শুতে যাবার আগে নিভাদিকে জানালার ধারে উদাস ম্লান চোখ মেলে ফাঁসুড়ে জজের বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে মনে প্রশ্ন জাগতো, এও কি সম্ভব? স্বামীর সম্পর্কে কি এত-টুকু সন্দেহ নেই নিভাদির মনে? সত্যিই কি তাঁর ধারণা রতনচাঁদ নির্দোষ? নাকি সব জেনে-শুনেও রতনচাঁদকে ক্ষমা করেছেন নিভাদি?

একটি মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিলো রতনচাঁদের, ঘনিষ্ঠতা থেকে প্রেম, প্রেম থেকে প্রবৃত্তি। তারপর হঠাৎ কলঙ্কের বিভীষিকা দেখেছিলো রতনচাঁদ। সেই কলঙ্ক অপসারণের স্থূল পথের সাহায্য নিতে গিয়েই কিনা কে জানে, মৃত্যু ঘটে মেয়েটির।

এমন একটি নৃশংস ইতিহাসের নায়ক রতনচাঁদ—এ খবর জানার পরও কি করে স্বামীকে ক্ষমা করলেন নিভাদি?

ক্ষমা! না, ক্ষমার চেয়েও আরো অনেক মহৎ গুণ বলতে হবে। চোখের সামনে দিনের পর দিন দেখলাম নিভাদির সুস্থ সুন্দর মুখে রোগপাণ্ডুর দুশ্চিন্তার ছায়া নামছে। শরীর শীর্ণ হয়ে চলেছে দিনে দিনে, স্নিগ্ধযৌবন মুখে নামছে রুগ্ন বিষণ্নতা।

নিভাদির বুকের ভেতর দিন-রাত যে আশঙ্কার আগুন জ্বলতো, তা তাঁর চেহারাতেই প্রকাশ পেতো। নিভাদির বাবাও বুঝতেন সব।

দুঃখ করে একদিন বললেন, জামাইকে হয়তো বাঁচাতে পারবো, কিন্তু মেয়ে বাঁচবে না আমি জানি।

সত্যিই তাই। প্রতিদিন সকালে ফাঁসুড়ে জজ গাড়ি চেপে কোর্টে যেতেন, প্রতিদিন বিকেলে ফিরে আসতেন যথারীতি। বোধ হয় লক্ষও করতেন না তিনি, ওপাশের একটি এক-তলা বাড়ির জানালায় ব্যথায় ভরা দুটি চোখ তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে। আশায় আশায় দিন গোনে, যদি কোনো দিন চোখে চোখ পড়ে, তা হলে হয়তো ঐ এক জোড়া কান্নাভরা চোখের দৃষ্টিতে স্বামীর প্রাণভিক্ষা করে অনুরোধ জানাবেন নিভাদি। আর এই দুশ্চিন্তার প্রতীক্ষায় দিনে দিনে দেখতাম ক্রমশই রোগা হয়ে যাচ্ছেন নিভাদি, মুখে ফুটছে রুগ্ন কুণ্ঠন, শরীরে অবহেলা।

শুধু কি তাই? রতনচাঁদকে বাঁচাবার জন্যে নিজের বাঁচবার মতনও কিছু আর অবশিষ্ট রাখলেন না নিভাদি।

নিভাদির বাবাই খবরটা ভাঙলেন একদিন। বললেন, খরচখরচা তো কম হচ্ছে না, তবু মেয়ের সিঁথির সিঁদুর বজায় রাখবার জন্যে বিষয়সম্পত্তি সব বিক্রি করে দিলাম।

শুধু বিষয়সম্পত্তিই নয়, হঠাৎ লক্ষ করলাম, নিভাদির হাতের চুড়ির সংখ্যা যেন বেশ কিছু কমে গেছে। গলার হারে তবু কণ্ঠা ঢাকা ছিলো, তাও দেখা গেল না আর।

পাড়ার মেয়েরা বলাবলি করতো, এমন স্ত্রীর কিনা অমন স্বামী!

আমরাও এ কথা বলাবলি করতাম। সর্বস্ব পণ করে নিভাদি এমন স্বামীকেই বাঁচাতে চায়, যে কিনা স্ত্রীর বিশ্বাসের মূল্য দেয় না, অন্য মেয়ের আকর্ষণে ছুটে বেড়ায়—তারপর একদিন সেই মেয়েকেই খুন করার দায়ে অভিযুক্ত হয়—নিভাদির ভাগ্যে কিনা সেই রতনচাঁদের মতো স্বামী!

নিভাদির জন্যে দুঃখের দীর্ঘশ্বাস ফেলতাম আমরা।

আর নিভাদি বলতেন, আমি বিশ্বাস করি না ভাই। সব মিছে কথা, সব পুলিসের কারসাজি। ও কখনো এমন কাজ করতে পারে? ও খুন করবে? মেয়েদের মতো নরম হাত, তুমি তো দেখোনি, চাঁপার কলির মতো আঙুল, সেই হাতে কিনা—

অবিশ্বাসের হাসি হাসতেন নিভাদি। আর তাঁর কথা শুনতে শুনতে আমাদেরও কেমন যেন অবিশ্বাস হতো।

নিভাদি বলতেন, আমি সব সহ্য করতে পারি ভাই, কিন্তু দুশ্চরিত্র পুরুষ আমার দু চক্ষের বিষ।

বলতেন, আমার কি মনে হয় জানো, এমনি ধারার কোনো লোকই ওকে মামলায় জড়িয়েছে।

রতনচাঁদকে মামলায় কে জড়িয়েছিলো তার খোঁজ না পেলেও দিনে দিনে মামলার বিবরণ পেতাম নিভাদির বাবার কাছে, কখনো বা খবরের কাগজে, আর বুঝতে পারতাম বিষয়সম্পত্তি, নিভাদির হাতের চুড়ি, গলার হার বিক্রি করা টাকায় যে উকিল লাগানো হয়েছিলো, তার বুদ্ধির প্যাঁচে মামলাটাও কম জড়িয়ে যায়নি।

তারপর একদিন শুনলাম, রতনচাঁদের মামলার রায় বেরুবে। রতনচাঁদ ছাড়া পাবে, এ কথা কেউ ভুলেও ভাবিনি আমরা। নিভাদি ছোট্ট ছেলেটাকে কোলে নিয়ে ফিটনে উঠে বসলেন। নিভাদির বাবার সঙ্গে সঙ্গে আমিও গাড়িতে উঠলাম। মনে তখন শুধু ভয়, শুধু আশঙ্কা। আগে থেকেই এক ডাক্তার বন্ধুকে বলে রেখেছিলাম, আদালতে উপস্থিত থাকবার জন্যে। হয় ফাঁসি, আর নয়তো দীর্ঘদিনের কারাদণ্ড। আর রায় শুনেই হয়তো নিভাদি অজ্ঞান হয়ে পড়বেন, ভয় ছিলো মনে। সেদিনই হয়তো প্রথম মনে মনে একান্তভাবে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম। শুধু একটা প্রার্থনা ছিলোঃ রতনচাঁদের যেন ফাঁসি না হয়। তা হলে হয়তো নিভাদিকে বাঁচানো যাবে।

কিন্তু রায় শুনে আমরা সবাই চমকে উঠলাম। প্রথমটা নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস হলো না। খালাস? সন্দেহের অবকাশে খালাস পেয়ে গেল রতনচাঁদ!

একমুখ হেসে উঠে ফিরে তাকালেন নিভাদি, আর নিভাদির দু চোখ বেয়ে ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়লো।—বলেছিলাম না? বলিনি আমি, সব মিথ্যে?

শুধু রতনচাঁদ কোনো কথা বললো না। এক কোণে জানালার বাইরে মুখ গলিয়ে দিয়ে বসে রইলো ও। বুঝলাম, লজ্জায় মুখ দেখাতে পারছে না ও!

রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবলাম, মানুষের জীবনে যদি কোনো সত্যিকারের আনন্দের রাত থাকে তো নিভাদি সে আনন্দের স্পর্শ পেলেন এতদিনে।

ভাবলাম, সকালবেলাতেই রতনচাঁদকে জানিয়ে আসবো কতখানি ত্যাগ আর দুঃখবরণের মধ্যে দিয়ে, কত গভীর বিশ্বাস আর প্রেমের হাতিয়ার নিয়ে নিভাদি তাকে বাঁচিয়ে তুলেছেন।

কিন্তু হট্টগোল শুনে ভোরবেলাতেই ঘুম ভেঙে গেল। শুনলাম, শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এও কি সম্ভব?

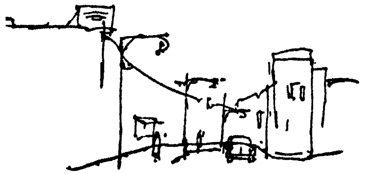
রতনচাঁদ বিষ খেয়েছে। বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে রতনচাঁদ।

শুনলাম, নিভাদি নাকি আবোলতাবোল কি সব বলছেন। নিভাদি পাগল হয়ে গেছেন।

দেখা করতে গেলাম।

বোবা চোখ মেলে আমার মুখের দিকে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন নিভাদি। তারপর হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠে বললেন, ক্ষমা? ক্ষমা করতে হবে? জানো, দুশ্চরিত্র পুরুষ আমার দু চক্ষের বিষ। হ্যাঁ, বিষ, বিষ।

খিলখিল করে আবার উন্মাদের মতো হেসে উঠলেন নিভাদি। আর তাঁর বিষের মতো নীল এক জোড়া চোখে হাসি দেখে ভয় পেলাম।



সম্ভব

ততক্ষণে সে অন্ধকার অলিগলি পার হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে লাইটপোস্টের নীচে। দোকান-গুলোয় ধীরে ধীরে আলো নিবছে, কপাট বন্ধ হচ্ছে। আলো-ঝলমল চৌরাস্তাটা হঠাৎ কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ছে। শুধু এপাশে-ওপাশে দোতলার ছাদে-জ্বলা নিয়ন আলোর রঙিন বিজ্ঞপ্তি থেকে কয়েক উঁকি ম্লান জোছনা এসে পড়েছে মেয়েটির মুখে।

অন্ধকার অলিগলি থেকে বেরিয়ে এসে প্রতিদিনই মেয়েটি দাঁড়ায় ঐ লাইটপোস্টের নীচে। চকিত চোখে আরেকজনকে খোঁজে। আর ঠিক তখনই চলন্ত ট্রাম থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে ছিমছাম চেহারার ছেলেটি। এপাশে-ওপাশে চোরা চোখ ফেলে সোজা চলে আসে সে মেয়েটিকে লক্ষ করে। চোখাচোখি হয়, ঈষৎ হাসির অভ্যর্থনা জানায় দুজনেই। তারপর মেয়েটি দু পা এগিয়ে আসে। ফিসফিস কথা শুরু হয়, পাশাপাশি হেঁটে যায় ওরা কালো ঘাসের জাজিম মাড়িয়ে। চাপা গলায় ক্রমশ চটুলতা দেখা দেয়।

অনিলেন্দু প্রথম যেদিন দেখেছিলো নিরুপমাকে, তা থেকে চেহারার পরিবর্তন হয়নি ওর এতটুকু। আজও তেমনি খিলখিল করে হেসে উঠে হাতের পাতায় মুখ ঢাকে নিরুপমা। আগের মতোই চোখে ভাসে ভয় আর কৌতুকের লুকোচুরি। সাদাসিধে একখানা রঙিন শাড়িতেই এখনো চমৎকার মানায় ওকে, এখনো ঘুঙুরবাঁধা রুপোরঙের কাঁটা পরে খোঁপায়। যখন এসে দাঁড়ায় ও ওদিকের ফুটপাথে, নিয়নের নীলাভ আলো নয়, যেন রহস্যের ছায়া নামে ওর ফরসা মুখে। হাতে কয়েক সারি কালো রঙের গালার চুড়ি, একটি বোধ হয় সোনার। আলোয় চিকচিক করে সে দুটো। দেখলে বেশ বোঝা যায়, এখানে আসার আগে নিরুপমা যে নিজেকে একটু-আধটু সাজিয়ে না নেয় এমন নয়। চোখের কোলে এত হালকা করে কাজল টানে, মনে হয় যেন কাজল নয়, কালো চোখের ছায়া। কানের দু-পাশে কয়েকটা খুচরো চুলের উড়ু-উড়ু ভাব। পা টেনে টেনে ক্লান্তভাবে ওরা যখন হেঁটে যায়, তখন অকারণেই নিরুপমা কখনো শাড়ির পাড়টা ঠিক করে নেয়, কখনো বা দেখে নেয় খোঁপায় গোঁজা রুপোলী কাঁটাগুলো ঢিলে হয়ে গেছে কি না। হাসেও বোধ হয় অকারণেই।

তারপর হঠাৎ একসময়ে বলে, পাড়ার লোক যদি জানতে পারে কি হবে বলো তো? বলেই হেসে ওঠে।

কি আবার হবে? একটু বিরক্তই হয় অনিলেন্দু। বলে, ভয় তো যত তোমারই।

—আহা, তোমার বন্ধুবান্ধবরা বুঝি বলবে না কিছু? না বাপু, পাশের বাড়ির পূর্ণিমারা যদি জানতে পারে...ছি-ছি, লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবো না।

অনিলেন্দু হেসে বলে, আমার বন্ধুরা যদি দেখে তো খুশীই হবে। তাদের সঙ্গে আড্ডা না দিয়ে যে সন্ধ্যেটা কাটাচ্ছি এমন একজনের সঙ্গে যার স্বামী থাকেন দূরদেশে, এ জানলে তো...

—আর বাকিটুকু যদি শোনে? মুখে আঁচল চাপা দিয়ে খিলখিল করে হেসে ওঠে নিরুপমা।

অনিলেন্দু গম্ভীর হয়ে যায় এ কথা শুনে। চুপচাপ খানিকটা হেঁটে গিয়ে ঘাসের ওপর বসে পড়ে এক জায়গায়।

তারপর কথা আর হাসিতে বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়ে ফিরে আসে দুজনেই। অন্ধকার গলির মুখে এসে ফিসফিস দু-একটা কথা হয়, অনিলেন্দু চলে যায় ট্রাম স্টপেজের দিকে, আর নিরুপমা সেদিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে। শেষে অন্ধকার অলিগলি পার হয়ে বাড়িতে পৌঁছয়।

দূর থেকে আশপাশের ফ্ল্যাটগুলো দেখে নেয়, কেউ কোনো জানালায় দাঁড়িয়ে আছে কি না। তারপর দরজায় টোকা মারে আস্তে আস্তে।

মা এসে কপাট খুলে দেন, কোনো প্রশ্ন করেন না। কপাট বন্ধ হয়।

নিরুপমাকে যত রাজ্যের প্রশ্ন শুনতে হয় পূর্ণিমাদের কাছে। সকালে আপিসে বেরুবার মুখেই কেউ-না-কেউ এসে বলবে, সারা জীবন কি চাকরিই করবেন নিরুদি?

তাই বলতে হয়, সময় তো কাটাতে হবে ভাই।

—বরের কথা ভাবলেও তো সময় কাটে। বলেই হেসে ওঠে ফাজিল মেয়েগুলো।

নিরুপমা হাসে। বলে, কোথায় পড়ে আছেন দিল্লীতে, ভাবনা পেঁছয় না অত দূরে।

ওদের আর নতুন কোনো প্রশ্ন করতে না দিয়ে নিরুপমা চলে যায়।

বিকেলে ফিরে আসতেইঃ অনুর ইস্কুলের মাইনে দিয়ে যাসনি।

ক্লান্তিতে বিছানায় ঢলে পড়ে নিরুপমা. বলে. সকালে চেয়ে নিতে বোলো।

খানিক চুপ করে থেকে মা আবার বলেন, মণ্টুদের কলেজ থেকে স্টিমার পার্টি যাবে...

—না, না, ওসব হবে না। চিৎকার করে ওঠে নিরুপমা। বলে, অত টাকা নেই আমার, শেষে ধার করতে হবে। তারপর নিজের মনেই বলে, ধার পাবোই বা কোথায়?

মা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। তারপর ধীরে ধীরে বলেন, অনিলেন্দুর সঙ্গে দেখা হয়?

ঘাড় নাড়ে নিরুপমা।

—কেমন আছে?

—ভালোই।

মা আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেন, ওর কাছ থেকে কিছু কিছু নিলেই তো পারিস।

উত্তর দেয় না নিরুপমা। মনে মনে ভাবে, যা রোজগার, নিজেরই চলে না, আমাদের সাহায্য করবে! হাত পেতে না নিলে সাহায্য নেওয়া হয় না নাকি? এই যে নিরুপমা চাকরি করে পুরো মাইনেটাই খরচ করছে মা আর ছোট ভাইবোনের জন্যে সে তো অনিলেন্দুরই সাহায্য। মা কি বুঝতে পারেন না? নিজের জীবনের জন্যে কতটুকু সুখ রেখেছে নিরুপমা, কতটুকু আনন্দ! সারা দিনের খাটুনি, অসহ্য দুশ্চিন্তা, আর তারই ফাঁকে রাত আটটা তিরিশ মিনিটের অর্ধসমাপ্ত রোমাঞ্চ।

নিয়ন আলোর আবছায়া থেকে অন্ধকার পথ, তারপর জলের ধারে ঠাণ্ডা ঘাসের ওপর পাশাপাশি বসা। জলের আয়নায় কোনো দিন হয়তো ভাঙা চাঁদের ছায়া পড়ে, কোনো দিন বা ওপারের আলোর সারিই আঁকে জলের সীমানা।

তারই ফাঁকে নিরুপমার দীর্ঘশ্বাস শোনা যায় একসময়।

হঠাৎ বলে ওঠে, আর ভালো লাগে না।

অনিলেন্দু পায়ের কাছ থেকে একটা ঘাসের শিষ তুলে নিয়ে অন্যমনস্কভাবে দাঁতে কাটতে কাটতে বলে, সত্যি, এমনভাবে তো আর চলে না!

নিরুপমার গলার স্বর ভারি হয়ে আসে। বলে, কি করবো বলো, মা-র কুসংস্কার যে দূর হয় না কিছুতেই। সেই পুরোনো দিনের নিয়মকানুন কি আজকের দিনে চলে?

অনিলেন্দু পা ছড়িয়ে বসে তাকিয়ে ছিলো ওপারের রেললাইনটার দিকে। বেশ খানিকটা শব্দ করে, হুইস্‌ল্‌ বাজিয়ে, ধোঁয়া ছেড়ে চলে গেল রাতের ট্রেন। অন্ধকারের গায়ে আলো-ঝলমল জানালার সারি আর জানালায়-বসা যাত্রীদের ভাসা-ভাসা মুখগুলো কোন এক কল্পনার জগতের মানুষ যেন। শুধু চলেছে আর চলেছে, থামার ভয় নেই এতটুকু। এমনি চলার নেশা অনিলেন্দুরও ছিলো একদিন। তারপর হঠাৎ থেমে পড়তে হলো। কিন্তু এমন-ভাবে কতদিন আর থেমে থাকা যায়!

অনিলেন্দু সে কথা ভেবেই বুঝি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, আমিই বা বাবা-মাকে কি করে বোঝাই বলো? মাইনের টাকাটা নয় তুলে দিলাম ওদের হাতে, কিন্তু তোমাদের ওখানে গিয়ে থাকা সেও বড় লজ্জা করে। লোকে পাঁচ কথা বলাবলি করবে।

এ কথা নিরুপমা নিজেও জানে। আর জানে, অনিলেন্দু যদি ওদের বাড়িতে গিয়ে থাকে

তা হলে সবচেয়ে বেশী লজ্জা পাবে নিরুপমাই। মুখ তুলে কথা বলতে পারবে না পূর্ণিমা-দের সঙ্গে, কিংবা ওপাশের বাড়ির রানীবউদির সঙ্গে। এমন কি, সব কথা যদি স্পষ্ট করে বলে ফেলতে পারে তা হলেও ঠাট্টা করতে ছাড়বে না কেউ, আর সে ঠাট্টার মুখে মাথা তুলতে পারবে না অনিলেন্দু।

কিন্তু মাকে কিছুতেই বোঝাতে পারে না নিরুপমা। সেই পুরোনো দিনের অহংমিকা নিয়েই বসে আছেন। কিছুতেই বোঝেন না যে দিনকাল বদলে গেছে। তবু, সাহসে ভর করে এসে দাঁড়ালো ও সেদিন, আরো একবার বলে দেখবে।

ছোট বোন অনুপমা কপাট খুলে দিতে ফিসফিস স্বরে জিজ্ঞেস করলে, মা কোথায় রে অনু?

—শুয়ে আছে।

—ওঃ। মাথা ধরেছে বুঝি?

অনু কপাট বন্ধ করতে করতে বললে, না, এমনি।

বারান্দার আলো কিছুটা গিয়ে পড়েছে ঘরের ভেতর। সেই আবছা আলোতেই নিরুপমা দেখলে, মেঝের ওপর একটা মাদুর বিছিয়ে শুয়ে আছেন মা।

পা ধুয়ে ধীরে ধীরে এসে বসলো মা-র কাছে, চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে শান্ত গলায় ডাকলো, মা!

—কে, নিরু এলি?

—হ্যাঁ।

বলেই চুপ করে গেল নিরুপমা। মা-ও আর কোনো কথা বললেন না। চুল থেকে কাঁধ আর কনুই বেয়ে এসে নিরুপমার হাত মা-র আঙুলগুলো ভেঙে দিতে শুরু করলো।

মা বোধ হয় বুঝতে পারলেন।—কিছু বলবি আমাকে?

—না।

এত কথা ভেবে রেখেও হঠাৎ সাহস হারালো নিরুপমা। বলি-বলি করেও মুখে কথা গুছিয়ে নিতে পারে না।

বেশ কিছুক্ষণ নিশ্চুপ বসে থেকে শেষ অবধি বললে, মা, ও বলছিলো...

—দেখা হলো অনিলেন্দুর সঙ্গে? মা ব্যগ্র হয়ে প্রশ্ন করলেন।—আসতে বললি একদিন?

চোখ বুজে শুয়ে না থাকলে, আর বারান্দার আলোটা আরো বেশী যদি ঘরে ঢুকতে পেতো তা হলে হয়তো মা নিরুপমার ব্যথার হাসিটা দেখতে পেতেন।

নিরুপমা বললে, এই তো সেবার থেকে গেল দিন কয়েক। তা ছাড়া বারবার এলে পূর্ণিমারা কি ভাববে বলো তো?

মা জবাব দিলেন না এ কথার।

নিরুপমা আবার থেমে থেমে বললে, ও বলছিলো, খুব অসুবিধে হচ্ছে ওর, বাবা-মাকে এ বয়সে দেখবার লোকও নেই কেউ...

এবারেও কোনো জবাব এলো না। তাই, অভিমানে, চোখে তো দেখতে পেলেন না নিরুপমাকে, কিন্তু গলার স্বরটা তার ভিজে-ভিজে শোনালো।

নিরুপমা বললে, দুটো সংসারেই তো অভাব মা। তার চেয়ে চলো না তোমরা, এক জায়গায় থাকলে তবু কিছুটা সুরাহা হবে।

মা যেন চমকে উঠলেন।—কি যে বলিস নিরু! জামাইয়ের বাড়িতে গিয়ে শাশুড়ী থাকবে? কস্মিনকালে এমন কথা শুনিনি আমি। তোর বাবা বেঁচে নেই বলে কি এমন বিষ হয়ে উঠেছি তোর চোখে?

এর পর কি আর কোনো কথা চলে! চোখ ভিজে যায় নিরুপমার। অভিমানে, হতাশায়। বাবা মারা যাওয়ার পর সংসারের সব ভার তো তুলে নিয়েছে ও নিজের কাঁধে। ইচ্ছে করলে কি সব বাঁধন ছিঁড়ে দিয়ে সুখী হতে পারতো না ও? তার বদলে শুধুই মিথ্যের মুখোশ এঁটে জীবন ক্ষয় করছে কেন, কার জন্যে? বাবা বেঁচে থাকতে যে সচ্ছল অবস্থা ছিলো ওদের, তা থেকে অনেকগুলো ধাপ নীচে নেমে এসেও যে ঘরের দৈন্য বাইরে প্রকাশ হতে দেয়নি, তার সবটুকু দামই তো নিরুপমা দিয়েছে। বিয়ের পর যখন পাড়াপড়শীদের কাছে ঘন ঘন

শুনতে হয়েছে, নিরুপমা শ্বশুরবাড়ি যায় না কেন, তখন এত এত মিছে কথা কেন বলেছে ও? স্বামী বিদেশে থাকেন, বাড়ি পাননি, এইসব আজেবাজে কথা তো বলেছে ও মা ভাই বোন এদের জন্যেই। ইচ্ছে করলে কি দুজনের রোজগারে সুখের সংসার গড়তে পারে না ওরা? মণ্টু পাস করবে, বড় হবে, চাকরি করে নিরুপমার কাঁধ থেকে তুলে নেবে সংসারের ভার, তারপর ছুটি পাবে ও। কিন্তু তখন কি ঘর বাঁধার রোমাঞ্চ এতটুকুও অবশিষ্ট থাকবে ওর জীবনে?

অনিলেন্দুর আয়ের অঙ্কটায় লোভ নেই নিরুপমার। কিন্তু বুড়ো বাপ-মাকে ফেলে সে কখনো এসে থাকতে পারে এখানে!

একদিন ভুলে এমন কথাও বলে ফেলেছিলো নিরুপমা।

আর অনিলেন্দু হেসে বলেছিলো, পাড়াপড়শীরা কি ভাববে, এই লজ্জায় তো আমাকে বিদেশে পাঠিয়েছো, এমন কি মাঝেসাঝে যে যাবো তোমাদের ওখানে তারও রাস্তা রাখোনি। এর পর ঘরজামাই অপবাদ না দিতে পারলে বুঝি সুখ হচ্ছে না?

সে অপবাদ কি আর অনিলেন্দুরই, নিরুপমার লজ্জা নয়? কিন্তু পথ একটা খুঁজে বের করতেই হবে।

দুটো অভাবের সংসারকে এক করতে পারলে তবেই সচ্ছলতা আসবে কিছুটা, আর নিরুপমাকেও এভাবে রাত সাড়ে আটটায় গোপন রোমাঞ্চের মাঝপথেই দীর্ঘশ্বাসের দাঁড়ি টানতে হবে না।

নিরুপমার কোনো কথাই তো অনিলেন্দুর কাছে লুকনো নেই, তা অনিলেন্দু নিজেও বোঝে। বোঝে বলেই মাঝে মাঝে অনিলেন্দু তার মাকে বলে, তুমি গিয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এখানে নিয়ে এসো না। ওদেরও ব্যবস্থা হয়, তুমিও দেখাশোনার লোক পাবে।

অনিলেন্দুর মা চটে যান ছেলের কথায়। বলেন, তখনই বলেছিলুম, শুনলি না তো। ঘরের বউ আবার কবে চাকরি করেছে?

অনিলেন্দু হেসে উঠে বললে, চাকরি না করলে ওদেরই বা চলতো কি করে বলো?

--দেশসুদ্ধ লোকের চলছে না? সবাই বুঝি চাকরি করছে? বউমাকে তুই যত ভালো ভাবছিস তত ভালো সে নয়, বুঝলি?

অনিলেন্দু তবু হাসে।—আমি যা ভাবি তার চেয়েও ভালো সে। নিজের মা ভাইবোনদের জন্যে কোন্ মেয়ে এমন করে দেখাও তো?

—দেখেছি, খুব দেখেছি। জবাব দেন অনিলেন্দুর মা। বলেন, স্বামী শ্বশুর শাশুড়ী এদের চেয়ে বড় হলো নিজের বাপের বাড়ি? চাকরি করুক না, তা বলে এখানে এসে থাকতে পারে না বউমা? মাসে মাসে নয় গোটা কয়েক টাকা ফেলে দিয়ে আসবে তার মাকে।

অনিলেন্দু যেন চমকে ওঠে এ কথা শুনে। এতখানি স্বার্থপর হতে বলবে ও নিরুপমাকে? এতখানি নৃশংস? তার চেয়ে ভাববে, বিয়েই করেনি ও, রোমাঞ্চের কোনো মধুলগ্নই আসেনি ওর জীবনে। হ্যাঁ, শুধু একটু নিয়ন আলোর রহস্য, কালো ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া, ব্যথা আর হাসি, পাশাপাশি পা ছড়িয়ে অন্ধকারের জলে ভাঙা চাঁদের ছবি দেখা আর কৌতুকহাসিতে হঠাৎ ঢলে পড়ার ঈষৎ স্পর্শ। এইটুকু পেয়েই সন্তুষ্ট থাকবে ও। নিরুপমাকে বলবে, এই ভালো।

নিরুপমা শুনলো সব। অনিলেন্দুর কোনো কথা কি ওর কাছে গোপন থাকতে পারে! তাই নিরুপমা শুনলো, শুনে যত না রাগলো অনিলেন্দুর মা-র ওপর, তার চেয়ে বেশী নিজের পঙ্গু সংসারের ওপর। বিতৃষ্ণায় ভরে গেল ওর মন।

সত্যিই তো। নিরুপমাকে নিজের থেকেই কি বলতে হবে নাকি? মা বোঝেন না কোন্‌টা উচিত-অনুচিত? টের পান না মেয়ের মনে কি ঝড় থমকে আছে?

বললেই তো পারেন। যেমনভাবে বলেন, অনিলেন্দু এসে থাকলেই তো পারে মাঝে-সাঝে, তেমনিভাবে বলতে পারেন না, নিরু গিয়ে থাকলেই তো পারিস দিনকয়েক!

শেষ অবধি নিরুপমাকেই বলতে হলো—বলছিলাম...ও বলছিলো বাড়িতে অসুখ-বিসুখ ...দিনকয়েক গিয়ে থাকবো আমি?

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর মা-র দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেলো নিরুপমা। মা বললেন, যা

ভালো বুঝিস। তোর বাবা বেঁচে থাকলে কি...

অভিমানে কথা শেষ করতে পারেন না। আর সে অভিমানের স্বর বিদ্রূপের মতো শোনায় নিরুপমার কানে। কি আশ্চর্য, অবিশ্বাস করছেন, বেশ বুঝতে পারে নিরুপমা। ভয় পাচ্ছেন। নির্ঝঞ্ঝাট সুখের স্বাদ পেলে মেয়ে হয়তো সব ভার নামিয়ে দেবে মাথা থেকে। অথচ বাবা বেঁচে থাকতে মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাবার জন্যে মা কতদিন ঝগড়া করেছেন। লুকিয়ে কখনো ডাকপিয়নের কাছে, কখনো অনুর কাছে জিজ্ঞেস করেছেন, নিরুপমার নামে কোনো চিঠি এসেছে কি না। আর যেদিন এসেছে তেমন চিঠি, সেদিন যেন খুশিতে দু চোখ ভরে গেছে তাঁর, আদরে আনন্দে নিরুপমাকে সামনে বসিয়ে চুল বেঁধে দিয়েছেন, নিজের দামী শাড়িটা বের করে পরতে বলেছেন, গলার হার খুলে পরিয়ে দিয়েছেন নিরুপমার গলায়।

সেই মা আজ কিনা দেয়াল গাঁথতে চাইছেন নিরুপমা আর অনিলেন্দুর মাঝখানে! কিন্তু এ দেয়াল ভাঙতেই হবে। সেতু গড়তে হবে দুটি জীবনের। তা না হলে কার মুখ চেয়ে বাঁচবে ও। কেন বাঁচবে?

অনিলেন্দুর কাছে শোনা এক সারি রূঢ় কথা ওর চোখের সামনে ভেসে উঠলো।—বউমাকে তুই যত ভালো ভাবছিস, তত ভালো সে নয়, বুঝলি! কথাগুলো হাসতে হাসতেই বলেছিলে। অনিলেন্দু, দেখোনি শক্ত দেয়ালটাও ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। দেখা দিয়েছে সেতুর ইশারা। নিরুপমার মুখের হাসিটা কত ম্লান হয়ে গিয়েছিলো।

না। স্বার্থ নিয়েই মা যখন ওকে বেঁধে রাখতে চান, তখন নিরুপমাও স্বার্থ দিয়েই নিজের পথ তৈরি করে নেবে। মা তো জানেন না যে, আর সে খবর মাকে জানাতে ভয় পেয়েছে নিরুপমা। কিন্তু অনিলেন্দুকে ভয় নেই তার। তার ছায়াতেই সব ক্লান্তি দূর হবে।

আজ বুঝি বা নিজেকে সংযত রাখতে পারবে না নিরু, আজ বুঝি মাকে ক্ষমা করতে পারবে না। ক্রোধে হতাশায় কেঁপে উঠলো যেন। এতদিন তো নিয়ে যেতে চেয়েছে অনিলেন্দু। আজও কি বলবে না? তা হলেই তো সব ভার, সব বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে যেতে পারে নিরুপমা।

প্রতিদিনের মতোই নিয়ন আলোয় ধোয়া ফুটপাথ ঘেঁষে এসে দাঁড়ালো ও লাইটপোস্টের নীচে। তারপর অন্ধকার পথ বেয়ে চাঁদ-চমকানো জলের ধারে পা ছড়িয়ে বসলো পাশাপাশি। অপেক্ষা করলো। তারপর, একসময় অনিলেন্দু প্রশ্ন করলো, যাবে?

এ প্রশ্ন বহুবার করেছে অনিলেন্দু, আর প্রতিবারেই অসম্মতি জানিয়েছে ও। কিন্তু মায়া মমতা স্নেহ সব ধুয়ে-মুছে অনিলেন্দুর ছায়ায় নিজেকে মিশিয়ে ফেলতে এসেছে আজ। বলতে এসেছে, যাবো, যাবো।

অনিলেন্দু আবার প্রশ্ন করলো, যাবে?

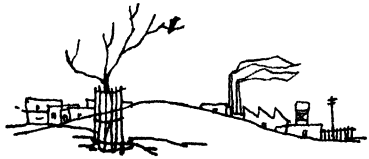
এক মুহূর্ত চুপ করে রইলো নিরুপমা। তারপর ধীরে ধীরে হাত বাড়িয়ে অনিলেন্দুর হাতটা স্পর্শ করলো ও।

অনিলেন্দু টের পেলো থরথর করে কাঁপছে নিরুপমার হাত।

তারপর হঠাৎ একসময় কান্নায় ভেঙে পড়লো নিরুপমা, অনিলেন্দুর বুকে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললে, কি করে যাবো বলো? কি করে যাবো?

অনিলেন্দু ধীরে ধীরে একটা হাত রাখলো নিরুপমার পিঠে। কোনো কথা বললো না।

[১৩৬০



রুমাবাঈ

যখনকার কথা বলছি আনারবাগ তখন নেটিভ স্টেট ইনামপুরের রাজধানী। নতুন বা পুরোনো কোনো মানচিত্রেই অবশ্য এ নাম দুটো খুঁজে পাবেন না। কারণ, নিখাদ সত্যি ঘটনাটা বলবার মতো দুঃসাহস আমার নেই এবং বলা হয়তো উচিতও নয়। ডাল্টনবাজারের ইতিহাস আমি যেভাবে মহুয়া-মিলনের নামে চালিয়েছি, রুমাবাঈকে নিয়ে গল্প লিখতে হলেও সেই পন্থাই অনুসরণ করতে পারতাম। কিন্তু যে স্টেটেরই নাম দিই না কেন, কে বলতে পারে সেখানেই রুমাবাঈ ধরনের অন্য কোনো চরিত্র আছে কি না। গল্পকে নিছক গল্প হিসেবে স্বীকার করেন না, এমন পাঠকের অভাব নেই এবং সে কারণেই সম্প্রতি আমি একটু বিপদেও পড়েছিলাম।

রুমাবাঈ অবশ্য আজ আর বেঁচে নেই, থাকলেও এ গল্প পড়ে হয়তো খুশীই হতেন। কিন্তু উষ্মা প্রকাশ পেতো রাজা প্রতাপকিঙ্কর চন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুরের ব্যবহারে।

আশ্চর্য এই যে, আনারবাগের পঞ্চান্ন বছরের আধ-পাগলা রাজা বাহাদুরের কাছে রুমা-বাঈয়ের চরিত্রের কোনো দিকটাই অজ্ঞাত ছিলো না।

রাজা বাহাদুরের খাস আস্তাবলের হেড সহিসের সুন্দরী স্ত্রী জাহানারার সঙ্গে প্রতাপ-কিঙ্কর চন্দ্রনারায়ণ সিংহের নাম জড়িয়ে গোপনে হাসাহাসি করতো অনেকে এবং পরপর নানা ঘটনার সূত্র জুড়ে কিউ ই ডি লিখে প্রমাণ করে দিতো যে রুমাবাঈ আসলে রাজা বাহাদুরের মেয়ে।

হলেও আপত্তি করবার কিছু ছিলো না। রূপে এবং বলা বাহুল্য যৌবনে, রুমাবাঈ ছিলো একেবারে ষোলো আনা রাজকন্যে।

তখন পর্যন্ত আমি রুমাবাঈ নামটাই শুনেছি, স্বচক্ষে তাঁর দর্শন পাবার সৌভাগ্য হয়নি। কারণ, আমি ইনামপুর স্টেটের প্রজা ছিলাম না। আনারবাগের নতুন সুগার ফ্যাক্টরীতে চাকরি নিয়ে গিয়েছিলাম সেখানে।

এখন অবশ্য আমি ইনামপুর স্টেটের পাইক-বরকন্দাজের নাগালের বাইরে এবং রাজা বাহাদুরের প্রতাপও এখন শুধু তাঁর নামেই, তাঁর স্বেচ্ছাচারের আইন এখন ঠুঁটো হয়ে গেছে। তবু তাঁকে ভয় করার একটি কারণ আছে। যে হেভি কেমিক্যাল ফ্যাক্টরীটায় আমি এখন চাকরি করছি, তার রেসিডেন্ট ডিরেক্টর কালে সাহেব প্রতাপকিঙ্করের পিয়ারের দোস্ত।

সুপারিশ পেয়েছিলাম, কিন্তু আমি লোকটা যে কে তা রাজা বাহাদুর স্বচক্ষে কোনো দিন দেখেননি। স্বচক্ষে তিনি কিছুই দেখতেন না। ফরসা গোলগাল চেহারা, বাকীটা ভোজপুরী দরোয়ানের মতো। আর সেই শরীরের ওপর একরাশ মখমলের রাজবেশ, মখমলের ওপর সোনালী জরি, লাল-নীল নানা দুর্মূল্য পাথর চুমকির মতো বসানো। সিংহাসনে বসে মাথায় মুকুট পরে একটা ছবি তুলিয়েছিলেন প্রতাপকিঙ্কর, আর সেই ছবিটাই তিন রঙে ছাপা ক্যালেন্ডার হয়ে আমাদের সকলের মেসে কোয়ার্টারে শোভা পেতো।

তাই রাজা বাহাদুরকে আমরা সকলেই চিনতাম। চিনতাম না রুমাবাঈকে।

সেদিন শুক্লা তিথির জোছনার রাতে শরীরে মলমল জড়িয়ে কোথায় রোমান্সের পক্ষিরাজে উড়ে বেড়াবার কথা, তা নয়, হঠাৎ কেমন যেন বেতো বুড়োর মতো খিটখিটে হয়ে উঠেছিলাম। হয়তো চাকরির ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়েই।

এক শো পঁচিশ টাকা মাইনেতে বহাল হয়ে গিয়েছিলাম আনারবাগের সুগার ফ্যাক্টরীতে, যে কারখানার স্বত্বাধিকারী ছিলেন স্বয়ং রাজা প্রতাপকিঙ্কর চন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর। আর যেহেতু স্টেটের দেওয়ানজী মিস্টার রায় এবং চিনির কারখানার মাদ্রাজী ম্যানেজার মিস্টার

কৃষ্ণস্বামী, এ দুজনের একজনেরও আশ্রিত লোক ছিলাম না সেইজন্যেই হয়তো স্থায়িভাবে আমাকে রাতের শিফ্‌টে ফেলে দিয়েছিলেন অ্যাসিস্টেন্ট প্রোডাকশন ম্যানেজার করিম সাহেব।

ডাকে-পাওয়া নিয়োগপত্রটি নিয়ে যেদিন প্রথম হাজির হলাম করিম সাহেবের কামরায়, সেদিনই টের পেয়েছিলাম, কপালে কি দুর্ভোগ আছে।

ফাইল ঘেঁটে আমার দরখাস্তটার ওপর চোখ বুলিয়ে কি যেন খুঁজে পেলেন না করিম সাহেব। অন্তত তাঁর মুখচোখ দেখে তাই মনে হয়েছিলো।

আর সেইজন্যেই বোধ হয় ভুরু কুঁচকে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, কার লোক তুমি?

প্রশ্নটা বুঝতে পারি না। কিন্তু বুঝতে না পারলে যে শুনতে পাইনি এমন একটা মুখ-ভাব করে বেগ ইওর পার্ডন বলতে হয় সে বিদ্যে রপ্ত ছিলো।

করিম সাহেব উলটে চটেই গেলেন।

—কানে কম শোনো নাকি? কার লোক তাই জিজ্ঞেস করছি।

বললাম, আজ্ঞে তা তো জানি না, কাগজে কেমিস্ট চাই বিজ্ঞাপন দেখে অ্যাপ্লাই করে-ছিলাম।

—আই সী! অস্ফুটে বললেন করিম সাহেব, তারপর আমার নিয়োগপত্রের এক কোণে লাল কালিতে লিখলেন, রেকমেনডেড ফর নাইট শিফ্‌ট। লিখে নীচে নাম সই করে বললেন, ঐ যে গলাবন্ধ কালো কোট পরে কেরানীবাবু বসে আছেন, ওঁর কাছে যাও। গিয়েছিলাম এবং যাওয়ার পর সেই যে শিফ্‌টের ইনচার্জের সঙ্গে তিনি আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন তারপর থেকে একদিনের জন্যেও দিনের শিফ্‌টে বদলি হতে পাইনি।

ফলে সারা রাত ডিউটি দিয়ে এসে সারা দিন পড়ে পড়ে ঘুমোতাম, আনারবাগের লোক-জনের সঙ্গে ভালো করে আলাপ করার সুযোগ পাইনি। তাই বোধ হয় সেদিন ঘুরন্ত পিনিয়নটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেমন যেন একটা অসহ্য বিতৃষ্ণা জমা হচ্ছিলো মনের মধ্যে।

কারখানাটা ছিলো বেশ খানিকটা উঁচু টিলার গায়ে। কিছুটা সমতল জমি কারখানার এলাকা পার হয়ে, তারপর ঢালু নেমে গেছে নীচের কুলিকামিনদের বস্তি অবধি।

একটা মোটা জলের পাইপ অতিকায় একটা অজগরের মতো নেমে এসেছে ওপরের রিজার-ভয়ার থেকে, এসে ঢুকেছে কারখানার ভেতরে। কুলিমজুরের হট্টগোল এড়িয়ে বাইরে বসে ছিলাম পাইপটার ওপর। বসে বসে দেখছিলাম আনারবাগের রূপ।

পূবের সীমান্তে যত দূর চোখ যায় শুধুই হিমাচলের আঁকাবাঁকা তরঙ্গ। যেন সুদীর্ঘ একখানি শ্যামল শাড়ি বিছানো আছে আকাশের গায়ে। জ্যোৎস্নার রোশনাই লেগে তুষারশুভ্র হিমচূড়ার রেখাটি যেন ফিকে রুপোলী রঙের পাড়। কোনো দৈত্যের কঙ্কালের মতো চারপায়া উঁচু রিজারভয়ারের ধোঁয়াটে আকাশের গায়ে বড় এক টিপ চাঁদ।

আনমনা উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম সেদিকে।

মেশিন চলছে। কেরিয়ার থেকে আখের রাশি ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে ক্ষিদে মেটাচ্ছে রসলোভী যন্ত্রের।

অবিরত শোঁ-শোঁ শব্দ, আর পিনিয়নের মূর্ছনা। পিনিয়নের দাঁতে দুটি বিশাল হিংস্র চাকার মধ্যে রাশি রাশি আখ মাড়াই হচ্ছে, এক দিকে জমা হচ্ছে ছোবড়ার রাশ, আর অন্য দিকে একটি উন্মুক্ত চোঙা বেয়ে ঢলে পড়ছে আখের রস।

হঠাৎ লক্ষ করলাম একটি ছায়াশরীর এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে।

এতখানি দূর থেকে স্পষ্ট দেখা গেল না, কিন্তু লোকটি যেন এক আঁজলা রস তুলে পান করবার জন্যে ঝুঁকে পড়লো।

কুলিমজুরদের সঙ্গে কাজ করে করে মেজাজটাও হয়ে উঠেছিলো রুক্ষ।

চিৎকার করে উঠলাম।—এই বেকুফ!

ছায়াশরীর সোজা হয়ে দাঁড়ালো, শব্দ লক্ষ করে তাকালো আমার দিকে।

এগিয়ে যেতে যেতে রুক্ষ স্বরেই বললাম, কি করছিলে?

কিন্তু ততক্ষণে আমি আরো কাছে পৌঁছে গেছি। চাঁদের আলোর তার শরীরের রেখা

স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পুরুষ নয়।

বব করা নরম চুল, উলের আঁট ব্লাউজ, ট্রাউজারের কোমরে হাত দিয়ে দৃপ্ত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে রইলো সে।

—বলছিলে কিছু? পরিষ্কার উর্দুতে নারীকণ্ঠের শান্ত প্রশ্ন শুনলাম।

গলার স্বর আপনা থেকেই নরম হলো, বললাম, কি করছিলেন আপনি? এ রসে হাত দেওয়া বে-আইনী।

মেয়েটি হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠলো।—বে-আইনী? বলে চুপ করলে মেয়েটি। —আমি কে জানো হে ছোকরা? আমি রুমাবাঈ।

রুমাবাঈ! সমস্ত শরীরে যেন শিহরন খেলে গেল। আর পরমুহূর্তেই কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করলাম। অস্বস্তি, না ভয়?

আপনা থেকেই গলার স্বর শান্ত হলো। যন্ত্রচালিতের মতো তিনবার কুর্নিশ করে তিন পা পিছিয়ে এলাম, সন্ধ্যের সময় একদিন দেওয়ানজী মিস্টার রায় কারখানা দেখতে আসায় ম্যানেজার মিস্টার কৃষ্ণস্বামী যেভাবে কুর্নিশ করেছিলেন ঠিক সেইভাবে।

তারপর মাথা তুলে দেখলাম রুমাবাঈ যেন কৌতুকের হাসি হাসছেন। হাসতে হাসতেই বললেন, নতুন এসেছো, না? কোথাকার লোক তুমি?

—বেঙ্গল। ছোট্ট একটি কথা, তাও যেন জিভে জড়িয়ে গেল।

—তাই বলো। কিন্তু একটু ভদ্র হতে চেষ্টা কোরো। কারণ এটা বাংলা দেশ নয়, আর রুমাবাঈয়ের ইচ্ছাটাই এখানে আইন।

এত চেষ্টা করেও হাত দুটোকে পরস্পর থেকে পৃথক রাখতে পারলাম না, হাত কচলাতে কচলাতে বললাম, এ রস তো খেতে পারবেন না, এতে ধুলো-বালি-ময়লা মিশে আছে, একটু অপেক্ষা করেন তো ভালো টাটকা রস এনে দিচ্ছি। বলে উত্তরের অপেক্ষা না করেই ছুটে গেলাম।

মিনিট দুই পরে কাঁচের গ্লাসে টাটকা এবং ছাঁকা পরিষ্কার রস নিয়ে যখন ফিরে এলাম তখন রুমাবাঈ উধাও। এদিক-ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ দেখতে পেলাম প্যালেসের দিকে এঁকে-বেঁকে যে রাস্তাটা এগিয়ে গেছে সেই রাস্তার ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে একখানা মোটরবাইক। আর মোটরবাইকের আরোহীর দেহরেখাটা যেন রুমাবাঈয়ের মনে হলো।

সে রাত্রিতে আর কাজে মন বসলো না! একটি নাম কেবলই ঘুরে বেড়ালো কানের চার-পাশে, বিভীষিকার মতো। রুমাবাঈ! রুমাবাঈ!

কারখানার প্রতিটি কর্মীর কাছে কতবার শুনেছি এ নাম। কত গোপন রসিকতা, কত অবোধ্য রহস্য। ভয় আর ভালোবাসা। বিদ্যুতের মতো যার আকর্ষণ। বিদ্যুতের মতোই যার চোখে মৃত্যুর পরোয়ানা।

সমস্ত শরীরে জ্বরাতুর উত্তাপ আর মনে দুশ্চিন্তার পাথর নিয়ে বাসায় ফিরেছিলাম সে রাত্রে।

তারপর দুপুরে একসময় ডাক পড়েছিলো করিম সাহেবের কাছে।

ভয়ে ভয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

করিম সাহেব একরাশ কাগজপত্রের মধ্যে মাথা ডুবিয়ে বসে ছিলেন, মাথা না তুলেই বললেন, নাইট শিফ্‌টে তুমি ছাড়া আর কোনো বাঙালী আছে?

বললাম, না স্যার।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন করিম সাহেব, মাথা তুললেন না। তারপর একসময় হঠাৎ বললেন, তোমার সাহস তো কম নয়, ম্যানেজারের কাছে কমপ্লেন করেছো আমার নামে?

—কমপ্লেন করেছি? বিস্মিত হলাম।

—করোনি? নাইট শিফ্‌টে রেখেছি বলে দরখাস্ত করোনি তুমি?

—না স্যার।

—হুঁ। আচ্ছা যাও, কাল থেকে ডে শিফ্‌টে কাজ করবে। করিম সাহেব এবারেও মাথা না তুলেই বললেন।

চলে আসছিলাম, হঠাৎ বললেন, মিস্টার কৃষ্ণস্বামীর সঙ্গে দেখা করো.

দুর্বোধ্য বিস্ময় আর আশঙ্কার অনুরণন বাজলো মনের কোণে। তবু ভয়ে ভয়ে গিয়ে দেখা করতে হলো ম্যানেজার মিস্টার কৃষ্ণস্বামীর সঙ্গে।

নমস্কার করে বললাম, ডেকেছেন আমাকে?

অনেকক্ষণ ধরে আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে মিস্টার কৃষ্ণস্বামী বললেন, দেওয়ানজী মিস্টার রায় তোমার রিলেটিভ? আগে বলোনি কেন?

বললাম, আজ্ঞে না, দেওয়ানজী আমাকে চেনেনও না।

কৃষ্ণস্বামী হাসলেন।—চেনেন না? অথচ তোমাকে ডে শিফ্‌টে বদলি করবার জন্যে ফোন করেছিলেন আমাকে?

বললাম, বিশ্বাস করুন—

—রাতের শিফ্‌টে তো তুমিই একমাত্র বাঙালী?

বললাম, হ্যাঁ স্যার।

কৃষ্ণস্বামী কি যেন চিন্তা করলেন, তারপর বললেন, আচ্ছা যাও। কাল থেকে ডে শিফ্‌টে।

চলে এলাম। কিন্তু যে খবর শুনে খুশী হয়ে ফিরে আসার কথা, সে খবর শুনেই কেমন আতঙ্ক বোধ করলাম।

দেওয়ানজী মিস্টার রায়। তিনি বলেছেন আমাকে দিনের শিফ্‌টে বদলি করতে? কেন? আমাকে চিনলেনই বা কি করে? ভাবলাম, কে জানে, আমি যে বাঙালী সে খবর হয়তো তাঁর কানে গেছে। তাই তিনি রাত্রির নির্যাতন থেকে রক্ষা করতে চেয়েছেন আমাকে। কিংবা, কে জানে, দেওয়ানজীর সুপারিশে চাকরি-পাওয়া বীরেন বক্সীই হয়তো সহকর্মীর জন্যে এ কাজটুকু করে দিয়েছে।

দিনের পাল্লায় আমি এবং বীরেন বক্সী ছাড়াও আরো পাঁচজন বাঙালী ছিলো। তাই কাজের সঙ্গে আড্ডা গল্পগুজব যেন অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে গিয়েছিলো। কৃষ্ণস্বামী এবং করিম সাহেব সাধারণত দপ্তরেই বসে থাকতেন, দু-এক মিনিটের জন্যে যদি বা আসতেন তো বাতাসের আগে সাবধানবাণী পৌঁছে যেতো।

সেদিনও অমনি কানে কানে খবর এলো, রুমাবাঈ আসছে, রুমাবাঈ আসছে। সঙ্গে দেওয়ানজী।

মিনিট কয়েক পরে কৃষ্ণস্বামী এবং করিম সাহেবের সশ্রদ্ধ পথপ্রদর্শনকে তাচ্ছিল্যভাবে উপেক্ষা করতে করতে রুমাবাঈ এগিয়ে এলেন। মেশিন নয়, মানুষগুলোর দিকেই যেন তাঁর চোখ। কিন্তু ছিমছাম চেহারার দেওয়ানজীর দৃষ্টি কাজের দিকে। আমরা দেখলাম শুধু রুমাবাঈকে।

সেদিন রাত্রিতে রুমাবাঈকে দেখেছিলাম, আর এ রূপ যেন ভিন্নজনের। দামী রেশমের শালোয়ার আর পাঞ্জাবিতে তাজা রক্তের বর্ণাভা, সলমা-চুমকির ঝলমলানি আর গোলাপী ওড়নার প্রান্ত লুটিয়ে আছে যৌবনোদ্দীপ্ত বুকের ওপর। চোখের নীচে সূক্ষ্ম সুর্মার লোভানি। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দৃষ্টি, সুডৌল হাত যেন গোলাপের পাপড়ি দিয়ে মাজা, যৌবন-পুষ্ট জঙ্ঘায় অস্থির চঞ্চলতা।

ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ আমার দিকে চোখ পড়লো, কাছে এগিয়ে এলেন রুমাবাঈ। কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই বিজন আচার্যের দিকে দৃষ্টি ফিরলো তাঁর।

—এই ছোকরা, শোনো এদিকে।

বিজন এগিয়ে এলো, কুর্নিশ করে সামনে দাঁড়ালো।

রুমাবাঈ জিজ্ঞেস করলেন, কি নাম তোমার?

নাম বললে বিজন।

আমাদের ফ্যাক্টরীর তৈরী এক মুঠো চিনি দেখালেন মিস্টার কৃষ্ণস্বামী।

সন্তুষ্ট হলেন না রুমাবাঈ।—এ তো স্রেফ ধুলো, এর চেয়ে বড় দানা হয় না?

জাভা চিনির নমুনাটা কারখানার তৈরী বলে দেখিয়ে দিলেন কৃষ্ণস্বামী। বললেন, দু-রকমই হয়।

দেখে সন্তুষ্ট হলেন রুমাবাঈ। ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেলেন।

আর ওঁরা সদলবলে চলে যাওয়ার পর ঠাট্টা শুরু করলাম আমরা বিজনকে নিয়ে।

আমার চেয়ে বয়েসে ছোটই ছিলো বিজন। কিন্তু শুধু সেইজন্যেই নয়, বিজনের ওপর আমাদের সকলেরই কেমন একটা দুর্বলতা ছিলো অন্য কারণে। রুমাবাঈকে দোষ দেওয়া যায় না, কোনো নারীমন বিজন আচার্যের প্রতি আকৃষ্ট না হ'য়ে পারে না। সুন্দর সুপুরুষ চেহারা, আর সে চেহারার চুল এবং চোখে কি অনুপম মাধুর্য। অথচ পোশাক-পরিচ্ছদ নোংরা, সব সময়েই মেশিনের তেল আর কালি লেগে আছে। তার কারণ, বিজনের চাকরিটা ছিলো অতি নগণ্য। মেশিন পরিষ্কার করা, দাঁতে দাঁতে মোবিল ঢালা; মাইনে ছিলো পঞ্চাশ টাকা, সে বাজারেও তা লোভনীয় ছিলো বলেই বাংলাদেশ ছেড়ে এত দূর আসতে হয়েছিলো তাকে।

কিন্তু আমাদের প্রাদেশিক আভিজাত্যে ঘা লাগতো তার জন্যে। বিজনের চেয়েও তো কম কোয়ালিফায়েড লোক ছিলো ইনামপুর স্টেটের সুগার ফ্যাক্টরীতে। অথচ বিজনের বেলাতেই কিনা এমন চাকরি?

সেই বিজনকে ডেকে কথা বলেছেন রুমাবাঈ, সুতরাং রসিকতা করতে ছাড়বো কেন আমরা।

বললাম, দেখিস ভাই, সেদিন রাত্তিরে খুব ফাঁড়া কেটে গেছে, বিপদে পড়লে বাঁচাস বিজন।

শুধু বক্সী হেসে বললে, সাবধান বিজন, রুমাবাঈ কিন্তু একটি আসল 'কেন ক্রাশার'। আখ হয়ে ঢুকলে—

নিষ্কাশিত-রস ছিবড়ের স্তূপটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে হাসলো বক্সী।

রহমান, আয়ার, মিশ্র কেউই ঠাট্টা করতে কসুর করলে না।

কিন্তু ঠাট্টা যে সত্যি হতে পারে তা আমরা কেউ কল্পনাও করিনি।

আনারবাগের একটা দিকের নাম ছিলো বাঙালীটোলা। স্টেটের বাঙালী চাকুরেরা সকলেই থাকতেন সেই পাড়ায়, একমাত্র দেওয়ানজী মিস্টার রায় ছাড়া। বাঙালীটোলার কালীমন্দিরের পাশেই ছিলো একটা মেস, আর সেই মেসে আমরা জন পঁচিশেক লোক থাকতাম। সুগার ফ্যাক্টরীর সাতজন, হেভি কেমিক্যাল-এর কয়েকজন, আর্ট স্কুলের একজন শিক্ষক, মেয়েদের কলেজের একজন কেরানী এবং আরো যেন কে কে। বৃহস্পতিবারটা ছিলো আমাদের ছুটির দিন।

সকালের চা আর ডাকযোগে-আসা বাসী খবরের কাগজ নিয়ে বারান্দায় বসে আছি আমরা, হঠাৎ লাল রঙের টু-সীটারখানা দেখা দিলো।

শোঁ করে বাঁক নিয়ে একেবারে আমাদের বারান্দার সামনে এসে দাঁড়ালো গাড়িটা।

দেখলাম, স্টিয়ারিং ধরে বসে আছেন রুমাবাঈ।

মেসের দরোয়ানটা ছুটে গেল, ফিরে এলো তটস্থ হয়ে। আচারিয়া সাহেবকে ডাকছেন রুমাবাঈ।

হাঁটুতে হাঁটু ঠেকলো বিজনের, ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে দাঁড়ালো বিজন, আর আমাদের চোখের সামনেই বিজনকে পাশে বসিয়ে রুমাবাঈ গাড়ি ছেড়ে দিলেন।

হতভম্ব হয়ে বসে রইলাম সকলে। এমন ঘটনা যেন গল্পেই ঘটে। গল্পেও নয়। শুধু দুর্নামী রটনায়।

বক্সী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, লাজ-লজ্জার বালাই নেই। একেবারে—

জানি না, বক্সী হয়তো এখনো আনারবাগেই আছে, সুতরাং তার শেষ কথাটা না বলাই ভালো, কিন্তু মানুষ কথায় আর কতটুকু প্রকাশ করতে পারে, মনের পুঞ্জীভূত ঘৃণাকে ভাষা দেবার মতো বাহন হয়তো এখনো আবিষ্কৃত হয়নি।

রুমাবাঈ! যে নামটা এতদিন ছিলো বিস্ময়ের, আশঙ্কার, আতঙ্কের কণ্ঠে উচ্চারণ করবার মতো, সেই নাম যেন ঘৃণার মন্ত্র হয়ে দাঁড়ালো। আর দুঃখ হলো বিজনের জন্যে। ওর কি দোষ কি করতে পারে ও বেচারী, এই অনাচারের রাজত্বে।

কিন্তু আমরা নিজেরাও বুঝতে পারিনি, কখন থেকে বিজনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে

তাকেও ঘৃণা করতে শুরু করেছিলাম।

প্রথম দিন বিজন ফিরে আসার পর জিজ্ঞেস করেছিলাম, কোথায় গিয়েছিলি, কেন ডেকে নিয়ে গেল?

শুনে হেসেছিলো বিজন।—তোমরা যা ভাবছো তেমন কিছু নয়।

আমরা কিন্তু বিশ্বাস করিনি। না করারই কথা। দিনে দিনে পরিবর্তন লক্ষ করতাম বিজনের। পোশাক-পরিচ্ছদে সব সময়েই ফিটফাট হয়ে থাকতো বিজন। কোনো দিন নিজেই আসতেন রুমাবাঈ, কোনো দিন বা গাড়ি পাঠিয়ে দিতেন।

প্যালেসের দরজী শেখসাহেব আসতো কোনো কোনো দিন, আর আমরা যেভাবে কুর্নিশ করেছিলাম রুমাবাঈকে, সেইভাবেই বিজন আচার্যকে কুর্নিশ করতো দরজীটা।

দেখে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করতাম আমরা। কিন্তু বিজনের সামনে হাসিঠাট্টা করতে সাহস হতো না। বুঝতে পারি না, আপনা থেকেই বিজনকে ভয় পেতে শুরু করেছি আমরা।

ইতিমধ্যে ধাপে ধাপে চাকরিতে উন্নতি হচ্ছিলো বিজনের। মেশিন-ইন-চার্জ থেকে সুপারভাইজার, সুপারভাইজার থেকে প্রোডাকশন ম্যানেজার। যিনি প্রোডাকশন ম্যানেজার ছিলেন তাঁকে বদলি করে দেওয়া হলো হেভি কেমিক্যালের ফ্যাক্টরীতে। আর আমি হলাম ব্লিচিং ডিপার্টমেন্টের কেমিস্ট-ইন-চার্জ। মাইনে এক পয়সা বাড়লো না, বাড়লো কাজ।

সেইজন্যেই যত রাগ গিয়ে পড়লো বিজনের ওপর। যার জন্য সহানুভূতি দেখাতাম, তাকেই ঈর্ষা করতে শুরু করলাম।

সহানুভূতি থেকে ঘৃণা, ঘৃণা থেকে ভয়, ভয় থেকে ঈর্ষা। আশ্চর্য মানুষের মন! কথা-বার্তা একরকম বন্ধই হয়ে গিয়েছিলো। প্রয়োজনের সময়ে যে দু-চার কথা বলতাম তাও মেপেজুখে। যে অন্তরঙ্গতার সূত্রে বাঁধা ছিলাম আমরা তা থেকে যেন ছিটকে বেরিয়ে গেল বিজন!

মেস ছেড়ে অন্য একটা বাড়িতে উঠে গেল ও, আর আমরা একজোট হলাম ওর বিরুদ্ধে। আলোচনা করতাম, ষড়যন্ত্র করতাম কিভাবে জব্দ করা যায় বিজনকে।

নাইট শিফ্‌টের সকলেই ছিলো আমার পরিচিত। তারা জানতো, প্রোডাকশন ম্যানেজার হওয়ার যোগ্যতা নেই বিজনের। তার না ছিলো শিক্ষা, না অভিজ্ঞতা। তবু কেন সে সকলের মাথার উপর চড়ে বসে থাকবে!

এ. পি. এম. ছিলেন ধুরন্ধর লোক। বিজনের ওপর তিনিও ছিলেন অসন্তুষ্ট। তাই আমাদের কথা শুনে অসহযোগ শুরু করলেন তিনি। বিজনের আদেশটুকুই মানতেন, নিজের বিদ্যেবুদ্ধির সাজেশন দিয়ে এতটুকু উপকার করতেন না। ফলে, প্রোডাকশন কমতে লাগলো। এ ছাড়া, আজ এ মেশিন বন্ধ, কাল ওটা খারাপ। আর কেমিস্টের কারসাজিতে যা তৈরী হতে শুরু হলো, কাশীর চিনিও তার তুলনায় উঁচু দরের।

দ্রুত উন্নতির তালে তালে চলতে পারলো না বিজন, মেজাজ হয়ে উঠলো রুক্ষ।

বিজনের ব্যবহারে কুলিমজুরদের মধ্যেও অসন্তোষের বীজ ছড়িয়ে পড়লো।

তবু টনক নড়লো না ম্যানেজারের। খোদ রুমাবাঈ যার সহায়, তাকে আমরা অপদস্থ করবো কি করে।

ওদের সন্ধ্যাভিসার জ্বালা ধরিয়ে দিতো আমাদের মনে। কোনো দিন দেখতাম গুলাব মহলের ঝাউবাগানে পাশাপাশি হেঁটে চলেছে বিজন আর রুমাবাঈ। কোনো দিন বা পাহাড়ী ঝরনাটার ধারে জলে-ভাসা পাথরে বসে গল্পগুজবে মত্ত।

আশ্চর্য চোখ-ঝলসানো রূপ ছিলো রুমাবাঈয়ের। আসমানী স্বচ্ছ শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে জ্বলতো তার যৌবনের উদ্দামতা, স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য।

একদিন দেখেছিলাম, সংকীর্ণ গিরিপথ বেয়ে চলেছে এক জোড়া আরবী ঘোড়া। ফুট-ফুটে সাদা ঘোড়াটার পিঠে দৃপ্ত ভঙ্গীতে বসে আছেন রুমাবাঈ।

আরেকদিন দূরে থেকে দেখেছিলাম, সুইমিং কস্টিউম পরে স্নান করছেন রুমাবাঈ, ঝরনার জলে নেমে। সে কি হাসাহাসি, পরস্পরের গায়ে জল ছিটিয়ে সাঁতার কেটে দূরে পালানো।

স্নান সেরে একটি শ্বেতাভ পাথরের ওপর এসে দাঁড়ালো রুমাবাঈ। নারীর শরীর নয়, যেন জ্বলন্ত কামনা।

ধরা পড়ার ভয়ে দূর থেকে দেখেই পালিয়ে এসেছিলাম সেদিন।

কিন্তু বিজন পালিয়ে আসতে পারেনি।

ও হয়তো সত্যিই ভালোবেসে ফেলেছিলো রুমাবাঈকে। তা না হলে কি মোতিকুমারীকে বিয়ে করতে রাজী হতো ও?

খবরটা এনেছিলো বক্সী। শুনেছো ব্যাপার? বিজনের সঙ্গে মোতিকুমারীর বিয়ে দিতে চায় রুমাবাঈ।

—মোতিকুমারী কে? প্রশ্ন করেছিলাম।

বক্সী বিস্মিত হয়েছিলো? —সে কি? চেনো না তাকে? স্টেটের মেডিক্যাল অফিসারের মেয়ে। রোগা আর কুৎসিত চেহারার মেয়েটা, যে মেয়েদের স্কুলে টিচারি করে। দু-বেলা তো যায় এখান দিয়েই।

চিনতে পেরেছিলাম। যৌবনবয়সেও যে নারীদেহ কত কুৎসিত হতে পারে মোতিকুমারীকে না দেখলে বোঝা যাবে না।

তাই বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেছিলাম, বিয়ে দিয়ে রুমাবাঈয়ের লাভ?

বক্সী হেসেছিলো, উত্তর দেয়নি।

তারপর বলেছিলো, রাজকন্যার খেয়াল। তোমাকে যে রাতের শিফ্‌ট থেকে দিনে বদলি করিয়েছিলো, কেন? লাভ ছিলো ওর?

—সে কি? রুমাবাঈ বদলি করিয়েছিলো? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম।

বক্সী শুনে হাসলো। —জানতে না?

বললাম, কোন খবরটাই বা আমরা জানি। কিন্তু মোতিকুমারীর সঙ্গে যদি বিজনের বিয়ে হয় তা হলে খুশী হবো। কিংবা ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে যদি খোঁড়া হয়।

বক্সীও হেসেছিলো। —হবে, হবে। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।

যে-কোনোভাবে বিজনের ক্ষতি করতে পারলে, বিজনকে অসুখী দেখতে পেলে তখন সত্যিই খুশী হয়ে উঠতাম। আমাদের সকলের কাছেই ও তখন চক্ষুশূল।

কিন্তু ভেতরে ভেতরে বিজনও যে রুমাবাঈয়ের চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়িয়েছে, জানতাম না।

সন্দেহ হলো যেদিন শুনলাম চিনির কারখানা থেকে হেভি কেমিক্যালে বদলি হয়েছে বিজন।

বক্সী বললো, শুনেছো খবর? পাঁচ শো থেকে তিন শো টাকায় নামিয়ে দেওয়া হয়েছে বিজনকে।

—সত্যি?

আজ স্বীকার করতে লজ্জা হয়, কিন্তু সেদিন সত্যিই খুশী হয়েছিলাম। আমাদের সমস্ত পরাজয়, সব গ্লানি যেন মুছে গেল এই একটি খবরে।

ঠিক যেমনভাবে ধাপে ধাপে উন্নতির শিখরে উঠেছিলো, তেমনি ধাপে ধাপে নামতে শুরু করলো ও। আর আমরা সকলেই তার দুর্দশা দেখে আনন্দে আত্মহারা হলাম। কারণটা অজানা রইলো না। রাজা প্রতাপকিঙ্কর চন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর তখন তিনখানা ডাকোটা বিমান কিনেছেন, আনারবাগ থেকে বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ করবার জন্যে। আর এই ডাকোটা বিমানের পাইলট হয়ে যে তিনজন নবাগতের আগমন হলো তাদের একজন হলো নিহাল। পাঞ্জাবী হিন্দু অর্থাৎ দাড়িগোঁফ-চাঁচা সুশ্রী চেহারা, যেমন সুশ্রী তেমনি স্মার্ট।

এই নিহালের সঙ্গে প্রায়ই আকাশবিহারে যেতে শুরু করলেন রুমাবাঈ। শুনতে পেতাম রুমাবাঈ নিজেও নাকি প্লেন চালানো শিখছেন।

অসম্ভব মনে হতো না, কারণ রুমাবাঈয়ের পক্ষে কোনো কিছুই অসম্ভব ছিলো না। ধুলিয়াবাবার আশ্রমের পাশ দিয়ে যে শীর্ণ খাড়াই পথটা পাহাড়ের গা বেয়ে এঁকেবেঁকে টুমুরিয়ার দিকে উঠে গেছে সেই দুর্গম পথ বেয়ে যেদিন ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে দেখেছিলাম রুমাবাঈকে, তার পর থেকে ধারণা হয়েছিলো, রুমাবাঈয়ের পক্ষে সবই সম্ভব।

বৈমানিক নিহালের সঙ্গে মাঝে মাঝে রুমাবাঈকে দেখতে পেতাম আংরেজবাজারে। কখনো বা ইম্পিরিয়াল ক্লাবের টেনিস লনে।

দেখে খুশী হতাম আমরা, খুশী হতাম এই ভেবে যে, নিহাল বিজন নয়।

বিজন যেদিন হেভি কেমিক্যাল থেকে সুগার ফ্যাক্টরীতে ফিরে এলো, কৌতুকের হাসি হেসে বললাম, দেখছিস বক্সী, বাছাধনের মুখটা একেবারে চুন!

বক্সী হেসেছিলো।—দু-দিনের জন্যে খুব নবাবি করে নিলো যা হোক। ভাগ্যিস দেওয়ানজীর কানে তুলেছিলাম।

—তার মানে?

বক্সী হেসে বলেছিলো, রুমাবাঈ যদি কাউকে ভয় করে তো সে এক দেওয়ানজী।

যে বিজনকে দেখলে একদিন সকলেই ভয় পেতো, সে কোনো কালেই হাতি ছিলো না, দ্বিতীয় কাদায় পড়েছে। সুতরাং অন্য সকলেই আড়ালে টীকা-টিপ্পনী কাটতে শুরু করলো। প্রথম প্রথম আড়ালে, কিছুটা শুনিয়ে শুনিয়েই।

একদিন আবার মেস-বাড়িতেই ফিরে এলো বিজন। আগের মতোই মেলামেশা করবার চেষ্টা করলে। কিন্তু স্বাভাবিক হতে পারলাম না আমরা। কোথায় যেন চিড় খেয়েছে, জোড়া লাগানো গেল না।

ওকে এড়িয়ে চলতাম। ঘৃণা নয়, কেমন যেন কৌতুক বোধ করতাম ওর কথা উঠলেই। ওর পরাজয় যেন আমাদেরই জয়তিলক।

তবু মনের মধ্যে ঔৎসুক্য গুমরে মরছিলো, তাই চেপে রাখতে পারলাম না। একদিন বিজনকে একা পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেন এমন হলো বল্ তো বিজন?

বিষণ্ণ হাসি হাসলে ও। বললে, কি জানি। খানিক চুপ করে থেকে বললে, হয়তো মোতিকুমারীর জন্যে।

বিস্ময়ে মুখ তুলে তাকালাম ওর দিকে।

দুঃখের হাসি হেসে বিজন বললে, মানুষ যে কখন কাকে ঈর্ষা করে!

ঈর্ষা! যেন নিজের মনেরই প্রতিধ্বনি শুনলাম। সত্যিই তো, এই বিজনকেই একদিন ঈর্ষা করতে শুরু করেছিলাম আমরা। ঘৃণা করতাম? হ্যাঁ, ঘৃণা—কিন্তু সে তো ঐ ঈর্ষা থেকেই।

বিজন চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর বললে, সেদিন এক চায়ের আসরে ডেকেছিলো রুমা। অনেকে এসেছিলো, তার সঙ্গে মেয়েদের ইস্কুলের মাস্টারনী মোতিকুমারী। দেখেছো তুমি তাকে?

—দেখেছি।

বিজন বললো, ওর চেয়ে কুৎসিত কোনো মেয়ে চোখে পড়েছে তোমার? পড়েনি। তাই হয়তো কেউই ওর সঙ্গে কথা বলছিলো না। মেয়েপুরুষ আরো অনেকে ছিলো সেদিন, সকলেই গল্পগুজব করছিলো, হই-হুল্লোড়ে মেতেছিলো। আর মোতিকুমারী উপেক্ষিত হয়ে এক কোণে বসে ছিলো চুপ করে। অথচ রুমাবাঈয়ের নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করার সাহস ছিলো না তার। দেখে মায়া হলো, গিয়ে ওর পাশের চেয়ারে বসলাম।

উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রশ্ন করলাম, তারপর?

—তারপর মাঝে-সাঝে দেখা হলে দু-একটা কথা বলতাম, হাসি ফুটতো ওর মুখে। ওর হাসি দেখে আমিও যেন খুশী হতাম। সে কথা বলতাম রুমাকে। শুনে রুমা একদিন বললে, তুমি ওকে বিয়ে করো...কি জবাব দেবো এ কথার। বললাম, অসম্ভব। শুনে যে চোখে তাকালো রুমা, সে চোখ আমি কোনো দিন দেখিনি।

—তারপর? যেন কোনো রোমহর্ষক কাহিনী শুনছি এমনি উৎকণ্ঠায় প্রশ্ন করলাম।

বিজন বললে, তারপর তো তোমরা জানো।

বললাম, রাজী হলি না কেন? রুমাবাঈয়ের খেয়াল, রাজী হলে হয়তো ভুলেও যেতো।

বিষণ্ণ দেখালো বিজনকে। বললে, রাজী হয়েছিলাম। ভয়ে নয়, সত্যিই ভালোবেসে ফেলেছিলাম মোতিকুমারীকে। রুমার নির্যাতন যত বাড়তে লাগলো ততই যেন অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলাম মোতিকুমারীর সঙ্গে, তারপর যেদিন বললাম, মোতিকুমারীকে আমি বিয়ে করছি, সেদিন—এই দেখো—

বলে জামাটা তুলে বিজন ওর পিঠটা দেখালে।

শিউরে উঠলাম। ফরসা পিঠের ওপর গোটা কয়েক কালশিটে দাগ, যেন ক্রোধান্ধ কেউ চাবুকের পর চাবুক বসিয়েছে সেখানে।

বিস্মিত হয়ে তাকালাম, সে কি? কেন?

বিজন হাসলে।—আমি জানতাম, ঈর্ষায় জ্বলছে রুমা, কিন্তু স্পষ্ট করে বলতে পারছে না। অথচ ওর সন্দেহ যে সত্যি তার প্রমাণ না পেলে যেন শান্তি নেই ওর। কিন্তু তোমাকে বলছি আমি, বিশ্বাস করো, রুমার চোখের সামনেই আমি মোতিকুমারীকে বিয়ে করবো। শেষের কথাগুলো এত দৃঢ়তার সঙ্গে বললে ও, যেন নিজের মনকেই বলছে।

বিয়ে সত্যিই হলো একদিন। কিন্তু রুমাবাঈয়ের চোখের সামনে নয়। বাঙালীটোলার কালীবাড়িতে যখন বিজন আর মোতিকুমারী মন্ত্র উচ্চারণ করছে সেই সময় নিহালের সঙ্গে রুমাবাঈ আকাশবিহারে উঠছেন। আর তার কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল সেই ডাকোটা বিমান-খানায় আগুন লেগেছে। মুহূর্তের মধ্যে রাত্রির আকাশে বিদ্যুৎ জ্বালিয়ে প্রচন্ড শব্দে মাটিতে পড়লো প্লেনটা।

ভিড় ছুটলো আনারবাগের ল্যান্ডিং গ্রাউন্ডটার দিকে। তখনো আগুনের শিখা দুলে দুলে উঠছে কালো আকাশের গায়ে। গুজব ফিরে এলো কিছুক্ষণের মধ্যেই।

কিন্তু, না, পরের দিন সকালেই খবর পাওয়া গেল। মারা যাননি রুমাবাঈ, বাঁচবেন কি না তাও সন্দেহ। সমস্ত শরীর নাকি ঝলসে গেছে তাঁর। যদি বা প্রাণে বেঁচে যান তবু চিনতে পারবে না কেউ। হয়তো অন্ধ হয়ে যাবেন, হয়তো পঙ্গু হয়ে কাটাতে হবে সারা জীবন, আগুনে পোড়া কুৎসিত মাংসপিণ্ডের মতো।

আমরা সবাই, যারা এতদিন ঘৃণা করে এসেছি, দুর্নাম রটিয়েছি রুমাবাঈয়ের, কেমন যেন ব্যথা অনুভব করলাম।

আনারবাগ শহরের উজ্জ্বলতম তারা যেন হঠাৎ নিঃশেষ হয়ে মিলিয়ে গেছে অন্ধকারে, যে তারার আলো আমাদের মনেও রোমাঞ্চ জাগাতো, যে তারার আলোয় ধাঁধা লাগতো আমাদের কল্পনাবিলাসী চোখে।

দিনকয়েক পরে বিজনকে কাছে ডেকে ফিসফিস করে প্রশ্ন করলাম, শুনেছিস?

—শুনেছি।

বললাম, একবার দেখা করে আয় বিজন, মৃত্যুর আগে এইটুকু সান্ত্বনা তাকে দিয়ে আয়। এই দুর্ঘটনাই প্রমাণ করলো বিজন, রুমাবাঈ তোকে ভালোবাসতো।

অবিশ্বাসের হাসি হাসলে ও।—বলছো যখন যাবো। তুমিও চলো।

প্যালেসের এক প্রান্তে সুব্যাপ্ত একটি ফুলের বাগানের মাঝখানে রাজা প্রতাপকিঙ্কর চন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুরের দানে গড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো রুমাবাঈকে।

অনুমতি নিয়ে দেখা করতে গেলাম আমি আর বিজন।

একটি ফরসা ধবধবে রোগশয্যায় সাদা চাদরের মতো ম্লান হয়ে পড়ে ছিলো রুমাবাঈয়ের অর্ধ-অচেতন শরীর। ওষুধের একটা তীব্র দুর্গন্ধ চারিদিকের হাওয়ায়। আর রুমাবাঈয়ের সারা শরীর ব্যান্ডেজে মোড়া। সমস্ত মুখ ব্যান্ডেজে ঢাকা।

ধীরে ধীরে টুলটায় বসলো বিজন। আস্তে আস্তে হাত বাড়িয়ে রুমাকে স্পর্শ করতে গিয়ে হাতটা ফিরিয়ে নিলো।

ডাকলে, রুমা!

ঠিক বোঝা গেল না, কি যেন অস্পষ্ট শব্দ বেরিয়ে এলো রুমাবাঈয়ের মুখ থেকে। একটু বোধ হয় নড়লো ওর শরীরটা।

নার্স ওর কানের কাছে মুখ নামিয়ে বিজনের নাম বললে।

রুমাবাঈ ফিসফিস করে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, ও আসেনি?

—কে? নার্স চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলে। কে রুমাবাঈ?

—রায়, মিস্টার রায়। উত্তর এলো ধীর স্বরে।

—দেওয়ানজী? উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করে বসলাম।—খবর দেবো, ডেকে পাঠাবো রুমাবাঈ?

মরণোন্মুখ একটি নারীর যে-কোনো শেষ ইচ্ছাকে তৃপ্ত করলে যেন আমিও তখন তৃপ্ত হই।

দীর্ঘশ্বাসের মতো ব্যথার কণ্ঠে রুমাবাঈ বললেন, না, না, আমি জানি সে আসবে না।

—আসবে না? বিস্ময়ের স্বরে নার্স প্রতিপ্রশ্ন করলে।

হয়তো ব্যান্ডেজের বাঁধনে চাপা পড়ে গেল রুমাবাঈয়ের বিষণ্ণ ম্লান হাসি। —পাথর, পাথর সে, মানুষ নয়। এত ঈর্ষার আগুন জ্বালাতে চেয়েছি বিজন, তবু চোখ ফেরায়নি সে। হেরে গেলাম আমি!

কোনো কথা বললাম না আমরা। ধীরে ধীরে নিঃশব্দে উঠে এলাম। আর রুমাবাঈয়ের সমস্ত দুর্নাম, সমস্ত হঠকারিতা আর দীপ্ত যৌবনের উন্দামতায় ঢাকা পড়েছিলো যে অতৃপ্ত ভালোবাসা, যে ভালোবাসা প্রকাশে ভীরু আর লজ্জায় দুর্বল, সেই ভালোবাসার উজ্জ্বল শিখাটি স্পষ্ট হয়ে উঠলো। মন বললে, রুমাবাঈও ভালোবাসতে জানে।

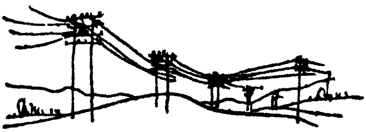
এতখানি দুর্বলতা কি করে ঢেকে রেখেছিলো রুমাবাঈ, এতখানি অতৃপ্ত বাসনার গায়ে অপবাদের শাল জড়িয়ে রেখেছিলো কেন!

বিজনকে সে কথা জিজ্ঞেস করবার জন্যে ফিরে তাকালাম হঠাৎ। দেখলাম বিজনের দু চোখ বেয়ে জল ঝরে পড়ছে।

কান্না, কান্না। কিন্তু এ কান্নার খবর রাখলো না কেউ।

আনারবাগের দুর্নামী রটনা শুধুই মোতিকুমারীর বিয়ের সঙ্গে রুমাবাঈয়ের বিমান দুর্ঘটনার যোগাযোগ আবিষ্কার করে তৃপ্ত হলো।

[১৩৬০



ইম্‌লী

শহরের এদিকটায় কর্পোরেশনের সীমান্ত টেনেছে পুব-পশ্চিমের রেললাইন। মাটি থেকে অনেকখানি উঁচু একটা পাড় রেকাবির কানার মতো গোল হয়ে ঘিরেছে শহরের দক্ষিণাংশ।

উত্তর-দক্ষিণের ট্রাম-লাইনটা এক জায়গায় নাক ঢুকিয়েছে ওদিকের মিউনিসিপ্যালিটির এলাকায়। ট্রাম-লাইনের ওপরে একটা পুল, পুলের ওপর দিয়ে দু-দশ মিনিট অন্তর একটা-না-একটা ট্রেন হুইস্‌ল্‌ বাজিয়ে যায়, ইঞ্জিন ধোঁয়া ছাড়ে। পুলের ওদিকে এখনো কাদামাটির রাস্তা, পচা পাঁকের ডোবা, কচুরিপানার দুর্গন্ধ। অথচ এদিকে চকচকে ইস্পাতের মতো পরিচ্ছন্ন রাস্তার পাশেই তকতকে এক সারি অট্টালিকা। জানালায় তার রঙিন পর্দা, বারান্দায় ইলেকট্রিকের ম্লান নীল আলো, ব্যালকনির বেতের চেয়ারে স্থূল চেহারার আসর। যে-কোনো একটার সামনে দাঁড়ালেই শোনা যায় চুড়ি-টুংটাং কথালাপ, নেপথ্যে নরম কলহাস্য, আর রেডিয়োর কণ্ঠে ঠান্ডা গলার গান।

রাস্তাটা ছায়া-ছিমছাম। ল্যাম্প-পোস্টগুলো দূরে দূরে, কৃষ্ণচূড়া আর গুলমোহরের পাতায় আড়াল-পড়া নিস্তব্ধতা। সিমেন্টে-বাঁধানো চওড়া ফুটপাথে কেমন একটা অন্ধকারের ছমছমানি। শুধু অন্ধকারই নয়, আরেকটা জিনিস চোখে পড়লে শিউরে ওঠা উচিত। কিন্তু চোখে পড়েও চোখে পড়ে না।

ফুটপাথের ওপর সারি সারি মানুষের কার্টুন। এক পাল মেয়ে-পুরুষ কাচ্চা-বাচ্চা, তেলচিট কাপড় আর উকুনজট চুলের বীভৎসতা নিয়ে সারা ফুটপাথ জুড়ে শুয়ে থাকে। শুয়ে থাকে তারা-ফোটার সন্ধ্যে থেকে। রোগা জিলজিলে চেহারা কারো, পাঁজর-বের-করা

বাচ্চাগুলোর পিপের মতো পেট, পুরুষগুলোর কানে মাকড়ি। দু-দশটা মেয়ের শরীরে মাংস আছে, যার নেই তার চোখে তেজ।

ফুটপাথের গায়েই দুটো না তিনটে বে-দরোজা খুপরি পড়ে আছে অন্ধকারে, আলো-ঝলমল এক সারি দোকানের মাঝে। চকমকি-চোখ সুন্দর একটি বাচ্চা মেয়ের ফোক্‌লা দাঁতের মতো ছন্দঃপতন। দোকান ভাড়া দেওয়ার জন্যে কাজে হাত লাগিয়ে শেষ অবধি আর টাকায় কুলিয়ে ওঠেনি হয়তো বাড়িওয়ালার। কিংবা কোনো মামলা-মকদ্দমায় ফেঁসে গেছে হয়তো।

দেয়াল আর ছাদ দু-ই আছে ঘর ক'খানার, কিন্তু কপাট বসেনি, সিমেণ্ট হয়নি মেঝেতে, দেয়ালে প্লাস্টার না পয়েণ্টিং কি উদ্দেশ্য ছিলো বোঝাই দায়। রাস্তার ওপর যারা শুয়ে আছে, তাদের দলেরই কয়েকজন এসে আশ্রয় নিয়েছে ঘর ক'খানার ভেতর। কুকুর-কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে।

রাত ন'টাও হয়নি তখন, কিন্তু ঘুম দু প্রহর পুরোনো হয়ে গেছে ওদের।

দুটো ভদ্রলোকের পোশাক এসে দাঁড়ালো সেখানে। তাকালো তারা এপাশ ওপাশ। ঘুমন্ত কোনো মেয়ের জাগর কোনো অংশের দিকেও হয়তো বা।

একটা পোশাক বললে, না! তাড়ানো যাবে না। রিফিউজিরা শুয়ে আছে।

অন্য পোশাকটা বললে, পেলে কিন্তু ভালোই হতো। দোকানের পজিশনটা দেখেছেন?

—উপায় নেই মশাই। রিফিউজিরা দখল করে বসেছে যখন, চেষ্টা করাই বৃথা।

রিফিউজি? একটি পোশাক এগিয়ে গেল, ঝুঁকে দেখলে লোকগুলোকে। বললে, রিফিউজি তো নয় মনে হচ্ছে মশাই!

—নয়? উৎসাহিত হয়ে উঠলো অন্য পোশাকটি—দেখুন, দেখুন ভালো করে। তা হলে তো মেরে হটিয়ে দেওয়া যাবে।

দুজনেই ঝুঁকে পড়লো।

স্পষ্ট আলো নেই, ঝরা-পাতার কৃষ্ণচূড়া গাছটা যেটুকু চাঁদকে উঁকি দিতে দিয়েছে তার আলোয় কিছুই ভালো দেখা যায় না। একদল ময়লা মানুষ—এইটুকুই চোখে পড়ে।

সন্দেহ দূর করার জন্যে ঘরটার কাছে এগিয়ে গেল একজন, খাটো শাড়ির ঢেউটার দিকে ঝুঁকে পড়ে কি যেন দেখতে চাইলো।

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েলী কণ্ঠের প্রতিবাদ এলো—আওরত দেখোনি কখনো, উল্লু কাঁহাকা।

সব কথাটা আর শুনতে হলো না, ছিটকে দূরে সরে এলো ভদ্রলোকের পোশাক-পরা লোকটি।

—চলুন মশাই, চলুন, গোলমাল বাধিয়ে দরকার নেই।

—হ্যাঁ, কাল বরং বাড়ি খোঁজ করা যাবে। রিফিউজি যখন নয় তখন মেরে হটিয়ে দেওয়া যাবে।

বাড়ির পথ ধরলো দুটো পোশাকই। আর ইম্‌লী উঠে বসলো। উঠে বসে এদিকে ওদিকে তাকালো। ওদের পালানো দেখে হাসলো মনে মনে।

ইম্‌লী মানে তেঁতুল, তেলেগু ভাষায় যার নাম চিন্তাপাণ্ডু। চেহারা দেখে ভুল হলেও আসলে ইম্‌লী কিন্তু তেলেঙ্গী নয়। মুখে হিন্দী-উর্দুর ফরফরানি থাকলেও আইনের চোখে ও খাস বাঙালী।

মেয়েটার বাপ-মা মারা গেছে, না বে-ঠিকানা, তা ইম্‌লী নিজেও হলফ করে বলতে পারে না। কিন্তু যে ওর নাম রেখেছিলো সে হয়তো আভাসে বুঝেছিলো এ মেয়ে বাঘা তেঁতুলকেও হার মানাবে।

শরীর তো নয়, যেন স্বাস্থ্যের জোয়ার। পুরোনো তামার মতো গায়ের রঙ, চোখের কোলে সরু একটা কাজল-রেখা সুর্মা টানার অপেক্ষা রাখেনি। ভরা-ভরা ঘাম-ঝরা কালো মুখের সঙ্গে খাপ খায় না মাথার একরাশ জটপাকানো চুল। রঙিন ডুরে শাড়ি একখানা পরনে, এতই খাটো মাপের যে ইজ্জত ঢাকে তো শরম ঢাকে না। ময়লা আঙিয়াটা বুকে পিঠে এমনই আঁটসাঁট হয়ে আছে যে না থাকলেও ক্ষতি ছিলো না।

লোক দুটো চলে যাওয়ার পর দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসলো ইম্‌লী। মাথা চুলকোলে খানিকক্ষণ। আন্দাজে আন্দাজে দু আঙুলের দুটো নখে একটা উকুন চেপে ধরলো, চোখের

সামনে এনেও দেখতে না পেয়ে নখের পিঠে নখ টিপে মারলে উকুনটা। তারপর আবার মাথা চুলকোতে শুরু করলে।

মুখে না মানলেও জাতে সাচ্চা বেদিয়া ওরা। কথাবার্তায়, হাবে-ভাবে কিছুটা হিন্দুয়ানী কিছুটা মুসলমানী। মনটা পাক্কা বেদের। স্বভাবে আর নেশায় বেদে ছিলো ওদের পূর্ব-পুরুষরা, ঘুঙুর-বাঁধা হাত-ঢোলক বাজিয়ে নেচে গেয়ে বেড়াতো। তাঁবু নয়তো হোগলার ছাউনি যতবার গড়তো ততবার ভাঙতো, বনমোরগের ঝাঁকের মতো উড়ে উড়ে বেড়াতো এখানে-সেখানে। গানের ভাষায় বলতো, রাস্তাই আমাদের জাহান, ফাটা তাম্বু আমাদের দরবার। স্বপ্ন দেখতো, মাশুক শুধু নাচবে গাইবে ঢোলক বাজাবে, আর আশক চাক্কু বেচবে চকবাজারে।

স্বভাবে আর নেশায় বেদে ছিলো পূর্বপুরুষরা, অভাবে আর পেশায় বেদে হতে হলো ইম্‌লীদের।

সুন্দরবনে জঙ্গল সাফ করে চাষ-বাসের জমি পেয়েছিলো ওরা ইজারাদারের কাছ থেকে। ঘন অরণ্যের হিংস্রতায় ডেরা বেঁধেছিলো দল-কে-দল। বুনো মোষ, বাঘ, ভালুক, নীলগাই তাড়িয়ে বনজঙ্গল পরিষ্কার করেছে, রামহরিণ আর হরিয়াল শিকার করেছে। বনের জমিকে সোনা-ফসলের জমি বানিয়েছে, মাটি ভিজিয়েছে গতরের ঘামে, রোপাই বুনেছে, ভাদুই তুলেছে বছরের পর বছর। তারপর ইজারাদার এসে একদিন বলেছে, খাজনা চাই। খাজনা দিয়েছে, খাজনা বেড়েছে। ভাবেনি কোনো দিন, হঠাৎ ডুগডুগি বাজিয়ে দেবে ইজারাদার, জমি ছেড়ে দিতে বলবে।

ডুগডুগি বাজলো একদিন। ইম্‌লীদের দলকে আর দরকার নেই ইজারাদারের, মোটরের লাঙল দিয়ে চাষ করবে সে নিজেই। জোয়ান চেহারার কেউ কেউ দিন-মজুরের কাজ পেলো, বাকী লোকগুলোকে তাদের ডেরায় থাকতে দিলো শুধু। চাষের জমি কেড়ে নিলো সব।

বেদের নেশা মুছে গেছে মন থেকে, স্বভাব শিকড় গেড়েছে সময়ের মাটিতে। এত কষ্টের ডেরা ছেড়ে যাবে কোথায়? মাটির মায়া কি এত সহজে ছাড়া যায়? আরো গভীর জঙ্গলের দিকে সরে গেল ওরা, ভালুকের সঙ্গে রেষারেষি করে মৌচাক ভেঙে মধু জমালে। একবার করে শহরে এসে মধু ফিরি করে সারা বছর চলতো কোনোক্রমে।

দলবলের সঙ্গে এবারেও মধু বিক্রি করতে এসেছিলো ওরা শহরে। লোকের মুখে ইম্‌লীর নাম হলো মধুওয়ালী। কিন্তু ও মধু ফিরি করবে কি, শহরে এসে মধুর খোঁজ পেলো ও নিজেই।

দলে জোয়ান চেহারার অভাব ছিলো না। তাদের দু-চারজন কি কখনো-সখনো চোখের ডাকে হাতছানি দেয়নি ইম্‌লীকে? ইম্‌লী নিজেও হাসাহাসি করেছে, ছুঁড়েছে দু-চারটে দিল্-জখমী দিল্লাগী। কিন্তু তারা তো কই এমনভাবে নাড়া দেয়নি ওর মনকে।

জঙ্গলের মধু আর মোম নিয়ে এর আগেও দু-দুবার এসেছিলো ইম্‌লী। তখনো শহর এমন বদলে যায়নি। রোজগারের টাকায় শুধু এক বেলা চাপাটি খাওয়াই নয়, বেশ কিছু পয়সা ঘুনসির গেঁজেতে পুরে ডেরায় ফিরতো তখন।

এবারে কিন্তু দিনকয়েক ঘোরাঘুরি করেই হয়রান হয়ে পড়লো ইম্‌লী।

ভোর না হতেই ফুটপাথটা জেগে উঠতো প্রতিদিন। মধুর হাঁড়ি মাথায় চাপিয়ে একে একে সবাই এ-গলি সে-গলি ধরে মধু ফিরি করে বেড়াতো চিৎকার করে করে। মুখের মিষ্টি ডাকে গলা শুকিয়ে কর্কশ স্বর বেরোতো দুপুর না হতেই। তবু খদ্দেরের হদিস মিলতো না। দেড় ক্রোশ পথ হাঁটার পর হয়তো তেতলা বাড়ির জানালা থেকে মেয়ে-গলার ডাক আসে, মধু চাখে বাংগালী বহু, দরদস্তুর করে, তারপর দড়াম করে কপাট বন্ধ করে দেয় মুখের ওপর। মনের ঝাল মিটিয়ে গালাগালি দিতে দিতে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসা, তারপর আবার পথ চলা। ভাবে, এত জলের দরেই যদি বেচতে হবে তো পট্টির ফড়িয়া কি দোষ করলে!

এমনিভাবে ইম্‌লীও প্রতিদিন সারাটা দুপুর ঝমঝমে রোদে ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যের সময় ফুটপাথের আড্ডায় ফিরে আসতো। ফিরে এসে শুকনো মুখে বসে বসে ধুঁকতো হাঁটুতে থুতনি রেখে। সকালে চিঁড়ে জোটে তো সন্ধ্যের চাপাটির পয়সা থাকে না। সারা দিন রাস্তার

কলে মুখ ভিজিয়ে বুকভরা ঠান্ডা জল খেয়ে কাটে।

আড্ডার সবারই মুখ শুকোয় ক্রমে ক্রমে। সন্ধ্যের সময় ফিরে এসে খবর নেয় ওরা পরস্পরের, শুধোয় কার কত বিক্রি হলো, হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বুড়োরা; শরীফদের জেবও কমজোর হয়ে গেছে।

অথচ মধু বিক্রি না হলে গাঁও-দেহাতে ফিরবে কোন্ সাহসে, সারা বছর চলবে কিসে? জীবনে এমন শুখা দিন আসেনি কখনো, ভাবলে সবাই।

সারা দুপুর রোদে টহল দিয়ে ফিরছিলো ইম্‌লী, ভাবছিলো সন্ধ্যের ভাবনাগুলোই। ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুরে চোখ জ্বলছে তখন, মুখের চামড়া তাওয়ার মতো তেতে উঠেছে, অসহ্য ঠেকছে গায়ের আঙিয়া। ছায়া খুঁজতে খুঁজতে একটা গলিতে ঢুকে পড়লো ইম্‌লী। তেলেভাজার দোকানের পাশ দিয়ে বেঁকেছে গলিটা। পোড়া তেলের মিষ্টি গন্ধটা নাকে আসতেই লোভী চোখে সেদিকে তাকালো, চোখে পড়লো ওপাশের বারান্দায় একজন ফুচকাওয়ালাকে ঘিরে হাতে শালপাতার ঠোঙা নিয়ে বসেছে জনকয়েক রং-ঝলমল চেহারার পাঞ্জাবী মেয়ে। রাস্তার ধারে হলদে ঠেলাগাড়ি থেকে কুলপি বরফ বিক্রি করছে একজন। আনমনে কোমরের বটুয়ায় হাত দিয়ে খুচরো পয়সার স্পর্শ নিলো ইম্‌লী, তারপর তরতর করে এগিয়ে গেল লোভ সামলে। সামনেই সিমেণ্ট-বাঁধানো চওড়া একটা রক। ছায়ায় ভিজে আছে যেন। একটা লোক শুধু কাচ আর অ্যালুমিনিয়ামের বাসন-সাজানো ঝুড়ি নামিয়ে আংগোছা নেড়ে নেড়ে হাওয়া খাচ্ছে।

এক পাশে ছায়ায় হাঁড়িটা নামিয়ে রেখে বসলো ইম্‌লীও। তারপর হঠাৎ চোখাচোখি হলো লোকটার সংগে। মধু ফিরি করতে এসে নিজেই মধুর খোঁজ পেলো ইম্‌লী।

রোগা, কিন্তু শিশুকাঠের মতো কালো আর মজবুত চেহারা লোকটার। কানে লাল মাকড়ি। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। পরনে নতুন জামা।

জাতে লোকটা ওদেরই মতো বেদে, বুঝলে ইম্‌লী। শহরে অনেকগুলো বছর কাটিয়েছে, এই যা। শহরের লোক হাজার ময়লা কাপড় পরে থাকলেও চিনতে পারে ও, কেমন একটা মুখে-চোখে পালিশ পড়ে শহরে থাকলে।

একবার চোখাচোখি হওয়ার পরই কাজে মন দিলো লোকটা, টাকাপয়সা গুনলে, আরো কি কি যেন করলে, চোখ তুলে একবারও আর দেখলে না, ইম্‌লী মোহময় দৃষ্টিতে, মোহব্বতের দৃষ্টিতে ঠায় তাকিয়ে রইলো তার মুখের দিকে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলে ইম্‌লী আবার চোখাচোখি হওয়ার আশায়। তারপর কখন যেন চোখ সরে গেল ওর, অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো।

—এ মধুওয়ালী!

হিসেব-নিকেশ শেষ করে ঝুড়ি থেকে একটা খাবার কৌটো বের করে ডাক দিলে লোকটা। তারপর নিজেই উঠে এলো ইম্‌লীর কাছে।

মধু চাইলে এক আনার, কৌটোটা খুলে ইম্‌লীর সামনে ধরে।

হেসে কি একটা ঠাট্টা করলে ইম্‌লী। এক আনার মধু? হেসে উঠলো আবার। সের হিসেবে বিক্রি হয় মধু, বড় জোর পাও-ভর নিতে পারে সে। তা বলে এক আনার?

লোকটাও হাসলে। হেসে ঠাট্টার জবাব দিলো। যে চিজ যত কমদর সে তত বেশী ওজনেই তো বিক্রি হয়। কয়লা বিক্রি হয় মন হিসেবে, মধু সের দরে, আর সোনাচাঁদি আর ওই অ্যালুমিনিয়ামের বর্তন বিক্রি হয় তোলা হিসেবে।

মুখের মতো জবাব হলেও অপ্রতিভ হলো না ইম্‌লী। জাত-জনম্ গাঁও-দেহাতের ঠিকানা নিলো, তারপর বললে, পয়সার দরকার নেই, মুফত দিয়ে দিচ্ছি। বলে এক হাতা মধু ঢেলে দিলো লোকটার রুটিতে।

ইম্‌লীর কোলের ওপর দুখানা রুটি ফেলে দিলো লোকটা, নে, তুইও খা দুখানা।

বাধা দিলো না ইম্‌লী, ফিরিয়ে দিতে চাইলো না। শুধু চোখ টিপে হাসলো।

রুটি চিবোতে চিবোতে খবর নিলো সে, কত মধু বিক্রি হয় দিনে, নাফা হয় কত?

যতটা সম্ভব বাড়িয়ে বললে ইম্‌লী, তবু আশ্চর্য হয়ে চোখ কপালে তুললো লোকটা।—বাস? অর্থাৎ এত কমে চলে কি করে ইম্‌লীর?

উপদেশ দিলে টুটা-ফাটা কাপড়ার বদলি বর্তন বিক্রি করতে। অনেক বেশী লাভ হবে। পট্টির পাইকারের কাছে মধুর হাঁড়িটা বেচে দিয়ে টাকাটা মহাজনের কাছে জমা রাখলে সেও কাচ আর অ্যালুমিনিয়ামের বাসন পাবে। তারপর পুরোনো কাপড়ের বদলে সেগুলো বিক্রি করে মহাজনের কাছেই টাকা পাবে টুটা-ফাটা কাপড়ের জন্যে।

ইম্‌লী ভাবলে, সত্যিই তো। মধু আর ক'জন খায়। কিন্তু বর্তনের দরকার সকলেরই, টুটা-ফাটা কাপড় তো সকলেই ফেলে দেয়।

বললে, কাল আসবো। ভেবে দেখি।

বেশ খানিকটা ও যখন এগিয়ে গেছে লোকটা নাম জিগ্যেস করলে ইম্‌লীর। নাম বললে ইম্‌লী, চোখে চোখে কি একটা অর্থপূর্ণ হাসি খেলে গেল, ওর নামও জিগ্যেস করলে ইম্‌লী।

—ফাল্‌সা।

এ-গলি সে-গলি ঘুরে বেড়ালো ইম্‌লী সারা বিকেল, মুখে ঘুরলো মধু ফিরির ডাক। কিন্তু মনের ভেতর ঘুরলো শুধু ওই একটাই নাম, ফাল্‌সা।

মধুর মতোই মুখে লেগে রইলো এ নাম, সারা দিন শুধু একটা তৃপ্তির হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে রইলো ও।

দলের সকলকে বললে ইম্‌লী। হেসে উড়িয়ে দিলো সকলে।

শহরে ব্যবসা করে কুত্তা আর বিল্লির মতো সারা বছর রাস্তায় পড়ে থাকতে তো আসেনি ওরা। না-হয় শেষ অবধি পাইকারের কাছেই বেচে দিয়ে যাবে সব মধু, তারপর ফিরে যাবে ডেরায়। পাতার ছাউনি দেওয়া জংলী ডেরাও এর চেয়ে অনেক সুখের। মেঠো খরগোশের মাংস খেয়েও পেট ভরানো যায় সেখানে।

ওরা কেউ বুঝলো না শহরে থাকার এত লোভ কেন ইম্‌লীর।

এ এক অদ্ভুত নেশা। চেষ্টা করেও এ নেশা ছাড়াতে পারলো না ইম্‌লী।

দুপুর হলেই কি এক দুর্বোধ্য আকর্ষণ যেন সেই গলির দিকে টেনে নিয়ে যায় তাকে। কোনো দিন ফাল্‌সার দেখা মেলে, আর কোনো দিন হয়তো বা সেই ছায়া-ভেজা রকে বসে অপেক্ষা করে সে ফাল্‌সার জন্যে। ঘামে ভিজে ফুটন্ত রোদ্দুরে ধুঁকতে ধুঁকতে এসে হাজির হয় সে, ইম্‌লীর দিকে চোখ তুলে না তাকিয়েও খুশিতে ভরে ওঠে তার মুখ। তারপর প্রতি-দিনের মতোই খাবার ভাগ করে খায়।

দুপুরের আলাপ ক্রমে সন্ধ্যে অবধি জের টানতে শুরু করলো। আড্ডায় ফিরতে দেরি হতে লাগলো ইম্‌লীর। সন্ধ্যের পর কোনো একটা রাস্তার কলে স্নান সেরে নির্জনে কোথাও গিয়ে বসে দুজনে, গল্প করতে করতে রাত ভুলে যায়। রাস্তা থেকে কেনা চিনাবাদাম চিবোতে চিবোতে পা ছড়িয়ে ঘাসের জাজিমে বসে গল্প করে দুজনে অনেক রাত অবধি, আড্ডায় ফিরে নানা ওজর দেখায়।

কেউ কিছু বিশেষ মনেও করে না তার জন্যে। বড় জোর ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে দু-চারটে, আড়ালে হাসাহাসি করে। কম বয়সের মেয়েগুলো এমন দেরি করে ফিরবে তা আর নতুন কি, ফিরতেই তো ভুলে যায় অনেকে।

ইম্‌লীও ফিরলো না একদিন।

টিনের শেড দেওয়া মাটির দেয়ালে ঘেরা ছোট্ট একখানা বস্তির ঘর, টুকরো-টাকরা দু-চারটে আসবাব, একটা দড়ির খাটিয়ায় নোংরা বিছানা। তবু প্রথম যেদিন এলো, ফাল্‌সার এ ঘরখানা খুব আপন মনে হলো ইম্‌লীর। একটা কেরোসিনের লম্প জেবলে চাপাটি বানাতে বানাতে মনে হলো সারা জীবন যদি এমন একখানা ঘরে কাটাতে পায়, ফাল্‌সার মতো একটা মানুষকে যদি রেজাই বানাতে পায় শীতের রাতে।

নিজের ঘর দেখাবার জন্যে ইম্‌লীকে ডেকে এনেছিলো ফাল্‌সা। চোখ আর মন শুধু পিয়ার মোহব্বতের ইশারা দেখিয়েছিলো, মুখের কথায় দুজনেই রসিকতা করতো শুধু। মন-জানাজানি হয়নি কোনো দিন, মোহব্বতের কথা উচ্চারণ করেনি কেউই।

আর ফাল্সার ঘর দেখতে এসেও ইম্লী মুখ ফুটে বললো না কিছু। চাপাটি বানালে, গল্প করলে, দুজনে খেয়ে-দেয়ে নিলো। তারপর দড়ির খাটিয়াটায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো ইম্লী।

বললে, নিদ্ আসছে চোখ জুড়ে। ফিরতে পারবো না আমি।

ফাল্সা হাসলে, লম্পটা নিবিয়ে দিয়ে এসে ইম্লীর পাশেই শুয়ে পড়লো সেও।

ভোরবেলায় যখন ঘুম ভাঙলো, ইম্লীর শরীরে জড়তা নেই, মনে তবু তার অপরিসীম লজ্জা। পিঠের ওপর থেকে ধীরে ধীরে ফাল্সার হাতটা সরিয়ে দিয়ে উঠে পড়লো সে বিছানা ছেড়ে। ফাল্সা ঘুমোচ্ছে তখনো, ঘুমোক। জেগে থাকলে কি করে চোখ তুলে চাইতো ইম্লী, লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে হতো না?

মধুর হাঁড়িটা মাথায় নিয়ে তরতর করে চলে এলো সে। কি করে এমন মাতোয়ালার মতো টলতে টলতে এগিয়ে গিয়েছিলো ইম্লী, লজ্জা হলো তার। এমন বেশরম মেয়ে হয়তো আগে দেখেনি ফাল্সা। আর এমন তাজ্জব আদ্মী ইম্লীও দেখেনি কখনো। একই খাটিয়ায় পাশাপাশি শুয়ে ঘুমের ঘোরে শরীরে হাত ছুঁইয়েও পাগল হয় না এ কেমনতর জোয়ান পুরুষ! এত হাসি-ঠাট্টা ইশারা-ইঙ্গিত—অথচ হাতের নাগালে পেয়েও...

এ-গলি সে-গলি হয়ে মধু ফিরি করে বেড়ালো ইম্লী। বারবার দুপুরের ছায়ায় ভেজা রকটা পা টানলো তার, তবু লজ্জা এসে পথ রুখে দাঁড়ালো। গলিটা দু-তিনবার পার হলো ইম্লী, তবু ঢুকতে সাহস পেলো না।

সন্ধ্যেবেলায় ফিরে এলো সে ফুটপাথের আড্ডায়।

দলের দু-চারজন মুখ টিপে টিপে হাসলো, চোখ টিপে ইঙ্গিতে কি যেন বলাবলি করলো। এমন তো হামেশাই হয়। ইম্লীর সমবয়সী দুটো মেয়ে চুপচাপ এসে বসলো ওর কাছে, কোমরের ঘুনসিটা দেখাতে বললে। দেখলে তারা, খুচরো কয়েক আনা পয়সা। খিলখিল করে হেসে এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়লো। ব্যস্, এই ক' আনা পয়সা! চোখ কপালে তুললো তারা। এমন ভরা যৌবনের আঁটসাঁট চেহারা, একটা পুরো রাত হারিয়ে গিয়ে কিনা এই ক' আনা পয়সা! এত সস্তায় শরীরের মধু বেচেছে ইম্লী!

কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলো, কেন ফেরেনি—এসব প্রশ্ন কেউই করলো না। এ বয়সে যদি এমন মাঝে মাঝে না হারাবে তো রূপের ইজ্জত রইলো কোথায়।

ঠাট্টাটা বুকে এসে বিঁধলো ইম্লীর, তবু বলতে পারলো না কোনো শহরওয়ালার হাতছানি, কোনো টাকার লালচ ডেকে নিয়ে যায়নি তাকে। পুলের ওপারে ডাণ্ডি বস্তিতে গিয়েছিলো পিয়ারবন্ধুর সঙ্গে, ফিরেছে ইজ্জত নিয়েই।

নিজের কাছে নিজেই যেন ছোট হয়ে গেছে ইম্লী। মুহূর্তের দুর্বলামি কাটিয়ে ফিরেছে ও, খুশীই হয়েছে সে-কারণে। কিন্তু ফাল্সা? কি ভাবছে সে?

যথেষ্ট বেশরমী কাজ করেছে ইম্লী, আরো বেশরম হতে পারবে না। ফাল্সার সঙ্গে আর দেখা করতে পারবে না ও, তাকাতে পারবে না চোখে চোখ রেখে। দলের সঙ্গেই ফিরে যাবে ফড়িয়ার কাছে সব মধু সস্তা দরে বেচে দিয়ে।

পুরো দল একসঙ্গে ফেরে না কোনোবারই। যার মধু শেষ হয়ে যায় সে সরে পড়ে আগেই, এবারেও একে একে অনেকেই কেটে পড়লো। দল ফিকে হয়ে গেল দু-দিনেই। কেউ ফিরে গেল, কল-কারখানায় কাজ জোটালে কেউ, কেউ বা বেখোঁজ হলো।

ইম্লীও একদিন পট্টির পাইকারের কাছে বেচে দিয়ে এলো সব মধু, ঘুনসিতে গোটা কয়েক টাকা গুঁজে বে-দরোজা দোকানঘরের দেয়ালটায় ঠেস দিয়ে বসে বসে ভাবলে। এ ক'টা টাকায় কি চলবে সারা বছর? জংগলের ডেরায় গিয়ে কি করবে সে, খাবে কি? তার চেয়ে শহরে থেকে টুটা-ফাটা কাপড়ার বদলি অ্যালুমিনিয়ামের বর্তন বিক্রি করা অনেক ভালো।

ফুটপাথে পড়ে পড়ে সারা রাত ঘুমিয়ে ভোরবেলায় উঠেই ভেবেছে, আজ দেখা করবো

ফাল্‌সার সঙ্গে। দুপুরের সেই নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অধৈর্য আবেগে পায়চারি করে বেড়িয়েছে। অনেক আগেই এসে পৌঁছেছে গলির মোড়ে। বহুবার চেষ্টা করেছে তবু ঢুকতে পারেনি। গলির মোড়ে ঘোরাঘুরি করেছে বারবার, যদি হঠাৎ দেখা হয়ে যায়। তারপর কখন দুপুর পার হয়ে বিকেল হয়ে গেছে। নতুন উত্তেজনায় পুল পার হয়ে বস্তির দিকে হেঁটে গেছে ইমলী, দূর থেকে দেখেছে বস্তিটা, এমন কি ফাল্‌সার ঘরখানাও দেখেছে দূর থেকে, তারপর মনকে বুঝিয়েছে, এত তাড়া কিসের, কাল আসা যাবে।

এমনি করে কয়েকদিন কাটলো, খালি হয়ে এলো ওর কোমরের থলি। শেষে একদিন সব শরম পায়ে মাড়িয়ে এসে উপস্থিত হলো। এপাশ-ওপাশ তাকালো চোরা চোখে। না, ফাল্‌সা নেই। ছায়া-ভেজা গলির ভেতর রকে বসে খেলা করছে দুটো বাচ্চা ছেলে। সারা দুপুর অপেক্ষা করে অধীর হয়ে উঠলো ইমলী। পায়ে যেন ক্লান্তি নেই, বিশ্রাম নেই মনের। এক দিকে হতাশা, আর এক দিকে অধৈর্য। এতদিন শুধু লজ্জার কথাই ভেবেছে ইমলী। কৃপণ মানুষের মতো মাটি খুঁড়ে না দেখেও জেনেছে ঐশ্বর্য ঠিকই লুকোনো আছে। সব হারাতে বসেছে দেখে প্রাণের আবেগে মাটি খুঁড়ে চললো ইমলী। মনকে বোঝালে, আছে, আছে, আরো নীচে লুকিয়ে আছে।

দ্রুত পায়ে পুলপারের বস্তিতে এসে হাজির হলো ইমলী। আশঙ্কার স্রোতে লজ্জা মুছে গেল। ফাল্‌সার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো ইমলী, খোলা জানালায় চোখ রেখে উঁকি মারলো ভেতরে।

না, ফাল্‌সা নেই। ফাল্‌সা চলে গেছে। দড়ির খাটিয়াটাও নেই সে ঘরে। পোড়া ইঁট দুটো আর একটা ভাঙা হাঁড়ি!

পাশের ঘরের ছোকরাটাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে জানলে সব, দীর্ঘশ্বাস আর ব্যথাশ্রু একসঙ্গেই ঝরে পড়লো।

ঘরের ভাড়া বাকী ছিলো ফাল্‌সার। সব বিক্রি করে দিয়ে চলে যেতে হয়েছে তাকে। কোথায়? কে জানে কোথায়। সারা পৃথিবীর রাস্তা জুড়েই তো গরিবের ঘর, চাঁদনী আকাশ তো তার তাঁবুর শামিয়ানা।

ফুটপাথের ধারে সেই বে-দরোজা দোকানঘরে ফিরে এলো ইমলী। রাত তখন অনেক। লোকচলাচল ফিকে হয়ে এসেছে। গুলমোহরের ফাঁক দিয়ে এসে পড়েছে এক টুকরো চাঁদের আলো।

দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে রইলো ইমলী। সব আশা-ভরসা বুঝি ধুয়ে-মুছে গেছে। অবশ হয়ে গেছে ওর সারা শরীর।

ক্লান্তিতে ঘুমে চোখ জুড়ে আসছিলো ইমলীর। হঠাৎ একটা শব্দে চমকে উঠলো ও। চোখ চেয়ে দেখলো একটা ছায়াশরীর এগিয়ে আসছে। ভদ্রলোকের পোশাক-পরা লোকটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো ইমলী। ভয়ে আশঙ্কায় বুক দুলে উঠলো ওর।

আরেকটা দিনের কথা মনে পড়ে গেল ইমলীর। সেদিনও এমনি অবশ হয়ে গিয়েছিলো সারা শরীর। বাধা দিতে পারেনি ইমলী।

আজ শুধু বাধা দেওয়ার শক্তিই নয়, মনের জোরও যেন কমে গেছে। লোভ জেগে উঠছে যেন।

সেদিনের মতোই এসে দাঁড়ালো লোকটা, পায়ে পা ঠেকিয়ে ফিসফিস করে কি যেন বললে। তারপর, হাতের মুঠোয় একটা টাকার স্পর্শ পেলো ইমলী। ইচ্ছে হলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে একটা চড় বসিয়ে দেয় লোকটার গালে। পারলো না।

ছায়াশরীরটা এগিয়ে গেল ধীরে ধীরে।

ইমলীও ছায়ার মতো অনুসরণ করলো তাকে।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কি করে কেটে গেল টের পেলো না ইমলী।

লোকটাও আসে না আর। অনেক অন্ধকার রাত জেগে কাটিয়েছে ইমলী। তবু সে ছায়া-শরীরের দেখা মেলেনি।

ভিক্ষে করে রাস্তার কলে জল খেয়ে খেয়ে কতদিন আর চালাতে পারে। কাজের চেষ্টায় অনেক ঘুরেছে, আর নয়। কেউ সন্দেহ করেছে চুরি করে পালাবে, কেউ ভেবেছে ঘরে উঠতি বয়সের ছেলেটা বিগড়ে যাবে। কল-কারখানাতেও কোনো কাজ জোটেনি। অনেক ভেবে ইম্‌লীর মনে হয়েছে রাতের অন্ধকারে ওই ছায়ার পথ ছাড়া গতি নেই তার।

কিন্তু রাতের অন্ধকারে যা মধু বলে মনে হয় দিনের আলোয় তা ফিরি করা যায় না। কোথায় সে উজ্জ্বল যৌবনের লোভান, শরীরের আদিম উগ্রতা কোথায় হারিয়ে গেল।

নোংরা রোগা হাড়-জিলজিলে শরীর টেনে টেনে ভিক্ষে করে বেড়ালো ইম্‌লী, আর পাঁচটা ভিখিরীর দেখাদেখি বাঁধা বুলি শিখে নিলো। কিন্তু অমন বিগতযৌবনার হাতে পয়সা দেবে কে?

শহরময় ঘুরতে ঘুরতে রেল-স্টেশনের কাছে এসে পৌঁছলো ইম্‌লী। আশ্চর্য! এমন এতোয়ারী হাটের ভিড় কেন স্টেশনে? অসংখ্য মেয়ে-পুরুষ কাচ্চা-বাচ্চা পড়ে আছে কেন উদাস উদ্‌ভ্রান্ত চোখে? কেউ চোখের জল মুছছে, কেউ তাকিয়ে আছে পাগলের মতো। এত চিৎকার হট্টগোল কান্না, কিন্তু হাসি নেই একজনেরও চোখে।

অসহায় দুঃখের ছায়া সকলের মুখে। মাথায়-টুপি ছোকরাগুলো ঘুরছে অনবরত। লোকগুলোকে দড়ি দিয়ে ঘিরে রেখেছে কেন এরা, টুপি-পরা মেয়েগুলোই বা কি কথা বলছে ওদের কানে কানে।

দু-একজনকে সাহসে ভর করে জিগ্যেস করলো ইম্‌লী।

কি আশ্চর্য! খোট্টা কি সাধে বলে। সারা দেশ জুড়ে উদ্বাস্তুদের কান্নার রোল উঠেছে, আর এই খোট্টা মেয়েটা উদ্বাস্তু কাকে বলে বুঝতেই পারছে না।

জমিজমা সম্পত্তি সব ফেলে রেখে পালিয়ে আসতে হয়েছে লোকগুলোকে। পিছনে ভর দেবার কিছু নেই, ভবিষ্যতের ভরসা নেই।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো ইম্‌লী, বুঝলো কিছুটা।

জল আর পাখা বিলোচ্ছে কেউ কেউ। ওদিকে খাবার দেওয়া হচ্ছে ঠোঙায় করে। পুরি তরকারি দিচ্ছে সবাইকে। দু-একজন অনুযোগ করছে, এমন নোংরা খাবার খাওয়া যায় না। দাঁতে চিবোনো যায় না এমন রুটি, বলছে কেউ কেউ।

কিছু বুঝলো, কিছু বুঝলো না ইম্‌লী। একসময় দেখলে নিজেরই অজান্তে কখন সে আর সকলের সংগে এক লাইনে এসে দাঁড়িয়েছে। আর যতই এগিয়ে আসতে শুরু করলো সে সকলের পিছনে পিছনে ততই আনন্দে চকচক করে উঠলো তার চোখ। পেট ভরে খেতে পাবে সে এতদিনে, পুরি আর তরকারি।

ওর হাতের ওপর যখন খাবারের ঠোঙাটা পড়লো তখনো যেন বিশ্বাস হচ্ছিলো না ইম্‌লীর। পিছনের মেয়েটিকে জায়গা করে দিয়ে সরে যেতে ভুলে গেল যেন।

খাবার নিয়ে সরে এলো ইম্‌লী। আর সংগে সংগে মাথায় গেরুয়া টুপি-পরা ছোকরাটা এসে পথ রুখে দাঁড়ালো ওর।

প্রশ্নের পর প্রশ্ন শুরু করলে। কোত্থেকে এসেছে, কি জাত, বাংলা জানে কি না। ভয়ে মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল ওর। আরো অনেক লোক জুটে গেল চারিদিকে।

কে যেন চেঁচালে, রিফিউজি নয় রে, রিফিউজি নয়।

—জোচ্চুরি করে খাবার মারতে এসেছে।

—রিফিউজিরা খেতে পাচ্ছে না, শালী নেমন্তন্নবাড়ি ভেবে ছুটে এসেছে।

—মেরে ভাগিয়ে দে মাগীকে।

যার যা মুখে এলো বললো। উত্তেজিত হয়ে উঠলো সবাই। হঠাৎ কে যেন একটা ধাক্কা মারলো ইম্‌লীকে, হাতের ঠোঙাটা পড়ে গেল দূরে। এদিক থেকে আর একজন কে ধাক্কা মারলে আবার, মাটিতে ছিটকে পড়লো ইম্‌লী নিজেই। চুল ধরে হিড়হিড় করে টেনে তুললো একজন, ঠেলে দিয়ে বললে, যা, ভাগ, আবার আসিস তো মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেবো।

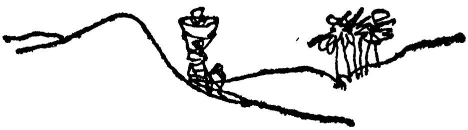
—যাক, যাক, ছেড়ে দে, যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে।

—মেয়েমানুষ আফটার অল। স্টেশনের বাইরে বের করে দিয়ে আয়, আর মারতে হবে না।

কোনো কথাই হয়তো বুঝতে পারলো না ইম্‌লী, চোখ বেয়ে দরদর করে জল গড়িয়ে পড়লো তার।

গায়ের ধুলো ঝেড়ে স্টেশনের বাইরের সিঁড়িতে বসে রইলো ইম্‌লী। হঠাৎ যেন বমির বেগ এসে ঠেকলো গলায়। উঠে দাঁড়াতেই মাথাটা ঘুরে গেল। বসে পড়লো আবার।

[১৩৬০



রেবেকা সোরেনের কবর

আশপাশের পাঁচটা কোলিয়ারির ভিড় ভেঙে পড়লো কারানপুরার বুকে। কারানপুরা—যার আদি নাম কর্ণপুর।

কিংবদন্তী শোনা যায়, মহাভারত-চরিত্র কর্ণের রাজধানী ছিলো এটা। দুসাদ দুবে মাহাতো সিংরা শুধু বলেই খালাস নয়। পাহাড়ের গায়ে এক সারি প্রাচীন গুহার দিকে আঙুল দেখিয়ে জানায়, ওই হলো কর্ণের দরবার। অরণ্যচর বীরহড়দের যে দলটা তীর ছোঁড়ার সময় বুড়ো আঙুলটা মুড়ে রাখে তাদের দেখিয়ে বলে, একলব্যের বংশধর ওরা।

কে কি বলছে না-বলছে, জংলা ডেরার সান্তালরা অবশ্য তার খোঁজ রাখে না। খোঁজ রাখে না, তবে রাখে কান। ঢেঁড়া কাঠির ডুগডুগির দিকে। সে ডুগডুগি মাঝে মাঝে জানিয়ে দেয়, লোক লাগবে বাঁশরিয়ার খাদানে, কিংবা নাটুয়া দল তাঁবু ফেলেছে ঝিন্‌কাগাড়ায়।

এমনি এক ডুগডুগির ডাক শুনেই মেয়ে-মরদের ভিড় ভেঙে পড়লো কারানপুরার রামলীলার মাঠে।

ভিখারিয়ার নাচ এসেছে, ভিখারিয়ার নাচ। নামে নাচ, আসলে গান। কানে আঙুল দেওয়া কবিগানের লড়াই। যা শোনবার আগ্রহে আঠারো ক্রোশ পথ হাঁটতেও উৎসুক হয়ে ওঠে দেহাতীরা, কোলিয়ারির হড় হো ভুম্পি খাড়িয়া রেজাকুলির দল।

তাই ডুগডুগি শুনতে না-শুনতে প্লাবন নামলো রামলীলার মাঠে, কুলিকামিন আর জোয়ান সান্ডা, বাচ্চা বুড়ো হাড়াম হপন্‌, সবাই।

ভিড়ের মুখে গা ভাসিয়ে রূপমতীও এসে পেঁছলো। পেঁছলো যখন, তোতা আর ম্যোর ভিখারিয়া ছাড়েনি তখনো।

'ভিখারিয়া হলো গ্রামের নাম, তা থেকে ভিখারিয়ার নাচ!' বোঝালেন কারানপুরা কোলিয়ারির কম্পাসবাবু।

মারাঠী ম্যানেজার সাঠে সাহেব মাথা নাড়লেন। ও তল্লাটের চীফ মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার ডিক্‌সন আর এজেন্ট ফার্নহোয়াইট চুরুট-চাপা ঠোঁটে বললেন, আই সী!

সব কৃতিত্বটুকু কম্পাসবাবু নিয়ে নিচ্ছেন দেখে কনুইয়ের ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে এলেন মিশিরজী। বললেন, তোতা পাখি আর ময়ূর সেজে দুজন লোক আসবে এখনি, নাটকটার কাহানী বলে দেবে।

কাহানী? ফার্নহোয়াইট ভুরুতে প্রশ্ন তুলে তাকালেন।

নিমন্ত্রিত সাহানা বললেন, কাহানী না ছাই। ভিলেজ স্ক্যান্ডাল, যত সব কেচ্ছা ভিন গাঁয়ের মেয়েদের নামে। ছড়া বেঁধে গাইবে ওরা, আর পারে তো সে গাঁয়ের লোক জবাব দেবে গান গেয়ে! না পারে তো লাঠিসোঁটা নিয়ে হইহই করে উঠবে।

মিশিরজী সায় দিয়ে বললেন, হ্যাঁ স্যার। ভিখারিয়ার নাচ হয়েছে অথচ দু-চারটে খুন-

জখম হয়নি এমন ঘটনা আমরা অন্তত শুনিনি।

বলতে না-বলতেই হইহই চিৎকার উঠলো ওদিক থেকে।

না। মারপিট দাঙ্গাহাঙ্গামার ব্যাপার নয়। তোতা আর ম্যোর দেখা দিয়েছে বাঁশ দিয়ে ঘেরা আসরের মাঝখানটিতে। তোতার মাথায় সাদা পালকের ঝুঁটি, ম্যোর অর্থাৎ ময়ূরের পেখম আঁটা আরেকজনের বুকে পিঠে। হঠাৎ দেখলে ভয় পাবার মতো চেহারা হয়েছে দু-জনেরই। দুজনেই সুর করে গান শুরু করেছে। মূল গায়েন যতক্ষণ না এসে পেঁছিয় দলবল নিয়ে ততক্ষণ আসর জমিয়ে রাখার দায়িত্ব এদের।

তোতা আর ম্যোরকে আসতে দেখেই আনন্দে হইহই করে দাঁড়িয়ে উঠেছে কুলিকামিন কোড়াকুড়ীর দল।

বাঁশের বাতা দিয়ে ঘেরা আসরের চারপাশে উবু হয়ে বসা নোংরা জনতার ভিড় যে কত দূর অবধি ছড়িয়ে গেছে ঠাহর হয় না। আর জনতাকে ঘিরে এক সারি ফার্নেসের মতো বড় বড় আগুনের কুন্ড। কারানপুরার খাদানে কয়লা থাকতে শীতে কাঁপবে কেন লোকগুলো, ফার্নহোয়াইট তাই পঁচিশ বাকেট কাঁচা কয়লা স্যাঙশন করেছেন। অগ্নিকুন্ডের মতো দাউ-দাউ করে জ্বলছে সেগুলো. আসরকে চারপাশ থেকে মালার মতো ঘিরে। ধোঁয়ার কুন্ডলী তো নয়, যেন সিন্ধবাদের কুড়িয়ে পাওয়া হাঁড়ি থেকে দুলে দুলে উঠছে এক-একটা দৈত্য।

দেহাতীদের থেকে খানিকটা দূরত্ব রেখে বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে বসে বসে দেখছিলেন ফার্নহোয়াইট, ডিক্‌সন, সাঠে, ঠিকাদারের দল আর সাহানা। শেষজনের ইঙ্গিতেই কে যেন সামনের টুলে দু বোতল হুইস্কি আর আনুষঙ্গিক রেখে গেল।

ফার্নহোয়াইটের কিন্তু সেদিকে চোখ ছিলো না! দোষও দেওয়া যায় না। কাছে-পিঠে রূপমতীর মতো মেয়ে শরীর কাঁপিয়ে ঘুরে বেড়ালে কি অন্য দিকে চোখ যায়!

সান্তালদের ভিড়ে এমন মেয়ে? আশ্চর্য হয়েই তাকিয়েছিলেন ফার্নহোয়াইট। আর তা লক্ষ করেই ঠিকাদার সিং ফিসফিস করে বললে, রূপমতী! আমাদের তিন নম্বর খাদে কাজ করে মেয়েটা।

রূপমতী? ফার্নহোয়াইটের বাউন্ডুলে ছেলেটা যার পেছনে ছায়ার মতো ঘুরতে চায়?

খাদানে নেমে তার আজ মাটি-কাটার প্লটে, কাল মাল-কাটারিদের কাছে-পিঠে ঘুরঘুর করা মেয়েপুরুষ কারও চোখ এড়ায়নি। কানাঘুষো ফিসফিস, চোখে হাসি, মুখে আঁচল-চাপা কৌতুক বোধ করেছে রেজা মেয়ের দল। সবাই লক্ষ করেছে কার খোঁজে জল-কাদা ডিঙিয়ে কালো কয়লার অন্ধকূপে নেমে আসে ম্যাকু। লক্ষ করে দেখেছে, রূপমতী যখন মাল-বোঝাই ঝুড়িতে ঝাঁকানি দিয়ে সেটা মাথায় তুলে ফিরে দাঁড়ায় আর চোখাচোখি হয় ম্যাকুর সঙ্গে, তখন হঠাৎ যেন তৃপ্তির ঝর্না নামে বাউন্ডুলে সাহেবটার মুখে-চোখে। আর রূপমতীও বোধ হয় ছোকরা সাহেবের নির্লজ্জ পাগলামি দেখে ফিক করে হেসে ফেলেই মুখ গম্ভীর করে।

কিন্তু দিনের পর দিন এমনি একভাবে আসা, দেখা হওয়া, হাসি কৌতুক...কেমন যেন নেশা ধরে যায় রূপমতীর। ঝুড়িটা উলটে নিয়ে তার ওপর বসে পা ছড়িয়ে একদিন লালোয়া কুড়ুখের সঙ্গে গল্প না করতে পেলেও বোধ হয় মন খারাপ হয় না রূপমতীর। মন খারাপ হয় দৈনন্দিন নেশা না মিটলে।

এদিকে কানাঘুষো হাসাহাসি থেকে ব্যাপারটা গুরুতর হয়ে দাঁড়াচ্ছে. বেশ টের পাচ্ছিলো রূপমতী। পট্টির বুড়াবুড়ীরাও বলা-কওয়া শুরু করেছিলো। লালোয়া কুড়ুখও বেজাত, কিল্লির মিল নেই। তবু তাকে নিয়ে রটনার মৌমাছি গুনগুন করে না। যত আপত্তি ম্যাকু-সাহেবের বেলা।

সাহেব। ও হলো আমাদের শত্রুর জাত। চান্দো বোঙা পাপের জল ছিটিয়ে দিয়েছে ওদের ওপর। ধরম নাই ওদের, তাই সান্তালদের ধরম নষ্ট করতে এসেছে ওরা। চান্দো বোঙার কাছ থেকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে খিস্টেন করে দেয় ওরা। যেমন করেছে ওই মরিয়ম, সেবাস্তিনা, মেরিয়া, রেজিকে।

তাই রূপমতীকেও সাবধান করে দিয়েছিলো পট্টির সর্দারনী। মুন্ডা গিতিওড়ার মেয়ে-দের. ওঁরাও ধুমকুড়িয়ার কুমারী মেয়ের দলকেও।

সান্তালপাড়ার ছিমছাম মেয়ে সোনামিরু কানে কানে রূপমতীকে বলেছিলো, বুড়োরা নজর রাখছেন তুয়ার প্যানে।

সোনামিরুর এই সাবধান-বাণী শুনেই ভয় পেয়ে গেল রূপমতী। বুড়োরা নজর রাখছেন! কেন তা রূপমতী ভালো করেই জানে।

বিটলাহা!

চোখের সামনে ভেসে উঠেছিলো বছর খানেক আগের একটি দৃশ্য।

বিটলা হওয়ার পর তিলে তিলে শুকিয়ে মরতে দেখেছে ও সেবাস্তিনার মাকে। পঞ্চায়েতের ভয়ে গুঁরাও-মুন্ডারাও কথা বলতো না, এক পয়সার তেল কি নুন কিনতে পেতো না। শনিচারীর হাটে। অশ্লীল ঠাট্টা-বিদ্রূপ, নোংরা অঙ্গভঙ্গী করে তাকে পাগল করে তুলতো বারো বছরের বাচ্চাগুলোও। আর—

ভাবতেও শিউরে ওঠে রূপমতী।

জোয়ান বুড়ো সবাই ধরম অধরম ভুলে হল্লা বাধাতো তার ডেরায়, রাতে-বিরেতে। লাজশরমের বালাই ছিলো না লোকগুলোর।

তাই কারও দিকে চোখ তুলে তাকাতেও ভুলে গিয়েছিলো রূপমতী।

এক শুধু ছুপছাপ দেখাশোনা লালোয়া কুড়ুখের সঙ্গে। দু কুড়ি টাকা জমলেই চলে যাবে কুমান্ডির খাদানে। দুজনে বাসা বাঁধবে সেখানে। বিটলার ভয়ে কাঁপতে হবে না।

তাই সন্ধ্যে পার না হতেই পট্টির পথ ধরতো ও, সাহস হতো না আগের মতো ম্যাকুসাহেবের সঙ্গে রয়ে-বসে রসিকতা করতে। মান্‌কির হুকুম না নিয়ে যেতো না আড্ডায়-আখড়ায়। কিন্তু ভিখারিয়ার ডুগডুগি উপেক্ষা করতে পারলো না ও। এসে হাজির হলো এই রামলীলার মাঠে।

ভিড় থেকে উঠে এসে সটান গিয়ে দাঁড়ালো ও মিঠাপানির দোকানটার সামনে। লাল নীল নানা রঙের বোতলে সস্তা লেমনেড আর চা-বিস্কুট নিয়ে রীতিমতো একটা দোকান বসে গেছে। আর কি আশ্চর্য, এই শীতেও যত চাহিদা ওই দুর্লভ মিঠাপানির।

রূপমতী খাটো শাড়ির আঁচলে বাঁধা খুচরো পয়সা গুনতে গুনতে তাকালো এদিক-ওদিক। অর্থাৎ পিয়াস গলার নয়, মনের। খুঁজছিলো লালোয়া কুড়ুখকে। দুফেরী পাল্লার কাজ সেরে সটান এখানে চলে আসবার কথা তার!

আসবে ঠিকই, জানে রূপমতী। ভিখারিয়ার নাচ আর রূপমতীর নাম—দু-দুটো হাতছানি উপেক্ষা করার মতো ছাতির জোর লালোয়ার মতো বাইশ বছরের সান্ডার অন্তত নেই। তবু একটু অধীর না হয়ে পারে না ও। সাঁঝের 'আওয়াজ' শোনা যায়নি এখনো। ভয় সেটুকুই। কাজ শেষ করে হাতের শাবল নামিয়ে রেখে লালোয়াটা খাদানে বসেই গল্প শুরু করে দেয় কোনো কোনো দিন, ডিনামাইটের সাবধানী ঘণ্টিটাও শুনতে পায় না। এমন এক ব্লাস্টিং-এর সময়েই কয়লার সীম চাপা পড়ে মারা গেছে রূপমতীর আঠারো বছরের জোয়ান ভাই হরবন্‌শী।

এদিক-ওদিক খুঁজে আবার গিয়ে আসরে বসলো রূপমতী। টের পেলো না ভিড়ের মধ্যে চুপচাপ বসে কোথায় লালোয়া কুড়ুখ একমনে তোতা আর ময়োরের গান শুনছে। ভিড়ের গলায় গলা মিলিয়ে হো হো করে হেসে উঠছে থেকে থেকে।

ভিখারিয়া জমে উঠলো এদিকে। সন্ধ্যা নামলো। ঘন হলো অন্ধকার। আর মূল গায়েন থেকে সবাই এসে একে একে দেখা দিয়ে গেল।

এদিকে রূপমতী, ওদিকে লালোয়া—নাটুয়াদের মুখে অপরের কুৎসা শুনে দুজনেই হাসছিলো হো হো করে। কিন্তু কে জানতো সে গানের ধুয়ো ঘুরে ঘুরে রূপমতীতে এসে ঠেকবে।

'বাঁশরিয়ার রূপমতী, মোতির মতো তার রূপ। ঝিনুকের ভেতর যেমন আড়াল থাকে মোতিয়া, তেমনি ছুপছাপ মন রূপমতীর। গরিবে কুড়িয়ে পায়, তারপর হাতে হাতে ঘুরে রাজার আঙুলে গিয়ে শোভা পায় সে মোতিয়া। মন-ছুপছাপ রূপমতী হাতে হাতেই ঘুরছে এখন, কিন্তু মন জানে ওর রাজার হদিস।'

এত কাব্য করে বলবার লোক তো নয় ভিখারিয়ার নাটুয়ারা। তাই গানটা কেমন যেন

অসহ্য লাগলো লালোয়ার। অপেক্ষা করলো কেউ জবাব দেয় কি না শোনবার জন্যে। কিন্তু সবাই শুধু হো হো করে হাসলো। এমন কি, রূপমতী নিজেও। আর রাগ সামলাতে না পেরে হাতের কাছে একটা কয়লার চাঙড় পেয়ে সেটা ধাঁই করে ছুঁড়ে মারলো লালোয়া, গায়েনকে লক্ষ্য করে।

হইহই হট্টগোল। আসর-সুদ্ধ লোক দাঁড়িয়ে উঠলো উৎকণ্ঠায় আশঙ্কায়। এক দল লাঠিসোঁটা নিয়ে তাড়া করলো গায়েনের দিকে। আরেক দল তাড়া করে এলো লালোয়া কুড়ুখকে।

ফার্নহোয়াইট, ডিক্সন, সাঠে আর সাহানার নেশা জমে উঠেছে তখন। কার হাত থেকে যেন গেলাসটা ছিটকে পড়লো ঝনঝন শব্দ করে। রঙিন চোখ চেয়ে ব্যাপারটা ঠাহর করবার জন্যে উঠে দাঁড়ালো সাঠে। টলতে টলতে দু কদম এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলো, ক্যা হুয়া? চিল্লাতা কাহে?

কেউ হয়তো শুনলো না তার কথা। উত্তর দিলো না কেউ।

রূপমতীও ভয়-কাঁপা চোখে তাকিয়ে দেখছিলো। কি করবে, কি করা উচিত কিছুই যেন ঠিক করতে পারলো না প্রথমটা। তারপর চোখ জোড়া লালোয়ার মুখের উপর পড়তেই ভিড়ের দিকে ছুটে যাবার জন্যে পা বাড়ালো ও।

আর পরমুহূর্তেই থেমে পড়তে হলো।

কাঁধের ওপর ভারি হাতের অনুভব পেয়েই ফিরে তাকালো রূপমতী।

ফার্নহোয়াইটের ছেলে ম্যাকুসাহেব বললে, যাও মাৎ।

বলে রূপমতীর হাত ধরে ডাক দিলো, চলো, ডেরামে ভাগ্ চলো রূপমটি।

এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করলো রূপমতী, পারলো না। অসহায় চোখ মেলে ও শুধু তাকালো ম্যাকুসাহেবের মুখের দিকে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই ভিড়টা যেন রূপমতীর দিকে ভেঙে পড়লো। লালোয়া কুড়ুখের ওপর যত রাগ, সব এসে পড়লো রূপমতীর ওপর।

পাপ যদি না করেছে তো রূপমতীর নামে ছড়া বাঁধবে কেন ভিখারিয়ারা, কুইলার চাঙড় ছুঁড়বে কেন লালোয়া কুড়ুখ। ও হলো সান্তাল, সাথাসাথি কিসের এত লালোয়ার সঙ্গে। আসরটা ভাঙে দিবার তরেই তৈরী ছিলো কুড়ীটো। বলাবলি করলো সকলে।

বলে রূপমতীর দিকে ছুটে এলো দলটা। পাশ থেকে মরিয়ম ফিসফিস করে বললে, পালায় যা, তু পালায় যা রূপমতী।

আর ম্যাকু বললে, আও, চলে আও রূপমটি। বলেই ওর হাত ধরে টানতে টানতে অগ্নি-কুণ্ড ছাড়িয়ে অন্ধকারে নেমে পড়লো।

নির্জন ফাঁকা মাঠের অন্ধকারে এসেই পা থেমে পড়লো রূপমতীর। অস্ফুটে বললে, লালোয়া, লালোয়ার কি হবেক সাহেব? পরমুহূর্তেই ম্যাকুর হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বললে, আমি আছি ইখানে, লালোয়াকে তু বাঁচা রে সাহেব! কান্না এলো যেন ওর গলা ঠেলে।

—ডরো মাৎ।

রূপমতীর পিঠে ভারি হাতখানা রেখে সান্ত্বনা দিলো ম্যাকু।

আর এই সময়েই বাতাস চিরে একটা বন্দুকের আওয়াজ হলো।

থরথরিয়ে কেঁপে উঠলো রূপমতী। ম্যাকুসাহেবের চওড়া বুক টের পেলো ঝড়ো পায়রার ছটফটানি।

আশ্লেষ শিথিল করে ম্যাকু বললে, যাও, ডেরামে যাও রূপমটি। লালোয়া বাঁচেগা। বলেই আসরের দিকে ছুটতে শুরু করলো সে।

বেশ কিছুক্ষণ অন্ধকারের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে ডেরার দিকেই পা বাড়ালো রূপমতী।

লালোয়া বাঁচলো, কিন্তু ভিখারিয়াদের টাঙির ঘায়ে জখম হলো তার একখানা হাত। আর জখম হলো সান্তালপট্টির মান-ইজ্জত।

রূপ-ঝরানো ফূর্তি নিয়ে হাসি-হাসি মুখে হেলেদুলে বেড়াতো রূপমতী। ফার্নহোয়াইট বা ডিক্‌সন হঠাৎ যদি বা কখনো খাদে নেমেছে কয়লার সীম পরীক্ষা করতে, কিংবা ওভার-বার্ডেনের স্তূপ ডিঙিয়ে দেখতে গেছে ঠিকাদারের 'সাক্ষী'র নাপী ঠিক ঠিক হয়েছে কি না, তো মাথার ঝুড়ি ফেলে বড় বড় চোখের কৌতুক আর কৌতূহল মেলে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকেছে রূপমতী, সাহেবের মুখপানে চোখ এঁটে। শনিচারীর হাটে হুড়ুম কিনতে গিয়ে ফিরেছে রঙিন কাচের জলচুড়ি নয়তো গলায় পুঁতি-আঁটা হাঁসুলি পরে। কেউ সন্দেহ করেনি, দোষ দেখেনি কেউ। খাদানের রেজা, কদমে কদমে তার চোখ রাখলে চলে না। মন যুগিয়ে চললে তবেই ঘরে চালের যোগান আসে, সে খবর সবাই জানে। তা বলে এমন বে-আবরু হয়ে ইজ্জত হারানো?

ভিখারিয়ার গায়েন কিনা ছড়া বাঁধলো রূপমতীর নামে? সান্তালপট্টির মান রইলো কোথায় তা হলে?

বুড়া চন্দু হাঁসদা পঞ্চায়েত ডাকলো। ডাকলো রূপমতীর বাপ মাধো সোরেনকে। আর সে খবর দিয়ে গেল রূপমতীর সই সোনামিরু। বললে, পঞ্চায়েত ডাকছে বুড়া চন্দু।

—ক্যানে? বিস্ময়ে চোখ কপালে তুললো রূপমতী।

সোনামিরু হেসে বললে, ভিখারিয়ার রাতে ম্যাকুসাহেবের সঙ্গে পাপ কএরছিস, স্মরণ নাই তুয়ার?

—হ্ঁ। হাসলো রূপমতী। বললে, পঞ্চায়েত বসুক গিয়া। কাল চন্দু বুড়ার ঘাড়ে বাক্‌টো ফেলায় দিব, হ্ঁ।

কিন্তু ঘাড়ে বাকেট ফেলে দিয়ে চন্দু বুড়োকে মেরে কি হবে, দুর্নাম রুখবে কে?

সারনাতলায় পঞ্চায়েত বসলো, আর পঞ্চায়েতের লোক এক কথায় বিচার দিলো।—বিটলাহা।

বিচার শুনে মাধো সোরেন ফিরলো মাঝরাতে। মেয়েকে ডাকলো কাঁদো-কাঁদো গলায়।—রূপমতী।

—কি আপুং?

মাধোর চোখ সজল হলো।—পঞ্চায়েত বিটলার বিচার দেছে রূপমতী!

—বিটলা? হতাশ চোখ মেলে প্রশ্ন করলো রূপমতী।

—বিটলা? চমকে উঠলো ম্যাকুসাহেব খবরটা শুনে।

খাদানের কাজ সেরে ফেরবার সময় ম্যাকুকে খবরটা জানাতে গিয়েছিলো সোনামিরু।

সোনামিরু চোখ মুছে বললে, সায়েব, তুই পাপ কএরছিস, তু ইবার বাঁচা উয়ারে।

কিন্তু বাঁচাতে বললেই তো বাঁচানো যায় না।

দুটো টান দিয়েই সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো ম্যাকু। জেলেকনাইটের কাঠের বাক্সটা টেনে নিয়ে বসলো তার ওপর। আর টিপলারে যেখানে কয়লার স্তূপ জমছে বাকেট উলটে উলটে, সেদিকে তাকিয়ে ভাবতে চেষ্টা করলো, কি করা উচিত।

তারপর হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালো ম্যাকু। ধীরে ধীরে নিজেরই অজান্তে কখন পট্টির দিকে পা বাড়ালো। শুধু হুকুমই নয়, পাঁচ গাঁয়ের মান্‌কি তখন পঞ্চায়েতের বিচার দিয়ে দিয়েছে।

ভিখারিয়ার গানই নয়, হইহল্লার সুযোগ নিয়ে রূপমতী ম্যাকুসাহেবের সঙ্গে আঁধারে গা ঢাকা দিয়েছিলো কেন, তা নাকি কারও বুঝতে বাকি নেই।

অতএব, বিটলা।

বিচার শুনে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো রূপমতী। যে লোকগুলো এত ধরম-অধরমের কথা বলছে, ও জানে এরাই এসে ইজ্জত কাড়বে ওর। খিদের যন্ত্রণায় কিংবা রোগে ভুগে ভুগে যখন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবে ও, তখনো দয়ামায়া দেখাবে না কেউ।

বিটলা! বিচার দিলো বড় পঞ্চায়েত। আর সঙ্গে সঙ্গে সারা গাঁয়ের ছেলে-ছোকরারা দলে দলে বাঁশি আর মাদল বাজিয়ে নাচতে নাচতে ঘিরে ফেললো রূপমতীকে। আর তার পিছনে পিছনে আরেক দল এলো তীর-ধনুক উঁচিয়ে।

ঠাট্টা বিদ্রূপ হাসাহাসি। আর অশ্লীল গান। কেউ তীরের খোঁচা দিলো, কেউ টানলো

তার শাড়ির আঁচল। আর মাঝে মাঝে হইহই চিৎকার।

বাচ্চা ছেলেগুলোও ছড়া কাটতে শুরু করলো। দু হাত তুলে চিৎকার করতে করতে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো রূপমতীর গায়ে।

এদিকে বাঁশ পোঁতা হলো রূপমতীর ডেরার সামনে। পোড়া কাঠ, পুরোনো ঝাঁটা, আর ভাত খাওয়ার পর ফেলে দেওয়া শালপাতা গেঁথে দেওয়া হলো বাঁশের ডগায়। কেউ উনোন ভাঙলো, কেউ হাঁড়ি কড়াই টুকরো টুকরো করলো।

কিন্তু তারপর, তারপর পাড়ার মেয়েরা পালালো সেখান থেকে। যে যার ঘরে ঢুকে কপাট বন্ধ করে দিলো, লজ্জাশরমের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে।

লোকগুলোর কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী দেখে কিন্তু স্থির থাকতে পারলে না ম্যাকু। গাছটার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে দাঁতে দাঁত চেপে বললে, বীস্টস্।

যাকে সামনে পেলে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো। তারপর শাড়িটা কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে দিলো রূপমতীর গায়ে।

ম্যাকুসাহেবকে দেখে ভয়ে থেমে পড়লো সবাই।

গায়ে কাপড়টা কোনোরকমে জড়িয়ে নিয়ে দাঁড়ালো রূপমতী। কপাল থেকে ঝরঝর রক্ত পড়ছে তখন। সারা গায়ে কাদা।

ম্যাকু এগিয়ে এসে শক্ত করে ধরলো রূপমতীর একখানা হাত। তাকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে তুললো বাংলোয়।

ফার্নহোয়াইট বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। বিস্ময়ে কপালে দ্রূ তুলে তাকালেন। অর্থাৎ কি ব্যাপার?

বাউন্ডুলে ম্যাকু একমুখ হেসে বললে, মাই লেডী লাভ, মাই ওয়াইফ। তারপর বললো সব ঘটনাটা।

শুনে হাসলেন ফার্নহোয়াইট।—এ প্রাইজ ইন্ডিড, এ প্রাইজ ফর ইওর শিভাল্রি। বলে সামনের টুল থেকে হুইস্কির গেলাসে আরেকটা চুমুক দিলেন।

কথাগুলো শুনলো রূপমতী, কিন্তু বুঝলো না কিছুই। কৃতজ্ঞতার চোখ মেলে ও শুধু তাকালো ম্যাকুর দিকে, অপমান আর নির্যাতন থেকে যে ওকে বাঁচিয়েছে।

রাতটাও কাটলো ফার্নহোয়াইটের বাংলোতেই, যে বাংলোর কোণের ঘরে ওঁরাওদের খিস্টানী মেয়ে মেরিয়ার রাত কাটতো!

রূপমতীর কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনা দিলো মেরিয়া।—সাহেবের বেটার নজর পড়ছে তুয়ার পরে, ডর নাই রে রূপমতী।

ডর নাই? যত ভয়ডর তো সেইজন্যেই। খাদানের কাজের ফাঁকে হাসি দিল্লাগী এক জিনিস, আর তার বাংলোয় রাত কাটানো অন্য। পীরিত ওর লালোয়া কুড়ুখের সঙ্গে। ঠিগিয়া হবে দু কুড়ি টাকা জমলেই। তা নয়, ম্যাকুসাহেব হাসতে হাসতে এসে বলে কিনা রূপমতীকে শাদি করবে ও।

বেজাত খিস্টানের সঙ্গে শাদি? লালোয়াকে মুছে ফেলে ম্যাকুসাহেবের সঙ্গে মিতালি পাতাতে হবে?

মেরিয়া বোঝালো রূপমতীকে।—ম্যাকুসাহেবের বাপটা আমারে সুখে রাখছে রে রূপমতী, বেটাও সুখে রাখবেন তুয়ারে। বলছে বিয়া করবে বটে।

শুনে ভয়ে কাঁপলো রূপমতী।

শিকল ছিঁড়ে পালালো ফার্নহোয়াইটের বাংলো থেকে।

হোক বিটলা। পটিই ভালো ওর। তবু তো লালোয়া কুড়ুখের সঙ্গে দেখা করতে পারবে লুকিয়ে। আর, আর বুড়ো বাপ মাধো সোরেন। তাকে ফেলে কিনা সুখের ঘর বাঁধবে রূপমতী?

অন্ধকারে শরীর লুকিয়ে ফিরে গেল রূপমতী। পা টিপে টিপে ঝাঁপ সরালো, ঢুকলো ভেতরে।

মাধো সোরেন বিছানায় শুয়ে শুয়ে তখন কাশছে খুকখুক করে। আর জ্বরের ঘোরে গোঙাচ্ছে থেকে থেকে।

রূপমতী ডাকলো ধীরে ধীরে।—আপুং।

—রূপমতী? চোখ খুললো মাধো।

রূপমতী এগিয়ে এলো কাছে, বাপের নির্বিকার মুখটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো ও। দেখলো মাধো সোরেনের দু চোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

আশঙ্কায় আগ্রহে প্রশ্ন করলো, আহার পাইছোন না আপুং?

মাধো বিষণ্ণ হাসি হেসে মাথা নাড়লো।

তারপর ধীরে ধীরে সব কথা বলে গেল মাধো। বিটলা হয়েছে রূপমতী। তাই মাধোর ঘুনসিতে কড়ি থাকলেও দাম নেই তার। হাটের লোককেও জানিয়ে দিয়েছে পঞ্চায়েত। হুড়ু বেচবে না কেউ ওকে, সিম-সিমারি কিনবে না।

—পাট্টির সক্কলে ডাইন বুলছে তুয়ারে। ডাইনীর বাপে ভুখা মরতে হবেক।

—সোনামিরু? আশায় আশায় প্রশ্ন করলো রূপমতী।

হাসলো মাধো। ধুমকুড়িয়ার মেয়ে বটে সোনা, পঞ্চায়েতের ডর নাই উয়ার?

দীর্ঘশ্বাস ফেললো রূপমতী। পঞ্চায়েতের ভয়ে সাহায্য তো দূরের কথা, দেখা হলে কথাও বলবে না কেউ, জিনিস বেচবে না দোকানী। শুধু বিদ্রূপ আর অত্যাচার। না খেতে পেয়ে তিলে তিলে মরতে হবে। সে সাংঘাতিক দৃশ্য দেখেছে রূপমতী।

তবু আশায় বুক বেঁধে অপেক্ষা করলো। হয়তো লালোয়া কুড়ুখ আসবে, সব বিপদ থেকে তাকে বাঁচাবে।

কিন্তু লালোয়ার দেখা মিললো না। পঞ্চায়েতের শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে আসতে সাহস পেলো না হয়তো।

শুধু সোনামিরু একদিন গভীর রাতে লুকিয়ে এসে খাবার রেখে গেল। আর চাপা গলায় বলে গেল, ইখান থেকে পালায় যা রূপমতী, তু পালায় যা। উয়ারা দল বাইন্ধা হামলা করবে তুয়ার পরে, আমি শুনেছি।

ভয়-চাপা গলায় বললে সোনামিরু, ভয় বাড়িয়ে দিলো রূপমতীর।

কিন্তু কি করবে রূপমতী? কি করতে পারে?

সারা রাত বসে বসে ভাবলো ও। তবু বুড়ো বাপ মাধো সোরেনকে ফেলে যেতে মন চাইলো না।

পরের দিন সোনামিরুর কথাই ফললো। রাত না বাড়তেই রূপমতী হইহল্লা শুনতে পেলো। দল বেঁধে আসছে সবাই। ঝাঁপির ফাঁকে চোখ রেখে দেখলো রূপমতী। কুৎসিত উত্তেজনার হাসি চমকে উঠছে তাদের মুখে চোখে।

আর বুড়ো মাধো সোরেন নিশ্বাস চেপে ভয়ে ভয়ে বললো, পালায় যা রূপমতী, তু পালায় যা।

পিছনের ঝাঁপি খুলে পালালো রূপমতী। বুড়ো বাপের দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে ছুটে পালালো অন্ধকারে। ম্যাকুসাহেবের বাংলোর পথ ধরে।

ম্যাকুসাহেব ওকে বিয়া করবে বলেছে, ম্যাকুসাহেব ওকে আশ্রয় দেবে।

ওঁরাওদের খিস্টানী মেয়ে মেরিয়া বলেছে, সাহেবের বেটার নজর পড়েছে তুয়ার পরে, ডর নাই রে, সুখ্যে রাখবেন।

সব কানাকানি খেউড় হল্লা চুপ হয়ে গেল।

পঞ্চায়েত বললে, মানকির বিচার মিছা হয় না। পাপ কএরছিলো রূপমতী, আখন পাপীর ঘরে ঠাঁই পায়েছে।

কোলিয়ারির কুলিকামিনরা বললে, বিটলাটো ঠিকই হইছে, কিন্তুক ডাইন ইবার হামাদের মজুরি কাটবেক। বুড়া সাহেবের বেটার ঘরনী হ'য়েছে উ।

ম্যাকুসাহেবের ঘরনী হয়েছে রূপমতী, খবরটা শুনলো উঁচুতলার লোকরাও। ডিক্‌সন

সিগারেটের টুকরোটা জুতোয় মাড়িয়ে বললে, ন্যুইসেন্স। একটা সান্তাল গার্লকে কিনা বাংলোয় নিয়ে গিয়ে তুলতে দিলো ফার্নহোয়াইট? মিশিরজী আর সাহানা চোখ চাওয়াচাওয়ি করে হাসলো। অর্থাৎ বুড়ো নিজেই বা কম কি! মেরিয়া? কম্পাসবাবু চোখ কুঁচকে কি যেন ইঙ্গিত করলেন।

আর সোনামিরু এসে বললো লালোয়া কুড়ুখের ক্লান্ত গাঁইতিটার পাশে। কোমরের গামছাটা খুলে পাখার মতো নাড়তে নাড়তে বললে, জোয়ান মানুষটো তুই সায়েবের ডরে লুকায় থাকবি?

দীর্ঘশ্বাস ফেললো লালোয়া। বললে, রূপমতীরে সমঝায়ে দেখ তুই, কুমান্ডির খাদানে কাম মিলবেক বটে, ধাওড়ায় ঘর মিলবেক। বিটলার ডর নাই।

সোনামিরু বললে, হুঁ, সমঝাবো রূপমতীরে। কিন্তুক তুয়ার দুইটো হাতে ঘর বাঁধবার হইল নাই, একটো হাতে কি ঘর বাঁধবারে পারবিন?

কাটা হাতটার দিকে তাকিয়ে বিষণ্ন হাসি হাসলো লালোয়া।

কিন্তু রূপমতী বুঝলো না।—লালোয়া? শুনে খিলখিল করে হেসে উঠলো ও। বললে, ওটা মরদ বটেক, না ধুমকুড়িয়ার কুড়ী? বিটলার সুময় যাতে পারে নাই টাঙ্গি লিয়ে?

শুনে আবার দীর্ঘশ্বাস ফেললো লালোয়া। তারপর লুকিয়ে লুকিয়ে নিজেই গিয়ে হাজির হলো বাংলোর বাগানে।

ফার্নহোয়াইটের বাচ্চা মেয়েটার পেরাম্বুলেটর ঠেলছিলো রূপমতী।

প্রথমটা চিনতে পারেনি, ভাবছিলো আয়াটাকেই জিগ্যেস করবে রূপমতীর খবর। কিন্তু বাঁক ঘুরে রূপমতীর সামনাসামনি হতেই সারা মুখ ম্লান হয়ে গেল লালোয়ার।

মাজাঘষা রূপ, তকতকে ফরসা একখানা শাড়ি, চুলে যত্নের চাকচিক্য।

লালোয়া বললে যা বলবার। অনুনয়, অনুযোগ।

আর রূপমতী শুধু অসম্মতির ঘাড় নাড়লো।

—ম্যাকুসাহেব কে তুয়ার, ও কি বিয়া করবে সান্তাল কুড়ীকে?

রূপমতী হাসলো। বললে, হুঁ। গির্জায় যায়ে খিস্টান হবো, ম্যাকুসাহেব বলেছে উ আমার হাসবাঁধ বটে।

সত্যিই হলো তাই। শুনলো কোলিয়ারির সবাই। সুন্দরগড়ের সাদা-আলখাল্লা পাদরী-সাহেব বাইকে চেপে এসে হাজির হলো একদিন, ছোট গির্জার অল্টারের সামনে দাঁড়িয়ে কি বলে গেল কিছুই বুঝলো না রূপমতী। শুধু বুঝলো ওর নতুন নাম হলো রেবেকা। রূপমতী থেকে রেবেকা। সান্তাল থেকে খিস্টানী।

খুশিতে উছলে ওঠে রূপমতীর মন। পরের রবিবারেই ওদের বিয়া। তারপর? তারপর ওকে রেবেকা মেমসাহেব বলবে সকলে। খাদানের কুলিকামিনরা। আর পঞ্চায়েতের যারা বিটলার জন্যে চিৎকার করেছিলো তারাই সেলাম জানাবে দেখা হলে।

এ যেন হারানো ইজ্জত ফিরে পাওয়া। লালোয়ার সঙ্গে ঠিগিয়া হলে কি এ সম্মান পেতো ও। সারা জীবন শুধু ভয়ে ভয়ে কাটাতে হতো। কে কি কানাঘুষা করে, কে কি বিচার দেয়।

ম্যাকুর কাছে কতবারই তো শুনেছে ও, বিয়ের পর ম্যাকু হবে ওর হেরেল, স্বামী। খিস্টানী ভাষায় যাকে বলে হাসবাঁধ অর্থাৎ হাসব্যান্ড।

আমলকীর ঝিরঝিরে পাতার ফাঁকে বাঁকা চাঁদের জ্যোৎস্নায় রূপমতী সব ভুলে গেল। ভাবলো, সুখের জীবন বুঝি মোড় নিলো এবার।

কিন্তু ভুল ভাবলো রূপমতী।

কোলিয়ারির চাকরি তো জুয়ার টাকা। আসতে যেতে সময় লাগে না। হিসেবের গলদ ধরা পড়লো, কোলকাতার অফিস জানালো ফার্নহোয়াইট বিদায় নিতে পারে চাকরি থেকে।

ফার্নহোয়াইট ছেলেকে ডেকে বললো, চাকরি যাক দুঃখ নেই। দুঃখ শুধু টাকাগুলো ওড়ানোর জন্যে। তুমিও তো রোজগারের ধার দিয়ে গেলে না।

চুপ করে রইলো ম্যাকু।

ফার্নহোয়াইট বললে, তল্পিতল্পা বাঁধতে হবে এবার। ভাবছি, বাঙ্গালোরে গিয়ে থাকবো,

আর যদি চাকরি একটা পেয়ে যাই ভালোই।
—আমি? প্রশ্ন করলো ম্যাকু।
—হ্যাঁ, তোমার ব্যবস্থাও করেছি। তোমার বোন ডোরা এসে পেঁছবে এই সপ্তাহেই। তার সঙ্গে আসছে পার্সিভালের মেয়ে সিলভিয়া।
—তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক?
ফার্নহোয়াইট হাসলেন।—তার যোগ্য হতে পারো তো পার্সিভাল নিশ্চয় একটা রেলের চাকরি তোমাকে দিতে পারবে।
—বিয়ে?
—কপালে চোখ তুলছো কেন? লাভ ইজ্‌ন্ট সামথিং ইম্পসিবল্?
মৃদু হেসে ফার্নহোয়াইট বললেন, রেবেকার কথা ভাবছো? ওটা কি বিয়ে নাকি? রোজগারের টাকাগুলো নষ্ট করেছি বটে, কিন্তু তোমার পাগলামির জন্যে দু-পাঁচ শো টাকা খেসারত দেবার সঙ্গতি এখনো আছে।
শুনে কি একটা দাঁতে চিবোনো কটূক্তি করে সরে পড়লো ম্যাকু।
কিন্তু দিনকয়েক পরেই যখন ডোরার সঙ্গে সিলভিয়াও এসে পেঁছলো, ম্যাকুর হঠাৎ মনে হলো বাপের কথাটা নেহাত মিথ্যে নয়। আর ফার্নহোয়াইট রূপমতীকে ডেকে বললেন, চৌকিদারের ঘরটা খালি আছে, ক'টা দিন এখানে থাকবি।
খুশী মনেই রাজী হলো রূপমতী। সত্যি তো। মেয়ে এসেছে, এসেছে মেয়ের সাথী। ও থাকলে বেমানান হবে বড়। আর অসুবিধেও হবে, হবে রূপমতীর নিজের।
সেই কথা বুঝিয়েই একদিন লরীতে মালপত্র তুললেন ফার্নহোয়াইট। ডোরা আর সিলভিয়া আগেই চলে গিয়েছিলো। তাই বিদায়-মুহূর্তে রূপমতীর কান্না-ঝরা চোখ মুছিয়ে দিলো ম্যাকু। বাপের চোখ এড়িয়ে নিজের চোখও মুছলো হয়তো।
বললে, ফিরে আসবো এক সপ্তাহের মধ্যেই। তারপর নিয়ে যাবো আমার রেবেকাকে।
সজল চোখে আনন্দের হাসি দেখা দিলো রূপমতীর।
যাবার সময় এক গোছা নোট গুঁজে দিলো ম্যাকু, রূপমতীর হাতে।
লরী ছেড়ে দিলো, পিছনে পিছনে ফার্নহোয়াইটের ছোট্ট মোটরখানাও।

কিন্তু ম্যাকু ফিরলো না আর।
ফার্নহোয়াইটের জায়গায় মাস কয়েক পরে এলেন মিস্টার পেরেরা। এসেই বাবুর্চিকে বললেন, চৌকিদারের ঘর থেকে সান্তাল মেয়েটাকে তাড়াও।
টুকটুকে বাচ্চাকে বুকে আঁকড়ে চোখ রাঙালো রূপমতী। বললে, কে জানিস আমি? ম্যাকুসায়েব আমার হাসবাঁধ।
শুনে হাসলো বাবুর্চি, হাসলেন মিস্টার পেরেরা। মিশিরজী, সাহানা, কম্পাসবাবু, সবাই হাসলেন। আর ঠাট্টা-বিদ্রুপের ছড়া বাঁধলা সান্তালপট্টির মেয়েপুরুষ।
হাসবাঁধ। সব বাঁধন ছিঁড়ে পালিয়েছে ম্যাকু, তা কি এখনো বোঝেনি নাকি মেয়েটা?
হাসলো সবাই, হাসলো না শুধু একজন।
লালোয়া কুড়ুখ।
গির্জার সামনের ঘরটায়, যেখানে বাচ্চা কোলে নিয়ে উঠে আসতে হলো রূপমতীকে, সেখানেই ভীরু ভীরু চোখে উঁকি মারলো সে একদিন। রূপমতীর চাটাইয়ের এক কোণে ভয়ে ভয়ে বসলো লালোয়া। বললে, চল রূপমতী, ইখান থেকে কুমাণ্ডির খাদানে চলে যাই।
চোখ রাঙালো আবার রূপমতী। বললে, পাপের কথা সান্তাল কুড়ীদের সাথে বলবি, আমি খিস্টানী বটি, পাপ করি না আমি। ম্যাকুসায়েব আমার হাসবাঁধ।
সোনামিরুও এলো একদিন দেখা করতে।
বললে, খাবি কি রূপমতী? খাদানে কাম নিবি তো চল, মুনশীরে বলি।
—খাদানের কাম? চোখ কপালে তুললো রূপমতী। বললে, আমার না ম্যাকুসায়েবের সাথে বিয়া হইছে। ম্যাকুসায়েবের ইজ্জত খতম্ করতে চাস তুরা?

—ম্যাকুসায়েবের ইজ্জত? রাগে দাঁতে দাঁত চাপলো সোনামিরু।—উ আর ফিরবে নাই রে, উ আর ফিরবে নাই।

অবিশ্বাসের হাসি হাসলো রূপমতী।—ম্যাকুসায়েব মানুষটারে তুরা বুঝিস নাই বটে। ও আমারে কয়ে যেছে ফিরা্যা আসবে।

কিন্তু ফিরলো না ম্যাকুসায়েব। আর ম্যাকুসায়েবের ইজ্জত বাঁচাবার জন্যে অনাহারে অভাবে দারিদ্র্যে রূপ হারালো রূপমতী। দিনের পর দিন স্বাস্থ্য ভেঙে পড়লো তার।

লালোয়া কুড়ুখ এলো একদিন। বসে গল্প করলো অনেকক্ষণ, তারপর অনুরোধ জানালো কুমান্ডির খাদানে যাবার। আর সে কথা হেসে উড়িয়ে দিলো রূপমতী। কিন্তু হাসি মুছে গেল ক্রমশ তার মুখ থেকে। সত্যিই ফিরলো না ম্যাকু।

তবু ম্যাকুর বাচ্চাকে মানুষ করে তোলবার স্বপ্ন দেখলো রূপমতী। এক ইঁটের দেয়াল দেওয়া দেহাতী গির্জার পশ্চিমের ছোট ঘরটায় চাটাইয়ে শুয়ে শুয়ে দিনের পর দিন স্বপ্ন দেখলো।

ছেলে বড় হবে, খাদানের সাহেব হবে তার ছেলে। সোনামিরু বলে কিনা খাদানে কাজ নিতে। নিজের মনেই হাসলো রূপমতী। সে হলো ম্যাকুসাহেবের মেম, ইজ্জত নাই তার?

সুন্দরগড়ের সাদা আলখাল্লার পাদরী বাইক ঠেলে আসতো প্রতি রবিবার। বাইব্‌ল্‌ পড়ার পর আর-আর খিস্টানীদের সঙ্গে রূপমতীও সুর টেনে টেনে গাইতো প্রার্থনার গান, তারপর ইশু বোঙার কাছে বলতো, ম্যাকুসায়েবেরে তাড়াতাড়ি পাঠায় দে ইশু বোঙা। পাদরী যাবার সময় সান্ত্বনা জানিয়ে যেতো। কখনো বা ওঁরাও আর মুণ্ডা খিস্টানীদের কাছ থেকে চাঁদা নিয়ে দিয়ে যেতো রূপমতীকে।

সোনামিরুও আসতো মাঝে মাঝে। এনামেলের থালায় করে ঠাণ্ডি ভাত এনে রাখতো তার পাশে। বসতো, গল্প করতো।

আর বাইরের রাস্তায় গাড়ির শব্দ শুনলেই ছুটে আসতো রূপমতী। ওই বুঝি ম্যাকু-সাহেবের গাড়ি এলো। একমুখ আশা-উজ্জ্বল হাসি নিয়ে ছুটে আসতো রাস্তা অবধি। তারপর মুখ কালো করে দীর্ঘশ্বাস বুকে পুষে ফিরে যেতো।

সোনামিরুকে বলতো, ফিরবো রে, ফিইরা আসবো। বেটার মুখ দেখবারে বাপ না ফিইরা পারবো ক্যানে।

লালোয়াও এসেছে কোনো কোনো দিন। সোনামিরুর সঙ্গে। আর ফেরার পথে ওরা বলাবলি করেছে, রূপমতীটো পাগল হইছে।

সোনামিরুও এসে জানিয়েছে, কাজ না করলে না খেয়ে মারা যাবে রূপমতী। বলেছে, মুনশীকে বলে কাম ঠিক করে দেবে।

আর রূপমতী হেসেছে সে কথা শুনে। ম্যাকুসায়েবের ওড়াগমকে অর্থাৎ ঘরনী কিনা খাদে গিয়ে ঝুড়ি বইবে? তাতে যে ম্যাকুসায়েবের ইজ্জত নষ্ট হবে।

এমনি করেই দিনের পর দিন কেটেছে। শেষে মৃত্যুও ঘনিয়ে এলো একদিন।

দুপুরের ছুটির সাইরেন বাজার পর এনামেলের থালায় করে ঠাণ্ডি ভাত নিয়ে এসে সোনামিরু ঘরে ঢুকেই চিৎকার করে উঠলো রূপমতীর বীভৎস চেহারা দেখে। এনামেলের থালাটা ধীরে ধীরে নামিয়ে রেখে রূপমতীর বুকের কাছ থেকে তুলে নিলো ফুটফুটে বাচ্চা ছেলেটাকে। তারপর—

চাঁদা তুলে কবর দেওয়া হলো রূপমতীর। সুন্দরগড়ের সাদা আলখাল্লার পাদরী বাইক ঠেলে এলো আবার, বাইব্‌ল্‌ থেকে দু লাইন বিড়বিড় করে বলে গেল।

কবরের নিস্তব্ধতায় নামিয়ে দেওয়া হলো রূপমতীর মৃতদেহ।

কবর নয়, মাটির ঢিবি। তার ওপর দু টুকরো কাঠ আড়াআড়ি করে বেঁধে একটা ক্রুশ পুঁতে দেওয়া হলো।

তারপর খিস্টান পল্লীর সবাই ভুলে গেল রূপমতীর কথা।

ভুললো না শুধু একজন। লালোয়া কুড়ুখ।

কারানপুরার কুলিকামিন, কোড়াকুড়ীরা বলে, প্রতিদিন সন্ধ্যায় এসে বসতো ও কবরের পাশে, ভয়ে ভয়ে হাত বোলাতো কবরের মাটির ওপর। চোখ থেকে জল ঝরে পড়ে সে মাটি ভিজে যেতো কোনো কোনো দিন। তারপর একসময় মাটির প্রদীপটা জেবলে দিয়ে চলে যেতো লালোয়া।

খিস্টান পল্লীর সান্তালরা বলে, লালোয়ার দেখাদেখি সোনামিরুও এসে বসতো কবরের পাশে। রূপমতীর ঘুম ভেঙে যাবে এই ভয়ে একটাও কথা বলতো না সে। শুধু কোনো কোনো দিন প্রদীপটা এগিয়ে দিতো নিজেই, কিংবা লালোয়ার হাত থেকে প্রদীপটা নিয়ে চকমকি ঠুকে ঠুকে নিজেই জবালাতো সেটা।

সান্তালপট্টির বুড়ো-বুড়ীর দল বলে—শালপাতার আড়াল দেওয়া প্রদীপের শিখাটা জবলতো তারার মতো, দেখেছে তারা নিজের চোখে, প্রতিদিন দেখতে পেতো।

আর তা দেখে একে একে সান্তালপল্লীর সবাই এসে বসতে শুরু করলো রূপমতীর কবরের পাশে।

এসে চুপচাপ বসে থাকা, তারপর প্রদীপ জবালিয়ে ফিরে যাওয়া।

এ প্রদীপের শিখা সবাই দেখতে পেতো দূর থেকে।

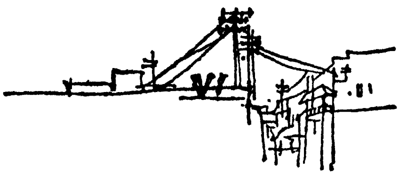
ক্রমশ মুর্গিবলি শুরু হলো রূপমতীর কবরের পাশে, পৌষ পরবে নাচ শুরু হলো। ওঁরাও মুন্ডা সান্তাল হো সবাই মিলে পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে দিলো রূপমতীর কবর, আর সেই কবরের গায়ে নাম খোদাই করার সময় ঝগড়া বাধলো সাদা আর কালো খিস্টানদের মধ্যে। কালো চামড়ার খিস্টানরাই জিতলো শেষ অবধি। রূপমতী নয়, রেবেকা ফার্নহোয়াইট নয়, মাধো সোরেনের মেয়ে রেবেকা সোরেনের কবর।

বড় বড় হরফে পাথর খোদাই করে লেখা হলো রেবেকা সোরেনের নাম।

আজও কারানপুরার কোলিয়ারিতে রেবেকা সোরেনের কবর ঘিরে সারি সারি প্রদীপ জবলে। লালোয়া কুড়ুখের কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সবাই।

কিন্তু একটি নাম ডুবে গেছে বিস্মৃতির অতলে। নিবে গেছে শুধু একটি প্রদীপ। যে প্রদীপ শুধু লালোয়া কুড়ুখই জবালাতে পারতো। যে আলো জবলতো শুধু সোনামিরুর বুকে।

।১৩৬০



রাঙা পিসীমা

বেলেঘাটার অনাদি দস্তিদার লেনের সতেরোর এক বাড়িটা আপনারা কেউ দেখেছেন কি না জানি না। যদি কোনো দিন বেলেঘাটায় যান, হাতে সময় থাকলে অনাদি দস্তিদার লেনের খোঁজ করবেন। তারপর অনাদি দস্তিদার লেনে ঢুকে বাঁ দিকের ফুটপাথ ধরে পরপর সতেরোটা নম্বর পার হয়ে এসে বাগানওয়ালা প্রকান্ড একখানা বাড়ি দেখতে পাবেন।

পাঁচিল দিয়ে ঘেরা নির্জন বাড়িটার দিকে তাকালে দিনের বেলাতেও আপনার গা ছমছম করবে। একটু লক্ষ করলে দেখবেন বাঁ দিকের দেয়ালে আলকাতরা দিয়ে বড় বড় হরফে লেখা আছে সতেরোর এক, কিন্তু ফটকের ডান দিকে দেখতে পাবেন একটা মারবেলের ফলক। ফুলপাতা-আঁকা নামটা লেখা আছে তার ওপর। নাম অনাদি-নিবাস।

অনাদি-নিবাসের পাঁচিল অবশ্য ধসে পড়েছে এখন, লোহার ফটকে জং ধরেছে। আর বাগান? হ্যাঁ, এককালে বেশ সাজানো বাগানই ছিলো। এখন চোরকাঁটার ঝোপের মধ্যে শুধু একটা মারবেলের মূর্তি।

অনাদি-নিবাসের জানলাগুলো আজ সাত বছর খোলা হয়নি, প্লাস্টার খসে খসে ইঁট বেরিয়ে পড়েছে, বৃষ্টির জলে ভিজে ভিজে দেয়ালে শ্যাওলা জমে এমন চেহারা হয়েছে যে ভূতুড়ে বাড়ি বলেই মনে হবে।

পাড়ার লোক নাকি মাঝরাতে ও-বাড়ি থেকে কান্নার শব্দ ভেসে আসতে শুনেছে। কেউ কেউ বলে, সাদা ধবধবে থান পরে একটি পরমাসুন্দরী মেয়েকে নাকি জ্যোৎস্না-রাতে ও-বাড়ির ছাদে ঘুরে বেড়াতেও দেখা যায়।

সত্যিমিথ্যে জানি না, তবে সন্ধ্যের পর অনাদি-নিবাসের পাশ দিয়ে কেউ হেঁটে যেতেও সাহস পায় না।

এত বড় একটা বাড়ি, অথচ কেউ নাকি কোনো দিন অনাদি-নিবাসে আলো জ্বলতে দেখেনি, মানুষ ঢুকতে বা বেরুতে দেখেনি। শুধু কার্নিসের ওপরে বসে একরাশ পায়রা বকম বকম করে, আর কার্নিসের নীচে চামচিকের রাজত্ব। তাই গাড়িবারান্দার ঠিক ওপরে দুটো পরীর মাঝখানে যদিও ইংরেজীতে লেখা আছে ১৯০২, তবু বাড়ির চেহারা দেখে মনে হয় সিরাজদ্দৌলার সংগে ক্লাইভের যুদ্ধ হওয়ার সময়েই বুঝি অনাদি-নিবাসের পত্তন।

আমি একসময় এই অনাদি-নিবাসের, এই সতেরোর এক অনাদি দস্তিদার লেনের বাসিন্দা ছিলাম। আরও দুটি কলেজের ছাত্রের সংগে আমিও সেদিন আশ্রয় পেয়েছিলাম রাঙা পিসীমার।

বাড়ির সরকারমশাই থেকে শুরু করে আমরা সবাই তাঁকে রাঙা পিসীমা-ই বলতাম। আশ্রিত লোক ও-বাড়িতে তখন কম ছিলো না। আত্মীয়ের মধ্যে রাঙা পিসীমার এক বিধবা ননদ, যাঁকে আমরা বুড়ীদি বলতাম; রাঙা পিসীমার এক মামা, যাঁকে আমরাও মামাবাবু বলতাম; আর বুড়ীদির আধ ডজন ছেলেমেয়ে, যাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় মেয়েটার নাম ছিলো মিনু।

রাঙা পিসীমা থাকতেন দোতলার একটি ঘরে; বুড়ীদি কিংবা মামাবাবুর সংগে তাঁর দেখা হতো, দু-চারটি কথা হতো, শুধু ভোরবেলায় যখন গংগাস্নানে যেতেন।

রাঙা পিসীমার চেহারা ছিলো পটের প্রতিমার মতো। লম্বা দোহারা গড়ন, ফরসা ধবধবে রঙ, নাকের ওপর গংগামৃত্তিকার রসকলি। লালপাড় গরদের শাড়ি পরতেন সব সময়, গায়ে থাকতো একটা নামাবলী। কানের পাশে চুল তাঁর তখনই অর্ধেক সাদা হয়ে গেছে।

এমন রূপ, কিন্তু সরকারমশাই বলেছিলেন, রাঙা পিসীমার মতো দুঃখের জীবন নাকি কারও হয় না।

দুঃখটা কিসের জানতে পারলাম হঠাৎ একদিন। কলেজ থেকে সবে ফিরেছি, মিনু এসে বললে, মামীমা তোমাদের ডাকছে।

আমরা তিনজন আশ্রিত বালক সুড়সুড় করে দোতলায় উঠে গেলাম। গিয়ে দেখি বাক্স-বিছানা বাঁধা হচ্ছে, রাঙা পিসীমা কোথাও যাবেন হয়তো।

বাক্স গুছোতে গুছোতে ফিরে তাকিয়ে বললেন, দু দিনের জন্যে কাশী যাচ্ছি, একটু সাবধানে থাকিস তোরা।

সায় দিয়ে ঘাড় নাড়লাম।

আবার বললেন, কিছু অসুবিধে হলে তোদের বুড়ীদিকে বলিস, কেমন?

এবারও ঘাড় নাড়লাম।

তারপর একসময় ফিটনে চড়ে রাঙা পিসীমা চলে গেলেন। আর রাঙা পিসীমা চলে যেতেই মিনু এসে ফিসফিস করে বললে, মামীমা কোথায় গেলেন জানো?

উত্তর দিলাম, কোথায় আবার, তীর্থে।

মিনু বেণী দুলিয়ে মাথাটা একবার বাঁ দিকে, একবার ডান দিকে হেলিয়ে বললে, উঁহু। কিচ্ছু জানো না।

বললাম, কোথায় গেলেন তবে?

মিনু ফাজিল মেয়ের মতো হাসি চেপে বললে, বরকে খুঁজতে। আমার ছোটমামা তো নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন, তাঁকে খুঁজতে গেলেন।

মিনুর কাছেই সেই প্রথম শুনলাম রাঙা পিসীমার ইতিহাস।

পনেরো বছর বয়সে নাকি বিয়ে হয়েছিলো রাঙা পিসীমার। ভালো ঘরে, ভালো পাত্রে। কিন্তু বিয়ের আগে যেটা ভালো মনে হয়েছিলো সেইটাই হলো কাল। এমন সুন্দরী বউ, এমন রাজার মতো ঐশ্বর্য, কিন্তু রাঙা পিসীমার স্বামীর নাকি এসবের দিকে টান ছিলো না। টান ছিলো এক তান্ত্রিক গুরুর দিকে। পুজো-আর্চা করতেন, তারপর হঠাৎ এক-এক দিন উধাও। আবার ফিরে আসতেন দু-দশ দিন পরে।

প্রথম প্রথম সবাই খোঁজাখুঁজি করতো, কিন্তু তারপর তাও বন্ধ হলো। সকলেই জানতো, দু দিন পরেই ফিরে আসবেন। কেউ বলতো, মাথায় ছিট আছে; কেউ বলতো, ও জন্মবৈরাগী, গেরুয়া দেখলেই ওর মন ঘর ছেড়ে পালাতে চায়। ও ঠিক সন্ন্যাসী হয়ে চলে যাবে একদিন।

শেষ পর্যন্ত হলোও তাই। বিয়ের পর তিনটে বছরও কাটেনি তখন, হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশ হলেন রাঙা পিসীমার স্বামী।

রাঙা পিসীমা ভেবেছিলেন, মাসখানেক পরেই ফিরে আসবেন।

কিন্তু মাস থেকে বছর কেটে গেল, তবু ফিরে এলেন না। তখন সরকারমশাইকে পাঠানো হলো তারকেশ্বরে সেই তান্ত্রিকের আশ্রমে।

সরকারমশাই মুখ কালো করে ফিরে এলেন। না, পাওয়া যায়নি দুজনের একজনকেও। না তান্ত্রিককে, না রাঙা পিসীমার স্বামীকে।

মুখ শুকিয়ে গেল রাঙা পিসীমার, সবাই বিব্রত হয়ে উঠলো। চিঠির পর চিঠি গেল আত্মীয়স্বজনদের নামে, কেউ যদি হদিস দিতে পারে। কিন্তু কেউ কোনো খবর দিতে পারলো না।

গয়া, কাশী, বৃন্দাবন—তীর্থে তীর্থে ঘুরে এলেন রাঙা পিসীমা, কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়ে কি হারানো মানুষকে খুঁজে পাওয়া যায়?

রাঙা পিসীমার মুখের হাসি নিবে গেল। সেই যে পুজোর ঘরে ঢুকলেন, তারপর থেকে শুধু নামকীর্তন আর পুজোপার্বণ। বাড়ির লোকদের সঙ্গে কথাবার্তাও একরকম বন্ধ হয়ে গেল, মেলামেশা বন্ধ হলো আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে।

ফিসফিস করে রাঙা পিসীমার ইতিহাস বলছিলো মিনু, সমবেদনায় ওর গলার স্বরও বুঝি ভারি হয়ে এসেছিলো। এমন সময় হঠাৎ বলে উঠলো, এই রে, সরকারমশাই...

বলেই ছুটে পালালো।

সরকারমশাই ঘরে ঢুকেই পটপট করে জামার বোতাম ক'টা খুলে দিয়ে হাতপাখাটা নিয়ে বুকে হাওয়া করতে শুরু করলেন।

তারপর হঠাৎ যেন নিজের মনেই বললেন, এই নিয়ে বোধ হয় দু শো পুরো হলো।

বুঝতে না পেরে তাকালাম তাঁর মুখের দিকে।

উত্তর এলো, দু শো বার, দু শো বার এমনি উড়ো খবর এসেছে। আত্মীয়স্বজন কেউ গয়া কি বৃন্দাবন বেড়াতে গেছে, আর সেখান থেকে চিঠি লিখেছে, সাধুদের আড্ডায় দেখলাম, মনে হলো যেন অমুক। রাঙা পিসীমাও তেমনি মানুষ, যে যা বলে বিশ্বাস করে বসেন। আর যত ঝামেলা আমার, 'সরকারমশাই, ব্যবস্থা করে দিন, যাই একবার, স্বচক্ষেই দেখে আসি।'

জিগ্যেস করলাম, এবারও বুঝি খবর পেয়েই গেলেন?

সরকারমশাই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, হ্যাঁ। দু শো বারই খবর পেয়ে গেছেন, কিন্তু কখনো হয়তো সাধুর হদিসই মেলেনি, কখনো গিয়ে দেখেছেন, সম্পূর্ণ অন্য লোক। এবারেও দেখো, তাই হবে।

সরকারমশাই যা বলেছিলেন তাই হলো। দিনকয়েক পরেই থমথমে মুখ করে ফিরে এলেন রাঙা পিসীমা। পাওয়া যায়নি।

পাওয়া যে যাবে না তা যেন সকলেই জানতো। জানতেন না শুধু রাঙা পিসীমা।

আগের মতোই আবার তেমনি নামাবলী গায়ে দিয়ে নাকে কপালে গঙ্গামাটির তিলক কেটে গুনগুন করে গান শুরু করলেন সকাল থেকে সন্ধ্যে।

হঠাৎ একদিন দেখি কি, দোতলার বারান্দায় একজন জ্যোতিষীর সামনে বসে একমনে কি যেন শুনছেন রাঙা পিসীমা।

সরকারমশাই হেসে বললেন, ওই তো কাজ। একবার শুনলে হলো অমুক জায়গায় ভালো জ্যোতিষী আছে, অমনি হুকুম হবে, 'যান তো সরকারমশাই, একবার নিয়ে আসুন তাঁকে।'

সেদিনও এমনি রাগে গজগজ করতে করতে সরকারমশাই এসে হাজির হলেন। বললেন, আমার হয়েছে যত ঝামেলা। কে খবর দিয়েছে বাঁশবেড়েতে ভালো গনৎকার আছে, তাকে আনতে হবে এখন।

সরকারমশাই চলে গেলেন, আর মিনুর কাছে শুনলাম ব্যাপারটা।

দিনের পর দিন এমনি একজন-না-একজন জ্যোতিষী আসে। নিজের আর স্বামীর দুখানা কুষ্ঠী মেলে ধরে আলোচনা হয়। আজেবাজে অনেক কথা বলে যায় গনৎকার, কিন্তু সেদিকে কান থাকে না রাঙা পিসীমার। শুধু একসময় ফিসফিস করে জিগ্যেস করেন, দেখুন তো ভালো করে উনি কবে ফিরে আসবেন।

এক-একজন এক-একটা তারিখ বলে, তা শুনে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন রাঙা পিসীমা। হয়তো পাঁজি দেখে দিন গোনেন, তারপর সে তারিখ পার হয়ে যায়। কেউ আসে না। ফিরে আসে না রাঙা পিসীমার স্বামী।

তখন আবার নতুন জ্যোতিষীর খোঁজ পড়ে।

এমনিভাবেই বছরের পর বছর কেটে গেছে রাঙা পিসীমার, এমনিভাবেই বছর কেটে চলে। কখনো স্বামীর খোঁজে তীর্থে তীর্থে ছুটে বেড়িয়ে, কখনো জ্যোতিষীর দেওয়া তারিখের দিকে তাকিয়ে। পনেরো বছর বয়েসে বিয়ে হয়েছিলো রাঙা পিসীমার, স্বামী নিরুদ্দেশ হয়েছিলো তাঁর আঠারো বছর বয়েসে। তারপর তার পথ চেয়ে অপেক্ষা করতে করতে কখন তাঁর কানের পাশে চুল সাদা হয়ে গেছে, মুখে বয়সের রেখা পড়েছে, তা বোধ হয় রাঙা পিসীমা বুঝতেও পারেননি।

এমন সময় হঠাৎ একদিন ভোরবেলায় হইচই হট্টগোল শুনে ঘুম ভেঙে গেল। শব্দ শুনে ভেতর-বারান্দায় ঢুকে দেখি ঝি চাকর সরকারমশাই সবাই আনন্দে হইচই জুড়ে দিয়েছে। আর হাসিমুখে প্রৌঢ় গোছের একটি গেরুয়া-পরা লোক গাড়ুর জলে পা ধুচ্ছে। সকলেই যেন লোকটাকে তোয়াজ করতে ব্যস্ত। কেউ জলের জন্যে ফরমাশ করলো, কেউ তোয়ালে এনে দিলো, কেউ বা আসন পেতে দিলো।

সরকারমশাইকে আড়ালে ডেকে ফিসফিস করে বললাম, কে উনি, নতুন জ্যোতিষী বুঝি?

একগাল হেসে সরকারমশাই বললেন, বড়বাবু গো, রাঙা পিসীমার স্বামী।

ফিরে এসেছেন? বুকের ভেতরটা হঠাৎ যেন দপ করে উঠলো। তা হলে শেষ পর্যন্ত স্বামীকে ফিরে পেলেন রাঙা পিসীমা? আনন্দে সমস্ত শরীর যেন থরথর করে কেঁপে উঠলো। এ যেন শুধু রাঙা পিসীমার আনন্দ নয়, আমাদেরও আনন্দ।

খবর পেয়ে ছুটতে ছুটতে এলো বুড়ীদি। ঢিপ করে একটা প্রণাম করে বললে, এতকাল পরে আমাদের মনে পড়লো দাদা!

রাঙা পিসীমার স্বামী আশীর্বাদের ভঙ্গীতে হাত তুলে লজ্জার হাসি হাসলেন।

মামাবাবুও ছুটে এলেন, পরস্পর পরস্পরকে কুশল প্রশ্ন করলেন।

মিনুরা আধ ডজন ভাইবোন ভয়ে ভয়ে দূরে দাঁড়িয়ে ছিলো, বুড়ীদির ইশারায় তারা একে একে এসে প্রণাম করলো।

এমন সময় সরকারমশাই বলে উঠলেন, আরে, আসল লোকই যে আসেনি। রাঙা পিসী-মাকে খবর দিয়েছো?

তাই তো! রাঙা পিসীমা কি এখনো ঠাকুরঘরে? কিছুই জানেন না?

সরকারমশাই আমাকেই কাছে পেয়ে বললেন, যাও, যাও, খবর দিয়ে এসো।

ছুটে গেলাম। এমন একটা শুভ সংবাদ জানাবার ভার পেয়ে যেন খুশী হলাম। কিন্তু সিঁড়িতে পা দিয়ে ওপরে তাকাতেই চমকে উঠলাম।

পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন রাঙা পিসীমা। ঠিক সিঁড়ির মাথায়।

আমাকে দেখতে পেয়েছেন মনে হলো না। মুখের ভাব বদলালো না একটুও।

ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভেঙে উঠতে লাগলাম, কিন্তু রাঙা পিসীমার মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন ভয়-ভয় করতে লাগলো।

কাছে গিয়ে দাঁড়াতে রাঙা পিসীমা বললেন, চল্।

ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভেঙে নেমে এলেন রাঙা পিসীমা। বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন।

সবাই দূরে সরে গেল।

স্থির চোখে গেরুয়া-পরা লোকটার দিকে তাকিয়ে রইলেন রাঙা পিসীমা।

তারপর বললেন, এ কে? এ কে সরকারমশাই? আমি তো চিনতে পারছি না।

সকলেই চমকে উঠলো।

সরকারমশাই বললেন, চিনতে পারছেন না কি রাঙা পিসীমা! বড়বাবু, বড়বাবু আমাদের।

রাঙা পিসীমা গম্ভীর গলায় বললেন, না।

বুড়ীদি চিৎকার করে উঠলো, দাদা, দাদাকে চিনতে পারছো না?

তেমনি গম্ভীর গলায় উত্তর এলো, না।

মামাবাবুও কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই রাঙা পিসীমা চিৎকার করে উঠলেন, না, না, সে নয়, সে নয়। দূর করে দাও ওকে, দূর করে দাও।

বলেই ছুটে দোতলার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলেন রাঙা পিসীমা। সশব্দে কপাট বন্ধ করে দিলেন।

গেরুয়া-পরা লোকটার মুখখানা ম্লান দেখালো। অভিমানের স্বরেই চলে যেতে চাইলেন তিনি। বুড়ীদি, মামাবাবু, সরকারমশাই অনেক বোঝালেন, তারপর নীচের একখানা ঘরে বিছানা পেতে দিলেন তাঁর জন্যে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করলেন।

রাঙা পিসীমা কিন্তু কপাট খুললেন না সন্ধ্যে পর্যন্ত।

সন্ধ্যেবেলায় একা একা গিয়ে টোকা দিলাম দরজায়। কপাট খুলে দিলেন রাঙা পিসীমা!

দেখলাম, দেখে শিউরে উঠলাম। এক বেলার মধ্যে এ কি চেহারা হয়েছে রাঙা পিসীমার!

বুঝলাম, সারাটা দিন কেঁদেছেন পড়ে পড়ে।

রাঙা পিসীমা চোখ মুছে জিগ্যেস করলেন, চলে গেছে? চলে গেছে সে?

বললাম, না।

চিৎকার করে উঠলেন রাঙা পিসীমা।—চলে যেতে বল্, চলে যেতে বল্ এখুনি। যেন রাগে ফেটে পড়লেন।

বললেন, যার কথা সারা জীবন ভেবেছি, যার খোঁজে সারা জীবন কেটে গেছে, সে যদি সত্যিই একদিন এসে হাজির হয় একেবারে অন্য চেহারা নিয়ে, সত্যিই যদি ফিরে আসে, সে যে কি অসহ্য তোরা বুঝবি না, তোরা বুঝবি না। ওরে, আজ বুঝতে পেরেছি, তার কথা ভাবতে চাই, তাকে চাই না আর।

বলে আবার বিছানার উপর লুটিয়ে পড়লেন রাঙা পিসীমা।

আর রাঙা পিসীমাকে ডাকতে গিয়ে দেখলাম, বিছানার ওপর বড় একখানা ফটো পড়ে রয়েছে। দেখেই বুঝলাম, রাঙা পিসীমার স্বামীর ছবি। একুশ-বাইশ বছরের একটি সুন্দর মুখ সে ছবিতে।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো আপনা থেকেই। বুঝতে পারলাম, যে চলে গিয়েছিলো তার সঙ্গে, যে ফিরে এসেছে তার, কোনো মিল নেই। কোনো মিল নেই। মানুষটাই শুধু এক।

তবু, গেরুয়া-পরা লোকটাকে, রাঙা পিসীমার স্বামীকে, বুড়ীদি, মামাবাবু, সরকার-মশাই ধরে রাখলেন।

সকলেরই বিশ্বাস ছিলো রাঙা পিসীমার রাগ পড়ে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু পরের দিন ভোরবেলায় গঙ্গাস্নান করতে সেই যে বেরিয়ে গেলেন রাঙা পিসীমা, আর ফিরে এলেন না।

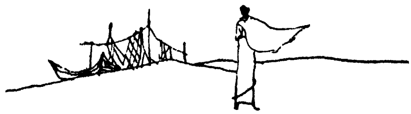
দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করে সরকারমশাই বেরিয়ে গেলেন রাঙা পিসীমার খোঁজে।

আত্মীয়স্বজনদের কাছে চিঠি লেখা হলো, থানায় খবর দেওয়া হলো, কিন্তু হদিস মিললো না রাঙা পিসীমার।

মাসখানেক পরে পরীক্ষা পাস করে জব্বলপুরে চলে গিয়েছিলাম একটা চাকরি নিয়ে। বহু বছর বাদে সেদিন হঠাৎ গিয়ে দেখি, লোহার ফটকে একটা বড় তালা ঝুলছে, মরচে ধরে গেছে তালাটায়। ও বাড়ির খবর জিগ্যেস করতে চোখ কপালে তুললো আশপাশের লোক। বললে, সে কি, ও বাড়িতে লোক ছিলো নাকি কখনো? ও তো ভূতুড়ে বাড়ি! কেউ বললে, মাঝরাতে কান্নার শব্দ ভেসে আসে অনাদি-নিবাস থেকে; কেউ বললে, জ্যোৎস্না-রাতে ও বাড়ির ছাদে ফুটফুটে একটি মেয়ে সাদা থান পরে ঘুরে বেড়ায়।

কিন্তু আমি জানি, ও বাড়ির হাওয়ায় যদি কোনো নারীর প্রেতাত্মাও থাকে, তাকে মানুষ ভয় পাবে না, তার দুঃখে চোখে জল আসবে।

[১৩৬০



মনবন্দী

তাঁর পুরো নামটা জানবার সৌভাগ্য হয়নি কোনো দিন। শুধু এইটুকু জানি যে, তখন তিনি কুমারী ছিলেন, উপাধি ছিলো সেন। পরে শ্রীমতী হয়েছিলেন, উপাধি হয়েছিলো ভট্টাচার্য। প্রথম দেখেছিলাম ডাউন দিল্লী এক্সপ্রেসের থার্ড ক্লাস কামরায়। রাতের ট্রেনে কখন কোন স্টেশন থেকে যে উঠেছিলেন লক্ষ করিনি। লক্ষ করবার উপায়ও ছিলো না।

পুজোর ভিড় তখন। থার্ড ক্লাস কম্পার্টমেণ্টে যদিও লেখা ছিলো 'বত্রিশজন বসিবেক', তবু জনপঞ্চাশেক লোক ঢুকেছিলো কামরায়। আর যত না যাত্রী, তার পাঁচ গুণ ছিলো বাক্স-বিছানা, লটবহর, খাবারের চ্যাঙাড়ি, মাটির কুঁজো, নতুন কুলো, ছাতা, লাঠি। নীচের বেঞ্চি, উপরের বাঙ্ক থেকে বাড়তি ভিড়টা উথলে এসে পড়েছিলো দরজার কাছে। তারই মধ্যে দরজার জানালায় মাথা গলিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিলাম আমি, আর আমার এক মুসলমান বন্ধু।

মাঝে মাঝে জানালায় মাথা গলাই, আর মাঝে মাঝে কচ্ছপের মতো সুড়ুৎ করে গলাটা টেনে নিয়ে শিরদাঁড়ার টনটনে ব্যথা ভাঙাই। আর তারই ফাঁকে দু-একটা আজেবাজে কথা চলে বন্ধুটির সঙ্গে।

এমন সময় হঠাৎ বন্ধুটি ফিসফিস করে বললে, ভদ্রমহিলা বোধ হয় কিছু বলতে চান তোমাকে।

ভদ্রমহিলা? ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, সত্যিই তাই। বেঞ্চির এক কোণে ইঞ্চি ছয়েক জায়গায় কোনোরকমে ব্যালান্স রক্ষা করে বসে আছেন একজন ভদ্রমহিলা। ভদ্রমহিলা বলবো, না তরুণী? একহারা লম্বা ছিপছিপে চেহারা, বয়স হয়তো ছাব্বিশ। কিন্তু এই বয়সেই চোখে-মুখে ছত্রিশ বছরের ক্লান্তি।

শরীর সম্পর্কে কোনো যত্ন না নিলে এবং অত্যধিক দুশ্চিন্তায় মুখের চামড়ায় যেমন এক ধরনের খসখসে ভাব ফোটে, তরুণীটির মুখেও সেই ছাপ দেখলাম। দু হাতে একরাশ জিনিস-পত্তর। একটা ছোট অ্যাটাচি কেস, আরো কি কি যেন জড়িয়ে ধরে বসে ছিলেন তিনি।

আর চোখ জোড়া কি যেন বলতে চাইছিলো।

বার তিনেক চোখাচোখি হওয়ায় হঠাৎ বললেন, শুনুন।

এগিয়ে গেলাম।

—আপনি তো বাঙালী?

বললাম, আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তবু চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন? উষ্মা প্রকাশ পেলো এবার।

বললাম, কেন বলুন তো?

—বাঃ, দেখতে পাচ্ছেন না কত অসুবিধে হচ্ছে। এভাবে কেউ ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে পারে?

মনে মনে ভাবলাম, কি আশ্চর্য, এই ভিড়ের মধ্যে যে বসবার জায়গা পেয়েছেন এই তো যথেষ্ট। আর আমি নিজেই যখন এত কষ্ট সহ্য করে এক পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি, তখন অপরের সুখসুবিধের দিকে চোখ না গেলেই বা কি অন্যায়। সারা গাড়িতে আর কেউ বাঙালী নেই বলেই কি সব দায়িত্ব আমার নাকি!

তবু সুর নামিয়ে বললাম, কি করবো বলুন।

বিরক্তির স্বরে উত্তর এলো, কেন, ঐ যে ওদিকের বেঞ্চে হাত-পা ছড়িয়ে সংসার পেতে বসেছেন ওঁরা, ওঁদের তো একটু বলতে পারেন।

তাকিয়ে দেখলাম কথাটা মিথ্যে নয়। ট্রেন ছাড়বার মুহূর্তে ওদিকটা একেবারে ভিড়ে ঠাসা ছিলো, তারপর দু-একজন নেমে গেছে, অথচ তাদের জায়গাগুলো দিব্যি দখল করে বসেছে মোটা চেহারার মারোয়াড়ী গিন্নীটি, নথ নেড়ে নেড়ে গল্প জমিয়ে তুলেছে, ছেলে-মেয়েগুলোও।

হাজার হোক স্বদেশবাসী, তাই অনেক কাকুতি-মিনতি করে জায়গা করে দিলাম ভদ্র-মহিলার জন্যে। বিদেশ-বিভুঁই থেকে ফিরছেন, আর নেহাত বিপদে পড়েই না সাহায্য চেয়েছেন। মনে মনে একটু বেশ খুশীই হলাম এ কারণে, অপরিচিতা কোনো মহিলার উপকার করতে পারলে একুশ বছরের রোমাণ্টিক মন যেমন খুশী হয়।

কিন্তু সেই যে উটের গল্প আছে না, নাক বাড়াতে দিলে সারা শরীরটাই ঘরে ঢোকায়, আমার অবস্থাও হলো তাই। মিনিট পাঁচেক যেতে না-যেতেই নারীকণ্ঠের আদেশ এলো।

—দেখুন, এই জলের ফ্লাস্কটা আপনি ধরুন তো, এতগুলো জিনিস সামলানো যায়!

এ ধরনের কথাকে অনুরোধ বলা যায় না, আদেশই বলতে হয়। আর এ আদেশের মধ্যে কি যেন আছে, উপেক্ষা করা যায় না, উত্তর দেওয়া যায় না, শুধু হুকুম মানতে হয়। সুতরাং জলের ফ্লাস্কটা আমাকেই কাঁধে ঝোলাতে হয়।

একটু পরেই আবার—এই থলিটা আপনার পায়ের কাছে রাখবেন? এখানে এক রত্তি জায়গা নেই।

এইভাবে একটার পর একটা হুকুম মানতে মানতে হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, ভদ্রমহিলার যাবতীয় সংসার আমার কাঁধে-কোলে ভর করেছে। অথচ বসতে পাওয়া তো দূরের কথা, তখনো পর্যন্ত ভালো করে দুটো পা রাখবার জায়গা পাইনি, এক-ঠ্যাঙা বকের মতো দাঁড়িয়ে আছি।

এমনি সময় হঠাৎ একটা স্টেশনে মিনিটখানেকের জন্যে গাড়ি দাঁড়ালো। গর্ম্ শিঙাড়া থেকে চায় গর্ম্ অবধি নানা গানের ধুয়ো শেষ হতেই গাড়ি ছেড়ে দিলো আবার।

আর সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রমহিলা আঁতকে উঠলেন যেন।—ও কি, চা ডাকলেন না? আবার কখন থামবে ঠিক নেই, আপনি কি বলুন তো?

আমি যে কি বস্তু, সে বিষয়ে আমার নিজেরই সন্দেহ হতে শুরু হয়েছে তখন।

তবু ঠাণ্ডা মেজাজেই বললাম, পরের স্টেশনেই বলবো।

শুধু একটা কথা বলতে পারলাম না যে, আমার নিজেরও চা-পানের ইচ্ছে হয়েছিলো, কিন্তু ভদ্রমহিলা তাঁর সারা সংসারটা আমার ঘাড়ে চাপানোয় সে আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে রেখেছি।

যাই হোক, পরের স্টেশনে জানালায় গলা বাড়িয়ে একটা চা-ওয়ালাকে ডেকে দিলাম,

ভদ্রমহিলা এক ভাঁড় চা-ও নিলেন। আর জিনিসপত্তর নামিয়ে রেখে কোনোরকমে হাতটা বাড়াবো আর এক ভাঁড় চায়ের জন্যে, ভদ্রমহিলা চিৎকার করে উঠলেন, না, না, আমি দিচ্ছি, আমি দিচ্ছি। আপনি দেবেন না।

সুতরাং ভদ্রমহিলা যে ভুল করেননি, এইটুকু বোঝাবার জন্যেই পকেটে হাত দিয়ে পয়সাটা দিয়ে দিতে হলো চা-ওয়ালাকে এবং নিজের চা নেবার আগেই ট্রেন ছেড়ে দিলো।

আর কিছুক্ষণ বেশ চুপচাপ কাটলো।

হঠাৎ।—শুনুন, এ ভিড়ে আমি থাকতে পারবো না। পরের স্টেশনেই আমাকে লেডিজ কম্পার্টমেণ্টে তুলে দেবেন।

এবারে আপত্তি করতেই হলো, কিন্তু তিনি কিছুতেই শুনবেন না। অগত্যা দেড় মিনিটের স্টপেজে লটবহর এবং তাঁকে সঙ্গে নিয়ে ছুটতে ছুটতে যেতে হলো। ভিড়ে ঠাসা লেডিজ কামরায় একরকম ঠেলে তুলে দিলাম তাঁকে, আর রেহাই পাওয়া গেছে ভেবে যেই না স্বস্তির নিশ্বাস ফেলা অমনি...

—প্রত্যেক স্টেশনে এসে খোঁজ নিয়ে যাবেন কিন্তু।

ঘাড় নেড়ে সায় জানিয়ে নিজের কামরায় ফিরে এসে হাত-পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়েছি অমনি উপরের বাঙ্ক থেকে খোনা সুরের ডাক শুনলাম।—ও মশাই।

ফিরে তাকিয়ে দেখি, এতক্ষণ বিছানার বাণ্ডিল ভেবে যেটাকে ভুল করেছিলাম সেটা আসলে মানুষ। বুড়ো লোকটি এবার উঠে বসলো গায়ের চাদরটা সরিয়ে। কপালে চন্দন না গঙ্গামৃত্তিকার তিলক, গলায় কণ্ঠি, শরীরে চামড়ার লাইনিং দেওয়া কয়েকখানা হাড়।

বৃদ্ধ উঠে বসে নাকী সুরে বললেন, আমাদের মিস সেনকে কোথায় তুলে দিয়ে এলেন বলুন না?

মিস সেন? নিজেই বিস্মিত হলাম। বললাম, আপনার পরিচিত নাকি?

আদরে-গলে-যাওয়া শিশুর মতো নাকী সুর বেরুলো আবার।—হ্যাঁ, আমাদের ইস্কুলের টিচার উনি, আর আমি হেড পণ্ডিত। আমার সঙ্গেই আসছিলেন কিনা।

গলার স্বরে ক্রোধ প্রকাশ করে বললাম, আমার সঙ্গেই আসছিলেন কিনা। তা এতক্ষণ বলেননি কেন?

বুড়ো ফোকলা মাড়ি বের করে হাসলে।—ভাবলাম আপনি বিরক্ত হবেন তাই, তা একটু বলুন না, কোন কামরায় গেলেন, একবার দেখা করে না এলে যদি সেক্রেটারীকে দরখাস্ত করে দেন।

সুতরাং তাঁকে পরের স্টেশনেই নিয়ে যেতে হলো লেডিজ কম্পার্টমেণ্টে। আর পণ্ডিত-মশাইকে দেখেই একমুখ হেসে মিস সেন হুকুম দিলেন, শুনুন, উনি রইলেন আপনাদের গাড়িতে, একটু দেখাশোনা করবেন। বুড়োমানুষ, একটু হাত-পা ছড়িয়ে বসবার ব্যবস্থা করে দেবেন।

তথাস্তু।

ভাবলাম, গল্পে তো পড়েছি উটটাই ঢুকেছিলো ঘরের ভিতর, আবার একজন সঙ্গী ডেকে এনেছিলো তা তো শুনিনি।

যাই হোক, দুর্ভোগ বেশী পোয়াতে হলো না। ট্রেন এসে পৌঁছলো গন্তব্যে। আর মিস সেনের জিনিসপত্তর কুলির মাথায় তুলে দিয়ে সুড়ুৎ করে সরে পড়ছি, তার আগেই।—পণ্ডিতমশাইকে পাঁচ নম্বর বাসে তুলে দিয়ে তারপর যাবেন যেন!

তারপর বহু দিন আর দেখা হয়নি মিস সেনের সঙ্গে।

বছর তিন-চার পরে ভাইঝিকে ইস্কুলে ভরতি করতে গেছি। দেখি হেড মিস্ট্রেস হয়ে যিনি বসে আছেন, তাঁর মুখটা কেমন যেন চেনা-চেনা। আর আমাকেও বোধ হয় চিনতে পারলেন তিনি।

বললেন, আপনাকে যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে!

বললাম, আমারও।

কিন্তু বহু চেষ্টা করেও মনে পড়লো না। যথারীতি ভরতি করার কাজ সেরে চলে আসবো, হঠাৎ হেড মিস্ট্রেস বললেন, আমার জন্যে একটা কম ভাড়ার ভালো ফ্ল্যাট খুঁজে

দিন তো!

ব্যস। সঙ্গে সঙ্গে সেই আদেশের সুরটা মনে পড়ে গেল।

বললাম, আপনি তো মিস সেন? সেই যে ট্রেনের কামরায় দেখা হয়েছিলো...

আরো দু-চার কথা স্মৃতিরোমন্থনে মিস সেনেরও মনে পড়লো। হেসে বললেন, আমি এখন মিসেস ভট্টাচার্য।

বাড়ির ঠিকানা দিয়ে বললেন, আসবেন একদিন, আপনাকে দিয়ে আমার অনেক কাজ করাতে হবে।

ভয় পেয়ে গেলাম। কেমন স্পষ্ট কথা। তবু ভাগ্য বলতে হবে যে, তখনই কোনো ফরমাশ দিয়ে বসলেন না মিস সেন, মানে মিসেস ভট্টাচার্য। ফরমাশ দিলেন না সে কথাই বা বলি কি করে।

সবে আপিসঘরের চৌকাঠ ডিঙিয়ে বাইরে পা দিয়েছি, অমনি শুনতে পেলাম,—আসবেন কিন্তু, আর ঐ সঙ্গে একটা ভালো ফ্ল্যাটের খবর নিয়ে আসবেন।

প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আর ও পথে নয়। এমন কি, ভাইঝিকে ও ইস্কুলে রাখবো না এমন বাসনাও জেগেছিলো।

কিন্তু অদৃষ্ট খণ্ডাবে কে! একটা টুথব্রাশ কিনতে গিয়ে পাড়ার স্টেশনারি দোকানটায় দেখা হয়ে গেল।

একমুখ হেসে মিসেস ভট্টাচার্য বললেন, খুব এলেন তো। চলুন, কয়েকটা জিনিস কিনে নিয়ে একটু গল্প করা যাবে।

শঙ্কিত হয়ে পকেটে হাত দিলাম। কিন্তু না, দাম নিজেই দিলেন তিনি। তারপর এক পা হাঁটেন তো তিন মিনিট দাঁড়ান। বাঃ, চমৎকার কাপগুলো তো। কত করে? আট আনা? এই বাজে কাপ? তারপরই দু পা হেঁটে, ডিম কত করে জোড়া? আবার দু পা এগিয়ে, ক্লিপ আছে? চুলের ক্লিপ? এক পা এগিয়ে, দেখি এক প্যাকেট ন্যাপথলিন। আবার খানিকটা গিয়েই, বেলফুলের মালা কত করে? দাও একটা। তারপর শো-কেসের সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ শাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকা।

পাকা দেড় ঘণ্টা। কোমরে ব্যথা, পা টনটন।

শেষকালে মিসেস ভট্টাচার্য বললেন, চলুন আমাদের বাসায়।

গেলাম। অর্থাৎ যেতে হলো।

ছোট দু কুঠুরির ফ্ল্যাট। এক ফালি বারান্দাই রান্নাঘর।

একটা ইজিচেয়ারে একজন বৃদ্ধ বসে ছিলেন। চিনতে পারিনি তাঁকেও।

মিসেস ভট্টাচার্য আলাপ করিয়ে দিলেন সহাস মুখে।—ইনিই মিস সেনকে মিসেস ভট্টাচার্য করেছেন। আর এঁকে তো তুমি দেখেছো, সেই যে একবার পুজোর ছুটিতে ট্রেনে...

—বসুন। নাকী সুর শুনেই মনে প'ড়ে গেল। বাঙ্কে ঘাপটি মেরে শুয়ে থাকা পণ্ডিত-মশাই, যিনি সেক্রেটারীর কাছে দরখাস্ত করে দেবে এই ভয়ে মিস সেনের খবর নিতে নেমেছিলেন!

কেনাকাটা জিনিসগুলো নামিয়ে রেখে মিসেস ভট্টাচার্য স্বামীর তদারকিতে মন দিলেন। —পায়ের ব্যথাটা কমেছে একটু? তেলটা মালিশ করে দেবো?

পণ্ডিতমশাই 'না, না' করে উঠলেন।

মিসেস ভট্টাচার্য তবু শান্ত হলেন না।—দাঁড়াও, মিকশ্চারটা এনে দিই—বলে ওষুধের শিশি-গেলাস নিয়ে এলেন।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম এবং ভালো করে লক্ষ করবার সুযোগ পেলাম পণ্ডিত-মশাইকে। রোগা হাড়-জিলজিলে শরীরে ধোপদুরস্ত আদ্দির পাঞ্জাবি, জরিপাড় শান্তিপুরী ধুতি, হাতের দশটা আঙুলে আটটা আংটি, সোনার রিস্টওয়াচ, পায়ে লাল মখমলের চটি। সে এক কিম্ভূত চেহারা।

ইতিমধ্যে ওষুধ খাইয়ে পদসেবা শুরু করে দিয়েছেন মিসেস ভট্টাচার্য। মালিশ শেষ করে খাবারের থালা নিয়ে এসে আসন পেতে দিলেন, তারপর পণ্ডিতমশাইকে ধরে ধরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলেন।

তারপর ছোট ছেলেদের মা যেভাবে খাইয়ে দেয় ঠিক সেইভাবেই পণ্ডিতমশাইয়ের মুখে খাবারের গ্রাস তুলে দিতে শুরু করলেন মিসেস ভট্টাচার্য।

পণ্ডিতমশাইকে উদ্দেশ করে বললেন, এ বাসাটা তোমার ভালো লাগছে না বলছিলে, তা এঁকে বলেছি একটা ফ্ল্যাট খুঁজে দিতে।

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, একটু তাড়াতাড়ি খুঁজে দেবেন, বুঝলেন।

আরো দু-একটা কথার পর উঠে গেলেন। আশা করেছিলাম এক কাপ চা অন্তত আসবে। কিন্তু তাও এলো না।

কিছুক্ষণ পরে উঠে চলে আসছি, হঠাৎ মিসেস ভট্টাচার্য সামনে এসে দাঁড়ালেন, ও কি, চলে যাচ্ছেন? ও একা থাকবে বলে বসিয়ে এলাম। যান, একটু গল্পগুজব করে ভুলিয়ে রাখুন ওঁকে, আমি পরীক্ষার খাতাগুলো দেখে নিই।

সুতরাং ফিরে এসে বসতে হলো। ঘণ্টাখানেক পরে দেখা দিলেন মিসেস ভট্টাচার্য, নতুন ফ্ল্যাট খুঁজে দেওয়ার হুকুম জানিয়ে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন।

বললাম, দেখবো। কিন্তু ওঁর জন্যে তো আপনাকে খুব খাটতে হয় দেখছি।

মিসেস ভট্টাচার্য হাসলেন—কি যে বলেন, ওঁর জন্যেই তো আজ ইস্কুলের টিচাররা আমাকে মান্য করে, ঈর্ষা করে, তা জানেন?

ঈর্ষা করে! কথাটা শুনে আপনা থেকেই চোখ গেল মিসেস ভট্টাচার্যের সিঁথির সিঁদুরের দিকে।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। কিন্তু একটা প্রশ্ন জাগলো মনে। মানুষ সুখী হতে চায়? না সুখে আছি, এ কথা জানিয়ে সুখী হয়?

[১৩৬০



সতী ঠাকরুনের চিতা

গল্পের রস মিলবে না হয়তো, কিন্তু গল্পের চেয়েও চমকপ্রদ এই যশাই পণ্ডিতের উপাখ্যান।

জেলা বাঁকুড়া, মহকুমা বিষ্ণুপুর, বিষ্ণুপুর থেকে সাত ক্রোশ পুবে ময়নাপুর, কাঁসারী-দের গ্রাম। গ্রামের এদিকে একখানা ভাঙা পুরোনো বাড়ি, লোকের মুখে—দেওয়ানজীর কাছারি। আশেপাশে আরো কয়েক ঘর বামুন-কায়েতের বাস থাকলেও গাঁয়ের আর সবাই ডোম।

সে কি আজকের কথা। অকলংক বাঁড়ুজ্যে যেদিন দেশে ফিরলেন, ময়নাপুরের লোক তখন বিষ্ণুপুরকে বলতো শহর, বাঁকুড়া ছিলো বিদেশ।

বিষ্ণুপুরে একটা মসলাপাতির দোকান ছিলো অকলংক বাঁড়ুজ্যের। বেশ কিছু টাকা লোকসান দিয়ে গ্রামে ফিরলেন তিনি।

ফিরে এসে দেখলেন বদলে গেছে সব রাতারাতি। ডোমপল্লীর নাম হয়েছে পণ্ডিতপাড়া।

কি ব্যাপার! ব্যাপার বিশেষ কিছুই নয়। ডোমপল্লীর যশাই সিদ্ধপুরুষ হয়েছে। পণ্ডিত হয়েছে। লোকে তাকে সসম্মানে যশাই পণ্ডিত বলছে।

শুনে প্রথমটা হেসেছিলেন অকলংক বাঁড়ুজ্যে। হাসি পাবারই কথা। ডোমের ছেলে হয়েছে পূজারী ঠাকুর। কালে কালে কতই দেখতে হবে। সারা দেশটা যে উচ্ছন্নে যাচ্ছে তা

অনেক আগেই টের পেয়েছিলেন তিনি। ধর্মকর্ম আর রইলো না বোধ হয়, সব খ্রীষ্টান হয়ে গেল। তা না হলে অমন যে বাপঠাকুর্দার জমাট ব্যবসা, তাও কিনা অচল হলো। মেথর মুদ্দোফরাশে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে জাহাজে করে মসলাপাতি এনে বাজারে ঢেলে দিলো সাহেব কোম্পানির লোক, আর তাই কিনা দু পয়সা দর সস্তার লোভে হুমড়ি খেয়ে কিনলো সকলে।

ক্ষোভের সীমা ছিলো না অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যের। ময়নাপুরে ফিরে দেখলেন গাঁয়ের মানুষের গায়েও সেই হাওয়া লেগেছে।

চারপাশে মাটির দেয়াল তুলে খড়ের চালা দেওয়া ছোট্ট একখানা ঘর—তাই নাকি যশাই পণ্ডিতের মণ্ডপ। ধর্মঠাকুরের নাম বাঁকুড়া রায়। যেমন পূজারী তেমনি দেবতা। তা হোক, কিন্তু বামুন-কায়েতগুলোও গিয়ে ভিড় করে কোন লজ্জায়?

কেন, গাঁয়ে যখন মড়ক নামলো তখন কোথায় ছিলেন বাঁড়ুজ্যেমশাই? কে থামালো সেই মড়ক? শিবেন মিস্ত্রীর মেয়েকে সেবার গোখরোয় কাটলো, কে বিষ ঝাড়লে? দু দিনের জ্বরে সদাশিব মুখুজ্যের বড় ছেলে ধড়ফড় করে মরলো, শ্মশানে গিয়ে সারা রাত মন্ত্র পড়ে যশাই পণ্ডিতই না বাঁচিয়ে তুললো তাকে? জমিদার অনন্ত হাজরার বুড়ী দিদিমার আঠারো বছরের বাত এক কলি শিকড় দিয়ে সারায়নি যশাই পণ্ডিত?

শুনে মনে মনে চটতেন অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যে, মুখে বিদ্রূপের হাসি হাসতেন।—নির্বোধ। কুসংস্কারাক্রান্ত মূর্খের দল সব। মনে মনে বলতেন আর নিজের আত্মাভিমানের গায়ে প্রবোধ বুলোতেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর থাকতে পারলেন না চুপ করে, তাঁর নিজের সংসারও কলঙ্কিত হতে চলেছে, অথচ কোনো দিন সন্দেহ হয়নি তাঁর। অক্ষয়তৃতীয়ার রাত্রে হঠাৎ কি একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। উঠে এসে দাওয়ায় বসলেন হুঁকো হাতে।

গৃহিণীকে ডাকলেন দুবার, সাড়া পেলেন না। বোধ হয় ছেলেমেয়েদের নিয়ে পাশের ঘরে ঘুমিয়ে আছে, ভাবলেন। তাই নিজেই নিবন্ত উনোন থেকে আঙার তুলে টিকে ধরালেন কোনোরকমে।

তারপর দাওয়ায় বসে অন্ধকার মাঠের দিকে চোখ মেলে বসে রইলেন। ডুগ ডুগ ডুগ ডুগ—ডুগি বাজছে যশাই পণ্ডিতের আখড়ায়। একটা লেলিহান শিখা দুলে দুলে উঠছে। নতুন কোনো ভণ্ডামি শুরু করেছে ডোমের ছেলেটা, ভাবলেন অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যে।

হঠাৎ সামনে পুকুরের দিকে চোখ গেল। ওদিকের ঘাটে এক সারি মেয়ে। স্নান করতে নেমেছে নাকি এত রাত্তিরে!

সেদিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করে রইলেন। হ্যাঁ, সাদা ফুটফুটে কাপড়টাই শুধু দেখা যাচ্ছিলো এতক্ষণ। এবার যেন এগিয়ে আসছে তাঁর দিকেই।

—কে? ক্রোধের স্বরে প্রায় চীৎকার করে উঠলেন তিনি।

যারা আসছিলো হঠাৎ যেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো তারা। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো একসময়। কোনো কথা না বলে মাথা হেঁট করে ঘরে ঢুকলো তারা।

—কল্যাণী!

আবার চীৎকার করে ডাকলেন অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যে।

মাথা হেঁট করে সামনে এসে দাঁড়ালো বড় মেয়ে কল্যাণী।

—কোথায় গিয়েছিলে এত রাতে?

মৃদু স্বরে উত্তর এলো, পণ্ডিতের মন্দিরে।

—পণ্ডিত? ক্ষিপ্ত স্বরে চীৎকার করে উঠলেন অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যে।—শালা ডোম, ভেলকি দেখিয়ে পণ্ডিত হয়েছে। আমার অনুমতি না নিয়ে আর কোনো দিন যাবে না তোমরা, এই বলে দিলাম শেষবারের মতো।

—যাবো না আর। মৃদু উত্তর এলো।

কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি ভুলতে সময় লাগলো না কল্যাণীর। তা না হলে সারা গাঁয়ে এত কানাঘুষো চললো কেন, ডোমপল্লীতে হাসির হুল্লোড় উঠলো কেন কল্যাণীর নামে!

সকলেই প্রথম প্রথম লক্ষ করতো, সকালে পুজোয় বসতে দেরি হয়ে যেতো যশাই পণ্ডিতের। কোষাকুষি ধুয়ে ফুল বেলপাতা নেড়ে সময় কাটাতো কেবল। তারপর একসময়

স্নান সেরে এলোচুলে এসে হাজির হতো কল্যাণী। সমস্ত শরীরে যৌবনের পুষ্প ফুটিয়ে, মুখে মুক্তোর হাসি দুলিয়ে। পুজোর উপকরণ সাজিয়ে দিতো।

ধর্মঠাকুর বাঁকুড়া রায়ের পুজোয় বসতো তখন যশাই পণ্ডিত। উচ্চ গম্ভীর স্বরে মন্ত্র-পাঠ শুরু করতো। বাঁকুড়া রায়ের মূর্তির পায়ে একটি জবাপুষ্প রেখে মন্ত্রপাঠ চলতো, যতক্ষণ না সেটি নীচের ঘটের মুখে এসে পড়ে মন্ত্রের শক্তিতে। জবাফুলটি ঘটের জলে ছিটকে এসে পড়লে তবেই পুজো সাঙ্গ হতো, শান্তিজল বিতরণ করতো যশাই পণ্ডিত! যেদিন কল্যাণী আসতো না, সেদিন জবাপুষ্প বাঁকুড়া রায়ের চরণেই থাকতো, কিছুতেই ঘটের মুখে এসে পড়তো না। যশাই পণ্ডিত বলতো, ধর্মঠাকুর অসন্তুষ্ট হয়েছেন, কল্যাণীর সেবা না পেলে খুশী হবেন না।

লোকে বিশ্বাস করতো সে কথা। বলতো, ভক্তির গুণে যশাই ডোম হয়েও পণ্ডিত। কিন্তু বাঁকুড়া রায় হলেন জাগ্রত দেবতা, তাই ব্রাহ্মণকন্যার সেবা না পেলে অতৃপ্ত থেকে যান।

এ কথা শুনে হাসতো শুধু ডোমপল্লী। যশাই ডোম পণ্ডিত হবার পর তার আত্মীয়-স্বজনরাও পণ্ডিত নাম নিয়েছিলো, অন্য ডোমদের ছোঁয়া খেতো না তারা। বামুনদের যেমন পৈতে, তেমনি পণ্ডিত ডোমদের 'তাম্র' হতো। ধর্মঠাকুরের পুজো দিয়ে হাতে একটি তামার আংটি পরতো পণ্ডিত ডোমরা; 'তাম্র' না হলে মণ্ডপে ঢুকতে পেতো না তারা। 'তাম্র' হওয়ার অধিকারও ছিলো না অন্য অন্য ডোমেদের। মনে মনে তাই রাগ ছিলো তাদের যশাই পণ্ডিতের ওপর।

তাই শেষ পর্যন্ত অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যের কানে উঠলো কথাটা।

ধর্মরক্ষার কোনো পথ খুঁজে না পেয়ে গ্রামেরই এক আশি বছরের কুলীন বৃদ্ধের সঙ্গে কল্যাণীর বিয়ে দিয়ে দিলেন তিনি। আর নিজের বৈঠকখানায় বিষ্ণুমূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন। বললেন, স্বপ্নাদেশ পেয়েছি, ওই ডোম কলঙ্ককে গ্রাম থেকে তাড়াতে হবে!

শুনলো সকলে, অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যের বিষ্ণুমূর্তিকে প্রণামও জানিয়ে গেল দু-এক দিন। কিন্তু ওই পর্যন্ত। বাঁকুড়া রায়ের মণ্ডপে ভিড় কমলো না এতটুকু। রোগে মড়কে আগের মতোই ছুটে গেল তারা যশাই পণ্ডিতের কাছে।

হাঁসের পালক থেকে যেমন জল খসে পড়ে, যশাই পণ্ডিতকে স্পর্শও করে না কোনো অপবাদ। আর যেটুকু হাসাহাসি, কানাচুপি তাও ওই কল্যাণীকে ঘিরে। অথচ সে অপবাদে কান দেয় না কল্যাণী। বৃদ্ধ স্বামী তার খুকখুক করে কাশে, তামাক খায়, গল্প করে। আর কল্যাণী সারাটা দিন থাকে যশাই পণ্ডিতের আখড়ায়। গভীর রাতে কোনো দিন আখড়া থেকে বেরিয়ে বাড়ির পথ ধরে কল্যাণী, দু-একজন যারা দেখে, চাপা গলায় বলে, ডাইনী। পাশের লোক শুনে হাসে।

—কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। বললে বুড়ো-বুড়ীরা, কান্নার রোল উঠতে শুনে।

—বামুনদের মেয়েটার রাস্তা পরিষ্কার হলো এবার। বললে ডোমপাড়ার ছেলে-ছোকরারা।

যশাই পণ্ডিতের কানে যখন খবর পৌঁছলো, কল্যাণীর বুড়ো স্বামীকে তখন শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

শুনেই শ্মশানে ছুটলো যশাই। শ্মশানে গিয়ে যখন পৌঁছলো, চিতা সাজানো হয়ে গিয়েছে। পাশাপাশি জোড়া চিতা। এক পাশে ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়ে আছে কল্যাণী। হাত আর পা শক্ত করে বাঁধা তার। মুখের স্বর রুদ্ধ করে আছে কাপড়ের বাঁধন।

সতী হবে কল্যাণী!

—সতীই ছিলো কল্যাণী-মা! বললেন অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যে, তারপর নিজে পরীক্ষা করে দেখলেন কল্যাণীর বাঁধনগুলো। স্বামী মরলে সতী হতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু কল্যাণীর নামে অপবাদ যখন আছে আর অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যের আছে আরো দুটি অনূঢ়া মেয়ে, তখন সতী হতেই হবে কল্যাণীকে।

ওদিকে গনগনে আগুন জ্বলছে তখন। অন্ধকারে তামাক খেতে খেতে চাঁড়াল দুটো মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে কল্যাণীর দিকে।

না, কল্যাণীর চোখে জল নেই। একদৃষ্টে যশাই পণ্ডিতের আখড়ার দিকে তাকিয়ে আছে কল্যাণী। ওখানে একটা লেলিহান শিখা দুলে দুলে উঠছে আকাশে।

অনেক আগেই টের পেয়েছিলেন তিনি। ধর্মকর্ম আর রইলো না বোধ হয়, সব খ্রীষ্টান হয়ে গেল। তা না হলে অমন যে বাপঠাকুর্দার জমাট ব্যবসা, তাও কিনা অচল হলো। মেথর মুন্দোফরাশে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে জাহাজে করে মসলাপাতি এনে বাজারে ঢেলে দিলো সাহেব কোম্পানির লোক, আর তাই কিনা দু পয়সা দর সস্তার লোভে হুমড়ি খেয়ে কিনলো সকলে।

ক্ষোভের সীমা ছিলো না অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যের। ময়নাপুরে ফিরে দেখলেন গাঁয়ের মানুষের গায়েও সেই হাওয়া লেগেছে।

চারপাশে মাটির দেয়াল তুলে খড়ের চালা দেওয়া ছোট্ট একখানা ঘর—তাই নাকি যশাই পণ্ডিতের মণ্ডপ। ধর্মঠাকুরের নাম বাঁকুড়া রায়। যেমন পুজারী তেমনি দেবতা। তা হোক, কিন্তু বামুন-কায়েতগুলোও গিয়ে ভিড় করে কোন লজ্জায়?

কেন, গাঁয়ে যখন মড়ক নামলো তখন কোথায় ছিলেন বাঁড়ুজ্যেমশাই? কে থামালো সেই মড়ক? শিবেন মিস্ত্রীর মেয়েকে সেবার গোখরোয় কাটলো, কে বিষ ঝাড়লে? দু দিনের জ্বরে সদাশিব মুখুজ্যের বড় ছেলে ধড়ফড় করে মরলো, শ্মশানে গিয়ে সারা রাত মন্ত্র পড়ে যশাই পণ্ডিতই না বাঁচিয়ে তুললো তাকে? জমিদার অনন্ত হাজরার বুড়ী দিদিমার আঠারো বছরের বাত এক কলি শিকড় দিয়ে সারায়নি যশাই পণ্ডিত?

শুনে মনে মনে চটতেন অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যে, মুখে বিদ্রূপের হাসি হাসতেন।—নির্বোধ। কুসংস্কারাক্রান্ত মূর্খের দল সব। মনে মনে বলতেন আর নিজের আত্মাভিমানের গায়ে প্রবোধ বুলোতেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর থাকতে পারলেন না চুপ করে, তাঁর নিজের সংসারও কলঙ্কিত হতে চলেছে, অথচ কোনো দিন সন্দেহ হয়নি তাঁর। অক্ষয়তৃতীয়ার রাত্রে হঠাৎ কি একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। উঠে এসে দাওয়ায় বসলেন হুঁকো হাতে।

গৃহিণীকে ডাকলেন দুবার, সাড়া পেলেন না। বোধ হয় ছেলেমেয়েদের নিয়ে পাশের ঘরে ঘুমিয়ে আছে, ভাবলেন। তাই নিজেই নিবন্ত উনোন থেকে আঙার তুলে টিকে ধরালেন কোনোরকমে।

তারপর দাওয়ায় বসে অন্ধকার মাঠের দিকে চোখ মেলে বসে রইলেন। ডুগ ডুগ ডুগ ডুগ—ডুগি বাজছে যশাই পণ্ডিতের আখড়ায়। একটা লেলিহান শিখা দুলে দুলে উঠছে। নতুন কোনো ভণ্ডামি শুরু করেছে ডোমের ছেলেটা, ভাবলেন অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যে।

হঠাৎ সামনে পুকুরের দিকে চোখ গেল। ওদিকের ঘাটে এক সারি মেয়ে। স্নান করতে নেমেছে নাকি এত রাত্তিরে!

সেদিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করে রইলেন। হ্যাঁ, সাদা ফুটফুটে কাপড়টাই শুধু দেখা যাচ্ছিলো এতক্ষণ। এবার যেন এগিয়ে আসছে তাঁর দিকেই।

—কে? ক্রোধের স্বরে প্রায় চীৎকার করে উঠলেন তিনি।

যারা আসছিলো হঠাৎ যেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো তারা। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো একসময়। কোনো কথা না বলে মাথা হেঁট করে ঘরে ঢুকলো তারা।

—কল্যাণী!

আবার চীৎকার করে ডাকলেন অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যে।

মাথা হেঁট করে সামনে এসে দাঁড়ালো বড় মেয়ে কল্যাণী।

—কোথায় গিয়েছিলে এত রাতে?

মৃদু স্বরে উত্তর এলো, পণ্ডিতের মন্দিরে।

—পণ্ডিত? ক্ষিপ্ত স্বরে চীৎকার করে উঠলেন অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যে।—শালা ডোম, ভেলকি দেখিয়ে পণ্ডিত হয়েছে। আমার অনুমতি না নিয়ে আর কোনো দিন যাবে না তোমরা, এই বলে দিলাম শেষবারের মতো।

—যাবো না আর। মৃদু উত্তর এলো।

কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি ভুলতে সময় লাগলো না কল্যাণীর। তা না হলে সারা গাঁয়ে এত কানাঘুষো চললো কেন, ডোমপল্লীতে হাসির হুল্লোড় উঠলো কেন কল্যাণীর নামে!

সকলেই প্রথম প্রথম লক্ষ করতো, সকালে পুজোয় বসতে দেরি হয়ে যেতো যশাই পণ্ডিতের। কোষাকুষি ধুয়ে ফুল বেলপাতা নেড়ে সময় কাটাতো কেবল। তারপর একসময়

স্নান সেরে এলোচুলে এসে হাজির হতো কল্যাণী। সমস্ত শরীরে যৌবনের পুষ্প ফুটিয়ে, মুখে মুক্তোর হাসি দুলিয়ে। পুজোর উপকরণ সাজিয়ে দিতো।

ধর্মঠাকুর বাঁকুড়া রায়ের পুজোয় বসতো তখন যশাই পণ্ডিত। উচ্চ গম্ভীর স্বরে মন্ত্র-পাঠ শুরু করতো। বাঁকুড়া রায়ের মূর্তির পায়ে একটি জবাপুষ্প রেখে মন্ত্রপাঠ চলতো, যতক্ষণ না সেটি নীচের ঘটের মুখে এসে পড়ে মন্ত্রের শক্তিতে। জবাফুলটি ঘটের জলে ছিটকে এসে পড়লে তবেই পুজো সাঙ্গ হতো, শান্তিজল বিতরণ করতো যশাই পণ্ডিত! যেদিন কল্যাণী আসতো না, সেদিন জবাপুষ্প বাঁকুড়া রায়ের চরণেই থাকতো, কিছুতেই ঘটের মুখে এসে পড়তো না। যশাই পণ্ডিত বলতো, ধর্মঠাকুর অসন্তুষ্ট হয়েছেন, কল্যাণীর সেবা না পেলে খুশী হবেন না।

লোকে বিশ্বাস করতো সে কথা। বলতো, ভক্তির গুণে যশাই ডোম হয়েও পণ্ডিত। কিন্তু বাঁকুড়া রায় হলেন জাগ্রত দেবতা, তাই ব্রাহ্মণকন্যার সেবা না পেলে অতৃপ্ত থেকে যান।

এ কথা শুনে হাসতো শুধু ডোমপল্লী। যশাই ডোম পণ্ডিত হবার পর তার আত্মীয়-স্বজনরাও পণ্ডিত নাম নিয়েছিলো, অন্য ডোমদের ছোঁয়া খেতো না তারা। বামুনদের যেমন পৈতে, তেমনি পণ্ডিত ডোমদের 'তাম্র' হতো। ধর্মঠাকুরের পুজো দিয়ে হাতে একটি তামার আংটি পরতো পণ্ডিত ডোমরা; 'তাম্র' না হলে মণ্ডপে ঢুকতে পেতো না তারা। 'তাম্র' হওয়ার অধিকারও ছিলো না অন্য অন্য ডোমেদের। মনে মনে তাই রাগ ছিলো তাদের যশাই পণ্ডিতের ওপর।

তাই শেষ পর্যন্ত অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যের কানে উঠলো কথাটা।

ধর্মরক্ষার কোনো পথ খুঁজে না পেয়ে গ্রামেরই এক আশি বছরের কুলীন বৃদ্ধের সঙ্গে কল্যাণীর বিয়ে দিয়ে দিলেন তিনি। আর নিজের বৈঠকখানায় বিষ্ণুমূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন। বললেন, স্বপ্নাদেশ পেয়েছি, ওই ডোম কলঙ্ককে গ্রাম থেকে তাড়াতে হবে!

শুনলো সকলে, অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যের বিষ্ণুমূর্তিকে প্রণামও জানিয়ে গেল দু-এক দিন। কিন্তু ওই পর্যন্ত। বাঁকুড়া রায়ের মণ্ডপে ভিড় কমলো না এতটুকু। রোগে মড়কে আগের মতোই ছুটে গেল তারা যশাই পণ্ডিতের কাছে।

হাঁসের পালক থেকে যেমন জল খসে পড়ে, যশাই পণ্ডিতকে স্পর্শও করে না কোনো অপবাদ। আর যেটুকু হাসাহাসি, কানাচুপি তাও ওই কল্যাণীকে ঘিরে। অথচ সে অপবাদে কান দেয় না কল্যাণী। বৃদ্ধ স্বামী তার খুকখুক করে কাশে, তামাক খায়, গল্প করে। আর কল্যাণী সারাটা দিন থাকে যশাই পণ্ডিতের আখড়ায়। গভীর রাতে কোনো দিন আখড়া থেকে বেরিয়ে বাড়ির পথ ধরে কল্যাণী, দু-একজন যারা দেখে, চাপা গলায় বলে, ডাইনী। পাশের লোক শুনে হাসে।

—কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। বললে বুড়ো-বুড়ীরা, কান্নার রোল উঠতে শুনে।

—বামুনদের মেয়েটার রাস্তা পরিষ্কার হলো এবার। বললে ডোমপাড়ার ছেলে-ছোকরারা।

যশাই পণ্ডিতের কানে যখন খবর পেঁছিলো, কল্যাণীর বুড়ো স্বামীকে তখন শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

শুনেই শ্মশানে ছুটলো যশাই। শ্মশানে গিয়ে যখন পেঁছিলো, চিতা সাজানো হয়ে গিয়েছে। পাশাপাশি জোড়া চিতা। এক পাশে ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়ে আছে কল্যাণী। হাত আর পা শক্ত করে বাঁধা তার। মুখের স্বর রুদ্ধ করে আছে কাপড়ের বাঁধন।

সতী হবে কল্যাণী!

—সতীই ছিলো কল্যাণী-মা! বললেন অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যে, তারপর নিজে পরীক্ষা করে দেখলেন কল্যাণীর বাঁধনগুলো। স্বামী মরলে সতী হতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু কল্যাণীর নামে অপবাদ যখন আছে আর অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যের আছে আরো দুটি অনূঢ়া মেয়ে, তখন সতী হতেই হবে কল্যাণীকে।

ওদিকে গনগনে আগুন জ্বলছে তখন। অন্ধকারে তামাক খেতে খেতে চাঁড়াল দুটো মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে কল্যাণীর দিকে।

না, কল্যাণীর চোখে জল নেই। একদৃষ্টে যশাই পণ্ডিতের আখড়ার দিকে তাকিয়ে আছে কল্যাণী। ওখানে একটা লেলিহান শিখা দুলে দুলে উঠছে আকাশে।

এমন সময় হঠাৎ চীৎকার শুনে চমকে উঠলো কল্যাণী।

—কল্যাণী! কল্যাণী! চীৎকার করতে করতে এসে পেঁছলো যশাই।

আর পরমুহূর্তেই ঝরঝর করে কল্যাণীর দু চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। এতক্ষণ বুঝি পণ্ডিতেরই অপেক্ষায় ছিলো সে।

অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যে বাধা দিতে গেল। ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো যশাই। কল্যাণীর বাঁধন কেটে দিলো কোমরের ধারালো ছুরি দিয়ে।

হইহই করে উঠলো সকলে।—কল্যাণী সতী হবে, কল্যাণী সতী হবে।

রুখে দাঁড়ালো যশাই। বললে, হবে কি গো, কল্যাণী সতীই যে ছিলো। আর আমার বাঁকুড়া রায়, আমার ধর্মঠাকুর যদি সত্যি হয় তা হলে কল্যাণী সধবা থাকবে, এ মড়া বাঁচিয়ে তুলবো আমি।

মড়া বাঁচিয়ে তুলবে? যশাই পণ্ডিত মড়া বাঁচিয়ে তুলবে?

অসম্ভব নয়—সকলেই স্বীকার করলে।

আহা, তাই যেন হয়! হঠাৎ অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যে যশাই পণ্ডিতের পা জড়িয়ে ধরলে। বললে, বাঁচিয়ে তোলো পণ্ডিত, কল্যাণী-মাকে যেন চিতায় উঠতে না হয়। বলে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যে।

যশাই অকলঙ্ককে শান্ত করে বললে, আমার ধর্মঠাকুর যদি সত্যি হয় তা হলে চিতা থেকে উঠে আসবে কল্যাণীর স্বামী।

হাসি দেখা দিলো কল্যাণীর মুখে, ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে এলো সে। গলায় আঁচল দিয়ে যশাইকে প্রণাম করলে।

যশাই তখন পাগলের মতো। মুখে কেবল একটি কথা, মড়া বেঁচে উঠবে, মড়া বেঁচে উঠবে।

চিতার সামনে দাঁড়িয়ে, চিতা পরিক্রমা করতে করতে মন্ত্রপাঠ শুরু করলো যশাই।

খবর শুনে এদিকে সারা গাঁয়ের লোক জড়ো হয়েছে। থেকে থেকে শাঁখ বাজাচ্ছে মেয়েরা, ডুগি বাজাচেছ ডোমের দল।

সকলের চোখ চিতায় তোলা বুড়োর মুখের দিকে। উদ্‌গ্রীব উৎকণ্ঠায় সেদিকে তাকিয়ে আছে সবাই। চোখে আশা, মনে আশঙ্কা।

শুধু একজনের মুখে শান্ত হাসি আর স্থির বিশ্বাস। যতই সময় যাচ্ছে, যতই তীব্র হয়ে উঠছে যশাই পণ্ডিতের কণ্ঠস্বর, অবিশ্বাস উঁকি দিচ্ছে যেন সকলের চোখে। কিন্তু কল্যাণী একাগ্র মনে তাকিয়ে আছে যশাই পণ্ডিতের মুখের দিকে। ও জানে, মৃতকে জীবন-দান করতে পারে যশাই।

গ্রামের লোকেও তো দেখেছে, শ্মশানে সারা রাত মন্ত্র পড়ে সদাশিব মুখুজ্যের বড় ছেলেকে বাঁচিয়ে তুলেছিলো যশাই।

কিন্তু রাত ফরসা হলো, ভোর জাগলো, তবু চিতার ওপর বুড়োর শবদেহ যেমনকার তেমনি। অথচ সূর্য উঠলে আর কোনো আশাই থাকবে না। মড়া বাঁচানোর মন্ত্র সূর্য উঠলে নিষ্ফল হবে।

হঠাৎ চুপ করলো যশাই। সারা শরীরে ঘাম ঝরছে তার তখন। কপালের শিরাটা ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। গলার নলিটা বাঁশের মতো শক্ত হয়ে গিয়েছে।

মন্ত্রপাঠ বন্ধ করে হঠাৎ চাঁড়ালের হাত থেকে লাঠিটা কেড়ে নিয়ে গ্রামের দিকে ছুটতে শুরু করলো যশাই।

এদিকে হাত-পা বেঁধে ঘৃতস্নান হলো কল্যাণীর। জোড়া চিতায় পাশাপাশি তুলে দেওয়া হলো বৃদ্ধ স্বামীর পাশে সতী ভার্যাকে।

উদ্দাম বেগে ঢোলক বাজলো, শাঁখ বাজলো। উলুধ্বনি আর চীৎকারে চাপা পড়ে গেল কল্যাণীর স্বর। চিতা জ্বলে উঠলো দাউদাউ করে।

কল্যাণীর মাথার সিঁদুর আর পায়ের আলতা বেলপাতায় মুছে নিয়ে সযত্নে মাথায় ঠেকালো গ্রামের মেয়েরা। তারপর বাড়ি ফিরলো। ফেরার পথে একজন বললে, যশাই পণ্ডিতের মন্ত্রে ভুল ছিলো। তা না হলে সদাশিব মুখুজ্যের বড় ছেলেকে বাঁচাতে পারলো,

আর একে পারলো না?

অনেকে সায় দিলো এ কথায়। কিন্তু অন্য সকলে বললে, তা নয়, আসলে কল্যাণী সতী ছিলো না। তাই কাজ হলো না মন্ত্রে।

আর কল্যাণী যে সতী ছিলো না, তা তো সকলেই জানতো। তা না হলে মাঝরাত পর্যন্ত যশাই পণ্ডিতের আখড়ায় থাকতো কেন?

গাঁয়ে ফিরে এসে কিন্তু দেখলে তারা, বাঁকুড়া রায়ের মন্দিরের দরজায় দমাদম লাঠি পিটছে যশাই।

এর আগে একটা দিনের জন্যেও বাঁকুড়া রায়ের মণ্ডপে আসেননি অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যে। সেদিন কিন্তু থাকতে পারলেন না, এসে হাজির হলেন সেখানে।

যশাই তখন লাঠি পিটছে কপাটে।

দু-একবার ডাকলেন, যশাই শোনো, যশাই।

কানে গেল না যশাইয়ের। ধীরে ধীরে সিঁড়ির ওপর বসে পড়লেন অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যে। দু চোখ বেয়ে তখন জল ঝরছে তাঁর।

সেদিকে যশাইয়ের চোখ গেল হঠাৎ। বাঁড়ুজ্যের কাছে এসে বললে, বামুন মশায়, বাঁকুড়া রায় মিথ্যে, বাঁকুড়া রায়ের পুজো আর করবো না আমি।

এই বলে কাঁধে লাঠি নিয়ে বেরিয়ে গেল যশাই।

দিন মাস বছর কেটে গেল, যশাই পণ্ডিতের আর কোনো খোঁজ মিললো না। অনেকে ভুলে গেল, অনেকে বললে, কল্যাণী সতী হওয়াতেই মনের দুঃখে আত্মঘাতী হয়েছে যশাই।

এদিকে বাঁকুড়া রায়ের পুজো করতে শুরু করেছেন অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যে। গ্রামের ধর্ম-ঠাকুর, জাগ্রত দেবতা, তাঁকে তো ফেলে রাখা যায় না। কিন্তু তেমন ভিড় আর হয় না; তেমন বিশ্বাসও যেন নেই কারো।

কই, আগের মতো তো নিজের চোখে কেউ দেখতে পায় না, বাঁকুড়া রায়ের চরণ থেকে জবাপুষ্প ছিটকে ঘটের মুখে এসে পড়ছে।

লোকে দুঃখ করে বলে, যশাই পণ্ডিত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেবতার আশীর্বাদও চলে গিয়েছে।

তবে অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যে নিজের মনেই পুজো করেন। হয়তো সতীকন্যা কল্যাণীর শোক ভোলবার চেষ্টায়, হয়তো অনুতাপ আর অনুশোচনা দূর করার জন্যে।

সেদিনও এমনি পুজো শেষ করে শান্তিজল দিতে যাচ্ছেন সকলকে, হঠাৎ একজনের দিকে চোখ গেল তাঁর।

—যশাই পণ্ডিত, তুমি!

হইহই করে উঠলো সকলে।—যশাই পণ্ডিত ফিরে এসেছে, যশাই পণ্ডিত ফিরে এসেছে।

মুখে হাসি দেখা দিলো সকলের। কিন্তু যশাইয়ের চোখে তখন ক্রুদ্ধ দৃষ্টি। একরাশ মূর্তি নিয়ে এসে নামালো যশাই। গ্রামে গ্রামে ঘুরেছে সে, বছরের পর বছর। যেখানে যে ধর্মঠাকুরের মূর্তি পেয়েছে, নিয়ে এসেছে সে, কখনো জোর করে কেড়ে নিয়েছে, কখনো চুরি করে। পরীক্ষা করবে যশাই, কোন্ ধর্মঠাকুরের শক্তি বেশী, কোন্ দেবতা বেশী জাগ্রত।

মন্ত্রপাঠ করে মড়া বাঁচাতে পারেনি সে। বাঁকুড়া রায় কি তা হলে মিথ্যে? আর তা যদি হয় তো দেখতে হবে কে সত্যি।

গ্রামে গ্রামে খবর রটে গেল। তীর্থযাত্রীদের ভিড় ভেঙে পড়লো ময়নাপুরের মাঠে।

একটা দিঘির পাড়ে এসে দাঁড়ালো যশাই, তারপর একে একে সব মূর্তিগুলো জলে ছুঁড়ে ফেললো। বাঁকুড়া রায়কেও ছুঁড়ে দিলো জলের মধ্যে।

তারপর চীৎকার করে যশাই বললে, সব ঠাকুরকে জলে ফেলে দিলাম। এবার মন্ত্র পড়বো আমি, তোমাদের মধ্যে যে প্রকৃত জাগ্রত ঠাকুর, সে আমার হাতে উঠে এসো।

এই বলে জলে হাত পেতে মন্ত্রপাঠ শুরু করলো যশাই।

মুহূর্ত কয়েক পরেই সকলে দেখলে একটি মূর্তি ঠেকেছে যশাই পণ্ডিতের হাতে।

মূর্তিটির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চীৎকার ক[illegible] উঠলো।—এ যে যাত্রাসিদ্ধি, যাত্রাসিদ্ধির

ঠাকুর! আমার বাঁকুড়া রায় কোথায়?

আবার মন্ত্রপাঠ শুরু হলো। কিন্তু বাঁকুড়া রায় হাতের কাছে উঠে এলো না।

ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো যশাই। বাঁকুড়া রায় তা হলে মিথ্যা? বাঁকুড়া রায় জাগ্রত নয়? এতদিন তা হলে মিথ্যার পুজো করে এসেছে সে?

তন্নতন্ন করে খুঁজে বাঁকুড়া রায়ের মূর্তিটা দিঘি থেকে তুলে আনলে যশাই। তারপর লাঠির ঘায়ে চূর্ণবিচূর্ণ করলে বাঁকুড়া রায়ের মূর্তি।

যশাই পণ্ডিতের আখড়ায় প্রতিষ্ঠা হলো যাত্রাসিদ্ধির।

আর অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যেকে তাড়িয়ে দিলো যশাই। বললে, যে বামুন নিজের মেয়েকে জীবন্ত পোড়াতে পারে, সে জাত যেন এ মণ্ডপে না ঢোকে। বামুন ছাড়া সব জাতের পুজো নেবেন যাত্রাসিদ্ধি।

তার চোখের সামনে হয়তো ভেসে উঠতো সেই একটি দৃশ্য। অগ্নিকুণ্ডের সামনে বসে গল্প করছে দুজন চাঁড়াল। পাশাপাশি এক জোড়া চিতা সাজানো হয়েছে। আর কল্যাণী, পূর্ণযৌবনা রূপময়ী কল্যাণীর হাতে আর পায়ে কঠিন বাঁধন। বাপ চিতায় তুলে দিচ্ছে নিজের কন্যাকে। জীবন্ত দগ্ধ হয়ে যেন চীৎকার করে উঠছে কল্যাণী, সে চীৎকার শুনতে পায় শুধু যশাই পণ্ডিত।

তাই জ্বলন্ত চিতা দেখলেই উন্মাদের মতো চীৎকার করে উঠতো যশাই পণ্ডিত।

মৃত্যুর সময়েও যশাই তার শিষ্যদের আদেশ দিয়ে গিয়েছিলো, তাকে যেন চিতায় পোড়ানো না হয়।

যশাই পণ্ডিতের নির্দেশমতো যাত্রাসিদ্ধির মন্দিরের ঠিক সামনে মৃত্যুর পরে তার শবদেহ সমাধিস্থ করা হয়। আর, আর যশাই পণ্ডিতের শেষ নির্দেশ—বামুনদেরও আসতে দিস রামাই।

—বামুনদের?

মৃত্যুর সময় মৃদু হাসি দেখা দিয়েছিলো যশাইয়ের মুখে। বলেছিলো, হ্যাঁ রামাই, কল্যাণী হয়তো পরজন্মে আবার আসবে। হয়তো বামুনের ঘরেই জন্ম নেবে আবার। আমাকে এমন জায়গায় পুঁতে রাখবি রামাই, কল্যাণী এলে যেন তার পায়ের শব্দ শুনতে পাই।

কিন্তু লক্ষজনের পায়ের শব্দে কি কল্যাণীকে চিনতে পারবে যশাই পণ্ডিত?

যাত্রাসিদ্ধির মন্দিরের সামনে আজও হাজার মানুষের ভিড় জমে, যশাই পণ্ডিতের সমাধির উপর দিয়ে হেঁটে যেতে হয় তাদের। দূর দূর দেশ থেকে আজও হাজার হাজার লোক আসে যাত্রাসিদ্ধির মেলায়। জেলা—বাঁকুড়া, মহকুমা—বিষ্ণুপুর। বিষ্ণুপুর থেকে সাত ক্রোশ দূরে ময়নাপুর। ময়নাপুরে যাত্রাসিদ্ধির পুজো দিতে যায় তীর্থযাত্রীরা। কিন্তু কেউই হয়তো খবর রাখে না, সতীদাহের কলঙ্ক মুছে ফেলার জন্যে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলো ডোম-পল্লীর একটি অশিক্ষিত পূজারী।

[১৩৬০



ঝুমরা বিবির মেলা

দারোগা অবিনাশবাবু বললেন, নির্ঘাত বাপবেটায় রেষারেষি হয়েছিলো কোনো—

কথা আর শেষ করতে হলো না। রেঞ্জার অমিয়বাবুও হাসলেন—অসম্ভব নয়, বুড়ো এই বছরখানেক আগে নাকি ষোলো-সতেরো বছরের একটি মেয়েকে বিয়ে করেছিলো।

থানার সিপাই কালী মণ্ডল বললে, স্যার, নিজেই যখন সারেণ্ডার করেছে তখন ব্যাপারটাও জানা যাবে, কিন্তু ডাকাত ব্যাটা মরে ঠকিয়ে গেল স্যার।

বুধন কিস্কুর মৃত্যুতে বিশেষ করে দারোগা অবিনাশবাবুই ঠকে গেলেন। এতদিনের তল্লাশ-তদন্ত সব ব্যর্থ হয়ে গেল।

ময়নাগড় থেকে বরকাডিহি, সারা কোলিয়ারি অঞ্চলটার অধিবাসীরা ভয়ে কাঁপতো দুর্ধর্ষ ডাকাত বুধন কিস্কুর নামে। তুড়ুক চাষীরা বলতো, ঝুমরা বিবি ডাইন হয়ে বুধনকেও শিখিয়ে দিয়েছে ঝাড়নি মন্তর। মারাং বুরুর পুজো দিয়ে সিদ্ধাই হয়েছে বুধন, আর তাই শালাই গাছের মাথায় চড়ে সোঁ-সোঁ করে উড়ে গিয়ে আজ এখানে কাল সেখানে ডাকাতি নয়তো রাহাজানি করে ফিরে আসে। থানা-হাকিমের সাধ্যি নেই যে বুধনের টিকিতে হাত দেয়।

টিকি অবশ্য ছিলো না বুধনের, বাপের মতো নুরও রাখতো না। বুধন কিস্কু নামটাই ঘুরতো লোকের মুখে মুখে। কিন্তু আসল চেহারাটা কেউই দেখেনি। দেখে থাকলেও এমন বুকের পাটা কারও ছিলো না যে, পুলিসের কাছে সে কথা জানায়। একরামপুর থানার দারোগা অবিনাশবাবু তাই হার মেনেছিলেন। আর সরকারী ডাক লুটের পর ঝুমরা বিবির মেয়ে আসমিনার খুনের তদন্ত করতে করতে যখন বুধন কিস্কুর প্রায় সব ঘাঁটিগুলো জানা হয়ে গেছে, সোনাডির চারদিকে প্লেন-ড্রেস বসানো—শুধু গ্রেপ্তারের অপেক্ষা, সেই সময় কিনা—

ছেলের ঘাড়ে টাঙির কোপ তো নয়, যেন অবিনাশবাবুর প্রোমোশনের পায়েই কুড়ুল বসিয়ে দিলে মিঞামাঝি।

অবিনাশবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, সারাটা জীবন এই একরামপুরের জঙ্গলেই কাটাতে হবে দেখছি। বুধনের দলেরই একটা লোক এসে খবর দেবে আর হাতে হাতকড়া পরাবো ভেবেছিলাম। তা বদলির আর আশা নেই।

নিরাশ হবারই কথা। যে জংগলে এক বছরের বেশী কোনো দারোগা টিকতো না, সেই বুনো তল্লাটে অবিনাশবাবুর জীবনই শেষ হতে চললো।

ছোট ছোট টিলার ঢেউ ময়নাগড় থেকে বরকাডিহি অবধি। আর শাল-শালাই, মহুয়া আর আমলকীর গভীর জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট সাঁওতালী গ্রাম। মাঝপথে একটা রোগা নদী—সোনাতুলসী। সোনাতুলসীর পারে খানকয়েক বাংলো। ফরেস্ট অফিসার ও তাঁর সহকারীদের দপ্তর-আবাস, বদলি হলেও যাঁদের সেই এক অরণ্য থেকে আরেক অরণ্য। কিন্তু অবিনাশবাবু তো বদলি হয়ে আধা-শহর ময়নাগড়ে যেতে পারতেন, কিংবা বরকাডিহিতে। তা নয়, এই জঙ্গলের মধ্যে থানা-হাকিম হয়ে শুকনো সেলামে পেট ভরানো।

কাছাকাছির মধ্যে সোনাতুলসীর ওপারে ছোট একটি গ্রাম। পাহাড়ের ঢালু উপত্যকায় দু-চার বিঘে লাল মাটির ক্ষেত, আর দু-দশ ঘর তুড়ুক চাষী। তুড়ুক, অর্থাৎ মুসলমান।

বোধ হয় কোনো প্রাচীনকালে তুর্কী সৈন্যের আগমন ঘটেছিলো এই অরণ্যাঞ্চলে, আর সেইজন্যেই মুসলমানদের নাম হয়েছিলো তুড়ুক। যেমন হিন্দুদের নাম ছিলো দেকো।

একরামপুরের তুড়ুক চাষীরা এককালে ছিলো বনচর মানুষ। চাষের ক্ষেতে স্থায়ী ডেরা বেঁধে কিভাবে যেন মুসলমান হয়ে যায়। অবশ্য নামেই তুড়ুক, আচারে-বিচারে সিকি ভাগ

মুসলমানী, বারো আনা সাঁওতালী। মুখে সেই সাঁওতালী বড়, উর্দুর ছিটেফোঁটা মেশানো। দেবদেবী সেই কিস্সাড় বোঙা, হাড়াম বোঙা, রামসাল্‌গি লিটা, জমসিম বোঙা। কিন্তু ওপারের লোক যেমন বলতো সবচেয়ে বুড়া হলো সিঙে বোঙা, তেমনি তুড়ুকদের সবচেয়ে বড় দেবতা এল্লা বোঙা! সেই এল্লা বোঙার কসম খেয়ে বুড়ো মিঞামাঝি বললে, হুজুর থানা-হাকিম—মিছা বলবো নাই। থানা-হাকিম আপুনি, সাজা দিবার হয় লটকে দে। লটকে দে, অর্থাৎ ফাঁসি দে।

শুনে হাসলেন অবিনাশবাবু, পাণ্ডে, সহায়, সিপাই কালী মণ্ডল। আর হাসলেন অমিয়-বাবু। বললেন, থানা-হাকিম! বেশ নামটি দিয়েছে কিন্তু।

দারোগা অবিনাশবাবু থানা-হাকিম, আর জমাদার গোবিন্দ সহায় ছিলো দারোগা। বন-পুলিসের দপ্তরে বসতেন বলে রেঞ্জার অমিয়বাবুর নাম ছিলো জঙ্গল-সাহেব।

জঙ্গল-সাহেবের বাংলোর বারান্দায় বসেই যথারীতি গল্পগুজব চলছিলো। রেঞ্জার অমিয়বাবু, দারোগা অবিনাশবাবু, জমাদার গোবিন্দ সহায়, এফ ও হৃদয়নাথ পাণ্ডে এবং আরো দু-চারজন চাপরাসী আর কনস্টেবল। বাইরে অমাবস্যার অন্ধকারে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমক দিচ্ছিলো। অঝোর ধারায় বৃষ্টি তো নয় যেন আলকাতরার প্লাবন।

গাছের পাতার খসখসানি, বৃষ্টির রিমঝিম আর বনফড়িঙের ঝিঁ ঝিঁ—এরই মাঝে হঠাৎ একসময় ঠুকঠুক করে এসে হাজির হলো বুড়ো মিঞামাঝি!

একমনে খইনি টিপছিলো জমাদার গোবিন্দ সহায়, মেঝেতে বসে বসে। তারই সামনে এসে দাঁড়ালো বুড়ো।—সেলাম দার্গাসাহেব।

সরাসরি অবিনাশবাবুর কাছে এগিয়ে যাবার সাহস হলো না। শুধু গামছায় বাঁধা পুঁটলিটা সামনে নামিয়ে রাখলো সে।

টিমটিমে একটা লণ্ঠন জ্বলছিলো বারান্দায়, তাই প্রথমটা বুঝতে পারেনি গোবিন্দ সহায়। ক্ষেতের খরমুজা দর্শনী এনেছে ভেবে বাঁ হাতে দুটো ফাঁপা তালি দিলে, তারপর খইনি টেপা বন্ধ রেখে গামছাটা খুলেই আঁতকে উঠলো—আরে রাম রাম সিয়ারাম, এ তো তিন শ' দো নম্বর কেস আছে।

অমিয়বাবু কিংবা পাণ্ডে তো দূরের কথা, অবিনাশবাবুও আঁতকে উঠেছিলেন। তারপর বললেন, এই বৃষ্টিবাদলের রাতে জ্বালালে দেখছি।

পরক্ষণে বুড়োর মুখের দিকে তাকিয়ে চিনতে পারলেন অবিনাশবাবু—আরে, সোনাডির মিঞামাঝি না?

—হুঁ থানা-হাকিম। আপনুরাই তো লটকে দিতিস হুজুর, তা বেটারে আমি কোঁপাই দিছি।

অবিনাশবাবু বুঝতে পারলেন না। জিগ্যেস করলেন, লটকে দিতাম? কেন, কে তোর বেটা?

—ডারীটা আনে দেখ্ না। উ হলো আমার বেটা বুধন কিস্কু। দে হুজুর, লটকে দে।

অবিনাশবাবু হাসলেন।—বুড়ো-হাকিমের কাছে বিচার হবে তবে তো; ফাঁসি দিয়ে দেবো এখনই? কিন্তু বুধন কে? ডাকাত বুধন কি তোর ছেলে নাকি?

বুড়ো ঘাড় নাড়লে শুধু।—হুঁ।

অবিনাশবাবু গোবিন্দ সহায়কে বললেন, বুড়োকে হাজতে রেখে ব্যবস্থা কর গোবিন্দ, মাথাটা এনেছে, ধড়টাও আনতে হবে তো।

বুড়ো মিঞামাঝি বুঝলো কথাটা। বললে, সে হুজুর সোনাডিতে আছে, বুড়ো হয়েছি, মুর্দা আনবার তাকত্ কুথায়? কিন্তু হাজত দিবি কানে হুজুর, লটকে দে। বোঙারা স্বপন দিলেন, বেটারে কুরবান দে; তো কুরবান দিছি, এখুন লটকে দে।

ছেলেকে খুন করেছে, সুতরাং ফাঁসি দিলেই যেন বুড়োর শান্তি।

কিন্তু অবিনাশবাবুর দুঃখ, বুধন কিস্কুর গলায় ফাঁসির দড়িটা নিজেই তুলে দিতে পারলেন না।

গোবিন্দ সহায় জনকয়েক কনস্টেবল, সিপাই কালী মণ্ডল আর কোমরে দড়ি বাঁধা মিঞামাঝিকে নিয়ে চলে যেতেই অমিয়বাবু বললেন, কি ব্যাপার বলুন তো? কেমন যেন

রহস্য-রহস্য ঠেকছে!

অবিনাশবাবু হাসলেন।—রহস্য? রহস্য নয়, রীতিমতো রহস্য-উপন্যাস।

উপন্যাস সত্যিই।

তুড়ুক সাঁওতালদের গ্রাম সোনাডি। আর সে গাঁয়ের দুর্ধর্ষ ডাকাত ছিলো বুধন কিস্কু। ময়নাগড় থেকে বরকাডিহি, সারা তল্লাটের যত খুনজখম, ডাকাতি, রাহাজানি সব কিছুর জন্যে লোকে দায়ী করতো বুধনকে। অথচ সাহস করে কেউ কিছু বলতো না। লোকটা যে কেমন দেখতে, কোথায় থাকে, কার ছেলে, কোনো খবরই পাওয়া যেতো না। আর কি করেই বা পাওয়া যাবে। গাঁয়ের সাঁওতালরা বলতো, ও হুজুর ডাইনের মন্ত্র শিখেছে ঝুমরা বিবির কাছে। মাংরা বুরুর নাম করে এখনই মানুষ আবার এখনই হরিণ, নয়তো পাখি। হাওয়ায় নাকি উড়ে যেতে পারে বুধন, সোনাতুলসীর জলে মিশে যেতে পারে।

আরেকজনের কথাও লোকে বলতো। সে হলো হরকরা নির্মল সিং। নির্মল সিংও নাকি মন্ত্র শিখেছিলো ঝুমরা বিবির মেয়ে আসমিনার কাছে, ঝুমুর ঝুম ঝুমুর ঝুম শব্দ করে হাওয়ায় উড়ে যেতো সেও।

লাঠির মাথায় ঘুঙুর বাঁধা, পিঠে মেলব্যাগ নিয়ে ময়নাগড় থেকে বরকাডিহি ছুটতো নির্মল সিং। ঝুমুর ঝুম ঝুমুর ঝুম শব্দ আসতো সন্ধ্যের দিকে, আর মাঝে মাঝে টানা-টানা চীৎকার: স-র-কা-রী ডা-ক!

আবার ছুটতো নির্মল সিং, ঝুমুর ঝুম ঝুমুর ঝুম। পিঠের মেলব্যাগে থাকতো চিঠি-পত্র, পার্সেল, টাকাকড়ি। শনিবারে শুধু মনি অর্ডারই নয়, সেভিংস ব্যাঙ্কের টাকাও জমা পাঠানো হতো বড় ডাকঘরে।

ডাক-হরকরার ওপর কেউ কোনো দিন লোভের হাত বাড়ায়নি। কিন্তু হঠাৎ পরপর দু দিন নির্মল সিং-এর ঘুঙুর বাজলো না। খবর এসে পৌঁছলো তৃতীয় দিনে।

রেঞ্জার অমিয়বাবু ভেবেছিলেন, লোকটা বুঝি বা এতদিনে অসুখে পড়লো।

কিন্তু অসুখ নয়, চিরনিদ্রা। সোনাতুলসীর পাড়ে তল্লাশ করে পাওয়া গেল মেলব্যাগটা। হরকরার লাঠি আর মেলব্যাগ যেমনকার তেমনি পড়ে আছে, আর কাছেই একটি মৃতদেহ।

না, নির্মল সিং নয়, আঠারো-বিশ বছরের একটি পূর্ণযৌবনা সাঁওতালী মেয়ে। কেউ যেন গলা টিপে মেরেছে তাকে।

গাঁয়ের লোক বললে, ঝুমরা বিবির মেয়ে আসমিনা। মায়ের মতো মেয়েও ছিলো ডাইন। নির্মল সিংকে বশ করেছিলো মেয়েটা, লোভ দেখিয়েছিলো, তারপর সুযোগ দেখে কলিজা বের করে খেয়ে নিয়েছে, তাই নির্মল সিং বাতাসে মিশে গেছে। ডাইনরা যখন মানুষের কলিজা খায় তখন আর চিহ্ন রাখে না।

কিন্তু আসমিনা মরলো কি করে?

বুড়োরা বললে, মা-মেয়ে দুই-ই ছিলো ডাইন। মাকে ভাগ না দিয়ে নির্মল সিংকে খেয়ে নিয়েছে বলে ঝুমরা বিবি মেয়ের বুক চিরে কলিজা বের করে নিয়েছে।

—তুরা তো হাসিস বাবুরা! ডাইন আছে কি না পরখ দেখলি তো হাকিম? বুড়ো মিঞা-মাঝি বলেছিলো অবিনাশবাবুকে।

বুড়ো মিঞামাঝি ছিলো গাঁয়ের মাথা। বিঘে দুই-তিন জমি ছিলো বুড়োর। জনারের চাষ করতো।

তার কাছে গিয়ে হাজির হলেন অবিনাশবাবু, সঙ্গে জমাদার গোবিন্দ সহায়, জনকয়েক কনস্টেবল আর সিপাই কালী মণ্ডলকে নিয়ে।

বললেন, তোরা সকলে মিলে সাহায্য না করলে এ ডাকাত ব্যাটাকে ধরা যাবে না।

বুধন যে মিঞামাঝিরই ছেলে তা তো জানতেন না।

মিঞামাঝি দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটা খাটিয়া পেতে দিলো বসবার জন্যে। তারপর বললে, ঝুমরা বিবিটাই আসামী হুজুর, ডাইনটাকে লটকে দে, দেখবি বুধন ভালো হয়ে যাবে।

অবিনাশবাবু বুঝলেন, কাজ হবে না এভাবে। রেঞ্জার অমিয়বাবুকে এসে বললেন, কি করা যায় বলুন তো। লোকটার কোনো হদিসই কেউ দিচ্ছে না। সবারই ভয় বুধনকে ধরিয়ে দিলে ডাইনে কলিজা খেয়ে নেবে তার।

সোনাডির লোকগুলোর ওপর নাকি বোঙাদের দৃষ্টি ছিলো আগে। তারপর এই ঝুমরা বিবি ডাইন হলো। অন্ধকার রাতে মন্ত্র পড়ে স্বামীকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে বেরিয়ে যেতো ঝুমরা বিবি। একটা ঝাঁটা রেখে যেতো স্বামীর কাছে। আর মন্ত্রের ঘোরে ঝাঁটাটা জড়িয়ে শুয়ে সে ভাবতো ঝুমরা বিবিই বুঝি বা শুয়ে আছে। ঝুমরা তখন কুলোর ওপর একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে বেরিয়ে যেতো।

গাঁয়ের অনেকে দেখেছে এ দৃশ্য, এলো বোঙার কসম খেয়ে বলতো তারা।

সে এক ভয়ঙ্কর চেহারা। কপালে চকচক করতো তেল-সিঁদুর, হাতে প্রদীপ, ঝুমরা বিবির কালো পাথরের শরীর দেখে মনে হতো যেন জোয়ান মরদের শক্তি তার হাতে। আর গুর্ভিন মেয়ের মতো তার ভারি লাজ দেখে যে পুরুষের মন চঞ্চল হতো, তারই কলিজা মুঠোয় পুরে নিতো ঝুমরা বিবি। শুধু কি তাই, সব ডেরা ঘুরে ঘুরে কোথাও ভায়ে ভায়ে ঝামেলার মন্ত্র পড়ে আসতো, বাপ-বেটীতে পাপ লাগাতো, গোলার হুড়ুতে পোকা লাগিয়ে গাঁয়ের লোককে ভুখা মারতো।

বুড়ো মিঞামাঝি বলেছিলো, তখুন জানতাম না থানা-হাকিম, সত্যি ডাইন বটেক, কি ঝুটা।

—কি করে জানলি? সিপাই কালী মণ্ডল জিগ্যেস করেছিলো।

মিঞামাঝি তার আধা-মাকুন্দ নুরে হাত বুলিয়ে বলেছিলো, ডাইন দেখলে চুপ থাকতে হয়। তো জানের বিচার যখন বললে, ঝুমরা বিবি ডাইন, তখন গাঁয়ের সক্কলে বললে, আমরাও দেখেছি বটে।

সেই ঝুমরা বিবির বশ হলো বুধন কিস্কু। বোঙাদের ধরম মানলো না, নিজেকে ভাসিয়ে দিলো পাপের গাড়ায়।

দারোগা অবিনাশবাবুরও চোখ ছলছল করে উঠেছিলো, অমিয়বাবুর কাছে সে কাহিনী বলতে বলতে।

বলেছিলেন, কত দুঃখে যে মানুষ নিজের ছেলেকে মারতে পারে বুড়োর কাছে না শুনলে বুঝবেন না অমিয়বাবু। ঠিগিয়া শাদি হওয়ার পর আধা-জীবন কেটে যেতেও নাকি ছেলেপিলে হয়নি মিঞামাঝির। না বেটা, না বেটী। তারপর ছেলে দিয়েই মারা গেল মিঞা-মাঝির প্রথম বউ!

—তারপর?

—মা না থাকলে বাপের আদর পেয়ে যা হয়। বুধন কিস্কু চাষবাস ছেড়ে শিকার করে বেড়ায়। ছোটখাট চুরি-জোচ্চুরি করে। তবু বাপ শক্ত হতে পারে না। শেষে ছেলে যখন জোয়ান হলো, পঞ্চায়েত বললে, বিধবা ঝুমরা বিবির সংগে বুধনের পীরিত হয়েছে। ভয় দেখিয়ে জরিমানা করে কোনো কিছুতেই যখন কাজ হলো না, তখন সবাই বললে, ঝুমরা বিবি ডাইনী। ওকে গাঁ থেকে তাড়াতে হবে।

অমিয়বাবু বললেন, শুধু দুটো জিনিসই দেখেছি ওদের জীবনে সত্যি, বোঙা আর ডাইনী।

অবিনাশবাবু বললেন, কিন্তু ডাইনী বললেই তো হবে না, জানের কাছে বিচার হলে তবে। ওঝার কাছে খড়ি গুনিয়ে তারপর ধুনো সুপুরি ভাঁড়নিচ নিয়ে যেতে হবে জানের কাছে।

হাতে হাতকড়া কোমরে দড়ি বাঁধা অবস্থায় স্টেটমেণ্ট দিচ্ছিলো বুড়ো মিঞামাঝি। অবিনাশবাবুর কথা শুনে বললে, হ্যাঁ হুজুর, জানে সব ঠিক ঠিক বললে, পরে বুন্দা চাইলে। বুন্দার টাকাটা দিলাম তো বললে, বেটার মাথায় ডাইন ভর করেছে। তো পুছলাম ডাইন আছে কোন ওড়ায়? জান ঠিকানা বললে। তল্লাশ করে ঝুমরা বিবি ডাইন হলো। তো গাঁয়ের লোক হড়মদড়ম মার দিলে, বে-আবরু করে ভাগায় দিলে মা-বেটীরে।

অগত্যা গাঁয়ের বাইরে গিয়ে ডেরা বাঁধলো ঝুমরা।

সেই ঝুমরা বিবির খোঁজে লোক পাঠালেন অবিনাশবাবু। কিন্তু পরপর তিন দিন কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না তার। শেষে বুধন কিস্কুর ডেড বডি আর বুড়ো মিঞামাঝিকে চালান করে দিতে হলো বরকাডিহিতে।

দিনকয়েক পরে ঝুমরা বিবি ফিরে এসে যখন শুনলো বুড়ো মিঞামাঝি টাঙির কোপে কেটে ফেলেছে তার ছেলে বুধন কিস্কুকে, তখন কেঁদে গড়িয়ে পড়লো সে।

চোখের জল মুছে বললে, লটকা হবে তো হুজুর ওই বুড়োটার? অবিনাশবাবু স্বভাব-সুলভ রসিকতায় বললেন, কেন বাবা, বুধন কে ছিলো তোমার যে তার বাপকে লটকে দিতে চাও?

ঝুমরা বিবি চোখের জল মুছে বললে, হুজুর, বুধনই বাঁচায়ে রাখেছিলো আমাদের। না হলে ভুখা মরতাম থানা-হাকিম।

—তবে সতী ঠাকরুন, মেয়ে যখন মরে পড়ে ছিলো সোনাতুলসীর পাড়ে, তখন কেন বুধন কিস্কুর নামে ডায়েরি লিখিয়েছিলে?

সবটা হয়তো বুঝলো না ঝুমরা বিবি, তবু যেটুকু বুঝলো সেইটুকুতেই অপ্রতিভ হলো।

বললে, সে হাকিম অনেক কথা।

যত চোখের জল মোছে ঝুমরা বিবি, ততই জলে ভরে আসে তার চোখ।

গাঁয়ের লোক বিটলা করে গাঁয়ের বাইরে তাড়িয়ে দিলে কি হবে, বুধন কিস্কু তার মন থেকে তাড়াতে পারেনি ঝুমরা বিবিকে।

অমিয়বাবু হেসে বললেন, পীরিত বটে। ওর চেয়ে দশ বছরের বড় এ মাগীটা, তার সঙ্গে কিনা...

অবিনাশবাবু হাসলেন।—যার সাথে যার মজে মন—

ফরেস্ট অফিসার পাণ্ডে বললে, সাচ্ অবিনাশবাবু। আগে পানি পিয়ে পিছু জাতি বিচার।

তা এখানে জাত তো একই, তফাত যেটুকু তা শুধু বয়সের। তা ছাড়া ডাকাত বুধন ছিলো বলেই না ঝুমরা বিবি ভুখা মরেনি। মেয়েকে নিয়ে গাঁয়ের বাইরে ও যখন ডেরা বাঁধলে তখন ওর না আছে জমি, না চাঁদি। আর পয়সা দিলেও কেউ এক কণা চাল বেচতো না ওকে। সেই সময় বুধন কখনো কখনো মাঝরাতে একা হাজির হতো। চাল-ডাল সোনা-দানা লুটের মাল খানিকটা এনে দিতো ঝুমরা বিবিকে। হাঁড়িয়া খেয়ে ঝুমরা বিবির সঙ্গে রাত কাটাতো, আর উধাও হতো ভোর চমক দেবার আগেই।

সেসব দিনের কথা বলতে বলতে হাঁটুতে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলে ঝুমরা বিবি।

বললে, হাঁড়িয়া খেলেই মনের ভিতরটা বেয়াদপ হয়ে যায় থানা-হাকিম। ভালো মানুষটা পাপী হয়ে যায়।

অর্থাৎ মনে পাপ ঢোকে। বুধনের মনেও একদিন সেই পাপ ঢুকলো। হঠাৎ একদিন মাঝরাতে এসে বুধন ডাকু হাঁড়িয়া চাইলে। তারপর নেশা যখন জমে উঠেছে, তখন হঠাৎ ঝুমরা বিবিকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলে! বললে, বেটীকে লিয়ে আয়।

—ডাকু নেশা করলে হুজুর বাঘের মতো তেজ হয়। ঝুমরা বিবি বললে।

অবিনাশবাবু বললেন, আর তাই মেয়েকে এনে দিলি, কেমন?

ঝুমরা বিবি লজ্জায় মাথা তুলতে পারলো না।

—তারপর?

তারপর বুধন যখনই আসতো, হাঁড়িয়া চাইতো। হাঁড়িয়া খেয়ে রাত কাটাতো আসমিনার সঙ্গে। শেষে হঠাৎ একদিন সন্ধ্যেবেলায় এসে হাজির হলো। বললে, বেটীকে লিয়ে আয়।

অমিয়বাবু বললেন, বাঃ, বেশ ইণ্টারেস্টিং ব্যাপার তো!

অমিয়বাবু হাসলেন।—তারপর? ডেকে দিলি আসমিনাকে?

ঝুমরা বিবি মুখ তুললো এতক্ষণে। বললে, না হুজুর, আসমিনা সাঁজের বেলায় সোনা-তুলসী থেকে পানি আনতো। তো বেটী গাডায় পানি আনতে গেছে শুনে টাঙিটা লিয়ে চলে গেল বুধন। তারপর তো তুরাই জানিস হুজুর। বলে কাঁদলে ঝুমরা, ঠিক সেদিন মেয়ের মৃতদেহের ওপর লুটিয়ে পড়ে যেভাবে কেঁদেছিলো।

সব শুনে অবিনাশবাবু বললেন, তবে আবার বুধনের বাপটাকে লটকে দিতে চাস কেন? মরেছে ভালোই হয়েছে।

ঝুমরা বিবি চলে যেতেই অমিয়বাবু বললেন, ফাঁসি হবে?

—পাগল হয়েছেন? হাসলেন অবিনাশবাবু। বললেন, বছর কয়েক জেল অবশ্য হবেই।

মাসকয়েক পরে একদিন বরকাডিহি থেকে ফিরে এসে বললেন, জেলই হলো অমিয়বাবু, চার বছর। বুড়ো মিঞামাঝি এমন স্টেটমেণ্ট দিলে যে, কোর্ট সুদ্ধ লোকের চোখে জল এলো।

—কি বললে? উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন অমিয়বাবু।

—বললে, হুজুর জন্ম দিয়েছি আমি, জীবনও নিয়েছি আমি। এখন আইনে ফাঁসি দিতে হয় দে। যে ছেলেকে কোলে-পিঠে করে আদর-যত্নে মানুষ করেছি, সে যখন ভালো হলো না, ডাকাতি রাহাজানি করে, মেয়েদের বেইজ্জত করে এল্লা বোঙার কাছে বেইমান হলো তখন তাকে কেটে ফেলবো না তো মুর্গি বলি দিয়ে তার পুজো করবো!

অমিয়বাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, কথাটা ঠিকই।

ক্ষোভের হাসি হাসলেন অবিনাশবাবু। ওর বেটার নাকি দোষ ছিলো না, ডাইনীর বশ হয়েছিলো। কিন্তু রায়ে জেল হয়েছে শুনে হাউহাউ করে কাঁদতে শুরু করলো বুড়ো। ভাবলাম, ফাঁসি হবার জন্যে এত আগ্রহ যার সে লোক জেল হয়েছে বলে কাঁদে? জিগ্যেস করলাম তো বললে, হুজুর, হিসাব ভুল হয়ে গেছে। লংটকা না হলে বোঙারা খুশী হবেন নাই, বুধন ভালো হবে নাই।

একটু চুপ করে থেকে অবিনাশ বললেন, বোধ হয় পাগল হয়ে গেছে ছেলেকে খুন করে। কিন্তু ডাইনী ভোলেনি।

পাণ্ডেও দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, বিশোয়াস্ অমিয়বাবু।

বিশ্বাস!

সত্যি তাই। অদ্ভুত মানুষ এই তুড়ুক চাষীরা। একবার যা বিশ্বাস করে, সারা জীবনেও তার নড়চড় হবে না, অমিয়বাবু বলতেন। বলতেন নতুন দারোগা সুধীনবাবুকে।

অবিনাশবাবু বরকাডিহিতেই বদলি হয়ে গিয়েছিলেন, আর তাঁর জায়গায় এসেছিলেন সুধীনবাবু।

খুনজখম বা ডাকাতি-রাহাজানির কেস এলেই বুধন কিস্কু আর বুড়ো মিঞামাঝির গল্প শোনাতেন অমিয়বাবু।

বলতেন, সে এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড সুধীনবাবু। সন্ধ্যেবেলায় ঝমঝম বৃষ্টি পড়ছে, বসে গল্প করছি আমরা, হঠাৎ সেই সময় ঠুকঠুক করে এসে হাজির হলো বুড়ো মিঞামাঝি, গামছায় ছেলের কাটা মুণ্ডুটা বেঁধে নিয়ে! সে কি আজকের কথা, সে প্রায় তিন-চার বছর হলো!

সেদিনও এমনি কি একটা গল্প হচ্ছিলো, হঠাৎ সিপাই কালী মণ্ডল ছুটতে ছুটতে এসে বললে, সোনাডির একটা গাছে গলায় দাঁড় লাগিয়ে একজন বুড়ো ঝুলছে স্যার।

—আত্মহত্যা? সুধীনবাবু প্রশ্ন করলেন।

—হ্যাঁ স্যার, সুইসাইড কেস। কালী মণ্ডল বললে।

অমিয়বাবু, সুধীনবাবু, পাণ্ডে, সহায় সকলেই বেরিয়ে পড়লো। হাঁটুজল সোনাতুলসী পার হয়ে এসে দেখলে, ভিড় ভেঙে পড়েছে গাছটার কাছে।

একটা সিপাই গাছে উঠে দড়িটা কেটে দিলো, ঝুপ করে মাটিতে পড়লো মৃতদেহটা।

অমিয়বাবু ঝুঁকে পড়ে দেখলেন। বুড়ো থুত্থুড়ে একটা লোক, মুখের চামড়া জিলজিলে হয়ে গেছে!

কে যেন বললে, জংগল-সাহেব, কয়েদ মকুব হয়েছিলো তাই সোনাডিতে ফিরে এসেছিলো বুড়ো মিঞামাঝি।

আরেকজন কে বললে, ডাইনটা মন্ত্র পড়ে বুড়োকে লটকে দিয়েছে হুজুর।

শুধু ঝুমরা বিবি বললে, না হুজুর, ডাইন নই আমি। বেটা বাপের কথা রাখে নাই হুজুর, তাই গলায় দড়ি দিয়েছে বুড়ো। বেটা বুধন বলেছিলো, জান বাঁচায় দিলে রাহাজানি করবে নাই।

অমিয়বাবু ধমক দিয়ে বললেন, কি বলছিস যা-তা।

সিপাই কালী মণ্ডল বললে, ঠিকই বলছে স্যার। গাঁয়ের লোকও বলছে, বুধন কিস্কু

ব'চে আছে।

—বুধন কিস্কু বে'চে আছে? বিস্মিত না হয়ে পারেন না অমিয়বাবু।

কালী মণ্ডল বললে, তা না হলে এত রাহাজানি হয় এখনো? ডাইনীটা বলেছিলো, কে একটা লোক নাকি থানায় খবর দিতে আসছিলো, তাকেই তিন শো দুই করে দিয়েছিলো ।। অথচ গাঁয়ের চারিদিকে তখন পুলিস।

—তারপর?

—তারপর বাপের কাছে মাঝরাত্তিরে গিয়ে বলেছিলো, এবার জান বাঁচিয়ে পালাতে দে, ; ছেড়ে চাষবাস দেখবো। তা স্যার, তুড়ুকই হোক, সাঁওতালই হোক, বাপের প্রাণ তো। ডেড বডিটাই বুধনের বলে চালিয়ে দিলো।

সুধীনবাবু অস্ফুটে বললেন, স্ট্রেঞ্জ!

কালী মণ্ডল বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ। বুড়ো ভেবেছিলো খুনের দায়ে ফাঁসি হবে ওর। আর াঁসি হলে তখন বাপের কলিজা বেটার বুকে এসে ঢুকবে। ডাইনী তখন ওর ছেলেকে দিয়ে খুশি করাতে পারবে না।

অমিয়বাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, অন্ধ বিশ্বাস! এইজন্যেই উন্নতি হলো না লোক-লার!

কালী মণ্ডলও দীর্ঘশ্বাস ফেললে।—যা বলেছেন স্যার। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে লোকটা ফিরলো, গাঁয়ের লোকদের নাকি চিনতেই পারেনি, একেবারে বদ্ধ পাগল হয়ে গিয়েছিলো।

—তাই নাকি? বিস্মিত হলেন সুধীনবাবু।

—হ্যাঁ স্যার। কালী মণ্ডলের চোখও যেন ছলছল করে উঠলো। বললে, বুড়ো নাকি ছুটে ড়াতো আর বলতো, ল'টকা হলো নাই, হিসাব ভুল হয়ে গেছে।

ফাঁসি হলেই যেন শান্তি পেতো বুড়ো।

আর সেইজন্যই হয়তো নিজের গলায় নিজেই ফাঁসির দড়ি পরালে।

কিন্তু সোনাডির তুড়ুকরা বললে, না হুজুর, বেটার কলিজা খেয়ে মিঠা লেগেছিলো র, তো বাপের কলিজাও খেয়ে নিছে।

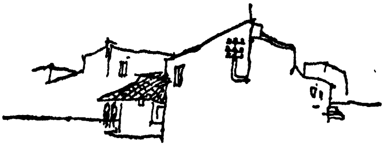
এ ঘটনার পর বহু দিন মাস বছর পার হয়ে গেছে। একরামপুরের থানা উঠে গেছে বরকা-হিতে, বন-পুলিসের দপ্তরে এসেছে নতুন লোক, সবাই ভুলে গেছে ঝুমরা বিবিকে, বুড়ো ঞামাঝিকে, ডাকাত বুধন কিস্কুকে। কিন্তু সোনাডির তুড়ুক চাষীরা ভোলেনি সে ঘটনা। এখনো শীতকালের দিনে সারা গাঁয়ের লোক মেলা বসায়—ঝুমরা বিবির মেলা। মেয়েপুরুষ দিনরাত নাচে গায়, দোকানীদের সারি বসে—মিঠাই, 'মান্ডী', রঙিন কাচের জলচুড়ি। ভিড় ভেঙে পড়ে মোরগ-লড়াইয়ের দিনে। চারপাশের লোক ছড়া বাঁধে, গান গায় ঝুমরা আর মিঞামাঝির নামে। এল্লা বোঙার পুজো দিয়ে একটা মোরগের নাম দেয় ঝুমরা অন্যটার মিঞামাঝি—তারপর দুজনেরই পায়ে ছুরি বে'ধে ছেড়ে দেয়।

যে বছর 'ডাইন' মরে, আনন্দ ধরে না আর গাঁয়ের লোকের। আর যেবারে 'মিঞামাঝি' রগটার চোট লাগে, সেবারে এল্লা বোঙার পুজো চলে সাত দিন ধরে। গাঁয়ের লোকের শুকিয়ে যায়।

কিন্তু মিঞামাঝির সন্তানস্নেহের দিকটা চোখে পড়ে না ওদের। ছেলের জান বাঁচাবার া, ছেলেকে ভালো করবার জন্যে বাপ নিজের গলায় ফাঁসির দড়ি লাগাবে—এই তো সাধারণ । এ ব্যাপারে বিস্মিত হবে কেন সোনাডির চাষীরা।

আমি নিজেও দেখেছি এ মেলা, ঝুমরা বিবির মেলা। দেখেছি সোনাডির মোরগ-লড়াই। এখন একে গল্প বলতে হয় গল্প বলুন, ইতিহাস বলতে হয় ইতিহাস।





তালাক

লোকে বলে গাঁ-ঘরে এমনটি দেখা যায় না। বড় ঘরের মেয়ে না হলে কি এমন রূপ হয়! কোরা ধুতির মতো চাঁপা-চাঁপা রঙ, আঁটোসাঁটো চেহারা, মাথায় একটু খাটো হলে কি হবে, মুখ-চোখের গড়নে খুঁত নেই এতটুকু। বারো বছরের চাঁদবানু যখন নাকছাবির চুনী আর পায়ে রূপোর মল বাজিয়ে ঘুরে বেড়ায়, চোখে না দেখতে পেলেও মনটা কানায় কানায় ভরে ওঠে কাসেমের, শুধু মলের ঝুনঝুন ঝুনঝুন আওয়াজ শুনে।

রসুলগাঁয়ের মাথা হলো লতিফসাহেব। এই লতিফসাহেবের মেয়ে চাঁদবানু।

বাপের তিরিশ বিঘে জোতজমি, মিঠাসায়রের চার আনি অংশ, আর আছে মৌলানার ডাঙায় আম-খেজুরের বাগান। এমন ঘরের মেয়ে বলেই না অমন রূপ। ঘরের মেঝে যে বিলিতী মাটিতে বাঁধানো, পায়ে তো কাদা লাগে না। আর করোগেটের চালে চাঁদনীর আলো ঠিকরে এসে মুখে পড়ে বলেই তো চাঁদের মতো রূপ চাঁদবানুর।

লতিফসাহেবের ছোট বিবিও দেখতে-শুনতে মন্দ ছিলো না বয়সকালে। তারই তো মেয়ে, হবে না কেন পরীর মতো দেখতে? তবে বয়েস কম হলো না, বারোয় পা দিয়েছে। গড়নে-বাড়নে চৌদ্দ বলেই মনে হয়।

তাই ছোট বিবি মাঝে মাঝে ধমক দেয়। বলে, বয়সটা কম হয় নাই তোর, বিয়াশাদি হলে ছেলের মা হতিস চাঁদি।

চাঁদবানু ঠোঁট ফুলিয়ে বলে, হোক বয়স, তা বলে বুরকার ভিতর—দম বন্ধ হয়ে আসে আমার।

লতিফসাহেব শুনে হাসে। বলে, তা চাঁদি ঠিকই বলছে, সদরের আবদুলসাহেবের মেয়েরা সব্বার চোখের সমুখ দিয়ে ইস্কুলে যায়, কাছারির মামলায় গিয়ে দেখে আসছি।

ছোট বিবি রেগে গিয়ে বলে, এটা সদর নয় তোমার, রসুলগাঁয়ের মাথা তুমি, ইজ্জতের কথাটা ভাবতে হয়।

লতিফসাহেব বলে, রাখো তোমাব ইজ্জতের কথাটা। মানুষ আছে নাকি রসুলগাঁয়ে যে লাজশরম হবে চাঁদির।

কথাটা সত্যি।

মানুষ আছে নাকি রসুলগাঁয়ে। পঁচিশ ঘর মুসলমানের ছোট্ট গাঁ। জাতেই মুসলমান, আদব-কায়দায় নয়। গরিবের গাঁ, কেউ ডিঙিতে মাছ ধরে বেড়ায়, কেউ তাঁত বোনে। আর বেশির ভাগই লতিফসাহেবের জমি চষে, ধান ভানে, আর নয়তো খেজুর-রসে জ্বাল দিয়ে গুড় বানায়।

একটাই লোক আছে—বাচ্চা করিম। বাপ মারা গেছে, এখন পাটোয়ারী কারবারটা করিম নিজেই দেখে। আশপাশের গাঁ থেকে ঘি, ডিম আর গুড় কিনে চালান দেয় সদরের হাটে। পয়সা হয়েছে, তার প্রমাণ দু-দুটো বিবি করিমের। নামটা কিন্তু সেই বাচ্চা করিমই রয়ে গেছে।

করিমের চেহারাটা বেশ ছিমছাম। পাকা দালান তুলবে বলে ইটের পাঁজা পোড়াচ্ছে সদর থেকে রাজমিস্ত্রী এনে। দু-দুটো বিবি, দুজনেরই গলায় রূপোর হাঁসুলি, মিনে-করা বাজু-বন্ধ। নকশাকাটা ফুলবাহার শাড়ি বানায় তাঁতী-ঘরে বায়না দিয়ে। এ ঘরে চাঁদির বিয়ে দিলে মেয়েটা সুখী হবে, ভাবে ছোট বিবি। আর তাই চাঁদবানু যখন-তখন খিড়কি পার হয়ে এদিক-ওদিক ছুটে গেলে রেগে যায় সে।

চাঁদবানু কিন্তু অতশত বোঝে না, হাতে লণ্ঠন নিয়ে গোয়াল দেখে, খড়ের জাবনায় হাত ডুবিয়ে দেখে জল আছে কি না, তারপর গুনে গুনে মুর্গিগুলোকে ঝাঁপিতে ভরে।

একটা কম হলে চীৎকার করে ডাক দেয়।—অ কাসেম, মুর্গিগুলো গুনতি করে দেখো ফের, একটা খাটাশে ধরলো না তো!

আঠারো বছরের জোয়ান কাসেম তাতেই খুশী, চাঁদবানুর কাছ থেকে কাজ পেলে আর কিছু চায় না ও। মিঠাসায়রের পাড় খুঁজে খুঁজে মুর্গিটা ধরে আনে, মুখ-চোখের ভাব যেন, কত বড় একটা কাজ করেছে।

কিন্তু হাসে না কেন চাঁদবানু? কেন জিজ্ঞেস করে না, কোথায় পেলো কাসেম দলছুট মুর্গিটাকে, কাদায় কাদায় কত ঘুরতে হয়েছে তাকে, সামনে দিয়ে সড়াৎ করে গোখরো গেছে কিনা ফণা দুলিয়ে!

হোক কাজের কথা, কথা শুনতে পেলেই কাসেম খুশী। কথা বলতে পেলে হয়তো আরো খুশী হতো। কিন্তু তেমন সুযোগ বড় একটা হয় না। সারাটা দিন ক্ষেতে লাঙল টেনে সন্ধ্যের সময় ফিরে আসে।

—এক ছিলিম তামুক দেবেন গোমস্তাসাহেব!

গোমস্তাসাহেব এ সময়টা এক গেলাস চায়ের লোভে পাটোয়ার-বাচ্চা করিমের বাড়িতে আড্ডা জমায় জেনেও, গোমস্তাসাহেবের নাম ধরেই ডাক দেয় কাসেম। বার দুই ডাক দিলেই বেরিয়ে আসে চাঁদবানু।

বলে, অ কাসেম, এই নাও তোমার তামাক।

আন্দাজে আন্দাজে অন্ধকারে হাতড়ে আঙিনাটার সামনে যায় কাসেম। দু হাতের আঁজলা এগিয়ে দেয়। আর উঁচু আঙিনার ওপর থেকেই ওর হাতের ওপর তামাকটা ফেলে দেয় চাঁদবানু।

—একটু আঙার দিবে না?

চটে যায় চাঁদবানু।—কাজ-কামের চেয়ে তোমার ফরমাশটাই বেশী বেশী কাসেম! বলে দপ-দপ করে পা ফেলে যায় উনোন থেকে আগুন আনতে।

ও তো বোঝে না আসলে কাসেমের ফরমাশটা কেন। মোট কথা চাঁদবানুর দিকে তাকিয়ে থাকতে, চাঁদবানুর হাঁটাচলা—সব—সব কিছুই যেন ভালো লাগে। আর ঘরে ফিরে ঘুম আসে না ওর চোখে। শুধু চাঁদবানু, চাঁদবানু। স্বপ্নে দেখে, অনেক টাকা জমিয়েছে কাসেম। জমিজমা না থাক, খেজুরের গাছ আছে বারোটা, খেজুরের গুড় আর পাটালি বানিয়ে সদরে বেচে এসেছে চড়া দরে। তারপর সেই টাকা নিয়ে শুরু করেছে করিমসাহেবের মতো পাটো-য়ারী কারবার। করোগেটের ঘর হয়েছে, বিলিতী মাটি অর্থাৎ সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো হয়েছে ঘরের মেঝে।

তারপর?

তারপর লতিফসাহেব যেন এসে বলছে, অ কাসেম, সবই তো হলো, জমিজমাও কিনলে, এবার বিয়াশাদি না করলে ঘর যে আঁধার সেই আঁধারই রয়ে যাবে।

কাসেম তখন বলবে, বিবি আনার মতো মেয়ে কই লতিফসাহেব, আপনিই কন দেখি?

—কেন, আমার চাঁদিকে তো ছোটকাল থেকে দেখছো তুমি।

সত্যি! তা যদি কোনো দিন সম্ভব হয়! ভাঙা চালের খড়ের ফাঁক দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে স্বপ্ন দেখে কাসেম। মুখটা তো দেখতে পায় না অন্ধকারে, আর আলো থাকলেও তো নিজের মুখ নিজে দেখতে পাবে না, তবু কাসেম বুঝতে পারে, তার মুখে যেন হাসি লেগে রয়েছে।

নিজের মনেই কখনো হতাশ হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, ময়লা গামছাটার খুঁটে চোখ মোছে। জন খাটার নসীব যার, সে কিনা স্বপ্ন দেখে চাঁদবানুকে বিয়ে করার! বুকটা ব্যথায় মোচড় দিয়ে ওঠে কাসেমের।

চাঁদবানু কিন্তু অতশত বোঝে না। তবু মাঝে মাঝে কেমন যেন কাসেমের ওপর দয়া হয় ওর। যেদিন বেগার দিতে আসে কাসেম, চাঁদবানু ডেকে কথা বলে।

কাজের শেষে কাসেমের হাতে তেল ঢেলে দেয়, বলে ডুব দিয়ে এসো মিঠাসায়রে, তোমার ভাত হয়ে আছে।

তাড়াতাড়ি একটা ডুব দিয়ে এসে মরাইয়ের পাশে এনামেলের থালা-ঘটি নিয়ে বসে পড়ে

কাসেম। চাঁদবানু নরম ভাত ঢেলে দেয় থালায়, আর ডাল। তরি-তরকারিও থাকে কোনো কোনো দিন।

বসে বসে পেট ভরে খায় কাসেম, আর সামনে দাঁড়িয়ে গল্প করে চাঁদবানু। বলে, অ কাসেম, বুড়া হতে চললে, বিয়াশাদি করবে না?

—বিয়াশাদি? হাসে কাসেম। বলে, আমাদের কে বিয়া করবে, নিজের পেটটাই কথা শোনে না।

বলে বটে, কিন্তু সন্দেহ যায় না। বিয়ের কথা কেন বলে চাঁদবানু? তবে কি কাসেমের স্বপ্নটা ওর মনেও উঁকি দেয়!

মনের ভেতর গুনগুনুনি শুরু হয়। নিজের মনেই একটা গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে করিমসাহেবের বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়।

হিসাবের খাতা দেখতে দেখতে চোখ তুলে তাকায় করিমসাহেব।—কি কাসেম, খবর আছে নাকি কিছু?

—একটা কিছু বাণিজ্য বাতলে দেন সাহেব। জন-মজুর খেটে তো পেট চলে না।

হো-হো করে হেসে ওঠে করিমসাহেব।

তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলে, বাণিজ্য আছে একটা, করবে তুমি?

ঘাড় নাড়ে কাসেম।

করিমসাহেব মৃদু হেসে বলে, বিশটা টাকা পাবে নগদ, বিয়া করতে হবে।

—বিয়া? চোখ কপালে তোলে কাসেম।

করিমসাহেব হেসে বলে, এ বাণিজ্যটা খুব ভালো কাসেম। সদরের মহাজন বাবু মিঞা তার এক বিবিকে তালাক দিয়ে নিজের হাতে নিজেই কামড় দিচ্ছে এখন।

কাসেম তবু বুঝতে পারে না, তেমনি চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে।

করিমসাহেব ধীরে ধীরে বলে, আমাদের মুসলমানের ধর্মটা বড় কড়া কাসেম! হিন্দুর ঘরের বউকে বাপের বাড়ি তাড়িয়ে আবার ফিরে লওয়া যায়। আমাদের একবার তালাক দিলে সে বিবিকে ঘরে আনা যায় না।

কাসেম তবু কথা বলে না, চুপ করে থাকে।

করিমসাহেব আবার বলে, হাঁ, সে বিবিকে অন্য কেউ বিয়া করে তালাক দিলে তবেই তালাক-দেওয়া বিবিকে আবার বিয়া করা যায়, ফিরে আনা যায়, এটা আমাদের কানুন।

কাসেম বলে, হাঁ সাহেব, মুসলমান ঘরের কানুন মানতে হয়।

—তাই তো বলছি কাসেম। বাবু মিঞার বিবিটাকে তুমি বিয়া করে তালাক দাও, কুড়িটা টাকা পাবে, আর ঘরের বিবি তার ঘরে ফিরবে।

লাফিয়ে ওঠে কাসেম।—ছি ছি, এ কি কন সাহেব! গরিব মানুষের কি ইজ্জত নাই?

—ইজ্জত! হো-হো করে হেসে ওঠে করিমসাহেব। বলে, কুড়িটা টাকা পাবে, ভেবে দেখো কাসেম।

ভেবে দেখেছে কাসেম, অনেক ভেবেছে। গরিব হলেও অমনভাবে ইজ্জত নষ্ট করতে পারবে না সে। তার চেয়ে মাছ ধরার নাম করে নদীতে ডিঙি ভাসিয়ে চলে যাবে একদিন, ফিরবে না আর। তা হলে তো চাঁদবানু বলবে না, কাসেম তালাক বেচে পেট ভরায়।

কাজ করতে করতে কেবলই ভয় হয় কাসেমের। চাঁদবানুর কানেও পেঁছে যাবে না তো কথাটা! করিমসাহেব মিছে করে বলবে না তো, কাসেম রাজী হয়েছে!

এমনি সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতেই সাঁতার দিয়ে নদী পার হচ্ছিলো কাসেম।

চাঁদবানু বলেছে, অ কাসেম, সদরে হাট বসেছে, আমার জন্যে চার গাছা রঙিন জলচুড়ি এনে দেবে?

কাসেম হেসে বলেছে, চুড়ি? তুমার জন্যে চাঁদ আনতে পারি, কও তো আনি। বলে কোমরে পয়সা গুঁজে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিলো কাসেম।

কিন্তু হঠাৎ কিসে যেন, বোধ হয় জলসাপে, কাটলো কাসেমকে। তাড়াতাড়ি পাড়ে উঠে এলো সে ডান হাতটায় অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে।

চীৎকার শুনে কেউ কেউ ছুটে এলো। লতিফসাহেব হেকিম আনালো মনিরপুর থেকে।

কিন্তু যন্ত্রণা কমলো না।

হেকিম বললে, সদরের হাসপাতালে পাঠাতে হবে, কিসে কামড় দিয়েছে বোঝা যাচ্ছে না।

মাস কয়েক পর সদরের হাসপাতাল থেকে যখন ফিরে এলো কাসেম, গাঁয়ের লোক দেখে চমকে উঠলো। কনুইয়ের ওপর থেকে ডান হাতটা একেবারে কাটা।

হাসিটা কান্নার মতো দেখালো কাসেমের। বললে, ডাক্তাররা বললেন, হাতটায় পচন ধরেছে, কেটে বাদ দিতে হবে। তা বাদ দিয়ে দিলেন তাঁরা।

কিন্তু কাসেম তখনো বুঝি জানতো না, সত্যিই একখানা হাত কাটা গেছে তার। তার যে রঙিন মন হাত বাড়িয়ে চাঁদ ধরতে চাইতো, সেই হাতটাই কাটা গেছে।

লতিফসাহেব বললে, একটা লোকের ভাত তো আর খরচ হবে না কাসেম, তুমি আমার বাড়িতেই থাকবে। চাঁদি তো নেই কাসেম, আমার ঘরটা আঁধার করে চলে গেছে চাঁদি, বাচ্চা করিমের ঘর আলো করেছে।

চলে গেছে চাঁদবানু? করিমসাহেবের ঘর আলো করতে চলে গেছে? ঝরঝর করে দু চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো কাসেমের। বাঁ হাতটা মাথায় রেখে বসে পড়লো সে।

লতিফসাহেব উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলে, কি হলো কাসেম?

—হয় নাই কিছু, বড় কাহিল লাগছে শরীরটা। উত্তর দিলো কাসেম। পরক্ষণেই উঠে দাঁড়িয়ে হনহন করে করিমসাহেবের বাড়ির দিকে চলে গেল। কাটাখালের কাছে পেঁছে বিস্ময়ের চোখে তাকিয়ে রইলো কাসেম।

রাতারাতি যেন ভোল পালটে গেছে বাড়িটার। ক'টা মাস হাসপাতালে পড়ে ছিলো কাসেম, আর তারই মধ্যে এত সব ঘটে গেল? চাঁদবানুর বিয়ে হয়ে গেল করিমসাহেবের সঙ্গে? তা হোক, করিমসাহেব না হোক, কোনো উঁচু ঘরে যে বিয়ে হবে চাঁদবানুর তা সে জানতো। কিন্তু এমন উঁচু ঘরে!

দূর থেকে তাকিয়ে রইলো কাসেম। দেখলে, ইটের দেয়াল উঠেছে, পাকা দালান হয়েছে করিমসাহেবের। দোতলায় একটা চিলেকোঠাও যেন হবে বলে মনে হলো। সামনের সার-কুঁড়ের পাশের জমিটুকুন ভরে আছে পালং শাকে। আর সারের গাদায় চরে বেড়াচ্ছে অগুন্তি মুর্গি। গোয়ালে চার-চারটে গাই।

সত্যি, এমন বাড়িতে যখন বিয়ে হয়েছে চাঁদবানুর, তখন সুখী হবে সে নিশ্চয়ই। তাই যেন হয়, মনে মনে কাসেম বললে, তাই যেন হয়। চাঁদবানুর জন্যে পীরের দরগায় মানত করে আসবে কাসেম।

কিন্তু চাঁদবানুকে একটুক্ষণের জন্যে দেখে আসতে ইচ্ছে হয় তার। ইচ্ছে হয় আগের মতোই গিয়ে তামাক চাইতে, দুটো কড়া কথা শুনে একমুখ হাসতে। অথচ তা বুঝি আর সম্ভব নয়। যে মেয়ে এ-পাড়া ও-পাড়া ছুটে বেড়াতো, জল-কাদায় নালাটা পার হবার সময় যার পায়ের গোছা চোখে পড়েছে কাসেমের কতবার, সে বোধ হয় এখন আর দেখাও দেবে না।

তবু করিমসাহেবের বারান্দায় গিয়ে হাজির হলো কাসেম। লতিফসাহেবের গোমস্তা আর আরো জনকয়েক লোক বসে বসে মোসায়েবি করছে তখন।

কাসেমকে দেখে সবাই চমকে চোখ তুললে কপালে।—কাসেম ভাই যে! হাতখানা কি হলো ভাই কাসেম?—কে যেন প্রশ্ন করলে।

বিষণ্ণ হাসি হাসলে কাসেম।—ডাক্তার কইলেন, হাতটায় পচন ধরেছে, তাই...

করিমসাহেবও দীর্ঘশ্বাস ফেললে। তারপর বললে, শোনো কাসেম, শোনো।

কাছে এগিয়ে গেল কাসেম।

করিমসাহেব বললে, আমি তো মাসের বিশটা দিনই সদরে থাকি, তা দালান তুললাম, ঘরটা দেখাশুনার লোক লাগবে। তুমি আমার কাছে থাকো কাসেম!

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। সেইজন্যেই তো এসেছিলো করিমসাহেবের কাছে। মনের মধ্যে গুনগুন করলো চাঁদবানু—চাঁদবানুর দেখা পায় না একবার? তা হলে দেখতে পেতো চাঁদবানুর চোখে জল টলমল করে কি না তার কাটা হাতখানা দেখে।

অনেকক্ষণ বসে রইলো কাসেম, তারপর তামাকের ছিলিমটা শেষ হতেই উঠে দাঁড়ালো।—

যাই করিমসাহেব, গাঁ-ঘরগুলো দেখে আসি একবার।

আনমনে করিমসাহেবের বাড়ির পর্দাঢাকা জানালাটার দিকে একবার চোরা চোখে তাকিয়েই মাঠের পথ ধরছিলো কাসেম।

হঠাৎ মেয়েলী গলার ডাক শুনে থমকে দাঁড়ালো।

—অ কাসেম!

চাঁদবানুর গলা না? ফিরে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকালো সে। দেখলে, খিড়কির দরজার পাশে বোরকায় মুখ ঢেকে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে।

কাছে এগিয়ে যেতেই মুখের পর্দাটা সরিয়ে ফেললো চাঁদবানু। তারপর কাসেমের কাটা হাতটার দিকে তাকিয়েই সশব্দে খিলখিল করে হেসে উঠলো।

—অ কাসেম, হাতটা তোমার কোন্ বিবিকে দিয়ে এলে?

কাসেম চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর ফিসফিস করে বললে, যে হাতে তোমার ফরমাশ খাটছি সে হাতে অন্য কারও ফরমাশ খাটবো না তাই...

খিলখিল করে আবার হাসলো চাঁদবানু। তারপর বললে, এই বেলা এইখানেই ভাত খাবে, গোসল করে এসো।

সারাটা গাঁ ঘুরে ঘুরে ফিরে এলো কাসেম। একটা কলার পাতা তুলে এনে ধানগোলার পাশে আগের মতোই বসলো।

চাঁদবানু জল ঢেলে দিলো ঘটিতে। গরম ভাত পড়লো পাতার ওপর। কি সুন্দর একটা গন্ধ নাকে এলো পাতায় গরম ভাত পড়তেই। ভাতের ওপরেই ডাল ঢেলে দিলো চাঁদবানু। আর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলে। আহা, বেচারী—বাঁ হাতে খেতে কষ্ট হচ্ছে কাসেমের। ডাল গড়িয়ে পড়ছে পাতা থেকে। ভাতের আড়া দিতে পারছে না।

চোখ ছলছল করে উঠলো চাঁদবানুর।

ছুটে পালালো সে সেখান থেকে। এ দৃশ্য বুঝি দেখা যায় না।

কাসেম কিন্তু মাথা হেঁট করে খাচ্ছে তো খাচ্ছে। বুঝতে পারলো না চাঁদবানু কেন চলে গেল।

খাওয়া শেষ করেও যখন চাঁদবানুর দেখা মিললো না, তখন ঘটির জলটা ঢকঢক করে শেষ করে পাতাটা মুড়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

করিমসাহেবের কাছেই তো কাজ পেয়েছে কাসেম, আজ না আসুক চাঁদবানু, আবার তো দেখা পাবে।

দেখা সত্যিই হতো, কথাও। চাঁদবানু কাছে এলেই যেন কথা আর শেষ হতে চাইতো না কাসেমের। আর চাঁদবানুও যেন ঐ সময়টুকুর জন্যেই হাসতে, কথা বলতে উন্মুখ হয়ে উঠতো। দুজনেই বুঝতে পারতো না, ওদের হাবভাব দেখে করিমসাহেবের অন্য বিবিদের মধ্যে কি ফিসফিসানি চলে।

যেদিন সদরে চলে যেতো করিমসাহেব, সেদিন বাড়ি পাহারা দেবার জন্যে বাইরের বারান্দাটায় শুতো কাসেম। আর দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতো চাঁদবানু। বাপ-মায়ের খোঁজ-খবর নিতো। যত দুঃখের কথা বলতো কাসেমের কাছে। অন্য বিবিরা কত দুর্ব্যবহার করে তার সঙ্গে, কি গালাগালি দেয় বড় বিবির মেয়ে, একদিনের তরেও বাপের কাছে কেন যেতে দেয় না করিমসাহেব।

তাদের কথা কেউ শুনছে কি না, আর কেউ দেখছে কি না তাদের, সে হুঁশ থাকতো না কারও। আর থাকবেই বা কেন? চাঁদবানুর বাপের কাছে জন খাটতো কাসেম। তা কাসেমের কাছে সুখদুঃখের কথা বলবে না তো, মন হালকা করবে কার কাছে সে?

করিমসাহেব কিন্তু অতশত বুঝলো না। চাঁদবানু নাকি কাসেমের কাছে আসতো রাত হলেই। বিবিরা নাকি নিজের চোখে দেখেছে সব।

রাগের মাথায় করিমসাহেব হাতের ছড়িটা বসিয়ে দিলে কাসেমের পিঠে। দুজন লোককে বললে, বারান্দায় খুঁটির সঙ্গে বেঁধে কাসেমের পিঠে চাবুক বসাতে।

সমস্ত পিঠে কালশিটে দাগ নিয়ে লতিফসাহেবের বাড়িতে ফিরে এলো কাসেম।

লতিফসাহেবকে দেখে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে। তারপর সব কথা খুলে বললে।

বললে, চাঁদবানু কোনো গুনা করে নাই সাহেব।

দোষ করুক বা না করুক, করিমসাহেব ভেবে দেখলো না। রাগের মাথায় মৌলবীকে সাক্ষী রেখে তালাক দিয়ে দিলো চাঁদবানুকে।

তালাক তালাক তালাক!

চাঁদবানু কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলো বাপের কাছে। লতিফসাহেবের ছোট বিবিও শুনে চোখ মুছলো আঁচলে।

গাঁয়ের মৌলবী বললো, তা তালাক দিয়েছে করিমসাহেব, ভালোই হয়েছে। মেয়ের তোমার নিকা দাও সদরের কোনো ভালো লোক দেখে। দু বছর ঘর করেছে করিমের, কোলে একটা বাচ্চাও দিতে পারেনি আহাম্মকটা।

লতিফসাহেব উত্তর দিলো, তালাকের ক'টা মাস যাক, চাঁদির মন হয় তো সদরের আব্দুল উকিলের ছেলের সাথেই নিকা দেবো।

চাঁদবানু কিন্তু কিছুতেই রাজী হলো না। না-হয় বেওয়ার মতোই থাকবে সে, তা বলে নিকা করবে না চাঁদবানু।

বাপ-মা বোঝাবার চেষ্টা করলো, কিন্তু বুঝতে চাইলে না সে।

কাসেমও ভয়ে ভয়ে বললে, আব্দুল উকিলের ছেলেটাকে দেখেছি আমি। বাপের মতোই বুদ্ধি ছেলেটার, তিন-তিনটা পাস দিয়েছে...

শুনে খিলখিল করে হেসে উঠলো চাঁদবানু।

কাসেমও বুঝলো না, কি চায় মেয়েটা। এমনি বিধবার মতো থাকবে নাকি চিরকাল? নাকি মনে মনে করিমসাহেবকেই ভালোবাসে ও! তাই হবে হয়তো!

হঠাৎ একদিন করিমসাহেবের কাছে গিয়ে হাজির হলো কাসেম। বললে, চাঁদবানুকে ঘরে ফিরিয়ে আনো করিমসাহেব, ও গুনা করে নাই কিছু। কু-লোকের কথা শুনে তালাক দিলে মিছামিছি।

করিমসাহেব দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, ঠিক কথা কাসেম, কু-লোকের কথা শুনে তোকেও শাস্তি দিলাম, নিজের বুকটাও কাঁদে এখন। চাঁদবানু, তুই জানিস না কাসেম, বড় ভালো মেয়ে চাঁদবানু।

—তবে ফিরায়ে আনো না কেন?

করিমসাহেব হাসলে।—মুসলমান ঘরের কানুনটা বড় কড়া কানুন কাসেম, ইচ্ছা হলেই তালাক দেওয়া বিবিকে ফিরায়ে আনা যায় না।

কাসেম বললে, মৌলবীকে বললে উপায় বাতলে দিবে।

করিমসাহেব ফিসফিস করে বললে, উপায় আছে কাসেম, তুই পারিস চাঁদিকে ফিরায়ে আনতে! তুই নিকা করে চাঁদিকে তালাক দে কাসেম। পঞ্চাশ টাকা দেবো তোরে, 'না' করিস না কাসেমভাই!

মৌলবীও সেই কথাই বললে।—ঘরের বিবি ঘরে ফিরবে, তুই বাদ সাধিস না কাসেম। লতিফসাহেবও রাজী হয়েছেন।

—আর চাঁদবানু? উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রশ্ন করলে কাসেম।

মৌলবী বললে, চাঁদবানু যে নিকা করলো না সে তো ঐ করিমের তরেই। নিকা হয়ে ফের তালাক না হলে করিমের ঘরে আসতে পাবে না চাঁদি, এ কথা মুসলমান ঘরের কানুন, তাই রাজী হয়েছে চাঁদি।

কাসেম বললে, তবে আমিও রাজী হইলাম, কিন্তু তালাক বিক্রির টাকা দিবেন না আমারে।

টাকাটা তো বড় কথা নয়। চাঁদিকে ছোটবেলা থেকে দেখে আসছে কাসেম, তার দোষেই তালাক দিয়েছিলো করিমসাহেব, ঘরের বিবি ঘরে ফিরবে, তার জন্যে টাকা নেবে কেন কাসেম।

চাঁদবানুকে সব কথা খুলে বললে লতিফসাহেব। জিজ্ঞেস করলে, তোর মতটা কি চাঁদি! রাজী আছিস তো? লজ্জার হাসি হেসে মাথা নাড়লো চাঁদবানু।

হাতকাটা কাসেমের সঙ্গেই নিকা হয়ে গেল চাঁদবানুর।

সত্যি, এমন দিনটার জন্যে কত স্বপ্নই না দেখেছে কাসেম। কত রাত না ঘুমিয়ে কাটিয়েছে শুধু আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে। অথচ, সত্যিই যখন তার ঘরে এলো

চাঁদবানু, কাসেমের মনটা হু-হু করে কেঁদে উঠলো। মনে হলো গাঁ-সুদ্ধ লোক যেন হাসছে তাকে দেখে। বলছে, কাসেম তালাক বিক্রি করেছে। কাসেমটা চশমখোর, টাকার লোভে তালাক বিক্রি করেছে করিমসাহেবকে!

চাঁদবানুর সঙ্গে মুখ তুলে কথা বলতেও সাহস হয়নি। চাঁদবানুও হয়তো হাসছে মনে মনে, কাসেমের নসীব দেখে।

নিজের মনেই নানা কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলো কাসেম। হঠাৎ মাঝরাত্রে ঘুম ভেঙে গেল তার। চমকে উঠলো কাসেম। পায়ের ওপর কি ওটা, বেড়াল নাকি?

উঁহু। পায়ের ওপর মুখ গুঁজে পড়ে আছে চাঁদবানু, আর চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে যেন কাসেমের পায়ের ওপর।

ধীরে ধীরে উঠে বসলো কাসেম। ডাকলে, চাঁদি, অ চাঁদি!

সশব্দে ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠলো চাঁদবানু।

তার মুখটা এক হাতে তুলে ধরবার চেষ্টা করলে কাসেম। বললে, কি হলো চাঁদি, কাঁদছো কেন?

জলে-ভাসা এক জোড়া চোখ তুলে কাসেমের মুখের দিকে তাকালো চাঁদবানু। বললে, আমাকে তালাক দিবে না কও!

দীর্ঘশ্বাস ফেললে কাসেম। বললে, না চাঁদবানু, দিব না তালাক, তালাক দিব না তোমারে। বলে চাঁদবানুকে বুকের কাছে টেনে নিলো কাসেম। একটাই তো হাত, চাঁদবানু নিজেই যেন তার বুকের কাছে সরে এলো। কাসেম কাটা হাতটা রাখলো চাঁদবানুর মাথায়। বললে, কিন্তু নিমকহারাম কইবে সকলে, তুমার আব্বাজানের কাছেও নিমকহারাম হইতে কয়ো না চাঁদি।

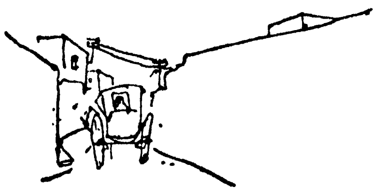
বিস্ময়ের চোখ তুলে তাকালে চাঁদবানু। অবোধ্য ঠেকলো যেন কাসেমের কথাগুলো! ও কি কোনো দিন বোঝেনি কাসেমের গোপন স্বপ্ন, নাকি ও নিজেই স্বপ্ন দেখেনি!

তবু কাসেম বললে, পাটোয়ারের বিবি হবার রূপ তুমার, আমার ভাঙা ঘরে কি চাঁদরে ধরা যায়। তালাক আমারে দিতেই হবে, তুমার ভালোর জন্যেই দিতে হবে চাঁদি।

তালাক, তালাক, তালাক।

তা হোক, গলার হার গলায় পরে খুলে দিয়েছে কাসেম। সেই স্বপ্ন তো সবচেয়ে মিঠে, কি হবে তাকে তার দেয়ালের বাক্সে ভরে রেখে।

[১৩৬২



যুবতী-ধরম

এক-একজনের চেহারার মধ্যে এমন কিছু থাকে যার ফলে একবার দেখলেই মনে দাগ কাটে, ভোলা যায় না। অন্ধকারের মধ্যেও তাই চিনতে পারলাম।

রাত তখন ঘন হয়ে আসছে। পার্কে যারা সান্ধ্য ভ্রমণের নামে চিনেবাদাম চিবোতে আসে তারা তখন ফিরতির মুখে। যুবকমন যাদের দেখে ঈর্ষা বা উল্লাস প্রকাশ করে সেইসব সুখী

দম্পতিরাও তখন পরিবারের অনুপস্থিত আত্মীয়স্বজনের সম্বন্ধে যাবতীয় দ্বিধা দ্বেষ দ্বন্দ্ব উদ্গিরণ করে পুনরায় ধোঁয়াটে মন নিয়ে বাসায় ফিরে চলেছে। এ সময়টায় পার্কের ঘাসে কিংবা কাঠের বেঞ্চিতে লোকজন খুবই কম দেখা যায়।

বেঞ্চিটা দূর থেকে মনে হয়েছিলো খালি আছে। কাছে আসতেই টের পেলাম কে যেন বসে রয়েছে। পিঠ দেবার জায়গাটায় হাত রেখে এবং হাতের ওপর মাথা রেখে যে বসে ছিলো, প্রথমটা মনে হয়েছিলো সে বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে।

ধীরে ধীরে তাই এক পাশে, একটু দূরত্ব রেখেই বসে পড়লাম। সমস্ত দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই পেয়ে পরম শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে লোকটা। আহা, ঘুমোক! পাছে ঘুম ভেঙে যায় তার, এই ভয়ে, দেশলাই জ্বালবো কি না সিগারেট ধরাবার জন্যে, ভাবছিলাম।

হঠাৎ চমকে উঠলাম।

মনে হলো, ভদ্রলোক যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। কান পেতে শুনলাম। হ্যাঁ, কান্না। নিশ্বাসের শব্দে কেমন যেন কান্নার আভাস।

চুপ করে বসে রইলাম। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো, উঠে পালাতে পারলেই যেন ভালো হয়। একবার আড়চোখে তাকালাম তাঁর দিকে, আর সঙ্গে সঙ্গে মুখ তুলে আমাকে একবার দেখে নিয়েই আবার হাতে মুখ গুঁজলেন ভদ্রলোক।

বলেছি না, এক-একজনের চেহারার মধ্যে এমন কিছু থাকে যে, একবার দেখলেই মনে দাগ কাটে, অন্ধকারেও চিনতে অসুবিধে হয় না।

মুখ তুলে মুহূর্তের জন্যে তিনি তাকালেন আমার দিকে, আর সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ে গেল সেদিনের দৃশ্যটা।

কেমন যেন রহস্য-রহস্য ঠেকলো। প্রায় ছ ফুট লম্বা বলিষ্ঠ চেহারা, বয়সে প্রৌঢ়ই বলা চলে, বসন্তের দাগ থাকলেও সুশ্রী বলা যায় এমন ধরনের মুখশ্রী। কিন্তু এমন স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ চেহারার মানুষ যে কাঁদতে পারে, বিশেষ করে পার্কের নির্জন অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদবে, তা কোনো দিন কল্পনাও করিনি। বরং প্রথম যেদিন দেখেছিলাম, মনে হয়েছিলো ওঁর মতো সুখী মানুষ বুঝি ভূভারতে নেই।

দুপুরবেলায় আপিস থেকে বেরিয়েছি এক বন্ধুর সঙ্গে, কাছেই ইস্কুলটায় বন্ধুপুত্রের জন্যে একটা সীটের ব্যবস্থা করার চেষ্টায়। ইস্কুলে তখন বোধ হয় টিফিনের ঘণ্টা পড়েছে। হইহল্লা ছুটোছুটি করছে ছেলেগুলো সামনের রাস্তায়। হঠাৎ একখানা গাড়ি শব্দ করে এসে থামলো।

সঙ্গে সঙ্গে একদল বাচ্চা ছেলে ছুটে এলো গাড়িটার কাছে।

ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, স্টিয়ারিং ছেড়ে গাড়ি থেকে নামলেন ভদ্রলোক। দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা, মুখে বসন্তের দাগ, কিন্তু তার মধ্যে কোথায় যেন অফুরন্ত হাসি লুকিয়ে ছিলো।

গাড়ি থেকে নেমেই পকেট থেকে রুমাল বের করে কপাল মুছলেন তিনি, তারপর রুমালটা পাদানির ওপর বিছিয়ে বসে পড়লেন। একরাশ ছেলে তখন ঘিরে ধরেছে তাঁকে।

তিনিও হাসতে হাসতে কি যেন বলছেন।

কাজ সেরে ইস্কুলের আপিসঘর থেকে যখন বেরিয়ে এলাম, তখনো তিনি গল্প করতে করতে বাঁ হাতের কৌটো থেকে টফি বের করে বিলি করছেন।

থামতে হলো। কোলকাতা শহরে এমন দৃশ্য তো দেখা যায় না। পকেটের পয়সায় টফি কিনে অপরের ছেলেকে খুশী করছেন—এ কেমন ধারার নির্বুদ্ধিতা।

ভদ্রলোক ততক্ষণে ম্যাজিক দেখাতে শুরু করেছেন। হাতের তাস উধাও করা, টফির টিনটা তখনই খালি, তখনই টাকায় ভরতি, রুমালের রঙ লাল থেকে সবুজ, সবুজ থেকে সাদা—এমনি নানান কলাকৌশল দেখিয়ে একসময় উঠলেন তিনি।

যেমন এসেছিলেন তেমনি চলে গেলেন টিফিন-শেষের ঘণ্টা পড়তেই। কিন্তু ছেলের দল তখনো একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো, যতক্ষণ না গাড়িটা সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যায়।

সেদিন সত্যিই রহস্যজনক মনে হয়েছিলো তাঁর ব্যবহার। মনে হয়েছিলো মানুষ খুব বেশী সুখ এবং সচ্ছলতার মধ্যে বোধ হয় স্বার্থশূন্য হয়ে অপরকেও খুশী করতে চায়।

তখন তো জানতাম না।

জানতাম না, সেই মানুষ কিনা অন্ধকারে পার্কের বেঞ্চিতে বসে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

অথচ কেন এই নিঃশব্দ কান্না তার হদিস খুঁজে পেলাম না।

তবু চুপচাপ বসে রইলাম। উঠে যেতেও মন চাইলো না।

খানিক পরেই মুখ তুলে সোজা হয়ে বসলেন ভদ্রলোক। সহজ হয়ে। আমার দিকে দু-একবার ফিরে তাকিয়ে বোধ হয় বোঝবার চেষ্টা করলেন, তাঁর গোপন কান্না আমার কাছে প্রকাশ হয়ে পড়েছে কি না।

পার্কে বেড়াতে এসে কত দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা হয়তো বসে থেকেছি কোনো অপরিচিতের পাশে। কিন্তু তার সঙ্গে আলাপ করতে, কথা বলতে ইচ্ছে হয়নি কোনো দিন। এটা কোলকাতা শহর। একই বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসার অধিকার আছে, পাশের লোকের শান্তি ভঙ্গ করে একমনে পাগলের প্রলাপ বকে গেলেও আপত্তি করা যাবে না, কিন্তু অপরিচিত লোকটির সঙ্গে কথা বলতে গেলেই তা অভদ্রতা!

পার্কটা তখন রীতিমতো নির্জন হয়ে উঠেছে। সামনের গাছটার ডালে পাখা ঝটপট করছে কয়েকটা পাখি। আর পার্কের চারপাশের গ্যাসবাতিগুলোও কেমন যেন ম্লান বিষণ্ণ। শুধু ঠাণ্ডা বাতাস আসছিলো থেকে থেকে।

উঠবো কি না ভাবছিলাম।

হঠাৎ ভদ্রলোক হাসলেন।

—আশ্চর্য হয়েছেন, তাই না?

চমকে ফিরে তাকালাম।

বললাম, না, না। আশ্চর্য হবো কেন?

উত্তর এলো, দোষ নেই আপনার। হঠাৎ পার্কে বসে বসে কাউকে কাঁদতে দেখলে আমিও হতাম।

সান্ত্বনা দেবার স্বরে বললাম, সকলের জীবনেই দুঃখ আছে।

হাসলেন ভদ্রলোক। অন্ধকারেও মনে হলো, সে যেন হাসি নয়, কান্নারই নামান্তর। বললেন, ভগবান দুঃখ দিলে সহ্য করা যায়, কিন্তু...কথা শেষ হলো না।

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক।

—আরেকদিন দেখা হবে।

একটা রহস্যের ছায়া যেন লম্বা লম্বা পা তুলে অন্ধকার থেকে আলোর ভিড়ে মিশে গেল। মনের মধ্যে জেগে রইলো একটা দুর্বোধ্য প্রশ্ন। সে প্রশ্নের উত্তর না জেনে শান্তি নেই যেন, স্বস্তি নেই। ভেবেছিলাম, আর বুঝি দেখা হবে না কোনো দিন। জানতে পারবো না, কি এমন দুঃখ গুমরে মরে এই বলিষ্ঠ শরীরের গোপন মনে।

কে জানতো টফি বিলি করার অভ্যাস তাঁর নিত্যদিনের। কে জানতো আবার দেখা হবে।

বন্ধুর ছেলেটিকে সেদিন বৃন্দাবন মিত্তিরের গলির ইস্কুলে ভরতি করতে গিয়ে দেখা হয়ে গেল!

গাড়িটা ফটকের সামনে এসে দাঁড়াতেই নমস্কার করে বললাম, কেমন আছেন? চিনতে পারছেন?

ভদ্রলোক মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর মৃদু হেসে বললেন, মাপ করবেন, ঠিক মনে পড়ছে না।

বললাম, পার্কের বেঞ্চিতে আলাপ হয়েছিলো...

দু হাত বাড়িয়ে আমার হাতটা মুঠো করে ধরলেন ভদ্রলোক।

—আপনি? আপনি যে কি উপকার করেছেন আমার...

উপকারটা যে কি বুঝতে পারলাম না। চুপ করে রইলাম। সেদিনও যারা ভিড় করে এলো, তাদের হাতে টফি দেওয়া শেষ করে বললেন, আজ আমার কাজ আছে, আজ আর ম্যাজিক দেখানো হবে না। কাল দেখাবো, কেমন?

বলেই আমাকে টেনে তুললেন গাড়িতে।

সার্কুলার রোডের ওপর একখানা বিরাট বাড়ির গাড়িবারান্দায় এসে নামলাম। দরজা

খোলাই ছিলো। তোয়ালে-কাঁধে বেয়ারাটা বসবার ঘর খুলে দিতে গেল।

ভদ্রলোক বললেন, না রতন, ওপরেই বসবো।

মারবেলের সিঁড়ি বেয়ে ওপরের শোবার ঘরে উঠে এলাম তাঁর পিছনে পিছনে।

ঘরে ঢুকেই দেয়ালের ছবিটার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। ছ-সাত বছরের ছোট্ট একটি ছেলে আর ন-দশ বছরের একটি মেয়ে। ভাইবোনে গলা জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দেয়ালজোড়া এত বড় অয়েল পেণ্টিংটা দেখেই কেমন সন্দেহ হলো।

মনে হলো, ছেলেমেয়ে দুটির মৃত্যুই হয়তো ভদ্রলোকের দুঃখের মূল। আর সেজন্যেই হয়তো বৃন্দাবন মিত্তিরের গলিতে ছুটে যান প্রতি দিন। শিশুর ভিড়ে নিজের দুঃখ ভোলার চেষ্টা করেন হয়তো।

একটা চেয়ার টেনে বসতে বললেন।

বসলাম। তারপর দেয়ালের চারপাশে তাকিয়ে আরেকখানা ছবি খুঁজলাম। কিন্তু পেলাম না।

ভদ্রলোক হঠাৎ অয়েল পেণ্টিংটার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

বললেন, আমার ছেলে আর মেয়ে। আচ্ছা, এদের দেখেছেন কোথাও?

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম, সে কি, হারিয়ে গেছে নাকি?

বিষণ্ণ হাসি হাসলেন ভদ্রলোক।

বললেন, না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আপনি যে কি উপকার করেছেন আমার!

অপ্রতিভ হয়ে বললাম, বারবার এ কথা কেন বলছেন, কোনো উপকার তো আমি করিনি।

—করেছেন। আপনি জানেন না কি দুঃখের বোঝা বয়ে চলেছি আমি। আপনি সেদিন সান্ত্বনা না দিলে...

খানিক থেমে বললেন, সেদিন আমি আত্মহত্যা করতাম, আত্মহত্যার জন্যেই তৈরি করেছিলাম নিজেকে। সত্যি, এক-একসময় মানুষ যে কত বোকা হয়ে যায়...

চুপ করে রইলাম। এ কথার প্রসঙ্গে বলবার মতো কথা খুঁজে পেলাম না।

দেরাজ থেকে একটা শিশি বের করলেন ভদ্রলোক। দেখিয়ে বললেন, আত্মহত্যাই করতাম, কিন্তু আপনার কথা শুনে জীবনের ওপর মায়া হলো, ভাবলাম...

দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। আয়নার টেবিলের দেরাজ খুলে অ্যালবাম নিয়ে এসে বসলেন।

—এই—আচ্ছা, একে দেখেছেন কোথাও? দেখেননি কখনো?

অ্যালবামটা হাতে নিয়ে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইলাম ছবিটার দিকে।

অপরূপ এক সুন্দরীর ফটোগ্রাফ। কোলে একটি ছোট্ট শিশু, আর হাঁটু জড়িয়ে ধরে আছে একটি ছোট্ট মেয়ে, এমন রূপময়ী মাতৃমূর্তি চোখে পড়েনি কখনো। শিশির-ভেজা নিষ্কলঙ্ক একটি পদ্মের মতো রূপ।

বলে দেওয়ার প্রয়োজন হলো না। বুঝলাম, ইনিই ভদ্রলোকের স্ত্রী।

অ্যালবামটা নিয়ে আবার পাতা ওলটাতে শুরু করলেন ভদ্রলোক। তারপর বললেন, আমার স্ত্রীর ছবি, আমার ছেলেমেয়ে।

বলে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

ভাবলাম, স্ত্রী হয়তো মারা গেছেন, তাই এমন হয়ে গেছেন উনি শোকে দুঃখে।

হঠাৎ মৃদু হাসি দেখা দিলো ওঁর মুখে। কান্নার মতোই দেখালো হাসিটা।

বললেন, মেয়েদের মন...আপনি জানেন না, বারো বছর একসঙ্গে থেকেও কোনো দিন বুঝতে পারিনি ও অসুখী ছিলো। হঠাৎ একদিন বিকেলে কাজ থেকে ফিরে এলাম ক্লান্ত শরীর নিয়ে। আসবার সময় দুখানা সিনেমার টিকিট কিনে এনেছিলাম। কিন্তু ফিরে এসে দেখলাম, সমস্ত বাড়ি ফাঁকা। এক টুকরো চিঠিও রেখে যায়নি সে। ভাবতে পারেন আপনি? বারো বছর ধরে যাকে ভালোবেসে এসেছি, বারো বছরের মধ্যে একদিনের জন্যে যার ভালোবাসায় সন্দেহ করার কোনো কিছু খুঁজে পাইনি, হঠাৎ এক সন্ধ্যায় ফিরে এসে যদি শোনেন সে চলে গেছে...

বলতে বলতে চোখ ছলছল করে উঠলো ভদ্রলোকের। ঘাম মোছার ভান করে রুমালে চোখ মুছলেন।

—প্রথমে ভেবেছিলাম, হয়তো বেড়াতে গেছে। কিংবা দোকানে কোনো জিনিস কিনতে। চাকর দরোয়ান কেউ কিছু বলতে পারলো না। অপেক্ষা করে রইলাম সে রাত্রি। পরের দিন আত্মীয়স্বজন চেনাজানা সকলের কাছে চিঠি লিখলাম। তারপর, তারপর ভয় হলো, ভাবলাম ...হ্যাঁ, পুলিসেও খবর দিলাম শেষকালে। হাসলেন ভদ্রলোক।

উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করলাম, খোঁজ পেলেন না?

—না। ছ মাস পরে একখানা চিঠি পেলাম শুধু। তিন লাইনের চিঠি। লিখেছে, 'যাকে ভালোবাসতাম, ভালোবাসি, তার সঙ্গেই চলে এসেছি। আমাকে জোর করে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার বৃথা চেষ্টায় নিজেকে কষ্ট দিও না।'

আহত বোধ করলাম। সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললাম, সত্যি, মেয়েদের মন...

হাসলেন ভদ্রলোক। বিষণ্ণ হাসি। বললেন, দুঃখ তার জন্যে নয়। স্ত্রীর দুঃখ আমি ভুলতে পেরেছি। কিন্তু আমার ছেলেমেয়ে দুটি...

দু হাতের ওপর মাথা গুঁজে সশব্দে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন ভদ্রলোক। আর সে কান্না দেখে আমার নিজের চোখও যেন ছলছল করে উঠলো। বুকের ভেতর কেমন একটা দুঃসহ ব্যথা অনুভব করলাম।

চুপ করে বসে রইলাম অনেকক্ষণ। তারপর একসময় মাথা তুললেন ভদ্রলোক। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, সেদিন কেন কেঁদেছিলাম জানেন? যে স্ত্রী ঘর ছেড়ে চলে গেছে তার দুঃখে নয়, ছেলেমেয়ের জন্যেও নয়...

—তবে? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম।

বিষণ্ণ হাসি হাসলেন ভদ্রলোক।

বললেন, সেদিনই প্রথম খোঁজ পেয়েছিলাম ওদের। জানতে পেরেছিলাম আমার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গেই চলে গেছে। খোঁজ পেয়েই ছুটতে ছুটতে গেলাম তার কাছে।

—তারপর?

—বললাম, আমি আর কিছু চাই না, শুধু ছেলেমেয়ে দুটিকে দাও। ওরা আমার সন্তান, আমি মানুষ করবো ওদের।

ভদ্রলোক চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ বললেন, যে স্ত্রীকে বারো বছর ধরে ভালোবেসে এসেছি, যার ভালোবাসায় কোনো দিন সন্দেহ করিনি, তার চোখে সেদিন যে ঘৃণার দৃষ্টি দেখলাম, সে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। ও ভাবলে, বুঝি ওকেই ফিরিয়ে আনতে চাই। তাই পাগলের মতো চীৎকার করে উঠলো, বললে, 'আইনের জোরে নিয়ে যেতে চাও আমাকে? কিন্তু জেনে রাখো, তা তুমি পারবে না। তার আগেই আত্মহত্যা করবো আমি, তবু তোমার কাছে ফিরে যেতে পারবো না।' হাসলাম তার কথা শুনে, ছেলে-মেয়ে দুটোকে হাত বাড়িয়ে কোলে নিতে গেলাম, তারা ভয়ে মায়ের আঁচল জড়িয়ে রইলো, কিছুতেই আসতে চাইলো না। আপনিই বলুন, তারপরও আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হবে না?

উত্তর দিতে পারলাম না। কি উত্তর দেবো এ কথার! কি সান্ত্বনা দেবো দীর্ঘশ্বাসের।

ভদ্রলোক হাসলেন, বোধ হয় আমার মুখের ভাব লক্ষ করেই।

বললেন, আপনি যেচে সেদিন সান্ত্বনা না দিলে হয়তো আত্মহত্যাই করতাম। কিন্তু তার-পরই মনে হলো, এভাবে নিজেকে ধ্বংস করে লাভ নেই। প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি জেগে উঠলো মনে। ভাবলাম, ও যেমন আমার জীবন নষ্ট করেছে, ওকেও তেমনি সুখী হতে দেবো না। সেদিন আমার স্ত্রীকে সামনে পেলে আমি খুন করতাম। এমন কি, ছেলেমেয়ে দুটোকেও...

বললাম, খুন করে বসলেও দোষ দিতাম না আপনার।

হাসলেন ভদ্রলোক। বললেন, কিন্তু তার আর প্রয়োজন হবে না।

—প্রয়োজন হবে না? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম।

ভদ্রলোক একটা সিগারেট ধরালেন। পরক্ষণেই হঠাৎ সচেতন হয়ে আমার দিক সিগা-রেটের টিনটা এগিয়ে দিলেন।

তারপর ধীরে ধীরে বললেন, বন্ধুদের পরামর্শে কোর্টে মামলা করলাম। বললাম, স্ত্রীকে

ফিরিয়ে নিতে চাই না, চাই শুধু আমার ছেলেমেয়ে দুটিকে। আইন আমার পক্ষে, ওরাও জানে আমার ছেলে আর মেয়েকে আমি ফিরে পাবো। তাই—

পকেট হাতড়াতে শুরু করলেন ভদ্রলোক। এক টুকরো কাগজ বের করলেন।

হাসতে হাসতে বললেন, সতীসাধ্বী স্ত্রীর চিঠি। লিখেছে, ছেলেমেয়েকে ছেড়ে থাকতে পারবে না ও! লিখেছে, ওর সব দোষ ক্ষমা করে আমি যেন ওকেও ফিরিয়ে নিই। বলে হো-হো করে হেসে উঠলেন।

বললাম, মুহূর্তের ভুলের জন্যে তাঁর সমস্ত জীবনটা নষ্ট করবেন না। তাঁকে ফিরিয়ে আনুন আপনি।

ভদ্রলোক হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, না, কক্ষনো না। তা হতে পারে না। ওকে আমি শাস্তি দিতে চাই, সমস্ত জীবন তার দুঃখময় করে তুলতে চাই আমি। আপনি জানেন না, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ভোলা যায়, প্রেম-ভালোবাসা মুছে ফেলা যায় মন থেকে, কিন্তু সন্তানস্নেহ যে কি, না হারালে বুঝবেন না। তাকে শিক্ষা দিতে চাই...

বলে স্থির হয়ে বসলেন ভদ্রলোক। তারপর স্ত্রীর চিঠিটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললেন।

আর একটা নিঃশব্দ নিশ্চুপ অস্বস্তির মধ্যে বসে থাকতে হলো আমাকে। তারপর এক-সময় বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

আসবার সময় শুধু বললেন, আবার আসবেন।

বললাম, আসবো।

কিন্তু মনে মনে জানতাম, এ অস্বস্তিকর পরিবেশে স্বেচ্ছায় আর কোনো দিনই আসবো না।

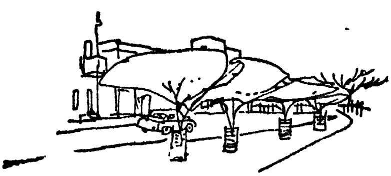
যাইওনি আর কোনো দিন।

জানি না তারপর কি ঘটেছে। জানি না স্ত্রীকে ফিরিয়ে এনেছেন কি না। কিন্তু এটুকু জানি, ছেলে আর মেয়েকে ছেড়ে থাকতে পারবেন না তাঁর স্ত্রী। এ অসহ্য অতৃপ্তির চেয়ে হয়তো বা আত্মহত্যাই বরণ করবেন।

যে যাই বলুক, যৌবনের ক্ষণিক মোহে পথ হারালেও যৌবনের ধর্ম হলো সন্তানস্নেহ।

বহুবার ইচ্ছে হয়েছে এই বিচিত্র ভদ্রলোকটির জীবন নিয়ে গল্প লিখতে। সামান্য একটু কল্পনার রঙ মেশালে হয়তো ভালো গল্পও একটা লেখা যায়। কিন্তু অসত্যের কালিমা মাখিয়ে তাঁর চরিত্রকে বিকৃত করতে ইচ্ছে হয় না, সাহিত্যের খাতিরেও না।

[১৩৬২



নকলচি

বর্ধমান-কাটোয়া ছোট লাইনের মাঝখানে মাঝারি গোছের স্টেশন বল্‌গনা। সেখান থেকে কাঁদর পার হয়ে গোবিন্দপুর বেণুগঞ্জের দক্ষিণে যে ঊর্ধ্ববাস পুকুরটা, তারও পশ্চিমে নকলচির কবর। দু বছর আগেও উঁচু ঢিবিটা দেখে কবর মনে হতো, দু বছর পরে হয়তো ক্ষেতের আল বলে ভুল হবে।

কাসেম আলিকে আমিও দেখেছি। কাসেম আলির গল্প শুনেছি তার চেয়েও বেশী।

ষাট বছরের বুড়ো, একটা চোখ কানা। তবু দু চোখেই মোটা মোটা কাচের চশমা পরতো কাসেম আলি, ফ্রেমটা দু কানে বাঁধা থাকতো কালো সুতোয়। পরনে ময়লা তেলচিটে লুঙ্গি; গায়ে একটা নোংরা ফতুয়া; হাতে লাঠির বাঁটে বাঁধা থাকতো একটা পিতলের দোয়াত, শোলা দিয়ে মুখটা বন্ধ করা। দু কানে দুটো খাগের কলম, আর লাঠির বাঁটে দোয়াত দুলতে দেখলেই দূর থেকেও লোকে বুঝতে পারতো কাসেম আলি আসছে।

বার-বাড়ির বৈঠকখানায় বসে ছিলাম। ধান ঝাড়াই হচ্ছিলো সামনের উঠোনে।

টুকটুক টুকটুক করে সামনে এসে দাঁড়ালো কাসেম আলি।

—সেলাম ছোটবাবু।

প্রতিসেলাম জানিয়ে বললাম, কি চাই?

হাসলো কাসেম আলি।—চিনতে পারলেন না হুজুর? আমি নকলচি কাসেম আলি।

—ও। বলেই নিজের কাজে মন দিলাম।

বিদেশ-বিভূঁই থেকে এসেছি বহু দিন বাদে, জমিজমার একটা পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করে দিয়েই চলে যাবো, এই ভেবে। সুতরাং সময় কোথায় সময় নষ্ট করার।

কাসেম আলি একটু উসখুস করলো। তারপর বললে, কিছু কাজ'বায়না দেবেন না ছোট-বাবু? নথিপত্র, দলিল-নকশা, পুঁথিপরচা কিছু নকল করাবেন না হুজুর?

মাথা নেড়ে বললাম, না। কিন্তু এখনো নকল করতে পারো নাকি মিঞাসাহেব, চোখে দেখতে পাও?

হাড়-জিরজির কাসেম আলির দন্তহীন মাড়ি দুটো হেসে উঠলো, দিয়েই দেখুন না ছোট-বাবু, বড় কলমে বলেন বড়, ছোট কলমে বলেন ছোট কলমে।

বড় কলম হলো পুঁথিপত্রে ঠিক যেমনটি লেখা আছে হুবহু সেই হস্তাক্ষরের নকল, আর ছোট কলম হলো যে বায়না দেয় তার হাতের লেখা। কথাটা যে মিথ্যে নয় তা ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি।

নকল করা কিন্তু কাজ ছিলো না কাসেম আলির। কম বয়সে গান লিখতো, ছড়া বানাতে পারতো মুখে মুখে। কবিগানের আখড়ায় কাসেম আলি এসে পেঁৗছেছে শুনলে ভয়ে পিছু হটতো সবাই। দূর দূর গ্রাম থেকে যাত্রার দল এসে গান লিখিয়ে নিয়ে যেতো, পাঁচালি, শতনাম, আরও কত কি। হিন্দুদের দেবদেবীর নাম-কীর্তনের পুঁথি লিখে দিতো কাসেম আলি।

কিন্তু কাল হলো তার এই হিন্দুয়ানি।

মুসলমানরা বললে, কাসেম আলি কাফের হয়ে গেছে। রাধাকৃষ্ণ, লক্ষ্মীনারায়ণ, সাবিত্রী-সত্যবানের পুঁথি লেখে ও। লয়লা মজনু, শিরিন ফরহাদের প্রেমোপাখ্যানও যে ও লিখেছে, পীর দরগার গান, 'আল্লার কৃপা মুসলমান'—এসবও যে তার কলম থেকেই বেরিয়েছে, সে কথায় কেউ কান দিলো কি না-দিলো সে দুশ্চিন্তা ছিলো না কাসেম আলির। ওর তখন ভরা বয়েস। চোখে রঙ, মনে স্বপ্ন।

পীরের দরগার সামনেই ছিলো একটা আমবাগান। সেই আমবাগানে বসে বসে সন্ধ্যের সময় গান গাইতো কাসেম আলি, একতারা বাজিয়ে। আর তার গান শোনবার জন্যে ভিড় করে আসতো গাঁয়ের মুসলমান মেয়েরা। তাদেরই মধ্যে একজন, মৌলবীসাহেবের মেয়ে হামিদা-বানু। হামিদাবানু যেদিন না আসতো, গান জমতো না ওর।

শেষে একদিন মৌলবীসাহেবকে বলেই ফেললো কাসেম আলি। বললে, হামিদাবানুকে সে বিয়ে করতে চায়।

মৌলবীসাহেব রাজী হলো, কিন্তু শর্ত হলো বিয়ের কাবান লিখে দিতে হবে, জীবনে কখনো হিন্দুর দেবদেবীর গান বাঁধতে পাবে না সে, গাইতে পাবে না সে গান। কাসেম আলি তখন হামিদাবানুর প্রেমে পাগল। কাবান লিখে দিলে ও।

কিন্তু প্রতিজ্ঞা করা সোজা, পেট চালানো সহজ নয়। চারপাশে হিন্দুর গাঁ, 'আল্লার কৃপা মুসলমান' লিখলে তো পয়সা দেবে না তারা।

অগত্যা গান বাঁধার কাজ ছেড়ে নকলচির কাজ শুরু করলো কাসেম আলি। কাবান লিখেছে

সে হিন্দুর গান বাঁধবে না, গাইবে না। নকল করে দেবে না, এমন প্রতিজ্ঞা তো করেনি।

নথিপত্র, দলিল-নকশা, পুঁথি-পাঠ নকল করে দেওয়ার কাজ করতে শুরু করলো কাসেম আলি। নকল করতে করতে নকলচি হিসাবে নাম ছড়িয়ে পড়লো চতুর্দিকে। বড় কলম আর ছোট কলম যে যেমনটি চায়। কেউ চায় পুঁথির মতো অবিকল হাতের লেখা, কেউ বায়না দেয়, এমন নকল হবে যেন মনে হয় আমারই লেখা।

দু কানে দুটো খাগের কলম, হাতে লাঠির বাঁটের দড়িতে বাঁধা পিতলের দোয়াত ঝুলিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায় কাসেম আলি। কার বাড়িতে কি পুঁথি আছে খোঁজ করে নকল করে আনে। আর পুঁথি তো কেউ বাক্স-প্যাঁটরায় তুলে রাখে না, পুঁথি হলো স্বয়ং ভগবানের বাণী। কে কবে কোথায় স্বপ্নে পেয়েছে, পুঁথিতে কি লেখা আছে তাও পড়ে দেখেনি। পুজোর ঘরে রুপোর সিংহাসনে সাজিয়ে রেখেছে, সিঁদুর লেপেছে তার গায়ে, চন্দনের ফোঁটা পরিয়েছে, আর পুজো করেছে পুঁথিকে দেবতা ভেবে।

সুতরাং সে পুঁথিকে ছুঁতে দেবে কেন তারা।

অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর কেউ হয়তো দয়া করে পাতার পর পাতা খুলে দেখিয়েছে দু গজ দূরে থেকে। আর তাই দেখে নকল করেছে কাসেম আলি। আর এই পুঁথি নকল করতে করতে নেশা ধরে গেছে তার। বায়না থাক বা না থাক, গ্রামে গ্রামে ঘুরে প্রতিটি পুঁথি নকল না করে যেন শান্তি নেই।

এমনিভাবেই কাটছিলো বছরের পর বছর।

মাঝে মাঝে হাসি পেয়েছে কাসেমের, হিন্দুদের হিন্দুয়ানি দেখে। অনেক অনুনয়-বিনয় করে যখন কেউ দু গজ দূরে থেকে পুঁথি খুলে দেখিয়েছে, কিংবা পড়ে শুনিয়েছে, তখন হঠাৎ কোনো কোনো দিন চিৎকার করে উঠেছে কাসেম, এ পুঁথি তো আমিই বেঁধেছি কর্তা। আমাকেই ছুঁতে দেবেননি?

সত্যিই তাই। পয়ার ছন্দ মিলিয়ে ছোটবেলায় যেসব পুঁথি লিখেছে কাসেম, এক হাত থেকে আর এক হাতে ঘুরে সর্বাঙ্গে সিঁদুর মেখে তা হয়ে দাঁড়িয়েছে দেবদেবীর তুল্যমূল্য। মনে মনে হেসেছে কাসেম, তার লেখা পুঁথি পুজো করতে আপত্তি নেই, কেবল তার ছোঁয়াতেই সব অশুদ্ধ হয়ে যাবে। আশ্চর্য মানুষের মন। মাঝে মাঝে তাই রাগে সারা অঙ্গ রী-রী করে উঠেছে কাসেমের।

জ্বলে উঠেছে শোধ নেবার জন্যে।

হামিদাকে বলেছে, পয়দা করলাম আমি, আমার ছেলে নয়, যে পুষ্যি নিলো সেই মালিক। তাজ্জব ধর্ম এ পৃথিবীর।

হামিদা বলেছে, আবার পয়ার বাঁধতে শুরু করো তুমি, হিন্দু গানই লেখো আবার। পেটও ভরবে, ওরাও জানবে তোমার গানের ইজ্জত।

কাসেম বলেছে, তোবা তোবা, কাবান লিখেছি মনে নেই?

হামিদা হেসে বলেছে, সে কাবান তো লিখেছো আমার জন্যেই, আমি বলছি হিন্দু গান লেখো তুমি।

তবু কথার খেলাপ করতে রাজী হয়নি কাসেম। একবার যা প্রতিজ্ঞা করেছে, সে প্রতিজ্ঞা ভাঙবে কি করে।

কাসেম আলির গল্প কারো অজানা ছিলো না, এসব কথা অনেকবার শুনেছিও। সকলে বলতো, কাসেম আলি মারা গেলেও নাকি ওর বাড়িতে প্রাচীন পুঁথিপত্রের নকল পাওয়া যাবে অনেক।

কিন্তু পুঁথির নেশা তো তখন ছিলো না।

তাই ষাট বছরের বুড়ো, এক-চোখ-কানা কাসেম আলি যখন এসে দাঁড়ালো প্রথমটা চিনতেই পারিনি।

পরনে ময়লা তেলচিটে লুঙ্গি, গায়ে একটা নোংরা ফতুয়া। হাতের লাঠিতে একটা পিতলের দোয়াত সুতো দিয়ে বাঁধা, শোলা দিয়ে মুখটা বন্ধ। মোটা কাচের ভেতর দিয়ে দেখা যায় শুধু একটা ঘোলাটে চোখ।

চিনতে পারিনি।

ঠুকঠুক করে এসে বললে, সেলাম ছোটবাবু।

বললাম, কি চাই!

উত্তর এলো, চিনতে পারলেন না হুজুর, আমি নকলচি কাসেম আলি।

মনে পড়লো। বললাম, না, কাজ তো কিছু নেই কাসেম।

কাসেম আলি হতাশ হয়ে যেমন এসেছিলো ঠুকঠুক করে তেমনি ঠুকঠুক করে চলে গেল।

তারপর একরকম ভুলেই গিয়েছিলাম।

বছর কয়েক বাদে নিজেকে আবিষ্কার করলাম এসিয়াটিক সোসাইটির দপ্তরে। একজন প্রবীণ বিখ্যাত অধ্যাপকের সহকারী হিসেবে প্রাচীন পুঁথিপত্র খুঁজে বের করতে হবে, যেখানে যা পাওয়া যায়।

প্রথমেই মনে পড়লো কাসেম আলির কথা।

বর্ধমান-কাটোয়ার ছোট লাইনের ট্রেনে চড়ে একদিন গিয়ে হাজির হলাম।

সবাই বিস্মিত হলো। কি ব্যাপার, এতদিন পরে?

কাজের তাগিদেই আসতে হয়েছে এ কথা তো ভেঙে বলা যায় না। বললাম, আসতে নেই নাকি।

কাসেম আলির গ্রামটা পাশেই, বাড়িটাও চিনতাম।

একা একা চলে গেলাম একদিন।

গিয়ে দেখি ছোট একটা খড়ের চালা, সামনে বসে আছে এক থুত্থুড়ে বুড়ী।

বললাম, বুড়ী, কাসেম আলির বাড়ি ছিলো না এখানে?

বুড়ী হেসে বললে, হ্যাঁ গো কর্তা, কিন্তু সে তো কবে বেহেস্তে পালিয়েছে আমাকে ফেলে রেখে।

বিস্মিত হয়ে বললাম, সে কি? মারা গেছে কাসেম আলি?

—হ্যাঁ।

চুপ করে রইলাম। বুড়ী বললে, উঁহু, মরেনি। মেরে ফেলেছিস তোরা।

একে একে সব বললে বুড়ী।

পুঁথি নকল করার নেশা নাকি বুড়ো বয়সেও ছাড়তে পারেনি কাসেম। বলতো, এখন কেউ বায়না দিচ্ছে না বটে, দেখিস আমি মরার পর এইসব নকল নেবার জন্যে কত দাম দিতে চাইবে। পুঁথি নয় রে, এ হলো হীরে-জহরত।

দিনের পর দিন যেখানেই খোঁজ পেতো নকল এনে এনে বাড়িতে জমাতো কাসেম। একটা ঘর নাকি ভরে গিয়েছিলো।

বললাম, কোথায় আছে সে পুঁথিগুলো?

হাসলো বুড়ী।

বললে, সে আমি আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছি।

বিস্মিত হয়ে বললাম, কেন?

বুড়ী চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর সব খুলে বললে।

গোবিন্দপুরের দত্তবাড়িতে নাকি একটা পুঁথি ছিলো। কেউ বলতো দু শো বছরের। কেউ বলতো পাঁচ শো।

কিন্তু দত্তরা বলতো, পুঁথি নয়, ঠাকুর। সকাল বিকেল পুজো করতো, মন্ত্র পড়তো।

কাসেম আলি গিয়ে বললে, আমি নকলচি বাবু, পুঁথিটা নকল করতে দেন।

শুনে রেগে গেল দত্তরা। তাদের বংশের স্বপ্নে-পাওয়া ঠাকুর কিনা মুসলমানে দেখবে। দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিলো তারা কাসেমকে।

আর কাসেমেরও নেশা চেপে গেল, ও পুঁথি নকল করতেই হবে। না জানি কি মণিরত্ন

আছে ওর ভেতর।

শেষে ঠিক করলে চুরি করে আনবে পুঁথি, নকল শেষ হলে আবার লুকিয়ে রেখে আসবে।

বুড়ী বললে, জোয়ান বয়েস হলে কথা ছিলো না। বুড়ো বয়েসে কি এসব পোষায় কর্তা। গাঁয়ের এক মুসলমান ছোকরাকে সঙ্গে নিয়ে গেল পুঁথি চুরি করতে। চুরি করে এনে সারা রাত জেগে গাছতলায় দীপ জ্বালিয়ে নকল করলে পুঁথি। তারপর...

বুড়ীর চোখ ছলছল করলো। বললে, নকল শেষ করে আবার রেখে দিয়ে আসতে গেল ভোর রাতে। রেখে দিয়ে আসতে গিয়েই হাতেনাতে ধরা পড়লো কাসেম।

চুরিই তো নয়, মুসলমান ছুঁয়েছে পুজোর পুঁথি। দোষ কি তাদের।—'তা বলে বুড়োমানুষকে কেউ এমন করে মারে বাবু।'

গাঁয়ে ফিরে এসে সেই যে শয্যা নিলো কাসেম, সাত দিন জ্বরে ভুগে হঠাৎ চোখ বুজলো।

বলে দীর্ঘশ্বাস ফেললে বুড়ী। বললে, আমারও রাগ হলো, দিলাম পুঁথির ঘরে আগুন লাগিয়ে। পুঁথিই তো কাল হলো। গোস্‌সা হয় না কর্তা?

সত্যি কথা বলতে কি, এমন অমূল্য সম্পদ এভাবে পুড়িয়ে নষ্ট করার জন্যে আমার রাগ হলো বুড়ীর ওপর। তবু বলতে পারলাম না কিছু।

ব্যর্থ মন নিয়ে ফিরে আসতে আসতে হঠাৎ একজনকে জিগ্যেস করলাম, নকলচি কাসেম আলির কবরটা কোথায় জানো?

উত্তর এলো, ওই ঊর্ধ্ববাসের পাড়ে।

খুঁজে খুঁজে গেলাম সেখানে। হ্যাঁ, কবর বলেই মনে হলো। একটা উঁচু ঢিবি, চমৎকার সবুজ ঘাস গজিয়েছে ওপরে। আর চারপাশ ছেয়ে আছে চোরকাঁটায়। এখনো কবর বলে বোঝা যায়, দু বছর বাদে হয়তো জমির আল বলে ভুল হবে।

কাসেম আলির কথা তখন কি কেউ মনে রাখবে?

[১৩৬২



নারীরত্ন

নারী যে রত্ন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু নীলার মতোই এ রত্ন ধারণ করলে উত্থান সন্দেহজনক, পতন প্রায় অনিবার্য।

কথাটা আমার নয়, একরামপুর জঙ্গলের থানা-হাকিম সুধীরবাবুর কাছে শোনা। সুধীরবাবু আবার কার কাছে শুনে স্রেফ নিজের অভিজ্ঞতা বলে চালিয়েছেন বলতে পারি না।

সুধীরবাবু অবশ্য এ কথা বলেছিলেন তাঁর কথামৃতের দৃষ্টান্ত হিসেবে। যেদিন বলেছিলেন সেদিনটাও আমার স্পষ্ট মনে আছে। কিন্তু ভেবেছিলাম, এ গল্প আমি কোনো দিন লিখবো না। এলাহাবাদ থেকে সুজাতা মল্লিক আমার গল্প সম্পর্কে কটাক্ষ করে চিঠি না লিখলে এ গল্প আমি সত্যিই লিখতাম না। নিছক প্রেমের গল্প আমি কেন লিখি না, তার জবাবে সুধীরবাবুর গল্পটাই বলতে হয়। অথচ এমনি মুশকিল, যাদের নিয়ে গল্প লিখলে আপনারা বিরক্ত হন, সুধীরবাবুর গল্পটা তাদেরই নিয়ে।

কালী মণ্ডল কিন্তু বলেছিলো, "ও স্যার সব মেয়েমানুষই এক। নাম আর পোশাক বদলে আপনার শহুরে মেয়ে বানিয়ে দিলেও অন্যায় হবে না। ভাববেন না এ শুধু জংলা মেয়েদের কীর্তি।"

থানা-হাকিম সুধীরবাবু হেসে বলেছিলেন, "সেইজন্যেই তো বলি, নারী হলো নরকের দ্বারী।"

"দ্বারী নয় স্যার, গাড়ি বলুন। গড়গড় করে নিয়ে গিয়ে পেঁৗছে দেয় নরকের দরজায়।"

সুধীরবাবুর মতো নারীবিদ্বেষী আমি এখনো দেখিনি। উনি বলতেন, জ্ঞানবৃক্ষের আপেল খাওয়ার পর থেকেই নাকি স্বর্গের সঙ্গে আড়ি তাদের।

আপত্তি করে বলতাম, "এ আপনার বাড়াবাড়ি। সব মেয়েই কি এক?"

সুধীরবাবু হেসে বলতেন, "তা ঠিক। ক'টা মেয়ে আর দেখেছি আমরা, দু-একজন নিশ্চয়ই ভালো আছে। তবে মুশকিল হয় কি জানো..."

বলে থামতেন সুধীরবাবু, আর আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকাতাম তাঁর মুখের দিকে। বেশ বুঝতাম, একটা-না-একটা গল্প বলার জন্য তৈরী হয়ে নিচ্ছেন সুধীরবাবু।

সেদিনও এমনিভাবে নারীচরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করতে করতে সুধীরবাবু হঠাৎ বললেন, "মুশকিল কি জানো, সব মেয়েদের তো আমরা ঠিক আগে থেকে চিনতে পারি না। এই যেমন ময়না কিস্কু।"

"সে আবার কে?" বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম।

সুধীরবাবু উত্তর না দিয়ে হঠাৎ নিজেরই দাবনার উপর ফটাস করে একটা চড় বসিয়ে দিলেন। তারপর হাতটা চোখের সামনে ধরে বললেন, "মশা তো নয়, যেন এক-একটা চড়ুই পাখি বোলতার হুল ধার নিয়ে এসে জুটেছে।"

কথাটা মিথ্যে নয়। একরামপুর জঙ্গলের মশা একমাত্র একরামপুরেই দেখেছি। শুধু মশা নয়, বৃষ্টিও। যে বৃষ্টির আভাস পেয়ে নোয়াকে নৌকো বানাতে হয়েছিলো, ঠিক তেমনি অঝোর ধারায় বৃষ্টি হচ্ছে তখন।

ঝমঝম ঝমঝম একটা একটানা শব্দ শুধু।

আর রাতও তখন অনেক। সিপাইকুঠি তখন ঘুমে নিঝুম। বারান্দায় শুধু আমরা পাঁচটি প্রাণী। আমি, সুধীরবাবু, অবনীবাবু, কালী মণ্ডল, আর হৃদয় পাণ্ডে। চারিদিক অন্ধকার আর বারান্দায় একটা টিমটিমে লণ্ঠন ঘিরে এক রাশ বাদলা পোকা।

যে ক'বছর ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টে চাকরি করতে হয়েছিলো, সে সময়টুকুর মধ্যে নানা বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়িয়েছি, কিন্তু একরামপুরের মতো জঙ্গল আর একটিও দেখিনি। জানালার গরাদ ধরে ভালুকে উঁকি মারে, চিতাবাঘ ঘুরে বেড়ায় যত্রতত্র, রাস্তায় হুডখোলা গাড়িটা নিয়ে বেরিয়েছো কি বনশুয়রের পাল তাড়া করে আসবে।

এ-হেন জঙ্গলের মাঝখানে একটা পাহাড়ের ঢালুতে সোনাতুলসী নদীর পাড়ে বিঘে কয়েক জনারের খেত নিয়ে যে সোনাডি গ্রাম, সে গ্রামের লোকগুলোও ছিলো বুনো।

সুধীরবাবু বললেন, "খুনজখম তখন হামেশাই লেগে থাকতো।"

একটু থেমে বললেন, "খাওয়াদাওয়া সেরে সবে শুতে যাবো, বাইরে হল্লা শুনে বেরিয়ে এলাম। এসে দেখি, দুটো মরদ আর একটা মেয়ে।

"জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার!

"উত্তর না দিয়ে হাউহাউ করে কাঁদতে শুরু করলে মেয়েটা। ধমক দিতে তবে চুপ করলো।

"খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কথা জিজ্ঞেস করে বুঝলাম একটা খুনোখুনি হয়ে গেছে।

"সঙ্গের মরদ দুটো একসঙ্গে বলে উঠলো, 'থানা-হাকিম, এ মেয়েটা হলো ভুখন কিস্কুর বউ ময়না কিস্কু।'

"খানিক পরেই সোনাডির জনকয়েক লোক তো ধুলন টুডুকে ধরে নিয়ে এসে হাজির হলো। আর ময়না কিস্কু মেয়েটার সে কি কান্না।

"কাঁদবে না? ভুখন তো ওর স্বামী; খুনীটা ধরা পড়েছে বলে তো আর স্বামীর শোক ভুলতে পারে না?

"কিন্তু থানায় কাজ করে করে ওসব মনের খবর আর রাখবার সময় থাকে কই। আমার তখন রাগ হলো সোনাডি গাঁ-টার ওপরেই। বাইরে ঝমঝম বৃষ্টি, অন্ধকার রাত। কোথায় দিব্যি আরামে ঘুমোবো, তা নয়, চলো কাদাজল ঠেঙিয়ে।

"খুনজখম কি কম দেখেছি এ জীবনে। কিন্তু এমন কেস হাতে এসেছে খুব কম। গিয়ে দেখলাম ঘরের মেঝেতে ভুখনের রক্তাক্ত দেহ পড়ে আছে কাটা ছাগলের মতো, আর পাশে একটা টাঙ্গি।

"গাঁয়ের সর্দার কদম মানকি খুলে বললে সব। বললে, 'হুজুর, ময়না কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসে জানালো যে, তার স্বামীকে টাঙ্গির এক কোপে সাবাড় করে দিয়েছে ধুলন টুডু।' "

সুধীরবাবু গল্প বলতে বলতে থামলেন হঠাৎ। বাইরে তখনো ঝমঝম বৃষ্টি আর অন্ধকার। সিপাই কালী মণ্ডল চুপচাপ শুনছিলো এতক্ষণ। হঠাৎ বললে, "সেদিনের কথা মনে পড়লে স্যার এখনো হাত-পা শিউরে ওঠে। আর মাগীটাও কি কান্নাই না কাঁদছিলো।"

"ব্যাপারটা কি?" উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রশ্ন করলাম।

সুধীরবাবু জানালেন ইতিহাসটা। বললেন, "ময়নাই দেখিয়ে দিলো চালটা, যে জায়গাটা ফুটো করে ধুলন পালিয়েছিলো। দেখলাম সত্যি তাই, ঘরের চাল ফুটো করে পালানোই বটে।

"ময়নাও কান্না থামিয়ে বললে, 'হুজুর, খুনীটা যেই ভুখনের কাঁধে টাঙ্গির কোপ ঝেড়েছে অমনি কপাট বন্ধ করে আগল তুলে দিয়ে কদম মানকির কাছে ছুটে গেলাম। ভাবলাম ডাকুটাকে হাতেনাতে ধরা যাবে। কিন্তু ফিরে এসে যখন গাঁয়ের লোক কপাট খুললো তখন দেখি ধুলন খুনীটা নেই, শুধু দেয়ালের গায়ে রক্তমাখা পায়ের দাগ।' "

কালী মণ্ডল বললে, "কিন্তু পালাবে কোথায়, গাঁয়ের লোকই খোঁজাখুঁজি করে ধরে আনলো ওকে।"

"তারপর?" জিজ্ঞেস করলাম সুধীরবাবুর দিকে চোখ তুলে।

সুধীরবাবু হাসলেন।—"ময়না বললে সব। হরকরার কাজ করতো ভুখন, নির্মল সিং মারা যাওয়ার পর ভুখন হয়েছিলো রানার। সোনাডি থেকে বরকাডিহি মেল পেঁছে দেওয়াই ছিলো ওর কাজ। তা সেদিন রাত্তিরে ভুখনের লাঠির ডগায় ঘুঙুর বাজতে বাজতে সোনা-তুলসী নদীটার ওপারে মিলিয়ে যেতেই ময়না কপাট বন্ধ করতে যাবে, এমন সময় নাকি হঠাৎ ধুলন এসে জাপটে ধরলে ওকে, জড়িয়ে ধরে ঘরের ভেতর এনে ফেললো।"

কালী মণ্ডল সুধীরবাবুর পিছনে গিয়ে একটা বিড়ি ধরালো, তারপর টিপ্পনী কাটলো, "আমি হুজুর শুনে কিন্তু সেদিন দোষ দিইনি ধুলনকে। ময়নার বেটীকে দেখেননি তো আপনি। পনেরো বছরের একটা ডাগর মেয়ে তখন ময়নার, ওর নিজের বয়েস তিরিশের কম নয়, কিন্তু অমন আঁটসাঁট গড়ন আপনি দেখেননি।"

সুধীরবাবু হেসে বললেন, "তা কালী যা বলছে ঠিকই। ভেনাসের মূর্তিতে গোলা খয়ের লেপে দিলে যেমনটি হয়।"

বললাম, "বর্ণনা রাখুন। আসল কেসটা কি?"

"কেস ঘোরালো না হলে আর বলছি কেন? ময়না যা বললে, বুঝলাম ধুলন একটা লম্পট। ময়নার ওপর চোখ ছিলো তার অনেক দিন থেকেই। সুযোগ পেয়ে সেদিন ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়েছিলো, এমন সময় ময়নার চীৎকার শুনে ভুখন হঠাৎ ফিরে এলো।"

অবনীবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।—"একেই নিয়তি বলে। ও সময় কি কেউ মানুষ থাকে, পশুরও অধম হয়ে ওঠে। বাধা পেয়ে তাই ভুখনের টাঙ্গিটাই কেড়ে নিয়ে যদি কোপ বসিয়ে দেয় ধুলন, তো দোষ দেবার কি আছে।"

সুধীরবাবুও সায় দিলেন।—"আমরাও তাই দেখলাম। খুনীটাকে যত প্রশ্ন করি একটা কথারও জবাব দেয় না। চুপচাপ উদাস চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে শুধু।

"সাক্ষীপ্রমাণের ঝঞ্ঝাট ও ব্যাটাই বাঁচিয়ে দিলে, জজের কাছে স্বীকার করলে সব। বললে, 'হাঁ হুজুর, আমিই কেটেছি ভুখনকে।' বললাম না, নারী হলো নরকের দ্বারী। তোমরা তো বিশ্বাস করবে না।"

বললাম, "বেশ লোক আপনি। এ ব্যাপারে ময়নার দোষটা কি? বেচারীর আঁটসাঁট চেহারা ছিলো এই বুঝি অপরাধ ওর।"

"আরে ছো।" হাসলেন সুধীরবাবু, "আমি কি তা ভেবেছিলাম নাকি? ধুলনের কথা

তো ভুলেই গিয়েছিলাম আমরা।"

কালী মণ্ডল সামনে এসে বসলো আবার। বললে, "ময়নার ডাগর মেয়েটা হঠাৎ এসে হাজির না হলে তো আর মনেই পড়তো না ওদের। কি বলেন হুজুর।"

সুধীরবাবু ঘাড় নাড়লেন।—"তা ঠিক। মেয়েটা হঠাৎ একদিন কাঁদতে কাঁদতে এলো বলেই মনে পড়লো। জিজ্ঞেস করলাম, 'কাঁদছিস কেন রে বেটী?'

"তা মেয়েটা বললে, 'হুজুর, তুই হুকুম দে মানকির ওড়ায় থাকবো আমি, ময়নাকে আমার ডর করে, ও ডাইনী।'"

সুধীরবাবু বললেন, "শুনে তো আমরা থ। মাকে ভয় পায় মেয়ে, মাকে ডাইনী বলে, এ আবার কোন দিশী কথা। জিজ্ঞেস করলাম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

"তখন মেয়েটা বললে সব। বললে, 'হুজুর, ময়নার সঙ্গে সাথ ছিলো ধুলনের।'

"'সাথ ছিলো, বলিসনি তো এতদিন?'

"'ডাইনীর ডরে বলতে পারিনি হুজুর।' কাঁদতে কাঁদতে বললে মেয়েটা।

"বললে, 'ভুখন মেল নিয়ে বেরিয়ে গেলেই হুজুর, আমাকে গিতিওড়ার ঘুমঘরে পাঠিয়ে দিতো ময়না।'

"'তারপর?'

"'আমার কেমন সন্দেহ লাগতো হুজুর। তা একদিন মাঝপথ থেকে ফিরে এসে দেখি ধুলনের সঙ্গে বসে গল্প করছে তোদের ময়না। তারপর থেকে রোজই লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতাম হুজুর ধুলন আর ময়নাকে। ভালো লাগতো না আমার, অথচ কিছু বলতে সাহস হতো না। শেষে আর চুপ করে থাকতে পারলাম না হুজুর, তোদের ভুখনকে বলে দিলাম সব।'

"'তারপর?'

"'তোদের ভুখন কিন্তু কিছুই বললো না হুজুর, চুপ করে রইলো। তারপর রোজের মতো সেদিনও মেল নিয়ে বেরিয়ে গেল। আর আমি গিতিওড়ায় না গিয়ে লুকিয়ে রইলাম, ধুলন কখন আসে। এমন সময় হঠাৎ দেখি, ধুলন নয়, ভুখনই ফিরে এসেছে। শুনতে পেলাম ভুখন বলছে, এই টাঙ্গি রইলো পাশে। আসুক ধুলন, তোর চোখের সামনেই তাকে টাঙ্গির এক কোপে শেষ করবো।

"'তারপর হঠাৎ একটা চীৎকার শুনলাম হুজুর। উঁকি মেরে দেখি ময়নার হাতে টাঙ্গি আর ভুখনের মাথাটা মাটিতে গড়িয়ে পড়েছে। দেখে গলা শুকিয়ে গেল ভয়ে, ছুটে পালাতেও পারলাম না। এমন সময় ধুলন এসে হাজির হলো রোজকার মতো।'"

রুদ্ধশ্বাসে সুধীরবাবুর গল্প শুনছিলাম। বললাম, "সে কি সুধীরবাবু, ধুলন খুন করেনি? আর ওরই ফাঁসি হয়ে গেল?"

সুধীরবাবু হাসলেন।—"তখন তো জানতাম না, আর ব্যাটা নিজেই যে স্বীকার করলে সব।"

বললাম, "কিন্তু স্বীকার করলো কেন?"

সুধীরবাবু বললেন, "ময়নার মেয়েটাও তো বুঝতে পারেনি। শুধু বললে, ধুলনকে ফিসফিস করে কি সব বলেছিলো ময়না। দেখিয়েছিলো ভুখনের কাটা শরীরটা। আঁতকে উঠেছিলো ধুলন, বলে উঠেছিলো, 'তুই খুন করেছিস ময়না, নিজের স্বামীকে খুন করেছিস?'

"আর তা শুনে এক মুহূর্ত স্তম্ভিত হয়ে ধুলনের দিকে তাকিয়ে থেকে ময়না বলেছিলো, 'তোর জন্যেই খুন করেছি ধুলন, তোকে বাঁচাবার জন্যেই খুন করেছি।'

"কিন্তু মৃতদেহ নিয়ে গিয়ে সোনাতুলসীর জলে ভাসিয়ে দিতে রাজী হয়নি ধুলন। বলেছিলো, 'না, না, এ কাজ আমি পারবো না।'

"আর তা শুনে হঠাৎ ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসেই কপাট বন্ধ করে চীৎকার করতে করতে ছুটে গিয়েছিলো ময়না।"

বলে হাসলেন সুধীরবাবু। বললেন, "প্রাণের মায়া তো সকলেরই আছে। ধুলন যখন বুঝলো খুনের দায়ে জড়িয়ে পড়বে, তখন চাল ফুটো করে পালাবার পথ দেখলে।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "আর সেটাকেই আমরা ভাবলাম প্রমাণ।"

বললাম, "কিন্তু জজের কাছে স্বীকার করলো কেন ধ্রুলন? সত্যি কথাটা বললে হয়তো ছাড়া পেতো। নয় কি?"

সুধীরবাবু চুপ করে রইলেন, কোনো উত্তর দিলেন না। কিছুক্ষণ পরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "কি জানি। তবে কেন স্বীকার করলো জিজ্ঞেস করছো? স্বীকার করলো হয়তো এইজন্যে যে ধ্রুলন সত্যিই ভালোবাসতো ময়নাকে।"

অবোধ্য ঠেকলো কথাটা, তাই সপ্রশ্ন চোখ তুলে তাকালাম সুধীরবাবুর মুখের দিকে।

সুধীরবাবু মাথা নিচু করে রইলেন। মাথা নিচু করে বললেন, "যাকে সত্যিই ভালোবাসি, সে যখন মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে চায়, তখন মৃত্যু কামনা করাই তো স্বাভাবিক।"

বললাম, "তা সত্যি।"

বললাম বটে, কিন্তু বিশ্বাস হলো না। না, সেদিনও বিশ্বাস হয়নি, আজও বিশ্বাস করি না সুধীরবাবুর গল্প, ময়না কিস্কুর গল্প।

কিন্তু আপনাদের কি মনে হয়? সত্যি হতে পারে এ গল্প?

।১৩৬২



পকেট

মম নিশ্চয়ই এ গল্পটা অন্যভাবে বলতেন। অর্থাৎ স্রেফ দুটি পুরুষমানুষ বাসের ভিড়ে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে হাওড়া থেকে শিয়ালদা অবধি এসে পৌঁছলো, আর বাসটা মৌলালীর দিকে মোড় ফিরতেই একজন নেমে পড়লো—এমন নীরস গল্প মম অন্তত লিখতেন না। বেদান্ত নিয়ে যতই নাচানাচি করুন তিনি, সংস্কৃত সাহিত্যের সংগে তাঁর যত পরিচয়ই থাক না কেন, রস বলতে তিনি আদি, বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র আর শান্ত এই নবরসের প্রথমটিকেই প্রাধান্য দিয়ে আসছেন। সুতরাং তিনি লিখতেন : তিনি ঠিক যে কি লিখতেন তা বলতে পারি না। তবে আমার পাশের লোকটি, যার সম্পর্কে গল্পটা ফাঁদতে বসেছি, তাকে হয়তো নারীরূপেই দেখতেন তিনি। কিন্তু তা হলে আমার গল্প অন্য মুখে চলে যেতো। তাই যেমন যেমন ঘটেছিলো সেইটুকুই আমি বলছি।

কোলকাতা শহরে সেদিনই আমি প্রথম এসেছি এবং সেই মুহূর্তে। কোটের ভেতরের পকেটে শ' দুয়েক টাকার স্পর্শে বুক ছুকছুক করছে। মফস্বল শহরের একটি ওষুধের দোকানে এক নাগাড়ে তিন বছর কাজ করার ফলে মালিকের কাছে বিশ্বস্ত প্রমাণিত হয়েছি তখন, আর আজীবন প্রবাসী হওয়ার দরুন নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. হলেও আমি যে শিক্ষিত তাও বিশ্বাস করেছেন তিনি। তাই কর্মজীবনে সেই প্রথম শ' দুয়েক টাকা দিয়ে মালপত্র কিনতে পাঠিয়েছিলেন তিনি, আর বারবার সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন : কোলকাতা হলো গুণ্ডা চোর পকেটমারের রাজত্ব, অতএব সাবধানে যাওয়া আসা কোরো। এতদিন যে লোকটি কোলকাতাকে শিক্ষা আর সভ্যতার এভারেস্ট বলে জাহির করে এসেছেন, তিনিই যখন বলে বসলেন, কোলকাতা পকেটমারের রাজত্ব, তখন ভয় পেলাম সত্যিই। কারণ, তখন পর্যন্ত কোলকাতা চোখে দেখিনি।

পাঁচজনকে জিজ্ঞেস করে, ভিড় ঠেলে ঠেলে বাস স্ট্যাণ্ডের কাছে এসে দাঁড়ালাম। ইচ্ছে ছিলো, একটা খালি বাসে উঠবো। কিন্তু সে আশা ছেড়ে দিয়ে ভিড়ের মধ্যেই উঠতে হলো।

প্রস্ত অবশ্য এমন একটা সুযোগকে দু লাইনে শেষ করতেন না। প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বর্ণনা করে যেতেন তিনি নিখুঁত ছবি আঁকার ভাষায়। হয়তো হাওড়া স্টেশনের বর্ণনাই দিতেন তিন পাতা জুড়ে, তারপর বাস স্ট্যান্ডের বর্ণনায় যেতো আরো দু পাতা এবং সর্বশেষে এই বাসের ভিড় এবং আমার মনের অবস্থাকে প্রকাশ করার জন্যে খরচ করতেন আরো দু পাতা। আমি প্রস্ত নই, সুতরাং যা যা ঘটেছিলো তা সংক্ষেপেই বলছি। আপনারা কেউ যদি এ ঘটনা থেকে কোনো গল্প বানাতে পারেন আপত্তি করবো না।

ভিড় ঠেলে বাসে তো উঠলাম। বাসের সঙ্গে বসার যে কোনো সম্পর্ক নেই, অবহিত হতে সময় লাগলো না। ওপরের রডটি ধরে বাদুড়-ঝোলা ঝুলতে শুরু করলাম বাস ছেড়ে দিতেই। এতগুলি লোকের নিশ্বাস, গায়ের ঘাম, কিচিরমিচির। আমার ওষুধের দোকানের মালিক বলে দিয়েছিলেন সাবধানে থাকতে, কিন্তু আমার মন বললো, বারবার বুকে হাত দিয়ে নোটের তাড়াটার স্পর্শ নেওয়া বোকামির কাজ হবে। কারণ, নেহাত যদি কারো চোখ থাকে আমার দিকে, তা হলে আমার ব্যবহারই বুঝিয়ে দেবে যে পকেটে টাকা আছে।

তাই একেবারে কপর্দকহীন যাত্রীর মতো নির্বিকার ভাব ফোটাবার চেষ্টা করছিলাম। হঠাৎ চমকে উঠলাম পাশের ভদ্রলোকের কথায়!

—পকেট সামলে চলবেন সকলে! একটা সাবধানী চিৎকার ছাড়লেন ভদ্রলোক।

ফিরে তাকালাম তাঁর মুখের দিকে; দেখলাম সে মুখে মিটিমিটি হাসি। তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললাম, পকেটে আছে কি যে সাবধান হবো।

ভদ্রলোকও হাসলেন। বললেন, আপনার না থাকতে পারে, যাঁর আছে তাঁকে সাবধান করে দিচ্ছি।

এদিকের আরেকজন বলে উঠলেন, তা যা বলেছেন। মাঝে মাঝে দু-একটা শুনছি বটে আজকাল।

—দু-একটা? ভদ্রলোক প্রতিবাদ করলেন।—হামেশা হচ্ছে মশাই, হামেশা। এই তো পরশু দিন, এক বুড়ো ভদ্রলোক সবে মাসের মাইনেটি পেয়েছেন, হঠাৎ হাউহাউ করে কেঁদে উঠলেন বাসের মাঝখানে। বাসের সবাই মিলে দু পয়সা করে চাঁদা দিয়ে তাঁর বাড়ি ফেরবার পয়সা দিলাম।

কথাটা শুনে মনে মনে শঙ্কিত হচ্ছিলাম। তবু বললাম, টাকা নিয়ে যাবার সময় একটু সাবধান হলেই পারেন, তা তো হবেন না কেউ।

—সাবধান! হাসলেন ভদ্রলোক। বললেন, পকেটমারদের কাছে সাবধান হবেন? তাদের টেকনিক জানেন?

বললাম, না তো।

—শুনুন তবে। বলে বাসের জানালায় একবার উঁকি দিয়ে দেখলেন ভদ্রলোক, বাসটা ব্রিজ পার হলো কি না।

তারপর শুরু করলেন গল্প। বাসের ভিড়, তার ওপর ঝুলতে ঝুলতে যাওয়া। মন্দ লাগছিলো না ভদ্রলোকের কথাগুলো। বললেন, পকেটমারদের সাইকোলজির জ্ঞান আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। দু শো গজ দূর থেকে বলে দেবে কার পকেটে টাকা আছে।

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম, তাই নাকি?

—বিশ্বাস করছেন না? রীতিমতো চটে উঠলেন ভদ্রলোক।—শুধু টাকা আছে কি না নয়, কত টাকা আছে সঙ্গে তাও আন্দাজে বলে দিতে পারে। আর পকেটমার মানে তো একজন নয়, একটি দল। স্টেশনের কুলি থেকে শুরু করে বাসের কন্ডাক্টরদের সঙ্গেও সাট থাকে তাদের।

—সে কথা সত্যি! সায় দিলেন অন্য একজন।

ভদ্রলোক বললেন, যেই একজন ইশারায় জানিয়ে দিলো অমুক লোকটার পকেটে বেশ কিছু আছে, অমনি টেলিগ্রাফ হয়ে গেল চোখে চোখে। তিন-চারজনে মিলে এমন গায়ের ওপর এসে পড়বে টেরও পাবেন না যে তারা পকেটের মালটা ওজন করে নিলো। তারপর বাসের মুখটিতে দাঁড়িয়ে থাকবে এমনভাবে, যেন তারাও যাত্রী।

—হ্যাঁ, সে অবশ্য প্রায়ই দেখি। টিপ্পনী কাটলেন অন্য একজন।

ভদ্রলোক উৎসাহ পেলেন যেন। বললেন, আঙুলের সঙ্গে ব্লেডের মতো ধারালো একটা ছুরি দিয়ে স্রেফ পকেটটি সদর করে দেবে কখন টেরও পাবেন না। তার সঙ্গে মালটি যে হাতে হাতে কোথায় চলে যায়, বুঝতেও পারবেন না। হাতেনাতে ধরলেন হয়তো তাকে, কিন্তু শেষকালে নিজেই অপদস্থ হবেন। টাকা অন্য কোথাও চলে গেছে, বাসের লোকদের সার্চ করেও পাবেন না।

—সে মশাই আমি স্বচক্ষে দেখেছি একবার। মন্তব্য করলেন একজন।

ভদ্রলোক বললেন, তবে অনেকে আবার একটু চালাক-চতুর হয়, একটু সাবধানে থাকে। তাদের বেলায় অবশ্য অত সহজে কাজ সারতে পারে না পকেটমাররা। ধাক্কাধাক্কি দিলেও হয়তো পকেট সামলে রাখছে লোকটি, তখন আরেক কায়দা করে। চট করে কয়েকটা খুচরো পয়সা ফেলে দেয়, আর লোকটি আচমকা পয়সার শব্দে ভাবে তার পকেট থেকেই পয়সা পড়েছে...আর যেই অন্যমনস্ক হয়ে পয়সা কুড়োতে যায় অমনি...বুঝলেন কিনা। হাসতে শুরু করেন ভদ্রলোক।

এমন একটা সুযোগ পেলে শেক্সপিয়ার চমৎকার একটা নাটক লিখে ফেলতেন হয়তো। সামান্য একটা রুমাল ফেলে দিয়ে ওথেলো নাটকটায় কি কান্ডই না বাধিয়েছেন তিনি। দর্শকরা নিশ্বাস বন্ধ করে আশঙ্কার সময় গোনে। কি হবে, কি হবে ভয়। আর সেই রোমিও-জুলিয়েটের গল্প? জুলিয়েটের ঘর থেকে রোমিও বেরিয়ে নেমে গেল ব্যালকনি বেয়ে, আর সেই সময় বুড়ী ঝি ঘরে ঢুকলো। দর্শকরা তো ভয়েই অস্থির! মেঝেতে রোমিওর ড্যাগারটা পড়ে রয়েছে, এই বুঝি সব ফাঁক হয়ে গেল। তা হলেই ভাবুন, পয়সা ফেলে দিয়ে কি না ঘটাতে পারতেন শেক্সপিয়ার। সে জায়গায় পকেটমারদের মতো ওস্তাদ আর্টিস্টরা সামান্য একটা পকেটে কাঁচি ঢুকিয়ে দেবে সে আর এমন আশ্চর্য কি।

সে কথা বললাম ভদ্রলোককে। তিনি হাসলেন।—তা যা বলেছেন। কিন্তু এতেও হয়তো কাজ হলো না। কিংবা পকেটমারটিকে হয়তো সন্দেহ করতে শুরু করেছেন পকেটের মালিক তখন। তার জন্যেও একটা চমৎকার টেকনিক আছে পকেটমারদের। এরিয়া ভাগ আছে তাদের। যেমন ধরুন হাওড়া থেকে বালিগঞ্জ যাবে বাসটা। এই রুটটা চারজনের ভাগে। একজন হাওড়া থেকে শিয়ালদা অবধি যাবে, যদি ইতিমধ্যে কাজ হাসিল করতে না পারলো তো শিয়ালদায় দলের যে লোকটি উঠলো তাকে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে নেমে যাবে সে। তারপর দু নম্বর লোকের এরিয়া মৌলালী পর্যন্ত, সেও যদি না পারে তো মৌলালীতে যে উঠবে তাকে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে নেমে যাবে সে।

বললাম, তাই নাকি!

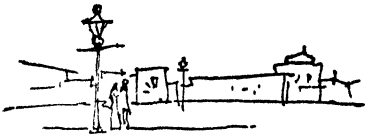
ভদ্রলোক হাসলেন।—পকেট মারার টেকনিকও কি একটা নাকি! ধরুন আপনি ঝুলতে ঝুলতে চলেছেন, পকেটমারটি করবে কি, ডান হাতে কিছু একটা ঝুলিয়ে এমনভাবে রড ধরবে যে আপনার ডান দিকের কানে বা চুলে লাগবে সেটা আর আপনি বিরক্ত হয়ে কেবল সে দিকে লক্ষ্য রাখবেন। আর এই সুযোগে বাঁ হাতে পকেট সাফ করে দেবে সে।

ভদ্রলোক হঠাৎ আবার জানালায় উঁকি দিয়ে দেখলেন। শিয়ালদায় বাস পৌঁছে গেছে তখন। আরেকবার সাবধান করে দিলেন, পকেট সামলে চলুন মশাই, পকেট সামলে চলুন।

হেসে বললাম, কি-ই বা আছে পকেটে যে সামলে চলবো। কিন্তু আপনি, আপনি কি এখানেই নামবেন নাকি।

বাস থেকে নামতে নামতে ভদ্রলোক বলেন, হ্যাঁ, আমার এরিয়া তো শেষ হয়ে গেল। বলে নেমে গেলেন তিনি। বাস ছেড়ে দিলো আবার।

ও হেনরি হলে এ গল্প অবশ্য এখানে শেষ করতেন না। এবং তিনি কিভাবে শেষ করতেন তা আমার চেয়ে কারও বেশী জানবার কথা নয়। কিন্তু ও হেনরির মতো গল্প শেষ করার কৃতিত্বটা বড়, না...থাক, সে কথা না-ই বা বললাম।



মাধবিকা

ঝাঁসী হয়ে ভূপাল যাবার পথে ভীলসা স্টেশন। স্টেশন থেকে নেমে পশ্চিমের পথ ধরে এক্কা ছুটবে। তারপর বেতুয়া নদী পার হয়ে পেঁছতে হবে বেশনগরে। বেশনগরের 'খাম্বাবা' এবং তার দু ক্রোশ দক্ষিণের উদয়গিরির প্রাচীন শিল্পভাস্কর্যই নয়, একটি রোমাঞ্চময় অতীত ইতিহাসকেও স্মরণ করিয়ে দেয়।

গোয়ালিয়র রাজ্যের এই নগরের সন্নিকটেই ছিলো প্রাচীন মালোয়া রাজ্যের রাজধানী, এই বেশনগরের দু দিক থেকে প্রবাহিত হতো বেতুয়া ও ব্যাস নদীর বিদ্যুৎস্রোত জলধারা। মালোয়ার রাজধানী এই বেশনগরেই ছিলো বাসুদেবের মন্দির।

স্থানীয় গাইড এই মন্দির-প্রাঙ্গণের একটি সুদীর্ঘ স্তম্ভের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বলে, এ হ্যায় খাম্বাবা।

—খাম্বাবা ?

প্রশ্নের উত্তরে সে জানালে, এই খাম্বাবা আসলে গ্রীক রাজপুত্র হেলিওডোরাসের তৈরী গরুড়স্তম্ভ। একটি ভারতীয় নারীর সঙ্গে এক গ্রীক যুবকের প্রণয়কাহিনী লুকিয়ে আছে এই স্তম্ভের আড়ালে, এই বাসুদেব-প্রাঙ্গণের নিঃশব্দ বাতাসে ফিসফিস করে কে যেন কানের পাশে কূজন করে যায় অতীতের এক যবন যুবক আর এক মালোয়া রাজকন্যার প্রেমের উপাখ্যান।

খ্রীষ্টপূর্ব ১৪০ অব্দে এই স্তম্ভ তৈরি করিয়েছিলেন হেলিওডোরাস, স্তম্ভগাত্রে ব্রাহ্মী হরফে তা কীর্তিত হয়ে আছে। 'পরম ভাগবত' উপাধি-ভূষিত তদানীং গ্রীক রাজপুত্র হেলিওডোরাসের পরিণয়-কাহিনী অপূর্ব একটি প্রেমের উপাখ্যান।

তক্ষশীলায় রাজত্ব করছেন তখন গ্রীকরাজ এণ্টিসিলিওডিরাস। মালোয়া তখন এক সমৃদ্ধিশালী স্বাধীন রাজ্য।

এণ্টিসিলিওডিরাস তাঁর রাজ্যকে শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচাবার জন্যে আদেশ দিলেন একটি সহস্রকুঞ্জর বাহিনী গঠন করবার। কিন্তু তক্ষশীলার অরণ্যে তো হাতির হদিস মিলবে না। এণ্টিসিলিওডিরাস বুঝলেন, গজবাহিনী গড়ে তুলতে হলে মালোয়ারাজ্যের সাহায্য প্রয়োজন। কারণ, মালোয়ার অরণ্যই তখন পশ্চিম ভারতের প্রায় সব রাজ্যকে হাতি সরবরাহ করতো।

তাই মালোয়ারাজের কাছে বাণিজ্য-সন্ধির শর্ত পাঠালেন এণ্টিসিলিওডিরাস। মালোয়া-রাজ জানালেন, তিনি সন্ধিশর্তে আবদ্ধ হবেন যদি গ্রীকরাজ পরিবর্তে মালোয়া-রাজপুত্রকে গ্রীক রণকৌশল শিক্ষা দেন।

শর্ত গ্রহণ করলেন এণ্টিসিলিওডিরাস। মালোয়া-রাজপুত্র এসে উপস্থিত হলেন তক্ষশীলায়। গ্রীকরাজ সাদর অভ্যর্থনা জানালেন যুবরাজকে, রাজবংশীয় ডিওনের ওপর ভার দিলেন অতিথিপরিচর্যার। এই রাজবংশোদ্ভূত ডিওনের পুত্রই হেলিওডোরাস।

শ্বেতকেশ ডিওন তাঁর পুত্রকে উপস্থিত করলেন মালোয়া-যুবরাজের কাছে। বললেন, আজ থেকে তোমরা পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের সৌহার্দ্য যেন মালোয়া এবং তক্ষশীলাকেও বন্ধুত্বের পাশে আবদ্ধ রাখতে পারে চিরকাল।

হেলিওডোরাস আর মালোয়া-যুবরাজ—প্রত্যূষে পাহাড়ী পথ বেয়ে দুই সুপুরুষ সুদর্শন যুবক ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে—প্রজারা দূর থেকে দেখেই চিনতে পারতো এই ভারতীয় আর গ্রীক যুবক দুটিকে। মধ্যাহ্নের অক্ষক্রীড়া, নিশীথের গল্পগুঞ্জনে মেতে থাকতো দুই ভিন্ন-দেশী বন্ধু।

এইভাবেই সুখে স্বপ্নে দিন কেটে যায় মালোয়া-রাজপুত্রের।

মালোয়ার উষ্ণ আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছে মালোয়া-রাজপুত্র। কিন্তু তক্ষশীলা শীতপ্রধান

রাজ্য।

পাহাড়ী ঝরনার গা বেয়ে দুই বন্ধু একদিন পরিভ্রমণ করতে করতে দেখতে পেলো পর্বতচূড়া থেকে তুষার গলে গলে পড়ছে। তুষারের মুকুটে ভূষিত পর্বতশৃঙ্গে ঠিকরে পড়ছে সূর্যের সোনালী রশ্মি। সে দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হলো মালোয়া-রাজপুত্র।

বললে, চলো বন্ধু, এই তুষার-গলে-পড়া সলিলে সন্তরণ করে আসি।

হেলিওডোরাস বাধা দিলো, বললে : না বন্ধু। এর রূপে আকৃষ্ট হওয়া এক, এর সলিল-স্রোতে স্নান করা অন্য। তুমি উষ্ণপ্রধান দেশের রাজপুত্র, এই শীতল জলধারা তোমার পক্ষে ক্ষতিকর।

তা সত্ত্বেও নিষেধ শুনলো না, হেলিওডোরাসের কথায় সশব্দে হেসে উঠে ঝরনার জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো মালোয়া-রাজপুত্র।

তারপর জ্বরবিকার, জীবনসংশয়।

ডিওনের প্রাসাদকক্ষে প্রায় মৃত্যুশয্যায় পড়ে আছে মালোয়া-রাজকুমার। হেলিওডোরাস, ডিওন, ডিওনের পত্নী সযত্নে সেবা শুশ্রূষা করে চলেন বিদেশী রাজপুত্রের। দেবতার পায়ে প্রার্থনা জানান ডিওন-পত্নী, আমার পুত্রের জীবনদান করো প্রভু।

হয়তো ডিওন-পত্নীর প্রার্থনা শুনতে পেলেন দেবতা। মালোয়া-রাজপুত্রের রোগ আরোগ্য হলো।

বন্ধুর মাতাকে প্রণাম জানিয়ে কৃতজ্ঞতা জানালো মালোয়া-রাজপুত্র।

মৃদু হাসলেন ডিওন-পত্নী।

বললেন, আমার পুত্রের বন্ধুও আমার পুত্রতুল্য। তোমাকে আমি সন্তানরূপেই দেখেছি বৎস।

মুগ্ধ হলো মালোয়া-রাজকুমার। গ্রীকরাজকে অনুরোধ জানালো হেলিওডোরাসকে মালোয়ার দূত নিযুক্ত করবার জন্য।

মালোয়ারাজ পুত্রের চিঠিতে জানতে পারলেন নবনিযুক্ত দূত হেলিওডোরাস তাঁর পুত্রের বন্ধু, তারই মাতার সেবাযত্নে প্রাণ লাভ করেছে তাঁর পুত্র।

তাই যুবক হেলিওডোরাস মালোয়ার দরবারে উপস্থিত হতেই সম্রাট বললেন, বিদেশী যুবক, আজ থেকে তুমি আমারও পুত্র। আমার পরিবারেরই সন্তান তুমি।

রাজপরিবারে রাজপত্নীর স্নেহসিঞ্চনে দিন কেটে চলে হেলিওডোরাসের। মাঝে মাঝে রঙিন স্বপ্নের মতো একটি সুন্দর লজ্জারুণ মুখ উঁকি দিয়ে সরে যায় যবনিকার অন্তরালে।

দাসীদের কাছে এই রাজকুমারীর কথা শুনতে পায় হেলিওডোরাস। ক্ষণিক রোমাঞ্চের চোখে বিদ্যুতের মতো সে রূপ দেখা দিয়ে মিলিয়ে যায়।

হেলিওডোরাস দরবারে যায়, কখনো মালোয়া পরিভ্রমণে বের হয়, আর ফিরে এসে দেখতে পায় একটি পুষ্পমাল্য তার দ্বারপ্রান্তে পড়ে আছে। কৌতূহল বোধ করে গ্রীক যুবক, মনে আনন্দের গুঞ্জরন ওঠে।

তার মনে রূপবতী রাজকন্যার কটাক্ষমধুর হাসি যে প্রেমের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছে, রাজকন্যার মনেও কি জ্বলছে সেই একই শিখা?

না শুধুই কৌতুক? বিদেশিনীর রহস্যঘেরা অভিনয়?

এমনিভাবেই দিনের পর দিন কেটে চলে। বসন্ত উৎসবের কাল ঘনিয়ে আসে।

সারা মালোয়া রাজ্য পুষ্পে-পত্রে শোভিত হয়ে উৎসবের রূপ নেয়। সুমধুর বাদ্যধ্বনি, সঙ্গীতের মূর্ছনায় পথপ্রান্তের রাজার প্রাসাদ যেন উচ্ছল হয়ে ওঠে।

বসন্তের লীলাচাপল্যে ভ্রূভঙ্গিমা দেখা দেয় মালোয়া-নাগরীদের চোখে। পুরাঙ্গনা, কুমারী কন্যার দল প্রসাধিত সৌন্দর্যের আগুন জ্বালিয়ে মেতে ওঠে বসন্ত উৎসবে।

নৃত্যগীতে নরনারীর অবাধ মিলনের স্বাধীনতা এই একটি দিনের তরে। এই একটি উৎসব যেন সব বিধিনিষেধ, সব সামাজিকতার লজ্জা দূর করে তরুণ-তরুণীদের মিলন ঘটায়। এই উৎসবের দিনেই হয়তো মিলনের প্রথম সোপান গাঁথা হয় কারো জীবনে, কেউ বা হতাশ দীর্ঘশ্বাস ফেলে ব্যথার স্মৃতি নিয়ে যায় মনের গোপনে।

রাজ-পুষ্পোদ্যানে উৎসবের উচ্ছ্বাস, আলো-ঝলমল নিকুঞ্জের বৃক্ষছায়ায় সম্ভ্রান্ত তরুণ-

কিন্তু এ কি! বরবেশে নয়। ত্যাগের গেরুয়া ভূষণে বিভূষিত হেলিওডোরাস হেঁটে চলে বিবাহমণ্ডপের দিকে।

বিস্ময় গোপন করেন মালোয়ারাজ। জামাতাকে আহ্বান জানিয়ে কন্যা সম্প্রদান করেন। মাধবিকা চোখ তুলে তাকায় হেলিওডোরাসের দিকে, পুষ্পমাল্য পরিয়ে দেয় গ্রীক যুবকের কণ্ঠে। হেলিওডোরাস পরিবর্তে তার কণ্ঠের ভক্তমাল্য পরিয়ে দেয় মাধবিকার গলায়।

বলে, চলো মাধবিকা, এ ঐশ্বর্য, এ বিলাসের মধ্যে আর ডুবে থাকতে চাই না। চলো মাধবিকা, প্রেমের চেয়েও বড় আকর্ষণ দেখতে পেয়েছি, তোমাকেও দেখাতে চাই সেই পথ।

—কি পথ স্বামী? প্রশ্ন করে মাধবিকা, কি আকর্ষণ?

হেলিওডোরাস বলে, ভক্তি, মাধবিকা। প্রেমের চেয়েও উচ্চ আনন্দ এই ভক্তি। বাসুদেবের চরণে আশ্রয় নেবে চলো।

মাধবিকা সায় দেয় তার কথায়।

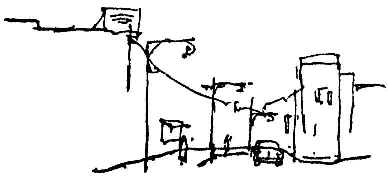
বলে, চলো, তোমার পথই আমার পথ, তোমাকে যিনি আশ্রয় দিয়েছেন আমার আশ্রয়ও তিনি।

ধীরে ধীরে বাসুদেবের মন্দিরপ্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হলো এক যবন রাজদূত। আর এক মালোয়া-রাজকন্যা।

দু হাজার বছর আগেকার সেই বাসুদেবের মন্দির আজ নেই, কিন্তু ভীলসা শহরের পাথরের দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আজও দেখতে পাওয়া যায়। দেখতে পাওয়া যায় বেতোয়া নদীর অপর পারে উদয়গিরির গুহাসৌন্দর্য।

আর স্থানীয় গাইড এই অপরূপ উপাখ্যান বর্ণনা করে সুদীর্ঘ স্তম্ভটির দিকে অঙ্গুলি-সঙ্কেত করে বলে, এ হ্যায় খাম্বাবা!

[১৩৬৩



হিসেবী

মহীতোষবাবুকে এভাবে দেখবো কোনো দিন কল্পনাও করিনি।

পার্কটার পাশ দিয়ে যেতে যেতে অন্যমনস্কভাবেই তাকিয়েছিলাম প্রথমটা।

ফুটপাথের উপর খড়ি দিয়ে চৌকো চৌকো কি সব ঘর কেটে এক রাশ পুঁথিপত্র নিয়ে বসে ছিলো লোকটা। গায়ে একটা ময়লা নামাবলী।

প্রথমটা চিনতে পারিনি। পার হয়ে খানিকটা যখন চলে এসেছি, তখন হঠাৎ মনে হলো, মহীতোষবাবু না? ফিরে তাকালাম, চোখাচোখি হলো আবার। এবং সঙ্গে সঙ্গে মহীতোষবাবু অন্য দিকে মুখ ফেরালেন।

বোধ হয় লজ্জায়।

লজ্জা আমারও। ফুটপাথের গনৎকার হয়ে বসে আছেন মহীতোষবাবু, স্টিফেন্স কোম্পানির চার শো টাকা মাইনের বড়বাবু মহীতোষ সান্যাল।

আমি তখন অনেক ছোট। সেই তখন থেকেই শুনে আসছি, মহীতোষবাবুর মতো কৃপণ

আর একটি নেই। বুড়োরা অবশ্য বলতেন, কৃপণ নয়, হিসেবী।

কৃপণ কি না জানি না, তবে খুব হিসেবী লোক ছিলেন মহীতোষবাবু। তিরিশ টাকা মাইনেতে ঢুকেই এক হাজার টাকা ইন্সিওর করে ফেলেছিলেন।

সে যুদ্ধের অনেক আগেকার কথা। তিরিশ টাকা মাইনেতে তখন পাঁচটা লোকের সংসার চলতো। আর পাঁচটা লোকই তখন এসে গিয়েছে তাঁর সংসারে।

বাপ ছিলেন ঐ স্টিফেন্স কোম্পানিরই বড়বাবু। মাইনে মোটামুটি ভালোই পেতেন। ছেলে কলেজে পড়ছে, বংশ ভালো, মেয়ের বাপরা ছোটাছুটি শুরু করে দিলো।

ফলে, কলেজে পড়তে পড়তেই বিয়ে করে ফেললেন মহীতোষবাবু। করে ফেললেন বলবো না, হয়ে গেল।

তারপর বছর না ঘুরতে একটি মেয়ে। মেয়ে হলেও মুখ ভার করার কারণ ছিলো না তেমন। বিয়ের ভাবনা, সে পনরো বছর বাদে ভাবা যাবে। হ্যাঁ, পনরোতেই অরক্ষণীয়া হতো তখন। আর ভাত-কাপড়ের ভাবনা তো মহীতোষবাবুর নয়, মহীতোষবাবুর বাবার।

মহীতোষবাবুর বাবা যা মাইনে পেতেন, তাতে ছেলে ছেলের বউ কেন, নাতনী নাত-জামাইকেও বসে খাওয়াতে পারতেন। টাকায় তখন পনরো সের চাল। এক জোড়া কাপড় দু টাকা দশ আনা।

মহীতোষবাবুও প্রথম দিকটায় তাই অতশত চিন্তা করেননি। যখন চিন্তা করতে শুরু করলেন, তখন আর নিশ্চিন্ত হবার উপায় নেই। তিন-তিনটি ছেলেমেয়ে তখন।

মহীতোষবাবুর বাবা অবসর নিলেন কাজ থেকে, আর এতদিনের বিশ্বস্ত চাকরির পুরস্কার চেয়ে নিলেন, ছেলের চাকরি।

তিরিশ টাকা মাইনের কেরানীর চাকরি। তা হোক, তিনিও ঐ মাইনেতে ঢুকে বড়বাবু হয়েছেন।

প্রথম প্রথম বেশ চলে যাচ্ছিলো। মাসের শেষে অভাবটা বাপের কাছে হাত পেতে মিটিয়ে নিতেন মহীতোষবাবু। ক্রমশ দু-পাঁচ টাকা করে বছরে মাইনেও বাড়ছিলো। তারপর একে একে বাবা-মা দুজনেই গত হলেন। জমানো কিছু টাকা হাতে পেলেন মহীতোষবাবু। কিন্তু যত আশা করেছিলেন তত নয়।

মহীতোষবাবুর স্ত্রী গঞ্জনা দিলেন, "এখন বললে কি হবে, খরচে লোক ছিলেন।"

অথচ খরচ যে সত্যি কি করে গেছেন তিনি, বোঝা গেল না। মহীতোষবাবুর তিন বোনের বিয়ে আর অসুখে-বিসুখে ডাক্তার ওষুধ। এত মাইনে পেতেন, সব কি এইভাবে গিয়েছে?

মহীতোষবাবু এমনিতেই হিসেবী মানুষ, আরো হিসেবী হয়ে উঠলেন। মেয়ে দুটোর বিয়ে দিতে হবে তো। ছেলেকে পড়াতে হবে ইস্কুলে কলেজে।

এক হাজার টাকা ইন্সিওর করেছিলেন। মাইনে বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরো কিছু করলেন। ব্যাঙ্কেও যখন যেমন পারতেন, বাঁচাতেন।

স্ত্রী কৃপণ বলতেন, মেয়েরা বায়না ধরতো নতুন শাড়ির। তবু এতটুকু নড়চড় হতে দিতেন না তিনি।

বাপের জমানো টাকাগুলো উড়ে গেল বড় মেয়ের বিয়ে দিতে। মহীতোষবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "দেখলে তো। আরেকটা মেয়েকে পার করতে হবে। তা ছাড়া, সমস্ত ভবিষ্যৎ-টাই..."

স্ত্রী বলতেন, "অত ভবিষ্যৎ ভাবলে চলে না। এখন খেয়ে-পরে বাঁচলে তবে তো ভবিষ্যৎ।"

"আহা, না খেয়ে থাকার কথা তো বলছি না। তবে দু হাতে না ওড়ালেই হলো।"

স্ত্রী ঝাঁঝালো গলায় বলতেন, "মাইনে তো এতদিনে পাচ্ছো পঞ্চান্ন। একটা হাত ভরে না, তার আবার দু হাতে ওড়াবো!"

ধক্ করে একটু লাগতো বুকে। তবু হাসি দিয়ে লজ্জা ঢেকে মহীতোষবাবু বলতেন, "তবু তো পঞ্চান্ন টাকা মাস গেলে পাচ্ছি। কিন্তু পঞ্চান্ন বছর বয়সে চাকরিটা ছেড়ে এসে যদি পনরো বছর বাঁচতে হয়..."

স্ত্রী হাসতেন।—"তখন তোমার অণিমারও বিয়ে হয়ে যাবে, আর মণ্টুও চাকরি করবে।"

"চাকরি?" অবিশ্বাসের হাসি হাসতেন মহীতোষবাবু। বলতেন, "বাবা ছিলো বড়বাবু,

সাহেব ভালোবাসতো, তা বলে আমার ছেলেরও চাকরি হবে নাকি অত সহজে!"

স্ত্রী বুঝতেন, তর্ক করে লাভ নেই। রেগে গিয়ে বলতেন, "নাও, বাজারের হিসেবটা নাও..."

খাতাকলম নিয়ে বসতেন মহীতোষবাবু।—"বলো।"

"মাছ সাড়ে তিন আনা।"

"মাছ সাড়ে তিন আনা। তারপর?"

"আলু সাত পয়সা।"

"আলু সাত পয়সা। হুঁ।"

"কয়লা সওয়া ন' আনা।"

খাতা থেকে চোখ তুলতেন মহীতোষবাবু। চোখ থেকে চশমা খুলতেন। তারপর স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলতেন, "ক' মন কয়লা লাগছে মাসে?"

ঐ এক কথা। ক' মন কয়লা লাগছে, ক' সের তেল লাগছে, ভাত কেন ফেলা যায়। তার ওপর জিনিসের দাম তো আছেই।

আগে থলি হাতে নিয়ে নিজেই বাজারে যেতেন, মন্টুটা বড় হয়ে কিছুতেই বাজারটা হাতছাড়া করতে চায় না।

বেশ খানিকটা ঝগড়াঝাঁটির পর আবার খাতাকলম নিয়ে হিসেব লেখা শেষ করে দুটো টান মেরে মোট কষতেন। তিন তিনবার যোগ করে লিখতেন সাড়ে চোদ্দ আনা।

"বাকী ছ' পয়সা?" মহীতোষবাবু প্রশ্ন করতেন।

"আবার ছ' পয়সা কোথায় পাবো, সবই তো খরচ হয়েছে। ভালো করে যোগ করে দেখো।"

"যোগ আমি ভালো করেই দিয়েছি।"

আবার খানিকটা কথা কাটাকাটি হতো। তারপর উপায় না দেখে মোট অঙ্কের নীচে মহীতোষবাবু লিখতেন, গরমিল—ছ' পয়সা।

মনটা বিষিয়ে যেতো, গরমিলের জন্যে নয়। একটা টাকা খরচের জন্যে। আগেকার পাতাগুলো উলটে দেখতেন, কোনো দিন দশ আনা, কোনো দিন সাত আনা। কিন্তু মাঝে মাঝে এই যে চাল, কয়লা, তেল ইত্যাদির মোটা খরচগুলো—দেখলেই ভয় পেতেন মহীতোষবাবু।

সত্যি, এভাবে খরচ করলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

ভবিষ্যৎ কেন, বর্তমানও। তবুও মাঝে মাঝে বছরে একদিন ফূর্তি হতো। মাইনে বাড়ার খবর শুনলেই। মাইনে বাড়তো। দু-পাঁচ থেকে দশ-পনরো পর্যন্ত।

মাইনে বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য টাকা জমিয়েছেন আরো বেশী।

কিন্তু কি করে যেন খরচও বেড়ে গিয়েছে। ছেলেমেয়েদের হালচাল বদলে গিয়েছে বলেই হয়তো।

মোটা শাড়ি আর পরতে চায় না অণিমা। অথচ বড় মেয়ে প্রতিমা পুজোয় প্রথম মিহি শাড়ি পেয়েছিলো। ছেলেও তেমনি কলেজে ঢুকেই ফুলশার্ট পরতে শুরু করলো। সিকি গজ কাপড় বেশী খরচ।

স্ত্রী চটে যেতেন।—"তুমি এখন আর তিরিশ টাকার কেরানী নও।"

না, ধাপে ধাপে চাকরিতে উন্নতি হয়েছে মহীতোষবাবুর। কেরানী থেকে ছোটবাবু। মাইনে দু শো পঁচিশ।

ইন্সিওর আর জমানো টাকায় সাত হাজার হয়েছে। কিন্তু ছোট মেয়ে গলায় গলায়। সম্বন্ধ ঠিক হলেই তিনটি হাজার টাকা বের করতে হবে। মোটামুটি একটা সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে, বাঁকিপুরের ছেলেটি এবার আই. এ. দেবে।

স্ত্রী বলেন, "অণির বিয়ে দিয়েই মন্টুর বিয়ে দেবো।"

চোখ কপালে তোলেন মহীতোষবাবু।—"মন্টুর? বি. এ. পরীক্ষা দিচ্ছে, চাকরি-বাকরি করুক, তারপর।"

"তুমি চাকরি করে বিয়ে করেছিলে?"

"করিনি বলেই তো সারা জীবন ঠেলা সামলাচ্ছি। না, না, উপায়ক্ষম না হলে ছেলের

বিয়ে দেবো না।"

ছেলের বিয়ের কথা পরে ভাবলেও চলবে। মেয়ের বিয়েটা আসল। ছেলের বাপ এসে মেয়ে দেখে, আর মহীতোষবাবু গিয়ে পণাপণ জিজ্ঞেস করেন। এদিক হয় তো ওদিক হয় না।

এইভাবে বছরের পর বছর যায়। এদিকে দু শো পঁচিশ থেকে তিন-চার লাফে একেবারে চার শো। ব্যাপার হলো, যুদ্ধ লেগে গেছে তাই সাহেবরা অনেকে চলে গেছে। কেউ যুদ্ধে, কেউ ভালো চাকরি পেয়ে। আর ধাপে ধাপে উঠে এসে বড়বাবু হয়ে গিয়েছেন মহীতোষবাবু। সুতরাং আই. এ. পাস ছেলের সঙ্গে ছোট মেয়ের বিয়ে দিতে পারেন না। রীতিমতো গ্র্যাজুয়েট পাত্র চাই। মানে তিন হাজারে আর হবে না, পাঁচ হাজার।

পণের কথা শুনে চটে যান মহীতোষবাবুর স্ত্রী। যত ধানচালের দাম বাড়ছে, চাষীদের হাতে টাকা আসছে, খুশিমতো সব পণ দিচ্ছে। বি. এ. পাস ছেলে কিনা পাঁচ হাজার?

মহীতোষবাবু হাসেন, "উঁহু, ব্ল্যাক, ব্ল্যাক! কালোবাজার বলে না? সেই কালোবাজার করে টাকা হয়েছে লোকের। বিয়ের পণেও তাই ব্ল্যাক মার্কেট হয়েছে।"

তবু উপায় নেই; শেষ পর্যন্ত ঐ পাঁচ হাজারেই বিয়েটা দিয়ে দিতে হলো মহীতোষবাবুকে।

তা বলে হিসেব এতটুকু আল্‌গা হতে দেননি। বাড়ি পালটাননি। কি হবে বেশী ভাড়া দিয়ে। ভবিষ্যৎ ভাবতে হবে তো। কিন্তু হিসেবের খাতাটাই তাঁর হাতে, জিনিসের দাম তো তাঁর হাতে নয়। মাইনে যত না বেড়েছে তার চেয়ে জিনিসের দাম।

সন্ধ্যেবেলায় চোখে চশমা এঁটে খাতাকলম নিয়ে বসেন মহীতোষবাবু। যথারীতি বলেন, "বাজারের হিসেবটা দাও।"

"মাছ দেড় টাকা।"

"দেড় টাকা? কাল তো এক টাকা দু আনা ছিলো।"

"চেঁচিয়ো না, জামাই রয়েছে ও ঘরে।...রসগোল্লা এনেছিলো আট আনার।"

"নাঃ, বড্ড বেহিসেবী হয়ে যাচ্ছো। রসগোল্লা কি পেট ভরে খাবার জন্যে? দুটো দিলেই পারো।"

স্ত্রী কথাগুলো গায়ে মাখেন না। বলেন, "আলু তেরো আনা।"

উপায় না দেখে লিখে চলেন মহীতোষবাবু।

"কয়লা এক টাকা দু আনা।"

একে একে সব লিখে দুটো লাইন টেনে যোগ করেন মহীতোষবাবু। তারপর খানিকটা কথা কাটাকাটির পর গরমিল লেখেন, এক টাকা দু পয়সা।

শুধু এক টাকা দু পয়সা নয়, সবই যেন কেমন গরমিল হয়ে যাচ্ছে। মাইনে বেড়েছে ধাপে ধাপে, মাছের সেরও আট আনা থেকে ধাপে ধাপে তিন টাকায় এসে পেঁৗছেছে। ঠিক যতখানি বাঁচাতে চান তিনি, জমছে না তা। আর যা জমছে তা...

মনে মনে একটা হিসেব করে নেন মহীতোষবাবু। ইন্সিওর চার হাজার, ব্যাঙ্কে সাত হাজার, প্রভিডেন্ট ফান্ড আর গ্র্যাচুইটি নিয়ে এগারো হাজার। মোট বাইশ হাজার থেকে পাঁচ হাজার গিয়েছে ছোট মেয়ের বিয়েতে। সেবার অসুখে চার মাস ভুগেছেন তা কোন না এক হাজার দেড় হাজার। দু মাস তো আধা মাইনে ছিলো। তারপর জামাইকে তত্ত্ব, পুজোর বাজার ইত্যাদির বাড়তি খরচও আছে।

ছেলেটার চাকরি-বাকরি একটা হলে হয়, জিনিসপত্তরের দাম যা চড়চড় করে বাড়ছে। চাল, কাপড়, ওষুধ, এমন কি বাড়িভাড়াও।

এরই ফাঁকে একটা দুর্ভিক্ষ চলে গেল। সে কি সাংঘাতিক দৃশ্য। ভাবলেও শিউরে ওঠেন মহীতোষবাবু।

'ফ্যান দাও মা', 'ফ্যান দাও মা'—নাকী কান্নায় রাত একটা পর্যন্ত ঘুমোতে পেতেন না, বিরক্ত হতেন লোকগুলোর উপর। সকালে অফিস যাবার সময় ফুটপাথে সারি সারি মড়া পড়ে থাকতে দেখেও এতটুকু দুঃখ হতো না। শুধু ভবিষ্যতের ভয়ে আঁতকে উঠতেন।

ভাবতেন, হাজার পনরো টাকা তো হাতে পাবো চাকরি ছাড়ার সময়। তাতে আর ক'টা দিন চলবে।

যাক, চালের দামটা বেড়ে আর দুর্ভিক্ষ হয়ে একটা কাজ হলো। র‍্যাশনিং হলো। র‍্যাশনিং-এ এক শো পঁচিশ টাকার চাকরি হলো মণ্টুর।

স্ত্রী ধরে বসলেন, "এবার বিয়ে দাও ছেলের।"

তা দিতেই হয়। বিয়ের বয়স পার হতে চললো ছেলের। সুতরাং...

মেয়েটেয়ে দেখে বিয়ে দিয়ে দিলেন শেষ পর্যন্ত।

বাপের অবস্থা দেখে বুদ্ধিসুদ্ধি হয়েছে ছেলেটার। তিন-চার বছরের মধ্যে ছেলেপিলে হলো না।

ছেলে হলো চার বছর বাদে। আর সেইবারেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে আসতে হলো মহীতোষবাবুকে। সব মিলিয়ে দেখলেন হাজার কুড়ি-বাইশ।

কিন্তু রোজগার শুধু মণ্টুর—মণ্টু নয়, এখন প্রিয়নাথ বলেন—এক শো পঁচিশ। ঐ মাগগী ভাতাটা নিয়ে। কিন্তু খরচ কমিয়ে কমিয়েও আড়াই শোর নীচে নামে না।

নাতিটা নাদুসনুদুস হয়েছে বটে, কিন্তু দুধ কি কম খায়? আর মেয়েরা মাঝে মাঝে আসে যায়, তাদের খরচ আছে।

যাক, ভগবান করুন, বেশী দিন না বাঁচতে হয়। কিন্তু সেই যে ছোটবেলায় ঠাকুমা বলেছিলো, মাথায় যত চুল তত বছর পরমায়ু হোক, তাই যেন হতে চলেছে।

পাঁচটা বছর যেতে না-যেতে বাইশ হাজারের অংক পনরো হাজারে নেমে এলো। নামছে না শুধু জিনিসের দাম। সব কিছুরই দাম বাড়ছে চড়চড় করে, দাম কমছে শুধু মানুষের।

"কই গো!" ডাকলেন মহীতোষবাবু।

"ডাকছো?" স্ত্রী এসে দাঁড়ালেন।

"হিসেবটা দাও। মাছ কত?"

"মাছ? মাছ কি রোজ আসে নাকি এখন?"

"ও! কয়লা এসেছে আজ?"

"হ্যাঁ, আধ মন।"

"আধ মন। এত কমে হচ্ছে এখন কি করে? আগে যে বলতে..."

"আরো কমে হবে। তখন আর রান্নাই হবে না।"

হ্যাঁ, সবই কিছু কিছু খরচ কমানো হচ্ছে। কমানো হচ্ছে না, কমে যাচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও জমানো টাকাও কমে যাচ্ছে মাসে মাসে।

"প্রিয়নাথ?" এবার ছেলেকেই ডাকলেন মহীতোষবাবু।

"ডাকছেন?" প্রিয়নাথ এসে দাঁড়ায়।

মহীতোষবাবু উসখুস করে বলেন, "মাইনে-টাইনে না বাড়লে তো...

"মাইনে বাড়বে?" হাসে প্রিয়নাথ।—"শুনছি র‍্যাশনিং উঠে যাবে।"

উঠে যায়ও। তবে অন্য একটা চাকরি পায় প্রিয়নাথ। তারপর সেটাও যায়, আরেকটা।

মহীতোষবাবু বুঝতে পারেন, হিসেবটা কোথায় যেন গরমিল হয়ে যাচ্ছে। হুঁ, পনরো হাজারটা নেমে এসেছে দশ হাজারে। তারপর দশ হাজার থেকে পাঁচ হাজার, পাঁচ হাজার থেকে ফুড়ুৎ।

নামতে নামতে হঠাৎ একদিন মহীতোষবাবু আবিষ্কার করেন, ছেলের গলগ্রহ হয়েছেন। জমানো টাকা একটাও নেই। ছেলের মাইনে দেড় শো হয়েছে, কিন্তু নাতিটার ইস্কুলের মাইনে যা, প্রিয়নাথের বেলায় কলেজে অত দিতে হয়নি। অসুখ হলেই আজকাল ছ' টাকার ওষুধ লাগে।

মাঝরাত পর্যন্ত জেগে বসে থাকেন। বলেন, "কি হবে বল তো।"

স্ত্রী রেগে যান।—"কেন, তুমি তো হিসেবী মানুষ, ভবিষ্যৎ ভাবতে দিনরাত।"

"হুঁ, তা তো ভেবেছি। কিন্তু আমার হিসেবটা যে মিললো না গো। টাকায় যখন পনরো সের চাল, তখন না খেয়ে টাকা জমিয়েছি। সুদে বেড়ে যা হাতে পেলাম, তাতে দু সের চাল হয় না।"

স্ত্রী রেগে যান।—"তখন পইপই করে বলিনি, এখন খেয়ে বাঁচি, শেষজীবনে নয় ভিক্ষে করবো।"

মহীতোষবাবু হেসে বলেন, "ভিক্ষে তো করতেই হবে।"

"তা হবে, কিন্তু তখন খেলে ভাবতুম, একদিন পেট ভরে খেয়েছি। পেট ভরে খেতেও পেলাম না, ভিক্ষেও করতে হলো।"

মহীতোষবাবু চুপ করে বসে থাকেন। কি যেন ভাবেন।

হঠাৎ জিজ্ঞেস করেন, "কেন এমন হলো বলো তো?"

স্ত্রী কর্কশ গলায় বলেন, "কেন আবার, কপাল।"

"কপাল? তাই হবে হয়তো।"

পরের দিনই খুঁজে খুঁজে পুরোনো তোরঙ্গ থেকে কোষ্ঠীটা বের করলেন মহীতোষবাবু। যখন ধাপে ধাপে উন্নতি হয়েছিলো, তখন একবার কোষ্ঠী নিয়ে বসেছিলেন। ধাপে ধাপে একেবারে নীচের তলায় নেমে এসে আবার কোষ্ঠীটা খুলে বসলেন।

দিনরাত কেবল কোষ্ঠীটা মেলে ধরে দেখেন মহীতোষবাবু। আঁকজোক কষেন, পাঁজি দেখেন। আর মাঝে মাঝে বলেন, "শনির বক্রীটা কেটে গেলে হয়তো..."

কিংবা, বৃহস্পতি চতুর্থে এসে পড়লেই...কখনো, মঙ্গল ব্যয়স্থ রয়েছে...

শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে যায় মহীতোষবাবুর স্ত্রীর। বলেন, "কি করছো দিন-রাত। নিজের কুষ্ঠিটা নিয়ে বসে না থেকে, রাস্তায় গিয়ে বসলেও তো পারো খড়ি পেতে, দুটো পয়সা আসে।"

বোকার মতো হাসেন মহীতোষবাবু।—"বলছো?"

"হ্যাঁ বলছি, কেন শুনতে পাচ্ছো না, কানের মাথা খেয়েছো?"

হাসেন মহীতোষবাবু অপ্রতিভের মতো। বলেন, "তা মন্দ নয়, দুটো পয়সা..."

"তা রাহু আপনার অষ্টম থেকে সরে গেলেই..."

পার্কটার পাশ দিয়ে ফিরে আসতে আসতে কথাটা শুনেই তন্ময়তা ভেঙে গেল।

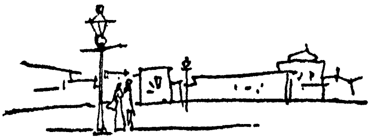
কি ছাইভস্ম ভাবছিলাম এতক্ষণ।

কিন্তু...কই না, এ তো অন্য একজন গনৎকার।

ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম। না, যেখানটায় মহীতোষবাবু একটু আগে বসে ছিলেন, সেখানে নেই। শুধু ফুটপাথের উপর খড়ির দাগগুলো পড়ে আছে। পুঁথিপত্রও নেই, মহীতোষবাবুও নেই।

হিসেবে বোধ হয় আবার গরমিল হয়ে গিয়েছে মহীতোষবাবুর। হিসেবের খাতাটাই আছে মহীতোষবাবুদের হাতে, হিসেব লেখবার মালিক হলে কি হবে, হিসেব ঠিক করবার মালিক তো নন।

[১৩৬৪



ঠগ

গ্রীষ্মের ছুটিতে মামাবাড়ি যাচ্ছিলাম। ভিড় ঠেলে কোনোরকমে বাক্স বেডিং তুলে থার্ড ক্লাস কামরার এক পাশে একটু জায়গা করে নিয়ে সবে গুছিয়ে বসেছি, দেখি কি, মাঝখানের দুটো বেঞ্চি পার হয়ে ওদিক থেকে এক জোড়া চোখ ভুরু কুঁচকে আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

চোখ ফিরিয়ে নিলাম সঙ্গে সঙ্গে, কারণ যিনি তাকিয়ে ছিলেন তিনি পুরুষ নন, মহিলা। বয়সে আমার চেয়ে বেশ কিছু বড়।

আমার প্রায় মুখোমুখি বসে ছিলেন তিনি। মাঝখানে শুধু দু বেঞ্চি মাথা দুলতে শুরু করেছিলো ট্রেনটা ছেড়ে দেওয়ার পর থেকে। তাদের মাথার দোলানিতে অবশ্য ভদ্রমহিলার মুখটা এক-একবার ঢাকা পড়ছিলো, এক-একবার দেখা যাচ্ছিলো।

দেখা গেলে কি হবে, আমি চোখ তুলে তাকাতে পারিনি। কারণ, যতবার আড়চোখে তাকাই ততবারই দেখি তিনি ঠায় একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। দু-একবার সন্দেহ হলো তিনি যেন ঠোঁট টিপে মুচকি মুচকি হাসছেন আমার অস্বস্তি দেখে।

ফর্সা গোলগাল মুখ, সিঁথিতে চওড়া সিঁদুর, হাতে কি একটা বইও ছিলো। মাঝে মাঝে তিনি সেটা পড়বার চেষ্টা করছিলেন, আর থেকে থেকে তাকাচ্ছিলেন আমার দিকে।

সে যে কি অস্বস্তি, বলে বোঝাতে পারবো না। আমি তাই ইচ্ছে করেই জানালায় মুখ গলিয়ে অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করলাম।

ট্রেন তখন বেশ জোরে চলতে শুরু করেছে।

অনেকক্ষণ জানালায় গলা বাড়িয়ে থাকার জন্যে ঘাড় টনটন করছিলো, মাথা তুলতেই তাঁর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল।

আর সঙ্গে সঙ্গে মুচকি হেসে তিনি বলে উঠলেন, কি রে, চিনতে পারছিস না?

বেশ জোরেই বললেন, যাতে দুটো বেঞ্চি পার হয়ে কথাটা আমার কাছে এসে পেঁছিয়।

চমকে উঠলাম প্রশ্ন শুনে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম তাঁকে। কিন্তু চিনতে পারলাম না। আমাকে বোধ হয় সে মুহূর্তে খুব অসহায় দেখালো।

আমার অবস্থা দেখে হাসলেন তিনি। বললেন, এ লাইনে কোথায় যাচ্ছিস? মামাবাড়ি?

বললাম, হ্যাঁ।

তারপর নানা প্রশ্ন। বাবা ভালো আছেন? মা কাশী থেকে ফিরেছেন? মীনার বিয়ের কিছু ঠিক হলো? নিমু চাকরি-বাকরি পেলো? আর একটার পর একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে চলেছি আমি।

হঠাৎ একবার থেমে পড়ে বললাম, উত্তর দেবো না আপনার কথার।

সশব্দে হেসে উঠলেন তিনি। বললেন, কেন?

বললাম, এত সব জিজ্ঞেস করে গেলেন, অথচ আপনাকে চিনতেই পারলাম না।

উত্তর এলো, তুই বল্ না আমি কে!

বললাম, সত্যি চিনতে পারছি না।

ভদ্রমহিলার মুখ থেকে হাসি সরে গেল। ক্রমে ক্রমে মুখখানা গম্ভীর হয়ে গেল তাঁর। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বললেন, আমি তোর সেজোমামীমা।

উত্তর দিতে তিনি যেন বেশ একটু অস্বস্তি বোধ করলেন। কিন্তু উত্তর শুনেও আমি চট্ করে বুঝে উঠতে পারলাম না।

মনে মনে আমি তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোলপাড় করছি। সেজোমামীমা? এ কেন সেজোমামীমা হবে!

এদিকে ট্রেন তখন এসে দাঁড়িয়েছে একটা ছোট্ট স্টেশনে; তাড়াহুড়ো করে সেই স্টেশনেই নেমে গেলেন তিনি। ট্রেন আবার ছেড়ে দেবার মুহূর্তে ফিরে তাকিয়ে মুচকি হেসে বিদায় জানালেন।

আর স্টেশনের নামটা চোখে পড়তেই মনে পড়ে গেল। আরে, এ তো করনডিহির মামীমা, আমাদের বুলুমামীমা।

আশ্চর্য, বুলুমামীমাকে একেবারে চিনতেই পারিনি। অনুশোচনায় মন ভরে গেল। ব্যথায় টনটন করে উঠলো বুকটা।

আশ্চর্য। যার কথা আমরা কোনো দিন ভাবিনি, যার কোনো খবরই রাখিনি এতকাল, তিনি দেখেই চিনতে পারলেন, কথাবার্তায় মনে হলো সব খবরই রাখেন আমাদের. সম্পর্কটা আমরাই মুছে ফেলেছি, তিনি কিন্তু মনে মনে পুষে রেখেছেন সব স্মৃতি।

আমি তোর সেজোমামীমা।

কথাটা বারবার গুনগুন করলো মনের মধ্যে। চেহারাটা তাঁর বদলে গেছে বলেই কি? না মন থেকে তাঁকে মুছে ফেলেছি বলেই চিনতে পারলাম না?

সেজোমামীমা বলতেই চোখের সামনে অন্য একটি মুখ ভেসে উঠেছিলো। যে মুখ গত দশ-বারো বছর ধরে দেখে আসছি। মামাদের সমস্ত সংসারটি যিনি বাসুকির মতো ধারণ করে আছেন মাথার ওপর। খেতে ভালোবাসি বলে সারা গাঁ খুঁজে যিনি মাগুর মাছ যোগাড় করে আনেন। ইঁচড়ের তরকারি রাঁধেন চমৎকার। অর্থাৎ রানীমামীমাকেই আমরা সেজো-মামীমা বলে জানি। আর ট্রেনে দেখা ইনি হলেন বুলুমামীমা।

ব্যাপারটা হলো এই যে সেজোমামার দুটো বিয়ে।

রানীমামীমা আর বুলুমামীমা।

দাদামশাই ছিলেন ও তল্লাটের বড় জমিদার। কত বড় তা ভাঙা পুরোনো কাছারিবাড়িটা দেখলেই বোঝা যায়। বিয়ের সময় ধুমধামও কম হয়নি! ব্যান্ড বাজানোর দল এসেছিলো কোলকাতা থেকে, কারবাইডের আলোয় সাজানো হয়েছিলো চতুর্দিক. আর নিমন্ত্রিতের সংখ্যা দু হাজারেরও বেশী।

সেসব ছবি এখনো আমার চোখের সামনে ভাসে। স্পষ্ট মনে পড়ে সব।

দাদামশাই দামী শাল গায়ে দিয়ে রুপোর পাতে মোড়া ছড়ি হাতে হুকুম দিচ্ছেন সকলকে, আদর-আপ্যায়ন ঠিক হচ্ছে কি না তদারক করছেন। আর সকলেই তটস্থ, ছোটখাট কোনো গাফিলতির জন্যে দাদামশাই না চটে যান। চটে গেলে কারও রক্ষে নেই. প্রলয়কাণ্ড বাধিয়ে বসবেন।

সত্যি কথা বলতে কি, দাদামশাইকে মামারাও ভয় পেতো। আমরা তো অনেক সময় কাছে যেতেই সাহস পেতাম না। কারণ, এমনি সকলের সঙ্গে হেসেখেলে কথাবার্তা বলতেন বটে, কিন্তু তাঁর হুকুমকে ভয় পেতো সকলে। একবার যা মুখ থেকে বের হবে তার নড়চড় হবে না।

বিয়ে যখন ঠিকঠাক, বাবা নাকি বলেছিলো, যার বিয়ে তাকে একবার মেয়ে দেখে আসতে বললে হতো না?

দাদামশাই হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

বলেছিলেন, মেয়ের বাপ তার মেয়েকে বিয়ে দিচ্ছে আমার ছেলের সঙ্গে। পাত্র দেখে যদি বিয়ে দিতো তো পাত্রের মতামতের কথা উঠতো।

আর এই কথাই শেষ পর্যন্ত বহাল রইলো। নিজে মেয়ে দেখতে যেতে পেলেন না সেজো-মামা।

বিয়ের পর টোপর-পরা সেজোমামার পিছনে পিছনে গাঁটছড়া বাঁধা রানীমামীমা যখন এসে নামলেন গাড়ি থেকে, তখন সব আশঙ্কা মুহূর্তে মিলিয়ে গেল।

এমন রূপ নতুন বউয়ের?

সবাই তারিফ করলো দাদামশাইকে।

বললে, পছন্দ বটে, খুঁজে খুঁজে সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটিকেই ছেলের বউ করে এনেছেন।

তারিফ শুনে খুশির হাসি হাসলেন দাদামশাই।

বললেন, দেখো বাপু, বুড়ো বয়সটার একটা দাম আছে। ছেলেছোকরারা ভুল করতে

পারে, কিন্তু বুড়োরা ভুল করে না।

সবাই স্বীকার করলো সে কথা।

রানীমামীমা যে শুধু দেখতেই সুন্দর ছিলেন তাই নয়, গুণও ছিলো অনেক। মাস কয়েক যেতে না-যেতে সে পরিচয়ও পাওয়া গেল। সব সময়ে মুখে হাসি লেগে আছে। সংসারের যে কাজই হোক, সব-প্রথমে এগিয়ে আসবেন রানীমামীমা। শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা, ছোটদের যত্নআত্তি থেকে পুজোপার্বণের ব্যবস্থা, সব দিকেই চোখ তাঁর। শত বিপদ-আপদেও মুখে হাসি লেগেই আছে!

কিন্তু সে আর কতদিন। বছর না ঘুরতেই অঘটন ঘটে গেল একদিন।

দাদামশাই বসে বসে তেল মাখছিলেন।

রানীমামীমা সামনের কুয়োয় জল তুলছিলেন দাদামশাইয়ের স্নানের জন্যে। বাড়িতে চাকরবাকর যথেষ্ট থাকলেও দাদামশাই নিজের হাতে তেল মাখতেন, আর রানীমামীমা নিজের হাতে জল তুলে দিতেন তাঁর স্নানের জন্যে।

এদিকে তেল মাখতে মাখতে হঠাৎ দাদামশাইয়ের চোখ গেল রানীমামীমার পায়ের দিকে।

তাঁর পায়ের গোড়ালির ওপর চোখ পড়তেই কপাল কুঁচকে উঠলো দাদামশাইয়ের।

গম্ভীর গলায় ডাকলেন, সেজোবউমা! এদিকে এসো তো একবার।

ঘোমটাটা একটু টেনে রানীমামীমা হাসিমুখে কাছে এসে দাঁড়ালেন।

দাদামশাই একটা আঙুল দেখালেন রানীমামীমার গোড়ালির দিকে। গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলেন, কি এটা?

আমিও দেখিনি তার আগে। দেখে শিউরে উঠলাম। শ্বেতির দাগটুকু দেখে ঘৃণায় আতঙ্কে সরে এলাম।

রানীমামীমা চুপ করে রইলেন। কোনো উত্তর দিতে পারলেন না। কিই বা উত্তর দেবেন এ প্রশ্নের।

দাদামশাই আবার প্রশ্ন করলেন, কতদিন হয়েছে?

রানীমামীমা এবারও কোনো উত্তর দিলেন না।

দাদামশাই জিজ্ঞেস করলেন, বিয়ের আগে থেকেই আছে?

রানীমামীমা মাথা নীচু করে পায়ের নীচে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে বললেন, হ্যাঁ।

আর কোনো কথা হলো না। তোলা জল হুড়হুড় করে ঢেলে দিলেন দাদামশাই, নিজে জল তুলে স্নান সেরে বেরিয়ে গেলেন বৈঠকখানায়।

সারা বাড়ি তখন থমথম করছে। সকলের মুখে-চোখে আতঙ্ক! দাদামশাইয়ের ভাবগতিক দেখে সকলেই বুঝতে পারলো ঝড়ের পূর্বাভাষ এটা।

একে একে কানাঘুষো, ফিসফাস বন্ধ হলো। শুনলাম, দাদামশাই নাকি রানীমামীমার বাবাকে চিঠি দিয়েছেন অপমান করে। চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, তাঁর মেয়েকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য।

সপ্তাহখানেক পরেই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন রানীমামীমার বাবা। পায়ে ধরে ক্ষমা চাইলেন, কত কি বোঝাতে চাইলেন, কিন্তু দাদামশাই এতটুকু নরম হলেন না। সকলেই বুঝতে পারলো, তাঁর মত বদলানো যায় না।

এদিকে রানীমামীমার অত সুন্দর চেহারা, এক সপ্তাহেই কালি হয়ে গেছে। তিন মাসের রুগীর মতো পাংশু মুখ, চোখের কোলে দুশ্চিন্তার দুঃখের ছায়া। শরীরে কোথাও যেন এক ফোঁটা রক্ত নেই। দেখলেই মনে হয় যেন কান্না থমকে আছে চোখের আড়ালে। কানা অবধি ভরতি জলের গেলাসের মতো, একটু নাড়া দিলেই যেন উপচে পড়বে।

বাবা বোঝাবার চেষ্টা করলেন, মামারা বোঝাবার চেষ্টা করলেন। এমন কি দিদিমাও রাগ করে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করলেন। কিন্তু দাদামশাইয়ের সেই এক কথা।—এ রোগ আমাদের বংশে কারও কখনো হয়নি, এ রোগে আমাদের বংশ নষ্ট হতে দেবো না।

গাঁয়ের ডাক্তারকে ডেকে আনা হলো, তিনি বোঝালেন, এটা এমন কিছু ভয় পাবার মতো রোগ নয়। ছোঁয়াচে তো নয়ই।

কিন্তু কে শোনে কার কথা।

শেষ পর্যন্ত দিদিমা বললেন, তুমি কি পাগল হয়েছো, বউমার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারোনি? এ সময় কি যাও বললেই যাওয়া চলে?

সে কি? চমকে উঠলেন দাদামশাই। দিদিমার ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, তা হলে আর কোনো কথা চলে না, ও মেয়েকে আমার বাড়ির বউ করে রাখতে পারি না। ও রোগ জন্মগত।

কান্নাকাটি অনুরোধ-উপরোধ কিছুই টিকলো না। রানীমামীমাকে চলে যেতে হলো।

রানীমামীমা চলে যাওয়ার পর থেকে পরিবর্তন শুরু হলো সেজোমামার। সব সময়ে চুপচাপ বসে কি যেন ভাবেন, একা একা থাকেন, কথা বললে বিরক্ত হন।

দাদামশাইয়ের কাছে চাপা থাকলেও আর-আর সকলেই জানতো। আগে জানালে হয়তো বিয়েই হতো না, এই আশঙ্কায় এটুকু চেপে রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন রানীমামীমার বাবা। বিয়ের পরই নাকি কাঁদতে কাঁদতে সে কথা সেজোমামাকে বলেছিলেন রানীমামীমা।

সেজোমামার দিক থেকে কোনো ক্ষোভ ছিলো না, কোনো আক্ষেপ ছিলো না তার জন্যে।

তাই সবচেয়ে বেশী আঘাত পেলেন সেজোমামা নিজে। আরো আঘাত পেলেন যখন দাদামশাই বলে বসলেন, ছেলের আবার বিয়ে দেবো আমি।

বেঁকে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন সেজোমামা।

সেই প্রথম বোধ হয় দাদামশাইয়ের বিরুদ্ধে কেউ বিদ্রোহ করার সাহস পেলো।

বাধা পেয়ে আরো রেগে গেলেন তিনি। ঘটককে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন মেয়ে দেখতে।

ফিরে এলেন পাত্রী দেখে, বিয়ের দিন পাকাপাকি করে।

খবর পেয়ে রানীমামীমার বাবা চিঠি লিখলেন, মেয়েকে বড় ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা করাচ্ছেন, সেরে উঠবে আশা দিয়েছেন ডাক্তার।

দাদামশাই হাসলেন চিঠি পেয়ে। সেরে যাবে? ও বিষ দূর করা কি সহজ কথা? পায়ের গোড়ালিতে আছে এখন, ক্রমশ সর্বশরীরে হবে। শ্বেতি ভীষণ রোগ, ধবলও যা শ্বেতকুষ্ঠও তাই। আপত্তি তো শুধু রোগের জন্য নয়। মেয়ের বাপ তাঁর সঙ্গে এমন প্রবঞ্চনা করলো কেন। আগে জানায়নি কেন? সেরে গেলেও ও ঠগ-জোচ্চোরের মেয়েকে বাড়ির বউ করে আনবেন না তিনি।

সেজোমামা বেঁকে দাঁড়ালেন, বিয়ে করবো না আমি, বিয়ের শখ আমার মিটে গেছে।

বিয়ে করবে না? রেগে আগুন হয়ে উঠলেন দাদামশাই, হুমকি দিলেন, ত্যাজ্যপুত্র করবেন বলে শাসালেন। শেষে কোনো কিছুতেই যখন কাজ হলো না—আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে বসলেন, বিয়ের দিন ঠিক করে ভদ্রলোককে কথা দিয়ে এসেছি আমি, আমার সম্মান যদি না রইলো তো বেঁচে থেকে কি লাভ। আমি আত্মঘাতী হবো।

শেষ পর্যন্ত সাহস হারালেন সেজোমামা। বিয়ে করতে রাজী হলেন।

বিয়ে হয়ে গেল। রানীমামীমার বদলে এলেন বুলুমামীমা।

সকলেই ভেবেছিলো দু-দিন পরেই সংসারের চাকা আবার সচল হবে। আবার সুস্থভাবে জীবন শুরু হবে সেজোমামার।

ভুল বুঝেছিলো সকলে।

দাদামশাইয়ের বিরুদ্ধে সেজোমামার যত আক্রোশ সব গিয়ে পড়লো বুলুমামীমার ওপর। যেন সংসারের সমস্ত অশান্তির জন্যে বুলুমামীমাই দায়ী।

বুলুমামীমার সঙ্গে ভালো করে কথাও বলতেন না সেজোমামা। পরিবারের অন্য সকলেও তাঁর সঙ্গে কেমন একটা দূরত্ব রেখে চলতো। তাই জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো বুলুমামীমার। টিকতে পারলেন না।

ছাই-চাপা আগুনের মতো বিতৃষ্ণায় জ্বলছিলেন বুলুমামীমা। হঠাৎ একদিন কি একটা সামান্য ব্যাপার থেকে তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে তুললেন। রাগারাগি করে বাপের বাড়ি চলে গেলেন। আর ফিরলেন না।

সেজোমামা ফিরিয়ে আনতে গিয়ে একাই ফিরে এলেন।

দাদামশাই চিঠি দিলেন, তার উত্তর এলো না।

সবই লক্ষ করছিলেন দাদামশাই, মুখ বুজে সহ্য করছিলেন সব কিছু। বুঝেছিলেন, ইচ্ছে থাকলে মানুষকে সবই দেওয়া যায়, দেওয়া যায় না শান্তি। বুলুমামীমার অশান্তি, সেজোমামার অশান্তি, সংসারের অশান্তি দেখতে দেখতে কঠিন অসুখে পড়লেন তিনি। বেশ কিছু দিন রোগে ভুগে মারা গেলেন।

মৃত্যুর খবর পেয়েই ছুটে এলেন রানীমামীমা। কোলে তখন তাঁর ছোট্ট একটি মেয়ে। যে মেয়ের জন্মের খবর পেয়েও সেজোমামাকে দেখতে যেতে দেননি দাদামশাই।

পাছে দিদিমা পা সরিয়ে নেন এই ভয়ে স্পর্শ বাঁচিয়ে প্রণাম করলেন রানীমামীমা। দিদিমা কিন্তু দূরে সরে থাকতে পারলেন না। দু হাত বাড়িয়ে ফুটফুটে নাতনীটিকে কোলে তুলে নিলেন।

বললেন, সেজোবউমা, ভগবান যা দিয়েছেন তাকে ঘৃণা করা চলে? তোমার পায়ে যা হয়েছে তা তো আমার ছেলের গায়েও হতে পারতো। তখন কি তাকে ফেলে দিতাম?

সে কথা শুনে দিদিমাকে জড়িয়ে ধরে রানীমামীমার সে কি কান্না। দিদিমাও কাঁদলেন, বাড়ির সকলেই কাঁদলো।

চোখের জলে সব বিষ, সব অভিশাপ ধুয়ে মুছে গেল। শান্তি নামলো সংসারে।

কিন্তু দিন কয়েক পরেই বুলুমামীমাও এসে হাজির হলেন। শ্বশুরের মৃত্যুর খবর জেনেও কি করে আর দূরে থাকেন।

বুলুমামীমা প্রণাম করে উঠতেই ছোট্ট ফুটফুটে নাতনীটিকে তাঁর কোলে দিয়ে দিদিমা হেসে বললেন, এই নাও তোমার মেয়ে, এবার থেকে তোমার।

—মেয়ে? কার মেয়ে? বিস্ময়ে চোখ কপালে উঠলো বুলুমামীমার!

এদিকে পরিচয় পেয়েই রানীমামীমা ছুটে এলেন। বোনের মতো স্নেহের আলিঙ্গনে বুলুমামীমাকে কাছে ডাকলেন।

কিন্তু বুলুমামীমার চোখে তখন আরো বিস্ময়। যেন ঠিক এমনটি আশা করেননি তিনি। বোধ হয় অন্য কিছু ভেবেছিলেন, অন্য কি কল্পনা।

যেমন এসেছিলেন হঠাৎ, তেমনি হঠাৎ চলে গেলেন তিনি। কেন চলে গেলেন কেউ বুঝতে পারলো না।

তারপর আর ফিরে আসেননি বুলুমামীমা। হয়তো দশ, হয়তো বারো বছর পার হয়ে গেছে, কিন্তু কোনো দিন তাঁকে ফিরিয়ে আনার কথা কল্পনাও করেননি সেজোমামা।

প্রথম প্রথম আলোচনা হতো, দু-একবার নাম উঠতো বুলুমামীমার। কেউ শুধু তাঁরই দোষ দেখতো, কেউ বলতো, তাঁর কোনো অপরাধ নেই।

এমনি করেই কখন যে সকলের মন থেকে বুলুমামীমার নাম মুছে গেল, কখন যে আমরা তাঁকে একেবারে ভুলে গেলাম, তা বুঝতে পারিনি। তিনি বেঁচে আছেন কি নেই, থাকলে কোথায় আছেন, কেমন আছেন, এসব প্রশ্নও মনে জাগেনি কোনো দিন।

দশ-বারো বছর পরে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল সেই বুলুমামীমার সঙ্গে। চেহারা একেবারে বদলে গেছে। দেখে চেনাই যায় না।

তারপর স্টেশনের নামটা দেখে মনে পড়ে গেল। কিন্তু তখন আর সময় নেই, ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে।

বাড়ি পেঁছে খবরটা না জানিয়ে থাকতে পারলাম না।

সকলের সামনেই বললাম, আজ একটা ব্যাপার হয়েছে। বুলুমামীমা—করনডিহির মামীমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ট্রেনে।

সকলেই চমকে উঠলো। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সমস্ত ঘটনার আনুপূর্বিক বর্ণনা দিলাম। বললাম, বুলুমামীমা কিন্তু আমাদের সব খবরই রাখেন। আমরাই শুধু তাঁর কোনো খবর রাখি না।

সকলেই গম্ভীর হয়ে গেল। কেউ কোনো কথা বললো না। শুধু সেজোমামার মুখখানা হঠাৎ কেমন যেন বদলে গেল, কেমন যেন চাপা কান্নায় থমথম করছে। মাথা নীচু করে বসে রইলেন।

তারপর একসময় সকলে উঠে যেতে সেজোমামা ফিসফিস করে বললেন, হ্যাঁ রে, আমার

কথা কিছু জিজ্ঞেস করলো?

বললাম, কই না তো।

—কিছু জিজ্ঞেস করলো না?

বললাম, না।

চুপ করে রইলেন, কোনো কথা বললেন না আর।

অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ওর আর কি দোষ বল, সব দোষ তো আমাদেরই।

বললাম, যাও না সেজোমামা, গিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে এসো তুমি। এভাবে একটা জীবন নষ্ট হবে চোখের সামনে?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সেজোমামা বললেন, তাই ভাবছি। হ্যাঁ যাবো, ফিরিয়ে আনতে যাবো আমি। কাল সকালের ট্রেনেই।

বলে স্যুটকেস গুছোতে শুরু করলেন সেজোমামা। রানীমামীমা নিজেই স্যুটকেস গুছিয়ে দিলেন। বললেন, সত্যি তো, দোষ আমাদেরই, যাও ফিরিয়ে নিয়ে এসো ওকে।

পরের দিন ভোরবেলাতেই ট্রেন।

ভোরবেলায় ঘুম ভাঙতে দেখি সেজোমামা তখনো ঘুমোচ্ছেন। ডেকে বললাম, করনডিহি যাবে না?

সেজোমামা ঘুম-ঘুম চোখেই বললেন, বড় ঘুম পাচ্ছে রে, এখন থাক, দশটার ট্রেনে যাবো।

দশটার সময় খোঁজ নিয়ে জানলাম, একটা কাজ সেরে আসতে গেছেন সেজোমামা।

ফিরে এসে বললেন, বড় দেরি হয়ে গেল রে, বিকেলের ট্রেনেই যাবো।

বিকেলবেলায় বললেন, শরীরটা ভালো নেই, তা ছাড়া পরের সপ্তাহে তো ওদিক দিয়ে যেতেই হবে, তখনই বরং...

পরের সপ্তাহে ফিরে আসতেই বললাম, করনডিহি গিয়েছিলে?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সেজোমামা বললেন, যাওয়া আর হলো কই। যা কাজের চাপ।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বললেন, কোন মুখেই বা যাবো বল।

জিজ্ঞেস করলাম, কেন?

উত্তর এলো, বাবাকে যদি ঠগ-জোচ্চোর বলে অপমান করে। মেয়ে দেখতে গিয়ে বাবা যে তোর রানীমামীমার কথা একেবারে চেপে গিয়েছিলেন।

চমকে উঠলাম সেজোমামার কথা শুনে। রানীমামীমার গোড়ালির সেই সাদা দাগটুকু দেখে একদিন দাদামশাই যেমন চমকে উঠেছিলেন।

বহু দিন আগে দাদামশাইয়ের মুখে শোনা 'প্রবঞ্চনা' কথাটা হঠাৎ যেন কানে বাজলো, যেন দাদামশাইকেই বিদ্রূপ করে উঠলো কথাটা।

[১৩৬৪



নতুন চশমা

লহনার সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেল। সেই লহনা—যার সঙ্গে আর একবার দেখা করার অদম্য বাসনায় কতদিন বেলেঘাটার সেই পরিচিত গলির মুখ পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এসেছি।

আর কি আশ্চর্য, এখানে আসার পূর্বমুহূর্তেও ভাবতে পারিনি, এভাবে এই বিয়ে-বাড়িতে লহনাও আসতে পারে। জানতাম না যার বিয়ে, সেই মহুয়ার সঙ্গে আত্মীয়তার বা বন্ধুত্বের সূত্রে লহনা এত ঘনিষ্ঠ।

বাড়িটার সামনে বেশ খানিকটা সবুজ ঘাসে ঢাকা বাগান, আর সেই বাগান ঘিরে লাল শালুর আস্তরণ, নানা রঙের নকশা-কাটা চাঁদোয়া আর উজ্জ্বল আলোর সারি। লোহার ফটকের মাথায় রোশনচৌকি। করুণ মধুর সুরে সানাই বেজে চলেছে একটানা। মনটা আপনা থেকেই কেমন যেন বিষাদ বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। এই আলো, এই সুর আর সুসজ্জিতা মেয়েদের রঙ-ঝলমল শাড়ি-কাঁপানো উচ্চকিত হাসির উচ্ছল উল্লাস।

মহুয়ার দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিলাম। আর তখনই আমাকে পাশ কাটিয়ে যেতে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে ফেললো মেয়েটি, যে ধরনের ধাক্কা বিয়ে-বাড়িতে প্রায়ই লাগে। যা কিনা সবাই উপেক্ষা করে, মেয়েরাও।

ধাক্কা লাগতেই হঠাৎ সে ফিরে তাকালো। বোধ হয় লজ্জিত ভঙ্গিতে একটু ক্ষমাপ্রার্থনার ভ্রূবিলাস দেখিয়েই চলে যেতো সে। কিন্তু চোখে চোখ পড়ার পর একটি মুহূর্ত শুধু, তার পরই লহনার চোখে যে ভাব ফুটে উঠলো তা শুধু পরিচিত কাউকে চিনতে পারার মুহূর্তেই ফুটে ওঠে। কিন্তু পরক্ষণেই কেমন একটা অস্বস্তির ছায়া পড়লো তার মুখে-চোখে।

বিস্মিত হয়েছিলাম, কারণ লহনাকে এখানে এভাবে দেখতে পাবো কোনো দিন কল্পনাও করিনি।

মুগ্ধ হয়ে তাকিয়েছিলাম ওর মুখের দিকে। অস্ফুটে বলে উঠেছিলাম, লোনা, তুমি!

খিলখিল করে হেসে উঠলো লহনা, বললে, দাঁড়াও একটু, আসছি। বলে যেমন ছুটে যাচ্ছিলো তেমনি ছুটে চলে গেল।

আর সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকের মধ্যে যেন আনন্দের নূপুর বেজে উঠলো।

না, চিনতে ভুল হয়নি লহনাকে। অথচ একদিন, যখন প্রতি মুহূর্তে লহনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে, লহনার দেখা পাওয়ার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকতাম, তখন কতবার ভুল হয়ে গেছে।

নতুন চাকরি নিয়ে সেবার দিল্লি যাচ্ছি। ট্রেন ছাড়ার শেষ পলকে এসে পেঁছিলাম স্টেশনে। ছুটতে ছুটতে এসে যে কামরা সামনে পেলাম সেই কামরাতেই উঠে পড়লাম। বাঙ্কের ওপর স্যুটকেসটা রেখে সবে ওদিকের বার্থে চোখ পড়েছে, মনে হলো লহনা বসে রয়েছে—জানলায় চিবুক রেখে বাইরের দিকে তাকিয়ে। আর একটু হলেই হয়তো নাম ধরে ডাকতাম। কিন্তু তার আগেই মহিলাটি ফিরে তাকিয়েছেন।

দেখলাম, লহনা নয়।

তখন বোধ হয় একটা নামই মনের মধ্যে বারবার ধ্বনি তুলতো, এই একটি মুখই বার-বার চোখের সামনে ভেসে উঠতো। তাই যেখানে গিয়েছি সেখানেই লহনাকে খুঁজে পেতে চেয়েছি।

বেলঘরিয়ায় যেবার এক্জিবিশন হলো, সারা কলকাতা ভেঙে পড়লো, অত অত মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে গিয়েছিলাম, সে কি অকারণেই?

সত্যি বলতে কি, মনের মধ্যে একটা ভয় চাপা পড়ে থাকতো, মনে মনে জানতাম, লহনার

সঙ্গে দেখা হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। দেখা হবে না আর। তাই মনে মনে একটা-না-একটা দৃশ্য কল্পনা করে নিতাম, যেন হঠাৎ দেখা হয়ে গেছে তার সঙ্গে। আর এমনি অদ্ভুত উদ্ভট সব কল্পনা দিয়েই আসল ভয়টুকু চেপে রাখতাম।

কিন্তু কি আশ্চর্য, লহনার সঙ্গে দেখা হওয়া যে এত সহজ, তা কোনো দিন কল্পনাও করিনি।

তাই বিস্ময়ের ঘোর কাটতেই অস্ফুটে বললাম, লোনা, তুমি!

হাসলো লহনা, বললে, দাঁড়াও একটু, আসছি। বলে ছুটে চলে গেল।

আর সঙ্গে সঙ্গে মুখে চন্দনের ফোঁটা, পরনে বেনারসী, বধূবেশে সজ্জিতা মহুয়া ডাক দিলো।—এতক্ষণে আসার সময় হলো বুঝি?

বললাম, না, এসেছি অনেকক্ষণ।

একটু চুপ করে থেকে আবার প্রশ্ন করলে, লহনা বউদিকে চেনো তুমি?

বললাম, চিনি কি না বলতে পারি না, চিনতাম।

মহুয়া হেসে বললে, ওই তো নিখিলেশদার বউ।

—নিখিলেশদা? বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করলাম আমি।

আর মহুয়া পরিচয় দিলো, আমার পিসতুতো দাদা, যে চক্রধরপুরে থাকতো। কলকাতায় বদলি হয়ে এসেছে, জানো না?

না, জানতাম না। জানবার আগ্রহও ছিলো না। কারণ, তখন আমার সমস্ত মন উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে আছে দরজার দিকে। লহনা কখন ফিরে আসে সেই আশায়।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন লহনা ফিরলো না, তখন বাধ্য হয়েই সরে এলাম সেখান থেকে। আর সঙ্গে সঙ্গে মহুয়ার মা বললেন, এই যে তুমি এসেছো, বোসো তো এখানে, কে কি দিচ্ছে নামগুলো খাতায় টুকে রাখো।

বলে হাতে খাতা আর পেন্সিল ধরিয়ে দিয়ে খাটের এক পাশে বসিয়ে দিলেন।

উপায় নেই। বসে বসে লিস্টি তৈরি করতে শুরু করলাম। প্রসাধন আর বেশবাসের প্রতিযোগিতায় উচ্ছল যৌবনের তরঙ্গ বয়ে চলেছে পাশ দিয়ে। কথা হাসি উল্লাসের ধ্বনি। সানাইয়ের করুণ সুর বেজে চলেছে। মুক্ত বিহঙ্গের মতো উন্মাদনায় অধীর মেয়ের দল। সকলেই আসছে হাতে উপহার নিয়ে।

মহুয়ার বড়দি বসেছেন ওদিকে। উপহারগুলো হাতে নিয়ে সাজিয়ে রাখছেন টেবিলের ওপর। ঝকঝকে আলো পড়ে সারা ঘরখানা যেন রূপান্তরিত হয়েছে বড় দোকানের সুদৃশ্য শো-কেসে। যেগুলি সাজিয়ে রাখার মতো নয় সেগুলো জড়ো হচ্ছে খাটের ওপর।

একটার পর একটা জিনিস হাতে নিয়ে গড়গড় করে ডিকটেশন দিয়ে চলেছেন মহুয়ার বড়দি, আর আমি তাঁর নির্দেশমতো লিখে চলেছি :

—বুক-স্ট্যান্ড আর তিনখানা বই : মাস্টারমশাই।

—নগদ দশ টাকা : পরাশর রোডের জ্যাঠাইমা।

—ব্যাঙ্গালোর শাড়ি : ধীরেনবাবুর স্ত্রী, ধীরেন বসু।

—কানের দুল : মিনতি মল্লিক।

—ইলেকট্রিক ইস্ত্রি : রাধারমণ ব্যানার্জি।

—পেন্ডেন্ট : মহুয়ার বন্ধু খুশী সেন।

একটার পর একটা নাম বলে চলেছেন মহুয়ার বড়দি, আর আমি খাতায় টুকেই তাকাচ্ছি এপাশ-ওপাশ, দরজার দিকে। হঠাৎ তারই ফাঁকে লক্ষ করলাম, হাসতে হাসতে কাকে উদ্দেশ করে কি যেন বলতে বলতে চলে গেল লহনা, একবার ফিরে তাকালো, তর্জনী দেখিয়ে হাসলো, অর্থাৎ বেশ জব্দ হয়েছো। ইচ্ছে হলো খাতা-কলম ফেলে দিয়ে উঠে পড়ি। পারলাম না। বোধ হয় চক্ষুলজ্জার জন্যেই। আর পারলাম না বলেই মহুয়ার মা-র ওপর মনে মনে চটে গেলাম। সত্যি, মহুয়াদের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা এমন কিছু নিকট নয়, যদিও পরিচয়টা ঘনিষ্ঠ। কিন্তু সেই ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ নিয়ে এমন একটা জায়গায় আমাকে তিনি যে বন্দী করে রেখে যাবেন, তা ভাবতে পারিনি। বিশেষ করে এমন একটা দিনে, যেদিন কিনা লহনার সঙ্গে দেখা হয়েছে এত বছর বাদে।

সবচেয়ে খারাপ লাগছিলো এইজন্যেই যে, মন ছুটে বেড়াচ্ছিলো লহনার পিছনে। মনের মধ্যে থেকে মোহগ্রস্ত ভাবটা তখনো দূর হয়নি, চোখের অঞ্জন মুছে যায়নি। একটি মাত্র মুহূর্তে ক্ষণিকের যে রোমাঞ্চ বুনে দিয়ে গেছে লহনা, তার অনুরণন শুনছি তখনো থেকে থেকে। ভাবলাম, কোনো একটা অছিলায় উঠে যাই, খুঁজে বের করি লহনাকে, কথা বলি—দুটি কথা। শুধু জেনে নিই যে দিন গিয়েছে চলে, তা একেবারেই গিয়েছে কি না!

কত দিন কত কল্পনায় রাঙিয়েছি যে কামনাকে, তা আজ হাতের মুঠোয় এসেও পিছলে যাবে?

হয়তো কোনো একটা অজুহাতে খাতা-কলম নামিয়ে রেখেই উঠে পড়তাম। তার আগেই এসে হাজির হলেন মহুয়ার বাবা।

আমার দিকে চোখ পড়তেই বললেন, এই যে, তোমাকে এখানে লাগিয়ে দিয়েছে বুঝি! উঠে এসো—উঠে এসো, তুমি বরং যাও ছাদে। গিয়ে দেখো ছাঁদনাতলার সব ব্যবস্থা হয়েছে কি না! লগ্ন শুরু হতে দেরি নেই।

হ্যাঁ, ছাদেই। চোখাচোখি হলো। হাসলাম। কিন্তু তার জবাবে হাসলো না লহনা, যেন উপেক্ষা করে গেল। তবে কি এই মেয়েপুরুষের ভিড়েই কোথাও মহুয়ার নিখিলেশদা আছেন?

লহনার হাবেভাবে কিন্তু তা মনে হলো না।

কি আশ্চর্য, সেই পুরোনো দিনের লহনা যেন বদলে গেছে। সেই স্থির সৌন্দর্য বুঝি আমোদিত মার্তঙ্গিনীতে রূপান্তরিত হয়েছে। এত চটুল চাহনি ছিলো না লহনার, এমন চপল ভঙ্গিমা ছিলো না।

ন' বছরের ফ্রক-পরা মেয়ের মতো সারা ছাদটা ছুটে বেড়াচ্ছে লহনা। মেয়েপুরুষ বাছ-বিচার নেই। এর পিঠে হাত রাখছে, ওর কাঁধে ঠেলা দিয়ে চলে যাচ্ছে। ওই যে সরু-করে-গোঁফ-ছাঁটা লোকটির বুকের বোতামে হাত রেখে অন্তরঙ্গ হয়ে কথা বলছে, ওই কি নিখিলেশ? তা হলে ধানদুর্বোর থালা হাতে যেতে যেতে যে সুদর্শন যুবকটির ডাক শুনে ঘাড় লম্বা করে মুখটা প্রায় তার মুখের কাছে নিয়ে গেল, সে কে?

সত্যি, লহনার ব্যবহার কেমন রহস্যে ঘেরা মনে হলো। যত পরিচিতই হোক, স্পর্শ না করে কি কথা বলা যায় না?

সমস্ত শরীরে কেমন যেন এক অবোধ্য ঈর্ষার জ্বালা অনুভব করছিলাম। অথচ সাহস করে এগিয়ে যেতেও কোথায় যেন বাধছিলো।

এদিকে সিঁড়ি বেয়ে ক্রমাগতই লোক উঠছে, ভিড় বাড়ছে।

ওদিকের ঘরটিতে মহুয়াকে এনে রাখা হয়েছে। জনকয়েক মিলে পাহারা দিচ্ছে তাকে। এদিকে ছাঁদনাতলায় মেয়েপুরুষ গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়েছে বিয়ে দেখবার লোভে।

ওপাশে পাতা পড়ছে। লহনাই লেগে পড়েছে তদারক করতে। জল ঢালতে গিয়ে জলের গেলাস হয়তো উলটে গেল, অমনি ছোট মেয়ের মতো হাততালি দিয়ে হেসে উঠলো লহনা। কিংবা বাতাসে পাতা উলটে গেল হয়তো, অমনি চোখ পাকিয়ে ধমক দিয়ে উঠলো, কিচ্ছু বুদ্ধি নেই, পাতার ওপর গেলাস বসাতে পারো না?

এদিকে মন্ত্র পড়া শুরু হয়ে গেছে তখন। গরদের ধুতি গায়ে জড়িয়ে বসেছেন মহুয়ার বাবা। এক পাশে বরযাত্রীর দল।

পাতা পাড়ার কাজ ফেলে ছুটে এলো লহনা শাঁখ বাজাতে। গিয়ে দাঁড়ালো বরযাত্রীদের পাশে। চোখে কৌতুকের হাসি এঁটে গাল ফুলিয়ে শাঁখ বাজাচ্ছে থেকে থেকে। আর সেই প্রথম লক্ষ করলাম লহনার বেশবাস যেন একটু দৃষ্টিকটু। যেন উদ্দাম যৌবনকে ফুটিয়ে তোলার জন্যেই এমন বিচিত্র সাজে নিজেকে সাজিয়েছে সে। বুকের বন্ধনী যেন বাঁধন নয়, নিলাজ মুক্তি। শাড়ির রেশমী ভাঁজে লুব্ধতা। আর সে যৌবনের উচ্ছলতাও যেন মুহূর্তে মুহূর্তে রঙ বদলে চলেছে।

কখন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ দেখি, লহনা পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

চমকে উঠতেই হাসলো লহনা। তারপর ফিসফিস করে বললে, নীচে।

অর্থাৎ নীচে যাবার, নির্জনে যাবার নিশ্চিত ইশারা।

এই নির্দেশটুকুর জন্যেই অপেক্ষা করে ছিলাম। ধীরে ধীরে দোতলার সিঁড়ির মুখে নেমে

এলাম।
মিনিট কয়েক পরেই লহনাও নেমে এলো।
বললাম, নিখিলেশবাবু এসেছেন? কই, আলাপ করিয়ে দিলে না তো?
হাসলো লহনা। বললে, না, আসতে পারেনি, কিন্তু—
একটু থেমে খিলখিল করে হেসে উঠে বললে, আমি কি এখনো লোনা হয়েই রইলাম তোমার কাছে?
বললাম, লোনাই আমার ভালো লাগে, যারা মিষ্টি পছন্দ করে আমি তাদের দলে নই।
লহনার মুখ থেকে হালকা ভাবটা সরে গেল। মুখ নামিয়ে বললে, তবে সুযোগ পেয়েও সেদিন লোনাকেই তুলে নাওনি কেন?
বললাম, তার ওপর আমার তো হাত ছিলো না লোনা, তুমি জানো।
—হাত ছিলো, হাতে শক্তি ছিলো না বলো। তীব্র ব্যঙ্গের স্বরে উত্তর দিলো লহনা।
বললাম, তোমার এই মিথ্যে ধারণাটা দূর করবার জন্যেই এতদিন তোমাকে খুঁজেছি, দেখা করতে চেয়েছি।
খিলখিল করে আবার হেসে উঠলো লহনা। বললে, কি লাভ তাতে? সে ধারণাটা বদলাতে পারলেই কি পুরোনো সম্পর্কটা বজায় থাকবে, তোমার ধারণা?
বললাম, ছি ছি! এ কথা আমি কোনো দিন কল্পনাও করিনি লোনা। এত নীচ আমাকে ভেবো না তুমি।
—নীচ? খিলখিল করে আবার হেসে উঠলো সে। কৌতুকের হাসি হেসে বললে, কেন? পরস্ত্রী বলে?
—হ্যাঁ। বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই বলবার চেষ্টা করলাম। বললাম, তোমার সুখের সংসার ভাঙতে চেষ্টা করবো এ কথা তুমি ভাবলে কি করে? তুমি সুখে থাকো, ভালো থাকো—এইটুকুই আমি চাই।
আবার হেসে উঠলো লহনা।—সুখে আছি এই বুঝি তোমার বিশ্বাস?
সুখে আছি এই বুঝি তোমার বিশ্বাস! কথাটা বুকে এসে বিঁধলো। ব্যঙ্গ? মিথ্যা অভিনয়? কিন্তু তা হলে হঠাৎ কেঁপে গেল কেন লহনার স্বর, গাঢ় হয়ে এলো কেন?
মুখ তুলে তাকালো সে। স্পষ্ট করে তাকালো আমার মুখের দিকে। দেখলাম কৌতুকের হাসি মুছে গেছে তার মুখ থেকে, দুটি চোখ ছলছল করে উঠেছে।
ধীরে ধীরে বললে সে, এত ন্যায়-অন্যায় যদি বোঝো, তবে পুরোনো দিনের কথাটা মনে পাড়িয়ে দিলে কেন?
উত্তর দিতে পারলাম না, চুপ করে রইলাম।
লহনা হঠাৎ আমার হাতখানা ওর হাতের মধ্যে তুলে নিলো। বললে, পুরোনো দিনের কথা ভেবে বেঁচে থাকাটা অপরাধ নয়, পুরোনো দিনে ফিরে যাওয়াটাই অপরাধ, তাই না?
বিস্ময়ের চোখে তাকালাম ওর মুখের দিকে। বললাম, কি বলছো লোনা।
লহনার দু চোখ যেন হঠাৎ জ্বলে উঠলো। বললে, ঠিকই বলছি। এখনই বললে না, সেদিন তোমার কোনো হাত ছিলো না। আজ আছে? আছে সেই সাহস? চলো, এখনই এই মুহূর্তে যেখানে খুশি তুমি আমাকে নিয়ে চলো। অপবাদকে আমি ভয় পাই না, দারিদ্র্যকে ভয় পাই না। যাবে, নিয়ে যাবে আমাকে?
উন্মাদের মতো এক জোড়া নৃশংস চোখ তুলে তাকালো লহনা।
কি যেন বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার আগেই ছাদ থেকে ডাক এলো।—লহনাদি, লহনাদি!
ছুটতে ছুটতে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে গেল লহনা। আর আমার সমস্ত শরীর কি এক নেশায়, কি এক লুব্ধ আবেগে কেঁপে উঠলো।
আবার ছাদে উঠে এলাম। দেখলাম, লহনা আবার তেমনি ছলনাময়ীতে পরিণত হয়েছে। তেমনি ছুটে বেড়াচ্ছে কর্মব্যস্তের মতো, এর গায়ে ঢলে পড়ছে, ওকে ধাক্কা দিয়ে চলে যাচ্ছে, এর মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কথা বলছে, খিলখিল করে হেসে উঠছে অন্য কারও কথায়। প্রতিটি পুরুষের সঙ্গে সেই একই ব্যবহার। প্রতিটি পুরুষকেই যেন নিখিলেশ বলে ভুল হয়। এত অন্তরঙ্গ, এত ঘনিষ্ঠ।

শুধু একসময় কাছে এসে দাঁড়ালো লহনা। ফিসফিস করে বললে, এখানেই তো বদলি হয়ে এসেছে ও, যাবে একদিন?

—যাবো। কিন্তু ঠিকানা তো জানি না।

ঠিকানা দিলো লহনা।

তারপর আহারপর্ব শেষ করে রাত এগারোটার সময় চলে যাবার আগে আর একবার মনে পড়িয়ে দিলো : যেয়ো কিন্তু।

তখনো লহনার দু চোখে যেন যৌবনের নেশা জড়িয়ে আছে।

লহনা না বললেও হয়তো যেতাম। ঠিকানা না দিলেও মহুয়ার কাছেই ঠিকানা জেনে নিতাম। কারণ, লহনার রহস্যময় ব্যবহার তখন আমার রক্তেও বিষাক্ত একটা নেশা ধরিয়ে দিয়ে গেছে।

যাকে আজীবন কামনা করেছিলাম, যাকে হারিয়ে জীবন ব্যর্থ হয়ে গেছে মনে হয়েছিলো, সে যদি উপযাচিকা হয়ে এসে দাঁড়ায় শুধু হৃদয়-দুয়ারে নয়, দেহের দেহলীতে, তা হলে উপেক্ষা করা যায় না।

বিশুষ্ক বারুদের গায়ে যেন একটি স্ফুলিঙ্গ ছুঁড়ে দিয়ে গেছে লহনা।

প্রবল উত্তেজনার মধ্যে কেটে গেল কয়েকটা দিন। নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করলাম। ন্যায়-অন্যায়ের মানদণ্ডে নিজের কামনা-বাসনাকে বিচার করলাম বারবার।

কি হবে একটা বাঁধা সংসারকে ভেঙে দিয়ে! কি হবে বিস্মৃতির তারে আবার বেসুরো ধ্বনি তুলে!

কিন্তু বারংবার লহনার কথাগুলো যেন কানের পাশে বাজতে লাগলো। 'আছে সেই সাহস? চলো, এখনই এই মুহূর্তে যেখানে খুশি তুমি আমাকে নিয়ে চলো।' তবে কি লহনার জীবন আজ ব্যর্থ, ব্যথিত? কি আশ্চর্য, এতদিন ধরে যার জীবন সুখের হোক বলে প্রার্থনা জানিয়ে এসেছি, যার জীবনে এতটুকু বেদনার ছায়া দেখতে চাইনি, তার সংসার মিথ্যার কুয়াশায় ঢাকা জেনে, তার ব্যর্থ জীবনের পরিচয় পেয়ে এতটুকু দুঃখ অনুভব করলাম না। বরং মনে মনে কেমন যেন খুশী হয়ে উঠলাম।

বোধ হয় আমার মনের মধ্যে একটা লোভী শৃগাল জেগে উঠেছিলো।

তাই দিন কয়েক পরে একদিন ঠিকানা খুঁজে খুঁজে চলে গেলাম লহনার বাড়িতে।

নম্বর মিলিয়ে বাড়ি খুঁজে পেতে দেরি হলো না। সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে দরজায় কড়া নাড়তেই একটা বাচ্চা চাকর এসে কপাট খুলে দাঁড়ালো।

বললাম, নিখিলেশবাবু আছেন?

—না, নেই। আপিসে গেছেন।

সত্যি বলতে কি, বোধ হয় হিসেব করেই এসেছিলাম। জানতাম, নিখিলেশবাবু ঘণ্টা-খানেক পরে ফিরবেন।

বললাম, নিখিলেশবাবুর স্ত্রী আছেন?

—কে? লহনার গলা শুনতে পেলাম, পরমুহূর্তেই দেখতে পেলাম তাকে। কিন্তু আমাকে দেখেই তার দু চোখে যেন বিরক্তি ফুটে উঠলো। চেষ্টা করেও সেটুকু লুকোতে পারলো না লহনা।

আহত স্বরেই বললাম, আসতে বলেছিলে তাই—

মুখে হাসি আনবার চেষ্টা করলো লহনা। বললে, এসো, এসো, কি ভাগ্য আমার! বলে কপট আপ্যায়নে একটা চেয়ার এগিয়ে দিলে ঘরে ঢুকেই।

বসলাম। বসে চোখ বুলিয়ে নিলাম ঘরখানার চতুর্দিকে। ছোট্ট ফ্ল্যাট। বারোয়ারী সিঁড়ির মুখে দরজা, দরজার পর এক ফালি বারান্দা পার হয়ে এসে ছোট্ট এই ঘর। কিন্তু সমস্ত জুড়ে কি এক অনির্বচনীয় শ্রী ফুটে রয়েছে! এক পাশে সাদাসিধে একখানা খাট, এদিকে আয়না-বসানো আলমারি, একটা ছোট্ট টেবিলে গেরুয়া রঙের ঢাকনি, তার ওপর সাদা ফুল-দানিতে এক ঝাঁক গাঢ় নীল অপরাজিতার ফাঁকে ফাঁকে সাদা সাদা জুঁই। তার পাশে স্ট্যাণ্ডে

বসানো পাশাপাশি দুখানা ছবি। একটা লহনার বলেই বুঝতে অসুবিধে হয় না যে অন্যটা নিখিলেশবাবুর।

এই নাকি নিখিলেশবাবু? সুন্দর চেহারা। সবল, পরিপূর্ণ, পৌরুষকমনীয়। বললাম, নিখিলেশবাবু ফেরেননি এখনো?

—না।...তুমি একটু বোসো, কেমন? বলে হাসলো লহনা। একটু থেমে বললে, এমন সময়েই এলে, রয়ে-বসে দুটো কথা বলতে পারবো না। আমার এখন অনেক কাজ।

কথাগুলোয় কেমন একটা ভদ্রতার সাজ, আন্তরিকতা নেই যেন। একটু বিস্মিত হয়েই স্পষ্ট চোখে তাকালাম লহনার মুখের দিকে। তার শরীরের দিকে।

আশ্চর্য! কি সংযত বেশবাস, মাথার ঘোমটাটা একটুও খসেনি, হাতের কনুইটাও যেন সযত্নে আঁচলে ঢাকা। আর মুখে—না হাসি, না প্রগল্ভতা।

আমাকে বসিয়ে রেখে চলে গেল লহনা, পাশের দরজা ডিঙিয়ে। আমি এসে দাঁড়ালাম জানলার কাছে, জানলার পর্দা সরিয়ে।

ছাদের পর ছাদ, চৌকো আকাশ একটুখানি, দূরে একটা নারকেলগাছের পাতার নড়াচড়া। কি শান্ত পরিবেশ!

খানিক পরেই ফিরে এলো লহনা। বললে, বোসো একটু, এখুনি এসে পড়বে ও, আলাপ করে যেয়ো। আমার সময় নেই একটুও, নয়তো বসতাম এখানে। সারা দিন খেটেখুটে আসবে বেচারী, খাবারটা তৈরি করে রাখি।

বলে খবরের কাগজটা আমার সামনে রেখে দিয়ে চলে গেল।

আর আমি বিস্মিত হলাম। হয়তো আহতও হলাম। সেদিন বিয়ে-বাড়িতে যে লহনাকে দেখেছিলাম, এ কি সেই? কোথায় গেল সেই উচ্ছলতা, সেই হাসি, কৌতুক, দুঃসাহস!

'আছে সেই সাহস! চলো, এখনই এই মুহূর্তে যেখানে খুশি তুমি আমাকে নিয়ে চলো।' কথাটা বলতে বলতে লহনার উন্মত্ত যৌবনের দুটি চোখ যেন জ্বলে উঠেছিলো সেদিন।

কিন্তু সে কামনার, সে প্রার্থনার সবটুকুই কি মিথ্যে? নাকি আজকের এই সংযত ব্যবহার, এই সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া?

একটু পরেই দরজায় কে যেন কড়া নাড়লো। ছুটে এলো লহনা।

বললাম, নিখিলেশবাবু এলেন বোধ হয়।

হাসলো লহনা।—না, না, তার আসতে এখন অনেক দেরি।

বলে দরজা খুলে দিলো। ছোট্ট একটি ছেলেকে কোলে নিয়ে ঝি ঘরে ঢুকলো। তার কোল থেকে ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো লহনা।

পাশে নামিয়ে দিয়ে বললে, মিলুর সঙ্গে ভাব করো ততক্ষণ। বলে কোমরে আঁচলটা জড়াতে জড়াতে চলে গেল।

বেশ বুঝতে পারলাম যেন ইচ্ছে করেই দূরে দূরে থাকছে লহনা। যেন কাছে আসতে, কথা বলতে ভয়।

অধৈর্য হয়ে উঠেছিলাম। এইটুকু সান্নিধ্য পাওয়ার লোভেই কি এতখানি ছুটে এসেছি! শুধু এই দেয়াল-আড়াল-দেওয়া আলাপটুকুর জন্যেই?

কি জানি, হয়তো এইটুকুই পরম লাভ বলে মনে হতে পারতো, যদি না বিয়ে-বাড়ির সেই উদ্দাম যৌবনের উন্মত্ত মুহূর্তটুকু দেখতাম।

কিছুক্ষণ পরেই এক কাপ চা হাতে নিয়ে এসে দাঁড়ালো লহনা। আমি তখন চশমাটা মিলুকে পরিয়ে তার মন ভোলাবার চেষ্টা করছি। তাই কি? না, লহনার শিশুপুত্রকে আদর করে লহনারই মন ভোলাতে চাইছিলাম?

লহনা চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রেখে দাঁড়িয়ে রইলো।

চোখ তুলে তাকালাম। না, কোনো পরিবর্তন নেই তার চোখে। তেমনি সংহত সচেতন দৃষ্টি। নীরস, নীরব।

তবু হাসলাম। বললাম যা সেদিন বলতে পারিনি।

বললাম, সেদিন তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে সময় পাইনি লোনা। শুনবে সে প্রশ্নের উত্তর, শোনবার সাহস আছে?

—ছিঃ!

ছোট্ট এক টুকরো কথা। কিন্তু কি স্পষ্ট, কতখানি অর্থপূর্ণ! তার অদ্ভুত গলার স্বর এই একটি মাত্র কথায় যেন এক রাশ ঘৃণা ছিটিয়ে দিলো আমার গায়ে। আমার সমস্ত শরীর যেন কাদায় মিশে গেল। মনে হলো, এর চেয়ে বড় অপমান যেন কোনো মেয়ে করতে পারে না।

ক্রোধ কি অস্বস্তি জানি না, সেটুকু কাটিয়ে ওঠবার জন্যেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম।
—আজ যাই আমি। কাজ আছে।

এতটুকু বাধা দেওয়া দূরের কথা, লহনা যেন খুশীই হলো। বললে, আর একদিন এসো তা হলে, ওর সঙ্গে আলাপ করে যেয়ো।

উত্তর দিলাম না। কি উত্তর দেবো এই প্রাণহীন কথার? এই অনান্তরিক সৌজন্যের?

ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলাম, দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এলো লহনা। সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনতে পেলাম।

সারাক্ষণ আত্মগ্লানি ভোগ করেছি। বুঝতে পারিনি কখন অন্যমনস্কভাবে বাসে উঠেছি, বাস অর্ধেক পথ পার হয়ে এসেছে।

অনেকখানি চলে আসার পর হঠাৎ খেয়াল হলো, চশমাটা ফেলে এসেছি। হুড়মুড় করে বাস থেকে নেমে পড়লাম।

ফিরে এলাম আবার। কিন্তু দরজায় টোকা দেবার আগেই শুনতে পেলাম খিলখিল করে হাসছে লহনা।

নিশ্বাস রোধ করে দাঁড়িয়ে রইলাম বন্ধ দরজার সামনে।

শুনতে পেলাম একটি পুরুষকণ্ঠের কপট ভর্ৎসনা।—বেশ তো, এসেছিলো তা কি এমন দোষ করেছে?

লহনার গলা ভেসে এলো। সশব্দে হেসে উঠে লহনা বললো, কি নির্লজ্জ দেখো, বাড়ি বয়ে দেখা করতে এসেছে! ও কি ভাবে জানো?

—কি ভাবে? নিখিলেশের স্বর নিশ্চয়ই।

লহনা আবার হেসে উঠে বললে, ও ভাবে আমি ওকে ভালোবাসি—ভালোবাসতাম। পুরুষ জাতটা যে কি বোকা হয়!

নিখিলেশ বললে, তা হলে আমিও হয়তো বোকা।

—বোকাই তো। আবার হেসে উঠলো লহনা।

আর আমি লজ্জায় অপমানে তরতর করে নেমে এলাম। পালিয়ে এলাম। না, ফিরে যেতে পারবো না, তার চেয়ে আর একটা নতুন চশমা করিয়ে নিলেই হবে। কিন্তু—

বোকাই তো! আর একবার কথাটা কানের কাছে বেজে উঠতেই অন্য একটা অর্থ হঠাৎ স্পষ্ট হয়ে উঠলো। সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো পরক্ষণেই। কিন্তু ঐ একটা কথার কোন অর্থটা সঠিক তা কি নতুন চশমার চোখে দেখতে পাবো?

১৩৬৫

রায়



দেবীপুরের বউকে এর আগে কেউ কখনো রাগতে দেখেনি।

বাবলাডিঙের সামন্ত-বাড়ির বড় ছেলে নিরঞ্জন দেবীপুরের সুদাম হাজরার মেয়ে মুকুলকে বিয়ে করে ঘরে আনার পর থেকেই বাপের বাড়ির গাঁয়ের নামেই মুকুলের নামকরণ হয়েছিলো—দেবীপুরের বউ। যেমন এ অঞ্চলের সব গাঁয়েই হয়, সব বাড়িতেই হয়। বউদের আসল নাম স্বামীরাও ভুলে যায়, বেঁচে থাকে শুধু বাপের বাড়ির গাঁয়ের নামটা।

দেবীপুরের বউ যখন এসেছিলো এ গ্রামে সামন্তদের বাড়িতে, তখন তার রূপের প্রশংসায়, গুণের কীর্তনে কান পাতাই দায় ছিলো। প্রশংসা করবার মতো রূপ অবশ্য এখনো আছে তার। বিজয়ার দিন সামন্তদের দরদালানে যে গেছে সেই দেখেছে। যে দেখেছে সেই তাকিয়ে থেকেছে দুর্গা-প্রতিমাকে ভুলে এই রক্তমাংসের প্রতিমার দিকে। পুজামণ্ডপ লোকে লোকারণ্য। বিসর্জন যাবে প্রতিমা, তাই মেয়ে-বউরা বরণ করছে প্রতিমাকে। হাতে কাঁসার বগিথালা, থালায় পান সুপুরি মিষ্টি কলা সিঁদুর আলতা সাজিয়ে পাক দিয়ে দিয়ে প্রতিমার চারপাশে ঘুরছে সে, ঘুরছে সবাই। কেউ প্রতিমার পায়ে আলতা পরাচ্ছে, কেউ প্রতিমার সিঁদুর সিঁথিতে ঠেকিয়ে তুলে রাখছে ফুল-বেলপাতার সঙ্গে। কিন্তু তার মধ্যে কোন জন দেবীপুরের বউ তা বলে দিতে হয় না। প্রতিমার চেয়েও সুগঠনা, প্রতিমার চেয়েও সুন্দরী যে—সেই। অন্য সকলের চেয়ে আধ হাত লম্বা, সবল পরিপুর্ণ চেহারা, ফরসা ঝকঝকে মুখে-কপালে ঘামের বিন্দু, আর টিকলো নাকের ডগাটা যার লাল হয়ে উঠেছে—সেই।

এখন লালপাড় গরদের শাড়িতে মুখখানা থমথমে দেখায় বটে, কিন্তু আগে দেবীপুরের বউয়ের মতো এমন মিশুকে মানুষ ছিলো না। সব সময়েই টানা-টানা চোখ দুটি যেন হাসছে। হেসে গড়িয়ে পড়তো কৌতুকে, ডেকে আলাপ করতো কোটালদের বউ-ঝিদের সঙ্গেও। কেউ কেউ বলতো বটে যে, দেবীপুরের বউয়ের হাবেভাবে কোথায় যেন একটা দাম্ভিকতা লুকিয়ে আছে; কিন্তু তা বোধ হয় সত্যি নয়। কারণ, তাকে কেউ কোনো দিন রাগতে দেখেনি, কারও সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে দেখেনি।

সেই মানুষ যে কেন এমন একটা কাণ্ড করে বসলো কেউ বুঝতে পারে না।

প্রতি বছর এ সময় ন্যাংটেশ্বরের মেলা বসে বাবলাডিঙে। বেশ বড় মেলা। চারপাশের গাঁ থেকে লোক ভেঙে পড়ে। দূর দূর জায়গা থেকে আসে দোকানীরা, টিকিট কেটে জায়গা নেয়, চালা তোলে, দোকান খোলে।

ন্যাংটেশ্বরের পুজো দিয়ে ভোগের থালাটা হাতে করে ফিরছিলো দেবীপুরের বউ। দু পাশের দোকানগুলোর দিকে তাকাতে তাকাতেই আসছিলো। হঠাৎ একটা দোকানের দিকে চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়ালো।

এক মুহূর্ত। তারপরই তরতর করে বাড়ি ফিরে এসে ভোগের থালাটা নামিয়ে রেখে বললে, মানো, কোটালদের ডাক তো একবার।

কোটালরা বংশপরম্পরায় সামন্ত-বাড়িতে লেঠেলের কাজ করে এসেছে। জমিদারি গেলেও তাদের ভক্তিশ্রদ্ধা কমেনি এখনো। বিশেষ করে দেবীপুরের বউ কিছু আজ্ঞা দিলে কাজ হাসিল করতে পিছপাও নয় তারা!

খবর পেতে না-পেতে ছুটে এলো জনকয়েক। চমকে উঠলো সবাই। দেখলে, দেবীপুরের বউয়ের কপালের শিরাটা ফুলে উঠেছে, রাগে চোখ দুটো রাঙা হয়ে উঠেছে।

হুকুম শুনেই ছুটলো তারা। লোকটাকে ঠেঙিয়ে তাড়াতে বলেছে দেবীপুরের বউ।

লোকটা মার খেলো, ভুগলো দিনকয়েক হাসপাতালে পড়ে পড়ে। তারপর সেখানে শুয়েই এজাহার দিলো পুলিসে। মারা গেল আঠারো দিনের দিনে। দেবীপুরের বউ জড়িয়ে পড়লো মামলায়। দেওয়ানী নয়, ফৌজদারী। খুনের দায়ে। আর মামলার প্রধান আসামী কিনা দেবী-পুরের বউ!

মামলার খবর শুনেই ছুটতে ছুটতে এলো মানিক হাজরা। দেবীপুরের বউয়ের ছোট ভাই। এসে শুনলো জামিন নিয়ে ফিরে এসেছে দিদি, কিন্তু নিরঞ্জন রয়ে গেছে সদরে। মামলার তদবির করতে।

এদিকে গাঁয়ের লোক কিছুই বুঝতে পারে না। কি করে এমন কাণ্ড ঘটলো, কেন ঘটলো! লোকটা কি খারাপ চোখে তাকিয়েছিলো দেবীপুরের বউয়ের দিকে? টিটকিরি দিয়েছিলো? নাকি—

কানাঘুষো গুজব যে রটবে তার একটা সূত্র থাকা চাই। সেটুকুরই অভাব এখানে। আর দেবীপুরের বউকে কেউ যে কিছু জিজ্ঞেস করবে সে সাহসই কারও নেই। সেই যে জামিন নিয়ে এসে কপাটে খিল দিয়েছে, খুলছে না কারও ডাকে।

মানিক হাজরা আসতেই ছুটে এলো বাড়ির পাটকরুনী ঝি মানো।

বললে, দেবীপুর থেকে তোমার ভাই এসেছে মা, দেখা করতে।

ভাইয়ের কথা শুনেই কপাট খুলে বেরিয়ে এলো দেবীপুরের বউ। লজ্জায় গ্লানিতে যেন সে চেহারা ভেঙে পড়েছে একেবারে। চোখে উদ্‌ভ্রান্তের মতো দৃষ্টি। মুখ তুলে তাকাতেও লজ্জা।

বারান্দায় মানিককে একটা আসন পেতে দিয়ে থামে ঠেস দিয়ে বসলো দেবীপুরের বউ। চিরকালের অভ্যাসে হাতপাখাটা টেনে নিয়ে বাতাস করতে শুরু করলো ভাইকে। কিন্তু কথা বললো না একটাও।

রোদে পুড়ে আলপথ ভেঙে হাঁটতে হাঁটতে এসেছে বটে মানিক, কিন্তু পাখার বাতাস খেয়ে জিরোবার বা জুড়োবার মতো মনের অবস্থা নয় তার।

তাই খানিক চুপ করে থেকে যখন দেখলে দিদি তার একটা কথাও বলছে না, তখন নিজেই প্রশ্ন করলে, কি ব্যাপার বল তো?

দীর্ঘশ্বাস ফেললো দেবীপুরের বউ।—শুনেছিস তো সবই।

—তা তো শুনেছি। কিন্তু সত্যি মারতে বলেছিলি লোকটাকে?

—বলিনি? দেবীপুরের বউয়ের চোখ দুটো যেন হঠাৎ জ্বলে উঠলো। বললে, মারতে নয়, মেরে ফেলতেই বলেছিলাম।

বিস্ময়ে আতঙ্কে চোখ তুলে তাকালো মানিক : কেন? কি করেছিলো লোকটা?

হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলো দেবীপুরের বউ। তারপর তার ফরসা হাতখানা এগিয়ে ধরলো মানিকের চোখের সামনে। এই দেখ, এরই জন্যে—সারা জীবন আমার নষ্ট হয়েছে। রাগ হয় না, বল তুই?

ফরসা সুডোল হাতখানার দিকে তাকিয়ে ছেলেবেলার সেই দৃশ্যটা মানিকের চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

মানিক আর মুকুল। ভাই আর বোন। দেবীপুরের সুদাম হাজরার ছেলে আর মেয়ে। পিঠোপিঠি ভাইবোন। যেমন ঝগড়া-খুনসুড়ি লেগে আছে দিনরাত, তেমনি আবার গলায় গলায় ভাব দুটিতে। দেখে দেখে মা হাসে, বাপ হাসে। এ ওর নামে লাগাচ্ছে, ও এর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছে, আবার পরস্পর পরস্পরকে সাক্ষী মানে দরকারের সময়।

মা কান ধরে মেয়েকে হিড়হিড় করে টেনে এনে প্রশ্ন করলো, রায়েদের বাগানে গিয়েছিলি আম পাড়তে?

মানিক অমনি এসে সাক্ষী দেবে, মারছো কেন দিদিকে? ও তো বৈঠকখানায় বসে ধান-ঝাড়াই দেখছিলো।

মা ছেলের চুলের মুঠি ধরে বললো, ছিপ ফেলেছিলি পাঁজাপুকুরে?

মুকুল অমনি এসে বলবে, ও তো গড়ের পাড়ে দাঁড়িয়ে আমাদের বাকুড়িজমির নিড়েন দেখছিলো।

তারপর মায়ের হাত থেকে ছাড়া পেয়েই দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ হাসিয়ে ছুটে পালাবে। কেমন, বাঁচিয়ে দিলাম তো!

দুটিতে যেমন ঝগড়া, তেমনি ভাব। দুজনেই গাঁয়ের মিড্‌ল্‌ প্রাইমারী ইস্কুলে যায়, বইখাতা বগলে নিয়ে, খেজুরগড়ে 'ডাঁর' ফেলে পাশাপাশি মাছ ধরতে বসে, সুধাসায়রে সাঁতার কাটে একসঙ্গে।

সুদাম হাজরার অবস্থা তখন পড়তির দিকে। জমিজমা, বংশপরিচয়, নগদ টাকা—সবই ছিলো তার। এমন কি জমিদারির তিন-আনি অংশও—পুত্রহীন মাতামহীর সূত্রে পাওয়া। কিন্তু কাল হলো তার নেশা—ব্যবসার নেশা। গাঁয়ের বাঁড়ুজ্যেরা বলগনায় ধান-কল খুলে ফুলে-ফেঁপে উঠেছে দেখে সুদাম হাজরাও কপাল ঠুকলো গণেশের পায়ে। ব্যবসা শুরু করলো কাঠ আর কয়লার। গদি কিনলো নিগন ইস্টিশনে। বি কে আর-এর ছোট লাইনের ধারে নিগন তখন গঞ্জ হয়েছে, ব্যবসা জমেছে। প্রথম প্রথম মনে হয়েছিলো ফেঁপে-ফুলেই উঠবে বুঝি। কিন্তু পাল্লা ঘুরে গেল তার গদির পাশে এক মারোয়াড়ী আড়ত খুলতেই। বছর দুই লোকসান খেয়ে খেয়ে ধৈর্য ধরে ধরে থেকে শেষ অবধি দোকানে কুলুপ মেরে দেবীপুরেই ফিরে আসতে হলো। ঘাড়ের ওপর তখন এক রাশ দেনা, আর বাড়ন্ত ফাঁপালো চেহারার মেয়ে মুকুল। ধার-দেনা শোধবার কথা দূরে, আর ক'টা বছর পরেই তো বেরতে হবে দু-দুটো খোঁজে। জমিজমা বন্ধক রেখে টাকা যোগাড় করতে হবে এক দিকে, মেয়ের বিয়ের পণ দেবার জন্যে, আর এক দিকে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরতে হবে পাত্রের সন্ধানে।

তবে মুখে এ কথা বললেও মনে মনে মুকুলের মা-বাবা অন্য স্বপ্ন দেখতো। আর সে স্বপ্নে রঙ চড়াতো গাঁয়ের লোকে, বলতো, হাজরা, তোমার আবার মেয়ের বিয়ের ভাবনা!

—নয় কেন?

—পাঁচটা গাঁ বেছে আনো দিকি মুকুলের মতো মেয়ে! প্রশংসার স্বরে বলতো সকলে।

আর বলবে না-ই বা কেন! সুদাম হাজরার ছেলে আর মেয়ে—গর্ব করবার মতোই। মানিক যেমন সুদর্শন, মুকুল তেমনি সুন্দরী, তেমনি তার মুখশ্রী। টিকলো নাক, টানা-টানা চোখ, কোঁকড়া-কোঁড়কা পিঠ-ভরতি চুল, আর যেমন গড়ন তেমনি বরন। সেই কিশোরী রূপের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সুদাম হাজরা ভাবতো, মাকে আমার সেরা ঘরে সেরা বরে পাত্রস্থ করবো। আর মুকুলের মা—পাড়াপড়শীর মুখে যার নাম ছিলো পলাসনের বউ—ভাবতো, মেয়ের বিয়েতে হয়তো জমিজমা বেচতে হবে না আর পাঁচজনের মতো।

অবশ্য বেচবার মতো জমিজমা তখন আর বিশেষ নেই। ছিলো শুধু মুকুলের মায়ের এক-গা গয়না। কিন্তু তেমনি আবার ছিলো জমিদারির তিন-আনি অংশ, যার অষ্টমের খাজনা মেটাতে গয়নাগুলো বন্ধক রাখতে হতো প্রতি বছর। আর ভাদ্র-আশ্বিনে ধানের দর উঠলে মরাই খুলে দিয়ে মরাইতলায় গুনে গুনে টাকা নিয়েই ছুটতে হতো কাটোয়ার মহাজনের কাছে বন্ধকী গয়না ফিরিয়ে আনতে। এমনি করেই চলছিলো। মানিক-মুকুলের পড়াশুনোর দিকে তেমন নজর ছিলো না সুদামের। গাঁয়ের ইস্কুলে নামটাই ছিলো তাদের, মন পড়ে থাকতো চাষের দিকে। কোন জমিতে কতখানি চাপান দিতে হবে, বাকুড়ির জমিতে নিড়েন দেওয়া ঠিক হয়েছে কি না, পালটা মই দিতে হবে কি না কোথাও, ছেঁচ দেওয়ার পর কাঁদরের জল এসে পড়লে হেজে যাবে কি না সব—এমনি নানান কথা নিয়ে বিজ্ঞের মতো তর্ক করতো মানিক, আর তা দেখে মনে মনে খুশী হতো সুদাম। কি হবে পড়াশুনোয়! তিনটে পাস দিয়েও তিরিশ টাকা মাইনের জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছে মোড়লদের দু-দুটো ছেলে। আর রায়েদের বাড়ির মেয়ে তো কলেজে পড়ছে বোর্ডিং-এ থেকে, তাতেও কি বিয়ের সুরাহা হয়েছে কিছু! ওসব কিছু না, মেয়ের রূপটাই আসল, আর মুকুল দেখতে শুনতে যখন এত সুন্দর তখন পাত্র খুঁজতে বেগ পেতে হবে না, কেউ পণও হাঁকবে না তেমন কিছু।

এমনি সাত-পাঁচ ভাবতো সুদাম হাজরা। কিন্তু মুকুলের মতো বুদ্ধিমতী মেয়ে যে হঠাৎ এমন একটা কাজ করে বসবে কোনো দিন, কল্পনাও করেনি কেউ। না সুদাম, না পলাসনের বউ—অর্থাৎ মুকুলের মা।

দোষ নেই মুকুলের। সাত বছর বয়স—গায়ে কোনোরকমে শাড়িটা জড়িয়ে-মড়িয়ে বেড়ায়, খেলাধুলো ছেলেদের সঙ্গে, ডাঁর ফেলে মাছ ধরে, গাছে উঠে পেয়ারা পাড়ে, সে কি করে বুঝবে অতশত!

পাশের গাঁ ক্ষীরগাঁ। যোগাদ্যার মেলা হয় প্রতি বছর। জাঁকালো মেলা, দোকানী আসে

দূর দূরে দেশ থেকে। শাস্ত্রে আছে যোগাদ্যা হলো বাহান্ন পীঠস্থানের একটি, বিশ্বাসীরা বলে পৃথিবীর কেন্দ্রভূমি। মা কালী স্বয়ং নাকি পূজারীর মেয়ে সেজে শাঁখারীর কাছ থেকে শাঁখা নিয়ে পরেছিলো।

ক্ষীরগাঁয়ের মেলায় যাবার তাই বড় সাধ মুকুলের। মুকুল আর মানিকের। বায়না ধরেছে বাপ-মার কাছে। কিন্তু নিয়ে যেতে রাজী হয়নি সুদাম হাজরা : মেলার ভিড়ে নিজেরাই রাস্তা হারিয়ে ফেলি, তোরা যাবি কি করে!

ভিড়! কি এমন ভিড়, লোকে যায় না মেলা দেখতে!

দুপুরবেলায় মেঝের ওপর মাদুর বিছিয়ে মায়ের পাশেই শুয়ে ছিলো মুকুল আর মানিক। তক্তাপোশের ওপর বাবা।

মিটিমিটি তাকিয়ে দেখলে মুকুল। হ্যাঁ, বাবা-মা দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

মানিককে একটা ঠেলা দিয়েই গুটিগুটি বেরিয়ে এলো। এসে একেবারে বাঁশডোবার ধারে কঞ্চি-ঝোপের আড়ালে দাঁড়ালো।

মানিক আসতেই বললে, যাবি?

—কোথায়? চোখ বড় বড় করলো মানিক।

মুকুল ফিসফিস করে বললে, ক্ষীরগাঁ। মেলায়।

—চ। খুশিতে নেচে উঠলো মানিকের চোখ দুটো।

ব্যস্। দু ভাইবোন ছুটতে ছুটতে চললো দুপুরের রোদে, রোদে-তাতা আল ধরে।

নাকের সোজা চলে গেলেই একটা কাঁদর। জল নেই এখন কাঁদরে। সেটা পার হয়ে বাঁ দিকে ফিরলেই চালা দেখা যাবে সারি সারি।

—রাস্তা ভুল করিসনি তো দিদি? অনেকখানি এসেও কাঁদরের দেখা মিলছে না বলেই জিজ্ঞেস করলো মানিক।

—না রে, না। ক্ষীরগাঁর আবার রাস্তা!

যেন সব জানে মুকুল, দু বছরের বড় বলেই জানে!

না, রাস্তা ভুল হয়নি। কাঁদর পার হতেই দেখলো, বোর্ডের রাস্তা ধরে লোক চলেছে সারি সারি। মাথায় করে জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে চলেছে অনেকে। একটা সাঁওতালের দল, মেয়েই বেশী।

মুকুল একবার জিজ্ঞেস করলো তাদের, মেলা কোন দিকে গো?

—এই মা গো! খিলখিল করে হেসে উঠলো মেয়েটা, পরক্ষণেই দলের সকলকে উদ্দেশ করে হাসতে হাসতে বললে, অরে, এ দুধপারা রঙের নাড়ু দুটা মেলাকে যাবে।

বলেই খিলখিল করে হেসে উঠে মুকুলকে আবার প্রশ্ন করলে, মেলাকে যাবি?

—হ্যাঁ, যাবো তো। একটু বিরক্ত হয়েই মুকুল বললে।

মেয়েটা আবার হেসে উঠলো : চ কেনে সাথে সাথে।

সাঁওতাল দলটার সঙ্গে সঙ্গে এসে মেলায় পেঁছলো দুজনে। এসে দেখলে, ভিড় সত্যিই। ঠেলাঠেলি, ছোটাছুটি, চিৎকার। এতক্ষণে কেমন ভয়-ভয় করতে লাগলো মুকুলের। হারিয়ে যাবার ভয়। শক্ত করে মানিকের হাতটা ধরলো, ছাড়াছাড়ি না হয়।

নাগরদোলা ঘুরছে তখন বনবন করে। যত দোকান, তত লোক। ভাজা পাঁপর আর তেল-ফুলুরির গন্ধ ভুরভুর করছে। সাঁওতালের দল পেলেই হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সার্কাস-ওয়ালা। বাঘের খেলা দেখাতে। সার্কাসওয়ালার হাত ছাড়িয়ে আসতে না-আসতে ধরেছে চুড়িওয়ালা। সারি সারি চুড়ির দোকান—কাচের চুড়ি রঙবেরঙের। তার পাশেই সোনার। সত্যি সোনা নাকি? একবার কি ভাবলে মুকুল। না, নকল সোনা বোধ হয়। ওদিকে ওটা? শাঁখার দোকান। শাঁখার দোকানই বেশী। শাঁখা পরতেই আসে সকলে। এ গাঁয়ে শাঁখা পরতে এসেছিলো মা কালী স্বয়ং। শাঁখারী 'শাঁখা চাই', 'শাঁখা চাই' বলে শাঁখা ফিরি করে যাচ্ছিলো। একটা কালো মেয়ে এসে বললে, দাও পরিয়ে।

হঠাৎ একটা ভিড়ের চাপে হাত ছেড়ে গেল মানিক আর মুকুলের।

মানিক ভয়ে চিৎকার করে উঠলো, দিদি!

কোনো সাড়া পেলো না। কোন ফাঁকে সাঁওতালের দলটা ছেড়ে এসেছে। হঠাৎ দু চোখ

ছাপিয়ে জল এলো মানিকের। ভয়ে কে'পে কে'পে উঠলো ওর সারা শরীর। সমস্ত মেলাটাই এতক্ষণ কিনতে ইচ্ছে হচ্ছিলো। এখন মনে হচ্ছে, মেলা নয়—যেন একটা বিভীষিকা। কই, দিদি কই? দিদি, দিদি! চিৎকার করলো মানিক।

—ও খোকা, পুতুল কিনবে, পুতুল?

কথাটা শুনেও শুনলো না মানিক, ফিরেও তাকালো না। গেরুয়া-কাপড়-পরা হাতে-চিমটে সন্ন্যেসীর দলটা পার হয়ে যেতেই মুকুলকে দেখতে পেয়ে আনন্দে হেসে উঠলো মানিক। মুকুলের চোখ থেকেও উৎকণ্ঠা দূর হলো। এই দলটা মাঝখানে এসে পড়াতেই দুজনে দুজনকে হারিয়ে ফেলেছিলো।

মুকুল ধমক দিয়ে বললে, বললাম—হাত ছাড়িস না, হাত ছাড়িস না।

অপরাধীর চোখে তাকালে মানিক। সে যে ইচ্ছে করে হাত ছাড়েনি, লোকগুলোর ধাক্কা সহ্য করতে না পেরেই হাত ছেড়ে দিয়েছিলো সে কথা যেন ভুলেই গেছে দিদিটা।

মুকুল ততক্ষণে পুতুলের দোকানটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। কতরকমের পুতুল। কোনোটা ঘাড় নাড়ছে দুলে দুলে, দু হাত তোলা নিতাই-গৌর, বাঈজীর মতো ঘাগরা পরে কোনোটা।

পুতুলগুলোর দিকে তাকিয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে মুকুল আর মানিক, আর খিলখিল করে হেসে ওঠে। কাছে এগিয়ে যায়, নেড়েচেড়ে দেখে, তারপরই মনে পড়ে যায়—একটাও পয়সা নেই কাছে, বিমর্ষ মুখে সরে আসে।

একটা দোকানে নানান ধরনের রান্নার জিনিসপত্র, আর কি সুন্দর দেখতে সেগুলো! খুন্তি সাঁড়াশি বাসনকোসন চালুনি—আর কি চমৎকার চাকি-বেলুন! মুকুলের মনে পড়লো, বেলুনটা খারাপ হয়ে গেছে। পয়সা থাকলে—

না, লোকটা পয়সার বদলে চালও নিচ্ছে ওজন করে করে। এক সের চালও যদি নিয়ে আসতো আঁচলে বে'ধে! তা হলে চাকি-বেলুনটা নিয়ে যেতো, আর তা দেখে মা খুশী হতো, মেলায় গিয়েছিলো শুনলে বড় জোর একটা ধমক দিতো।

ঘুরতে ঘুরতে আবার একটা শাঁখার দোকানের সামনে এসে পে'ছিলো ওরা।

হারিয়ে যাওয়ার পর থেকেই কেমন ভয়-ভয় করছিলো মানিকের। বললে, দিদি, বাড়ি চ।

—দাঁড়া না। বলে শাঁখার দোকানটার কাছে এগিয়ে গেল মুকুল।

বউটাকে শাঁখা পরাতে পরাতে গল্প বলছে শাঁখারী: 'হ্যাঁ মা, এখানেই কালো মেয়ে শাঁখা পরে বলেছিলো—যা, বাবার কাছে দাম নিবি। বলে দেখিয়ে দিয়েছিলো পূজুরীর বাড়ি। পূজুরী শুনে বিশ্বাস করলে না, বললে—মেয়েই নেই আমার।...'

এ গল্প মুকুল জানে, সরে এলো ও। ওদিকটায় এত ভিড় কিসের দেখতে হবে তো। ভিড়ের দিকেই এগিয়ে চললো।

মানিক ধীরে ধীরে বললে, তারপর কি হলো রে দিদি?

—ও মা, জানিস না? পুকুরের পাড়ে এসে যেই পূজুরী জিজ্ঞেস করলো—কই গো মেয়ে, কেউ শাঁখা পরেছো? অমনি পুকুরের মাঝখান থেকে একখানা শাঁখাপরা হাত...

সাঁওতালের একটা দল ঘাড়ের ওপর এসে পড়লো। কথা শেষ হলো না মুকুলের। তার আগেই ওরা দুজনে লোকটার সামনে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে।

কোনোরকমে সামলে-সুমলে উঠে দেখলে, লোকটার সামনে মাটির ওপর সুন্দর সুন্দর সব ছবি বিছানো রয়েছে। পটো বোধ হয়! না, ভালো করে দেখলে মুকুল—পটুয়া নয়। একটা যন্ত্র দিয়ে মেয়েটার হাতে ছবি এ'কে দিচ্ছে লোকটা। দাঁড়িয়ে দেখে মুকুল। যত দেখে ততই অদ্ভুত লাগে। কেমন একটা নেশা ধরে যায়! চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকে লোকটার দিকে, তার হাতের যন্ত্রটার দিকে।

ছোটমামা একবার মুকুলের হাতে কালি দিয়ে নাম লিখে দিয়েছিলো। সে নাম জলে ধুতেই উঠে গিয়েছিলো। কিন্তু লোকটা বলছে, এ ছবি নাকি কোনো দিন উঠবে না। যার যে ছবি পছন্দ তাই এ'কে দেবে।

একে একে ভিড় কমে এলো। কেউ খানিকটা দেখে সরে গেল, কেউ বা উল্কি আঁকিয়ে

নিয়ে গেল। সবাই তারা হাসছে, খুশী হয়েছে, সকলের মুখেই কি-লজ্জা কি-মজা ভাব।

অপেক্ষা করতে করতে যখন সকলেই চলে গেল, তখনো ঠায় দাঁড়িয়ে আছে মুকুল আর মানিক।

উল্কিওয়ালার চোখ পড়লো এতক্ষণে। বললে, কি খুকী, উল্কি আঁকাবে নাকি?

—হ্যাঁ। ঘাড় কাত করে হাতটা বাড়িয়ে দিলো মুকুল।

উল্কিওয়ালা প্রশ্ন করলে, কোনটা দেখিয়ে দাও।

সামনের ছবিগুলো থেকে যে-কোনো একটা পছন্দ করে বাছতে বললে।

এক মুহূর্ত কি যেন ভাবলে মুকুল। তারপর বললে, না, ও ছবি নয়। ফিক করে হেসে ফেলে বললে, মানিকের ছবি এঁকে দাও, আমার ভাই মানিক—ওর মুখ এঁকে দাও।

উল্কিওয়ালা বললে, দু আনা লাগবে।

—দু আনা! হতাশ সুর ফুটলো মুকুলের গলার স্বরে। যেন হাতের গ্রাস চিলে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল।

মুকুল প্রায় কাঁদো-কাঁদো গলায় বললে, আমার কাছে যে পয়সা নেই!

—পয়সা নিয়ে এসো বাড়ি থেকে।

বাড়ি থেকে পয়সা নিয়ে আসবে? কোথায় পাবে পয়সা? ফিরে গেলে আর কি আসতে পাবে? কিন্তু হাতে উল্কি আঁকতে না পারলে যেন জীবনই ব্যর্থ। মনে নেশা ধরে গেছে তখন মুকুলের। উল্কি আঁকবার জন্যে সবই যেন করতে পারে।

মানিক একবার শুধু বললে, দূর, ওসব করে কি হবে রে দিদি!

—তুই চুপ কর তো। ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলো মুকুল।

তারপর অনুনয় করতে শুরু করলো উল্কিওয়ালাকে। চোখ ছাপিয়ে জল এলো।

বললে, তুমি তো অনেক পয়সা পেয়েছো, এমনি করে দাও না আমাকে। শুধু এক হাতে করে দাও।

উল্কিওয়ালা মাথা নাড়লো বারবার।

শেষে হতাশ হয়েই মানিকের হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে চলে এলো মুকুল। মুখে চোখে রাগ উপচে পড়ছে যেন।

দু পা আসতেই ডাক শুনতে পেলো।

—ও খুকী, শোনো, দিচ্ছি করে, এসো।

উল্কিওয়ালার মন নরম হলো বোধ হয়। কিংবা তার মনও হয়তো উল্কি আঁকার জন্যে ছটফট করছিলো। সারা দিন তো কালো কালো হাতে গলায় পায়ে উল্কি এঁকেছে সে। এমন ফরসা ধবধবে সোনার মতো রঙের হাত তো পায়নি।

উল্কিওয়ালার ডাক শুনেই ফিরে এলো মুকুল। সুডোল নিটোল ফরসা হাতখানা এগিয়ে দিয়ে বললে, মানিকের মুখ হয় যেন।

—হবে, হবে। সান্ত্বনা দিলো উল্কিওয়ালা। তারপর যন্ত্রটা হাতে নিয়ে শুরু করলো ছবি আঁকতে।

বিন্দু বিন্দু রক্ত ফুটে উঠেছে, সারা হাত চিনচিন করছে, টাটিয়ে উঠেছে যেন কাঁধের কাছটা, তবু আনন্দে ফুর্তিতে আত্মহারা হয়ে উঠেছে মুকুল।

শেষ অবধি একটা মুখ আঁকা হয়ে গেল তার হাতে। খুশী মনে মেলা থেকে বেরিয়ে বোর্ডের রাস্তা ধরে চলতে শুরু করলো দুজনে। বোর্ডের রাস্তা থেকে কাঁদিরের জল। তারপর দেবীপুরের মাঠ।

আলপথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে একটু একটু করে ভয় উঁকি দিতে শুরু করলো মুকুলের মনে। ফিসফিস করে ভাই মানিককে বললে, মাকে বলিস না যেন!

—দূর।

'দূর' বলে সব ভয় দূর করতে চাইলো বটে মানিক, কিন্তু মুকুলের মনে তখন ক্রমশই ভয় বাড়ছে। মানিক না বললে কি আর জানতে পারবে না মা, দেখতে পাবে না! তার চেয়ে এক কাজ করা যাক। রাস্তার ধারে ধারে আকন্দ ফুটে আছে। বাবলাগাছ থেকে কাঁটা ভেঙে নিয়ে আকন্দর মালা গাঁথলো মুকুল, তারপর হাতে জড়ালো সেটা, উল্কিটা ঢেকে। ব্যস,

আর কেউ দেখতে পাবে না, সন্দেহ করবে না।

কিন্তু এত সহজে কি ঢাকা যায়! যা তার সারা জীবনের সঙ্গী হয়ে রইলো তা কি চাপা ঢাকা দেওয়া যায়!

বাড়ি ফিরতে ফিরতেই মুকুল বললে, হাতটা বড় টাটিয়েছে রে!

—টাটাবেই তো, তখন তো শুনলি না। বিজ্ঞের মতো বললে মানিক। সে বুঝে নিয়েছে যে দিদির জন্যে তাকেও মার খেতে হবে।

বাড়ি ঢুকতে গিয়ে দুজনেই পড়লো একেবারে মা-র সামনে। তাড়াতাড়ি হাতটা পিছনে লুকালো মুকুল। কিন্তু ওসবের দিকে চোখ গেল না মায়ের, মুকুলকে দেখতে পেয়েই ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে দিলো তার গালে।

—কোথায় গিয়েছিলি? সারা দুপুর টো-টো করে কোথায় বেড়াচ্ছিলি?

কোনো উত্তর দিতে পারলো না মুকুল। সারা শরীর তখন পুড়ে যাচ্ছে, চোখ জ্বালা করছে। জ্বর আসছে বোধ হয়। শীত-শীত করছে। কাঁপুনি দিয়েই জ্বর এলো। সন্ধ্যের দিকে জ্বর বাড়লো।

বিব্রত বোধ করলো সুদাম হাজরা। ডাক্তারকে খবর পাঠিয়ে এসে মুকুলের হাতটা তুলে জ্বর দেখতে গিয়ে দেখলো, কনুই থেকে কবজি অবধি ফুলে উঠেছে। আর—

মানিকের কাছ থেকে সবই শুনলো সুদাম, শুনলো পলাসনের বউ। শুনে ছি-ছি করে উঠলো।

—ছি-ছি! এ কি করলি তুই? ভদ্রঘরের মেয়ে হাতে উল্কি আঁকিয়ে এলি শেষে? ছি-ছি!

কেঁদে ফেললে বাপ-মা দুজনেই। তাদের সব আশা-ভরসা, সব স্বপ্ন যেন ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিয়েছে মেয়েটা।

হাতে উল্কি দেখলে যে বিয়ে দিতে রাজী হবে না কেউ! টাকা দিয়েও যে পার পাওয়া যাবে না!

টাকা দিয়েও যেখানে পার পাওয়া যায় না, প্রতারণাই সেখানে একমাত্র পথ। তেরো বছর পার না হতেই মুকুলের লম্বা ছিপছিপে চেহারাটা মাথায় বাড়লো চড়চড় করে, শরীর ফাঁপলো আঁটসাঁট হয়ে। সুন্দর তো ছিলোই, যৌবনের স্পর্শে আরো রূপময়ী হয়ে উঠলো।

এ-গাঁ ও-গাঁ ছোটাছুটি করতে করতে শেষ পর্যন্ত বিয়েও ঠিক করে ফেললো সুদাম হাজরা।

বাবলাডিঙের বলরাম সামন্তর ছেলে নিরঞ্জনের সঙ্গে। বলরাম এলো, কনে দেখলো, পণাপণ ধার্য হলো, দিনও ঠিক হয়ে গেল।

মুকুলের দু হাতে দুটো চওড়া মানতাসা পরিয়ে মেয়ে দেখানো হয়েছিলো, বিয়ের পর বিদায় দেবার সময় মেয়েকে কাছে ডেকে মা কানে কানে বললে, মানতাসা যেন খুলিস না কারুর সামনে।

মুকুল ফিক করে হেসে ফেলেই ঘাড় নাড়লো। মনে মনে ভাবলো, মায়ের যত মিথ্যে দুর্ভাবনা। হাতে একটা উল্কি আছে তো কি হয়েছে, শখ করে কেউ করায় না!

মনে মনে বললো বটে, কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারলো না নিরঞ্জনকে।

দু-একদিন বলি-বলি করেও শেষ পর্যন্ত সাহস হয়নি। সাহস যেদিন হয়েছে সেদিন সুযোগ জোটেনি। আর সুযোগ পাবেই বা কি করে!

ভোর না হতেই, নিরঞ্জনের ঘুম না ভাঙতেই উঠে আসতে হয় বিছানা ছেড়ে। ননদ আর শাশুড়ীর কাছে কাছেই সারাটা দিন কেটে যায়। দুপুরে নিরঞ্জনের সঙ্গে দেখা হয় কদাচিৎ, তাও দু-দশ মিনিটের জন্যে। আর রাত্তিরে যখন সংসারের কাজকর্ম সেরে শ্বশুরের তামাক সেজে দিয়ে শাশুড়ীর পায়ে তেল মালিশ করে শুতে আসে, নিরঞ্জনের তখন মাঝরাত্রি। সারা দিনের খাটাখাটুনির পর ক্লান্ত মানুষটা পড়ে পড়ে ঘুমোয়। এরই মাঝে যেটুকু কথা বলা যায়, যেটুকু ফিসফিসানি, তাও কি নষ্ট করা যায় উল্কির কথা তুলে?

কিন্তু না বলে যেন শান্তি পায় না মুকুল। মুকুল? না, ও নামটা যেন ভুলেই গেছে ও।

সবাই ডাকে দেবীপুরের বউ বলে। সবাই সম্মান করে, সম্ভ্রম দেখায়। পাড়ার লোক সামন্ত-গিন্নীকে বলে, দেবীর মতোই বউ হয়েছে তোমার দেবীপুরের বউ।

আর পূর্ণিমার রাত্রে এক ফালি আলো যখন এসে পড়ে দেবীপুরের বউয়ের ফরসা মুখ-খানার ওপর, একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে নিরঞ্জন, ফিসফিস করে বলে, সত্যি, এত রূপ তোমার?

কৌতুকে আনন্দে হাসে দেবীপুরের বউ। কিন্তু বুক দুরদুর করে। এক-একবার ভাবে, বলে ফেলি উল্কির কথাটা। আর কেউ না জানুক, স্বামী অন্তত জানুক। কিন্তু পারে না। কেমন একটা ভয়, কেমন একটা আতঙ্ক উঁকি দেয় মনে।

কিন্তু না বলেও যেন শান্তি নেই। দিনরাত মনের মধ্যে একটা খুঁতখুঁতুনি, দিনরাত কেমন একটা গা-সিরসির আতঙ্ক। কখন বুঝি শাশুড়ী শুনতে পায়, কখন ননদরা দেখতে পায়! তার চেয়ে নিজের থেকেই বলে ফেলবে সে নিরঞ্জনকে।

না, মুখে বলতে পারবে না। তার চেয়ে নিজের চোখে দেখুক। নিরঞ্জন নিজেই জিজ্ঞেস করুক। যা সত্যি তাই বলবে ও।

দুপুরের খাওয়ার পর খাটের পাশে এসে দাঁড়ালো ও। বিছানায় শুয়ে তারই অপেক্ষায় বুঝি দরজার দিকে তাকিয়ে ছিলো নিরঞ্জন। বললে, পান দেবে না?

—পানের জন্যেই বুঝি ঘুমোওনি! বলে কৌতুকে হাসলো দেবীপুরের বউ।

তারপর হাতের মানতাসা চুড়ি গলার হার খুলে বালিশের তলায় রেখে শুয়ে পড়লো। বললে, বড় ঘুম পাচ্ছে।

বলে চোখ বুজে পড়ে রইলো। বুক কাঁপছে, নিশ্বাস দ্রুত হচ্ছে, এখনই বুঝি চমকে নিরঞ্জন প্রশ্ন করবে! তবু সেই প্রশ্নটাই যেন শুনতে চায় দেবীপুরের বউ। শান্তি পেতে চায়।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে থেকে চোখ খুললো। না, হাতের দিকে, উল্কির দিকে দৃষ্টি নেই নিরঞ্জনের। একদৃষ্টে তার মুখের দিকেই মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছে শুধু।

উঠে পড়লো দেবীপুরের বউ। ঘরের কোণে পানের বাটা আছে কুলুঙ্গিতে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পান সাজলো। পান নিয়ে দাঁড়ালো নিরঞ্জনের সামনে। হাত বাড়িয়ে পান দিলো। তবু নিরঞ্জনের চোখে পড়লো না উল্কিটা।

আর হঠাৎ কেমন সারা গা শিউরে উঠলো দেবীপুরের বউয়ের। শুয়ে পড়ার ভান করে পাশ ফিরে লুকিয়ে লুকিয়ে বালিশের তলা থেকে মানতাসা বের করে হাতে পরলো, উল্কি ঢাকলো। কি আশ্চর্য! নির্বোধের মতো কেন সে নিজের কলঙ্ক নিজেই তুলে ধরতে চাইছিলো স্বামীর চোখের সামনে!

এত যে ভালোবাসা মান-অভিমান—সব কিছুই হয়তো মুছে যাবে মুহূর্তে, কে বলতে পারে!

এক-একদিন হঠাৎ যেমন দুঃসাহসে এগিয়ে আসে দেবীপুরের বউ, তেমনি এক-একদিন ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে ওর।

সেই সেদিনের মায়ের সজল চোখের ধিক্কারটা যেন কানের পাশে বেজে ওঠে বারবার।—ছি-ছি! কি করলি তুই, ভদ্রঘরের মেয়ে হাতে উল্কি আঁকিয়ে এলি শেষে?

যত দিনের পর দিন কেটে যায়, দেবীপুরের বউ ততই বুঝতে পারে তার এই নির্দোষ কলঙ্কটুকুও স্বামীর সামনে তুলে ধরার সুযোগ চলে যাচ্ছে, সাহস কমে যাচ্ছে।

মন এক-একদিন আনন্দে ভরে ওঠে, মনে রোমাঞ্চ জাগে, নিজেই কৌতুকে এগিয়ে যায় নিরঞ্জনের কাছে, তার চুলে বিলি কাটতে কাটতে স্বপ্নের মতো ভাঙা-ভাঙা কথা বলে, কিন্তু তার পরই—যখনই নিরঞ্জনের দুটি হাত আলিঙ্গনের উচ্ছ্বাসে এগিয়ে আসে, নিরঞ্জনের চোখ উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ওঠে আবেগে, তখনই কেমন যেন ভয়ে কেঁপে ওঠে দেবীপুরের বউ, সমস্ত শরীর তার অবশ হয়ে যায়। হঠাৎ কোথা থেকে একটা আশঙ্কার কুয়াশা এসে দাঁড়ায় চোখের সামনে। আয়নার প্রতিচ্ছবিতে যেমন হাতে হাত ঠেকে, মুখে মুখ, অথচ কোনো স্পর্শের অনুভূতি জাগে না, তেমনি দুজনে কাছে থেকেও যেন দূরে। নিরঞ্জনকেও কেমন যেন আশাহত বেদনার মতো মনে হয়। বিস্ময়ের, অতৃপ্তির চোখ তুলে তাকায়। সে কি যেন খোঁজে, কি যেন খোঁজে! মনে হয়, কি যেন এক অজানা রহস্যের পাঁচিল গাঁথা হয়ে যাচ্ছে দুজনের মাঝ-

খানে। দুটি দেহ কাছাকাছি এসেও রয়ে গেছে অনেক দূরে। মন দূরে সরে গেছে।

এমনি করেই দিন কাটছিলো। হঠাৎ একদিন আতঙ্কে শিউরে উঠলো দেবীপুরের বউ একটি ঘটনায়। দিনের পর দিন কত ঘটনাই তো ঘটছে, এই সামন্ত-বাড়ির বউ হয়ে আসার পর থেকে অনেক কিছুই দেখছে, কখনো দেখছে শ্বশুর-শাশুড়ীর রুদ্র মূর্তি, কখনো কোমল স্নেহ, কিন্তু এমন একটা ঘটনা যে তারই চোখের সামনে ঘটবে তা বুঝি কল্পনাও করেনি সে।

বাবলাডিঙের বলরাম সামন্তর পুত্রবধূ হয়ে এ বাড়ির অন্দরমহলে ঢোকার পর থেকে অনেক কিছুই দেখেছে সে, অনেকবার আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে, কিন্তু বুকে গিয়ে বেঁধেনি কোনো দিন।

অথচ এ বাড়িতে মাথায় লাল বেনারসীর আঁচল টেনে সিঁথিতে সিঁদুর নিয়ে যেদিন এসেছিলো, সেদিন শুধু যৌবনের রোমাঞ্চই নয়, স্বামী-গৃহের গৌরবেও গর্বিত হয়েছিলো সে। সামন্তদের সংসার তখন জমজমাট। অবস্থা চারপাশের গাঁয়ের পাঁচটা হাঁকডাকের জমিদারের দশ গুণ। রাশভারী লোক ছিলেন বলরাম সামন্তর বাপ, সদরে মামলা করতে যাবেন অপরের জমির ওপর দিয়ে, মাঝপথে দেখলেন কাঁদরের বাঁধ কেটে জলে ভাসিয়ে দিয়েছে জমি। বুঝলেন, অপর পক্ষের সঙ্গে যোগসাজসে হয়েছে কাণ্ডটা। ফিরে এসে প্রতিজ্ঞা করলেন, সদরে যদি কোনো দিন যাই তো নিজের জমির ওপর দিয়ে যাবো। প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে পারেননি তিনি নাকের সোজা সাত শো বিঘে জমি কিনেও। বাপের ইচ্ছা পূরণ করেছিলো পুত্র বলরাম সামন্ত। সামন্তদের খামার ছিলো চোখ চেয়ে দেখবার মতো। মরাইয়ের পর মরাই বিঘে পনরো জমি জুড়ে, দূর থেকে চিকচিক করতো খড়ের ছাউনি, লোকে গ্রাম বলে ভুল করতো। আর সে মরাই খোলা হতো কালেভদ্রে, কিস্তির সময় গাঁয়ের পাঁচটা খামার যখন খাঁ-খাঁ করতো, মরাইয়ের 'বড়ে' হাত পড়তো না তখনো সামন্ত-বাড়িতে।

গাঁয়ের লোকে বলতো, চাল যে খারাপ হয়ে যাবে বড় কর্তা, ক' বছর আর ধরে রাখবেন? দাম চড়েছে, দিন এবার বেচে।

বলরাম সামন্ত হেসে বলতো, বেচে দেবার চাল ওই মাঠে খামারে। এ আমার ঘরে খাবার বাসমতী। পাঁচ বছরের পুরোনো হলে তবে খুলবো।

লোকে বিস্মিত হয়ে তাকাতো বলরামের মুখের দিকে।

আর বলরাম হাসতে হাসতে বলতো, যার যা নিয়ম। সুতোর মতো সরু আর গ্যাঁড়া-গ্যাঁড়া দেখতে, কিন্তু ভাত হবে একেবারে সীতাভোগ, যেমন লম্বা তেমনি বড়। আর বাস কি তার, এসো না, আজ দুপুরে এখানেই নয়—

তা কৃপণ ছিলো না বলরাম, সুযোগ পেলেই গাঁ-সুদ্ধ নিমন্ত্রণ করে বসতো। যার বাড়িতেই কুটুম আসুক, সামন্ত-বাড়িতে এক বেলা খেয়ে যেতেই হবে। দিঘির মতো পুকুর সব, গোয়াল-ভরা গাই।

এমনি ভরভরন্ত সময়েই তার ছেলে নিরঞ্জনের বউ এসেছিলো—দেবীপুরের বউ। এসে দেখলে, অষ্টমের খাজনা মেটাতে গিন্নীর গয়না বন্ধক রাখতে হয় না, ধানের দর জলের মতো হলেও মরাই খুলতে হয় না।

প্রথম প্রথম তাই খুশীই হয়েছিলো দেবীপুরের বউ। আনন্দে নেচে উঠেছিলো তার মন। কিন্তু দু দিন না যেতেই বউয়ের গয়নাপত্তর দেখে নাক বেঁকালো সামন্ত-গিন্নী।

দু গালে দু জোড়া পান গুঁজে এক মুঠো দোক্তা মুখে পুরে বউয়ের গলার হারটা নেড়েচেড়ে বলেছিলো, এ কি হার গো বউমা, এ যে মুড়কিমালা, পাটকরুনী বাগদী-বউয়ের ছেলের মুখে-ভাতে দিয়েছিলাম।

শুনে লজ্জায় কুঁকড়ে গিয়েছিলো দেবীপুরের বউ। চোখ ঠেলে জল এসেছিলো তার। মনে মনে ভেবেছিলো, এর চেয়ে গরিবের ঘরে হলেও শান্তি পেতো সে। শ্বশুর-শাশুড়ীকে ভয় পেতো বাড়ির সবাই। সবচেয়ে বেশী ভয় পেতো দেবীপুরের বউ।

কিন্তু নিরঞ্জনের ব্যবহারে খুঁত ছিলো না। নিরঞ্জনের ব্যবহারে অনেক কিছু ভুলতে পেরেছিলো সে, অনেক কিছু ক্ষমা করতে পেরেছিলো।

শুধু ভুলতে পারেনি একটি কথা।

তার হাতের উল্কির কথা—যে কলঙ্ক সে গোপন রাখতে চেয়েছে, দিনের পর দিন যে কলঙ্ক তার গোপন মনকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। যা গোপন করতে গিয়ে নিরঞ্জনের কাছ থেকে দূরে সরে গেছে সে, সব রঙ গেছে তার চোখ থেকে।

সেই উৎফুল্ল যৌবনের কৌতুক-ছন্দে গড়া কোমল শরীরটা যেন দিনে দিনে বিষাদক্লিষ্ট অভিশপ্ত অহল্যায় পরিণত হয়ে চলেছে তখন।

এমনি সময়েই ঘটনাটা ঘটলো তার চোখের সামনে।

ঝাংলাই-পুজোর সময় একান্নবর্তী সামন্ত-পরিবারের সবাই ফিরে আসে গাঁয়ে। ভায়াদ সম্পর্কের ছেলে-বউরা, বউ-ঝিরা, মেয়ে-জামাইরা—সকলে এসে হাজির হয়। তাই রান্নার জন্যে সে সময় আনা হয় কয়েকজন রাঁধুনী।

হঠাৎ চিৎকার শুনে সেদিন ছুটে এসে দেবীপুরের বউ দেখলে, রাঁধুনী বামনীদের একজন সাদা থান কাপড়ের ঘোমটাটা একটু টেনে দিয়ে উঠনে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে। আর চিৎকার করছে সামন্ত-গিন্নী।

—কি হয়েছে মা? এসে জিজ্ঞেস করলো দেবীপুরের বউ।

আর সে প্রশ্ন শুনে আবার চিৎকার করে উঠলো সামন্ত-গিন্নী। দেবীপুরের বউ শুনলো ব্যাপারটা। বামুনের ঘরের বিধবা মেয়ে পরিচয় দিয়ে সে নাকি এ ক'দিন রান্নার কাজ করছিলো। আজ হঠাৎ শাশুড়ীর চোখে পড়েছে তার চিবুকে উল্কির দাগ।

সে যত বোঝাতে চায়, সে বামুনের ঘরেরই মেয়ে, সামন্ত-গিন্নী তত চিৎকার করে।—ছি-ছি-ছি, বামুনের ঘরের মেয়ের গায়ে উল্কি থাকে কখনো? ও নিঘ্ঘাত ছোট জাত, নিঘ্ঘাত কোনো খারাপ বংশের মেয়ে—

ননদরা বোঝাবার চেষ্টা করলো। সামন্ত-গিন্নীর তবু সেই স্থির সিদ্ধান্ত: কাটোয়ায় গঙ্গা নাইতে গিয়ে দেখেছি বাপু, বোঝাস না আমাকে, যত সব বেবুশ্যেদের হাতে-মুখে উল্কি থাকে।

কথাটা শুনেই ছুটে পালিয়ে এলো দেবীপুরের বউ। মাথাটা হঠাৎ যেন ঘুরে গেল তার, সারা শরীর কেঁপে উঠলো থরথর করে। বিছানায় শুয়ে পড়লো দেবীপুরের বউ, বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলো। ভয়ে আতঙ্কে সারা শরীর তখনো কাঁপছে তার, কাঁপছে লজ্জায় ঘৃণায়।

অনেকক্ষণ পরে বিছানা ছেড়ে উঠলো সে। তারপর কোটাল-বউকে ডেকে গোপনে তার হাতে একখানা চিঠি দিয়ে পাঠিয়ে দিলো দেবীপুরে।

দু দিন পরেই পালকি নিয়ে হাজির হলো সুদাম হাজরা।

ছেলের বিয়ের মিথ্যা খবর দিয়ে নিয়ে গেল মেয়েকে।

তারপর আর বাবলাডিঙে ফিরলো না দেবীপুরের বউ। অথচ সামন্ত-বাড়ির কেউ কিছু বুঝলো না। সবাই ভাবলো, নিরঞ্জনের সঙ্গে বুঝি কোনো মনোমালিন্য হয়েছে তার। আর নিরঞ্জন খুঁজে পেলো না এ রহস্যের চাবি।

বারবার চিঠি লিখেও যখন উত্তর পেলো না বলরাম সামন্ত, লোক পাঠিয়েও পুত্রবধূকে ফিরিয়ে আনতে পারলো না, তখন ক্রুদ্ধ হয়ে বলে পাঠালো, ও বউকে আর ঘরে আনবো না।

আর এমনি করেই সাতটা বছর কেটে গেল।

সামন্ত-গিন্নী মারা গেলেন, তার পরে বলরাম সামন্ত।

বাপ-মা মারা যাওয়ার পর শেষ চেষ্টা হিসেবে দেবীপুরে এলো নিরঞ্জন, আর নিরঞ্জনের সঙ্গেই বাবলাডিঙে ফিরে এলো দেবীপুরের বউ।

কিন্তু তার মাস কয়েক পরেই...

ন্যাংটেশ্বরের মেলা। প্রতি বছরেই এ সময় মেলা বসে বাবলাডিঙে। চারপাশের গাঁ থেকে লোক ভেঙে পড়ে। দূর দূর জায়গা থেকে আসে দোকানীরা, টিকিট কেটে জায়গা নেয়। চালা তোলে, দোকান খোলে।

ন্যাংটেশ্বর শিবের পুজো দিয়ে ভোগের থালাটা হাতে করে ফিরছেন দেবীপুরের বউ। পরনে লালপাড় গরদের শাড়ি, দীর্ঘ ঋজু চেহারা, প্রতিমার মতো সুগঠন সুন্দরী, টিকলো নাক, টানা-টানা চোখ, ফরসা ঝকঝকে মুখে কপালে ঘামের বিন্দু, নাকের ডগাটা লাল হয়ে আছে।

দোকানগুলোর দিকে তাকাতে তাকাতেই ফিরছিলো দেবীপুরের বউ। হঠাৎ একটা দোকানের দিকে—লোকটার দিকে চোখ পড়তেই থেমে পড়লো।

একটি মুহূর্ত। তারপরই তরতর করে বাড়ি ফিরে ভোগের থালাটা নামিয়ে রেখে ডাকলো, মানো!

পাটকরুনী ঝি সামনে এসে দাঁড়ালো।

দেবীপুরের বউয়ের কপালের শিরা দুটো তখন দপদপ করছে। গম্ভীর গলায় বললে, কোটালদের ডাক্ তো একবার।

কেউ কিছু বুঝলো না, কেউ কিছু খুঁজে পেলো না। শুধু শুনলো দেবীপুরের বউয়ের হুকুমে মেলার একটা উল্কিওয়ালাকে পিটিয়ে মেরেছে কোটালরা। তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিলো, যেতে চায়নি লোকটা, তাই পিটিয়ে মেরেছে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে এমন থানা-পুলিস মামলা-মকদ্দমা হবে তা কে জানতো! কে জানতো দেবীপুরের বউ খুনের আসামী হয়ে দাঁড়াবে!

দেওয়ানী নয়, ফৌজদারী মামলা। প্রধান আসামী দেবীপুরের বউ। নিরঞ্জন ছোটাছুটি শুরু করলো—কাটোয়া বর্ধমান, এ-উকিল সে-উকিল। এদিকে লজ্জায় ভয়ে ঘৃণায় সামন্ত-বাড়ি যেন নিঃঝুম হয়ে গেছে। আর সামন্ত-বাড়ির বউ—দেবীপুরের বউ খিল দিয়েছে জামিন নিয়ে ফিরে এসে। পাটকরুনী মানোর ডাকে সাড়া দিচ্ছে না, ভাই-ভায়াদ সম্পর্কের ননদ-জাদের ডাকে সাড়া দিচ্ছে না।

শেষ পর্যন্ত কপাট খুললো দেবীপুরের বউ, ভাই মানিক দেবীপুর থেকে ছুটে এসেছে শুনে।

কপাট খুলে বেরিয়ে এলো সে। লজ্জায় গ্লানিতে এই দু দিনেই যেন সেই প্রতিমার মতো চেহারা ভেঙে পড়েছে। চোখে উদ্‌ভ্রান্তের মতো দৃষ্টি। মুখ তুলে তাকাতেও লজ্জা।

রোদে পুড়ে মাঠ ভেঙে ছুটতে ছুটতে এসেছে মানিক হাজরা। কিন্তু তার চোখে চোখ রেখে তাকাতে পারলো না দেবীপুরের বউ। চোখ নামিয়ে ধীরে ধীরে এসে বারান্দায় একটা আসন পেতে দিলো ভাইকে, হাতপাখাটা নিয়ে কলের পুতুলের মতো বাতাস করতে শুরু করলো।

তারপর মানিকের প্রশ্ন শুনে ডুকরে কেঁদে উঠলো দেবীপুরের বউ—কান্নায় ভেঙে পড়লো।

একে একে শুনলো মানিক, শুনলো সব।

বললে, ভয় নেই, সব কথা শুনলে বোধ হয় ছাড়া পেয়ে যাবি, জজেরও রায় ঘুরে যাবে।

উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করে নিরঞ্জনও সেই কথাই বোঝালো। শুধু হাতটা বাড়িয়ে উল্কিটা দেখাতে হবে, বলতে হবে তার জীবনের ব্যথাবেদনার কাহিনী। বলতে হবে, মেরে ফেলতে বলিনি, মেরে তাড়িয়ে দিতে বলেছিলাম।

শুনলো দেবীপুরের বউ। মুখের ভাব এতটুকু বদলালো না। কথাগুলো শুনলো কি শুনলো না বোঝাই গেল না।

যথাসময়ে মামলা উঠলো আদালতে, দেবীপুরের বউ উঠলো কাঠগড়ায়।

তারপর প্রশ্ন শুরু হলো। প্রশ্নের পর প্রশ্ন।

—উল্কিওয়ালাটাকে মারতে বলেছিলেন কোটালদের?

—হ্যাঁ।

—কেন বলেছিলেন?

—রেগে গিয়েছিলাম হঠাৎ।

—কেন রেগে গিয়েছিলেন?

উত্তর নেই। উকিলের প্রশ্নের জবাবে কোনো উত্তর দিচ্ছে না দেবীপুরের বউ। চুপ করে আছে।

নিশ্বাস রোধ করে বসে আছে নিরঞ্জন। নিশ্বাস রোধ করে বসে আছে মানিক। আর বিভ্রান্তের মতো তাকাচ্ছে উকিল। শেখানো জবাবটা কি দিতে পারছে না দেবীপুরের বউ, সত্যি কথাটা বলতেও কি মুখে আটকাচ্ছে?

—কেন রেগে গিয়েছিলেন বলুন।

বারবার প্রশ্ন করলো উকিল, আর দেবীপুরের বউ শেষ পর্যন্ত উত্তর দিলো, সে কথা আমি বলতে পারবো না।

উত্তর শুনে চুপসে গেল সব আশা-ভরসা।

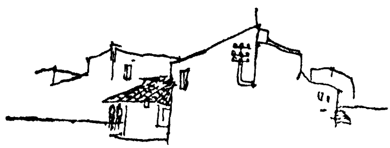
শুনানির দিন পড়লো আবার। আর বেরিয়ে আসতে আসতে মানিক প্রশ্ন করলো, কি হলো, উত্তর দিলি না কেন? উল্কি দেখালি না কেন? তা হলেই তো জজের রায় ঘুরে যেতো।

হাসলো দেবীপুরের বউ। বিষণ্ণ হাসি।

বললে, কি যে বলিস! একঘর লোকের সামনে দেখাবো হাতে উল্কি আছে আমার? কি ভাববে বল তো? হয়তো খারাপ কিছু সন্দেহ করবে, হয়তো—না, না, তার চেয়ে যা খুশি রায় দিক গে জজ, যা খুশি—

যা খুশিই হয়তো রায় দেবে এই ছোট্ট আদালতের জজ, কিন্তু আরো বড় জজের এজলাসে—সবচেয়ে বড় জজের এজলাসে হয়তো অন্য রায় পড়া হবে। রায় পড়বেন সেই সবচেয়ে বড় আদালতের জজ, হয়তো বলবেন, এই আর একটি দৃষ্টান্ত থেকে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, মানুষের একদিনের কামনা আর একদিন কলঙ্ক হয়ে দেখা দেয়, আর সেই কলঙ্ক গোপন করতে গিয়ে মানুষ আরো অনেক কলঙ্কের বোঝা...

[১৩৬৫



সুর্মা

ওরা সমাজ-ছাড়া, সমাজের বাইরে ওরা। কিন্তু ওদেরও একটা সমাজ আছে। ওদেরও ছেলে-মেয়ে আছে, আর ছেলেমেয়েদের বিয়েও হয় কখনো-সখনো। কিন্তু বিয়েটাকে খুব সুনজরে দেখতে পারে না সকলে।

পারে না তার কারণ এ নয় যে, ওরা অসামাজিক জীব। কারণটা অর্থনৈতিক। ওদের সমাজে শেষ ভরসা হলো একটি ভরা-বয়সের মেয়ে। নিজের হোক পরের হোক, তফাত নেই কোনো। মা-মাসীর রোজগারে ভাটা পড়লে ভয় কিসের? মেয়ের যৌবনের জোয়ার মানেই তো রোজগারেও জোয়ার।

কিন্তু দু-একটা মেয়ে হঠাৎ একসময় বেঁকে দাঁড়ায়।

চোখ কপালে ওঠে বিপত্তারিণীর। বিপত্তারিণী অবশ্য নাম নয়, আসল নামটা যে কি ছিলো তা আর মনেই নেই কারও। বয়সকালে যতবার পাড়া বদলেছে ততবার নাম, তারপর

এ তল্লাটে যখন ব্যবসা জাঁকিয়ে বসলো তখন থেকে সবাই ঠাট্টা করে নাম দিলো—বিপত্তারিণী। ব্যবসাটা মন্দ চলে না। আইনকানুনের যত কড়াকড়ি হচ্ছে, বিপত্তারিণীর ততই লাভ। দিশী বিলিতী পাঁচ রকমের মদ রাখে বিপত্তারিণী। রাত্তিরে মদের দোকানগুলো যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন অনেকে ছুটে আসে তার কাছে। বাড়তি দাম দিয়ে কিনে নিয়ে যায়। লুকোচুপির কাজ, কিন্তু থাকে দু-পয়সা। সত্যি বলতে কি, শেষ বয়সে মেয়ের রোজগারে খাবার লোভও নেই, প্রয়োজনও হবে না বিপত্তারিণীর। তা বলে সমাজ-ছাড়া হবে কেন তার মেয়ে!

চিরকাল যা দেখে এসেছে, বাকী দিন ক'টাও তাই দেখে যেতে চায় বিপত্তারিণী। উঠতি বয়সে অমন অনেক কথা মনে হয়, অনেক স্বপ্ন ও নিজেও দেখেছিলো। তারপর ঘা খেয়ে খেয়ে ভুল ভেঙে গেছে, বুঝেছে যে যার নিজের নিজের ফুটপাথ ধরে চলাই ভালো। তাই সুর্মাকে ভুল করতে দিতে চায় না। সোনাদানায় গা মুড়ে বেশ রবরবা নিয়ে জাঁকিয়ে বসেছে মেয়ে তার, এইটুকু দেখে যেতে পেলেই যেন খুশী হয় বিপত্তারিণী। আর বিয়েই যদি করতে হয় তো শেঠেদের সেই ছোকরা বাবুটি—

তা নয়, সুর্মার মন পড়েছে রতনের ওপর। এ পাড়ারই ছেলে, এ পাড়াতেই গান শিখিয়ে বেড়ায়। গলির মধ্যে চায়ের দোকানটা চালায় রতনের মা। দোকানটা ছিলো এক হিন্দুস্থানীর, রতনের মা-র কাছে আনাগোনা ছিলো তার। কলেরা না বসন্ত কি হয়ে যেন মারা যায় লোকটা, তারপর থেকে ওটা রতনের মা চালিয়ে আসছে।

রতনের দোকান-টোকান ভালো লাগতো না। গান গাইতে পারতো ভালো, হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান শেখাতো পাড়ার মেয়েদের।

যে যা পারতো দিতো মাইনে, রোজগার মন্দ হতো না।

সবচেয়ে বড় রোজগার হয়ে গেল সুর্মা।

সুর্মাকে গান শেখাতে শুরু করেছিলো সে খুব ছেলেবেলা থেকে। তারপর ধীরে ধীরে কখন যে সকলের অজ্ঞাতে হঠাৎ বড় হয়ে উঠেছে সুর্মা, তা রতন লক্ষ্যও করেনি।

ওসব অত লক্ষ করেও না রতন। এই পাড়ায় মানুষ, জন্মে থেকে অনেক কিছু দেখছে, অনেক কিছু শিখছে, তাই সবই গা-সওয়া হয়ে গেছে। কার বয়স বাড়লো, কার বয়স ছাড়লো —এসব খোঁজই রাখে না।

তবু হঠাৎ একদিন তার মনটা কেমন যেন আনচান করে উঠলো। সুর্মার চোখে, সুর্মার হাসিতে, এমন কি তার গলার স্বরেও কি যেন একটা নতুন নতুন ঠেকলো। রতন যাকে রোজ দেখে, ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছে, এ যেন সেই সুর্মা নয়। অন্য কেউ।

গান শেখাতে শেখাতে এক-একসময় অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে রতন। কি যেন ভাবে। আর তা দেখে মুচকি হাসে সুর্মা।

এমনিভাবেই চলছিলো। বিপত্তারিণীর যে চোখে পড়েনি তা নয়। কিন্তু এমনধারার ইয়ারকি-ফাজলামিকে কোনো গুরুত্ব দিলে চলে না ওদের। তাই দেখেও দেখেনি।

কিন্তু এমন একটা সাংঘাতিক কথা সুর্মার কাছে শুনতে পাবে, বিপত্তারিণী কোনো দিন কল্পনাও করেনি।

দুম্ করে একদিন সুর্মা বলে বসলো, রতন বলেছে আমাকে বিয়ে করবে।

চোখ কপালে উঠলো বিপত্তারিণীর : কি করবে? বিয়ে? ওই রতন?

অট্টহাসি হেসে উঠলো বিপত্তারিণী। মোটাসোটা থসথসে চেহারাটা কেঁপে কেঁপে উঠে আরো কুৎসিত দেখালো। নিজের মেদবহুল দু হাতে চেপে বসে আছে সোনার তাগা, গলায় মোটা বিছে-হার, সেগুলোর দিকে আঙুল দেখিয়ে বিপত্তারিণী বললে, তা এগুলো পরিয়ে দিতে হবে তোকে, তাই না!

ঠাট্টা বুঝে চুপ করে রইলো সুর্মা।

বিপত্তারিণী হেসে বললে, তারপর এগুলো বেচে দু দিন পরে আবার ফিরে আসবি, এই তো!

মেয়ের কথা শুনে তখনো বিশ্বাস হচ্ছে না যেন। বিয়ে করবে সুর্মা? তাও রতনকে?

সুর্মা ধীরে ধীরে বললে, কিছু চাই না তোমার কাছে, ফিরেও আসবো না কোনো দিন।

—অ, রতন বুঝি বাসা করে নিয়ে যাবে? কথাগুলো বিছুটির মতো ছিটিয়ে দিলো

বিপত্তারিণী।

কিন্তু গায়ে মাখলো না সুর্মা। বললে, হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখবো না আমি। এ পাড়াটা আমার বিষ লাগে।

হঠাৎ যেন একটা ঘা খেলো বিপত্তারিণী। রাগে জ্বলে উঠলো তার সর্বশরীর। বললে, দেখ্ সুর্মো, নাটক-নবেলের মতো কথা বলিস নে, হাড় জ্বলে যায় শুনলে। বলে দপদপ করে পা ফেলে চলে গেল বিপত্তারিণী চায়ের দোকানটার দিকে। অর্থাৎ রতনের মায়ের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে হবে।

কিন্তু রতনের মায়ের কোনো আপত্তি নেই। এমন বিয়ে তো কতই হয়েছে তাদের পাড়ায়। হবে না কেন? বিয়ের পর কেউ সরে গেছে, ঘর-সংসার করেছে, আবার কেউ বিয়ে করেও ব্যবসা ছাড়েনি। রতন যদি বিয়ে করে এখান থেকে চলেই যায় তো কি অন্যায় হবে?

সুর্মা দেখতে একটু সুশ্রী ছিমছাম তাই এত আপত্তি বিপত্তারিণীর, তা বোঝে সবাই।

পর পর দিন কয়েক কান্নাকাটি ঝগড়া-বিবাদ চললো। তারপর একদিন সকলের চোখের সামনে দিয়েই সুর্মা আর রতন চলে গেল।

ও-পাড়া ছেড়ে দিয়ে এসে বাসা করলো। গলির মধ্যে নীচের তলার একখানা ঘর, একেবারে বস্তির গায়ে।

নতুন ঘর-সংসার পাতার স্বপ্ন দেখলো সুর্মা। রতনের উৎসাহও কম নয়।

রতনের মা এসে যোগাড়যন্তর করে দিয়ে গেল, উপদেশ দিয়ে গেল এক রাশ। কিন্তু ফিরে গিয়ে সাতটা দিনও পার হলো না। খবর পেয়ে ছুটে গেল রতন। কিন্তু তখন সব শেষ।

চায়ের দোকানটা নিয়ে বিপদে পড়লো রতন। গান শেখাবে, না দোকান দেখবে?

সুর্মা বললে, না। ও-পাড়ায় আর গান শেখানো হবে না।

রতন হাসলো : ও-পাড়ায় না শেখালে আর কোথাও কাজ পাবো নাকি? ভদ্দরপাড়ায় অচেনা অজানা লোক রাখবে কেন?

সুর্মা বললে, তবে দোকানটা এদিকে কোথাও তুলে আনো, দোকানের রোজগারে বেশ চলে যাবে।

রতন আপত্তি করলে : চালু দোকান ছেড়ে দিয়ে এদিকে করলে চলবে কি না কে জানে!

—চলবে, চলবে। সুর্মার কথাটাই যেন সবচেয়ে বড় যুক্তি।

বোঝাবার চেষ্টা করলো রতন। বললে, ও দোকানটাই চালাই এখন, ধীরে ধীরে টাকা জমিয়ে এদিকে একটা শুরু করা যাবে। এ দোকানটা দাঁড়ালে তখন ও-পাড়ারটা তুলে দেবো।

সুর্মার কিন্তু তাতে আপত্তি। যে পাড়াটাকে ও মনে-প্রাণে ঘৃণা করে, যে জীবনকে ছেড়ে চলে এসেছে, তার সঙ্গে আর কোনো সম্পর্কই রাখতে চায় না।

অনেক ভেবেচিন্তে রতন চলে গেল শেঠেদের সেই ছোকরাটির কাছে। গঙ্গাধরকে ও-পাড়ায় একদিন রতনই পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো। বড়লোকের ছেলে, তিন-তিনটে বাড়ি, টাকার শেষ নেই। দু-একটা ভালো খবর-টবর দিলে দু-চার টাকা রতনকে দিতো গঙ্গাধর।

বৈঠকখানায় বেরিয়ে এসে রতনকে দেখে গঙ্গাধর প্রথমটা তাই উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলো। ভেবেছিলো, কোনো নতুন খবর-টবর।

গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবির হাতাটা সরিয়ে হাতে রিস্ট-ওয়াচের সোনার চেনটার কড়া লাগাতে লাগাতে গঙ্গাধর প্রশ্ন করলে, কি খবর রতন?

হাত কচলাতে কচলাতে রতন বললে, আজ্ঞে, খবর একটা আছে। বিয়ে করেছি।

—বিয়ে? তুই? আঁতকে উঠলো যেন গঙ্গাধর।

বোকা-বোকা হাসি হেসে রতন বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ। ওই যে রাতেবিরেতে মদ বেচতো বিপত্তারিণী, তার মেয়ে সুর্মা।

—হুঁ। বলে চুপ করলো গঙ্গাধর। অর্থাৎ আরো কিছু শুনতে চায়।

রতন বললে, তা বউটার জন্যে ও-পাড়া ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে। রোজগারপাতি নেই—

—তা আমি কি করবো? গঙ্গাধর যেন অধৈর্য হয়ে ওঠে।

রতন হাত কচলাতে কচলাতে বলে, কিছু টাকা দিতেন তো একটা চায়ের দোকান করতাম।

গঙ্গাধর তাকালো রতনের মুখের দিকে, কি যেন খুঁজলো। তারপর ধীরে ধীরে বললে, কোথায়?

—আজ্ঞে, আমার ওই বাসার সামনেই একটা ঘর আছে খালি, ওইখানেই করবো ভাবছি।

—কত টাকা লাগবে?

রতন বললে, উপস্থিত এক শো টাকা পেলেই—

কথা শেষ করতে দিলো না গঙ্গাধর। বললে, ঠিক আছে, কাল গিয়ে ঘরটা দেখে আসবো, তারপর—

—আজ্ঞে, কখন আসবো তা হলে?

বিনয়ে গলে পড়লো রতন। এত সহজে টাকাটা পেয়ে যাবে ভাবতেও পারেনি সে। তাই মনটা খুশী হয়ে উঠলো। এত খুশী হলো যে পরের দিন গঙ্গাধরকে দোকানঘরটা দেখিয়ে এনে একেবারে তার একতলার ছোট্ট ঘরখানার সামনে গাড়ি দাঁড় করালো।

গাড়ির দরজা খুলে বললে, আজ্ঞে, একটু চা-টা খেয়ে যাবেন না?

—তাই চ। নেমে পড়লো গঙ্গাধর।

তারপর সুর্মাকে দেখলো। দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। এমন ছিমছাম সুন্দর মেয়েটা এতকাল ও-পাড়ায় ছিলো অথচ খবরটা দেয়নি রতন? মনে মনে একটু রাগও হলো, একটু ঈর্ষাও হয়তো বা।

রতন পরিচয় করিয়ে দিলো : ইনি গঙ্গাধরবাবু, টাকা দিচ্ছেন তোমার সেই দোকান করবার।

ইনিই তা হলে টাকাটা দিচ্ছেন? কৃতজ্ঞতার চোখে তাকালো সুর্মা। বললে, আপনাদের মতো লোক থাকতে আমাদের আর ভয় কি বলুন?

—না, না। গঙ্গাধর অন্তরঙ্গ স্বরে বলে ওঠে, আমরা থাকতে তোমাদের কোনো ভয় নেই।

ভয় নেই বললো বটে গঙ্গাধর, কিন্তু ভয় যেন বেড়ে গেল সুর্মার।

শেঠেদের এই ছোকরা বাবুটিকে দূর থেকে কয়েকবার দেখেছে সে এর আগে, ও-পাড়ার অনেকে দু-একটা রসিকতাও করতো গঙ্গাধরকে নিয়ে।

কিন্তু সামনাসামনি এই প্রথম দেখলো সুর্মা। না, লোকটা ভালোই।

রতনের বন্ধু নিশ্চয়ই, তা না হলে দোকান করার জন্যে এতগুলো টাকা দিয়ে দেয়!

রতন ফিরে আসতেই সুর্মা বললে, বাবুটি লোক ভালো। তোমার বন্ধু বুঝি?

রতন বললে, হ্যাঁ, বন্ধু বলতে পারো, অনেক দিনের। তবে খুব বড়লোক তো, তাই একটু আপনি-আজ্ঞে করি, এই আর কি!

সুর্মা বললে, তা টাকা যখন দিচ্ছেন, দোকানটা ভালো করে চালাতে হবে।

বলে নিজেই উঠে-পড়ে লাগে সুর্মা। দোকানঘরের চুনকাম থেকে শুরু করে কাচের গেলাস কেনা পর্যন্ত সব কিছু নিজে দেখেশুনে করে দেয়।

প্রথম প্রথম নিজেও দোকানের দু-একটা কাজ করেছিলো, খদ্দেরগুলো বড় বেশী খিদে-খিদে চোখে তাকায় বলেই পর্দার আড়ালে চলে গেল সুর্মা।

ও যেখানে মানুষ হয়েছে সেখানকার মেয়েরা কারও চোখকে ভয় পায় না। কিন্তু সুর্মা যে সে জীবনটা ভুলে যেতে চায়।

সুর্মা বোধ হয় সত্যিকার ভালোবেসে ফেলেছে রতনকে। এমনভাবে ভালোবেসেছে যে অতীতের আতঙ্ক দেখলেই ভয় পায়। সব ভুলে গিয়ে ও নতুন করে ঘর-সংসার বাঁধতে চায়। সুখী হতে চায় শুধু রতনকে নিয়ে।

চায়ের দোকানটায় লাভ কিন্তু তেমন হয় না। একটু একটু করে ধারের অঙ্ক বেড়ে ওঠে আর একটু একটু করে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে গঙ্গাধর।

মাঝে মাঝেই আসে সে রতনের বাড়িতে। আর সুর্মাও বেশ বুঝতে পারে কার টানে ছুটে আসে গঙ্গাধর। দোকানের ভালোমন্দ নিয়ে সুর্মার সঙ্গে, রতনের সঙ্গে এমনভাবে

আলোচনায় মেতে ওঠে গঙ্গাধর, যেন তারই দোকান, যেন লাভ-লোকসানের ওপর তার ভবিষ্যৎও নির্ভর করছে। প্রথম প্রথম কোনো সন্দেহ হয়নি সুর্মার। রতনের বন্ধু, টাকা ধার নিয়ে রতনকে দোকান করে দিয়েছে, ভয় পাবার কারণ নেই। আর ভয় সত্যিই কাউকে পায় না সুর্মা। নিজের ভালোমন্দ নিজেই বোঝে। বিরক্ত হয়ে ও যার দিকে তাকায় তার সাধ্য নেই ফিরে তাকাবার। আসল ভয় রতনকে। কখন কি ভুল বোঝে!

সুর্মা জানে, ও ও-পাড়ার মেয়ে। ওর মা সারা জীবন ব্যবসা করেছে।

ছেলেবেলা থেকে সকলকে ব্যবসা করতেই দেখেছে ও। তাই ওর সব সময়ে ভয়, রতন না ওকে ভুল বোঝে, ওকে অবিশ্বাস করে। ভুল বোঝা অসম্ভব নয়, অবিশ্বাস করারই কথা। তবু সুর্মা যে অন্য ধরনের, অন্য জাতের মেয়ে তা রতন বুঝবে কি করে!

এদিকে ঘন ঘন যাতায়াতের ফাঁকে গঙ্গাধর যেন কেমন-কেমন চোখে তাকায় তার দিকে। যেন ইশারায় ইঙ্গিতে কি বলতে চায়।

এক-একসময় রাগ হয় সুর্মার। ইচ্ছে হয় তার মুখের সামনে দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিতে। পারে না। কেমন একটা সঙ্কোচ।

দু-এক দিন ভেবেছে রতনকে বলবে, তোমার বন্ধু লোক ভালো নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলতে পারেনি। কি জানি, যদি রতন তারই দোষ দেখে। যদি ভাবে, ও-পাড়ার মেয়ে, তার আবার এত সতী-সতী ভাব কেন!

অনেক ভেবেচিন্তে শেষ পর্যন্ত আর বলতে সাহস পায়নি। আর বলেনি যে, ভালোই করেছে।

চায়ের দোকানটা আর চলে না। রেখে লাভ নেই। শুধু ধারের অঙ্কই বেড়ে চলেছে। আর যতই ধার বাড়ে ততই গঙ্গাধরকে ভয় পায় সুর্মা।

রতনকে বলে, ও দোকান তুলে দাও তোমার। অন্য কিছু চেষ্টা করো।

হাসে রতন। অনেক কিছু স্বপ্ন দেখেছিলো ও। সুর্মাকে নিয়ে ঘর বাঁধবে ভেবেছিলো।

এদিকে একটা ছেলে আসছে সুর্মার কোলে। কিন্তু সুর্মার চেহারায় সে জলুস নেই। চোখ দুটো যেন বসে যাচ্ছে ক্রমশ। রক্তশূন্য ফ্যাকাশে চেহারা হয়ে গেছে সুর্মার।

এ-সবই দেখতে পায় রতন। দেখেও কিছু করবার নেই।

বলে, ও-পাড়াতেই ফিরে যাও সুর্মা, তোমার মায়ের কাছে।

ক্রুদ্ধ চোখ তুলে তাকায় সুর্মা। যেন সম্ভব হলেই দৃষ্টি দিয়ে পুড়িয়ে ফেলতো সে রতনকে। তিল তিল করে যদি না খেয়ে মরতেও হয় তবু ও-পাড়ায় ফিরে যাবে না সুর্মা। ওদের হাসিঠাট্টা, বিপত্তারিণীর শ্লেষ সহ্য করতে পারবে না বলেই কিনা কে জানে! হয়তো তা নয়। ওই জীবনটাই পছন্দ নয় তার। ওই জীবনের চেয়ে মৃত্যু ভালো।

নতুন বাসাটায় উঠে এসে সেই সত্যটা যেন নতুন করে চোখে পড়েছে তার। আশেপাশের পাঁচটা বাড়ির বউ-ঝিদের সঙ্গে দেখা হয়, গল্প করে। দুপুরে দু-একজন বেড়াতে যাবার জন্যে ডাকে।

নানান উপদেশ দেয় তারা। এ সময় কি খাওয়া উচিত, কোনটা উচিত নয়। তাদের সঙ্গে গল্প করতে করতে এক-একসময় সুর্মা ভুলে যায় যে, সে এ পাড়ার লোক নয়, অন্য পাড়ার। ভুলে যায় যে এত অন্তরঙ্গতা, এত হাসিঠাট্টা সব বন্ধ হয়ে যাবে এক মুহূর্তে, যদি কেউ জানতে পারে এ জীবনের অধিকার নিয়ে সে জন্মায়নি।

এখানে যেন অনেক বেশী আনন্দ, অনেক বেশী মর্যাদা। তাই এই জীবনটার ওপর এতখানি লোভ তার। তাই ফিরে যেতে বললেই চটে যায় সুর্মা।

বলে, না খেয়ে মরবো, তবু—

হাসে রতন। দুর্বল অসহায় মানুষের মতো হাসে।

কি করবে বেচারী! সুর্মা বোঝে দোষ রতনের নয়। দোষ ভাগ্যের। যে ভাগ্য নিয়ে এসেছিলো ও, সে পথ থেকে সরে আসতে গিয়েই তো এমন অবস্থা।

গঙ্গাধর আসে। বলে, অন্য কিছু ব্যবসা শুরু কর্ রতন—

কথার সঙ্গে একটু ইশারাও ছুঁড়ে দেয়।

জোড়হাত করে রতন। বলে, ও কথাটি বলবেন না আজ্ঞে, সুর্মা ও লাইনে যেতে দেবে না।

কিন্তু কোন লাইনে যে যাবে, তা ঠিক করতে পারে না রতন। দিন কয়েক একটা ছাপাখানায় কাজ পায়। তারপর আবার বেকার। এটা-ওটা ব্যবসা করার চেষ্টা করে।

এমনিভাবে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর কেটে চলে। এদিকে দু-দুটো ছেলে হয়েছে সুর্মার।

চেঁচায় আর কাঁদে ছেলে দুটো। খিদের জ্বালায়।

সুর্মার চেহারাও একেবারে শুকিয়ে কালি হয়ে গেছে। মেয়েছেলে বলে মনেই হয় না।

গঙ্গাধর মাঝে মাঝে আসে। খোলাখুলিই বলে, আমার কাছে থাকো তো বলো সুর্মা, সব ব্যবস্থা করে দেবো।

বিরক্ত হয়, ভয় পায় সুর্মা। কিন্তু রাগে না। রাগবার মতো শক্তিটুকুও যেন নেই তার।

হাঁপাতে হাঁপাতে কোনোরকমে বলে, আপনি আসবেন না আর, আসবেন না এখানে।

তবু রতনকে কিছু বলতে পারে না সুর্মা। বলতে পারে না, তোমার বন্ধুটিকে আসতে বারণ কোরো।

বললেও বারণ করতে কি পারতো রতন? সে সাহস কোথায় তার, সোজা হয়ে দাঁড়াবার জোর কোথায় শরীরে?

রতনের নিজেরই মাঝে মাঝে মনে হয়, সুর্মাকে বিয়ে করে তাকে ও-পাড়া থেকে নিয়ে এসে ভুল করেছে সে। তা না হলে হয়তো গঙ্গাধরের মতোই কারও কাছে থাকতে পেতো সুর্মা, কিংবা তার মা বিপত্তারিণীই সব বিপদ তাড়াতো।

ক্রমশই যেন ভেঙে মুষড়ে পড়ে রতন। সুর্মা তবু মনে জোর আনতে চায়। রতনকে খুশী করার জন্যে এক-একদিন পুরোনো হারমোনিয়মটা টেনে এনে গান গাইতে বলে।

গান গায় রতন। কিন্তু সে গলা নেই। তবু সেই পুরোনো দিনের রেশটা মনে পড়ে যায়। মুগ্ধ হয়ে শোনে সুর্মা। চোখের সামনে ভেসে ওঠে স্বপ্নে-ঘেরা মধুর দিনগুলো—যখন গান শেখাতো রতন আর শিখতো সুর্মা।

এমনিভাবে চলছিলো দিনগুলো।

তারপর হঠাৎ একদিন ফিরলো না রতন।

অনেক রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করলো সুর্মা। ভাবলো, কোথাও কোনো কাজে আটকে পড়েছে। হয়তো কাজ পেয়েছে কোনো।

সে রাতটা আশায় আশায় কাটলো। কিন্তু পরের দিনও ফিরলো না রতন। পরের পরের দিনও।

এমনি করে আশায় আশায় রতনের পথ চেয়ে দিনের পর দিন কেটে গেল। রতন আর ফিরলো না।

কেউ ভাবলে, গাড়িচাপা পড়ে মারা গেছে। কেউ ভাবলে, বউকে ফেলে পালিয়েছে।

ও-পাড়ায় বিপত্তারিণীর কাছেও কি করে যেন খবর পেঁছে গেল।

ও মেয়ের আর মুখ দেখবে না ভেবেছিলো সে, তবু মেয়ের বিপদের কথা শুনে এলো দেখা করতে।

বললে, ফিরে চ সুর্মো।

সুর্মা হাসলো। বলে, যাবার হলে অনেক আগেই যেতাম। তুমি ফিরে যাও। আমি না খেয়ে মরবো, তবু—

সেই এক প্রতিজ্ঞা।

উপায় না দেখে গালাগালি দিতে দিতে চলে গেল বিপত্তারিণী।

বিপত্তারিণী যেতে না-যেতে বিপদ নিজেই এসে হাজির হলো।

গঙ্গাধর এসে বললে, আমার কাছে থাকবে তো চলো সুর্মা, রতন আর ফিরবে না।

হাসলো সুর্মা। বললে, আপনার বাড়িটা তো চিনি। যাবার হলে আমি নিজেই গিয়ে হাজির হবো। বলে গঙ্গাধরকে বিদেয় করে দিলো সুর্মা।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর পারলো না সে। হঠাৎ একদিন সকালে উঠে দেখলো ছোট ছেলেটা নড়ছে না। বুকে হাত দিয়ে টের পেলো না কিছু।

তারপর হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলো সুর্মা। বুঝতে পারলো ছেলে তার নড়বে না। না খেয়ে আর আধপেটা খেয়ে মরে গেছে ছেলেটা।

মরে গেছে?

চোখ মুছলো সুর্মা। তারপর বড় ছেলেটাকে কোলে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো একেবারে গঙ্গাধরের বৈঠকখানায়।

ঠিক এমনিভাবেই একদিন রতন এসে দাঁড়িয়েছিলো। আর এমনিভাবেই ঘড়ির চেনটা হাতে বাঁধতে বাঁধতে এসে দাঁড়িয়েছিলো গঙ্গাধর।

সুর্মাকে দেখে সপ্রশ্ন চোখে তাকালো গঙ্গাধর। ঠিক এমনটি যেন কোনো দিনই আশা করতে পারেনি।

সুর্মা হাসলো ম্লানভাবে। বললে, এলাম।

খুশী হয়ে উঠলো গঙ্গাধর। এ মেয়েটা একদিন তার মনে নেশা ধরিয়েছিলো। তখন রূপ ছিলো সুর্মার। কিন্তু রূপ হারিয়েও দারিদ্র্যের মধ্যেও মেয়েটা কিসের জোরে সব লোভ জয় করেছিলো ভেবে পায় না গঙ্গাধর। যে বারবার তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে, তার রূপ নেই আজ, তবু তাকেই হাতের মুঠোয় পেয়েও ছেড়ে দিতে ইচ্ছে হয় না।

সুর্মা বললে, আমাকে নয়, আমার ছেলেকে বাঁচান।

সুর্মাকে আশ্রয় দিলো গঙ্গাধর। দিলো যা কিছু চাইতে পারে সুর্মা, যা কিছু বাসনা।

এতদিন শুধু ভালোবাসার স্বপ্ন দেখেছিলো সুর্মা। এবার দেখতে পেলো ঐশ্বর্যের সুখ।

এমনি করেই বছরের পর বছর কেটে গেল। চেহারা বদলে গেল সুর্মার। বিলাসে বৈভবে সারা দেহে তার নতুন করে যৌবন এলো যেন। আর সেই যৌবনকে বিকশিত করে তুললো গঙ্গাধরের ঐশ্বর্য। জড়োয়া গহনায়, বহুমূল্য বসনভূষণে অপ্সরীর রূপ নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে একদিন থমকে দাঁড়ালো সুর্মা।

—কে? রতন?

রতন কিন্তু তখনো যেন চিনতে পারছে না সুর্মাকে। এই তার সুর্মা? এমন রূপ তার?

অথচ রতনের চেহারা শীর্ণ ভিক্ষুকের মতো। নোংরা শতচ্ছিন্ন কাপড়। একমুখ খোঁচা-খোঁচা দাড়ি আর উস্কখুস্ক চুল, চোখ দুটো পাগলের মতো ঘোলাটে।

রতন চাপা গলায় বললে, হ্যাঁ সুর্মা।

নিজের ঘরে নিয়ে গেল সে রতনকে। বললে, এসো, আমার ঘরে এসো।

সুর্মার ঘরে ঢুকলো রতন, সঙ্কোচের সঙ্গে। তাকালো চারপাশের দেয়ালের ছবিগুলোর দিকে, দামী দামী আসবাবপত্রের দিকে।

বললে, সুর্মা, এসব তোমার? এ-সব?

—হ্যাঁ। বিষণ্ণ হাসলো সুর্মা।

রতন ধীরে ধীরে বললে, আমি সব দেখেছি সুর্মা, লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেছি।

সুর্মা প্রশ্ন করে, কিন্তু কোথায় ছিলে তুমি এতদিন? কেন ফেলে গিয়েছিলে আমাকে?

চুপ করে থাকে রতন, দু চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ে। বলে, তোমার জন্যেই গিয়েছিলাম সুর্মা। ভেবেছিলাম, যেমন করে হোক নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। তারপর এসে নিয়ে যাবো তোমাকে—

সুর্মার চোখ দুটোও চিকচিক করে উঠলো।

বললে, আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে না কেন?

—অনেক কষ্ট, সে অনেক দুঃখ সুর্মা। কিন্তু পারলাম না, এত চেষ্টা করেও পারলাম না। কান্নায় ভেঙে পড়ে রতন।

হঠাৎ রতনের পিঠে হাত রাখলো সুর্মা। বললে, ভেঙে পোড়ো না। শোনো—

মুখ তুলে তাকালো রতন। বললে, চলে যাবার আগে একবার ছেলেটাকে দেখে যেতে চাই সুর্মা। দেখাবে?

ম্লান হাসি হাসলো সুর্মা। সায় দিয়ে ঘাড় নাড়লো। তারপর বললে, শোনো, চলো, আমাকে নিয়ে চলো। আবার জীবন শুরু করবো আমরা, নতুন করে চেষ্টা করবো নিজের পায়ে দাঁড়াবার।

—যাবে, যাবে সুর্মা? কথাটা যেন বিশ্বাস হয় না রতনের। এমন নির্ঝঞ্ঝাট, এমন আরামের জীবন ছেড়ে সত্যিই যাবে সুর্মা?

—হ্যাঁ, যাবো। যাবো আমি।

উঠে দাঁড়ায় সুর্মা। তারপর দ্রুত পায়ে ভিতরে চলে যায়: বোসো তুমি। এখনই যাবো, যাবো তোমার সঙ্গে।

বিস্মিত হয় রতন। মনে মনে খুশী হয়। এত ভালোবাসা? এত গভীর টান তার ওপর?

না, রতন আবার দাঁড়াবে, আবার—

সুর্মার এত টাকা, এত অলঙ্কার, এই মূলধন নিয়ে আবার ব্যবসা শুরু করবে সে, জীবন শুরু করবে। সুখী হবে। নানা কল্পনায় রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে রতন। আনন্দে ফুর-ফুর করে ওঠে তার মন।

—চলো।

সুর্মার কথায় চমকে চোখ তোলে রতন। ছেলের হাত ধরে এসে দাঁড়িয়েছে সুর্মা।

দু হাত বাড়িয়ে ছেলেকে কোলে তুলে নেয় রতন, কিন্তু পরমুহূর্তেই সুর্মার দিকে স্পষ্ট চোখে তাকিয়ে চমকে ওঠে। এ কি! সমস্ত গহনা খুলে ফেলেছে সুর্মা, পোশাক বদলে এসেছে। একখানা সাদাসিধে শাড়ি আর দু হাতে শাঁখা।

সুর্মা আবার বললে, চলো।

বিস্মিত হলো রতন: কিন্তু—কিন্তু তোমার গায়ের গয়নাগুলো কি হলো সুর্মা? তোমার জিনিসপত্তর?

হাসলো সুর্মা: দুঃখ-কষ্টকে তো আমি ভয় পাই না। যত দুঃখই পাই, যত কষ্টই হোক, তোমার সঙ্গে চলেছি এই তো সবচেয়ে বড় সুখ।

—কিন্তু—কিন্তু সুর্মা, তোমার টাকা, তোমার গয়না এসব না দিলে কি নিয়ে ব্যবসা করবো, কি করে দাঁড়াবো আবার?

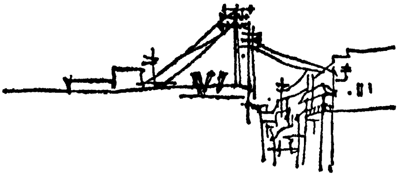
হঠাৎ যেন চিৎকার করে উঠলো সুর্মা। বললে, না, না, যে আমাকে সব দিয়েছে, তাকে তো কিছুই দিইনি আমি। কি দিয়েছি? না, না, তার দেওয়া কোনো কিছুই আমি নিয়ে যেতে পারবো না—পারবো না।

—পারবে না? কেমন যেন বিরক্ত হলো রতন।

অট্টহাসে হেসে উঠলো সুর্মা: না, পারবো না, পারবো না। যে আমাকে বিশ্বাস করে সব দিয়েছে, আমার ছেলেকে বাঁচিয়েছে, তার দেওয়া একটা কানাকড়িও আমি নিতে পারবো না।

রতন স্তম্ভিত বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো সুর্মার মুখের দিকে।

[১৩৬৫



ঈর্ষা

একসময় শান্তনুকে আমরা উপহাস করতাম। উপহাস করবার মতোই একটা কাজ তখন করে বসেছে শান্তনু। বি. এ. পাস করার আগেই বিয়ে করে বসেছে। তাও একেবারে ডল-পুতুলের মতো একটা গ্রাম্য মেয়েকে। গ্রাম্য, অশিক্ষিত, তেরো-চোদ্দ বছরের একটি মেয়ে গলা অবধি ঘোমটা টেনে যেদিন সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলো সেদিন না হেসে পারিনি। মনে হয়েছিলো, নাকে মুক্তোর নাকছাবি না থেকে নথ থাকলেই যেন বেশী মানাতো।

সহপাঠীদের সকলকে অবশ্য বরযাত্রী যাবার জন্যে বলেনি শান্তনু। খবরটা সকলের জানবার কথাও নয়। কিন্তু দেখা গেল সারা কলেজে রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছে, শান্তনু বিয়ে করছে।

গোলগাল ফরসা নাদুসনুদুস চেহারার শান্তনুর মুখে-চোখে এমনিতেই কেমন একটা বোকা-বোকা ভাব ছিলো। দুলে দুলে ঘাড় কাত করে হাঁটতো সে, দুলে দুলে ঘাড় কাত করে ক্লাসে ঢুকতো। আর তা দেখে মেয়েরা, যারা আড়াআড়ি করে পাতা কয়েকটা বেঞ্চিতে আমাদের স্পর্শ বাঁচিয়ে বসতো, তারা পরস্পরের সঙ্গে চোখের ইশারায় কি যেন বলাবলি করে ঠোঁট টিপে টিপে হাসতো।

তাদের সেই চাপা হাসিটা কিন্তু সশব্দে খিলখিল করে উঠলো শান্তনু যেদিন হলদে চিঠির তাড়া নিয়ে নিমন্ত্রণ জানাতে এলো।

অন্য কেউ হলে হয়তো চেপে যেতো। কিন্তু শান্তনু বলে ফেললো, বউ তার গ্রামের মেয়ে, ইস্কুলে ফিফ্‌থ্‌ ক্লাস পর্যন্ত পড়েছে। বয়েস তেরো কি চোদ্দ। আর সব-শেষে বললে, মা বলেছে, দেখতে কিন্তু সুন্দর।

খবরটা আমার কাছ থেকে শুনলো নীলিমা, নীলিমার কাছ থেকে সমস্ত মেয়েমহল। হাসির হুল্লোড় উঠলো তাদের মধ্যে।

ওঠবারই কথা। কারণ এ কলেজে কোনো ছাত্র তখন পর্যন্ত বিয়ের কল্পনাও করেনি। ছাত্রীদের মধ্যে দু-দশজনের সিঁথিতে যদি বা সিঁদুর উঠেছিলো, তবু তারা সিঁথির পাশের চুলগুলো ফাঁপিয়ে কিভাবে যেন সিঁদুরের রেখাটুকু ঢাকবার চেষ্টা করতো। অর্থাৎ তখন কি ছাত্র কি ছাত্রী, আমাদের সকলের মনেই একটা রঙিন না-যায়-ধরা না-যায়-ছোঁয়া স্বপ্ন কুয়াশার মতো জমে আছে। চোখে চোখে কত কি কল্পনা! হৃদয়ে অনেক রোমাঞ্চ!

নাকে নথ পরলে যাকে ভালো মানাতো, শান্তনুর সেই জড় পদার্থের মতো বউটিকে দেখে তার সঙ্গে নীলিমাকে তুলনা করে মনে মনে আমি গর্বিত না হয়ে পারিনি। নীলিমার মতো মেয়ে আমাদের কলেজে আর একটিও ছিলো কি না সন্দেহ। নীলিমার চেহারায় এমন একটা কিছু ছিলো যার জন্যে সকলের চোখ গিয়ে পড়তো তারই ওপর। রূপসী ছিলো না নীলিমা, কিন্তু রূপে তার শ্রী ছিলো। তার চেয়েও বেশী ছিলো মুখে-চোখে সপ্রতিভ ভাব। মুখের পেশীতে কোনো কুঞ্চন না ফেলেও শুধু চোখ জোড়া তার এত মধুরভাবে হাসতো, এত স্নিগ্ধ ছিলো তার গলার স্বর যে তার সঙ্গে শুধু কথা বলার জন্যে অনেকেই লুব্ধ ছিলো।

সেদিনই ক্লাস পালিয়ে প্রতিদিনের মতো নিরুদ্দেশভাবে এ-গলি সে-গলি বেড়াতে বেড়াতে একসময় নীলিমা হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠলো।—রসগোল্লার বউকে দেখে এলেন?

শান্তনুর গোলগাল চেহারার জন্যে মেয়েরা তাকে ঠাট্টা করে 'রসগোল্লা' নাম দিয়েছিলো।

বললাম, হ্যাঁ, দেখে এলাম।

—কেমন দেখতে? পান্তুয়া, না লেডিগিনি? বলে আবার হেসে উঠলো নীলিমা।

বললাম, লেডিগিনিই বলা চলে, যেমন কালো তেমনি গোলগাল।

নীলিমা হেসে বললে, এইবার আপনিও একটা বিয়ে করে ফেলুন, অমনি একটা গেঁয়ো মেয়ে দেখে। দিব্যি রান্নাবান্না করে দেবে, কলেজে আসার আগে পান সেজে দেবে—

সায় দিয়ে বললাম, হ্যাঁ, আর দিব্যি একপাল ছেলেমেয়ে নিয়ে—

কথা শেষ করার আগেই হয়তো হেসে লুটিয়ে পড়তো নীলিমা, কোনোরকমে আমার কাঁধে হাত রেখে সামলে নিলো বটে, কিন্তু তার বুকের কাছে ধরা বইখাতার স্তূপ ছিটকে পড়লো রাস্তার ওপর। সেগুলো কুড়িয়ে দিতে দিতে লক্ষ করলাম, গলির মোড়ের দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দুটি বয়স্কা গৃহিণী সকৌতুকে কি যেন বলাবলি করছে আমাদের সম্বন্ধে।

তাড়াতাড়ি দুজনেই পাশের গলিতে ঢুকে পড়লাম। কারণ লোকচক্ষুর দৃষ্টিতে বড় অস্বস্তি বোধ করতাম তখন। আর বুঝতে পারতাম না, কেন ষাট বছরের বুড়োও ফিরে তাকাতো আমাদের দিকে, খোঁড়া ভিখিরীটাও কেন ড্যাবড্যাব করে তাকাতো! আর মিষ্টির দোকানের সামনে উনুনের ঠাণ্ডা ছাইয়ের গাদায় কুস্তি লড়তে লড়তে রাস্তার ল্যাংপেঙে ছেলেগুলো কেন ছুটে এসে নীলিমার কাছে পয়সা চাইতো!

এখন বুঝতে পারি। কতই বা বয়স তখন আমাদের! কুড়িও পার হয়নি। নীলিমার বয়স কিছু কম। আর তখন আমি যদিও একখানা বাঁধানো খাতা নিয়ে কলেজে আসি, নীলিমা কিন্তু আসতো এক রাশ বইখাতা দু হাতে আড়াআড়ি করে বুকে চেপে। তাই সকলে হয়তো বুঝতে পারতো, আমরা কলেজ পালিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

ক্রমশ নেশাটা আমাদের দুজনকেই এমনভাবে পেয়ে বসলো যে, বলা চলে কলেজ পালাবার জন্যেই আমরা কলেজে আসতাম। দুপুরের রোদে টো-টো করে ঘুরে বেড়াতাম কোনো দিন, কখনো বা নির্জন কোনো চায়ের দোকানে। যেদিন সময় বেশী পেতাম, চলে যেতাম চিড়িয়াখানায়, মিউজিয়মে, চাঁদপাল ঘাটে। ইডেন গার্ডেনের সবুজ ঘাস কিংবা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের গাছের ছায়ায় বসে বসে কিভাবে যে সন্ধ্যে হয়ে যেতো টের পেতাম না। কখনো অনর্গল আজেবাজে অর্থহীন কথায়, কখনো নিশ্চুপ স্তব্ধতায় শুধু পরস্পরের সান্নিধ্যটুকু উপভোগ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেতো।

পরীক্ষার তখন মাত্র কয়েক মাস বাকী। তবু পরীক্ষার কথা যেন ভুলেই গিয়েছিলাম। মনে পড়িয়ে দিলো শান্তনু।

হঠাৎ একদিন এসে বললে, পরীক্ষা দেওয়া আর হলো না, কলেজ ছেড়ে দিচ্ছি।

—কেন? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম।

শান্তনুর চোখ ছলছল করে উঠলো। বললে, এ কলেজে পড়ার এত ইচ্ছে ছিলো আমার—

বললাম, পড়লি না কেন? কে বাধা দিচ্ছে?

শান্তনু বিষণ্ন হাসি হেসে বললে, এখানে মেয়েরাও পড়ে জানতে পেরে মা বললে, বিয়ে না করলে পড়া চলবে না। এখন বলছে, চাকরি না করলে, রোজগার না করলে বউকে এনে রাখা চলবে না। কি করি বল্? তোরা কিন্তু বেশ আছিস ভাই।

না হেসে পারিনি তার দুর্দশায়। তারপর যখন শুনলাম কোন একটা আপিসে চাকরি পেয়েছে সে, পড়া ছেড়ে দিচ্ছে, তখন তাকে রীতিমতো নির্বোধ মনে হয়েছিলো। চাকরি কি পালিয়ে যাচ্ছে? পড়া শেষ করে করা যেতো না?

নীলিমা শুনে হেসে উঠলো: হরিপদ কেরানী এবার আকবর বাদশা হবে। আপনিও একটা চাকরি যোগাড় করে নিয়ে কলেজ ছেড়ে দিন না।

বললাম, দেবো, এখন নয়, কয়েক বছর বাদে। আর তখন যদি বেগম পাই বাদশা হতে বাধবে না।

নীলিমার সুন্দর শরীরটা উজ্জ্বল হাসির তোড়ে কেঁপে কেঁপে উঠলো। শাড়ির আঁচলটায় ডান হাতখানা মুড়ে দাঁতে তার প্রান্তটুকু চেপে বললে, কলেজে-পড়া মেয়ে তো আর বেগম হবে না, তার চেয়ে লেডিগিনি খুঁজতে শুরু করুন।

কিন্তু আমি জানতাম স্পষ্ট করে ভালোবাসার কথা কোনো দিন উচ্চারণ না করলেও, ভবিষ্যতে একটি শান্ত সংসারের ছবি আমাদের কারও মনে উদয় না হলেও আমরা পরস্পরের ওপর একটা অস্বাক্ষরিত স্থির বিশ্বাসের দাবি মেনে নিয়েছিলাম। মেনে নিয়েছিলাম বলেই সে কথাটা কোনো দিন প্রকাশ করে বলিনি, সে কথাটা শোনবার জন্যে কোনো দিন আগ্রহ

প্রকাশ করিনি।

শুধু পরীক্ষা পাস করে নীলিমাকে প্রশ্ন করেছিলাম, এবার?

—চাকরি নাও।

পরীক্ষা পাস করে নীলিমা এসে প্রশ্ন করেছিলো, এবার?

—আবার পড়ো।

অর্থাৎ তখন আমরা পরস্পরের উপদেষ্টা।

সুযোগ পেয়ে একটা চাকরিতে ঢুকে পড়লাম সেই সময়ে। আর ভাবলাম, এইবার বলি নীলিমাকে নতুন সংসারের কথা। যদিও তখন মনে মনে বেশ একটা সন্দেহ ছিলো, এই রোজগারে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখা নির্বুদ্ধিতা কি না! কিন্তু তা যে এতখানি নির্বুদ্ধিতা বুঝতে পারতাম না, যদি না সিনেমা-হল থেকে বেরিয়ে এসেই শান্তনুর সঙ্গে দেখা হতো।

শান্তনুকে দেখতে পেয়েই আমার হাতে একটা চিমটি কেটে কৌতুকে হেসে উঠলো নীলিমা। যেন শান্তনুর চেহারাটাই হাস্যকর। বললে, এই, রসগোল্লা! তোমার বন্ধু।

শান্তনু তখন ফিরে তাকিয়েছে।

বললাম, কি রে, কি খবর?

নীলিমা আঁচলে হাসি ঢেকে দূরে দাঁড়িয়ে রইলো। আর তার দিকে তাকিয়ে শান্তনুর মুখে কেমন একটা অস্বস্তির ছাপ পড়লো।

তবু কিন্তু-কিন্তু করে বললে, বেশ আছিস তোরা। আমি ভাই নাজেহাল হয়ে গেলাম। এক শো টাকা মাইনে, এদিকে দুটো বাচ্চা। ছোটটা—মেয়েটা ভুগছে ক' মাস থেকে, ডাক্তারের খরচ দিতেই ফতুর হয়ে গেলাম।

আরো অনেক দুঃখের কথা বললো শান্তনু। শেষে জিজ্ঞেস করলো, বিয়ে করেছিস?

বললাম, না।

শান্তনু হেসে বললে, তোর কি, শিক্ষিত শহুরে মেয়ে বিয়ে করবি, দরকার হয় দুজনেই চাকরি করে দিব্যি সংসার চালাতে পারবি। যাক, চলি ভাই, ছেলেটার জন্যে আবার ওষুধ নিয়ে যেতে হবে।

শান্তনু চলে গেল। আর তার দুর্দশার কথা শুনে নীলিমা হেসে কুটিকুটি।

তারপর হঠাৎ হাসি থামিয়ে বললে, আমি বাবা ওসবের মধ্যে নেই। চাকরি-বাকরি একটা না করে—

আমারও মনে হলো, কথাটা মোটেই যুক্তিহীন নয়। স্বপ্ন দেখা এক জিনিস, আর তাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া অন্য। অর্থই পরমার্থ এ যুগে, তার অভাবে কত সুখের সংসারও বিস্বাদ হয়ে যায়। কত উন্মাদ সমুদ্র নিস্তরঙ্গ হয়ে যায়।

এ কথাটা বোধ হয় আমার চেয়েও ভালো করে বুঝতো নীলিমা। তাই পড়া শেষ করেই একটা চাকরির জন্যে উঠে-পড়ে লাগলো সে। আর শেষ পর্যন্ত একটা মেয়েদের ইস্কুলে চাকরি পেয়েও গেল।

তারপর একটা বিশেষ দিন দেখে আমাদের পরস্পরের স্থির বিশ্বাসকে স্বাক্ষরিত রূপ দিলাম। উঠে এলাম এই ছোট্ট ফ্ল্যাটে।

এতদিন শান্ত সংযত ছিলো নীলিমা। বাস্তবের মাটি থেকে এতটুকু পা তুলতে রাজী হতো না। কিন্তু এই নতুন ঘরের হাওয়ায় কি যেন এক নেশা ছিলো! উচ্ছল উন্মাদনায় নেচে উঠলো ওর চোখের তারা। এই প্রথম বোধ হয় স্বপ্ন দেখতে শুরু করলো।

কোত্থেকে একটা বাচ্চা চাকর যোগাড় করে আনলো, তাকেই রান্নার কাজ শিখিয়ে নেবে। চলো, একটা কুকার কিনে নিয়ে আসি, কমলাদি বলছিলো, রান্নার খুব সুবিধে। খাট কি হবে, একটা তক্তাপোশ হলেই চলবে। রেণুদি—ভূগোলের টিচার বলছিলেন যে, চেয়ার-টেবিল নিলামে কিনলে অনেক সস্তা। জানলার পর্দাটা পালটে আনবে, সবুজ রঙ আমার বিষ লাগে। চলো, তোমার সঙ্গে আমিও বাজার যাবো। এই যা, তালা কেনা হয়নি যে! না, না, কেনা তোশকে শুতে পারবো না। মড়া নিয়ে যাওয়ার কি না কে জানে! তার চেয়ে নতুন তৈরি করিয়ে নাও। দু-দিন কি মাদুরে শোয়া যাবে না! একটা ফুলদানি কিনে আনবো ইস্কুল থেকে ফেরবার সময়, কেমন!

সত্যি, দেখে দেখে বিস্মিত হতাম। দু-দিনেই ছোট ফ্ল্যাটের দুখানা ঘর কি সুন্দর করে সাজিয়ে তুললো নীলিমা! জীবনের কোথাও যেন যতি নেই, ছেদ নেই। কোথাও যেন কুশ্রীতা রাখবে না, গ্লানি রাখবে না।

আনন্দের স্রোতে, রোমাঞ্চের মত্ততায় গা ভাসিয়ে দিনগুলো কেটে যাচ্ছিলো। আশা করেছিলাম, এমনি করেই বুঝি সমস্ত জীবনটা কেটে যাবে। কিংবা কে জানে, জীবনের কথাই হয়তো তখন ভাবতাম না। জীবন যে এত দীর্ঘ তা জানতাম না।

আমাদের দুজনের মনেই তখন একটি নেশা। পরস্পরকে চমকে দেবার নেশা। কোনো কোনো দিন তাই আপিসের ছুটি হওয়ার অনেক আগেই ফিরে আসতাম। কোনো দিন নীলিমা ফিরে আসতো অনেক দেরিতে। তার প্রতীক্ষায় বসে বিরক্ত-হয়ে-ওঠা আমার মুখটা দেখতে নাকি বেশ মজা লাগে। বলতো নীলিমা।

এমনি করেই দিন কেটে যাচ্ছিলো। শুধু দুঃসহ লাগতো মাঝে মাঝে যখন নাইট ডিউটি দিতে হতো। অথচ সেটুকু সহ্য না করেও উপায় ছিলো না। খবরের কাগজের আপিসে বার্তা বিভাগের চাকরি, সে কেন জানতে চাইবে একটি নতুন-বাঁধা হৃদয়ের বার্তা!

নীলিমা মাঝে মাঝে অনুযোগ করতো, ও চাকরি তুমি ছেড়ে দাও।

বলতাম, দেবো, তার আগে অন্য একটা জুটিয়ে নিয়ে।

কিন্তু জুটিয়ে নেবো বললেই কি জোটে? নাকি চাকরি করতে করতে সে উদ্যম সকলের থাকে?

তবু তারই মাঝে রোমাঞ্চ বুনে নিতাম। চেষ্টা করতাম, যাতে পরস্পরকে চমকে দেওয়ার নেশাটা না কেটে যায়।

তাই সেদিন নাইট ডিউটি সত্ত্বেও শরীর খারাপের নাম করে ফিরে এলাম। গলির চৌকো ধোঁয়াটে আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ।

ঘরে ঢুকেই বললাম, আজকের এমন সুন্দর রাতটা তোমাকে ছেড়ে থাকতে ইচ্ছে হলো না, চলো, ছাদে গিয়ে বসি।

চোখ কপালে তুললো নীলিমা। বিছানার ওপর স্তূপীকৃত খাতার রাশি দেখিয়ে বললে, বেশ, আর ওই পরীক্ষার খাতাগুলো কে দেখবে? কালকেই শেষ দিন, ফেরত দিতে হবে।

সারা রাত বিছানায় শুয়ে ছটফট করলাম, ঘুমোবার চেষ্টা করলাম। আর হঠাৎ মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যেতেই দেখলাম, নীলিমা তখনো টেবিল ল্যাম্পের নীচে ঝুঁকে পড়ে পরীক্ষার খাতা দেখছে। নিজেকে শান্ত করলাম এই ভেবে যে, প্রতি দিনই তো আর পরীক্ষার খাতা দেখতে হবে না নীলিমাকে।

এদিকে ক্রমশ টের পাচ্ছিলাম একটা সংসারকে সচল রাখতে দুটো রোজগারের চাকাও যথেষ্ট নয়। তাই উপরি-আয়ের চেষ্টা করতে হতো। আর সেই উপরি-আয়ের আশাতেই সুযোগ পেলে দু-চারটে প্রবন্ধ লিখতাম। দু-চারখানা বই আর পত্রিকা উলটেপালটে 'ভারতের পররাষ্ট্রনীতি' বা 'স্বাধীনতা ও মহাত্মাজী' ধরনের প্রবন্ধ লেখা তো কিছু শক্ত নয়। দু-দশ টাকা যদি আসে তো মন্দ কি!

ভোরবেলায় উঠে খাতা-কলম নিয়ে হয়তো লিখতে শুরু করেছি অমনি নীলিমা এসে বললে, এই, বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, চলো আজ বেণুদি আমাদের দুজনকে চায়ের নিমন্ত্রণ করেছেন। তোমার সঙ্গে আলাপ করবেন—

—কিন্তু প্রবন্ধটা যে আজকেই চাই।

মুখ থমথম করে উঠতো নীলিমার : তা বলে সামাজিকতা মানবে না? নেমন্তন্ন করে-ছেন—

বাধ্য হয়ে উঠতে হতো। কিন্তু তখন বোধ হয় বুঝতে পারতাম না যে ভিতরে ভিতরে একটু একটু করে নীলিমার উপর আমি অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছি।

সংসারের চাকাকে সচল রাখতে হলে কিছু উপরি-আয় যে প্রয়োজন তা নীলিমাও যে বুঝতো তার প্রমাণ পেলাম দিন কয়েক পরেই।

সারা দিন আপিস করে ভিড় ঠেলে বাসে উঠে বাসায় ফিরতে সাড়ে সাতটা বেজে গেল। বড় ক্লান্ত লাগছিলো। বাসায় ঢোকার আগেই নীলিমার গলা শুনলাম। বেশ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে

বলছে, এতবার বললাম, মনে থাকছে না কেন? চণ্ডাশোক ধর্মাশোকে রূপান্তরিত হলেন কেন? কি দেখে অনুশোচনা হলো তাঁর?

কি ব্যাপার? ঢুকেই দেখি, একটি বছর বারো বয়সের মেয়ে মাথা নিচু করে বসে আছে, আর নীলিমা পড়াচ্ছে তাকে।

পাশের ঘরে এসে বসলাম, মন বিরক্ত হয়ে উঠলো। কানের কাছে তখনো নীলিমার গলা ভেসে আসছে : কলিঙ্গ যুদ্ধজয়ের পর শত শত সহস্র সহস্র মৃতদেহ দেখিয়া সম্রাট অশোক—

ন'টা বাজার পর ছাত্রীকে বিদায় দিয়ে উঠে এলো নীলিমা। মৃদু হেসে বললো, আজ থেকেই শুরু করলাম। বলিনি তোমাকে, মাসে পঁচিশ টাকা করে দেবে, শুধু সন্ধ্যের সময়টা পড়াতে হবে।

সমস্ত মন যেন বিষিয়ে উঠছিলো নীলিমার বিরুদ্ধে, নিজের অদৃষ্টের বিরুদ্ধে। হ্যাঁ, কখন থেকে যেন অদৃষ্ট মানতে শুরু করে দিয়েছিলাম।

আমার মুখের ভাবে বোধ হয় মনের ঝড়টা টের পেলো নীলিমা। কৌতুকের হাসি হেসে এসে দাঁড়ালো আমার পিছনে। ওর নরম সরু সরু আঙুলগুলো আমার চুলের মধ্যে কাঁকুইয়ের মতো টানতে টানতে বললে, রাগ কোরো না, লক্ষ্মীটি। দুটো টাকা যদি পাওয়া যায়—রাণুদি কমলাদিও তো ট্যুইশনি করেন। তা ছাড়া তোমার খাটুনি তো কত বেশী, আমার মোটেই কষ্ট হয় না।

মন নরম হয়ে গেল মুহূর্তে। বেচারী। আমার জন্যেই তো—

সব বুঝতাম। কিন্তু সব বুঝেও নীলিমার বিরুদ্ধে এভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠবো একদিন, আমি নিজেও কল্পনা করিনি।

মাস কয়েক পরের কথা। নাইট ডিউটি দিয়ে ফিরে এলাম ভোরবেলায়। খিদেয় পেট জ্বলছে, ক্লান্ত শরীর, অথচ—

বাড়ি পেঁছেই দেখলাম, নীলিমা সেজেগুজে তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই প্লেটে ঢেলে চা খাচ্ছে। বেশ একটা তাড়াহুড়োর ভাব মুখে-চোখে।

বললাম, কি ব্যাপার?

হাসলো নীলিমা : মর্নিং স্কুল শুরু হলো যে! স্টোভে জল চড়িয়ে দিয়েছি, চা-টা তুমিই করে নিয়ো, আর কিছু খাও তো চাকরটাকে বোলো—

বলেই দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল সে।

সে এক দুঃসহ জ্বালা। দিনের পর দিন। ভোরবেলায় ফিরে আসি, আর নীলিমা ছুটতে ছুটতে চলে যায় মর্নিং স্কুলে। রাত জাগতে হবে বলে এগারোটার মধ্যে খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়ি, নীলিমা কখন ফেরে টেরও পাই না। সন্ধ্যের সময় ঘুম থেকে উঠে দেখতাম, নীলিমার ছাত্রী এসে হাজির হয়েছে। কানের পাশে পাঠ্যপুস্তকের ঘ্যানঘ্যানানি ভালো লাগতো না, বেরিয়ে পড়তাম। একা একা ঘুরে বেড়াতাম রাস্তায়, পার্কে, যেখানে খুশি।

ন'টার সময় ফিরে খাওয়া-দাওয়া সেরে আপিসে বেরিয়ে যেতাম। বাড়িতে একা বসে থাকার চেয়ে যেন বাইরে একা থাকাও অনেক রমণীয়। নীলিমাকে পেয়ে নীলিমার সান্নিধ্যের লোভে যে বন্ধুদের ভুলে গিয়েছিলাম, তাদেরই খুঁজে বেড়াতাম, খুঁজে বের করতাম কখনো কখনো।

তবু এক-একদিন হঠাৎ মনে রোমাঞ্চ জাগতো। মনে হতো, নীলিমার উপর যেন অবিচার করছি।

সেদিন দুপুরের শিফ্‌ট্‌ শেষ করে বাসায় ফিরতে ফিরতে হঠাৎ মনে হলো, বহু দিন সিনেমা দেখিনি। নীলিমাকে সঙ্গে নিয়ে সিনেমা দেখিনি বহু দিন।

একেবারে দুখানা টিকিট কেটে নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। রবিবার, সুতরাং নীলিমার ছাত্রী থাকবে না আজ।

এসে বললাম, চলো, সিনেমা দেখে আসি, টিকিট কেটে এনেছি।

চোখ কপালে তুললো নীলিমা : না জিজ্ঞেস করেই টিকিট কাটলে?

—কেন? ছাত্রী তো নেই আজ।

নীলিমা হাসলো, বিমর্ষ হাসি : ছাত্রী নেই, কিন্তু আমিই ছাত্রী এখন। সামনের হপ্তায় পরীক্ষা দিতে হবে, পাস করলে মাইনে বাড়বে কিছু।

বললাম, তা হলেই বা। পরীক্ষা তো আজ নয়।

—বাঃ রে, সব তো ভুলে গেছি, ঝালিয়ে নিতে হবে না একটু!

অনুরোধ করলাম, বললাম, টাকার চিন্তা তোমাকে করতে হবে না। তবু শুনলো না নীলিমা। বললে, আহা, শুধু টাকার জন্যেই নাকি! ইস্কুলের সব টিচার দিচ্ছে, সবাই পাস করবে আর আমি যদি ফেল করি? প্রেস্টিজ বলে তো একটা কথা আছে।

বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে এলাম। টাকা, প্রেস্টিজ, ইস্কুল, ট্যুইশানি, পরীক্ষার খাতা! সারা শরীর রি-রি করে উঠলো। না, প্রয়োজন নেই নীলিমায়। দেখি রাস্তায় ঘাটে পার্কে কোথাও কোনো চেনা লোক পাওয়া যায় কি না! তাকে নিয়েই সিনেমা দেখে আসবো।

ভাগ্যক্রমে দেখাও হয়ে গেল। হাতে ছাতা, ছেঁড়া ক্যাম্বিসের জুতো, পিঠটা কুঁজো হয়ে গিয়েছে। প্রথমটা চিনতে পারিনি।

সামনাসামনি হতেই থমকে দাঁড়ালাম : শান্তনু না?

শান্তনু হাসলো : কি খবর? বিয়ে-টিয়ে করেছিস?

বললাম, করেছি। নীলিমাকে। তুই তো দেখেছিস তাকে। কিন্তু তাকে বিয়ে করেই এই দুর্দশা, একা একা সিনেমা দেখতে যাচ্ছি। চল্ তুইও।

খুশী হলো শান্তনু। বেশ বুঝলাম, অর্থাভাবে বেচারা সিনেমা দেখতে পায়নি বহু দিন।

সিনেমা দেখতে দেখতে মাঝে মাঝে শুধু বলে, বাঃ, বেশ ছবিটা! বউকে নিয়ে এলে হতো। একা একা দেখলাম, শুনে এত চটবে!

সিনেমা থেকে ফিরতে ফিরতে শান্তনু হঠাৎ বললে, চল্, একটু চা খেয়ে যাবি আমার বাসায়।

বললাম, চল্। তোর বউয়ের সঙ্গেও আলাপ হবে।

শান্তনু ঠিক সেই আগেকার মতোই বোকা-বোকা লজ্জার হাসি হাসলো, সঙ্কোচের সঙ্গে বললে, আলাপ করবি? কি আলাপ করবি, গেঁয়ো বউ তো আমার।

সেই একতলার একখানা ঘর, এক ফালি বারান্দা। পুরোনো বাড়ি, দেয়ালের পলেস্তারা খসে পড়েছে কোথাও কোথাও। আর সারা ঘরখানা জিনিসপত্রে ঠাসা। তক্তাপোশ, তোরঙ্গ, একটা মোড়া, দেয়ালে-ঝোলানো একটা কাপড়ের টিয়াপাখি, মা কালীর একখানা বাঁধানো ছবি, তিনটে ক্যালেন্ডার। একসময় এ ঘরে দু মিনিট থাকতে হলে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠতো। কিন্তু কেন জানি না, বেশ ভালোই লাগলো।

বিছানার উপর একটা রোগা মেয়ে ঘুমোচ্ছিলো। আর ছেলেটাকে কোলে করে নিয়ে এলো শান্তনু। ফিসফিস করে কি যেন বলে এলো ওদিকের বারান্দায়। বুঝলাম শান্তনুর স্ত্রী রান্না করছে।

বিছানার উপর থেকে তালপাতার পাখাটা নিয়ে গেল শান্তনু। দরজার এ-পাশ থেকে যেটুকু দেখা যায়, দেখলাম শান্তনু বসে বসে উনুনে হাওয়া করছে।

একটু পরেই একটা প্লেটে করে কিছু ফল নিয়ে এসে দাঁড়ালো শান্তনুর স্ত্রী। একটু রোগা হয়েছে, কালো হয়েছে আগের চেয়ে। ঘোমটা কমেছে তার। তবে সেই লাজুক হাসিটা আছে এখনো।

বললাম, এসব কি হবে, আমি ফল খাই না। চা দিন বরং।

শান্তনুর স্ত্রী হেসে বললে, গরিবের ঘরে আম কলা ছাড়া আর কি দেবো বলুন! এসেছেন যখন খেতে হবে।

খেলাম, তৃপ্তির সঙ্গেই খেলাম।

শান্তনুর স্ত্রী কাজের ফাঁকে ফাঁকে এলো, কথা বললো, একবার ঘুমন্ত মেয়েটাকে পাখা করতে করতে গায়ে হাত দিয়ে বললে, জ্বর ছেড়েছে বোধ হয়।

শান্তনু বললো, মেয়েটা বড় ভুগছে। [illegible] সারে তো আর একটা হয়।

শান্তনুর স্ত্রী বললো, আজ তো দক্ষিণেশ্বর যাবো ভেবেছিলাম, ওর জ্বরটার জন্যেই যাওয়া হলো না।

দক্ষিণেশ্বর! বিস্মিত হয়ে বললাম, কেন?

শান্তনুর স্ত্রী হাসলো। বললে, বেড়াতে। আমরা তো রবিবারে রবিবারে বেড়াতে যাই। কখনো বেলুড়, কখনো দক্ষিণেশ্বর। একটু পরে সশব্দে হেসে উঠে বললো, কিন্তু সবচেয়ে মজা হয়েছিলো ডায়মণ্ডহারবার গিয়ে। বলবো?

বলে কৌতুকের চোখে তাকালো সে শান্তনুর দিকে। শান্তনু হাসলো, ইশারায় নিষেধ জানালো।

বললাম, আর অন্য দিনগুলো কি করিস?

শান্তনু হাসলো। স্ত্রীর সঙ্গে একবার চোখাচোখি করে হেসে বললো, উনি আসার পর থেকে কিছু করবার সময় কই? সকালে বাজার যাই, দাড়ি কামাই, আপিস যাই। আর বিকেলে দু মিনিট ফিরতে দেরি হলে ও দরজা খুলবে না। তাই ফিরে এসে ছেলেমেয়েগুলোকে দেখি একটু, ও রান্না করে।

—ব্যস্, আর কিছু না? প্রশ্ন করলাম সবিস্ময়ে।

শান্তনু হেসে বললে, এই উনুনে পাখা-টাখা করে দিই, কয়লা ভেঙে দিই, ও বেচারী একা আর কত করবে বল্! তারপর লাজুক হাসি হেসে শান্তনু বললো, তোরা তো বেশ আছিস, অভাব নেই, দুজনে রোজগার করিস—

বিদায় নিয়ে চলে এলাম আর একা একা আমার নির্জন নিঃসঙ্গ বাসার পথ ধরে আসতে আসতে মনে মনে বললাম, শান্তনুকে আমি ঈর্ষা করি।

নীলিমা তখনো গুনগুন করে কি যেন মুখস্থ করছে। পরীক্ষার পড়া, প্রেস্টিজের পড়া, মাইনে বাড়ানোর পড়া।

বললাম, পড়া রাখো তোমার, শোনো, আজ রসগোল্লার বাড়ি গিয়েছিলাম। অভাবের সংসার হলেও—

খিলখিল করে হেসে উঠলো নীলিমা : লেডিগিনিকে দেখলে?

—দেখলাম। এত সামান্য রোজগার, তায় একটা ছেলে একটা মেয়ে, কিন্তু—

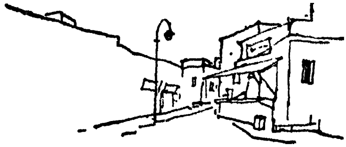
নীলিমা হঠাৎ হেসে উঠলো। বললো, ওভাবে অভাব-অনটনে সংসার করার শখ যে কেন হয় ওদের!

বললে বটে, কিন্তু মনে হয় নীলিমাও যেন লেডিগিনিকে ঈর্ষা করে।

আর সঙ্গে সঙ্গে, কেন জানি না, শান্তনুর কথাটা মনে পড়লো।—তোরা তো বেশ আছিস, অভাব নেই, দুজনে রোজগার করিস—

কথাটা যেন সমস্ত দেহমনে সান্ত্বনার প্রলেপ দিলো। সান্ত্বনা এইটুকুই যে, শান্তনুও আমাদের ঈর্ষা করে।

[১৩৬৫



আজকের গল্প

ব্যাপারটা ঘটেছিলো গত পুজোর সময়। কিন্তু এমন ঘটনা বোধ হয় প্রতি দিনই ঘটছে, প্রতি মুহূর্তে।

তিন টাকা বারো আনা দিয়ে এক জোড়া জুতো কিনেছিলাম, আমার আড়াই বছরের মেয়ের জন্যে। তার ছোট ছোট পায়ের মাপমতো এক জোড়া লাল টুকটুকে জুতো খুঁজে বের করেছিলাম অনেক ঘুরে, অনেক ভিড় ঠেলে।

বুলার তখনই দু-দশটা বুলি ফুটেছে মুখে, আধো-আধো উচ্চারণের দু-একটা পাকা-পাকা কথাও।

পুজোর সময় সকলের জন্যেই কিছু-না-কিছু কেনা হয়, কেনাকাটাই রীতি।

তাই বুলাকে কাছে ডেকে বললাম, তুমি কি নেবে বুলা? কি আনবো তোমার জন্যে?

বুলা অবশ্য ওর নাম নয়। অর্থাৎ ওর নাম নেই। ছিলো না। কেউ বুড়ী বলে, কেউ বা খুকু। কে যেন বুলাই বলতো, আর কেউ কেউ নানান সুন্দর সুন্দর দুরূহ-উচ্চারণ নামে ডাকতো। শেষ অবধি কোনটা ধোপে টি'কবে জানি না।

আমি বললাম, তুমি কি নেবে বুলা? কি আনবো তোমার জন্যে?

আধো-আধো উত্তর দিলো বুলা।—দুতো।

হেসে বললাম, দুটো তো বুঝলাম, কি? লজেন্স?

—না, না, দুতো। প্রতিবাদে মাথা নাড়লো বুলা।

'দুতো' যে 'দুটো'র শিশুভ্রংশ, সে বিষয়ে সন্দেহ করার কারণ ছিলো না। তাই একে একে অনেক জিনিসের নাম করে গেলাম। অর্থাৎ কোন্ জিনিসটি চায় সে, জেনে নেবার জন্যে। আর প্রতিবারেই সে সজোরে ঘাড় নেড়ে বলে ওঠে, না, না, দুতো।

শেষ পর্যন্ত সে বোধ হয় আমার বুদ্ধি সম্পর্কে নিরাশ হয়েই বললে, দুতো দানো না, দুতো? পায়ে থাকে? বলে নিজেই ছুটে গিয়ে তার দাদুর ভারি চটিজোড়া পায়ে গলিয়ে টলতে টলতে এগিয়ে এলো।

আমরা সবাই হেসে উঠলাম।

বুঝলাম, প্রশ্ন করার আগেই বোঝা উচিত ছিলো। কারণ সারাটা দিন এই একটিই কাজ বুলার। কেউ জুতো খুলে রাখলেই হলো। বুলা তার জুতো, চটি বা স্যাণ্ডেলের ফোকরে আড়াই ইঞ্চি মাপের ক্ষুদে ক্ষুদে পা জোড়া ঢুকিয়ে দেবে, আর সারা বাড়ি টেনে টেনে বেড়াবে সেই জুতো জোড়া। এবং শেষ পর্যন্ত সেটা যে কোথায় রেখে আসবে, ঠিক-ঠিকানা নেই। খুঁজে বের করা দুরূহ।

তাই সকলেই একবাক্যে বললে, হ্যাঁ, ওর জন্যে এক জোড়া ভালো দেখে জুতো কিনতে হবে।

বাবা বললেন, সেই মখমলের জুতো চাই—লাল মখমলের ওপর সোনালী জরির কাজ...

বললাম, ওর জন্যে আবার দামী জুতো!

সকলেই প্রতিবাদ করে উঠলো তীব্র স্বরে।—দামী জুতো তো ওদের জন্যেই।

বাবা শুধু বললেন, দামী কেন হবে, এক টাকা দু আনা করে তো দাম ছিলো।

এক টাকা দু আনা! হেসে বললাম, সে মান্ধাতার আমলে ছিলো।

বাবা বললেন, মান্ধাতার আমলে নয়, এই উনচল্লিশ সালেও ছিলো। মঞ্জরীর মেয়ের জন্যে কিনেছিলাম সেবার। তা সব জিনিস তো চার গুণ দাম বেড়েছে, গবর্নমেণ্টই বলে, তা হলে এখন দাম বড় জোর সাড়ে চার টাকা!

নিজের পকেটের দৌড় যা-ই হোক না কেন, সাড়ে চার টাকা দামের কোনো জিনিসকে আজ

আর দামী বলার উপায় নেই। মাছ হঠাৎ একদিন আড়াই টাকা সের পাওয়া গেলে রীতিমতো উল্লাস দেখা দেয় সকলের মুখে-চোখে, আপিসে সারাটা দিন আলোচনা চলে—মাছ সস্তা হয়ে গেছে।

তাই বাধ্য হয়েই বলতে হলো, দেখবো যদি পাওয়া যায়।

পাওয়া যে যাবে না, আমি জানতাম। প্রথম প্রথম বুলাকে সঙ্গে নিয়েই দোকান দোকান ঘুরলাম। শু-শোভিত ফুটপাথের দেয়াল থেকে বড় বড় দোকান অবধি।

শেষে আশাভরসা ছেড়ে দিয়ে বুলার ছোট ছোট পায়ের মাপ নিতে হলো কাগজের ওপর পেন্সিলের দাগ কেটে। এবং সেটা কাবুলিওয়ালার মেয়ের পাঞ্জার ছাপের মতো সযত্নে ভাঁজ করে পকেটে রেখে সারা কোলকাতা চষে বেড়াতে হলো।

একটা করে দোকানে ঢুকি আর রেডিওর অনুরোধের আসরে রেকর্ড বাজানোর মতো একই অনুরোধ বারবার : লাল মখমলের ওপর সোনালী জরির...

কথা শেষ করার আগেই দোকানদার না-বাচক ঘাড় নাড়ে। কেউ কেউ সতেরো রকমের চামড়ার নাম করে, কেউ বা বলে, ওসব আজকাল চলে না মশাই, প্লাস্টিক নিন, প্লাস্টিকের নতুন ডিজাইন...

আমার বাড়ির গলির মুখেই তো কয়েকটা জুতোর দেয়াল আছে, তা হলে আর এত দূর আসবো কেন।

শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিতে হলো, কারণ এক জোড়া মনের মতো জুতো খুঁজতে খুঁজতেই সপ্তমীর দিন এসে গেল।

সুতরাং বাধ্য হয়েই সাদাসিধে এক জোড়া জুতো কিনে আনতে হলো তিন টাকা বারো আনা দিয়ে। লাল টুকটুকে এক জোড়া জুতো। দু পাশে দুটো সাদা বোতাম।

আর সে জুতো পেয়ে কি ফুর্তি বুলার।—আমার দুতো? আমার?

বললাম, হ্যাঁ, তোমার।

জুতোমোজা পরিয়ে দিতেই গটগট করে হাঁটতে শুরু করলো সে, ওপর নীচে, এ-ঘর ও-ঘর। যেন কত বড় একটা সম্পদ পেয়েছে। শুধু কি তাই, বোধ হয় জুতো পেয়ে সে নিজেকে অনেক বড় মনে করলো, ভাবতে পারলো, সেও বড় হয়েছে। তার চোখে জুতোটাই বোধ হয় প্রবীণতার একমাত্র প্রতীক।

তিন টাকা বারো আনার মধ্যে যে কারো এক-পৃথিবী আনন্দ থাকতে পারে, তার আগে কোনো দিন মনেই হয়নি।

সন্ধ্যের সময় বাড়ি ফিরে দেখি, সামনের গলি দিয়ে কাতারে কাতারে লোক চলেছে প্রতিমা দেখতে। সমস্ত শহরটাই যেন আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। শাড়ি, গাড়ি, আলো, বাজনা। সকলের কাছেই বুঝি এমনি এক-একটা তিন টাকা বারো আনার বৃত্তে পৃথিবীর সব আনন্দ বাঁধা আছে। দোষ কি আড়াই বছরের ছোট্ট মেয়ে বুলার!

কিন্তু বাড়ি ঢুকতেই দেখি সকলেই কেমন বিচলিত। বাবার মুখ গম্ভীর, আরো গম্ভীরতা আড়াই বছরের ছোট্ট মুখে।

কি ব্যাপার!

ব্যাপার গুরুতর। বুলার এক পাটি জুতো পাওয়া যাচ্ছে না।

পাওয়া যাচ্ছে না? কেন? কি হলো?

শুনলাম একে একে।

সকলেই যখন নিজের নিজের সাজ-পোশাক নিয়ে ব্যস্ত, প্রতিমা দেখতে যাবার জন্যে, তখন বাচ্চা মেয়েটাও ব্যস্ততা দেখিয়েছিলো। জুতোমোজা পরিয়ে দিতে বলেছিলো। আর যেহেতু তাকে বলা হয়েছিলো, আমরা আগে কাপড় পরে নিয়ে তোমাকে জুতো জামা পরিয়ে দেবো, সেই কারণে রেগে গিয়ে এক পাটি জুতো জানালা গলিয়ে ফেলে দিয়েছে সে।

ফেলে যে দিয়েছে তা স্বীকার করেছে বুলা নিজেই। এবং ফেলে দিয়ে মুখ গম্ভীর করে বসে আছে সে।

চাকর-ঠাকুর, বাবা, আমি—সকলে মিলে নীচের রাস্তা, ফুটপাথ তন্নতন্ন করে খুঁজলাম।

না, কোথাও নেই। হয়তো এই চলমান ভিড়ের পায়ে পায়ে কোথাও নিরুদ্দেশ হয়েছে এক পাটি জুতো।

মনটা সকলেরই খারাপ হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত যদি বা এক জোড়া জুতো কেনা হলো, তা একটা দিনও পরতে পেলো না! পুজোর দিন ক'টাও পরতে পেলো না বেচারী।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর হাল ছেড়ে দেওয়া হলো। ভাবলাম, সকালে গিয়ে আরেক জোড়া কিনে আনবো। আরো তিন টাকা বারো আনা। তা হোক।

কিন্তু সকালে গণশা বাজার থেকে ফিরে এসেই খবর দিলে, জুতোটা পাওয়া গেছে।

—পাওয়া গেছে?

গণশা বললে, হ্যাঁ, পাওয়া যাবে।

সে আবার কি কথা!

সমস্ত ব্যাপারটা শুনে তো হেসে বাঁচি না। বলে কি! তাও কি কখনো হয়। গণেশ নিশ্চিত মিছে কথা বলছে। আর মিছে কথা বলাটাই তো ওর পক্ষে স্বাভাবিক। অর্থাৎ ওর সব কথাই যেখানে অবিশ্বাস্য মনে করা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক, সেখানে সত্যিই কিছু অবিশ্বাস্য বলে বসলে বিশ্বাস করবো কি করে। এককালে যা কিছু হারাতো, গিন্নীরা বলতেন, কেষ্টা বেটাই চোর। এ যুগে সেটা স্পষ্ট করে বলার সাহস কারো নেই, কারণ সঙ্গে সঙ্গে এ যুগের কেষ্টারা কাঁধে শার্ট ফেলে পকেট থেকে চিরুনি বের করে অ্যালবার্ট কেটে টিনের স্যুটকেসটি হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়বে। এবং তারপর ভোরে উঠে কয়লা ভাঙা থেকে শুরু করে রাত্তিরে মশারি টাঙানো অবধি শুনতে হবে, আনতে তো পারো না একটা, চাকর-ঠাকুর তাড়াতেই ওস্তাদ...ইত্যাদি।

তাই ভয়ে ভয়ে বললাম, দূর, তাই কখনো হয়।

গণেশ গলার স্বর চড়ালো।—দেখে এলাম আমি, চলুন না দেখিয়ে দিচ্ছি।

ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, এক পাটি হারানো জুতো পাওয়া গেছে, অর্থাৎ এক পাটি জুতোর হদিস পাওয়া গেছে। গলির মোড়ের অসংখ্য দেয়াল-দোকানের একটিতে নাকি সেটি টাঙানো আছে—নীচে দাম লেখা আছে বারো আনা।

রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছে তারা—এ কথা নাকি স্বীকার করেছে, কিন্তু বারো আনা দাম দিয়ে কিনতে হবে।

হারানো জিনিস কুড়িয়ে পেলে অনেকে ফেরত দেয়, কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়, পুলিসে জমা দেয়, কত কি তো জানা ছিলো। এমন কথা কখনো শুনিনি যে, এক পাটি জুতো, তাও কুড়িয়ে পেয়েছে—অথচ দাম দিতে হবে।

গেলাম সে দোকানে। অন্য পাটি জুতো হাতে নিয়ে।

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছে গণেশ। সেই হারানো পাটিটাই।

বললাম, কুড়িয়ে পেয়েছেন তবু দাম নেবেন কেন?

দোকানী চড়া গলায় বললে, দাম ছাড়া কোন্ জিনিসটা আজকাল পাওয়া যায় মশাই?

বললাম, এক পাটি জুতো, আমি না নিলে তো বিক্রি হবে না।

দোকানদার হাসলো।—আপনিই কিনবেন স্যার, বারো আনা দিয়ে। তিন টাকা তো আপনার লাভ হবে।

দামটাও জানে তা হলে! কিন্তু কেমন একটা গোঁ চেপে গেল। হঠাৎ মনে হলো, রবীন্দ্রনাথের কথাই ঠিক, অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে দুজনেই সমান অপরাধী। ইচ্ছে হলো, পুলিসে দিই লোকটাকে। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝলাম, কাজ হবে না তাতে, উলটে আমাকেই হয়রান হতে হবে।

ফিরে এলাম বাড়িতে। ভাবলাম, দিনে দিনে সমস্ত দেশটা কত বদলে গেছে। টাকা ছাড়া আর কিছুই চেনে না আজকের মানুষ। এক পাটি জুতো কুড়িয়ে পেয়েও টাকা রোজগারের ফিকির খোঁজে।

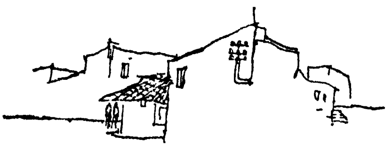
বাড়িতে ফিরে এসে বললাম, নেবো না ও জুতো। আমার তিন টাকা লোকসান হয় হোক, ওকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে।

তারপর রেগে গিয়ে হাতের এক পাটি জুতো ছুঁড়ে ফেলে দিলাম রাস্তায়। ছুঁড়ে ফেলে দিলাম বলবো না, যেন ছুঁড়ে মারলাম। ওই অর্থলোভী দোকানীর উদ্দেশেই নয়, আজকের অর্থগৃধ্নু সমাজের উদ্দেশে, আজকের ন্যায়নীতিবর্জিত মানুষের উদ্দেশে।

একটা অদ্ভুত আনন্দ পেলাম পরমুহূর্তে, যেন একটা মস্ত বড় লোভ জয় করেছি। একটা সৎ কাজে তিনটি টাকা বিসর্জন দিয়েছি।

পুনশ্চ—জীবনের এই ছোট্ট ঘটনাটিকে যেখানে শেষ করলাম, সেই অবধি লিখলে তুচ্ছ এই কাহিনীটুকু গল্প হতে পারতো। আরো চটকদার গল্প হতো যদি বলতাম, ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া পাটিটাও পরের দিন দেখলাম সেই দোকানের দেয়ালে, হারানো পাটিটার পাশে। কিন্তু যেহেতু গল্পের চেয়েও বড় কথা জীবন, তাই শেষটুকুও বলা প্রয়োজন। অর্থাৎ জুতো ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার পরক্ষণেই বোকামি বুঝতে পেরে নিজেই গিয়ে সেটা কুড়িয়ে এনেছিলাম এবং তারপর গলির মোড়ের দোকান থেকে বারো আনা দিয়ে হারানো এক পাটি জুতোকে উদ্ধার করে তিনটি টাকা বাঁচিয়েছিলাম। ন্যায়নীতির দম্ভ টেঁকেনি। কারণ আমিও তো আজকের মানুষ!

[১৩৬৬



আমি একটি সাধারণ মেয়ে

আমি একটি সাধারণ মেয়ে। সাধারণ মেয়েদের মতোই সারা জীবন আমার কেটেছে শুধু স্বপ্ন দেখে। সাধারণ ঘরে আমার জন্ম। স্বাস্থ্য অটুট ছিলো না কোনো কালেই, দেখতে সুন্দরী ছিলাম না, 'পাত্রপাত্রী' কলমের ভাষার মধ্যমশিক্ষিতা। তবু আমি স্বপ্ন দেখতাম সুখের, স্বাচ্ছন্দ্যের।

ছোটবেলায় যখন ইস্কুলে পড়তাম, কি ফুর্তিতেই না কেটে যেতো দিনগুলো। মা কাছে ডেকে বসাতো, যত্ন করে বিনুনি বেঁধে দিতো। ইস্কুলের বাস এসে পড়লে ভালো করে খাওয়া হবে না বলে নিজেই বারবার ঘড়ি দেখতো, সময় থাকতে সামনে বসিয়ে খাওয়াতো, বলতো, 'আর দুটি ভাত নিবি না?'

সত্যি, তখন মাকে কি ভালো যে লাগতো। আবার ভালো লাগতোও না। মনে হতো, আমার যেন এতটুকু স্বাধীনতা নেই। একটু ময়লা জামা পরলে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হবে? সময়ে ভাত না খেলেই কি নয়? চুলে তেল না দিলে, কিংবা চুল ভিজে থাকলে এমন কি অপরাধ?

তারপর একটু একটু করে বড় হলাম। আর আশ্চর্য, দেখলাম মায়ের ব্যবহারে কি অদ্ভুত পরিবর্তন। আগে মনে হতো মা-র এত যত্ন যেন অসহ্য, এখন মনে হলো, মা কি একটুও ভালোবাসতে পারে না আমাকে! যত্ন পেতাম আগে, এখন পেলাম শুধু শাসন। কথায় কথায় মা শোনাতো, আমি তার গলায় লেগে আছি। অর্থাৎ মা তখন আমাকে পার করার, পর করার কথা ভাবছে দিনরাত। পার করার পথটা খুঁজে পাচ্ছিলো না বলেই সব দোষ এসে পড়তো আমার ঘাড়ে। আমি নাকি সভ্যতা জানি না, দেখতে ভালো নই, কপাল নিয়ে আসিনি।

এই সময়ে ভাগ্যিস দাদার বিয়ে হলো। বউদি এলো ঘরে, রাঙা টুকটুকে চেহারা, এক-গা গয়না, শরীর স্বাস্থ্য চমৎকার। সবচেয়ে বড় কথা, বউদির মিষ্টি ব্যবহার। দু দিনেই আমাকে আপন করে নিলো। শুধু তাই নয়, একে একে আমার কাজগুলো কেড়ে নিতে লাগলো বউদি। প্রথম প্রথম আপত্তি করতাম। কিন্তু প্রথমেই বলেছি, স্বাস্থ্য আমার তেমন ভালো ছিলো না, তাই ঘর-সংসারের কাজ করতে রীতিমতো কষ্ট হতো। তবু না করলে কে করবে, তাই করতে হতো সব কিছু। রান্না থেকে পরিবেশন, ঘর ঝাঁট দেওয়া থেকে মশারি খাটানোর কাজগুলো বউদি নিয়ে নিলো, আর ক্রমে বউদি যত পুরোনো হয়ে যেতে লাগলো, দেখলাম, কাজ না করায় অনেক সুখ, অনেক আরাম। দু-একটা কাজ করতে হলেই মুখ বেজার করতাম।

এদিকে তখন দু-একজন করে মেয়ে দেখতে আসছে। মা-র এবং বউদির নির্দেশমতো আমি সেজেগুজে তাদের সামনে গিয়ে বসছি, পরীক্ষা দিচ্ছি, পণাপণের পরীক্ষায় বাবা বার-বার ফেল করছে আর সব দোষ এসে পড়ছে আমার ওপর।

কাজ আমি এমনিতেই করতাম না, যদি বা দু-একটা করতে যেতাম, মা বাধা দিতো। উনুনের তাতে দিনের পর দিন রান্না করে, ঘর-সংসারের খাটুনি খেটে বউদির চেহারা দিনকের দিন কালি হয়ে যাচ্ছিলো, চোখের সামনে দেখতে পেতাম। তাই কোনো কোনো দিন রান্নাঘরে গিয়ে দাঁড়াতাম, কাপ-ডিশ ধুতে যেতাম, আর মা বকুনি দিতো বউদিকে। যেন বউদিই জোর করে খাটাচ্ছে আমাকে। এমনিতেই মেয়ে পছন্দ হচ্ছে না কারও, এব পর আগুন-তাতে গেলে যা চেহারা হবে, বুঝি বা মেয়ের আর বিয়েই দিতে পারবে না। আমি কিছু বলতে পারতাম না, কারণ ধমকটা যদিও বউদির উদ্দেশে, তবু তার মধ্যে আমার বিরুদ্ধেও একটা হুল উঁচিয়ে থাকতো কথাটায়।

আমি দেখতে সুন্দরী নই, আমার কপাল মন্দ, ভব্যতা শিখিনি—এসব অভিযোগ একদিন কিন্তু মিথ্যে হয়ে গেল। সব দুঃখ-কষ্ট, সব জ্বালাযন্ত্রণা সহ্য করেও সাধারণ মেয়েদের মতোই যে সাধারণ স্বপ্নটা আমি দেখতাম তা একদিন সত্যি হলো। আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে মা-র ব্যবহারে আবার পরিবর্তন দেখলাম। সেই ছোটবেলাকার মতো আদর-যত্ন করে মা সামনে বসিয়ে চুল বেঁধে দেয়, শোবার সময় নিজে হাতে করে দুধের বাটি নিয়ে আসে, খাওয়ার সময় মাছের টুকরো একটার জায়গায় দুটো হয়। এত ভালোবাসা পেয়ে এক-একদিন আমার চোখে জল আসতো। ভাবতাম, কি বোকা আমি, এত ভালোবাসে মা, আর মাকে আমি এতদিন দু চোখে দেখতেই পারতাম না।

বাবার হাতে যেদিন চাল আর টাকা দিয়ে ঋণ শোধ করার কথা বলতে হলো সেদিন আরো বেশী করে টের পেলাম—বাবা-মা ছাড়া আমার আর কেউ নেই। যার স্বপ্ন দেখে এসেছি এতদিন, সেও আমার কেউ নয়। কি বোকা আমরা সাধারণ মেয়েরা। শ্বশুরবাড়ি এসে প্রথম প্রথম মন খারাপ হতো বটে, কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে সবই প্রায় ভুলতে বসলাম। ভালো লেগে গেল নতুন ঘর-সংসার, ভালোবেসে ফেললাম শ্বশুর-শাশুড়ী, ননদ-জা, ভাশুর-দেওর সকলকে। মনে হলো, আমার মতো সুখী ত্রিভুবনে কেউ নেই।

হঠাৎ একটা ধাক্কা খেলাম যেদিন, তন্ময়তাটা কেটে গেল। বড় জা বললে, আমার নাকি লাজলজ্জা নেই। ননদ বললে, আমি নাকি কাজ করতে চাই না। ঠিক এত স্পষ্ট করে কেউই বললো না, হাবেভাবে টীকাটিপ্পনী, ব্যঙ্গবিদ্রূপে এ কথাটাই তারা বলতে চাইলে। হঠাৎ সন্দেহ হলো, ঠিক এমনি কথা যেন আমিও বলেছি বউদিকে—হাবেভাবেই বলেছি।

আমি তাই উঠেপড়ে লাগলাম ওদের খুশী করার জন্যে। একে একে সব কাজ আমি কেড়ে নেবার চেষ্টা করলাম। প্রথম প্রথম ওরা ছাড়তে রাজী হতো না, অথচ কথা শোনাতো। কিন্তু টানাপোড়েন চলতে চলতে একদিন আবিষ্কার করলাম উনুনের সামনে আগুন-তাতে বসে রান্না করা থেকে রাত্রে মশারি টাঙানো পর্যন্ত সব কিছুই আমার ঘাড়ে এসে চেপেছে। অথচ আমার খাওয়া-দাওয়ার দিকে নজর নেই কারও। এক পো দুধ কেউ হাত তুলে দেয় না।

ছোট ননদের তখন বিয়ের কথা চলছে। তাই শাশুড়ী তাকে কোনো কাজে হাত দিতে দিতেন না। বড় জা গেলেন বাপের বাড়ি তাঁর ছোট ছেলের জন্যে একটি ভাই কিংবা বোন আনতে। বড় ননদ ফিরে এলেন শ্বশুরবাড়ি থেকে। বাপের বাড়িতে দু-দশ দিন জিরিয়ে নেবার জন্যে। শাশুড়ী তাদের জন্যে দুধের বরাদ্দ করলেন, নিজে বসে খাওয়া-দাওয়া তদারক

করতেন।

আমি একা মানুষ, এত বড় সংসারটা সামলাতে গিয়ে হিমসিম খেয়েই ক্ষান্ত নই, কথায় কথায় খোঁটাও খাই, বাপের বাড়ির শীতের তত্ত্ব কেন ভালো হয়নি; মাছ-ঝালটায় নুন কেন বেশী হলো, দুধ কেন ঢাকা দিয়ে রাখিনি।

শরীর খারাপ হচ্ছিলো, মন আরো খারাপ হতে শুরু হলো। ফলে আয়নায় একদিন দেখলাম, বিশ্রী রোগা হয়ে গেছি, চোখ বসে গেছে, রঙও আমার এতটা কালো ছিলো না তো। কিন্তু কি বোকা আমি, পাছে এই চেহারা স্বামী দেখতে পায়, তাই পাউডার মেখে, সেজেগুজে এমন একটা ভাব করতাম যেন আমি যা ছিলাম তাই আছি। দু-একজন বেড়াতে এসে বলতো, এ কি, তোমার চেহারা এত খারাপ হয়ে গেছে কেন? আমি হাসতাম, কিন্তু মনের ভিতরটা গুমরে উঠতো। ভাবতাম, কথাটা আমাকে না বলে শাশুড়ীকে বলে না কেন। তা হলে হয়তো...।

দাদা একবার দেখা করতে এসে ওই কথাই বললো, তারপর বাবাও এলো একদিন। এসে শাশুড়ীকে বললো, আপনাদের অমত না থাকে তো ওকে একবার নিয়ে যাই, অনেক দিন যায়নি!

শাশুড়ী অমত করলেন না। সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে চিবুকে হাত ঠেকালেন।

বাপের বাড়িতে ফিরে এসে স্বস্তি পেলাম। হাত-পা ছড়িয়ে এবার একটু জিরিয়ে নিতে হবে। রুগ্ন শরীরকে এবার একটু সুস্থ করে তুলতে হবে।

প্রথম কয়েকদিন বউদিরও খুব ফুর্তি। এতদিন পরে আবার দুজনে গল্প-গুজব করতে পেয়েছি। আমি একদিন বউদিকে সিনেমা দেখালাম, বউদি একদিন আমাকে দেখালো। বেশ হইচই করে কেটে গেল কয়েকটা দিন।

তারপর ক্রমে ক্রমে বউদির মুখের ভাব বদলাতে শুরু করলো। বেচারীর দোষ কি। অমন সুন্দর রূপ একেবারে কালি হয়ে গেছে। খাটছে তো খাটছেই সারা দিন।

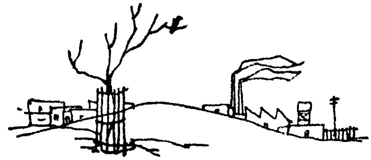
একটু একটু সাহায্য করার ইচ্ছে যে আর না হতো তা নয়। কিন্তু তা হলে আমার শরীর সারবে কি করে। শখ করে তো বাপের বাড়িতে আসিনি। একটু বিশ্রাম না নিলে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে আবার কাঁধে জোয়াল তুলে নেবো কি করে? বউদি কিন্তু এটুকু কিছুতেই বুঝতে চাইতো না। ওর গোমড়া মুখ দেখে আমি বেশ বুঝতে পারতাম। মা আমার পাতে দুটো মাছ দিতো কি সাধ করে! না দুধের বাটিটা এগিয়ে দিতো মিছেমিছি! আমি তো দু-দিনের জন্যে এসেছি, দুধ মাছ যত খুশি বউদি তো এর পর খেতে পাবে। আমাকে এসব কে দেবে শ্বশুরবাড়িতে? কে দেবে বিশ্রাম?

সত্যি, বউদি এত ভালো ছিলো, এখন কি যেন হয়ে গেছে। বউদির বিরক্তিটা স্পষ্টই যেন দেখতে পেতাম। তাই একদিন অতিষ্ঠ হয়ে চিঠি লিখলাম স্বামীকে।

দিন কয়েক পরেই শ্বশুরবাড়িতে চলে এলাম আমি। আবার ঘর-সংসারের ভার কাঁধে তুলে নিলাম।

ভাবনা-চিন্তার সময় কই? আমি হলাম একটি সাধারণ মেয়ে। সাধারণ ঘরে আমার জন্ম, সাধারণ স্বপ্ন, হতাশাও সাধারণ। এত সময় নেই যে ভেবে দেখবো—বাপের বাড়িতে যা করে এসেছি, শ্বশুরবাড়িতে তাই ফিরে পাচ্ছি। কিন্তু যদি ভেবে দেখতাম! ভেবে দেখবো কি করে, তখন যে আমি সাধারণ মেয়েদের মতোই আর একটি সাধারণ স্বপ্ন দেখছি! যা সবাই দেখে।

[১৩৬৬



টাকার দাম

শিবপ্রসাদবাবু অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন না। তিরিশ-বত্রিশ বছর আগে কলেজে সামান্য কয়েকখানা অর্থনীতির বই পড়েছিলেন। জীবনযুদ্ধে নেমে দেখলেন সেসব নিয়মনীতি বৃথা। বইয়ে-পড়া অর্থনীতির সঙ্গে জীবনের আর্থিক নীতির কোনো সম্পর্ক নেই, কোনো মিল নেই। এ সমাজে নিজের চেষ্টাতেই নিজের জীবনকে সাজিয়ে নিতে হয়, নিজের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার ব্যবস্থাও নিজেকেই করতে হয়। তাই নিজের ভবিষ্যৎ ভেবে যতটা সম্ভব সঞ্চয়ের দিকে মন দিয়েছিলেন। শুধু দুর্দিনের আশঙ্কাতেই নয়, সুদিনের আশাতেও মানুষ সঞ্চয় করে। সঞ্চয় ছাড়া ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার আর কি ব্যবস্থা আছে।

চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার বছর কয়েক আগে থেকেই ছেলেমেয়েরা বলতে শুরু করলো, এবার কোলকাতায় একটা বাড়ি করা দরকার।

স্ত্রী হেমলতা দেবীও সায় দিলেন, হ্যাঁ, চিরটা কাল কি ভাড়াবাড়িতেই থাকবো নাকি?

যুক্তিটা মন্দ লাগলো না শিবপ্রসাদবাবুর। একটা বাড়ি, ছোট্ট একখানা বাড়ি। বেশ সুন্দর ছিমছাম দেখতে, সাদা ধবধবে একখানা বাড়ি। একটা সাদা বাড়ি। বাড়ি নয়, যেন একখানা শ্বেতশুভ্র পতাকা, একটা সাদা ঝকমকে পায়রা। শান্তি, বিশ্রাম, নিশ্চিন্ততার প্রতীক যেন।

মন্দ কি। যা কিছু জমাতে পেরেছেন, তার সঙ্গে চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর প্রভিডেন্ট ফান্ডের গচ্ছিত টাকা যোগ দিয়ে ছোটখাট একখানা সুন্দর বাড়ি তৈরি করা এমন কিছু অসম্ভব নয়। কিন্তু, বাড়িটা এখনই করা কি যুক্তিযুক্ত? সবে যুদ্ধ থামলো, জিনিস-পত্রের দাম এখনো আগুন হয়ে আছে। তিন গুণ দাম দিয়ে লোহালক্কড় কিনতে হবে, পাঁচ গুণ দাম দিয়ে সিমেন্ট। তার চেয়ে আর কয়েকটা বছর যাক না। ইঁটের হাজার পনরো-বিশ টাকায় নেমে যাবে তখন। জমির দাম হবে আধাআধি।

দাম তো বেড়েছে যুদ্ধের জন্যে, এ দাম তো আর থাকবে না।

স্ত্রী হেমলতা হাসলেন।—তা হলেই হয়েছে। জিনিসের দাম আবার কোন্ কালে কমেছে, ও একবার উঠলে আর নামে না।

শিবপ্রসাদবাবু বিজ্ঞের মতো হাসলেন।—এমনি আগুন দাম থাকবে চিরকাল? কি যে বলো। চুরি জোচ্চুরি ব্ল্যাকমার্কেট করে করে লোকের হাতে এখন টাকা এসেছে, ব্যবসাদার-গুলোও হয়েছে ডাকাত, যা পাচ্ছে লুটে নিচ্ছে। যুদ্ধ থেমে গেল, এর পর দেখবে তরতর করে নেমে যাবে সব জিনিসের দাম।

হেমলতার গলার স্বরে এবার উষ্মা প্রকাশ পেলো। বললেন, বাজে বকিও না। সেই ষোলো বছর বয়েস থেকে তো শুনছি সোনার দাম কমলে বিছে-হার গড়িয়ে দেবো। কমলো? পনরো-বিশ-তিরিশ-চল্লিশ করে এখন তো আশি টাকা ভরি। দেখো বাপু, মেয়েছেলেদের মাথায় যা ঢোকে তোমাদের পুরুষমানুষদের মাথায় তা ঢোকে না। সোনার দাম কমে না, আর টাকার দাম বাড়ে না। ঘরে সোনা থাকলে ডিম পাড়ে, টাকা থাকলে ঘুণ ধরে।

শিবপ্রসাদবাবু হেসে বললেন, সে দিনকাল এখন আর নেই। মাটিতে নোট পুঁতে রাখলে ঘুণ ধরে বটে। কিন্তু ব্যাঙ্কে রাখলে সেও ডিম পাড়ে।

অর্থাৎ টাকাগুলো আরো কয়েকটা বছর থাকলে সুদে বাড়বে। দুটো বছর আগে আর দুটো বছর পরে—কি এমন তফাত। মাঝখান থেকে যদি কয়েক হাজার টাকা সুদ বেশী পাওয়া যায় মন্দ কি।

হেমলতা দেবী রেগে উঠে পড়লেন, দপদপ করে পা ফেলে চলে গেলেন উনুনে চড়িয়ে-

আসা ডালটা পুড়ে গেল কি না দেখতে। এই মানুষ আবার বাড়ি করবে। টাকা যেন শরীরের রক্ত। ভালো কাজে খরচ করতেও সই সরে না।

টাকা অবশ্য শরীরের রক্তই। শিবপ্রসাদবাবুর চেয়ে সে কথা আর কেউ বেশী জানে না। সারা জীবন ধরে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে তবে এই সামান্য কিছু টাকা জমেছে। জমেছে মানে : এই টাকাই তো সারা জীবনের ভবিষ্যৎ। রোদজল মানেননি, শরীরমন তুচ্ছ করেছেন, কত দিন ছোটসাহেবের সঙ্গে মন কষাকষি হয়ে চাকরি ছেড়ে দেবেন ভেবেও ছাড়তে পারেননি, সেকশনের কেরানীর সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করে ফেলে অনুশোচনায় ভেঙে পড়েছেন, তবু চাকরির মায়া ছাড়তে পারেননি। কেন? সে তো শুধু বর্তমান ভেবে নয়, ভবিষ্যৎ ভেবে। চুনারের বেগুনের মতো মাইনেটা যেদিন দিশী বেগুনের পেনসনে এসে দাঁড়াবে সেদিন চলবে কি করে।

—সেইজন্যেই তো বলছি বাড়ি একটা করে ফেলো। হেমলতা দেবী আবার একদিন বলে বসলেন, শিবপ্রসাদবাবুর মেজাজ ভালো দেখে। বললেন, মাথা গোঁজবার জায়গা থাকলে পেটে গামছা বেঁধেও চলে যায়।

শিবপ্রসাদবাবু হাসলেন কথা শুনে। তারপর সায় দিয়ে বললেন, বেশ জমি-টমি তা হলে একটা দেখতে বলো ছেলেদের।

ব্যস, মত যখন হয়েছে তখন আর দেরি নয়। হেমলতা বড় আর মেজো ছেলেকে ডেকে নিয়ে গেলেন ইশারায়, ছাদের ঠাকুরঘরের সামনে দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিলেন, জমি-টমি দেখ তোরা, মত হয়েছে ওঁর।

জমি খুঁজতে শুরু করে দিলে অতুল আর প্রতুল। দিন কয়েক খুব হুড়োহুড়ি চললো। ট্রামে বাসে ঘোরাঘুরি, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন, দালালদের সঙ্গে জমি দেখতে যাওয়া।

অতুল একদিন এসে বললে, বাবা, আজ একটা জমি দেখে এলাম, খাসা। পুব-দক্ষিণ খোলা, পাড়াটাও—

—কোথায়?

—লেক রোডের পুবে যে রাস্তাটা...

—কত করে?

—তিন হাজার...

—তিন হাজার? মাথা খারাপ হলো নাকি তোদের? এই সেদিনও ন' শো টাকা করে ছিলো ওদিকের জমি, এখন আঠারো শো হোক?

সুতরাং খোঁজ চললো দু হাজার টাকা কাঠার। আঠারো শো বলেছেন, টেনেটুনে বড় জোর দু হাজারে তোলা যাবে। অতএব...

খোঁজ চললো আবার। বিজ্ঞাপন, দালাল, ঘোরাঘুরি। প্রতুল শেষ পর্যন্ত একটা খবর নিয়ে এসে হাজির হলো।

বললে, ফার্ন রোডের কাছে দু হাজার টাকা কাঠা, ফাইন!

—পুব খোলা?

—তা পুব খোলা, দক্ষিণ—তাও হ্যাঁ, খানিকটা খোলা।

—তবেই হয়েছে। আপিস যেতে তোদের দু ঘণ্টা লাগবে, আর আমি বুড়ো বয়সে বসে বসে হাতপাখা নাড়বো, না কি?

অতুল প্রতুল হেমলতা দেবী আবার পরস্পরকে ইশারা করে ছাদের ঠাকুরঘরটির কাছে উঠে এলো, ফিসফিস করে শুরু হলো জল্পনা-কল্পনা।

হেমলতা দেবী বিষণ্ণ মুখ করলেন; অতুল হাল ছেড়ে দিয়ে বললে, বামুনের গরু কেনা বাপু আমার দ্বারা হবে না; প্রতুল বললে, বাবার বাড়ি করার ইচ্ছে নেই।

ছেলেরাই হেমলতা দেবীর একমাত্র হাতিয়ার। হাল ছেড়ে দিলে তাঁর চলবে না। তাই অতুল-প্রতুলকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে আবার জমির খোঁজে লাগাতে হয়। ছেলেরা আবার হায় হায় করে ঘুরে বেড়ায় দিন কয়েক। আবার খোঁজ আনে, আবার নাকচ হয়ে যায়—কখনো দামের জন্যে, কখনো পাড়া ভালো নয়, কখনো পুব-দক্ষিণের বায়নাক্কা।

এমনি করে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কেটে যায়! চাকরি থেকে অবসর নেবার দিনও ঘনিয়ে আসে। আর যত দিন ঘনিয়ে আসে ততই শিবপ্রসাদবাবু নিজেই

ব্যস্ত হয়ে ওঠেন জমি কেনার জন্যে। চাকরি ছেড়ে পেনসনে তো আর চলবে না। তা ছাড়া আপিস থেকে বাড়িভাড়া বাবত যে টাকাটা পাচ্ছেন তাও বন্ধ হয়ে যাবে। ভাড়া গুনবেন তখন কি করে? কই, জিনিসপত্রের দাম তো কমছে না। না লোহা-কাঠ-সিমেন্টের, না চাল-চিনি-তেলের। তবে কি কমবে না জিনিসের দাম?

হেমলতা দেবী হাসেন সে কথা শুনে।—গরিবের কথা বাসী হলে মিষ্টি হয়, বুঝলে!

তবু স্তোকবাক্য ছাড়েন শিবপ্রসাদবাবু।—কমবে, কমবে। কথাটা যেন নিজেকেই সান্ত্বনা দেবার জন্যে।

হেমলতা হাসেন।—চালের দাম মনে আছে, সাঁইত্রিশ সালে ছিলো টাকায় এগারো সের সরু রামশাল, বেড়ে বেড়ে কত হলো?

শিবপ্রসাদবাবু বলেন, ওসব হোর্ডারদের কারসাজি, সত্যি কি অত দাম হয় নাকি চালের?

—কেন হবে না শুনি? দু আনা রোজ দিয়ে বাবা দেশে পুকুর কাটিয়েছিলো, দু টাকা রোজে এখন মুনিষ পাবে? ক্যানেল কর ছিলো তখন? খোলের বস্তা কত করে জানো? দু শো টাকা এক জোড়া বলদের দাম, আগে দু শো টাকায় সারা বৃন্দাবন কেনা যেতো।

শিবপ্রসাদবাবু কথা খুঁজে না পেয়ে হেসে বলেন, তোমার যেমন কথা!

হেমলতা রেগে যান। বলেন, আমার বাবা তো চাকুরে নয় তোমাদের মতো, চাষ দেখে নিজে, জমিজমা আছে বিঘে দরুনে, তোমাদের মতো এক কাঠা দু কাঠার জন্যে হা-হুতাশ করে বেড়ায় না।

আহত হন শিবপ্রসাদবাবু, চুপ করে যান। কি করে বোঝাবেন কোলকাতার জমি আর দেশগাঁয়ের জমি এক নয়। বললেও হয়তো উত্তর দেবে, জমি একই, ভাগ্যক্রমে শহর হয়ে গেছে তাই।

সে যাই হোক, তর্ক করে তো লাভ নেই। জমি এক টুকরো দরকার, এক টুকরো জমি। তার ওপর ছোট্ট একখানা বাড়ি, মাথা গোঁজবার ঠাঁই। খানকয়েক ঘরের ছোট্ট একখানা বাড়ি, সাদা বাড়ি একখানা, সাদা—ঝকঝকে পায়রার মতো সাদা। বিশ্রাম, নিশ্চিন্ত নিরাপত্তা।

এবার শিবপ্রসাদবাবু নিজেও উঠেপড়ে লাগেন। নিজেই মাঝে মাঝে জমি দেখতে বেরোন। কিন্তু, কি আশ্চর্য, এদিকে আসেননি কত দিন? কয়েক বছরই পার হয়ে গেছে নাকি? তা যাক, কিন্তু এত বাড়ি হয়ে গেছে ইতিমধ্যে? কত জমি তো ছিলো এসব দিকে। ভালো ভালো জমি, পুব-দক্ষিণ খোলা, রাস্তার ওপরেই। এখন যে বেশির ভাগ সবুজই ঢাকা পড়ে গেছে? সব সবুজ সাদা হয়ে গেছে—সাদা সাদা বাড়ি। নিজেরই অজান্তে শিবপ্রসাদবাবুর সবুজ মনটা যেমন হঠাৎ কখন যেন তাঁর চুলের মতো সাদা হয়ে গেছে তেমনিভাবে।

তবু, এরই মধ্যে একটা জমি খুঁজে নিতে হবে।

দালালের সাহায্যে শেষ পর্যন্ত লেক রোডের উত্তরে একটা জমি পাওয়া গেল। কিন্তু সাড়ে চার হাজার টাকা কাঠা।

সাড়ে চার হাজার!

চোখ কপালে উঠলো শিবপ্রসাদবাবুর। না, চার হাজার পর্যন্ত উঠতে রাজী আছেন, তার বেশী নয়।

শুনে হাসলো অতুল। মাকে গিয়ে বললে, দক্ষিণ-চাপা এ জমির জন্যে চার হাজারে রাজী হচ্ছেন, অথচ ওর পাশের অত ভালো জমিটা তখন তিন হাজারে রাজী হলেন না।

হেমলতা বললে সে কথা। শুনে শিবপ্রসাদবাবু গম্ভীর হয়ে গেলেন, বললেন, তা বটে, তবে ওটা থাক, অন্য জমিই দেখি। বরং ফার্ন রোডের দিকে...

ফার্ন রোডের জমিটা দেখে মোটামুটি পছন্দই হলো। দক্ষিণ-চাপা হলে কি হবে, পুবটা একেবারে খোলা! তা ছাড়া বাস-ট্রাম তো রয়েছে, কত লোক তো ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে আপিস করে, কি আর এমন দূর হবে অতুলের।

কিন্তু দামটা বড় বেশী চাইছে। সাড়ে তিন হাজার করে কাঠা!

প্রতুল হেমলতা দেবীকে ছাদের ঠাকুরঘরের সামনে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে, দেখলে মা! তখন দু হাজারে পাওয়া যেতো এর চেয়ে কত ভালো জমি, দূর বলে রাজী হলেন না...

হেমলতা দেবী চোখের জল ফেলে বললেন, আমি আর কি বলবো বল্।

বললেন বটে, তবু না বলেও থাকতে পারলেন না। অভিযোগের সুরে শিবপ্রসাদবাবুকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, প্রতুল যখন ফার্ন রোডের জমিটা দু হাজারে ঠিক করে এলো...

—তুমি ক্ষেপেছো নাকি! হাসলেন শিবপ্রসাদবাবু। বললেন, ও আমি তিন হাজারের বেশী এক পয়সা দেবো না।

শিবপ্রসাদবাবু প্রতিজ্ঞা করে বসে থাকলেই তো আর বেচাকেনা বন্ধ থাকবে না। দিন কয়েক পরেই জানা গেল, জমিটা তিন হাজার দু শো টাকা দরে বিক্রি হয়ে গেছে।

সুতরাং আবার খোঁজো, আবার দেখো।

টালিগঞ্জ? ওই জলে-ডোবা ব্রিজ পার হয়ে? তা, তাই হোক। দু বছর আগে অবশ্য নাক সিঁটকেছিলেন, কিন্তু সস্তায় আর যখন কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। তা ছাড়া চারু অ্যাভিনিউ পাড়াটা ভালোই। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

একটা জমি পাওয়া গেল পছন্দসই। পুবটা চাপা, দক্ষিণ কিন্তু একেবারে খোলা। দক্ষিণেই রাস্তা। জমিটাও বেশ উঁচু—পুকুর-বোজানো জমি নয়। বাড়ি ধসে যাবার ভয় নেই।

দাম?

তিন হাজার টাকা কাঠা।

তিন হাজার? তা হলে ফার্ন রোডের জমিটা কি দোষ করলো? দু শো টাকা বেশী দিলেও তো অনেক ভালো হতো। না, ও ব্রিজ পার হয়ে যাওয়া মানে নোংরার সমুদ্র সাঁতরে পার হওয়া। টিপটিপ বৃষ্টি হয়েছে কি ট্রাম বন্ধ, তার চেয়ে বালিগঞ্জ গার্ডেন্‌সের দিকে কি একটা জমি যেন আছে বলছিলো...বালিগঞ্জ গার্ডেন্‌স, বেশ নামটা!

দু বছর আগে এসব নাম শুনে হাসতেন শিবপ্রসাদবাবু। বলতেন, কলেজে পড়ার সময় একবার ছ্যাকরাগাড়ি করে কালীঘাটে এসেছিলাম, বাড়ি ছিলো কয়েকটা ওই ভবানীপুরে, আর মন্দিরের কাছে, আর সব জলা-জঙ্গল! শেয়ালের ডাক অবশ্য এখনো শোনা যায়, আগে সন্ধ্যে হলেই হুক্কা হুয়া। তার আজকাল কতরকম নাম—ধানজমির রাস্তা তার নাম কর্নফিল্ড রোড, ঘাস নেই পার্ক, গাছ নেই গার্ডেন্‌স।

সেই শিবপ্রসাদবাবুই বললেন, বালিগঞ্জ গার্ডেন্‌স পাড়াটা ভালোই!

কিন্তু দর-দাম শুনে হকচকিয়ে গেলেন। সে কি, এত দাম হবে কেন এদিকের জমির! নাক থেকে রুমাল সরালে খাটালের গন্ধ আসে, একখানা গাড়ি না থাকলে যাতায়াত দুষ্কর, আর গাড়ি না-হয় নিজেদের জন্যে রইলো, ঝিকে বাজারে পাঠাবার জন্যে তো গাড়ি রাখতে পারবেন না, তবে? আর জমিগুলোও তো বেশ নীচু, জল দাঁড়ায়, পুকুর-বোজানো জমি কি না কে জানে।

না, না, সারা জীবনের সঞ্চয়, ভবিষ্যতের সম্বল এমনভাবে না ভেবেচিন্তে জলে ফেলতে পারবেন না।

অবসর নেবার দিন যত ঘনিয়ে আসে হেমলতা তত তাড়া দেন, আর হেমলতা যত তাড়া দেন শিবপ্রসাদবাবু তত বিরক্ত হন। বাড়ি করবো, জমি কিনবো সবই সত্যি, তা বলে সেই রূপকথার রাজার মতো প্রতিজ্ঞে করে তো বসিনি যে সকালে উঠে যার মুখ দেখবো তার সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেবো।

বড় ছেলে শুনে বললে, অমনি একটা প্রতিজ্ঞা না করে বসলে বাড়ি হবে না।

শিবপ্রসাদবাবু শুনলেন কথাটা, মনে মনে বললেন, অর্বাচীন!

কিন্তু চটপট এত বাড়ি হচ্ছেই বা কি করে, লোকে এই আগুন দামে জমি কিনছেই বা কি করে! ব্ল্যাকমার্কেট, ব্ল্যাকমার্কেট—সব ব্ল্যাকমার্কেটের টাকা।

হেমলতা দেবী প্রতিবাদ করেন—কেন, চাকুরে লোকেরা কি বাড়ি করছে না?

—করছে, চাকরির টাকায় নয়, ঘুষের টাকায়। যে যতই মাইনে পাক না কেন, উপরি-আয় না থাকলে এত দাম দেওয়া সম্ভব নয়, এ বাজারে বাড়ি করা—

শিবপ্রসাদবাবুর কাছে ব্যাপারটা সত্যিই রহস্য মনে হয়। তিনিও তো মোটা মাইনের চাকরিই করে এসেছেন, টাকাও খরচ করেছেন এমন কিছু মড়ার পিছনে খই ছড়ানোর মতো করে নয়, তবে?

ভাবতে ভাবতেই কেমন করে দিনগুলো কেটে গেল, শিবপ্রসাদবাবু রিটায়ার করলেন।

আঃ, বিশ্রাম। পরম শান্তি। আর দশটা পাঁচটা করতে হবে না, আপিসের কাজ নিয়ে দুশ্চিন্তায় চমকে উঠতে হবে না ঘুমের মধ্যে। এবার অবসর পাওয়া গেছে। হাতে অফুরন্ত সময়। সুতরাং রয়ে-বসে এইবার একটা জমি দেখতে হবে, একটা পছন্দসই বাড়ি করতে হবে।

ভুল অবশ্য করেছেন। ভুল করেছেন সেই যুদ্ধের সময়েই। তখন জমির দাম সস্তা ছিলো, বাড়ির দামও। কিন্তু জাপানী বোমায় সারা কোলকাতা দুরমুশ হয়ে যাবে এই আশঙ্কায় সুযোগ পেয়েও কেনেননি জমি, বাড়ি। কিনে রাখলে আজ আর এই দুর্ভোগ হতো না।

কিন্তু দুর্ভোগ যে এত বাড়বে তাই বা কে জানতো। অবসর নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িওয়ালা ব্যবহারটা ইদানীং একটু খারাপ করতে শুরু করেছে। করবে না কেন! বাড়িভাড়া যে হারে বাড়ছে, বাড়িওয়ালাদের লোভ বাড়ছে তার শতগুণ। পুরোনো ভাড়াটেকে তুলে দিয়ে নতুন ভাড়াটে বসাতে পারলেই ডবল ভাড়া পাবে।

আর ভাড়াই বা ডবল হবে না কেন? হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা লাগতেই পুব বাংলার লোক আসতে শুরু করেছিলো লাখে লাখে। সঙ্গে প্রথম প্রথম তারা অনেকে নিশ্চয় টাকাও এনেছিলো লাখে লাখে। তা না হলে জমি বাড়ি কিনতে পারলো কি করে পটাপট—দ্বিগুণ ভাড়ায় বাড়িই বা নিলো কি করে?

পাকিস্তান হয়ে গেল, দেশ স্বাধীন হলো, আর জমির দামও বাড়তে শুরু করলো তরতর করে। যে জমিতেই হাত দিতে যান শিবপ্রসাদবাবু, ছ্যাঁকা লাগার ভয়ে হাত সরিয়ে নেন, আগুন দাম।

হেমলতা বলেন, জমির দাম এমনিও বাড়তো, ওরা আসাতে একটু তাড়াতাড়ি বাড়লো। জিনিসের দাম, জমির দাম কবে কমেছে? ও চিরকাল বেড়েই যায়, বেড়ে যেতেই দেখলাম। বিয়ে হয়েছিলো যখন—সোনার ভরি ছিলো তেরো টাকা, এখন আটানব্বই।

বড় ছেলে অতুল বললে, এখন আর এদিকে খোঁজ করে লাভ নেই, পাঁচ-ছ' হাজারের কমে জমি মিলবে না, তার চেয়ে টালিগঞ্জের ওদিকে কিংবা যাদবপুরের দিকে হয়তো...

কিন্তু সে যে অনেক দূর। আনডেভেলপড এরিয়া। জল আর জঙ্গল। বাসের জন্য আধ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। তা ছাড়া জমিটা যদি বা আড়াই হাজার তিন হাজার দরে পাওয়া যায়, সিমেণ্ট লোহা ইঁট কাঠ তো আগুন। বরং আর কিছু দিন অপেক্ষা করলে খোলাবাজারে লোহা সিমেণ্ট পাওয়া যাবে। এখন গবরমেণ্ট ডিভিসি-টিভিসি করছে, কারখানা খুলছে চতুর্দিকে, ওগুলো হয়ে গেলেই সব পাওয়া যাবে, কম দামেই পাওয়া যাবে।

সেই ভেবেই বসে ছিলেন শিবপ্রসাদবাবু। দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছিলো বসে বসেই। সকালে খবরের কাগজ, দুপুরে ঘুম, বিকেলে সান্ধ্যভ্রমণ। বেশ নিশ্চিন্ত বিশ্রামেই কাটছিলো দিনগুলো। দুশ্চিন্তা দেখা দিতো শুধু মাঝে মাঝে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে হলেই। অথচ না তুলেই বা উপায় কি। জিনিসের দাম বেড়েছে বলে তো পেনসনের অঙ্কটা বাড়েনি। তা ছাড়া বাড়িভাড়াটা সবাই যদিও বলে সস্তা তবু শিবপ্রসাদবাবুর কাছে তা গন্ধমাদন। আপিস থেকে তো আর বাড়িভাড়ার অর্ধেক পান না এখন।

মাসে মাসে সঞ্চিত অর্থ থেকে কিছু কিছু তুলতে তুলতে ক্রমশ তাঁর মনটাও তিক্ত হয়ে ওঠে। চাকরি ছেড়ে পরম নিশ্চিন্তির বিশ্রাম পাবেন সারা জীবন ভেবেছিলেন। নিরাপত্তার আশায় সঞ্চয় করে এসেছেন। কিন্তু সব স্বপ্ন যেন তাঁর ভেঙে যাচ্ছে। মন বিষিয়ে ওঠে তাঁর—বাড়িওয়ালার বিরুদ্ধে, সরকারের বিরুদ্ধে, ছেলেদের বিরুদ্ধে। দু-দুটো ছেলে—অথচ তাদের রোজগারে সংসার চলে না। এত কম মাইনে পায় ছেলেরা—তার জন্যে যেন তারাই দায়ী। যেন ইচ্ছে করেই বেশী মাইনে নিচ্ছে না।

না, একটা বাড়ি না করলে আর চলে না। যে হারে টাকা তুলছেন ব্যাঙ্ক থেকে শেষের দিন ক'টা হয়তো খেতে পাবেন না। তার চেয়ে যেখানে হোক, যেমন করে হোক একটা বাড়ি করে ফেলতে হবে।

খাতা পেন্সিল নিয়ে বসেন শিবপ্রসাদবাবু। আর ব্যাঙ্কের পাস-বই। শেয়ার আর সেভিংস সার্টিফিকেটগুলো।

কিন্তু এ কি? হিসেব কষতে কষতে মাথায় রক্ত চড়ে যায়। এত টাকা খরচ হয়ে গেছে

এ ক'টা বছরে? আশ্চর্য তো! অথচ ভেবেছিলেন দশটা বছর ব্যাঙ্কে টাকাগুলো রাখতে পারলে সুদ সমেত দেড় গুণ হয়ে দাঁড়াবে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন। চোখের দু কোণ জ্বালা করে উঠলো, ব্যর্থতায়, হতাশায়।

বললেন, নাঃ, বাড়ি করবার মতো টাকা আর নেই, সব শেষ করে এনেছো তোমরা।

হেমলতা চটে গেলেন।—আমরা শেষ করে এনেছি, না, তুমি শেষ করে এনেছো।

—আমি?

—হ্যাঁ, তুমি। খরচ না হলেই বা কি হতো, তোমার টাকাটা না-হয় দেড় গুণ হতো, কিন্তু জিনিসের দাম, জমির দাম যে দশ বছরে চার গুণ হয়েছে, খেয়াল আছে।

শিবপ্রসাদবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তা সত্যি! কি আর করবো বলো!

হেমলতা হাসলেন, তাচ্ছিল্যের, ব্যঙ্গের, দুঃখের হাসি। বললেন, তখনই বলেছিলাম টাকা সুদে বাড়ে না, টাকা সুদে কমে।

শিবপ্রসাদবাবু উত্তর দিলেন না, চুপ করে রইলেন। জীবনের অভিজ্ঞতায় হেমলতার কথাই তো সত্যি মনে হচ্ছে, কিন্তু কলেজে পড়ার সময় সেই যে ক'খানা অর্থনীতির বই পড়েছিলেন সে বই-পড়া বিদ্যের কাছে ব্যাপারটা কেমন যেন দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে! সত্যিই তো, যে হারে সুদ জমে তার চেয়ে জিনিসের দাম বাড়ার হারটা অনেক বেশী!

আর—

আর জিনিসের দাম বেড়েই চলে, কমে না, কমে না। অর্থনীতির বই বেশী পড়েননি তিনি, কিন্তু ইতিহাসটা তো ভালো করেই পড়েছিলেন। তিনি তো জানতেন, আকবরের সময়ে ধানের দাম যা ছিলো আওরংজেবের সময়ে ছিলো তার চেয়ে বেশী। কোম্পানীর আমলে যা দিন ছিলো মহারানীর আমলে তার চেয়ে বেশী। আর ইংরেজ আমলে যা ছিলো স্বাধীনতা পাওয়ার পর...

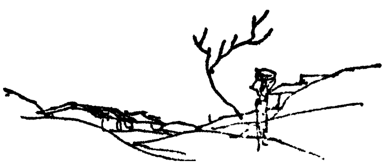
নিজের মনেই বিড়বিড় করেন শিবপ্রসাদবাবু।—সোনার দাম বাড়ে, টাকার দাম কমে। সোনা রাখলে ডিম পাড়ে, টাকা রাখলে ঘুণ ধরে। টাকা সুদে বাড়ে না, টাকা সুদে কমে।

জমি, বাড়ি, আসবাবপত্র—এ সবই তো সোনা। রাখলে বাড়তো।

সামনের ছাদটার দিকে অন্যমনস্কভাবে তাকালেন শিবপ্রসাদবাবু।

বৃষ্টি পড়ছে, বৃষ্টি। আর কার্নিসে বসে একটা সাদা ফুটফুটে পায়রা ভিজছে। ভিজে পালকগুলো কেমন যেন কালো কালো দেখাচ্ছে।

[১৩৬৬



মানুষ অমানুষের গল্প

হা-লা-লা-লা, হা-লা-লা-লা বান্দর-মার, হা-লা-লা-লা বান্দর-মার।

গাঁয়ের দক্ষিণ কোণ থেকে মোড়লদের বাকুড়ি পার হয়ে চীৎকার করতে করতে ঢুকলো দলটা। কালোকুলো চেহারা, হাতে কপালে উল্কি, ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল। জন পনরো পুরুষ, জন দশেক মেয়ে। মেয়েগুলোর চেহারাও দিব্যি জোয়ান, মুখে-চোখে রুক্ষতা, চোখের দৃষ্টি হিংস্র অথচ চঞ্চল। কিংবা চোখের তারা কটা-কটা বলেই হয়তো হিংস্র দেখায়।

পুরুষদের পরনে নেংটি, হাতে তীর-ধনুক।

জন পাঁচশেক মেয়েপুরুষের বিচিত্র দলটা গাঁয়ের দক্ষিণ কোণ দিয়ে ছুটতে ছুটতে এলো সমস্বরে চীৎকার করতে করতে। হা-লা-লা-লা, হা-লা-লা-লা বান্দর-মার, হা-লা-লা-লা বান্দর-মার।

তীর-ধনুক উঁচিয়ে ছুটতে ছুটতে আসে আর আকাশ-ফাটানো চীৎকার : হা-লা-লা-লা বান্দর-মার।

তারপর গাঁয়ের ঘর-গেরস্থালির কাছে এসে পেঁছতেই মেয়েগুলো গলা ছেড়ে গান ধরে :

বাণ মার্ বাণ রাম বান্দর-মার আইল গো—
ঘর-ঘরানী কল্যা কাঁঠার জিয়াইল গো—
নাউ কুমড়া জিয়াইল গো—
মাঠের বাগুন শাকপাতা গুড়কুমড়া জিয়াইল গো—
মিঠা কুমড়া জিয়াইল গো—
বাণ মার্ বাণ রাম বান্দর-মার আইল গো—

দশটা পুরুষালী চেহারার জোয়ান মেয়ে গলা ছেড়ে গায়, আর তারপরই দল-কে-দল ছুটে চলে তীর-ধনুক উঁচিয়ে; চীৎকার করে ওঠে সমস্বরে : হা-লা-লা-লা...

কোটালপাড়ার পাশ দিয়ে গাঁয়ে ঢুকতেই দলটা ভেঙে গেল। ছোট ছোট দল হয়ে ছড়িয়ে পড়লো চতুর্দিকে।—বান্দর-মার আইল গো, বান্দর-মার। পশ্চাৎ ডাকোন গো, পশ্চাৎ। হাত টাকা নগদ লিবো, তিন জুড়া গামছা।

ঘরে ঘরে গিয়ে বলতে শুরু করে মেয়েগুলো। কেউ কেউ ঝোলা থেকে একটার পর একটা পুঁটলি বের করে।—চাম লিবে গো, চাম। বাঘের চাম, হরণের চাম, ছাগের চাম, বান্দরের চাম—লিবে গো? আসুন হবে খোঁকা বসবে, আসুন হবে নন্দাই বসবে, আসুন হবে মায় বহুত ঠাকুর পুজবে।

মেয়েগুলোর ঝোলা-ভরতি চামড়া। বাঘ, হরিণ, ছাগল, বাঁদরের চামড়া। সাপের চামড়া, খরগোশের চামড়া।

—লোহার আছেন গো গাঁয়ে?

লোহার, অর্থাৎ কামার। থাকলে টেনে টেনে বলবে, চাম লিবে গো, হাঁপর হবে।

—মুধা আছেন গো গাঁয়ে, মুধা? সুর টেনে টেনে জিগ্যেস করে।

মুধা, অর্থাৎ চামার আর মুচী। তারাই হলো সেরা খদ্দের বাঁদর-মারাদের। কিন্তু আসল কাজ গাঁ থেকে বাঁদর তাড়ানো, বাঁদর মেরে সাফ করা। তার জন্যে চাই সাত টাকা নগদ আর তিন জোড়া গামছা। দেবে গাঁয়ের লোক একজোট হয়ে।

দূর থেকে ওদের ওই চীৎকার শুনলেই বোঝা যায় বাঁদর-মারা আসছে। কিন্তু তার আগেই কি করে যেন টের পেয়ে যায় বাঁদরগুলো। বোধ হয় গায়ের গন্ধে। মাঠের আলে বাঁদর-মারার দল পা দিয়েছে কি না দিয়েছে, প্রাণপণে পালাতে শুরু করে। ইয়া ইয়া তাগড়াই গতর নিয়ে যে বাঁদরগুলো সরে বসতে চায় না, বউ-ঝিদের পথ আগলে দাঁত খিঁচোয়, সেগুলো বাঁদর-মারার গন্ধ পেয়ে দিক্‌বিদিকে ছুটতে শুরু করে দেয়। কেউ গাঁ ছেড়ে যায়, কেউ বট-অশ্বত্থের মাথায় বসে কাঁপে থরথর করে।

বাঁদর তো নয়, রাক্ষুসে হনুমান। হুটোপুটি করে দলে দলে লাফিয়ে পালাতে শুরু করলো হঠাৎ। রুগ্ন অসুস্থ বাঁদরগুলো বোধ হয় বট-অশ্বত্থের ঘন পাতার আড়ালে লুকোবার চেষ্টা করলো। আর মা-বাঁদরগুলোও। তাদের পেটে বাচ্চা।

গাঁয়ের লোক তখনো হা-লা-লা-লা চীৎকার শোনেনি। হুটোপুটি ছুটোছুটি দেখেই একটু বিস্মিত হয়েছিলো। ভেবেছিলো, কোনো একটাকে হয়তো লতায় কেটেছে। লতায় অর্থাৎ সাপে। সাপে কাটলেও এমনি চিঁ চিঁ করে, ছুটোছুটি করে, গাছের শাখায় বসে থরথর করে কাঁপে সবাই। শুধু দু-চারটে ধাড়ী বাঁদর কি একটা নাম-না-জানা গাছের পাতা নিয়ে এসে দু হাতে ঘষে ঘষে লাগিয়ে দেয় কাটা জায়গায়, মুখের ফাঁকে গুঁজে দেয়। তবু কেউ মরে, কেউ আধ ঘণ্টা চিঁ চিঁ করে আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে, লাফাতে লাফাতে পালায়। গাঁয়ের লোক তাই প্রথমটা ভেবেছিলো এমনি কিছু একটা ঘটেছে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই

বাঁদর-মারাদের চীৎকার আর গান ভেসে আসতেই বুঝলো ব্যাপারটা।

কিছু দিন ধরেই জল্পনাকল্পনা চলছিলো শাঁখাভাঙার লোকেদের মধ্যে। পঞ্চু মোড়ল দেড় বিঘে জমিতে বেগুনের চারা বসিয়েছিলো, বেশ একটু ডাগর হয়েছিলো চারাগুলো, তারপর একদিন দেখলে সব ছত্রাকার করে দিয়ে গেছে। শাক-সবজি করতে দেবে না, লাউ-কুমড়ো হতে দেবে না, আখের ক্ষেতে ঢুকে মটমট করে ভেঙে দিয়ে যাবে সব। শুধু কি তাই, কারো উঠন থেকে কাপড় নিয়ে পালাবে, বারান্দায় বড়ি শুকোতে দিলে ঘেঁটে দিয়ে যাবে, গাড়ুটা-হাঁড়িটা এর বাড়ি থেকে নিয়ে গিয়ে ওর বাড়িতে ফেলে দেবে। ভয়ডর নেই এতটুকু। পথে মেয়ে-বউ দেখলেই তাড়া করে। ছোট ছেলেপিলে সামনে গেলেই দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে আসে।

শাঁখাভাঙার বামুন-কায়েত ডোম-বাগদী সবাই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলো। দিনরাত বিব্রত আর বিরক্ত করে মারছে!

পঞ্চু মোড়ল তাই বলেছিলো, বাঁদর-মারাই আনতে হবে, জঙ্গল পানে একটা লোক পাঠান চাটুজ্যেমশাই।

চাটুজ্যে কোটালদের রিদেকে ডেকে বলেছিলেন, তাই বাঁদর-মারারই খোঁজ কর রে রিদে। তোদের কোটালপাড়ায় এত লোক, তবু তোরা তা পারবি না।

হৃদয় কোটাল হেসে বলেছিলো, ও কোনো লাভ নেই বামুনমশাই। ওরা এলে পালাবে, দু-একটা মরবে, তারপর দুটো বছর যেতে না-যেতে আবার এসে ঢুকবে সব। বাঁদরগুলোই বা করবে কি কত্তা, এ গাঁয়ে বাঁদর-মারা এলে ও গাঁয়ে পালায়, ও গাঁয়ে বাঁদর-মারা এলে নচ্ছার-গুলো এ গাঁয়ে ঢোকে।

হৃদয় কোটালের কথায় সায় দিয়েছিলেন অকলঙ্ক ভট্চায। পঁচিশটা গাঁয়ের গুরুবংশ। ধবধবে ফর্সা, দীর্ঘ ঋজু চেহারা, লাল টকটকে একখানা রেশমের কাপড় পরে সকালসন্ধ্যা কালীপুজো করেন, 'কারণ'-পানের জন্যেই চোখ জবার মতো লাল। পায়ের খড়ম ঠকঠক করে ঘুরে বেড়ান এই বৃদ্ধ বয়সেও।

বাঁদর মারায় তাঁর ঘোর আপত্তি। প্রতিবাদ করেছেন বহুবার, কেউ শোনেনি।

তবু প্রতিবাদ করতে তিনি ছাড়েন না। এবারও বললেন, ওরা বানর নয় চাটুজ্যে, ওরা বানর নয়, অভিশপ্ত মানুষ। রামচন্দ্রের অনুচর ওরা, শক্তির সাথী। বানরহত্যাও যা নরহত্যাও তাই।

প্রথম প্রথম অনেকে অবশ্য কান দিতো, গাঁয়ের মেয়ে-বউরা অকলঙ্ক ভট্চাযের পক্ষ নিতো। কিন্তু দিনে দিনে বাঁদরগুলোর সাহস আর অত্যাচারও যেমন বেড়েছে, তেমনি দিন-কালও গেছে বদলে। বাঁদর মারার বিরুদ্ধে ওসব কুসংস্কার দূর হয়ে গেছে। তাই এবার আর কেউই কান দিলো না তাঁর কথায়।

পঞ্চু মোড়ল তাঁর কথার জবাবে হাঁচির মতো করে এমনভাবে হ্যাঁ বলে উঠলো যে, অকলঙ্ক ভট্চায একটু অপমানিতই বোধ করলেন। বিখ্যাত পণ্ডিত শিবকালী ভট্চাযের বংশে তাঁর জন্ম, এ তল্লাটের শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের শতকরা আশিটা লোক তাঁর কাছে মন্ত্র নিতে পেলে ভাগ্যবান মনে করে, আর কালের হাওয়ায় তাঁকেও কিনা অশ্রদ্ধা করছে পঞ্চু মোড়ল! রাগে অভিমানে ঠকঠক করে খড়ম বাজিয়ে চলে গেলেন তিনি।

আর সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় কোটাল হাত পাতলে মোড়ল আর চাটুজ্যেমশাইয়ের কাছে। চিঁড়ে-গুড় আর যাতায়াতী খরচ বাবত একটি টাকা তার পাওনা।

টাকাটি নিয়ে পেটকাপড়ে গুঁজে রেখেছিলো রিদে কোটাল, বলেছিলো, পরশু ভোর নাগাদ যাবো আজ্ঞে। মঙ্গলের ঊষা বুধে পা যথা ইচ্ছে তথা যা। শুভ কাজ তো বামুনমশাই, বুধ-বারকে কাকপাখি ডাকতে না-ডাকতে বেরিয়ে পড়বো।

কিন্তু বেরুতে হলো না হৃদয় কোটালকে। পরের দিন বিকেলেই গাঁয়ের দক্ষিণ কোণ থেকে চীৎকার ভেসে এলো।—হা-লা-লা-লা বান্দর-মার, হা-লা-লা-লা বান্দর-মার।

এ চীৎকার সবাই চেনে। ঘরে ঘরে স্বস্তির নিশ্বাস পড়লো। যাক, এবার কিছু দিনের জন্যে বাঁদর নিশ্চিহ্ন হবে গ্রাম থেকে। বাঁদর-মারার দল এসেছে, বাঁদর-মারার দল।

দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়লো দলটা।

মেয়েগুলো গান শুরু করে থেকে থেকে, আর গানের শেষে সুর করে টেনে টেনে বলে, বান্দর-মার আইল গো, বান্দর-মার। পশ্চাৎ ডাকোন গো, পশ্চাৎ। হাত টাকা নগদ লিবো, তিন জুড়া গামছা।

গাঁ-সুদ্ধ লোক এসে জড় হলো তাদের ডাকে। পঞ্চে মোড়ল, চাটুজ্যে, হৃদয় কোটাল।

চাটুজ্যে বললে, সাত টাকা নগদ পাবি, কিন্তু গামছা দু জোড়া।

—উঃ, ভিখ মাগোন আইলাম গো। বলে মুখের ওপর একটা ঝামটা দিয়ে ফিরে দাঁড়ালো টিকালী।

আঠারো-বিশ বছরের একটা আঁটসাঁট রুক্ষ যৌবন, চোখ-মুখে কেমন একটা হিংস্র রহস্যের ভাব, কটা-কটা চোখে কুটিল তীব্রতা। মেয়েটা এক ঝটকায় ফিরে দাঁড়াতেই তার দু হাতে দোলানো হরিণের চামড়াটা সপাং করে এসে লাগলো রিদে কোটালের গায়ে।

গাঁ-সুদ্ধ লোকের সামনে বাঁদর-মারা দলের মেয়েটা কিনা ছুঁয়ে দিলো তাকে! রেগে টং হয়ে চামড়াটা কেড়ে নিয়ে কি যেন বলতে যাচ্ছিলো রিদে কোটাল, কিন্তু ততক্ষণে মেয়েটার শরীরের দিকে চোখ পড়েছে তার। আর চোখ পড়তেই থমকে থেমে গেল হৃদয়।

রুক্ষ রুক্ষ চেহারার নোংরা এই বাঁদর-মারার দলে এমন একটা মেয়ে আছে এতক্ষণ বুঝি লক্ষই করেনি রিদে কোটাল।

টিকালীও প্রথমটা ঠাহর করতে পারেনি কি ঘটলো। কেন তার হাতের চামড়া কেড়ে নিলো লোকটা। কিন্তু বোকা-বোকাভাবে তার দিকে সে তাকিয়ে আছে দেখে ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে দিলো সে রিদে কোটালের গালে। আর সঙ্গে সঙ্গে গাঁয়ের লোক হো-হো করে হেসে উঠলো।

চড় খেয়েও কিন্তু কিছু বললে না রিদে কোটাল। শুধু চামড়াটা ছুঁড়ে দিলো টিকালীর কাঁধের ওপর।

পঞ্চে মোড়ল হাওয়াটা হালকা করার জন্যে বললে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, বাঁদর তাড়া তো আগে।

সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসে চীৎকারে ফেটে পড়লো দলের মেয়েপুরুষ সবাই। সমস্বরে চীৎকার করে উঠলো : হা-লা-লা-লা, হা-লা-লা-লা বান্দর-মার, হা-লা-লা-লা, হা-লা-লা-লা।

তারপরই সুর টেনে টেনে গাইতে শুরু করলো মেয়ের দলটা : বাণ মার্ বাণ রাম বান্দর-মার আইল গো—

গাঁয়ের এক প্রান্তে একটা বকুলগাছের তলায় গিয়ে ডেরা বাঁধলে বাঁদর-মারার দল। কাঠ-কাঠি যোগাড় করে আনলে মেয়েগুলো, পুরুষগুলো বেরিয়ে পড়লো মেঠো ইঁদুর, জলা ব্যাং কিংবা খাটাশ-খরগোশের খোঁজে।

মেয়েদের ঝোলা থেকে বের হলো জোয়ারের দানা, মেটে হাঁড়ি, কয়েকটা সরা।

রাত করে ফিরলো পুরুষগুলো। কারো হাতে একটা মোটাসোটা ইঁদুর, কারো হাতে খাটাশ। কাঠকাঠির আগুন তখন গনগন করে জ্বলছে, মাটির সরাগুলো উলটে নিয়ে জোয়ারের রুটি সেঁকছে মেয়েগুলো।

পুরুষগুলো শিকার করে ফিরতেই সরা নামিয়ে নিলো সবাই, ইঁদুর আর খাটাশগুলো গুঁজে দিলো গনগনে আগুনে।

তারপর ফুর্তিতে কলকল করে উঠলো একসঙ্গে। কাজও মিলেছে এ গাঁয়ে, শিকারও মিলেছে। এখন দিন কয়েকের জন্যে নিশ্চিন্ত। রচ্চন আর টিকালীও।

টিকালী কিন্তু আসলে ভুলভুলিয়াদের মেয়ে। বাপ তার ভালুক পোষ মানায়, সে পারবে না মানুষ পোষ মানাতে! রচ্চন রোজাকে দেখে অবশ্য মনে হবে না পোষ মেনেছে সে। কাঁধ অবধি ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুলে জট পাকিয়ে আছে। একটা লাল কাঠের কাঁকুই দিয়ে আঁটা। নাকটা থ্যাবড়া, চওড়া চৌকো মুখ, হনুর হাড় উঠে আছে, চোখ দুটো হিংস্র আর ভয়ঙ্কর। যেমন রুক্ষ চেহারা তেমনি দস্যুর মতো স্বাস্থ্য। দিনরাত যেন রেগে টং হয়ে আছে এমনি লাল লাল চোখ। কিন্তু টিকালীর কাছে এসে যখন বসে রচ্চন, গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে

দলের সঙ্গে গল্পগুজব করতে করতে টিকালীর দিকে তাকায় ফিরে ফিরে, তখন আপনা থেকেই যেন তার রুক্ষ শরীরটার ওপর একটা কোমল স্নিগ্ধতা নেমে আসে।

সত্যি, বাঁদর-মারার দলে দশটা মেয়ে, কিন্তু টিকালীর মতো একটাও নয়। না চেহারায়, না কাজে। ওর মতো জোয়ারের রুটি বানাতে পারে না কেউ, পারে না এমনভাবে শিকারের মাংস 'ঝামরে' দিতে, কিংবা তাড়িয়া মদ বানাতে।

শিকার থেকে ফিরে এসে কাঠকাঠির গনগনে আগুন ঘিরে বকুলগাছটার তলায় ডেরা ফেলেছে দলটা। গল্পগুজব করছে সবাই। সাতটা টাকা পাওয়া যাবে এ গাঁয়ে, আর তিন জোড়া গামছা। কে কে পাবে গামছাগুলো, গত বছর কে কে পায়নি, তার হিসেবনিকেশ ভাগ-বাঁটোয়ারা হচ্ছিলো। ভাগবাঁটোয়ারার কথায় মাঝে মাঝে তেতে উঠছিলো দু-চারজন, চেঁচিয়ে উঠছিলো। ঝগড়া হাতাহাতি হবার উপক্রম হতেই মিটিয়ে দিচ্ছিলো বুড়োগুলো! কিন্তু হিসেবনিকেশের যেন আর মীমাংসা নেই। সাত টাকার মধ্যে কত খরচ হবে জোয়ার কিনতে, নুন কিনতে, আর কত পয়সার হাঁড়িয়া!

যত রাত হয়, কলহ-কোলাহল ততই বাড়ে। তারপর একসময়ে মেয়েগুলো গুনগুন করে গান ধরে আগুনের মধ্যে শিকারের মাংস ঝলসাতে ঝলসাতে। দশটা মেয়ের গুনগুনানিতে চাপা পড়ে যায় সব কাজিয়া ঝগড়া, পুরুষগুলো ক্লান্ত হয়ে চুপ করে একসময়।

তারপর খেয়ে-দেয়ে হাঁড়িয়ায় চুমুক দিয়ে গাছতলাতেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে শুয়ে পড়ে সকলে।

ভোর না হতেই বেরিয়ে পড়ে বাঁদর-মারার দল। হাতে তীর-ধনুক। ছোট ছোট চারটে দল হয়ে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে শাঁখাভাঙার চৌহদ্দি। তারপর সমস্বরে একবার করে চীৎকার করে ওঠে : হা-লা-লা-লা বান্দর-মার, হা-লা-লা-লা বান্দর-মার! আর ছুটে ছুটে আসে কোনো একটা বাঁদরকে পালাতে দেখলেই। পুকুরের পাড়, গাছের শাখা, বাড়ির ছাদ— যেখানেই লুকোবার চেষ্টা করুক না কেন, বাঁদর-মারার হাত থেকে নিস্তার নেই।

লারী, টিকালী আর রচ্চনরা সাতটা লোক নিয়ে একটা দল। ভোর হতেই ওরা এসে ঢুকলো গাঁয়ের মধ্যে। চারপাশ থেকে তাড়া খেয়ে মাঠের গাছ থেকে লাফাতে লাফাতে বাঁদর-গুলো এসে জোটে গাঁয়ের মধ্যে। কারো টিনের ছাদের কার্নিসে, কারো খড়-পালুইয়ের আড়ালে লুকোয়। সবচেয়ে বিপদ যেগুলোর বুকে-কোলে ছোট ছোট বাচ্চা।

টিকালীদের ছোট দলটার চীৎকার শুনেই গাঁয়ের লোক, ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো এসে জুটলো। পঞ্চু মোড়ল, চাটুজ্যে, রিদে কোটাল।

টিকালীর রুক্ষ হাতে একটা চড় খেয়েছে রিদে কোটাল, কিন্তু তার জন্যে আর কোনো রাগ নেই তার। ও শুধু দেখছিলো দলটার কারসাজি। কেমন আন্দাজে আন্দাজে লুকোনো বাঁদরগুলোকে খুঁজে বের করছে ওরা। আর তারপরই তাড়া দিচ্ছে।

ফাঁকে ফাঁকে টিকালীর সঙ্গে চোখাচোখি হয় রিদে কোটালের।

হাসে টিকালী, চোখ ঠারে, তারপরই বাঁদর মারার নেশায় হঠাৎ যেন ভুলে যায় রিদে কোটালকে।

রিদে কোটাল কিন্তু ভোলে না। ওর চোখ শুধু টিকালীর দিকে, টিকালীর উগ্র যৌবনের লোভানির দিকে। একটু আড়াল খোঁজে রিদে, একটু আড়ালে পেলেই দুটো রসিকতার কথা বলে দেখতো সে।

টিকালী আর রচ্চন ওসব বোঝে না। দেখেও দেখে না। ওদের চোখ তখন পঞ্চু মোড়লের মরাইতলায়। একটা বাচ্চা বুকে নিয়ে ধাড়ীটা লুকিয়েছে আমগাছটায়। থরথর করে কাঁপছে। কিন্তু ওখান থেকে ওকে তাড়িয়ে আনতে পারছে না ওরা কিছুতেই। অথচ তাড়িয়ে না আনলেও চলবে না। গৃহস্থঘরের আঙিনায় তো বাঁদরের রক্ত পড়তে দিতে পারে না। তাড়িয়ে তাকে মাঠের দিকে নিয়ে যেতে হবে, তারপর তীর ছুঁড়ে মারবে।

বার কয়েক হা-লা-লা-লা চীৎকার ছুঁড়লো রচ্চনের দল। কিন্তু বাঁদরটা নড়লো না।

শুধু চীৎকার শুনে বেরিয়ে এলেন অকলঙ্ক ভট্চায। খড়ম ঠকঠক করে এসে দাঁড়ালেন পঞ্চু মোড়লের আঙিনায়। আমগাছের ডালের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। আহা, ছেলেটাকে কোলে নিয়ে ভয়ে কাঁপছে মা। চিঁ চিঁ করছে বাচ্চা বাঁদরটা।

অকলঙ্ক ভট্চায এগিয়ে এলেন, চাটুজ্যে আর পঞ্চেখ মোড়লের উদ্দেশে বললেন, আহা, অমন করে হত্যা কোরো না ওদের। বানর নয় হে ওরা, মানুষ। অভিশপ্ত মানুষ ওরা। দেখছো না, মানুষের মতো কেমন বুকে জড়িয়ে রেখেছে ছেলেটিকে।

পঞ্চেখ মোড়ল আর চাটুজ্যে হাসলো মুখ টিপে। পন্ডিত শিবকালী ভট্চাযের বংশে জন্ম হলে কি হবে, ভট্চায মশাই নির্ঘাত পাগল হয়ে গেছেন। বাঁদর কিনা মানুষ! মানুষের মতো!

রিদে কোটালও হেসে বললে, মানুষের মতন বটে, কিন্তু মানুষ লয় গুরুমশাই! গাছের ফলটা-আশটা খায়, বলি ক্ষিদের লেগে খায়। মোড়লমশায়ের বেগুনের চারা নষ্ট করে কেন? কাপড় লিয়ে পালায় কেন? বউ-ঝিদের বেইজ্জত করে কেন পথে-ঘাটে! সাধে কি আর বাঁদর কয় মশাই।

রচ্চন আর টিকালীর ওসব দিকে চোখ-কান নেই। ওরা মাঝে মাঝে চীৎকার করে ওঠে হা-লা-লা-লা করে, আর বাঁদরটাকে ভয় দেখানোর জন্যে তীর ছোঁড়ে। এমনভাবে ছোঁড়ে যাতে গায়ে না লাগে, অথচ ভয় পায়।

ধাড়ী মা-বাঁদরটা ভয়ে ভয়ে নড়ে-চড়ে বসছিলো এ-ডাল থেকে ও-ডালে। আর নড়া-চড়া করতে গিয়েই একটা কান্ড ঘটে গেল। মায়ের বুক আঁকড়ে লেপটে ছিলো বাচ্চাটা, টুপ করে হঠাৎ নীচে পড়ে গেল হাত ফসকে।

সে কি চীৎকার মা-বাঁদরটার! যেন আতঙ্কে কান্নায় ফেটে পড়লো!

রচ্চনের দলের একটা লোক ছুটে এসে তুলে নিলো বাচ্চাটাকে। তারপর পুকুরপাড় দিয়ে হাঁটতে শুরু করলে। বাচ্চাকে দূরে নিয়ে গেলে ও জায়গা ছেড়ে আসতেই হবে মাকে।

সত্যিই তাই, বাচ্চাটাকে নিয়ে লোকটা যত এগোয়, মা-বাঁদরটা ততই তার পিছনে পিছনে চলে এ-গাছ থেকে ও-গাছে লাফিয়ে লাফিয়ে।

রচ্চনদের সঙ্গে সঙ্গে গাঁয়ের লোকও ভিড় করে চলে। চাটুজ্যে, পঞ্চেখ মোড়ল, রিদে কোটাল। যেন কত বড় একটা তামাশা হচ্ছে।

অকলঙ্ক ভট্চাযও পিছনে পিছনে চলেন খড়ম ঠকঠক করে, আর বারবার বলেন, আহা, ওকে ছেড়ে দাও, ওইটুকু এক রত্তি শিশু, নিষ্পাপ নির্বোধ মানবসন্তান, ওকে তোমরা মুক্তি দাও।

কে শোনে তাঁর কথা।

পঞ্চেখ মোড়লের বেগুনের হলহলে চারাগুলি বাঁচাতে হবে, আখের ক্ষেত বাঁচাতে হবে, তরিতরকারির বাগান বাঁচাতে হবে।

অকলঙ্ক ভট্চায আবার কি বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ ধাড়ীটাকে তাঁর দিকে ছুটে আসতে দেখে গাঁয়ের লোক দূরে পালালো। অকলঙ্ক ভট্চায নিজেও একটু ভড়কে গেলেন।

কিন্তু পরক্ষণেই দেখলেন, ধাড়ীটা ছুটে এসে বসলো তাঁর সামনে, ঠিক মানুষের মতো দুটি হাত জোড় করে দুটি করুণ চোখে তাকিয়ে রইলো। কিচকিচ করে কি যেন বলতে চাইলো বাঁদরটা। কিন্তু তার আগেই বাঁদর-মারাদের একটা তীর এসে লাগলো ধাড়ীটার বুকে। যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠেই ছটফট করতে শুরু করলো বাঁদরটা। তারপর নিস্তব্ধ হয়ে গেল। রক্তে ভিজে গেল অকলঙ্ক ভট্চাযের পায়ের তলার মাটি।

দু চোখ বেয়ে জল নামলো তাঁর। কাউকে কোনো কথা না বলে খড়ম ঠকঠক করে বাড়ির পথ ধরলেন তিনি। এতদিন ধরে মন্ত্রই দিয়ে এসেছেন পাঁচটা গাঁয়ের মানুষগুলোকে, মন দিতে পারেননি।

অদ্ভুত একটা জ্বালা নিয়ে ফিরে গেলেন তিনি।

দিনের পর দিন সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত সারা গাঁ টহল দিয়ে বেড়ায় বাঁদর-মারার দল। মাঝে মাঝে হা-লা-লা-লা চীৎকার করে ওঠে, ক্যানেস্তারা বাজায়, আর তীর ছোঁড়ে।

এমনিতেই বাঁদর-মারা এসেছে টের পেয়ে পালিয়েছিলো সব, যা দু-দশটা এদিক-ওদিক ছিটকে লুকিয়ে ছিলো সেগুলোকেও কয়েক দিনের মধ্যেই মেরে শেষ করলো। তীর মেরেই

কাজ শেষ নয়, মরা বাঁদরগুলোকে কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে গিয়ে ডাঙ করেছে বকুলতলায়, চাম ছাড়িয়ে রোদে শুকিয়েছে, ঝোলায় ভরেছে। তারপর ডোম আর মুচী-মুধাদের পাড়ায় গিয়ে হাঁক ধরেছে মেয়েগুলো : চাম লিবে গো, চাম। বাঘের চাম, হরণের চাম, ছাগের চাম, বান্দরের চাম—লিবে গো। হাঁপর হবে, আসুন হবে।

আর বামুন-কায়েতদের ঘরে ঘরে গিয়ে বলেছে, ভালুকের লোম লিবে গো, ভালুকের লোম। ঘুনসিতে বাঁধবে, জ্বর ছাড়বে। গলায় বাঁধবে, জ্বর ছাড়বে। ভালুকের লোম লিবে গো!

ভুলভুলিয়াদের কাছ থেকে ভালুকের লোম নিয়ে আসে তারা, ছাগের চাম, বাঘের চাম নিয়ে আসে, আর আনে সাপের বিষ, কাঁকড়াবিছের তাগা, দু-পাঁচটা জড়িবুটি। গান গেয়ে গেয়ে বিক্রি করে।

বায়নামতো কাজ শেষ হতেই মেয়েগুলো বেরিয়ে পড়লো ঘরে ঘরে সেসব বেচে আসতে।

টিকালী, রচ্চন আর লারী এসে বসলো পঞ্চেখ মোড়লের মরাইতলায়। গড় হয়ে পেন্নাম করলে বাংলাবাড়ির উঁচু উঠনটার উদ্দেশে, যেখানে পঞ্চেখ মোড়ল, চাটুজ্যে, গাঁয়ের আর পাঁচটা লোক বসে তামাক টানছিলো, তাস পেটাচ্ছিলো।

রিদে কোটাল বসে ছিলো উঠনের একটেরে, থামে ঠেস দিয়ে।

সেদিকে তাকিয়ে চোখ ঠেরে হাসলো টিকালী। বোধ হয় সেদিনকার চড় মারার কথাটা মনে পড়তেই। একটু মায়াও হলো যেন। আহা, অমন জোয়ান মানুষটাকে চড় মারলো সে, তবু কিচ্ছু বললো না? মানুষটা লরম বটে। মনটা লরম ওর!

রচ্চনের ওসব দিকে চোখ-কান নেই। ও এসে নীচের উঠনে ধান-ঝাড়াইয়ের পাটাটার পাশে বসলো। গড় হয়ে পেন্নাম করলে : দেন গো মশাইরা, আমাদিগের ছুত্যির টাকাটা দিয়া দেন।

টিকালী ধুয়ো ধরলে : হাঁ গো, হাত টাকা নগদ লিবো, আর তিন জুড়া গামছা।

পঞ্চেখ মোড়ল ধমক দিয়ে উঠলো।—হ্যাঁ, তা দেবো না! চুক্তি ছিলো তাই?

রচ্চন চোখ কপালে তুললো।—হাঁ গো মশাইরা।

পঞ্চেখ মোড়ল বললে, সাত টাকা নগদ দেবো বলেছিলাম, গামছা তো দু জোড়া।

—না মশাইবাবু, তিন জুড়া গামছা। টিকালী দাঁড়িয়ে উঠলো, তারপর রিদে কোটালকে দেখিয়ে বললে, শুধাও কেনা ওই মানুষটারে।

রিদে কোটাল বিব্রত হলো। বাবুরা যা বলছে, বামুনমশাই যা সায় দিচ্ছে, তার বিরুদ্ধে ও কি বলবে। দু জোড়া গামছার কথা হয়েছিলো বটে, কিন্তু রাজী হয়নি বাঁদর-মারার দল। তিন জোড়া গামছাই ওদের পাওনা।

চাটুজ্যে বললে, যা দিচ্ছি নিয়ে যা, আর ঝামেলা করিস না।

টিকালী সজোরে মাথা নাড়লে।—না গো মশাইরা, উ মানুষটাকে মাঝস্থ করছি। উ বলুক কেনা। বলে দুটো কপিশ ক্রূর চোখ যথাসম্ভব করুণ করে টিকালী তাকালো রিদে কোটালের দিকে।

পঞ্চেখ মোড়ল হাসলো।—ভালো সাক্ষী জুটিয়েছিস তো। বল্ রে রিদে, কি চুক্তি হয়েছিলো?

রিদে কোটাল বিব্রত হলো। তবু বাবুদের মন রাখবার জন্যে বললে, দু জোড়াই তো বলেছিলেন আজ্ঞে।

পঞ্চেখ মোড়ল বললে, ওই দেখ, ওই দু জোড়াই দেবো, কাল এসে নিয়ে যাস।

টিকালী একবার তাকালে মোড়লের দিকে, একবার রিদের দিকে, তারপর হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠলো। বললে, মানুষ লও তুমরা।

অসন্তুষ্ট ক্রুদ্ধ মন নিয়ে ফিরে গেল টিকালী আর রচ্চন আর লারী। কাল সকালেই আবার আসবে ওরা দলের সবাইকে নিয়ে।

কিন্তু পরের দিন সকালে আর আসা হলো না। হাঁড়িয়া খেয়ে সারা রাত নাচগান করে ভোম হয়ে ঘুম দিলো সব এক প্রহর বেলা অবধি। খোয়ারি ভাঙলো না। নেশায় গড়ালো শুধু।

নেশার ঘোরে টিকালীর বারবার মনে পড়ছিলো শুধু রিদে কোটালের চেহারাটা। কি মজবুত চেহারা মানুষটার, ইয়া চওড়া কাঁধ, শক্ত দুখানা হাত। টিকালী বুঝেছে, ওর ওপর লোভ পড়েছে মানুষটার। আর টিকালীর নিজেরও মায়া পড়েছে তার ওপর। আহা, মিছে-মিছি লোকটার গালে একটা চড় বসিয়ে দিয়েছিলো ও। পরক্ষণেই মনে হলো, ভালোই করেছে। মিছে কথা বললে লোকটা, টিকালীর কথার মান রাখলো না? বলে কিনা দু জোড়ার চুক্তি হয়েছিলো?

কিন্তু তিন জোড়া গামছা না পেলে যে ওদের ভাগবাঁটরা সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে। না, মশাইবাবুরা তিন জুড়াই দিবে, দিবে। রিদে কোটালকে আবার শুধালে ও নিচ্চয় বলবে তিন জুড়া দিবার ছুত্যি ছিলো।

তবু লোকটার সাথে টুকুন হাসাহাসি কথা বলতে হবে। কি জানি, লোকটা রাগ করেছে হয়তো। ওকে খুশী করলে তিন জোড়া গামছাই মিলবে।

নেশায় ঢুলুঢুলু চোখ মেলে তাকালো টিকালী। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলে। না, মেয়েপুরুষ সব লুটিয়ে আছে। খোয়ারি ভাঙেনি রচ্চনেরও।

একা-একাই উঠে পড়লো টিকালী। কোমর থেকে খসে-পড়া ছেঁড়া নোংরা কাপড়টা আঁট করে বাঁধলে কাঁপা-কাঁপা হাতে। নেশার ঘোর কাটেনি তখনো। টলতে টলতে গাঁয়ের পথ ধরলে।

গাঁ অবধি আসতে হলো না। মাঝ-মাঠে আমবাগানে ঘেরা সাঁইপুকুরের পাশ দিয়ে আসতে আসতে টিকালী দেখলে একটা লোক বসে রয়েছে পুকুরপাড়ে। কে বটে? এগিয়ে গেল টিকালী। সারি সারি গাছের গুঁড়িতে ঢাকা পড়লেও বোঝা যাচ্ছে একটা পুরুষমানুষ।

আরে, রিদে কোটালই তো! ছিপ ফেলে বসে আছে। মাছ ধরছে এক মনে।

টলতে টলতে এলো টিকালী, তবু পা টিপে টিপে। শুকনো পাতায় পা পড়ে না মড়মড় শব্দ হয়। রিদে কোটাল না সজাগ হয়। ধীরে ধীরে এসে পিছনের একটা গুঁড়ির আড়ালে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

ফাতনার দিকে চোখ রেখে বসে ছিলো রিদে কোটাল। আর তার পুরুষ্টু কাঁধ আর চওড়া পিঠের ওপর মোহময় চোখ মেলে দাঁড়িয়ে ছিলো টিকালী।

ফাতনায় টান পড়তেই সপাং করে ছিপে টান দিলো রিদে কোটাল।

কিন্তু মাছ উঠলো না, শুধু টোপটা খেয়ে পালিয়েছে মাছটা।

আবার বঁড়শিতে কেঁচো গেঁথে ছিপ ফেললো হৃদয়।

খানিক পরেই ফাতনায় টান পড়লো, আবার সপাং করে ছিপ টানলো সে।

সঙ্গে সঙ্গে খিলখিল করে সশব্দে হেসে উঠলো টিকালী।

চমকে ফিরে তাকালো হৃদয়। দেখে চমকে উঠলো। সারা শরীর যেন তার সিরসির করে উঠলো মেয়েটার দিকে তাকিয়ে। দুলে দুলে কেঁপে কেঁপে হাসছে মেয়েটা, নেশার হাসি। হাসছে আর কাঁপছে তার শরীরের মাংসল ঢেউগুলো। কাঁপছে না, যেন নাচছে থরথর করে।

হাসতে হাসতেই টিকালী বললে, ডাঁড়ে শিকার লাগলো নাই?

রিদে কোটাল ততক্ষণে ছিপটা গুটিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। টিকালীর খিলখিল হাসি আর তার উদ্ধত যৌবনের থরথরানি দেখে হৃদয় কোটালের মনেও তখন নেশা ধরেছে।

দুটো ভারি পা ফেলে এগিয়ে এলো সে। এগিয়ে এসে মোহগ্রস্তের মতো তাকিয়ে থাকতে থাকতে টিকালীর একখানা হাত ধরলে খপ করে, ধরলে শক্ত মুঠোয়।

হাতটা ছাড়াবার জন্যে দুটো হেঁচকা টান দিলে টিকালী। পারলে না।

হাত ছাড়াতে না পেরেই খিলখিল করে হেসে উঠলো সে। সারা শরীর তার নেচে নেচে উঠলো।

তারপর তার হিংস্র আর কটা-কটা চোখে রিদে কোটালের মুখের দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিলে সে। ফিসফিস করে বললে, চ উদিক পানে।

রোদ চড়তেই খোয়ারি ভাঙলো, একে একে উঠে বসলো বাঁদর-মারার দল। এ ওকে ঠেলে

তুললো, ও একে ঠেলে তুললো। কুণ্ডলী পাকিয়ে সব এক দলা কেঁচোর মতো ঘুমিয়ে ছিলো, উঠে বসলো এক দলা গুবরে পোকার মতো।

আধা-নেশার চোখে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলে রচ্চন।

ঝলসানো মাংসের চিবোনো হাড়, নোংরা ঝোলাঝুলি, বাঁদরের চাম, মেটে হাঁড়ি আর সরা এখানে-ওখানে ছড়ানো-ছিটানো। একে একে দলের সবারই মুখের ওপর লাল টকটকে চোখ জোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে গেল রচ্চন। না, সবাই আছে, নেই শুধু টিকালী।

গেল কোথায়? চোখ দুটো হঠাৎ তার হিংস্র হয়ে উঠলো, কপালের শিরাটা ফুলে উঠলো।

ক্ষ্যাপা গলায় রচ্চন চেঁচিয়ে উঠলো।—এ লারী! টিকালী কুথাকে?

তেজী সাপের মতো ঘাড় ফেরালো মেয়েটা।—তুর বহু তু জানিস। লেশা হয়েছে দেখে উ লিঘ্‌ঘাৎ উদের ঠেঙে টাকা আর গামছা লিয়ে পালাবে।

দলসুদ্ধ লোক হইহই করে চীৎকার করে উঠলো। উঠে দাঁড়ালো সবাই। পুরুষগুলো উঁচিয়ে ধরলো তীর আর ধনুক। মেয়েগুলোর হাতে চাম-ছাড়ানোর ধারালো ছুরি। সাত দিনের মজুরি তাদের : হাত টাকা নগদ, তিন জুড়া গামছা। সারা গাঁয়ের বাঁদর তাড়িয়েছে, বাঁদর মেরে শেষ করেছে। আর ছুত্যির টাকা নিয়ে পালাবে টিকালী?

—ভুলভুলিয়ার মেয়্যা, অমন তো হবেই। বিজ্ঞের মতো ঘাড় নেড়ে নেড়ে বললে দলের বুড়া।

এক সারি ক্ষ্যাপা শুয়োরের মতো রাগে ঘোঁতঘোঁত করতে করতে মশাইবাবুদের বাড়ির পথ ধরলো বাঁদর-মারার দল। টাকা আর গামছা নিয়ে পালিয়ে থাকে তো পাঁচ গাঁ ঘুরে খুঁজে বের করবে টিকালীকে। ছালতাই চাকু দিয়ে চাম ছাড়িয়ে লিবে টিকালীর। লুভী মেয়েটাকে ঠুসে দেবে কাঠকাঠির আগুনে। ভুলভুলিয়ার মেয়্যা, বাঁদর-মারা চিনে না!

নানান জল্পনাকল্পনা, হই-হট্টগোল আর গালাগালি দিতে দিতে আলপথ ধরে আসছিলো দলটা।

গাঁ যত কাছে আসছে রাগ তত বাড়ছে। রাগ যত বাড়ছে মুখের কথা তত কমছে।

শুধু একটা ঘোঁতঘোঁত শব্দ হয় নাকের। মুখে কথা নেই কারো। সারা শরীর যেন রাগে জ্বলছে সবার।

মাঠের আমবাগানে ঘেরা সাঁইপুকুরের পাশ দিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ চমকে থেমে পড়লো দলটা। বাগানের ভিতরে কারা যেন কথা বলছে, হাসছে?

রচ্চন আর লারী এগিয়ে গেল বাগানের দিকে।

আর পরমুহূর্তেই খিলখিল করে হেসে উঠলো লারী। দূরের ঝোপটার দিকে আঙুল দেখিয়ে আবার হেসে উঠলো।

তীর-ধনুক উঁচিয়েই ছিলো রচ্চন। সাঁ করে তীরটা ছুঁড়ে দিলো সে রিদে কোটালকে লক্ষ্য করে।

যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠলো হৃদয়, চীৎকার করে উঠেই মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

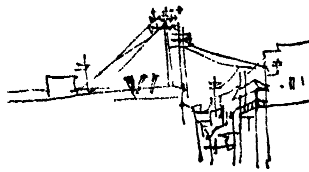
ছুটতে ছুটতে এলো রচ্চন। রচ্চন আর লারী। আর টিকালী তখনো দাঁড়িয়ে আছে। কাঁপছে থরথর করে।

ছুটে এলো রচ্চন। দেখলে রিদে কোটালের একটা হাত এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দিয়েছে তীরটা। ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়ছে। মাটি ভিজে গেছে রক্তে। গোঁ গোঁ করছে রিদে।

রচ্চন হিংস্র ক্রূর চোখে তাকালে রিদে কোটালের মুখের দিকে, তীরের ডগাটা মট করে ভেঙে দিয়ে তীরটা টেনে বের করলে।

তারপর অসীম ঘৃণার সঙ্গে মাটিতে এক দলা থুতু ফেলে বললে, বা-ন্‌-দ-র!

খিলখিল করে লারী হেসে উঠলো আবার। আর সঙ্গে সঙ্গে টিকালীর কটা-কটা হিংস্র চোখ জোড়াও খিলখিল করে হেসে উঠলো। হাসতে হাসতে বলে উঠলো : বা-ন্‌-দ-র।



শুধু কেরানী

আমরা পাঁচজন এ আপিসে, এই রেকর্ড সেকশনে, একসঙ্গে ঢুকেছিলাম। কিন্তু কেউ কাউকে চিনতাম না। আমি, রেণুকাদি, অপর্ণা এবং আরো দুজন, যারা এখন আর এ আপিসে নেই। সুজাতা চলে গেছে অন্য আপিসে, গৌরী বিয়ে করে সংসার করছে। কি সুন্দর ফুটফুটে একটি ছেলে হয়েছে তার, কি মিষ্টি আধো-আধো বুলি।

প্রথম যেদিন চাকরিতে যোগ দিলাম, সেদিন এদের কাউকে চেনা তো দূরের কথা, আপিসের এই লম্বা হলখানাও চিনতাম না। গোলকধাঁধার মতো এই বিরাট বাড়িখানা শুধু দেখেছিলাম বাইরে থেকে, ইণ্টারভিউ দিয়েছিলাম এ বাড়ির অন্য এক প্রান্তে, বড়সায়েবের খাস কামরায়।

অ্যাপয়েণ্টমেণ্টের চিঠিখানা নিয়ে কেমন একটা ভয়-ভয় থরথর বুকে এসে দাঁড়িয়েছিলাম এর সামনে, খোঁজ করে হদিস জেনেছিলাম রেকর্ড সেকশনের।

বাইরে থেকে চেহারাটা বিরাট মনে হলেও এর ভেতরে যে এমন একটা গোলকধাঁধা আছে টের পাইনি। সিঁড়ির পাশেই লিফ্‌ট ছিলো, লিফ্‌টের সামনে লোকও দাঁড়িয়ে ছিলো অনেক। কিন্তু সাহস করে তাদের পিছনে দাঁড়াতে পারিনি। কি জানি, এই লিফ্‌টে ওঠার অধিকার আমার আছে কি না—আমার, রেকর্ড সেকশনে আশি টাকা বেসিক স্যালারির নতুন চাকরি-পাওয়া একটি মেয়ে-কেরানীর। তাই সিঁড়ি ভেঙে ভেঙেই ওপরে উঠেছিলাম, তেতলার বারান্দায় এসে এদিক-ওদিক তাকিয়েছিলাম। একে জিগ্যেস করে, ওকে জিগ্যেস করে একবার এ-বারান্দা, একবার ও-বারান্দা করেছি। আর বারবার হাতের ছোট্ট ঘড়িটার কাঁটার দিকে তাকিয়েছি। শুধু অন্ধকার বারান্দার সারি এদিক থেকে ওদিক থেকে এসে পরস্পরকে কাটা-কাটি করে চলে গেছে, আর তারই পাশে পাশে ঘর, ঘরের সামনে টুলে-বসা চাপরাসীদের গজল্লা।

তাদেরই একজন বললে, রেকর্ড সেকশনে? আসুন আমার সঙ্গে।

বিরাট দরজা, যেমন চওড়া তেমনি উঁচু। ঢোকবার আগে বুকটা কেমন দুরুদুরু করে উঠলো, গলা শুকিয়ে এলো।

ঢুকলাম চাপরাসীর পিছনে পিছনে। ভালো করে তাকিয়ে দেখতেও কেমন অস্বস্তি। সারি সারি টেবিল, টেবিলে টেবিলে ফাইলের রাশি, দেয়ালগুলো র‍্যাক আর আলমারিতে ঠাসাঠাসি, র‍্যাকে ধুলোটে ফাইলের স্তূপ। কিন্তু বিতৃষ্ণা জাগলো না। নতুন চাকরির মোহ আর ছোটসায়েবের সঙ্গে দেখা করার আতঙ্কে তখন মন ভরে আছে।

ছোটসায়েবের সঙ্গে ইংরাজীতে কথা বলতে হবে, না বাংলায়, তা ভেবেছি দু দিন ধরে, কিন্তু কোনো কিছুই ঠিক করতে পারিনি। বাবা বলেছিলেন, ইংরেজী; ছোটমামা বলেছিলো, বাংলা।

একটা কিছু ঠিক করার আগেই দেখলাম চাপরাসীটা সুইং ডোর ঠেলে বেরিয়ে এসে বলছে, আসুন।

একমুখ হেসে দু হাত তুলে নমস্কার জানালেন ছোটসায়েব, আমিও বেঁচে গেলাম।

অ্যাপয়েণ্টমেণ্টের চিঠিখানা আমার কাছ থেকে নিয়েই তিনি উঠে এলেন, এসে আলাপ করিয়ে দিলেন হেড অব সেকশনের সঙ্গে।

আর সদানন্দবাবু চেয়ার দেখিয়ে দিলেন।

প্রথম দিনটা যে কি অস্বস্তিতে কেটেছিলো! সদানন্দবাবু না থাকলে দ্বিতীয় দিন হয়তো আপিসে আসতে পারতাম না।

ময়লা আদ্দির পাঞ্জাবি, চোখের চশমার ফ্রেমটা একসময় রোল্ড গোল্ড ছিলো কিন্তু এখন পিতল মনে হয়, চুলের অর্ধেক সাদা। পান খান মিনিটে মিনিটে। এই হলো সদানন্দবাবু।

খুব আন্তরিকভাবে কথাবার্তা বললেন তিনি, কথা বলতে বলতে আনমনে হাতের উলটো পিঠটা নিজের চিবুকে-গালে ঘষে নিলেন একবার, বোধ হয় দাড়িটা কামানো নেই দেখে একটু অস্বস্তি বোধ করলেন। এতক্ষণে ভয় কেটে গেল কিছুটা, মনে মনে কৌতুক বোধ করলাম।

সারাটা দিন কোনো কাজ করতে দিলেন না সদানন্দবাবু। বললেন, এখন দিন কয়েক জিরিয়ে নিন মিস রায়, কাজ শুরু হলে আর নিশ্বাস ফেলতে পাবেন না।

আমি শুধু হাসলাম।

রেণুকাদি, অপর্ণা, সুজাতা আর গৌরীও সেদিন থেকেই কাজে লাগলো। শুধু নামধাম জিগ্যেস করা ছাড়া তাদের সঙ্গে আর কোনো আলাপই হলো না। অন্য পুরুষ-কেরানীদের নামধামটুকুও জিগ্যেস করতে পারলাম না। তা কেন, মুখ তুলে তাদের দিকে তাকাতেও লজ্জা

অথচ গৌরী ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই দিব্যি আলাপ জমিয়ে ফেললো কয়েকজনের সঙ্গে। আর তারাও গৌরীর দিকেই নজর দিলো বেশী।

দোষ নেই, আমাদের পাঁচজনের মধ্যে গৌরী একটু পৃথক। চেহারাটা ভালো, মুখখানা মিষ্টি, যেমন ফিগার তেমনি স্মার্ট। আবার তেমনি সাজপোশাক।

পরের দিনও ঠিক সময়েই এলাম, দেরাজ খুলে পেপার-ওয়েট, পিন-কুশন, কলম-পেন্সিল বের করে সাজিয়ে রাখলাম টেবিলে। জলতেষ্টা পেয়েছিলো, সবাই চাপরাসী রাধানাথকে জল দিতে বলছিলো, কিন্তু তাদের মতো আমি রাধানাথকে চেঁচিয়ে ডাকতে পারলাম না।

ফিসফিস করে সদানন্দবাবুকে বললাম, একটু জল দিতে বলুন না।

একটু আগেই রাধানাথ তাঁর টেবিলে এক গ্লাস জল কাগজের চাকতি ঢাকা দিয়ে রেখে গিয়েছিলো, সদানন্দবাবু সেটাই এগিয়ে দিলেন।

জলটা ঢকঢক করে গিলে নিয়ে বললাম, কাজ দিন।

সদানন্দবাবু হাসলেন, তারপর কয়েকটা ফাইল এগিয়ে দিয়ে বললেন, কাজ করতে হবে না, এগুলো উলটে উলটে দেখুন শুধু।

প্রৌঢ় সদানন্দবাবুর ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। অথচ এই সদানন্দবাবুই নাকি সেকশনে মেয়েদের চাকরি দেওয়া হবে শুনে রীতিমতো চটে গিয়েছিলেন।

একটু একটু করে কাজ দিতে শুরু করলেন সদানন্দবাবু, সেসব খুবই সহজ কাজ। একটু একটু করে সকলের সঙ্গে আলাপ হতেও শুরু হলো।

আলাপ হলেও বেশী কথাবার্তা ওই সদানন্দবাবু আর চক্কোত্তির সঙ্গেই হতো। চক্কোত্তি রসিক বৃদ্ধ, শুনেছিলাম মাস কয়েক পরেই নাকি রিটায়ার করবেন।

হাসতে হাসতে একদিন বলেছিলেন, সেই এলে মা লক্ষ্মীরা, দু-দিন আগে এলে না!

আমরা হাসতাম, আমি, অপর্ণা, রেণুকাদি, সুজাতা। আর গৌরী, যেমন প্রশ্ন তার তেমনি জবাব দিতো।

অমন ফাজিল মেয়ে আমাদের সেকশনে আর একটিও ছিলো না। আমাদের মেয়েদের দলটাকে সব সময়ে যেন ফুর্তিতে মজিয়ে রাখতো সে।

টিফিনের সময় আমরা পাঁচজনে কাছের একটা চায়ের দোকানে গিয়ে বসতাম। ইডলি, দোসা, চা-কফি খেতাম, আর হই-হল্লা করতাম নিজেদের মধ্যেই এক-একজনকে নিয়ে। পরস্পরকে আমরা এত ভালোবেসে ফেলেছিলাম যে, একদিন একসঙ্গে এই চায়ের দোকানে এসে জুটতে না পারলে মনে হতো সারা দিনটা বুঝি বৃথাই গেল। আবার পরস্পরের সমালোচনাও করতাম, হাসিঠাট্টা।

ছোটসায়েব যে গৌরীকে একটু স্নেহের চোখে দেখতেন, একটু ঘন ঘন তার ডাক পড়তো তাঁর খাস কামরায়, তা আমরা সবাই লক্ষ করতাম। সবই লক্ষ করতাম আমরা, কোনো কিছুই আমাদের চোখ এড়িয়ে যেতো না।

রেণুকাদির বিয়ে হয়ে গিয়েছিলো চাকরিতে ঢোকার আগেই, স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চাকরি করতেন দু আপিসে। আর সেই সূত্রেই কিছু কিছু খবর এসে পৌঁছাতো। রেণুকাদিই খবর

এনেছিলেন ছোটসায়েব বিবাহিত, ছেলেমেয়েও তাঁর সিকি ডজন।

মাদ্রাজী চায়ের দোকানে বসেই সে খবর জানিয়েছিলেন রেণুকাদি, গৌরীকে ঠাট্টা করে বলেছিলেন, সতীন নিয়ে ঘর করতে চাস তো আমাদের কোনো আপত্তি নেই।

গৌরী সশব্দে হেসে উঠে বলেছিলো, সতীনে আপত্তি ছিলো না রেণুকাদি, কিন্তু সোয়া তিনটে ছেলেমেয়েও আছে যে ছোটসায়েবের।

অপর্ণা টিপ্পনী কাটতো, যত দোষ আমাদের গৌরীর, এদিকে সন্ধ্যা যে সদানন্দ বুড়োর সঙ্গে...

আমি চটে যেতাম। আর আমি যত চটতাম ওরা তত আমাকে নিয়ে পড়তো। আমার চটার কারণ যে না ছিলো তা নয়। অভিলাষবাবু তো প্রায়ই আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন, গল্পগুজব করতেন। বেশ বুঝতে পারতাম আমার সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ খুঁজছেন। আমি এড়িয়ে চলতাম। তা হোক, ওরা তো অভিলাষবাবুর নাম করে আমাকে ঠাট্টা করতে পারতো। তা নয়, বুড়ো সদানন্দবাবুকে নিয়ে।

সদানন্দবাবু লোক ভালো ছিলেন। বাড়ির খবর নিতেন। ভাইয়ের অসুখ সেরেছে কি না। দিদির কি হয়েছে, ছেলে না মেয়ে। সত্যিকারের ভদ্রলোক ছিলেন সদানন্দবাবু, তাঁর ব্যবহারে কোনো দিন ত্রুটি পাইনি। কিন্তু ওরা ঠাট্টা করতো বলেই আমি এক-একদিন সদানন্দবাবুর ওপর চটে যেতাম, কথাবার্তা বেশী বলতাম না, হ্যাঁ-না দিয়ে উত্তর সারতাম। আর সদানন্দ-বাবুর ওপর চটতাম বলেই অভিলাষবাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করতাম।

অভিলাষবাবুর বয়স তখন কমই, চেহারাটাও মন্দ ছিলো না। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে সত্যিই কোনো দুর্বলতা ছিলো না আমার মনে। তবু তাঁর সঙ্গে যেচে গল্প করে আসতাম। নিজের থেকেই দু-একদিন বলতাম, চলুন, চা খেয়ে আসি।

রেণুকাদিদের সামনে দিয়েই আমরা দুজনে গিয়ে বসতাম চায়ের দোকানে। ধীরে ধীরে চায়ে চুমুক দিতাম, আরো ধীরে ধীরে কথা বলতাম। ইচ্ছে করে এমন একটা ভাব দেখাতাম, যেন ডুবে ডুবে জল খাচ্ছি।

কাজ হলো কিছু দিনের মধ্যেই। ওরা সদানন্দবাবুর বদলে অভিলাষবাবুকে জড়িয়ে আমার নামে কানাঘুষো শুরু করলো। আর রেণুকাদি একদিন বললে, গেঁথে তো এনেছিস. এবার টেনে তোল।

প্রথমটা আমি খুশী হয়েছিলাম। কিন্তু মনে মনে একটু ভয়ও যে না পেতাম তা নয়। অভিলাষবাবুর ওপর আমার কোনো দুর্বলতাই ছিলো না। যেমন রেণুকাদিকে ভালো লাগতো, তেমনি অভিলাষবাবুকেও। বন্ধু ভাবতাম, সঙ্গ ভালো লাগতো তাঁর। কারণ অভি-লাষবাবু মানুষটি খুব হাসিখুশী মিশুকে। এক কথায়, মজার মানুষ, হাসাতে পারতেন প্রচুর, হাসতেনও।

কিন্তু এক-একসময় তাঁর কথাগুলো দুমুখো মনে হতো, চোখের দৃষ্টিও। আশঙ্কা হতো, অভিলাষবাবু না ভুল বোঝেন। আমার এই অন্তরঙ্গ হবার প্রয়াসের মধ্যে তিনি ভুল করে না অন্য অর্থ খুঁজে পান।

তাই মাঝে মাঝে কৌতুকের স্বরে দু-একটা রূঢ় কথা শুনিয়ে দিতাম, আঘাত দেবার জন্যেই। বলতাম, যে রেট-এ টাক পড়ছে আপনার, তাড়াতাড়ি বিয়ে করে ফেলুন, এর পর আর মেয়ে পাবেন না।

অভিলাষবাবুও রসিকতা করতে ছাড়তেন না। বলতেন, মেয়ের অভাব হবে না বাংলা-দেশে, কিন্তু দুঃখ আমার আপনার জন্যেই।

—কেন ?

—বিয়ে হচ্ছে না, কিন্তু চুল পাকছে বলে।

চুলে আমার তখনো পাক ধরেনি, তবু বয়স যে বাড়ছে এই সত্যি কথাটা শুনতে ভালো লাগতো না। তাই হেসে হালকা হবার চেষ্টা করে বলতাম, দিন না আপনিই একটা ব্যবস্থা করে।

—কত মাইনে চান পাত্রের? অভিলাষবাবু জিগ্যেস করলেন একদিন।

বললাম, অন্তত চার শো।

বললাম অভিলাষবাবুকে আঘাত দেবার জন্যেই। কারণ তিনি তখন মাত্র দেড় শো টাকা মাইনে পান।

অভিলাষবাবু দমলেন না। বললেন, দেখি তা হলে বুড়ো সদানন্দবাবুকে বলে, উনি পান চার শো বাহান্ন টাকা।

চটে গিয়ে বললাম, দায় পড়েছে।

অভিলাষবাবু হেসে বললেন, তা হলে অপেক্ষা করুন, সদানন্দবাবুর বয়েস হোক আমার, তখন আমিই চার শো টাকা মাইনে পাবো।

এ কথা শুনে আমি আর রাগতে পারলাম না। হো হো করে হেসে উঠলাম। মনটাও হালকা হলো। ভাবলাম, অভিলাষবাবুর মনে নিশ্চয়ই কোনো গোপন অভিলাষ নেই। থাকলে এভাবে রঙ্গরসিকতা করতে পারতেন না।

এমনিভাবেই দিন কাটছিলো। একটু একটু করে কখন যে আমার মনের জড়তা কেটে গেছে, সপ্রতিভ হয়ে উঠেছি, আলাপ হয়ে গেছে সেকশনের সকলের সঙ্গেই, রায়-হাজরা-বিনয় মল্লিকদের সঙ্গেও, তা টের পাইনি। এমন কি, এটুকুও বুঝতে পারিনি কখন থেকে কাজের চাপ বেড়েছে। ফাইলের পর ফাইল স্তূপীকৃত হয়েছে টেবিলে, দশটা পাঁচটা ঘাড় গুঁজে কাজ করতে করতে হঠাৎ কখন থেকে ফাঁকি দিতে শিখেছি, ফাঁকি-দেওয়া অকাজের সময়টুকুতে আর পাঁচজনের মতোই দল বেঁধে পরচর্চা শুরু করেছি, ছোটসায়েবের উদ্দেশে গালাগালি দিয়েছি নিজেদের মধ্যে, পরস্পর বলা-কওয়া করেছি, বুড়ো সদানন্দটা রিটায়ার করে না কেন?

আমি যে একটা সাধারণ মেয়ে, আমরা, পাঁচজনই তা যেন ভুলে গিয়েছিলাম। পুরুষ-কেরানীদের সঙ্গে আমাদের যে কোনো পার্থক্য আছে বুঝতেই পারতাম না।

সচেতন হতাম শুধু মাদ্রাজীদের চায়ের দোকানে যেদিন আমরা পাঁচজন একসঙ্গে জুটতাম। জুটতাম অবশ্য খুব কম দিনই। কারণ, আমি যেমন প্রায়ই অভিলাষবাবুর সঙ্গে চা খেতে যেতাম, তেমনি গৌরী, অপর্ণা, রেণুকাদি সবাই কে কোথায় যেন ছিটকে যেতো টিফিনের সময়। যেমন ছুটির পর বাস-স্ট্যাণ্ডে গিয়ে দাঁড়াতে চাইতাম না একসঙ্গে। কেউ কেউ হয়তো ভাবতো, এক বাসে উঠলে একসঙ্গে টিকিট কাটতে হবে বলে—কিন্তু আসলে তা নয়। আমরা পাঁচজনে কেউ কাউকে সহ্য করতে পারতাম না। কিন্তু ঘুণাক্ষরে সে কথা কেউ কাউকে জানতেও দিতাম না। দিতাম না বলেই মাঝে মাঝে একসঙ্গে এসে বসতাম।

সেদিনও এসে বসেছিলাম। কিন্তু এমন একটা খবর যে শুনবো আশঙ্কা করিনি।

আমরা চারজন এসে সবে কফির অর্ডার দিয়েছি, রেণুকাদি এসে ঢুকলেন হাসতে হাসতে। বললেন, শুনেছিস খবর?

—কি খবর রেণুকাদি?

আমরা সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়লাম।

রেণুকাদি হেসে আড়চোখে তাকালেন গৌরীর মুখের দিকে, আর গৌরীর মুখখানা কেমন অপ্রতিভ অথচ খুশী-খুশী দেখালো।

রেণুকাদি বললেন, গৌরীর বিয়ে।

—কবে?

—কোথায়?

—কার সঙ্গে?

সকলেই বিস্ময়ের সুরে প্রশ্ন করলাম একসঙ্গে, আর রেণুকাদি বললেন, এতদিন ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিলো। বলেনি কিছুই।

একে একে সব খবর রেণুকাদির কাছেই শুনলাম। চোখের ডাক্তার, চমৎকার চেহারা, মাসে সাত-আট শো টাকা রোজগার। না, প্রেম নয়, গৌরী গিয়েছিলো চোখ দেখাতে। ভদ্রলোকের দেখে ভালো লেগে গিয়েছিলো। নিজেই প্রোপোজ করেছিলেন গৌরীর বাবার কাছে, পরিচিত এক ভদ্রলোকের মারফত।

আমরা সেদিন খুব হই-হল্লা করলাম, মসাল্লা দোসা আলুভাজি কফির বিল মেটাতে বাধ্য করলাম গৌরীকে, নানারকম ফুর্তি-ফাজলামির প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে তুললাম তাকে, আর রাগাবার জন্যে বললাম, কারও বাড়ি থেকে মাস আষ্টেকের একটি ছোট্ট ছেলেকে নিয়ে

গিয়ে বিয়ের দিন গৌরীকে উপহার দিয়ে আসবো।

গৌরী রেগে লাল হলো, হাসলো, আমাকে জড়িয়ে ধরে বললে, আমাকে কেন ভাই, ডাক্তার সেনকে।

রেণুকাদি চোখ পাকালেন।—ডাক্তার সেন কি রে? 'ওঁকে' বল্।

এমনি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ রঙ্গ-রসিকতায় দিনটা কেটে গেল। ছুটি হলো। একে একে সকলে এসে বাস-স্ট্যান্ডে দাঁড়ালাম।

তারপর হঠাৎ একসময় মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল। কবিতায় যাকে উদাস হওয়া বলে, ঠিক তেমনি। এতদিন পরে যেন আচমকা মনে হলো আমি রেকর্ড সেকশনের এক শো ছ' টাকা বেসিক স্যালারির একটি কেরানী মাত্র নই, আমি একটি মেয়ে। হ্যাঁ, এ ক' বছরে মাইনে বেড়ে বেড়ে এক শো ছ' টাকা হয়েছিলো, আর কানের পাশে দু-দশ খি চুলও পেকেছিলো। পাকা চুলগুলো রাখিনি, তুলে ফেলেছিলাম, কিন্তু মন থেকে তুলতে পারিনি।

তাই বোধ হয় হঠাৎ খাঁ-খাঁ করে উঠলো সারা মন। গৌরী জিতে বেরিয়ে গেল বলে নয়, আমি হেরে যাবো, হেরে গেছি এই ভয়েও নয়। মনে হলো, অভিলাষবাবুকে আমি মিথ্যে ভয় পেয়েছিলাম, আমি তাকে ভালোবাসি ভেবে সে হয়তো ভুল করতে পারে এই ভয়ে তটস্থ ছিলাম এতদিন। ভাবলাম, সে ভয়টা সত্যিই মিথ্যে হয়ে যাক তা হয়তো চাইনি। অভিলাষ-বাবু ভুল করলে হয়তো ভালোই হতো।

কেন জানি না, অভিলাষবাবুর ওপর মনটা বিষিয়ে গেল। বিরক্ত হলাম। বিরক্ত হলাম বাড়ির ওপর, মা-বাবা-ভাই-বোন সকলের ওপর।

যখন প্রথম কলেজে ঢুকতে চেয়েছিলাম, মা আপত্তি করেছিলো। দু দিন রাগারাগি করে তবে সম্মতি আদায় করেছিলাম। কিন্তু পড়াশুনো শেষ করে যখন চাকরি করতে চাইলাম, বাবাও আপত্তি তুললেন। কয়েকটা বছর উঠে-পড়ে লাগলেন, আমার বিয়ের ব্যবস্থা করতে। পারলেন না। সে সময় আমার মেজাজ সপ্তমে চড়ে থাকতো, কারো সঙ্গে ভালোভাবে কথা বলতে পারতাম না, হাসতে পারতাম না প্রাণ খুলে। আত্মীয়স্বজনরা এসে সমবেদনার ভঙ্গিতে আমার বিয়ের কথা জিগ্যেস করতো; আমি জ্বলে উঠতাম ভেতরে ভেতরে। সারাটা দিন সারাটা রাত্রি কিভাবে যে কাটতো, মনে হতো ঘড়ির কাঁটা যেন থেমে গেছে—ক্যালেন্ডারের পাতা নেই।

কাউকে কিছু না জানিয়েই চাকরির জন্যে দরখাস্ত পাঠিয়েছিলাম, ইন্টারভিউ দিয়ে-ছিলাম। আর অ্যাপয়েন্টমেন্টের চিঠিটা পেয়ে বাবাকে দেখালাম।

বাবা দেখলেন, খুশী হলেন, বললেন, বেশ তো, চুপচাপ বসে থাকার চেয়ে এ অনেক ভালো।

মা বললে, আজকাল তো অনেকেই চাকরি করছে।

কি আশ্চর্য, চার বছর আগের সেই আপত্তি কোথায় উবে গেছে, কখন থেকে, তা আমি নিজেও টের পাইনি।

আর টের পাইনি, বছরের পর বছর চাকরি করতে করতে কখন থেকে বাড়িতে আমাকে কেউ আর 'মেয়ে' ভাবে না। আপিসের হেড অব সেকশন সদানন্দবাবুর মতো, ছোটসায়েবের মতো, বাড়িতেও আমি শুধু কেরানী। আত্মীয়স্বজনরাও বেড়াতে এসে কোনো দিন বিয়ের কথা তুলতো না। তুলতো না বলেই আমি নিজেও ভুলে গিয়েছিলাম যে আমার মনের ভেতরেও একটা সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা আছে।

পরের দিন আপিসে এসে অপর্ণা আর সুজাতার মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। দুজনই যেন অসুখে ভুগছে, মুষড়ে পড়েছে, কেমন একটা বিষণ্ণ ভাব। আয়নায় মুখ দেখে বুঝতে পারিনি, ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে আমার নিজের মুখটাও যেন দেখতে পেলাম।

কাজে মন বসলো না। অকারণে সদানন্দবাবুর সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করলাম। ধমক দিলাম চাপরাসী রাধানাথকে। আর প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অভিলাষবাবুর কাছ থেকে ফাইলটা চেয়ে নিতে পারলাম না।

তারপর টিফিনের সময় চমকে উঠলাম অভিলাষবাবুকে পিছনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। সে যে কি অস্বস্তি!

—চলুন একটু চা খেয়ে আসি। অভিলাষবাবু বললেন।

আমি আরো অস্বস্তি বোধ করলাম। বোধ হয় বিদ্রোহ।

বললাম, আপনি আজ একাই যান, আমি রেণুকাদির সঙ্গে যাবো।

অভিলাষবাবু সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, আজ আমার একটু জরুরী কথা ছিলো।

কেমন অসহায় হয়ে পড়লাম আমি। যেন কিছুই বুঝতে পারছি না। উনি কি কিছু বলতে চান আমাকে? যা শুনতে চাই? না, না, তা নয়, ও আশঙ্কা মিথ্যা। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে স্পষ্ট কথার চাবুক মেরে আমি নিজেই তো বোবা করে দিয়েছি অভিলাষবাবুকে। কিংবা সে কল্পনাটুকুও মিথ্যা। হয়তো আমার অহংকার। নিজেকে বড় বেশী বড় করে দেখেছি। অভিলাষবাবু এই নীরস মধ্যাহ্নের মুহূর্ত কয়েকের বিশ্রাম চেয়েছেন, সঙ্গ চেয়েছেন, সঙ্গী করতে চাননি।

তাই ধীরে ধীরে বললাম, চলুন।

অন্য দিনের মতোই এসে বসলাম চায়ের দোকানের খোপটায়।

দু পেয়ালা কফির অর্ডার দিলেন অভিলাষবাবু। কফি দিয়ে গেল। চামচটা প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় কফির পাত্রে নাড়তে লাগলেন অভিলাষবাবু। অনেকটা সময় কেটে গেল। দুজনেই চুপচাপ।

তারপর একসময় বেশ চেষ্টা করেই সোডার বোতলের ছিপি খোলার মতো আকস্মিক সশব্দতায় অভিলাষবাবু প্রশ্ন করলেন, আপিসের এই চাকরি আপনার ভালো লাগে?

স্পষ্টভাবে সত্যি কথাটাই বললাম।—না।

অভিলাষবাবুর গলার স্বর গাঢ় হয়ে এলো।—এসব ছেড়েছুড়ে দিয়ে ঘর-সংসার করতে ইচ্ছে হয় না আপনার?

খিলখিল করে হেসে উঠলাম। কথাটাকে হালকা করে দেবার চেষ্টা করলাম, বললাম, হলেই বা উপায় কি?

অভিলাষবাবু গম্ভীর হয়ে গেলেন। ধীরে ধীরে চামচটা ঠুনঠুন করে কফির পাত্রে বাজাতে বাজাতে মুখ নিচু করেই বললেন, আমি বলছিলাম কি, আপনার অমত যদি না থাকে...

অস্বস্তিতে, লজ্জায়, অপ্রতিভতায় আমি কেন জানি না, তাঁর কথা শেষ হওয়ার আগেই উঠে দাঁড়ালাম। আমি কেমন যেন অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম।

অভিলাষবাবুও উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আজকেই উত্তর দিতে বলছি না, আজকের দিনটা ভেবে দেখুন, কাল, কাল ঠিক এই সময়ে আপনার উত্তরটা শুনবো।

কোনো জবাব দিতে পারলাম না। সমস্ত শরীর তখন থরথর করে কাঁপছে। বুক দুরু-দুরু করছে, কেমন একটা আতঙ্ক আর আনন্দের ভাব, ঠিক সেই চোদ্দ বছর বয়সে পাড়ার একটা বকাটে ছেলে যেদিন পাশ দিয়ে যাবার সময় হাতে চিঠি গুঁজে দিয়েছিলো, ঠিক সেই দিনের মতো কাঁপতে কাঁপতে সেকশনে ফিরে এলাম। একটিমাত্র প্রশ্নে আমার বয়সটা যেন কুড়ি বছর পিছনে চলে গেল, মনে হলো সেদিনের মতোই অনভিজ্ঞ এক কিশোরীতে পরিণত হয়ে গেছি।

সেদিন আর কোনো কাজে মন বসলো না। চোখ তুলে বুড়ো সদানন্দবাবুর দিকেও তাকাতে পারলাম না।

প্রশ্ন নয়, কথা নয়, অভিলাষবাবু যেন এক মুঠো আবীর মাখিয়ে দিয়েছেন আমার মুখে। মুখ তুললেই যেন সকলে দেখতে পাবে।

ছুটির পর সকলকে এড়িয়ে বাস-স্ট্যাণ্ডে এসে দাঁড়ালাম। প্রথম বাসটার ভিড় ঠেলেই উঠে পড়লাম কোনো দিকে না তাকিয়ে।

সমস্ত রাত্রি ঘুম এলো না। না, আনন্দ নয়, কেমন একটা ভয়-ভয় ভাব। কেমন একটা আতঙ্ক।

ঘর-সংসারের কথা ভেবেছি, গৌরীর সৌভাগ্যে ঈর্ষা বোধ করেছি। এই ধুলোটে ফাইলের পরিবেশ আর চাকরি-জীবনের তিক্ততা থেকে রেহাই চেয়েছি কত দিন।

কিন্তু সেই ঘর-সংসার বিবাহিত জীবন সামনে এসে দাঁড়াতেই কেন যে ভয় পেলাম

নিজেও বুঝতে পারি না। কেমন একটা অবোধ্য আতঙ্ক। কিন্তু কি উত্তর দেবো অভিলাষবাবুকে। জীবনের একমাত্র কামনা কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, সামনে এসে। হাত বাড়াবো, না, হাত গুটিয়ে নেবো?

কোনো উত্তরটাই যেন মনের মতো হয় না।

ভাবতে ভাবতে একটা রাত কেটে গেল। সকাল।

ভাবতে ভাবতেই কখন আপিসে পৌঁছে গেছি। নিজের টেবিলে এসে বসেছি, দেরাজ খুলে পেপার-ওয়েট, পিন-কুশন, কলম-পেন্সিল বের করে সাজিয়ে রেখেছি, রাধানাথকে চেঁচিয়ে ডেকেছি, বলেছি জল দিতে, তারপর ঢকঢক করে জলটুকু খেয়ে তলানিটুকু ঢেলে দিয়েছি শুকিয়ে-যাওয়া কালির দোয়াতে।

মনে মনে ঠিক করে ফেলেছি, কি উত্তর দেবো। ঠিক করে ফেলেছি, উত্তর নয়, কপট লজ্জা আর মৃদু হাসি হেসে সম্মতি জানাবো।

খুব অন্তরঙ্গভাবে কথা বলেছেন সদানন্দবাবু, তাঁর বাড়ির কথা, আমার বাড়ির কথা। বলেছেন, ছোটসায়েব লোক তো ভালো ছিলেন, এখন মেজাজটা কড়া হয়ে গেছে। বলেছেন, আমার তো আর মাত্র দু মাস মিস রয়! তারপর রেণুকাদি এসে বসেছেন একসময়, চেয়ার টেনে নিয়ে অপর্ণা আর সুজাতাও।

রেণুকাদি বলেছেন, সুজাতা চললো।

—কোথায়?

অপর্ণা হেসে বলেছে, এ জি বি। ভালো চাকরি পেয়েছে।

রেণুকাদি বলেছেন, তুই এবার ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষাটা দিয়ে দে সন্ধ্যা। তা না হলে উন্নতি হবে না।

আমি চুপ করে শুধু শুনেছি। শুনে গেছি, সুবিমলবাবু চিৎকার করে মানিককে বলছেন, তিনি নাকি ডব্লু বি সি এস দিচ্ছেন। রায় আর হাজরার থিয়েটারের গল্প : ভেবেছিলাম গৌরী দেবীকে পার্টটা করতে বলবো, আপনি একটা রোল করুন না মিস রায়?

আমি হেসেছি শুধু। কত দিন এই ছোটসায়েবের চরিত্রচর্চায় মজে গিয়েছি, ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করেছি। মেন রোলটা গৌরীকে কেন দেওয়া হবে বলে তর্ক করেছি।

কিন্তু অভিলাষবাবুর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে যেন শান্তি নেই।

একসময় সময় কেটে গেছে। একে একে টিফিনে বের হতে শুরু করেছে সকলে। আর আমি অভিলাষবাবুর দিকে তাকিয়েছি, অভিলাষবাবু আমার দিকে।

দুজনে চুপচাপ এসে বসেছি চায়ের দোকানটায়। দু পেয়ালা কফির অর্ডার দিয়েছি আমি নিজেই।

তারপর কফির পেয়ালায় চামচ নেড়েছি ঠুনঠুন করে, কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করেছি, তারপর একসময় হঠাৎ বলে উঠেছি, তা হয় না অভিলাষবাবু। তা হয় না। এ কথা আমি কোনো দিন ভাবিনি, আমার বন্ধু, আমরা...

আবেগে থরথর করে উঠেছি আমি। কথা শেষ করতে পারিনি।

ধীরে ধীরে কফির পেয়ালাটা আমি শেষ করেছি, আর অভিলাষবাবু পেয়ালাটায় একটা চুমুকও দেননি। সেটা আমার চোখের সামনেই জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

তারপর ধীরে ধীরে উঠে এসেছি, এসে বসেছি নিজের টেবিলে। এক মনে, হালকা মনে কাজ করেছি তন্ময় হয়ে। ভারি পাথরটা তখন সরে গেছে বুক থেকে।

ধুলোটে ফাইলগুলোকে ভেলভেটের ব্লাউজের চেয়েও নরম মনে হয়েছে। সদানন্দবাবুর গিন্নীর গল্প শুনতে আগ্রহ বোধ করেছি, সুবিমলবাবুকে বলেছি, গত বছরের পরীক্ষার প্রশ্নগুলো দেবেন তো একবার; রায় আর হাজরাকে বলেছি, মেন রোল আমাকে দিতে হবে, রেণুকাদিকে ঠাট্টা করেছি তাঁর স্বামীর কথা বলে, অপর্ণাকে খোঁটা দিয়ে বলেছি, লজ্জাও করে না, এখনো পাত্রপক্ষের সামনে সেজেগুজে গিয়ে বসতে।

তারপর একসময় নিজের মনকেই প্রশ্ন করেছি, ঘর-সংসারকে আমি ভয় পাই, না এই রেকর্ড সেকশনের ধুলোটে ফাইল আর ধোঁয়াটে মানুষগুলোকে ভালোবাসি?

উত্তর খ'ুজে পাইনি। উত্তর খ'ুজে খ'ুজেই বছরের পর বছর কেটে গেছে, কেটে চলেছে। কিন্তু সেদিন গৌরীর ফুটফুটে ছেলেটাকে দেখে এত ভালো লাগলো, এমন মিষ্টি মুখখানা, একুশ বছরের বাচ্চা ছেলে মানিক যেদিন আপিসে জয়েন করলো, সেদিন যেমন ভালো লেগেছিলো, ঠিক তেমনি...

[১৩৬৬



আমি, আমার স্বামী ও একটি নুলিয়া

আমার একেবারেই ইচ্ছে ছিলো না। বড় জা জোর করে ঠেলে পাঠালো। বললে, 'নতুন, অত লজ্জা দেখাসনি। ঐ লজ্জা করে করেই আমরা সব হারিয়েছি, এখন তোদের দেখলে শুধু হিংসেয় জ্বলে-পুড়ে মরি।' বড় জা আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। তাই বিয়ের পর যেদিন প্রথম আলাপ হলো, আমি বয়সের এবং সম্পর্কের মান রাখবার জন্য প্রণাম করলাম, সেদিন থেকেই বড় জা আমাকে 'তুই' বলতে শুরু করেছিলো। আর যেহেতু আমি ওর ছোট দেওরের বউ অর্থাৎ বাড়ির একেবারে আনকোরা নতুন বউ, সেই হেতু আমার নাম হলো, 'নতুন'। তা বড় জা বললে, 'দেখ্ নতুন, যা কিছু ফুর্তিটুর্তি এখন করে নে, এর পর তো সারাটা জীবন আমাদের মতো হাঁড়ি ঠেলতে হবে।' আমার তখন সবে বিয়ে হয়েছে, অনভ্যাসের ঘোমটা টানতেও কেমন হাসি-হাসি পায়। তাই বড় জা-র খোলাখুলি কথাগুলো শুনে কেমন লজ্জা-লজ্জা করতো। কিন্তু বড় জা দমবার পাত্র নয়। তার দেওরটিকে বললে, 'ছোট্ ঠাকুরপো, নতুনকে নিয়ে পুরী কি দার্জিলিঙ কোথাও বেড়িয়ে এসো দিন কয়েকের জন্যে। ওই যে হনিমুন না কি বলে, আমরা কি ছাই জানি আজকালকার রীতিনীতি।' তা শুনে এমনভাবে হাসলো গৌতম, তাকালো আমার দিকে যে বেশ বুঝতে পারলাম অমন একটা ইচ্ছে ওরও যে না হচ্ছে তা নয়। গৌতমের গোপন ইচ্ছেটা বুঝতে পেরে—না, আজকালকার মেয়েদের মতো ওকে নাম ধরে ডাকতে আমি পারি না, পুরোনো দিনের বউদের মতোই আড়েঠারে বুঝিয়ে দিই, তবু সত্যি কথা বলতে কি, মনে মনে ওর নাম ধরে ডাকতে, নামটা মুখের মধ্যে লোফালুফি করতে বেশ লাগতো। কিন্তু বড় জা-র সামনে তো আর নাম বলতে পারি না। তাই বললাম, 'ওর ইচ্ছে হয় যাক, আমি যাবো না।' বড় জা রাগ দেখিয়ে বললে, 'ওরে আমার লজ্জাবতী লতা, যাবার ইচ্ছে নেই! যা বলছি, শোন নতুন, দুটিতে দিন কয়েক কোথাও গিয়ে—'

ঠেলেঠুলেই একরকম পাঠিয়ে দিলে। আমি আর গৌতম এসে উঠলাম পুরীর একটা হোটেলে। একেবারে সমুদ্রের গা ঘে'ষে। সমুদ্র আমি আগে তো কখনো দেখিনি। দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। অভিভূত হয়ে গেলাম। সমুদ্র এত সুন্দর! সমুদ্র এমন বিশাল! মনে হলো, কোথায় ছিলাম আমি এতদিন! এমন একটা রূপের পৃথিবী আছে আমি জানতামই না? আমার বুকের মধ্যেও যেন খুশির ঢেউগুলো গুরগুর করতে করতে ফুর্তিতে ফেটে পড়তে লাগলো। ছেলেমানুষের মতো আমার নাচতে, গাইতে, ছুটে যেতে ইচ্ছে হলো ঢেউগুলোর কাছে। কিন্তু তা না করে আমি গৌতমের উপর খুশী হয়ে উঠলাম, ঠায় ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি-মিষ্টি হাসি হাসতে লাগলাম। আর ওর সুন্দর চোখ জোড়ার দিকে, চোখের তারা দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার কেমন ভাবতে ভালো লাগলো, ওর চোখ দুটো যেন সমুদ্রের মতো নীল, সমুদ্রের মতো গভীর, সমুদ্রের মতো বিশাল। আনন্দে আহ্লাদে ওর চোখের দুটি সমুদ্রে ডুবে যেতে ইচ্ছে হলো, হারিয়ে যেতে ইচ্ছে হলো।

ও বললে, 'কি দেখছো অমন করে?' ওর বোধ হয় একটু অস্বস্তি লাগছিলো। লাগবারই

কথা। কেউ একজন হাতে চিবুক রেখে ঠায় মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে অস্বস্তি লাগবে না?

কিন্তু আমি কি করবো। আমাকে তখন দুষ্টুমিতে পেয়েছে। বললাম, 'সমুদ্দুর দেখছি।'

ও কেমন অপ্রতিভ হলো, হাসলো। বললে, 'আমি কি সমুদ্র নাকি?'

আমি আরো দুষ্টুমি করে সুর দিয়ে গেয়ে উঠলাম, 'তুমি হও গহীন গাঙ, আমি ডুইব্যা মরি!'

ও তিনটে আঙুলের হালকা থাপ্পড় দিলে আমার গালে। আমি খিলখিল করে হেসে উঠেই ছুটে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। বালির ওপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে গিয়ে দাঁড়ালাম একেবারে সমুদ্রের ধারে, বালির ওপর যেখানটাতে ঢেউগুলো ফেটে ফেটে ফেনা হয়ে পড়ছে, সেখানে।

না, ঠিক অত দূর নয়। ঢেউয়ের অত কাছে যেতে আমার কেমন ভয়-ভয় করলো। আমি তো তার আগে সমুদ্র দেখিনি।, তাই অমন সুন্দর ঢেউগুলোকে যেমন ভালোও লাগলো তেমনি কাছে যেতেও কেমন একটা আতঙ্ক বোধ করলাম। অচেনা মানুষের কাছে যেতে হলে যেমন ভয়-ভয় করে, তেমনি। ঠিক কেমন, বলবো? ফুলশয্যার রাতটার মতো। ভালোও লাগছে, মনের মধ্যে বেশ একটা খুশির গুনগুন, আবার অচেনা মানুষ গৌতমের এত কাছে যেতে হবে ভেবে কেমন এক ভয়-ভয় ভাব।

হঠাৎ চমকে উঠে ফিরে তাকিয়ে দেখি কি গৌতমও এসে দাঁড়িয়েছে একেবারে আমার পাশটিতে, গা ঘেঁষে। আর আমারই মতো তাকিয়ে আছে সমুদ্রের দিকে।

ছোট ছোট এক-একটা দল পাড় ঘেঁষে হেঁটে যাচ্ছিলো। মেয়ে পুরুষ, ছোট ছোট বাচ্চা ছেলেমেয়ে। যেই ঢেউ এসে পড়ছে, দু-একজন ছুটে যাচ্ছে সাদা ফেনায় পা ডোবাতে। ওদিকে জেলেদের ডিঙির সারি পড়ে আছে বালির ওপর, আর বালির ওপর বসে বসে বড় বড় জাল-গুলো মেরামত করছে জেলেরা।

--এই, ওরা কি কুড়োচ্ছে, কি? আমি জিগ্যেস করলাম।

ও বললে, ঝিনুক।

ও মা, তাই নাকি! আমিও ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম, ছোট বড় নানারকমের, সাদা আর রঙিন ঝিনুকের রাশি এসে পড়ছে ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে। ঢেউ সরে গেলেই সেগুলো চিকচিক করছে বালির ওপর। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই দেখলাম। কুড়োতে কেমন লজ্জা হলো। আমার বয়েসী অনেক মেয়েই ঝিনুক কুড়োতে কুড়োতে এগিয়ে যাচ্ছিলো। আমি কেমন লজ্জা পাচ্ছিলাম। কারণ যারা সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলো, তারা ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিলো আমার দিকে। মেয়েরাও। আমি দেখতে খুব সুন্দর, আমার চোখ দুটো টানা-টানা, আমার ঘাড়টা কি চমৎকার, আমার ফরসা সুডোল হাত দেখলে নাকি হাত বোলাতে ইচ্ছে করে, এমনি সব কথা বলে ইস্কুলের বন্ধুরাও আমাকে খেপাতো, কলেজের মেয়েরা প্রশংসা করতো। কিন্তু সমুদ্রের পাড় দিয়ে যেতে যেতে ওরা যখন বারবার ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিলো তখন বেশ বুঝতে পারছিলাম রূপ দেখছিলো না ওরা। বয়স-হওয়া দুটি মহিলার হাসি দেখেই বুঝলাম ব্যাপারটা। আসলে ওরা বুঝতে পারছিলো আমাদের সবে বিয়ে হয়েছে। ও ঠিক বোঝা যায়, আমি নিজেও তো কত মেয়েকে দেখেই ধরে ফেলতাম। বিয়ের পর চেহারাটাই কেমন অন্যরকম অন্যরকম লাগে। তা ছাড়া সিঁথিতে সিঁদুরও বোধ হয় একটু বেশী দিয়ে ফেলতাম তখন। একটু বেশী দূর অবধি।

ওরা তাকাচ্ছিলো বলে লজ্জা নয়, সবে বিয়ে হয়েছে বলে লজ্জা নয়, বরং মজাই লাগছিলো। তবে লজ্জা হচ্ছিলো ঝিনুক কুড়োতে, ওদের সামনে ওদের মতো ঝিনুক কুড়োতে। কিন্তু সে আর কতক্ষণ। একসময় দেখলাম, নিজেরই অজান্তে কখন হাসতে হাসতে আমিও ঝিনুক কুড়োতে শুরু করেছি, ঢেউয়ের ফেনায় পা ডুবিয়ে হাঁটছি। আর ঢেউ লেগে কাপড় ভিজে যাবে বলে কাপড়টা এক বিঘত তুলে ধরেছি। লজ্জা দূর হয়ে গেছে, ভয় ভেঙে গেছে তখন।

হাঁটতে হাঁটতে একটু অনুভবেই বুঝতে পারছিলাম যে গৌতম পিছন পিছন আসতে আসতে আমার ফরসা পা—পায়ের উন্মুক্ত অংশটুকুর দিকে তাকাচ্ছে।

এক বিঘত পা উন্মুক্ত করে হাঁটা এক জিনিস, আর সমুদ্রে স্নান করা অন্য। স্বামী

বলেই তো বেশী অস্বস্তি। তা ছাড়া অত লোকের সামনে! না বাবা, আমি সমুদ্রে স্নান করবো না।

পরের দিন সকাল থেকেই নুলিয়াটা পিছনে লাগলো।—সমুন্দরে নাহাবে না দিদি।

ও বলে উঠলো, না, না, নুলিয়া লাগবে না। আমি কি নতুন নাকি এখানে! আরো কতবার এসেছি।

সত্যি, গৌতমের ওপর এত হিংসে হচ্ছিলো। ও কতবার এসেছে, অথচ আমি কিনা এই প্রথম! এমন চমৎকার জায়গা ছেড়ে কোথায় ছিলাম এতদিন? যাক, এসেছি যখন চোখ ভরে দেখে নিই, প্রাণ ভরে নিশ্বাস নিই।

যেখানটায় সকলে স্নান করছিলো সেইখানটায় এসে বালির ওপর বসলাম দুজনে। স্নান করতে করতে সবাই হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে। ঢেউ লেগে বালিতে লুটোপুটি খাচ্ছে মেয়েরা, দু-একজন পুরুষ ঢেউয়ের মাথায় লাফাতে লাফাতে অনেক অনেক দূর অবধি চলে যাচ্ছে। আর তারও ওদিকে, অনেক দূরের অথই জলে কালো-কালো ক্ষুদে-ক্ষুদে কয়েকটা ডিঙিতে করে মাছ ধরছে নুলিয়ারা। পাড় থেকে কেউ বা ডিঙি ভাসাবার চেষ্টা করছে, বারবার ফিরে আসছে ঢেউ লেগে।

ও বললে, কি, সমুদ্রে স্নান করবে না?

আমি আতঙ্কে হাত নেড়ে বলে উঠলাম, না বাবা, অত শখ নেই আমার।

—আরে দূর, ভয়ের কিছু নেই। আমি নিয়ে যাবো তোমাকে, দেখো। গৌতম বললে—এমনভাবে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, যেন উনিও একজন নুলিয়া, সমুদ্রের সঙ্গে এত চেনা-শোনা।

আমি মনে মনে বললাম, তোমাকেও আমি নুলিয়া না নিয়ে একা নামতে দেবো কিনা। বিয়ের পর বউয়ের কাছে সবাই অমন শিভালরি দেখাতে চায় গৌতমবাবু, আমি তা জানি।

মনে মনে এ কথা ভাবতে ভাবতে আমি হঠাৎ ঠাট্টার সুরে ডাকলাম, ও গৌতমবাবু!

ও ফিরে তাকালো।

বললাম, কি দেখছেন স্যার?

—সমুদ্র।

বললাম, উঁহু। আমি জানি।

—কি?

হেসে উঠে বললাম, বলবো না।

সত্যি, মেয়েরা যে কি করে স্নান করছিলো আমার নিজেরই অবাক লাগছিলো। কখনো বালিতে গড়িয়ে পড়ছে, কাউকে স্রোতের টানে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কারো কাপড়চোপড়—

একজনের অবস্থা দেখে তো আমি আর গৌতম হেসে লুটিয়ে পড়লাম। বেচারা শাড়ি-খানা হাতে নিয়েই টুপ করে বসে পড়লো গলা অবধি জলে ডুবিয়ে। কি করবে, জলের তোড়ে লাজলজ্জা রাখা দায়। আর কাপড়-জামা নামেই আছে, জলে ভিজে এমন অবস্থা, শরীরের কিছুই চাপা-ঢাকা থাকে না। পুরুষগুলোও কেমন ক্যাটক্যাট করে তাকিয়ে আছে দেখো।

আমি ইয়ারকির ছলে গৌতমের চোখের দিকে তাকালাম।—এই। কি দেখছো মশাই অমন ড্যাবড্যাব করে?

ও হাসলো। আর আমি ভাবলাম, ওদের মতো ওভাবে সমুদ্রের জলে নামতে পারবো না আমি এত লোকের সামনে। গৌতমের সামনে।

কিন্তু ইচ্ছেও যে না হচ্ছিলো তা নয়। এক-একবার ভাবছিলাম, মন্দ হয় না। বেশ তো জলে লুটোপুটি খাওয়া যায়। বিয়ের আগে এই তো সেদিনও ঝমঝম বৃষ্টি পড়ছে, আমরা দু বোন ছাদে গিয়ে ভিজলাম। তবে হ্যাঁ, নুলিয়া না নিয়ে নামতে পারবো না। ওদের মতো নুলিয়াটাকে হাত ধরতে দেবো না অবশ্য। মেয়েগুলো অমনভাবে নুলিয়াদের হাত ধরেই বা যাচ্ছে কেন ঢেউ কেটে কেটে! টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যাবে, ভেসে যাবে, এই ভয়? তা একটু দূরেই নয় থাকবে নুলিয়াটা। না, এত দূর এসে সমুদ্রে স্নান না করে গেলে মনে খুঁতখুঁতুনি থেকে যাবে। বড় জা হয়তো জিগ্যেস করবে, হ্যাঁ রে নতুন, সমুদ্রে নেয়েছিস তো রোজ? তারপরও অবশ্য ইয়ারকি-ঠাট্টা করবে তা জানি। বড় জা অবশ্য বলেছিলো, আগে

নাকি এসেছিলো একবার রথের সময়। ননদরাও। এবার ওরা যদি সবাই আসতো ভালো হতো। সবাই মিলে সমুদ্রে স্নান করা যেতো। বড় জা বেশ ভালো মানুষ। সত্যি, আমি কত সুখী, কত সুখী। কারো জীবনে যে এত সুখ থাকে বিয়ের আগে কল্পনাও করতে পারিনি।

গৌতম হঠাৎ হেসে উঠলো হো-হো করে। তন্ময়তা ভেঙে গেল। সামনে তাকাতেই আমিও হেসে উঠলাম। ভীষণ মোটা একটা লোক সমুদ্রে নামছিলো, প্রথম ঢেউ লেগেই কাত। ফুটবলের মতো গড়াতে গড়াতে ফিরে এলো বালির ওপর হুমড়ি খেয়ে।

আরে, এর মধ্যে এত চড়া রোদ উঠে গেছে? বালি তেতে উঠেছে।

—কি, নামবে না? গৌতম জিগ্যেস করলো।

আমি সায়ও দিলাম না, অমতও করলাম না। ভেতরে ভেতরে যে একটু ইচ্ছে না হচ্ছিলো তা নয়। গৌতম বললে, চলো, তা হলে তেল তোয়ালে নিয়ে আসি, কাপড়টা বদলে আসি।

উঠে পড়লাম। হোটেলের নুলিয়াটা আবার সেলাম করলে।—নাহাতে যাবে না দিদি?

বললাম, যাবো, দাঁড়াও।

গৌতম বলে উঠলো, না, না, নুলিয়া লাগবে না। আমি একাই পারবো তোমাকে সামলাতে।

আমার অবশ্য নিজের জন্যে তত ভয় হচ্ছিলো না, ভয় হচ্ছিলো ওর জন্যেই। বললাম, থাক না একজন সঙ্গে। সবাই তো নুলিয়া নিয়েই নামছে।

তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলো গৌতম, আমার কথাটাকে কোনো আমলই দিলো না। হেসে বললে, তুমি দেখছি সাজুন্তির চেয়েও ভীতু!

আমি কি যেন বলতে যাচ্ছিলাম, থেমে গেলাম। কারণ আমাদের দোতলার ঘরটির পাশের সিঁড়ি বেয়ে তেতলার সেই বউটি, যার সাজগোজের ঘটা দেখে আমরা 'সাজুন্তি' নাম দিয়েছিলাম, তাকে নেমে আসতে দেখলাম। পিছনে তার স্বামী।

চোখোচোখি হতেই বউটি হেসে বললে, যাবেন না সমুদ্রে স্নান করতে?

কি আশ্চর্য, ওই বউটা—যে কাপড় ভিজে যাবে এই ভয়ে ঝিনুক কুড়োবার সময়েও ঢেউয়ের কাছে যেতো না, সেও চলেছে সমুদ্রে স্নান করতে? একটা সাদাসিধে শাড়ি পরেছে, গোলাপী রঙের টার্কিশ তোয়ালেটা বাঁ কাঁধ থেকে ডান কাঁধ অবধি ছড়িয়ে দিয়েছে সুছন্দ বুকের ওপর দিয়ে, এক রাশ ফাঁপানো চুলে ঢেকে গেছে সারা পিঠ।

নিজের অজ্ঞাতেই আমি গৌতমের দিকে তাকালাম। চোখ সরিয়ে নিলে ও, আর বউটির প্রশ্নের জবাবে, হেসে বললে, তখন থেকে তো ভয় ভাঙাবার চেষ্টা করছি।

আমি হাসলাম বটে, কিন্তু মনে মনে চটে গেলাম গৌতমের ওপর। আমি সমুদ্রকে ভয় পাই এ কথাটা বউটিকে না শোনালেই কি চলতো না? আর গৌতম বউটির দিকে অমন মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে ছিলোই বা কেন? না-হয় আমার চেয়ে একটু সাজগোজ বেশীই করে, দেখতে কি আমার চেয়ে সুন্দর?

বউটি এবং তার স্বামী হাসতে হাসতে নেমে গেল। আমি চুল খুলে কাপড় বদলে নেমে পড়লাম একটাও কথা না বলে। গৌতম পিছনে পিছনে।

নুলিয়াটা আবার ধরলো বেরুবার মুখে।

গৌতম বললে, না, না, লাগবে না।

আসলে ওর মনে প্রথম থেকেই একটা বাহাদুরি দেখাবার নেশা ঢুকেছিলো বেশ বুঝতে পেরেছিলাম। ও যেন সব জানে, সব বোঝে, সব পারে। প্রথম প্রথম ওর এই ভাবটা আমার বেশ ভালোই লাগছিলো। বেশ একটা নির্ভর করবার মতো মানুষ যেন। কিন্তু যেখানে সত্যিই ভয় আছে সেখানে এই বাহাদুরির কি দরকার। দু আনা পয়সা তো, তার বেশী আশাও করে না নুলিয়াটা। কিন্তু পয়সার জন্যে তো নয়, বরং পয়সা খরচ করতে পেলেই যেন খুশী হয় গৌতম। আসলে ওই অকারণ টাকা খরচ করার মধ্যেও যেন কি একটা বাহাদুরি লুকিয়ে আছে। বেশ বুঝতে পারতাম, ও যেন আমার চোখে—তার নবপরিণীতা স্ত্রীর চোখে নিজেকে বড় করে তোলবার ফিকির খুঁজছে। কখনো অপ্রয়োজনে টাকা খরচ করে, কখনো সমুদ্রকে তুচ্ছ করে, কখনো বা হোটেলের ঠাকুর-চাকরকে ধমক দিয়েও বোধ হয় আমার কাছে ওর মূল্য বাড়াবার চেষ্টা করছিলো।

নুলিয়াটা কিন্তু নাছোড়বান্দা। ফিরে তাকিয়ে দেখলাম সে এসে দাঁড়িয়ে আছে একটু

দূরে।

গৌতম যখন ওকে তুচ্ছ করে আমার হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যেতে গেল, নুলিয়াটা তখন শুধু বললে, কারিণ্ট আছে বাবু।

কিন্তু কে শোনে তার কথা। গৌতম টানতে টানতে আমাকে তখন জলে নামিয়ে নিয়ে গেছে। ওর হাত ধরে ধরেই ঢেউয়ের ঘা খেতে খেতে ভয়ে ভয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। কিছুটা গিয়ে আর সাহস হলো না। ও যত এগিয়ে যেতে চায় আমি তত বাধা দিই। শেষে হাল ছেড়ে দিলে ও, বললে, বেশ, তবে তুমি উঠে যাও, আমি একটু পরে উঠবো।

তখন ওর কথা আর কে ভাবে, নিজে পালিয়ে বাঁচতে পারলে হয়।

পাড়ে উঠে এসে চীৎকার করে বললাম, এই! বেশী দূর যেয়ো না।

কিন্তু বললেই কি আর শোনে। ঐ যে বললাম, ওর মনে তখন বাহাদুরি দেখানোর নেশা ঢুকেছে। বিয়ের পর তখন একটা মাসও কাটেনি, এ সময়ে নতুন বউটির চোখে নিজেকে নেপোলিয়ান বানানোর ইচ্ছা কোন স্বামীর না হয়। ও তাই আমার কথায় কান দিলো না।

আমার অবশ্য যেমন ভয়ও করছিলো, তেমনি ভালোও লাগছিলো। সাজুন্তি ইতিমধ্যে স্নান সেরে ভিজে কাপড়ে এসে দাঁড়িয়েছে আমার পাশে, আর তার স্বামীটি স্নান করছে তখনো, কিন্তু নুলিয়ার হাত ধরে। তাকে দেখে আমি হেসেই ফেললাম। মেয়েমানুষেরও অধম, কি ভীতু রে বাবা ভদ্রলোকটা। মনে মনে ভয় পেলে কি হবে, গর্বও হচ্ছিলো গৌতমের জন্যে। ও একা-একাই কত দূর এগিয়ে যাচ্ছে দেখো!

একটার পর একটা ঢেউয়ের মাথায় লাফ দিয়ে, কখনো ঢেউ ভেঙে পড়ার মুহূর্তে টুপ করে ডুব দিয়ে ও তখন অনেক দূরে চলে গেছে। আমি চীৎকার করে ডাকলাম একবার, বোধ হয় শুনতে পেলো না।

এ কি, এত দূরে চলে যাচ্ছে কেন ও? এত দূর চলে গেছে তখন গৌতম, যেখানে আশে-পাশে আর একটিও লোক নেই।

সাজুন্তির স্বামী ততক্ষণে উঠে এসেছেন, আর বউটি গৌতমের দিকে আঙুল দেখিয়ে তার স্বামীকে বললে, দেখো, দেখো, উনি কত দূর গেছেন।

বউটির চোখের দৃষ্টিতে, গলার সুরে সপ্রশংস ভাবটুকু দেখে গর্বে বুক ফুলে উঠলো আমার। সত্যি, গৌতম যেন মুহূর্তের জন্যে নেপোলিয়ানের মতো বীর হয়ে উঠলো আমার চোখে।

কিন্তু সাজুন্তি আর তার স্বামী হোটেলের দিকে চলে যেতেই আমার বুকের ওপর একটা আতঙ্কের পাথর চেপে বসলো।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই আমার মনে হলো, গৌতম যেন নিজে ইচ্ছে করে এগিয়ে যাচ্ছে না, গৌতম বুঝি বা স্রোতের টানে তাল রাখতে না পেরে ভেসে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তাই। হাত তুলে বারবার যেন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে। যেন হাত তুলে চীৎকার করে বলছে, আমাকে বাঁচাও।

অত দূর থেকে তার চীৎকার এসে পৌঁছানোর কথা নয়। কিন্তু সমস্ত শরীর যেন মুহূর্তে থরথর করে কেঁপে উঠলো আতঙ্কে, ভয়ে। মনে হলো, গৌতম ভেসে যাচ্ছে, স্থির মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

বিভ্রান্তের মতো আমি এদিক-ওদিক তাকালাম, কি করবো ঠিক করে উঠতে পারলাম না, নুলিয়াটাকে খুঁজলাম।

লোকটা ঠায় দাঁড়িয়ে আছে তখনো। অন্যমনস্কভাবে কি যেন দেখছে।

সমস্ত শরীর শিউরে উঠলো আমার, চোখ ঠেলে কান্না এলো। পাগলের মতো হয়ে গেলাম আমি। ছুটে গেলাম নুলিয়াটার কাছে। তারপর মুহূর্তের মধ্যে আমার দু হাতের দুটো বালা খুলে তার হাতে গুঁজে দিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে অনুরোধ করলাম, ওকে বাঁচাও তুমি, বাঁচাও। ঐ দেখো ভেসে যাচ্ছে, ডুবে যাচ্ছে...

ঠিক কি বলেছিলাম, কিভাবে বলেছিলাম, নিজেও জানি না। সেই মুহূর্তে আমার মাথার ঠিক ছিলো না।

কিন্তু নুলিয়াটার মাথার ঠিক ছিলো। সে বালা দুটো আমার হাতেই গুঁজে দিয়ে একবার

তাকালো গৌতমের দিকে। বিড়বিড় করে কি যেন বললে, তারপর সমুদ্রের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

উঃ, সে যে কি উৎকণ্ঠায় এক ঘণ্টা কেটেছে, আজ ভাবলেও সারা শরীর ঘামে ভিজে যায়, ঘুম আসে না কোনো কোনো দিন।

নুলিয়াটা একটু একটু করে এগিয়ে চলেছে. একটার পর একটা ঢেউ পার হচ্ছে, আর আমার মনে হচ্ছে যেন কত সময় পার হয়ে যাচ্ছে। বালির ওপর এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অবধি নিষ্ফল ছোটাছুটি, নিজেরই অজ্ঞাতে কখন আমিও জলের কাছে এগিয়ে এসেছি...

একটার পর একটা ঢেউ পার হচ্ছে নুলিয়াটা. আর আমার মন বলছে. পারবে না, পেণছতে পারবে না নুলিয়াটা. গৌতমকে বাঁচানো যাবে না।

এক নিমেষের জন্যে গৌতমের শরীরের কালো বিন্দুটুকু একটা মাতাল ঢেউয়ের মাথায় উঠেই অদৃশ্য হয়ে গেল। আর আমার পা দুটো থরথর করে কেঁপে উঠলো, মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠলো, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হলো, চোখের দৃষ্টি হঠাৎ ঝাপসা হতে হতে সামনের সব কিছু অন্ধকার হয়ে গেল. সমুদ্রের গর্জন আর স্নানার্থীদের চীৎকার কোলাহল একটু একটু করে স্তব্ধ হয়ে গেল...আমি কি অন্ধ হয়ে যাচ্ছি, আমি কি কানে শুনতে পাবো না আর?... বীভৎস একটা আতঙ্কে চীৎকার করে কেঁদে উঠতে চেষ্টা করলাম আমি. তারপর বোধ হয় বসে পড়লাম বালির ওপর, কিংবা পড়ে গেলাম. কিংবা...

কি যে হয়েছিলো আমি জানি না।

একটু একটু করে যখন জ্ঞান ফিরে এলো, দেখলাম এক রাশ লোক আমাকে ঘিরে আছে। মুখের সামনে ঝুঁকে পড়ে অচেনা এক ভদ্রমহিলা বাতাস করছেন আমাকে, আর নুলিয়াটা চোখের পাতা খুলতে দেখে একমুখ হাসি নিয়ে বলছে. বাবুকে জান বাঁচায় দিয়েছি, দিদি. বাবু বাঁচ গেছে।

ধীরে ধীরে আমি উঠে বসলাম। দেখলাম. পাশে বসে ক্লান্তিতে অবসন্নতায় গৌতম তখনো ধুঁকছে।

ক্লান্ত অবসন্ন শরীর টানতে টানতে. নুলিয়াটার কাঁধে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে হোটেলে ফিরে এলাম। ফিরে এসে বিছানায় লুটিয়ে পড়লাম। ঘুম. ঘুম. পরম তৃপ্তির ঘুম।

বিকেলের দিকে যখন হোটেলের সামনের বারান্দাটায় দুখানা চেয়ার টেনে নিয়ে এসে আমরা বসলাম, তখন আমার শরীরের ক্লান্তি দূর হয়েছে. কিন্তু গৌতমের সারা দেহে তখনো ব্যথা, অসহ্য ব্যথা। দৈত্যের মতো শক্তিশালী অবিশ্রান্ত ঢেউয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে করে পরাজিত সৈনিকের মতো ক্লান্ত আর লজ্জিত সে। মুখ তুলে তাকাতেও লজ্জা।

ইতিমধ্যে গুজবটা রটে গিয়েছিলো সারা হোটেলে। সকলেই একবার করে এসে সমবেদনা জানিয়ে যাচ্ছিলো, খোঁজ নিয়ে যাচ্ছিলো গৌতম কেমন আছে, আর লজ্জায় অস্বস্তিতে আমি মাটিতে মিশে যেতে চাইছিলাম। মনে হচ্ছিলো, এই সমুদ্র ছেড়ে, এই হোটেল ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারলে যেন বাঁচি।

একসময় সাজুন্তি আর তার স্বামী এসে দাঁড়ালো পিছনে।—কেমন আছেন?

গৌতম অপ্রতিভ হাসি হেসে তাকালো, বললে, ভালো। তারপর মাথা নিচু করলে।

আর ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে আমার মনে পড়ে গেল তাঁকে নুলিয়ার হাত ধরে স্নান করতে দেখে আমরা হেসেছিলাম। পাশাপাশি দুজনকে তুলনা করে গৌতমের দুঃসাহসের জন্যে গর্ববোধ করেছিলাম।

ওরা চলে গেল। আমাদের চোখের সামনে দিয়েই সমুদ্রের পাড়ে গিয়ে দাঁড়ালো।

আর তখনই চোখোচোখি হলো নুলিয়াটার সঙ্গে। সামনের রাস্তাটা দিয়ে যেতে যেতে সে ফিরে তাকালো আমার দিকে, হাসলো, সেলাম করলো। তারপর চলে গেল নিজের কাজে। আর আমার সমস্ত মন কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়লো। ও না থাকলে আজ কি যে হতো। গৌতম বাঁচতো না, আমি বাঁচতাম না। হ্যাঁ, মৃত্যুই তো বলবো তাকে। বিয়ের পর একটা মাসও যেতে না-যেতে যদি আমার বাইশ বছরের যৌবন থমকে থেমে যেতো তা হলে তাকে মৃত্যু ছাড়া আর

কি বলবো!

নিজেরই অজান্তে কখন যে হাতের তিন ভরি সোনার বালা দুটোয় হাত দিয়েছি টের পাইনি।

সচেতন হতেই একটা খুশির দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। ভাবলাম, লোকটাকে এখনই ডেকে বালা দুটো দিয়ে দিলে হতো। ও আমার জন্যে যা করেছে, যা দিয়েছে, তার কাছে এটুকু দান কত তুচ্ছ!

কিন্তু লোকটা তখন অনেক দূর চলে গেছে। তাই ভাবলাম, থাক, এত তাড়া কিসের, লোকটা তো আর চলে যাচ্ছে না, কাল সকালে যখন আবার আসবে তখনই দিয়ে দেবো।

পরের দিন সকালে গৌতম আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলো। গত কালের সেই লজ্জা আর অস্বস্তি যেন ঝেড়ে ফেলেছে।

বললে, চলো, বেড়াতে যাবে না?

বললাম, চলো।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালাম সমুদ্রের পাড়ে, যেখানে অবিশ্রান্ত ঢেউ ফেটে পড়ছে তীরের ওপর, তা থেকে একটু দূরে। আগেকার মতো কাছে যেতে ইচ্ছে হলো না। না, ভয় নয়, কেমন একটা বিতৃষ্ণা।

হঠাৎ দেখলাম নুলিয়াটা আর একজনের সঙ্গে কাঁধে একটা লাঠিতে বিরাট জালটা ঝুলিয়ে যাচ্ছে আমাদের পাশ দিয়ে। চোখোচোখি হলো। ও হাসলো। আমিও।

ভাবলাম, এখনই দিয়ে দেবো বালা দুটো? কিন্তু এই বালা দুটো নিয়ে কিই বা করবে ও? ওর কাছে এ বালা দুটোও যা, দুগাছি চুড়িও তাই। নিয়ে ওর বউকে পরতে দেবে হয়তো, বিক্রি তো করবে না। আর চুড়ি দুটোর দামই বা কম কি? দুটোয় এক ভরি সোনা তো আছেই। তা ছাড়া, কৃতজ্ঞতার দাম তো সোনা দিয়ে যাচাই হয় না। আর বালা দুটো ওকে দিয়ে দিলে মা বকবে না তো! বড় জা? বলবে হয়তো, 'দু দিনের জন্যে গেলি নতুন, গিয়েই বালা জোড়া খুইয়ে এলি?' বলবে নিশ্চয়ই, কারণ বালার প্যাটার্নটা বড় জা-র খুব পছন্দ হয়েছিলো। তার চেয়ে এক জোড়া চুড়িই বরং দেওয়া যাবে নুলিয়াটাকে, ওর বউকে পরাতে বলবো।

কিন্তু এ জায়গাটা ছেড়ে পালাতে না পারলে যেন শান্তি নেই। আমরা দুজনে এই সমুদ্রের পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছি, অন্য সকলের মতো সমুদ্র দেখছি, কিংবা কিছুই দেখছি না। অথচ ঝিনুক কুড়োতে কুড়োতে যারাই যাচ্ছে, ফিরে তাকাচ্ছে আমাদের দিকে, আমার দিকে। আর তাদের সেই তীব্র দৃষ্টিতে আমি যেন উপহাস দেখতে পেলাম। যেন সকলেই হাসছে আমাদের দেখে। যেন বলাবলি করছে, যেমন বীরত্ব দেখাতে গিয়েছিলো, উচিত শাস্তি হয়েছে।

সাজুন্তির চোখেও যেন এমনি এক উপহাস লুকিয়ে ছিলো। সেই দুটি টানা-টানা কৌতুকে চঞ্চল চোখ, যে চোখ প্রশংসায় বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে বলে উঠেছিলো, 'দেখো, দেখো, উনি কত দূর গেছেন!' সেই চোখ জোড়া এখন যেন উপহাসে তীক্ষ্ন।

আমি গৌতমকে বললাম, চলো, কাল সকালেই চলে যাই। আমার আর ভালো লাগছে না।

গৌতম সায় দিলো, তাই চলো।

কিন্তু যাওয়া হলো না। স্টেশন থেকে ফিরে এসে গৌতম বললে, বার্থ পাওয়া গেল না। তিন দিন পরে একটা ব্যবস্থা হবে।

পরের পরের দিন সকালে নিত্যদিনের মতোই সাজুন্তি আর তার স্বামী নেমে গেল আমার চোখের সামনে দিয়ে। তেমনি বুকের ওপর গোলাপী তোয়ালেটা বিছিয়ে, এক-পিঠ এলো চুলে একটা অকারণ ঝাঁকুনি দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে আমাদের ঘরের সামনে বউটি থমকে দাঁড়ালো, কিন্তু স্নান করতে যাবো কি না সে প্রশ্ন না করেই নেমে গেল। অর্থাৎ ওরা লক্ষ করেছে যে আমরা ঐ দুর্ঘটনার পর আর সমুদ্রে স্নান করতে যাইনি। শুধু কি লক্ষ করেছে? হয়তো বলাবলি করেছে নিজেদের মধ্যে, হাসাহাসিও।

বউটির ওপর অকারণেই চটে গেলাম আমি। থামলোই যদি আমার চোখের সামনে তা হলে একটাও কথা বললো না কেন? ভাবলাম, আমিও আর কথা বলবো না ওর সঙ্গে, উত্তর দেবো না কোনো প্রশ্নের।

কিন্তু ওরা যখন স্নান সেরে ফিরছে, মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল সিঁড়ির বাঁকে। আর হঠাৎ কথার ফোয়ারা হয়ে উঠলো বউটি।—শুনেছেন? আজ আবার একজন ডুবে যাচ্ছিলো, একটা বুড়ো। নুলিয়ারা গিয়ে বাঁচালো তাকে।...কেউ ডুবে গেলে বাঁচানোর কাজ ওদের, নুলিয়াদের। শুনলাম গরমেণ্ট নাকি টাকা দেয় সেইজন্যে। সত্যি? নুলিয়ারা না থাকলে কি যে হতো।...আর আজ কি সাংঘাতিক জোয়ার ছিলো, দেখলেন না তো!

অনর্গল কথা, অনেক কথা বলে গেল বউটি। আমি শুধু ম্লান হাসলাম একটু। আর বউটি চলে যেতেই আমি গৌতমকে বললাম, এই! নুলিয়ারা নাকি টাকা পায় গরমেণ্টের কাছে, কেউ ডুবে গেলে বাঁচাবে বলে?

—কই, শুনিনি তো! গৌতম বললে।

আমি বললাম, হ্যাঁ, ওপরতলার বউটি যে বললে। ওই সাজুন্তি।

দুপুরে শুয়ে শুয়ে আমি ঐ কথাই ভাবছিলাম, আর আনমনে চুড়ি দুটো নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম। চুড়ির প্যাটার্নটা দিদি পছন্দ করেছিলো। দিদি! দিদির কথা মনে পড়লেই আমার এত ভালো লাগে। দিদির মতো আমাকে বোধ হয় আর কেউই ভালোবাসে না। গৌতমও নয়। বিয়ের যত ঝামেলা তো দিদিই মাথায় করে নিয়েছিলো। বাজার করা, ডেকোরেটর ডাকা, শ্বশুরবাড়ির লোকদের আদর-আপ্যায়ন।—বাবা বুড়ো মানুষ, কত দিক আর সামলাবেন? দাদাটা তো আড্ডা আর হকি-ক্রিকেট নিয়েই আছে।

দিদি বিয়ের পর একটা উপদেশ শুধু দিয়েছিলো। বলেছিলো, দেখ নমি, গায়ের গয়নাগুলো—বাবা যা দিয়েছেন তোকে-আমাকে, এগুলো লোক দেখাবার জন্যে নয়, সাজগোজের জন্যেও নয়। এগুলোই আমাদের ব্যাংক, আমাদের ভবিষ্যৎ। খেয়ালের বশে যেন এগুলো বিক্রি করিস না, হাজার অভাব-অনটন হলেও না।

আচ্ছা, অভাব-অনটন হলেও যা বিক্রি করতে নিষেধ করেছিলো দিদি, তা যদি নুলিয়াটাকে দিয়ে দিই তা হলে কি দিদি রাগ করবে? দিয়ে অবশ্য দেবো না। দিতে আমার নিজেরই তেমন ইচ্ছে এখন আর হচ্ছে না। কেন দেবো, সাজুন্তি যে বললে, ওরা গরমেণ্টের কাছ থেকে টাকা পায়। ডুবন্ত মানুষ দেখলে তাকে বাঁচানো তো ওদের কাজ। তা ছাড়া ডিঙি করে কত মাছ ধরে আনে ওরা, বিক্রি করে। নেহাত গরিবও ওরা নয়। এক-একজনকে স্নান করিয়ে দিতে দু আনা করে নেয়, তাতে কম টাকা রোজগার হয় নাকি ওদের! আমি অবশ্য অকৃতজ্ঞ নই। নুলিয়াটা সত্যিই তো গৌতমকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। ও না থাকলে, আজ কি দশা হতো আমার? কোন মুখ নিয়ে বাড়ি ফিরতাম? তা ছাড়া, সারা জীবনটাই তো নষ্ট হয়ে যেতো, এই বাইশ বছর বয়সে—। না, নুলিয়াটাকে কিছু একটা দিতেই হবে। আংটিটা দিলে কেমন হয়। আমার তো অনেকগুলো আংটি। চেনা-অচেনা অনেকেই তো আংটি দিয়েছে। মুক্তো-বসানো যেটা, সেটা অবশ্য দেবো না। আর জামাইবাবু যেটা দিয়েছে সেটা খুব সুন্দর দেখতে! ওটা রেখে দেবো। না রাখলে জামাইবাবু কি ভাববে? যদি কোনো দিন পরতে বলে। ওটা দিয়েছি শুনলে জামাইবাবু খুব দুঃখ পাবে। জামাইবাবু সত্যি খুব ভালোবাসে আমাকে, খুব। এক-একসময় মনে হয় দিদিকেও যেন অত ভালোবাসে না। তা অবশ্য সত্যি নয়। বউয়ের চেয়ে কেউ কি আর শালীকে বেশী ভালোবাসতে পারে? মোটেই না। জামাইবাবুটা ভারি ফাজিল, আর ভারি দুষ্টু। ও ইচ্ছে করেই অমন ভাব করে। আমি কি আর বুঝি না! দিদিকে রাগাবার জন্যেই অমনি করে। রাগলে দিদিকে খুব সুন্দর দেখায় কিনা।

রাগলে দিদিকে যে খুব সুন্দর দেখায়—আমি কিন্তু কোনো দিন লক্ষ করিনি। গৌতমই প্রথম বলেছিলো। সেই যে দিদির বাড়ি গিয়ে সব মিষ্টিগুলো খেতে পারেনি গৌতম, আর দিদি তাই রেগে গিয়েছিলো—তার পরই বলেছিলো ও, বলেছিলো, তোমার দিদি রেগে গেলে খুব সুন্দর দেখায় কিন্তু ওঁকে।

গৌতম রেগে গেলে আমার মোটেই ভালো লাগে না। তাই দু দিন পরে, যাবার আগের দিন বিকেলে ও যখন রুক্ষ গলায় বললে, জিনিসপত্তর গোছগাছ করছি না কেন, তখন আমার খারাপ লেগেছিলো। কই, বিয়ের পর থেকে একটা দিনও তো অমনভাবে কথা বলেনি ও। হঠাৎ এমন রাগ-রাগ ভাব কেন? আসলে ও বোধ হয় ভেবেছিলো আমার ফিরে যেতে ইচ্ছে নেই। আর ও তখন পালাবার জন্যে অধীর! প্রতি মুহূর্তে বেচারার মনে অদ্ভুত এক লজ্জা।

কিনা, সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছিলো লোকটা! ভাবলে আমার নিজের হাসি পায়। সত্যি, কি কান্ডটাই না করলো গৌতম। বড় জা বলেছিলো হনিমুন করে আসতে। ভালো হনিমুনই হলো বটে।

কিন্তু সারাটা বিকেল, সারাটা সন্ধ্যে কেমন গম্ভীর-গম্ভীর ভাব, সারা মুখ যেন থমথম করছে গৌতমের। অপ্রয়োজনে একটা কথাও যেন বলতে নারাজ। ওর এই মুখের ভাব দেখে কথাটা বলতে সাহস হলো না, অথচ ওকে না বলে তো আংটিটা দেওয়া যায় না।

ভাবলাম, থাক, কাল সকালে নিশ্চয় মনটা ভালো থাকবে ওর, তখনই বলবো। আর নুলিয়াটাও তো কাল সকালেই আসবে, তখনই দেওয়া যাবে গৌতমকে জিগ্যেস করে।

গৌতমকে জিগ্যেস করে আংটিটা দিতাম ঠিকই। আর গৌতম নিশ্চয়ই আপত্তি করতো না, কিন্তু পরের দিন সকালে যে এত তাড়াহুড়ো হবে আমি কি ছাই জানতাম।

সকালে ঘুম থেকে উঠতে এমনিতেই দেরি হয়ে গেল। অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিলাম টাইমপীসে, কিন্তু অ্যালার্মের দম দিয়ে রাখতেই ভুলে গিয়েছিলাম। তাই সেটাও বাজেনি, ঘুমও ভাঙেনি। যখন ঘুম ভাঙলো তখন আর এক ঘণ্টাও সময় নেই।

গৌতম চা খেয়ে চলে গেল হোটেলের হিসাব মেটাতে। ফিরে এসে বিছানাপত্তর গোছ-গাছ করতে লেগে গেলাম দুজনে। সংসার ছড়িয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে ছিলাম এ ক'দিন। টুকিটাকি জিনিসপত্তরগুলি তো নেহাত কম ছিলো না। আগের দিন কিছু কিছু বাঁধাছাঁদা হয়েই ছিলো, কিন্তু চিরুনি, টুথব্রাশ, পাউডার, দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম সব গুছিয়ে নিতে সময় লাগলো।

আর এসব করতে গিয়ে নুলিয়াটার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।

বাক্স-বেডিং সব রিকশায় তুলে সবে রিকশাওয়ালা প্যাডেলে পা দিয়েছে অমনি দেখি কি নুলিয়াটা আসছে সামনের রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে।

রিকশা চলতে শুরু করেছে তখন। আমাদের দেখতে পেয়ে একমুখ খুশির হাসি হাসলো নুলিয়াটা, সেলাম করলে। সেলাম করলো বোধ হয় বকশিশের লোভেই।

ছি ছি, একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম ওর কথা। এত খারাপ লাগলো আমার। রিকশা-ওয়ালাকে থামতে বললাম।

গৌতমকে বললাম, এই, দেখো তো তোমার ব্যাগটা, ওর বকশিশটা দেওয়া হয়নি। গৌতম বললে, টাকা তো তোমার বটুয়াতে।

তাই তো। খেয়ালই ছিলো না। আমার হাতেই তো বটুয়াটা। লাল ভেলভেটের ওপর সুন্দর নকশা-করা বটুয়াটা এখানেই কিনেছি—মন্দিরে যেদিন গিয়েছিলাম সেই পান্ডার ছড়িদারটার সঙ্গে, সেদিন।

বটুয়া খুলে দেখলাম, দশ টাকার নোটই চার-পাঁচখানা, খুচরো মাত্র দুটি টাকা আর কয়েক আনা পয়সা।

কি করি, স্টেশনে পেঁছেই তো রিকশার ভাড়া দিতে হবে। কুলির পয়সা দিতে হবে। সব খুচরোগুলো তো দিয়ে দেওয়া যায় না।

তাই একটা এক টাকার নোট বের করে নুলিয়াটার হাতে তুলে দিলাম। ও খুশী হয়ে সেলাম করলে। হাসলো। বললে, ফির আসবেন বাবু, সেলাম দিদি, সেলাম।

সেলাম জানিয়ে চলে গেল লোকটা। আর আমার এত ভালো লাগলো তাকে। এত ভালো।

ফিরে এসেই বড় জাকে বললাম, জানেন দিদি, নুলিয়াগুলো এত ভালোমানুষ, এমন চমৎকার!

বড় জা হাসলো। বললে, দেখিস নতুন, এত ভালো ভালো বলিস না, ঠাকুরপোর আবার হিংসে হবে।

আমি হেসে ফেললাম। তারপর বললাম, ও মা—আসল কান্ডটার কথাই তো বলিনি, রীতিমতো একটা কান্ড।

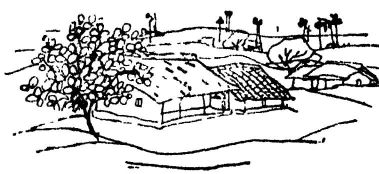
—কি কান্ড? চোখ কপালে তুললো বড় জা।

আমি বললাম, আপনার ঠাকুরপো আর একটু হলেই তো ডুবে যেতো। একটা নুলিয়া দেখতে পেয়েই সাঁতরে গিয়ে বাঁচালো। লোকটা নিজেই দেখতে পেয়েছিলো। ওরা তো সমুদ্রে চান করাতে দু আনা করে নেয়, আমি আসবার সময় কিন্তু একটা টাকাই বকশিশ দিয়ে

এসেছি।

বলতে বলতে হঠাৎ কেন জানি না একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, সেদিনের সেই আতঙ্কের দৃশ্যটুকু চোখের সামনে ভেসে উঠেছিলো। বড় জা কি যেন বললে, আর আমার তন্ময়তা ভেঙে গেল। ভাবলাম, সত্যিই কি বালা দুটো দেবো বলেছিলাম নুলিয়াটাকে? বোধ হয় না। সে সময় আমার কি মাথার ঠিক ছিলো? কি বলেছি, কি করেছি তা কি আর আমিই জানি! না, বালা-টালার কথা নিশ্চয়ই বলিনি। তা ছাড়া আমার বলা-কওয়ার জন্যে কি অপেক্ষা করে ছিলো নাকি নুলিয়াটা? কখনো না। আমি বলার আগেই হয়তো নুলিয়াটা দেখতে পেয়েছিলো। দেখতে পেয়েই সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। কেউ ডুবে গেলে তাকে বাঁচানো তো ওদের কাজ।

[১৩৬৭



তিনটি প্রশ্ন

তখন সবে দাঙ্গা থেমে গেছে। মানুষ-চলাচল শুরু হয়েছে এ-পাড়ায় ও-পাড়ায়। তবু মনের ক্লেদ সম্পূর্ণ মুছে যায়নি, ভিতরে ভিতরে সকলেই সতর্ক। এদিকে কাজকর্ম শুরু হয়েছে, দোকানপাট খুলেছে, তাই ব্যস্ততার মধ্যে সতর্ক ভাবটা মুছে যায়।

এমনি একটা দিনের কথা মনে পড়ছে।

বিকেল চারটে, কিংবা চারটেও বাজেনি হয়তো তখন। কলেজ স্ট্রীটের ফুটপাথে আর প্রেসিডেন্সী কলেজের রেলিঙে সাজানো পুরোনো বইয়ের প্রলোভনের যে নেশা ধরেছিলো ছাত্রজীবন থেকে, দীর্ঘদিনের বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে সব-প্রথমে তারই হাতছানি মনে পড়লো।

একা-একাই একটা দোতলা বাসে উঠে বসলাম। গিয়ে নামলাম কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে। আর বাস থেকে নেমে মনে হলো, না, শহরটা এখনো সহজ আর প্রকৃতিস্থ হয়নি। স্বাভাবিকতা ফেরেনি তখনো। কারণ রেলিংগুলো তখনো শূন্য, ফুটপাথ নিরাভরণ। শুধু ফাঁকে ফাঁকে বড় বড় বইয়ের দোকানগুলির বড় বড় দরজার সারি আধখোলা। দোকানে দোকানে কর্মচারীরা বসে আছে, খদ্দের নেই।

দু মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে ভাবলাম, কি করা যায়। এতখানি পথ এসে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে যেতেও ইচ্ছে হলো না।

শ্যামাচরণ দে স্ট্রীটের এক প্রকাশক বন্ধুর কথা মনে পড়লো। মাঝে মাঝে দু-চারজন সাহিত্যিক সেখানে এসে জমায়েত হন, অপ্রশস্ত ঘরখানিতে প্রশস্ত আড্ডা জমে। সুতরাং সেখানেই এক দফা ঢুঁ মেরে যাই।

গিয়ে দেখি স্যাঁতসেঁতে দেয়ালের গন্ধ আর গ্যামাক্সিনের গন্ধ মাখা ঘরটিতে বন্ধুটি চুপচাপ গালে হাত দিয়ে বসে আছেন।

খদ্দের না হোক, পাওনাদার ঢুকলেও যেন বন্ধুটি খুশী হয়ে উঠতেন। সব দোকানদারেরই তখন অবস্থা একই ধারা। তাই আমাকে পেয়ে যেন উল্লসিত হয়ে উঠলেন।

বললাম, একা-একা যে!

বন্ধুটি হাসলেন। বললেন, আরো দাঙ্গা করুন।

তাঁর কথা বলার ধরনই এই। যেন পৃথিবীর যাবতীয় অসৎ কর্ম তাঁর বন্ধুরা করছেন এবং তিনিই শুধু সৎ পথে রয়েছেন। তবে তাঁর কথা বলার এই বিচিত্র ধরনটির সঙ্গে পরিচিত বলেই আমি আপত্তি তুললাম না। আর তা দেখে বন্ধুটি দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার শুরু করলেন।

তারপর একসময় তিনি থামলেন।

প্রশ্ন করলাম, পুরোনো বইয়ের দোকানগুলো কি খুলবে না?

—কি করে খুলবে শুনি? বন্ধুটি আবার উষ্মা প্রকাশ করলেন। সমবেদনা জানিয়ে বললেন, গরিব বেচারীরা দুটো পয়সা 'করে' খায়, তাও সাহস করে এসে দোকান খুলতে পারছে না।

অনেকক্ষণ ধরেই এই একই ধরনের আলোচনা চললো, এবং শেষ পর্যন্ত আমরা দুজনেই স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম যে, দাঙ্গা কারও কোনো উপকারে আসে না।

অবশ্য এই আলোচনার পরই আমরা বেরিয়ে আসিনি। যথানিয়মে আলোচনা রাজনীতি, সাহিত্য ইত্যাদি কক্ষপথে বিচরণ করে সিনেমায় এসে থেমেছিলো। এবং তারপর আমরা আবিষ্কার করেছিলাম এক কাপ চা খাওয়া প্রয়োজন।

তাই দুজনেই এসে দাঁড়িয়েছিলাম হ্যারিসন রোডের মোড়ে। হয়তো মনে মনে ভাবছিলাম, কোন্ রেস্তোরাঁয় ঢোকা যায়।

রাস্তায় রোদ্দুরের তাপ তখন অনেকটা স্নিগ্ধ হয়ে এসেছে। ফুটপাথে ভিড় বেড়েছে। দু-একটা গাড়ি হর্ন বাজিয়ে যাচ্ছে থেকে থেকে।

রাস্তা পার হতে যাবো, হঠাৎ দেখি একখানা জীপ আসছে বিদ্যুৎবেগে, বিদ্যুতের মতোই তা আমাদের পার হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে একটি মেয়েলী কণ্ঠের চিৎকার ভেসে এলো চলন্ত জীপ থেকে।

একটি মুহূর্তের ঘটনা, কিন্তু আজ তার বর্ণনা দিতে গেলে একটা উপন্যাসের পরিধিতেও কুলোবে না।

তীব্র করুণ কণ্ঠের চিৎকার ভেসে এলো।—বাঁচান, আমাকে বাঁচান!

না, কথাটা স্পষ্ট শুনতে পাইনি, বুঝতে পারিনি। কিন্তু বিদ্যুৎবেগে ছুটে যাওয়া একটি জীপ গাড়ির ভিতর নারীকণ্ঠের আর্তনাদ এ ছাড়া আর কি কথা বলতে পারে। শুধু মনে আছে তার চিৎকারের শেষ দিকটা যেন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো। যেন কেউ তার মুখ চেপে ধরলো।

স্তম্ভিত বিস্মিত দৃষ্টিতে সেই চলন্ত জীপটার দিকে নির্বিকার তাকিয়ে রইলো দু-পাশের জনতা। আমরাও বিভ্রান্ত অবিচল দাঁড়িয়ে রইলাম।

যেমন বিদ্যুৎবেগে জীপখানা পশ্চিম দিক থেকে এলো তেমনি বেগেই চলে গেল শেয়ালদার দিকে। আর মনে হলো একটি ট্যাক্সি যেন তাকে ধাওয়া করেছে।

পাঁচটি মিনিটে রাস্তার দু-পাশের লোক যে যেখানে ছিলো স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইলো অবাক বিস্ময়ে। মনের মধ্যে একটা উত্তাল রহস্যের ঢেউ ফেটে পড়লো, একটা বেদনার তরঙ্গ।

তারপর দু-পাশের ভিড় আবার চঞ্চল হয়ে উঠলো। যে যার কাজে চলে গেল। আমরাও। কিন্তু মন থেকে সেই একটি কান্না-ভরা চিৎকার মুছে গেল না। সেই রহস্য আজও মনের মধ্যে উঁকি দিয়ে যায়। থেকে থেকে সেদিনের সেই চিৎকার যেন কানে ভেসে আসে। একটি অসহায় কণ্ঠের আবেদন—বাঁচান, আমাকে বাঁচান!

নির্জন নিঃসঙ্গ মুহূর্তে কত দিন সেই রহস্যের সমাধান খুঁজেছি। সেই চলন্ত জীপের চারজন আরোহীর মুখ এখনো ভাসা-ভাসা মনে পড়ে। কিন্তু, না, সেই মেয়েটির মুখ দেখতে পাইনি, শাড়ির প্রান্তটুকুও না।

আজও ভাবি, পিছনের ট্যাক্সিচালক কি জীপখানাকে ধরতে পেরেছিলো? একটি অসহায় নারীর সম্মান রাখতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছিলো কেউ? উদ্ধার পেয়েছিলো সেই মেয়েটি? কোনো দিন, কোনো দিন সে কি মুক্তির আলো দেখেছে?

না, এসব প্রশ্নের কোনো উত্তর আজও খুঁজে পাইনি। শুধু মনে পড়ে সেদিন আমরা

দু বন্ধু পরস্পরের সঙ্গে অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারিনি। আমরা দুজনেই যে চা খেতে বেরিয়েছিলাম, সে কথাও ভুলে গিয়েছিলাম কিছুক্ষণের জন্যে। তারপর একসময় স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মতো গিয়ে বসেছিলাম একটি চায়ের দোকানে। মুখোমুখি। কেউ কোনো কথা বলিনি, দুজনের মনের মধ্যে তোলপাড় চলছিলো। দু কাপ চা আমাদের দুজনের সামনে, অথচ চুমুক দিতে ইচ্ছে নেই।

অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ পরে বন্ধুটি বলেছিলেন, দাঙ্গাটা থামিয়ে না দিলেই হতো! বলে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিলেন সশব্দে!

২

আরেকটি দিনের কথা মনে পড়েছে। চাকরি না পেয়ে ব্যবসার চেষ্টা করছি তখন। আর পাঁচরকম ব্যবসার পাঁচ দরজায় কড়া নাড়তে নাড়তে হঠাৎ আচমকা হাতে কিছু টাকা এসে গেছে। তাই মনে মনে এবং কখনো কখনো খাতায় কলমে মতলব ভাঁজছি কি করে টাকাটা আরো লাভের ব্যবসায় খাটানো যায়।

এমন সময় ইস্কুলের সহপাঠী নিরঞ্জনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। নিরঞ্জন তখন ডাক্তারি পড়ছে, সেই বছরই তার ফাইনাল ইয়ার। বোধ হয় তার মাস কয়েক পরেই।

সব শুনে নিরঞ্জন বললো, ক'টা মাস অপেক্ষা কর্। ডাক্তার হয়ে বের হই, তারপর একটা ওষুধের দোকান খুলবো দুজনে, খুব লাভের ব্যবসা, বুঝলি?

প্ল্যানটা বেশ মনঃপূত হলো। বললাম, তাই হবে। তবে প্রথমটা একটু ছোট করে করবো, তারপর...

তারপর কি কি করবো, দিনে দিনে ব্যবসা কিভাবে জেঁকে উঠবে, নিজেরাই কোনো চুলের তেল বের করবো কি না, এমনি সব সাতপাঁচ জল্পনা-কল্পনা করতে করতে কখন যে এতটা রাত হয়ে গেছে, কেউই টের পাইনি।

বহু দিন পরে ছেলেবেলার একজন বন্ধুকে পেয়ে মানুষ এমনিতেই মশগুল হয়ে ওঠে, বেকারের কাছে ব্যবসার আলোচনা তো সময় ভুলিয়ে দেবেই।

রেস্তোরাঁ থেকে বের হবার সময়ে বুঝতে পারলাম কত রাত হয়েছে। প্রথমে চায়ের দাম দিতে গিয়ে, দ্বিতীয়বার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে।

রাত তখন দশটা কি সাড়ে দশটা, পথঘাট নির্জন হয়ে এসেছে। এতকাল পরে স্পষ্ট মনে নেই, কিন্তু সময়টা বোধ হয় শীতকাল। তা না হলে পর পর বারো কাপ চা দুজনে মিলে খেতাম না, আর রাত সাড়ে দশটায় পথঘাট এত নির্জনও হতো না।

দুজনেই বেরিয়ে এলাম রেস্তোরাঁ থেকে। একটা দোতলা বাস দেখতে পেয়েই উঠে পড়লাম দুজনে।

নিরঞ্জন আর আমি, দুজনেই দক্ষিণের যাত্রী। উঠে বসেছি সামনের দিকের সীটে। চৌরঙ্গীর ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে বাসটা, লাল-নীল আলোর রোমাঞ্চ পার হয়ে। অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে গড়ের মাঠে, দোকানের আলো-নেবানো আবছা ফুটপাথে দু-চারটে ফিরিঙ্গী মেয়েপুরুষ, দু-একটা ক্লান্ত ফিটন।

বাসটা ছুটে চলেছে, ভবানীপুরের দিকে। দু-পাশের দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে। অন্ধকার, নিঃশব্দ, নির্জন।

এলগিন রোডের মোড়ে এসে বাসটা ক্ষণিকের জন্য থামলো। আর সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার ভেসে এলো। একটি নারীকণ্ঠের সেই নির্জন নিঃশব্দতার মধ্যে একটা তীব্র আর্তনাদ।

বাসযাত্রীদের গুঞ্জন নিস্তব্ধ হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। কান পেতে আরেকবার সেই চিৎকারটা শোনবার জন্যে সকলেই যেন উন্মুখ হয়ে উঠলো।

কিন্তু না, আর কোনো চিৎকার শোনা গেল না। সকলেই আমরা বিস্মিত চোখে এদিক-ওদিক তাকালাম। স্পষ্ট একটি নারীকণ্ঠের আর্তনাদ শুনেছি এইমাত্র, অথচ এই অন্ধকার বাড়িগুলোর মাঝে কোথায় কোন্ ফ্ল্যাটে সেই রহস্য চাপা পড়ে গেল আমরা কেউ বুঝতে

পারলাম না। কেবল বিস্ময়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম আমরা।

আর ঠিক সেই সময়ে নিরঞ্জন উঠে দাঁড়ালো।

বললাম, কোথায় চললি?

ও উন্মত্ত আবেগে বলে উঠলো, যাবো না? দেখবো না? কোথায় কি হয়েছে দেখতে হবে না, বাঁচাতে হবে না মেয়েটিকে? আহা, বেচারী!

বলেই তরতর করে নেমে গেল নিরঞ্জন। বাসসুদ্ধ সকলেই যেন খুশী হলো। আর আমিও বোধ হয় বাধ্য হয়েই নিরঞ্জনের পিছনে পিছনে নেমে পড়লাম।

আরো মুহূর্ত কয়েক অপেক্ষা করে বাসটা চলে গেল।

আমি আর নিরঞ্জন বৃথাই অন্ধকার বাড়িগুলোর আশেপাশে ঘুরে বেড়ালাম, কিন্তু না, আর কোনো চিৎকার শুনতে পেলাম না। যেন ও চিৎকারে পড়শীদের কেউই বিচলিত হয়নি।

অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে সেদিন বাড়ি ফিরে এসেছিলাম, কিন্তু মন থেকে সে রহস্য মুছে যায়নি কোনো দিন।

কিন্তু তার চেয়েও বড় রহস্য মনে হয়েছিলো নিরঞ্জনকে।

ডাক্তারি পাস করার পরই বিয়ে করলো নিরঞ্জন, আমরা কয়েকজন বন্ধু বরযাত্রী গিয়েছিলাম।

তার পরও কয়েকবার দেখা হয়েছে, গল্পগুজব হয়েছে। কিন্তু ওষুধের দোকান খোলার জল্পনা-কল্পনায় আগের মতো আর মেতে ওঠেনি ও। নিরঞ্জন তখন বিলেত যাবার তোড়জোড় করছে। শ্বশুর ওকে বিলেত পাঠাবে, গর্ব করে বলেছে সে।

এমনিতেই তো বন্ধুরা বিয়ের পর দূরে সরে যায়, নিরঞ্জন আবার বিলেত যাবার কথা শোনায় দেখা হলেই, তাই কি করে আপনা থেকেই যেন দূরে সরে গেল ও।

কবে থেকে যে ওর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো জানি না। বছর তিনেক পরে হঠাৎ আরেক বন্ধু এসে খবর দিলো, নিরঞ্জনের বিয়ে।

—বিয়ে? আমি চমকে উঠলাম। ওর স্ত্রী যে মারা গেছে, শুনিনি তো।

বন্ধুটি হাসলো—মারা যাবে কেন?

—তবে?

উত্তর এলো, শ্বশুর ব্যবসায়ে ফেল মেরে নিরঞ্জনকে বিলেত পাঠাতে পারলো না যে, তাই আবার বিয়ে করছে নিরঞ্জন।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। প্রশ্ন করলাম, ওর বউ?

বন্ধুটি হাসলো আবার।—তাকে তো বিয়ের ক' মাস পরেই বাপের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে।

সত্যি বলতে কি, খবরটা শুনেও বিশ্বাস হয়নি। কিন্তু সত্যিই একদিন একটা ছাপা নিমন্ত্রণপত্র পেলাম।

আর সেদিন বারবার মনে পড়লো সেই রাত্রির কথা। একটি নারীকণ্ঠের আর্তনাদ শুনে যেদিন নিরঞ্জন আর্তনাদ করে উঠেছিলো, বাঁচাতে হবে না মেয়েটিকে? আহা, বেচারী!

বারবার ওই একটা কথাই আমার মনে বেজেছিলো, আর সেই মেয়েলী চিৎকার।

৩

আরেকটি দিনের কথা মনে পড়ে। মেদিনীপুরের সেই দিনগুলির একটি।

ওদিকে সুবিস্তৃত ধোবীঘাট, সারি বেঁধে ধোপার দল সকাল-সন্ধ্যা কেবল কাপড় আছড়াচ্ছে চৌবাচ্চার ধারের শানের ওপর। আর এদিকে মাত্র পাঁচ-সাতখানা বাড়ি। এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক আর তাঁর বাঙালী স্ত্রী—প্রায়-বাঙালী ছেলেমেয়ে। দুটি মধ্যবিত্ত পরিবার পাশাপাশি, তার ওপাশে একটি বাঙালী পরিবার। জাতিতে গোপ। গোটা পাঁচেক ভাগলপুরী গাই বাঁধা থাকে সামনের মাঠে। স্বাস্থ্যবতী ক'টি মেয়ে আর একটি পুরুষ সদাসর্বদাই সেই গাইগুলির তত্ত্বাবধানে ব্যস্ত। কেউ ছানি কাটে, খোল ভুসি খাওয়ায়, কেউ বা পিতলের

বালতি নিয়ে দুধ দোহায়।

মেয়েগুলোর মুখে শ্রী, দেহে যৌবন, চোখে অলাজ ভঙ্গি ছিলো। তাই পাড়ার ছেলেরা তাদের দিকে বিশেষ দৃষ্টিপাতে তাকায় কি না, তাকায় কেন—এসবের দিকে ভ্রূক্ষেপই ছিলো না। কারণ তাদের শরীরে স্বাস্থ্য ছিলো। ছিলো নির্ভয় সাহস।

তখন তো ও তল্লাটে এত মানুষের ভিড় ছিলো না। পাড়াটা ছিলো প্রায় নির্জন নিঃশব্দ। শান্ত।

হ্যাঁ, ঠিক, হৃদয় ঘোষের বিধবা পুত্রবধূর মতো। বউটিকে কখনো-সখনো দেখতে পেতাম আমরা। ফরসা দোহারা চেহারা, ডিমের মতো সুন্দর একটি মুখ, বড় বড় চোখ, চোখের পাতা। শুধুমাত্র একখানা থান কাপড়ে সর্বাঙ্গ ঢেকে, ঈষৎ ঘোমটা টেনে কোনো কোনো দিন পাঁচিলের ধারে বসে সেও দুধ দোহাতো। দু হাঁটুর মধ্যে পিতলের বালতিটা চেপে দুধ দোহাতে দোহাতে এদিক-ওদিক কোনো দিন সে তাকিয়ে দেখে কি না আমরা লক্ষ করিনি।

শীতের সকালে সামনের মাঠে বসে আমরা পাড়ার ছেলেরা আড্ডা দিতাম। গ্রীষ্মকালে মিত্তিরদের রকের ছায়ায়।

ওই পরিবারটিকে নিয়ে আমাদের আলোচনার অন্ত ছিলো না, কিন্তু সেসব আলোচনাই ছিলো হৃদয় ঘোষের মেয়েগুলোকে ঘিরে। শুধু একজন ছিলো—যতীশ—সে-ই শুধু মাঝে মাঝে বলতো, আহা, ওইটুকু বাচ্চা মেয়ে, ষোল-সতেরো বছর বয়েস, অথচ এর মধ্যেই বিধবা হলো মেয়েটি! ওর আবার বিয়ে দেওয়া উচিত!

আমরা সায় দিতাম তার কথায়, ঠাট্টা করে বলতাম, বিয়ে কর না তুইই।

যতীশ চুপ করে যেতো। বলতো, সবেতেই তোদের ঠাট্টা।

ওর গুরুগম্ভীর মুখ দেখে তাই কোনো দিন আমাদের সন্দেহ হয়নি।

কিন্তু এমন একটা কান্ড ঘটে যাবে কে ভেবেছিলো।

সেদিন মিত্তিরদের রকে বসে আমরা ক' বন্ধু তাস পেটাচ্ছি, রাত তখন আটটা কি ন'টা, হঠাৎ হৃদয় ঘোষের বাড়ি থেকে একটা তীব্র আর্তনাদ ভেসে এলো। মেয়েলী কণ্ঠের কান্নার মতো শোনালো চিৎকার। যেন চিৎকার করে উঠলো কেউ, বাঁচান, আমাকে বাঁচান।

না, স্পষ্ট কিছু বোঝা গেল না। কিন্তু আর্তনাদ ঠিকই, মেয়েলী কণ্ঠের আর্তনাদ।

আমরা চমকে উঠলাম। দূরের পুঞ্জীভূত অন্ধকারের দিকে দুর্বোধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ, তারপর আর কোনো চিৎকার বা কান্না শুনতে পেলাম না। তাই মনের মধ্যে বিস্ময় পুষে রেখে আমরা আবার তাস ভাঁজতে শুরু করলাম।

মনে মনে একটা সন্দেহ জাগলো, তবে কি হৃদয় ঘোষ তার পুত্রবধূর ওপর নির্যাতন করছে। তার গোপন অভিসারের কথা টের পেয়েছে বলে?

আবার তাস খেলতে শুরু করেছিলাম আমরা, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা কান্নার রোল উঠলো। ভিড় জমে গেল হৃদয় ঘোষের বাড়িতে।

আমরা ছুটে গেলাম।

না, বউটিকে দেখতে পেলাম না। শুধু শুনলাম, আগুনে পুড়ে মারা গেছে সে।

আত্মহত্যা?

না। হৃদয় ঘোষের বড় মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললে, দুধ জ্বাল দিতে গিয়ে কাপড়ে আগুন লেগে গিয়েছিলো। পাশের বাড়ি গিয়েছিলাম, ছুটে এসে দেখি সব শেষ।

হৃদয় ঘোষ বাড়ি ছিলো না, কিছুক্ষণ পরেই সে ফিরলো। তারপর খবর শুনেই হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠলো।

আমাদের চোখেও জল এলো সে দৃশ্য দেখে।

তারপর একসময় হৃদয় ঘোষ বেরিয়ে এলো, ঝিম মেরে বসে রইলো এক ধারে। দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে যেন নিজেই বললে, মায়ের আমার আবার বিয়ে দেবো ভেবেছিলাম।

আমরা চলে এলাম একে একে। ফেরার পথে একজন বললে, দুধ জ্বাল দিতে গিয়ে আগুন লেগে গেছে? বিশ্বাস হয়?

আরেকজন বললে, আত্মহত্যা করলে দরজা খুলে রাখবে কেন?

সে প্রশ্নেরও উত্তর দিলো একজন।

কিন্তু আরেকটা প্রশ্ন জাগলো, হৃদয় ঘোষ তো আবার বিয়ে দিতেও রাজী ছিলো তার। তবে? আত্মহত্যা করবে কেন সে?

কিন্তু, কি আশ্চর্য, আমরা কেউই প্রশ্ন করলাম না, চিৎকার শুনেও আমরা একজনও কেন ছুটে যাইনি।

[১৩৬৭



পাঠক

আমি স্বনামধন্য বিজন ঘোষ রায়। স্বনামধন্য শব্দটার অর্থ বোধ হয় এই যে আপন নামেই পরিচিত, অন্য পরিচয় যাঁর প্রয়োজন হয় না। আমার ধারণা, আমার নাম শুনেই আপনারা আমার পরিচয় বুঝতে পেরেছেন। হ্যাঁ, আমি সেই বিখ্যাত লেখক, যাঁর লেখা গল্প-উপন্যাস পড়তে চান, আপনাদের এত প্রিয়। আপনারা যে আমার লেখা গল্প-উপন্যাস পড়তে চান, পড়তে ভালোবাসেন, তা আমি বুঝতে পারি আমার বইয়ের কাটতি দেখেই। কাটতি অবশ্য এমন অনেক লেখকেরই আছে যাদের আপনারা সাহিত্যিক বলে স্বীকার করেন না, অথচ সময় কাটানোর জন্যে যাদের বই আপনারা খবরের কাগজের মলাট দিয়ে নিয়ে পড়েন। আমি যে সে দলের নই, তার প্রমাণ উন্নাসিক পত্রিকাগুলোতেও সাহিত্য সমালোচনার নামে কখনো কখনো আমার শ্রাদ্ধ করা হয়। এবং সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, এইসব উন্নাসিক পত্রিকাও আমার কাছে লেখা চান তাঁদের বিশেষ সংখ্যার জন্যে, পেলে ধন্য মনে করেন। না পেলে ক্রুদ্ধ হয়ে আরো কঠোর সমালোচনা করেন। বিশ্বাস না হয় তো আমার কাছে এসে দেখে যেতে পারেন, বিরুদ্ধে যেসব পত্রিকায় যে মাসে সমালোচনা বেরিয়েছে তার মাস কয়েক আগেই সেই পত্রিকার সম্পাদক আমার কাছে গল্প বা প্রবন্ধ বা যা হোক একটা কিছু চেয়ে পাঠিয়েছেন এবং জানিয়েছেন যে প্রার্থিত বস্তুটি পেলে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করবেন। এ থেকে আমি একটা বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, পাঠকদের চেয়ে আমি সম্পাদকের কাছেই বেশী প্রিয়। তার প্রধান কারণ বোধ হয় এই যে, আমার রচনা ভাঙিয়ে তাঁরা দু-পয়সা রোজগার করতে পারেন। অবশ্য বিনিময়ে তাঁরা আমাকে যথেষ্ট পারিশ্রমিক দিয়ে থাকেন, সে কথা স্বীকার করতেই হবে। এমন কি অনেক সময় আমার একটি গল্পের জন্যে তাঁরা যে পারিশ্রমিক দেন—পারিশ্রমিক না বলে তাঁরা অবশ্য বলেন সম্মান-দক্ষিণা—তা আমার মাসিক বেতনের কাছাকাছি।

হ্যাঁ, যদিও আমি বিখ্যাত সাহিত্যিক বিজন ঘোষ রায়, যদিও শত সহস্র পাঠকপাঠিকার ধারণা আমি স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ ধনী বিদ্বান ও বিচক্ষণ, তবু স্বীকার করছি যে তাঁদের ধারণা আমাকে লজ্জা দেয়। তাঁরা মনে করেন যে, আমি টাকার অভাব কি বস্তু তা জানি না, আমি শখ করে চাকরি করি এবং আমি আছি বলেই এই ব্যাঙ্কের কাজকর্ম চলছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি এক শো টাকা বেতনের একজন কনিষ্ঠ কেরানী মাত্র। এবং চাকরিটা আমাকে রাখতে হয়েছে এই কারণেই যে, আমার রচনার ওপর আপনাদের যতটুকু আস্থা আছে, আপনাদের ওপর আমার আস্থা তার শতাংশের একাংশও নেই। নেই, কারণ ইতিমধ্যেই আমি দেখেছি আপনারা সুখেন মল্লিকের রচনা সম্বন্ধেও কিছু কিছু ঔৎসুক্য দেখাচ্ছেন। তার সম্পর্কেও আপনারা আলোচনা করেন, তার বইও আজকাল কিছু কিছু বিক্রি হয় এবং আমি বিজন ঘোষ রায় আজকাল চেষ্টা করেও বিজন ঘোষ রায়ের মতো লিখতে পারি না। কারণ আপনারা যে বিজন ঘোষ রায়কে চেনেন, ভালোবাসেন, যার লেখা আপনাদের এত ভালো লাগে সে আমার

চেয়ে পনরো-বিশ বছরের ছোট। আমি চেষ্টা করেও সেই বয়সে ফিরে যেতে পারি না, সেই অনভিজ্ঞ কল্পনার উচ্ছ্বাস আঁকতে পারি না, চিন্তাহীন উত্তাপ সঞ্চার করতে পারি না আমার রচনায়। কিন্তু সুখেন মল্লিক তা পারে। সুখেন মল্লিক আমার চেয়ে দশ-পনরো বছরের ছোট এবং সম্ভবত জীবন সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। তাই তার পক্ষে যা সম্ভব, আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়।

শুধু জীবন-যৌবনের অভিজ্ঞতাই আমার কল্পনা, আমার মনের উত্তাপ কেড়ে নেয়নি। সুখেন মল্লিক হয়তো এখনো জানে না, যে মোহে সে জীবনকে শুধুমাত্র বিখ্যাত করতে চায় সে মোহ কতখানি মিথ্যা। বিখ্যাত হওয়ার পর সুখেন মল্লিকও বুঝবে খ্যাতির কোনো মূল্য নেই। শুধু তাই নয়, খ্যাতি তাকে মানুষ হিসেবেও মিথ্যে করে দেবে।

আমি বিজন ঘোষ রায় আজ সেই মিথ্যার ওপর দাঁড়িয়ে আছি। হ্যাঁ, আমার আজকের রচনা পড়ে যখন পাঠক প্রশংসা করে তখন আমি বেশ বুঝতে পারি, সে সেই বিগতযৌবনা প্রেমিকার মন নিয়ে যৌবনের প্রেমিককে ভালোবাসছে। এই মিষ্টি স্মৃতির চোখ দিয়ে দেখলে চল্লিশোত্তর প্রৌঢ়ের টাকের ওপরও যেমন কোঁকড়ানো চুল কল্পনা করা যায়, তেমনি এ'রা আমার রচনার মধ্যেও সেই পুরোনো দিনের রস খুঁজে পান। খুঁজে পান না, তবু নিজেরাই মনে মনে সেটুকু বানিয়ে নেন।

আর তাই আমার কাছে তাঁদের চাহিদা বেড়েই চলে। বেড়ে চলে বলেই সম্পাদক এবং প্রকাশকরাও আমাকে এত আদর করেন। কিন্তু আমি জানি, সুখেন মল্লিক একদিন আমার চেয়ার উলটে দিয়ে নিজেই বসবেন এ জায়গাটিতে।

আমি সুখেন মল্লিককে পছন্দ করি, সুখেনের লেখা আমার ভালো লাগে, সুখেন মল্লিক আমাকে শ্রদ্ধা করে এবং সুখেনের রচনায় আমার কিছু কিছু প্রভাব আছে এ কথা পাঠকরাও বলেন। আমি সুখেনকে ভালোবাসি, তার কারণ আমি সুখেন মল্লিককে ভয় পাই না। কিন্তু আমি আপনাদের ভয় পাই। কারণ আপনারা সুখেনকে ভালোবাসতে শুরু করলে আমাকে আর ভালোবাসবেন না। কারণ যেদিন থেকে আপনারা আমার লেখা পছন্দ করতে শুরু করেছেন সেদিন থেকে নিত্যানন্দ রায়ের লেখা আপনাদের আর পছন্দ হয়নি। সেই বিখ্যাত নিত্যানন্দ রায়, বাংলা সাহিত্যের একটি যুগের স্রষ্টা হিসেবে যাঁকে আজও অভিহিত করা হয়, অথচ যাঁর বই আজকাল আর তেমন বিক্রি হয় না।

দশ-পনরো বছর আগে আপনারা যখন আমাকে তরুণ লেখক বলে অভিহিত করতেন সেই সময় নিত্যানন্দ রায় আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছেন। কি কারণে জানি না, তিনি আমাকে স্নেহ করতেন, আমার রচনার প্রশংসা শুধু আমার সামনেই নয়, আমার অনুপ-স্থিতিতেও নানা সভাসমিতিতে এবং নানা সুধীজন-সমক্ষে করেছেন। আমিও অবশ্য তখন তাঁকে যোগ্য সম্মান জানিয়ে এসেছি। তারপর একসময় বিস্মিত হয়ে দেখলাম, আমি তরুণ লেখকের বেঞ্চি ছেড়ে হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে এগিয়ে কখন যেন প্রবীণ লেখকের চেয়ারটিতে এসে বসেছি, কখন থেকে যেন জনপ্রিয় হয়ে গেছি, প্রশংসা পেতে শুরু করেছি সুধী পাঠক-দেরও—এবং কি আশ্চর্য, নিত্যানন্দ রায়ের স্নেহ থেকে বঞ্চিত হতে শুরু করেছি। তাঁর ব্যবহারে বিশেষ কোনো পরিবর্তন দেখতে পেয়েছিলাম এমন নয়, বরং তিনি আগের তুলনায় একটু বেশী ভদ্র ব্যবহারই করতেন আমার সঙ্গে, কথাবার্তা বলতেন এমন ঢঙে যেন আমি আর তাঁর অনুজপ্রতিম নই, তাঁর সমকক্ষ, কিন্তু তবু বুঝতে পারতাম আন্তরিকতার কোথায় যেন অভাব ঘটেছে। মাঝে মাঝে কানে আসতো তিনি কোনো সাহিত্যসভায় আমার নিন্দা করেছেন, কোনো তরুণ লেখকের কাছে বলেছেন, আমার বই আদপেই বিক্রি হয় না, এবং যদি বিক্রি হয় তো এই কারণে যে, আমি পাঠকের মুখের দিকে তাকিয়ে লিখি এবং পাঠকরা সকলেই নির্বোধ। এসব কথা শুনে আমি বিস্মিত হতাম এবং কৌতুক বোধ করতাম। বিস্মিত হতাম, কারণ নিত্যানন্দ রায়ের এই ব্যবহারের প্রকৃত কোনো কারণ আমি খুঁজে পেতাম না। বিস্মিত হতাম, কারণ নিত্যানন্দ রায়ও একদা জনপ্রিয় ছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধেও এই অভিযোগ উঠেছিলো একসময় এবং তাঁর পাঠকদেরও তখনকার প্রবীণ সাহিত্যিকরা নির্বোধ বলতেন। কিন্তু যেদিন শুনলাম, নিত্যানন্দ রায় বলেছেন যে, আমি বিজন ঘোষ রায় টাকার জন্য লিখি, সেদিন আমি প্রচুর হেসেছিলাম।

হেসেছিলাম এইজন্য যে, আমি জনপ্রিয় হয়ে উঠলেও আমি যে ব্যাঙ্কে এক শো টাকা বেতনের কনিষ্ঠ কেরানীর চাকরি করি—নিত্যানন্দ রায়ের সেই ব্যাঙ্কেই পঞ্চাশ হাজার টাকার অ্যাকাউণ্ট ছিলো। তা ছাড়া তিনি বাড়ি, গাড়ি এবং আরো অনেক কিছুই করেছিলেন। এবং সবই তাঁর অক্ষয় কলমটির দৌলতে।

টাকার জন্যে লেখায় আমার কোনো আপত্তি ছিলো না, কিন্তু টাকা না হতেই সেই অভি-যোগের সম্মুখীন হতে আপত্তি ছিলো। নিত্যানন্দ রায় কি ভাবতেন জানি না। তবে ব্যাঙ্কে মাঝে মাঝে যখনই আসতেন তখনই আমার সঙ্গে দু-চারটে কথা বলতেন এবং এমন একটা ভাব দেখাতেন যেন তিনিই আমার নিয়োগকর্তা, যেন তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর আমার চাকরির স্থিতি এবং বিনাশ নির্ভর করছে।

এই ব্যবহার আমাকে সহ্য করে যেতে হতো, কারণ আমাদের ব্যাঙ্কের এজেণ্ট নিত্যানন্দ রায়কে খাতির করতেন তাঁর অ্যাকাউণ্টটির জন্য এবং আমি তাঁকে খাতির করে চলতাম তাঁর সাহিত্যখ্যাতির জন্য। মনে মনে আমি অবশ্য নিত্যানন্দ রায়কে ক্ষমা করবার চেষ্টা করতাম, কারণ আমি বেশ বুঝতে পারতাম যে, নিত্যানন্দ রায় যা করেন তা ইচ্ছাকৃত নয়, তাঁর নিজের ওপর আস্থার অভাব ঘটেছে বলে এবং আমার ক্রমবর্ধমান খ্যাতিকে সহ্য করতে পারছেন না বলেই তিনি আমার ওপর বিরূপ হয়ে উঠেছেন। এটুকু বোঝবার ক্ষমতা আমার ছিলো বলেই আমি হাসতাম, কৌতুক বোধ করতাম এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করতাম যে, এ ধরনের কোনো ক্ষুদ্রতা আমি কোনো দিন দেখাবো না। সুখেন মল্লিক যদি সত্যি কোনো দিন বিখ্যাত হয়, জনপ্রিয় হয় এবং প্রচুর অর্থ উপার্জন করতেও সক্ষম হয় তা হলেও তাকে আমার স্নেহ থেকে বঞ্চিত করবো না।

অন্তত নিত্যানন্দ রায় সেদিন যা করলেন, তেমন ব্যবহার—

নিত্যানন্দ রায় সেদিন ব্যাঙ্কে এসে আমার কাউণ্টারের সামনে দাঁড়ালেন আমিরী চালে, তারপর পাস-বইটা এগিয়ে দিলেন : বিজন, এটা আপ-টু-ডেট করে দাও তো হে!

বললেন এমনভাবে যেন আমি তাঁর কর্মচারী। তিনি আমাকে একদা স্নেহ করতেন এবং আমি তাঁকে এখনো শ্রদ্ধা করি বলেই যে তিনিও আমাকে নিছক একজন কেরানী ভাববেন আমি তা আশা করিনি।

তাই উষ্মা গোপন করে বললাম, এখন তো হবে না, আপনি রেখে যান, আমি পরে করে রাখবো।

তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, এ ব্যাঙ্ক থেকে অ্যাকাউণ্ট তুলে নেবো।

বলে রাগে দপদপ করে পা ফেলে এজেণ্টের ঘরের দিকে চলে গেলেন।

সুখেন মল্লিক সেদিনই ভীরু-ভীরু শ্রদ্ধাবনত ভঙ্গিতে এসে দাঁড়ালো আমার কাউণ্টারের সামনে, বললে, বিজনদা, একটা উপকার করতে হবে।

বললাম, কি উপকার ভাই?

সুখেন বললে, একটা অ্যাকাউণ্ট খুলে দিতে হবে আপনার ব্যাঙ্কে।

আমার ব্যাঙ্ক! হাসলাম আমি, তারপর ব্যবস্থা করে দিলাম। ব্যবস্থা করে দিয়ে নিত্যানন্দ রায়ের কথা বললাম তাকে। বললাম, এজেণ্টের কাছে গিয়েছিলেন কমপ্লেন করতে। তিনি বলেছেন, পাস-বইয়ের এনট্রি সঙ্গে সঙ্গে করা যাবে না।

আমরা দুজনেই খুব হাসলাম।

আর সুখেন বললে, বিজনদা, আপনার প্রশংসা করে সকলেই, ওঁর লেখা তো কেউ পড়ে না আজকাল, তাই এত রাগ। ওঁর ধারণা আপনি নাকি লাখ লাখ টাকা...

লাখ লাখ টাকা না হলেও বেশ কয়েক হাজার টাকা সত্যিই আমি রয়ালটি হিসাবে পেয়ে-ছিলাম, পাচ্ছিলাম। কিন্তু স্বল্প বেতনের চাকরি করে সে টাকা বিশেষ জমাতে পারতাম না। অথচ সুখেন মল্লিক যে কি করে টাকা জমাতো বুঝতে পারতাম না।

ব্যাঙ্কে অ্যাকাউণ্ট খোলার পর ও প্রায়ই আসতো এবং একটা-না-একটা চেক জমা দিয়ে যেতো। প্রথম প্রথম আমি ভাবতাম ওর বই তেমন বিক্রি হয় না, অবুঝ ছেলেছোকরারাই ওর বই পড়ে। কিন্তু ওর বইয়ের কাটতি ধরা পড়তো প্রকাশকদের কাছ থেকে পাওয়া চেক জমা দিতে দেখলেই।

এমনি করেই দিন কাটছিলো। এবং কখন থেকে জানি না সুখেনের ওপর আমি চটতে শুরু করেছিলাম। বোধ হয় ঘন ঘন ওর চেক জমা পড়তো বলে। তা ছাড়া তরুণতর যেসব লেখক এবং সম্পাদক আমার কাছে আসতো মাঝে মাঝে, তাদের মুখে সুখেনের প্রশংসা শুনে শুনে আমিও বিষিয়ে উঠতাম।

সুখেনের ব্যবহারেও ইদানীং কিছু কিছু আত্মম্ভরিতা লক্ষ করলাম এবং বেশ বুঝতে পারতাম সুখেন মল্লিক ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

সেদিন কি একটা কাজে এজেন্টের ঘরে ডাক পড়েছে। কাগজপত্র নিয়ে যেতেই তিনি বসতে বললেন। তারপর কাগজপত্রে সই করতে করতে বললেন, কি লিখছেন বিজনবাবু?

বললাম, কিছু না।

তিনি হেসে বললেন, লিখুন, লিখুন। নতুন কিছু লিখুন মশাই। সুখেন মল্লিকের লেখা পড়েছেন? ওই ধরনের নতুন কিছু।

বললাম, পড়েছেন নাকি ওর লেখা?

—পড়িনি মানে? চোখ তুলে তাকালেন তিনি। বললেন, পাওয়ারফুল লেখক যাই বলুন।

অত্যন্ত বিরক্ত মন নিয়ে ফিরে এসে দেখলাম কাউণ্টারের সামনে নিত্যানন্দ রায়। বহু দিন পরে হঠাৎ আবার এসেছেন কেন?

নিত্যানন্দ রায় একটা চেক এগিয়ে দিলেন, টাকা তুলবেন।

টোকেনটা নিয়েই মিষ্টি করে প্রশ্ন করলেন, কিছু লিখছো-টিকছো? লেখা ছেড়ে দিলে নাকি?

বললাম, লিখে আর কি হবে, কার জন্যে লিখবো বলুন। যেমন অর্বাচীন সব পাঠক হয়েছে, সুখেন মল্লিকের ওইসব ভেলকিবাজি পছন্দ করে তারা।

হেসে উঠলাম দুজনেই। হাসি থামিয়ে নিত্যানন্দ রায় বললেন, যা বলেছো, পাঠক ছিলো আগেকার দিনে, এখন আর সে পাঠক নেই।

[১৩৬৭



একটি কর্ণিক

আমরা তখন কত ছোট। পণ্ডিতের পাঠশালাটা তখন সবে প্রাইমারী ইস্কুল হয়েছে। কেউ যখন জিজ্ঞেস করতো, বেশ বুক ফুলিয়ে বলতাম, ইস্কুলে যাচ্ছি। 'পাঠশালা' বলতে লজ্জা হতো। কিন্তু মাস্টারমশাইকে গাঁয়ের সকলের মতোই 'পণ্ডিত' বলতাম।

ইস্কুল বসতো রায়েদের বৈঠকখানায়, মাদুর-বিছানো মেঝেতে নয়, কাঁঠালকাঠের বেঞ্চি আর ডেস্কে।

ইস্কুলের সামনে নতুন পুকুর। কবে নতুন ছিলো কে জানে, জ্ঞান হয়ে অবধি কচুরিপানা আর দামশ্যাওলায় বুজে-থাকা পুরোনো চেহারাটাই আমরা দেখে আসছি। মাঝে মাঝে শুধু শালুক ফুটতো, চাটুজ্জেদের গৌরীর খোঁপা-বাঁধা মাথাটার মতো গর্বে খাড়া হয়ে উঠতো দু-দশটা কচুরিপানার ফুল। কচুরিপানার ফুলের রঙটা বড় সুন্দর লাগতো আমার। নীলচে বেগুনী ঝকঝকে রঙ, আর গড়নটা কি সুন্দর! চাটুজ্জেদের কাছারি-বাড়ির একটা ঘরে ধুলো-জমা একটা ঝাড়লণ্ঠন দেখেছিলাম, ঠিক সেই ঝাড়লণ্ঠনটার মতো।

পণ্ডিত আমাদের আঁক কষতে দিয়ে হাটে যেতো। আর আমরা হুল্লোড় শুরু করতাম। আচমকা চুপ করতাম এক-একদিন, পণ্ডিতমাসীকে আসতে দেখে। রায়েদের বৈঠকখানাটা ছিলো গাড়ার গাঁথনি। কাদা দিয়ে বসানো ইঁটের দেয়াল, তার গায়ে কলিচুনের ঝাপটা। আর পিছনে ছিলো পণ্ডিতের বাড়ি—কাদার দেয়াল, খড়ের ছাউনি। দরকার পড়লেই পণ্ডিতমাসী এসে বলতো, "সিধরের দোকান থেকে এক ছটাক তেল এনে দে না বাবা!" কিংবা তেজপাতা, মরিচ।

এনে দিতাম। তারপর ঠায় বসে থাকতাম নতুন পুকুরের দিকে তাকিয়ে। খোলামকুচি ছুঁড়তাম লুকিয়ে লুকিয়ে, আর বলতাম, "দেখলি, একটা মাছ ঘাই মারলো, খুব মাছ আছে পুকুরটাতে।"

ছিপ নিয়ে বসতাম ছুটির দিনে। কোথায় মাছ! জীবনে কেউ পানা সাফ করায়নি, পোনা ফেলেনি। মাছ হবে কোত্থেকে!

হোক বা না হোক, আরেকজন এসে ছিপ নিয়ে বসতো। চাটুজ্জেদের অবনীজ্যাঠা। আমরা বলতাম বুনোজ্যাঠা। সবাই বলতো। বুনো নাম হয়েছিলো কেন, জানি না। হয়তো একমুখ দাড়িগোঁফ আর নোংরা শতচ্ছিন্ন জামাকাপড়ের জন্যে।

নতুন পুকুরের ওপারেই দেওয়ানবাড়ি। চাটুজ্জেদের কে কবে দেওয়ান হয়েছিলেন, তিনিই বানিয়েছিলেন ওই বিরাট দোতলা দালানটা। এত বড় দালান এ তল্লাটের কোনো গাঁয়েই ছিলো না। সারি সারি জানলা, সারি সারি দরজা। আর কপাটগুলো যেমন বড়, তেমনি মজবুত। কাঠের ওপর অসংখ্য লোহার গুলি বসানো। কিন্তু সংস্কারের অভাবে চাটুজ্জেদের এই কাছারি-বাড়ির অর্ধেক ঢেকে গিয়েছিলো ঝোপ-জঙ্গলে। উত্তরের ছাদ ফুঁড়ে বেরিয়েছে একটা অশথ-গাছ। পুব দিকটার খানিকটা ভেঙে পড়েছে, রাশি রাশি ইঁট স্তূপীকৃত হয়ে আছে। বৃষ্টিতে ভিজে, শ্যাওলা পড়ে ইঁটগুলোর রঙ হয়ে গিয়েছিলো কালো। রাত্তিরে হঠাৎ ঢিবিটা দেখলে ভয় করতো, গা ছমছম করতো।

ভয়ে গা ছমছম করবার মতোই দেখাতো দেওয়ানবাড়িটাকে। সন্ধ্যের পর আলো জ্বলতে দেখা যেতো না। এত বড় বাড়ি—তার মালিক বুনোজ্যাঠা। বুনোজ্যাঠা, তার বউ,—আমরা অবশ্য জ্যাঠাইমা বলতাম না, বলতাম চাটুজ্জেমাসী,—আর তার দুটো ছেলে, এক মেয়ে। মেয়ে গৌরী।

বাড়িটার গহ্বরে কোথায় কোন প্রান্তে যে ওরা থাকতো, একটা হারিকেন লণ্ঠন জ্বলতো কি জ্বলতো না, আমরা আলো দেখতে পেতাম না কোনো দিন। শুধু এক-একদিন রাত্তিরে দেওয়ানবাড়ির দিক থেকে একটা শব্দ ভেসে আসতো—ঠুকঠুক, ঠুকঠুক।

কেউ বলতো ভূত, কেউ বলতো পেঁচা, নয়তো চামচিকে। চামচিকে ছিলোও অবশ্য অগুনতি। দুর্গন্ধে বাড়ির ভেতর ঢোকে কার সাধ্যি!

যে কারণেই শব্দটা হোক না কেন, সন্ধ্যের পর আমরা আর ও পথ দিয়ে হাঁটতাম না। পাড়াগাঁয়ে এমনিতেই সন্ধ্যের পর নিশুতি রাত, চারিদিক নিস্তব্ধ। তার ওপর যদি ছায়া-ছায়া দৈত্যের মতো ওই পোড়ো বাড়িটা থেকে ঠুকঠুক ঠুকঠুক শব্দ ভেসে আসে, ভয় পাবারই কথা।

দিনের বেলায় অবশ্য ভয় করতো না। দু-একজন মুনিষ-মানুষ ঢুকতো বাড়িটায়, বেরিয়ে আসতো। বুনোজ্যাঠাকে দেখতে পেতাম, গৌরীকে।

গৌরীর এক ভাই দেপুরের বড় ইস্কুলে পড়তো, বোর্ডিংয়ে থেকে। কদাচিৎ আসতো সে ছুটিছাটায়। আরেক ভাই পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে ডাংগুলি খেলতো, বিড়ি খেতো, জুয়া খেলতো মেলার সময়।

গৌরী মেয়েটাকে আমার খুব ভালো লাগতো। ডুরে শাড়ি, দু হাতে এক গাছা করে রুলি, কানে মাকড়ি। কিন্তু নাকটা টিকোলো ছিলো বলে খুব রাশভারি লাগতো। কেমন যেন গরবিনী-গরবিনী ভাব ফুটতো ওর গরিবানী পোশাকেও।

বলতো, আমরা তো "বড়লোক"!

বড়লোক কাদের বলে, কত টাকা থাকলে বড়লোক হয়, আমি তখন জানতাম না। তবে চাটুজ্জেরা যে বড়লোক তা বুঝতাম। কারণ, অত বড় দালান ও তল্লাটে আর একটাও ছিলো

না। পোড়ো বাড়ি হলেও দোতলা দালান তো বটে। তা ছাড়া শুনতাম, ওদের নাকি অনেক সোনাদানা লুকোনো আছে সিন্দুকে! কোন নবাবের দেওয়ান ছিলো ওদের বংশের কে যেন, সেই থেকেই নাকি ওরা বড়লোক।

বিশ্বাসও করতাম। তবু মনে হতো, বুনোজ্যাঠা বড্ড কঞ্জুস। এত টাকা তার, অথচ এমন নোংরা ছেঁড়া পোশাক পরে কেন! আর এক দিকের দেয়াল ভেঙে পড়ায় ছাদের আধখানা ফেটে চৌচির হয়ে গেছে যখন, সারিয়ে নেয় না কেন! রাজমিস্ত্রী না পাওয়া যায় বোশেখ মাসে যখন দল বেঁধে ঘরামিরা আসে, দড়ি কাস্তে হাতে নিয়ে বাড়ি বাড়ি টহল দিয়ে যায়, তখন তাদের দিয়ে খড়ের ছাউনিও তো করিয়ে নিতে পারে। আর কিছু না হোক, বৃষ্টি তো আটকাবে।

কিন্তু সেসব দিকে লক্ষ্যই ছিলো না বুনোজ্যাঠার। এমন কি মাঠে চাষ দেখতেও যেতো না।

বলতো, ওসব আমার পোষায়? হাজার হোক দেওয়ানবাড়ির ছেলে আমি।

শুনে সবাই ঠোঁট টিপে হাসতো, আড়ালে ঠাট্টা করতো।

বুনোজ্যাঠা ভ্রূক্ষেপও করতো না। হয় ছিপ নিয়ে বসতো নতুন পুকুরের পাড়ে, আর নয়তো বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াতো, ইঁটের পাঁজার ওপর দিয়ে।

ভোরবেলায় বিশেষ করে প্রায়ই দেখতাম বুনোজ্যাঠা কি যেন খুঁজছে ভেঙে-পড়া ইঁটের পাঁজায়!

একদিন সকালে নিমের ডাল ভেঙে দাঁত মাজতে মাজতে বুনোজ্যাঠাকে দূর থেকে দেখে এগিয়ে এলাম। দেখি না, কি খুঁজছে ভাঙা ইঁটের স্তূপে!

বুনোজ্যাঠা আমাকে বোধ হয় দেখতেই পায়নি। হঠাৎ চমকে উঠলো আমার পায়ের শব্দে, ফিরে তাকালো, আর এমনভাবে তাকালো আমার দিকে, যেন ভয় পেয়েছে।

তারপরই পাগলের মতো ছুটে এলো আমার কাছে।

মুহূর্তের মধ্যে একটা লোকের চেহারা যে এত বদলে যেতে পারে ভাবাই যায় না।

চোখ দুটো লাল ছিলো, আরো বড় বড় হয়ে উঠলো। আর সারা শরীর যেন তখন ফুলে ফুলে উঠছে।

ছুটে এসেই পাগলের মতো চিৎকার করে উঠলো, "বেরো, বেরো, বেরো এখান থেকে।"

একটা কি বিচ্ছিরি গালাগালও দিলো বোধ হয়।

আমি তো হতভম্ব। লোকটা কি বদলে গেল নাকি? এত চেনাজানা, ও বাড়িতে কত দিনের যাওয়া-আসা, ছিপ ফেলে পাশাপাশি বসি, কত কথা বলে অন্য সময়, আর সেই মানুষ হঠাৎ ক্ষেপে গেল কেন!

বললাম, "বুনোজ্যাঠা, আমি! আমি নিতু।"

কিন্তু বুনোজ্যাঠার মুখের ভাব বদলালো না এতটুকু। আমাকে ধাক্কা দিয়ে আরেকটু হলে হয়তো ফেলেই দিতো।

কিছু বুঝতে না পেরে আমি সরে এলাম। চোখ ঠেলে অভিমানে জল এলো। চলে আসতে আসতে একবার পিছন ফিরে তাকালাম। আর সঙ্গে সঙ্গে চোখাচোখি হলো গৌরীর সঙ্গে। দেখলাম, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে গৌরী। চোখাচোখি হতেই হাতের ইশারায় আমাকে চলে যেতে বললো।

চলে এলাম বটে, কিন্তু রহস্যটা রয়ে গেল মনের মধ্যে। বুনোজ্যাঠা হঠাৎ আমাকে দেখে চমকে উঠলো কেন? ভয় পাবারই বা কি ছিলো?

রেগে গিয়ে আমাকে তাড়িয়েই বা দিলো কেন?

পাড়াগাঁয়ের ছেলে, জন্ম থেকে ভূত আর খুনখারাবির গল্প শুনে আসছি। তাই আমার হঠাৎ মনে হলো, বুনোজ্যাঠা নিশ্চয় একটা খুন-টুন করেছে। ওই ইঁটের পাঁজায় লুকিয়ে রেখেছে খুন করে।

কিন্তু কাকে খুন করলো? চাটুজ্জেমাসীকে?

দূর থেকে বারবার তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, চাটুজ্জেমাসীকে দেখা যায় কি না! বেঁচে আছে কি না!

শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা গোপন রাখতে পারলাম না। দু-একজন সঙ্গী-সাথীকে বলে

ফেললাম সকালের ঘটনাটা। ওরাও বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করলো। বললে, উ'হ্ন, চাটুজ্জেমাসী সকালে নতুন পুকুরে বাসন ধুয়ে নিয়ে গেছে দেখেছি; ও নিশ্চয় অন্য কাউকে খুন করেছে। সকালে তাই ই'টের পাঁজায় রোজই বুনোজ্যাঠা ঘুরে বেড়ায়।

তবে?

ঠিক করলাম, ও বাড়িতে ভূতই থাক আর দৈত্যদানোই থাক, রাত্তিরে গিয়ে দেখবো তো, কি ব্যাপার।

রতি ছেলেটা পড়তো আমাদের সঙ্গে, কিন্তু বয়সে ছিলো তিন-চার বছরের বড়। ও হাটের নাপিতকে ডেকে লুকিয়ে দাড়ি কামাতো, চেহারাটাও ছিলো লম্বাচওড়া। দু বেলা মুগুর ভাঁজতো, ভিজে ছোলা খেতো।

সব শুনে রতি বললে, "ঠিক আছে, যাবো আজ রাত্তিরে। দেখবো কি ব্যাপার।"

এমনিতেই রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়া সারতে দেরি হতো আমাদের, আর খাওয়ার পরও মা রান্নাঘর ধুতো, হে'শেল সাজাতো।

খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই শুয়ে পড়লো, আমি চুপিচুপি উঠে এসে উ'কি দিয়ে দেখলাম, রান্নাঘরে একটা কুপি জ্বলছে, মা ঝাঁটা নিয়ে সপসপ করে রান্নাঘর ধুচ্ছে।

সুতরাং মা-র কাজ সারা হতে হতে ফিরে এলেই চলবে।

বেরিয়ে পড়লাম অন্ধকারে, বাজ-পড়া খেজুরগাছটার উদ্দেশে। রতি বলেছিলো, ওখানেই থাকবে ও।

সেদিকে এগিয়ে যেতে যেতেই মুখের ওপর দুবার টর্চ পড়লো। বুঝলাম, রতি এসে অপেক্ষা করছে।

সাহসে বুক ফুলিয়ে দেওয়ানবাড়ির দিকে পা চালালাম দুজনে। রতি একটা মোটা লাঠি নিয়ে এসেছিলো। আমিও একটা আনলে পারতাম। অভাবে হাফপ্যাণ্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে পেন্সিল-কাটা ছুরিটা ছুঁয়ে রইলাম। লোহা তো বটে, ছুঁয়ে থাকলে ভূতপ্রেতরাও ভয় পায়।

পা টিপে টিপে চলেছি দুজনে, কিন্তু শুকনো পাতাগুলো পায়ের চাপে মড়মড় করে উঠছে, ঝি'ঝি ডাকছে। জোনাকির সারি জ্বলছে নিবছে। দূরে কোথায় একটা কুকুর বিকট চিৎকার করে উঠলো বার কয়েক।

এমন সময় আমরা দুজনেই হঠাৎ থেমে পড়লাম একই সঙ্গে।

রতি বললে, "দেখেছিস!"

বললাম, "দেখেছি।"

আর কিছুই নয়, দেওয়ানবাড়ির ই'টের স্তূপ পার হয়ে এ'কেবে'কে দুলে দুলে এগিয়ে গেল একটা হারিকেন লণ্ঠন। লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোয় শুধু এইটুকু বোঝা গেল, আলোটা একটা লোকের হাতে ঝুলছে।

কিন্তু কে লোকটা? বুনোজ্যাঠা?

দূর থেকে চেনা গেল না, দেখালো ঠিক একটা দস্যুর মতো। পরক্ষণেই আতঙ্কে চমকে উঠেছিলাম ভূত দেখেছি মনে করে। কিন্তু না। আসলে লণ্ঠনের আলোয় লোকটার ছায়াটা বিরাট দৈত্যের আকার নিয়ে দেওয়ানবাড়ির দেয়ালে লেপটে গিয়েছিলো।

লণ্ঠন লক্ষ্য করে এবার পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলাম। আর কাছাকাছি পে'ছিতেই কানে এলো সেই ঠুকঠুক শব্দ।

দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ করলাম।

দাড়িগোঁফে-ঢাকা বুনোজ্যাঠার মুখখানা বীভৎস দেখাচ্ছে। চোখ দুটো গরুর চোখের মতো অন্ধকারেও জ্বলছে। কিন্তু এ কি করছে বুনোজ্যাঠা!

দেওয়ানবাড়ির ভেঙে-পড়া ঘরগুলোর পুবে যে দেয়ালটা দিব্যি মজবুত রয়েছে, পলেস্তারাও খসেনি, সেই দেয়ালে ঘন ঘন শাবল মারছে। একটার পর একটা ই'ট খসে পড়ছে। এক-একবার দেয়ালের গায়ে শাবলের মাথাটা ঠুকে ঠুকে কান পেতে শুনছে, আর তার পরেই জোরে জোরে শাবলের ঘা মারছে দেয়ালে।

রতির হাতটা পিঠে পড়তেই চমকে উঠেছিলাম। রতি ফিসফিস করে বললে, "চ।"

বললাম, "কোথায়?"

"বাড়ি চ।"

ফিরে এলাম দুজনে। ফেরার পথে রতি শুধু বললে, "বুঝে নিয়েছি।"

"কি বল্ তো?"

রতি হেসে বললে, "মোহর খুঁজছে।"

দিন দশেক পরের কথা। মরাইতলার ছায়ায় বসে বসে অঙ্ক কর্ষছি, মাছের পোনা বেচতে এসেছে ক'টা লোক, বড় বড় ডেকচি সাজিয়ে বসে বাবার সঙ্গে দর কষাকষি করছে।

মা উঠনের দড়িতে ভিজে কাপড় মেলতে মেলতে বলছে, "ওদের পোনা নিও না, বোয়াল মেশানো থাকে, সব মাছ খেয়ে শেষ করে দেবে", এমন সময় একটা মুনিষ এসে খবরটা দিলে।

বললে, "কর্তা, চাটুজ্জেদের আরেকটা দেয়াল ভেঙে পড়লো আজ।"

বাবা হাসলো, মা হাসলো। অর্থাৎ এ আর নতুন খবর কি, একে একে সবই তো ভেঙে পড়বে।

বাবা বললো, "কোন মান্ধাতা আমলের বাড়ি, সারাবে না, ফাঁকফোকরগুলোয় চুন সিমেন্ট দেবে না মাঝে মাঝে, ভেঙে পড়বে না তো কি হবে!"

মা বললো, "আমাদের ছাতের ফাটলটা দেখালে না তো রাজমিস্ত্রী আনিয়ে!"

চাটুজ্জেদের বাড়ি থেকে কথাটা ঘুরে ঘুরে এলো আমাদের বাড়িতে, আর তার সূত্র ধরেই আরেকটু হলেই হয়তো কথা-কাটাকাটি শুরু হতো বাবা-মার মধ্যে।

আমি এদিকে আসল রহস্যটা বলবো কি বলবো না ভাবতে ভাবতে বলেই ফেললাম।

বললাম, "তোমরা কিছু জানো না, বাড়ির দেয়াল তো বুনোজ্যাঠা নিজেই শাবল মেরে মেরে ভাঙে।"

মা কাপড় মেলে দিয়ে চলে যাচ্ছিলো, ফিরে দাঁড়ালো। চোখ পাকিয়ে বললে, "তোকে বলে গেছে, নিজে ভাঙে!"

বললাম, "বলে যাবে কেন, দেখে এসেছি। রতিকে জিজ্ঞেস কোরো, বুনোজ্যাঠা মোহর খোঁজে।"

"সে কি রে!" বাবা মা দুজনেই হেসে উঠেছিলো প্রথমটা।

কিন্তু বাবা অবিশ্বাস করলো না। বললে, "হতে পারে, সবারই তো ধারণা দেওয়ানবাড়ির দেয়ালে ঘড়া ঘড়া মোহর গাঁথা আছে, অবনের বাপ না ঠাকুরদা একবার নাকি পেয়েছিলো..."

মা হেসে ফেললো।—"তা বলে একটার পর একটা দেয়াল ভেঙে চলেছে, না জেনেশুনে?"

এর পর থেকে আমরাও হাসাহাসি করতাম বুনোজ্যাঠার বুদ্ধি সম্পর্কে।

গৌরীকে একবার ঠাট্টা করে বলেছিলাম। শুনে রেগে গিয়েছিলো। বলেছিলো, "ঘরে মোহর পোঁতা থাকবে, আর ভিক্ষে করে খাবো, না? তা হলেই সকলে বুদ্ধিমান বলবে?"

বলেই দপদপ করে পা ফেলে চলে গিয়েছিলো।

কিন্তু খানিক পরেই ফিরে এসেছিলো আবার। রাগ কোথায়, তখন একেবারে অন্য চেহারা।

ফিসফিস করে বলেছিলো, "নিতুদা, তুমি কাউকে বোলো না কিন্তু।"

বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করেছিলাম, "কি?"

"মোহরের কথা। বাবা জানতে পারলে ভাববে আমি বলেছি, তা হলে..."

তা হলে যে গৌরীকে খুন করে ফেলবে বুনোজ্যাঠা, তা টের পেয়েছিলাম সেই যেদিন ভোরবেলায় আমাকে ঠেলতে ঠেলতে তাড়িয়ে দিয়েছিলো, আর গৌরী ইশারায় চলে যেতে বলেছিলো আমাকে।

বলার সুযোগও আর হয়নি।

কারণ তার কিছু দিন পরেই ছোটকাকা আমাকে নিয়ে এলো কলকাতায়, গাঁয়ের ইস্কুলে পড়াশুনো হচ্ছে না বলে।

আর কলকাতার নেশায় এমন পেয়ে বসলো আমাকে যে, ছুটিছাটাতেও গাঁয়ে ফিরতে ইচ্ছে হতো না। পড়াশুনোর ক্ষতি হবে এই অজুহাতে কলকাতাতেই থাকতাম। যদি বা যেতাম

দু-চার দিনের জন্যে, বাড়ির বাইরে বের হতাম না বড় একটা, মিশতাম না কারও সঙ্গে। মনে হতো, রতি-টতির মতো ছেলেগুলো মেলামেশা করার যোগ্যই নয়।

তাই দেওয়ানবাড়ির ক'টা দেয়াল ভেঙে পড়লো, ক'খানা ঘর রইলো, লক্ষ্যই করিনি কোনো দিন।

ম্যাট্রিক পাস করে সেবার গাঁয়ে ফিরলাম। সেইবারই প্রথম দেখলাম। দেখে চমকে উঠলাম।

দেওয়ানবাড়ির সবটাই তখন ইঁটের স্তূপ। একটি দুটি ঘর কোনোরকমে টিঁকে আছে। আর ইঁটের ওপর রীতিমতো গাছ গজিয়েছে দু-চারটে।

মনটা খারাপ হয়ে গেল। মন খারাপ হয়ে গেল যত না বুনোজ্যাঠার জন্যে, তার চেয়ে বেশী গৌরীর জন্যে।

মা বলতো, "চাটুজ্জেদের গৌরীর আর বিয়ে দিতে পারবে না ওরা।"

বলতো, দুঃখও করতো। তলে তলে দু-একটা সম্বন্ধর চেষ্টাও করতো মা। কিন্তু পণের টাকা না দিতে পারলে, লুকোনো মোহরের গল্প শুনে তো কেউ বিয়ে দেবে না।

হঠাৎ আমার গৌরীকে দেখতে ইচ্ছে হলো। কত দিন দেখিনি। কি জানি, এখন দেখে চিনতে পারবো কি না! আমাকে সে চিনতে পারবে কি না!

একবার ভাবলাম, যাই বুনোজ্যাঠাদের বাড়ি। দু-একটা কথা বলে আসি গৌরীর সঙ্গে, গৌরীর মা-র সঙ্গে।

কিন্তু অনেক কাল দেখাসাক্ষাৎ নেই বলেই কেমন লজ্জা-লজ্জা করলো। যেতে পারলাম না। ভাবলাম, থাক, মাকেই বরং বলবো গৌরীকে ডেকে পাঠাতে।

পরক্ষণেই মনে হলো, ডেকে পাঠানো কি উচিত হবে, ডাকলেও কি আসবে সে! কে জানে, এতদিনে কত বড় হয়েছে, কত বদলে গেছে।

ভাবতে ভাবতে খিড়কি পার হয়ে বাড়ি ঢুকেছি, অমনি মেয়েটা ঘুরে বসলো।

প্রথমটা লক্ষ করিনি। মনে হয়েছিলো, পাড়ার কেউ রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে মা-র সঙ্গে গল্প করছে।

কিন্তু উঠে দাঁড়াতেই চিনতে পারলাম। বললাম, "গৌরী না?"

গৌরী ওর বড় বড় চোখ দুটো তুলে আমার দিকে এক পলক চেয়েই মাথা হেঁট করলো, তারপর পায়ের বুড়ো আঙুলে দাওয়ার মাটি খোঁচাতে খোঁচাতে বললে, "কি ভাগ্যি আমার, চিনতে পেরেছো?"

আমি হাসলাম, মা হাসলো।

গৌরী কিন্তু মুখ তুলে তাকাতে পারলো না। মুখ নিচু করেই বললে, "ভেবেছিলাম কলকাতার বাবুরা পাড়াগাঁয়ের লোকদের চিনতে চায় না।"

আমি ততক্ষণে লজ্জা আর অস্বস্তি কাটিয়ে উঠেছি। বললাম, "এদিকে তো দেখছি লজ্জাবতী লতা, অথচ মুখে তো বিছুটি লেগে রয়েছে।"

মা ধমক দিলো।—"ও এসেছে তোর সঙ্গে দেখা করতে, আর তুই কিনা ঝগড়া শুরু করলি!"

বলে থালাবাসন নিয়ে মা বেরিয়ে গেল, ঘাটে ধুয়ে আনতে।

আর আমি ভালো করে তাকালাম গৌরীর দিকে।

সত্যি বদলে গেছে গৌরী। সেই ছোট্ট মেয়েটির সারা দেহের ভাঁজে ভাঁজে পরিপূর্ণতা এসেছে। কৈশোরের প্রগল্ভ বন্যা যেন বিদায়-মুহূর্তে ওর শরীরে যৌবনের পলিমাটি লেপে দিয়ে গেছে। সেই চঞ্চল চোখ দুটি যেন শান্ত আর শীতল, শীতল আর গভীর।

চোখ তুলে তাকালো গৌরী। কৌতুকের চাউনিটা কৌতূহলের দৃষ্টিতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

ওর স্থির শান্ত দৃষ্টিটা একটা বিরাট জালের মতো আমার চারদিকে বিছিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে টেনে তুলতে চাইছে যেন। হৃদয়ের গভীর থেকে কিছু খুঁজে বের করতে চাইছে। আর আমার সমস্ত মন কেমন এক বিচিত্র অনুভূতিতে কেঁপে উঠলো। মনে হলো, আমি যেন নতুন কিছু আবিষ্কার করেছি, নতুন করে আবিষ্কার করেছি।

প্রেম নয়। একেই বোধ হয় মোহ বলে। যৌবনের উত্তপ্ত আকর্ষণ। আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন ওর শরীরের রেখায় রেখায় যৌবনের লুব্ধ ইশারা খুঁজে বেড়ালো।

আবেগের কণ্ঠে হয়তো কিছু বলেও বসতাম।

সেই মুহূর্তেই থালাবাসন হাতে মা ফিরে এলো খিড়কির পুকুর থেকে, তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বললো, "ও মা, তোরা ঠায় দাঁড়িয়ে আছিস তখন থেকে! গৌরী. যা নিতুকে পিঁড়িটা এনে দে।"

গৌরীকে অপ্রতিভ দেখালো। তাড়াতাড়ি পিঁড়িটা এনে দিলো ও।

তারপর দু-একটা ছোট ছোট প্রশ্ন আর উত্তর।

একসময় চলে গেল গৌরী, ফিসফিস করে মা-র কানে কি বলে গেল।

আর মা বললো, "তোকে একটা কাজ করতে হবে নিতু।"

"কি?"

"গৌরীর বাবাকে গিয়ে বোঝাতে হবে। গাঁয়ের কারও কথা তো নিলো না। তাই গৌরী বলছিলো. তুই কলকাতার লোক হয়ে গেছিস. একটা পাস করেছিস, তুই বললে হয়তো শুনবে।"

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম, "কি কথা?"

মা এবার কৌতুকের হাসি হাসলো। বললে, "ওর বাপ তো দেখেছিস বদ্ধ পাগল, একে একে বাড়িটা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলো, এদিকে দেওয়ানবাড়ির ছেলে বলে গর্ব কম নয়। দেপুরের অনাদি. ওই যে মুদীখানা আছে বলরামপুর ইস্টিশনে, তার সঙ্গে গৌরীর বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে. কিন্তু বিয়ে দেবে না তোদের বুনোজ্যাঠা।"

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম. "অনাদি? খালি গায়ে লুঙি পরে বসে থাকে মুদীখানায়. তার সঙ্গে গৌরীর বিয়ে? একটা অশিক্ষিত চাষা..."

মা হেসে বললো, "তুইও দেখছি ওর বাপের মতোই বলছিস। দেওয়ানবাড়ির মেয়ে গৌরী ঠিকই. কিন্তু কি আছে তাদের এখন? বিয়ে দিতে পারবে আর ও মেয়ের?"

বললাম, "গৌরীর কি মত?"

মা হাসলো, "সেই কথাই তো বলতে এসেছিলো। ওর খুব মত আছে। বললে. মাসীমা, তবু তো খেয়ে-পরে থাকতে পাবো, বিয়ে না হলে যে বাপের বাড়িতে ভাইরা পরে আর খেতে-পরতেও দেবে না।"

আশ্চর্য, কথাটা শুনে সহানুভূতি জাগলো না. বরং অকারণ একটা আক্রোশ হলো গৌরীর ওপর। কিংবা অকারণ নয় হয়তো।

রেগে গিয়ে বললাম. "তা কি করতে হবে আমাকে?"

মা আমার রাগ দেখে হাসলো। বললে, "গৌরী বলছিলো, ওর বাপকে গিয়ে তুই একবার বুঝিয়ে বলে আয়. গৌরীর ওখানে বিয়ে দিতে যেন অমত না করে।"

বেশ. তাই হবে। যাবো দেওয়ানবাড়িতে, বুনোজ্যাঠাকে বলে আসবো। মনে মনে অদ্ভুত একটা আত্মনিপীড়নের আনন্দ পেলাম। শুধু কি তাই? মনে হলো. গৌরীকেও যেন কষ্ট দেওয়া হবে। মুদীখানার অনাদিকে বিয়ে করতে তার যখন এত সাধ, করুক বিয়ে।

গৌরী কি ভেবেছে আমি তাকে এক মুহূর্তের দেখাসাক্ষাতে ভালোবেসে ফেলেছি! একটা কিশোরী মেয়েকে হঠাৎ যৌবনের ঘাটে দেখলে কার না ভালো লাগে, কার না মনে রোমাঞ্চ হয়! কয়েক মুহূর্ত মুগ্ধ হয়ে তার দিকে তাকিয়েছিলাম বলেই কি ভালোবেসে ফেলেছি নাকি!

নিজের বোকামিতে নিজেই হেসে ফেললাম একসময়. কি সব ভাবছি অতশত! গৌরী হয়তো এত কথা ভাবেইনি, ও শুধু অনাদিকে বিয়ে করে খাওয়া-পরার সমস্যা মেটাতে চায়। কিংবা কে জানে অনাদিকে ও হয়তো...

সত্যি সত্যি একদিন সন্ধ্যেবেলায় চলে গেলাম দেওয়ানবাড়িতে। হাতে একটা টর্চ নিয়ে।

দেওয়ানবাড়ির তখন আর কতটুকুই বা অবশিষ্ট আছে। দুখানা ঘর বোধ হয়।

ডাক শুনে গৌরীর মা বেরিয়ে এলো। বললে. "এসো নিতু. এসো।"

ছোট ছোট দুখানা ঘর. একটা লণ্ঠন জ্বলছে. এক পাশে উনুন। হয়তো রান্না করছিলো

গৌরী, একটা আসন পেতে দিলো।

এ-কথা সে-কথায় চাটুজ্জেমাসী বললে, "গৌরীর বাবা একটু বেরিয়ে গেছে, একটু বোসো নিতু, এখনই আসবে।"

তারপর রেকাবিতে করে দুটো নাড়ু আর এক গ্লাস জল এনে আমার সামনে রেখে পাখার বাতাস করতে লাগলো।

পাখার বাতাস করতে করতে একবার পাখাটা আমার গায়ে লাগতেই ঠক করে সেটা মাটিতে ঠুকে চাটুজ্জেমাসী বললে, "তুমি ওঁকে বুঝিয়ে বোলো নিতু, তোমার কথা রাখতে পারে। তাই গৌরীকে দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছিলাম।"

বললাম, "সেইজন্যেই তো এসেছি।" তারপর হেসে ফেলে তাকালাম গৌরীর মুখের দিকে। বললাম, "গৌরীর বিয়েতে কিন্তু আমি ছুটি নিয়ে আসবো, যখনই হোক।"

গৌরী দুটো বড় বড় ক্লান্ত চোখ তুলে তাকালো আমার মুখের দিকে, তার বিষণ্ণ মুখের ওপর একটা হালকা খুশির হাসি চমকে উঠে মিলিয়ে গেল।

চাটুজ্জেমাসীর চেয়ে গৌরীর উৎসাহই যেন বেশী। বারবার বাইরের দরজার দিকে তাকাচ্ছিলো ও, বুনোজ্যাঠার পায়ের শব্দ শুনতে পাবার আশায়। কিছু একটা শব্দ হলেই কোনো একটা কাজের অছিলায় বাইরে উঁকি দিয়ে আসছিলো।

কিন্তু বুনোজ্যাঠা অনেক রাত পর্যন্ত ফিরলো না। এদিকে ওই আধা-অন্ধকার ঘরের গুমোটে বসে থাকতেও অসহ্য লাগছিলো।

একসময় উঠে পড়ে বললাম, "আজ থাক, কাল আবার আসবো মাসীমা।"

চাটুজ্জেমাসী আরেকটু অপেক্ষা করতে বললো, শেষে আমার অনিচ্ছা বুঝতে পেরে বললে, "কাল সকালে একবারটি এসো তা হলে।"

বললাম, "আসবো।"

গৌরী লণ্ঠন হাতে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আসছিলো, বললাম, "আলো লাগবে না, টর্চ আছে।"

লণ্ঠনটা নামিয়ে রেখে দিলো গৌরী, তারপর জড়সড় হয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলো। বাড়ির সামনের রাস্তাটা অবধি।

গৌরী বললে, "এসো কিন্তু।"

"আসবো। চলি আজ..."

বিদায় নিয়েও কিন্তু পা বাড়াতে পারলাম না। থেমে পড়লাম। ফিরে দাঁড়ালাম।

আবছা অন্ধকারে আমরা কেউ কাউকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না। শুধু ছায়া-ছায়া দুটো শরীর চুপচাপ কাছে দাঁড়িয়ে আছে। কারও মুখে কোনো কথা নেই। কিংবা কে জানে, দু-জনের মনেই হয়তো একই কথা। দুজনেই হয়তো পরস্পরকে আমরা কিছু বলতে চাইছিলাম।

হঠাৎ কি হলো, নিজেই বুঝলাম না। গৌরীর একখানা হাত টেনে নিলাম মুঠোর মধ্যে, চেপে ধরলাম। থরথর করে আবেগে কেঁপে উঠলাম আমি, আর স্পষ্ট অনুভব করলাম, গৌরীর হাতখানাও যেন কাঁপছে। শুধু স্পর্শের মধ্যে দিয়ে আমরা কি যেন বলতে চাইলাম, নির্বাক অনুভূতির ভাষায় পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে কি এক প্রতিশ্রুতি আদায় করলাম।

হয়তো বলেছিলাম, আমি আছি।

হয়তো শুনেছিলাম, আমি থাকবো।

তারপর একসময় হঠাৎ হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে পালিয়েছিলো গৌরী। অন্ধকার, শুধু অন্ধকার। তাই বুঝতে পারিনি গৌরীর দু চোখে সেদিন কি ছিলো। জল? না, লজ্জা!

জানতে পারিনি, কোনো দিনই জানতে পারবো না।

পরের দিন ইচ্ছে করেই বুনোজ্যাঠার সঙ্গে দেখা করতে যাইনি। কলকাতায় চলে এসে একবার শুধু একটা মামুলী চিঠি লিখেছিলাম চাটুজ্জেমাসীকে। উত্তর পাইনি।

তারপর ধীরে ধীরে গ্রামের কথা, গৌরীর কথা মন থেকে মুছে গিয়েছিলো, শুধু যৌবনের প্রথম রোমাঞ্চের সুরটুকু মাঝে মাঝে ক্ষীণ স্বরে বেজে উঠতো।

বছর দুই পরে আবার যখন গ্রামে ফিরলাম, গৌরীকে মনে পড়লো। কিন্তু মাকে তার কথা জিজ্ঞেস করতে কেমন যেন লজ্জা হলো।

ভোরবেলায় উঠেই সেই ছোটবেলাকার মতো নিমের কাঠি ভেঙে নিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে নতুন পুকুরের পাশ দিয়ে দেওয়ানবাড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু বেশী দূর আর এগোতে হলো না। চমকে উঠলাম সেদিকে তাকিয়ে।

সেই অবশিষ্ট ঘর দুখানাও আর নেই। শুধুই ভাঙা পুরোনো ইঁটের স্তূপ। শ্যাওলা আর ঝোপ, ফাঁকে ফাঁকে কচি বট-অশ্বত্থের চারা উঠেছে।

কিছুই নেই? কিছুই রাখেনি বুনোজ্যাঠা?

তাড়াতাড়ি ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলাম, "বুনোজ্যাঠারা কোথায় উঠে গেছে মা? ঘর তুলেছে নতুন?"

"ঘর?" মা অবাক হয়ে তাকালো আমার মুখের দিকে। বললে, "শুনিসনি তুই?"

"কি? কই, শুনিনি তো কিছু?"

মা-র চোখ ছলছল করে উঠলো। বললো, "কেউ জানে না রে, কেউ জানে না, কোথায় যে লুকিয়ে লুকিয়ে চলে গেল।"

খানিক চুপ করে থেকে আবার বললো, "দেওয়ানবাড়িটা পড়ে যাবার পর রায়েদের বৈঠকখানাটায় ওদের থাকতে দিয়েছিলো, ইস্কুল তো উঠে গেছে নতুন বাড়িতে..."

"তারপর?"

মা চোখ মুছলো।—"দেওয়ানবাড়ির এত নাম, তাদের কিনা থাকতে হচ্ছে রায়েদের বৈঠকখানায়, তাই লজ্জায় মুখ দেখাতো না গৌরীর বাবা। একদিন কাউকে কিছু না জানিয়ে কখন যে চলে গেল, কোথায় গেল, কেউ খবরই পেলো না।"

সমস্ত বুক নিঙড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। একটা কথাও বলতে পারলাম না। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ইচ্ছে হলো, জিজ্ঞেস করি, গৌরীর বিয়ে হয়েছিলো? অনাদির সঙ্গে, না আর কোথাও?

কিন্তু পারলাম না। মনে হলো, এই একটা প্রশ্নের মধ্যেই হয়তো আমার মনের গভীরের সমস্ত দুর্বলতাটুকু ধরা পড়ে যাবে। মনে হলো, এর চেয়ে অপ্রিয় কোনো কথা যদি শুনতে পাই, যদি শুনি, গৌরীর বিয়ে হয়নি, গৌরীই শেষে বিয়েতে মত দেয়নি, তা হলে হয়তো নিজের কাছে চিরকালের জন্য অপরাধী থেকে যাবো।

তাই সমস্ত জ্বালাটুকু সেদিন নীরবে সহ্য করেছিলাম।

কিন্তু সব জ্বালা ধীরে ধীরে মুছে যায়, সব স্মৃতি সময়ের প্রলেপে চাপা পড়ে।

গৌরীকে ভুলে গিয়েছিলাম। ভুলে গিয়েছিলাম বুনোজ্যাঠাকে, লুকোনো মোহরের লোভে যে মানুষটা অত বড় দেওয়ানবাড়িটা ধুলোয় মিশিয়ে দিলো, যে মানুষটা একদিন নিঃস্বতার লজ্জায় গাঁ থেকে মুখ লুকিয়ে পালিয়ে গেল।

কে জানতো, এত বছর বাদে বুনোজ্যাঠাকে আবার মনে পড়বে।

এই কলকাতারই এক অভিজাত পল্লীতে সহকর্মী বন্ধু নতুন বাড়ি তুলছে। তার গর্বের এবং গৌরবের কিছুটা অংশ দেবার জন্যেই হয়তো নতুন বাড়িটা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলো সে।

রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়েই দেখালো, যাতে বাড়ির বিরাটত্ব পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারি।

তাকিয়ে দেখছিলাম বাড়িখানা। চারপাশে বাঁশের ভারা বাঁধা আছে, দেয়ালে প্লাস্টার করা হচ্ছে। মিস্ত্রীরা কাজ করছে।

হঠাৎ বন্ধু বললে, "ওই যে রাজমিস্ত্রীটাকে দেখছো? হাতে কর্ণিক নিয়ে পলেস্তারা লাগানো দেখিয়ে দিচ্ছে..."

দেখলাম। দেখে চমকে উঠলাম। পরনে লুঙি আর ফতুয়া। একমুখ দাড়িগোঁফ, হুবহু সেই চেহারা!

বন্ধু বললে, "কলকাতায় তিনখানা বাড়ি ওর, অগাধ টাকার মালিক। রাজমিস্ত্রী ছিলো, এখন বড় ঠিকাদার। কিন্তু এখনো নিজের হাতে কর্ণিক নিয়ে কাজ করে।"

আরো কি যেন সব বললে বন্ধুটি, আমার কানে গেল না। আমি শুধু অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখছিলাম। ঠিক সেই মুখ, সেই চেহারা। এতটুকু তফাত নেই।

এগিয়ে গেলাম তার দিকে, ডাকলাম, "অবনীজ্যাঠা!"

বুনোজ্যাঠা নামটা মুখে আনতে বাধলো।

বন্ধু হেসে বললে, "কে অবনীজ্যাঠা আপনার? ও তো বড়েমিঞা।"

একেবারে সামনাসামনি আসতেই ভুল ভাঙলো। না, বুনোজ্যাঠা নয়। অথচ দূর থেকে দেখে মনে হয়েছিলো হুবহু বুনোজ্যাঠা।

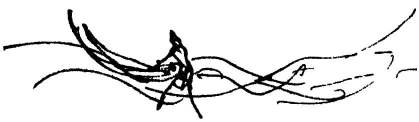
আমার অপ্রতিভ ভাবটা দূর করবার জন্যে বন্ধু তার উদ্দেশে বললে, "বড়েমিঞা, এখনো নিজের হাতে কাজ করছো? এবার ছুটি নাও।"

বড়েমিঞা হাসলো, একমুখ গোঁফদাড়ির ফাঁকে চোখ দুটো তার খুশিতে নেচে উঠলো একবার।

তারপর হাতের কর্ণিকটা দেখিয়ে বললে, "আমি ছুটি নিলে কি হবে বাবুসাব, কর্ণিক ছুটি নেবে না।"

আবার হাসলো সে, পরিষ্কার উর্দুতে বললে, "দৌলত তো বাবু সারা দুনিয়াতেই লুকোনো আছে, কিন্তু সেরা দৌলত এই কর্ণিক।"

[১৩৬৭



ঝিনুকের কৌটো

বিয়ের পর চার বছর নিশ্বাস ফেলবার অবকাশ পায়নি শান্তনু। অথচ এই সময়টুকুই তো মানুষের জীবনে একমাত্র অবসর। কেমন একটা মুগ্ধ আত্মহারা ভাব মনের সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে থাকে এই সময়ে। দায়দায়িত্ব, অর্থচিন্তা, আত্মীয়স্বজন—সব কিছুই মন থেকে মুছে যায়। চোখে কেমন একটা রঙিন দৃষ্টি আসে, শরীরে ঝলমলিয়ে ওঠে পরিতৃপ্তির আলো।

শান্তনু বিয়ের পর যে এমন দিন উপভোগ করেনি তা নয়, কিন্তু সে শুধু ক'টা দিনের জন্যে, বড় জোর কয়েকটা মাস। তারপর বারংবার কঠোর বাস্তবের আঘাতে সেই মুগ্ধভাব তার কেটে গেছে, নিজেকে বাঁধতে বাধ্য হয়েছে দৈনন্দিন আজ আর কর্তব্যের জোয়ালে।

সেই একঘেয়ে জীবনের অন্ধকার কারাকক্ষে এক ফালি আলো শুধু দেখা দিয়েছিলো একবার, যেদিন রুমার জন্ম হলো। যে কোথাও ছিলো না সে এলো। চাপা নাক, তুলতুলে একটা শরীর, কি সুন্দর গাঢ় নীল ধূর্ত এক জোড়া চোখ, সরু সরু আঙুল।

শান্তনু আর গীতা দুজনেই আবার একবার মুগ্ধ হলো, আত্মহারা হলো। মেয়েকে চুমু খেয়ে, আদর করে, তার ননীর মতো কোমল দুটি হাতে থাসাথাসি করে সে যে কি আনন্দ!

দুটো-একটা করে ভাঙা-ভাঙা কথা ফুটতে শুরু হলো যখন, তখন আরো আনন্দ। এক-একটা নতুন কথা শিখতো রুমা, আর রুমার বুদ্ধি দেখে তাজ্জব হয়ে যেতো শান্তনু। এই এক ফোঁটা মেয়ে, সেদিনও যে ছিলো না, সে এত কথা শিখছে কি করে? বিস্মিত হতো শান্তনু আর গীতা, আবার কথা শুনে হেসে লুটোপুটিও খেতো। কখনো ভাবতো, এই বয়সে এত বুদ্ধি কি করে হয়, এত ধূর্তুমি শেখে কি করে!

আপিসে যেতে ইচ্ছে হতো না শান্তনুর, মনে হতো মেয়েকে নিয়ে সারা দিন শুয়ে বসে আদর করে কাটিয়ে দেয়। আপিস থেকে ফিরতে চাইতো তাড়াতাড়ি, কিছুটা দুশ্চিন্তায়—কেমন আছে রুমা, বিপদ আপদ ঘটেনি তো ইতিমধ্যে, আবার কিছুটা উন্দাম আগ্রহে, গিয়ে দেখবে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে রুমা, দেখতে পেয়েই, 'বাবা এয়েছে, মা বাবা এয়েছে,' বলতে বলতে সিঁড়ি বেয়ে নিচে আসবে এই লোভে।

তবু তারই মধ্যে কেমন করে যেন একঘেয়েমি ঢুকে গেল। হয়তো কাজের চাপে, হয়তো শরীরটা ভালো যাচ্ছিলো না বলে। মনে মনে তাই একটা গোপন ইচ্ছা রেখেছিলো শান্তনু। একদিন কথাটা ভেঙেই ফেললে গীতার কাছে।

বললে, চলো, দিন কয়েক কোথাও বেড়িয়ে আসি।

—কোথায়? বিস্ময়ে চোখ কপালে তুললো গীতা। বিস্ময় তার অকারণ নয়, যেখানে প্রতি মাসের শেষেই আয়-ব্যয়ের হিসেবে জোড়া লাগাতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে সে, সেখানে বাইরে বেড়াতে যাওয়ার কল্পনা মাথায় আসে কি করে শান্তনুর। চেঞ্জে যাওয়া, দেশভ্রমণে যাওয়া—এমন সব কথা শোনা যায় বটে, কিন্তু সেসব উঁচুমহলের লোকদের জন্যে। গীতা আর শান্তনু যাবে বেড়াতে? তবু কথাটা শুনে গীতার মনেও যে একটু লোভ উঁকি না দিয়েছে এমন নয়।

—টাকার অভাব তো চিরকালই থাকবে, চলো ধার করেই নয় দু-দশ দিন পুরী থেকে ঘুরে আসি।

শান্তনু যখন এ কথা বলেছে তখন গীতা সায় দিয়ে বসেছে। বলেছে, বেশ তো! কি আর এমন খরচ হবে। আমি সব সামলে নেবো ফিরে এসে।

শেষ অবধি তাই ছুটি নিয়েছে শান্তনু, গিয়ে উঠেছে পুরীর একটা কম খরচের হোটেলে।

হোটেলটা দেখে, হোটেলের ঘর দেখে খুশীই হয়েছে দুজনে। বাঃ, বেশ ছোট্ট ঘরখানি, একেবারে সমুদ্রের ওপরে। বারান্দায় বসে বসে সমুদ্রের অবিশ্রান্ত ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে থাকা যায়। ঢেউয়ের মাথায় মাতালের মতো টলছে যে নুলিয়া-ডিঙির সারি, তার দিকে তাকিয়ে থাকা যায়, আর দেখা যায় ক্ষণে ক্ষণে সমুদ্রের রঙ বদলাচ্ছে।

একঘেয়ে জীবনের রঙও যেন তাদের ক্ষণে ক্ষণে বদলাতে থাকে।

প্রথম যেদিন রিকশায় করে হোটেলের দিকে আসছিলো গীতা, সেদিন রাস্তা থেকেই সমুদ্র দেখে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলো সে। শান্তনু এর আগেও এসেছে এখানে, সমুদ্র দেখেছে। কিন্তু গীতা জীবনে এই প্রথম যেন সমুদ্রের স্বাদ পেলো।

কেমন একটা গুর্‌গুর্ ধ্বনি, তারপরই চর্‌চর্‌চর্ ব্রেকারের শব্দ। নীল ঢেউ আর সাদা ফেনার মাতলামি। এই নাকি সমুদ্র? এত বিশাল আর সীমাহীন অথই জলের রাশি এই প্রথম দেখলো গীতা। বিস্ময়ের চোখ মেলে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেমন যেন নেশা ধরে যায়। সেই এক শব্দ, সেই এক ঢেউ, একইভাবে তীরের বালিতে ভেঙে পড়া। তবু সেই একই ঢেউ নয় যেন। প্রতিবারই বুঝি সে নতুন ঢেউ, নতুন রঙ।

হোটেলের ঘরটিতে কোনোরকমে বাক্স-বেডিং নামিয়ে দিয়েই রুমাকে বুকে জাপটে নিয়ে ছুটলো গীতা।

আহ্লাদের আলোয় সারা মুখ ভাসিয়ে শান্তনুর পাঞ্জাবির আস্তিন ধরে টানলে, আহা, এসো না, এসো না একবারটি, পাড়ে গিয়ে দেখবো একবার।

বাধ্য হয়েই শান্তনুকে সঙ্গ দিতে হয়। খালি পায়ে বালির ওপর দিয়ে হাঁটতে বেশ লাগে গীতার। একেবারে পাড়ে গিয়ে দাঁড়াতে একটু ভয়-ভয়ও করে। কি ভীষণ এক-একটা ঢেউ। একবার যদি পা ফসকে ঢেউয়ের মধ্যে পড়ে যায় তবে কি ওই বিশাল সমুদ্রের মধ্যে হারিয়ে যেতে হবে? কিন্তু ভয়ই বা কিসের, ওই তো অত লোক হাঁটছে, কয়েকটা মেয়ে, ঘোমটা-টানা একটা ফুটফুটে-মুখ বউ। বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলোও তো বেশ ছুটে গিয়ে ভেঙে-পড়া ঢেউয়ের সাদা ফেনায় পা ভিজিয়ে আসছে। তবে আর গীতার এত ভয় কেন।

তবু ঠিক সাহস হয় না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই দেখে গীতা, রুমাকে বুক থেকে নামিয়ে দিয়ে।

রুমাও আনন্দে হাততালি দিয়ে ওঠে, ছুটে যেতে চায় সাদা সাদা ফেনায় পা ভেজাবার

জন্যে।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, সমুদ্র দেখে ফিরে আসে। বাক্স-বিছানা যেমনকার তেমনি পড়ে আছে। গোছগাছ তো করতে হবে। তা ছাড়া সারাটা রাত ট্রেনে এসেছে, এক কাপ চা-ও পড়েনি পেটে।

শান্তনু তাই বললে, চলো, চা-টা খেয়ে পরে আসবে।

নিতান্ত অনিচ্ছায় ফিরে এলো গীতা। চা-ডিম-টোস্টের লোভ নেই ওর, তার চেয়ে যদি আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পেতো!

হোটেলের ঘরখানাও কিন্তু বেশ। সামনে এক টুকরো বারান্দা আছে, আর সেখান থেকেও সমুদ্র দেখা যায়, জেলেডিঙিগুলো দেখা যায়। নুলিয়ারা জাল শুকোয়, জাল মেরামত করে, মাতাল ঢেউয়ের মাথায় নৌকা ভাসাবার চেষ্টা করে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, কখনো বা ডেকচেয়ারে শরীর এলিয়ে দেখে গীতা।

শান্তনু এসে পাশে বসে, হাঁটু জড়িয়ে রুমা। কি সুন্দর এই পৃথিবী, জীবন, সময়। ভোরবেলায় উঠেই উনন ধরাবার তাড়া নেই, বাসন-মাজার ঝিয়ের সঙ্গে ঝগড়া নেই, আয়-ব্যয়ের হিসেব মেলানোর দুশ্চিন্তা নেই।

এমনি নিশ্চিন্ত আরাম, এত আনন্দ, এত সুখ যেন অসহ্য একটা ফুর্তির ঢেউ হয়ে ফেটে পড়তে চায় গীতার বুকের ভেতর।

—উঃ, এতদিন কোথায় ছিলাম বলো তো। অনুযোগের স্বরেই বলে গীতা। চোখ দুটো তার বড় বেশী উজ্জ্বল দেখায়।

সেই এক জোড়া সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে শান্তনুও যেন সব ভুলে যায়, মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থেকে হাসে। হাসি নয়, যেন গীতার কথায় সায় দেয়। সত্যিই তো, কোথায় ছিলো সে এত-দিন? একঘেয়ে জীবনের মধ্যে, দশটা-পাঁচটার ছকে বাঁধা দলাদলি অভাব-অসন্তোষের মধ্যে এতদিন নিজেকে খুঁজে পায়নি সে।

কিন্তু কতক্ষণ আর বসে থাকতে পারবে গীতা। রোদ তো অনেকক্ষণ হলো পড়ে গেছে, বালি ঠাণ্ডা হয়েছে, আবার রঙবেরঙের শাড়ির আগুন ছড়িয়ে একটার পর একটা মেয়ের দল চলেছে, পাড় ঘেঁষে। বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলোও ছুটছে, বালি ছুঁড়ছে, হাসছে, লুটোপুটি খাচ্ছে।

রুমাই বা কতক্ষণ লোভ সামলাবে। মা-র হাঁটু জড়িয়ে সে বরাবর নাকী সুরে আবদার ধরে, চলো না মা, সমুন্দুরের কাছে চলো না।

আচ্ছা, ওরা ওই কুড়োচ্ছে কি? ওই যে দুটি মেয়ে চলছে—ওরা মাঝে মাঝে ঝুঁকে পড়ে কি তুলছে? ও মা, ঝিনুক? হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই সকালে দেখেছিলাম বটে, ভাঙা-ভাঙা পড়ে ছিলো বালির ওপর। ওগুলো ঢেউয়ের সঙ্গে আসে? কি করে আসে? আমি ভেবেছিলাম কি জানো, বোধ হয় নুলিয়াদের—নুলিয়াই তো, ওই কালো কালো লোকগুলো?—ভেবেছিলাম ওদের জাল থেকে ছড়িয়ে পড়েছে।

ছুটতে ছুটতে রুমাকে নিয়ে বেরিয়ে আসে গীতা। এখন তো আর ভয় নেই ঢেউকে, শান্তনু না এলো তো বয়েই গেল। চল্ রুমু, আমরাও ঝিনুক কুড়ুই।

কিন্তু কেমন একটা অস্বস্তি লাগে গীতার। এক দল লোক—কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বসেছে মাদুর নয়তো শতরঞ্জি বিছিয়ে, গল্প করছে। খুব ফ্যাশন-করা ঢিলে-খোঁপা একটা বউ হেলে-দুলে হাসছে ওদের সঙ্গে, গল্প করছে।

ওদের দিকে তাকিয়ে অস্বস্তি বোধ করলো গীতা। ওদের চোখের সামনে ঝিনুক কুড়োবে ও? কুড়োলেই বা, ওই তো দূরে দূরে কয়েকটা গীতার বয়সী মেয়ে—কি আশ্চর্য, ঝিনুক কুড়োতে কুড়োতে এত দূর চলে গেছে? সেই বেজায় উঁচু লাইট-পোস্ট ছাড়িয়ে, রেল-হোটেল ছাড়িয়ে। কি সাহস রে বাপু!

আরে, রুমাও যে ঝিনুক কুড়োচ্ছে।—মা, মা, দেখো, কি সুন্দর একটা ঝিনুক পেয়েছি!

এরই ফাঁকে কখন অন্যমনস্ক হয়েছে গীতা, আর রুমা নেমে গেছে। ঝিনুকটা নিয়েই ফুর্তিতে চিৎকার করতে করতে ছুটে এলো রুমা।—দেখো, দেখো, কি সুন্দর একটা ঝিনুক!

আড়চোখে একবার শতরঞ্জি-বিছিয়ে-বসা দলটার দিকে তাকিয়ে নিয়ে ঝিনুকটা হাতে

নিলো গীতা। ছোট্ট একটা ঝিনুক, কি সুন্দর জুঁইফুলের মতো সাদা!

শান্তনু এসে দাঁড়িয়েছে পিছনে।

গীতা ঝিনুকটা দিলো তার হাতে। শান্তনু নিলো সেটা, হাসলো, রুমাকে ফিরিয়ে দিলো। তারপর বললে, দূর, এ তো কতই আছে, এর চেয়ে অনেক বড় বড় পাবে, কত রঙ-বেরঙের, কত সুন্দর সুন্দর...

গীতা আস্তে আস্তে, একটু লাজুক স্বরে বললে, চলো না একটু ওদিকে, আমরাও কুড়োবো।

—বেশ তো।

ধীর পায়ে একটু একটু করে এগোতে শুরু করলো ওরা। দু পা চার পা। একটা করে ঢেউ এসে পড়ে আর ছুটে যায় গীতা। রুমাও পিছনে পিছনে।

নুয়ে পড়ে ঝিনুক কুড়োয়। হাতের রুমালটাকে ইতিমধ্যে একটা থলের মতো করে নিয়েছে গীতা।

শান্তনু ধীরে ধীরে হাঁটছে, হাসছে মনে মনে, দেখছে গীতাকে। কি সুন্দর দেখাচ্ছে গীতাকে! এই ছেলেমানুষ, হাসিখুশী গীতাকে কোনো দিন যেন দেখেনি শান্তনু। দেখতে পায়নি।

একটা ক্যামেরা থাকলে ছবি তুলে রাখতো। গীতার এ চেহারা আগে কখনো চোখে পড়েনি কেন তার! এই উচ্ছল যৌবন। সমস্ত শরীর থেকে যৌবনের ছন্দ ঝরে পড়ছে। রঙিন ডুরে শাড়িটা টান-টান করে পরেছে গীতা, কোমরে জড়িয়ে নিয়েছে আঁচলটা। সুপুষ্ট সুডোল পিঠের ওপর শাড়িটা পাক খেয়ে গেছে. চিকচিক করছে ফর্সা ঘাড়, ঘাড়ের ওপর সরু হারটা, নিরাবরণ হাত আর কনুইয়ের ভঙ্গিটা কি অপরূপ, মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে কেমন লালচে আভা দিচ্ছে। সূর্য ডুবছে ওদিকে, নীল—নীল নয়, ধোঁয়াটে সমুদ্রের ওপর সূর্য ডুবছে। ঠিক একটা কলসী যেন উপুড় করে রেখেছে কেউ সমুদ্রের সীমান্তে। একটা লাল টকটকে কলসী—সিঁদুর-মাখানো। আর তার লাল আভার সঙ্গে রুপোলী মেঘের মাখামাখি।

—গীতা!

এতখানি হেঁটে এসে শান্তনুও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, সারা শরীর ঘেমে উঠেছে। ভিজে জবজব করছে পাঞ্জাবিটা।

শান্তনু আবার ডাকলে, এই গীতা! এবার চলো, ফিরি ওদিকে। আর কত কুড়োবে!

—দাঁড়াও না বাপু! জবাব দেয় গীতা। হাসতে হাসতে বলে, এই ছক-কাটা ঝিনুকটার একটা জোড়া পেলেই ফিরবো।

আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে শান্তনু, আরো কিছুটা হেঁটে যায় স্বর্গদ্বারের দিকে। না, ফেরবার নাম নেই গীতার। রুমাও ঝিনুক কুড়োতে কুড়োতে চলেছে।

এবার একটু রাগত ভাব ফোটে শান্তনুর গলার স্বরে। বলে, আমি চললাম। যাও যত দূর তোমার খুশি। রুমা, রুমা, তুমি ফিরে এসো।

—বেশ, বেশ। আমি যেন একা যেতে পারি না, অত কি ভয় দেখাচ্ছো মশাই, যাও না ফিরে। উত্তর দেয় গীতা। কিন্তু ঝিনুক কুড়োনোর কাজ থামে না তার।

আর রুমা যেন শুনতে পায়নি এমন ভাব করে।

পা টনটন করে শান্তনুর, ক্লান্তিতে সারা শরীর অবসন্ন, কম হেঁটেছে নাকি সে। তবু বাধ্য হয়েই আরো দু-চার পা এগোতে হয়। আবছা অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, এই ভিড়ে ফেলে রেখে তো চলে যেতে পারে না।

আরেকবার ধমক দিয়ে সত্যিই ফিরতে শুরু করে শান্তনু।

গীতা একবার ফিরে তাকায়, নিজের মনেই হাসে, তারপর আবার ঝিনুক কুড়োনোয় মন দেয়। বাবু খুব চটেছেন বোধ হয়। কিরকম দপদপ করে পা ফেলছে দেখো। বাঃ রে, সবাই তো ঝিনুক কুড়োচ্ছে। ঝিনুক না কুড়িয়ে করবোই বা কি? বসে বসে সমুদ্র দেখবো?

এবার সোজা হয়ে দাঁড়ালো গীতা। উঃ, কোমর টনটন করছে. পিঠের শিরদাঁড়াটা যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। অসীম ক্লান্তিতে পা দুটো ভারি হয়ে গেছে। পা টানতে পারছে না। সকালে সেই যে পায়ে গোদ নিয়ে একটা পান্ডা এসেছিলো, ওর পা দুটোও যেন তেমনি

ভারি হয়ে গেছে।

নাঃ, বেশী দূর চলে যায়নি শান্তনু। ওই তো দেখা যাচ্ছে ওর ছায়া-ছায়া শরীরটা।

রাগে দপদপ করতে করতেই ফিরে আসছিলো বটে শান্তনু, তবু দু-চারবার পিছন ফিরে তাকিয়েওছিলো। যখন দেখলে, গীতাও ফিরছে এক হাতে ঝিনুকের থলি নিয়ে আরেক হাতে রুমাকে টানতে টানতে, তখন আরো দ্রুত চলতে শুরু করলে শান্তনু।

যেতে যেতে এক জায়গায় দেখলো একটা ছোট্ট দল বসেছে। দুটি মেয়ে, একটি বুড়ো বোধ হয় মেয়ে দুটির দাদু, আর তিনটি ছোকরা গোছের।

কয়েকটা চায়ের পেয়ালা নিয়ে জাঁকিয়ে বসেছে বুড়ো, কমবয়সী মেয়েটি কেটলি থেকে চা ঢেলে দিতে দিতে আদুরে সুরে রসিকতা করছে দাদুর সঙ্গে। হাসছে সবাই।

বেশ লাগছে মেয়েটিকে। দুবার ফিরে তাকালো শান্তনু তার দিকে। তারপর বালি মাড়িয়ে মাড়িয়ে হোটেলের সামনে এসে হোটেলের নিয়ন-আলোয় ভেজা নরম বালির ওপর বসে পড়লো। গীতা যখন আসে আসবে। কোথায় তোয়ালে বিছিয়ে পাশাপাশি বসে গল্প-গুজব করবে, ঢেউ দেখবে, আকাশ দেখবে, তা নয় তিন মাইল হেঁটে বেড়াও তার পিছনে পিছনে।

গীতার ওপর যত না রাগ হচ্ছিলো, তার চেয়ে বেশী রাগ হচ্ছিলো ঝিনুকের ওপর। কি অমূল্য জিনিস, চারটে পয়সা দিলে নুলিয়াদের ছেলেগুলো এক রাশ এনে হাজির করবে।

সমুদ্রের বুকের গুমগুম ধ্বনির মতোই শান্তনুর বুকের ভেতরটাও যেন গুমরে উঠছিলো, রাগে, ক্ষোভে।

বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে, অন্ধকার হয়ে গেছে কোন ফাঁকে, চাঁদ উঠেছে, ভাঙা চাঁদ। বসে জিরিয়ে এতক্ষণে শরীরের ক্লান্তিটা যেন জুড়িয়ে নিয়েছে শান্তনু।

ওদিকে কয়েকটা লোক ঘিরে দাঁড়িয়ে কি যেন দেখছে। উৎসুক চোখে সেদিকে তাকালো শান্তনু, কিন্তু উঠে যেতে ইচ্ছে হলো না। এদিকে গীতাও এসে পেঁচেছে। না, একটাও কথা বলবে না শান্তনু, একটাও না। ওর যা খুশি করুক, শান্তনু শুধু চুপচাপ বসে থাকবে। সমুদ্র দেখবে। তারপর একসময় একা-একাই হোটেলে ফিরে যাবে।

কিন্তু গীতা অমন রাগ-অভিমান অনেক দেখেছে। শান্তনু যে চটেছে, মনে মনে ফুলছে, তা জানে গীতা। কিন্তু জানতে দেবে কেন!

গীতা এসেই ধুপ করে বসে পড়লো শান্তনুর পাশে।

—আসবার সময় আহ্লাদীকে দেখলে? হাসলো গীতা।

এত যে রেগেছিলো শান্তনু, এত সব প্রতিজ্ঞা করে বসেছিলো কথা বলবে না বলে, সব রাগ জল হয়ে গেল।

বললে, আহ্লাদী কে?

—কেন, ওই যে ন্যাকা-ন্যাকা মেয়েটা, কেটলি-হাতে দাদুর সঙ্গে রসিকতা করছে।

—ওর নাম আহ্লাদী কে বললে?

হাসলো গীতা।—আমি নাম দিয়েছি।

শান্তনু ভেবেছিলো গীতার নেশাটা এক দিনেই কেটে যাবে। ভুল ভেবেছিলো। পরের দিন সকাল না হতেই দেখলো কুড়োনো ঝিনুকগুলো নিয়ে বসেছে সে। জলে ধুয়ে তার বালি পরিষ্কার করে দামী টার্কিশ তোয়ালের ওপর সেগুলো বিছিয়ে রোদে দিচ্ছে।

—একটা কৌটো কোথায় পাই বলো তো? গীতা নিজের মনেই যেন প্রশ্ন করলো।

তারপর অপরূপ হিল্লোলে ঘুরে দাঁড়িয়ে একটা তর্জনী তুলে নিজেই বললে, ঠিক হয়েছে, রুমার গুঁড়ো দুধের টিনটা...

ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে কৌটো থেকে সামান্য দু-দশ চামচ যা গুঁড়ো দুধ ছিলো, সেটুকু কাগজের মোড়কে ঢেলে রেখে কৌটোটা পরিষ্কার করতে শুরু করলো।

সারাটা দিন ওই এক কাজ। মা আর মেয়ে দিনরাত কেবল ঝিনুক নিয়ে মেতে আছে। গীতার দেখাদেখি রুমাকেও যেন ওই এক নেশায় পেয়েছে। শান্তনু দেখে আর হাসে। কখনো বা বিরক্ত হয়। তবু রুমাকে নিয়ে গল্প করে, আদর করে, গায়ে বুকে তাকে আঁকড়ে ধরে হাসাহাসি করে সময় কাটছিলো শান্তনুর। সেটুকু আনন্দও যেন কেড়ে নিয়েছে ওই ঝিনুকের

নেশা। রুমাকে আধখানা কেড়ে নিয়েছিলো গীতা, বাকী আধখানাও কেড়ে নিলো তার ঝিনুকের নেশা।

কি অসীম ধৈর্য গীতার! ভাবে শান্তনু। কখনো ঝিনুকের রাশি সাবান-জলে ধুয়ে রাখছে, রোদে শুকোতে দিচ্ছে, কৌটোয় ভরে রাখছে কখনো, আবার দু মিনিট পরেই সেগুলো বের করে জোড়া মিলিয়ে দেখছে, রঙ মিলিয়ে দেখছে। 'জানো, এই ঝিনুক দুটো দিয়ে না, তোমাকে কি সুন্দর একটা ছাইদানি করে দেবো দেখো। কাপড়ের ওপর এই রঙিন ঝিনুক বসিয়ে কি চমৎকার একটা পর্দা হবে দরজার। সাদা ঝিনুকগুলো বসিয়ে একটা পয়সা-রাখার কৌটো হবে বেশ ভালো, না?' এমনি একটা-না-একটা কথা সারা দুপুর।

আর সকাল না হতেই রুমার হাত ধরে ছুটবে সমুদ্রের পাড়ে, বালির ওপর যেখানে ঢেউয়ের ওপর ঢেউ আছড়ে পড়ছে, আর ঢেউয়ের সঙ্গে রাশি রাশি ঝিনুক। সন্ধ্যেবেলাও ওই একই কাজ। ঝিনুক কুড়োতে কুড়োতে কত দূর যে চলে যায় গীতা, শান্তনুর চোখের নাগাল থেকেই নয়, তার মনের নাগাল থেকেও।

এমনি করেই কাটছিলো দিনগুলো—গীতার উচ্ছল আনন্দ আর শান্তনুর অসীম বিরক্তিতে। কত কি ভেবে এসেছিলো শান্তনু, কত রঙিন স্বপ্ন দেখেছিলো। ভেবেছিলো, সেই যেদিন ফুলের সৌরভ আর সানাইয়ের সুরে প্রথম পরিচয়ের মোহ জেগেছিলো তার চোখে, তেমনি আনন্দের বিশ্রামে গা ভাসিয়ে দেবে। কিন্তু সব স্বপ্ন বুঝি ভেঙে যেতে চলেছে।

হয়তো ভেঙেই যেতো শান্তনুর স্বপ্ন, তার আগে নেশাই ভেঙে গেল গীতার একটা ঘটনায়।

প্রতি দিনের মতোই ঢেউয়ের গায়ে পা ভিজিয়ে চলেছিলো গীতা আর রুমা। যেতে যেতে গীতা হঠাৎ দেখলে, বালির ওপর একটি ছেলে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে কি সুন্দর সুন্দর সব মূর্তি আঁকছে! ঠিক যেন মন্দিরের গায়ের মূর্তির মতো।

অন্যমনস্ক হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো গীতা, মুগ্ধ হয়ে দেখছিলো ছেলেটিকে। দেখছিলো তার আঙুলের জাদু।

আর ঠিক তখনই চিৎকার করে উঠলো রুমা। ছুটে এলো গীতা, দূর থেকে শান্তনুও ছুটে এলো। কোনোরকমে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে শান্তনু টেনে তুললো রুমাকে।

ধক্ করে উঠেছিলো গীতার বুক, নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো সে। অন্যমনস্ক হয়েই ঝিনুক কুড়োচ্ছিলো রুমা, আর একটা আচমকা বড় ঢেউ এসে আর একটু হলেই তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলতো সমুদ্রের দিকে।

চিৎকার শুনে আরো কয়েকজন জড় হলো।

আর শান্তনুর মনের রাগ হঠাৎ ফেটে পড়লো গীতার ওপর। দিনে দিনে যে রাগ পুঞ্জীভূত হচ্ছিলো, সেটা এই ঘটনায় ফেটে পড়লো অভদ্রভাবে, রূঢ় স্বরে—তোমার ওই ঝিনুকের নেশাই একদিন মেয়েটাকে খুন করবে।

আর জড়-হওয়া মেয়েপুরুষদের সামনে শান্তনুর ধমক খেয়ে লজ্জায় মরে গেল গীতা। শুধু লজ্জা নয়, ক্রোধও জমে উঠলো তার বুকে। শান্তনুর প্রতিটি কথা যেন সেই গল্পে-শোনা বিষাক্ত সামুদ্রিক মাছটার লেজের ঝাপট।

একটাও কথা বললো না গীতা। চুপচাপ হোটেলের পথে ফিরে এলো সে, অভিমানে ভেঙে পড়তে চাইলো তার মন।

এতদিনের নিরানন্দ একঘেয়ে জীবনে, এত অভাব-অনটন ব্যথা-ব্যর্থতার মধ্যেও কোনো দিন শান্তনু তাকে এভাবে অপমান করেনি।

এতগুলি লোকের চোখের সামনে শান্তনু যেন চিৎকার করে জানিয়ে দিয়েছে, তাদের এই হাসি-ফুর্তি, আনন্দ আর তৃপ্তির উচ্ছ্বাস যেন একটা মেকী জীবনের মুখোশ। যেন এসবের আড়ালে তারা রিক্ত, বঞ্চিত, মিথ্যা।

একটাও কথা বললো না আর গীতা।

একবার ভাবলে, ঝিনুকের কৌটোটা আর খুলবে না। যাবে না সমুদ্রের পাড়ে। ঝিনুক কুড়োবে না।

কিন্তু শান্তনুকে জবাব দেবার জন্যেই যেন নতুন উৎসাহে ঝিনুক কুড়োতে শুরু করলো

সে। চাঁদনী রাতের আবছা আলোয় যত দূর চোখ যায়, চলে যেতো ঝিনুক কুড়োতে কুড়োতে, তার চেয়েও দূরে।

না কি শান্তনুই দূরে চলে গেল? গীতার কাছ থেকে, গীতার পৃথিবী থেকে!

শান্তনু আর কোনো কথা বললো না। আর কোনো কথা বলেনি কোনো দিন।

তারপর কত বছর কেটে গেছে। সেই সমুদ্রের মুক্তি থেকে একঘেয়ে জীবনের বন্ধনে ফিরে এসেছিলো ওরা। কাজে, কর্তব্যে, নিরলস ক্লান্তিতে।

কত কত দিন পার হয়ে গেছে তারপর, কত বছর। সেই তিক্ত অথচ তৃপ্ত দিনগুলোকে যেন ভুলেই গিয়েছিলো গীতা।

ভুলে যেতে বাধ্য হয়েছিলো। স্বামীর মৃত্যুর পর কত কিছুই তো ভুলে গেছে সে। শুধু ভোলেনি, সংসারের সব দায়িত্ব এখন তার ওপর। রুমার দায়িত্ব, তার নিজের ভার।

তবু এক-একদিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তার শরীরের দিকে তাকিয়ে তার শরীরে-জড়ানো শ্বেতশুভ্র থান কাপড়ের দিকে তাকিয়ে শিউরে ওঠে গীতা।

আজ সকালেও তেমনি শিউরে উঠেছিলো। কি আশ্চর্য, এতবার চেষ্টা করেও শান্তনুর মুখখানা মনের পটে স্পষ্ট করে আঁকতে পারেনি সে। কেমন একটা অস্পষ্ট ছায়া-ছায়া স্মৃতি শুধু। ব্যথা নেই, বেদনা নেই, শুধু একটা অবোধ্য মায়া। আর কিছু নয়।

এই বাড়ি, যার আলোয় বাতাসে শান্তনুর স্মৃতি জড়িয়ে আছে, ভেবেছিলো গীতা, সেই বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার মুহূর্তে একবার শান্তনুর মুখখানা মনের চোখে জাগিয়ে তুলতে, জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলো সে, পারেনি।

কি আশ্চর্য, এমন যে হবে, এমনভাবে হারিয়ে যাবে শান্তনু, ভাবতে পারেনি গীতা।

খাট-আলমারি, আসবাবপত্র নামানো হয়েছে। একটা একটা করে জিনিসপত্র নিয়ে গিয়ে তোলা হচ্ছে লরীটায়।

আলমারিটা সরাতেই দেয়ালের শেল্‌ফে চোখ গেল গীতার।

মাকড়সার জাল আর ঝুলে ঢাকা ওটা আবার কি?

এগিয়ে গেল গীতা। তুলে আনলো। ঝনঝন একটা শব্দ হলো। কি আছে এর ভেতর, এই কোণে পড়েই বা আছে কেন?

একটা গুঁড়ো দুধের টিন।

ভিতরে কি আছে দেখবার জন্যে কৌটোটা খুললো গীতা। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা দুর্গন্ধ বেরিয়ে এলো।

ঝিনুক। ঝিনুক, রাশি রাশি রঙ-বেরঙের ঝিনুক!

কৌটোটা নিয়ে রাস্তায় ফেলে দিতে গেল গীতা। কি বিশ্রী দুর্গন্ধ কৌটোটার।

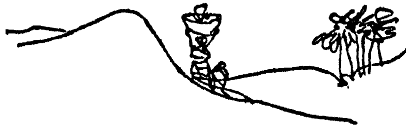
বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো গীতা। কৌটোটা ফেলতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালো।

পারলো না। ভুলে-যাওয়া সেই দিনগুলির ঝাপসা একটা স্মৃতি জেগে উঠলো চোখের সামনে।

আট বছর এই কৌটোটার কথা মনেই ছিলো না তার, হয়তো এর পরও আর মনে পড়বে না। তবু ওটা ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারলো না গীতা। একটা দীর্ঘশ্বাসের চাদরে সযত্নে মুড়ে রাখলো।

শান্তনুও বুঝি তার জীবনে এমনি এক ঝিনুকের কৌটো!

[১৩৬৭



আহ্লাদী

সুবর্ণরেখা নদীটা এখান দিয়েই এঁকেবেঁকে নেমে গেছে। সামনে উঁচুনীচু অসমতল প্রান্তর। কোথাও গভীর খাদ, কোথাও বা ঢল ঢিবি, বিরাট এক এক খণ্ড পাথর। দূরের পাহাড় থেকে কবে কোন্ যুগে পাথরের চাঙড়গুলো গড়িয়ে পড়েছিলো কেউ জানে না। কিংবা কে জানে, হয়তো কোনো পাহাড়ী বন্যার স্রোতে ভেসে এসে এমনি বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে।

খানিকটা এগিয়ে গিয়েই রেলের লাইন, তার এপারে লাক্ষার বাগান। ওপারে কয়েকটা রেলের কোয়ার্টার। তারপর লাক্ষাবাজার। শনিচারীর হাটের দিনে সারা এলাকা গমগম করে ওঠে হাটুরেদের চিৎকারে, গাঁওওয়ালীদের হাসি-হল্লায়।

লাক্ষাবাজার পার হয়ে আবার উঁচুনীচু অসমতল ক্ষেত, কোথাও বা অনুর্বর শুখা মাটি। ধীরে ধীরে চড়াই উঠেছে সেখান থেকে, নির্জন উপত্যকা সিঁড়ির মতো ধাপে ধাপে উঠে গেছে ময়না চৌকিদারের কুঠির দিকে। নিঃসঙ্গ নিঃশব্দ প্রান্তরের বুকে অন্ধকার রাত্রিতে সেখানে কোনো দিন আলো জ্বলে, কোনো দিন জ্বলে না। দিনের আলোয় কিন্তু কুঠরিটা অনেক দূর থেকে দেখা যায়। দেখা যায় আরো দূরের রূপসি পাহাড়, রূপসি পাহাড়ের ঘন গভীর বন। দেহাতী লোকেদের মুখে সে বনের নাম জঙ্গলখান্ড্।

এঁকেবেঁকে নীচে নেমে যাওয়া নদীর বাঁকে, রেললাইনের শেষ প্রান্তের লাল পাখনার সঙ্গে যেখানে আকাশ মিশে গেছে, সেখানে তখন সূর্যাস্তের রক্তমেঘ ধীরে ধীরে নীলাভ হয়ে আসছে।

ময়না চৌকিদারের বাচ্চা ছেলে দামু একবার ফিরে তাকালো সেদিকে, তারপর বাঁশের বাতা দিয়ে ঘেরা মিঠা আলুর বাগানের বাইরে এসে দাঁড়ালো কালো আর রুক্ষ পাথরের চাঙড়টার ওপর। এখান থেকে অনেক দূর অবধি দেখা যায়; রূপসি পাহাড়ের শেষ বাঁক পর্যন্ত।

কোমরের কালো ঘুনসিতে একটা আঙুল গুঁজে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো দামু, জঙ্গলখান্ডের দিকে চোখ মেলে। প্রতি দিন এমনি আশায় আশায় এসে দাঁড়ায় ও, অঘোন বল্লমীর পথ চেয়ে।

যত দূর চোখ যায় জনার আর কলাইয়ের ক্ষেত। মাঝে মাঝে দু-চার ছটাক সরষের। ক্ষুদে ক্ষুদে হলুদ রঙের ফুল ফুটে আছে। তারই ফাঁকে ফাঁকে সাদা ধুলোর সরু রাস্তা। এই পথ ধরেই নেমে আসে অঘোন, নেমে আসবে। আঁকাবাঁকা রাস্তাটা যেখানে শাল আর শালাই গাছের ভিড় থেকে হঠাৎ মুখ বাড়িয়েছে, তারপর ছোট্ট টিলাটার আড়ালে পড়া জলো ডোবাটায় ডুব দিয়েই একেবারে ঢিবিটার ওপর এসে পেঁছেছে, সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো দামু।

তারপর হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলো, দূরে—অনেক দূরে অঘোনের অস্পষ্ট শরীরটা চোখের সামনে ভেসে উঠতেই। আসছে। অঘোন বল্লমী আসছে। হাতের লম্বা বর্শাটা আগে আগে, পিছনে বেঁটেখাটো জোয়ান চেহারার মানুষটা।

একটা গভীর কাটা কালো দাগ রূপসি পাহাড়ের শুখা ঝরনার মতো তার কপাল থেকে এঁকেবেঁকে এসে নেমেছে চিবুকের কাছে। বেঁটেখাটো চেহারা, কিন্তু বুক আর কাঁধ—দুটো মানুষের। বাবরি চুলে লাল কাঁকই এঁটে, কাঁধে একটা চিতাবাঘের চামড়া ফেলে প্রতি দিন এ পথ দিয়ে জঙ্গলখান্ডে যায় অঘোন বল্লমী, আর ফিরে আসে ঠিক এই সময়টায়। তার পায়ের তালে তাল মিলিয়ে দোলে হাতের বর্শাটা।

দূর থেকে দামুকে দেখতে পেয়েই হাসে জোয়ান লোকটা। সকালে যাবার সময় বলে যায়, আনব, লিচ্চয় আনব দামুভাই।

আর ফেরার পথে সেই এক উত্তর, পেলাম নাই, আজ পেলাম নাই দামুভাই, কাল লিচ্চয় আনব।

তারপর ফিসফিস করে প্রশ্ন করে, বুনটারে তোর দেখছি নাই ক্যানে? লদীকে যেছে?

এ কথার কোনো জবাব দেয় না দামু, রাগে অভিমানে ছুটে পালায় ও। আর সঙ্গে সঙ্গে হো-হো করে সশব্দে হেসে ওঠে অঘোন। বাচ্চা ছেলে দামুর মনে হয়, মানুষ লয়, যেন একটা পাহাড় হাসছে।

এদিকে টালির ছাদের ছোট্ট ঘরখানার ভেতর লোহার কড়াইটা উনুনের ওপর উলটে বসিয়ে জনারের রুটি সেঁকতে সেঁকতে রংলী সে হাসি শুনতে পায়। শুনে কেমন যেন ভয়-ভয় করে তার।

তাই দামুকে ধমক দিয়ে বলে, উ ডাকুটার সাথে তু কথা কইবি না, হুঁ!

—এঃ, ডাকু! দামুর ছোট্ট কপালটা কুঁচকে ওঠে। বলে, উ তো লিষাদ বটে, লিষাদ।

অর্থাৎ শিকারী।

কিন্তু নিষাদই হোক, ডাকাতই হোক, অঘোনকে বড় ভয় রংলীর। অঘোনের হাসিকে।

জমির ঢল নেমে নেমে লাক্ষার বাগান, রেলের লাইন, তারও নীচে সুবর্ণরেখা নদী। রূপসি পাহাড়ের আড়ালে ভোরের আলো ফুটতে না-ফুটতে মাটির কলসীটা মাথায় নিয়ে হেলে-দুলে প্রতি দিন যখন নদী থেকে জল আনতে যায় রংলী, তখন কোনো কোনো দিন মাঝপথে অঘোনের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তার। চোখোচোখি হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে পাহাড় কাঁপিয়ে হেসে উঠে অঘোন। ভয়ে জড়সড় হয়ে তরতর করে নদীর দিকে যেতে যেতে রংলী নিজের মনেই বলে, মানুষ লয়, মহিষ বটে, মহিষ।

সত্যিই বুঝি তাই। নদীতে গা ডুবিয়ে বসে থাকে যে মোষের দঙ্গল, যার পিঠে চড়ে দু-একটা বাচ্চা ছেলে এপার-ওপার করে, অঘোনও যেন তেমনি একটা গোঁয়ার মোষ।

তাই দামুকে ধমক দেয় রংলী রুটি সেঁকতে সেঁকতে। বলে, উয়ার সাথে কথা কইবি না দামু, উ ডাকু বটে।

—হঃ, কইবোনি! ভেংচে ওঠে দামু। বলে, অঘোন আমারে হরিল আনে দিবে, কথা কইবোনি!

হরিণ। একটা হরিণছানার বড় সাধ দামুর। আর সেই জিনিস যে এনে দেবে বলেছে, সে কিনা ডাকু! অঘোনের উদ্দেশে যত গালাগালি দেয় রংলী, ততই রংলীর ওপর চটে যায় দামু।

আবার অঘোনের ওপরও রাগ হয়, অভিমান হয়, যখন ফেরার পথে রোজই অঘোন ঐ এক কথা বলে।—আজ পেলাম নাই দামুভাই, কাল লিচ্চয় আনব। লিচচয়, লিচচয়।

বিশ্বাস করে না দামু, আবার অবিশ্বাস করতেও সাহস হয় না। তাই প্রতি দিনের মতো সেদিনও এসে দাঁড়ালো ও উঁচু ঢিবিটার ওপর। তাকিয়ে রইলো জঙ্গলখানুডের দিকে, রূপসি পাহাড়ের আঁকাবাঁকা পথের দিকে।

তারপর একসময় দূরের ছোট্ট কালো বিন্দুটা একটু একটু করে স্পষ্ট হয়ে উঠলো দামুর চোখের সামনে, অঘোনের চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

আশায় উৎসাহে পায়ে পায়ে এগিয়ে চললো দামু। দূর থেকে দেখে একবার মনে হলো, কি যেন রয়েছে অঘোনের কাঁধে। পরক্ষণেই বুঝলো, চিতাবাঘের চামড়াটা। অঘোন যত এগিয়ে আসে, ততই তার পিছনে কিছু আছে কি না লক্ষ করার চেষ্টা করে ও। হরিণছানা আনলে নিশ্চয় দড়িতে বেঁধে টানতে টানতে আনবে অঘোন। কিন্তু কই? পিছনে তো কিছুই নেই।

ততক্ষণে টিলার ওপাশের খাদটায় ডুব দিয়ে মিনিট কয়েক পরেই একেবারে ঢিবিটার ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে অঘোন। আর দামুর মনে হলো...

হ্যাঁ, চোখ দুটো চকচক করে উঠলো দামুর, মুখে হাসি ফুটলো।

ছুট, ছুট, একেবারে ছুটতে ছুটতে এসে মাঝপথেই ধরলো সে অঘোনকে। হাঁপাতে হাঁপাতে আনন্দে হাততালি দিয়ে ছাগলছানার মতো তিড়িং তিড়িং করে নাচতে শুরু করলো!

না, চিতার চাম লয়। অঘোনের বগলে হরিণছানাটা স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলো দামু। হরিল, হরিলের ছানা!

খুশী-খুশী চোখে দু হাত বাড়িয়ে বাচ্চাটা নেবার চেষ্টা করলো দামু। আর অঘোন বললে, দিব, দিব, ঘরকে চল ক্যানে। তুয়ার লেগেই আনছি, দিব রে, লিঘ্যাৎ দিব।

তবু ধৈর্য ধরতে রাজী নয় দামু, একবার হাতে পেলেই যেন স্বর্গ হাতে পায়।

অঘোন তবু হাসে আর বলে, পালায় যাবে, পালায় যাবে। ঘরকে চল, দিব।

কিন্তু না, একবার অন্তত ওর গায়ে হাত দেবে দামু।

হরিণের পিঠে হাত বুলিয়ে ফুর্তিতে আনন্দে চোখ বুজলো ও। টেনে টেনে বললে, কি লরম!

তারপর অঘোনের আগে আগে ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরলো দামু। চিৎকার করে ডাকলে, বাপু! বাপু রে! বুন, অরে অ বুন! হরিল আনেছে, হরিল!

চিৎকার শুনে বেরিয়ে এলো ময়না চৌকিদার, পিছনে পিছনে রংলী। কপাটের আড়ালে দাঁড়িয়ে পায়ের বুড়ো আঙুলের নখে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে আড়চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো সে হরিণের বাচ্চাটাকে।

দামু তখনো ছাগলছানার মতো তিড়িং তিড়িং করে নাচছে, আর মাঝে মাঝে হরিণটার গায়ে হাত বুলিয়ে বলছে, কি লরম; বাপু, কি লরম!

অঘোন হেসে বললে, একটা রশি লিয়ে আয়, বাঁধে রাখতে হবে।

হরিণের বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রংলীর মনটাও কেমন নরম হয়ে গেল। অঘোনকে একটুও আর ভয় লাগলো না। একটা দড়ি খুঁজে এনে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল ও।

অঘোন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কৌতুকে হাসলো, তারপর দড়িটা নিয়ে আঙিনার সজিনা গাছের গুঁড়িতে বাচ্চাটাকে বেঁধে দিলো।

রংলীর দিকে একবার, ময়না চৌকিদারের দিকে একবার তাকিয়ে দামুর গালটা টিপে দিয়ে অঘোনও ঠাট্টার সুরে বললে, কি লরম! বলেই হেসে উঠলো।

সঙ্গে সঙ্গে ময়না চৌকিদার আর রংলীও।

ঘুম ছুটে গেল দামুর চোখ থেকে। সারাটা দিন কলাইয়ের ক্ষেতে, রেললাইনের পাথর কুড়িয়ে, দিদির সঙ্গে নদীর জলে হুটোপুটি করে সন্ধ্যে হতে না-হতেই যে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়তো সেই বাচ্চা ছেলেটা যেন মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেছে।

এত আনন্দ, এত ফুর্তির স্বাদ যেন কোনো দিন পায়নি দামু। আর কোনো আশা নেই, আর কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই, মুঠোর মধ্যে যেন স্বর্গ পেয়ে গেছে।

তবু বাপের ধমক খেয়ে চাটাইয়ে শুয়ে পড়তে হলো ওকে, আর রংলীকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে শুয়েও খটখট খটখট শব্দটার দিকে কান পেতে রইলো।

হরিণটার চোখেও বুঝি ঘুম নেই। সারা রাতই কি এমনিভাবে সজিনা গাছটাকে পাক দেবে নাকি ঘানির বলদের মতো? খটখট খটখট—একটানা ক্ষুরের শব্দ। ঘুরছে, ঘুরছে, অবিরাম ঘুরছে শুধু।

সন্ধ্যার আবছা আলোয় বাচ্চাটাকে ভালো করে দেখতে পায়নি দামু। গায়ের ফুটফুট সাদা ফোঁটাগুলো মনে হয়েছে খুব ছোট। সেবার লাক্ষাবাগানের বাবুরা একটা বড় হরিণ শিকার করে নিয়ে গিয়েছিলো, বড় বড় সাদা দাগ ছিলো তার গায়ে! কিন্তু এ হরিণছানাটার গায়ে ফোঁটাগুলো এত ছোট কেন? বয়স বাড়লে কি এর গায়ের দাগগুলোও বড় হবে? আর সুন্দর হবে?

কে জানে!

শুয়ে শুয়ে কত কি স্বপ্ন দেখে দামু। নানান ভয় আর আশঙ্কা। হরিণের বাচ্চাটাকে নিয়ে কি করবে কিছুই যেন ঠিক করতে পারছে না ও।

এক-একবার ইচ্ছে হয় পা টিপে টিপে উঠে গিয়ে দেখে আসে বাঁশের বেড়ার ফটকটা বন্ধ আছে কি না। কেবলই ভয় হয়, শেয়াল-খাটাশে না নিয়ে যায়। কিন্তু সাহস হয় না। বাপু দেখতে পাবে, দিদি জেগে উঠবে। আর, আর রাতকে বড় ভয় দামুর, অন্ধকারকে।

তাই শুয়ে শুয়ে হরিণছানাটার একটানা ক্ষুরের শব্দ শুনতে শুনতে নানান কথা ভাবতে শুরু করলো ও। কোত্থেকে কচি কচি পাতা ভেঙে আনবে, নদীতে নাহাতে নিয়ে যাবে কি না।

এমনি সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলো, ও নিজেই জানে না।

যখন ঘুম ভাঙলো তখনো ফরসা হয়নি। ধড়মড় করে বিছানা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলো দামু।

পাহাড়ের আড়াল থেকে উঁকি দেওয়া আকাশটা তখন চাঁদির মতো চিকনাই দিতে শুরু করেছে। কিন্তু সেদিকে চোখ গেল না দামুর, প্রতি দিনের মতো পাথরের চাঙড়টার ওপর গিয়ে দাঁড়ালো না অঘোনের অপেক্ষায়।

শালকাঠের জাফরি-কাটা দরজাটা ঠেলে বাইরে এসে দাঁড়ালো ও, দেখলে হরিণটা তখনো খটখট খটখট ক্ষুরের শব্দ বাজিয়ে পাক দিচ্ছে সজনে গাছটাকে। দামুকে দেখতে পেয়েই বুঝি চমকে উঠলো বাচ্চাটা, স্থির হয়ে দাঁড়ালো! টানা-টানা বড় বড় চোখ জোড়া তার ঠায় তাকিয়ে রইলো দামুর দিকে। কান দুটো তার খাড়া হয়ে উঠলো। দুটি গভীর কালো চোখ যেন কি বলতে চায়। কান দুটো যেন কি শুনতে চায়। দামুকে নয়, যেন অনেক দূরের, দামুকে পার হয়ে আরো অনেক—অনেক দূরের দিকে তাকিয়ে আছে চোখ দুটো। বুঝি বা হারিয়ে যাওয়া অরণ্যের পাতার খসখসানি শুনতে চায়।

কিন্তু অতশত বুঝলো না দামু। ও ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলো বাচ্চাটাকে, কোলে তুলে নিলো। তার নরম পিঠে গাল ঘষলো গভীর আবেশে। মনে মনে বললে, আঃ, কি নরম!

পরক্ষণেই ওর মনে হলো, আহা, বেচারী সারা রাত ভুখা আছে।

এদিক-ওদিক তাকালো দামু। না, বাপ তার ঘুমোচ্ছে এখনো, রংলীও!

সারি সারি ভেলি বানিয়ে মিঠা আলুর চাষ করেছে ময়না চৌকিদার, সবুজ সবুজ তাজা লতায় ভরে আছে ভেলিগুলো। চালকুমড়োর চারাটার দিকে একবার লোভের চোখে তাকালো ও, তারপর মিঠা আলুর পাতা ছিঁড়তে শুরু করলো পটপট করে।

এক রাশ পাতা ছিঁড়ে সবে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে, আর চোখোচোখি হয়ে গেল রংলীর সঙ্গে।

একটা বেপরোয়া ভাব ফুটে উঠলো তার চোখে-মুখে। রংলী দেখেছে তো দেখুক গিয়া, ডরায় নাকি সে বুনটারে!

যেন কিছুই ঘটেনি, যেন রংলী দেখলেও কিছু আসে-যায় না। পটপট করে আরো কিছু পাতা ছিঁড়ে নিয়ে রাঙা আলুর শাকগুলো এনে ফেললো সে হরিণছানাটার সামনে। হরিণটা কিন্তু হঠাৎ চমকে উঠে যেমন অপলক তাকিয়ে ছিলো রংলীর দিকে তেমনি তাকিয়ে রইলো।

দামু বললে, লে, খা, খা, ভুখা আছিস তো খায়ে লে।

সত্যিই যেন দামুর কথাটা বুঝতে পারলো হরিণটা। দুটো পাতা চিবিয়েই কিন্তু মুখ তুলে নিলো, ঠায় তাকিয়ে রইলো আবার রংলীর দিকে। তারপর আবার একবার চমকে উঠেই খটখট খটখট ক্ষুরের শব্দ তুলে সজনে গাছটা পাক দিতে শুরু করলো।

আর রংলী এবার চিৎকার করে ডাকলে, বাপু, বাপু, মিঠা আলুর শাকগুলা দামু অর আহ্লাদীরে খাওয়াইছে।

আহ্লাদী! নামটা ময়না চৌকিদারেরও পছন্দ হয়ে গেল। বললে, মাদী বটে, আহ্লাদীই নাম হবে হরিণটার!

সত্যিই বুঝি আহ্লাদী। বাচ্চা ছেলে দামু সব অভাব ভুলে গেল হরিণছানাটা পেয়ে। নিজের মনেই দিনরাত কথা বলে তার সঙ্গে, মাঠে মাঠে ঘুরে তার জন্যে কচি কচি মহুয়া আর আমলকীর পাতা ভেঙে আনে। জড়িয়ে ধরে আদর করে, চুমো খায়।

ময়না চৌকিদার তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে আর হাসে। তার মনেও উঁকি দেয়, ছোট্ট এক ফোঁটা মেয়ে রংলীকে পেয়ে বুঝি এমনি পাগল হয়ে গিয়েছিলো সে। এমনি আদর-আহ্লাদ, এমনি নিজের মনে কত প্রলাপ বকতো রংলীর সঙ্গে। তা দেখে হাসতো রংলীর মা, সোহাগের ধমক দিতো। তারপর, তারপর এলো দামু, কিন্তু দুটো বছরও কাটলো না, একদিন লাক্ষা-বাজারে মহুয়ার তেল বেচতে গিয়ে আর ফিরলো না দামুর মা। এত সুখ-সোহাগ, এমন ভরসংসারের বাঁধন কেটে পালালো সে।

ময়না চৌকিদারের মনে ভয় উঁকি দেয়, আহ্লাদীও বুঝি তেমনি করে পালাবে একদিন। সেদিন দামুও হয়তো মুখ বুজে কাঁদবে তার মতো, কাঁদবে আর কাঁদবে!

তাই অঘোন বল্লমীর ডাক শুনলেই কেমন যেন চমকে উঠতো ময়না চৌকিদার।

হ্যাঁ, প্রতি দিন যাতায়াতের পথে একবার করে এসে দাঁড়াতো অঘোন, ডাক দিতো, আহ্লাদী! জঙ্গলখান্‌ডেকে যাবি আমার সাথে?

ময়না চৌকিদার বুঝতো না, দামু বুঝতো না, কিন্তু রংলী ছুটে আসতো সে ডাক শুনে। আড়চোখে একবার অঘোনের দিকে তাকিয়েই ফিকফিক করে হাসতো ও মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে। বুঝতো, অঘোনের ডাক আহ্লাদীকে নয়, রংলীকে।

তবু উত্তর দিতে পারতো না রংলী। ও শুধু ভেবে কূল পেতো না, অঘোনকে ওর যে এত ভয়, তা কেন উবে গেল ক'টা দিনের মধ্যে।

ময়না চৌকিদার মুখে হাসি আনতো অঘোনের ডাক শুনে, বলতো, বড় মায়ার হরিল লিয়ে আসেছ বল্লমী, মনটা ঘর ছাড়তে লারে।

অঘোন হেসে উত্তর দেয়, বনের হরিল্‌ ও, অর মনে মায়া লাই গো, টুকুন টুকুন মাণ্ডি দিবে, লেশা দিবে, লইলে পালায় যাবে কোনবাগে।

অর্থাৎ হরিণের বাচ্চাটাকেও মাণ্ডির নেশা ধরাতে হবে, ঘরে মন বসাতে হবে।

ঠিক কথাই বলেছে অঘোন, ময়না ভাবে। সঙ্গে সঙ্গে রংলীর মায়ের কথাটাও ক্ষণিকের জন্যে মনে উঁকি দিয়ে যায়। কিসের নেশায় ঘর-সংসার ফেলে পালালো সে, কোন নেশা?

কিন্তু অঘোনের কথাটা শুনে থেকেই দামু ভয় পেয়ে গেল। সত্যি কি বাঁধন ছিঁড়ে পালাবে আহ্লাদী? আহ্লাদীর জন্যে কি না করছে সে! এত ভালোবাসে সে আহ্লাদীকে, তবু পালাবে?

পরের দিন থেকেই একটু একটু করে মাণ্ডি এনে দিতে শুরু করলো দামু।

মাটির সরায় করে মাণ্ডিটুকু এনে ধরে দামু, আর চুলুক চুলুক করে সেটুকু খেয়ে নেয় আহ্লাদী। তা দেখে হাততালি দিয়ে হেসে ওঠে দামু, বলে, বাপু, আহ্লাদীটা মাতাল বটে, মাতাল।

হাসে, হাততালি দেয়, সারাটা দিন সে আহ্লাদীর সঙ্গে বকবক করে, কিন্তু ভয় যায় না মন থেকে। কেবলই ভয় হয়, আহ্লাদী পালাবে। তাই যতক্ষণ না ঘুম আসে ও কান পেতে থাকে, শুনতে পায় খটখট খটখট শব্দ করে সজনে গাছটাকে পাক দিচ্ছে আহ্লাদী। শব্দ শুনে নিশ্চিন্ত হয়।

সেদিনও নিশ্চিন্ত হয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিলো দামু। ভোরবেলায় ঘুম ভাঙতে নোংরা চোখেই বেরিয়ে এলো ও প্রতি দিনের মতো। বেরিয়ে আসতেই ওর ছোট্ট বুকখানা যেন মুহূর্তের মধ্যে খাঁ-খাঁ করে উঠলো। স্তম্ভিত নির্বোধ দুটি চোখে সজনে গাছটার দিকে তাকিয়ে রইলো ও।

নেই। আহ্লাদী নেই।

দামুর কান্না শুনে ময়না চৌকিদার ছুটে এলো, রংলী ছুটে এলো। দেখলে, দড়িটা দাঁতে চিবিয়ে বাঁধন কেটে পালিয়েছে আহ্লাদী।

ছেলের দুঃখে বুক ভেঙে গেল ময়না চৌকিদারের। দামুকে কোলে কাঁধে তুলে নিয়ে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলে, কান্না থামাবার চেষ্টা করলে। কিন্তু কি সান্ত্বনা দেবে সে। তার বুকটাও তো এমনি নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিলো একদিন। এমনি খাঁ-খাঁ করে উঠেছিলো বুকের ভেতর।

দামুর দু চোখের জল বাধা মানলো না। সেই কবে ওকে বাড়িতে রেখে রংলী একবার লাক্ষাবাজারে ভিখারিয়ার নাচ দেখতে গিয়েছিলো, সেদিনও বুঝি এত কষ্ট হয়নি দামুর!

রংলীর কাছে দামুকে বসিয়ে রেখে ময়না চৌকিদার বললে, কাঁদিস ক্যানে, লিয়ে আসব আহ্লাদীরে, ক্ষেতে যাক, লদীতে যাক, ধরে লিয়ে আসব উয়ারে।

বলে সত্যি সত্যিই আহ্লাদীকে খুঁজতে বেরিয়ে গেল ময়না। শেয়ালে খাটাশে যদি না ধরে থাকে, আহ্লাদীকে ও খুঁজে আনবেই।

আর বাপ চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রংলীও বেরিয়ে পড়লো জলের কলসীটা নিয়ে। লাক্ষাবাজারের বেপারীরা যদি চুরি করে থাকে, দেখে আসবে নদীতে জল আনতে গিয়ে। কিংবা রেলে কাটা গেছে কি না!

কতক্ষণ আর একা-একা বসে থাকবে বেচারী। বাপু ফিরছে নাই: বুনটা ফিরছে নাই

ক্যানে? ভাবলে দামু। তারপর নিজেও বেরিয়ে পড়লো। খুঁজে দেখবে আহ্লাদীকে। কিংবা...

হ্যাঁ, অঘোনকে বলবে দামু। অঘোন হয়তো খুঁজে এনে দেবে। ভারি লিষাদ অঘোন। অঘোন বল্লমী। ও নিশ্চয় খুঁজে এনে দিতে পারবে আহ্লাদীকে।

বাইরে এসে পাথরের চাঙড়টার ওপর দাঁড়িয়ে রইলো দামু, অঘোনের পথ চেয়ে। ঠিক এমনি সময়েই তো প্রতি দিন জংগলখান্‌ডের দিকে যায় অঘোন। কিন্তু আজ এখনো তার দেখা নেই কেন?

অপেক্ষা করে করে অধৈর্য হয়ে উঠলো দামু। তবে কি অঘোন চলে গেছে আজ, আহ্লাদীকে ডাক না দিয়েই? নিজের অজান্তেই কখন নদীর পথ ধরে হাঁটতে শুরু করে দিয়েছে দামু, অঘোন বল্লমীর ঘরের দিকে।

রেললাইন পার হয়ে নদীর দিকে এগিয়ে চলে দামু। বড় বড় পাথরের চাঙড় লাফিয়ে লাফিয়ে, খাদখন্দ পার হয়ে।

ওপারের ছেলেগুলো মোষ নিয়ে নেমেছে নদীর জলে। মোষের পিঠে চড়ে হেলে-দুলে তাকে পাশ কাটিয়ে গেল একটা বাচ্চা ছেলে।

দামু তাকে জিজ্ঞেস করলে, আহ্লাদীরে দেখেছিস?

—আহ্লাদী? কে বটে সে মেয়াটা!

দামু কান্না-ভরা গলায় বলে, মেয়া লয়, হরিল বটে, হরিল।

মোষের পিঠে-বসা ছেলেটা হেসে উঠলো এবার। নিজের মনেই যেন বললো, ক্ষ্যাপা নাকিন রে!

অন্য সময় হলে হয়তো রেগে যেতো দামু, একটা নুড়ি কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে মারতো। কিন্তু রাগলো না দামু, বললে, বুনটারে দেখেছিস! রংলীরে?

ছেলেটা এবার পিঠে দু ঘা পাচন বসিয়ে মোষটাকে ছুটিয়ে দিয়ে বলে গেল, রংলী অংলী কইতে লারব, অঘোন্ বল্লমীর সাথে একটা ডাঙর মেয়া পীরিত করছে, হুই উদিকে.. বলে পাচনটা তুলে দেখিয়ে দিলে।

কান দুটো ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠলো দামুর। রাগে দপদপ করে পা ফেলে ও সেদিকেই এগিয়ে গেল। নালা আর খাদ-ডোবা লাফিয়ে লাফিয়ে, ঢিবিঢাবা ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে।

যেতে যেতে হঠাৎ একটা খিলখিল হাসি শুনে চমকে উঠলো দামু। থমকে দাঁড়ালো। রংলী না? রংলীই তো। ঠিক এমনি করেই হাসে রংলী। কিন্তু কোথায় সে? চারপাশে তন্ন-তন্ন করে খুঁজলো সে রংলীকে।

আবার হাসির শব্দ ভেসে এলো। আর দামু ছুটে গিয়ে উঁচু ঢিবিটার ওপর উঠে নীচের খাদটার দিকে তাকালো।

সারা শরীর জ্বলে উঠলো দামুর। রাগে, অভিমানে। এই নাকি আহ্লাদীকে খুঁজছে রংলী?

নীচে একটা খাদের মতো ঢল নেমে গেছে বর্ষার জল শুকিয়ে গিয়ে। আর সেখানেই অঘোন আর রংলী মুখোমুখি বসে আছে। হাসছে।

এক মুহূর্ত কি যেন ভাবলো দামু, তারপর বড় একটা মাটির ঢেলা সজোরে সেদিকে গড়িয়ে দিয়ে ছুটতে শুরু করলো। ছুট ছুট, একেবারে ঘরের দিকে ছুটে পালালো। বাড়ির কাছে পেঁছে তবে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে তাকালো। তারপর নিজের মনেই ভেংচে ডাকলো, অঘোন ডাকু বটে, উয়ার সাথে কথা কইবি না। হঃ, উ ডাকু তো তু ডাইন বটিস, হুঁ! মনে মনে ভাবলে, বাপুকে কয়ে দিব রংলীটার লাজ নাই, ধরম নাই।

বাঁশের ফটকটা খোলা দেখে ভাবলে, বাপু ফিরে এসেছে। নাকি নিজেই সে আনমনে খুলে রেখে গেছে যাবার সময়? মিঠা আলুর শাকগুলান ছাগলে খেয়ে দেয়নি তো।

তাড়াতাড়ি ভিতরে ঢুকলো দামু, পরক্ষণেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। ধীরে ধীরে মুখ-খানা তার হাসিতে ভরে উঠলো। চিৎকার করে উঠলো দামু, বাপু, বাপু!

কপালের ঘাম মুছতে মুছতে তখনই ফিরলো ময়না চৌকিদার। ক্ষেতে ক্ষেতে ঘুরে বেড়িয়েছে, চতুর্দিকে খুঁজেছে সে। পায়নি, পায়নি সে আহ্লাদীকে।

উঠনে পেঁছেই চমকে উঠলো সেও।

তারপর হাসতে হাসতে বললে, নেশার টান বড় টান রে দামু।

বাঁধন খুলে গেল। মাণ্ডি মদের বাঁধন পড়েছে যার গলায়, দড়ির বাঁধন তার লাগে না। ভয় ভেঙে গেল দামুর। ও জানে আহ্লাদী আর পালাবে না, পালাতে পারবে না ও।

সত্যিই বুঝি তাই। সারাটা দিন ঘুরে বেড়ায় আহ্লাদী, পাগলের মতো ছুটে বেড়ায়। আর দামুর ডাক শুনলেই ফিরে আসে। পায়ে পায়ে জড়িয়ে যায়, গলা বাড়িয়ে দেয় সোহাগ পাবার লোভে। তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করে দামু, গালে গাল ঘষে। প্রশ্ন করে, আর পালায় যাবি না তো আহ্লাদী?

আহ্লাদীও যেন ওর কথা বুঝতে পারে, মাথা নাড়ে। আনন্দে হাততালি দিয়ে ওঠে দামু, নিজের মনেই বলে, আহ্লাদী আমার কথাটা বুঝে, কথাটা বুঝে।

কিন্তু তার পরই উন্মাদের মতো ছোটাছুটি শুরু করে আহ্লাদী, অনেক দূর পর্যন্ত ছুটে যায়, আবার ফিরে আসে, হঠাৎ হয়তো থমকে দাঁড়ায়, আর টানা-টানা দুটি চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে—দূরে, অনেক দূরের কোনো ভেসে-আসা শব্দ শোনবার জন্যে যেন কান দুটো তার সজাগ হয়ে ওঠে।

দামু দেখে আর হাসে। বলে, ক্ষেপী, ক্ষেপী তু আহ্লাদী।

দামু নিজেও বুঝি ক্ষ্যাপা। ওর মাথায় ঢুকেছে, লাক্ষাবাজারের শনিচারীর হাট থেকে এক ছড়া ঘুঙুর কিনে আনবে, পরিয়ে দেবে আহ্লাদীর গলায়।

তাই বাপের কাছে আবদার ধরে, উয়ার গলায় বাঁধব, এক ছড়ি ঘণ্টি আনে দে।

বাপ হেসে বলে, অরে আমার আহ্লাদী, এতগুলান দামড়ি লাগবে, দিবে কে?

অতশত বোঝে না দামু, রাগে অভিমানে ঠোঁট ফোলায়। ক'টা দামড়ি, তাও কি দিতে পারে না বাপু? বাপু তার অঘোনের মতো নিষাদ নাকি, না শনিচারীর হাটের চোরা বেপারী? লাক্ষাবাজারের চৌকিদার না বাপু? লাক্ষাবাগানের বাবুর তার সঙ্গে হেসে হেসে কথা হয়, দেখেছে দামু!

তাই বিশ্বাস হয় না তার, বাপু কি এক ছড়া ঘণ্টি কিনে দিতে পারে না আহ্লাদীকে!

—না দিবে তো না দিবে, বাগান থিকা লাক্ষা চুরি করব আমি, হাটে বেচে দিব লাক্ষা-গুলান। রংলীকে বলে দামু।

রংলী হাসে। বলে, ঘণ্টি আনে দিব তোরে, আমি আনে দিব।

—পাবি কুথাকে? অবিশ্বাসের চোখে তাকায় দামু।—কে দিবে তোরে?

—অঘোন দিবে।

অঘোন? চমকে ওঠে দামু। কি যেন ভাবে মুহূর্তের জন্যে। প্রতি দিন জঙ্গলখান্ডে যাবার সময় অঘোন যখন হাঁক দিয়ে যায়, তখন কোনো কোনো দিন দামু দেখেছে রংলীর সঙ্গে কেমন যেন হেসে হেসে কথা বলে অঘোন, কেমন একটা দুর্বোধ্য হাসি ফোটে রংলীর চোখেও।

মুহূর্তের জন্যে বুঝি সেই দৃশ্যটা উঁকি দিয়ে গেল। নদীর ধারে সেই যেদিন খাদের আড়ালে বসে রংলীকে অঘোনের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছিলো। সেদিনের কথাটা মনে পড়তেই দামুর মনটা কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে উঠলো।

কিন্তু সত্যিই যে অঘোন আহ্লাদীর জন্যে ঘণ্টি এনে দেবে ভাবতে পারেনি দামু। তাই দুপুরে যখন মাঠে মাঠে ঘুরে বাড়ি ফিরলো তখন হঠাৎ টুংটুং শব্দটা শুনে ও চমকে উঠে-ছিলো।

ওকে দেখতে পেয়েই আহ্লাদী ছুটে পালালো ক্ষেত মাঠ পার হয়ে, আর সঙ্গে সঙ্গে ঝুম ঝুম ঝুম ঝুম করে তার গলার ঘুঙুর বেজে উঠলো! দামুর মনে হলো যেন নদীর জলে এক সারি নুড়ি গড়িয়ে গড়িয়ে ভেসে গেল।

খুশী-খুশী চোখে তাকিয়ে রইলো সে আহ্লাদীর দিকে। ছুটতে ছুটতে অনেক দূর অবধি চলে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে তখন আহ্লাদী, মুগ্ধ চোখে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে জঙ্গলখান্ডের দিকে, রুপসি পাহাড়ের দিকে। কান দুটো আবার সজাগ হয়ে উঠেছে তার, যেন কান পেতে দূর থেকে ভেসে আসা কোনো শব্দ শুনছে। নাকি নিজের গলার

ঘুঙুরের শব্দেই চমকে উঠছে থেকে থেকে!

কয়েক মুহূর্তের জন্যে ঠায় তাকিয়ে রইলো আহ্লাদী, তারপর আবার ছুটতে ছুটতে ফিরে এলো।

কাছে আসতেই তাকে জড়িয়ে ধরলো দামু, তার পিঠে পেটে গাল ঘষতে ঘষতে বললে, কে দিছে রে আহ্লাদী? বুন?

আহ্লাদী কি বুঝলো কে জানে, মাথা নাড়লো সে। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘুঙুরছড়া টিন টিন টিন বেজে উঠলো। দামুর মনে হলো, যেন আহ্লাদী বলছে, না, না, না।

অর্থাৎ রংলী নয়, অঘোন দিয়েছে, অঘোন।

বিকেলে ময়না চৌকিদারও ফিরে এসে চমকে উঠলো আহ্লাদীর গলার ঘুঙুরের শব্দ শুনে।

দামুকে সামনে দেখতে পেয়েই জিজ্ঞেস করলে, কে দিছে উ ঘণ্টিটা?

দামু বলতে গিয়েও বলতে পারলো না। কেমন যেন ভয়-ভয় করলো ওর। কই, বাপু তো এমনভাবে তাকায় না ওর দিকে। আর আহ্লাদীর গলায় ঘুঙুর দেখে চটবেই বা কেন বাপু!

দামু তাই আস্তে আস্তে বললে, বুন জানে।

বাপের গলা শুনে রংলীও বেরিয়ে এলো। সেও ভয়ে ভয়ে তাকালো বাপের দিকে, তার পর ধীরে ধীরে বললে, অঘোন দিছে।

ময়না চৌকিদার শুনলো সে কথা। ক্রুদ্ধ চোখ জোড়া তার রংলীর মুখের ওপর কি যেন খুঁজে বেড়ালো। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কপাটের পাশ থেকে খুরপিটা তুলে নিয়ে মিঠা আলুর ভেলির দিকে এগিয়ে গেল সে। আর রংলী ভয়-ভয় চোখে বাপের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ ঘরের ভেতর ছুটে পালালো।

বিকেলের আলো পড়ে এলো। জঙ্গলখান্ডের অরণ্য আঁধার। রূপসি পাহাড়ের কালো কালো ছায়া নেমে এলো ধীরে ধীরে। দূরের রেললাইনের পাখনাটায় একটা লাল আলো জ্বলে উঠলো, রুপোলী তারার নীচে একটা রক্তাক্ত তারার মতো।

ঠিক সেই সময়েই খুরপি-হাতে মিঠা আলুর বাগান থেকে বেরিয়ে এলো ময়না চৌকিদার, আর সঙ্গে সঙ্গে অঘোনের গলার স্বর ভেসে এলো।—অরে অ আহ্লাদী, জঙ্গলখান্ডকে যাবি? চ তোরে লিয়ে যাব।

প্রতি দিনই যাতায়াতের পথে ডাক দিয়ে যায় অঘোন, আর ডাক শুনে হাসি-হাসি মুখে ছুটে আসে রংলী।

কিন্তু না, রংলী এলো না ডাক শুনে। শুধু ময়না চৌকিদার খুরপিটা কপাটের পাশে ছুঁড়ে দিয়ে হাতে হাত ঘষে মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে বললে, শুন বল্লমী, একটা কথা আছে তুমার সাথে।

অঘোন হাসতে হাসতেই বাঁশের ফটকটা খুলে ভিতরে এলো।

ময়না চৌকিদার আবার বললে, একটা কথা আছে তুমার সাথে।

—বল ক্যানে। হাসলো অঘোন।

ময়না আস্তে আস্তে বললে, মেয়েটা আমার ডাগর হ'য়েছে।

—হুঁ, হ'য়েছে বটে। ঘাড় নাড়'লো অঘোন।

ময়না এবার একটু রূঢ় স্বরেই বললে, উয়ার সাথে তুমি অমন ফুলুক-ফালাক কথা কইবে নাই, হাটের লোক আমায় দুষবে!

অঘোন হাসলো এবার। তারপর বল্লমটা সোজা করে ধরে পায়ের কাছে মাটিতে গেঁথে বললে, তো বিটির তুমার বিয়া দাও ক্যানে আমার সাথে!

সঙ্গে সঙ্গে একটা ক্রুদ্ধ চিৎকারে ফেটে পড়লো ময়না চৌকিদার। গম্ভীর গলায় বললে, তুমি বল্লমী বটে, আমা'রও ঘরে টাঙি আছে অঘোন।

সঙ্গে সঙ্গে রেগে টং হয়ে গেল অঘোন। বল্লমী বটে সে, লিষাদ বটে। তাই রাগে গরগর করতে করতে বললে, তুমার বিটিরে তুমি রাখ, আমার হরিল আমি লিয়ে যাব।

ময়না চৌকিদার তাচ্ছিল্যের স্বরে বললে, যাও, লিয়ে যাও তুমার হরিল, আমার ঘরকে

লজর দিবে নাই তুমি, হুঁ।

দামু এতক্ষণ ভয়-ভয় চোখে তাকিয়ে ছিলো, শুনছিলো সব কথা। কিছুটা বুঝতে পারছিলো ও, কিছুটা বুঝতে পারছিলো না। কিন্তু এবার আর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না, ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলো ও আহ্লাদীকে। কাঁদো-কাঁদো গলায় বললে, না, না, বাপু, না, আহ্লাদীরে আমি দিব নাই; আহ্লাদীরে দিব নাই।

সঙ্গে সঙ্গে ময়না চৌকিদার ছুটে এলো, রাগের মাথায় ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিলো দামুর গালে, তারপর আহ্লাদীর পেটে একটা লাথি মেরে বললে, যাও, লিয়ে যাও তুমার হরিল।

মার খেয়ে করুণ চোখে দামুর দিকে তাকালো আহ্লাদী। আর অঘোনও কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। মুখ ফসকে নয় কথাটা বেরিয়েই গেছে, কিন্তু দামুর কাঁদো-কাঁদো মুখের দিকে তাকিয়ে মায়া হলো তার। তাই এগিয়ে গিয়ে দামুকে কাছে টেনে নিয়ে তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে গেল ও।

ময়না চৌকিদারের তখনো রাগ পড়েনি। বললে, চৌকিদার বটি আমি, লিষাদের বেটা লিষাদ! আমার বিটিরে বিয়া করবার সাধ জাগছে তুর?

কথাটা শুনে আবার রুখে দাঁড়ালো অঘোন। আর ময়না বললে, ফ্যালফ্যালায়ে দেখতিছ কি, হরিল তুমার লিয়ে যাও।

চমকে উঠে এতক্ষণ ময়না চৌকিদারের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলো আহ্লাদী, হঠাৎ এবার মাথাটা নেড়ে উঠলো সে, আর ঘুঙুরছড়া বেজে উঠলো—না, না, না।

কিন্তু তার কথা কেউই যেন বুঝলো না।

এক মুহূর্ত কি যেন ভাবলো অঘোন, তারপর সজিনা গাছের তলা থেকে দড়িটা তুলে নিয়ে আহ্লাদীর গলায় বেঁধে তাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল।

দামু কাঁদতে কাঁদতে ছুটে বেরিয়ে এলো, পাথরের চাঙড়টার ওপর উঠে দাঁড়িয়ে দেখলে, আহ্লাদীকে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে অঘোন। কিন্তু—কিন্তু আহ্লাদী কিছুতেই যেন যেতে চাইছে না।

ভোর থেকেই কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এলো দামুর। সমস্ত মন যেন ভেঙে গেছে তার।

ময়না চৌকিদারের মনটাও ভালো ছিলো না। সারাটা রাত তারও ভালো ঘুম হয়নি। অঘোনের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ করে ভিতরে ভিতরে পুড়ছিলো সে দামুর কথা ভেবে। ঘুমের মধ্যেই দামুকে অস্থির হয়ে বারবার এ-পাশ ও-পাশ করতে দেখে বুঝতে তার বাকী ছিলো না, ছেলেটা কিসের যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে।

ভোরবেলাতেও দামুকে উঠতে না দেখে কেমন যেন সন্দেহ হলো। কাছে গিয়ে দামুর কপালে হাত রাখলে।

সঙ্গে সঙ্গে হাতটা সরিয়ে দিলো দামু। না, কারো ওপর ভালোবাসা নেই, মায়াদয়া নেই, ওর। বাপুকে চায় না ও, রংলীকে চায় না। ওর আহ্লাদীকে বাপু হাতে তুলে দিয়ে দিয়েছে, কিসের ভালোবাসা বাপুর তরে!

জ্বরের ঘোরেই দামু দেখলো, প্রতি দিনের মতোই ভিজা ভাতের থালাটা গামছায় বেঁধে বাপু চলে গেল লাক্ষাবাগানে।

তারপরই রংলী এসে বসলো ওর পাশে। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে গেল রংলী। এবারও হাত সরিয়ে দিলো দামু, আর সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলো, আমার বাপু নাই, বুন নাই। তুরা সবাই দুশমন, তু দুশমন, বাপু দুশমন!

বলতে বলতে দু ফোঁটা গরম চোখের জল তার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়লো।

রংলী সান্ত্বনার স্বরে বললে, কাঁদিস ক্যানে, আহ্লাদীরে লিয়ে আসব, ঠিক লিয়ে আসব আমি।

তবু বিশ্বাস হলো না দামুর। বললে, উ দিবে নাই, দিবে নাই, দিবে নাই অঘোন।

—দিবে, দিবে। সস্নেহ হাসি হাসলো রংলী।

আর দামুর মনটাও যেন একটু হালকা হলো তার কথায়। কেমন যেন বিশ্বাস হলো,

রংলী বললে হয়তো সত্যিই আহ্লাদীকে ফিরিয়ে দেবে অঘোন।

হঠাৎ রংলীর হাতটা জড়িয়ে ধরলো দামু, ওর ছোট ছোট দু হাতের মুঠোর মধ্যে। জলে-ভাসা দুটো চোখ মেলে রংলীর মুখের দিকে তাকালো ও।

তারপর ধীরে ধীরে বললে, অঘোনরে তু বিয়া করবি?

খিলখিল করে হেসে উঠলো রংলী। বললে, উ তো ডাকু বটে!

রংলীর হাতটা চেপে ধরলো দামু। বললে, লিষাদ কি মানুষ লয়? তু বিয়া কর অঘোনরে, তু বিয়া করলে লিঘ্যাৎ আহ্লাদীরে ফিরায় দিবে অঘোন।

দামুর কথা শুনে আবার খিলখিল করে হেসে উঠলো রংলী। বললে, আহ্লাদীরে আমি লিয়ে আসব, ফিরায় আনব উয়ারে।

কিন্তু দামুকে সান্ত্বনা দিলে কি হবে, অঘোনের কাছে যেতে মন চাইলো না তার। কেন যাবে সে? তার বাপুকে রাঙা চোখ দেখিয়েছে অঘোন, আহ্লাদীকে নিয়ে গেছে দামুর কাছ থেকে। তার কাছে আবার কেন যাবে রংলী? না, অঘোনের সঙ্গে যদি বা নদীর পথে দেখা হয়ে যায়, মুখ ফিরিয়ে নেবে ও, কথা বলবে না।

লিষাদ, লিষাদ! সারাক্ষণ রংলীর মন বললে, অঘোন একটা লিষাদ বটে, উয়ার মনটা পাথর বটে।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর দামুকে এনে সজনে গাছটার পাশে রোদ্দুরে বসালো রংলী, কপালে হাত দিয়ে দেখলে।

বললে, ধুপ আছে ইখানটায়, বসে থাক্, জ্বরটো ছাড়ে যাবে।

—জ্বরটো ছাড়ে যাবে তো কি হবে? আহ্লাদীরে মিলবে? রুখে উঠলো দামু, তারপর ধুঁকতে লাগলো জ্বরের ঘোরে।

বসে থাকতে থাকতে চোখ গেল তার সজিনা গাছটার তলায়। প্রথম যখন আহ্লাদীকে এনে বাঁধা হয়েছিলো এখানে, তখন সারা দিন সারা রাত খটখট খটখট করে পাক দিতো হরিণটা—এই সজিনা গাছটাকে। আর ক্ষুরের ঘা খেয়ে খেয়ে একটা গোল দাগ হয়ে গিয়েছিলো সেখানটায়। দামু দেখলো, সে দাগটা এখনো মুছে যায়নি।

নিজের মনে, অকারণেই একটা কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সেই দাগটাকে আরো স্পষ্ট করে তুললো দামু।

তারপর রোদ পড়ে আসতেই বাইরে বেরিয়ে এসে সেই পাথরটার ওপর গিয়ে দাঁড়ালো ও, তাকিয়ে রইলো জঙ্গলখানডের সরু ধুলোর রাস্তাটার দিকে।

অঘোন ফিরবে এখনই, এ পথ দিয়ে। দামু নিজেই বলবে তাকে, বলবে, আহ্লাদীরে ফিরায় দাও, রংলী তুমারে বিয়া করবে!

কিন্তু কই, অঘোন ফিরছে না কেন এখনো!

একে একে আলো ডুবে গেল, আলো জ্বলে উঠলো দূরের রেললাইনের বাঁকে, লাল পাখনাটার গায়ে লাল তারাটা।

এমন সময় হঠাৎ দামু লক্ষ করলো অঘোন আসছে। রুপাসি পাহাড়ের পথ ধরে এগিয়ে আসছে।

কিন্তু মুখে তার উল্লাস ফুটতে না-ফুটতে মনটা মুষড়ে গেল দপ করে। অঘোন তার প্রতি দিনের এই রাস্তাটা ছেড়ে ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে বাঁক নিলো। চলে গেল অনেক দূর দিয়ে। আর দামুর মনে হলো অঘোনের মনটা পাথর, অঘোন মানুষ লয়, ডাকু, ডাকু!

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই দূর দিয়ে সন্ধ্যের ট্রেনটা চলে গেল শিস দিয়ে দিয়ে। মুগ্ধের মতো চলন্ত ট্রেনটার দিকে তাকিয়ে রইলো দামু। সারবন্দী আলো-জ্বলা জানালাগুলো রহস্যময় এক রোমাঞ্চ বুনে দিয়ে গেল তার মনে।

ওর মনে হলো, ঐ রেলে চেপে কোথাও চলে গেলে, এখান থেকে হারিয়ে গেলে যেন শান্তি পাবে ও।

তারপর হঠাৎ মনে পড়ে গেল, সেবার নৌটঙ্কীর মেলার সময় একটা লোক কাটা পড়েছিলো রেলে। ভিড় জমে গিয়েছিলো ওখানে। দামু লোকটাকে দেখতে পায়নি, শুধু দূর থেকে ভিড় দেখেছিলো।

দামুর হঠাৎ ইচ্ছে হলো, তার মতোই রেলে কাটা পড়বে ও। রেলে কাটা পড়ে বাপুর ওপর, অঘোনের ওপর প্রতিশোধ নেবে।

এমনি সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে কখন যে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলো দামু, ময়না চৌকিদারের ডাক শুনে সংবিৎ ফিরলো।

ঘরে ফিরে এলো দামু, কিন্তু বাপুর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারলো না। রংলী যখন গরম দুধ নিয়ে এসে দাঁড়ালো, দামু চুমুক দিতে দিতে একবার শুধু বাপুর দিকে আড়-চোখে তাকালো।

ময়না চৌকিদার এসে দামুর কপালে হাত দিলো, নিজের মনেই বললে, জ্বর বাড়ছে।

জ্বর বাড়লো পরের দিন সকালেও। ঘোরের মধ্যেই পড়ে ছিলো দামু, আর মাঝে মাঝে প্রলাপ বকছিলো—রেলগাড়ি আসতিছে, রেলগাড়ি আসতিছে, আহ্লাদী!

রংলী সে কথার কোনো অর্থ খুঁজে পেলো না। ভাবলে, আহ্লাদী রেলে কাটা পড়বে এই কথাই হয়তো ভাবছে দামু।

ময়না চৌকিদার তখন লাক্ষাবাগানে চলে গেছে। রংলী দামুর কাছে বসে থাকতে থাকতে কি যেন ভাবলো, তারপর মাটির কলসীটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালো হঠাৎ।

হ্যাঁ, অঘোনের সঙ্গেই দেখা করবে ও। অঘোনকে বলবে, চল তুমার সাথে পালায় যাব, কলে কাম লিব, নয়তো খাদানে। বলবে, আহ্লাদীরে ফিরায় দাও, দামুর পরানটা ফিরায় দাও, তুমার সাথে পালায় যাব।

কলসীটা মাথার ওপর বিঁড়েতে বসিয়ে একবার দামুর দিকে ফিরে তাকালো রংলী, তারপর তরতর করে নদীর পথ ধরে অঘোনের ঘরের দিকে নেমে গেল আঁকাবাঁকা ঢালু রাস্তা বেয়ে।

আর দামু একা শুয়ে থাকতে থাকতে দুবার ডাকলো রংলীকে, সাড়া না পেয়ে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালো জ্বরের ঘোরেই। তারপর বেরিয়ে এলো। না, রংলী নেই, বাপু নেই।

বাইরে বেরিয়ে এলো দামু। পা টলছে, মাথা ঘুরছে। তবু পাথরের চাঙড়টার ওপর দাঁড়িয়ে রেললাইনটার দিকে তাকালো ও। ধীরে ধীরে টলতে টলতে এগিয়ে গেল সেদিকে।

কিন্তু বেশী দূর যেতে পারলো না। মাথা ঘুরছে তার, সারা শরীর টলছে। ঘাসের ওপর বসে পড়লো দামু, ক্লান্তিতে জ্বরের ঘোরে শুয়ে পড়লো সেখানেই। সমস্ত শরীর যেন নির্জীব হয়ে গেছে, অবশ হয়ে গেছে।

কখন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলো দামু নিজেই জানে না। টুং টাং টুং টাং একটা শব্দ কানে আসতেই চোখ চাইলো। তবু স্পষ্ট কিছু দেখতে পেলো না। চোখ ঝাপসা। কিন্তু শব্দটা যেন চেনা-চেনা। আহ্লাদীর গলার ঘণ্টি নাকি? না, স্বপ্ন দেখছে দামু?

উঠে বসলো দামু। আর সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলো ও। নিজের চোখকেও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না—আহ্লাদী! আহ্লাদী, তু আসেছিস?

আনন্দে চিৎকার করে উঠলো দামু, আর সঙ্গে সঙ্গে আহ্লাদীর গলার ঘণ্টিটা ঝুমঝুম করে উঠলো। যেন সাড়া দিচ্ছে আহ্লাদী—হুঁ, হুঁ, হুঁ, হুঁ।

এদিক-ওদিক তাকালো দামু, আর পাশেই জড়-করা এক রাশ লতাপাতার দিকে চোখ পড়লো ওর। একটুক্ষণ কি যেন ভাবলো পাতাগুলো হাতে তুলে নিয়ে। নামিয়ে রাখলো। বিস্ময়ে তাকালো আহ্লাদীর দিকে।

জ্বরের ঘোরে লক্ষ করেনি দামু, পাতাগুলো এখানেই পড়ে ছিলো কি না। অন্য কেউ যাবার সময় মাথার বোঝা থেকে পাতাগুলো পড়ে গেছে কি না।

দুটো পাতা মুখে করে তুললো আহ্লাদী, তারপর অপলক দুটি করুণ চোখে দামুর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এগিয়ে এলো। দামুর মনে হলো আহ্লাদী যেন ওকে পাতাগুলো খেতে দিচ্ছে। না কি, দামুকে দেখে খেতেও ভুলে গেছে সে?

সেই প্রথম যখন আহ্লাদীকে জঙ্গলখান্ড্ থেকে ধরে এনেছিলো অঘোন, সেই ঘুম-ভাঙা সকালে মিঠা আলুর পাতা এনে দিয়েছিলো সে আহ্লাদীকে। সেদিনের দৃশ্যটা যেন চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

হাসলো দামু, গলা জড়িয়ে ধরলো আহ্লাদীর। তার গালে গাল ঘষতে ঘষতে বললে,

আমি ভুখা নাই রে আহ্লাদী, ভুখা নাই।

তারপর নিজের মনেই বললে, রেলে কাটা যাব নাই আমি, ক্যানে যাব! আহ্লাদীরে ফির্যা পাইছি না?

আহ্লাদীকে ফিরে পেয়ে দামুর মনে হলো, তার জ্বর ছেড়ে গেছে। ক্লান্তি কেটে গেছে।

ধীরে ধীরে বাড়ির পথ ধরলো দামু। আর আপনা থেকেই আহ্লাদী তার আগে আগে চললো। পায়ের তালে তালে তার গলার ঘুঙুর বাজলো টুং টুং টুং টুং।

মহুয়া গাছটা থেকে যখন পাকা মহুয়া পড়ে লাক্ষাঘরের টিনের ছাদে তখনো যেন এমনি একটা মিষ্টি আওয়াজ হয়।

কিন্তু দামুর পিছনে আহ্লাদীকে দেখেই রাগে জ্বলে উঠলো রংলী, ক্রুদ্ধ চোখে ডাকলে, বাপু, বাপু!

ময়না চৌকিদার বেরিয়ে এলো।

রংলী বললে, আহ্লাদীরে ফিরায়ে দিয়া আস উ ডাকুটার কাছে। দামু মাঙে আনছে আহ্লাদীরে।

ময়না চৌকিদার আর দামু, দুজনেই বিস্ময়ের চোখে তাকালো রংলীর মুখের দিকে। দুজনের কেউই যেন এমন কথা আশা করেনি রংলীর কাছ থেকে। তবে কি, অঘোন রংলীর ইজ্জতে ঘা দিয়েছে, অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে তাকে!

দামু কিছুতেই বুঝলো না। ও শুধু বললে, আহ্লাদী নিজেই আসেছে বাপু, আমি মাঙে আনি নাই।

ময়না চৌকিদার তবু একটা কঞ্চি তুলে নিয়ে সপাং করে বসিয়ে দিলো আহ্লাদীর পিঠে, সঙ্গে সঙ্গে ছুটে পালালো সে, অঘোনের ঘরের দিকে।

সেই যে আহ্লাদীকে তাড়িয়ে দিলো ময়না চৌকিদার, তারপর আর আহ্লাদীর দেখা মিললো না।

আশায় আশায় প্রতি দিনই ও মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ায়, রেললাইনের ধার দিয়ে অনেক দূর অবধি চলে যায়, কিন্তু আহ্লাদীর দেখা মেলে না। মনে মনে ভাবে, তবে কি আহ্লাদীকে বেঁধে রেখেছে অঘোন?

এক-একদিন ইচ্ছে হয়, মহুয়া আর আমলকীর পাতা পেড়ে নিয়ে দিয়ে আসে আহ্লাদীকে। কোনো দিন বা ভাবে, এক থালি মাণ্ডি দিয়া আসব আহ্লাদীরে!

কিন্তু সাহস হয় না। ও বুঝে নিয়েছে, রংলীর সঙ্গে কিছু কাজিয়া-বিবাদ হয়েছে অঘোনের। তা না হলে অঘোনের নাম শুনলেই চটে যায় কেন রংলী।

সেদিন দুপুরে সজিনা গাছটার তলায় বসে বসে একটা শালকাঠির ঝুড়ি বুনছিলো দামু। একমনে ঝুড়ি বুনতে বুনতে হঠাৎ চমকে উঠলো।

আহ্লাদীর গলার ঘুঙুর না? একবার এদিকে, একবার ওদিকে। ছুটে বেড়াচ্ছে যেন হরিণটা। কিন্তু ঠিক কোন দিক থেকে শব্দটা আসছে তা বুঝতে পারলো না দামু। তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এলো।

দেখলে, আহ্লাদী একবার বিদ্যুতের মতো ছুটে যাচ্ছে রূপসি পাহাড়ের সেই টিলাটার দিকে, টিলাটার ওপর উঠে জঙ্গলখানডের দিকে ঠায় তাকিয়ে থাকছে কিছুক্ষণ, তারপরই পাগলের মতো ছুটতে ছুটতে ফিরে আসছে। আবার থমকে দাঁড়িয়েই ফিরে যাচ্ছে টিলাটার কাছে, টিলাটায় উঠে তাকিয়ে থাকছে জঙ্গলখানডের দিকে।

—আহ্লাদী! আহ্লাদী! দুবার ডাকলে দামু।

কিন্তু আহ্লাদী যেন শুনতেই পাচ্ছে না। ঠায় একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ও জঙ্গলখানডের দিকে।

পিছন থেকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো দামু। সিঁড়ির মতো ধাপে ধাপে উঠে গেছে ঢালু ক্ষেতের সারি, তারও পরে হঠাৎ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে টিলাটা। তার ওপর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আহ্লাদী—রূপসি পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে, জঙ্গলখানডের দিকে তাকিয়ে।

কি দেখছে ও অমন মুগ্ধ চোখে?

কি মনে হলো দামুর, কে জানে। ছুটতে শুরু করলো ও টিলাটার দিকে। ছুট্ ছুট্, একেবারে টিলাটার কাছে এসে পৌঁছতেই ওর পায়ের শব্দে চমকে ফিরে তাকালো আহ্লাদী। যেন ভয় পেলো। পরক্ষণেই দামুকে চিনতে পেরে ভয় ভেঙে গেল ওর।

হাঁপাতে হাঁপাতে টিলার ওপর উঠে দাঁড়ালো দামু। শুখা ঝরনার ওপারের দিকে তাকালো। আর সঙ্গে সঙ্গে ওর সারা দেহে যেন রোমাঞ্চ দিলো।

কি আশ্চর্য! ওরই দিকে এমন মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে আহ্লাদী!

সারা শরীর যেন সিরসির করে উঠলো দামুর। আনন্দে? না, আতঙ্কে?

রুপসি পাহাড়ের শুখা ঝরনাটার ওপারে অন্ধকার অরণ্যের গাছগাছালির ভিড় থেকে বেরিয়ে এসে স্থির দাঁড়িয়ে আছে আর একটা হরিণ। আঁকাবাঁকা বড় বড় সুন্দর শিংওয়ালা একটা বুনো হরিণ। মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে আহ্লাদীর দিকে। থমকে দাঁড়িয়ে আছে হরিণটা। যেন নেশায় পেয়েছে তাকে।

সেদিকে তাকিয়ে দামু যেন নিজের কাছেই হারিয়ে গেল। সব ভুলে গেল ও—বাপু, রংলী, অঘোন। সারা শরীর-মনে এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ। জঙ্গলখান্ড যেন ওকেও হাতছানি দিয়ে ডাকছে, রুপসি পাহাড়ের বাতাস। তিরতির করে বয়ে চলেছে শুখা ঝরনার সরু জলের ধারাটুকু—নীচে, অনেক নীচে। তার ওপারেই আরেকটা ঢিবি উঁকি দিয়েছে শাল শালাই মহুয়া আর আমলকীর ঘন গভীর বনের ভেতর থেকে। আর সেই ঢিবিটার ওপর সুন্দর আঁকা-বাঁকা শিংওয়ালা একটা বুনো হরিণ!

টানা-টানা দুটি গভীর কালো চোখে সরল শিশুর মতো দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছে সে আহ্লাদীকে।

কি আশ্চর্য! আহ্লাদীও মোহ-ভরা চোখে নিথর দাঁড়িয়ে আছে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দামু নিজের মনেই বলে উঠলো, মাদী লয়!

পরক্ষণেই একটা নুড়ি কুড়িয়ে নিয়ে তাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিলো দামু, আর সঙ্গে সঙ্গে হরিণটা বিদ্যুৎবেগে ছুটে পালালো বনের মধ্যে। বনের মধ্যে হারিয়ে গেল সে।

সঙ্গে সঙ্গে আহ্লাদীও ছুটে পালালো। ঘুঙুরের শব্দটা শুধু বেজে উঠলো ঝুমঝুম করে।

দামু আবার ডাকলো, আহ্লাদী!

কিন্তু না, আহ্লাদী সেই সজিনা গাছটার তলায় গিয়ে দাঁড়ালো না। রেলের লাইনের দিকে, অঘোনের ঘরের দিকে ছুটে গেল।

তা দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো দামুর ছোট্ট বুক নিঙড়ে। দামুর মনে হলো, আহ্লাদী তাকে আর ভালোবাসে না, আহ্লাদী তাকে ভুলে গেছে। নাকি অঘোনের ঘরেও বাঁধা পড়েছে ও মাণ্ডির নেশায়।

মন খারাপ হয়ে গেল দামুর। ওর ছোট্ট বুকের দীর্ঘশ্বাসটুকুর বুঝি কোনো দাম নেই। বাপু না, রংলী না, এমন কি আহ্লাদীও ওকে ভালোবাসে না, ওকে ভুলে গেছে।

ক্ষেতে ক্ষেতে ধনিয়ার চারা গজিয়েছে কচি কচি। অন্য সময় হলে দু-দশটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে চিবোতে চিবোতে আসে দামু। কিন্তু ওর মন আজ সারা পৃথিবীর ওপর বিশ্বাস হারিয়েছে, সকলের ওপরে ক্ষেপে গেছে। তাই ছোট ছোট পায়ে ধনের চারাগুলোকে মাড়িয়ে মাড়িয়ে চললো ও। কেমন একটা আনন্দের, তৃপ্তির ভাব ফুটে উঠলো ওর মুখে-চোখে। যেন সারা দুনিয়াকে এমনি পায়ে মাড়িয়ে যেতে চায়। সামান্য কারণে বাপু তার আহ্লাদীকে তুলে দিয়েছে অঘোনের হাতে। আর রংলী? খাদে-খন্দে বসে হেসে হেসে কথা বলতে পারে ও অঘোনের সঙ্গে, আর বিয়া করতে পারে না? কিন্তু অঘোনকেও ক্ষমা করতে পারে না দামু। নিজের হাতেই যে একদিন আহ্লাদীকে ধরে এনে দিয়েছিলো, দামুকে যে এত ভালোবাসতো, সেই অঘোনও কিনা তার কাছ থেকে হরিণটা কেড়ে নিয়ে গেছে। লিষাদ ও, লিষাদ, মানুষ লয়—নিজের মনেই বলে দামু।

সবাইকে অবিশ্বাস করে দামু, সকলের বিরুদ্ধেই ওর রাগ, অভিমান। কিন্তু মনে মনে ও জানতো, আহ্লাদী ওকে ভালোবাসে, আহ্লাদী ওকে ভোলেনি। নাম ধরে ডাকলেই ফিরে আসবে, পায়ে পায়ে চলবে, হাঁটুতে মুখ ঘষবে। কিন্তু সেটুকু বিশ্বাসও যেন মুহূর্তে উবে গেল, মুষড়ে পড়লো দামু। 'আহ্লাদী! আহ্লাদী!' বলে এত যে ডাকলো দামু, তবু থামলো না কেন সে, ফিরে এলো না কেন! অঘোনের ঘরের দিকেই বা ছুটে পালালো কেন? রাগে অভিমানে ধনের চারাগুলো পায়ে দলতে দলতে দামু হঠাৎ দেখলে তার দু চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

দু হাতের চেটোতে চোখের জল মুছলো দামু, ভিজে হাতটার দিকে তাকালো, তারপর নিজের মনেই হেসে উঠলো। হয়তো নিজের বোকামিতেই। ভাবলে, আরে ধুৎ, উ তো একটা হরিল বটে!

কিন্তু থেকে থেকেই ব্যথাটা মোচড় দিয়ে ওঠে। কিছুতেই যেন ভুলতে পারে না। আবার এক-একসময় ভাবে, আহ্লাদী ওকে ভোলেনি, ভোলেনি, ছাড়া পেলেই ছুটে আসবে আবার।

দিনের পর দিন কাটে, প্রতি দিনই আশায় আশায় ঘুরে বেড়ায় ও মাঠে মাঠে। কান পেতে রাখে, কোথাও দূরে যদি হঠাৎ ঘুঙুরের শব্দ বেজে ওঠে! এক-একসময় মনে হয় বাতাসে কিসের যেন গন্ধ ভেসে আসছে। আহ্লাদীর? নাক কান সজাগ রেখে আহ্লাদীকে খুঁজে বেড়ায় দামু। আর এক-একসময় নিজেই নিজের বোকামিতে হেসে ফেলে। হরিণ নাকি ও? তবে আহ্লাদীর মতো কান খাড়া করে ঘুঙুরের শব্দ শুনতে চায় কেন? শুকনো পাতার গন্ধকে আহ্লাদীর গায়ের গন্ধ মনে হয় কেন?

কিন্তু দুঃখের কথাটা, বুকের গোপন ব্যথাটা লুকিয়ে রাখবে কি করে।

ওর শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলো রংলী। বললে, আজ যাব অঘোনের কাছকে। লিয়ে আসব আহ্লাদীরে।

রংলীর কথা শুনে দামুর কপালের শিরাটা ফুলে উঠলো রাগে। বললে, না, লিব না আহ্লাদীরে, অঘোন ফিরায় দিলেও লিব না। ও হরিলটা বেইমান বটে।

ওর মুখের দিকে তাকালো রংলী, কি যেন ভাবলো। তারপর একসময় মাটির কলসীটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

বাপুর সঙ্গে ঝগড়া-কাজিয়া করেছিলো বলেই অঘোনের ওপর রাগ হয়েছিলো রংলীর। তারপর একদিন ওকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে অঘোন। তাই যদি বা দু-এক দিন মাঝ-পথে দেখা হয়েছে, অভিমানে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে রংলী। কিন্তু না, আহ্লাদীকে ফিরিয়ে আনবে ও, ফিরিয়ে এনে দামুর মুখে হাসি ফোটাবে।

হ্যাঁ, তারপর দামুকে ফেলে, বাপুকে ফেলে চলে যাবে ও অঘোনের সঙ্গে। লিষাদের বউ লিষাদী হয়ে বনে চলে যাবে, রূপসি পাহাড়ের জঙ্গলে। আর নয়তো শহরের কলে গিয়ে কাজ নেবে দুজনে, কিংবা খাদানে।

আঁকাবাঁকা ঢালু রাস্তা বেয়ে রেললাইনের ধারে ধারে তরতর করে নেমে চললো রংলী, অঘোনের ঘরের দিকে।

কিন্তু বেশী দূর যেতে হলো না। মাঝপথেই থেমে পড়লো রংলী। ক্ষেতের আঁকাবাঁকা সরু আল ধরে হেঁটে চলেছিলো ও, হঠাৎ চোখ পড়লো সামনে। একই আলপথে একটা লোক এগিয়ে আসছে। হ্যাঁ, অঘোন। হাতের বল্লমটা দেখেই চিনতে পারলো রংলী।

ভেবেছিলো রাগের মাথায় অঘোন হয়তো ওকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চাইবে।

কিন্তু কাছে আসতেই রংলী চমকে উঠলো। এ কি চেহারা হয়েছে অঘোনের? উস্কখুস্ক চুল, চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে। মানুষটা কি পাগল হয়ে গেছে নাকি!

কাছে পেঁছেই অঘোন উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, আহ্লাদীরে দেখেছিস রংলী?

—আহ্লাদী? চমকে উঠে অঘোনের মুখের দিকে তাকালো রংলী।

আর অঘোনের গলার স্বরটা কেঁপে উঠলো। দীর্ঘশ্বাসের মতো শোনালো তার কথাটা। বললে, আহ্লাদী পালায় যেছে, আহ্লাদী পালায় যেছে।

—পালায় যেছে?

হ্যাঁ, পালিয়ে গেছে আহ্লাদী। কাল থেকে আহ্লাদীর কোনো খোঁজ মেলেনি। সারা দিন

সারা রাত খুঁজেছে ও, পায়নি। শুধু এক ভরসা অঘোনের, যদি রংলীদের ঘরের দিকে গিয়ে থাকে, যদি দামু তাকে লুকিয়ে রেখে থাকে।

কান্নার মতো শোনালো অঘোনের গলার স্বর। বললে, আহ্লাদীরে আমি ফিরায় দিব, শুধু কয়ে দে রংলী, দামু লুকায় রাখছে নাকিন। আহ্লাদীরে আমি ফিরায় দিব।

বিভ্রান্ত লোকটার দিকে দুর্বোধ্য চোখে তাকিয়ে রংলী শুধু ঘাড় নাড়লো।

রংলীর কথা বিশ্বাস হয় না অঘোনের। ময়না চৌকিদারের ঘরের দিকে ছুটে চলে ও, পিছনে পিছনে রংলী। অঘোনের বিশ্বাস, দামু ওকে নিশ্চয় লুকিয়ে রেখেছে। আর কিছু চায় না অঘোন, শুধু জানতে চায় আহ্লাদী বেঁচে আছে। তা হলেই ও খুশী। দামুকে ফিরিয়ে দেবে ও, কিন্তু আহ্লাদী যেন বেঁচে থাকে।

হাঁটতে হাঁটতেই অঘোন বলে, বড় মায়ার হরিল বটে আহ্লাদী, মায়ার হরিল।

রংলীর মনটাও ভিজে নরম হয়ে যায় অঘোনের দিকে তাকিয়ে। নিষাদ নাকি এই মানুষটা? ডাকু? দামুর মতো এই এক রত্তি একটা ছোট্ট ছেলে যেন অঘোন। একটা হরিণকে ভালোবেসে ফেলেছে!

বারবার বিস্ময়ের চোখে তাকায় ও অঘোনের মুখের দিকে, আর ভাবে, কেমন লিষাদ বটে, হরিলের লেগে কাঁদতিছে ই কেমন লিষাদ!

কিন্তু রংলী কি ভাবছে না-ভাবছে সেদিকে চোখ নেই অঘোনের। দপদপ করে পা ফেলে ময়না চৌকিদারের কুঠরির দিকে এগিয়ে এলো ও। তারপর ডাকলে, দামু! দামু!

দামু ছুটে এলো অঘোনের ডাক শুনে। ভাবলে, আহ্লাদীকে বুঝি ফিরিয়ে এনেছে অঘোন।

কিন্তু অঘোন বল্লমীর দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠলো দামু। আর অঘোন ছুটে এসে বললে, আহ্লাদীরে লুকায় রাখেছিস দামু? কয়ে দে কথাটা, তুয়ার আহ্লাদী তুয়ার থাকবে; বল তু, লুকায় রাখেছিস?

দামু শুনলো কথাগুলো, তারপর ধীরে ধীরে বললে, না, উ জঙ্গলে পালায় যেছে।

—জঙ্গলে পালায় যেছে?

মুহূর্তের জন্যে হয়তো সেদিনের সেই দৃশ্যটা দামুর চোখের সামনে ভেসে উঠলো। এদিকে আহ্লাদী নিথর তাকিয়ে আছে, আর ওদিকে শিংওয়ালা একটা বুনো হরিণ—সেও তাকিয়ে আছে আহ্লাদীর দিকে।

অঘোন আবার প্রশ্ন করলে, উ জঙ্গলে পালায় যেছে?

দামু বললে, হুঁ, ঘরের লেশা ওর কাটে যেছে, বনের লেশায় জঙ্গলখানুডে যেছে আহ্লাদী।

অঘোনও এবার বল্লমটা কাঁধে তুলে নিলো, বললে, তারে আমি ঢুঁড়ে আনব, আহ্লাদীরে ঢুঁড়ে আনব আমি।

দামুও দু পা এগিয়ে গেল।—আমিও যাব তুমার সাথে।

অঘোন হাসলো, তাকালো দামুর মুখের দিকে, তারপর বললে, চ ক্যানে।

দুজনে তালে তালে পা ফেলে এগিয়ে গেল। আঁকাবাঁকা সরু ধুলোর রাস্তাটা ধরে, যে রাস্তাটা উঁচু টিলাটার ওপর উঠেই শুখা ঝরনায় ডুব দিয়ে গিয়ে মিশছে রূপসি পাহাড়ের অন্ধকারে, জঙ্গলখানুডের অন্ধকার রহস্যে।

লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল দুজনে, আর পিছনে, দূরে দূরে—রংলী।

টিলাটার কাছে পেঁৗছে থমকে দাঁড়ালো দামু। কান পেতে শুনলো। যেন নীচে কোথায় টুং টুং টুং টুং একটানা একটা শব্দ বাজছে।

আহ্লাদী! আহ্লাদী! চিৎকার করতে করতে ছুটে গেল দামু। গিয়েই অর্থহীন চোখে তাকিয়ে দেখলো চারিপাশে।

না, আহ্লাদী নয়।

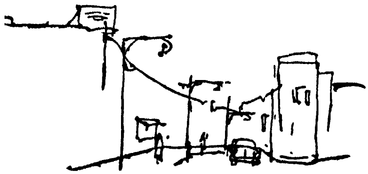
একটা পুরোনো ভাঙা মরচে-ধরা করোগেটেড টিন পড়ে আছে ঝরনাটার ধারে। আর পাশের মহুয়া গাছটা থেকে তার ওপর টুপটুপ করে পাকা মহুয়া পড়ছে।

অঘোন এগিয়ে গিয়ে দামুর হাত ধরলো, তারপর শুখা ঝরনাটা পার হতে হতে ফিরে তাকালো একবার। দেখলে উঁচু টিলাটার ওপর এসে দাঁড়িয়েছে রংলী। হাসছে।

হাসলো অঘোন, হাত তুলে চিৎকার করলে, আহ্লাদী, জঙ্গলখান্ডে যাবি? চ লিয়ে যাব।

—যাব। রংলী উত্তর দিলো, না অঘোনের শেষ কথাটার প্রতিধ্বনি ফিরে এলো, কে জানে। দামু আর অঘোন দুজনেই তখন মহুয়াবনের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

[১৩৬৭



গত যুদ্ধের ইতিহাস

১৯৪০ সাল।

আমরা তখন প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র। অর্থাৎ কলেজের খাতায় নাম আছে, ক্লাস করি রায়ের কেবিন কিংবা বেকার ল্যাবরেটরীর উত্তরের বিস্তৃত সবুজ মাঠে। নিজেরাই এক-একটি ক্ষুদে অধ্যাপক, প্রশ্ন এবং মীমাংসা নিজেরাই করি। বিষয় : দেশের স্বাধীনতা থেকে চেম্বার-লেনের ভুল পর্যন্ত। আমরা সকলেই তখন এক-একজন যুদ্ধবিশারদ।

কলেজের মাঠে বসে আড্ডা দিতে দিতে কখন যে সেদিন সন্ধ্যা নেমেছে, আকাশে তারা আর পথে পথে ইলেকট্রিকের আলো জ্বলেছে খেয়াল হয়নি।

খেয়াল হলো একটা প্লেনের আওয়াজে।

ধীরে ধীরে আমরা ক' বন্ধু বেরিয়ে এলাম, লোহার ফটক খুলে দিলো দারোয়ান।

তারপর একে একে সবাই বিদায় নিলো, ঘণ্টি বাজিয়ে একটার পর একটা ট্রাম চলে গেল, আর আমি অন্যমনস্কভাবে রেলিঙের ধারে টাঙানো পুরোনো বই দেখতে দেখতে কখন যে হ্যারিসন রোডের মোড়ে পানের দোকানটার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি টের পাইনি।

পকেট থেকে সাতটা পয়সা বের করে দোকানীর কাছ থেকে পাঁচটা ক্যাপস্টান ম্যাগনাম সিগারেট কিনতে যাবো, হঠাৎ পিছন থেকে একটা মেয়েলী গলা শুনলাম, দুটো পয়সা দেবেন?

ফিরে তাকালাম। ফিরে তাকিয়ে চমকে উঠলাম।

বছর তেরো-চোদ্দ বয়সের একটি ফর্সা মুখ। কাঠির মতো রোগা শীর্ণ চেহারা, কিন্তু চোখ দুটো কেমন করুণ গভীর। কপালে একটা খয়েরের কিংবা বিন্দির টিপ।

তার শরীরে জড়ানো ছাপা শাড়িটায়, চুলে আর মুখে, অল্প হলেও একটা সযত্ন প্রসাধনের চিহ্ন ছিলো।

আমি তার দিকে তাকিয়ে আছি দেখে সে হঠাৎ ফিক করে হেসে উঠেই গলায় যথাসম্ভব গাম্ভীর্য আনবার চেষ্টা করে বললে, ব্যাণ্ডেলে ফিরে যাবো, দুটো পয়সা কম পড়ছে, দিন না দুটো পয়সা!

বলে হাত পাতলো সে।

দেখলাম, তার হাতে বেশ কয়েক আনা পয়সা রয়েছে।

আমি ইতস্তত করছি দেখে সে আবার বললে, দুটো পয়সা তো, দিন না...

বাড়তি পয়সা আমার কাছেও বিশেষ ছিলো না, তবু একটা আনিই দিলাম তাকে। আর পয়সাটা নিয়েই সে চলে গেল, হারিয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে।

কিন্তু ঐ শীর্ণ ফর্সা মুখখানা মন থেকে মুছে ফেলতে পারলাম না। থেকে থেকেই মনের

মধ্যে খোঁচা দিতে শুরু করলো।

সময় পেলেই সন্ধ্যের দিকে পানের দোকানটার সামনে এসে দাঁড়াতাম, ওকে খুঁজতাম। যদি আবার কোনো দিন দেখা পাই।

কিন্তু দিনের পর দিন কেটে গেল, খুঁজে পেলাম না। হয়তো ভুলেও গিয়েছিলাম।

হঠাৎ আবার দেখা হয়ে গেল একদিন, একটা সিনেমা-হাউসের সামনে।

ঠিক আগের মতোই ও এগিয়ে এলো, হাত বাড়ালো। বললে, দুটো পয়সা দেবেন, ভাড়ার পয়সা কম পড়ে গেছে।

আমি হেসে ফেলে ওর মুখের দিকে তাকালাম। কিন্তু বেশ বুঝতে পারলাম, মেয়েটি আমাকে চিনতে পারেনি।

কোনো কথা না বলে দুটো পয়সা ওর মুঠো-ভরা আনি দু-আনির ওপর রেখে দিলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে আমার সঙ্গী বন্ধুটি প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো : ও কি রে, দিলি ওকে?

মেয়েটি ততক্ষণে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেছে।

বন্ধুটিকে বললাম, দিলেই বা? দুটো পয়সা তো!

সে হাসলো, বললে, ওকে চিনিস না? এক নম্বরের জোচ্চোর। সবাইকে ঐ এক কথা বলে পয়সা নেয়। সব মিছে কথা ওর।

বললাম, ফন্দিটা মিথ্যে হতে পারে, অভাবটা মিথ্যে নয়।

বন্ধু ঠাট্টা করলে, তেরো বছরের একটা পুঁচকে মেয়ে দেখেই দাতা কর্ণ হয়ে গেলি যে!

হেসে বললাম, তেরো বছর বয়েস বলেই ফন্দি আঁটতে হচ্ছে ওকে, বয়েস বাড়লে কি আর এসব দরকার হবে!

কথাটা যখন বলেছিলাম, তখন অত হিসেব করে বলিনি।

কিন্তু মেয়েদের বয়েসটা যে অত বড় জিনিস তখন জানতাম না।

মাঝখানে কয়েকটা মাস, না একটা বছর কেটে গিয়েছিলো, জানি না। শুধু এটুকুই মনে আছে, পরীক্ষা শেষ হলো সেদিনই। আমরা ক' বন্ধু একসঙ্গে বাসে উঠলাম, বাড়ি ফেরার পথে। চিৎকার হট্টগোল করে, বাসসুদ্ধ লোকের বিরক্তি উৎপাদন করে আমরা তখন প্রশ্ন আর উত্তরের জটিল তর্কে ডুবে আছি।

আর সেই সময়েই হঠাৎ এক গাছি কাচের চুড়ি পরা সরু আর ফর্সা একখানা হাত চোখের সামনে এগিয়ে এলো।

চমকে চোখ তুললাম। দেখি, সেই মুখ, তেমনি টানা-টানা করুণ গভীর এক জোড়া চোখ! শুধু শরীরে ঈষৎ পরিবর্তন। রুগ্নতার মধ্যেও কোথায় যেন একটা শ্রী ফুটে উঠতে চাইছে। কৈশোর যেন উঁকি দিতে চাইছে যৌবনের জানালায়।

আগের মতোই মুঠো-ভরতি আনি দু-আনির হাতখানা এগিয়ে দিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইলো। কিন্তু কোনো কথা বললো না, কারণ দর্শালো না, অনুরোধ জানালো না।

দুটো পয়সা দিতেই সে সরে গেল, গিয়ে দাঁড়ালো পাশের লোকের সামনে। আর কি আশ্চর্য, সকলেই কিছু-না-কিছু দিলো।

কিন্তু বাসের পাঞ্জাবী কনডাকটারের চোখে পড়তেই সে তাড়া করে এলো মেয়েটিকে। তাকে নেমে যেতে বললে ধমকের ভাষায়।

সেই শীর্ণ পাণ্ডুর মুখখানার এতটুকু পরিবর্তন হলো না, দুটো তীব্র চোখ তুলে মেয়েটি কনডাকটারের দিকে তাকালে। তারপর ধীরে ধীরে নেমে গেল, বাস থামতেই। আর বিশাল চেহারার কনডাকটারটা যেন মুহূর্তে চুপসে গেল।

আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমরা গর্বিত বোধ করলাম।

এর পর তাকে প্রায়ই বাসে ট্রামে দেখতে পেতাম। নিত্যদিনের মতোই সে পয়সা-ভরা একটা মুঠো খুলে ধরতো চোখের সামনে। কেউ দু-চার পয়সা দিতো, কেউ দিতো না। যেন রুটিন-বাঁধা কাজ। সময় ধরে কয়েক সেকেণ্ড সে সকলের সামনে দাঁড়াতো।

এমনি সময় একদিন একটা ঘটনা ঘটলো।

সন্ধ্যের সময় বাড়ি ফিরছি দোতলা বাসের হাওয়া খেতে খেতে। আঃ, সে কি ঝড়ের মতো হাওয়া পুরোনো দিনের সেই বাসে।

সেদিনও মেয়েটি এসে দাঁড়াচ্ছে এক-একজনের সামনে। এমন সময় একটা চিৎকার শুনলাম কনডাকটারের : পয়সা নেহি তো উতর যাও।

বিস্মিত হয়ে ফিরে তাকালাম।

জামা-কাপড়ে কালিঝুলি-মাখা একটি লোকের ওপর কনডাকটার তড়পাচ্ছে। আর লোকটা মুখ কাঁচুমাচু করে বলছে, পয়সা পড়ে গেছে পকেট থেকে, আমাকে আজ যেতে দাও সর্দারজী।

কিন্তু সর্দারজীর মন গলানো গেল না, সে আবার বললে, উতর যাও। লোকটাকে নামিয়ে দেবার জন্যে বোধ হয় হাতও বাড়িয়েছিলো।

এমন সময় মেয়েটি চিৎকার করে উঠলো : এই জানোয়ার!

সকলেই চমকে উঠলো, সকলেই বিস্মিত হলো। ভিক্ষে যার বৃত্তি, তার মুখ থেকে এমন একটা ধমক আসতে পারে কেউ ভাবিনি।

মেয়েটির সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সে তেমনি তীব্র চোখে তাকিয়ে কনডাকটারের দিকে এগিয়ে গেল, তারপর একটা দু-আনি এগিয়ে দিয়ে বললে, দাও, ওর টিকিট দাও।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, এর পর যেদিনই ও আসবে, হাত পাতবে, একটা আনি দেবো, কিংবা দু-আনি।

হয়তো দু-একবার দিয়েওছিলাম। তারপর কখন থেকে যে ওকে পয়সা দেওয়া বন্ধ করেছিলাম, জানি না। তখন সারা কোলকাতায় ব্যাফল্ ওয়াল উঠছে, বিদেশী সৈন্যরা আসছে, বড় বড় মিলিটারী ট্রাকে পথঘাট সরগরম।

জিনিসপত্রের দামও তখন বাড়ছে তরতর করে। তাই হয়তো মেয়েটিকে অনেকেই নিরাশ করতে শুরু করলো। একটা আনির তখন কোনো দাম নেই বলেই একটা আনিরও তখন অনেক দাম।

সেইজন্যেই হয়তো মেয়েটিকে আর বড় একটা দেখতে পেতাম না।

১৯৪২ সাল।

মাঝখানে অনেকগুলো মাস কেটে গেছে, মেয়েটিকে কোনো দিনই দেখতে পাইনি। হয়তো হাত বাড়িয়ে দাঁড়ালেও কেউ ভিক্ষে দিতো না বলেই, কিংবা কে জানে, হয়তো ভিক্ষের চেয়েও বেশী কিছু দিতে চাইতো কেউ কেউ, তাই ও পথ থেকে সরে গিয়েছিলো সে।

কিন্তু একদিন হঠাৎ ওকে আবার আবিষ্কার করলাম।

ডালহৌসী স্কোয়ারের একটি আপিসে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি। দেখি কি, ছোট্ট একটি স্যুটকেস হাতে নিয়ে মেয়েটি ঢুকলো। প্রথমটা ওর মুখ দেখতে পাইনি, আমাদের দিকে পিছন ফিরে উলটো দিকের টেবিলে যারা বসে ছিলো তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো সে, স্যুটকেস খুলে কি যেন দিলো, পয়সা নিলো। বেশ বুঝতে পারলাম, মেয়েটিকে ওরা সকলেই চেনে, মাঝে মাঝে নিশ্চয় আসে, টুকিটাকি ফিরি করে যায়। কারণ, ওকে দেখে প্রত্যেকেই মৃদু হেসে অভ্যার্থনা জানালো, কেউ বোধ হয় শুধু হাতে ফেরাতে চাইলো না।

মেয়েটি ঘুরে ঘুরে বন্ধুটির টেবিলেও এলো। আর তখনই ওকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম, চিনতে পারলাম।

স্যুটকেস খুলে দাঁড়ালো মেয়েটি। প্যাকেট-বাঁধা পাঁপর, দাঁতের মাজনের শিশি, আরো দু-চারটে টুকিটাকি।

মেয়েটির মুখের দিকে, শরীরের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম এবার। একটু যেন লম্বা হয়েছে আগের চেয়ে, একটু শ্রী বেড়েছে।

সে চলে গেল একসময়, আর চলে যাবার পরও যেন একটা রেশ রেখে গেল মনের ওপর। রীতিমতো খুশী হয়ে উঠলাম মনে মনে। খুশী হয়ে ওঠবারই তো কথা! যে এই সেদিনও ভিক্ষের ওপর নির্ভর করতো সে যে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছে, এ কি কম আনন্দের। মেয়েটির পরিচয় জানার জন্যে তীব্র একটা আগ্রহ দেখা দিলো মনের মধ্যে।

বন্ধুটিকে প্রশ্ন করলাম, চিনিস ওকে?

—না তো ! আসে মাঝে মাঝে, এটা-ওটা বিক্রি করে যায়।

বলতে গিয়েও বন্ধুটিকে ওর পুরোনো ইতিহাস বলতে বাধলো। না, যে নিজের মর্যাদা নিজে আহরণ করেছে, তার পিছনের পরিচয়টুকু জানিয়ে দিয়ে তাচ্ছিল্য দেখাবো না।

তবে আমার অভিমানের তারে মেয়েটি বোধ হয় ঘা দিয়ে গেল। বহুবার ঘা দিয়ে গেছে। আশ্চর্য, এতদিন ওকে ভিক্ষে দিয়েছি, এতবার দেখা হয়েছে, তবু কোনোবারই আমাকে ওর চেনা মনে হয়নি। পৃথিবীর কোনো মানুষটাই যেন ওর পরিচিত নয়। কেউ রাস্তার মানুষ, ভিক্ষে দেওয়ার পর যার আর কোনো পরিচয় নেই। কেউ শুধুই খদ্দের, জিনিস কেনাবেচার পর যার সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক থাকে না।

মেয়েটির কথা ভেবে আমি বহুবার বিস্মিত হয়েছি। এ কেমন মানুষ, যে পিছনের দিকে তাকায় না? এ কেমন মানুষ, যে মিষ্টি হাসির প্রতিদানটুকুও দেয় না! কিন্তু ভেতরে ভেতরে একটু শ্রদ্ধাও যে না করতাম তা নয়।

মনে হতো, ওর নিজের ভবিষ্যৎ ও নিজেই গড়ে নেবে, গড়ে নিতে জানে। গড়ে নিয়েছিলো।

মাস কয়েক পরেই আরেক টুকরো রোমাঞ্চের শিস দুলিয়ে দিয়ে গেল মেয়েটি।

চমকে উঠেছিলাম, একেবারে সেই প্রথম দিনটির মতোই।

কালীঘাটের ট্রাম ডিপোর সামনে দাঁড়িয়ে আছি, ট্রামের অপেক্ষায়। হঠাৎ দেখি মন্দিরের দিক থেকে একটি মেয়ে হেসে হেসে হেলে-দুলে এগিয়ে আসছে, সঙ্গে একটি প্রায় সমবয়সী ছোকরা। মেয়েটির পরনে লালপাড় সাদা শাড়ি, কপালে ডগডগে সিঁদুরের ফোঁটা, সিঁথিতে চওড়া করে টানা সিঁদুর, আর হাতে মাটির সরায় বেলপাতায় লেপা সিঁদুর, ফলমূলের প্রসাদ। হয়তো কালীমন্দিরে পুজো দিয়ে ফিরছিলো। সঙ্গের ছেলেটি যে ওর স্বামী তা বুঝতে অসুবিধে হলো না। একটা খাকির ময়লা ট্রাউজার্স ছেলেটির পরনে, গায়ে কলারওয়ালা নীল গেঞ্জি। বোধ হয় কোনো মোটর গ্যারেজে কাজ করে।

হাসতে হাসতে ওরা এগিয়ে এলো, ট্রামে উঠলো। দেখলাম মেয়েটির শরীরে অদ্ভুত পরিবর্তন এসেছে। সেই শীর্ণ কিশোরী মেয়েটি যেন যৌবনের পরিপূর্ণতার ঘাটে এসে পেঁৗছেছে। সেই বিষণ্ণ মুখে কি এক বিচিত্র উন্মাদনা।

ছোটবেলায় আমাদের বাড়ির সামনে একটা লেবুগাছ বসানো হয়েছিলো। রোজ ভোরবেলায় উঠেই তার কাছে ছুটে আসতাম, ভাবতাম গাছটা বুঝি রাতারাতি বড় হয়ে উঠেছে। কিন্তু না, ধীরে ধীরে সেটা কবে যে বড় হয়েছে, কোনো দিনই টের পাইনি। শুধু একদিন দেখলাম, সে গাছে ফুল ধরেছে, তারপর ফলও ধরলো একদিন। আর সেদিন কি আনন্দ যে হয়েছিলো গাছটায় লেবু ধরতে দেখে। ঠিক তেমনি আনন্দ হলো মেয়েটিকে দেখে, মনে হলো ও বুঝি সত্যি ওর গন্তব্যে পেঁৗছে গেছে।

১৯৪৩ সাল।

ভুল ভেবেছিলাম। খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে বাতাসের শব্দ শুনতে চেয়েছিলাম। ভাবিনি, রাস্তায় রাস্তায় ব্যাফল্ ওয়ালের ধাক্কা খেয়ে অন্ধকার ঘরের নিভৃতে বাতাস ঢোকে না, ঢুকতে পায় না। ভাবিনি, পথে পথে চোখে ঠুলি আঁটা ব্ল্যাক আউটের রাতের ল্যাম্পপোস্টের আলো তার নীচেই অন্ধকার জমিয়ে রাখে।

তাই আবার একদিন দেখতে পেলাম মেয়েটিকে।

সাদা চাদরের মতো মুখ। বিষণ্ণ, ক্লান্ত, পরাজিত। একটা সরু কালোপাড় ধুতি পরনে, মাথায় ঘোমটা, কোলে একটি বাচ্চা শিশু—সিঁথির সিঁদুর মুছে গেছে।

কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়ে হাত পেতে ভিক্ষে চাইছিলো সে।

স্তম্ভিত বিস্ময়ে দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখলাম ওকে। কি এক অজানা ব্যথায় বুকটা মোচড় দিয়ে উঠলো। কাছে এগিয়ে গেলাম, একটা আধুলি রাখলাম ওর পাতা হাতে।

ও চমকে চোখ তুললো। চোখ নামালো।

আমি ধীরে ধীরে বললাম, তোমার স্বামী?

ও আবার চোখ তুললো, চোখ নামালো। কিছুক্ষণ নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থেকে বললে, নেই।

বললাম, কি হয়েছিলো?

মেয়েটি কোনো উত্তর দিলো না, হঠাৎ ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়লো ওর দু গাল বেয়ে।

আবার কি বলতে যাচ্ছিলাম, কে যেন শিস দিয়ে উঠলো। ফিরে তাকালাম। দেখি, দুটো অভদ্র দৃষ্টি ওকে লক্ষ্য করে কি যেন বলাবলি করছে।

আমি তাড়াতাড়ি একটা চলন্ত ট্রামে উঠে পড়লাম।

সে রাত্রে ঘুমোতে পারিনি। মনে হয়েছে, শুধু ওই মেয়েটিই নয়, আমি—আমরা সকলেই যেন হেরে গেছি, হেরে যাবো।

পরের দিনই আবার ওর খোঁজে গিয়েছিলাম। কিন্তু, না, আর সেই ল্যাম্প-পোস্টের নীচে তাকে দেখতে পাইনি।

১৯৪৪ সাল।

দোলের দিন। চতুর্দিকে বর্বর উল্লাস। বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছি, সামনের গলি দিয়ে হেঁটে চলেছে রঙমাতাল মানুষের দল।

•হঠাৎ একটা হুড-খোলা গাড়ি ছুটে এলো, থামলো।

বেয়াদবির রঙে রাঙা জন পাঁচেক নেকড়ে-মানুষ। মাঝখানে একটি মেয়ে। সারা শরীর তার রঙে আর আবীরে মাখা। তার এক রাশ ফাঁপানো চুলে যৌবনের আগুন।

প্রথমটা চিনতে পারিনি। গাড়ি থেকে নেমে মেয়েটি দু হাতে ওর এলো চুলের রাশিকে খোঁপায় জড়ালে, শাড়ির প্রান্তে মুখের রঙ মুছলে। আর তখনই চিনতে পারলাম।

সেই মেয়েটি!

সমস্ত মন আমার বেদনায় বিষণ্ণ হয়ে গেল। কিন্তু তার যেন কোনো দিকেই ভ্রূক্ষেপ নেই। হাসিমুখে কি একটা ঠাট্টা ছুঁড়লো সে, তারপর আবার গাড়িতে উঠে বসলো। পর-মুহূর্তেই গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

সেদিন আমি মনে মনে প্রার্থনা করেছিলাম, যেন মেয়েটিকে আর কোনো দিন দেখতে না হয়। যেন দেখা না হয়।

মনে মনে বলেছিলাম, প্রতি মুহূর্তে রাস্তায় এত এত দৈত্যাকায় মিলিটারী ট্রাকের নীচে এত এত মানুষের মৃত্যু হচ্ছে, ওই মেয়েটিরও যেন এভাবেই মৃত্যু হয়। গোরা বা মার্কিন সৈন্যদের একটু বেহিসেবীপনার ফলে ও যেন মুক্তি পায়।

কিন্তু না, আমার প্রার্থনা শোনবার মতো সময় নেই তখন ঈশ্বরের। সারা পৃথিবীর যুদ্ধ-বিধ্বস্ত মানুষের প্রার্থনা তখন শুনতে হচ্ছে তাঁকে।

তাই মেয়েটিকে আবার দেখতে হলো। কিন্তু এভাবে দেখবো, ভাবিনি কোনো দিন।

সাদার্ন অ্যাভেনিউয়ের কয়েকখানা প্রাসাদোপম বাড়িতে তখন ব্রিটিশ আর মার্কিন সৈন্যদের বাস। লেকের ধারে সৈন্যশিবির। আমেরিকান নিগ্রো সৈন্যদের পৈশাচিক উল্লাসে কখনো নিস্তব্ধ রাত সচকিত হয়ে ওঠে, কখনো শ্বেতাঙ্গ সৈনিকদের নির্লজ্জ বর্বরতায় আমরা স্তম্ভিত হয়ে যাই। যুদ্ধদিনের সেই মানুষগুলোকে দেখে বোধ হয় বনের পশুও লজ্জা পেতো। তাই সন্ধ্যে ঘন হতে না-হতেই সকলে ফিরে আসতো তখন ঐ তল্লাট থেকে। একটা বীভৎস প্রেতনৃত্য চলতো তখন ঐ অন্ধকার গাছগাছালির জ্যোৎস্না-ঢাকা ছায়ায়।

আমরা ক' বন্ধু ফিরে আসছি তখন! রাত ন'টা হবে হয়তো। কিংবা আরো বেশী।

শ্বেতসৈনিকের দল চলেছে ফিরিঙ্গী বারবধূদের কোমর জড়িয়ে ধরে। কারো সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ নার্স, অথবা ওয়াকি মেয়ে।

হঠাৎ এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়ালাম। রাস্তার ধারে গাছের নির্জন ছায়া-ছায়া অন্ধকারে একা একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারে তার মুখ দেখা গেল না। কিন্তু সে যে বাঙালী, শাড়ির বদলে কোমরে বেল্ট বাঁধা লম্বা সেমিজটাকে প্রায় গাউনের ভাব দিলেও তা বুঝতে ভুল হলো না।

থমকে দাঁড়ালাম। সামনের ব্যারাক থেকে একটি টমি বেরিয়ে এলো, এসে দাঁড়ালো মেয়েটির সামনে। সিগারেট বের করে দিলো মেয়েটিকে। তারপর দুজনেই সিগারেট ধরিয়ে এগিয়ে গেল

লেকের ঘাস গাছ জলের অন্ধকারে। আর সেই মুহূর্তে, একটা ঠুলি-পরা ল্যাম্প-পোস্টের কাছে গিয়ে ওরা পেঁছতেই আমি শিউরে উঠলাম।

মেয়েটিকে স্পষ্ট চিনতে পারলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই বিস্মৃত মুহূর্তের ছবিটা নতুন করে চোখের সামনে ভেসে উঠলো। সেই ক্লান্ত ম্লান বৈধব্যের কোলে একটি ছোট্ট শিশু। একটি পরাজিত মুখে মাতৃত্বের গৌরব! ক্ষণিকের জন্যে একটি প্রশ্ন জেগেছিলো মনে, জানতে ইচ্ছে হয়েছিলো সেই ছোট্ট শিশুটির কথা। কিন্তু সে প্রশ্নের সুযোগ জোটেনি।

সেই শেষ। তারপর আর কোনো দিন তাকে দেখিনি। কত বছর কেটে গেছে, তার কথাও ভুলে গিয়েছিলাম।

ইতিমধ্যে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। স্বাধীনতা এসেছে। আরো কত কি। দিনে দিনে কত ইতিহাস রচিত হয়ে গেছে আমাদের চোখের সামনে।

কে জানতো, সেই মেয়েটিকে আবার একদিন মনে পড়বে!

১৯৫০ সাল।

সন্ধ্যার সময় চৌরঙ্গীর পত্রপত্রিকার স্টলের দিকে চলেছিলাম এক বন্ধুর সঙ্গে। ট্রাম-লাইন পার হয়ে খানিকটা আবছা অন্ধকার। এক রাশ বালি পড়ে আছে এক পাশে, হয়তো রাস্তা মেরামতের জন্যে জড় করে রাখা হয়েছে। আর তার ওপর কুস্তি লড়ছে দুটো কালো-কুলো ছেলে। বয়েস ছ-সাত বছরও নয়। খালি গা।

ধমক দিতেই ছেলে দুটো হাত-পায়ের বালি ঝেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। তারপর একজন হাত পাতলে, এট্টা বিড়ি দেন না বাবু!

হেসে ফেললাম তার ভাবে-ভঙ্গিতে।

হাতের সিগারেটে শেষ টান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলতেই অন্য ছেলেটি ছুটে গিয়ে সেটা তুলে নিলো, বার তিনেক টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লে পরম তৃপ্তিতে।

বললাম, মারামারি করছিস কেন?

একজন দাঁত বের করে হাসলো, ও শালা বলছে ওর বাবা সাহেব!

আরেকজন বললে, ও শালার বাবা নেই বাবু। বলেই খিলখিল করে হাসলো।

সঙ্গের বন্ধু জিগ্যেস করলে, কে আছে তোদের? বাবা-মা আছে?

দুজনে একই সঙ্গে বললে, কেউ নেই বাবু।

—কেউ নেই? সহানুভূতির স্বরেই বন্ধুটি প্রশ্ন করলে, মা?

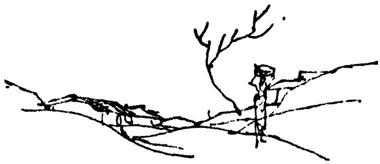
ছোট ছেলেটা হেসে উঠলো, বললে, কি জানি বাবু, সে মা বেটীই জানে, বেঁচে আছে না মরে গেছে।

বললো এমন ভঙ্গিতে যেন মায়ের প্রতি ঘৃণাও নেই ছেলেটার। তার চেয়েও নৃশংস একটা নির্লিপ্ত ভাব।

কেন জানি না, সেই বহুপরিচিত মেয়েটির কথা মনে পড়ে গেল। কপালে ডগডগে সিঁদুরের ফোঁটা, সিঁথিতে আগুনের মতো লাল রেখা। হাতে মাটির সরায় যাকে একদিন সিঁদুর বেলপাতা আর পুজোর প্রসাদ নিয়ে হাসতে হাসতে হেলে-দুলে স্বামীর পাশে পাশে ট্রামে উঠতে দেখেছিলাম। আবার একদিন যাকে শ্বেত-শান্ত বৈধব্যের কোলে একটি কালো-কুলো শিশুকে নিয়ে রাস্তার মোড়ে হাত পেতে দাঁড়াতে দেখেছিলাম।

আর মনে হয়েছিলো, ইতিহাস শুধু বইয়ের পাতায় নিঃশব্দে পড়ে থাকে না, ইতিহাস আমাদেরই আশেপাশে, আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরে বেড়ায়।

।১৩৬৮



মন্ত্র

লালচাঁদ রোজাকে প্রথম দেখেছিলাম বেলাংডিহির ঝাঁপানে। আষাঢ়-পঞ্চমীতে মেলা বসতো, লোক থিকথিক করতো মেলাতলায়। কাঁধের বাঁকে সাপের ঝাঁপি সাজিয়ে দূর দূর গাঁ থেকে আসতো বেদের দল। সাপ খেলাতো, পুজো দিতে আসতো তারা বিষহরী জগৎগৌরী মায়ের থানে। আসতো গান গেয়ে, জড়িবুটি বিষপাথর বেচে দু-পয়সা রোজগার করতে।

মদন মাল, লখাই সর্দার, কান্ত বেদে—ওরা সব এখন সারি দিয়ে বসেছে, সাপখেলা দেখাচ্ছে সামনে লাল গামছা বিছিয়ে। যার যা ইচ্ছে দু-চার পয়সা ফেলে দিচ্ছে গামছায়, আর সিঁদুর-টুপি সাপের ফণায় টোকা দিয়ে দিয়ে বাঁ হাতের শূন্য মুঠিটা ডুগডুগির মতো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ওস্তাদ একজন বলছে, আসল লাগ বটে গো, সিঁদুরটুপি লাগ। কামালো লাগ লয়।

অর্থাৎ বিষ-কামানো সাপ নয়।

ওস্তাদকে বললাম, সাপের মন্ত্র শিখিয়ে দেবে ওস্তাদ?

সে হেসে উঠলো, তারপরই ইশারায় দেখিয়ে দিলো যার দিকে, কে জানতো সে-ই লালচাঁদ রোজা।

মাথায় গেরুয়া পাগড়ি, বুক পর্যন্ত পাকা দাড়ি, গায়ে একটা গেরুয়া রঙে ছোপানো ফতুয়া, কোমরে শক্ত করে গিঁঠ দিয়ে বাঁধা কাপড়টাও গেরুয়া রঙের, লুঙ্গির মতো করে পরা। কাঁধে একটা ঝোলা। আর চোখ দুটো জবাফুলের মতো লাল, পাক-দেওয়া দড়ির মতো শুকনো চেহারা।

লালচাঁদ কাছে আসতেই ফণা-তোলা সাপটাকে ঝাঁপির ঢাকনায় চেপে দিয়ে দু হাত কপালে ঠেকালো ওস্তাদ, বললো, গড় হই গো বাবাঠাকুর।

সঙ্গে সঙ্গে মদন মাল, লখাই সর্দার, কান্ত বেদেও বলে উঠলো, পেন্নাম গো বাবাঠাকুর, পেন্নাম।

তারপর ওস্তাদ হেসে উঠে আমাকে দেখিয়ে বললে, লাগের মন্তর চায় গো ই খোকাবাবু।

আমার তখন কতই বা বয়স। তেরো কি চোদ্দ। বেলাংডিহির পাশের গাঁ পলাশবনিতে মামার বাড়িতে থেকে ইস্কুলে পড়ি। সাপের মন্তর শেখার তখন ভারি শখ।

লালচাঁদ হাসলো আমার দিকে তাকিয়ে। তারপর বললে, দিব, দিব বাপ, আসল লাগ চিনায় দিব, লাগবন্দী মন্তর শিখায় দিব। খড়ি গুনতে শিখায় দিব, বিষ লামানোর মন্তর শিখায় দিব, বিষপাথর চিনায় দিব। শাগরেদ হবি বাপ?

বলতে বলতে বটতলার দিকে চোখ পড়লো লালচাঁদের। বেদেনীর দল সেখানে তখন জটলা পাকিয়ে গান গাইছে। ভিড় করে শুনছে মেলার লোক।

সে গান শুনে আমরা ক' বন্ধু হেসেই খুন। কি গানের বাহার। কেবল মাঝে মাঝে ধুয়ো উঠছে : মরি হায় রে!

একটা বছর পনরো বয়সের মেয়ে আবার নাচ জুড়ে দিয়েছে। নাচছে একবার করে আর গাইছে :

লাগের সাগর লাগর ভাগর
লদে লৌকা বায় রে!
মরি হায় রে!

লালচাঁদেরও চোখ পড়েছিলো মেয়েটার দিকে। হঠাৎ হাসতে হাসতে ছুটে গিয়ে তার হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে আনলো লালচাঁদ, বললে, ই কে বটে রে? লতুন লতুন লাগে?

কান্ত বেদে লজ্জায় মাথা নীচু করে হেসে বললে, আমার বেটী গো। পার্বুতী!

—কান্তর বেটী তুই? পার্বতী? চোখ বড় বড় করে তার দিকে তাকালো লালচাঁদ, যেন বিশ্বাস হচ্ছে না তার।

না হবারই কথা, কারণ এক বছর আগে এই বিষহরীর থানেই আমরাও দেখেছিলাম কান্ত বেদের মেয়েকে। একটা বছরে ও যে এত বড় হয়ে গেছে ভাবাই যায় না।

মেয়েটার গানের গলাও ছিলো খুব মিষ্টি।

সন্ধ্যের সময় আমরা ক' বন্ধু যখন গাঁয়ে ফিরছি, তখন ওর গলার সুর নকল করে আমরাও গাইছি :

কোলেতে লইয়ে মরা পতি
কলার মান্দাসে বেউলা সতী
বলে, মায়ের থানে আমি যাই রে!
জলে জলে ভেসসা চলে
পরানে সতীর ডর লাই রে।

একটা করে কলি গেয়ে উঠি আর হেসে লুটোপুটি খাই।

কিন্তু লালচাঁদ রোজাকে কিছুতেই যেন মন থেকে মুছে ফেলতে পারি না। ওর সম্পর্কে কেমন একটা বিস্ময় আর কৌতূহল তখন আমাদের মনের মধ্যে চেপে বসে আছে।

লালচাঁদ রোজা, লালচাঁদ রোজা! চারপাশের গাঁয়ের লোকের মুখে মুখে যার কথা এতদিন শুনে এসেছি সেই মানুষটিকে এতদিনে স্বচক্ষে দেখতে পাওয়া কি কম ভাগ্যের কথা?

গাঁয়ে ফিরে মামাকে, মামীকে, গাঁয়ের সবাইকে, বিশেষ করে দিদিমাকে না শুনিয়ে স্বস্তি নেই যেন। চোরাদিঘির সামন্তগিন্নী নাকি গলার হার খুলে দিয়েছিলো লালচাঁদকে, তার ছেলেকে বাঁচিয়েছিলো বলে। জনপুরের চাটুজ্যেরা দিয়েছিলো গরদের পাগড়ি আর এক শো রুপোর টাকা। মোমিনগাঁয়ের ছোট হাজী দিয়েছিলো দশ ভরি রুপোর রেকাবি-ভরতি টাকা আর শাল। আরো কত গল্প যে শুনতাম।

ভারি ইচ্ছে হতো, লালচাঁদ কি করে বিষ নামায়, সাপে-কাটা মানুষ বাঁচায়, নিজের চোখে দেখবার। কিন্তু আমার বাসনা যে এমনভাবে সফল হবে কে জানতো! এমনটি তো আমি চাইনি।

সেদিনের কথাটা বলতে গেলেই সমস্ত দৃশ্যটা যেন চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে ওঠে।

আমি তখন সবে ইস্কুলে গিয়েছি। গাঁয়ের ইস্কুল, মাস্টারমশাইরা তখনো সকলে এসে পৌঁছনি। আমরা সবাই হইহই করছি। হঠাৎ কে যেন ছুটতে ছুটতে এসে বললে, বীরু, তোর দিদিমাকে লতায় কেটেছে!

লতায় কেটেছে? বুকের ভেতরটা ধক করে উঠলো। চোখ ঠেলে জল এলো। এত লোক থাকতে শেষে কিনা দিদিমাকে সাপে কাটলো?

ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরে এলাম। পিছনে পিছনে আরো অনেকে।

এসে দেখি ভিড় জমে গেছে উঠনে। ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়লাম, কিন্তু আর এগোতে পারলাম না। থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো মরাইতলায়।

দেখলাম, রান্নাঘরের উঁচু দাওয়ায় খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে দিদিমা চুপচাপ বসে আছে মাথা নীচু করে। বাঁ হাতটার কাঁধ অবধি দড়ি দিয়ে এমন করে বাঁধা হয়েছে যে ফাঁকে ফাঁকে মাংস কেটে বেরিয়ে আসার উপক্রম।

মামাকে ধারে-কাছে দেখতে পেলাম না, শুধু দেখলাম, পৈঠের ওপর বসে অঝোরে কাঁদছেন মামীমা, দু চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে গাল বেয়ে।

গাঁয়ের লোক যার যা খুশি উপদেশ দিচ্ছে, দু-একজন হইহই করছে, আর সকলে চুপ-চাপ। ভয়ে, আতঙ্কে যেন থমকে গেছে সকলে।

আমার বুকটাও তখন ধকধক করছে। কি হয়, কি হয়! এত লোকজন, কিন্তু সব মিলে কেমন একটা থমথমে ভাব।

আস্তে আস্তে শুনলাম সব খবর। পুজোয় বসেছিলেন দিদিমা। ঠাকুরঘরের এক পাশে চৌকির ওপর রাখা চালের বস্তা, গুড়ের নাগরি। পুজো করতে করতে আনমনে বাঁ হাত বাড়িয়ে সেই চৌকির তলা থেকে পুজোর বাসন বের করতে গেছেন দিদিমা, অমনি মনে হয়েছে

কিসে যেন কামড়ে দিলো। তখনো বুঝতে পারেননি, বুঝতে পেরেছেন একটু পরেই চন্দ্রবোড়া সাপটাকে ধীরে ধীরে চৌকির তলা থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে।

সাপটা চৌকাঠ পার হয়ে নতুন গোড়ে পুকুরটার দিকে চলে যেতেই চিৎকার করে উঠেছেন দিদিমা।—ও বউ, বউ, আমায় সাপে কামড়েছে, চন্দ্রবোড়া সাপে!

চন্দ্রবোড়ায় কেটেছে? তা হলে কি আর কোনো আশা আছে? চোখ ঠেলে কান্না এলো আমার। ইচ্ছে হলো ছুটে যাই দিদিমার কাছে, মামীমার কাছে, জিগ্যেস করি সবাই যা বলা-বলি করছে সত্যি কি না। কিন্তু পারলাম না। সমস্ত পরিবেশটার মধ্যে কি যেন ছিলো, তাই আমাকেও ভিড়ের মধ্যে থমকে দাঁড়িয়ে থাকতে হলো।

ঠিক সেই মুহূর্তে চিৎকার উঠলো, জয় বিষহরী জগৎগৌরীর জয়!

রুক্ষ কর্কশ গলার চিৎকার ভেসে এলো বাইরের দরজা থেকে।

সবাই চমকে ফিরে তাকালো। আমিও।

আর পরমুহূর্তেই যাকে দেখতে পেলাম, একবারও আশা করিনি, সে এই মুহূর্তে এসে পড়বে।

রোজা লালচাঁদ।

সেই বুক পর্যন্ত দাড়ি, গেরুয়া পাগড়ি, লাল চোখ আর পিঠে ঝোলা।

এসেই হাসি-হাসি মুখে বললে, ডর নাই গো মা-ঠাকরুন, ডর নাই। ওস্তাদের লিদ্দেশ, মা জগৎগৌরীর লিদ্দেশ, লাগে কেটেছে শুনলে সব ফেলে ছুট্যে আসতে হবে বাপ। কাঁদর-পাড়ে খপর শুনেই ছুট্যে এয়েছি বাপ।

বলেই কাঁধের ঝোলা নামিয়ে খড়ি আর পাতা বের করে মাটির ওপর আঁক-জোক কাটতে শুরু করলে লালচাঁদ আর সঙ্গে সঙ্গে একটা গুঞ্জন উঠলো। মনের মধ্যে কেমন একটা অদ্ভুত আনন্দ।

মনে হলো, জগৎগৌরী বিষহরী নিজেই যেন পাঠিয়ে দিয়েছেন লালচাঁদ রোজাকে। সকলের চোখেই এতক্ষণে আশা দেখা দিলো। লালচাঁদ যখন এসে পৌঁছেছে তখন আর কোনো ভয় নেই।

দিদিমাও একটু মুখ তুলে তাকালেন। সাপে কেটেছে, সে যেন দিদিমার নিজেরই লজ্জা। তাই মুখ নীচু করে এতক্ষণ বসে ছিলেন! লালচাঁদের কথা শুনে এবার মুখ তুলে তাকালেন। মনে হলো দিদিমা যেন হাসলেন। সে হাসিতে আশা আর আনন্দ খেলে গেল। যেন এতক্ষণে একটা ভরসা খুঁজে পেয়েছেন।

দিদিমার চেহারা ছিলো খুব সুন্দর। যেমন লম্বা-চওড়া, তেমনি ফরসা। মাথার চুল সব সাদা।

লালচাঁদ খড়ি পাতা শেষ করে দিদিমার কাছে এগিয়ে এসে বললে, আ বাপ, তুমায় কাটল চন্দবোড়া লাগে? সোনার পদ্ম রূপ যে মা গো, ই যে সাক্ষাৎ বিষহরী গৌরী মা আমার!

বলে ধীরে ধীরে উঠনে দিদিমাকে শুইয়ে দিলো লালচাঁদ। হাতের বাঁধন খুলে ঝোলা থেকে শিকড়বাকড় বের করে বিষপাথরে ঘষে ঘষে লাগিয়ে দিলে কাটা জায়গায়।

সঙ্গে সঙ্গে পাশের লোকেরা বলে উঠলো, আর ভয় নেই। রোজার রাজা লালচাঁদ, ও যখন এসে গেছে আর ভয় নেই।

আমার মনও বললে, ভয় নেই।

ঝোলা থেকে এবার একটা নিমের ডাল বের করলে লালচাঁদ। তারপর দিদিমার মাথা থেকে পা অবধি সেটা বুলিয়ে বুলিয়ে মন্ত্র পড়তে শুরু করলে।

একবার করে পাতা বোলানো শেষ হয়, আর একটু করে আশা হয়।

সমস্ত গ্রাম যেন নিশ্চুপ, থমথম করছে চারিদিক, আর তার মধ্যে লালচাঁদ মন্ত্র পড়ে:

তেল তেল রায়ে তেল
বিষ উঠো লাগ উঠো
বিষহরী জগৎগৌরী
লাগ বাঁধো, বিষ বাঁধো...

এমনি একটা মন্ত্র পড়ে যায় লালচাঁদ, মাঝে মাঝে জড়িবুটি বদলে দেয়। আর ক্রমাগত

দিদিমার মাথা থেকে পা অবধি নিমের ডালটা বুলিয়ে বুলিয়ে বিষ নামাচ্ছে। কোদালের কোপে কোপে পুকুরের পাঁক তোলার চেয়েও বেশী পরিশ্রম যেন।

লালচাঁদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, দরদর করে ঘামছে লালচাঁদ, আর ক্রমশই যেন পাগলের মতো হয়ে উঠছে। গলার স্বর উঠছে ক্রমে ক্রমে, নিস্তব্ধ বাড়িটা যেন কেঁপে উঠছে থেকে থেকে লালচাঁদের কর্কশ গলার মন্ত্রধ্বনিতে।

এমন সময় ছোটমামা ছুটতে ছুটতে ফিরে এলেন। সদরে গিয়েছিলেন ধানকল থেকে ধান-বেচা টাকা আনতে। মাঝপথে খবর পেয়েই ফিরে এসেছেন।

ফিরে এসেই দিদিমার কাছে ছুটে চললেন, কিন্তু তার আগেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন ছোটমামা। কে যেন ছুটে গেল জল আর পাখা নিয়ে আসতে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরলো ছোটমামার।

শুধু হতাশ চোখে দিদিমার দিকে তাকিয়ে বললেন, মাকে সদরের ডাক্তারখানায় নিয়ে গেলে না কেন তোমরা?

লালচাঁদের কানে গেল কথাটা। বললে, বুলবেন না উ কথা, বুলবেন না ছোটকত্তা, মা বিষহরী পাপ লিবে। বলে আবার মন্ত্র পড়তে শুরু করলে।

দুপুর বিকেল হলো, বিকেল সন্ধ্যা।

শেষে একসময় বোঝা গেল, লালচাঁদের মন্ত্র মিথ্যে। লালচাঁদের বিষপাথর মিথ্যে।

পাশের গাঁয়ের ডাক্তার এসে পড়লেন। দিদিমার হাতখানা তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখলেন।

আমরা বুঝলাম, দিদিমা অনেক আগেই মারা গেছেন।

নিস্তব্ধ বাড়িটা আশায় আশায় এতক্ষণ থমকে চুপ করে ছিলো, এবার সকলেই একসঙ্গে কেঁদে উঠলো।

আর লালচাঁদ হঠাৎ পাগলের মতো চিৎকার করে বলে উঠলো, মা বিষহরী মিছা গো, জগৎগৌরী মিছা! লাগবন্দী মিছা, বিষ লামানোর মন্তর মিছা। সোনার পদ্ম মা-ঠাকরুনেরে জিয়াইল না, জিয়াইল না।

বলে ধীরে ধীরে ঝোলাটা কাঁধে তুলে নিয়ে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে হনহন করে চলে গেল মাঠের আল ধরে। তখনো অঝোরে জল পড়ছে লালচাঁদের দু চোখ বেয়ে।

এর পর আবার যে কোনো দিন লালচাঁদের সঙ্গে দেখা হবে ভাবতেই পারিনি! ভাবতে পারিনি আমাদের গাঁয়ে এসেই ও ডেরা বাঁধবে।

আমাদের গাঁয়ের কাছাকাছি কোথাও ইস্কুল ছিলো না বলেই মামাবাড়িতে গিয়ে থাকতাম। বছর তিনেক পরে আমাদের গাঁয়ে নতুন ইস্কুল হতেই ফিরে এলাম। আর ফিরে এসে হঠাৎ একদিন দেখা হয়ে গেল লালচাঁদের সঙ্গে।

রায়পুকুরের পাড়ের অশথগাছটার নীচে ভাঙা মাটির বাড়িটা এতদিন নির্জন পড়ে ছিলো, খড়ের ছাউনি দেখে এগিয়ে গিয়েছিলাম কে আছে খোঁজ নিতে।

ডাকাডাকি শুনে প্রথম যে বেরিয়ে এলো তাকে প্রথমটা চিনতে পারিনি। কিন্তু তারপরেই বুঝতে পারলাম। কান্ত বেদের মেয়ে পার্বতী, যাকে গান গাইতে দেখেছিলাম বেলাংডিহির ঝাঁপানে। শুধু বয়সটা বেড়েছে আরো, কিন্তু চেহারা ভেঙে পড়েছে।

ডাক শুনে লালচাঁদও বেরিয়ে এলো।

চমকে উঠে বললাম, লালচাঁদ, তুমি?

লালচাঁদ হাসলো শুধু, জবাব দিলে না। বুঝলাম, ও আমাকে চিনতে পারেনি। চেনবার কথাও নয়।

কিন্তু পার্বতী এখানে কেন? লালচাঁদ কি...।

জিগ্যেস করতেই লালচাঁদ হাসলো আবার, বললে, পার্বতী রে বাপ, বেদের বেটী রোজার বউ হয়েছে।

কেন জানি না, মনটা বিষিয়ে উঠলো লালচাঁদের ওপর। হয়তো পার্বতীর মতো বাচ্চা

মেয়েটাকে বিয়ে করেছে বলে, হয়তো দিদিমাকে ও বাঁচাতে পারেনি বলে।

ফিরে এসে মাকে বললাম। বললাম, লালচাঁদ রোজাটা একটা জোচ্চোর। ও-ই তো দিদিমাকে মেরে ফেলেছে। রোজা না আরো কিছু, সব বুজরুকি ওর।

আমার কেমন একটা ধারণাও হয়েছিলো, লালচাঁদ জেনে-শুনেই জোচ্চুরি করে বেড়ায়। টাকা রোজগারের ফন্দি। আর রাগ হতো ওই পার্বতী মেয়েটার ওপর।

মাঝে মাঝে বাড়ি বাড়ি চাল ভিক্ষে করতে আসতো পার্বতী।

একদিন মাকে বললাম, চাল দিয়ো না ওকে।

পার্বতী হেসে বললে, কেনে, চাল দিবে নাই কেনে?

বললাম, তুই ওকে, ওই জোচ্চোরটাকে বিয়ে করলি কেন? তোদের জাতে লোক ছিলো না?

পার্বতী হেসে উঠলো। হাত-পা নেড়ে বলে উঠলো, বুল না, বুল না, পেটে বিদ্যা লাই গো উদের, ভানুমতীর খেল দেখায় শুধু। কামালো লাগের মাথায় টোকা দিয়ে বলে আসল লাগ।

—আর লালচাঁদ সব জানে?

পার্বতী আবার হাসলো। বললে, উ রোজা বটেন, ওস্তাদ বটেন। আসল লাগ চিনেন উ, লাগবন্দী মন্তর জানেন। উ খড়ি গুনতে জানেন গো, বিষ লামানোর মন্তর জানেন।

শুনে হেসে উঠলাম আমি, আর পার্বতী রেগে গেল। চাল ভিক্ষে না নিয়েই চলে গেল রাগে দপদপ করে পা ফেলে।

কিন্তু আমার বিস্ময় কাটলো না। তবে কি এই মোহে, এই অন্ধ বিশ্বাসেই লালচাঁদের সঙ্গে ঘর ছেড়ে পালিয়ে এসেছে পার্বতী?

আর লালচাঁদ? দিদিমাকে যখন বাঁচাতে পারলো না তখনো বলেছিলো, সব মন্ত্র মিথ্যে ওর। নাকি তখন পালিয়ে আসার জন্যেই ওরকম অভিনয় করেছিলো?

কিন্তু না। শেষ অবধি লালচাঁদের বিশ্বাসেও হয়তো ফাটল ধরেছিলো। তাই একদিন হঠাৎ কথায় কথায় প্রশ্ন করলে, হাসপাতালের ডাকতোরবাবু লাকি বিষ লামানোর মন্তর জানে, বাপ?

বললাম, হ্যাঁ, আজকাল সেইজন্যেই তো কেউ রোজা ডাকে না।

লালচাঁদ গম্ভীর হয়ে গেল। বললে, ঠিক বলেছেন গো বাপ, রোজার মন্তর মিছা বটে, রোজার মন্তর মিছা।

শুনে ভাবলাম, তবে কি সত্যিই এতদিন বুজরুকি দেখিয়ে গেছে ও? জোচ্চুরি করে গেছে জেনে-শুনে?

আমার এ প্রশ্নের জবাব যে এত তাড়াতাড়ি পাবো, কে জানতো।

সারা দিন-রাত বৃষ্টির পর ভোরের দিকে বৃষ্টিটা তখন একটু থেমেছে। হঠাৎ কোটালদের কে এসে বললে, রোজার বউকে লতায় কেটেছে।

রোজার বউ পার্বতীকে? শুনেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। অনুশোচনা হলো সেদিন তাকে গালাগালি দিয়েছিলাম বলে।

হরু কোটাল শুধু বললে, ক্যানেল হয়ে আজ্ঞে জল মিলল না, শুধু টাক্সো দাও, আর পাহাড়ী সাপ লাও। সাপ ছিল না এ গাঁয়ে আজ্ঞে।

কিন্তু ওর কথা আমার কানে গেল না। ছুটতে ছুটতে চলে এলাম লালচাঁদের বাড়িতে। এসে দেখি জন দশেক লোক জুটে গেছে। আর লালচাঁদ কেবল তড়পাচ্ছে, বেদের বেটী রোজার বউ, সিঁদুরটুপি লাগ চিনলি না তুই? লাগে মাছ ভাবলি তুই, আ বাপ!

একটু একটু করে শুনলাম সব। ভোরবেলায় আরা থেকে মাছ তুলতে গিয়েছিলো পার্বতী। আর ঘোলা জলে চিনতে পারেনি, মাছ ভেবে যেই ঝুড়িতে তুলতে গেছে, অমনি কামড় দিয়েছে সিঁদুরটুপি সাপ।

ছুটতে ছুটতে ফিরে এসেছে। এসে বলেছে লালচাঁদকে।

দেখলাম, পার্বতী চুপচাপ বসে আছে দু হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে। আর ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে তার আঙুল থেকে। কাপড় ভিজে যাচ্ছে।

পণ্ডা কোটালকে বললাম, ডাক্তার ডেকে নিয়ে আয়। না, বরং হাসপাতালেই নিয়ে যা।

পণ্ডা বললে, গাড়ি জুতবো রোজা? সদরের হাসপাতালে নিয়ে যাবো?

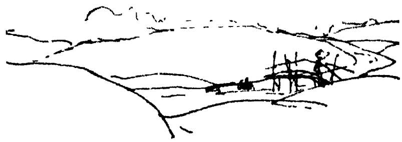
বোকা-বোকা চোখ মেলে আমাদের মুখের দিকে তাকালো লালচাঁদ। তারপর বললে, আ বাপ, উ কথা বুলেন না গো, মা বিষহরী জগৎগৌরী পাপ লিবে।

রেগে গিয়ে বললাম, অনেক তো মেরেছিস টাকা রোজগারের জন্যে, বউটাকে অন্তত বাঁচা।

শুনে হাসলো লালচাঁদ। তারপর ঝোলা থেকে জড়িবুটি শিকড়বাকড় বের করতে করতে বললে, মা বিষহরীর মন্তর কখুনও মিছা হয় গো বাপ, লাগবন্দী বিষ লামানোর মন্তর কখুনও মিছা হয়।

বলে বিষপাথরে একটা শিকড় ঘষতে শুরু করলো।

।১৩৬৮



ঋণ

আপনারা অনেকেই হয়তো লক্ষ করেননি, আজকের খবরের কাগজে মাত্র পাঁচ লাইনের একটি ছোট্ট শোক-সংবাদ বেরিয়েছে। নিমাপুরের রাজা বিনয়েন্দ্রমোহন সিংহরাওয়ের মৃত্যুর খবরটা যদি বা আপনাদের চোখে পড়ে থাকে, তা হলেও নিমাপুর জায়গাটা কোথায় ভেবে ভেবে আপনারা কোনো কূলকিনারা পাননি। না পাবারই কথা, মানচিত্রের গায়ে এখন আর নিমাপুর নামটা খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কিন্তু নিমাপুর সত্যিই একসময় ছোট একটা স্টেট ছিলো। বিহার আর পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে মাত্র বাইশখানা গ্রাম নিয়ে ছিলো নিমাপুর রাজ্য। এবং একজন রাজাও ছিলেন সে রাজ্যের। তাঁরই নাম ছিলো রাজা বিনয়েন্দ্রমোহন সিংহরাও—যিনি সাতষট্টি বছর বয়সে অকস্মাৎ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেলেন গত পরশু, যাঁর মৃত্যু-সংবাদ আজকের খবরের কাগজে ছাপা হয়েছে—কিন্তু মাত্র পাঁচ লাইনে।

বিনয়েন্দ্র সিংহরাওয়ের সঙ্গে ঘটনাচক্রে আমার একবার আলাপ হয়েছিলো। ঘটনাচক্রে না বলে, বলা উচিত দুর্ঘটনাচক্রে।

বোধ হয় মৃত্যুর পর শিব হওয়ার বাসনা ছিলো আমার পিতামহের, তাই বার্ধক্যে বানপ্রস্থে না গিয়ে বারাণসীতে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। এদিকে আমার বাবার বদলির চাকরি ছিলো, কোথাও দু-দণ্ড তিষ্ঠোতে পেতেন না, টহল দিয়ে বেড়াতে হতো তাঁকে সারা ভারতবর্ষ। তাই ঠাকুরদার কাছে থেকেই আমি পড়াশুনো করতাম।

কাশীর বাঙালীটোলায় একখানা ছোট্ট বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতেন দাদু, আর আমি প্রতি দিন সাইকেলে করে কলেজে যাতায়াত করতাম।

অর্থাৎ বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে আমি তখন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছি, সেটাই আমার ফাইনাল ইয়ার। পরীক্ষার তখনো বেশ কয়েক মাস দেরি আছে।

আমরা কয়েক বন্ধু—আমি, শিউপ্রসাদ, বিশ্বনাথন আর গুরুমুখ সিং—সকলেই একসঙ্গে সাইকেল চালিয়ে ফিরতাম ছুটির পর।

দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে রবিন মাইতির একটা সাইকেল সারানোর দোকান ছিলো, সেখানে আমরা চার বন্ধু আমাদের সাইকেল ক'খানা জমা রেখে বেতের ক্যারিয়ার-বক্স থেকে গামছা আর লুঙি নিয়ে ঘাটের সিঁড়ি ভেঙে নেমে যেতাম একেবারে গঙ্গায়, জলের ওপর-পিঠে সারা দিন রোদ্দুর পাওয়ায় ঈষৎ তাপ থাকতো বটে, কিন্তু বেশ খানিকটা সাঁতার কাটলেই গরমের দিনের সব ঘাম মুছে যেতো, সব ক্লান্তি উবে যেতো, তারপর সেই মৃদু মৃদু ঠাণ্ডা বাতাস... সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে ক্রমে ক্রমে দু-চারটে তারা ফুটতো, ভাঙা এক টুকরো চাঁদ উঁকি দিতো, কখনো বা অমাবস্যায় অদূরের মণিকর্ণিকার ঘাটে দু-একটা চিতা জ্বলতো দাউদাউ করে...আর আমরা সেদিকে তাকিয়ে থাকতাম।

সে দিনগুলোর কথা ভাবলেও রোমাঞ্চ জাগে। বিশেষ করে সেই দিনটির কথা—যেদিন রাজা বিনয়েন্দ্র সিংহরাওয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিলো। পরিচয় হয়েছিলো—ঘটনাচক্রে নয়, দুর্ঘটনাচক্রে।

তারিখটা মনে নেই, বারটা মনে আছে। বুধবার। মনে আছে, তার কারণ, বুধবারেই আমাদের একটু তাড়াতাড়ি ছুটি হতো। দশাশ্বমেধ ঘাটে সেদিন স্নানযাত্রীর ভিড় ছিলো বিকেলের দিকে।

অনেকেই তখন ডুব দিচ্ছে ঘাটে, দু কানে আঙুল দিয়ে কি সব মন্ত্র বিড়বিড় করছে, এমন সময় হঠাৎ একটা হইহই চিৎকার! কেন চেঁচাচ্ছে সকলে, প্রথমটা বুঝতে পারিনি। কিন্তু পরক্ষণেই দেখি আধ-মানুষ জলে দাঁড়িয়ে এক হাত ঘোমটা টানা এক মহিলা হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করেছে। কাঁদছে, আর জলের ওপর থাবড়া মেরে মেরে 'বাবুয়া' 'বাবুয়া' বলে চেঁচাচ্ছে।

আর সেই মুহূর্তেই আমার চোখে পড়লো এক ধারে দাঁড় করানো একটা নৌকোর তলা থেকে একটা বাচ্চা ছেলের মুখ একবার করে ভেসে উঠছে, আর বাঁচবার চেষ্টায় সে যতবার হাত-পা ছুঁড়ে ভেসে উঠতে যাচ্ছে ততবার নৌকোর গায়ে তার মাথা ঠুকে যাচ্ছে, আবার জলে ডুবে যাচ্ছে সে।

জলকে আমার ভয় ছিলো না। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে আমি কেন যে ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম, আজও জানি না। বাবুয়ার মা কাঁদছিলো বলে? লোকগুলো হইহই করছিলো, কিন্তু কেউই ছেলেটিকে খুঁজে পাচ্ছিলো না বলে? নাকি আমার মনে মুহূর্তের জন্য কোনো শিভালরি উঁকি দিয়েছিলো? জানি না। আমি শুধু একসময় আবিষ্কার করলাম, আমি ঝাঁপিয়ে পড়েছি জলে। আমার শুধু মনে হলো, ছেলেটিকে বাঁচাতে হবে।

কিন্তু ঘাটের ওপর থেকে ছেলেটিকে যত স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিলো, সাঁতার কেটে নৌকোটার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে তাকে আর তত স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম না। একটা জায়গায় শুধু খানিকটা জলের ভুড়ভুড়ি উঠছে দেখে সেদিকেই এগিয়ে গেলাম। কিন্তু কই? দু-তিনবার ডুব দিয়েও তার হদিস পেলাম না। তবে কি নৌকোর ওপারে চলে গেছে ও? নৌকোর নীচে চাপা পড়ে গেছে? হঠাৎ আমার বুকটা ভয়ে আঁতকে উঠলো। এই প্রথম মনে হলো, যেন আমার নিজেরই কোনো আত্মীয়, কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু মারা যাচ্ছে। বাঁচবার চেষ্টা করছে সে, অথচ...ভাবলাম, নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে ওকে বাঁচাবোই!

আরেকবার ডুব দিতেই হঠাৎ কে যেন আমার পা জড়িয়ে ধরলো জলের ভেতর থেকে। একটা ভারি পাথরের মতো, আমি পা টেনে তুলতে পারছি না। একটা আসুরিক দস্যুর শক্তি দিয়ে সে আমার পা জড়িয়ে ধরেছে। কি বিশ্রীভাবে, বেকায়দায় ধরেছে সে আমার একটা পা। আমি জলের ওপর ভেসে উঠতে পারছি না, আমি তাকে বাঁচাবার জন্যে জলে ডুব দিতে পারছি না। হঠাৎ, হঠাৎ আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। মৃত্যুর মতো অন্ধকার ঘনিয়ে এলো আমার চোখে। আমি প্রাণপণে একটা হেঁচকা টান দিয়ে পা ছাড়িয়ে নিতে চাইলাম। আমি আতঙ্কে চিৎকার করে উঠে তাকে একটা লাথি মেরে ফেলে দিতে চাইলাম। পারলাম না। কি ভীষণ শক্ত হাতে সে আমার পা জড়িয়ে ধরে আছে। আমার মনে হলো, আমার মৃত্যু অবধারিত। আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, আমাকে ক্রমশ নীচে টানছে সে, তার শরীরের ভারটা একটা ভারি পাথরের মতো আমাকে ডুবিয়ে মারতে চায়।

একটু আগে, এক মুহূর্ত আগে যাকে আত্মীয় বলে মনে হয়েছিলো, মনে হয়েছিলো

আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু, যার জীবনকে আমার জীবনের চেয়ে এতটুকু কম মূল্যবান মনে হয়নি, তাকে আমার সবচেয়ে বড় শত্রু মনে হলো, মনে হলো একটা নৃশংস শয়তান।

আমি আরেকবার একটা হেঁচকা টান দিয়ে তার হাত থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে আমার হাতে কি যেন ঠেকলো। হ্যাঁ, নৌকোর মোটা দড়িটা আমার হাতে ঠেকলো। আমি প্রাণপণ শক্তিতে সেটা ধরে রইলাম।

তারপর কি হলো, কি হয়েছিলো, আমি নিজেও জানি না। আমাকে কে নৌকোয় টেনে তুলেছিলো, আর ছেলেটা—বাবুয়া—কিভাবে আমার পা থেকে হাঁটু—হাঁটু থেকে কোমর জড়িয়ে ধরে ওপরে উঠেছিলো, জীবন ফিরে পেয়েছিলো, সেসব পরের মুখেই শুনেছিলাম।

শুনেছিলাম, মাঝিরা আমাকে আর বাবুয়াকে ঘাটে নিয়ে আসার অনেকক্ষণ পরে।

এক হাত ঘোমটার সেই বউটি তখন বাবুয়াকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে হাউমাউ করে। আর আমাকে ঘিরে আছে শিউপ্রসাদ, বিশ্বনাথন, গুরুমুখ সিং।

আর, আর আমি উঠে বসতেই গলায় কুঁচের মালা, কানে সোনার মাকড়ি পরা এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক আনন্দে হেসে উঠলেন, আমার হাত দুটো তাঁর হাতের মধ্যে নিয়ে কি যেন বলতে গেলেন তিনি, পারলেন না। শুধু তাঁর দু চোখ ছাপিয়ে জল নামলো।

আমি তখনো কিছুই বুঝতে পারছি না।

একটু পরে কথা ফুটলো ভদ্রলোকের মুখে। বললেন, তুমি আমার জীওন দিয়েছো বেটা, আমার বেটার জীওন বাঁচিয়েছো।

কৃতজ্ঞতার যেন আর শেষ নেই। স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে কি যে বলবেন, কি যে করবেন, কিছুই ঠিক করতে পারছেন না।

তারপর একসময় প্রৌঢ় ভদ্রলোক আমার নাম-ঠিকানা জেনে নিলেন, আর বললেন, তুমি আমার বেটার জীওন বাঁচিয়েছো বাঙালীবাবু, তোমার জন্যে আমি সব করবো, যা চাইবে তুমি, যখন চাইবে।

তারপর ধীরে ধীরে বললেন, আমি নিমাপুরের রাজা, বিনয়েন্দ্রমোহন সিংহরাও আমার নাম। একটা লেফাফা দিয়ে খবর নিলে আমি হাজির হয়ে যাবো .বাবুয়া আমার বেটা, তুমিও আমার বেটা!

তারপর বহুকাল পার হয়ে গেছে। পর পর দুবার পরীক্ষায় ফেল করে কবে থেকে যেন সমাজসেবী হয়ে উঠেছিলাম। সমাজের সেবা করবো, সমাজের উপকার করবো—এমনি সব মহৎ আদর্শের পিছনে উৎসর্গ করলাম নিজেকে। কেন কে জানে। হয়তো বন্ধুদের অনেকেই এ পথে সাড়া দিয়েছিলো বলে, কিংবা...হ্যাঁ, আমার মনের গোপনে কোথাও একটা আত্মধিক্কার জমে ছিলো। হ্যাঁ, বিনয়েন্দ্র সিংহরাওয়ের সেদিনকার সেই সজল চোখ আর কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস বোধ হয় বারবার মনে পড়িয়ে দিতো, আমি কত স্বার্থপর, কত মিথ্যা গৌরবের অধিকারী।

কিন্তু বিনয়েন্দ্রমোহনকে ভুলতে পারলাম না। তখন আমরা নেচে উঠেছি—একটা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করতে হবে। চাঁদার খাতা নিয়ে ঘুরছি দিকে দিকে। হঠাৎ একদিন মনে হলো, নিমাপুরের সেই রাজাকে একটা চিঠি লিখলে কেমন হয়। দেবেন না হয়তো কিছুই, এতদিনে কি আর মনে আছে, তবু দেখা যাক, যদি দেন দু-এক শো।

নিমাপুর জায়গাটা কোথায় খুঁজে বের করে চিঠি দিলাম। নিজের পরিচয় দিয়ে লিখলাম, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কোনো দিন প্রয়োজন হলে সাহায্য করবেন, তাই লিখছি।

আমি কল্পনাও করিনি। হাসপাতাল কমিটির নামে পাঁচ হাজার টাকার একখানা চেক এলো, এবং একখানা চিঠি : আরো কত লাগবে জানাবেন।

হাসপাতাল থেকে ইস্কুল, ইস্কুল থেকে কলেজ—যখন যে খাতেই টাকার দরকার হয়েছে চিঠি লিখেছি, আর সঙ্গে সঙ্গে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন বিনয়েন্দ্রমোহন। আর তা দেখে আমার লোভ বেড়ে গেছে—কিংবা অহংকার। শুধু নিজের কাজেই নয়, যখন যেখানে কেউ টাকার অভাবে পড়েছে, কিংবা চাঁদা চেয়েছে, বিনয়েন্দ্রমোহনের নামে চিঠি দিয়ে দিয়েছি—তাঁকে যেন সাহায্য করা হয়। আর কি আশ্চর্য, কেউ বিফল হয়নি। তবে প্রথম প্রথম দরাজ হাতে

দান করেছেন তিনি, শেষের দিকে যেন তেমন মুক্তহস্ত ছিলেন না। কিন্তু কিছু-না-কিছু সাহায্য করেছেন।

আমার নিজেরও কেমন একটা অধিকার দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো। যেন বিনয়েন্দ্রমোহনকে দেশের সেবায় টাকা খরচ করতে দিয়ে আমি তাঁকে কৃতার্থই করছি।

কোনো হিন্দী কবি তাঁর কবিতার বই বের করতে পারছেন না, লিখে দাও বিনয়েন্দ্রমোহনকে। কোনো রাজনৈতিক নেতার মৃত্যুতে তাঁর পরিবারবর্গ দুঃস্থ হয়ে পড়েছে, বিনয়েন্দ্রমোহন থাকতে দুশ্চিন্তা কিসের! ভাবতাম, তাঁর ছেলের জীবন বাঁচিয়েছি, টাকায় কি তা শোধ হয়!

তাই প্রথমটা আশ্চর্য হয়েছিলাম। কাশীর এক বিখ্যাত ওস্তাদ গাইয়ের ক্যান্সার হলো, চিকিৎসার জন্যে টাকা দরকার। চিঠি দিলাম বিনয়েন্দ্রমোহনকে। কিন্তু চিঠির উত্তরটুকুও এলো না। টাকা তো দূরের কথা। ভাবলাম, চিঠি পাননি, তাই আবার চিঠি দিলাম। কিন্তু এবারও উত্তর এলো না।

মনে মনে রেগে গেলাম। সকলেই ভেবেছিলো আমি চিঠি দিলেই টাকা আসবে। তাদের কাছে আমার সম্মানকে মাটিতে মিশিয়ে দিলেন অকৃতজ্ঞ লোকটা? হ্যাঁ, অকৃতজ্ঞই মনে হলো বিনয়েন্দ্রমোহনকে। তাঁর ছেলের জীবন বাঁচিয়েছিলাম একদিন, টাকা দিয়েই কি তা শোধ হয়ে গেছে ভেবেছেন নিমাপুরের রাজা? মাত্র বাইশখানা গ্রাম নিয়ে তো রাজত্ব—শুনেছিলাম অনেক আগেই—তাই নিজেদের মধ্যে হাসিঠাট্টাও করলাম।

কিন্তু রাগ গেল না মন থেকে। বেশ চটে গিয়েছিলাম বলেই আর কোনো চিঠি দিইনি।

কয়েক মাস পরের কথা। ইলেকশনের কাজে মজঃফরপুর যাচ্ছি, মাঝপথের একটা ছোট স্টেশনে ট্রেন থামতেই চমকে উঠলাম! এই তো সেই নিমাপুর!

নেমে পড়লাম ট্রেন থেকে।

রাজার নাম বলতে কুলিটা কেমন বোকার মতো তাকিয়ে রইলো মুখের দিকে, তারপর আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলো রাস্তাটা।

অনেক খোঁজাখুঁজি করে এসে পেঁছিলাম যে বাড়িটায়, সেটাকে কোনোক্রমেই রাজবাড়ি বলা চলে না। মান্ধাতা আমলের জীর্ণ পোড়ো বাড়ি, আধখানা ধসে গেছে, খান দুই ঘর তখনো টিঁকে আছে কোনোপ্রকারে।

ডাকাডাকির পর এক বৃদ্ধ বেরিয়ে এলেন। হাড়-বের-করা শীর্ণ চেহারা, মাথার সব চুল সাদা, সারা গায়ে শিরাগুলো ফুলে ফুলে উঠেছে। ঠুকঠুক করে এসে বললেন, রাজা নয় বাবু, আমি ফকির বিনয়েন্দ্রমোহন।

আমি আমার নাম বললাম।

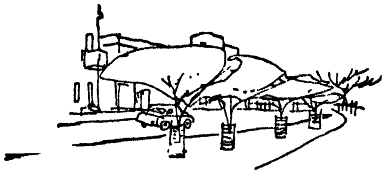
ছানি-পড়া চোখে ঠিক ঠাহর করতে পারলো না বুড়ো। কিন্তু পুরোনো দিনের পরিচয় দিতেই লাঠিটা ফেলে দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলো আমাকে, হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো। বললে, বেটা, আমার বেটা!

বললাম, কোথায় আপনার বেটা? বাবুয়া কই? কত বড় হয়েছে সে?

উত্তর নেই। ছানি-পড়া সজল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেললে বুড়ো। বললে, বাবুয়া? আপনি তার জীওন বাঁচালে কি হবে বাবুজী, বানারস থেকে আসার দু মাস বাদেই তো ভগবান তাকে ছিনিয়ে নিয়েছিলো।

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। বাবুয়া মারা গেছে! কাশী থেকে ফিরেই মারা গিয়েছিলো? কি আশ্চর্য, না জেনে বুড়োর ওপর কত অত্যাচার না করেছি বারেবারে টাকা চেয়ে। প্রতিবারেই তাঁকে মনে পড়িয়ে দিয়েছি বাবুয়ার কথা।

আর, আর বাবুয়া মারা গেছে, তবু তার জীবন বাঁচানোর কৃতজ্ঞতার ঋণ সারা জীবন ধরে শোধ করে গেছেন নিমাপুরের রাজা বিনয়েন্দ্রমোহন সিংহরাও—যাঁর মৃত্যু-সংবাদ বেরিয়েছে আজকের খবরের কাগজে। তাও মাত্র পাঁচ লাইনে। আজ তাই তাঁকে নিয়েই এ গল্প লিখলাম। কিন্তু এত সহজেই কি তাঁর ঋণ শোধ করা যাবে?



লোভ

ওর চরিত্রে এটা যে একটা বড় খুঁত তা গাঙ্গুলী-বাড়ির ছোট বউ উমার কোনো দিনই মনে হয়নি। আড়ালে বড় এবং মেজ জা ওর ওই আদেখ্‌লেপনা নিয়ে হাসিঠাট্টা করেছে, ননদরা মুখ ফুটে এবং ঠোঁট বেঁকিয়ে স্পষ্টাস্পষ্টি বলেও ফেলেছে কখনো কখনো। বিরাম নিজেও অনেক দিন সহ্য করেছে, তারপর যখন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে, বিরক্ত হয়ে বলেছে, যা আছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকো, নইলে দুঃখ পাবে।

আঠারো বছরের নতুন বউ উমা বিরামের কথায় খিলখিল করে হেসে উঠে বলেছে, মশাই, নিজে কেন তা হলে চাকরিতে প্রোমোশন হলো না বলে মুখ গোমড়া করেছিলে, শুনি?

বিরাম আরো বিরক্ত হয়েছে ওর কথায়। বলেছে, তোমার খরচটাও যে টানতে হয়, তাই। এই মাইনেতে যদি চলতো তা হলে চাইতাম না।

এ কথায় উমার মুখ গম্ভীর হয়ে গেছে, চোখের চাউনি তীব্র। ছিপছিপে শরীরটায় ডুরে শাড়ির আঁচলটাকে আরো টেনে জড়িয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে ও, বলেছে, বিয়ে না করলেই পারতে। এত ভার না সইতে পারো তালাক দিয়ে দাও, চলে যাই।

তা শুনে হেসে ফেলেছে বিরাম, কিন্তু জবাব দিতে পারেনি। কারণ সত্যিই তো উমার কোনো হাত ছিলো না এ বিয়েতে, বিরাম নিজেই পছন্দ করে বিয়ে করেছে। বাপ-মা গিয়ে কনে দেখে এসেছিলো প্রথম, তারপর বন্ধু-বান্ধব সঙ্গে নিয়ে বিরামও গিয়েছিলো দেখতে।

মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। বাপ ইউ ডি ক্লার্ক ছিলো, বছর দুয়েক বড়বাবু হয়েছে। বাড়ির অবস্থা যে ভালো নয়, তা মেয়ে দেখতে গিয়ে ঘরখানাকে এক নজরে দেখেই বুঝতে পেরেছিলো বিরাম। সচ্ছলতা এবং রুচির অভাবটা বেশী করে চোখে পড়েছিলো। যে ঘরখানায় গালিচা পেতে ওদের বসতে দেওয়া হয়েছিলো সে ঘরের সঙ্গে গালিচাটা ছিলো একেবারে বেমানান। এমন কি, চায়ের পেয়ালাগুলো, মনে হয়েছিলো, প্রতিবেশী কোনো বাড়ি থেকে চেয়ে আনা। প্রথমটায় তাই মন বিরূপ হয়ে উঠেছিলো বিরামের। মুক্তারামবাবু স্ট্রীট থেকে বেরিয়েছে গলিটা, এমনিতেই আলো-হাওয়া ঢোকে না ঘরে। যাও বা ঢুকতো, জানালার ধারে একটার ওপর আরেকটা ট্রাঙ্ক সাজিয়ে এবং তার ওপর লেপ তোশক বালিশের রাশি রেখে আলো এবং হাওয়া দুটোরই পথ আটকে দিয়েছে। ছোট্ট ঘর। তার এক পাশে একখানা নকশা-কাটা ধুলো-জমা খাট, একটা পাল্লা-বেঁকে-যাওয়া আলমারি। আলমারির গা-চাবি খারাপ হয়ে যাওয়ায় দুটো কড়া লাগিয়ে তাতে বড় একটা কুলুপ লাগানো। আর খাটের তলায় দুটো বড় বড় ঘড়া, এক রাশ বাসনপত্তর। দেয়ালে তিন দিকে পাঁচটা নানা সাইজের ক্যালেন্ডার, একটা ফ্রেমে বাঁধানো কার্পেটের কাজ। আরেকটা কালো ভেলভেটে রঙিন সুতোয় 'পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম' লেখা শ্লোক, তাও ফ্রেমে বাঁধানো। কপাটের মাথায় একখানা রামকৃষ্ণ পরমহংসের ছবি। পাশেই এক বুড়ো ভদ্রলোকের ফোটো—কাচের ওপর থেকেই তার কপালে চন্দনের ফোঁটা আঁকা হয়েছে।

লাজুক-লাজুক চোখে মাথা নিচু করে উমা যখন এসে বসেছিলো গালিচায়, তখন কিন্তু আরো বেখাপ্পা বেমানান মনে হওয়া উচিত ছিলো বিরামের। হয়নি। ও বরং স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলো। না, রূপে উর্বশী মনে হয়নি উমাকে। কিন্তু ওর লাজুক নম্র চোখে, কিশোরী কোমল চেহারায়, আর ঈষৎ কালো ঠাণ্ডা মুখশ্রীতে কি জাদু ছিলো কে জানে, বিরামের মনে হয়েছিলো ঠিক এমনিটিই যেন ও চেয়েছিলো।

কি আশ্চর্য, সে মেয়েটার ভেতর যে এত সব লুকিয়ে ছিলো কে জানতো। কিংবা সিঁথের সিঁদুর, মাথায় ঘোমটা ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই বোধ হয় মেয়েটা বদলে গিয়েছিলো।

বিয়ের পর বিরামদের বাড়িতে দুটো সপ্তাহও কাটেনি, জানালার পাশটিতে বিরাম আর উমা দাঁড়িয়ে দেখছে সামনের বাড়ির কার্নিসে দুটো কাক ভিজছে বৃষ্টিতে, হঠাৎ উমা বলে উঠলো, ওদের বাড়িটা কি সুন্দর, না? আমার ভারি ইচ্ছে করে অমনি একটা বাড়িতে থাকবো।

তখন বিরামের চোখে নতুন বিয়ের ঘোর লেগে আছে, তাই ও শুধু হেসেছিলো। বলেছিলো, মাইনেটা বাড়লে আমরাও নয় অমনি একটা বাড়িতে উঠে যাবো।

—বা রে, তা কি করে যাবে? বুঝতে না পেরে বড় বড় ঠাণ্ডা দুটো চোখ মেলে উমা তাকিয়েছিলো বিরামের মুখের দিকে।

বিরাম হেসে বলেছিলো, বেশী ভাড়া দিলেই পাওয়া যাবে অমন বাড়ি।

একটু বাড়িয়েই বলেছিলো বিরাম, না বলে উপায় ছিলো না বলে। যদিও ও মনে মনে জানতো, ওর চাকরিতে যত উন্নতিই হোক, ও বাড়ির মতো আর সুন্দর বাসা ও কোনো দিনই করতে পারবে না। তবু এই একটা মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে উমাকে ভোলাতে চেয়েছিলো।

অথচ উমা কিনা নাক সিঁটকে বলে বসলো, ভাঙা বাড়ি! ভাঙা বাড়িতে আমার একটুও থাকতে ইচ্ছে করে না। আমার বড় জামাইবাবু কি সুন্দর বাড়ি করেছে শ্যামবাজারে!

কথাটা বুকে গিয়ে ধাক্কা দিয়েছিলো। মুহূর্তের জন্যে হলেও কেমন যেন অপ্রতিভ হয়ে গিয়েছিলো বিরাম। আর এই আঘাতটা ভুলতে পারেনি বলেই মনের মধ্যে পুষে রেখেছিলো। সুযোগ খুঁজছিলো নতুন কোনো স্বপ্ন দেখিয়ে উমার মন থেকে তার দুর্বলতাটুকু মুছে ফেলার।

কথায় কথায় একদিন বলেওছিলো। খাটের ওপর মুখোমুখি দুজনে আধশোয়া হয়ে একটা ছবির কাগজ দেখছিলো সেদিন। তার একটা পাতায় সুন্দর একখানা ছোট্ট বাংলো টাইপের বাড়ির ছবি। ছোট্ট বাড়ি, দুখানা হয়তো ঘর, সামনে এক টুকরো বাগান। ছবিটা দেখিয়ে বিরাম বলেছিলো, এবার ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষাটা দিয়ে দেবো। মাইনে বাড়লে মাসে মাসে কিছু কিছু করে জমাবো, তারপর এমনি একটা ছোট্ট বাড়ি করবো আমাদের—একতলা বাড়ি, দুখানা ঘর, ছোট্ট একটা বারান্দা, বারান্দায় মাধবীলতার ঝাড় লাগিয়ে দেবো একটা।

আরো অনেক কিছুই হয়তো অনর্গল বলে যেতো বিরাম, তার আগেই উমা বলে উঠলো, এ মা, এমনি ছোট্ট বাড়ি? ছোট বাড়ি আমার একদম পছন্দ নয়, একদম না। কেন, বড় রাস্তার মোড়ের ওই নতুন বাড়িটার মতো করতে পারবে না? খুব বড় বাড়ি হবে, অনেক লোক থাকবে, এক রাশ ঠাকুর চাকর ঝি—রেডিও বাজবে...।

উমার আকাঙ্ক্ষার যেটুকু তখন মেটাবার মতো সামর্থ্য, শুধু সেইটুকু দিয়েই তাকে খুশী করতে চেয়েছিলো বিরাম। একদিন তাই সত্যি সত্যি আপিস থেকে কয়েক শো টাকা লোন নিয়ে রেডিও সেট একটা কিনে আনলে। ভেবেছিলো উমাকে চমকে দেবে, উমা খুব খুশী হবে।

প্রথমটা খুশী হয়েছিলো উমা। এরিয়েল টাঙিয়ে রেডিওটা যখন চালু করলে বিরাম, তখন কি ফুর্তি তার। রেডিওর 'নব' নিয়ে এদিক-ওদিক ঘোরায়, তখনই গান, তখনই গুরু-গম্ভীর বক্তৃতা, কখনো তীব্র চীৎকার, কখনো অস্পষ্ট গানের কলি। যেন কত বড় কৌতুক, হাসিতে খিলখিল করে ওঠে।

বিরামের মেজ বোন শর্মিলা এসে ঠোঁট টিপে হাসলো, তারপর টিপ্পনী কাটলো।—বাবা, এতদিন তো দাদার রেডিও কেনার পয়সা ছিলো না!

বিরামের মা এসে একসময় উমাকে বললেন, বউমা, বিরুকে বোলো, শখ মেটানোর বয়স এখনো অনেক আছে, এখন থেকে এত পয়সা নষ্ট করলে পরে অনেক দুঃখ পেতে হবে।

শুধু বিরামের বাবা বললেন, তা ভালোই করেছে বিরু, বউমা বেচারী সারাটা দিন একা-একা থাকে...।

ননদ দুজন অবশ্য সে কথা শুনে উমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে, একা-একা? কেন, দুপুরে আমরা কি আপিসে যাই নাকি? না, বাবা-মা থাকে না?

উমা এসব শুনে মনে মনে চটলো বটে, কিন্তু বিরামের ওপর খুশী হয়ে উঠলো। তার জন্যেই তো রেডিওটা কিনে এনেছে বিরাম, এতদিন তো আনেনি। তাই ভেতরে ভেতরে ও যা ভেবেছিলো, সেটুকু প্রকাশ করলো না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে কথা চাপা রাখতে পারলো

না। বিরাম তখন সদ্য আপিস থেকে ফিরেছে, চায়ের কাপটা এনে বিরামের সামনে রেখে রেডিওটা খুলে দিতে গেল ও। কিন্তু যেখানেই কাঁটা ঘোরায়, হয় বক্তৃতা, নয় খবর, নয় অন্য কিছু।

বিরক্ত হয়ে রেডিওটা বন্ধ করে দিয়ে ও বিরামের চেয়ারের পিছনে এসে দাঁড়ালো, বললে, আচ্ছা, এই ছোট্ট রেডিওটা আনলে কেন বলো তো? দিদির বাড়িতে একটা আছে অনেক বড়, তাতে রেডিও হয়, আবার রেকর্ড বাজানোও চলে, তেমনি একটা...।

বিরাম একবার শুধু ফিরে তাকালো উমার মুখের দিকে, কোনো কথা বললো না। বেশ বোঝা গেল ও চটেছে, কিন্তু কেন যে চটেছে বিরাম, তা উমা বুঝতে পারলো না। এমন কি অন্যায় কথা বলেছে ও? সারা দিনের কাজের পর রোদে পুড়ে এসেছে বিরাম, রেডিওর গান না থাক, এখন একটা রেকর্ড বাজাতে পারতো ও। ক্লান্ত মানুষটার চোখে চোখ রেখে হাসি-হাসি মুখে বাজনার তালে তালে পেয়ালার গায়ে চামচটা দিয়ে ঠুনঠুন করে বাজাতে তো পারতো? কিন্তু বিরাম ওর অতশত স্বপ্নের খবর রাখবে কি করে। লোনের টাকাটা তখনো থেকে থেকেই ছারপোকার মতো কামড়াচ্ছে। তাই একটু ঘা খেলো বিরাম মনে মনে, তবু চুপ করে রইলো।

কিন্তু বিরাম কিছু না বললে কি হবে, শর্মিলা আর উর্মিলা দু বোন শোনাতে ছাড়বে কেন। উমাকে সঙ্গে নিয়ে পুজোর শাড়ি কিনতে গেছে বিরাম, সঙ্গে গেছে দু বোন। আর এত শাড়ি থাকতে কিনা এমন একখানা পছন্দ হয়েছে উমার, যেটার দিকে বিরামের ফিরে তাকাতেও সাহস হয়নি।

তাও চাইতো না বিরাম, কিন্তু উমা ফস করে বলে বসলো, জানো, দিদি ঠিক এমনি একটা ঢাকাই শাড়ি কিনেছিলো ওর ভাশুরপোর বিয়েতে যাবার জন্যে। এটা পেঁয়াজী রঙের আর সেটা ছিলো ফিকে সবুজ, কিন্তু সেটার ওপরও এমনি সাদা সাদা ফুল ছিলো...।

শর্মিলা সঙ্গে সঙ্গে বলেছে, তোমার বাবার মতো বড়লোক তো নয় আমার দাদা!

কথাটা চাবুকের মতো লেগেছে উমার, সারা মুখ অপ্রতিভ হয়ে গেছে ওর। ওর বাবা যে গরিব তা তো সবাই জানে, বাবার কথা তো বলেনি উমা, বলেছে দিদির কথা। জামাইবাবু বড় চাকরি করে, একটা ঢাকাই শাড়ি দিতে পারবে না কেন দিদিকে?

উমা অবশ্য পরমুহূর্তেই ওর অন্যায় বুঝতে পেরেছে, সত্যিই তো, জামাইবাবু বড়লোক হতে পারে, তা বলে বিরাম কোত্থেকে অত টাকা পাবে। না, এর পর আর কোনো দিন না ভেবে-চিন্তে কথা বলবে না।

দিন কয়েক ও সত্যি সত্যিই খুব সাবধানে থেকেছে। যা মনে এসেছে চেপে রেখেছে। কি জানি, কোন কথার কি মানে করে বসে ওরা।

কিন্তু প্রতিজ্ঞা রাখতে পারেনি।

সামনের বাড়ির বউটি বেড়াতে এসেছে একদিন। বউটিকে এত সুন্দর কোনো দিন তো মনে হয়নি ওর। ঠিক যেন একটা গোলাপী পদ্ম। আর কি অপূর্ব লেগেছে তাকে বেনারসী শাড়িটায়। কিন্তু তার চোখ নাক চিবুকের সৌন্দর্য, তার শাড়ির ঘটা, এসব ছাড়িয়ে উমার চোখ কখন গিয়ে পড়েছে গলার জড়োয়া নেকলেসে। এমনিতেই গোলগাল স্বাস্থ্য বউটির, চওড়া মুক্তোর নেকলেসটা কণ্ঠি থেকে প্রায় ছ আঙুল বুক ঢেকে আছে। কি অপরূপ যে লেগেছে তাকে!

গল্প করতে করতে তার কাছে গিয়ে বসেছে উমা, তারপর তার গলার নেকলেসে হাত দিয়ে দেখেছে। কিছুতে হাত সরাতে ইচ্ছে হয়নি যেন। ইচ্ছে হয়েছে একবার খুলে নিয়ে নিজে পরে। বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখে কেমন মানায়।

কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। তাই মুখে বলেছে, কি সুন্দর প্যাটার্ন ভাই। বলে উর্মিলার দিকে তাকিয়েছে। তারপর শর্মিলা আর উর্মিলার ক্রুদ্ধ ভর্ৎসনায় হঠাৎ চুপসে গিয়েছে উমা।

তবু সেই মুহূর্তেই ওর মুখ দিয়ে কেন কে জানে বেরিয়ে পড়েছে—দিদির ঠিক এমনি একটা আছে, শুধু লাল পাথরের জায়গায় সবুজ।

তা শুনে শর্মিলা আরো চটে গেছে। দিদি, দিদি, দিদি। কেন বলতে পারতো না, উর্মিলার অমনি একটা আছে!

কিন্তু শেষ অবধি ওর এই স্বভাবের জন্যে যে এমন একটা কাণ্ড ঘটে যাবে উমাও ভাবতে

পারেনি। অথচ ব্যাপারটা একেবারেই তুচ্ছ। এতই তুচ্ছ যে কাউকে বলাও যায় না।

পিসতুতো বোনের বিয়ে। আর তাই বিরামই ওকে প্রশ্ন করেছিলো, কি দেওয়া যায় বলো তো?

উমা শুনেছিলো, বিরাম নাকি ছোটবেলায় পিসীমার কাছেই থেকে পড়াশুনো করেছিলো। পিসীমা নাকি বিরামকে খুব ভালোবাসেন। তা ছাড়া বিরামের এই পিসতুতো বোনটিকে উমারও খুব ভালো লেগেছিলো।

তাই বিরাম জিজ্ঞেস করতেই ও বলেছিলো, কানের দুল দাও না এক জোড়া, সে-ই খুব ভালো।

বিরামও রাজী হয়েছিলো। সত্যিই তো, সোনার কিছু একটা দেওয়াই উচিত ওর। শর্মিলা, ঊর্মিলা, বিরামের মা, সকলেই একমত।

শেষ পর্যন্ত উমাকে সঙ্গে নিয়েই গহনার দোকানে গিয়েছিলো বিরাম। বেশ একটা বড়-সড় দোকানে। আর দামের অঙ্কটা জানিয়ে বিরাম যখন এক জোড়া কমদামী দুল প্রায় পছন্দ করে ফেলেছে, তখন হঠাৎ বেঁকে বসলো উমা। উজ্জ্বল আলোয় শো-কেসের কাঁচের নীচে সারি সারি আংটি, দুল, নেকলেস সাজানো। আর সেই দিকে এতক্ষণ তন্ময় হয়ে তাকিয়ে ছিলো উমা।

বিরাম তার পছন্দমতো দুল জোড়া দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলে, এটাই নিই, কি বলো?

সঙ্গে সঙ্গে উমা দোকানদারের সামনেই বলে উঠলো, দূর। ও কি দেওয়া যায় নাকি কাউকে, ও ঘরে পরবার জন্যে। বলেই শো-কেসের এক জোড়া পাথর-বসানো দুল দেখিয়ে বললে, দিদি না ওর বন্ধুর বোনের বিয়েতে ঠিক এমনি এক জোড়া দুল দিয়েছিলো, কি সুন্দর, দেখো!

বিরাম একবার সেই দুল জোড়ার দিকে তাকিয়ে মনে মনে বোধ হয় দামটা আঁচ করে নিলো আর পরমুহূর্তেই রাগে ফেটে পড়লো। ক্রুদ্ধ চোখের দৃষ্টিটা একবার উমার মুখের উপর বুলিয়ে নিয়ে কমদামী দুল জোড়াই কিনলো, তারপর দোকান থেকে বেরিয়ে এসে বললে, তোমার দিদি কাকে কি দিয়েছে সেটুকুই তোমার মনে থাকে, কই তোমার বাবা তোমাকে কি দিয়েছেন, সে কথাটা তো মনে থাকে না।

কথাটা শুনেই ভেতরে ভেতরে জ্বলে উঠেছে উমা। জ্বলে উঠলো, তার কারণ কথাটা মিথ্যে নয়। উমার বাবা যে গরিব তা কি উমাই জানে না। ওর বাবা যে ওকে বিশেষ কিছুই দিতে পারেননি, সে তো উমারও লজ্জা। কিন্তু সে কথাটা এত স্পষ্ট করে রূঢ় ভাষায় না বললে চলতো না?

সারা পথ একটা কথাও বললো না উমা। শেষ অবধি হয়তো ওর রাগ পড়ে যেতো, কিন্তু বাড়ি ফিরে কেনা দুল জোড়া শর্মিলা আর ঊর্মিলাকে দেখাতে দেখাতে বিরাম টিপ্পনী কাটলে, তোদের বউদির আবার হীরের দুল না হলে পছন্দ হয় না, এত কমদামী দুল দিতে ওর লজ্জায় নাক কাটা যাচ্ছে।

শর্মিলাও ছাড়তে রাজী নয়। বললে, বড়লোকের মেয়ে কিনা! সেদিন সামনের বাড়ির বউটা ঘটা করে শাড়ি গয়না দেখাতে এসেছিলো, কোথায় ওসব কিছু লক্ষ করিনি এমন ভাব করে বসে আছি আমরা, বউদি এমন করতে শুরু করলো যেন জীবনে মুক্তোর হার কোথাও দেখেনি। অথচ বললে কিনা ওর দিদির ওইরকম একটা জড়োয়া নেকলেস আছে!

ব্যস, এইটুকুই। কিন্তু এই ছোট্ট একটু স্ফুলিঙ্গ থেকে কিভাবে যে বিস্ফোরণ ঘটে গেল বোঝা দায়! দু পক্ষেরই রাগ একটু একটু করে বাড়তে বাড়তে হঠাৎ একটা তীব্র চিৎকার করে বিদ্রোহ জানালো উমা, এবং চিঠি লিখে বাবাকে আনিয়ে পরের দিনই চলে এলো মুক্তারামবাবু স্ট্রীটের সেই গলির বাড়িতে।

কিন্তু আসল ব্যাপারটা যে কি তা বাবা-মাকে বলতে পারলো না। এমন একটা তুচ্ছ ব্যাপার কি করে বলবে ও। তা ছাড়া বাপের বাড়িতে ফিরে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই ওর রাগ পড়ে গিয়েছিলো। কেমন যেন লজ্জাও করছিলো ওর। বাবা-মা কি ভাবছেন কে জানে। গোপন ব্যথাটা প্রকাশ করে কাউকে বলতে না পেরে আরো বিমর্ষ হয়ে পড়লো ও। সারা দিন চুপচাপ বসে থাকে জানালার ধারে, আর কেবলই মনে হয়, বিরাম আসবে ওকে ফিরিয়ে নিতে

যেতে।

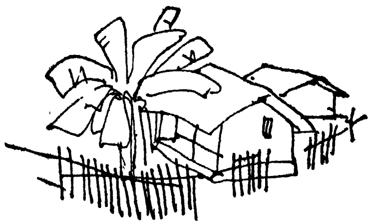
না, বেশ কয়েক দিন কেটে গেল, তবু বিরাম এলো না। পরিবর্তে একদিন ওর দিদিই এসে হাজির হলো। ভাবলে, কিছু একটা মান-অভিমানের পালা চলছে নিশ্চয়। তাই বললে, চুপচাপ এখানে একা-একা রয়েছিস, তার চেয়ে চল না আমার কাছে দিন কয়েক থাকবি।

একটু থেমে আবার বললে, যাবি তো বল, একটা ট্যাক্সি ডাকতে বলি।

—ট্যাক্সি? হঠাৎ হেসে উঠলো উমা, একটা গাড়ি কিনতে বলো না জামাইবাবুকে। আমার বড় ননদাই সেদিন এসেছিলো, একটা নতুন গাড়ি কিনেছে। কি চমৎকার না গাড়িটা। অনেক দাম, আজকাল নাকি পাওয়াই যায় না! আসছে বছর আমরাও...।

আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিলো, কি যেন বলার ইচ্ছে ছিলো উমার। কিন্তু দিদির মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চুপ করে গেল। আর ওর দিদি তখনো স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে উমার চোখের দিকে, একটু আগে কথা বলতে বলতে যে চোখ জোড়া লোভে চকচক করে উঠেছিলো, তার দিকে।

[১৩৬৯



স্ত্রৈণ

মেসের সবাই ওকে ঠাট্টা করে। করে আসছে স্ত্রৈণ বলে। ভৈরব শোনে আর হাসে। হাসিটা যেন অভিযোগের পিঠে সায় দিতে চায়। আসলে ভৈরব নিজেও নিজেকে তাই ভাবে, ভেবে খুশী হয়।

অথচ মেসের পুরোনো বাসিন্দেরাও তো কই কোনো দিন ভৈরবের স্ত্রীকে দেখেনি। তার ছেলেমেয়ে, ছোট সংসার—এসবের কিছুই দেখেনি তারা। কদাচিৎ দু-একজনের চোখে হয়তো সেই নতুন বিয়ের পর বউয়ের লেখা খামখানা পড়েছে, কিন্তু তার ওপরও ঠিকানাটা লেখা থাকতো আপিসের টাইপরাইটারে টাইপ করা। পাছে মেয়েলী হাতের ঠিকানা দেখে কেউ সন্দেহ করে, খুলে পড়ে, তাই খামের পিঠে ঠিকানা টাইপ করে নতুন বউকে দিয়ে আসতো ভৈরব। সে খাম যে কবে থেকে পোস্ট কার্ড হয়ে গেছে, পোস্ট কার্ডে ঠিকানা লেখা রয়েছে আঁকাবাঁকা অক্ষরে, সে অক্ষরের লেখা চিঠি হাতে পেয়েও কবে থেকে যে বাসিন্দে-বন্ধুদের পড়ে দেখার কৌতূহল মরে গেছে, তা ভৈরব নিজেও জানে না।

মরেনি শুধু একটা নেশা। শনিবারের নেশা।

এ নেশা শুধু ভৈরবের নয়। নিশীথ কুণ্ডু লেনের মেস-বাড়ির ছাদের ফুটো-হয়ে-যাওয়া গঙ্গাজলের ট্যাঙ্কের চুঁইয়ে-পড়া জলে ভিজে ভিজে যে ইঁটগুলো নড়বড়ে দাঁতের মতো হয়ে উঠেছে, যেন একটু আঘাত লাগলেই খসে পড়বে, সেই ইঁটগুলোও অন্যরকম দেখায় শনিবার এলেই। অন্তত বাসিন্দেদের চোখে। তা না হলে অন্য দিন আপিসে যাবার মুখে জামাকাপড়ে দু-এক ছিটে জল এসে পড়লেই যারা বাড়িওলার উদ্দেশে অস্ফুট কোনো অশিষ্ট উক্তি করে বসে, তারাও কেন শনিবার হলেই মেস-বাড়ির নোংরা আবহাওয়ার মধ্যেও এতখানি আরাম খুঁজে পাবে!

ভৈরবের সঙ্গে একই ঘরে আরেকখানা তক্তপোশ নিয়ে থাকে সরল মুন্সী। বিয়ে-থা করেনি, সেই কোন্ পাঠ্যজীবনে কলকাতায় এক মেসে এসে উঠেছিলো, তারপর ডজনখানেক মেস বদলে—এখানে। এই নিশীথ কুণ্ডু লেনে। নিশীথ কুণ্ডু লেনেই বুঝি বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেবে। শনিবার হলেই এক কাপ চায়ের সঙ্গে রেসের বইটা খুলে বসে সরল মুন্সী। মাঠে রেস না থাকলে ঘরেই তে-তাসের আড্ডা জমাবার জন্যে একে-ওকে বলে রাখে।—মুকুন্দ-বাবু, তাড়াতাড়ি ফিরবেন মশাই, এক হাত বসা যাবে।

মুকুন্দবাবু কখনো রাজী হন, কখনো বা গিলে-করা পাঞ্জাবিটা মাথায় গলিয়ে, তাঁতের ধুতিতে চুনোট দিতে দিতে বলেন, না সরলবাবু, আজ একটু কাজ আছে।

সারা সপ্তাহটা যিনি আধময়লা জামাকাপড়ে কাটিয়ে দেন, ধোপদুরস্ত বাবু সেজে তিনি যে কোন্ কর্তব্যের ডাকে বেরিয়ে যান জানতে কারো বাকী নেই। তাই উত্তর শুনে সরল মুন্সী শুধু হাসে।

কিন্তু এই মুকুন্দবাবুও সরল মুন্সীর মতোই ঠাট্টা করেন ভৈরবকে। বলেন, আপনার মতো স্ত্রৈণ লোক মশাই জীবনে দেখিনি।

আর তাদের দেখাদেখি কলেজের ছোকরা অনুপমও শনিবার হলেই বলে, কি ভৈরবদা, বউদির মুখখানা একবার দেখে আসবার জন্যে বাড়ি যাচ্ছেন নাকি?

ভৈরব শোনে আর হাসে। আসলে শনিবার সকাল থেকেই কি আর তৈরী হয় সে! তৈরী হয় সারা সপ্তাহ ধরেই। সোমবার সকালে যখন ছুটতে ছুটতে এসে সাতটা চল্লিশের ট্রেনটা ধরে মেমারীতে, ট্রেনে উঠে একটা বসার জায়গা খুঁজে পায়, তখন থেকেই স্বপ্ন দেখতে শুরু করে ভৈরব।

স্বপ্নই তো। মাঝে মাঝে শুধু স্ত্রীর দু-চারটে ফাইফরমাশ মনে পড়ে যায়। বড় ছেলেটার জন্যে একখানা পাটীগণিত কিনতে হবে, ছোট মেয়ের জন্যে ওষুধ, স্ত্রীর শাড়িখানার আড়ং ধোলাই ইত্যাদি মনে উঁকি দেয়, স্বপ্ন ভেঙে দেয়। তারপর প্রতি দিনই এটা-ওটা কিনে, যোগাড় করে করে মেসে ফেরে আপিস ছুটির পর। আর শনিবার সকালে সেগুলো গুছিয়ে নিয়ে একটা থলের মধ্যে ভরে নেয় ভৈরব। গুণের অংক কষার সময় মনে মনে নামতা আউড়ে নেবার মতো কোথাও কিছু ভুলভ্রান্তি বাদ-ছাদ পড়লো কি না ভাবতে চেষ্টা করে। তারপর তাড়া-হুড়ো করে স্নান সেরে থলি-ব্যাগটা হাতে নিয়েই খাবার ঘরে নেমে যায় ও।

তারপর আপিস, আপিস ছুটির পর পড়ি-কি-মরি করে ভিড়ে-ভরা বাসের পাদানিতে একটুখানি জায়গা করে নিয়ে কাঁধে থলি-ব্যাগ ঝুলিয়ে নিজেকেও ঝুলতে ঝুলতে হাওড়া স্টেশনে এসে পেঁছতে হয়।

ট্রাম-বাসের মতোই লোকাল ট্রেনেও সমান ভিড়। তারই মধ্যে কোনোরকমে উঠে পড়ে তবে নিশ্চিন্ত। দুটো তিরিশের ট্রেনটা না পেলে বাড়ি পেঁছতে সন্ধ্যে হয়ে যায়। মনে হয় একটা বেলা বরবাদ হয়ে গেল। শুধু কি তাই? ভৈরব নিজেও জানে না, দুটো তিরিশের ট্রেনটা না পেলে হঠাৎ তার মন-মেজাজ এত খারাপ হয়ে যায় কেন।

কিন্তু না, ট্রেনটা হাতছাড়া হয় না বড় একটা। ঠিক হিসাব করেই বের হয় ভৈরব। হিসেবমতোই ট্রেনে জায়গাও পেয়ে যায়। কখনো চেনা-জানা দু-একজন ডেকে জায়গা দেয়, মুখ-চেনা অনেকে সরে বসে আধখানা আসন ছেড়ে।

তারপর ইলেকট্রিক ট্রেনের চেয়েও তাড়াতাড়ি ছুটতে ইচ্ছে করে। মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখে, আর কতক্ষণ বাকী। কখনো বা মাইল-পোস্ট দেখে। মাইল-পোস্ট অবশ্য এখন আর দেখতে হয় না, এ ক' বছরে এ লাইনের সব নাড়ীনক্ষত্র তার চেনা হয়ে গেছে। জানালা দিয়ে একটু মুখ বাড়িয়েই বুঝতে পারে কোথায় এসেছি, কত দূর। দু পাশের গাছগুলো, জলে ডোবা খালবিল, এমন কি মাঠে মাঠে পানের বরজ কিংবা ধানের ফলন দেখেও চিনতে পারে।

আশপাশের লোক অবশ্য ভৈরবের মতো অধৈর্য হয়ে ওঠে না। ট্রেনে যখন উঠেছি, ঠিক সময়েই পেঁছবো। বড় জোর দু-দশ মিনিট লেট হবে। কি যায় আসে তাতে। ট্রেনে উঠেই ওদিকে চার বন্ধু সামনাসামনি বসে হাঁটুতে হাঁটুতে একটা টেবিল বানিয়ে নিয়েছে। তার ওপর রুমাল পেতে তাস ভাঁজতে শুরু করেছে ট্রেন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। জানালার পাশে বসে একটি ছোকরা উপন্যাসের পাতায় ডুবে গেছে। সার্ভিস ম্যানুয়েলের কোন সাব-ক্লজ দেখিয়ে

ছোটসাহেবকে কে জব্দ করেছে তার উল্লাসিত বর্ণনা চলে কোথাও। কিন্তু ভৈরবের সেদিকে চোখ নেই, কান নেই।

মেমারী স্টেশনে এসে ট্রেন থামলে তবে শান্তি। ততক্ষণে ট্রেনের কামরাও ফাঁকা হয়ে গেছে একে একে। তাড়াহুড়ো করেই নেমে পড়ে ভৈরব। এক হাতে ব্যাগ আর অন্য হাতে কপি, নয়তো ইলিশ মাছটা ঝুলিয়ে নিয়ে প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে পড়ে।

এর পরও দেড় মাইল পথ হেঁটে গিয়ে তবে গ্রামের বাড়ি। সেখানে ভৈরবের বউ, ছেলে-মেয়ে; বেগুনের চারায় ছোট ছোট বেগুনী রঙের ফুল দেখা দিয়েছে। একটু একটু করে মাথা তুলছে গত বছরে বসানো নারকেলের চারা।

কিন্তু এসব কথা এখন মনে পড়ে না ভৈরবের।

বাস-রাস্তা ধরে বেশ খানিকটা গিয়ে তবে গ্রামের পথে বাঁক নিতে হয়। গোটা কয়েক পয়সা দিলেই বাসে যাওয়া যায়। তবু এটুকু পথ হেঁটে চলাতেই ভৈরবের আনন্দ। নাকি কয়েকটা পয়সা বাঁচিয়েই?

পাশাপাশি কয়েকটা চালাঘর পাকা রাস্তার ধারে। কেউ চা শিঙাড়া খায়, টুকিটাকি জিনিস কেনে, কেউ বা বিড়ি খেতে খেতে বাসের জন্য অপেক্ষা করে। তাদের এড়িয়ে হনহন করে হেঁটে চলে ভৈরব। তারপর একসময় পা গতি হারায়। নিজেরই অজান্তে ধীরে ধীরে চলতে শুরু করে ও, টিনের চালাগুলোর শেষে দোতলা ভাঙা পুরোনো বাড়িখানা চোখে পড়তেই।

মান্ধাতা আমলের পুরোনো বাড়ি। এক পাশের দেয়াল ভেঙে পড়ে ইঁটের স্তূপ জমেছে। ওপাশের দেয়ালে শ্যাওলা, জানালা দরজা ক্ষয়ে গেছে বৃষ্টির জলে, ফেটে চৌচির হয়ে গেছে রোদে পুড়ে।

বাড়িটার সামনে ঘাস আর কচুর শাক গজিয়ে জঙ্গল হয়ে আছে। তার ওপাশে একটা ছোট্ট ডোবা।

একটু আগেই তো ইলেকট্রিক ট্রেনটা বিচিত্র বাঁশি বাজিয়ে চলে গেছে। এই সংকেত শুনেই হয়তো বুঝতে পারে ভাঙা পুরোনো বাড়ির চেনা-অচেনা একটি মেয়ে। এসে দাঁড়ায় দোতলার ভাঙা জানালার সামনে। চেয়ে দেখে যাত্রীদের।

ভৈরব হাতে থলি আর কপি ঝুলিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করে। তারপর চোখ তুলে তাকায়।

চোখাচোখি হয় মেয়েটির সঙ্গে। আর অদ্ভুত একটা আনন্দের শিহরন খেলে যায় ভৈরবের শরীরে মনে। চোখের দৃষ্টি পরস্পরকে চিনে নেয়।

যতক্ষণ দেখা যায়, বাড়িটা পার হতে হতে বারবার চোখ ফিরিয়ে দেখে ভৈরব। একটি সুন্দর সপ্রতিভ মুখ অপেক্ষা করে থাকে জানালার সামনে। সে মুখে বুঝি আনন্দের ঈষৎ হাসিটা জ্বলে উঠেই ধীরে ধীরে নিবে যায়। যৌবনে উজ্জ্বল সুন্দর সেই মুখখানি, টানা-টানা দুটি চোখের ভাষা যেন ভৈরবের মনের ওপর কত অনুক্ত হৃদয়ের কথা শুনিয়ে যায়। কবে থেকে সে মুখে বয়সের ঈষৎ ছাপ পড়েছে, কপালের সিঁদুরের ফোঁটাটা অদৃশ্য হয়েছে, ভৈরব নিজেও বুঝি লক্ষ করে না।

মেয়েটিকে প্রথম যেই দেখতে পায়, চোখে চোখ পড়ে, ঈষৎ হাসি দোলে তার ঠোঁটে, অমনি অদ্ভুত একটা শিহরন খেলে যায় ভৈরবের সারা শরীরে। সব ক্লান্তি ঝরে পড়ে, প্রতীক্ষা সফল হয়।

এমন সময় বাড়িটা পার হয়ে চলে যায় ভৈরব, নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই পার হয়ে যেতে হয়। মেয়েটিকেও আর দেখা যায় না। কিন্তু ভৈরবের মনের ওপর একটা মুগ্ধতার প্রলেপ থেকেই যায়।

আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে তবে মেঠো পথে বাঁক নিতে হয়। মনের মধ্যে কত কি কল্পনার সৌধ গড়তে গড়তে কখন যে গ্রামে এসে পেঁছয় ও, ঘরের দাওয়ায় এসে দাঁড়ায়, ভৈরব নিজেও টের পায় না।

চমক ভাঙে বড় ছেলেটা ছুটে এসে যখন আদুরে গলায় প্রশ্ন করে, আমার বই এনেছো?

ছোট মেয়েটা কাছে আসে না। পুতুল নিয়ে দাওয়ার এক কোণে খেলা করতে করতে এক-

বার শুধু চোখ তুলে তাকায় বাপের দিকে। তারপর অপেক্ষা করে।

ভৈরব তার দিকে তাকিয়ে হাসে, অভিমান বুঝতে পারে। তাই চুলের রিবনটা থলি থেকে বের করে এগিয়ে এসে মেয়েকে কোলে তুলে নেয়।

ওদিক থেকে স্ত্রীর কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।—আলনায় কাপড় আছে, দে তো মণ্টু।

মণ্টু কাপড়খানা এনে দেয়, ভৈরব সামনের পুকুরটায় গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে এসে কাপড় ছাড়ে। ট্রেনের জামা-কাপড় পরে ঘরে ঢোকা নিষেধ, তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্ত্রীর মন যুগিয়ে চলতে হয়। কিংবা স্ত্রীর মন যুগিয়ে চলতে যেন ভালোই লাগে। সমস্ত মন জুড়ে তখন খুশী-খুশী ভাব। সেই আনন্দটুকু যেন স্ত্রীর ওপরই উজাড় করে দিতে ইচ্ছে হয়।

সারাক্ষণ ছেলেমেয়েদের নিয়ে গল্প করে ভৈরব, আর দেখে স্ত্রী ওপাশে রান্নাঘরে একটার পর একটা কাজ করে চলেছে। একবার কাছে এসে দুটো কথা বলার সময় নেই। শোনার ধৈর্য নেই। দূর থেকে এক-চোখ দেখেই সন্তুষ্ট, আগের মতো কাছে এসে দাঁড়াতেও অনিচ্ছা যেন।

মণ্টুকে সঙ্গে নিয়েই বাঁশের বাতা দিয়ে ঘেরা শাকসবজির বাগানটা তদারক করতে বেরিয়ে আসে ভৈরব। বাঃ, পালং শাকগুলো বেশ হরহরে হয়ে উঠেছে। ক্ষুদে ক্ষুদে বেগুন ধরতে শুরু করেছে গাছে। খুরপি নিয়ে বেগুনের চারার নীচে মাটি ঢিলে করে দিতে দিতে মণ্টুকে উপদেশ দেয় ভৈরব।—ভেলিগুলো মাঝে মাঝে খুঁড়ে দিবি, বুঝলি। মাটি পড়ে ভেলি বন্ধ হয়ে গেলে জল আসবে না।

একটার পর একটা গাছের গায়ে হাত বুলিয়ে যেন পরম পরিতৃপ্তি। গত বছরে বসানো নারকেল গাছের চারাটার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে ও কিছুক্ষণ। বাঃ, বেশ ধীরে ধীরে গজিয়ে উঠছে। গাছটা মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। ঠিক মণ্টুর মতোই। মণ্টুই কি কম বড় হয়েছে। গত বছরেও ভৈরবের হাঁটুর কাছে পড়তো মণ্টু, এখন প্রায় কোমর ছুঁই-ছুঁই।

বাগানের কাজ শেষ করে গাড়ুর জলে হাত-পা ধুয়ে দাওয়ায় মাদুর বিছিয়ে বসে ভৈরব। ধীরে ধীরে অন্ধকার যেন নেমে আসে। মণ্টু হারিকেনটা জেবলে বইখাতা নিয়ে এসে বসে বাপের কাছে। সারা সপ্তাহে এই তিন বেলা ছেলের পড়াশুনোর খবর নিতে পায় ভৈরব। তাই একটা মুহূর্তও অপব্যয় করতে ইচ্ছে হয় না।

এতক্ষণে ভৈরবের স্ত্রীর সময় হয়। কাঁসার থালায় দুখানা পরোটা আর বেশ খানিকটা গুড় এনে নামিয়ে দেয়। ছোট মেয়েটা জলের গ্লাসটা এনে রাখে।

পরম পরিতৃপ্তিতে পরোটা দুখানা খায় ভৈরব, আর মণ্টুর মা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। তারপর থালা আর গ্লাসটা তুলে নিয়ে যেতে যেতে জিগ্যেস করে, ওষুধটা এনেছো?

—হ্যাঁ, ওই থলিতে আছে। বলেই নিজে উঠে গিয়ে ওষুধটা বের করে দেয়। তারপর ব্যাগ থেকে জরিপাড় শাড়িখানা বের করে খুশির হাসি হেসে তাকায় স্ত্রীর দিকে। বলে, আপিসের লোককে দিয়ে শান্তিপুর থেকে ধুইয়ে এনেছি এবার, দেখো কেমন চমৎকার ধুয়েছে। ঠিক যেন নতুন। স্ত্রী খুশী হয়, লাজুক-লাজুক হাসে।

আর কোনো কথা নয়। ভৈরব আবার ছেলেকে পড়াতে শুরু করে।

কোনো দিন বা আবার সেই সুন্দর মুখের স্মৃতিটুকু মুছে যেতে চায় না। স্টেশন থেকে নেমে হেঁটে আসতে আসতে দেখা সেই পুরোনো ভাঙা দালানের জানালায় আঁটা ছবির মতো মুখখানা।

প্রতি শনিবারই দেখে আসছে তাকে, আবার সেই সোমবার সকালে যাবার সময়। মণ্টু হয়নি তখন, ভৈরব বিয়ে করেনি, তখন থেকেই দেখে আসছে। ঠিক অমনি এসে দাঁড়াতো সে তখনো। কতই বা বয়স ছিলো! ষোল বছরের একটি কিশোরী মেয়ে—মুখে-চোখে চটুল হাসি।

নাম জানে না তার ভৈরব, জানতে ইচ্ছেও হয়নি। শুধু দূর থেকে ক্ষণিকের জন্যে গোপন মনের রোমাঞ্চ বুনে আসে।

তারপর একদিন বিয়ে করে ফিরলো ভৈরব। স্টেশনে নেমে গরুর গাড়িতে করে নতুন বউকে নিয়ে গ্রামে ফিরছিলো সেদিন। ভৈরবের গালে কপালে তখনো চন্দনের ফোঁটা, নতুন বউয়ের মাথায় লাল চেলির ঘোমটা।

বর-বউ দেখতে দু-পাশের লোক ছুটে এলো। আর তারই ফাঁকে ভৈরব দেখলে সমবয়সী একটি মেয়ের কাঁধে ভর দিয়ে কৌতূহলের চোখে তাকিয়ে আছে মেয়েটি। ভৈরবের সঙ্গে

চোখাচোখি হতেই ফিক করে হেসে ফেললে সে। আর সেদিন থেকেই যেন একটা পরিচয়ের সম্পর্ক গড়ে উঠলো।

তারপর দিনে দিনে বয়েস বেড়েছে ভৈরবের, বয়েস বেড়েছে মেয়েটির। দোতলা পুরোনো দালান-বাড়িটা থেকে ক্ষয়ে-যাওয়া ইঁটের রাশি খসে খসে পড়েছে! আর সেই বাড়ি ঘিরে হঠাৎ একদিন চাঞ্চল্য দেখতে পেয়েছে ভৈরব, আনন্দের উল্লাসের হাওয়ায় মেতে উঠতে দেখেছে বাড়িটাকে। স্টেশন থেকে নেমে এমনি এক শনিবারের বিকেলে বুকের ভেতরটা হঠাৎ যেন ছ্যাঁত করে উঠেছে।

একটা অবোধ্য ব্যথা অনুভব করেছে ভৈরব বুকের মধ্যে। পর পর কয়েকটা শনিবার দীর্ঘশ্বাসের দৃষ্টি ফেলে তাকিয়েছে সে জানালাটার দিকে। ফিরে গেছে ব্যর্থ মন নিয়ে।

পর পর অনেকগুলো সপ্তাহ কেটে গেছে। ভিতরে ভিতরে যেন মুষড়ে পড়ছিলো ভৈরব। কখনো কখনো বা কল্পনার চোখে একটি সুখের নীড় গড়ে তুলতে চেয়েছে মেয়েটির জন্যে। কি নাম মেয়েটির? মনে মনে কত সুন্দর নাম আউড়ে গেছে ভৈরব। কেমন দেখতে তার স্বামীকে? কেমন মানুষ? হয়তো খুব ভালোবাসে সে ওই মেয়েটিকে। স্ত্রীকে ভালোবাসাই তো স্বাভাবিক। ভৈরব নিজেই কি তার স্ত্রীকে কম ভালোবাসে?

ভৈরব ভেবেছিলো আর কোনো দিন বুঝি দেখতে পাবে না মেয়েটিকে।

কিন্তু একদিন চমকে উঠেছে জানালার সামনে সেই চেনা মুখখানাকে ফিরে আসতে দেখে। সিঁথির সিঁদুরটুকু দূর থেকে চোখে পড়েনি, চোখে পড়েছে শুধু কপালের ডগডগে বড় একটা সিঁদুরের ফোঁটা। আর ভৈরবের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ঈষৎ হেসে মাথায় ঘোমটা টেনে দিয়েছে মেয়েটি।

দিনের পর দিন কেটে গেছে। আর দিনের পর দিন বিস্মিত হয়েছে ভৈরব তার দিকে তাকিয়ে। প্রতিবারই মনের মধ্যে একটা আশঙ্কা পুষে ট্রেন থেকে নেমেছে, প্রতিবারই মনে হয়েছে, এবার হয়তো যাওয়ার পথে তাকে দেখতে পাবে না। কিন্তু ঠিক সময়টিতে জানালার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সে হাসিমুখে। সে মুখের দিকে তাকিয়ে খুশিতে ভরে উঠেছে ভৈরবের মন, আবার রহস্যের মতো মনে হয়েছে তাকে। একটা কাল্পনিক দুঃখে সমবেদনা জেগেছে। মনের মধ্যে শত প্রশ্ন উঁকি দিয়ে গেছে। মেয়েটি বছরের পর বছর এখানেই, এই বাড়িতেই কাটিয়ে চলেছে কেন! কেন, কেন! কোনো উত্তর খুঁজে পায়নি ভৈরব।

তবু এ এক অদ্ভুত নেশা। ওদিকে না তাকিয়ে পারে না ভৈরব। কয়েকটি মুহূর্তের জন্য, তবু তারই মধ্যে যেন লুকোনো আছে কি এক অপার্থিব আনন্দ।

সোমবার ভোর হতে না-হতেই আবার ওই স্বপ্নটা উঁকি দেয়। তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে তৈরী হয়। মুখ-হাত ধুয়ে এসে দেখে, স্ত্রী উনন ধরিয়ে রান্না শুরু করে দিয়েছে। ট্রেন থেকে একেবারে সটান আপিসে চলে যেতে হয় ভৈরবকে, তাই স্নান সেরে নাকে-মুখে দুটি ভাত গুঁজে নিয়ে ছুটতে হয়। নইলে ট্রেন ধরতে পারবে না, সময়মতো আপিসে পৌঁছতে পারবে না।

আপিসের ছুটির পর সেই নিশীথ কুণ্ডু লেনের মেস-বাড়ি। ছাদের গঙ্গাজলের ট্যাঙ্ক থেকে জলের ছিটে পড়ে। জলে-ভেজা শ্যাওলা-পড়া দেয়ালে কি একটা বিদঘুটে গন্ধ। দশটা-পাঁচটা আপিস।

রেসের বই খুলে ঘোড়ার নাম দেখতে দেখতে ফিরে তাকায় সরল মুন্সী। বলে, কি দাদা, বউদি কেমন আছে?

প্রশ্নের পিঠে অর্থপূর্ণ হাসি হাসে।

মুকুন্দবাবু টেড়ি-কাটা চুলে মহাভৃঙ্গরাজ মাখতে মাখতে বলেন, ভৈরববাবু ফিরেছেন দেখছি। ভাবছিলাম এবারটা হয়তো আঁচলে বাঁধা থাকবেন।

ছোকরা অনুপম কলেজ থেকে ফেরার মুখে ভৈরবের ঘরে উঁকি দেয়। বলে, সে কি, এবারও একা? ভাবলাম বউদিকে বুঝি সঙ্গে করেই নিয়ে আসবেন।

ভৈরব শোনে আর হাসে। ভালোও লাগে। রসিকতা করে বলে, বিয়ে তো একদিন করবে ভাই, তখন বুঝবে।

আবার সারা সপ্তাহ ধরে তৈরী হতে শুরু করে ভৈরব। ছেলেমেয়েদের ফাইফরমাশ, স্ত্রীর

বায়না। একটি একটি করে খুঁটিনাটি জিনিস কিনে এনে থলিতে ভরে রাখে।

তারপর আবার সেই শনিবারের দুটো তিরিশের ট্রেন। সেই মেমারী স্টেশনে নেমে একটা খুশির গুনগুনুনি।

প্রতিবারের মতোই সেদিনও পায়ের গতি কমে এলো। পুরোনো দোতলা দালানখানা দেখা যাচ্ছে। দেখা গেলেই ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করে ভৈরব। স্বপ্নের ঘোরেই যেন এতক্ষণ কেটে গেছে তার। স্বপ্নের ঘোরেই সারা সপ্তাহটা কেটে যায়।

কিন্তু বাড়িটার সামনে পেঁৗছেই হঠাৎ যেন একটা ধাক্কা খেলো ভৈরব। বুকের মধ্যে একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগলো বুঝি। ঠিক সেই দিনটির মতো, যেদিন বিয়েবাড়ির আনন্দ আর উল্লাস দেখেছিলো পোড়ো বাড়িটাকে ঘিরে! কিংবা তার চেয়েও বেশী।

নিজেরই অজান্তে কখন পা থেমে গিয়েছিলো। বারবার জানালাটার দিকে তাকালো ভৈরব। জানালার আশেপাশে। সমস্ত বাড়িটার ওপর চোখের দৃষ্টি ঘুরে গেল।

না, জানালাটা বন্ধ হয়ে গেছে! কেউ আর সেখানে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে নেই। এক টুকরো মৃদু হাসির অভ্যর্থনা, তাও নিবে গেছে ভৈরবের জীবন থেকে।

সমস্ত মনটা যেন বিষিয়ে গেল। হনহন করে পথটুকু হেঁটে পার হয়ে গেল ভৈরব। বুকের মধ্যে শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস যেন বেরিয়ে আসার পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

প্রতিবারের মতোই কানা-উঁচু কাঁসার থালায় দুখানা পরোটা আর গুড় নিয়ে এসে নামিয়ে রাখলো ভৈরবের স্ত্রী। জিগ্যেস করলে, আমার জর্দাটা এনেছো?

ভৈরব তিক্ত স্বরে উত্তর দিলে, ওই তো আছে, ব্যাগটা খুলেই দেখো না।

ছোট মেয়েটা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে করে ঠোঁট ফুলিয়ে অভিমানে সরে গেল সেখান থেকে। ভৈরব তাকিয়েও দেখলে না।

বড় ছেলেটা মাদুর পেতে হারিকেন লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে নিয়ে এসে বসলো। বললে, অঙ্কটা বুঝিয়ে দাও না বাবা।

ভৈরব একটু চুপ করে থেকে উত্তর দিলে, ইস্কুলের মাস্টারমশাইকে বলিস বুঝিয়ে দিতে।

কত বড় বড় বেগুন ধরেছে গাছে। নারকেলের চারাটা কত বড় হয়েছে, কোনো কিছুই দেখতে ইচ্ছে হলো না ভৈরবের।

ক্লান্তিতে বিরক্তিতে দেড়টা দিন কাটিয়ে দিয়ে সোমবার সকালেই আবার ফিরে এলো ভৈরব। আসার পথে ভালো করে তাকিয়ে দেখলে দোতলা দালানটার দিকে। না, জানালাটা তেমনি বন্ধ আছে। কপাটে একটা বড় কুলুপ ঝুলছে।

একটা সপ্তাহ কেটে গিয়ে আবার শনিবার এলো। কিন্তু ভৈরব যেন সে খবর জানে না।

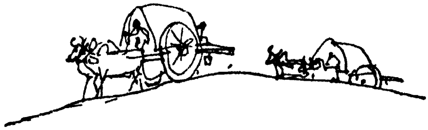
শনিবার সকালে ভৈরব তখনো শুয়ে আছে তক্তপোশের ওপর। সরল মুন্সী সেদিকে তাকিয়ে বিস্মিত স্বরে বললে, কি ব্যাপার, এখনো ঘুমোচ্ছেন যে! ব্যাগ-ট্যাগ গুছিয়ে নিয়েছেন?

ভৈরব কোনো জবাব দিলে না।

মুকুন্দবাবু দাড়ি কামাতে কামাতে কি একটা রসিকতা করতে এসে থমকে দাঁড়ালেন।—আরে ভৈরববাবু, আজ বাড়ি যাবেন না নাকি? এর মধ্যেই স্ত্রী পুরোনো হয়ে গেল?

কলেজ যাবার মুখে একবার উঁকি দিয়েই থেমে পড়লো ছোকরা অনুপম।—ভৈরবদা কি বউদির সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছেন নাকি? বউদির সঙ্গে আপনারও তা হলে মন-কষাকষি হয়!

ভৈরব একে একে সকলের কথাই শুনলো, কিন্তু কোনো কথারই জবাব দিলে না। ওর তখন চোখ ঠেলে জল আসছে, একটা অন্ধ আক্রোশে। নিজের ওপরেই একটা অসহ্য অভিমান। স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, সেই বেগুনের চারা, একটু একটু করে বেড়ে ওঠা নারকেল গাছটা—সেই ছোট্ট সংসারের সমস্ত আনন্দ যে জানালার ফাঁক দিয়ে দেখে এসেছে সে এতদিন, সেই জানালাটাই যে আজ বন্ধ হয়ে গেছে।



এক সের বেগুন

বীরভূম জেলার রায়মঙ্গল কেন্দ্রের অপ্রতিদ্বন্দ্বী জননেতা আবুল হোসেন হায়াত সাহেব কেন মাত্র সতেরোটি ভোট পেয়ে নির্বাচনে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছেন এবং তাঁর ভোট-বাক্সের উপর কেন একটি হাস্যকর উপহার পাওয়া যায়, সে রহস্য সম্প্রতি উদ্ঘাটিত হয়েছে। প্রকৃত-পক্ষে ওই উপহার-সামগ্রীটির মধ্যেই তাঁর পরাজয়ের কারণ খুঁজে পাওয়া গেছে।

হায়াত সাহেব সাধারণ নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন এ সংবাদ পাঠ করে সমগ্র পশ্চিম-বঙ্গের অধিবাসীরাই স্তম্ভিত হয়েছেন, যদিও রাজনৈতিক দলবিশেষ ইতিমধ্যে প্রাথমিক বিস্ময় কাটিয়ে উঠে হায়াত সাহেবের পরাজয় ও তাঁদের প্রার্থীর আশাতীত জয়লাভকে তাঁদের দলের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার নিদর্শন বলে প্রচার করতে শুরু করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে অবশ্য এ ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে, নির্বাচনে কোনো প্রার্থীর জয়লাভের পিছনে রাজনৈতিক দলের কিংবা দলীয় প্রার্থীর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তাই কার্যকরী হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে জয়ী প্রার্থী আব্দুল করিম সাহেবের জনপ্রিয়তাকে ইতিপূর্বে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ বলে মনে হয়েছিলো এবং ঘোড়দৌড়ের ভাষায় যাকে আপসেট বলা চলে, তেমনই একটি নির্বাচনের প্রকৃত ঘটনা জানবার জন্য এবং এই নির্বাচনী ফলাফলকে নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করার জন্য এই নির্বাচন-কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে আমি যখন স্বয়ং করিম সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, তখন তিনি কোনো উল্লাস প্রকাশ করা দূরের কথা, স্পষ্ট স্বীকার করেন যে, এই ফলাফলকে তিনি এখনো বিশ্বাস করতে পারছেন না।

স্মরণ থাকতে পারে, হায়াত সাহেব এ অঞ্চলের অক্লান্ত কর্মী এবং একনিষ্ঠ সমাজসেবী হিসেবে দীর্ঘ বাইশ বছর যাবৎ অপ্রতিদ্বন্দ্বী জননেতার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এবং গত দুটি নির্বাচনেই তিনি বিপুল ভোটাধিক্যে বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁর কোনো রাজনৈতিক পদক্ষেপে বিন্দুমাত্র ভ্রান্তি হয়েছে বলে শোনা যায়নি, বা তাঁর নির্বাচন-কেন্দ্রের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রাখতে পারেননি এমন সন্দেহও করা সম্ভব নয়। কারণ বিধানসভার অধিবেশন-কালীন সময়টুকু ব্যতীত সারা বৎসরই তিনি স্বগ্রামে বসবাস করেন এবং আপন চেষ্টায় তিনি একটি বালিকা বিদ্যালয় ও একটি মাতৃসদন প্রতিষ্ঠা করেছেন। তা ছাড়া বিধানসভাতেও তাঁর নির্ভীক ও যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতায় গ্রামবাসীদের প্রতি তাঁর আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। স্থানীয় ইস্কুলের জনৈক শিক্ষকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই বিষয়ে আলোচনা করে জানতে পেরেছি যে, হায়াত সাহেব যে মাঝে মাঝেই স্বদলের গ্রাম-বিরোধী ভূমিকাকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করে দলীয় প্রধানদের বিরাগভাজন হয়েছেন তাও এ অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে অজ্ঞাত নেই। তৎসত্ত্বেও কেন যে হায়াত সাহেব এভাবে পরাজিত হলেন তার কার্যকারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে একটি বিচিত্র সংবাদ সংগৃহীত হয়েছে।

অপ্রতিদ্বন্দ্বী কোনো কোনো জননেতা এই সাধারণ নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন, এমন কি দুই-একজনের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে এ খবরও জানা গেছে। কিন্তু হায়াত সাহেবের মতো জনপ্রিয় প্রার্থীর মাত্র সতেরোটি ভোট পাওয়ার সংবাদ বোধ করি সমগ্র নির্বাচনের ইতিহাসেই একটি দুর্বোধ্য রহস্য হিসাবে স্বীকৃত হবে।

গত পরশুর সংবাদপত্রে রায়মঙ্গল কেন্দ্রের নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এবং সে ফলাফলের তালিকায় দেখা গেছে, করিম সাহেব সতেরো হাজার তিন শো বাষট্টিটি ভোট পেয়েছেন, স্বতন্ত্র প্রার্থী শ্রীধর বসু পেয়েছেন দু হাজার এক শো একান্নটি ভোট, এবং অবিশ্বাস্য মনে হলেও হায়াত সাহেবের বাক্সে মোট সতেরোটি ভোট পড়েছে। গত কালের বিভিন্ন সংবাদপত্রেও এ বিষয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা প্রকাশিত হয়েছে, এবং হায়াত সাহেবের পরাজয়কে অনেকে দলীয় জনপ্রিয়তা হ্রাসের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বলে মনে করেছেন। কিন্তু এ

রহস্যের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করতে এসে জানা গেল যে, হায়াত সাহেবের বাক্সে কেবলমাত্র সতেরোটি ভোটপত্রই পাওয়া যায়নি, এ ছাড়াও আরেকটি দ্রব্য পাওয়া যায়। অফিসার নাকি স্থানীয় এক ভদ্রলোকের কাছে গল্পচ্ছলে জানান যে, হায়াত সাহেবের বাক্সের উপরে কোনো ভোটদাতা একটি বেগুন রেখে যান। উক্ত ভোট-কেন্দ্রের উভয় রাজনৈতিক দলের এজেন্টরাই এ কাহিনী সমর্থন করেন, এবং পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে যে, কয়েক দিন পূর্বে কোনো একটি পোলিং বুথে ভোট-বাক্সের উপরে কেউ একটি বেগুন রেখে যায়, এ সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিলো। অবশ্য সে সংবাদে কোন প্রার্থীর বাক্সের উপরে বেগুনটি পাওয়া যায় উল্লেখ করা হয়নি। এবং বলা বাহুল্য, সে সময়ে খবরটি পাঠ করে সকলেই কৌতুকবোধ করেছিলেন।

আপাতদৃষ্টিতে উক্ত সংবাদটি কৌতুককর মনে হলেও ঘটনাটির পিছনে কি গভীর তাৎপর্য ও করুণ কাহিনী লুকিয়ে আছে তার কিছুটা হদিস বোধ হয় পাওয়া গেছে।

রায়মঙ্গল কেন্দ্রের ভোটার-সংখ্যা কিঞ্চিদধিক ষাট হাজার। তম্মধ্যে তেরো হাজার মুসলমান ও সাতচল্লিশ হাজার হিন্দু। সুতরাং কোনো কোনো মহলে যে প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে, রায়মঙ্গল কেন্দ্রের নির্বাচনে এবার সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রকট হয়েছে তা সত্য নয়। কারণ সাম্প্রদায়িক কারণে করিম সাহেব তেরো হাজার ভোট পেয়ে থাকলেও স্বীকার করতে হবে, অন্তত চার হাজার হিন্দু ভোটও তিনি পেয়েছেন। অথচ সাম্প্রদায়িক মনোভাব থাকলে স্বতন্ত্র প্রার্থী শ্রীধর বসু হিন্দুদের ভোট অধিক সংখ্যায় পেতেন, এবং মুসলমানদের ভোট পেতেন হায়াত সাহেব। কারণ হায়াত সাহেবের পিতা এতদঞ্চলের সর্বজনশ্রদ্ধেয় মৌলবী ছিলেন এবং দরিদ্র মুসলমান চাষীদের উন্নতির জন্য হায়াত সাহেব প্রাণপাত করেছেন বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। অন্য পক্ষে করিম সাহেব কিঞ্চিৎ সাহেবী ভাবাপন্ন, দরিদ্র মুসলমান চাষীদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগই তিনি রাখতে পারেননি, কারণ ব্যারিস্টারী পেশায় নিযুক্ত থাকার ফলে তাঁকে অধিকাংশ সময় কলকাতায় থাকতে হয়। সুতরাং এই বিস্ময়কর ঘটনাটির জন্য সাম্প্রদায়িকতাকে অকারণে দায়ী করা চলে না।

আরেকটি মহলের গবেষণায় প্রকাশ, জমিদারি উচ্ছেদের পক্ষে হায়াত সাহেব যে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতাদি দিয়েছিলেন, তার ফলেই নাকি তিনি সম্ভ্রান্ত ও সচ্ছল পরিবারগুলির ভোট থেকে বঞ্চিত হয়েছেন এবং করিম সাহেব প্রাক্-নির্বাচন সফরে ক্যানাল ট্যাক্সের বিরোধিতা করে যেসব বক্তৃতা দেন, তা গ্রামবাসীদের কাছে তাঁকে জনপ্রিয় করে তোলে। কিন্তু সংবাদ নিয়ে এবং সেটেলমেন্ট আপিসের নথিপত্র ঘেঁটে দেখা গেছে যে, রায়মঙ্গল কেন্দ্রের মাত্র সাত শো পরিবার জমিদারি উচ্ছেদ আইনের আওতায় পড়েন এবং আইন-অন্তর্ভুক্ত একুশ হাজার বিঘা জমির মালিক পাঁচ-ছয় শো জনের অধিক নয়। সুতরাং নীতিগত কারণে হায়াত সাহেব সাত শো পরিবারের পরিবার-পিছু পাঁচজন করে ধরলে সাড়ে তিন হাজার ভোট হারাতে পারেন, এবং করিম সাহেবও পাঁচ-ছয় শো পরিবার থেকে ক্যানাল ট্যাক্স-বিরোধী বক্তৃতার দৌলতে বড় জোর আড়াই হাজার বা তিন হাজার ভোট পেতে পারেন। কিন্তু প্রকৃত ক্ষেত্রে করিম সাহেব পেয়েছেন সতেরো হাজারেরও বেশী ভোট, এবং হায়াত সাহেব পেয়েছেন মাত্র সতেরোটি। অথচ গত নির্বাচনে হায়াত সাহেব তেইশ হাজার ভোট পেয়েছিলেন।

অবশ্য হায়াত সাহেব মাত্র সতেরোটি ভোটই পাননি, উপরন্তু তাঁর বাক্সের উপরে পাওয়া গেছে একটি বেগুন। এই বেগুনটি অনেকের কাছে কৌতুককর মনে হলেও আমার মনে হয়, হায়াত সাহেবের পরাজয়ের প্রকৃত কারণ পাওয়া যাবে এই রহস্যের সমাধান করতে পারলেই।

কলকাতা শহরে বসে এই ঘটনাটির তাৎপর্য অনুধাবন করা অবশ্য আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। এবং পরীক্ষার্থী ছেলেমেয়েরা শূন্যের পরিবর্তে যেমন 'রসগোল্লা' শব্দটি ব্যবহার করে, তেমনই একটি বেগুন দান করে কোনো ভোটার হায়াত সাহেবের বাক্সকে শূন্য করবার পক্ষপাতী ছিলো বা প্রতিপক্ষেরই কেউ বেগুন দিয়ে কোনো তুকতাক করতে চেয়েছিলো এমন মনে করা যেতে পারতো। এমন কি হায়াত সাহেব নিজেও এই রহস্যটির এই ধরনের ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। তিনি আমাকে জানান যে, রায়মঙ্গলের গ্রামবাসীরা অত্যন্ত দরিদ্র এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন; তাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও উন্নতির জন্য সরকার কোনো চেষ্টাই করেননি, সুতরাং তাদের মধ্যে কারও কারও তুকতাকে বিশ্বাস থাকা অস্বাভাবিক নয়। অবশ্য ব্যাপারটার অন্য ব্যাখ্যাটাও তিনি আমাকে জানান। এ-হেন পরাজয় সত্ত্বেও সহাস কৌতুকে বলেন যে, কোনো

চাষী ভোটার হয়তো বেগুনটি তাঁকে খাবার জন্যে দান করে গেছে, বা ভোট দিতে এসে ভুল-ক্রমে বাক্সের উপর নামিয়ে রেখে গেছে।

এই সূত্রে কথোপকথন করতে করতে তিনি নির্বাচনের কথা ভুলে বেগুন সম্পর্কে আলোচনা শুরু করে দেন, এবং জানান যে, তাঁর বাড়ির উঠনেও কয়েকটি বেগুনচারা ছিলো এবং তাতে এক সের ওজনের বেগুনও ধরতো। হায়াত সাহেব দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, বিধান-সভায় যেতে হতো এবং দীর্ঘদিন কলুটোলার একটি হোটেলে বাস করতে হতো। সে কারণে বেগুনের চারাগুলি নষ্ট হয়ে যায় এবং ইচ্ছা সত্ত্বেও তিনি সেগুলির পরিচর্যা করতে পারতেন না, এ কথা জানিয়ে তিনি মনের ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

বলেন যে, নির্বাচনে পরাজিত হয়ে তাঁর উপকারই হয়েছে, কারণ এখন আর তাঁকে কলুটোলার নোংরা হোটেলে বাস করতে হবে না, পরম আনন্দে তিনি তাঁর ক্ষুদ্র ভিটাবাড়ির সামনের বাগানে বেগুনের পরিচর্যা করতে পারবেন।

হায়াত সাহেবের এই বেগুনপ্রীতির বর্ণনা শুনতে শুনতে আমি যখন সন্দিহান হয়ে উঠছিলাম, এবং এর সঙ্গে ভোট-বাক্সের কোনো সম্পর্ক আছে কি না মনে মনে অনুসন্ধান করছিলাম, তখন তিনি একটি বিস্ময়কর খবর প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, প্রায় চার বৎসর পূর্বে তিনি একবার বিধানসভার অধিবেশন সমাপ্তির পর গ্রামে ফিরছিলেন, এমন সময় গ্রামের হাটে একজনকে ঝুড়ি-ভরতি বড় বড় বেগুন বেচতে দেখে এত দূর প্রলুব্ধ হন যে, সেখানেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন এবং কিছু বেগুন কিনতে তাঁর ইচ্ছে হওয়ায়, বেগুনওয়ালা এক সের বেগুনের জন্যে তিন আনা পয়সা চায় এবং হায়াত সাহেব কোনো দরদস্তুর না করে তিন আনা পয়সা দিয়েই বেগুনগুলি নিয়ে চলে আসেন। ঘটনাটির উল্লেখ করে হায়াত সাহেব হাসতে হাসতে আমাকে জানান যে, সে রাত্রে পেঁয়াজ সহযোগে তিনি শুধু বেগুনপোড়া দিয়েই ভাত খেয়েছিলেন।

এই সূত্রেই তাঁর হঠাৎ স্মরণ হয় যে, তিনি যখন বেগুন কিনছিলেন, তখন পিছন থেকে কে যেন মন্তব্য করে, হায়াত সাহেবের দেখি আজকাল এক সের বেগুন না হলে চলে না।

এই স্থানীয় অনুসন্ধানের পরিপ্রেক্ষিতে রায়মঙ্গল কেন্দ্রের নির্বাচনী সাফল্যের বিশ্লেষণের মধ্যেই হায়াত সাহেবের পরাজয়ের প্রকৃত কারণ এবং ভোট-বাক্সে রাখা বেগুনটির সব রহস্য, আমার ধারণা, সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত হয়েছে। সাম্প্রদায়িকতা, জমিদারি উচ্ছেদ, ক্যানাল ট্যাক্স—বহুজনে বহু মতামত হয়তো প্রচার করবেন, রাজনৈতিক দলগুলি হয়তো এই নির্বাচনী ফলাফলের মধ্যে কোনো দলবিশেষের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি বা হ্রাসের হদিস পাবেন, কিন্তু দর-দস্তুর না করে তিন আনা পয়সায় এক সের বেগুন কেনার ফলে যে একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী জননেতা গদিচ্যুত হতে পারেন, এ খবর অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্য।

এই তুচ্ছ ঘটনাটিকে আমি ইতিপূর্বে বিস্ময়কর বলেছি। তার কারণ হায়াত সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাতের পর ফেরার পথে সেই গ্রামেরই এক দরিদ্র মুসলমান চাষীর সঙ্গে আমার দেখা হয়, এবং তাকে আমি স্টেশনের পথটা দেখিয়ে দেবার জন্যে অনুরোধ করি। পরিবর্তে সে প্রশ্ন করে জানতে চায়, আমি গ্রামে কার বাড়ি গিয়েছিলাম। উত্তর শুনে চাষীটি উপহাসের হাসি হাসে এবং বলে যে, সে আমাকে দেখেই বুঝতে পেরেছিলো যে, আমি নবাবজাদার বাড়ি গিয়েছিলাম। 'নবাবজাদা' বলতে সে কাকে বোঝাতে চায় জিজ্ঞাসা করায় লোকটি হেসে বলে যে, গ্রামে নবাবজাদা তো একজনই আছেন। ইতিমধ্যে আরো দু-চারজন লোক এসে জড় হয় এবং হাসতে হাসতে বলে যে, এখন তারা হায়াত সাহেবকেই নবাবজাদা সম্বোধন করে। এবং তাঁর পরাজয়ে যে তারা খুশী হয়েছে তাও প্রকাশ করে।

আমি বিস্মিত হয়ে তাদের উল্লাসের কারণ জানতে চাই। তখন একজন সহাস্যে বলে যে, হায়াত সাহেব মানুষটি ভালো ছিলেন বলেই তারা তাঁকে মাথায় করে রেখেছিলো। কিন্তু বিধানসভার সদস্য হয়েই তিনি নাকি ধরাকে সরা ভাবতে শুরু করেন! আমি ক্ষীণ প্রতিবাদ করার চেষ্টা করে বলি যে, তাদের ধারণা ভুল, হায়াত সাহেব যেমন ছিলেন তেমনই আছেন। বলা বাহুল্য, তাদের প্রকৃত মনোভাব জানার জন্যই আমি হায়াত সাহেবের পক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করি। কিন্তু এর ফলে লোকগুলি রুষ্ট হয়ে ওঠে এবং জানায় যে, হায়াত সাহেবের কথা বলতেও তাদের লজ্জা হয়। তিনি নাকি হাটে বেগুন কিনতে গিয়ে দরদস্তুর করেন না। তিন

আনাই দিয়ে দেন। এবং যিনি বাড়ির গাছের বেগুন খেতেন তাঁর নাকি বর্তমানে এক সের বেগুন না কিনলে চলে না।

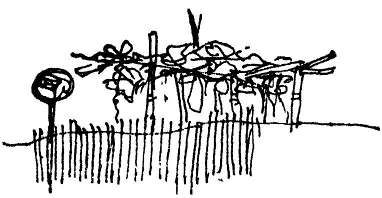
এর পর আমি সমগ্র অঞ্চল সফর করে হায়াত সাহেব সম্পর্কে জনসাধারণের প্রকৃত অভিমত জানবার চেষ্টা করি, এবং জানতে পারি যে শুধুমাত্র এক সের বেগুনের দরদস্তুর না করে কেনার সময় যারা তাঁর আশেপাশে ছিলো তারা ক্রমে ক্রমে হায়াত সাহেবের পরিষ্কার জামা-কাপড়ের দিকেও দৃষ্টি দিতে শুরু করে। এইভাবে নানান গুজব চতুর্দিকের গ্রামগুলিতে ছড়িয়ে দিতে আরম্ভ করে। এবং অনেকের এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে তাঁর সম্পর্কে ধারণা হয় যে বিধানসভার সদস্য হওয়ার ফলে তিনি নিশ্চয় খুব বড়লোক হয়ে গেছেন। অন্যথায় হায়াত সাহেবের মতো একজন দরিদ্র জননেতা এক সের বেগুন কিনবেন কেন, এবং কিনলেও দরদস্তুর না করে তিন আনা দাম কেন দেবেন?

কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে কোনো গুজব রটনা শুরু হলে শেষ পর্যন্ত তা কত সুদূরপ্রসারী ক্ষতিকর হতে পারে পরবর্তী ঘটনাটি থেকেই তা প্রমাণ হবে। হায়াত সাহেব যখন বৎসর দুই আগে প্রাণপণ চেষ্টায় একটি মাতৃসদন প্রতিষ্ঠা করেন সরকার ও সাধারণের সাহায্য নিয়ে, তখন সকলেই বলতে শুরু করে যে তিনি এখান থেকেই দু-পয়সা রোজগার করেছেন।

কিন্তু তাঁর জনকল্যাণ প্রচেষ্টার সম্পূর্ণ কদর্থ করা হয় বৎসরখানেক পূর্বে তিনি যখন রায়মঙ্গলে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে অগ্রণী হন। কারণ, এ অঞ্চলের অধিবাসীরা আরেকটি বিদ্যালয়ের পক্ষপাতী ছিলো বটে, কিন্তু বালিকাদের জন্য নয়।

এ পর্যন্ত হায়াত সাহেবের বিরুদ্ধে গ্রামবাসীদের নানা কাল্পনিক অভিযোগ থাকলেও তাঁর চরিত্রের উপর কেউ কোনো কটাক্ষ করেনি। কিন্তু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা শুনে সকলেই রুষ্ট হয় এবং প্রশ্ন করে যে হায়াত সাহেবের দৃষ্টি হঠাৎ বালিকাদের উপর পড়েছে কেন! ফলে তাদের সুপ্ত আক্রোশ পত্রে-পুষ্পে পল্লবিত হতে শুরু করে এবং হায়াত সাহেবের মতো জননেতাও অল্প দিনের মধ্যেই লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন হন। এ কারণেই সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ যদিও তাঁর মতো অক্লান্ত কর্মী ও একনিষ্ঠ দেশসেবকের শোচনীয় পরাজয়ে স্তম্ভিত ও বিস্মিত হয়েছে তথাপি রায়মঙ্গল কেন্দ্রের জনসাধারণ এই পরাজয়ের প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করতে সমর্থ হয়নি।

[১৩৬৯



জনৈকা নায়িকার মৃত্যু

[কিছু দিন আগে একজন অপরিচিত পাঠক আমাকে একটি দীর্ঘ চিঠি লেখেন। চিঠি নয়, প্রায় গল্পের পাণ্ডুলিপি। তিনি একটি সমস্যার সমাধান চেয়েছিলেন এই গল্পটি পাঠিয়ে। তাঁর প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর দেওয়া হয়তো আমার সাধ্যে নেই, তবু ভদ্রতার খাতিরে তাঁকে নিশ্চয় রচনাটি ফেরত পাঠানো উচিত ছিলো। কিন্তু সে পথ তিনি নিজেই বন্ধ করে রেখেছেন, অসতর্কতাবশত চিঠির কোথাও তিনি তাঁর ঠিকানার উল্লেখ করেননি। কিছু দিন তাই অপেক্ষা করেছিলাম, ভেবেছিলাম উত্তর না পেয়ে তিনি আবার চিঠি দেবেন। কিন্তু, কি কারণে জানি না, তিনি এখনো সম্পূর্ণ নীরব হয়েই আছেন। তাঁর কাছে ফেরত পাঠানোর অন্য পথ

খুঁজে না পেয়ে তাই চিঠিটি, কিংবা পাণ্ডুলিপিও বলা চলে, এখানে অবিকল ছেপে দিলাম।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আমার এই দীর্ঘ চিঠিখানি পেয়ে আপনি হয়তো বিস্মিত হবেন। বিস্মিত হবারই কথা। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি আপনাকে আমার জীবনের কাহিনী নিয়ে উপন্যাস রচনা করার অনুরোধ জানাচ্ছি না। আমি লেখক নই, তবু এমন একটি ব্যথা আমার বুকের মধ্যে পুষে রেখেছি যাকে মুক্তি না দিয়ে স্বস্তি নেই। কিন্তু আমার এই তুচ্ছ গল্পটিকে কোথায় শেষ করবো, কোথায় শুরু করবো এ কাহিনী আমি খুঁজে পাচ্ছি না।

এক-একবার মনে হয় এ গল্প এখনো শেষ হয়নি, কখনো বা সন্দেহ হয়, অনেক কাল আগেই এ গল্প শেষ হয়ে গেছে। সে দিকটা বিচার করার ভার দিয়ে আপনাকে বিব্রত করবো না। শুধু অনুরোধ করবো, গল্পটি কোথায় শুরু ও কোথায় শেষ হওয়া উচিত সেটুকু জানিয়ে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করবেন!

প্রথমেই জানিয়ে রাখি রানী মেয়েটাকে নিয়ে আমার গল্প। এবং সে একটি গ্রাম্য মেয়ে।

বাবা ছাত্রবৃত্তি পাস করে সেই যে গ্রাম ছেড়েছিলেন, তারপর আর বড় একটা ঘরমুখো হননি। চিরকাল এই কোলকাতা শহরেই কাটিয়ে দিয়েছেন। ছোটকাকা ও মেজকাকা মাঝে মাঝে দেখা করতে এসেছেন, খুড়তুতো ভাইবোনেরাও। কিন্তু আমাদের ভাগ্যে গ্রামের বাড়িতে যাওয়া হয়ে উঠতো না। একবার শুধু খুব ছোটবেলায় ঠাকুরদার শ্রাদ্ধে মধুকুলিতে গিয়েছিলাম। হ্যাঁ, আমাদের গ্রামের নামটা বেশ মিষ্টি—মধুকুলি। কিন্তু লোকের মুখে তার নাম হয়ে গেছে 'মাৎকুল'।

যখনকার কথা বলছি তখন আমার বয়স ষোল, এ গল্পের নায়িকার বয়স—বোধ হয় পনরো।

কিন্তু তার সম্পর্কে পরে বলবো, ঘটনাচক্রে তার সঙ্গে কিভাবে দেখা হলো সেটাই আগে বলি।

আমার দিদির তখন ভীষণ অসুখ, দুশ্চিন্তায় কারো চোখে ঘুম নেই, দিনরাত বড় বড় ডাক্তার আসা-যাওয়া করছে। সকলেরই ধারণা, যন্ত্রণা দু-এক দিনের মধ্যে না কমলে অপারেশন করতে হবে।

এমন সময় ছোটকাকার হাতে লেখা একখানা চিঠি, আর একটা ছাপানো নিমন্ত্রণপত্র এসে হাজির হলো। নিমন্ত্রণপত্রের নীচে বাবার নাম ছাপা।

আপনি জানেন, একান্নবর্তী পরিবারে বড় ভাইয়ের অথবা জ্যেষ্ঠতম ব্যক্তির নামে চিঠি দেওয়ার রীতি আছে। অথচ অনেক ক্ষেত্রে তার পরামর্শ নেওয়া দূরের কথা, খবরটাও যথাসময়ে তাকে দেওয়া হয় না। তাই আমরা আগে থেকে কিছুই জানতে পারিনি।

ছোটকাকার মেয়ে বিনুর বিয়ে যে এত তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে আমরা ভাবতেই পারিনি। ছোটকাকা লিখেছিলেন, মেয়ের বিয়ে ঠিক করা কি যে ঝঞ্ঝাট তা তো জানো, হঠাৎ ব্যবস্থা হয়ে গেল, তাই খবর দিতে পারিনি আগে থেকে। তোমরা চিঠি পেয়েই চলে এসো।

বাবা চিঠি পেয়ে খুশী হলেন, মা তাঁর নিজের মেয়ের বিয়ের ভাবনায় ভাবিত হলো, এবং তারপর বাবা-মা দুজনেই দিদির অসুখের কথা নিয়ে আলোচনা করলো।

মা বললে, ছোট ঠাকুরপো হয়তো রাগ করবে, কিন্তু জানে না তো কি ঝঞ্ঝাটে দিন কাটছে আমাদের! আর আমাকে দেখতে পেয়ে বাবা বললেন, এ সময় একজনকে যেতেই হয়। অবু, তুই চলে যা...

মা আর ছোট বোন এক ফাঁকে একদিন দোকানে গিয়ে একখানা ভালো শাড়ি কিনে আনলো। ছোটকাকার মেয়ে বিনুর বিয়েতে দেবার জন্যে। তারপর স্যুটকেস গুছিয়ে দিলো, ছোটকাকীমাকে কি বলতে হবে, মেজকাকা যেন রাগ না করেন ইত্যাদি প্রায় পাখি পড়িয়ে আমাকে রওনা করে দিলো।

আগেই বলেছি, আমার বয়স তখন ষোল। আর তখনকার দিনে আজকালকার ছেলেদের মতো আমরা অত চালাক-চতুর যে হতাম না, আপনিও নিশ্চয় বিশ্বাস করবেন!

যাই হোক, দুবার ট্রেন বদলে, ভিড়ে-ভরা মফস্বলী বাসে আধ ঘণ্টা ধকল সহ্য করে এক-সময় আমি মধুকুলি যাবার রাস্তার মোড়ে নেমে পড়লাম।

বাস থেকে আরো জনকয়েক নামলো। এক গেঁয়ো ভদ্রলোক, দুটি ঘোমটা-টানা বউ, একটি সস্তা ছিটের ফ্রক পরা মেয়ে, আর দুটো হাফ-প্যাণ্ট পরা বাচ্চা।

পথের ধারে একটা খড়-বোঝাই গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিলো। আর ছই-দেওয়া দুখানা গরুর গাড়ি। গরু দু জোড়া একটু দূরে খড় চিবোচ্ছিলো। আর ছই-দেওয়া গাড়ি দুটো তাই ফড়িং-এর মতো ল্যাজ তুলে দাঁড়িয়ে ছিলো।

বাসে আসতেই বেশ ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা বাতাস এসে লাগছিলো। বাস থেকে নেমে দেখি কি পশ্চিম দিকের আকাশে ঘন কালো মেঘ থমথম করছে। বেশ বুঝতে পারলাম, বাড়ি পেঁছিতে পেঁছিতে বৃষ্টি এসে পড়তে পারে।

বাস থেকে যারা নামলো তারাও হয়তো ছোটকাকার মেয়ের বিয়েতেই চলেছে, কোনো আত্মীয়স্বজন হবে হয়তো, এমন সন্দেহ যে না হয়েছিলো তা নয়। তবু তা জিগ্যেস করতে কেমন লজ্জা হলো।

যারা গাড়ি নিয়ে এসেছিলো, সেই মুনিষ দুটো জিনিসপত্র ধরাধরি করে তুললো ছই-দেওয়া গাড়ি দুটোয়। আর তারই ফাঁকে আমাকে জিগ্যেস করলো, কোথায় যাবো, কোত্থেকে আসছি ইত্যাদি। আমি এড়িয়ে গিয়ে ততক্ষণে আলপথ ধরে মাঠের মধ্যে নেমে পড়েছি। হাতে স্যুটকেস।

মধুকুলি গ্রামটা বাস-রাস্তা থেকে দেখা যায়! অর্থাৎ পাশাপাশি তিন-চারটি গ্রামের প্রত্যেকটির গাছপালা, টিনের ছাদ, খড়ের পালুইয়ের মাথা দেখে বুঝতে পারতাম মধুকুলি কোন্‌টা। কিন্তু এতকাল পরে একা-একা চলেছি বলেই কেমন ভয়-ভয় করতে লাগলো।

ঠিক পথ চিনে যেতে পারবো তো! বৃষ্টি এসে পড়ার আগে গিয়ে পেঁছিতে পারবো তো!

যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই হলো। প্রায় আধখানা রাস্তা মেরে এনেছি, হঠাৎ ঠাণ্ডা বাতাসটা ঝড়ের বেগে এগিয়ে এলো।

বিকেল পাঁচটা কি সাড়ে পাঁচটা তখন, জষ্টি মাস, হিসেবমতো সন্ধ্যের আগেই পেঁছে যাওয়ার কথা। কিন্তু মেঘের দাপটে চারিদিক অন্ধকার হয়ে আসতে লাগলো।

হঠাৎ চোখ পড়লো ক্যানালের ওপারে বৃষ্টি নেমেছে। সে যে কি অপূর্ব দৃশ্য বলে বোঝাতে পারবো না। কোলকাতায় ও দৃশ্য দেখা যায় না। একটা মাঠের মাঝখানে আপনি দাঁড়িয়ে আছেন, আপনার পিছনে সব শুকনো খটখটে। দিব্যি আলো রয়েছে, আর সামনে কিছু দূর থেকে সব অন্ধকার। আকাশের আধখানা রাত, আর আধখানা ঝকঝকে দিন। এ-দিকে বৃষ্টি নেই, ওদিকে যত দূর চোখ যায় ঝমঝম বৃষ্টি।

জানি না, আপনি হয়তো বলবেন, নায়িকাকে এখনো উপস্থিত করছি না কেন, এসব প্রাকৃতিক বর্ণনা ধৈর্য ধরে কে পড়বে! কিন্তু মুশকিল কি জানেন, রান্বীর কথা মনে পড়লেই, সেদিনের এই পরিবেশটাও আমার মনে পড়ে যায়। তা ছাড়া তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হওয়া মুহূর্তটির সঙ্গে এই প্রচণ্ড বৃষ্টিরও কিছুটা সম্পর্ক আছে।

যাই হোক, আমি আগে যে দৃশ্যটির উল্লেখ করেছি সে দৃশ্য বেশীক্ষণ উপভোগ করতে হলো না। দেখতে দেখতে সাইক্লোনের বেগে বৃষ্টিটা এগিয়ে এলো।

আমি ছুটতে ছুটতে গিয়ে একটা আমগাছের তলায় দাঁড়ালাম। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই মনে হলো, গাছতলায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজে লাভ নেই।

সারা শরীর তখন আমার ভিজে গেছে, স্যুটকেসটাও। কোনো উপায় না দেখে মাথার ওপর স্যুটকেসটা ধরে, ধুতির ভিজে কোঁচাটা কোমরে গুঁজে ছুটতে শুরু করলাম।

কাদায় পা ডুবে যাচ্ছে থেকে থেকে, পামশুর ভেতর কাদা, ধুতিতে কাদার দাগ—সে এক বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার। সারা শরীর বেয়ে জল ঝরছে, ভিজে চুলে মাথা ভারি হয়ে আছে, শার্টের আস্তিনেও কখন কাদা লেগেছে।

এই চেহারা নিয়েই গ্রামে পেঁছিলাম অঝোরধারা বৃষ্টির মধ্যে। কিন্তু ভিতর-বাড়িতে ঢুকতে লজ্জা।

যাই হোক, কোনোরকমে ভিতর-বাড়িতে ঢুকলাম এবং তারপর পশ্চিমদুয়ারী ঘরখানার

দাওয়ায় ছোটকাকা ও বিনুকে দেখতে পেয়ে বোকার মতো হাসতে হাসতে ছুটে গিয়ে দাওয়ায় উঠে পড়লাম।

গামছা একখানা চার ভাঁজ করে মাথায় ফেলে ছোটকাকীমা রান্নাঘর থেকে ছুটতে ছুটতে এলো বৃষ্টির মধ্যেই।—ছি ছি ছি, কি অবস্থা ছেলের। গামছা দিয়ে মাথা মুছিয়ে দিতে দিতে বললে, হ্যাঁ রে, একটা খবর দিয়ে আসতে হয় তো, গাড়ি পাঠাতাম তা হলে।

ছোটকাকা বললে, জামাকাপড় ছেড়ে ফেল শিগগির।

বিনু একটা ধুতি নিয়ে এসে দাঁড়ালো।

আমি সবে ভিজে শার্টটা খুলেছি, আর সঙ্গে সঙ্গে হাসির শব্দে দক্ষিণদুয়ারী ঘর-খানার দিকে তাকালাম। আর সেই মুহূর্তেই নায়িকার সঙ্গে চারিচক্ষুর মিলন হলো। মেয়েটিকে দেখে চিনতে পারলাম না, শুধু মুখের আদল দেখে বুঝলাম পাশে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটির মা।

মেয়েটি তখনো মুখে রুমাল চাপা দিয়ে হাসছে।

হ্যাঁ, হাতে তার রুমাল ছিলো আমার স্পষ্ট মনে আছে। আর গ্রাম্য মেয়ে বলতে মেয়েটির যে চেহারা আপনি কল্পনা করছেন তেমন নয়। দেখেছেন নিশ্চয়, গ্রামের পরিবেশেও হঠাৎ এমন এক-একটি মেয়েকে দেখা যায় যাদের গ্রামের পরিবেশে একেবারেই মানায় না। হাবভাব, কথাবার্তা, পোশাক-পরিচ্ছদ—এমন কি শাড়ি পরার রীতিটাও মনে হয় রীতিমতো শহুরে।

এ মেয়েটির মুখে-চোখেও তেমনি একটা ছাপ ছিলো। চোখ ফিরিয়ে নেওয়া যায় না এমন রূপ। পনরো বছরের সেই কিশোরী রূপের বর্ণনা দিয়ে ধৈর্যচ্যুতি ঘটাবো না। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে তার ফর্সা রঙ, টিকোলো নাক, সুপুষ্ট বেণী, কপালে বিন্দির টিপ, শাড়ির ডিজাইন এবং শাড়ি পরার ধরন থেকে শুরু করে তার চোখের চটুল চাউনি পর্যন্ত কোনোটাই গ্রাম্য ছিলো না। তাই আমার প্রথমটা ধারণা হয়েছিলো, ওরাও কোল-কাতার বাসিন্দে, এই বিয়ে উপলক্ষে এসেছে।

অবশ্য এত সব আমি সেই মুহূর্তে লক্ষ করিনি। কারণ তাকে হেসে কুটিকুটি হতে দেখে আমি রীতিমতো লজ্জিত হয়ে পড়েছিলাম।

বিনুর হাত থেকে ধুতিখানা নিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকতে যাওয়ার আগে আরেকবার ফিরে তাকাতেই দেখলাম, মা মেয়েকে ধমক দিচ্ছে হাসিমুখে, আর ধমক শুনেও মেয়েটি হাসছে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে।

তখনো অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়ছিলো, তাই নিশ্চিন্ত ছিলাম, ও নিশ্চয় হাসির চাবুক নিয়ে আমার কাছ অবধি ধাওয়া করবে না।

এদিকে এতখানি বৃষ্টিতে ভিজে ছোটাছুটি করে এসেছি, তাই কাপড় বদলানোর একটু পর থেকেই ক্লান্তি লাগছিলো। ছোটকাকীমা ভিজতে ভিজতে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল চা বানাতে। আমি শুয়ে পড়লাম খাটের ওপর। বিছানায় শুয়ে থাকতে থাকতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না।

ঘুম ভাঙলো বিনুর ডাকে।

ও বললে, অবুদা, ওঠো, খাবে চলো।

আমি উঠে এসে দাওয়ায় বসে—আমাদের ওদিকে বলে পিঁড়ে, সেখানে বসে গাড়ুর জলে মুখ-চোখ ধুলাম। বিনু তখনো হারিকেন-হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

এক ফাঁকে হঠাৎ একবার দক্ষিণদুয়ারী ঘরখানার দিকে আমি তাকালাম, আর সঙ্গে সঙ্গে বিনুর মুখে একটা ফাজিল হাসি উঁকি দিয়েই দপ্ করে নিবে গেল।

মজা এই, সেই সুন্দরমতো মেয়েটির সঙ্গে চোখোচোখি হবার ভয়ও রয়েছে তখন, আবার দেখার ইচ্ছেও।

তাকে দেখতে না পেয়ে নিশ্চিন্ত হলাম কি! জানি না।

বিনু হারিকেন-লণ্ঠন ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলো, আর আমি তার পিছনে পিছনে মরাইতলার পাশ দিয়ে রান্নাবাড়িতে এসে উঠলাম।

ছোটকাকা, মেজকাকা, আরো কে কে তখন খেতে বসেছে।

আমি বসতে যাচ্ছি। মেজকাকীমা ডাকলে, অবু, শোন এদিকে।

ভিতরের দিকে দু পা এগোতেই উননের জ্বলন্ত কাঠের গনগনে আগুনের আভায় সেই মেয়েটিকে আবার দেখতে পেলাম।

মেয়েটির মা বললেন, চিনতে পারছো?

আমি তাঁর পায়ে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করলাম।

মেজকাকীমা বুঝতে পেরে বললেন, কত ছোটবেলায় দেখেছিস, চিনবি কি করে।

বলে কি একটা পরিচয় দিলেন। সেটা এতই জটিল, আমার পিসীমার সম্পর্কে কি যেন হয়...আমি ভালো বুঝতে পারলাম না।

তাই হাসতে হাসতে বললেন, হ্যাঁ রে, রানীকেও চিনতে পারছিস না? কত ভাব ছিলো তোদের দুটিতে!

আমি আকাশ-পাতাল ভেবেও মনে আনতে পারলাম না। কিন্তু ছোটবেলায় এসে কবে ওদের গ্রামের বাড়িতে দু দিন ছিলাম, সেই ইতিহাস শুনে নিজেরই ভালো লাগলো।

এবং সেই ইতিহাসই আমাদের দুজনকে ঘনিষ্ঠ করে দিলো।

পরের দিন সকাল থেকেই রানীর মুখে শুধু অবুদা আর অবুদা। সদাসর্বদাই ও আমার কাছে কাছে ঘুরতে লাগলো।

রানীর স্বভাবটা ছিলো এমনিতেই মিষ্টি আর মিশুকে। আর সব সময়েই মুখে কৌতুকের হাসি লেগে আছে। যত তুচ্ছ ব্যাপারই ঘটুক না, রানী যেন এক দণ্ড না হেসে পারে না।

আর দুষ্টুমিরও ওর অন্ত ছিলো না।

আত্মীয়স্বজনরা সব একে একে আসছে। গ্রামের বিয়েবাড়ি তো কোলকাতার মতো নয় যে যথাসময়ে এসে নেমন্তন্ন খেয়ে উপহার দিয়ে তাড়াতাড়ি কেটে পড়বে! যারাই আসে দু-পাঁচ দিন থেকে যায়।

তাই সকালের দিকেই ছোটকাকীমা রানীকে ডেকে বললেন, পান সাজ দিকিনি, কত লোক খাবে দুপুরে, তাদের পান দিতে হবে না!

রানী কোমরে আঁচল জড়িয়ে নিয়ে পানের বাটার সামনে বসলো।

তারপর এক ফাঁকে দেখতে পেয়েই ডাকলে, এই অবুদা, সুপুরি কেটে দিয়ে যাও তো। বলে জাঁতি আর সুপুরি এগিয়ে দিলে।

আমি সুপুরি কাটতে গিয়ে গলদ্ঘর্ম হলাম। বললাম, জাঁতিতে ধার নেই।

আর সঙ্গে সঙ্গে খিলখিল করে হেসে উঠে চুনের ভাঁড়ে আঙুল ডুবিয়ে ও আমার গালে লেপে দিলো। বললে, ছি ছি, একটা সুপুরি কাটতে পারো না? কালি থাকলে আরেক গালে দিয়ে দিতাম।

আমি রেগে গিয়ে ওর শাড়ির আঁচলে চুনটা মুছতে গেলাম। ও আঁচলটা কেড়ে নিতে গেল আমার হাত থেকে। ধস্তাধস্তি হলো হাসাহাসির মধ্যে, আর সেই মুহূর্তে যৌবনের একটা বিচিত্র অনুভূতির দ্বার যেন হঠাৎ আমার সামনে মুক্ত হয়ে গেল।

কি একটা নেশায় পেয়ে বসলো আমাকে, সেখান থেকে উঠে যেতে ইচ্ছে হলো না। বললাম, দাও তো আরেকবার সুপুরি আর জাঁতি। কেটে দিচ্ছি।

—না মশাই, না। শুধু আপনাকে পরীক্ষা করছিলাম। এই বলে রানী দেখিয়ে দিলো ঠোঙার মধ্যে সের পাঁচেক কাটা সুপুরি আছে।

তারপর ওর আশেপাশের বাচ্চা-বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলোকে একবার দেখে নিয়ে বললে, মেয়েদের এখানে তুমি বসে আছো কেন, যাও এখান থেকে।

আমি হাসতে হাসতে উঠে পালিয়ে এলাম। বুঝলাম, ও ভীষণ লজ্জা পেয়েছে।

এই ঘটনাটির যথাযথ বর্ণনা দিলাম বটে, কিন্তু আমার মনেও একটা সঙ্কোচ রয়েছে। আপনি হয়তো বলবেন, এ ধরনের ছেলেমানুষী কাণ্ড আজকের দিনের প্রেমের গল্পে অচল! আমি নিজেও সে বিষয়ে একমত। এটি লেখার সময় বাদ দেবো কি না ভেবে দেখেছি। কিন্তু জীবনের সত্যকার অভিজ্ঞতাকে বাদ দিয়ে বানানো গল্প না লিখলেই কি তা সাহিত্যপদবাচ্য হয় না?

যাই হোক, এইভাবেই আমরা দুজনে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠছিলাম। এবং আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলাম ছোট্ট একটি রসিকতায়।

সেদিন দুপুরের দিকে আমি খাটে শুয়ে ঘুমোচ্ছিলাম। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, দেখলাম ঘামে সারা শরীর ভিজে গেছে। ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে।

বিনুর কাছ থেকে এক গ্লাস জল চাইতে যাবো, দেখলাম নীচে মাদুরের উপর বসে ছোটকাকীমা, রানী আর রানীর মা গল্প করছেন।

আমি বিনুর নাম ধরে ডাক দিতেই ছোটকাকীমা বললেন, কেন রে?

—জল খাবো।

রানী চট করে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আমি এনে দিচ্ছি।

জল দিয়ে রানী চলে যাচ্ছিলো, আমি হাতপাখাটা চাইলাম।

ছোটকাকীমা হাসি চেপে বললেন, যাও না রানী, একটু বাতাস করো না অবুদাকে। কোলকাতার মানুষ, এত গরম কি সহ্য হয়।

রানী বললে, বয়ে গেছে পাখা করতে। বলে পাখাটা ছুঁড়ে দিলে আমার দিকে।

আর পাখা নাড়তে নাড়তে আমার আবার তন্দ্রার মতো এসেছিলো। হঠাৎ হাসির শব্দে কান পাতলাম।

ছোটকাকীমা বললেন, তা মন্দ হয় না, অবুর সঙ্গে রানীর বিয়েটাও দিয়ে দিলে হয়।

চোখ না খুলেও বেশ বুঝতে পারলাম রানী রাগ করে উঠে গেল। আর রানীর মা হাসতে হাসতে বললেন, অত লজ্জা পেতে হবে না রে, অবুর বাবা এক কাঁড়ি টাকা না নিয়ে তোকে নেবে না।

কথাগুলো যে আমার কানে গেছে রানী জানতো না। তাই বিকেলে যখন আমার মুখ থেকেই শুনলো তখন ওর কান লজ্জায় লাল হয়ে গেল।

আমি বোধ হয় কিছু একটা খুঁজে দিতে বলেছিলাম ওকে।

ও বললে, কেন, আমি তোমার কে যে সব কাজ আমাকে বলছো।

আমি বললাম, হও না কিছুই, কিন্তু হতেও তো পারো!

দুপুরের রসিকতাটার উল্লেখ করতেই ও ভীষণ লজ্জা পেলো।

কিন্তু তারপর থেকেই ও আমার রীতিমতো ভক্ত হয়ে পড়লো। যখন যা দরকার হয় হাতের কাছে এগিয়ে দেয়। ঘুম ভাঙতেই চায়ের পেয়ালা নিয়ে হাজির হয়, গামছা কি তেল চাইলে ছুটে গিয়ে নিয়ে আসে, খাওয়ার পর সুপুরি আর লবঙ্গ।

আর সদাসর্বদাই, পরস্পর থেকে যত দূরেই থাকি না কেন, চোখে চোখে কথা চলে।

বিয়ের রাতেও যখন রসগোল্লার হাঁড়ি ছোটকাকাকে দিতে নিয়ে যাচ্ছিলো, হঠাৎ আমাকে সামনে দেখে থামলো, হাসতে হাসতে একটা রসগোল্লা নিয়ে বললে, হাঁ করো।

আমি হাঁ করতেই ও একটা রসগোল্লা মুখের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়ে বললে, কি করলাম জানো তো?

—কি?

রানী হেসে বললে, মরার সময় দেখা হবে না।

আমি বললাম, সে তো পান খাওয়ালে হয়।

ও হাসতে হাসতে বললে, পান কেন, বউ কিছু খাইয়ে দিলেই হয়।

বলেই পালালো।

লিখতে লিখতে আমার নিজেরই লজ্জা হচ্ছে। আপনি হয়তো বলবেন, আজকাল এসব কৈশোরের প্রেম, বিশেষ করে শরৎচন্দ্রের ভঙ্গিতে লেখা গল্প কেউ পড়তে চাইবে না। সমালোচকরা খড়্গহস্ত হয়ে উঠবেন। কিন্তু আপনাকে আমি প্রথমেই তো জানিয়ে রেখেছি আমি সাহিত্যিক নই, সাহিত্যিক হতেও চাই না। আর গল্পের উৎকর্ষ বিচার করে এসব ঘটনাই যদি বদলাতে হয় তা হলে আমার এ গল্প লেখার যে কোনো সার্থকতাই থাকে না।

তাই আপনাকে আমি বাকীটুকুও ধৈর্য ধরে পড়তে অনুরোধ করছি।

সংক্ষেপেই বলছি।

এত ফুর্তি, এত আনন্দ সব মাটি হয়ে গেল বিয়ের রাত্তিরেই। কারণ সেদিনই ছোটকাকার নামে বাবার চিঠি এলো, দিদির অবস্থা খুব খারাপ, বিয়ের পরের দিনই আমি যেন ফিরে যাই।

রানীর মা খবর শুনে বললেন, ভেবেছিলাম তোমাকে এখান থেকে আমাদের গাঁয়ে নিয়ে যাবো।

ছোটকাকীমা বললেন, বিনু শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরে আসা অবধি থাকবি ভেবেছিলাম।

আর বিয়ের রাতের হই-হট্টগোলের মধ্যে রানী একসময় চোখের ইশারায় ডেকে নিয়ে গেল মরাইতলার পাশের নির্জন জায়গাটিতে।

আমার হাতে হাত রেখে বললে, অবুদা, তুমি নাকি কালই চলে যাবে?

আমি কোনো উত্তর দিতে পারলাম না। বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠলো। চোখ ঠেলে জল এলো। বিচ্ছেদ যদি এত তাড়াতাড়ি আসবে তো এত কাছে আসার কি প্রয়োজন ছিলো।

আমার বুকের মধ্যে একটা ভীষণ তোলপাড় চলছে তখন। আর মুখ তুলে আমার মুখের দিকে রানী তাকিয়ে আছে যেন কি শোনবার আশায়। ও তখন অনর্গল কি সব বলে চলেছে, কিন্তু আমার কানে একটা কথাও গেল না।

আমি শুধু দেখলাম, ওর দু চোখ, দুটি করুণ বিষণ্ণ বড় বড় চোখ জলে ভাসছে।

আমি বললাম, আবার আসবো, যাবো তোমাদের বাড়ি।

—যাবে? সত্যি বলছো? আশার চোখ মেলে তাকালো ও। যেন বিশ্বাস করলো আমার কথা।

আমি নিজেও হয়তো বিশ্বাস করেছিলাম।

আর পরের দিন স্যুটকেস হাতে নিয়ে যখন বাস-রাস্তার দিকে হেঁটে চলেছি, তখন যতক্ষণ চোখ যায় ফিরে ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, পুকুরের পাড়ে রানী দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে আছে।

আমি ভেবেছিলাম, কোনো দিন না কোনো দিন আবার ওর সঙ্গে দেখা হওয়ার সুযোগ মিলবে। ভেবেছিলাম, হঠাৎ একদিন কিছু একটা অজুহাতে ওদের গ্রামে গিয়ে হাজির হবো।

যখনই ছোটখাট ছুটি পেয়েছি, ইচ্ছে হয়েছে মধুকুলিতে ছুটে যাই। কত কি কল্পনা করেছি, মধুকুলিতে যেতেই রানীর মা নেমন্তন্ন করে ডেকে নিয়ে গেছেন। পরীক্ষার পড়ায় মাথা ডুবিয়ে কত দিন রানীর স্বপ্ন দেখেছি। ইস্কুল থেকে আপিস। কত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে হঠাৎ কোনো দিন থমকে দাঁড়িয়েছি রানীকে দেখতে পাবার আশায়।

কিন্তু সত্যি সত্যিই তেমন সুযোগ এলো না, তেমন সাহস হলো না।

তবু মাঝে মাঝে যখন কারো কাছে ওর খবর পেতাম, মনটা ফিরে যেতো বিনুর বিয়ের দিন কটিতে। অসহ্য একটা ব্যথা অনুভব করতাম. অসম্ভব কিছু কিছু স্বপ্ন দেখতাম।

আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে কেউ হঠাৎ এসে বলতো, রানীকে মনে আছে তোর, রূপনারানপুরের পিসীমার মেয়ে রানী? সে তোর কথা জিগ্যেস করছিলো।

সে কথা শুনে সমস্ত দেহে-মনে রোমাঞ্চ জাগতো।

কেউ বা খবর দিতো, রূপনারানপুরের পিসীমার মেয়ে রানী কি মোটা হয়েছে, খুব সুন্দর দেখতে লাগলো।

আবার কখনো।—স্টেশনে দেখা হলো, মামাবাড়ি গিয়েছিলো। চেনাই যায় না এত রোগা হয়ে গেছে।

এক-একটা ছোট খবরে এক-একটা বছর পার হয়ে যেতো।

বছরের পর বছর কেটে গেছে পরের মুখে শোনা খবরে। মাঝে মাঝে দুঃখ হতো, আহা, অমন সুন্দর মেয়েটা কিনা অসুখে অসুখে রোগা হয়ে গেছে। কিংবা মোটা হয়ে গেছে এত, দেখলে চিনতে পারবো তো!

রানীকে আর একটিবার দেখার জন্যে, দেখা পাওয়ার জন্যে আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠতাম। কিন্তু দেখা হওয়ার কোনো উপায়ই ছিলো না। কারণ, তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা ছিলো অত্যন্ত ক্ষীণ, অনেকখানি দূরের। আর আমার বয়সটাও ইতিমধ্যে এমন জায়গায় এসে ঠেকে-ছিলো, যে বয়সে তার সঙ্গে দেখা হলেও আর সেই পুরোনো দিনের মতো ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পেতাম না।

ঠিক এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন খবর এলো, রানীর বিয়ে হয়ে গেছে। খুব ভালো পাত্রে।

শুনে মনটা একবার খুশিতে ভরে উঠেছিলো। আবার দুঃখও যে পাইনি এমন নয়।

একটা মিথ্যে আশার আলো যেন হঠাৎ ফিউজ হয়ে গেল।

তারপর?

এখানেই আমার আসল সমস্যা। এই সমস্যারই সমাধান চেয়ে আপনার কাছে এ চিঠি লিখছি। সত্যি বলতে কি, প্রেমের গল্পে যেমন বিচিত্র সব ঘটনা ঘটে তেমন কিছুই তো আমার জীবনে ঘটেনি। কোনো জটিলতা নেই, তেমন কোনো দীর্ঘশ্বাসও নেই। অথচ আমাদের ভালোবাসা তো মিথ্যে নয়। তা হলে এ গল্প লেখা চলবে না কেন, আপনিই বলুন। আর যদি লিখি কোথায় শেষ করবো এ গল্প! সেই যেদিন বিয়ের রাতে ও আমার হাতে হাত রেখে অনেক কথা বলেছিলো? না, মধুকুলি গ্রাম ছেড়ে চলে আসতে আসতে বারবার ফিরে তাকিয়ে দেখেছিলাম, ও দাঁড়িয়ে আছে?

নাকি ওর বিয়ের খবরে?

অবশ্য এর পরেও একটা তুচ্ছ ঘটনা আছে।

ওর বিয়ের প্রায় পাঁচ-ছ' বছর পরের ঘটনা।

রানীর যেখানে বিয়ে হয়েছিলো তাদের সম্পর্কে একটা আবছা ধারণা ছিলো আমার! তাও লোকমুখে শুনে। গ্রামের নামটাও জানতাম।

নদীয়া জেলার একটি গ্রাম। আর সেই গ্রামেই শুনলাম আমার এক বন্ধুর বিয়ে। নামটা শুনেই বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠলো।

কোলকাতার বাইরে কখনো কোনো বন্ধুর বিয়েতে বরযাত্রী যাওয়ার কথা আমি কল্পনাও করতে পারি না। আর বন্ধুটিও আমার এমন কিছু অন্তরঙ্গ নয়।

তবু, কেন জানি না, বলে বসলাম, বরযাত্রী যাবো।

সে নিজেও কম বিস্মিত হলো না।

সত্যি কথা বলতে কি, রানীর বিয়ের পরেও বহু দিন কল্পনা করেছি, ওর সঙ্গে আবার দেখা হয়েছে। শৈশব-সীমান্তের সেই মধুর দিনগুলির মতোই স্নিগ্ধ হাসিতে আবার উজ্জ্বল হয়েছি আমরা দুজনে।

তাই কেবলই ইচ্ছে হতো রানীকে আরেকবার দেখার। দেখা দেওয়ার। শুধু এইটুকুর মধ্যেই যেন বাকী জীবনের আশ্বাস খুঁজতে চেয়েছিলাম।

যথারীতি অন্য অনেকের সঙ্গে তাই গিয়ে হাজির হলাম সেই গ্রামে। শাঁখ বাজলো, হই-হুল্লোড় হলো, পেট্রোম্যাক্স জ্বললো।

আর আমি যে আশা নিয়ে গিয়েছিলাম সেই আশায় প্রত্যেকের মুখের উপর চোখ বুলিয়ে গেলাম। যদি সেই মুখটিকে আবিষ্কার করতে পারি, যদি সেই মুখ আরেকবার দেখতে পাই।

কথায় কথায় একজনের কাছে রানীর শ্বশুরের নাম বললাম। রানী এখানে আছে কি না প্রশ্ন করলাম। বললাম, আমি তার বাপের বাড়ির দেশের লোক, আত্মীয়।

বেশ কিছুক্ষণ পরে একটি ছেলে এসে আমাকে ডেকে নিয়ে গেল ভিতর-বাড়িতে। বন্ধুরা হাসাহাসি ঠাট্টা করলে।

আর আমি এসে দাঁড়ালাম যেখানে, সেখানে গরদের শাড়ি পরে একজন বৃদ্ধা অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর পাশে আরো জনকয়েক মহিলা। একজন শুধু দাঁড়িয়ে ছিলো বুক পর্যন্ত ঘোমটা টেনে।

বৃদ্ধা সহাস্যে জিগ্যেস করলেন, উমেশের ছেলে তুমি? তুমি তো আমাদের নিজের লোক তা হলে।

সলজ্জ হাসিতে আমি সায় দিলাম।

বৃদ্ধা আবার বললেন, কে এসে বললে তুমি খোঁজ করেছো, তা তোমার নাম শুনে বউমা পরিচয় দিলো। ভাগ্যিস নিজে থেকে খবর পাঠিয়েছিলে তাই দেখা হলো।

বলে বুড়ী অনর্গল অতীতের অনেক কথা বলে গেল।

তারপর ঘোমটার আড়াল থেকে ক্ষীণ কণ্ঠের একটি প্রশ্ন এলো, ভালো আছো?

আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, ভাল্লো।

তারপর একসময় বৃদ্ধা আরো অনেক কথা বললেন। কোনো কথাই আমার কানে গেল না।

আমি তখন ভিতরে ভিতরে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি শুধু একটি মুহূর্তের জন্যে। ঘোমটার আড়ালে মুখখানিকে একবার, এক লহমার জন্যে দেখার নেশায়।

সামনের উঠনে কিছু লোক কাজে ব্যস্ত। তাদেরই কেউ একজন হয়তো রানীর শ্বশুর, ভাশুর, কিংবা স্বামী। নাকি বৃদ্ধা সরে গেলেই ধীরে ধীরে ঘোমটা তুলে মৃদু হাসির অভ্যর্থনা জানাবে ও?

আমি অপেক্ষা করলাম। পায়ের বুড়ো আঙুলের নখে মাটি খুঁড়লাম।

কিন্তু ঘোমটা সরলো না, আর কোনো প্রশ্নও এলো না ঘোমটার আড়াল থেকে।

বৃদ্ধার আরো কিছু অনর্গল কথা শুনে আমি ফিরে এলাম। বিদায়ের সময় বললেন, উমেশকে বোলো পলাশের গাঁয়ের বিন্দু তার কথা জিগ্যেস করছিলো।

বন্ধুরা নানান প্রশ্ন করলো। কোথায় গিয়েছিলাম, কেন গিয়েছিলাম। আমি কোনো প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারলাম না। সমস্ত জীবনের ব্যথা-বেদনা, সমস্ত জীবনের স্বপ্ন দিয়ে যে মুহূর্তটিকে আমি রাঙিয়ে রেখেছিলাম সেই মুহূর্তটি সমস্ত মনপ্রাণকে যে এমন বিস্বাদ করে দিতে পারে কে জানতো!

পরের দিন সকালেই সদলবলে আমরা ফিরে এলাম।

ফিরে এলাম জীবনের সমস্ত আনন্দ আর সুখকে বিসর্জন দিয়ে। একটা প্রচণ্ড হতাশার ব্যথা এঁকে নিয়ে।

তারপর রানীকে ঘিরে, কৈশোরের সেই মধুর স্মৃতিটুকুকে ঘিরে আর কোনো দিন কোনো স্বপ্ন দেখতে পারিনি।

একটি প্রেমের গল্পের যে নায়িকা শুধুই একটা স্বপ্নের মধ্যে বিরাজ করেও ধীরে ধীরে একটি উপন্যাস গড়ে তুলছিলো, মনে হলো, আমার জীবনে সে নায়িকার মৃত্যু ঘটে গেছে।

অনেক গল্প আপনি লিখেছেন, বহু গল্পেই আপনার নায়িকার মৃত্যুও ঘটেছে। কখনো দুঃখে রোগে, কখনো সে আত্মহত্যা করেছে, কখনো দুর্ঘটনায়। আর কখনো তিলে তিলে দগ্ধ হয়ে জীবন বিসর্জন দিয়েছে তারা! কিন্তু একজন নায়িকার এমন মৃত্যু আপনি দেখেছেন কখনো?

আমি জানি না, তুচ্ছ একটা প্রেমের গল্পকে এত দূর টেনে আনা যায় কি না। জানি না, গল্প এখানে শেষ করা সম্ভব কি না। আর সেজন্যেই আপনার শরণ নিতে চাইছি। আপনি খ্যাতিমান লেখক, অনেক গল্প লিখেছেন। গল্প কোথায় শুরু করতে হয়, কোথায় তার শেষ— আপনার তা নখদর্পণে। তাই আপনার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ, আপনার অভিজ্ঞ উপদেশ যেন একটি ব্যর্থ জীবনের জ্বালা মুছে দেওয়ায় সাহায্য করে। নমস্কার ইতি—

অবিনাশ রায়।

[১৩৭০



মৃত-অমৃত

ধরা যাক তাঁর নাম ডাক্তার সোম। অর্থাৎ ডাক্তার সোম তাঁর নাম নয়, এবং কোনো দিন হয়তো এ কাহিনী তিনি নিজেই আরো ভালোভাবে লিখবেন, এই আশাতেই নামটা উপস্থিত গোপন করে যাচ্ছি। শুধু তাঁর নামটাই নয়, যে বিখ্যাত সাহিত্যিকের নাম এ কাহিনীর সঙ্গে জড়িত তাঁর নামটাও। কারণ এ নামটা ডাক্তার সোম নিজেই গোপন করেছিলেন।

গল্পটি শুনেছিলাম এক ঝিরঝিরে বৃষ্টির বিকেলে। সমুদ্রের ধারে কাফেটেরিয়ার বারান্দায় বসে। চোখের সামনে এক সারি ঝাউগাছ, জাল আর জেলে, অশেষ জলতরঙ্গ। লোহার সিকের মতো কালো কঠিন চেহারার দুটি মানুষ দু দিক থেকে একটা বিরাট জাল টেনে তুলছে। জালের মধ্যে ইলিশই হয়তো—রুপোলী চিকচিক মাছের উঁকিঝুঁকি।

আর ঝিরঝিরে বৃষ্টি। বালির ওপর, ঝাউয়ের পাতায়, সমুদ্রের নরম তরঙ্গে।

বাইরে যাবার উপায় নেই বলেই আমরা ক'জন বেতচেয়ার টেনে নিয়ে কাফেটেরিয়ার বারান্দায় বসে ছিলাম। আমি, অনিলেন্দু, অনিলেন্দুর স্ত্রী গীতালি, আর ডাক্তার সোম। আমাদের সকলেরই মুখে-চোখে তখনো বিমর্ষতার আচ্ছাদন। প্রিয়জনবিয়োগের একটা দুঃসহ ভার বুকে চেপে আছে। আর ডাক্তার সোম কেমন যেন অসহায় বোধ করছেন।

কারণ, তিনি বেশ বুঝতে পারছেন, তাঁর ওপরই আমরা ভরসা করেছিলাম। কি আশ্চর্য, একটা সপ্তাহ আগে, যেদিন আমরা এখানে প্রথম এসে উঠেছিলাম, সেদিনও আমরা চারজন মানুষই, এখানে, এই বেতচেয়ারে, এই কাফেটেরিয়ার বারান্দায়, এমনিভাবেই বসেছিলাম, গল্প করেছিলাম, আর—না, সেদিন হেসেছিলাম, হাসিয়েছিলাম। আর আজ?

ডাক্তার সোম দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। গীতালি কি একটা বলতে গেল, পারলো না। ওর চোখ ছলছল করে উঠলো।

ডাক্তার সোম গীতালির মুখের দিকে তাকালেন, আমার মুখের দিকে, অনিলেন্দুর মুখের দিকে, তারপর চোখ নামালেন।

নিজের মনকেই যেন প্রবোধ দেবার জন্যে বললেন, আমরা কতটুকুই বা পারি!

আমরা কেউ কোনো কথা বললাম না। কারণ, পার্থকে আমরা ভুলতে পারছিলাম না। মাত্র এক সপ্তাহ আগে কত উৎফুল্ল আনন্দের হাসি নিয়ে পার্থ এসেছিলো। কত কি স্বপ্ন ছিলো তার। সব এক নিমেষে এভাবে মুছে যেতে পারে আমরা কল্পনাও করতে পারিনি। টেলিগ্রাম পেয়ে ডাক্তার সোম এলেন, এই এত কষ্ট সহ্য করে, এত অসুবিধে ডিঙিয়ে, তারপর, দ্রুত ব্যস্ততার পায়ে আমাদের আগে আগে এসে ঢুকলেন পার্থর ঘরটিতে। দেখলেন, পরীক্ষা করলেন, চেষ্টার ত্রুটি ছিলো না, তবু, তবু একসময় উদ্‌ভ্রান্ত্ দৃষ্টি মেলে ঐ সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন। সে কি আমাদেরই উৎকণ্ঠ প্রশ্নের উত্তর? নাকি তাঁর নিজের মনকেই জবাব দিলেন!

জানি না। শুধু জানি, পার্থ আজ সকালেও ছিলো, এখন নেই। শুধু জানি, এই এখানে, সমুদ্রের ধারে, যেখানে আমরা আগে কোনো দিন আসিনি, আর কোনো দিন আসবো কি না কে জানে, সেই সমুদ্রের ধারের ঝড়ো বাতাসের শ্মশানে পার্থর শরীর রেণু রেণু হয়ে উড়ে গেছে। আর কোনো দিন সেই ছাইয়ের রাশি জোড়া লেগে পার্থ হয়ে উঠবে না।

আমরা তাই ডাক্তার সোমের কথা শুনেও চুপ করে রইলাম।

আর ডাক্তার সোম বললেন, এইটেই আমার জীবনের ট্র্যাজেডি।

—এই পার্থ? পার্থর মৃত্যু? আমি বিস্মিত প্রশ্ন করলাম।

ডাক্তার সোম বিষন্ন হাসি হাসলেন।—না, মানুষের মৃত্যু। জানেন, ছেলেবেলায় কি অহংকার ছিলো। মৃত্যু দূর করবো, মানুষকে জীবন দেবো।

একটু থেমে থেকে বললেন, আমার মা বিনা চিকিৎসায় মারা গিয়েছিলেন। আমি তখন ইস্কুলে পড়ি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিলো, আমরা যদি গরিব না হতাম, যদি ভালো ডাক্তার আনতে পারতাম, তা হলে মা বাঁচতো। আমার ডাক্তারি পড়ার পিছনে এইটিই ছিলো একমাত্র প্রেরণা।

আনলেন্দু সান্ত্বনার সুরে বললে, ডাক্তারের হাতও সেই নিয়তির কাছে বাঁধা।

ডাক্তার সোম হাসলেন।—কি জানি, কখনো কখনো সন্দেহ যে না হয় তা নয়। কিংবা আমরা হয়তো জ্ঞানসমুদ্রের উপলখণ্ডটাই কুড়িয়ে পেয়েছি।

আমি বললাম, কিন্তু আপনি যা করেছেন! পার্থর জন্যে, আমাদের জন্যে...

ডাক্তার সোমের কানে গেল না কথাটা। যেন গল্প বলার নেশায় পেয়েছে তাঁকে।

ধীরে ধীরে বললেন, মেসে থাকি তখন, কলেজে পড়ি। আমার পাশের সীটে আমাদের ক্লাসেরই আরেকটি ছেলে...তার নাম আপনারা সবাই জানেন।

বললাম, কে, কে বলুন?

ডাক্তার সোম হাসলেন। বললেন, ধরুন সুমন্ত। কিংবা অন্য কিছু। যে নামে আমি চিনতাম, সে নামে তো আপনারা চিনবেন না।

ডাক্তার সোম চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, রোগা লিকলিকে, কালো আর লম্বা চেহারা। চোখ দুটো বড় বড়।

ও একদিন আমাকে জিগ্যেস করলে, আই এস-সি পাস করে কি করবি?

বললাম, ডাক্তারি পড়বো। রোগ আর মৃত্যু থেকে মানুষকে বাঁচাবো।

শুনে সুমন্ত হেসে উঠলো। বললে, মৃত্যু থেকে?

তখন বিজ্ঞানের, চিকিৎসাশাস্ত্রের ওপর, আর আমার নিজের আদর্শের ওপর অসীম বিশ্বাস। তাই বললাম, হ্যাঁ, মৃত্যু থেকে।

তারপর প্রশ্ন করলাম, তুই কি করবি?

ও বললে, মৃত নিয়ে, অর্ধমৃত নিয়ে তোর কারবার, আমার সাধনা অমৃত নিয়ে।

সতেরো বছরের একটি ছেলের কাছ থেকে এ কথা শুনতে নিশ্চয়ই আরেকটি সতেরো বছরের ছেলের ভালো লাগবার কথা নয়।

তাই বললাম, তুই পাগল।

ও লাজুক-লাজুক হাসলো। ওর চেহারাটা ছিলো প্রায় ছ' ফুট লম্বা, রোগা-রোগার ওপর বেশ আঁটসাঁট, চোখ দুটো বড় বড় কিন্তু ভাসা-ভাসা। অমনি বিরাট চেহারা ছিলো সুমন্তর, কিন্তু ভীষণ লাজুক ছিলো। কিংবা ওর হাসিটাই কেমন লাজুক-লাজুক লাগতো। আর ভীষণ সিগারেট খেতো। হাতটা মুঠো করে প্রায় গাঁজায় টান দেবার ভঙ্গিতে সিগারেট ধরে একটা টান দিলো ও, তারপর ধোঁয়া ছেড়ে রিং করতে করতে বললে, আমি অমৃত সৃষ্টি করবো।

ওর রোগটা আমি জানতাম, তক্তপোশের ওপর টান-টান হয়ে শুয়ে কাগজ-কলম নিয়ে ঘন ঘন করে লিখতেও দেখেছি মাঝে মাঝে, তাই ঠাট্টা করে বললাম, কবি? কবিতা লিখবি?

ও বললে, গড়ে তোলার আগে প্রতিমার চেহারা কেমন হবে আমিই কি জানি?

আমি বললাম, মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে আনাই হবে আমার সাধনা।

খুব গর্ব করে বলেছিলাম সেদিন। তারপর সত্যিই একদিন ডাক্তারি পাস করলাম, ডাক্তার হলাম। আর সত্যিই আমার নিজেরই আশ্চর্য লাগে, অনেক, অনেক মানুষকে আমি মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছি। কিন্তু সুমন্ত যে এভাবে আমার গর্ব চূর্ণ করে দেবে...

ডাক্তার সোম এবার থামলেন। আমি একটা সিগারেট ধরালাম। গীতালি হয়তো এতক্ষণ ডাক্তার সোমের কোনো কথাই শোনেনি, পার্থর কথাই ভাবছিলো। এতক্ষণে ও আঁচলে চোখ মুছলো।

আর ডাক্তার সোম বললেন আমাকে, আপনি, আপনি রিং করতে পারেন?

আমি ধোঁয়া ছেড়ে চেষ্টা করলাম, পারলাম না। ডাক্তার সোম বিষণ্ণ হাসি হাসলেন।—সুমন্ত বড় সুন্দর রিং করতে পারতো।

অনিলেন্দু বললে, আপনি তাঁর গল্পটা শেষ করুন।

ডাক্তার সোম গম্ভীর হলেন।—গল্প? গল্প নয়, জীবনের মস্ত বড় ট্র্যাজেডি।

আমি এদিকে ডাক্তার হিসেবে নাম করেছি, আর সঙ্গে সঙ্গে সুমন্তও নাম করেছে সাহিত্যিক হিসেবে। ওর নাম অনেক বেশী, চতুর্দিকে ওর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে তখন। আর ও যে আমার বন্ধু ছিলো সেটাই আমার গর্ব। ও একদিন সাহিত্যকে বলেছিলো অমৃতের সাধনা। সে কথা আমি বিশ্বাস করলাম।

দু দিন পরেই হয়তো মৃত্যু হতে পারে, যন্ত্রণায় কাতর রোগীকে ওষুধ দিয়েও যাকে আরাম দিতে পারি না, এক-একদিন হঠাৎ হাসপাতালে গিয়ে দেখেছি সে রোগী একখানা বইয়ের পাতায় ডুবে আছে, মুখে প্রশান্ত তৃপ্তি। একদিন একজনের হাত থেকে বইখানা চেয়ে নিয়ে উলটে দেখলাম, সুমন্তর নাম।

না, না, সুমন্ত নয়। বলেছি তো, নামটা আমি গোপন করেছি। যে নামে সে পরিচিত সে নাম বললেই আপনারা ভাববেন বানিয়ে বলছি।

আমরা তিনজনই প্রতিবাদ করে উঠলাম। বললাম, এ কথা আপনি বলবেন না। সাহিত্যিক হিসেবে তিনি যত বড়ই হোন, চিকিৎসক হিসেবে আপনিও কম বিখ্যাত নন।

কথাটা তাঁকে খুশী করার জন্যে বলিনি। খুশী করার জন্যে যে বলিনি তার প্রমাণ, ডাক্তার সোমের আসল নামটা আমি গোপন করেছি।

ডাক্তার সোম কিন্তু আমাদের কথায় খুশী হলেন না।

শুধু বললেন, তারপর বহু দিন ইচ্ছে হয়েছে সুমন্তর সঙ্গে দেখা করার। দেখা হয়ে ওঠেনি। আমার ডাক্তারি শাস্ত্রকে, আমার ছেলেবেলার আদর্শকেও আমি সাহিত্যের চেয়ে খাটো মনে করতে পারিনি। ধনীর বাড়িতেই হোক, আর বস্তিতেই হোক, মরণোন্মুখ একটি রোগীর সামনে গেলেই আজো সারা শরীর কি যেন হয়ে যায়। হয়তো ছেলেবেলার সেই মা মারা যাওয়ার দৃশ্যটা ভিতরে ভিতরে কোনো প্রেরণা দেয়, মানুষটাকে মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে আনার জন্যে পাগল হয়ে উঠি। হয়তো গর্ব, অহংকার, হয়তো মৃত্যুর সঙ্গে রেষারেষি। তখন আমি অন্য মানুষ।

আমরা চুপ করে রইলাম। এ দৃশ্য আমরাও চোখের সামনে দেখেছি, দেখেছি কিভাবে পার্থকে জীবন ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যে ডাক্তার সোম পাগল হয়ে উঠেছিলেন।

ডাক্তার সোম হাসলেন।—দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ যখন একটি মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করি, তখন হয়তো আর সকলের কথা ভুলে যাই, হয়তো অন্য রোগীদের ওপর অবিচার হয়। কিন্তু এ এক অন্য নেশা, অন্য আনন্দ। জানেন, যখন এত চেষ্টার পর, সত্যিই একজনকে ফিরিয়ে আনতে পারি, জীবন ফিরে পেয়ে কৃতজ্ঞ হাসি হেসে কেউ সামনে এসে দাঁড়ায়, বিদায় নেয়, তখন যে আনন্দ পাই, ইচ্ছে ছিলো সুমন্তকে জিগ্যেস করবো, ও ওর সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে কি তার চেয়ে বেশী আনন্দ পায়?

ডাক্তার সোম থামলেন। তারপর বললেন, দেখা এক দিন হয়েছিলো।

—হয়েছিলো? আমরা প্রশ্ন করলাম।

ডাক্তার সোম হাসলেন।—হ্যাঁ। এক দিন নয়, দু দিন।

তারপর, আমরা লক্ষ করলাম, ধীরে ধীরে একটা গভীর দুঃখের, ব্যর্থতার ছায়া যেন তাঁর মুখের ওপর এসে পড়লো।

গলার স্বরও যেন ক্ষীণ হয়ে এলো। ডাক্তার সোম উদাস চোখে একবার সমুদ্রের দিকে তাকালেন। ঝাউগাছ, জাল-জেলে, ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়া সমুদ্রের বুকে যেখানে উত্তাল তরঙ্গকে মনে হচ্ছিলো ফুটন্ত জলের ভুড়ভুড়ি—সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর ঘড়ি দেখলেন।

গীতালি এতক্ষণে বললে, আপনার ট্রেনের এখনো অনেক দেরি।

অনিলেন্দু বললে, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসবো।

আমি বললাম, আমরাও তো এই ট্রেনে চলে যেতে পারতাম।

ডাক্তার সোম কোনো উত্তর দিলেন না। চাপা খসখসে গলায় বললেন, গাড়ি করে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখলাম ওয়েলিংটনের মোড়ে প্রকাণ্ড চেহারার একটি লোক একা নিঃস্বের মতো দাঁড়িয়ে একমনে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে রিং করছে।

তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম। কাছে এগিয়ে গেলাম। সুমন্ত বলেই সন্দেহ

একটু থেমে থেকে বললেন, আমার মা বিনা চিকিৎসায় মারা গিয়েছিলেন। আমি তখন ইস্কুলে পড়ি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিলো, আমরা যদি গরিব না হতাম, যদি ভালো ডাক্তার আনতে পারতাম, তা হলে মা বাঁচতো। আমার ডাক্তারি পড়ার পিছনে এইটিই ছিলো একমাত্র প্রেরণা।

আনলেন্দু সান্ত্বনার সুরে বললে, ডাক্তারের হাতও সেই নিয়তির কাছে বাঁধা।

ডাক্তার সোম হাসলেন।—কি জান, কখনো কখনো সন্দেহ যে না হয় তা নয়। কিংবা আমরা হয়তো জ্ঞানসমুদ্রের উপলখণ্ডটাই কুড়িয়ে পেয়েছি।

আমি বললাম, কিন্তু আপনি যা করেছেন! পার্থর জন্যে, আমাদের জন্যে...

ডাক্তার সোমের কানে গেল না কথাটা। যেন গল্প বলার নেশায় পেয়েছে তাঁকে।

ধীরে ধীরে বললেন, মেসে থাকি তখন, কলেজে পড়ি। আমার পাশের সীটে আমাদের ক্লাসেরই আরেকটি ছেলে...তার নাম আপনারা সবাই জানেন।

বললাম, কে, কে বলুন?

ডাক্তার সোম হাসলেন। বললেন, ধরুন সুমন্ত। কিংবা অন্য কিছু। যে নামে আমি চিনতাম, সে নামে তো আপনারা চিনবেন না।

ডাক্তার সোম চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, রোগা লিকলিকে, কালো আর লম্বা চেহারা। চোখ দুটো বড় বড়।

ও একদিন আমাকে জিগ্যেস করলে, আই এস-সি পাস করে কি করবি?

বললাম, ডাক্তারি পড়বো। রোগ আর মৃত্যু থেকে মানুষকে বাঁচাবো।

শুনে সুমন্ত হেসে উঠলো। বললে, মৃত্যু থেকে?

তখন বিজ্ঞানের, চিকিৎসাশাস্ত্রের ওপর, আর আমার নিজের আদর্শের ওপর অসীম বিশ্বাস। তাই বললাম, হ্যাঁ, মৃত্যু থেকে।

তারপর প্রশ্ন করলাম, তুই কি করবি?

ও বললে, মৃত নিয়ে, অর্ধমৃত নিয়ে তোর কারবার, আমার সাধনা অমৃত নিয়ে।

সতেরো বছরের একটি ছেলের কাছ থেকে এ কথা শুনতে নিশ্চয়ই আরেকটি সতেরো বছরের ছেলের ভালো লাগবার কথা নয়।

তাই বললাম, তুই পাগল।

ও লাজুক-লাজুক হাসলো। ওর চেহারাটা ছিলো প্রায় ছ' ফুট লম্বা, রোগা-রোগার ওপর বেশ আঁটসাঁট, চোখ দুটো বড় বড় কিন্তু ভাসা-ভাসা। অমনি বিরাট চেহারা ছিলো সুমন্তর, কিন্তু ভীষণ লাজুক ছিলো। কিংবা ওর হাসিটাই কেমন লাজুক-লাজুক লাগতো। আর ভীষণ সিগারেট খেতো। হাতটা মুঠো করে প্রায় গাঁজায় টান দেবার ভঙ্গিতে সিগারেট ধরে একটা টান দিলো ও, তারপর ধোঁয়া ছেড়ে রিং করতে করতে বললে, আমি অমৃত সৃষ্টি করবো।

ওর রোগটা আমি জানতাম, তক্তপোশের ওপর টান-টান হয়ে শুয়ে কাগজ-কলম নিয়ে ঘন ঘন করে লিখতেও দেখেছি মাঝে মাঝে, তাই ঠাট্টা করে বললাম, কবি? কবিতা লিখবি?

ও বললে, গড়ে তোলার আগে প্রতিমার চেহারা কেমন হবে আমিই কি জানি?

আমি বললাম, মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে আনাই হবে আমার সাধনা।

খুব গর্ব করে বলেছিলাম সেদিন। তারপর সত্যিই একদিন ডাক্তারি পাস করলাম, ডাক্তার হলাম। আর সত্যিই আমার নিজেরই আশ্চর্য লাগে, অনেক, অনেক মানুষকে আমি মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছি। কিন্তু সুমন্ত যে এভাবে আমার গর্ব চূর্ণ করে দেবে...

ডাক্তার সোম এবার থামলেন। আমি একটা সিগারেট ধরালাম। গীতালি হয়তো এতক্ষণ ডাক্তার সোমের কোনো কথাই শোনেনি, পার্থর কথাই ভাবছিলো। এতক্ষণে ও আঁচলে চোখ মুছলো।

আর ডাক্তার সোম বললেন আমাকে, আপনি, আপনি রিং করতে পারেন?

আমি ধোঁয়া ছেড়ে চেষ্টা করলাম, পারলাম না। ডাক্তার সোম বিষণ্ণ হাসি হাসলেন।—সুমন্ত বড় সুন্দর রিং করতে পারতো।

অনিলেন্দু বললে, আপনি তাঁর গল্পটা শেষ করুন।

ডাক্তার সোম গম্ভীর হলেন।—গল্প? গল্প নয়, জীবনের মস্ত বড় ট্র্যাজেডি।

আমি এদিকে ডাক্তার হিসেবে নাম করেছি, আর সঙ্গে সঙ্গে সুমন্তও নাম করেছে সাহিত্যিক হিসেবে। ওর নাম অনেক বেশী, চতুর্দিকে ওর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে তখন। আর ও যে আমার বন্ধু ছিলো সেটাই আমার গর্ব। ও একদিন সাহিত্যকে বলেছিলো অমৃতের সাধনা। সে কথা আমি বিশ্বাস করলাম।

দু দিন পরেই হয়তো মৃত্যু হতে পারে, যন্ত্রণায় কাতর রোগীকে ওষুধ দিয়েও যাকে আরাম দিতে পারি না, এক-একদিন হঠাৎ হাসপাতালে গিয়ে দেখেছি সে রোগী একখানা বইয়ের পাতায় ডুবে আছে, মুখে প্রশান্ত তৃপ্তি। একদিন একজনের হাত থেকে বইখানা চেয়ে নিয়ে উলটে দেখলাম, সুমন্তর নাম।

না, না, সুমন্ত নয়। বলেছি তো, নামটা আমি গোপন করেছি। যে নামে সে পরিচিত সে নাম বললেই আপনারা ভাববেন বানিয়ে বলছি।

আমরা তিনজনই প্রতিবাদ করে উঠলাম। বললাম, এ কথা আপনি বলবেন না। সাহিত্যিক হিসেবে তিনি যত বড়ই হোন, চিকিৎসক হিসেবে আপনিও কম বিখ্যাত নন।

কথাটা তাঁকে খুশী করার জন্যে বলিনি। খুশী করার জন্যে যে বলিনি তার প্রমাণ, ডাক্তার সোমের আসল নামটা আমি গোপন করেছি।

ডাক্তার সোম কিন্তু আমাদের কথায় খুশী হলেন না।

শুধু বললেন, তারপর বহু দিন ইচ্ছে হয়েছে সুমন্তর সঙ্গে দেখা করার। দেখা হয়ে ওঠেনি। আমার ডাক্তারি শাস্ত্রকে, আমার ছেলেবেলার আদর্শকেও আমি সাহিত্যের চেয়ে খাটো মনে করতে পারিনি। ধনীর বাড়িতেই হোক, আর বস্তিতেই হোক, মরণোন্মুখ একটি রোগীর সামনে গেলেই আজো সারা শরীর কি যেন হয়ে যায়। হয়তো ছেলেবেলার সেই মা মারা যাওয়ার দৃশ্যটা ভিতরে ভিতরে কোনো প্রেরণা দেয়, মানুষটাকে মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে আনার জন্যে পাগল হয়ে উঠি। হয়তো গর্ব, অহংকার, হয়তো মৃত্যুর সঙ্গে রেষা-রেষি। তখন আমি অন্য মানুষ।

আমরা চুপ করে রইলাম। এ দৃশ্য আমরাও চোখের সামনে দেখেছি, দেখেছি কিভাবে পার্থকে জীবন ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যে ডাক্তার সোম পাগল হয়ে উঠেছিলেন।

ডাক্তার সোম হাসলেন।—দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ যখন একটি মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করি, তখন হয়তো আর সকলের কথা ভুলে যাই, হয়তো অন্য রোগীদের ওপর অবিচার হয়। কিন্তু এ এক অন্য নেশা, অন্য আনন্দ। জানেন, যখন এত চেষ্টার পর, সত্যিই একজনকে ফিরিয়ে আনতে পারি, জীবন ফিরে পেয়ে কৃতজ্ঞ হাসি হেসে কেউ সামনে এসে দাঁড়ায়, বিদায় নেয়, তখন যে আনন্দ পাই, ইচ্ছে ছিলো সুমন্তকে জিগ্যেস করবো, ও ওর সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে কি তার চেয়ে বেশী আনন্দ পায়?

ডাক্তার সোম থামলেন। তারপর বললেন, দেখা এক দিন হয়েছিলো।

—হয়েছিলো? আমরা প্রশ্ন করলাম।

ডাক্তার সোম হাসলেন।—হ্যাঁ। এক দিন নয়, দু দিন।

তারপর, আমরা লক্ষ করলাম, ধীরে ধীরে একটা গভীর দুঃখের, ব্যর্থতার ছায়া যেন তাঁর মুখের ওপর এসে পড়লো।

গলার স্বরও যেন ক্ষীণ হয়ে এলো। ডাক্তার সোম উদাস চোখে একবার সমুদ্রের দিকে তাকালেন। ঝাউগাছ, জাল-জেলে, ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়া সমুদ্রের বুকে যেখানে উত্তাল তরঙ্গকে মনে হচ্ছিলো ফুটন্ত জলের ভুড়ভুড়ি—সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর ঘড়ি দেখলেন।

গীতালি এতক্ষণে বললে, আপনার ট্রেনের এখনো অনেক দেরি।

অনিলেন্দু বললে, আপনাকে পেঁৗছে দিয়ে আসবো।

আমি বললাম, আমরাও তো এই ট্রেনে চলে যেতে পারতাম।

ডাক্তার সোম কোনো উত্তর দিলেন না। চাপা খসখসে গলায় বললেন, গাড়ি করে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখলাম ওয়েলিংটনের মোড়ে প্রকাণ্ড চেহারার একটি লোক একা নিঃস্বের মতো দাঁড়িয়ে একমনে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে রিং করছে।

তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম। কাছে এগিয়ে গেলাম। সুমন্ত বলেই সন্দেহ

হলো। তেমনি লম্বা কালো চেহারা, কিন্তু স্বাস্থ্য ভালো হয়েছে। একটা বিশাল পুরুষ-মানুষের চেহারা।

হ্যাঁ, সুমন্তই নিশ্চয়।

গিয়ে প্রশ্ন করলাম।—সুমন্ত নাকি?

ও প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিলো। একবার বুঝি মাথা নেড়ে 'না' বলে ফেলেছিলো। আসলে 'সুমন্ত' নামটা ও হয়তো ভুলেই গিয়েছিলো। কারণ ও তখন অন্য নামে বিখ্যাত।

সুমন্ত কিন্তু আমাকে চিনতে পারলো না।

পরিচয় দেওয়ার পর ও আমাকে জড়িয়ে ধরলো।—তুই?

ওকে হাসপাতালে আমার ঘরে নিয়ে গেলাম। ও বললে, হ্যাঁ রে, তুই নাকি এখন খুব বড় ডাক্তার হয়েছিস, অনেকে বলে।

বললাম, তোর নাম যে সবাই বলে।

সুমন্ত হাসলে।—হ্যাঁ ভাই, নাম হয়েছে, লোকে আমার লেখা পড়েও শুনেছি।

আরো অনেক কথা, পুরোনো দিনের কত গল্প হলো।

ও বললে, মরা মানুষ বাঁচাতে পারলি?

বললাম, মৃত্যুর মুখ থেকে তো অনেককে ফিরিয়ে এনেছি।

সুমন্ত হেসে বললে, যাক, নিশ্চিন্ত হলাম। লিভার তো পচে গেছে, মৃত্যু অবধারিত জানলে তোর কাছেই আসবো।

আমরা হঠাৎ হেসে উঠলাম। প্রশ্ন করলাম, এসেছিলেন তিনি?

ডাক্তার সোম দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, হ্যাঁ, এসেছিলো সুমন্ত।

হঠাৎ একদিন, রাত এগারোটার সময় হাসপাতাল থেকে জরুরী টেলিফোন এলো। সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে হাজির হলাম। বেডের সামনে গিয়ে চমকে উঠলাম। সুমন্তই। কিন্তু তখন আর সুমন্তর জ্ঞান নেই।

আমি বুঝেছিলাম, ওকে বাঁচানো যাবে না। তবু সাতটা দিন ওর পাশে পাশে কাটিয়েছি সর্বক্ষণ, আমাদের শাস্ত্রে যতরকম চেষ্টা আছে সব করেছি। শুধু কয়েক মুহূর্তের জন্যে ওর জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলাম। আমি জানতাম, ওকে বাঁচানো যাবে না। তবু, তবু জ্ঞান ফিরে পেলে ওকে শুধু বলতাম, সুমন্ত, তুই আমার কাছেই এসেছিস। .

একটু থেমে ডাক্তার সোম বললেন, হয়তো ডাক্তার হিসেবে বলা চলতো না, তবু মনে হয়েছিলো, ওকে বলি, সুমন্ত, মিথ্যে গর্ব আমাদের, মৃত্যুর মুখ থেকে কাউকেই আমরা ফিরিয়ে আনতে পারি না।

আমরা অভিভূতের মতো চুপ করে বসে রইলাম।

আর ডাক্তার সোম বললেন, সুমন্ত ঠিকই বলেছিলো। মৃত নিয়েই আমাদের কারবার, অমৃতের খোঁজ ও-ই পেয়েছিলো।

আমরা প্রতিবাদ করার, সান্ত্বনা দেওয়ার মতো কোনো কথা খুঁজে পেলাম না। চুপ করে রইলাম।

ডাক্তার সোম ধীরে ধীরে বললেন, আজ আপনারা যাকে হারালেন, যেভাবে হারালেন, সুমন্তও এইভাবে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গিয়েছিলো।

বলেই উঠে দাঁড়ালেন ডাক্তার সোম।

গীতালিও উঠে দাঁড়ালো।—কি বলছেন আপনি?

ডাক্তার সোম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, মানুষ নিজেই মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়।

বলে লম্বা লম্বা পা ফেলে কাফেটেরিয়ার বারান্দা থেকে বেরিয়ে গেলেন। সামনে ঝির-ঝিরে বৃষ্টি-ভেজা বালির ওপর দিয়ে ঝাউগাছের সারি, জাল-জেলে, ভুড়ভুড়ি-ওঠা সমুদ্রের দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে লাগলেন।

আমরা সকলেই বিস্ময়ের চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম।



নিজ নতা নেই

ছেলেটি রাস্তার এদিকের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ছিলো। বোধ হয় বাসের অপেক্ষায়। হঠাৎ দেখলে ওদিকের ফুটপাথ ধরে মেয়েটি আসছে।

প্রথমটা হয়তো শুধু রঙিন শাড়ি দেখেই চোখ পড়েছিলো। কিংবা মেয়ে বলেই। এ বয়সে চোখ জোড়া নিজের বশে থাকে না, কি যেন খুঁজে বেড়ায়। ছেলেটিও হয়তো সেজন্যেই বাস আসছে কি না গলা বাড়িয়ে মাঝে মাঝে দেখছিলো বটে, তবু চঞ্চল চোখে এপাশ-ওপাশও তাকিয়ে দেখছিলো।

মেয়েটিকে দেখতে পেয়েই ও চিনতে পারলো, একটু বোধ হয় বিচলিত হলো। এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে কি ভাবলো, বাস আসছে কি না আরেকবার দেখলো, তারপর ধীরে ধীরে চলন্ত গাড়ি, ট্রাম, রিকশা এড়িয়ে রাস্তা পার হলো।

মেয়েটি বোধ হয় কিছু কিনতে বেরিয়েছে, তাই দু-দশ পা এগিয়েই বারবার এক-একটা দোকানে ঢুকছিলো, আর চাহিদামতো জিনিসটা না পেয়ে বেরিয়ে আসছিলো।

এবারও ব্যর্থ হয়ে দোকানঘর থেকে সবে বেরিয়ে আসছে, ছেলেটির সঙ্গে চোখাচোখি হলো। আর সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন লজ্জিত হয়ে পড়লো মেয়েটি, একটা পরিচয়ের মৃদু হাসি দুলে গেল তার ঠোঁটে।

সুনন্দর পায়ের গতি আপনা থেকেই একটু দ্রুত হলো, আর ও লক্ষ করে বুঝলো, নীলিমার পা এবার যেন থেমে থেমে চলছে।

একবার বুঝি পিছন ফিরেও তাকালো নীলিমা। আর এই ধীর পদক্ষেপে, পিছন ফিরে তাকানোয় স্পষ্ট একটা প্রশ্রয়ের ভাব রয়েছে।

এটা অবশ্য নতুন কিছু নয়। আর পরিচয়টাও পুরোনো। অর্থাৎ ওরা পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছে, কিন্তু কাছে আসার সুযোগ পায়নি। কিংবা সাহস। কারণ দুজনেরই বয়স অল্প। বয়স অল্প বলেই হয়তো হঠাৎ দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে।

নীলিমা আগে আগে হাঁটছিলো, সুনন্দ একটু তাড়াতাড়ি।

সুনন্দ যখন একেবারে পাশাপাশি পেঁছে গেছে নীলিমা তখন বুঝি আড়চোখে তাকিয়ে নিজের মনেই হাসলো।

সুনন্দও। তারপর বললে, কি খুঁজছো?

—গরু।

সুনন্দকে অপ্রতিভ দেখালো।

এবার নীলিমা লজ্জা পেলো। তবু অস্বস্তি কাটিয়ে চাপা গলায় বললে, লেস।

সুনন্দ সামনের একটা বড় স্টেশনারি দোকানের দিকে হাত দেখালে, ওখানে পাবে।

নীলিমাও তাই ভেবেছিলো। তবু বললে, কোত্থাও পাচ্ছিনে।

—ওখানে পাবে।

নীলিমার সঙ্গে সঙ্গে সুনন্দও দোকানে ঢুকলো। একটু দূরত্ব রেখে দাঁড়িয়ে রইলো।

নীলিমা যখন লেস দেখছে, পছন্দ করছে, তখন দোকানী সুনন্দকে জিগ্যেস করলে, ও কি চায়।

ও ইশারায় নীলিমাকে দেখিয়ে দিলো। না, নীলিমাকে চায় এ কথা বোঝাবার জন্যে নয়, শুধু বলতে চাইলে ও নীলিমার সঙ্গে এসেছে।

লেস কিনে নীলিমা বাইরে আসতেই সুনন্দ বললে, তোমার সঙ্গে...

মুখ না ফিরিয়েই নীলিমা বলে উঠলো, আজ না সুনন্দা, তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।

সুনন্দর মুখে একটা ব্যথার ছাপ পড়লো। ও থেমে পড়লো। নীলিমা ততক্ষণে ভয়ে ভয়ে এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে দেখতে দেখতে দ্রুত পায়ে বাড়ির পথ ধরেছে।

পরের দিন আবার যখন দেখা হলো, সুনন্দ কি যেন বলতে গেল, অমনি নীলিমা আতঙ্কের চোখে বলে উঠলো, এই না, কেউ দেখতে পাবে।

অর্থাৎ নীলিমা তখন সবে স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকেছে।

তাই সুনন্দ আর কোনো কথা বললে না। তবু আগের দিনের মতো থেমেও পড়লো না। একটু দূরত্ব রেখে পাশে পাশে হাঁটলো। যেন পরস্পরকে ওরা চেনে না।

তারপর একদিন কলেজের ছুটির পর বাড়ি ফিরছে নীলিমা, হাতে-বুকে বইয়ের রাশ, সুনন্দ এগিয়ে এলো কাছে। এই দুপুর-গড়ানো বিকেলে, পাড়া-নিঃঝুম গলিতে নিশ্চয়ই কোনো বাধা নেই, ভয় নেই।

সুনন্দ বললে, শোনো।

নীলিমা অপাঙ্গে তাকিয়ে হাসলো। কিন্তু পায়ের গতি থামালো না।

সুনন্দ পিছনে পিছনে হাঁটতে শুরু করলো, তারপর বললে, তোমার সঙ্গে আমার একটা.

নীলিমা চট্ করে পিছনে ফিরে তাকিয়েই বললে, লক্ষ্মীটি, তুমি একটু এগিয়ে যাও। কলেজের মেয়েরা আসছে।

সুনন্দ বললে, এলেই বা।

—না, না, যদি বুঝতে পারে। বলেই বোধ হয় সুনন্দর হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে থেমে পড়লো, পিছন দিকে ক' পা ফিরে এসে চেঁচিয়ে ডাকলে, এই অঞ্জনা, তাড়াতাড়ি আয় না।

সুনন্দ কি করবে, উপায় খুঁজে না পেয়ে এমন ভাব করলে যেন বাড়ির নম্বর খুঁজছে।

সুনন্দ অসন্তুষ্ট হলো, রাগলো, অভিমানে দিন কয়েক দেখাই করলো না।

কিন্তু এ বয়সে রাগ পুষে রাখতেও ইচ্ছে হয় না। নিজের অভিমান নিজেকেই ভাঙাতে হয়। আর তাই সেদিন সন্ধ্যের সময় খাতাপত্র হাতে নীলিমাকে অঞ্জনাদের বাড়ি থেকে একা ফিরতে দেখেই কাছে এগিয়ে গেল।

নীলিমা মৃদু হেসে বললে, খুব রেগে গেছো, না?

সুনন্দ বললো, তোমার এত ভয় কেন বলো তো।

নীলিমা ঝট করে একবার পিছন ফিরে তাকিয়েই চাপা গলায় বলে উঠলো, সব্বনাশ! তোমার দাদা!

শুনেই ছিটকে সরে গেল সুনন্দ, অন্যমনস্ক পথিকের বুকের কাছে হঠাৎ একটা গরু শিং নেড়ে উঠলে যেমন ছিটকে সরে যেতে হয়।

পরক্ষণেই নীলিমাকে খিলখিল করে হেসে উঠতে দেখে রেগে গেল সুনন্দ, এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলে কেউ কোথাও নেই।

সুনন্দ কাছে আসতেই নীলিমা বললে, ভয় কেন বুঝলে?

সুনন্দ অপ্রতিভ হলো না। বললে, বয়ে গেছে ভয় করতে, শুধু তোমার জন্যেই...

নীলিমা হাসি চাপলে। বললে, আজ নয়, দেরি করে ফিরলে মা ভীষণ বকুনি দেবে।

—কোনো দিনই কি তোমার সময় হবে না? কথাটা কান্নার মতো শোনালো নীলিমার কানে।

ও বললে, পরশু দিন।

—ঠিক তো?

—হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি কলেজ ছুটি হবে, তুমি...

—আমি থাকবো।

যথাসময়েই দাঁড়িয়ে ছিলো সুনন্দ। অন্য মেয়েরা এসে পেঁছনোর আগেই গলির মোড়ে এসে এপাশ-ওপাশ তাকালো নীলিমা।

বললে, তুমি একটু দূরে দূরে এসো।

দূরে দূরেই এলো সুনন্দ, তারপর বড় রাস্তার কাছে এসে বললে, চলো এদিক দিয়ে যাই।

আবার একটা গলিতে ঢুকলো নীলিমা, কিন্তু খানিকটা গিয়েই দ্রুত পায়ে ফিরে এলো।—না, না, এদিকে যাওয়া যাবে না।

—কেন?

—শিগগির পালিয়ে এসো, মেসোমশাই থাকেন পরের গলিটাতে। যদি হঠাৎ...

সুনন্দও যেন ভয় পেলো। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে বললে, তবে চলো ঐ পার্কটায় গিয়ে বসি।

নীলিমা এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবলো।

সুনন্দ বিরক্ত হয়ে বললে, পার্কে বুঝি মামামশাই থাকবে!

নীলিমা রাগলো, আর তাই ওকে আরো সুন্দর দেখালো। সুন্দর দেখালো বলেই সুনন্দর সুর নরম হলো।

—দূর, কে আবার থাকবে এ সময়। তোমার শুধু ভয়। সান্ত্বনা দিলো সুনন্দ।

—ও, কি বীরপুরুষ!

বললো, তবু পার্কের দিকেই পা বাড়ালো। নিজের মনেই যেন বললে, বেশী দেরি করবো না কিন্তু, মা জিগ্যেস করবে দেরি হলে।

সুনন্দ ভিতরে ভিতরে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলো, তবু প্রকাশ করে বললো না কিছু।

পার্কে সুনন্দ আগে আগে ঢুকলো, নীলিমা পিছনে পিছনে। যেন দুজনের মধ্যে কোনো আলাপ-পরিচয় নেই।

নীলিমা ভিতরে ঢুকে দু-পাঁচজন লোক যারা বসে ছিলো এখানে-ওখানে, তাদের ভালো করে দেখলে। না, চেনা মুখ নেই। নীলিমাকে চেনে না কেউ।

দুজনে এবার একটা জায়গা বেছে নিয়ে পাতাবাহারের ঝোপটার ওপাশে গিয়ে ঘাসের ওপর বসলো।

সবে বইয়ের রাশ নামিয়ে রেখে ঘাসের ওপর পা বিছিয়ে বসেছে নীলিমা, সুনন্দ পকেট থেকে একটা দুমড়ে যাওয়া সিগারেট বের করে কারো কাছে দেশলাই পাওয়া যায় কি না দেখছে, হঠাৎ নীলিমা লক্ষ করলো সামনের বেঞ্চে একটা লোক শুয়ে ছিলো, সে উঠে বসেছে, ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

লোকটার চোখের দৃষ্টিতে বেশ বোঝা গেল, ও যেন কি সন্দেহ করছে। কিংবা নীলিমাকে বা সুনন্দকে ওর চেনা-চেনা লেগেছে।

নীলিমা বললে, লোকটা বোধ হয় তোমাকে চেনে।

—পাগল নাকি! আমি ওকে চিনিই না। সুনন্দ চাপা গলায় বললে, বোধ হয় তোমাকে চেনে।

নীলিমা রেগে গেল।—ওরকম বিচ্ছিরি চেহারার লোক আমাকে চিনতেই পারে না।

সুনন্দ অভিযোগ করলে, অমন বদখত লোকরাই আমাকে চেনে?

নীলিমা ততক্ষণে বইপত্র তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। উঠে দাঁড়িয়ে বললে, না, না, এখান থেকে চলো। আমার ভয় করছে।

সুনন্দ বিরক্ত হয়ে উঠে পড়লো। তারপর পার্ক থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বললে, মিছিমিছি...

নীলিমা অভিযোগের স্বরে বললে, একেবারে দেখা হওয়া বন্ধ হলে সেটাই ভালো হবে, না?

সুনন্দ কোনো উত্তর দিলো না। একটু থেমে রাগত স্বরেই বললে, এর চেয়ে দেখা না হওয়াই ভালো।

—বেশ, তাই।

বলেই তাড়াতাড়ি একটা বাসে উঠে পড়লো নীলিমা। আর কথাটা বলার জন্যে সুনন্দর ভীষণ অনুশোচনা হলো।

ও ভাবলে নীলিমা হয়তো ওর সঙ্গে আর কথাই বলবে না। আর সে কথা ভেবে ওর কেমন যেন কান্না পেলো।

তবু কাঁদলো না। কারণ নীলিমা যখন দেখতেই পাচ্ছে না, তখন চোখে জল এনে কি

লাভ!

পরের দিন নীলিমা বললে, কাল এক কেলেঙ্কারি হয়েছিলো আরেকটু হলে।

—কেন, লোকটা সত্যি চেনা নাকি?

নীলিমা হেসে উঠলো।—না, না। অঞ্জনার একটা খাতা নিয়ে চলে এসেছিলাম, ও সটান বাড়ি গিয়ে আনতে গিয়েছিলো।

—সে কি! আতঙ্কে বুকটা ধক্ করে উঠলো সুনন্দর।

নীলিমা হাসলো।—গিয়ে দেখে আমি ফিরিনি।

—তারপর? কি বললে মাকে?

—বললাম...

নীলিমার কথা শেষ হওয়ার আগেই সুনন্দ বলে উঠলো, এই রে, ছোটকাকীমা। বলেই উলটো দিকে হনহন করে এগিয়ে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে দিলো সুনন্দ।

সে কথা ভেবে পরের দিন খুব এক চোট হেসে নিলো নীলিমা।

তারপর নিজের মনের ক্ষোভটাও প্রকাশ করে ফেললো, কি করা যায় বলো তো।

—চলো একটা চায়ের দোকানে গিয়ে বসি।

—তাই ভালো।

দুজনে পর পর তিনটে রেস্তরাঁ দেখে সবচেয়ে কম ভিড়ের একটায় ঢুকলো। বয় এসে একটা কেবিন দেখিয়ে দিতেই ওরা সুড়ুৎ করে ভিতরে গিয়ে বসলো সামনাসামনি। আর বয় পর্দা টেনে দিয়ে চলে গেল।

সুনন্দ এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হয়ে বললে, তোমাকে আমি...

—কি দেবো বলুন।

সবে নীলিমার হাতখানা ছুঁয়েছে সুনন্দ, অমনি পর্দার ফাঁকে মাথা গলিয়ে বয় জিগ্যেস করলে, কি দেবো বলুন।

ঝট্ করে হাতটা সরিয়ে নিয়ে সুনন্দ বললো, কাটলেট।

তারপর বয় চলে যেতেই ও পর্দাটা একটু ফাঁক করে বাইরে নতুন কারা যেন এলো দেখতে গেল।

পরক্ষণেই বললে, খেয়েছে!

—কি হলো? নীলিমার মুখেও আতঙ্ক।

সুনন্দ ফিসফিস করে বললে, প্রফেসর সেন!

নীলিমা দুষ্টুমির চোখে প্রশ্ন করলে, পড়া জিগ্যেস করবেন বুঝি?

—আরে না, না, আমাকে চেনে।

—তা হলেই বা। নীলিমার চোখে বেপরোয়া ভাব।

সুনন্দ ফিসফিস করে বললে, মেজমামার বন্ধু, রোজ তাস খেলতে যায়।

নীলিমা চাপা গলায় বললে, এখানে তো আর ঢুকবেন না।

সুনন্দর মুখ শুকিয়ে গেছে ততক্ষণে।—বের হবো কি করে?

—কেন, উনি চলে গেলে।

—জানো না তাই বলছো। যেখানে একবার গিয়ে বসেন আর নড়তে চান না।

কাটলেট গলা দিয়ে নামছে না, অথচ প্লেট ফাঁকা হয়ে গেল।

কাটলেট শেষ হয়ে যেতেই বয় এসে আবার পর্দার ফাঁকে মাথা ঢোকালো।

সুনন্দ বললে, চপ।

চপ শেষ হতেই সুনন্দ পর্দার এক ইঞ্চি ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখলে প্রফেসর সেন তখনো এক কাপ চা নিয়ে বসে আছেন।

তাই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, ডোবালে।

বয় আবার পর্দার ফাঁক দিয়ে মাথা গলাতেই নীলিমা বললে, ডেভিল।

সুনন্দ বললে, সত্যি।

নীলিমা হেসে উঠলো, আর সুনন্দ ঠোঁটে আঙুল দিয়ে হাসিতে চাবি আঁটতে বললে।

ডেভিল শেষ হতেই সুনন্দ উঁকি মেরে দেখলে প্রফেসর সেন চলে গেছেন। সঙ্গে সঙ্গে

বিল মিটিয়ে ও বেরিয়ে এলো। একটু পরে নীলিমাও।

ভয়ে বুক দুরদুর করছে তখনো।

বেরিয়ে এসেই নীলিমা বললে, আমি চললাম।

সুনন্দ ভাবলো, বাঁচলাম। রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছলো ও।

পরের দিন নীলিমা বললে, তার চেয়ে সিনেমা ভালো, একটা ম্যাটিনি শোয়ে...

সুনন্দ বললে, ঠিক তো।

—হ্যাঁ, শুরু হয়ে যাওয়ার পর ঢুকবো...

সুতরাং একদিন টিকিট কেটে দুপুরের শোয়ে সিনেমা হলে গিয়ে বসলো দুজনে। তখন সিনেমা শুরু হয়ে গেছে।

দুজনে পাশাপাশি, কাছাকাছি। অন্ধকারে নীলিমা ডান হাত বাড়িয়ে তুলে নিলো সুনন্দর বাঁ হাতখানা। আর সুনন্দ একটু পরে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে নীলিমার কাঁধের ওপর রাখলে। সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে কারা হেসে উঠলো।

সুনন্দ ছবির পর্দায় কোনো হাসির কারণ খুঁজে না পেয়ে পিছন ফিরে তাকালো। মনে হলো ওরই বয়েসী দুটি ছেলে হাসছে।

হাসি শুনেই সুনন্দর বাঁ হাতখানা থরথর করে কেঁপে উঠলো। ও তাড়াতাড়ি নীলিমার কাঁধ থেকে হাতখানা সরিয়ে নিলো।

এতক্ষণ প্রেমিক-প্রেমিকার মতো কাছাকাছি ঘন হয়ে বসেছিলো। এবার স্বামী-স্ত্রীর মতো দুজনে দু পাশে হেলে পড়লো।

ছবি দেখতে দেখতে, অর্থাৎ ছবি না দেখতে দেখতে যেই দুজনে কাছাকাছি হয়, অমনি আবার হাসি ওঠে। আবার ছিটকে দূরে সরে যায় দুজনেই।

একটু পরে নীলিমা বললে, দূর, ভালো লাগছে না।

সুনন্দ বললে, আমারও।

ছবির ইন্টারভ্যাল হতে আর সামান্য বাকী, দুজনেই উঠে পড়লো। আলো জ্বলে উঠলে আবার যদি চেনাশোনা কেউ বেরিয়ে পড়ে!

হল থেকে বেরিয়ে এসেই নীলিমা ওদিকের ফুটপাথ ধরলে, সুনন্দ এদিকের। কিন্তু যতক্ষণ হেঁটে হেঁটে চললো দুজনে ততক্ষণই বারবার ফিরে ফিরে তাকালো পরস্পরের দিকে, বারবার ঠোঁট টিপে হাসলো, ইশারায় কথা বললো। এদিকের ফুটপাথ ও ওদিকের ফুটপাথ—অন্ধকারের নদীতে দুটো দূরে দূরে ইস্টিমার যেন লাল আলোর দপদপানি জ্বেলে কথা বলছে।

পরে দেখা হতেই নীলিমা বললে, দূর, এভাবে কোনো মানে হয় না।

সুনন্দ বললে, সত্যি।

নীলিমা বললে, যা হয় হবে, চলো পার্কে গিয়েই বসি।

সুনন্দ বললে, সেই ভালো।

দুজনে এসে পার্কে ঢুকলো। নীলিমা আগে আগে, সুনন্দ পিছনে পিছনে।

লোকে লোকারণ্য তখন পার্ক। বেঞ্চি খালি নেই একটাও, ঘাসের ওপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে মানুষগুলো। আর এক সারি ছেলেমেয়ে এক কোণে স্লিপ খাচ্ছে।

এক কোণে গিয়ে দাঁড়ালো সুনন্দ, কেউ চেনাজানা আছে কি না তন্নতন্ন করে দেখলে। কোথায় বসা যায় খুঁজলে।

নীলিমাও একটু দূরে দাঁড়িয়ে সুনন্দর দিকে একবার তাকালে, কেউ চেনাশোনা আছে কি না খুঁজলে, কোথায় বসা যায় ভাবলে।

আর তখনই দুজনেরই চোখ পড়লো পার্কের মাঝখানে ঘাসের ওপর।

চারপাশে এত লোকজন, এত হই-হল্লা, আর তার মাঝখানে ঘাসের ওপর খালি-গায়ে একজন জোয়ান হিন্দুস্থানী, রিকশাওয়ালা হয়তো। বেশ শক্তসমর্থ চেহারা, আর একটা যুবতী বয়সের উচ্ছল স্বাস্থ্যের কালোকুলো মেয়ে। চ্যাপটা নাক, গোল গোল চোখ, রূপের কমতিটুকু পুষিয়ে দিয়েছে যৌবনের প্রাচুর্য।

নীলিমা মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে দেখছিলো। লোকটা মেয়েটার চুলে আঙুল চালিয়ে উকুন বেছে দিচ্ছিলো বোধ হয়। নখে করে উকুন ধরছে আর দু আঙুলের নখে টিপে উকুন মারছে মনে হলো। মেয়েটার শরীরের ঢিলে ভঙ্গিমার মধ্যে কেমন একটা স্বচ্ছন্দ তৃপ্তি।

মেয়েটা চুপ করে মাথা হেঁট করে বসে ছিলো, এবার হেসে উঠে লোকটার হাত ধরে টান মারলো। লোকটাও সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠে ঘাসে গড়িয়ে পড়লো। প্রীতির আবেগে ভেঙে পড়া দুটি শরীর। মেয়েটার কোলে মাথা রেখে পাশ ফিরে শুয়ে পড়লো লোকটা, আর মেয়েটা ভিজে গামছা দিয়ে তার পিঠের ঘাম মুছে দিতে লাগলো।

চারপাশে লোকজন, হই-হল্লা। কিন্তু লোক দুটোর যেন কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

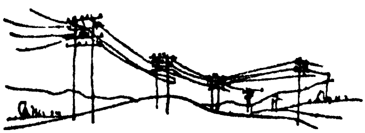
মনে হলো, ওদের পৃথিবী নিঃশব্দ, কোনো চোখের উৎসুক দৃষ্টি নেই ওদের ওপর। যেন এদের কাছে সময় হারিয়ে গেছে, মাটি হারিয়ে গেছে। মানুষ নেই কোথাও।

সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নীলিমা সুনন্দর দিকে ফিরে তাকালো। সুনন্দও তন্ময় হয়ে দেখছিলো ওদের, নীলিমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই দুজনে ফিক করে হেসে ফেললে।

তারপর সুনন্দ তরতর করে নীলিমার কাছে এসে বললে, এতটুকু নির্জন নেই কোথাও।

নীলিমা মুখ কাঁচুমাচু করে বললে, এই ভিড়ের মধ্যে...বড্ড ভয়-ভয় করছে।

ভয়টাই যে জনতা এ কথা কেউ বললে না।



একটি মনি-ব্যাগ ও এক ফালি হাসি

দেবতোষ ভেবেছিলো, এখানে সুখ আছে। এখন ভাবছে, সুখ বোধ হয় কোথাও নেই। সেই খুব ছোটবেলায় রাস্তার ধারে একটা বেশ মজার খেলা দেখেছিলো। একটা লোক বসেছে সামনে শতরঞ্জি বিছিয়ে। তার ওপর আধ ডজন চীনেমাটির বাটি সারি দিয়ে উপুড় করে বসানো। লোকটা চারপাশের ভিড়ের সামনে একটা ঘুঁটি মেলে ধরেই সেটা একে একে সব ক'টা বাটির নীচে চালান করে দেওয়ার ভান করছিলো। কোন বাটিটার নীচে সত্যি সত্যি সেটা চালান করেছে কেউ বলে দিতে পারলে ডবল পয়সা পাবে, না পারলে বাজির টাকাটা গায়েব! ভিড়ের মধ্যে মাথা সেঁধিয়ে ভিতরে ঢুকে অনেকক্ষণ সেই মজার খেলাটা দেখেছিলো দেবতোষ! যে বাটিই তোলা হয়, সেটাই ফাঁকা। শেষে সন্দেহ হতে একজন রেগে গিয়ে পর পর সব ক'টা বাটি উলটে দিয়ে দেখে ঘুঁটি নেই কোনোটার মধ্যেই। হাতসাফাই শুধু।

এও এক ভগবানের হাতের হাতসাফাই নাকি!

কথাটা মনে হতেই দেবতোষ নিজের মনেই হেসে ফেললে।

অরুণা খাটের এক কোণে ঠেস দিয়ে হাঁটু ভেঙে বসে একমনে প্লাস্টিকের সুতোয় পুঁতির পর পুঁতি গেঁথে চলেছিলো। ক'টা দিন আহার-নিদ্রা ভুলে একটা পুঁতির ব্যাগ করায় মেতে উঠেছে অরুণা। তাই কোনো দিকে তার চোখ নেই।

কিন্তু এক ফাঁকে কখন ও চোখ তুলে তাকিয়েছে, আর সঙ্গে সঙ্গে দেবতোষের আপনমনা হাসিটা চোখে পড়ে গেছে।

—কি, হাসলে যে! অরুণা নিজেও হাসলো।

দেবতোষ লজ্জা পেলো।—কই, না। পরে ধরা পড়ে গেছে বুঝতে পেরে বললে, এমনি।

অরুণা ঠোঁট উলটে বললে, বুঝেছি, বুঝেছি। এখন হাসছো তো, ব্যাগটা তৈরী হোক, তখন দেখবে কি সুন্দর হবে। কথাটা বললো বটে, কিন্তু চোখ তুললো না, হাত থামালো না।

দেবতোষ যেন বাঁচলো। যাক, অরুণা তা হলে ভেবেছে ওকে রাতদিন পুঁতির মালা গাঁথতে দেখেই হেসেছে ও।

দেবতোষ এবার ডেকচেয়ারে বসে বসেই পা দোলাতে লাগলো। একবার ইচ্ছে হলো বাবুকে ডেকে তোলে ঘুম থেকে। বিছানার ওপর রবার ক্লথ, রবার ক্লথের ওপর কাঁথা, তার ওপর ক্ষুদে বালিশটায় মাথা রেখে ফুটফুটে ছেলেটা ঘুমোচ্ছে। নাদুসনুদুস গোলগাল চেহারা, মাথায় এক রাশ কোঁকড়ানো চুল। তাকিয়ে দেখতে বেশ লাগে। দেবতোষের হাত নিশপিশ করে, বাবুকে একটু চটকে থেসে আদর করতে। কিন্তু কাছে যাবার উপায় নেই, অরুণা খাই-খাই করে উঠবে। ঘুম পাড়াতে পারো না, ঘুম ভাঙাতে ওস্তাদ। আরো কত কি বলবে।

দেবতোষ তাই নিজের মনেই হাঁটু দোলাতে লাগলো ডেকচেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে। একবার অরুণার দিকে তাকালো।

দিন কয়েক হলো ঘরের বাল্‌ব্‌টাকে চল্লিশ থেকে পঁচিশ ওয়াটে নামিয়ে দিয়েছে। বারান্দার, কলঘরের আরো কম। মাসের শেষে ইলেকট্রিকের বিলটা যদি দুটো টাকাও কমে।

বই-টই পড়তে একটু অসুবিধে হয় বটে, কিন্তু অল্প আলোয় ঘরটা বেশ লাগছে। মেঝের ওপর অরুণার ছায়া পড়েছে, ঠিক একটা আঁকা ছবির মতো। হাঁটু ভেঙে বসেছে অরুণা খাটের কোনায় ঠেস দিয়ে, মাথাটা ঈষৎ নুয়ে আছে, চোখ দুটো হাঁটুর ওপর রাখা পুঁতি-গাঁথা প্লাস্টিকের সুতোয়। মুখে একটা চাপা হাসি।

পুঁতির পর পুঁতি গাঁথতে গাঁথতে অরুণা চোখ না তুলেই বললে, উল বুনলে রাগ, সেলাই করতে গেলে রাগ—ব্যাগ নয় নাই বানাতাম, সময়টা কাটে কি করে বলো তো?

দেবতোষ হাসলো। কি আর জবাব দেবে। সারা দুপুর ও যখন আপিসে থাকে, তখন দিব্যি ঘুমিয়ে কাটাবে অরুণা, আর দেবতোষ ফিরে এলেই অরুণার কাজ।

তবে, দেবতোষের হঠাৎ মনে হলো, কথাটা মিথ্যে বলেনি অরুণা। সত্যি, ইদানীং বড় একা-একা লাগে। অরুণা আছে, তবু। এক বাবু যখন জেগে থাকে সে স টুকুই দিব্যি কেটে যায়।

দেবতোষ হঠাৎ চিৎকার করে ডাকলে, বা-বু-উ!

—এই! কপট রাগে চোখ পাকালো অরুণা।—খবরদার বলছি।

ঠোঁট বাঁকালো দেবতোষ।—উরি বাপ্‌স্‌! ভস্ম করে দেবে নাকি!

—অমন আদর সবাই পারে। কই, কাঁদে যখন ভোলাতে তো পারো না।

দেবতোষ কোনো উত্তর দিলো না। ডেকচেয়ারে দু হাতের আড়াআড়িতে মাথাটা রেখে আরো জোরে জোরে হাঁটু দোলাতে শুরু করলে। আপিসের নিবারণবাবুর কথাটা হঠাৎ একবার মনে উঁকি দিয়ে গেল। বয়স পঁয়তাল্লিশ, কনফার্মড ব্যাচেলার। সন্ধ্যে হলেই এক বোতল বীয়ার নিয়ে 'বার'-এ গিয়ে বসেন। দেবতোষ একদিন আপত্তি করেছিলো, এভাবে পয়সা উড়িয়ে কি লাভ হয় মশাই? নিবারণবাবু উত্তর দিয়েছিলেন, আপনাদের কি বলুন, বউ-ছেলের সঙ্গে গালগল্প করে সময় কেটে যায় আপনাদের।

নিবারণবাবুর কেন, সকলেরই তাই ধারণা। বিশেষ করে দেবতোষের যখন বয়স কম, সবাই ভাবে, দিনরাত বুঝি ওরা প্রেমালাপ করছে। একবার এসে দেখে যাক না তারা, এই যে এতক্ষণ চুপচাপ বসে আছে দুজনে, ক'টা কথা হয়েছে।

পরক্ষণেই দেবতোষের মনে হলো, না, এটা ভুল। কথা না হলেও একই ঘরে, এক ছাদের নীচে ওরা তিনটি প্রাণী তো রয়েছে। ইচ্ছে হলে কথা তো বলতে পারে। আর সেটুকুই অনেক-খানি সান্ত্বনা। কোনো কোনো দিন আপিস থেকে ফিরে যখন দেখেছে অরুণা দোকানে দু-একটা জিনিস কেনাকাটা করতে গেছে, তখন ওই একটা ঘণ্টা কি কম অসহ্য লেগেছে! কিংবা সেই চুঁচড়োর বাড়িতে যখন অরুণা থাকতো, দেবতোষ ডেলি প্যাসেঞ্জারি করতো, বাবা-মা পিসীমা আর বোনরা যখন কাছে কাছে থাকতো বলে অরুণাকে নাম ধরে ডাকতে পেতো না বাড়ি ফিরে, কিংবা দুটো কথা বলতে পেতো না, তার তুলনায় এই চুপচাপ বসে থাকাও

ভালো।

ভালো? উঁহু। তা নয়। সুখ বোধ হয় কোথাও নেই।

বাবা-মার সঙ্গে একটু মনোমালিন্য করেই এখানে বাসা নিয়ে উঠে এসেছে দেবতোষ সংসার পেতেছে। পিসীমাও দুটো কাটা-কাটা কথা শুনিয়েছে। তবু উঠে এসে, প্রথম প্রথম বেশ ভালো লেগেছিলো। অরুণারও। ঘোমটার বালাই নেই, ফিসফিস গলায় কথা বলার প্রয়োজন নেই, সিনেমায় যেতে হলে কি বেড়াতে বের হবার আগে কথাটা মা-র কানে তোলবার জন্যে আধ ঘণ্টা ধরে শলাপরামর্শের প্রয়োজন নেই।

কিন্তু সেই বেশ-বেশ ভালো লাগার দিনটা এত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাবে তা কি ভেবেছিলো ওরা!

এর মধ্যেই কেমন যেন একঘেয়ে লাগছে। কেউ একজন দিন কয়েক বেড়াতে এলে ভালো হতো। একঘেয়ে লাগছে, নাকি ওদের আনন্দের ভাগটা আরো একজনকে না দিয়ে আনন্দ নেই!

অরুণা বোধ হয় কিছু ভাবছিলো। হাত কাজ করলেও মন তো স্থির হয়ে থেমে থাকে না।

অরুণা হঠাৎ বললে, দিদি আজো চিঠির জবাব দিলো না। ওরা বোধ হয় আসবে না।

দেবতোষ সাড়া দিলো না এ কথার।

—না আসে না আসবে, আমরাও আর যাবো না। অরুণার গলায় ঝাঁঝ।

দেবতোষ এতক্ষণে বললে, আমি জানতাম। অণিমাদের মতো বড়লোক হতাম তো দেখতে এত সাধাসাধির দরকার হতো না, নিজে থেকেই কতবার এসে ঘুরে যেতেন।

—সে কথা শোনাবো না ভেবেছো দেখা হলে? পুঁতিগুলো কাপড়ের ছোট্ট থলেটায় ভরে সেটা পাশে সরিয়ে রাখলো অরুণা। প্লাস্টিকের সুতোগুলো গুটিয়ে রেখে ভাত হয়েছে কি না দেখতে গেল।

ছোট ছোট দুখানা ঘর, পাশে এক ফালি বারান্দা। বারান্দায় তোলা-উনুনে ভাত ফুটছে। ঢাকনিটা সরিয়ে খুন্তি করে গোটা কয়েক ভাত তুলে বুড়ো আঙুলে টিপে টিপে দেখলে অরুণা, তারপর হাঁড়ি ঢাকা দিয়ে ঘটির জলে হাত ধুয়ে আবার এসে বসলো।

বললে, গরিবকে কেউ পোঁছে না।

ক্ষোভের সুর ফুটলো। নতুন বাসা করার পর থেকে অরুণা চিঠি লিখে লিখে হয়রান হয়ে গেছে। বউদিদের লিখেছে, দিদিকে লিখেছে, এমন কি মেজ ননদকেও। সকলেই সান্ত্বনা দিয়েছে, যাবো, যাবো। কারো ছেলেদের পরীক্ষা, মেয়ের অসুখ, দাদার মামলা, তোর জামাইবাবুর কাজের চাপ।

অথচ অরুণাদের এত একা-একা, একঘেয়ে লাগছে, এ সময়ে কেউ এলে ওরা দুটো দিন ফুর্তিতে কাটাতে পারতো।

দেবতোষের ইচ্ছে কেউ ওরা আসুক, দুটো দিন থেকে যাক। ও মনে মনে ভেবেও রেখেছে, কেউ এলে কিভাবে আদরযত্ন করবে।

অরুণার কথা শুনে অরুণার দাদা-বউদি, দিদি-জামাইবাবুর ওপর ওরও অভিমান হলো। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে, আর চিঠিপত্র দেবে না, বিজয়ার পরও না।

পরক্ষণেই বললে, তোমার দিদিকে আমি একটা চিঠি দিয়ে দেখি, কি বলো!

চিঠি দিতে হলো না। তার আগেই চিঠি এলো। অমুক ট্রেনে অমুক দিন যাচ্ছি তোমাদের কুঞ্জে।

চিঠি পেয়ে কি ফুর্তি দুজনের। বাবুকে কোলে নিয়ে অরুণা বললে, বাব্বু, কে আসছে জানিস? বলো মাসী।

আধো-আধো কথা ফুটেছে বাবুর। ও চোখ গোল গোল করে তাকালো অরুণার মুখের দিকে। তারপর বললে, বলো মাসী।

—হ্যাঁ, বড় মাসী আসবে, মণ্টুদাদা আসবে তোর, রিনাদিদি আসবে, বড় মেসো আসবে।

দেবতোষের মুখে হাসি। প'য়তাল্লিশ টাকা ভাড়ায় এই একতলার ছোট ছোট দুখানা ঘর, আর এক ফালি বারান্দা পেয়ে যেদিন নতুন সংসার পাততে এসেছিলো ওরা, সেদিনও হয়তো এত আনন্দ হয়নি, এত স্বপ্ন দেখেনি।

দেবতোষ বললে, ক'টার ট্রেনে আসবে লিখেছে, দেখো তো।

—সকালে আটটা-ন'টায়। কোন্ ট্রেন ঠিক করে লেখেনি।

দেবতোষ বললে, তা হলে আটটার সময়েই স্টেশনে যেতে হবে, ওই ট্রেনে না আসে তো পরের ট্রেন দুটোও নয় দেখে আসবো।

—আপিসের দেরি হবে না? অরুণা জিগ্যেস করলে।

দেবতোষ হাসলো।—হয় হবে!

সত্যি সত্যিই গোয়ালা যখন দুধ দিতে এলো সকালে, তখনই দেবতোষ স্টেশনে যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছে।

আর অরুণা গয়লাকে বললে, আজ থেকে সকালে এক পো, বিকেলে এক পো দুধ বেশী দিও। ভালো দুধ দিও কিন্তু, খোকার মাসী আসছে, দাদা-দিদি আসছে।

দাদা-দিদির একজনের বয়স আট, আরেকজনের ছয়।

দেবতোষ ঘরের ভেতর থেকেই বললে, এক পো নিলে হবে নাকি, দেড় পো করে বেশী দিতে বলো।

অরুণারও তাই ইচ্ছে ছিলো, কিন্তু সাহস পায়নি। দেবতোষের কথায় সায় দিয়ে বললে, হ্যাঁ, তাই। দেড় পো করে বেশী দিও।

ঠিকে ঝি সুনন্দা এসেছিলো বাসন মাজতে। নামটা অরুণার পছন্দ নয়। প্রথম প্রথম ডাকতে গেলেই হেসে ফেলতো। ঝিয়ের নাম সুনন্দা! তাই বদলে করেছে নন্দ।

অরুণা বললে, নন্দ, বাজারটা আজ তোমাকে করে দিতে হবে। দিদি আসবে আজ, তাই ওকে স্টেশনে যেতে হয়েছে।

দেবতোষ তখন স্টেশনে চলে গেছে, আর অরুণা থেকে থেকেই ঘড়ি দেখছে, সময়ের হিসেব কষছে।

—মাছ দেড় পো এনো, ভালো হয় যেন।

আরো টুকিটাকি পাঁচটা জিনিসের ফর্দ দিয়ে দুটো টাকা তার হাতে দিলো অরুণা। অন্য দিন দেবতোষ নিজে বাজার গেলেও এক টাকার বেশী পায় না।

সুনন্দা বাজারে চলে যেতেই আরেকবার ট্রাঙ্কটা খুললো অরুণা। টাকার ব্যাগটা বের করে নোটগুলো গুনে দেখলো। একটা তৃপ্তির হাসি ফুটলো মুখে। আরেকটু হলেই হয়তো গুনগুন এক কলি গান গেয়ে উঠতো।

মাসের মাঝামাঝি। ভাগ্য ভালো দিদি-জামাইবাবু শেষের দিকে আসছে না।

ট্রাঙ্ক বন্ধ করে ঘড়িটা দেখে সবে বাথরুমে ঢুকেছে অরুণা, অমনি জামাইবাবুর মোটা গলার ডাক শুনতে পেলো।

—কই, মেমসাহেব কই?

খটাং করে বাথরুমের দরজা খুলে ব্লাউজটা আবার পরতে পরতে ছুটে এলো অরুণা। একমুখ হাসি নিয়ে।

—এই কি অভ্যর্থনার রীতি নাকি। আমি ভাবলাম দরজায় দাঁড়িয়ে আছো রাস্তার দিকে চেয়ে।

অরুণা ততক্ষণে দিদি-জামাইবাবুকে প্রণাম করে দিদির বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। দিদিকে জড়িয়ে ধরে বুক জুড়িয়েছে। তারপর রিনাকে কোলে তুলে নিয়েছে।

দিদি বললে, বাবু কোথায়?

—নন্দ, মানে ঝি বাজার গে'ছ, নিয়ে গেছে তাকে। এক্ষুনি আসবে।

শোবার ঘরে নিয়ে এসে সবাইকে বসালো অরুণা। দিদির স্যুটকেস দুখানা খাটের তলায় গুঁজে দিলো। তারপর ইশারায় দেবতোষকে বারান্দায় ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে, নন্দ নেই, মিষ্টি নিয়ে এসো।

পকেটে হাত দিয়ে দেখলে দেবতোষ, তারপর বেরিয়ে গেল।

অরুণার তখন কি ফুর্তি, কি ফুর্তি।—কত দিন পরে দেখা বল্ তো দিদি। মণ্টু কত লম্বা হয়েছে।

জামাইবাবুকে বসিয়ে রেখে একখানা শাড়ি দিলো সে দিদিকে। দিদি কাপড় বদলে আসতেই বারান্দায় বসে পড়ে দুজনে চাপা গলায় গল্প শুরু করলে। তাদের বাড়ির খবর, বাবা-মা, মেজ জামাইবাবু কখন এসেছিলো, জ্যাঠামশাইয়ের ছেলেরা কি অভদ্র ব্যবহার করছে বাবার সঙ্গে, মাসতুতো বোন নীলিমা আর নীলিমার বরের কি গর্ব, দেবতোষের সম্পর্কে কি ঠাট্টা করেছে। এক পৃথিবী কথা জমে আছে, সব একে একে, এক্ষুনি না বের করে দিতে পারলে শান্তি নেই।

দেবতোষ আপিস চলে যাওয়ার পরে, জামাইবাবুকে খাওয়া শেষ হতেই খাটে তাঁর বিছানা ঠিক করে দিয়ে খেতে বসলো দুজনে। আবার গল্প, গল্প, হাসি, কৌতুক।

একবার চেঁচিয়ে বললে, কি মশাই, নাক ডাকাচ্ছেন নাকি?

হাত-মুখ ধুয়ে এসে দেখলে জামাইবাবু খাটে শুয়ে তখনো জেগে বসে আছে, সিগারেট খাচ্ছে।

ওপাশে নীচে মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়লো দুজনে, পাশে বাবু। খাটে জামাই-বাবুর পাশে মণ্টু আর রিনা।

কি আনন্দ, কি আনন্দ। কত দিন দিদির সঙ্গে পাশাপাশি শুয়ে গল্প করতে পায়নি অরুণা। দিদিকে হাত বাড়িয়ে ছুঁতে পায়নি।

দুটো দিন পরম আনন্দে কেটে গেল। শুধু তৃতীয় দিনে ব্যাগ বের করে বাজারের টাকা দিতে গিয়ে একটু খিচখিচ করে লাগলো যেন। নোটগুলো গুনে দেখলে।

এক শো আশি টাকা হাতে পায় দেবতোষ। মাইনে দু শোর সামান্য বেশী হলে কি হবে। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, স্টাফ ইন্সিওরেন্স, লাইব্রেরীর চাঁদা—অতশতর হিসেব রাখে না অরুণা।

মাইনের টাকাটা এনে পঁয়তাল্লিশটা টাকা—কড়কড়ে নোট ক'খানা বাড়িওয়ালার হাতে তুলে দিতে গিয়ে বুকটা চড়চড় করে ওঠে। তার ওপর মাসকাবারী বাজার, গয়লা। টাকা সের দুধ। সব মিটিয়ে এর মধ্যেই সাতখানা নোটে এসে ঠেকেছিলো।

মনে মনে দু-বেলার বাড়তি দেড় পো করে দুধের দামটা হিসেব করলো যেন একবার। সেটা অবশ্য পরের মাসের ভাবনা। কিন্তু এই দুটো দিনেই আরো দুখানা দশ টাকার নোট ভাঙানো হয়ে গেছে। অবশ্য সবটাই খরচ হয়নি, ছ-সাত টাকা আছে তার। কিন্তু সাতখানা দশ টাকার নোট তো আর নেই। পাঁচখানা হয়ে গেছে। খুচরো ছ' টাকা তো ইলেকট্রিকের বিল দিতেই চলে যাবে।

দূর, ওসব এখন ভেবে লাভ নেই। ভারি তো দু-চার দিনের জন্যে এসেছে ওরা।

অরুণা ফিসফিস করে দেবতোষকে বললে, এক পো ঘি এনো আজ, বিকেলে জলখাবার ওই রুটি-পাঁউরুটি ওদের রোজ রোজ দিতে ইচ্ছে হয় না, দুখানা লুচি ভেজে দেবো।

—বেশ তো। দেবতোষও যেন দিলদরিয়া হয়ে গেছে। হিসেব করে বললে, পাঁচ টাকার নোটটাই দাও।

অরুণার ভয় ছিলো, দেবতোষই হয়তো অসন্তুষ্ট হবে, বলবে, এভাবে খরচ করলে বাকী মাসটা চালাবো কি করে। এমনিতেই তো মাসের শেষ দিকে খিটিমিটি কথা-কাটাকাটি চলে। হিসেব বোঝাতে না পেরে, কিংবা আজেবাজে খরচ করার খোঁটা খেয়ে এক-একদিন রাগ করে নীচে মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে শোয় অরুণা। ভালোভাবে কথা বলে না। প্রতি মাসেই বলে, টাকা-পয়সা নিজের হাতে নাও, আমি অত হিসেব দিতে পারবো না। দেবতোষ রেগে গিয়ে বলে, ঠিক আছে, তাই নেবো। কিন্তু মাইনের পর নতুন ঝকঝকে নোট ক'খানা হাতে এলেই সব রাগ জল হয়ে যায়, সব প্রতিজ্ঞা ভুলে যায়। হাসিমুখে টাকাগুলো অরুণার হাতে দেয়, আর হাসিমুখেই হাত পেতে নেয় অরুণা।

এমন তো কত দিন ধরেই দেখে আসছে, তাই ভয় ছিলো, দেবতোষ হয়তো বলবে, একটু হাত টেনে খরচ করো।

সে কথা বললে লজ্জায় মরে যেতো অরুণা। দিদি-জামাইবাবুর কাছে ছোট হয়ে যেতো। দু-দিনের জন্যে এসেছে, তা ছাড়া এরা তো এত টানাটানির মধ্যে সংসার চালায় না। বেড়াতে

এসেছে বলে না খেয়ে থাকবে নাকি?

শোয়ার ব্যবস্থাটা অবশ্য দিব্যি চলে যাচ্ছে। একখানাই খাট, একখানাই ভালো ঘর। সেটাই ওদের ছেড়ে দিয়েছে। জামাইবাবু খাটে শোয়, ছেলেমেয়েকে নিয়ে দিদি শোয় মেঝেতে। আর এ ঘরে মাদুরের ওপর চাদর পেতে ওরা দুজন।

দেবতোষ একটু আয়েশী মানুষ, অরুণা বুঝতে পারে ওর অসুবিধে হচ্ছে, তবু বলছে না কিছু। শীতকাল হলে কি ঝামেলাই না হতো! না, এক মাস কয়েকটা টাকা বাঁচিয়ে এক-খানা বাড়তি তোশক করাতে হবে। লোকজন এলে বড় অসুবিধে হয়।

রবিবারে দেবতোষ বললে, আজ মাংস আনি, কি বলো?

অরুণা একটু চুপ করে রইলো চারখানা মাত্র নোট হাতে নিয়ে। এদিকে চাল তেল সব ফুরিয়ে এসেছে। ওদের দুটি প্রাণীর মাসকাবারী বাজারে এতগুলি লোকের কত দিনই বা চলে।

বাজার থেকে ফিরে মুটের মাথা থেকে চালের থলেটা নামাতেই দিদি হেসে বললে, কি রে অরুণা, দু-দিনেই সব শেষ করে দিলাম নাকি?

অরুণাও হাসলো।—কম খাচ্ছো নাকি, ফতুর করে ছাড়বে।

দেবতোষ, জামাইবাবু সকলেই হো-হো করে হেসে উঠলো।

নিছক ঠাট্টা করেই কথাটা বললে অরুণা।

জামাইবাবু দিদিকে বললে, এই বেলা ভালোয় ভালোয় সরে পড়ো। এর পর প্রহারেণ...

দিদি হাসলে, পরশু দিন তো যাবো বাবা, এ দুটো দিন...

—ইস্, যেতে দিলেই হলো কিনা। পরের রবিবারে ভাবা যাবে ওসব কথা। অরুণা সহাস্যে বলে উঠলো।

জামাইবাবু বাধা দিলো।—আমার ছুটিই বিষ্যুৎবার অবধি।

—না জামাইবাবু। জামাইবাবুর হাতখানা ধরলো অরুণা।

অনুনয়ের স্বরে বললে, প্লীজ।

দেবতোষও হেসে ফেললে।

অরুণা জামাইবাবুর হাতখানা চেপে ধরলে।—কত দিন পরে এলেন, দিদির সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে ঠিক নেই। তা ছাড়া চিড়িয়াখানা যাবো, বোটানিক্‌সে যাবো...

রবিবার বিকেলেই বেরিয়ে পড়লো সকলে, বোটানিক্‌স্ যাবার জন্যে। ট্রাঙ্ক খুলে ব্যাগটা বের করলে অরুণা। তিনটি মাত্র নোট। দুটো দেবতোষের পকেটে দিয়ে দিলো। যদি হঠাৎ দরকার হয়!

দিদি-জামাইবাবু বললে, ট্যাক্সি দেখো একটা।

দেবতোষের ইচ্ছে ছিলো ট্যাক্সিতে যাবার, কিন্তু সাহস হলো না। অনেকগুলো টাকা বেরিয়ে যাবে। ভাড়াটা হয়তো ওরাই দিতে চাইবে, কিন্তু দেবতোষকেও তো পকেট থেকে টাকা বের করতে হবে। যদি দিতেও হয় ওকেই?

তাই মনে মনে একটা অজুহাত ভেবে রেখেছিলো দেবতোষ।

বললে, ট্যাক্সিতে তো চারজনের বেশী নেবে না।

অরুণাও সায় দিলো।—হ্যাঁ, বাসেই চলুন।

দেবতোষ খুশী হলো। যাক, অরুণার তা হলে বুদ্ধি আছে। থাকবারই কথা, ও কি আর হিসেব রাখছে না খরচের। এর পর আরো দশটা দিন চালাতে হবে। ওরা চলে যাওয়ার পরেও।

টিফিন-কেরিয়ারে লুচি আর আলুর দম করে নিয়ে গিয়েছিলো অরুণা। গাছের ছায়ায় ছায়ায়, গঙ্গার ধারে ধারে ঘুরে এক জায়গায় বসে খাওয়া-দাওয়া করলো সবাই মিলে। গল্প করলো। হাসি, রসিকতা।

সারা দিন হেঁটে শরীরে আর শক্তি নেই কারও।

ফেরার পথে ট্যাক্সিই করতে হলো। জামাইবাবু ভাড়া দিতে যেতেই রেগে গেল অরুণা।—ভালো হবে না কিন্তু।

ফিরে এলো ক্লান্ত হয়ে। অরুণাও ক্লান্ত।

দিদি বললে, আমি উনন ধরাচ্ছি, তুই একটু শুবি যা। তোকে আর এদিকে আসতে হবে না।

তাও কি হয়! অরুণা কাছে বসে রইলো। দু-একটা সাহায্য করলে। খাওয়ার পরও গল্প করলো অনেক রাত অবধি।

তারপর অরুণা এসে পাশে শুয়ে পড়তেই দেবতোষ ফিসফিস করে বললে, দাদা কি বললেন? কবে যাবেন?

—শুক্রবার সকালে।

—তুমি কি বললে?

অরুণা বোধ হয় হাসলো।—কি আর বলবো, ছুটি নেই যখন।

—হুঁ। মিছিমিছি লোকের অসুবিধে করে কি লাভ? হয়তো কাজের ক্ষতি হবে।

অরুণা চুপ করে রইলো। তারপর চাপা গলায় বললে, আমি তো আর কিছু বলিনি।

একটু পরে অরুণা ফিসফিস করে বললে, গোটা কুড়িক টাকা ধার এনো। সব তো ফুরিয়ে গেছে।

—ফুরিয়ে গেছে? চমকে উঠলো দেবতোষ। বোধ হয় বিরক্ত হলো।

দেবতোষের একটা দীর্ঘশ্বাস শুনলো অরুণা।—দেখি।

অরুণা অসহায়ের মতো বললে, ট্যাক্সিভাড়াই তো লাগলো ছ' টাকা।

পরের দিন সকালে আবার হাসি-আনন্দ। রঙ্গ-রসিকতায় মেতে উঠলো দুই বোন। যেন কোনো টাকার চিন্তা নেই, শোয়া-থাকার অসুবিধে নেই।

দিদি বললে, চলে যেতে হবে ভাবতেও এত খারাপ লাগছে।

—সত্যি। আবার যে কবে দেখা হবে!

মুখে বললো বটে অরুণা, দুঃখও হলো, তবু মনে মনে একটা আতঙ্কও রয়েছে। আবার না দু-পাঁচ দিন থাকতে রাজী করিয়ে ফেলে ও নিজেই।

এতদিন ধরে আশায় আশায় বসে থেকেছে, দিদি-জামাইবাবু আসবে, মণ্টু-রিনা আসবে, কত স্বপ্ন বুনেছে, দু বোনে গল্প আর গল্প, হই-হল্লা করে কাটাবে। কিন্তু দশটা দিনও কাটলো না, এর মধ্যেই যেন ভিতরে ভিতরে অস্বস্তি বোধ করছে অরুণা। দেবতোষ হয়তো রাগছে মনে মনে। ভাবছে, গেলে বাঁচি। সত্যি, এত খরচ কি ভেবেছিলো ওরা!

এক-একটা নোট ভাঙাতে না-ভাঙাতে খরচ হয়ে যায়।

যদি অনেক টাকা থাকতো অরুণার, বাড়ি-গাড়ি, সত্যি কত ফুর্তিতেই না কাটাতে পারতো। জামাইবাবুর ছুটি ফুরিয়ে যাওয়ার অজুহাতটা কিছুতেই শুনতো না।

কিছুতেই না।

কিন্তু শুক্রবার সকালেও অরুণা মুখ ফুটে একবার বলতে পারলো না, আর দুটো দিন থেকে যান জামাইবাবু!

সমস্ত সংসারটা, হিসেবের খাতাটা যেন এ ক'দিনেই ওলটপালট হয়ে গেছে। ওরা চলে গেলে হয়তো আবার সব গুছিয়ে নিতে পারবে। দুশ্চিন্তা ঘুচে যাবে।

দেড় পো করে দুধ বাড়তি নেওয়া হয়েছে। সাত-আট টাকা বেশী দিতে হবে পরের মাসের মাইনে পেয়ে। সে মাসেও কি গুছিয়ে নিতে পারবে!

এতদিন একা-একা দুঃসহ লেগেছিলো, এখন যেন আবার একা হতে পারলেই শান্তি।

শুক্রবার সকালেই ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো। স্যুটকেস দুটো তুলে দিলো দেবতোষ।

হাসি-হাসি মুখে রসিকতা করলো জামাইবাবু।—খুব ক'দিন জ্বালিয়ে গেলাম, এবার দুটিতে নিশ্চিন্ত হবে।

কিন্তু এ কি! অরুণা হেসে উঠে কোনো উলটো ঠাট্টা ছুঁড়লো না। শুধু জলে ভাসা দুটি বড় বড় চোখ মেলে তাকালো জামাইবাবুর দিকে, তারপর দিদিকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলো।

—চলে যাচ্ছিস দিদি, আবার যে কবে...

কথা শেষ করতে পারলো না অরুণা। ওর বুকের ভেতর থেকে একটা প্রচণ্ড ব্যথা যেন বেরিয়ে আসার পথ পাচ্ছে না।

দিদি সান্ত্বনা দিলে সজল চোখে।—ছিঃ, কাঁদিস না। এই তো এইটুকু পথ, আবার আসবো। তোরাও যাবি, যাবি কিন্তু।

জামাইবাবুও ঠাট্টা ভুলে গম্ভীর হয়ে গেছে।—না গেলে আর আসবোই না। গিয়ে থাকতে হবে কিন্তু বেশ কিছু দিন, বুঝলে দেবতোষ।

দিদি-জামাইবাবুকে প্রণাম করলে অরুণা।

ট্যাক্সি ছেড়ে দিলো। হর্ন দিয়ে ট্যাক্সিটা সোঁ করে এগিয়ে গেল, গলির মোড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বুক খাঁ-খাঁ করে উঠলো অরুণার।

সমস্ত বাড়িখানা, দুখানা ছোট ছোট ঘর একটা বিরাট নির্জন হলঘরের মতো, পরিত্যক্ত একটা পোড়ো বাড়ির মতো খাঁ-খাঁ করে উঠলো।

অরুণা বাবুকে খাটের উপর বসিয়ে দিয়ে দীর্ঘশ্বাসের স্বরেই যেন বললে, এত খারাপ লাগছে, সমস্ত বাড়িটা...

অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইলো। কথা বললো না কেউ। কথা হারিয়ে গেছে।

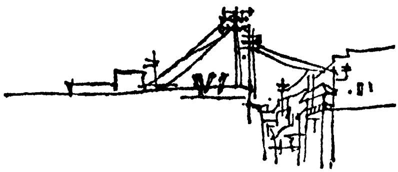
জানালার ধারে গিয়ে চুপটি করে বসে রইলো অরুণা বাবুকে কোলে নিয়ে।

দেবতোষের গলার স্বরও ভারি হয়ে এলো।—কো-অপারেটিভ থেকে গোটা পঞ্চাশ টাকা ধার নিলেই হতো। তবু তো রবিবার অবধি থাকতেন ওঁরা।

অরুণা বিষণ্ণ হাসি হাসলে।—সত্যি!

তারপর শাড়ির আঁচলে চোখ মুছে বাবুর হাত থেকে দিদির দেওয়া দু টাকার নোটটা কেড়ে নিয়ে শাড়ির খুঁটে বেঁধে রাখলে।

।১৩৭০



একটি হাসপাতালের জন্ম ও মৃত্যু

স্নেহের অনন্ত,

তোমার চিঠি যথাসময়েই পেয়েছিলাম, কিন্তু নানা কাজের ব্যস্ততায় উত্তর দিতে পারিনি। তোমরা জানো আমি ঠিকাদার মানুষ, ইঁট-সুরকি নিয়ে বাস করি। কিন্তু আমাদের গ্রামটির কথা আমার মন থেকে কখনো দূর হতে পারে না। শহরে বড় বড় বাড়ি বানানো আমার কাজ হলেও খেলাই গ্রামের সেই মাটির ঘরের স্মৃতি কোনো দিনই ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। একটু অবসর পেলেই ওখানে ছুটে যাওয়ার জন্যে মন হাঁসফাঁস করে। তোমার পরের চিঠিতে জানলাম একটা হাসপাতাল গড়ে তোলার কাজে তোমরা অনেকখানি এগিয়েছো। আমার কাছে দশ হাজার টাকা চেয়েছো, কিন্তু হয়তো বিশ্বাস করবে না, খরচ করার মতো দশটা পয়সাও আমাদের কন্ট্রাক্টরদের হাতে থাকে না। তবে যথাসাধ্য আমি নিশ্চয়ই সাহায্য করবো। কিন্তু গ্রামের ও আশেপাশের বড় জোতদার বা ব্যবসাদারদের দানে কোনো কিছু গড়ে তোলার দিন কি এখন আর আছে? সেসব এখন আর সম্ভব নয়। সরকার যদি এদিকে মন না দেয়, তা হলে কিছুই হবার নয়। তোমরা বরং মন্ত্রী ধরো, চারপাশের গ্রামের লোকদের দিয়ে দরখাস্ত করাও। চেষ্টা করলে, সরকারী টাকায় বেশ বড় একটা হাসপাতাল ওখানে হতে পারে। তারপর আমি

তো আছিই। ইতি

গুণময়দা

২

নুটুদা,

বারাসতের সেই ব্যাপারটা নিয়ে টেলিফোনে আপনার সঙ্গে কথা হওয়ার পর একদিন যাবো যাবো করেও যেতে পারলাম না। তাই খেলাই গাঁয়ের এই ছেলে ক'টিকে আপনার কাছে পাঠালাম। ওরা ওখানে একটা হাসপাতালের জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছে, আমি বলেছি আমিও যথাসাধ্য সাহায্য করবো। স্বাধীনতার পর কত জায়গায় কত ইস্কুল-কলেজ-হাসপাতাল হলো, অথচ আপনার গ্রাম কালিকাপুরের জন্যে কিছুই হলো না। আপনি আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র, তার ওপর মন্ত্রী, আপনার পক্ষে নিজের গ্রামের জন্যে কিছু করলে পক্ষপাতিত্ব মনে হবার সম্ভাবনা বলেই আপনি এদিকে নজর দেননি, একদিন বলেছিলেন। কিন্তু গ্রামের লোকদেরও তো একটা দাবি আছে। আপনি এদের কথা একটু ধৈর্য ধরে শুনবেন আশা করছি। আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার জানবেন। ইতি

গুণময়

৩

অনন্ত,

নুটুদার সঙ্গে তোমরা দেখা করার পর আমার কথাবার্তা হয়েছে। তোমরা হাজার পনরো টাকা চাঁদা তুলতে পারলে বোধ হয় একটা সুরাহা হবে।

খবর দিও মাঝে মাঝে। ইতি

গুণময়দা

৪

অনন্ত,

অনেক দিন তোমাদের চিঠি না পেয়ে ভেবেছিলাম তোমরা আশা ছেড়ে দিয়েছো। যাই হোক, টাকার প্রতিশ্রুতি যখন পেয়েছো তখন বাকী টাকাটা গভর্নমেণ্ট থেকে পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। নুটুদাদের কালিকাপুর থেকে আমাদের খেলাই পর্যন্ত বারো মাইলের মধ্যে একটাও হাসপাতাল নেই, গ্রামের লোকদের দুঃখকষ্ট ইত্যাদি জানিয়ে তোমরা খবরের কাগজে কয়েকখানা চিঠি ছাপানোর ব্যবস্থা করো। রমেশ নন্দীর ছেলে খবরের কাগজের লোক, তাকে গিয়ে ধরতে পারো। ইতি

গুণময়দা

৫

অনন্ত,

খবরের কাগজের কাটিংগুলি পেলাম। আমাকে পাঠানোর দরকার ছিলো না, আমি আগেই দেখেছি। তাই ফেরত পাঠালাম। এগুলি নিয়ে জগৎপুরের নিশা ভট্চাযের সঙ্গে দেখা করো। উনি যদিও আমাদের পাশের নির্বাচনকেন্দ্র থেকে বিধানসভায় এসেছেন, তবু খেলাইয়ের প্রতিবেশী গ্রামের লোক তো উনি। তা ছাড়া বিরোধী পক্ষের সদস্য হিসাবে ওঁর পক্ষে হাসপাতালের অভাবের কথাটা তোলা অনেক সহজ। নিশাবাবুকে আমিও চিঠি দিলাম। ইতি

গুণময়দা

৬

অনন্ত,

কাল নুটুদার সঙ্গে টেলিফোনে কথা হলো। নিশাবাবু বিধানসভায় আলোচনার সময়

দেশ বুদ্ধি করে বলে নিয়েছেন। নুটুদার উত্তরটাও আশাপ্রদ। তোমরা দু-একজন চিঠি পেয়েই নুটুদার সঙ্গে দেখা কোরো। আর নিশাবাবুকে ধন্যবাদ দিয়ে এসো। আমিও তাঁকে টেলিফোনে ধন্যবাদ জানিয়েছি। ইতি

গুণময়দা

৭

নুটুদা,

শেষ পর্যন্ত যে ব্যবস্থা হলো, তার জন্যে অশেষ ধন্যবাদ। আমরা সত্যিই আপনার জন্যে এতকাল গর্ববোধ করে এসেছি। এখন আরো কৃতজ্ঞ রইলাম। আমার কর্মচারী শিবেনবাবু চিঠি নিয়ে যাচ্ছে, ওর কাছে সব শুনবেন। আপনার লিভারের ব্যথাটা এখন কমেছে কি না জানাবেন। প্রতি দিন এক চামচ করে কালমেঘের রস খেয়ে দেখলে পারতেন। আমি উপকার পেয়েছিলাম। যদি না পান, আমাকে জানাবেন, প্রতি দিন টাটকা কালমেঘ পাঠানোর ব্যবস্থা করবো। পরের সপ্তাহেই দেখা করছি। ইতি

গুণময়

৮

প্রিয় শিবেন,

আমি রাঁচি থেকে এ সপ্তাহে ফিরতে পারবো না। বারাসতের কাজ কত দূর এগিয়েছে, সিমেণ্ট রাখার কি ব্যবস্থা করলে, যতীনবাবু ইস্কুল-বাড়ির প্ল্যান সাবমিট করেছেন কি না—সব জানাবে। আর নুটুদার সেক্রেটারি ভদ্রলোক—নামটা ভুলে গেছি, তাঁর সঙ্গে দেখা করে খেলাইয়ের হাসপাতালের অর্ডার ইসু করার জন্যে তাগাদা দেবে। একটু চা-টা খাইও। ইতি

গুণময় সেন

৯

যতীনবাবু,

আমার ফিরতে আরো তিন-চার দিন লাগবে। এখানকার বিলটা আদায় হলেই যাবো। কাজ করে টাকা আদায় করা এক সমস্যা। ব্যবসাপত্র গুটিয়ে ফেলতে ইচ্ছে হয় মাঝে মাঝে। যাই হোক, আপনার ইস্কুল-বাড়ির প্ল্যানটা ওদের খুব পছন্দ হয়েছে শুনলাম।

আমাদের খেলাই গ্রামের মাঠে বড় রাস্তার ধারে একটা বড় হাসপাতাল হবার সম্ভাবনা আছে। সরকারী আপিসের কাজ তো জানেন, কত টাকা মোট খরচ হবে ঠিক করতেই আঠারো মাস লাগবে। অতএব আপনি একটা প্ল্যান এঁকে রেডি করে রাখুন, লাখ দেড়েক টাকার মতো খরচ করাতে চাই। হাতের কাছে প্ল্যানটা ফেলে দিয়ে অর্ডার পাস করানো সহজ হবে।

আজ সকালে শিবেন ট্রাংক-কল করেছিলো, তাকেও বুঝিয়ে দিয়েছি। ইতি

গুণময় সেন

১০

নুটুদা,

শিবেনকে আপনার কাছে হাসপাতালের প্ল্যান সমেত পাঠালাম। আপনি একটু দেখবেন। আপনাদের ইঞ্জিনীয়ারদের দিয়ে প্ল্যান করাতে গেলে আমরা আর হাসপাতাল দেখে যেতে পারবো না। তাই নিজের খরচেই করালাম। প্রায় পঞ্চাশটি গ্রাম যখন উপকৃত হবে, তখন প্ল্যানের খরচ না-হয় আমিই দিলাম।

আমি কাল রাঁচি থেকে ফিরেছি। আজ রিষড়া যাচ্ছি। দু দিন থাকবো।

ফিনান্স ডিপার্টমেণ্টে আপনি একটু বলে দেবেন এ বিশ্বাস আমার আছে। আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার জানবেন। ইতি

গুণময়

পুঃ—আপনার নির্দেশমতো শংকরের চাকরির কথা কলিন সাহেবকে বলেছি। বোধ করি

হয়ে যাবে।

১১

শিবেন,

আমাদের করা হাসপাতালের প্ল্যানটা একটু অদলবদল করে অ্যাকসেপ্টেড হয়েছে জেনে খুশী হলাম। টেন্ডার ইন্‌ভাইট করে কবে বিজ্ঞাপন বের হবে আগে থেকে জেনে নিও। অদলবদল হওয়ার ফলে এস্টিমেট কি দাঁড়াবে যতীনবাবুকে ভালো করে হিসেব করতে বলবে। খাঁকতি আজকাল সবারই বেড়ে যাচ্ছে, সেদিকটা মনে রাখতে বলবে। বসন্তবাবু লোকটাকে না ট্র্যান্সফার করাতে পারলে চলছে না। সামান্য এটুকু কাজের জন্যে এত টাকা? ইতি

গুণময় সেন

১২

বসন্তবাবু,

শিবেনবাবুকে আপনার কাছে পাঠালাম। শুনবেন। আপনি চিরকালই আমার উপকারী বন্ধু, কৃতজ্ঞচিত্তে সে কথা আমি চিরকাল মনে রাখবো। কে কে টেন্ডার দেবে আন্দাজ পেলে অনুগ্রহ করে জানাবেন। আর চিনি চাই? ইতি

গুণময়বাবু

১৩

শিবেন,

পরশুদিন দুর্গাপুর থেকে ফিরতে পারবো আশা করছি। কিন্তু তার আগেই খেলাইয়ের হাসপাতালের টেন্ডার সাবমিট করতে হবে। বসন্তবাবুর সঙ্গে ভিতরের খবর পেয়ে যতীন বাবুকে ফ্রেশ এস্টিমেট দিতে বলবে।

রিষড়ার বিলটা পাস করাতে একবার যেতে হবে তোমাকে। আমি সেবার টু পারসেন্টের বেশী রাজী হইনি। তুমি দরকার হলে একটু বাড়িও। ইতি

গুণময় সেন

১৪

শিবেন,

টেন্ডার অ্যাকসেপ্টেড হয়েছে জেনে খুশী হলাম। নুটুদা কি কিছু বলে দিয়েছিলেন? ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার দাশগুপ্তর সঙ্গে তুমি এখনো আলাপ করে উঠতে পারোনি কেন বুঝলাম না। অত্যন্ত অন্যায় করেছো। কাজটা হাতে পাওয়ার আগেই আলাপ জমিয়ে রাখলে হতো। এখন গেলে শুধুই টাকা-পয়সার সম্পর্ক। ইতি

গুণময় সেন

১৫

অনন্ত,

অনেক দিন তোমাদের কোনো খবরাখবর নেই। তোমরা কি আমাকে ভুলে গেলে? অথচ তোমাদের উৎসাহ দেখেই হাসপাতালের জন্যে আমি আজ ন' মাস ধরে কি পরিশ্রম করেছি ভাবতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত হাসপাতাল হচ্ছে। যদিও গ্রামের হাসপাতালের বাড়িটা বানিয়ে ব্যবসায় বিশেষ কোনো লাভই হবে না, তবু এ কাজটা আমি নিজে হাতে নিয়েছি। ঠিকাদারদের কোনো বিশ্বাস নেই, জানো তো। শেষে এত চেষ্টায় একটা হাসপাতাল স্যাংশন করিয়ে দু দিনে ধসে পড়বে এ আমি চাইনি। তাই কাজটা নিজেই নিয়েছি।

তোমরা একটু সহযোগিতা করো। ইতি

গুণময়দা

১৬

শ্রদ্ধেয় নিশাবাবু,

অনেক দিন আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারিনি। সাত কাজে এত ব্যস্ত থাকি যে সময় করে উঠতে পারি না। আজকাল কণ্ট্রাক্টরদের অবস্থা তো জানেন, সরকারী আপিসের পেয়াদা থেকে মন্ত্রী অবধি সবাই ধমক দেয়। আর পদে পদে হাত বাড়িয়েই আছে। আপনারা তবু মাঝে মাঝে দু-একটা সত্যি কথা মুখের ওপর বলেন।

খেলাইয়ের হাসপাতালের কাজটা আমি নিয়েছি। লাভ হবে না, লাভ একমাত্র আমাদের ও তল্লাটে একটা বড় হাসপাতাল হবে। বুড়ো বয়সে ওখানে গিয়েই থাকবো আমার সাধ, তাই হাসপাতালটা যাতে ভালো হয় তার চেষ্টা করছি। তবে, জানেন তো, সব সময়ে সব কাজ নিজে দেখতে পারি না। কর্মচারীদের ওপর নির্ভর করতে হয়। যদি হাসপাতালের কাজে কোনো ভুলভ্রান্তি দেখেন, দয়া করে কোনো হইচই করবেন না। আমাকে জানাবেন, আমি ঠিক করে দেবো।

সেদিন হঠাৎ কিছু গলদা চিংড়ি পেয়ে গেলাম, আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। খারাপ হয়ে যায়নি তো? ইতি

গুণময় সেন

১৭

শিবেন,

ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার দাশগুপ্ত দিন কয়েক কোলকাতায় থাকবেন, ওঁকে কারনানি ম্যানসনের ফ্ল্যাটটা খুলে দিও, বগলাকে কাজকর্ম করে দিতে বোলো। আর সব আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা করে দিও। ইতি

গুণময় সেন

১৮

অনন্ত,

তুমি খেলাইয়ের ছেলে, আমিও খেলাইয়ের ছেলে। তোমার বাবা ও আমার বাবার মধ্যে কি সম্পর্ক ছিলো, আমি আজও ভুলিনি। তা ছাড়া এই হাসপাতালের জন্যে কত কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে তুমি জানো না। সরকারী আপিসে এক টেবিল থেকে আরেক টেবিলে একটা চিঠি সরতে তিন মাস লাগে। আমরা কণ্ট্রাক্টররা চেষ্টা করি বলেই সেগুলো নড়াচড়া করে। এ-দেশে যদি কিছু কাজ হয়ে থাকে তা আমাদেরই চেষ্টায়। এর জন্যে এরই মধ্যে কত টাকা জলে গেছে তার হিসেবও জানি না। তবে সে টাকা জলে যায়নি বলে মনে করি, কারণ নিজের গ্রামের কাছে একটা এত বড় হাসপাতাল হচ্ছে এইটুকুই আনন্দ। অন্তত পাশাপাশি পঞ্চাশটা গ্রাম ও থেকে উপকার পাবে।

শুনলাম ছেলেদের দল নাকি আমার রাজমিস্ত্রী ও ওভারসিয়ারদের নানাভাবে উত্ত্যক্ত করছে। তোমরা এর বিহিত করো। আর ইটের কোয়ালিটি, দরজা-জানালার কাঠ ইত্যাদি নিয়ে তাদের বাজে প্রশ্ন করার কোনো মানে হয় না। কোন্‌টা ভালো, কোন্‌টা মন্দ, মিস্ত্রীরাই যদি জানতো, তা হলে তারাই তো কণ্ট্রাক্টর হয়ে যেতো। বিশ্বাস রেখো, আমার গ্রামকে অন্তত আমি ঠকাবো না। তা ছাড়া ইঞ্জিনীয়ার দাশগুপ্ত নিয়মিত ইন্‌স্‌পেকশনে যাচ্ছেন।

তোমাদের সহযোগিতা কামনা করি। ইতি

গুণময়দা

পুঃ—হাসপাতাল সম্পূর্ণ হতে দাও, তখন দেখলে তোমরাও খুশী হবে। এখন খুঁটিনাটি ব্যাপারে বাধা দিলে শেষ অবধি হয়তো হাসপাতাল হওয়াই বন্ধ হয়ে যাবে।

১৯

শিবেন,

ইঞ্জিনীয়ার দাশগুপ্তের জন্যে চারখানা ক্রিকেটের টিকিট যেভাবে পারো যোগাড় করে

তাঁকে পেঁাছে দেবে। ইতি

গুণময় সেন

২০

অনন্ত,

তোমার চিঠি পেলাম, তুমি যে আমার কথা বুঝতে পেরেছো জেনে খুশী হলাম। আমার চিঠিতে আমি কি তোমার ওপর দোষারোপ করেছিলাম? আসলে আমার সন্দেহ বিরোধী পক্ষের সদস্য নিশা ভট্টাচায কয়েকটি ছেলেকে নাচিয়েছিলো। গভর্নমেণ্ট কোনো ভালো কাজ করে, এ তো ওরা সহ্য করতে পারে না, যে-কোনোপ্রকারে বাধা দিতে চায়। তোমরা তাদের বোঝাবার চেষ্টা কোরো। ইতি

গুণময়দা

২১

শ্রদ্ধেয় নিশাবাবু,

কাল আপনার বাড়ি থেকে ফেরার পর আপনার কথাগুলি আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিলো। সত্যি, এভাবে চললে এ-দেশের কোনো উপকার হওয়া সম্ভবই নয়। আপনাদের পার্টির ফাণ্ডে পাঁচ শো টাকা দিতে বলেছিলেন, আমি আজ শিবেনের হাতে এক হাজার টাকা পাঠালাম। আমার পক্ষে যেটুকু সাধ্য সেটুকুই বা করবো না কেন। আপনারা হয়তো ভাবেন আমরা অনেক লাভ করি। কিন্তু ধারণাটা ভুল। এক দিকে ট্যাক্স সতেরো রকমের, অন্য দিকে পদে পদে ঘুষ। ব্যবসা করতে ইচ্ছে হয় না। আর দিশী জিনিসের যা হাল হচ্ছে আজকাল, আমরা নিরুপায় বলে ব্যবহার করি, লোকে দোষ দেয়।

আগামী ইলেক্‌শনে আপনি আর দাঁড়াবেন না বলছিলেন। কিন্তু হাজার হাজার মানুষ যে আপনার মুখ চেয়ে আছে এ কথাটা ভুলবেন না। সশ্রদ্ধ নমস্কার জানবেন। ইতি

গুণময় সেন

২২

মাই ডিয়ার দাশগুপ্ত,

লঞ্চে করে দিন কয়েক সুন্দরবনের দিকে বেড়াতে যাচ্ছি, পাখি শিকার করা যাবে। ইট-কাঠের জগৎ কি আপনারই ভালো লাগে, না আমার ভালো লাগে। মিসেস ও বাচ্চাদের নিয়ে চলুন না, ঘুরে আসি। খুব ভালো লাগবে।

মিসেসকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাবেন, বাচ্চাদের আমার স্নেহ। ইতি

সেন

পুঃ—বেনারসীখানা মিসেসের পছন্দ হয়েছে কি না জানাবেন।

২৩

নুটুদা,

খেলাই-কালিকাপুর হাসপাতালের কাজ অনেক দূর এগিয়েছে, কিন্তু এবার বোধ হয় কাজ বন্ধ রাখতে হবে। প্রথম কিস্তির বিলটার এখনো পেমেণ্ট পেলাম না। অনেক চেষ্টা করেছি। মুকুজ্যে সাহেবকে একটু ফোনে বলে দিন না দয়া করে।

সেদিন আপনার ওখান থেকে আসার পর ভীষণ সর্দিকাশিতে কাহিল ছিলাম। আপনি কেমন আছেন? ইতি

গুণময়

পুঃ—জমিটা কিনে ফেলুন, বাড়ির জন্যে ভাববেন না।

২৪

শিবেন,

মুকুজ্যে সাহেব কি চায় স্পষ্টাস্পষ্টি জেনে নাও ক্লার্কটার কাছে। এইজন্যেই বলেছিলাম

যতীনবাবুকে এস্টিমেট বাড়িয়ে করতে।

রাঁচির ব্যাপারটায় আই টি ও মূর্তি এটা কি করলো? হাতে মাথা কাটতে শুধু বাকী। ইতি

গুণময় সেন

২৫

শিবেন,

প্রথম কিস্তির টাকাটা পেমেন্ট পেয়েছো জেনে খুশী হলাম। দাশগুপ্ত আবার পার্সেন্টেজ বাড়াতে চায়। দিয়ে দিও, উপায় তো নেই। যত ঝামেলা আমরা পোয়াবো আর লাভের ভাগ ওরাই পাঁচ ভূতে লুটেপুটে নেবে।

হাসপাতালের অ্যাকাউন্টের এক শো টন কাপুরকে দেবে। নগদ। ইতি

গুণময় সেন

২৬

শিবেন,

হাসপাতালের কাজটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে হবে। আরো মিস্ত্রী লাগাও। দুর্গাপুরে আরেকটা টেন্ডার অ্যাকসেপ্টেড হয়েছে। লোক পাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে সব বেকার বেকার বলে, অথচ কেউ কাজ করতে চায় না। লোক পেলেই নিয়ে নিও।

হাসপাতালের জানলা-দরজাগুলো তাড়াতাড়ি রঙ করিয়ে দিও, আর চুনকাম। কে কখন এসে দেখে যাবে, শেষে কাঠের কোয়ালিটি নিয়ে গোলমাল করবে। ইতি

গুণময় সেন

২৭

অনন্ত,

তোমার চিঠি পেলাম। চারপাশের গ্রামের লোকে হাসপাতাল-বাড়িটা দেখে খুশী হয়েছে জেনে আমিও খুশী হলাম।

আমার যেটুকু কর্তব্য সেইটুকুই করেছি। শুভেচ্ছা জেনো। ইতি

গুণময়দা

২৮

শিবেন,

বসিরহাটের টেন্ডার দেবার ব্যবস্থা করো। যতীনবাবুকে বোলো মার্জিন বেশী রাখতে। খেলাইয়ের ব্যাপারে দেখলে তো এস্টিমেটের চেয়ে কত বেশী উপরি খরচ হয়ে গেল। এদিকে আবার ইনকাম ট্যাক্সের খাঁড়া ঝুলছে। ওদের তো ধারণা হাতে যা পাই সবই লাভ।

যাক, খেলাইয়ের দ্বিতীয় বিলটার পেমেন্ট পেয়েছো এই সান্ত্বনা। ইতি

গুণময় সেন

২৯

ভাই অনন্ত,

তোমার তিনখানি চিঠিই পেয়েছিলাম। এই এক মাস নানা কাজে এতই ব্যস্ত ছিলাম যে উত্তর দিতে পারিনি। খেলাইয়ের হাসপাতালের যে কথা লিখেছো তা শুনে সত্যিই খারাপ লাগছে। কিন্তু আমি আর কি করতে পারি বলো। যেটুকু ভার নিয়েছিলাম তা আমি করে দিয়েছি। শুনে আশ্চর্য হবে, এখনো তার সব টাকা পাইনি। তোমার নটুদাকে ধরো। উনি যদি কিছু করতে পারেন। অবশ্য উনিই বা কি করবেন। সরকারী ব্যাপারই এমনি। কন্ট্রাক্টর-দের সকলে গালাগাল দেয়, বলে গভর্নমেন্ট নিজে করলে নাকি অনেক ভালো হবে। দেখছো তো সরকারী আপিসের কান্ড। আমি হাসপাতালের বিল্ডিং তৈরির দায়িত্ব নিয়েছিলাম,

করে দিয়েছি। ডাক্তার, নার্স, যন্ত্রপাতি—এসব তো আমার কাজ নয়। যন্ত্রপাতি আর ওষুধ-পত্র যদি আসে শেষ অবধি, সেও জেনো কোনো কণ্ট্রাক্টরের কল্যাণে। এখন তো মনে হচ্ছে ডাক্তার নার্স যোগাড় করার কাজটার জন্যেও যদি টেণ্ডার ইন্‌ভাইট করে তবেই কাজ হবে।

এ-দেশে যেটুকু কাজ হয়েছে তা আমাদের চেষ্টায়। যেখানেই কণ্ট্রাক্টর নেই, সেখানেই কাজ পড়ে থাকে। তোমার নুটুদার সঙ্গেই দেখা কোরো। ইতি

গুণময়দা

৩০

শিবেন,

খেলাই হাসপাতালের সব পেমেণ্ট পেয়ে গেছো শুনে খুশী হলাম। বসিরহাটের টেণ্ডার অ্যাকসেপ্টেড হলো কি না জানাবে।

আমি এখন দুর্গাপুরেই থাকবো। ইতি

গুণময় সেন

৩১

অনন্ত,

তোমার কয়েকখানা চিঠিই পর পর পেয়েছি। আমার যা বলার তা তোমাকে আগেই জানিয়েছি। ডাক্তার নার্সের ব্যাপারে আমার কিছুই করার নেই।

লিখেছো, হাসপাতাল বিল্ডিং-এর একটা দেয়াল ধসে পড়ছে। এ ব্যাপারেও আমাদের কিছু করার নেই। যথারীতি ইন্‌স্‌পেকশন হয়েছিলো, তখন কেউ কোনো ত্রুটি পায়নি। বাড়ির যত্ন না নিলে বাড়ি তো ধসে পড়বেই। ইতি

গুণময়দা

৩২

অনন্ত,

তুমি বারবার আমাকে বিরক্ত করছো কেন বুঝলাম না। এ ব্যাপারে আমার কিছুই করার নেই। ইতি

গুণময়দা

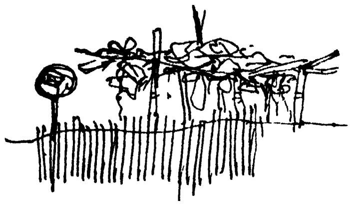
৩৩

শিবেন,

অনন্তর চিঠি এলেই ছিঁড়ে ফেলে দিও। রিডাইরেক্ট করে আমাকে পাঠানোর প্রয়োজন নেই। ইতি

গুণময় সেন

[১৩৭১



ছুরি

কাঁটাতারে-ঘেরা বাগানের মধ্যে ও আমার পাশে পাশে হেঁটে এসে পেয়ারাগাছটার নীচে দাঁড়ালো।

ওকে কিছু দেখাতে ইচ্ছে হলো।

একটা ডাল বেশ উঁচুতে, ডালে দু-তিনটে পেয়ারা ঝুলছে। ওকে দেখালাম।

সরু কোমরের ওপর ক্রমশ ফেঁপে ওঠা শরীরটা হেসে উঠলো। ও হাত বাড়িয়ে পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে একটা পেয়ারা পাড়বার চেষ্টা করলো। একবার লাফ দিয়ে ছুঁতে চেষ্টা করলো। পারলো না।

ওকে কিছু দেখাতে ইচ্ছে হলো আমার।

আমি হাত বাড়িয়ে অনায়াসে পেয়ারাটা পেড়ে দিলাম। বেশ বড় একটা ডাঁশা পেয়ারা।

ও মুগ্ধ চোখে আমার দিকে তাকালো, হাসলো মিষ্টি করে, যেন মনে মনে বললো, অনেক উঁচুতে তোমার হাত যায়, তুমি অনেক উঁচুতে।

পেয়ারাগাছের নীচে পরিষ্কার ঘাস ছিলো, ও ঘাসের ওপর বসে পড়লো হাঁটু মুড়ে 'দ' হয়ে। আমিও বসলাম।

ওর ব্লাউজের মধ্যে আরো কিছু থাকতে পারে আমি ভাবিনি।

—দেখি, দেখি, কি ওটা? আমি বলে উঠলাম।

ও টুপ করে ব্লাউজের বুকে হাত ডুবিয়ে ছোট্ট ছুরিটা ততক্ষণে বের করে ছুরির ফলাটা খুলে ফেলেছে। ছুরি বসিয়ে পেয়ারাটা দু ফালি করেছে।

বাঃ, ছুরিটা খুব সুন্দর তো! হাতির দাঁতের মতো রঙের ছুরির বাঁট, তাতে কারুকাজ রয়েছে। এত ছোট অথচ এত সুন্দর ছুরি আমি আগে কখনো দেখিনি।

—কোথায় পেলে? খুব সুন্দর তো। আমি হাত বাড়ালাম।

ও ছুরিটা দিলো না, আধখানা পেয়ারা এগিয়ে দিলো। বললো, ইস, অসিতকেই দিইনি!

ঐ সুন্দর ছুরিটা সব সময়েই ওর সঙ্গে সঙ্গে থাকতো।

যখনই দেখতে চাইতাম, ও ফলাটা বন্ধ করে টুপ করে ব্লাউজের বুকে ফেলে দিতো। আমার খুব ইচ্ছে হতো ওটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখতে। ইচ্ছে হতো ব্লাউজের দুর্ভেদ্য দুর্গ থেকে ওটা ছিনিয়ে আনতে। সাহস হতো না।

একদিন ওদের বাড়িতে ও ছুরিটা নিয়ে আনারস কেটে কেটে দিচ্ছিলো আমাকে।

বললাম, ছুরিটা দেখি।

—উঁহু। শুধু একটা শব্দ করলো ও মুখে, আর সরে বসলো, যাতে ছুরিটা কেড়ে নিতে না পারি। আমার দিকে না তাকিয়ে ঈষৎ হাসি ছোঁয়ানো ঠোঁটে অস্ফুটে বললো, অসিত কতবার বলে চেয়েছে। তাকেই দিইনি।

আমি প্লেটসুদ্ধ আনারস ঠেলে দিলাম। —অসিতকে দিও। বলেই গটগট করে বেরিয়ে চলে গিয়েছিলাম।

অসিতের সঙ্গে ওকে দেখলে, কিংবা অসিতের কথা ওর মুখে শুনলে আমার ভীষণ রাগ হতো। বুকের ভিতরটা জ্বালা করতো। অথচ ওর সঙ্গে কাঁটাতারে-ঘেরা বাগানে ঘুরতে, পাশাপাশি হাঁটতে আমার খুব ভালো লাগতো।

একদিন ওদের বাড়ি থেকে চলে আসছি, বাগানের মধ্যে দিয়ে লাল কাঁকরের রাস্তা ধরে লোহার ফটকের দিকে চলেছি, ও হঠাৎ বললো, এই, দাঁড়াও।

ব্লাউজের ভেতর হাত ডুবিয়ে ছুরিটা বের করে ফটকের পাশের রজনীগন্ধার বেড থেকে

গোটা কয়েক রজনীগন্ধা খচখচ করে কেটে স্টিকগুলো আমাকে দিলো।—তোমার টেবিলে রেখে দিও, কাল গিয়ে দেখে আসবো। বলে হাসলো।

আমি হাত বাড়িয়ে নিলাম। তারপর বললাম, ছুরিটা দাও না, দেখি একবার।

হাতির দাঁতের মতো ঘি-ঘি রঙের বাঁট ছুরিটার, সুন্দর কারুকাজ করা। আমার দেখতে খুব ইচ্ছে হলো।

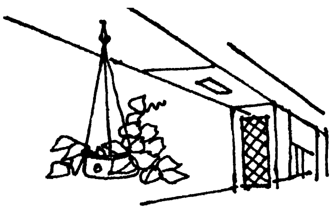
ও আমার চোখের দিকে তাকালো করুণভাবে, কি যেন বলতে চাইলো, তারপর সত্যি সত্যি ছুরিটা আমার দিকে এগিয়ে দিলো। বললো, নাও; তোমাকেই দিলাম, অসিতকেও দিইনি কোনো দিন। বলে মুগ্ধ চোখে হাসলো।

আর আমি অসিতের নাম শুনেই ছুরিটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে, ছুরির ফলাটা তখনো খোলা, ঝট্ করে সেটা ফিরিয়ে দিলাম ওর বুকে।

ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বেরুলো, ও বিমূঢ় চোখ তুলে আমার দিকে তাকালো, বুকের ওপর হাত বুলিয়ে রক্তমাখা হাতটা দেখলো বিস্ফারিত চোখে, তারপর ছুটে পালালো। আমার হাতে তখনো রজনীগন্ধার স্টিকগুলো।

আমার ধারণা হয়েছিলো ছুরিটা ওকে ফিরিয়ে দিয়েছি। সেই কুড়ি বছর আগের দিনটিতে। কিন্তু এখনো যখন একা থাকি, হঠাৎ গেঞ্জির ভেতর হাত ঢুকিয়ে বুকের ওপর চেপে ধরতে হয়। দুটো পাঁজরের ফাঁকে আটকে-থাকা ছুরির ফলাটায় বড় ব্যথা লাগে। মনে হয়, আসলে ওটা চুরি করে রেখেই দিয়েছি।

[১৩৭২



একুশ

আমি তখন একুশ। আমরা সকলেই।

এক-এক বেঞ্চে পাঁচজন করে সেঁটে আছে, সুরঞ্জন কনুইয়ের ধাক্কা দিয়ে বললো, অশোক, অশোক! থার্টি সেভেন এসেছে।

সেটা বোধ হয় কলেজের তৃতীয় দিন। ডাইনে-বাঁয়ে দু সারি নারায়ণী সেনা নিয়ে প্রফেসররা বসেন, রোল নাম্বার ধরে ডাকেন, মেয়েরা দস্তার মতো মুখ নিয়ে চুপচাপ বসে থাকে, নোট নেয়।

কেউ কারও নাম জানি না।

ভুলু বাঁ দিক থেকে বললো, গোলাপী শাড়ি। ববি, গোলাপী শাড়ি।

যেন কারও কিছু বলে দেওয়া দরকার ছিলো। যেন এক চুপড়ি গাঁদাফুলের ভিড়ে একটি ছোট্ট লাল গোলাপ হারিয়ে যেতে পারে।

আমি কোনো কথা বললাম না। ভুলু আমার ডাকনাম বলায় আমার একটু অস্বস্তি লাগলো।

পি. এন. জি. সেদিনই প্রথম। আমাদের চোখ তখনো তাঁকে যাচাই করছিলো।

তিনি বিশাল খাতাখানা খুলে রোল নাম্বারের বদলে নাম ধরে ডাকতে শুরু করলেন।

ছত্রিশটি নামের মধ্যে পাঁচ-সাতটি মেয়েও ছিলো। তারা উঠে দাঁড়িয়ে সীসের মতো হেসে, উপস্থিতি জানিয়ে, পানকৌড়ির মতো টুপ করে ভিড়ের মধ্যে ডুব দিয়েছিলো। তাদের আসল নাম কেউ শোনেনি, মুখে মুখে নতুন নাম চালু করেছিলো।

থার্টি সেভেনে এসে পি. এন. জি. তোৎলাতে শুরু করলেন। —দিশন...দিশান...দিশ্যান...

রাত্তিরে গোলাপী কুঁড়ি ছিলো, ভোরবেলায় হঠাৎ পাপড়ি মেলে লাল গোলাপ। থার্টি সেভেন ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে, তারা-ঝরানো হাসি, গোলাপী শাড়ি তো নয়, গোলাপের পাপড়িতে ধরা ভোরের শিশিরের মতো মুখ। বললে, দিশন্তী লাহিড়ী স্যার। লাহিড়ী পদবীটা সেই মুহূর্তে লহরীর মতো শোনালো।

কেউ কোনো কথা বললো না, কেউ কোনো টিপ্পনী কাটলো না। কেউ নতুন নামে তাকে বিদ্রূপ করলো না। ক্লাসসুদ্ধ সমস্ত তরুণের দল যেন 'একজন' যুবক—বিমুগ্ধ, রোমাঞ্চিত।

কয়েক দিনের মধ্যেই সমস্ত কলেজ জুড়ে দিশন্তী, দিশন্তী। দিশন্তী কারও দিকে এক পলক চোখ ফেললে সে ধন্য হয়ে যাবে। দিশন্তী কোনো ছেলের সঙ্গে দুটি কি একটি কথা বললে সমস্ত কলেজ যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ে সেই ছেলেটির টুঁটি চেপে ধরবে।

কিন্তু কি ছিলো দিশন্তীর! ছিপছিপে শরীর...সে তো অনেকেরই। এক মুঠো আবীর বাঁধা সাদা সিল্কের রুমালের মতো রঙ! আছে, আরো অনেকের আছে।

কিন্তু ঐ চোখ কারও নেই, কোথাও নেই। ঐ চোখ একবার দেখলে ভুলে যাওয়ার উপায় নেই। ওর শরীর, মুখশ্রী, চলার ছন্দ, চুল—সব যেন ওর দুটি চোখকে সাজিয়ে রাখার ফুলদানি।

আমি একদিন বললাম, দিশন্তীর চোখ দেখলে কি মনে হয় জানিস, ভুলু?

বললাম, দুটো ময়ূর মুখোমুখি।

আসলে আমি একটু-আধটু ছবি আঁকতে পারতাম। নোট লেখার খাতার পিছনে একদিন অন্যমনস্কভাবে দিশন্তীর ছবি আঁকার চেষ্টা করেছিলাম। দিশন্তীর—মানে দিশন্তীর চোখের। চোখের মধ্যেই ও যেন সম্পূর্ণ, ওর নাম শুনলে শুধু চোখ দুটোই মনে পড়ে যেতো। কিন্তু সেই চোখ হয়তো আঁকা যায় না। টানা-টানা দুটি চোখের ঢলে-পড়া ঢেউ আরো কয়েকটি রেখার মুখোমুখি দুটি ময়ূর হয়ে গিয়েছিলো।

চটুল অথচ স্নিগ্ধ, সরল অথচ দীপ্ত সেই চোখের তারায় কি যেন জাদু ছিলো।

সুরঞ্জন একদিন বললো, অশোক, হৃৎপিণ্ড তো একটা? বাঁ দিকে থাকে?

আমি ওকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বললাম, দিশন্তীর দুটি চোখের দিকে তাকানোর পর থেকে আমার দুটো বুকের দু দিকেই ধুকধুক করছে অনবরত।

ভুলু বললো, দিশন্তীর ওপর তোর বড্ড লোভ।

লোভ! লোভ কথাটা এত কুৎসিত আমি জানতাম না। সেই মুহূর্তে আমার মনে হলো দিশন্তী বৃষ্টি-ভেজা রাস্তায় পা পিছলে পড়ে গেল। মনে হলো ভুলু ইচ্ছে করে কলার খোসাটা ওখানে ছুঁড়ে দিয়েছিলো।

—রোল নাম্বার থার্টি সেভেন।

কেউ সাড়া দিলো না। আমরা জানতাম কেউ দেবে না। করিডরে করিডরে আমরা সকাল থেকেই ঘুরে বেড়িয়েছি, মেয়েদের কমন-রুমে ভিড় করে দাঁড়ানো হট্টগোলকে মনে হয়েছে একটা উপচে-পড়া ডাস্টবিন। কারণ দিশন্তী সেদিন আসেনি।

আমাদের কারও সেদিন কিছু ভালো লাগলো না। আমাদের কারও ক্লাস করতে ইচ্ছে হলো না। যেদিন নেহাতই দিশন্তীর সঙ্গে কোনাকুনি বসার মতো বেঞ্চি পেতাম না সেদিনই ক্লাস পালাতাম। দিশন্তী আসেনি, দেখা গেল অর্ধেক ক্লাস ফাঁকা।

ক্যাণ্টিনে, চায়ের কেবিনে, কোথাও সেদিন আর স্বস্তি নেই।

আমি বললাম, বিরক্ত করিসনে ভুলু।

সুরঞ্জন বললো, ধুৎ।

ভুলু বললে, শালা রাবিশ চা!

পরের দিনই দিশন্তী আবার এলো, আমরা আবার নিজেদের ফিরে পেলাম।

কিন্তু ও কিছুতেই যেন কারও দিকে চোখ তুলে তাকাতো না। কিংবা কারও দিকে তাকাতে হলে চোখের তারাকে স্থির হতে হয়, দিশন্তীর চোখ সব সময় অস্থির।

আমার ইচ্ছে হতো একবার, একবার অন্তত ওর চোখের সামনে পড়বো। দেখে দেখে মানুষের কতটুকুই বা আশ মেটে, দেখা দেওয়ার জন্যেই তো দেখা। উঁচু সিলিং, দীর্ঘ করিডরের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে গল্প করতে করতে হঠাৎ দেখলাম দিশন্তী দুটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে অন্য প্রান্ত থেকে আসছে। ভুলুকে সুরঞ্জনকে কনুইয়ের ইশারা দিয়ে এগিয়ে এলাম, কিন্তু কাছাকাছি পৌঁছনোর আগেই দিশন্তী প্রফেসরদের ঘরে ঢুকে পড়েছে, একটু পরেই হাসতে হাসতে বেরিয়ে গিয়ে কমন-রুমে।

কতবার সামনাসামনি পড়েছিও। কিন্তু...

—ও মাইরি নির্ঘাত ট্যারা। ভুলু ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলো। বলেছিলো, নিশ্চয় সোজা-সুজি তাকায়, আমরা ধরতে পারি না।

আমি তখন একুশ। আমরা সকলেই।

আমাদের তখন আরেকটা মন ছিলো, বয়সের মন। আমরা সবাই একটি-একটি শরীরকে ভালোবাসতে চাইতাম। একটি শরীরকে ভালোবাসতে পেতাম না বলে আমরা সকলের শরীরকে ভালোবাসতাম।

দিশন্তীর বাড়ি থেকে একটা সুন্দর দু ঘোড়ার ল্যান্ডো গাড়ি আসতো, স্কুল-ফেরত ওর ছোট বোন ফ্রক-পরা হাসি নিয়ে বসে থাকতো। মেয়ে-বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে করতে ও লোহার ফটক পার হতো, কাউকে হাত নেড়ে হাওয়ার-ভাসা কাশের মতো ছন্দে হেঁটে গিয়ে গাড়িতে উঠে বসতো। চোখ তখন ছোট্ট বোন কিংবা কোচোয়ান কিংবা রাস্তার কোনো মজা।

মৈনুদ্দিন ইশাভী একটা সাদা শেভ্রলে গাড়িতে আসতো। পদ্মাবতী বড়ুয়া আসতো একখানা রেসিং কারে। ঘোড়ার গাড়ি কলকাতার রাস্তায় তখন গ্যাসবাতির মতোই নিবু-নিবু, তবু ঝকঝকে ল্যান্ডোতেই দিশন্তীকে মানাতো।

মেজ বউদি তার দিদির ছোট দেওরের বউ দেখে এসে বললো, চোখ দুটো বেশ বড় বড়, বেশ সুন্দর।

বললাম, ধুস্, কাকে সুন্দর চোখ বলে তোমরা দেখেছো? বড় বড় চোখ তো গরুর মতো। আমাদের ক্লাসে দিশন্তী লাহিড়ীর...

মেজ বউদি সব-জান্তার হাসি হেসে বললো, আরে বোকা, ওরা সব এঁকে আসে।

আমি ভীষণ রেগে গিয়েছিলাম। চৌকাঠ ডিঙিয়ে বাইরে তো বেরোওনি, তুলসীর চারা তোমাদের কাছে বৃক্ষ। দিশন্তীর চোখ নাকি ড্রয়িং স্যারের খাতা।

দিশন্তীর বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে আমার গায়ে ছ্যাঁকা লাগতো। আমি মেজ বউদিকে বোঝাতে চাইতাম সুন্দর বলতে চোখ বোঝায়, সুন্দর চোখ বলতে দিশন্তী। অথচ কি নির্দয় আর অকৃতজ্ঞ দেখো মেয়েটা, একদিন চোখাচোখি তাকালো না, একটা কথা বলার সুযোগ দিলো না।

এমনি সময় একদিন শুনলাম ক্লাসের অনিরুদ্ধর সঙ্গে ওর নাকি আলাপ হয়েছে।

অনিরুদ্ধর ওপর আমার খুব হিংসে হলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আশা জাগলো। অনিরুদ্ধর সঙ্গে যখন আলাপ হয়েছে তখন আমাদের সঙ্গে আলাপেই বা বাধা কি।

কিন্তু দিশন্তী ছুটির পর চলে যেতেই আমাদের মন কেমন করতে করতে মন যেন কেমন হয়ে যেতো। আমরা তখন শরীর দেখার নেশায় মেতে উঠতাম।

ভুলু একটার পর একটা ট্রাম ছেড়ে দিতো।—এতখানি বসে বসে যেতে হলে পিঠ ব্যথা হয়ে যাবে মাইরি।

সুরঞ্জন একটার পর একটা দোতলা বাস ছেড়ে দিতো।—বাসটা শালা গল্স্‌ওয়ার্দির মতো বোরিং।

আসলে তখন তো ট্রামে-বাসে বসতে পাওয়া যেতো, কিন্তু ওসব তুচ্ছ সুখ-সুবিধে নিয়ে কে-ই বা মাথা ঘামায়।

—দেখ ববি, ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে যাওয়াটা কিচ্ছু নয়, চোখ টায়ার্ড হলেই শরীর ক্লান্ত।

ভুলু বলতো।

আসলে তখন আমাদের সকলের মনেই দেখার নেশা। এগিয়ে গিয়ে কথা বলার, আলাপ করার সাহস সুরঞ্জনেরও ছিলো না।

চক্ষুমৈত্রী বলে একটা কথা আছে না, প্রতি দিন কিংবা মাঝে-মাঝেই দেখা হতো তিন-চারটি সুশ্রী চেহারার মেয়ের সঙ্গে। অর্থাৎ বাস-স্টপে কিংবা ট্রামের সীটে তাদের দেখতে পেতাম। তারা দিশন্তীর মতো কৃপণ ছিলো না, চোখ তুলে তাকাতো দু-একবার, কেউ কোনো দিন মুখ ফিরিয়ে মৃদু হাসতো। কিন্তু চোখে চোখেই তারা চেনা হয়ে গিয়েছিলো।

কালো শাড়ি পরা একটা ফর্সা মেয়ে চাবটে চুয়াল্লিশে মাঝপথে উঠতো। সুরঞ্জন ঘাড় ধরে একদিন আধ ঘণ্টা পায়চারি করে তবে বাসে উঠেছিলো। তারপর থেকে রোজ। কখনো দেখা পেতো, কখনো পেতো না।

একদিন সুরঞ্জন আসেনি, কিন্তু মেয়েটা আমাদের দেখতে পেয়েই ভিড়ের মধ্যে সুরঞ্জনকে খুঁজেছিলো।

পরের দিন সে কথা শুনে সুরঞ্জন আমাদের দুজনকে চায়ের সঙ্গে দুখানা করে টোস্ট খাইয়েছিলো। ব্যাটা কিপটের জাসু, আমি হলে মামলেট খাইয়ে দিতাম।

ভুলু টোস্ট আর চা শেষ করে বলেছিলো, সুরঞ্জন, তোর টেস্ট নেই। মেয়েটার মধ্যে আছে কি? নিঙড়োলে এক ফোঁটা রক্ত বেরোবে না।

আমারও একজনকে একটু একটু ভালো লাগছিলো। বইখাতা বুকে নিয়ে এগারোটা সাতে সে আমাদের বাড়ির কাছের স্টপ থেকে...না, তার পরের স্টপ থেকে উঠতো। আমি তাড়াতাড়ি খেয়ে বেরিয়ে পড়তাম, হাতের ঘড়ি দেখতে দেখতে একটা স্টপ হনহন করে হেঁটে এসে বাস ধরতাম। যেদিন দেখতে পেতাম না সেদিন পনরো মিনিট কি আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করতেও খারাপ লাগতো না।

একদিন দেরি হয়ে গিয়েছিলো, দূর থেকেই দেখতে পেলাম কমলা রঙের শাড়ির মেয়েটি একটা বাস ছেড়ে দিলো। ভিড় ছিলো বলেই হয়তো। কিন্তু আমার ভাবতে ভালো লাগলো, আমার জন্য।

সে যাক গে, রাঙাদির ননদ কিন্তু প্রায়ই আসতো, মেজদি আর ছোটদির সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করে যাবার সময় আমার সঙ্গে হেসে দু-একটা কথা বলে যেতো। রাস্তায় একদিন দেখা হয়েছিলো, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে গল্প করেছিলো। একদিন—নিচের ঘরে মেজদিকে না পেয়ে ছাদে চলে এসেছিলো। আমি তখন ছাদে একা। আলসের ধারে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলো, মেজদি এসে পড়বে ভেবে আমি ভয়ে ভয়ে নিচে নেমে এসেছিলাম।

রাঙাদির ননদ নিশ্চয় ভুল বুঝেছিলো।

রাঙাদি একদিন বলেছিলো, আমার ননদের খুব চুল।

আমি বলেছিলাম, আমাদের ক্লাসে একটা মেয়ে পড়ে, এত সুন্দর চোখ। চোখই আসল।

লেকের ধারে একটা তালগাছের নিচে বসে আমরা আড্ডা দিতাম সন্ধ্যেবেলায়। বারট্রান্ড রাসেল আর হাক্সলি থেকে লীলা দেশাই হয়ে আমরা কিছুক্ষণ টেরিরিস্টদের মতো চটপট দেশোদ্ধার করে শেষে সুন্দর চেহারার কোনো মেয়েকে কোনো ছেলের সঙ্গে হাঁটতে দেখলে নিজেদের মধ্যে বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি কথা বলতাম।

তারপর ক্লান্ত হয়ে যখন বাড়ি ফিরতাম তখন হঠাৎ কখন দিশন্তীর দুটি চোখ আমার বুকের মধ্যে দুটি হৃৎপিণ্ড হয়ে ধুকধুক ধুকধুক করতো।

একদিন কলেজ ছুটির পর আমি আর সুরঞ্জন তর্ক করছি উত্তেজিত হয়ে, ভুলু ফটকের কাছ থেকে আরো উত্তেজিত গলায় বললে, ববি, ববি।

ও ছুটে এসে বললো, শিগগির চল্।

না বুঝেও তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম। দেখলাম ট্রাম-স্টপে দিশন্তী দাঁড়িয়ে আছে।

ভুলু বললো, গাড়ি আসেনি।

সুরঞ্জন বললো, ইস, যাবে তো উলটো দিকে।

আমি বললাম, চল্, চল্, না-হয় ফিরেই আসবো। তবু তো অনেকক্ষণ দিশন্তীর সঙ্গে এক ট্রামে থাকতে পাবো।

সেই প্রথম।

দিশন্তী আমাদের দেখে প্রথমটা একটু অস্বস্তিবোধ করলো। কিন্তু ট্রামে উঠে লেডিজ সীটে বসে চোখ তুলে তাকালো।

সেই প্রথম আমার সঙ্গে তার চোখাচোখি হলো।

হৃৎপিন্ড নাকি রক্তকমল। পদ্মের মতোই পাপড়ি মেললো আমার হৃদয়—আমার আবার হৃদয়!—আর পাপড়ি মেলে ধরা পদ্মের মাঝখান থেকে ফিনকি দিয়ে রক্তের ফোয়ারা ছুটলো।

একসময় দিশন্তী নেমে গেল। কে যেন পার্কের ফোয়ারাটা চাবি ঘুরিয়ে হঠাৎ বন্ধ করে দিলো।

'অনিরুদ্ধটা ভীষণ সেল্‌ফিশ', আমি বলেছিলাম। কারণ অনিরুদ্ধ একদিন তো আলাপ করিয়ে দিতে পারতো। কিন্তু সে কথা শোনার পর থেকে ও কেমন এড়িয়ে এড়িয়ে চলতো।

আমার সন্দেহ হতো, অনিরুদ্ধ হয়তো দিশন্তীকে ভালোবাসে। দিশন্তী অনিরুদ্ধকে ভালোবাসতে পারে এ কথা ভাবতেও আমার বুক ফেটে যেতো।

অথচ আমি তো তাকে ভালোবাসতাম না। আমার শুধু সুন্দর ছবি কিংবা ক্রিসেন্থিমাম দেখার মতো দিশন্তীকে দেখতে ভালো লাগতো, দিশন্তীর চোখ—

একদিন দুপুরে হঠাৎ কলেজের গেটের কাছে দেখলাম একজন দাঁড়িয়ে আছে, দু আঙুলের ফাঁকে সিগারেট ধরে উদাস-উদাস চোখে অপেক্ষা করছে। শ্যাম্পু-করা হাওয়ায়-ওড়া চুল ভদ্রলোকের, বেজায় ফর্সা আর লম্বা, মুখে কেমন মিষ্টি কুয়াশা লেগে আছে।

দিশন্তী হাসতে হাসতে কোত্থেকে এগিয়ে এলো, কথা বললো তার সঙ্গে, তারপর দুজনে তারা হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল।

প্রথমটা আমার বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠেছিলো, পরক্ষণেই আমি খুশী হয়ে উঠলাম। মনে হলো আমি যেন অনিরুদ্ধের ওপর রীতিমতো একটা রিভেঞ্জ নিয়েছি।

কলেজ ছাড়ার দিনে আমি যতবার পারলাম, যতক্ষণ পারলাম দিশন্তীকে দেখলাম। অন্য সকলেই হয়তো খুব খুশী, এতদিনে কলেজের বাঁধন কাটলো, আমার কেবলই মনে হচ্ছিলো, এর পরই শূন্যতা।

আমরা সকলেই—আমি, সুরঞ্জন, ভুলু পরস্পর থেকে ছিটকে পড়েছিলাম।

সুরঞ্জন যখন বিয়ে করলো তখন বরযাত্রী গিয়েছিলাম। গল্প করতে করতে ভুলু বললো, দিশন্তীকে মনে আছে?

আমি ভেবেছিলাম দিশন্তীকে ভুলে গেছি, কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার বুকের মধ্যে কেমন করে উঠলো।

সুরঞ্জন বরের আসনে বসেই বললো, জানি, জানি। সেই বেজায় ফর্সা উদাস-উদাস লোকটাকেই বিয়ে করেছে।

ভুলুর বড় ছেলের পইতের সময় আবার দিশন্তীর নাম শুনলাম। সুরঞ্জন আসেনি, সে তখন নাগপুরে বদলি হয়েছে। ভুলু বললো, চিঠি দেবো কি, ঠিকানাই জানি না। অনিরুদ্ধ এসেছিলো, সে বললো, দিশন্তীর মেয়ে খুব সুন্দর দেখতে হয়েছে।

আমি কিছুই বললাম না। কিছুই বললাম না দেখে ওরা একবার আমার টাক নিয়ে ঠাট্টা করলো, তারপর বললো, টাকের জন্যেই নাকি আমার বিয়ে হলো না।

আমি শব্দ করে হাসলাম। সঙ্গে সঙ্গে রাঙাদির ননদের কথা মনে পড়ে গেল। আমি একদিন সিঁড়ির বাঁকে তার হাত ধরেছিলাম। হাত ছাড়িয়ে ও ভয়ে পালিয়েছিলো, কিন্তু তারপর থেকে এমন চোখে তাকাতো আমি বেশ বুঝতে পারতাম।

বিয়ের পর প্রথমে একটা বাচ্চাকে নিয়ে সে আসতো কখনো কখনো, তারপর দুটো বাচ্চাকে নিয়েই আসতো। শেষে তিনটে বাচ্চাকে নিয়ে। আমার তখন বিরক্ত লাগতো।

তারপর একদিন হঠাৎ অনিরুদ্ধ আমার বাড়িতে এসে হাজির হলো। ওর ছেলেকে কলেজে ভরতি করানোর জন্যে।

কথায় কথায় ও বললো, আমরা সবাই বুড়িয়ে গেলাম, দিশন্তী কিন্তু এখনো সুন্দর।

আমি বললাম, তার সঙ্গে তোর এখনো দেখা হয়?

—বাঃ, হয় না? এলেই তো দেখা করি। অনিরুদ্ধ বললো। তারপর একটু থেমে বললো,

তোর কথাও একদিন বলছিলো।

আমি বেশ বুঝতে পারলাম, ও ফ্ল্যাটারি করছে। হেসে বললাম, আমার কথা? আমাকে ও চিনতোই না।

অনিরুদ্ধ সিরিয়াস হয়ে গেল। —কি বলছিস? তোকে চেনে, চেনে। তুই নাম-করা কলেজের নাম-করা প্রফেসর...

অনিরুদ্ধ একটা ইডিয়ট। আমি যেন সেই চেনার কথা বলছি।

আমি দিশন্তীকে চিনি, কারণ তার কথা উঠলেই আমার চোখের সামনে মুখোমুখি দুটো ময়ূর ভেসে ওঠে। দুটি চোখ।

অনিরুদ্ধ হাসলো। বললো, একুশ বছর পার হয়ে গেছে মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড, একুশ বছর। সেই চোখ দিশন্তীর অনেক কাল হারিয়ে গেছে।

একুশ বছর?

আমি চমকে উঠলাম। হিসেব করলাম। হ্যাঁ, একুশ বছর।

আমি তখন একুশ। আমরা সকলেই।

কিন্তু বিশ্বাস হলো না, দিশন্তীর সেই চোখ হারিয়ে যেতে পারে।

সুরঞ্জনের দুটো অ্যাটাক হয়ে গিয়েছিলো, থার্ড অ্যাটাকে ও মারা গেল। মাত্র বছর খানেক আগে ও বদলি হয়ে এসেছিলো।

ভুলু সক্কালবেলাতেই খবর দিলো। আমরা কেওড়াতলায় গেলাম, অনিরুদ্ধ বললো, ইলেকট্রিকে পোড়ানো হবে, ইলেকট্রিকে।

থমথমে মুখে সবাই বসে ছিলো, দাঁড়িয়ে ছিলো, ফিসফিস কথা বলছিলো।

শুধু ভুলু বললো, চুল্লী খালি হতে আরো এক ঘণ্টা।

আর আমি হঠাৎ দেখলাম দূরে দাঁড়িয়ে—দিশন্তী। কালো-পাড় সাদা শাড়ি, মুখে বিষন্নতা আঁকা।

ভুলু বললো, অনিরুদ্ধর সঙ্গে এসেছে।

অনিরুদ্ধ একসময় বললো, পালাস না, তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো।

আর অনিরুদ্ধ ওর দিকে যখন এগিয়ে গেল, আমি দেখলাম, দিশন্তীর সেই চোখ সত্যি হারিয়ে গেছে। দিশন্তী যেন অন্য মানুষ।

আমি আর ভুলু কিছু না বলে চলে এলাম। কারণ, আমাদের তখন ভীষণ খারাপ লাগছিলো। আমার, আমার কান্না পেলো। সুরঞ্জনের জন্যে নয়, নিজের জন্যে। দিশন্তীকে দূর থেকে দেখে আমার মনে হলো আমি বুড়িয়ে গেছি।

সেই প্রথম মনে হলো, আমার সব হারিয়ে গেছে।

এতদিন ভাবতাম, আমি এখনো একুশ। আমরা সবাই।

দিশন্তীর ঈষৎ মোটা-হওয়া সুন্দর চেহারায় সবই ছিলো, ছিলো না শুধু সেই চোখ। একুশ বছর পরে আমার কিছুই ছিলো না, ছিলো শুধু একুশ বছরের চোখে দেখা এক জোড়া চোখ।

তাও হারিয়ে গেল। সেই একুশ বছরের বয়সটা চিরকালের জন্যে হারিয়ে গেল।

[১৩৭২



ফিরে আসা

গ্রামের নাম কানিয়ালুকা। শুদ্ধ করে বলতে হয়—কন্যালুকা। শুধুই একটা খেয়ালী মিষ্টতা, নাকি কোনো ইতিহাস লুকিয়ে আছে ও নামের পিছনে? কোন্ সে কন্যা, যাকে হাঙরের লোভ থেকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিলো, ওখানে! কিংবা, কে জানে, পুরুষচিত্তে লোভ জাগাবার মতো কন্যা এখনো হয়তো ঐ জংলা গ্রামেই লুকিয়ে আছে।

মুশাবনীর রোপওয়ের বাকেটের সারি চলেছে মাথার ওপর দিয়ে, মাটিতে হাওয়ায় কি এক বিচিত্র ধাতব গন্ধ। চালকো পাইরাইট ওর্-এর বাকেট থেকে, কিংবা খনিজ কপারের গভীর খাদ থেকে রেণু রেণু তাম্রগন্ধ এসে মিশছে বাতাসে। পাথর, বনঝোপ, আঁকাবাঁকা ট্রেঞ্চের মতো অগভীর খাদ—রক ফসফেট, অ্যাসবেসটস, কোয়ার্টজাইট। রত্নগর্ভা মাটি মুশা-বনীর। মাটি, কিংবা সাদা আর সবুজাভ কায়ানাইটের পাথুরে ওর। ওদিকে জাদুগোরায় ইউরেনিয়াম মাইন্স্—ড্রিলিং-এর আওয়াজ আসছে সেখান থেকে।

তীব্র শীতের বিকেলে আমরা চার বিবেকবান ভদ্রসন্তান বেওয়ারিশ লম্পট হয়ে উঠতে চাইছিলাম। নবাবী গেস্ট হাউসের আরামের দেয়াল যেন আমাদের টুঁটি চেপে ধরতে চাই-ছিলো। হাটের সেই উন্মত্ত যৌবনের শরীরী অরণ্যতার মধ্যে আমরা মুক্তি চাইছিলাম।

—কোথায় বাড়ি রে তোর? অবিনাশ জিগ্যেস করেছিলো মেয়েটাকে।

কালো চকচকে মুখটা পরিচ্ছন্ন দাঁতের হাসি ছিটিয়ে বলেছিলো, কানিয়ালুকা গো, ঐ শুড়িগ পাহাড়ের লিচে।

কানিয়ালুকা নামটা তখনো আমাদের কানের পাশে গুনগুন করছে।

কিন্তু জিওলজিস্ট সুনন্দর পাশে পাশে ঘুরছে ছোটু প্রধান। কেউ কেউ বলে ছোটু মিঞা। বেঁটেখাটো গোলগাল চেহারার লোকটা হঠাৎ মিঞা হলো কেন বলা দুষ্কর।

সুনন্দর পিছনে যেন আঠার মতো লেগে আছে প্রথম দিন থেকে। ঠিক গেস্ট হাউসের বিনয়ী খানসামা মৈনুদ্দিনের মতো।

সুনন্দ নালার মতো সরু সরু খাদের এক-এক টুকরো ওর তুলে ধরছে চোখের সামনে, বলছে, এই লেয়ারটা, বুঝলি বরেন, কায়ানাইটের। এই যে সবুজ-সবুজ পাথর...

কিংবা একটা কালো মাটির ঢেলা তুলে বলছে, এই সোনালী-সোনালী ফাইবার—এ হলো কপার পাইরাইট। তামা, তামা।

অবিনাশ বিরক্ত হয়ে বললো, ধুত্তোর, কোন্টা অ্যাসবেসটস, কোন্টা কোয়ার্টজাইট জেনে আমার কি হবে?

—উ চিনাই তো আসল বাবু! ছোটু প্রধান দাঁত বের করে হেসে উঠে বললো। তারপর ধীরে ধীরে সুনন্দকে বললো, একটা মাটি ইজারা করে দিন হুজুর, ব্যস্, ছোটু আপনার গোলাম।

অবিনাশ ক্ষেপে উঠেছিলো। সে বললো, তার চেয়ে একটা ভালো সাঁওতাল মেয়ে চিনিয়ে দাও না বাবা, আমরা তোমার গোলাম হয়ে যাবো।

সুনন্দ ভুরু কোঁচকালো। জিওলজিস্ট সুনন্দর এখানে অন্য চেহারা, অন্য খাতির। এক মুঠো হলুদ-হলুদ মাটি তুলে ও বলে দিতে পারে কত পার্সেণ্ট রক ফসফেট আছে, কিংবা আছে কি না।

তাই সুনন্দ অপ্রতিভ হলো, হলো না ছোটু মিঞা। সে দাঁত বের করে হেসে বললো, সে আপনি হুকুম দিন না বাবু, আমার কুঠিতে চলেন, কোতো রেজা আছে উখানে, দেখে পসন্দ্ করে লেবেন! বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠলো।

বরেন বললো, উঁহু, একটা জীপ চাই।

অবিনাশ বললো, কানিয়ালুকা!

পরের দিন বিকেলেই একটা জীপ এসে হাজির।

ছোটু মিঞা বলেছিলো, পারি হুজুর, সোব পারি। লোকটা বোধ হয় সত্যি সত্যিই সব পারে।

আমরা তখন গেস্ট হাউসের বারান্দায় বসে দূরের শালবন, খয়ের আর হরীতকীর ঝোপের দিকে তাকিয়ে আছি। তোয়ালে-কাঁধে মৈনুদ্দিন খানসামা কে কি ব্রান্ডের সিগারেট খায় চোরা চোখে দেখে নিয়ে দু-দু প্যাকেট সিগারেট সকলের সামনে রেখে দিয়ে গেছে।

তা দেখে বরেন বললো, শালার সত্যি নবাবী ব্যাপার রে!

অবিনাশ ক্ষোভের স্বরে বললো, নবাবী ব্যাপারের আসলটাই তো নেই। সাঁওতালী মেয়ে-টেয়ে...

ঠিক সেই মুহূর্তে জীপের হর্ন শোনা গেল।

অবিনাশ লাফিয়ে উঠে বললো, কানিয়ালুকা!

মন চঞ্চল হয়ে উঠলো আমাদের সকলেরই।

দূরে দূরে পাহাড়, ঘন পাহাড়ী বন, তামার খাদ, এদিকে একটা সাঁওতালী হাট, হাটে লালপাড় শাড়ি, হাত-কাটা মহাজন মেওয়ালাল—ব্যস্। দেখে দেখে চোখ পচে গেল। পরিত্যক্ত রাখা মাইন্স্ এলাকায় ঝোপঝাড় জঙ্গলের মাঝে মাঝে এক-একটা শ্যাওলা-ধরা নিঃসঙ্গ পাঁচিল, নয়তো মাটিতে মিশে যাওয়া কোনো অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ।

মৈনুদ্দিন এসে ফিসফিস বিনয়ে বললো, জীপ আয়া হুজুর।

দূর থেকে উঁচু পাহাড়—শুঁড়িগি পাহাড় আর বন, আর শাড়ির পাড়ের মতো টান-টান শাঁখ নদীটা, গেরুয়া স্লেট-হলুদে রাঙানো সাঁওতাল পল্লীর পরিপাটি বাড়িগুলো যেন হাত-ছানি দিয়ে ডেকে উঠলো।

মিহি শীত শরীরে চামরের বাতাস দিচ্ছিলো এ ক'দিন। বিকেল থেকে সেটা যেন জমাট বাঁধতে শুরু করেছে। অদূরের লাইসেন্স্ড্ ডিস্টিলারী থেকে এক ঝল্‌কা রমরমে গন্ধ ভেসে আসতেই মনটা চাঙ্গা হয়ে উঠলো।

গরম প্যান্ট আর ফুল-হাতা সোয়েটারে শরীর ঢেকে আমরা এসে জীপে উঠলাম। পশ্চিমের লাল আকাশটা তখন ক্রমে ক্রমে মাটির ওপর ঝুলে পড়ছে।

ড্রাইভারকে নামিয়ে দিয়ে অবিনাশ স্টিয়ারিঙ-এ বসলো।

কয়েকটা হাট-ফেরতা সাঁওতাল মেয়ে সাদা ফটফট শাড়ির মধ্যে সিল্যুট ছবি হয়ে গিয়ে ছমছম হাসি ছিটিয়ে চলে গেল।

কিন্তু অবিনাশ স্টার্ট দিতেই মৈনুদ্দিন ছুটে এলো। পিছন থেকে লাফিয়ে উঠে বসলো। —আপকা ধন্দেমে...মুঝে ছোড়্‌কে...

ওর সেবা থেকে পরিত্রাণ পাবার যেন উপায় নেই।

স্টার্ট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা বেশ জোর জার্ক খেলো গাড়িটা। বেশ বোঝা গেল অবিনাশ রেগে গেছে।

মৈনুদ্দিন বললো, সাবধানে চালান হুজুর, বড়ি আফৎ কি রাস্তা .

অবিনাশ কানেও তললো না ও কথা। মেঠো রাস্তার মোড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাহাড়ী পথটার দিকে গাড়ি ছুটিয়ে দিলো।

অন্ধকার নেমে আসছে ক্রমে ক্রমে। অন্ধকার, শীতের রাতের অন্ধকার আরেকটু জমাট হতেই পূর্ণিমার বিশাল লাল-হলুদের চাঁদটা কোন্ ফাঁকে হঠাৎ ছোট হয়ে গেল, রূপো হয়ে গেল, এতক্ষণ নজরে পড়েনি। এখন আকাশ-ছোঁয়া শালগাছের মাথার ওপর সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

এদিকে গোঁয়ারের মতো গাড়ি চালাচ্ছে অবিনাশ।

—আঃ, লাভ্‌লি। চাঁদটার দিকে তাকিয়ে আমি বলে উঠলাম।

বরেন বললো, লাভ্‌লি কিছু পেলে তো!

পাহাড়ের ঢল বেয়ে কাশঝোপের মধ্যে দিয়ে জীপ ছুটছে তখন।

সুনন্দ বললো, এবার কানিয়ালুকা গ্রাম!

—কানিয়ালুকা? স্টিয়ারিঙ-এ বসে অবিনাশ বলে উঠলো।

কিন্তু কি শান্ত, স্তব্ধ নির্জন গ্রাম। মানুষ আছে বলে মনেই হয় না। যেন একটা বোবাদের গ্রাম। দু পাশে ঝোপঝাড়, মাঝখানের সরু ধুলোর রাস্তাটা যেন গ্রামটাকে দু ভাগ করে দিয়ে গেছে।

নির্জীব পড়ে আছে। মাটির দেয়ালে চাঁদের আলো পড়েছে। মাঠে, ক্ষেতে। ঝিঙের ক্ষেত, চালের ওপর কুমড়ো আর শিম উঠেছে লতিয়ে।

ধুলোয় চাকা ডুবে যাচ্ছে। পিছনে ধুলো উড়ছে।

—গ্রামটা মরে গেছে নাকি? আমি প্রশ্ন করলাম।

মৈনুদ্দিন হাসলো।—সব খাদে কাজ করতে গিয়েছে হুজুর, রাতে ফিরবে।

সুনন্দ বললো, চল্ তা হলে পাহাড়ের ওপর। রিয়েল ফরেস্ট দেখে আসবি।

অবিনাশ অ্যাক্সেলারেটারে পা চাপালো। গোঁ গোঁ আওয়াজ করে জীপ গতি বাড়ালো। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা ছাগলের চীৎকার শোনা গেল।

—শালার ছাগল চাপা দিয়েছি রে! অবিনাশ ব্রেক কষে বলে উঠলো।

—ছাগল! যেন কিছুই নয় এমনভাবে হেসে উঠলো বরেন।

কিন্তু মৈনুদ্দিনকে মুহূর্তে বড় চঞ্চল দেখালো। ওর চোখে মুখে গলার স্বরে আতঙ্ক। —পালান হুজুর, পালান।

অবিনাশ স্পীড বাড়িয়ে দিলো।

আমরা শুধু বুঝতে পারলাম না এত আতঙ্কের কি থাকতে পারে। কিন্তু মৈনুদ্দিনের নড়ে-চড়ে বসায়, তার গলার স্বরে এমন কিছু ছিলো, যা আমাদের ভয় ধরিয়ে দিলো।

আমরা ফিরে তাকিয়ে দেখলাম। না, কেউ ছুটে আসছে না, কেউ চীৎকার করছে না।

অনেকখানি এসে তবে আমরা নিশ্চিন্তে হাসাহাসি করলাম।

বরেন বললো, ধরা পড়লে ঠ্যাঙাতো নাকি রে!

মৈনুদ্দিন চুপচাপ, গম্ভীর। ও ধীরে ধীরে বললো, এদিকে ফিরবেন না হুজুর।

মৈনুদ্দিন বললো, ওদিক দিয়ে নামলে শাঁখ নদী, এখন পানি বহুত কম, ওদিক দিয়ে রাস্তা আছে।

—রাস্তা আছে? জীপ চালাতে চালাতে অবিনাশ আশ্বস্ত হলো।

কিন্তু আমরা আশ্বস্ত বোধ করতে পারলাম না। মনে হলো, কেবলই মনে হলো, সড়কি বল্লম টাঙি নিয়ে যেন সাঁওতাল পল্লীটা ধাওয়া করে আসছে।

পাহাড়ের উপর উঠে ঘোরানো সিঁড়ির মতো আঁকাবাঁকা রাস্তা বেয়ে বুনো ফুলের গন্ধ, দৈত্যের মতো ছায়া-ছায়া জংলা গাছ, লতা-ঝোপ, চিংকি-চাক চিংকি-চাক পাখির ডাক আর ভামের কান্না ছাপিয়ে মরা ছাগলটার ঠিকরে বেরিয়ে আসা চোখ দুটো আতঙ্ক জাগালো থেকে থেকে।

চিংকি-চাক! চিংকি-চাক! আর একটা ডাক শুনলাম।

সেই নিঃশব্দতার মধ্যে ঐ রহস্যজনক শব্দটায় শরীরে কেমন যেন একটা সিরসিরানি বয়ে যায়।

বেশ খানিকটা এসে একটা ছোট্ট পাহাড়ী গ্রাম দেখে তবে আশ্বস্ত হওয়া গেল।

একটা জঙ্গল-চৌকি ঘিরে কয়েকটা মাটির ঘর। লম্ফ হাতে একটা সাঁওতাল মেয়ে একটা ঘর থেকে অন্য ঘরে গেল।

সুনন্দ একটা চিমটি কাটলো।

মৈনুদ্দিন চুপচাপ বসে ছিলো, বললো, বাঁয়ের রাস্তা নদীর দিকে গেছে।

অবিনাশের হয়তো থামার ইচ্ছে ছিলো, কিন্তু থামতে পারলো না। শুধু বললো, ধুৎ, মিছিমিছি আসা।

মৈনুদ্দিন হঠাৎ দার্শনিক হয়ে উঠলো নাকি? ধীরে ধীরে বললো, জিন্দগী মে কুছ ভি বেফায়দা নেহি হোতা হুজোর!

জীবনে কিছুই নাকি অকারণ নয়। নয়ই তো। এই শীতের সুন্দর রাতটা, এই নিঃশব্দ আতঙ্কের ঘন বনের পথ, এই চাঁদ কি আর কখনো দেখেছি?

দেখার তখনো বোধ হয় বাকী ছিলো।

আমরা সকলেই তখন নিশ্চিন্ত। দূরে, পাহাড়ের ঢল থেকে নামতে নামতে নদীর ওপরের বালি দেখতে পাচ্ছি। একটা আনকোরা শাড়ি যেন চাঁদের আলোয় কেউ বিছিয়ে রেখেছে।

—লাভ্‌লি! লাভ্‌লি! কে বললো যেন।

কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই আমাদের দুশ্চিন্তায় মুষড়ে পড়তে হবে কে জানতো।

বালি নয়, জল।

নদীর জল শুকিয়ে যায়নি, বেশ স্রোত রয়েছে কোমর-ডোবা জলেও।

আমরা বিমূঢ় হয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইলাম।

অবিনাশ শুধু বললো, তা হলে?

সুনন্দ হেসে উঠে বললো, জীপ ঘুরিয়ে নে।

বরেন বললো, এখন রাত ন'টা! খিদেয় পেট চুঁইচুঁই করছে।

আমি বললাম, ফেরার পথে, ভয় কি, আমাদের রোস্ট বানিয়ে দেবে।

কেউ হাসলো না। কেউ হাসলো না দেখে আমিও ভয় পেলাম।

ফিরে চলেছি। ফিরে চলেছি। উঃ, আবার এই পাহাড়টার সরু ঘোরানো সিঁড়ির মতো ঘুরপাক-খাওয়া রাস্তা ধরে ওপরে উঠতে হবে। তারপর আবার নামতে হবে, নামতে হবে সেই ফেরার পথ ধরে।

কিন্তু এবার আর কারও মুখে কোনো কথা নেই।

আমি সাহস দেবার জন্যে বললাম, এত চুপচাপ কেন সব। অ্যাঁ? আমরা যে চাপা দিয়েছি তার প্রমাণ কি? কেউ তো দেখেনি।

বরেন বললো, ঠিকই তো, তা ছাড়া হয়তো কেউ দেখেওনি এখনো।

মৈনুদ্দিন কোনো কথা বললো না। মনে হলো ও-ই সবচেয়ে বেশী ভয় পেয়েছে।

সুনন্দ বললে, আরে দূর, ফিরতে ফিরতে রাত এগারোটা হয়ে যাবে, ঘুমিয়ে পড়বে সব। ঠিক তো! মাঝ রাত অবধি কে আর জেগে থাকবে।

সুনন্দর কথায় সবাই নিশ্চিন্ত বোধ করলো। সুনন্দ যখন এখানকার মাটি চেনে, তখন নিশ্চয় মানুষও চেনে।

আমরা আবার রসিকতা করতে শুরু করলাম। গলা ছেড়ে গান ধরলো বরেন।

এদিকে পথ যেন আর ফুরোতে চায় না। পাহাড়টাকে পাক দিয়ে দিয়ে আমরা যেন তার সাত পাকের বন্ধনে আটকে গেছি, ছাড়া পাবার উপায় নেই।

সেই বন, সরু ধুলোর রাস্তা, চিংকি-চাক চিংকি-চাক ..

অবিনাশ হঠাৎ বললো, গান থামা বরেন।

সুনন্দ বললো, এসে গেছি।

জীপটা তখন পাহাড়ের ঢল বেয়ে সেই সাঁওতাল গ্রামের সরু রাস্তাটার দিকে মোড় নিয়েছে।

না! কেউ কোথাও নেই মনে হচ্ছে। মশাল হাতে, কিংবা সড়কি বল্লম টাঙি হাতে কেউ হই-হল্লা করছে না। মাদল বাজিয়ে আগুন ঘিরে কেউ আমাদের জীবন্ত রোস্ট করার জন্যে আনন্দে নাচছে না।

অবিনাশ হেসে উঠে বললো, মিথ্যে ভয় পেয়েছিলি।

আমরা কলরব করে হাসতে গিয়ে মৈনুদ্দিনের কথায় থমকে গেলাম।

মৈনুদ্দিন চাপা গম্ভীর গলায় বললো, হেডলাইট বুদা দিজিয়ে!

ঝপ করে হেডলাইট নিবিয়ে দিলো অবিনাশ।

তারপর চাঁদের আলোয় ফুটফুট করা সাদা ধুলোর শীর্ণ রাস্তা ধরে নিঃশব্দে এগোতে শুরু করলো জীপটা।

আর আধ মাইল। দূর থেকে নির্জন নিস্তব্ধ গ্রামটা দেখা যাচ্ছে। না, একটাও লোক দেখা যাচ্ছে না। আলো জ্বলছে না।

নিশ্চিন্ত বোধ করছি সবাই। নিশ্চিন্ত হয়েই হয়তো স্পীড বাড়িয়ে দিলো অবিনাশ।

আর রাস্তাটা মোড় ঘুরতেই দূর থেকে—সবাই আমরা সোজা হয়ে বসলাম।

রাস্তার ওপর চাঁদের আলো পড়েছে। চাঁদের আলোয় সাদা-সাদা থোকা-থোকা জুঁই-ফুলের মতো ফুটফুট করছে কি যেন!

অবিনাশ নাকের ভেতর দিয়ে একটা শব্দ করে হঠাৎ হেডলাইট জ্বাললো। আর আমরা সবাই আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

জীপ থামিয়ে দিলো অবিনাশ।

রাস্তা রোধ করে রাস্তার ওপর অগুন্তি মানুষ। কালো কালো মানুষ। সাদা শাড়ি আর ধুতি ফুটফুট করছিলো এতক্ষণ, হেডলাইটের আলোয় স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

জীপ এক চাকাও এগোলো না।

পঁচিশ গজ দূরেই অসংখ্য মানুষ রাস্তা জুড়ে বসে আছে। নিঃশব্দ নির্বাক।

গাড়ি দেখেও তারা নড়লো না, এগিয়ে এলো না, চীৎকার করলো না। কথা বললো না।

সে এক অদ্ভুত আতঙ্ক। সে এক অসহ্য যন্ত্রণা।

এক পা এক পা করে এগিয়ে চলেছে জীপ, আবার থমকে থামছে।

আমরা চাইছি ওরা কিছু বলুক। ওরা বলুক, ছাগল চাপা দিয়েছো তোমরা। তা হলে আমরা একটা অজুহাত দিতে পারবো, বলতে পারবো, আমরা নির্দোষ।

কিন্তু না, জীপ এগিয়ে আসতে দেখেও তারা নড়ে বসলো না। যেমন রাস্তা জুড়ে বসে ছিলো, তেমনি বসে রইলো।

মানুষ, মানুষের মাথা। কত মানুষ তার হিসেব নেই। হয়তো এক শো, হয়তো দু শো। কিন্তু হেডলাইটের আলোয় দেখা যাচ্ছে তাদের হাতে কোনো সড়কি বা বল্লম নেই, একটা লাঠিও নেই।

নিরস্ত্র নির্বাক একটি জনপদ যেন প্রতিবাদের মূক মুখে চুপচাপ বসে আছে।

জীপ একেবারে তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, তবু কোনো কথা বলছে না তারা। কেউ দাঁড়িয়ে উঠছে না।

বাধ্য হয়েই আমরা তাদের উঠতে বললাম, পথ দিতে বললাম।

এবারও নির্বাক।

—কি, হয়েছে কি? মৈনুদ্দিন নেমে দাঁড়ালো।—আমি মৈনুদ্দিন, চিনিস না আমাকে?

কোনো জবাব নেই।

ভয়ে ঘাম দিচ্ছে সারা শরীর। সারা রাত কি এখানেই কাটাতে হবে নাকি? কিংবা আরো সাংঘাতিক কিছু!

—এই বুধন! চেনা লোক দেখতে পেয়ে এগিয়ে গেল মৈনুদ্দিন।

কিন্তু ছোকরা বুধন চোখ তুলে তাকালো না। যেমন বসে ছিলো তেমনি বসে রইলো।

এবার বুড়ো গোছের মোড়লটাকে দেখতে পেলো মৈনুদ্দিন।

এগিয়ে গেল তার কাছে।

আর বুড়োর সামনে গিয়ে মরা ছাগলটা দেখতে পেলো।

ছাগলটা সামনে ফেলে রেখে বসে আছে সমস্ত গ্রামের লোক।

মৈনুদ্দিন হেসে হালকা হবার চেষ্টা করলো। —আমি মৈনুদ্দিন। ভাটিখানার মৈনুদ্দিন। কাল যাবি তোরা। নেশা করবি, দারু পিয়ে ফুর্তি করবি...রাস্তা ছাড়।

বুড়ো মোড়ল এবার জোরে মাথা নাড়লো। না, না, না।

আমরা এবার সাহস করে জিগ্যেস করলাম, কি চাস তবে?

একমুখ হেসে বুড়ো হাতের দশটা আঙুল দেখালো।

দশ টাকা!

যার পকেট থেকে যা বের হলো নিয়ে দশটা টাকা দিয়ে দিলাম বুড়ো মোড়লের হাতে।

আর সংগে সংগে হইহই করে দাঁড়িয়ে উঠলো সকলে। ফুর্তিতে চীৎকার করে পথ ছেড়ে দিলো।

অবিনাশ আবার স্টার্ট দিতে যেতেই বুধন মরা ছাগলটা নিয়ে ছুটে এলো।—এটা লিয়ে

যা বাবুরা, তুরা দাম দিয়েছিস!

আতঙ্কের পারাটা তখন তরতর করে নেমে গেছে।

বললাম, না রে, ওটা তোরাই খাবি। রেখে দে।

—উঁহু, সে চলবে না, তুরা দাম দিয়েছিস!

বুধন জোর করলো।—ই তো মহিমবাবু, ভাটিখানার মহিমবাবু, আমরা তো তোকে চিনি বটে, ই লিয়ে যা তোরা।

চিনি বটে! এতক্ষণে চিনতে পারছে বুধন।

আমি বুড়ো মোড়লকে বললাম, তোরা রেখে দে, ভোজ করবি।

—ভোজ!

বুড়ো মোড়ল কি বললো সকলকে। আর সঙ্গে সঙ্গে হইহই করে উঠলো সকলে। ভিড় করে জীপের কাছে এসে হাত ধরে টেনে নামাতে চাইলো।—যেতে দিব নাই তুদের, তুরাও ভোজ খাবি!

আরেকটা বুড়ো বললে, আয়, মাংস খাবি, মদ খাবি আমাদের সঙ্গে।

আমরা তখন পালাতে পারলে বাঁচি।

অনেক করে তাদের বুঝিয়ে কোনোরকমে পরিত্রাণ পেলাম আমরা। আর রাস্তা ফাঁকা পেতেই জোর স্পীডে জীপ ছুটিয়ে দিলো অবিনাশ।

আমরা ফিরে এলাম।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠতেই মৈনুদ্দিন গম্ভীর বিনয়ের কণ্ঠে বললে, ছোটু মিঞা ভেট পাঠিয়েছে হুজুর।

বলে দরজার দিকে তাকালো।

আমরা ফিরে তাকিয়ে দেখলাম দরজার সামনে হাসি-হাসি মুখে একটা সাঁওতাল মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আমরা চমকে উঠলাম। আরে, এ যে হাটে দেখা সেই কানিয়ালুকার মেয়েটা!

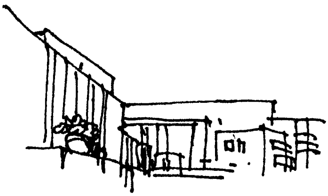
কানিয়ালুকা!

সঙ্গে সঙ্গে, কেন জানি না, আমাদের চোখের দৃষ্টিতে শ্রদ্ধা মিশে গেল। মেয়েটার দিকে, তার উদ্দাম যৌবনের শরীরটার দিকে আমরা লম্পটের চোখে তাকাতে পারলাম না।

অবিনাশ তার দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বললো, না রে, তুই ফিরে যা!

আসলে তাকে তো আমরা ফিরিয়ে দিলাম না, আমরা নিজেরাই ফিরে এলাম।

[১৩৭২



লেখকের মৃত্যু

পাঠকের জন্ম সেই বয়সে। যে বয়সে ওদের সাদা জীনের হাফ প্যাণ্টের নীচে দুটো পুরুষ্টু হাঁটু রাতারাতি ফেঁপে উঠছে। যে বয়সে ওদের গলার স্বর হঠাৎ গাঢ় হয়ে উঠছে। মুখগুলো কৈশোর-পার-হওয়া ঘাম-ঘাম ভরাট। ওরা হাতে হকি স্টিক নিয়ে সিমেণ্ট-বাঁধানো বড় নালাটার নড়বড়ে পুলের ওপর দিয়ে ছুটতো খেলার মাঠের দিকে। ছুটতে ছুটতে কনভেণ্টের পাশের মেহেদি-বেড়ায় ঘেরা মাঠের ধারে মিনিট কয়েকের জন্য থামতো। মেহেদি-বেড়ার সেই ভলি গ্রাউণ্ড। যেটাকে এতকাল সবাই উপেক্ষা করে এসেছে, কিন্তু তারপর হঠাৎ কখন থেকে ওরা উপেক্ষা করতে পারেনি। যেখানে ওরা সবাই একবার থামতো। লাল স্কার্ট পরা, খাটো লাল স্কার্ট পরা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েগুলো। তার মধ্যে একজন পাঞ্জাবী, আর একজন বাঙালী, সেই যে মিনি না কি নাম। লেডিজ সাইকেলে সাঁ-সাঁ করে উড়ে যেতে যেতে বজ্জাত ছেলেদের মুখে দু আঙুল পুরে দেওয়া শিস শুনে সে ইংরিজীতে গালাগাল দিতো, ওরা সকলে কনভেণ্টের মাঠে ভলিবল নিয়ে দাপাদাপি করতো। পর পর অনেকগুলি ক্লাস ওদের দিকে নাক বেঁকিয়ে চলে যেতে যেতে যেদিন মৈনুন, আফত আর রণেন হকি স্টিকে ঠেস দিয়ে কনভেণ্টের মেয়েদের ঝাঁপাঝাঁপি দেখতে শুরু করলো, সেদিন আমিও সংগে ছিলাম।

সাদা ধবধবে ব্লাউজ, একটু ফাঁপা-ফাঁপা, আর লাল, টকটকে লাল স্কার্ট, তার নীচে ফর্সা ধপধপে হাঁটু, আর পা আর পায়ের পাতা, বিনুনি করা চুল, ছটফটে চুলের বিনুনি, আড়চোখের চাউনি, ঠোঁট-টেপা হাসি, খেলার ফাঁকেই কানে কানে ফিসফিস...সব দেখতে দেখতে বুকের ভিতরটা আমার, আর মৈনুনের, আর আফতের, আর রণেনের কেমন যেন কেমন-কেমন করে উঠতো।

অথচ, তার আগে আমরা জানতামই না, মৈনুন কিংবা আফত কিংবা রণেন কিংবা ফার্স্ট বয় অলোক অথবা সেকেণ্ড মাস্টার বিলাসবাবু ছাড়া পৃথিবীতে আর-এক জাতের মানুষ আছে।

কনভেণ্টের মেয়েদের খেলা দেখতে দেখতে সেদিন জানলাম, আছে, আরেক রকমের মানুষ আছে। সেদিন আরেকটা জিনিস আবিষ্কার করলাম। লাল ইটের ইনস্টিটিউট-বাড়িটার পাশে জালে-ঘেরা টেনিস কোর্টের ওপাশে যে সারি সারি কোয়ার্টার, তার একটা দেয়ালে নম্বর মারা আছে ৭১/৭৪৪ বাই ডবলু বি।

ডবলু আর বি দুটোর সংগেই ইংরেজী বর্ণপরিচয়ের মাধ্যমে পরিচয় ছিলো, কিন্তু একটা বাড়ির দেয়ালে তার কি সংকেত, কিসের তা জানার ইচ্ছেও হয়নি। একাত্তর আর সাত শো চুয়াল্লিশই বা কেন, তাও জানতে চাইবো কেন।

কিন্তু ওই বাড়িটার দিকে তখন বারবার চোখ যেতো। আর সাহেববাজারে কিছু কিনতে যাবার সময় কেন জানি না ৭১/৭৪৪ নম্বরের সামনে দিয়ে যে লাল কাঁকরের সরু রাস্তাটা গেছে সেটাকেই শর্ট কাট মনে হতো।

তার কারণ বোধ হয় ওই পেঁয়াজি রঙের শাড়ি পরা শালিক পাখিটা। রোগা-রোগা পাখিটা তখন পাখির মতোই ফুড়ুক ফুড়ুক করে উড়তো বসতো, কখনো জানলায়, কখনো পাশের বাগানের পেঁপেগাছের ধারে, সামনের রাস্তায় কিংবা কাছের কালভার্টে। একদিন ভোর-বেলায় নরেশদার ক্লাবে মুগুর ভাঁজতে যাচ্ছি, ঈশ্বরপ্রসাদের দোকানে তখন বড় কড়াইটায় জেলাপী ভাজা হচ্ছে, দেখি কি সেই শালিক পাখিটা সবুজ শাড়ি পরেছে, হাতে শালপাতায় মোড়া গরম জেলাপী কিনে নিয়ে যাচ্ছে।

পাখি দেখতেই শুধু আমার ভালো লাগতো না। তার সঙ্গে তার মতো কিচিরমিচির করে কথা বলতেও ইচ্ছে হতো।

তাই ভাবলাম, এর চেয়ে ভালো সুযোগ তো আর পাবো না।

পাখি না ফুল, নৈনীতাল আলু না ওল, মুখটা কিসের মতো করে তার দিকে এগিয়ে গিয়েছিলাম জানি না।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা অঘটন ঘটে গেল। আমি গলাটাকে কোকিলের মতো মিষ্টি করে ডাকতে গিয়েছিলাম, গলাটার বদলে মুখটাই কোকিলের মতো হয়ে গেল। কারণ সেই মুহূর্তে একটা বাজখাঁই চিল কোত্থেকে সোঁ করে নেমে এসে পাখির হাতের ঠোঙায় ছোঁ মারলো।

পাখির হাত ছুড়ে গেল, ঠোঙা থেকে গরম জেলাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লো মাটিতে।

পাখির মুখ সাদা হয়ে গেল, পাখি ভয় পেলো, পাখি লজ্জায় তাকাতে পারলো না। আর ওর দু চোখের কোণে দু ফোঁটা জল চিকচিক করলো।

তারপর সে আমার দিকে ক্রুদ্ধ দুটি চোখ তুলে তাকালো। বেশ বুঝতে পারলাম, আমাকে এগিয়ে আসতে দেখে ও অস্বস্তি বোধ করেছিলো, কিংবা ভয়, আর তাই অসতর্ক হয়ে পড়েছিলো।

আমি আর কোনো কথা না বলে নরেশদার ক্লাবে চলে গেলাম। কিন্তু মন থেকে পাখির মুখটা, ভোরবেলায় ঘুম ভাঙা ঘুম-জড়ানো চোখ, চোখের পাতা, এলোমেলো চুলের বিনুনি, ফোলা-ফোলা মুখ—কিছু ভুলতে পারলাম না।

কেবল মনে হতে লাগলো বাবার পকেট মেরে একটা রুপোর টাকা, কি খুচরো কয়েক আনা পয়সা যদি রাখতে পারতাম, তা হলে পাখিকে আবার জেলাপী কিনে দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতাম।

নরেশদা দু-চার দিন হয়তো লক্ষ করেছিলেন। তাই মুগুর ভাঁজলেই তিনি খুশী হতেন না। প্রায়ই বলতেন, শরীরচর্চা করলেই তো হবে না, মনের চর্চাও দরকার। ভালো ভালো বই পড়ো।

বিবেকানন্দের বই পড়তে বলতেন।

মৈনুন আর আফত আর রণেন তা দেখে হাসাহাসি করতো। মুগুর ভাঁজা আর কর্মযোগ পড়া ওদের একদম পছন্দ ছিলো না। রণেন গর্ব করে বলতো, আমি যখন গোল দিলাম ডোরা হাততালি দিয়েছে।

পাখি খেলা দেখতে যেতো না। পাখি বাড়ির পাশের পেঁপেগাছের নীচে একটা চেয়ার পেতে বই পড়তো। আর আমাকে দেখতে পেলেই ওর মুখটা বইয়ের উপর আরো নীচু হয়ে ঝুঁকে পড়তো। তবু ইনস্টিটিউট লাইব্রেরিতে রোজ বই বদল করতে যেতাম। না গেলে পাখির বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার কোনো অজুহাত খুঁজে পেতাম না।

একদিন হয়েছে কি, ইনস্টিটিউটে গিয়েছি বই বদলাতে, হাতে ছিলো একটা ধর্মগ্রন্থ। ব্রজেনদা লাইব্রেরিয়ান, তাঁকে পানের দোকানের ভিড়ের মতো আমরা সবাই বই বদলে দিতে বলছি, হঠাৎ পিছন থেকে ঝাঁঝালো গলা।—আজ না দিলে ব্রজেনদা, গলাটা কচ্ করে কেটে দেবো।

মেয়েলী গলা শুনে ব্রজেনদা তাকালেন, হাসলেন। বললেন, রেখেছি, রেখেছি, এইমাত্র ফেরত এলো।

পাশের ভিড় সরে গেল, আর এগিয়ে আসতেই আমি পাখিকে দেখলাম। পাখি আমাকে দেখলো। তারপর সপ্রতিভভাবে টেবিলে-রাখা বইটা টেনে নিয়ে নামটা দেখেই ও ফিক করে হেসে ফেললো।

আর আমার মনে হলো ঠাস করে ওর গালে একটা চড় বসিয়ে দিই। হাসবার কি আছে? নরেশদা তো বলেন এগুলোই ভালো বই। ধর্মগ্রন্থ কি লোকে পড়ে না? তবে ছাপা হয় কেন!

ভাগ্যিস চড়-মারা চোখে তার দিকে তাকাইনি। কারণ পরের দিনই আবার দেখা হলো। দেখা হবারই কথা, কারণ আমি আধ ঘণ্টা ধরে ইনস্টিটিউটের সামনে পায়চারি করেছিলাম। আর দূর থেকে পেঁয়াজি রঙের শাড়িটা দেখে ভিতরে ঢুকেছিলাম।

আমার পাশে দাঁড়িয়ে পাখি বললো, ব্রজেনদা, অ্যাদ্দিনে একটা ভালো বই পড়ালেন, ব্রিলিয়েণ্ট।

সঙ্গে সঙ্গে সেই চিলটার মতো আমি বইটা ছোঁ মেরে নিয়ে নিলাম।—ব্রজেনদা, আমাকে দিন এটা।

পাখি আড়চোখে তাকালো, হাসলো।

আর আমার মনে হলো বৃষ্টিতে-ভেজা রোগা শালিকটার বুকের পালক তিরতির করে কাঁপছে, কেঁপে কেঁপে নতুন হয়ে উঠছে তার সারা শরীর।

মৈনুন আর আফত আর রণেন তখনো হকি স্টিক হাতে ফিক্সড হুইল সাইকেল চালিয়ে মিনি আর ডোরার গল্প বলে। আর আমি ভাবি, ওরা কি বোকা, কি বোকা!

কারণ তখন পাখি পাখিই, আমি চিল হয়ে গেছি।

আমি কোনো ভালো বই পড়লে ওকে না পড়িয়ে আনন্দ নেই। পাখির ভালো লাগা বই আমার তেমন ভালো না লাগলে ও জ্বরো রুগীর মতো মুখ করে। দুঃখ পায়।

ইনস্টিটিউটে একই সময়ে বই বদলাতে দুজনে আসি, কথা বলি, তারপর বিলিয়ার্ড রুমে গিয়ে বিলিয়ার্ড খেলা দেখি। গ্যালারির মতো দু সারি বেঞ্চ, আমি নিচেরটায় বসি, ও ওপরের বেঞ্চে, ঠিক পিছনে। কখনো কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে কিছু বলে, কখনো কাউকে ঢুকতে দেখে সোজা হয়ে বসে। তারপর একসময় চিমটি কাটে।

ইনস্টিটিউটের সামনে অনেকখানি সবুজ ঘাসের লন, মৌসুমী ফুল, ফোয়ারা। আর নীল নীল আলো। মাঝে মাঝে দু-একটা গ্যাসের আলো।

কোনো-কোনো দিন দুঃসাহসে ভর করে ফোয়ারার আবছা অন্ধকারে এসে বসি দুজনে। কিন্তু আলোচনা সেই বই আর বই।

আর এই সময়েই ব্রজেনদা চাকরি থেকে অবসর নিলেন। নতুন যিনি এলেন তাঁকে আমরা উৎপলদা বলতে পারলাম না। যদিও তিনি ব্রজেনদার চেয়ে অনেক ছোট।

তাঁর চোখে চশমা ছিলো, চুলে তেল দিতেন না, দেখতে সুন্দর ছিলেন, গরদের পাঞ্জাবি পরতেন।

তিনি শুধু বই দিতেন না, উপদেশও দিতেন। বইটা ফেরত দেওয়ার সময় জিগ্যেস করতেন। আর এইভাবে কখন থেকে তিনি যেন আমাদের দুজনের কাছেই হিরো হয়ে গেলেন।

আমি বলতাম, উৎপলবাবু ব্রজেনদার মতো নন। উনি ভালোমন্দ বোঝেন, বোঝাতে পারেন।

তখন দুজনেই আমরা উপন্যাস পড়ার নেশায় ডুবে গেছি। স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজের লাইব্রেরিতেও ছাড়পত্র মিলেছে। বই ভালো লাগলেই পাখিকেও না পড়িয়ে শান্তি নেই।

মৈনুন আর আফত ইতিমধ্যে কারখানায় অ্যাপ্রেণ্টিস। রণেন আর আমি সাইকেলে সাত মাইল পার হই, কাঁসাই নদী পার হই ফেরিতে, কলেজ করি। ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে।

ইনস্টিটিউটে এসে পাখির সঙ্গে দেখা। তারপর বাড়ি।

সেদিন কলেজ লাইব্রেরি থেকে নেওয়া বইখানা হাতে নিয়ে ইনস্টিটিউটের লনে বসে অপেক্ষা করছি। মনের মধ্যে পাখি পাখি পাখি।

না, পাখি এলো না। রণেনও চলে গেল। তবু অপেক্ষা করতে করতে কখন যে বইটা নাড়াচাড়া করতে শুরু করেছি কে জানে।

ঘাসের লন ছেড়ে আলোর নীচে একটা বেঞ্চে বসে বইটার পাতা খুললাম। শব্দের পর শব্দ, লাইনের পর লাইন পড়ে চলেছি। আর কি আশ্চর্য, সমস্ত মন কেমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে, সমস্ত শরীরে অদ্ভুত একটা অনুরণন।

ভালো লাগছে, ভালো লাগছে। বিস্ময় আর আনন্দ, আগ্রহ আর পুলক। নেশার ঘোরে যেন আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বইটা। তেজী ঘোড়ার মতো টগবগিয়ে ছুটে চলেছি। তেজী ঘোড়ার পিঠে ছুটে চলেছে পেশোয়ারী মেয়ে ফিরোজা। আনারের দানার মতো তার গাল, নীল নীল চোখ।

একটু একটু করে যখন সব নিস্তব্ধ হয়ে গেছে, সব আলো নিবে গেছে, শুধু উপন্যাসের

নায়িকার সেই নীল নীল চোখ দুটি দেখতে পাচ্ছি।

রুদ্ধশ্বাসে সেই স্বল্পালোকিত বেঞ্চটিতে বসে পড়ে চলেছি। সমস্ত শরীরে অদ্ভুত এক পুলক। মনে হচ্ছে এমন আনন্দ বুঝি কখনো পাইনি। এমন বই বুঝি বা কখনো লেখা হয়নি। মনে মনে লেখকের পায়ে কয়েকটি শ্বেতপদ্ম রেখে প্রণাম করতে ইচ্ছে হচ্ছে।

কনভেন্টের মিনি আর ডোরা, ৭১/৭৪৪ নম্বরের পাখি—সব মুছে গেছে। সব পৃথিবী চুপ করে গেছে।

জেগে আছে শুধু একটি নায়িকা। ফিরোজা, ফিরোজা।

শেষ পৃষ্ঠা শেষ করে আচ্ছন্নের মতো বসে রইলাম অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ। স্বার্থপরের মতো সমস্ত আনন্দটুকু বুকের গভীরে নিশ্বাসের মতো টেনে নিতে চাইলাম।

তারপর, তারপর হঠাৎ আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। চমকে চারদিকে তাকালাম।

না, কেউ কোথাও নেই। সমস্ত লন ফাঁকা হয়ে গেছে, ইনস্টিটিউটে কেউ নেই। বিলিয়ার্ড রুমের নুয়ে-পড়া উজ্জ্বল আলোগুলো কখন নিবে গেছে।

বইটা বন্ধ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। হয়তো ফিরোজার দুঃখে। তারপর লক্ষ করলাম, খাকী কোট পরা নাইট গার্ড খট্‌খট্‌ বুট পায়ে এগিয়ে আসছে।

তার দিকে তাকিয়ে বোকার মতো হাসলাম, তারপর সাইকেলের প্যাডেলে পা দিলাম।

কিন্তু অসহ্য একটা যন্ত্রণা তখন বুকের মধ্যে। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে ডেকে ডেকে বইটা পড়াতে ইচ্ছে হচ্ছে। ইচ্ছে হচ্ছে, পৃথিবীর সকলে আমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলে উঠুক, অপূর্ব, অপূর্ব!

পাখির কাছে ছুটে যেতে ইচ্ছে হলো। যেন এখনই এই স্বর্গের স্বাদ না দিতে পারলে শান্তি নেই, শান্তি নেই। পাখি, পাখি, পাখি, মনের মধ্যে অবিরাম ডেকে চলেছি।

পরের দিনই পাখির সঙ্গে দেখা। বললাম, পাখি, এ বইটা পড়ো। আজই, আজই পড়ে ফেলো। মনে মনে বললাম, পাখি, তোমাকে এক টুকরো স্বর্গ দিলাম। অনেক, অনেক বড়, বিশাল একটা আকাশ দিলাম।

নেড়ে-চেড়ে দেখলো পাখি।—ভালো?

বললাম, হয়তো এর চেয়ে ভালো বই আর নেই। আর নেই।

পরের দিনই উত্তেজনায় ছটফট করতে করতে এলো পাখি। কথা বলতে গিয়ে ওর চোখ-মুখ কেঁপে উঠছে। গলার স্বর গাঢ় হয়ে আসছে।—পড়িনি, পড়িনি অতুলদা, এমন বই আমি কখনো পড়িনি।

—আমিও না।

পাখি বললো, আমি ঘুমোতে পারিনি। সারা রাত পড়েছি, আর ভেবেছি।

বললাম, আমিও।

তারপর, তারপর আমরা দুজনাই হঠাৎ উৎপলবাবু আর ব্রজেনদার ওপর চটে গেলাম। পৃথিবীতে এমন বই থাকতে ওঁরা যেন আমাদের বঞ্চনা করে এসেছেন, আমাদের সময়, জীবন, আগ্রহ নষ্ট করেছেন। নিজেদের মনে হলো আমরা এতকাল ঠকে গেছি। উৎপলবাবু আমাদের ঠকিয়েছেন।

আমি আর পাখি ইনস্টিটিউটে ঢুকলাম।

উৎপলবাবু বই দিচ্ছেন। জন তিন-চার লোক দাঁড়িয়ে আছে।

পাখি বইখানা হাতে নিয়ে এগিয়ে গেল।—কি বাজে বাজে বই দেন উৎপলবাবু, একটাও তো ভালো বই দেন না।

উৎপলবাবু চোখ তুলে তাকালেন।

পাখি হাসলো। হাতের বইখানা দেখালো।—এসব বই নেই আপনার? ব্রিলিয়েন্ট, ন্ট, ভাবতে পারবেন না কি সুন্দর।

আমি বললাম, এর চেয়ে ভালো বই আমি পড়িনি।

উৎপলবাবু বইটা নিলেন, মলাট উলটে নাম দেখলেন। লেখকের নাম।

তারপর তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললেন, এ তো বটতলা। রাবিশ, এসব বই পড়ছো? বলে হেসে উঠলেন। আশেপাশে যারা ছিলো তারাও।

মনে মনে আমি চুপসে গেলাম। বটতলা? আমার মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হলো না। পাখির মুখ সাদা হয়ে গেল। ও কোনো কথা বললো না।

সমস্ত শ্রদ্ধা, সমস্ত ভালো লাগা পলকের মধ্যে মন থেকে মুছে গেল। অপরাধীর মতো আমরা আমাদের ভালো লাগা গোপন করতে চাইলাম। মনকে বোঝাতে চাইলাম, ভুল করেছি, ভুল করেছি। যে লেখককে উত্তেজনায় আনন্দে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছিলাম সেই মুহূর্তে সে টলে পড়লো। তার মৃত্যু হলো।

আর পাঠকের? সেই মুহূর্তে তার জন্ম হলো, না মৃত্যু, আজও জানি না, আজও জানি না।

[১৩৭৩



স্বর্ণলতার প্রেমপত্র

ব্যাপারটা আমি তখনো বুঝতে পারিনি। অলক কি এমন কথা বলতে চায়; বলতে চায়ই যদি, তো এত উসখুস করছে কেন। বলেই ফেলুক না।

অলক তখন আমাদের সকলের কাছেই হিরো হয়ে গেছে।

হিরো হবারই তো কথা। আমাদের ক্লাসের ফার্স্ট ইয়ার আর্টসের ছেলেদের মধ্যে ওর মতো সুন্দর চেহারা একজনেরও ছিলো না। না, একজনের ছিলো—অমিয়। কিন্তু তার কেমন মেয়েলী-মেয়েলী চেহারা, মুখে পাউডার মাখতো, কোঁচানো শান্তিপুরী ধুতি পরতো, কথা-বার্তাতেও তার কেমন একটা সখী-সখী ভাব ছিলো। আমরা তাই ঠাট্টা করে বলতাম, সখী-বাবু।

অলক কিন্তু অমিয়র মতো ছিলো না। একেবারে অন্যরকম চেহারা, অথচ সুন্দর। দোতলা বাসের সামনের সীটে ও একদিন বসেছিলো কলেজে আসবার সময়, আমি পিছনে, হাওয়ায় ওর শ্যাম্পু-করা হালকা চুল উড়ছিলো, পিছন থেকে ওর ঘাড়, টিকোলো নাক, চিবুক সব মিলে এমন ছবির মতো লাগছিলো, আর ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ দেখলাম কি, ওপাশের সীটে বসা একটি সুশ্রী মেয়ে একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে আছে।

আমি নিজের মনেই হেসে ফেলেছিলাম মেয়েটির চোখের দিকে তাকিয়ে। একসঙ্গে কলেজের সামনে বাস থেকে নেমেই সে কথা বলেছিলাম অলককে।

বলেছিলাম, তোর মতো চেহারা হলে কি করতাম জানিস?

লজিকের ক্লাসে প্রক্সির ব্যবস্থা করে যখন রানার কেবিনে এসে সবাই জড় হলাম, বাসে-দেখা দৃশ্যটা রসিয়ে রসিয়ে আমি বর্ণনা করে মণীন্দ্রকে জিগ্যেস করলাম, ওর মতো চেহারা পেলে কি করতিস তুই, বল তো!

মণীন্দ্র হেসে বললো, কি আবার, চুটিয়ে প্রেম করতাম।

অমূল্য আমাকে প্রশ্ন করলো, তুই?

বললাম, স্রেফ পকেট মারতাম। ওই চেহারায় ধরা পড়লেও কেউ বিশ্বাস করতো না।

মেয়েটিকে বাসের মধ্যে ওর দিকে ওভাবে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে হেসে ফেলেছিলাম নিজের মনেই, কিন্তু ও বয়সে বুকের মধ্যে কি একটু জ্বালা বোধ করিনি? একটু হিংসে? সেজন্যেই হয়তো বললাম, ওকে পেলে পকেটমাররা মাইরি লুফে নেবে।

অলক কিন্তু চটলো না, ও শুধু হাসলো। আসলে ও বোধ হয় কারও ওপর চটতে জানতো না, এত মিষ্টি ব্যবহার ছিলো ওর, এমন মোলায়েমভাবে কথাবার্তা বলতো যে ওর কাছে নিজেকে ভীষণ ছোট মনে হতো।

কিন্তু একটা ব্যাপারে আমরা সবাই একমত ছিলাম—আমি, অমূল্য, মণীন্দ্র। আমরা তখন সেভেন-ও-ক্লকে দাড়ি কামিয়ে সিগারেট ধরিয়ে বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে যে-কোনো একটি মেয়ের চোখে বিশেষ হয়ে ওঠার আপ্রাণ চেষ্টা করছি। কিন্তু মনে মনে তখন আমরা সকলেই জানতাম, আমাদের কারও জীবনে কোনো দিন যদি সত্যি সত্যি প্রেম আসে তা হলে তা নিঃসন্দেহে আসবে অলকের জীবনে।

অথচ অলক নিজেও তখন হা-হুতাশ করছে; অমিয়র অর্থাৎ সখীবাবুর বানানো প্রেমের গল্পে ডুব দিয়ে আমাদের মতোই আনন্দ পাচ্ছে।

এমন সময় সেই অঘটন ঘটে গেল।

কয়েক দিন ধরেই লক্ষ করছিলাম, অলক কি যেন বলবার জন্যে উসখুস করছে।

আমি শেষ অবধি আর থাকতে পারলাম না। বললাম, কি হয়েছে বল তো তোর? এত অন্যমনস্ক হয়ে যাস কেন মাঝে মাঝে?

অলক কিছু বললো না, শুধু মুচকি হেসে বললো, যাঃ।

অথচ অপ্রতিভ ভাব দেখে, ওর লাজুক-লাজুক তাকানোর মধ্যে সব রহস্য ধরা দিলো।

আমি বললাম, নির্ঘাত তুই প্রেমে পড়েছিস, বল সত্যি কি না?

অলক এস-বি'র ক্লাসে কোনো দিন নোট নেয়নি। তবু সেদিন নোট নেওয়ার ছলে মুখ নামালো খাতার ওপর। তারপর ধীরে ধীরে বললো, বলবো, বলবো।

তা হলে সত্যিই কিছু ঘটেছে? সত্যিই কোনো মেয়েকে ভালোবেসেছে ও? শুনে অদ্ভুত এক ধরনের আনন্দ হলো। আর অদম্য এক কৌতূহল। যেন অলক নয়, আমি নিজেই কাউকে ভালোবেসে ফেলেছি।

ক্লাস শেষ হতেই রানার কেবিনে চা খেতে এলাম দুজনে।

আর অলক বললো, অমূল্যদের বলবি না বল?

—না, কক্ষনো না।

একে একে সব কথা বলে গেল অলক, মনে হলো এ ক'দিন কারও কাছে তার এই গোপন আনন্দের খবরটুকু না দিতে পেরে ও নিজেও যেন দম বন্ধ হওয়া যন্ত্রণায় ভুগছিলো।

কি আশ্চর্য, অলকের ওপর আমার কিন্তু একটুও হিংসে হলো না। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমি সব কথা জিগ্যেস করলাম। আর অলক যখন মেয়েটির সঙ্গে প্রথম আলাপ হওয়ার কথা, তার নিজের ভয়-সংশয়-অনিশ্চয়তার কথা বিশদভাবে বলে যেতো তখন আমি তন্ময় হয়ে শুনতাম। যেন অলক নয়, আমি নিজেই একটি উপন্যাসের নায়ক হয়ে উঠেছি।

যেটুকু দূরত্ব ছিলো, এই একটি ঘটনায় অলক আর আমি যেন আরো অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলাম।

আমি জিগ্যেস করলাম, কি নাম রে তার?

—স্বর্ণ, স্বর্ণলতা। অলক মৃদু হেসে কেমন সলজ্জভাবে বললো, বলেই প্রশ্ন করলো, ভারি মিষ্টি নাম, তাই না?

নামটা আমার খুব সেকেলে লাগলো, তবু, তবু কেন জানি না খুব ভালো লাগলো। বললাম, খুব মিষ্টি নাম।

স্বর্ণকে দেখবার জন্যে আমার তখন প্রচণ্ড আগ্রহ। আলাপ করার তীব্র ইচ্ছে। আমি কি তা হলে অলকের মুখে তার কথা শুনে শুনে নিজের অজান্তেই স্বর্ণর প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম! কি জানি।

অলক কিন্তু কিছুতেই আমাকে নিয়ে যেতো না, এমন কি চোখের দেখাতেও তার যেন আপত্তি। আমি বুঝতাম, ও আমাকে ভয় পায়, কিংবা বিশ্বাস করে না। সে কথা ভেবে হাসি পেতো, কখনো বা রাগ হতো। আমি কি ওর হাত থেকে স্বর্ণকে ছিনিয়ে নেবো? ছিনিয়ে নেওয়া কি সম্ভব? তবু ও কেন এড়িয়ে যেতে চায় আমি বুঝতে পারতাম না।

আমি তাই মাঝে মাঝে ওকে ঠাট্টা করতাম। বলতাম, আমার সঙ্গে আলাপ হলেই আমার

প্রেমে পড়ে যাবে নাকি তোর স্বর্ণ?

স্বর্ণকে নিয়ে কোনো ঠাট্টা অলক কিন্তু একেবারেই সহ্য করতে পারতো না। ওর উজ্জ্বল মুখখানা তখন কেমন যেন হঠাৎ ম্লান হয়ে যেতো।

এমন সময়ে হঠাৎ একদিন খুব খুশী-খুশী মুখ নিয়ে হাজির হলো অলক। যেন পৃথিবী জয় করে এইমাত্র ফিরে এলো।

বললাম, কি ব্যাপার? এত ফুর্তি কিসের?

অলক লাজুক হাসি হেসে একটা চিরকুট বের করলো বুকপকেট থেকে। এগিয়ে দিলো আমার দিকে।

মাত্র দু লাইনের একটা চিঠি। স্বর্ণর লেখা। যেন এর চেয়ে মূল্যবান পৃথিবীতে আর কিছুই নেই, থাকতে পারে না, এমনভাবে চিরকুটটা ফেরত নিলো অলক, সযত্নে নরম হাতের স্পর্শে সেটা ভাঁজ করলো, করে পকেটে রাখলো।

তারপর ওর কপালে দুশ্চিন্তা দেখা দিলো। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, কি করি বল তো? উত্তর চেয়েছে।

—উত্তর দিবি!

অলক চুপ করে রইলো, তারপর বললো, যা হাতের লেখা আমার...

আমি হেসে ফেললাম। সত্যি, বেচারীর হাতের লেখা সত্যিই একেবারে বিশ্রী। ওই হাতের লেখায় কি প্রেমপত্র লেখা যায়?

অলক নিজের মনেই বললো যেন, স্বর্ণর হাতের লেখাটা খুব সুন্দর, না রে?

সুন্দর না হলেও বেশ পরিচ্ছন্ন, বেশ স্পষ্ট।

অলক কি যেন ভাবলো, তারপর বললো, তোর মতো হাতের লেখা যদি হতো আমার

শুনে ভীষণ ভালো লাগলো আমার, বুকের গোপনে একটা গর্বের ফুল যেন পাপড়ি মেলতে চাইলো। অলকের সঙ্গে কোনো দিক থেকেই তো আমার কোনো তুলনা হয় না, তবু, তবু একটা জায়গায় আমার মাথা যেন অলককে ছাড়িয়ে অনেক উঁচুতে উঠে গেল। আমার হাতের লেখা সুন্দর, খুব সুন্দর। আর প্রেমের চিঠিও হয়তো আমি ওর চেয়ে অনেক ভালো করে লিখতে পারবো। ও কি লিখবে? ও তো বনলতা সেন পড়েইনি।

অলক তখনো উসখুস করছে। কি যেন বলতে চায়। যদি বলতেই চায় বলেই ফেলুক না। যদি চায়, ওর হয়ে আমি একটা চিঠি ড্রাফ্‌ট্ করেও দিতে পারি, ও সেটা নকল করে স্বর্ণকে পাঠিয়ে দিতে পারে।

আমি অপেক্ষা করে রইলাম, ও কি বলে শোনবার জন্যে।

অলক অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো, তারপর হঠাৎ বললো, স্বর্ণ তো আমার হাতের লেখা চেনে না, তুই লিখে দে না!

আমি হেসে ফেললাম।—আহা রে, তোমার হয়ে আমি চিঠি লিখি, তারপর বাপের কাছে ধরা পড়লে আমাকে ঠ্যাঙানি খেতে হোক আর কি!

অলক বাধা দিলো।—যাঃ, তা কেন হবে। তোকে তো কেউ চেনেই না।

ওঃ হো, আসলে হাতের লেখা-টেখা তা হলে বাজে কথা। ধরা পড়ার ভয়ে নিজের হাতে চিঠি লিখতে চাইছে না অলক। তা ছাড়া আর কি, যাকে ভালোবাসিস তার কাছ থেকে হাতের লেখাটা লুকোবার কি দরকার শুনি!

অলক কিন্তু ততক্ষণে আমার কাঁধে হাত রেখে অনুনয়ের কণ্ঠে বলছে, শোন আনন্দ, তোকে লিখে দিতেই হবে।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি 'না' বলতে পারলাম না। অনেক সুন্দর সুন্দর কবিতার লাইন দিয়ে, অনেক ফুল-তারা-পালক সাজিয়ে একটা চিঠি লিখে দিলাম। লিখতে লিখতে মনে হলো যেন অলক নয়, আমিই না-দেখা না-জানা একটি ষোল বছরের মেয়ের উদ্দেশে আমার বুকের সুপ্ত অনুভূতিগুলো উজাড় করে দিচ্ছি।

কিন্তু একখানা চিঠি লিখেই কি নিস্তার আছে। দিন কয়েক পরেই স্বর্ণর উত্তরটা নিয়ে এসে হাজির হলো অলক।—দেখ আনন্দ, তোর চিঠির, তোর হাতের লেখার কত প্রশংসা করেছে।

সত্যিই। স্বর্ণর চিঠিটা পড়তে পড়তে আমার বুকের মধ্যে কেমন করে উঠলো। অলকের লেখা মনে করে স্বর্ণ যা কিছু লিখেছে, যা কিছু প্রশংসা, তা যেন আমারও প্রাপ্য।

আমি তাই ঠাট্টা করে বললাম, দেখিস অলক, শেষ অবধি স্বর্ণ না আমার প্রেমে পড়ে যায়।

শুনে অলক হাসলো। বললো, এবারে আরো ভালো করে লিখে দে উত্তরটা।

আমি কি অলকের অনুরোধ শুনে ভালো করে লিখতে চেষ্টা করতাম? না। জীবনে যে কোনো দিন প্রেমের স্পর্শ পায়নি, প্রেম যার কাছে শুধু বইয়ে-পড়া অনেক দূর থেকে দেখা অস্পষ্ট অভিজ্ঞতা, অথচ অভাবে হতাশায় কল্পনার রঙে মেশানো একটা অনুভূতি, একটা চিঠি লেখার সুযোগ পেয়ে তার হৃদয়ই হয়তো কপাট খুলে দিয়েছিলো।

একদিন তাই সন্দেহ হলো, আমি অলকের হয়ে স্বর্ণকে চিঠি লিখছি, না আমি নিজেই তার কাছে কৃপাপ্রার্থীর মতো ছুটে যেতে চাইছি।

স্বর্ণ কে, সে কেমন দেখতে, আমাকে দেখে সে ঘৃণায় মুখ ফেরাবে কি না এসবের হিসেব নিতে ইচ্ছে হতো না। আমার শুধু মনে হতো, আমি নিজেই যেন স্বর্ণ নামের কোনো একটি মেয়েকে প্রেম নিবেদন করছি।

এক-একসময় তাই অলককে আমার অসহ্য লাগতো, অসহ্য লাগতো স্বর্ণর চিঠিগুলো। কারণ, সে চিঠিতে আনন্দর কোনো ভূমিকা নেই। সেখানে দেখতাম স্বর্ণর সমস্ত মন জুড়ে বসে আছে অলক। আনন্দ বলে কেউ আছে এ খবরও সে জানতো না।

সেদিন তাই অলক যখন আবার একটা চিঠি লিখে দিতে বললো, আমি হেসে বললাম, ওসব চলবে না রোজ রোজ। স্বর্ণকে একটা চুমু খেতে দিবি বল, তা হলে লিখে দেবো। তা না হলে যাও বাবা, নিজে লিখে নেবে যাও।

আমি ভেবেছিলাম আমার কথা শুনে অলক হাসবে। কিন্তু ও হাসতে পারলো না। অসহ্য কোনো কষ্টে ওর সমস্ত মুখ মুহূর্তে কেমন বিকৃত হয়ে গেল। বুঝলাম, ও খুব আঘাত পেয়েছে। তখন তো জানতাম না, কাউকে যখন আমরা ভালোবাসি তখন ভিতরে ভিতরে আমরা তাকে শ্রদ্ধাও করি।

অলক অসহায় দুর্বলের মতো আমার হাতের ওপর হাত রাখলো। বললো, তুই আনন্দ, তুই এসব বলিস না।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি অপ্রতিভ বোধ করলাম। মনে হলো এখনই বুঝি ওর দু চোখ ঠেলে জল গড়িয়ে পড়বে।

অলক আমাকে বলেছিলো, অমূল্যদের তুই এসব কথা বলিস না। আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, বলবো না। কিন্তু আমার মাঝে মাঝেই ভয় হতো, যদি কোনো কারণে স্বর্ণ তার বাবা-মার কাছে ধরা পড়ে, যদি অলকের বাবার কাছে গিয়ে অভিযোগ করেন তাঁরা...

মণীন্দ্র প্রথম শুনেই বলেছিলো, করেছিস কি তুই? ধরা পড়লেই তো ও শালা বলবে তোর লেখা। মরবি তুই, দেখিস।

বাড়ি জিনিসটা তখন আমাদের কাছে একটা কঠোর শাসনের রক্তচক্ষু। বাবাকে কোনো কোনো পারিবারিক অশান্তির মুহূর্তে দেখে মনে হতো পুলিস ফাঁড়ির দারোগা। সাদা কথায়, বাবা, মা, মেজকা, বড়দা, এমন কি সেজদিকেও আমরা ভয় পেতাম।

তাই প্রায়ই মনে হতো প্রতিজ্ঞা চুলোয় যাক, অমূল্যদের সব কথা খুলে বলি, ওরা অন্তত সাক্ষী দেবে যে চিঠিগুলো আমার লেখা নয়। অর্থাৎ হাতের লেখাটাই শুধু আমার।

সেদিন রানার কেবিনে এসে বসেছি, মণীন্দ্র অমূল্য ওরা সখীবাবুকে ঘিরে ধরেছে, আর কোঁচানো ধুতির ডগাটা কাগজের ফুলের মতো বাঁ হাতের মুঠোতে তুলে ধরে অমিয় দিব্যি তার প্রেমের গল্প বলে যাচ্ছে। ছেলেটাকে দেখলেই আমার গা জ্বালা করতো। আমরা যে এমন হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াই, কই, একটি মেয়েও তো ফিরে তাকায় না। অথচ প্রতি দিনই এক-একজন নতুন প্রেমিকা জোটে ওর।—আমি তো দেখিনি, বাস থেকে নামতেই একটা মেয়ে বললো, শুনুন...

সখীবাবু বলে যাচ্ছিলো, আর অমূল্য মণীন্দ্র গোগ্রাসে গিলছিলো তার বানানো গল্প।

আমি অমিয়কে আঘাত দেবার জন্যেই বললাম, আরে দূর, ওসব কে শুনতে চায়। অলক আসুক, তার কাছে শুনবি।

—অলক? ওরা সকলেই চমকে উঠলো।

আর আমি যতখানি সম্ভব বাড়িয়ে বাড়িয়ে ফেনিয়ে ফেনিয়ে, যতখানি সম্ভব সুন্দর করে তার প্রেমের গল্প শোনালাম ওদের। চিঠি লিখে দেওয়ার কথাও।

মণীন্দ্র সব শুনে বললো, ও ব্যাটা ধরা পড়লে মরবি তুই, ও স্রেফ তোর ঘাড়ে দোষ চাপাবে।

তা চাপাক, ওরা তো সাক্ষী রইলো, তখন দেখা যাবে। কিন্তু আমার ইচ্ছে হতো, অলক তার স্বর্ণকে বলুক, চিঠিগুলো আমার লেখা, তার প্রতিটি শব্দ আমার অনুভূতি দিয়ে গড়া, হাতের লেখাটাও।

কিংবা সেসবই ও গোপন করে রাখুক, শুধু একটি দিন ও স্বর্ণকে দেখতে দিক। শুধু চোখের দেখা, আর কিছু নয়।

আমি তখন কল্পনায় স্বর্ণকে দেখি, স্বর্ণর একটা মিষ্টি সুন্দর চেহারা আমার বুকের মধ্যে আঁকা হয়ে গেছে।

এদিকে অলক আমার ওপর খুব চটে গিয়েছিলো, আমি কেন সব কথা অমূল্যদের বলে দিয়েছি।

আমি রেগে গিয়ে বলেছিলাম, বেশ করেছি, তুই আর আসিস না আমার কাছে চিঠি লেখাতে।

কিন্তু বেচারী না এসেই বা পারবে কেন! তখন ও আমার হাতের মুঠোর মধ্যে, তখন ইচ্ছে করলে আমি ওকে দু আঙুলে ধরা ফড়িঙের মতো ছটফটিয়ে মারতে পারি, ইচ্ছে করলে ওকে কাশের আকাশে উড়িয়ে দিতে পারি।

অর্থাৎ তখন আর হাতের লেখা বদলানোর উপায় নেই অলকের। আমার শরণাপন্ন তাকে হতেই হবে। তখন আর সব কথা স্বর্ণকে খুলে বলারও সাহস নেই তার, পাছে সব কথা শুনে স্বর্ণ তাকে ঘৃণা করতে শুরু করে, অবিশ্বাস করতে শুরু করে।

আমি তাই সেদিন আবার বললাম, এক-একটা চিঠির দাম এক-একটা চুমু। স্বর্ণকে একটা চুমু খেতে দিবি বল, তবে লিখে দেবো।

অমূল্য আর মণীন্দ্র হো হো করে হেসে উঠলো, বললো, ঠিক বলেছে আনন্দ।

কিন্তু অলকের মুখ সাদা হয়ে গেল, ও এক অসহ্য যন্ত্রণা লুকিয়ে হাসবার চেষ্টা করতেই ওর মুখটা কেমন বিশ্রী দেখালো।

তা দেখাক, ওই বা আমাকে এভাবে এড়িয়ে এড়িয়ে চলবে কেন? স্বর্ণকে একটা দিন কি ও চোখের দেখা দেখাতে পারে না? একটা দিন আলাপ করানোর সুযোগ পায় না? আমি বুঝতাম, ও নানা অজুহাতে স্বর্ণকে আমাদের কাছ থেকে আড়াল করে রাখতে চায়।

কিন্তু ও প্রায়ই বলতো, স্বর্ণর সঙ্গে দেখা হলো, স্বর্ণ কি বলেছে জানিস? বলেছে, আমাকে না পেলে সারা জীবন...

—রেখে দে তোর স্বর্ণ! আমি বিরক্ত হয়ে একদিন বলেছিলাম। তারপর ওর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু কষ্ট হয়েছিলো। বলেছিলাম, হ্যাঁ রে, প্রায়ই তো তোদের সঙ্গে দেখা হয়, তা হলে এত চিঠি লেখালেখি কেন?

অলক খুব লজ্জা পেয়েছিলো, তারপর বলেছিলো, মুখে কি মনের কথা বলা যায় রে!

কিন্তু চিঠিতে তো অলকের মনের কথা আমি লিখতাম না, লিখতাম বোধ হয় নিজেরই মনের কথা। স্বর্ণকে নয়, যে-কোনো একটি মেয়েকে। আমার কামনা বাসনা অতৃপ্তির রঙ বুলিয়ে লিখতাম সেসব চিঠি।

এমনিভাবেই চলছিলো দিনের পর দিন, মাসের পর মাস।

হঠাৎ একদিন অলককে কেমন উদ্‌ভ্রান্ত দেখালো। দিনে দিনে ওর শরীরের সমস্ত রক্ত যেন কে ধীরে ধীরে নিঙড়ে নিচ্ছে। ওর চোখের দৃষ্টি বদলে গেল। কেমন একটা রুক্ষ প্রতিবাদের মতো ওকে মনে হতো।

একদিন জিগ্যেস করলাম, কি হয়েছে রে অলক? আর তো চিঠি লেখাস না?

একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করে অলক বললো, বলবো, বলবো।

সেদিন কলেজ ছুটির পর আমরা দুজনে হাঁটতে হাঁটতে কার্জন পার্কের দিকে চলে গেলাম। তখন কার্জন পার্কের অন্য চেহারা, অন্য রূপ। ট্রামের ঘর্ঘর ছিলো না, লোকের ভিড় ছিলো না এত, অনেকখানি জায়গা জুড়ে ফুল-ফুল ঘাস নিঃশব্দতা ম্লান আলো অন্ধকার 'মা-লি-শ'।

আমরা দুজনে এসে আরো নির্জন একটা কোণ বেছে নিয়ে বসলাম, বাঁ কনুইয়ে ভর দিয়ে আধশোয়া, দাঁতে ঘাসের একটা লম্বা শীষ কাটলাম, জিগ্যেস করলাম, বল তো কি ব্যাপার।

অলক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। বললো, স্বর্ণর বিয়ে।

—কার সঙ্গে? আমি চমকে উঠে জিগ্যেস করলাম।

অলক তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললো, কে জানে, আমি জানতে চাইওনি।

তারপর পকেট থেকে একটা বাণ্ডিল বের করলো। সেই চিরকুট থেকে শুরু করে যত চিঠি স্বর্ণ তাকে লিখেছিলো, যেগুলো উত্তর লেখার জন্যে দরকার এই অজুহাতে আমি মাঝে মাঝেই পড়তে নিতাম, পড়ে ভালো লাগতো, নতুন করে বেঁচে উঠতে ইচ্ছে হতো, যেগুলো পড়ে মনে হতো যেন কোনো একটি মেয়ে, একটি শান্ত স্নিগ্ধতার শরীর, একটি উজ্জ্বল গভীর মন, আমাকেই লিখেছে, আমাকে। আমার সমস্ত অতৃপ্তি আর শূন্যতা ভরে যেতো।

অলক সেই বাণ্ডিলটা সামনে রাখলো। তারপর দীর্ঘশ্বাসের স্বরে বললো, সব শেষ হয়ে গেল আনন্দ, সব শেষ।

বলে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে আমাকে একটা দিলো, একটা প্যাকেটের গায়ে ঠুকে ঠুকে নিজের ঠোঁটে চেপে রইলো। তারপর অনেকক্ষণ কি যেন ভাবলো ও।

দেশলাই বের করে ফস্ করে একটা কাঠি জেবলে আমার সিগারেটটা ও ধরিয়ে দিলো, নিজেরটা ধরালো।

কে. সি. দাসের মাথায়, একেবারে আকাশ ছুঁয়ে আলো জবলে জবলে তখন খেলার খবর লেখা হয়ে যাচ্ছে, খবর জবলে উঠছে এক-এক লাইন।

কিন্তু আমার সেদিকে কোনো আগ্রহ নেই তখন।

অলক আবার বললো, আজ রাত্রেই সব শেষ হয়ে গেল।

—আজ রাত্রে? আমি চমকে উঠলাম।

—হ্যাঁ। আজ স্বর্ণর বিয়ে।

আমার মনে হলো আমি ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছি। আমার মনে হলো আমার শরীরে কোনো শক্তি নেই, আমি ভেঙে পড়েছি। 'সব শেষ হয়ে গেল' কথাটা বারবার আমার কানের কাছে বাজলো। আমার মনে হলো যেন আমি নিজেই আমার কোনো প্রেমিকার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। মনে হলো কেউ আমার জীবনের সমস্ত আনন্দ শুষে নিয়ে চলে গেল। আমি বুঝতে পারলাম, আমি স্বর্ণকে কোনো দিন দেখিনি, চিনি না, তার কণ্ঠস্বরও আমার অচেনা, তবু আমি যেন নিজেরই অজান্তে তাকে কখন ভালোবেসে ফেলেছিলাম।

অলক সিগারেটে পর পর কয়েকটা টান দিলো, তারপর ফস্ করে আরেকটা দেশলাই-কাঠি জেবলে চিঠির বাণ্ডিলটা তার ওপর ধরলো।

—অলক! আমি চীৎকার করে উঠলাম।

আমি চিঠির বাণ্ডিলটা দ্রুত হাতে কেড়ে নিলাম।

বললাম, এ কি করছিস অলক?

অলকের মুখ আবছা দেখা যাচ্ছিলো। মনে হলো একটা অসহ্য যন্ত্রণাকে ও বুকের মধ্যে চেপে রাখার চেষ্টা করছে।

ও অনেকক্ষণ চোখ বুজে রইলো। তারপর বললে, দে আনন্দ, পুড়িয়ে শেষ করে দিই। ওগুলোকে বড় ভয় আমার। কাছে থাকলে জানি না কবে কি করে বসি। ছি ছি, শেষে স্বর্ণর যদি কোনো ক্ষতি করে বসি, যদি রেগে পাগল হয়ে গিয়ে...

আমি ওর হাত চেপে ধরলাম। বললাম, তোর ভয় নেই, এগুলো আমার কাছে থাক। যখন এ চিঠিগুলোকে তোর আর কোনো ভয় থাকবে না, যখন জ্বালা জুড়িয়ে গিয়ে শুধু একটা মিষ্টি স্মৃতি হয়ে থাকবে চিঠিগুলো, তখন তোকে এগুলো দিয়ে দেবো।

অলক আর স্বর্ণর চিঠিগুলো ফেরত চায়নি। নাকি একবার চেয়েছিলো, আমি খুঁজে পাচ্ছি না এই অজুহাতে ফেরত দিইনি।

এ চিঠিগুলো যে তখন আমার, আমারই। কতদিন কতবার যে পড়েছি, কতবার লিখে-দেওয়া উত্তরের লাইনগুলো মনে পড়েছে।

এক-একসময় আমার মনে হয়, আমি স্বর্ণকে দেখেছি, আমি স্বর্ণকে চিনি, স্বর্ণর কথা শুনেছি, ঐ তো হেসে হেসে কত মিষ্টি করে ও বলছে, এই, তুমি শরীরের যত্ন নিচ্ছো না কেন বলো তো! এই, তুমি ওভাবে চলন্ত বাস থেকে কোনো দিন নামবে না।

আজ অলক কোথায় চলে গেছে জানি না। অলক কি করে, কোথায় আছে, বেঁচে আছে কি না কিছুই জানি না। কয়েকটা যুগ পার হয়ে গেছে। অলক আজ দূরে সরে গেছে, অনেক দূরে।

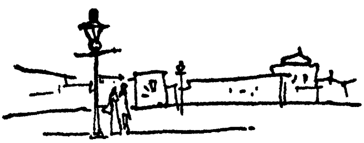
কিন্তু স্বর্ণ আজও আমার কাছে কাছে, আমার পাশে পাশে। যেদিনই নিজেকে নিঃস্ব মনে হয়, যেদিনই কোনো গভীর বেদনা আমার বুকে পাথর হয়ে চেপে বসে, সেদিনই স্বর্ণর সেই চিঠিগুলো বের করে খুলে দেখি, পড়ি।

আর মনে মনে কল্পনায় ভাবতে ইচ্ছে করে, স্বর্ণ কোথায় জানি না, অনেক দূরে, অনেক বিস্মৃতি পেরিয়ে কোন্ এক অশান্ত অতৃপ্ত মুহূর্তে তার স্বামী-সন্তানদের লুকিয়ে হয়তো, হয়তো তার ভাঙা তোরঙ্গের নীচে থেকে দুপুরের নির্জনতায় আমার লেখা চিঠিগুলো খুঁজে বের করে, সে চিঠি পড়ে। পড়তে পড়তে...অলকের চেহারা এখন নিশ্চয় তার কাছে ঝাপসা হয়ে গেছে, অলককে সে ছুঁতে পারে না, চিঠিগুলো পড়তে পড়তে তাই কোনো একসময় আমার লেখা তারা-ফুল-কাশ-আকাশ গভীর যন্ত্রণা অনুভব করতে করতে আমাকেই ছুঁয়ে যায়। আমাকে।

ঠিক যেভাবে আজও আমি মাঝে মাঝে স্বর্ণর চিঠিগুলো...

তবে কি আমরা যখন গল্প লিখি, গল্প পড়ি, তখন এমনি কোনো অদেখা স্বর্ণ আর বিস্মৃত অলকের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাই!

[১৩৭৩



দাম

অনন্ত এবার মেন সুইচ অফ করে দোকান বন্ধ করবে কি না ভাবছিলো। আশপাশের দোকানে আলো নিবছে, তালা পড়ছে, কাঠের পাল্লাগুলো বয়ে নিয়ে যাওয়ার বা খাঁজে খাঁজে বসানোর শব্দ, আর কর্মচারীদের দু-একটা চিৎকার শোনা যাচ্ছিলো। অনন্ত জানে এখন আর নতুন কেউ আসবে না, বড় জোর রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে চেনা কেউ জিগ্যেস করবে, আমার ছবি ক'টা প্রিন্ট হয়েছে অনন্তদা?

দোকান নয়, স্টুডিও। অর্থাৎ ফোটো তোলার দোকান। আঠারো বর্গফুট পরিমাণ জায়গায় কাউণ্টার, শো-প্লেট, স্টুডিও। ডার্করুম এক বন্ধুর বাড়ির নীচেতলার এক ফালি ঘরে। মডার্ন স্টুডিওর যা কিছু চাকচিক্য আলোয় ছবিতে, কাচে আর কাঠের দেয়ালের মোলায়েম রঙটুকুতে।

কিন্তু খদ্দেরের অপেক্ষায় ছিলো না অনন্ত। আসলে এই রাত আটটায় দোকানে তালা লাগিয়ে মেসে ফিরতে ইচ্ছে হয় না ওর। রাতটা অনেক বড় মনে হয়। বন্ধুবান্ধব দু-একজন জুটে গেলে তবু আড্ডা দিয়ে কিংবা ন'টার শোয়ে সিনেমা দেখে দিব্যি কেটে যায়। না জুটলে মেসের তক্তপোশটা অসহ্য লাগে। একটা চটুল মুখ, উদ্ধত যৌবনের শরীর।

সকালটা তবু আশায় আশায় কাটে কিংবা ডার্করুমের কাজে।

জীবনে আছে অথচ রাত্রির বিছানায় নেই, এর চেয়ে দুঃসহ কষ্ট আর কি আছে।

উঠি-উঠি করেও তাই বসে ছিলো অনন্ত। হঠাৎ চোখ পড়লো রাস্তার ওপারে। আলো নিবে যাওয়া আবছা অন্ধকারে দেখলো ভদ্রলোক এদিকেই আসছেন। প্যাণ্টের পকেটে হাত দিয়ে রাস্তার দু দিক দেখলেন, গাড়ি-টাড়ি আসছে কি না, তারপর এগিয়ে এলেন।

অনন্ত প্রথমে ভেবেছিলো, পাসপোর্ট সাইজ ছবি চাই হয়তো। পি এল ফর্ম, ফরেন এক্সচেঞ্জ, ইনকাম ট্যাক্স ক্লিয়ারেন্সের জন্যে ছোটাছুটি করার মতো চেহারা। কিন্তু কাছে আসতেই তার নিজের দোকানের আলোটা ভদ্রলোকের মুখে পড়লো। আর সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত কেমন যেন ভয় পেলো, অস্বস্তি বোধ করলো।

অনন্ত একদিন হাসতে হাসতে বলেছিলো, এভাবে চললে কোন দিন শেষ হয়ে যাবো।

নিজের অজান্তেই তাই ভদ্রলোকের প্যাণ্টের পকেটে ঢোকানো হাতটার দিকে তাকালো, তারপর অস্বস্তিতে মেমোবুকের পাতা ওলটাতে লাগলো।

পুরু-সোল জুতোর চপ্‌চপ্ আওয়াজটা কাউণ্টারের কাছে এগিয়ে আসতে মুখ না তুলে উপায় রইলো না।

চোখ তুলে তাকালো। কান সজাগ রেখে ঠাহর করতে চেষ্টা করলো পাশের দু-একটা দোকানও খোলা আছে কি না, রাস্তায় লোক আছে কি না।

—আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিলো। নিরঞ্জন বললো।

বিস্ময়ের ভান করে অনন্ত নিরঞ্জনের মুখের দিকে তাকালো।—আমার সঙ্গে?

—হ্যাঁ। হাতটা তখনো পকেটে।

অনন্তর ভয় করতে লাগলো। তবু সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করে বললো, বলুন।

এর আগেও নিরঞ্জনকে ও কয়েকবার দেখেছে দূর থেকে, একবার বুঝি সামনাসামনি হয়েছিলো এখানেই। কিন্তু এখন, এখন নিরঞ্জনের কাছে ওর নিজেকে বড় ছোট মনে হলো। ও নিজে ভোঁতা বাটালি দিয়ে বানানো শালকাঠের শরীর। রুক্ষ। মুখটা পাকা আতার মতো কালচে আর এবড়ো-খেবড়ো। নিরঞ্জন বেশ ফর্সা আর নরম। এখন ফ্যাকাশে, বিষণ্ণ—একটা চাপা রাগ, ঘৃণা, ব্যথা আর বিব্রত ভাবকে অহংকারের মধ্যে লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা।

তবু কথাগুলো নিরঞ্জন এত স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করছিলো যে, অনন্ত ভয় পেলো।

নিরঞ্জন বোধ হয় চেয়ার-টেয়ার খুঁজলো। তারপর বললো, একটু সময় লাগবে।

বলে হালকা কাঠের দরজাটা ঠেলে ভিতরের ফোটো তোলার জায়গাটা দেখলো।—আসুন, এখানেই বসি।

যেন নিরঞ্জন ওর দোকানে আসেনি, অনন্তই আগন্তুক।

এখানে, বাইরে, রাস্তা থেকে দেখা যাওয়া কাউণ্টারে ও তবু কিছুটা নির্ভয় ছিলো। এবার বুক দুরদুর করলো। আড়চোখে একবার নিরঞ্জনের প্যাণ্টের পকেটটা দেখলো।

কিন্তু না গিয়েও উপায় নেই। অনন্ত একবার ভাবলো দোকান বন্ধ করার সময় হয়ে গেছে।

পারলো না। ধীরে ধীরে ছোট্ট কুঠরিটার ভিতর গিয়ে ঢুকলো নিরঞ্জনের পিছনে পিছনে।

নিরঞ্জন কাঠের দরজাটা ঠেলে বন্ধ করে দিলো। ঘরখানার চার দেয়াল, টাঙানো ছবি, ক্যামেরা-স্ট্যাণ্ড, ফোকাস-লাইট, দেয়ালের অগুন্তি সুইচ দেখলো। তারপর ফোল্ডিং সোফা —সেটার ভাঁজ খুলে দিলে বেড। ওটার দিকে তাকিয়ে নিরঞ্জন মুখের ক্রূর কুটিল নৃশংস

হাসিটুকু চাপলো।

দুখানা টুল নিয়ে মুখোমুখি বসলো দুজনে।

এই লোকটার শান্তি নষ্ট করেছি আমি, হয়তো প্রতিশোধ নিতে এসেছে। অনন্ত ভাবলো নিরঞ্জনের মুখের দিকে তাকিয়ে।

লোকটার অবস্থা মোটেই ভালো নয়, চেহারা বদখত, এ আমাকে অপমান করেছে, নিরঞ্জন ভাবলো অনন্তর মুখের দিকে তাকিয়ে।

আজ অনন্ত ভয় পাচ্ছে, কিন্তু এতদিন নিরঞ্জনের ওপর রাগে গুমরেছে ও। দাঁতে দাঁত চেপে একদিন বলেছে, বলো তো শালাকে সাফ করে দিই।

নিরঞ্জন সহ্য করেছে, বিকৃত হাসির আড়ালে জ্বালা লুকিয়েছে। ভেবেছে, এই বন্য মানুষটা বড় বড় নখ দিয়ে তার হৃৎপিন্ড আঁচড়ে দিয়েছে।

ওরা দুজন দুটো টুলে মুখোমুখি বসে কথা খুঁজলো।

অনন্ত একবার নিরঞ্জনের প্যান্টের পকেটের দিকে তাকিয়ে হাতের কাছে কিছু আছে কি না খুঁজলো। অকারণেই ক্যামেরার স্ট্যান্ডটা কাছে টেনে আনলো হাত বাড়িয়ে।

দুটো ক্ষুধার্ত, প্রচন্ড রাগী বাঘ যেন পরস্পরের দিকে ওত পেতে বসে আছে। কে আগে লাফ দেয় তারই আশঙ্কায়।

ফোল্ডিং সোফাটার দিকে তাকিয়ে অনন্তর মনে মুহূর্তের জন্যে একটু হাসি খেলে গেল, বিজয়ীর হঠকারী হাসি। পরক্ষণেই নিরঞ্জনের লুকোনো হাতটার দিকে তাকিয়ে ও ভয় পেলো।

নিরঞ্জনের চাপা উত্তেজনার মুখটা এক পলক দেখলো অনন্ত, উদ্দেশ্যটা আঁচ করার চেষ্টা করলো। এই লোকটিকে একসময় ও ঈর্ষা করতো, মনে মনে ওর সামাজিক, আর্থিক, এমন কি দৈহিক মূল্য কষে নিয়ে নিজের চেহারা আর প্রতিষ্ঠার দারিদ্র্য সম্পর্কে লজ্জিত বোধ করতো। এখন মনে মনে করুণা করে, উপহাস করে, ক্রুদ্ধ হয়, কখনো কখনো লুব্ধতার উত্তেজক একখানা শরীরকে রাত্রির নির্জনতায় না-পাওয়ার ক্ষোভে সারা দেহ তার নিরঞ্জনের বিরুদ্ধে আক্রোশে চিড়বিড় করে ওঠে।

নিরঞ্জন সব জানে, সব বোঝে। তবু অক্ষম প্রতিহিংসায় শুধু দাঁতে দাঁত ঘষে। পরিত্রাণ খোঁজে, এই নিত্যদিনের যন্ত্রণা থেকে পালাবার পথ খোঁজে।

তাই, কোনো ভণিতা করলো না নিরঞ্জন। অপমানে লাজুক আর অসহায় চোখ দুটো তার হঠাৎ দৃঢ়তায় স্থির হলো।

বিজয়ীর হাসিটা নিবে গেল অনন্তর চোখ থেকে। ও অস্বস্তিতে চোখ নামালো, ভয় সরিয়ে একবুক দুঃসাহস নিয়ে একটা আকস্মিক কোনো ঘটনার জন্যে তৈরী হলো। কিংবা বজ্রাঘাতের মতো কোনো কথা শোনার জন্যে।

নিরঞ্জন চাপা অথচ স্পষ্ট গলায় বললো, আপনার কাছে মাধবীর একটা চিঠি আছে।

অন্য সময় হলে অনন্ত বিস্ময়ের ভান করতে পারতো। হয়তো চোখ কপালে তুলে প্রশ্ন করতে পারতো, মাধবী কে? কিংবা ঘাড়-বাঁকানো বিস্ময়ে: চিঠি!

কিন্তু প্রতি মুহূর্তে যে প্রচন্ড একটা বিস্ফোরণ আশঙ্কা করছিলো, হঠাৎ এত সাধারণ প্রশ্নে সে নিশ্চিন্ত বোধ করলো। পরক্ষণেই ভাবলো, একখানা চিঠির কথা কেন জানতে চাইছে নিরঞ্জন। মাধবীর লেখা অনেক চিঠি, অনেক চিরকুটই তো তার কাছে আছে।

—আমার স্ত্রীর—কথাটা বলেই শুধরে নিলো নিরঞ্জন—মানে মাধবীর লেখা একটা চিঠির কথাই বলছি। 'একটা চিঠি' বলতে গিয়ে নিরঞ্জন বোধ হয় ঈষৎ হাসলো।

অনন্ত চকিতে ভাবলো, কোন্ চিঠিটার কথা বলছে নিরঞ্জন। নিশ্চয় অনুপমকে যে চিঠিটা সগর্বে দেখিয়েছিলো, সেই চিঠিটাই। মুখে মুখে সেই খবরটা ওর কাছে পৌঁছে গেছে? সর্বনাশ।

অনন্ত মরিয়া হয়ে উঠলো।—হ্যাঁ, আছে।

—আমি চিঠিটা কিনতে চাই।

অনন্ত চমকে উঠলো। কিনতে চায়? চিঠি, একটা সামান্য চিঠি কিনতে চায় নিরঞ্জন?

নিরঞ্জন স্টুডিও-ঘরের এপাশ-ওপাশ চোখ বুলিয়ে দেখলো। না, তেমন সাজ-সরঞ্জাম

বিশেষ নেই। ব্যবসা জাঁকিয়ে তোলার মতো বিশেষ কিছুই নেই। অর্থাৎ এই বর্বর অশিক্ষিত লোকটার ক্যাপিটেল বলতে যদি কিছু থাকে তা শুধু ওর ভিউ-ফাইণ্ডারে আঁটা চোখ। সুতরাং টাকার লোভ আছে নিশ্চয়।

নিরঞ্জন হাসলো।—মনে হচ্ছে আপনার টাকার প্রয়োজন।

অনন্ত ব্যাপারটা তখনো ঠিক বুঝতে পারছে না। মাধবীর লেখা একটা প্রেমপত্র টাকা দিয়ে কিনতে চাইছে কেন লোকটা? মাধবীর মুখের ওপর ছুঁড়ে মারার জন্যে? কিন্তু ইদানীং তো তেমন গোপনতা রাখে না মাধবী। স্পষ্টভাবে নিরঞ্জনকে বলেনি অবশ্য, কিন্তু জানতেও কিছু বাকী থাকেনি তার।

নিরঞ্জন ধীরে ধীরে প্রায় চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, ধরুন হাজার পাঁচেক টাকা যদি পান, শুধু একটা চিঠির জন্যে...

কথার শেষে নিরঞ্জন হাসলো। —মাধবী অবশ্য জানবে না।

মাধবী জানবে না? অথচ পাঁচ হাজার টাকা পেয়ে যাবে অনন্ত?

—পাঁচ হাজার? টাকার অঙ্কটা সম্পর্কে স্থিরনিশ্চয় হবার জন্যেই বিস্ময় প্রকাশ করলো অনন্ত।

—হ্যাঁ, পাঁচ হাজার। আমি তা হলে...সোমবার, সোমবারেই আসবো।

নিরঞ্জন উঠলো। পুরু-সোল জুতোর চপ্‌চপ্‌ ধ্বনি মিলিয়ে গেল রাস্তার অন্ধকারে। মডার্ন স্টুডিওর আলো নিবে গেল।

উল্লাসের আলোটা শুধু জ্বলে উঠলো মনের গোপনে। মাধবীকে ও চায় পরিপূর্ণভাবে, এমন চোরা পথে নয়। তার জন্যে আরেকটু প্রতিষ্ঠা চাই, আরেকটু সচ্ছল অবস্থা। দোকান-টাকে তা হলে সত্যি মডার্ন করতে হবে। টাকা ঢালতে হবে কিছু।

অদ্ভুত যোগাযোগ, সেই টাকা কিনা যুগিয়ে দিতে চায় নিরঞ্জন। কিন্তু কেন? আজ আর কিছুই তো বোধ হয় জানতে বাকী নেই তার। এখন আর নিছক সন্দেহে জ্বলছে না সে।

রাত্রের সেই দৃশ্যটা ভাবতে ভাবতে হাসি পায় অনন্তর। অকারণ ভয় পেয়েছিলো, ভেবে-ছিলো মৃত্যুর মুখোমুখি বসে আছি, তার বদলে দুর্বোধ্য এক জীবনের আশা দেখতে পেয়েছে সে।

মাধবীকে বলতে হবে সমস্ত ব্যাপারটা। মাধবীও হয়তো হাসবে।

মাধবী। দুপুর বারোটার পর থেকে অসহ্য অপেক্ষায় বসে থাকতে হয়। কে বলে শরীর দিয়ে ভালোবাসা যায় না। অনন্ত তার সমস্ত শরীরকে তখন সহস্র প্রদীপের মতো জ্বালিয়ে রাখে। সমস্ত ইন্দ্রিয় উন্মুখ হয়ে থাকে।

মাধবী আসছে। কাউণ্টারে বসে দেখতে পেলো অনন্ত। অবৈধ প্রণয়ের শঙ্কিত বিব্রত পায়ে কি অদ্ভুত দুঃসাহস।

স্লেট-পাড় সাদা সিল্কের শাড়িখানায় চমৎকার লাগছে। একবার চোখাচোখি হতেই মৃদু হাসলো মাধবী। দ্রুত পায়ে এগিয়ে এলো।

বাচ্চা নিমু টুলে বসে বসে ক্যানসেল-করা ছবিগুলো বেছে পৃথক করে রাখছে।

মাধবী এসেই নিঃশব্দে কাঠের দরজাটা ঠেলে ভিতরে ঢুকে গেল।

অনন্তর সমস্ত শরীর তখন উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে। আগ্রহে অধৈর্য। অথচ মাধবীকে ঠিক এভাবে চায় না ও। এই বাধা, ভয়, দ্রুততা ছিন্ন করে নিঃশঙ্কভাবে পেতে চায়।

—নিমু।

নিমু ঘাড় নাড়লো, অর্থাৎ 'ঠিক হ্যায়'! এসে কাউণ্টারে বসলো।

নেহাতই যেন নিরুদ্দেশ ঔদাসীন্যে রাস্তার এপাশ-ওপাশ দেখলো অনন্ত, তারপর শো-প্লেটের আড়ালে এসে কাঠের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলো। কাঠের দরজা বন্ধ হলো।

এ সময়টা উত্তেজনায় আগ্রহে কেমন যেন নার্ভাস হয়ে পড়ে অনন্ত। অথচ নিশ্চিন্ত দুঃসাহসিক মাধবীর শরীরের কাছে এসে দাঁড়ালেই সব ভয়, সব আশঙ্কা অস্বস্তি মুহূর্তে সরে যায়।

পাখাটা চালিয়ে দিয়ে মাধবী তখনো মাথায় ঘোমটা টেনে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে অনন্তর

অপেক্ষায়।

মাধবী হাসলো, অনন্ত হাসলো। তারপর—এই, এই, তুমি কি বলো তো? চাপা গলায় ভর্ৎসনা।—কাছে পেয়েও কেবল খাই-খাই।

আকৃষ্ট মৌমাছির মতো হাসলো অনন্ত। মাধবী কাঠের দরজার খিলটার দিকে তাকিয়ে নিলো।

অনন্ত একবার ভাবলো মাধবী ওর নয়, পরস্ত্রী। একবার ভাবলো নিরঞ্জনের উদ্ভট প্রস্তাবটার কথা বলি। উ‍ঁহু, মেজাজ নষ্ট হয়ে যাবে মাধবীর।

—কি কুক্ষণে যে ছবি তোলাতে এসেছিলাম। মাধবী কৌতুকে হাসলো।

—তার আগে থেকেই তো ছবিটা বুকের মধ্যে গাঁথা হয়ে গিয়েছিলো। অনন্ত নেহাতই কথার পিঠে কথা বললো।

—হাতটাকে একটু ভব্য করতে শেখো। মাধবী কপট ক্রোধ দেখালো।—আমি অন্যের বউ, তোমার নই।

অনন্তর মনে হলো মাধবীকে ডাইনীর মতো দেখাচ্ছে।

—আমার হতে তোমারই অনিচ্ছা। অনন্ত অনুযোগ করলো।

—তোমার সাহস নেই। মাধবী অভিযোগ তুললো।

—তুমি সাত শো টাকা মাইনের সঙ্গে বাঁধা পড়েছো। অনন্ত বললো।

—আঃ, কি হচ্ছে কি! এবার সত্যিই অনন্তকে ঠেলে সরিয়ে দিলো মাধবী।

অনন্ত একটুক্ষণ কি যেন ভাবলো, তারপর খসখসে চাপা গলায় বললো, তুমি কষ্ট পাবে।

—আমি সচ্ছলতা চাই না, স্বস্তি চাই। তুমি, তুমি জানো না...হঠাৎ চোখে জল এলো মাধবীর, জলে ভাসা দুটো বড় বড় চোখ মেলে তাকালো সে অনন্তর মুখের দিকে—আমি, আমি পারছি না...এভাবে বাঁচতে—তুমি আমাকে বাঁচাও।

অনন্ত ওর অন্যমনস্কতায় খুশী। গুনগুন করে অস্পষ্ট ঠোঁট-চাপা একটা শব্দে কি যেন বললো ও, স্তোক দিলো।

—আমি, আমি ওখানে থাকতে পারবো না। মাধবী চোখের জল মুছলো।

অনন্ত প্রকৃতিস্থ হলো, মাধবীর যন্ত্রণার স্পর্শে ওর মন নরম হলো। কপালের ঘাম মুছে বললো, বেশ কিছু টাকা পাচ্ছি, ব্যবসাটা জাঁকিয়ে তুলে...দীর্ঘশ্বাস ফেললো অনন্ত, বললো, আমার দিন...দিনরাত্রি কিভাবে কাটে তুমি জানো না।

—খুব জানি। তোমাকে আমার জানতে বাকী নেই। মাধবী এতক্ষণে আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। কৌতুকে হেসে উঠলো ও। মাথার ওপর ঈষৎ ঘোমটার আভাস দিয়ে চোখে অনুনয় আঁকলো। —চলি।

—এখনই?

—এই, না। কাঠের দরজাটা ঠেলে বেরিয়ে এসে এক নিমেষ থমকে দাঁড়ালো মাধবী, তারপর দ্রুত পায়ে ফুটপাথে নেমে হারিয়ে গেলো।

নিজের ফ্ল্যাটটায় ফিরে এসে—নিজের?—মাধবী নিশ্চিন্ত বোধ করলো। বুকের দাপানিটা এতক্ষণে থেমেছে। মুখে যত দুঃসাহসের নিঃশঙ্ক ভাব ফোটাক না কেন, এই ছোট্ট সুন্দর ফ্ল্যাটের নির্ভাবনার আশ্রয়ে ফিরে এসে তবেই হৃৎপিণ্ডের দ্রুততা স্বাভাবিক হয়।

ঘরে ফিরেই ঝি আন্নার মা-র খোঁজ করলো, বিছানা দেখলো। না, টুনু তেমনি ঘুমোচ্ছে, খুদে খুদে ফর্সা নরম হাতের মুঠিতে তোয়ালের একটা প্রান্ত ধরে। দেখে মনটা খুশী হলো, হাসি পেলো, ফুর্তিতে টুনুর ঘুমন্ত গালে চুকুক করে একটা চুমু খেলো, নিজের মনেই এক পাক ঘুরে নিয়ে গুনগুন করে একটা গানের কলি ভাঁজলো, আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। আয়নায় নিজেকে ভালোবাসলো। টান-টান করে শাড়িটা পরলো, আয়নায় দেখলো, হাসলো।

তারপর আবার টুনুর কাছে এসে তার হাতের মুঠো থেকে তোয়ালেটা টেনে সরাতে গিয়ে হেসে উঠলো। টুনুর সমস্ত শরীরটা ঘুমের মধ্যেই ধড়মড় করে নড়ে উঠেছে। মজা পেলো

মাধবী। টুনুটা কি বোকা। মা-র শাড়ির আঁচলটা চেপে ধরে ঘুমোয়, কিছুতেই ছাড়িয়ে নেওয়া যায় না। কতদিন তাই শাড়ির ভেতর থেকে নিজেকে বের করে আনতে হয়েছে। মুঠোর মধ্যে আঁচলটা ধরা থাকলেই ভাবে মা আছে।

মাধবী একবার ভাবলো, আমরা সবাই কি তাই? নিরঞ্জন ওর সিঁথির সিঁদুরটার দিকে তাকিয়ে ভেবেছে, মাধবী আছে। নিরঞ্জনের কাছ থেকে মাসের মাইনেটা নিয়ে মাধবী ভেবেছে, নিরঞ্জন আছে।

অনন্তটা বুনো, বুনো। একটা রাক্ষস। নিজের মনেই খিলখিল করে হেসে উঠলো ও। দুর্ভিক্ষের খিদে। বনমানুষ, বনমানুষ। একটু পেয়েছো কি গোগ্রাসে গিলতে চাও। আচ্ছা, কি দেখে এমন নেশায় পেলো মাধবীকে? মাধবী কিছুতেই বুঝতে পারে না। অথচ...ও নিজেও হয়তো বন্য, বাঘিনী। 'তোমার স্টুডিও-ঘরের এই খাটো দরজাটা...মনে হয় কি জানো? একটা পাহাড়ী জঙ্গলের কাঠের পাটা সরিয়ে গুহায় ঢুকছি। আদিম মানুষদের গুহা, বড় বড় নখ, খোঁচা খোঁচা দাড়িগোঁফ...' খিলখিল করে হেসে উঠলো আবার।

সুযোগ পেলেই মুঠোয়-ধরা শাড়ির খোলস থেকে সুড়ুৎ করে সরে পড়ি। আমরা সবাই। উঁহু, অনন্ত তা নয়। অনন্ত সরে পড়বে না। আচ্ছা, অনন্ত কি সত্যি কিছু টাকা পাচ্ছে? ব্যবসা জাঁকিয়ে তুলবে?

না, অনন্তকে অবিশ্বাস করে না ও। কিন্তু এক-একসময় ঐ গোঁয়ার আর রাগী মানুষটাকে বড় ভয় হয় মাধবীর। কি সাহস বাবা। ছবি ভালো হয়নি, ভালো হয়নি বলে কতবার যে ঘুরিয়েছিলো। তখন কে জানতো। না, ওর নিজেরও বারবার যেতে ইচ্ছে হতো। তা না হলে যেদিন ওকে সোফায় বসিয়ে শাড়ির পাড়টা ঠিক করে দিতে গিয়ে ওকে আলতো-ভাবে ছুঁলো, লজ্জায় কান ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠলেও রাগতে পারলো না কেন?

আচ্ছা, ডিভোর্স নেবো? ডিভোর্স? তারপর কি অনন্তকে ও...না, না, অনন্তকে ও ভালোবাসে ঠিকই, তা বলে নিরঞ্জনের বদলে অনন্ত?

—তুমি, তুমি একটা ছোটলোক। ছোটলোকের মতো সন্দেহ তোমার। প্রথম দিন ক্রোধে ফেটে পড়েছিলো মাধবী। অথচ ও জানতো নিরঞ্জনের সন্দেহটা অকারণ নয়। শুধু মনে হয়েছিলো, কি এমন দোষ করেছে ও। না, কোনো পাপ তো করেনি। শুধু একটা নেশা।

এখন? এখন নিরঞ্জনকেই ও সহ্য করতে পারে না। ওর একটুখানি স্বপ্নকে বাধা আর নিষেধের কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত করতে চেয়েছে নিরঞ্জন। তবু সহ্য করেছে। অথচ সহ্য করতে করতে কখন দূরে সরে গেছে। তারপর যেদিন আবিষ্কার করলো, নিরঞ্জন একটা হিপোক্রীট, সেদিন ওর জীবন থেকেই মুছে গেল সে। না, যতক্ষণ নিরঞ্জন বাসায় না থাকে ততক্ষণই শান্তি। বিয়ের পর এক ছাদের নীচে আছি দুজনে, তাতেই কত আনন্দ ছিলো। এখন চার দেয়ালের মাঝে নিরঞ্জন ফিরে এলেই নিজেকে বন্দী মনে হয়। হাঁপিয়ে ওঠে মাধবী।

হ্যাঁ, পায়ের শব্দে বুঝতে পারছে মাধবী, নিরঞ্জন ফিরছে। ঘড়ির দিকে তাকালো।

এখন মাধবী একটা হৃদয়হীন যন্ত্র। যন্ত্রের মতো দু-একটা কথা বলবে, প্রায় টেপ-রেকর্ডের গলায়, চিঠিগুলো এগিয়ে দেবে, খাবার টেবিলে ভাতের থালা নামিয়ে দিয়ে শুষ্ক স্বরে বলবে, আচার আছে বাটিতে। কিন্তু খাবার টেবিলে বসে নিরঞ্জন উসখুস করলো। তারপর ধীরে ধীরে বললো, আমাদের একটা ফয়সালা করে ফেলা উচিত।

ভাতের ওপর ডালের বাটিটা উপুড় করে ভাত মাখতে লাগলো মাধবী। চোখ তুললো না।

—আমি এভাবে চলতে দিতে পারি না। স্পষ্টভাবে প্রত্যেকটি কথা উচ্চারণ করলো নিরঞ্জন।

—অর্থাৎ? মাধবী মুখ না তুলেই বললো।

—আমি ন্যাকামি পছন্দ করি না, তুমি সবই বুঝতে পারছো। ধীর স্থির কণ্ঠে বললো নিরঞ্জন।

চারপাশের ফ্ল্যাট, সামনের রাস্তা—সব নিশ্চুপ হয়ে গেছে। আলো নিবে গেছে সব জানালায়। শুধু বড় রাস্তায় ট্রামের হুস্-স্ একটানা একটা শব্দ এলো। নিস্তব্ধতার মাঝে তাই নিরঞ্জনের ঠাণ্ডা উত্তাপহীন চাপা গলার কথাগুলো ভীষণ নৃশংস ঠেকলো মাধবীর কানে।

ও নিজেও ভিতরে ভিতরে নৃশংস হয়ে উঠলো। আস্তে আস্তে বললো, কি চাও তুমি?

—অসতী স্ত্রীকে সকলেই যা করতে চায়।

দপ্ করে জ্বলে উঠলো মাধবী। জ্বলন্ত দুটো চোখ তুলে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো নিরঞ্জনের দিকে। ওর মুখের ওপর নিরঞ্জন যেন একটা অপমানের থাপ্পড় বসিয়ে দিয়েছে। মাধবীর গলার স্বরে উত্তেজনা প্রকাশ পেলো।—তুমি, তুমি একটা নীচ, ইতর...তুমি, তুমি ভাবছো আমি কিছু জানি না? আমি কিছু বুঝি না? সুধা আমার মাসতুতো বোন, আমার চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট...তোমার, তোমার নিজের ওপর ঘেন্না হওয়া উচিত।

—চুপ করো, পাশের ফ্ল্যাটে শুনতে পাবে।

—শুনুক। লজ্জা শুধু লোকে শুনবে!

—আমি ডিভোর্স চাই। নিরঞ্জন শান্ত গলায় বললো।

—তুমি সুধাকে বিয়ে করার সুযোগ খুঁজছো।

—সুযোগ তুমিও কম পাবে না।

—আমি কোনো ইতরের সঙ্গে কথা বলতে চাই না। বলতে হয় কোর্টে গিয়ে বলবো। সশব্দে চেয়ারটা পিছনে ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো মাধবী। বাসনের ঝনঝন শব্দ হলো।

চেয়ার টানার শব্দে, বাসনের শব্দে টুনুর ঘুম ভেঙে গেল। কেঁদে উঠলো ও।

মাধবী টুনুর কাছে গিয়ে শুয়ে পড়লো। তারপর শুনিয়ে শুনিয়ে বললো, আমার আর টুনুর মাসোহারা দিয়ে কত ফুর্তিতে থাকো দেখবো।

সলিসিটরের বাড়ি থেকে ফেরার পথে ঐ একটা কথাই মাথার মধ্যে হুল ফুটিয়েছে। এই যন্ত্রণা থেকে বাঁচতে চায় নিরঞ্জন।

একসময় মাধবীকে ও ভালোবাসতো। মাধবী ওকে। তারপর তিল তিল সন্দেহ থেকে অসীম ঘৃণা। মাধবীর কথা মনে পড়লেও সমস্ত শরীর রাগে রি-রি করে ওঠে। মাধবীর উপস্থিতি একটা দম-আটকানো বোবা কান্না। এই যন্ত্রণা থেকে চিরকালের জন্যে পালাতে চায় ও।

সুধাকে ওর নতুন করে ভালো লাগছে। তাকে নিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করতে চায়।

—অপরাধটা যদি স্ত্রীর না হয়, অ্যালিমনি গুনতেই হবে সারা জীবন।

—সারা জীবন?

হ্যাঁ, মাধবীকে অতিষ্ঠ করে তুলতে পারে নিরঞ্জন, অত্যাচারে অত্যাচারে তাকে ডিভোর্স নিতে বাধ্য করতে পারে কিংবা খাবার টেবিলে বসে একটা বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে এই অসহ্য অবস্থা থেকে রেহাই পেতে পারে, কিন্তু...

মাধবী তার স্ত্রী, তার সন্তানের মা। অথচ মাধবীর শরীরটার দিকে, তার উগ্র বেশবাসের দিকে হঠাৎ চোখ পড়লে মাধবীকে বিশ্রী নোংরা লাগে নিরঞ্জনের। গা ঘিনঘিন করা ক্লেদাক্ত, আর অশুচি।

যাকে ঘৃণা করে, যার উপস্থিতিটুকু জ্বালা ধরায়, পাশের ফ্ল্যাটের ধূর্ত বেড়ালটার মতো যাকে উপেক্ষা করেও চোখে চোখে রাখতে হয়, হৃদয়ের অনুভূতিতে কোথাও যার অস্তিত্ব নেই, সেই নোংরা শরীরটার লোলুপতার কাছে মাসে মাসে একটা মোটা অঙ্ক তুলে ধরার যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেতে চায় নিরঞ্জন।

সব স্মৃতি মুছে ফেলে নতুন করে জীবন শুরু করতে চায়।

সলিসিটর নির্বিকার কণ্ঠে বলেছেন, তা হলে একটা প্রমাণ চাই, দ্যাট শী ইজ নট ফেথফুল টু ইউ। আছে আপনার কাছে?

আছে। নিরঞ্জন জানে, নিরঞ্জন জানতে পেরেছে সে প্রমাণ আছে। অনন্তর কাছে। খবরটা কি অনন্তই কায়দা করে তার কানে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলো? বেশ একটা মোটা টাকা হাঁকবার জন্যে?

কাঠ-কাঠ ঐ বিচ্ছিরি চেহারার লোকটাকে মাধবী নিশ্চয় বিয়ে করার কথা ভাবতেও পারে না। আর মাধবী! অনন্তর কাছে মাধবী নিশ্চয় অনেকের মধ্যে একজন। কয়েক হাজার টাকার চেয়ে দামী নয়।

অনন্তকাল ধরে একটা পাহাড়প্রমাণ টাকা গুনে দিতে পারবে না নিরঞ্জন! এই দুশ্চিন্তা,

এই বিষাক্ত কাঁটাটা বুকের ভেতর বয়ে বেড়াতে পারবে না।

—সুধা, তুমি কি বলো?

—লোকটা এক নম্বরের বজ্জাত। চাপ দিয়ে তোমার কাছে বেশী টাকা আদায় করতে চায়। কিন্তু সেও ভালো, অতীতকে মুছে ফেলো তুমি, আমাদের সামনে ভবিষ্যৎ আছে।

—আমি পাঁচ হাজার টাকা দিতে চেয়েছি। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড আর ইনসিওরেন্স থেকে ধার করে ওকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাই। শুধু ঐ চিঠিটা পেলেই......

নিরঞ্জন হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো। না, আজ আরেকবার দেখা করবে অনন্তর সঙ্গে। শেষ কথা বলে আসবে। নিশ্চয় চিঠিটা বেচতে রাজী ও, তা না হলে মাধবীর কাছে সমস্ত গোপন রেখেছে কেন? নাকি সব জেনে-শুনেও চুপ করে আছে মাধবী। মজা দেখছে।

রাত আটটা বেজে গেছে। এই সময়টাই নির্জন। এখনই দেখা করার, ধীরেসুস্থে কথা বলার সুযোগ।

নিরঞ্জনকে দূর থেকে দেখতে পেলো অনন্ত। উঠে পড়লো, ইশারায় নিরঞ্জনকে অপেক্ষা করতে বলে দোকানের আলো নেবালো, দরজা বন্ধ করলো, তালা ঝোলালো। শালার ইন্স-পেক্টরগুলোকে বিশ্বাস নেই, নগদানগদি পাঁচটা টাকা দিয়ে বিদেয় করতে হবে হয়তো।

—চলুন কোথাও একটা চায়ের দোকানে গিয়ে বসা যাক। অনন্ত বললো।

একজন প্রবঞ্চক, আরেকজন প্রবঞ্চিত। নিরঞ্জন ভাবছে, ভাগ্যের পরিহাস দেখো, এই লোকটা আমার স্ত্রীকে অপবিত্র করেছে, ব্যভিচারিণী করেছে, আমার কাছ থেকে তার মন কেড়ে নিয়েছে। সে এখন আমার কাছে একটা ঠাণ্ডা জড়পদার্থ। আমার উচিত একটা ধারালো ছুরি এনে ওর পিঠে গেঁথে দেওয়া। কিংবা একটা কার্তুজ নষ্ট করা। তার বদলে আমি এখন হেসে, অনুনয় করে লোকটার মন ভেজাতে চাইছি। আমি ওর বন্ধু হয়ে উঠতে চাইছি।

অনন্ত ভাবছে, মজা দেখো, এই লোকটাকে আমি এখন আঙুলের ডগায় নাচাতে পারছি। এই লোকটা—অফিসে যার দাপট আছে, আইনে যার স্ত্রীর ওপর অধিকার আছে। এই লোক-টাকে প্রথম প্রথম কি ভয়ই না পেতাম। এখনো পাই। মাধবী ভয় পায়, আমি ভয় পাই। এর ভয়েই মাধবীকে কোনো দিন নিশ্চিন্তে পেলাম না, পেয়েছি শুধু বুক-দুরুদুরু আশঙ্কার মধ্যে। অথচ এখন আমরা দুজনে লেনদেনের ব্যবসায় বন্ধু হবার চেষ্টা করছি।

নিরঞ্জন আর অনন্ত একটা চায়ের দোকানে এসে ঢুকলো। অন্য সব দোকান বন্ধ হয়ে গেছে, অন্ধকার রাস্তা, রাস্তা কিছুটা নির্জন। চায়ের দোকানটাও বন্ধ হবো-হবো। বয়-গুলো কেউ বিরক্ত হলো ওদের দেখে, কেউ নির্বিকার বসে রইলো।

দু কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে খদ্দেরহীন দোকানটার এক কোণে গিয়ে টেবিলের দু পাশে মুখোমুখি বসলো দুজনে।

অনন্তর হাসি পেলো। প্রথম দিন ওর স্টুডিওর গুহাঘরে যেদিন মুখোমুখি বসেছিলো ওরা, সেদিন কি ভয়ই না পেয়েছিলো অনন্ত। বারবার নিরঞ্জনের পকেটে গোঁজা হাতটার দিকে তাকাচ্ছিলো। সেদিনের কথা ভেবে হাসি পাচ্ছে। আজও তেমনি পকেটে হাত গুঁজেই এসেছে নিরঞ্জন, যেন অনন্তর একটা কথায় ওই পকেট থেকে কয়েকটা হাজার টাকার নোট বের করে দেবে। আসলে পকেটে হাত রেখে হাঁটা নিরঞ্জনের অভ্যাস। অনন্ত এ ক'দিনে বুঝে গেছে।

—আপনি কি তা হলে ব্যাপারটা ভেবে দেখলেন? নিরঞ্জন ধীরে ধীরে জিগ্যেস করলো।

—সামান্য একটা চিঠি নিয়ে আপনার কি লাভ বলুন তো। অনন্ত হাসলো—যেন তার কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু মোটা দাম দিয়ে একটা রিজেক্টেড ছবি কিনতে এসেছে।

অনন্ত ভেবেছে, ভেবেছে এ ক'দিন। মাধবীকে বলতে গিয়েও থেমে গেছে।

ওর কানের কাছে মাধবী যেন ফিসফিস করে বলে উঠেছে, সে কি, তুমি চিঠিটা বেচে দেবে? বেচে দেবে? তুমি তো আমাকেও কোন্ দিন...

—আমি মুক্তি চাই, আমি মাধবীকে ভুলে যেতে চাই। সারা জীবন ধরে প্রতি মাসে সে আমাকে কাঁটার মতো একবার করে বিঁধে যাবে...

—টাকাটা খুবই কম। অনন্ত লোকটাকে যেন করুণার চোখে দেখছে।

—বেশ, ছ' হাজার। ছ' হাজার দেবো। লোভে চকচক করলো অনন্তর চোখ দুটো। তবু নিরঞ্জনের কাছে সেটা প্রকাশ করলো না। মনে মনে এ'চে নিলো, এই টাকাটায় স্টুডিওটা কিভাবে আরো আধুনিক করে তোলা যায়। একটা ভালো ক্যামেরা, বড় সাইজ এনলার্জার একটা, ডার্করুমের টুকিটাকি, আর, হ্যাঁ, ডার্করুম অ্যাসিস্টেণ্ট একজন মাইনে করে রাখলে অর্ডারমতো খেলাধুলো, সভা-সমিতির ছবি তুলতেও ও বেরোতে পারবে।

—আমার কিন্তু আরো বেশী কিছু টাকার দরকার। অন্তরঙ্গ হাসি হাসলো অনন্ত।

—কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমার বেশী টাকা দেওয়ার মতো সঙ্গতিই নেই। অনুনয়ের স্বরে বললো নিরঞ্জন। ভিতরে ভিতরে ও জ্বলে উঠতে চাইলো। ব্যাটাকে এক ধাক্কায় মাটিতে ফেলে তার বুকের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লাথির পর লাথি মারতে ইচ্ছে হলো। প্রথম যেদিন সন্দেহ হয়, সেদিনও এমনি একটা ইচ্ছে হয়েছিলো। অনন্ত না, মাধবীকে।

—সাত হাজার টাকা যদি দেন আমি ভেবে দেখতে পারি। অনন্ত উপেক্ষার গলায় বললো।

—সাত হাজার? নিরঞ্জন চমকে উঠলো।

—হ্যাঁ, সাত হাজার। গলার স্বর কঠিন হলো অনন্তর।

অনন্ত ভাবলো, মাধবী যদি এ দৃশ্য দেখতো, খুব মজা হতো। ওর স্বামী, যে স্বামীর ভয়ে ওর এত লুকিয়ে লুকিয়ে আসা, থরথর করে কাঁপা, তার মুখটা যদি একবার দেখতো এখন!

নিরঞ্জন ভাবলো, সভ্য মানুষ মানে কি কাপুরুষ! সুধাকে নিয়ে একটা ভবিষ্যৎ গড়ার লোভ, আর আইনের ভয় আমাকে কত অসহায় করে দিয়েছে। তা নইলে আমি এখনই কিংবা অনেক আগেই লোকটাকে খুন করতাম। রাগে রি-রি করে উঠলো ওর সারা শরীর, আঙুল-গুলো নিশপিশ করলো। এখনই ব্যাটার টুঁটিটা চেপে ধরলে...

—অনেক চেষ্টা করে তবে হয়তো ছ' হাজার টাকা যোগাড় করতে পারবো। নিরঞ্জনের মুখটা করুণ দেখালো।

অনন্ত ফ্যাকফ্যাক করে হাসলো।—আরো এক হাজার নয় ধার করলেন।

অসহ্য কষ্টে, অসহ্য রাগে, অসহ্য অনুশোচনায় চোখ বুজে কপাল কুঁচকে বসে রইলো নিরঞ্জন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালো।—বেশ, তাই।

ক'দিন ধরে মাধবীকে বলি-বলি করেও বলতে পারেনি অনন্ত। কি জানি, লোভ দেখিয়ে শেষ মুহূর্তে নিরঞ্জন সরে পড়বে কি না।

কয়েকটা দিন সময় নিয়েছিলো সে, টাকাটা যোগাড় করতে হবে তো। আজ বিকেলে চিঠিটা নিয়ে উকিলের কাছে যাবার কথা, দেনাপাওনা সেখানেই মিটবে।

চিঠিটা প্রথম দিনই খুঁজে বের করে রেখেছিলো, আজ বুকের কাছে রেখেছে। ঠিক সেই প্রথম যেদিন পেয়েছিলো চিঠিটা—মাধবী তখন শিলং বেড়াতে গেছে—ওঃ, সে কি রোমাঞ্চ! বারবার চিঠিটা পড়েছে অনন্ত, যত্ন করে রেখেছে বুকপকেটে, আর মাধবীর জন্যে ছটফট করেছে।

আজ আবার চিঠিটা একবার পড়লো। কৌতুকে হাসলো, মাধবীর জন্যে ছটফট করলো, চোখ বুজে মাধবীর শরীরটা মনে মনে গড়ে নিলো।

দুপুরে কাউণ্টারে বসে বসে ও বারবার রাস্তার দিকে তাকালো।

আজ সকাল থেকেই উত্তেজনায় কাঁপছে ও। সাত হাজার, সাত হাজার টাকা।

অনন্ত হাসলো। মাধবীকে এবার একবার বলা দরকার। মাধবী শুনে বোধ হয় খুশীই হবে। এই টাকায় মডার্ন স্টুডিওর চেহারা পালটে যাবে।

মাধবী আসছে, চোখ পড়লো অনন্তর। তেমনি ভয়ে ভয়ে শঙ্কিত চাউনি। মনে মনে হাসলো অনন্ত, এখন আর ভয় পাবার কি আছে। কাঠের দরজা ঠেলে গুহাটার ভেতরে ঢুকে পড়লো মাধবী। বাঃ, মাধবীকে আজ খুব সুন্দর লাগছে।

দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলো অনন্ত। মাধবী হাসলো।

চিঠির কথাটা, সাত হাজার টাকা, নিরঞ্জন—অনন্ত এক নিমেষ ভাবলো, মাধবীকে এই

মুহূর্তে বলবো?

ছন্দিত লতার মতো আবেশে শিথিল একটা শরীর একটা অসহায় কণ্ঠে ফিসফিসিয়ে বললো, জানো, ও আমাকে ডিভোর্স করবো বলে ভয় দেখাচ্ছে।

অনন্ত হাসলো।—ভয়ের কি আছে? আমরা বিয়ে করবো।

—বিয়ে? তোমাকে? হঠাৎ দু হাতে অনন্তকে ঠেলে দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠলো মাধবী।—লোকে বলবে কি! বাবা মা...বন্ধুরা, ওরা...কেন, তুমি তো সবই পেয়েছো—হাসলো মাধবী। মনে মনে ভাবলো, ঐ লোকটার. .অনন্তর পাশে পাশে থাকবে ও ওর স্ত্রী হয়ে? না, না, প্রাণ থাকতে ও তা পারবে না, শুধু ভালোবাসবে, গোপনে ভালোবাসবে—

তার উচ্ছল হাসির মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনন্তর সমস্ত মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। আলিঙ্গনের দুটো রূঢ় হাত কেমন অবশ হয়ে গেল। অনন্ত একটু আগে ভেবেছিলো চিঠির কথা, সাত হাজার টাকা, নিরঞ্জনের অনুনয়—সব বলবে, দুজনে প্রাণ খুলে হাসবে। বলবে, নিরঞ্জনের মুখটা কেমন দেখাচ্ছিলো। এখন দেয়ালের আয়নাটাকে ভয় পেলো অনন্ত। ওর মুখটা অপমানে কতখানি করুণ আর ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে, দেখতে ইচ্ছে হলো না।

—লোকে বলবে কি! কথাটা মাথার মধ্যে হুল ফোটালো।

এই ক'দিনে নিরঞ্জন—যাকে ওরা ভয় পেতো, সে অনন্তর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়েছিলো। এখন অনন্তর মনে হলো, নিরঞ্জন সব হারিয়েও অনন্তর বুকের ওপর পা দিয়ে আবার উঠে দাঁড়িয়েছে।

না, মাধবীর ওপর লোভ হচ্ছে না অনন্তর। ওর মাংসল লুব্ধতার ওপর আর কোনো আগ্রহ নেই। সাত হাজার টাকা, সাত হাজার টাকা চায় শুধু। মডার্ন স্টুডিওর চেহারাটা বদলে দিতে চায়।

—কই, আপনি তো গেলেন না উকিলের কাছে?

একটা দোকানও তখন বন্ধ হয়নি। আলো—আলো। রাস্তায় ভিড়, দোকানে দোকানে। চিৎকার হট্টগোল।

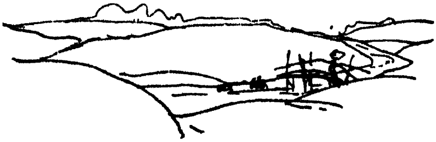
নিরঞ্জনের মুখের ওপর আলো পড়েছে। নিরঞ্জনের হতাশ অসহায় মুখটার দিকে তাকালো অনন্ত।

প্যাণ্টের পকেটে হাত রেখে ঠিক তেমনিভাবে এগিয়ে এলো নিরঞ্জন।—কই, আপনি তো গেলেন না উকিলের কাছে?

অনন্ত হাসলো।—চিঠিটা এনেছি। বুকপকেট থেকে দীর্ঘ সাতটা রঙিন পাতার চিঠিখানা বের করলো।—এই চিঠিখানা। অনন্ত আবার হাসলো, তারপর বললো, এটা আমি বিক্রি করবো না।

বলে আস্তে আস্তে নিরঞ্জনের চোখের সামনে চিঠিটা দু ভাঁজ করে ছিঁড়লো, আবার ভাঁজ করলো, আবার ছিঁড়লো, আবার, আবার।

[১৩৭৩



দুবার বাঁচা

শহরলুটিয়া চেনেন? শহরলুটিয়া?

সত্তর বছর আগে প্রথম যে ইংরেজ ব্যবসায়ী ওখানকার মাটির নীচে খনিজ তেলের সন্ধান পেয়েছিলেন, তাঁর স্ত্রী দেহ রেখেছিলেন পেট্রোলিয়ামের গন্ধ-মাখা ঐ পাথুরে মাটিতে। আর সেই মৃত স্ত্রীর নাম থেকে ঐ অয়েল টাউনের নাম হয়েছিলো শার্লোট। কুলিকাবাড়িদের মুখে মুখে একদিন সেই শার্লোট হয়ে গেল শহরলুটিয়া—লুটের শহর।

অনর্থক এ নামকরণ নয়, কারণ অয়েল টাউন শার্লোটের পথে পথে তখন অনর্থ লেগেই থাকতো। লুট রাহাজানি ছিলো নিত্যদিনের খবর। মাঝে মাঝে খুনখারাবিও যে দু-চারটে না হতো তা নয়।

শহরলুটিয়া মানে লুটের শহর।

সায়ন্তন বলতো, লুটের শহরই তো। শালার কোম্পানি লুটছে তেল. ঠিকাদার লুটছে টাকা, আর কাঠিয়ালরা...

বলে দাঁতে দাঁত ঘষতো সায়ন্তন।

ও তখন ড্রিলিং ডিপার্টমেণ্টের অ্যাপ্রেণ্টিস।

একটু গোঁয়ার টাইপের মজবুত চেহারা ছিলো সায়ন্তনের, শার্লোট শহরের পাহাড়ী শীতকে জব্দ করার জন্যে ও তখন মোটা উলের ফুলহাতা একটা নীল সোয়েটার পরতো, আর ওর কোমরের বেল্টে মিথুন-চামড়ার খাপে থাকতো একটা কুকরি।

ওর বাইরের রুক্ষ চেহারাটার সঙ্গে কোমরের বেল্টে বাঁধা মিথুন-চামড়ার খাপটা দিব্যি মানিয়ে যেতো। তবু কেউ যদি বা রসিকতা করে সেটার দিকে আঙুল দেখিয়ে হাসতো. তা হলে সায়ন্তন তার চৌকো চোয়ালে কাঠিন্য এনে বলে উঠতো, কাঠিয়াল কুত্তাগুলোর সংগে দেখা হয়ে গেলে গায়ের ছাল ছাড়িয়ে নিতে হবে না?

আমি তখন ডেরিকের কাজ করি, কোম্পানির একটা জীপ আমার এক্তিয়ারে। রাত দশটার আগে সেটা বাবুগঞ্জের গ্যারাজে জমা দেওয়া নিয়ম ছিলো, কিন্তু প্রীতম দারোয়ানকে আফিঙের কাঠি ডোবানো এক ভাঁড় চা খাওয়ালে রাত বারোটায় জীপ জমা পড়লেও তার আপত্তি হতো না।

শার্লোট শহরের গা ঘেঁষে যে বান-ডাকা নদীটার জলস্রোত সারা বছরই অভিমানে ফুলে-ফুঁসে উঠতো তার নাম ছিলো নেশারী।

নেশারী নদীর ওপর দিয়ে একটা শীর্ণ কংক্রিটের পোল, কোনোরকমে একটা গাড়ি পার হতে পারে। পোলের ধারে খাটো রেলিং, রেলিং থেকে ঝুঁকে আমরা কত দিন সন্ধ্যায় নেশারী নদীর বুকে জলের খেলা দেখেছি। ঢেউয়ের গায়ে ঢেউ জড়িয়ে পড়া দেখেছি। যেন সাদা-কালো তিনটে সদ্যোজাত ফুটফুটে ছাগলছানা এ ওর গায়ে ঢুঁ মারছে।

কংক্রিটের পোল পার হয়ে সটান একটানা সরু একটা মেটাল রোড ছুটে গেছে আঙগামা বস্তিটার দিকে, আঙগামা বস্তি পার হয়ে ছোট ছোট কয়েকটা পাহাড়ী টিলা, ঘন জঙ্গল। বাঁকে বাঁকে সরু পাহাড়ী রাস্তা।

আঙগামা বস্তির ওধারে আমরা বড় একটা যেতাম না।

সেদিন কংক্রিটের পোল পার হয়ে রাস্তার ধারের বুন্দা ঘাসের ওপর জীপ থামিয়ে অন্ধকারে বসে সবে একটা সিগারেট ধরিয়েছি, জ্বলন্ত কাঠিটা সায়ন্তনের দিকে এগিয়ে দিচ্ছি. একটা হাত তখনো স্টিয়ারিং-এ. হঠাৎ একটা গাড়ির শব্দে সচকিত হয়ে ফিরে তাকালাম। গাড়িটা তখন কংক্রিটের পোলটার ওপর দিয়ে ঝড়ের বেগে এগিয়ে আসছে। এক জোড়া হেডলাইট দুলতে দুলতে ছুটে আসছে।

ঢেউ-খেলানো উঁচুনিচু রাস্তা দিয়ে পলকের মধ্যে গাড়িটা আমাদের পার হয়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির ভিতর থেকে একটা মেয়েলী কণ্ঠের তীব্র চিৎকার ভেসে এলো। আবার, আবার। নিস্তব্ধতার মাঝে একটি নারীকণ্ঠের তীক্ষ্ণ স্বরের আর্তনাদ যেন চতুর্দিকে একটা শব্দের বিদ্যুৎ হয়ে চমকে গেল।

চিৎকার করে কি বলতে চাইলো মেয়েটি? 'আমাকে বাঁচান, আমাকে বাঁচান?' না অন্য কিছু? আমরা কেউই বুঝতে পারলাম না।

আমরা তখন স্তম্ভিত, বিমূঢ়। শুধু এইটুকু আমরা তখন বুঝতে পারছি, অচেনা অজানা কোনো একটি মেয়ে আমাদের সাহায্য চাইছে।

ঠিক তখনই বোধ হয় সায়ন্তন বলে উঠলো, শালা কাঠিয়াল!

আর আমি নিমেষের মধ্যে, যন্ত্রের মতো, কিছু না ভেবেই চাবি ঘুরিয়েছি, ক্লাচ ছেড়ে জোর চাপ দিয়েছি অ্যাকসেলারেটারে। সমস্ত শরীরে তখন উত্তেজনা। উত্তেজনায় জীপের শরীরটাও যেন থরথর করে কাঁপছে।

কিংবা অসহায় ক্রোধে।

ক্রমাগত স্পীড বাড়িয়ে চলেছি আমি, ভাঙা স্পীডোমিটারের কাঁটাও আমাকে সতর্ক করতে ভুলে গেছে, ভুলে থমকে থেমে আছে। আমি ডাকু গাড়িটার ব্যাকলাইট লক্ষ্য করে ঝড়ের মতো এগিয়ে চলেছি। আমি তখন ভিতরে ভিতরে উন্মাদ হয়ে উঠেছি।

অথচ কেন তার পিছনে এভাবে ধাওয়া করছি, আমি তখন জানি না। সায়ন্তন নিঃশব্দে পাশে বসে আছে, তার মুখেও কোনো কথা নেই। আমি দৃঢ় হাতে স্টিয়ারিং ধরে আছি, আমি পাগলের মতো অ্যাকসেলারেটারে চাপ দিচ্ছি। একটু একটু করে ডাকু গাড়িটার কাছে এগিয়ে আসছি আমি, আরো, আরো কাছে। আর মাত্র এক ফার্লং, আধ ফার্লং।

ব্যাকলাইটের হলদে আলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো, হঠাৎ ঝপ করে সেটা নিবে গেল। তা যাক, আমার জীপের হেডলাইট এখনই গাড়িটাকে ছুঁয়ে ফেলবে, ছুঁয়ে ফেলেছে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছি, আমি, ডেরিক ডিপার্টমেন্টের অনিমেষ মল্লিক, ঐ লুণ্ঠিতা মেয়েটিকে বাঁচাবোই।

আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই কাঠিয়ালদের ঐ গাড়িটাকে আমি ধরে ফেলতে পারবো। তারপর? ডাকুগুলোর হাতে কি আছে আমি জানি না। শুধু জানি, সায়ন্তনের কোমরে বাঁধা মিথুন-চামড়ার খাপে ঢাকা ধারালো কুকরিটা কোনো কাজেই লাগবে না।

তবু এত দিনের একটা গোপন চাপা আক্রোশে ফেটে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে। এত দিনে মনে হয়েছে বাবুগঞ্জের, শার্লোট শহরের কোনো মেয়ে হারিয়ে যাওয়া যেন আমাদেরই অপমান।

—শালা কাঠিয়াল! এবার আমি বললাম, আমি, ডেরিক ডিপার্টমেন্টের অনিমেষ মল্লিক।

আর তখনই আমার জীপের হেডলাইট সাঁ করে আলোর ফাঁস ছুঁড়ে দিয়ে ডাকু গাড়িটাকে কাছে টানলো। হেডলাইটের আলো পড়ে গাড়িটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু, কিন্তু ওভার-টেক করে এগিয়ে যাওয়ার এতটুকু পথ দিচ্ছে না সে। এগিয়ে গিয়ে পথ রোধ করে রুখে দাঁড়াবার উপায় নেই। শীর্ণ রাস্তার ঠিক মাঝ বরাবর ঝড়ের মতো উড়ে চলেছে সামনের গাড়িটা।

কিন্তু হাতে আর এতটুকু সময় নেই। এর পরই আংগামা বস্তির পাশ দিয়ে দিয়ে পাহাড়ী রাস্তা। যে-কোনো মুহূর্তে গাড়িটা নাগালের বাইরে চলে যাবে।

আমি নিমেষের মধ্যে ভাবলাম, মেয়েটিকে বাঁচাতে হবে।

আমি পলকের জন্যে ভাবলাম, মেয়েটির সম্মান বাঁচাতে হবে।

না, আমি ওদের পালাতে দেবো না। কিছু না পারি, আমার এই মজবুত বডির জীপ-খানাকে ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দেবো। ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবো, ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাবো।

মেয়েটিকে যদি বাঁচাতে না পারি, তার ইজ্জত, তার সম্মান রক্ষা করবো। আমি ঐ লম্পট দস্যুদের আর ঐ লুণ্ঠিতা মেয়েটিকে একই সঙ্গে হত্যা করবো। মেয়েটিকে হত্যা করে আমি তাকে গ্লানিময় জীবন থেকে রক্ষা করবো।

আমি মনে মনে বললাম, আমি বাঁচাবো কিংবা হত্যা করবো।

উন্মত্ত আর প্রচণ্ড একটা ঝড়ের মতো, আমি একটা পাগলা-ঘণ্টি সাইক্লোনের মতো

হুড়মুড় করে এগিয়ে গেলাম—মৃত্যুর দিকে। আমার এবং মেয়েটির।

আমি মৃত্যুর চাদরে মেয়েটির শরীর ঢেকে দিয়ে তার সম্মান বাঁচাতে চাইলাম। নিষ্পাপ নির্মল একটি রক্তকরবীর মতো তার ছিটকে-পড়া লাল রক্তের বিশুদ্ধতায় আমি তাকে ফুটিয়ে তুলতে চাইলাম।

—সায়ন্তন! আমি তাকে সাবধান করার জন্যে বোধ হয় চিৎকার করে উঠেছিলাম।

তারপর প্রচণ্ড বেগে ছুটন্ত গাড়িটার গায়ে ধাক্কা দিলাম। একটা বিস্ফোরণের শব্দ শুনলাম শুধু। ঝনঝন ঝনঝন করে কাচের টুকরো ছিটকে পড়লো চতুর্দিকে। আমি কয়েকটা পুরুষকণ্ঠের আর্তনাদ শুনতে পেলাম। আমি একটি নারীকণ্ঠের আর্তনাদ শুনলাম। কিংবা আমি নিজেই হয়তো যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠেছিলাম।

আমি জ্ঞান হারালাম।

এ গল্প দুবার বাঁচার গল্প, কিংবা দুবার বাঁচানোর!

শার্লোট শহরে কোম্পানি হাসপাতালে প্রথম যেদিন জ্ঞান হলো, কেউ বুঝি কানের কাছে ফিসফিস করে বলেছিলো, দময়ন্তীর সম্মান বাঁচিয়েছো তুমি।

হ্যাঁ, মেয়েটির নাম দময়ন্তী। হাসপাতাল থেকে ছুটি পাওয়ার দিনে সায়ন্তনের সঙ্গে সে আবার এলো, ঈষৎ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে প্লাস্টার-করা বাঁ হাতখানা বুকের কাছে ঝুলিয়ে।

সায়ন্তনের কপালে আর চিবুকে গভীর কাটা দাগ ওকে যেন আরো রুক্ষ করে তুলেছে!

সায়ন্তন হাসতে হাসতে বললে, দেখ অনিমেষ, কে তোকে নিতে এসেছে।

আমি তাকিয়ে দেখলাম, আমি মুগ্ধ হলাম। কিন্তু ভোরবেলাকার শিশির-ভেজা কনক-চাঁপা ফুলের মতো স্নিগ্ধ তার চোখের পাতায় বিষন্ন করুণ কি এক দৃষ্টি দেখে আমি অনুশোচনায় দগ্ধ হলাম। মনে হলো তার এই খুঁড়িয়ে চলা আর ভাঙা হাতের জন্য আমিই দায়ী।

পরক্ষণেই সে আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসলো, বললে, আপনাকে নিতে এসেছি।

কত দূরে সে আমাকে নিয়ে যাবে আমি জানতাম না, তবু আমার প্রতিটি রক্তকণিকা আশার ফুলঝুরি হয়ে উঠলো। কারণ, তার চোখের দৃষ্টি দেখে মনে হলো সে যেন কৃতজ্ঞতায় আমার কাছে নিজেকে বিক্রি করে দিতে চায়।

কিন্তু আমি তো কৃতজ্ঞতা চাইনি। আমি যা চেয়েছিলাম, আমি তা মুখ ফুটে বলতে পারতাম না।

তবু দিনে দিনে আমরা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। ক্যামেলিয়া ফুলের মতো উজ্জ্বল সেই আলোকিত কিশোরীর চোখে আমি জানি না কিসের ছায়া আবিষ্কার করেছিলাম। শুধু জানি, একটি রজনীগন্ধার বনের ওপর দিয়ে সন্ধ্যার বাতাসের মতো আমাদের দিনগুলো এক অভাবনীয় রোমাঞ্চের মধ্যে কেটে গিয়েছিলো।

আমি কি সায়ন্তনের চেয়ে আরো বেশী কিছু চেয়েছিলাম? তা না হলে আমি একটা ক্ষীণ সন্দেহের মধ্যে দুলতাম কেন? অথচ আমি তখন রাতারাতি শার্লোট শহরের হিরো হয়ে গেছি। দময়ন্তীর বাবা—অ্যাকাউণ্টস অফিসের হেমনাথবাবুও আমাকে স্নেহের চোখে দেখতে শুরু করেছেন।

তবু আমি সায়ন্তনকে ভয় পেতাম। অথচ আমরা দু বন্ধুই কেউই কারো কাছে মনের দরজা খুলে দিতে সাহস পেতাম না।

অহংকার আমার কানে কানে বলতো, অনিমেষ, তুমি দময়ন্তীকে অসম্মানের জীবন থেকে বাঁচিয়েছো, তার ওপর সায়ন্তনের কোনো অধিকার নেই।

আমি মনে মনে প্রশ্ন করতাম, নিষ্পত্র বৃক্ষের মতো সায়ন্তনের সমস্ত রুক্ষতা দময়ন্তী কাছে এলেই কেন সবুজ পাতায় ঝলমল করে ওঠে।

সেদিন আমি তাই দময়ন্তীকে স্পষ্ট করে কিছু বলতে চেয়েছিলাম। আমি নিষ্ঠুরের মতো সায়ন্তনের সামনেই হয়তো মুখ ফুটে কিছু বলতাম।

প্রতি দিনের মতো অপূর্ব এক মুগ্ধতার মধ্যে আমরা তিনজনে সেদিনও নেশারী নদীর

সেই কংক্রিটের পোলের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছিলাম। আমি, দময়ন্তী, সায়ন্তন।

দময়ন্তীর বাঁ হাত তখন ভালো হয়ে গেছে। ও হঠাৎ সায়ন্তনের কোমরে বাঁধা মিথুন-চামড়ার খাপটা বাঁ হাতের আঙুলে ছুঁয়ে হাসতে হাসতে বললে, এটা কাকে খুন করার জন্যে?

সায়ন্তন, রুক্ষ সায়ন্তন, বলে উঠলো, নিজের বুক চিরে কাউকে যদি হৃৎপিন্ডটা তুলে দেখাতে হয় সেজন্যেই।

দময়ন্তী তার কথায় হেসে লুটিয়ে পড়লো।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে আমি দেখলাম, প্রচন্ড বেগে একখানা খুনী-চোখ নীল রঙের গাড়ি অন্ধের মতো ছুটে আসছে।

নেশারী নদীর শীর্ণ পোলের ওপর দাঁড়িয়ে নিমেষের জন্যে আমি বিমূঢ় বোধ করলাম। কারণ ঐ নীল গাড়িখানাকে আরেক দিন জর্জ মার্কেটের রাস্তায় আমাদের দিকে ছুটে আসতে দেখেছিলাম। যেন কোনো চোরাই মাল নিয়ে পালাতে চায়, কিংবা কে জানে, হয়তো আমাদের কোনো একজনকে...

এক মুহূর্ত। এক মুহূর্ত দেরি হলেই গাড়িটা দময়ন্তীকে চাকার তলায় পিষে ফেলতো, তার শরীরকে ছিন্নভিন্ন করে তার রক্তের ঝর্নায় সমস্ত পথ রাঙিয়ে দিয়ে যেতো। আমি তাই পলকের মধ্যে তাকে বাঁচাবার জন্যে সজোরে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলাম। আমি তাকে বাঁচাতে চাইলাম।

আর সংগে সংগে সায়ন্তন চিৎকার করে উঠলো।—অনিমেষ।

আমার মাথা ঘুরছে তখন, আমি টলছি, আমি জানি না দময়ন্তীকে আমি বাঁচাতে পেরেছি কি না।

সায়ন্তন আবার বলে উঠলো, কি করলি তুই অনিমেষ!

আমি চমকে ফিরে তাকিয়ে দময়ন্তীকে দেখতে পেলাম না। শুধু দেখলাম, সায়ন্তন মুহূর্তের মধ্যে তার নীল সোয়েটারটা খুলে আমার দিকে ছুঁড়ে দিলো।

আমি দু চোখ বন্ধ করলাম।

আমি চোখ বন্ধ করে দেখতে পেলাম সায়ন্তনের শরীরটা নদীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। তার ছ' ফুট চেহারাটা আমার চোখের সামনে দৈর্ঘ্য হারাতে হারাতে একটা ছোট্ট বিন্দুতে হারিয়ে গেল।

আমি তখনো আতঙ্কে উৎকণ্ঠায় থরথর করে কাঁপছি। আমি তখনো ঠিক বুঝতে পারছি না, আমি কি করেছি। কিংবা বুঝতে পারার ফলেই আমার দু চোখ ঠেলে জল এলো।

আমি ছোট্ট শিশুর মতো হাউহাউ করে কেঁদে উঠলাম।

আমি পোলের ধারের খাটো রেলিং থেকে ঝুঁকে নীচে, অনেক নীচের নেশারী নদীর আলো-মাখা কালো-কালো ঢেউয়ের দিকে তাকালাম। আমি দময়ন্তীকে খুঁজলাম, আমি সায়ন্তনকে খুঁজলাম।

আমি, আমি পাগলের মতো কংক্রিটের পোল থেকে ছুটে নেমে গেলাম, নেশারী নদীর তীরের দিকে ছুটে গেলাম।

সেই মুহূর্তে সাঁতার জানি না বলে নিজেকে আমার একেবারে, একেবারে মূল্যহীন মনে হলো।

সে এক দুঃসহ যন্ত্রণা। আমার চোখের সামনে আমি দুটি মৃত্যু দেখতে পাচ্ছি। দুটি অবধারিত মৃত্যু। নেশারী নদীর জোয়ার-জলে কালো-কালো ঢেউ তখন ফুলে-ফেঁপে উঠছে—তার মধ্যে দুটি মানুষ তলিয়ে যাচ্ছে। একজন আমার স্বপ্ন, আরেকজন আমার সহায়। একজন আমার আশা, আরেকজন আমার একমাত্র ভরসা। আমার পায়ের তলার মাটি, আমার মাথার ওপরের আকাশ।

তীরে দাঁড়িয়ে আমি তন্নতন্ন করে ওদের খুঁজলাম।

পোলের ওপরের আলো এসে পড়েছে জলে, সেই ক্ষীণ আলোয় আমি হঠাৎ দুটি মাথা দেখতে পেলাম। দেখতে পাচ্ছি। একটি মাথা ডুবে যাচ্ছে, আবার দুটি মাথাই ভেসে উঠছে। একবার তারা পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, আবার কাছে আসছে।

অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ, কতক্ষণ আমি আজও জানি না।

আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছুটে গেলাম।

সায়ন্তন উঠে আসছে, দময়ন্তীর অচৈতন্য শরীরটাকে টানতে টানতে বয়ে নিয়ে আসছে, ক্লান্ত অবসন্ন শরীরে ধুঁকতে ধুঁকতে উঠে আসছে।

আমি ছুটে গেলাম, আমি খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠলাম। দময়ন্তী বেঁচে আছে, সায়ন্তন বেঁচে আছে।

আনন্দে আমার দু চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো।

আমি ভাবলাম, কৃতজ্ঞতার মূল্য হিসেবে আমি সায়ন্তনকে সব—সব দিতে পারি।

না, আমরা পারি না। কৃতজ্ঞতার প্রতিদান হিসেবে মানুষ বোধ হয় অনেক বেশী মূল্য চায়।

তা না হলে সায়ন্তন অমন মুগ্ধের মতো দময়ন্তীর মুখের দিকে তাকাতে শুরু করবে কেন? দময়ন্তী কেন সায়ন্তনের সঙ্গ পেলেই এমন উচ্ছল হয়ে উঠবে?

আমার সন্দেহ হলো বুক চিরে হৃৎপিণ্ডটা তুলে দেখানোর কথা হয়তো নিছক রসিকতা নয়। আমি তাই হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলাম, সায়ন্তনকে আমি ঈর্ষা করতে শুরু করেছি, সায়ন্তনকে আমি ঘৃণা করতে শুরু করেছি।

আমি তখন এক বিচিত্র যন্ত্রণায় জ্বলছি।

সেই প্রথম আমি সায়ন্তনকে নির্জনে ডেকে নিয়ে গিয়ে নিষ্ঠুরের মতো মুখ ফুটে বললাম, সায়ন্তন, আমি দময়ন্তীকে ভালোবাসি।

সায়ন্তন ধীরভাবে শুনলো, চোখ বুজলো, চোখ খুললো।

তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, আমিও যে ভালোবাসি অনিমেষ।

আমি পাগলের মতো বললাম, কিন্তু দময়ন্তী? সে তোকে ভালোবাসে? না, ভালোবাসে না?

সায়ন্তন মাথা নিচু করে বললে, জানি না।

আমি বললাম, আমি তার ইজ্জত বাঁচিয়েছিলাম, তার সম্মান। ভেবে দেখ সায়ন্তন, যদি তাকে আজ অসম্মানের বোঝা বয়ে বেড়াতে হতো...তার জীবন বাঁচানোর জন্যে সে তোকে ঘৃণা করতো।

সায়ন্তন হাসলো। বললে, জীবন বাদ দিয়ে সম্মানের দাম কতটুকু রে অনিমেষ। তুই, তুই তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিলি, আমি তার জীবন বাঁচিয়েছি। ভেবে দেখ, তার জীবন না বাঁচালে আমরা আজ কাকে ভালোবাসতাম।

আমি তার যুক্তিতে কান দিলাম না। শুধু বললাম, এভাবে চলতে পারে না। এর একটা মীমাংসা করতেই হবে সায়ন্তন।

আমরা দুজনে একদিন একই সঙ্গে দময়ন্তীর কাছে গিয়ে হাজির হলাম। আমরা তিনজনে গিয়ে বসলাম আমাদের জর্জ মার্কেটের চায়ের দোকানটায়।

আমাদের উত্তেজিত মুখ দেখে দময়ন্তী কি বিস্মিত হয়েছিলো?

আমরা বললাম, দময়ন্তী, আমরা স্পষ্ট উত্তর জানতে চাই। তুমি কাকে ভালোবাসো?

দময়ন্তী বিষণ্ণ করুণ দুটি চোখ তুলে বিহ্বলভাবে একবার আমার মুখের দিকে তাকালো, একবার সায়ন্তনের মুখের দিকে।

আমার মনে হলো ভিতরে ভিতরে ও যেন যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়েছে। বুক ঠেলে বেরিয়ে আসা একটা অসহ্য ব্যথাকে চাপা দিতে গিয়ে ওর দু চোখ জলে ভরে এলো।

আমি তবু বললাম, উত্তর দাও দময়ন্তী।

আর সায়ন্তন তার দিকে এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দিলো।

বললো, উত্তর চাই।

মাথা নিচু করে কাগজের টুকরোটা টেনে নিলো দময়ন্তী, কি যেন ভাবলো, তারপর ধীরে ধীরে তার উত্তর লিখে কাগজটা ভাঁজ করলো।

উত্তর জানার জন্যে আমরা উৎসুক হয়ে উঠলাম। সম্মান বাদ দিয়ে জীবনের দাম কতটুকু? কিংবা জীবন না থাকলে সম্মান অর্থহীন কি না। আমরা জানতে চাইলাম, দময়ন্তী

কাকে ভালোবাসে? জীবন, না আত্মসম্মান? সায়ন্তন, না অনিমেষ?

দময়ন্তী ততক্ষণে কাগজের টুকরোটা জর্জ মার্কেটের সেই চায়ের দোকানের টেবিলের ছাইদানি চাপা দিয়ে রেখে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেছে।

আমরা দুজনেই কাগজটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। উৎসুক, অথচ প্রচণ্ড একটা ভয়। যেন এখনই আমাদের যে-কোনো একজনের সমস্ত স্বপ্ন, সব আশা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। যেন আমরা এখনই পরস্পরের শত্রু হয়ে উঠবো।

আমরা উৎসুক হয়ে উঠলাম একটি প্রশ্নের উত্তর জানার জন্যে। দময়ন্তী কাকে ভালোবাসে, কোন্ কৃতজ্ঞতার প্রতিদান দিতে চায় দময়ন্তী।

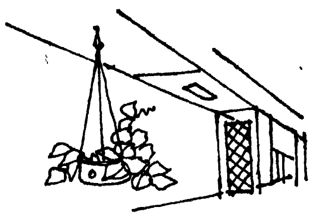
আমি সায়ন্তনকে বললাম, তুই খোল, খুলে দেখ কি আছে।

সায়ন্তন হেসে বললে, আমার সাহস নেই, তুই, তুই দেখ অনিমেষ।

আমি ভয়ে ভয়ে কাগজের টুকরোটা টেনে নিলাম। আমার হাত থরথর করে কাঁপলো। আমি ভাঁজ খুললাম, খুলে পড়লাম কাগজের লেখাটুকু। তারপর টুকরোটা সায়ন্তনের দিকে এগিয়ে দিলাম।

শুধু একটি লাইন, একটি লাইনই লেখা ছিলো সেই কাগজের টুকরোয়। লেখা ছিলো : কৃতজ্ঞতার চেয়ে প্রেম অনেক অনেক বড়।

[১৩৭৪



বসবার ঘর

কোথায় যেন গিয়েছিলো, হিমু হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এলো। রেখাকে দেখেই দম নেবার চেষ্টা করে হাসতে হাসতে বললে, ছোট বউদি, কেলেঙ্কারিয়াস ব্যাপার।

—কি হলো আবার? রেখার মুখে তখনো আতঙ্ক ছিলো না, বরং কৌতুকের ছিটে লেগে ছিলো হাসিতে, হিমু কিছু একটা করে এসেছে হয়তো। দু টাকার নোটটা কোথায় যে পড়ে গেল, কিংবা ভাঙানি পয়সা ফেরত নিতে ভুলে গেছি!

উঁহু, হিমু তখনো হাঁপাচ্ছে। কোনোরকমে বললে, অবনীবাবুকে দেখলাম। বাস থেকে নামলেন, সঙ্গে বোধ হয় অবনীবাবুর বউ। বলে আমার দিকে তাকালো হিমু, আমি রেখার মুখের দিকে।

রেখার চোখ বললে, বোঝো এবার। তার পরই ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝে ওর মুখ ফ্যাকাশে হলো, চোখ গোল গোল। রীতিমতো আতঙ্ক সে চোখে।

হিমু তখনো হাসছে।—দেখেই...বাস থেকে নামলেন আর আমি ছুটতে ছুটতে—এই দেখো, স্যাণ্ডেল ছিঁড়ে গেছে।

রেখা চট্ করে একবার ঝুলবারান্দা থেকে উঁকি দিয়ে দেখে এলো, অবনীবাবুরা এসে পড়লেন কি না। আমার তখন এত আক্ষেপ হচ্ছে, কি যে করবো ভেবে পাচ্ছি না। সেদিন

অবনীবাবুদের পাড়া দিয়ে যেতে যেতে কি যে খেয়াল হলো, কেন যে ঢুঁ মারলাম ওঁর বাড়িতে!

অবনীবাবুর স্ত্রী খুব মিশুকে লোক, আলাপ হতেই বললেন, স্ত্রীকে নিয়ে আসবেন একদিন।

আমি দিব্যি ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে ভাবলাম, রেহাই পাওয়া গেল। কিন্তু অবনীবাবু বলে বসলেন, আহা, প্রথমে একবার তুমি গিয়ে না বলে এলে তিনি আসবেন কেন!

সে কথাটা রেখাকে আর বলিনি, ভেবেছিলাম অবনীবাবুরা সত্যি কি আর আসবেন। তা ছাড়া, শুনলে রেখাও তো চটে যেতো।—এলে কোথায় বসতে দেবে শুনি? অবনীবাবু একা হলেও কথা ছিলো, মেয়েদের তো জানো না, সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাদের দেখা চাই।

এখন আর সেসব কথা বলার সময়ই নেই তার। রাস্তার মোড়ে লাল আলোটা হলুদ থেকে সবুজ হয়ে গেলেই যেমন তাড়াহুড়ো পড়ে যায়, সমস্ত বাড়িটার এখন তেমনি অবস্থা! পলকের মধ্যে খবরটা মেজ বউদির কাছে, কুমকুমের কাছে, ছোড়দির কাছে পেঁছে দিয়ে এসে ও তখন আলমারির সামনে চাবির গোছা নিয়ে দাঁড়িয়েছে।

আলমারি খুলে সবে মণিপুরী বেডকভারটা বের করেছে, মেজ বউদি এসে বললে, ছোটু, ধোয়ানো চাদর আছে আর?

একটা সাদা চাদর বের করে দিলো রেখা, আর মেজ বউদি সেটা হাতে নিয়ে কুমকুমকে ডাকতেই সে সুড়ুৎ করে বেরিয়ে গেল। বলতে বলতে গেল, ইস্, আমাকে বুঝি শাড়িটা বদলাতে হবে না!

রেখা ততক্ষণে বিছানার ওপর বেডকভারটা বিছিয়ে ফেলেছে, আলনার কাপড়গুলো দ্রুত হাতে গুছিয়ে রাখছে।

এমন প্রায়ই হয়। কেউ এসে পড়লে বা এসে পড়েছে শুনেই দুদ্দাড় ছোটাছুটি শুরু হয়ে যায়। দু-চার মিনিটে এলোমেলো নোংরা ঘর ক'খানা যতখানি সাজিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা যায়।

—কাজের সময় কেন যে আসে। কাজের ফাঁকেই বিড়বিড় করলো রেখা।

কেউ এলেই আজকাল চটে যায়। অথচ আগে প্রায়ই বলতো, কি বাড়ি বাবা তোমাদের, কেউ বেড়াতেও আসে না!

অলক, আমার ইস্কুলের বন্ধু, একসঙ্গে পড়তাম। হঠাৎ একদিন পনরো বছর পরে বাসে দেখা হয়ে গেল। চিনতে পেরে চলন্ত বাসেই জড়িয়ে ধরলো, চল্, তোকে আমার বাড়ি আজ যেতেই হবে।

আমি যত বলি, হবে হবে, আরেক দিন গেলেই হবে, তবু শোনে কি। শেষে ঠিকানা লিখে নিলো, বললে, না এলে দেখিস বউকে নিয়ে একদিন গিয়ে হাজির হবো।

রেখাকে এসে বললাম, জানো, আজ এক ইস্কুলের বন্ধু, অলক...

রেখা সব শুনে বললে, না গিয়ে ভালোই করেছো, গেলেই তো আসার কথা বলতে হতো...

—কিন্তু ও যে বলেছে, না গেলে নিজেই এসে হাজির হবে বউকে নিয়ে। আমি হাসতে হাসতে বললাম বটে, কিন্তু ভয় আমারও। ও তো জানে, আমি চাকরি করছি ভালো, উন্নতি হয়েছে, এসে ঘরখানা যদি দেখে...

—সত্যি, বসবার ঘর একখানা না হলে কিন্তু চলে না। রেখা মাঝে মাঝে বলে।

অথচ উপায় কি!

এত ইচ্ছে হয়, এই একঘেয়েমি ছেড়ে মাঝে-সাঝে এর-ওর বাড়ি বেড়াতে যাই, ইচ্ছে হয় তারা মাঝে মাঝে বেড়াতে আসুক, দু দণ্ড বসে গল্প করি, কিন্তু—না, আমাদের কোনো বসবার ঘর নেই। নেই বলেই দিনে দিনে মানুষগুলোকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছি, দূরে সরে আসছি নিজেরা, একা হয়ে যাচ্ছি।

ছি, ছি, মালপত্রে ঠাসা এই নোংরা ঘরে কাউকে এনে বসানো যায়? এই খাট-আলমারির বন্ধ-হাওয়া অন্ধকূপে?

ওঃ, সেদিন কি ভয়ই পেয়েছিলাম। আলনা গুছিয়ে, বিছানার চাদর বদলে, রেখা কুমকুম ওরা শাড়ি পালটে, মেঝেতে তাড়াতাড়ি ঝাঁটা বুলিয়ে অপেক্ষা করে রইলো। কিন্তু অবনী-

বাবুরা এলেন না। হিমুর কাণ্ড, কাকে দেখতে কাকে দেখেছে। কিংবা অবনীবাবুই হয়তো অন্য কার বাড়ি গেছেন, বাস থেকে নামতে দেখে ও ভেবেছে এদিকেই আসছেন।

সেদিন খুব হাসাহাসি হয়েছিলো হিমুকে নিয়ে। তখন অস্বস্তি কেটে গেছে, অবনীবাবু আসতে পারেন এমন ভয়ও নেই, তাই প্রাণ খুলে হাসতে পেরেছিলাম হিমুকে ঠাট্টা করে।

কুমকুম তবু ঠোঁট ফুলিয়ে বলেছিলো, আমাদের বাড়িটা কি রে ছোটদা, একটা ড্রয়িং রুমও নেই।

বাইরের লোক এলে তাকে বসতে দেবার জন্যে এক টুকরো বারান্দা থাকলেও কথা ছিলো। তা-ও নেই। না, আমাদের কোনো বসবার জায়গাই নেই।

কিন্তু মেজদা বড় মেজাজী রসিক মানুষ। কুমকুমের অভিযোগ শুনে খেঁকানি দিয়ে উঠলেন!—কি নেই? তারপর কুমকুমের আদুরে-আদুরে গলাটা নকল করে ভেংচি কাটলেন, ড্রয়িং রুম? টুল-রুম নেই, তার ড্রয়িং রুম।

—টুল-রুম কি মেজদা? কুমকুম বুঝতে না পেরে জিগ্যেস করলো।

—টুল-রুম বুঝলি না? বসবার জন্যে দু-একটা টুল রাখার মতো ঘর। মেজদা নিজের রসিকতায় নিজেই হাসতে লাগলেন।

আট বছরের টুটু মিশনারি ইস্কুলে পড়ে, ও মাস্টারি করতে ছাড়লো না। ঠাণ্ডা গম্ভীর গলায় বললে, ড্রয়িং রুম না রে দিদি, আজকাল সিটিং রুম বলে।

—তুই থাম তো। কুমকুমের ভুল ইংরেজী উচ্চারণ ধরে ও কথায় কথায়, তাই ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলো কুমকুম।

এদিকে মেজ বউদি কোন্ ফাঁকে এসে ঢুকেছেন কেউ লক্ষ করেনি। বললেন, তোমার আবার ড্রয়িং রুমের দরকার পড়লো কেন শুনি? পাত্রপক্ষ যখন মেয়ে দেখতে আসবে তখন এই ঘরে বসতে দিলেই হবে, তোমার অত দুশ্চিন্তা বইতে হবে না।

কুমকুম নাক উঁচু করলো।—বয়ে গেছে গান্ধীর মতো গালে হাত দিয়ে বসতে। আমি বিয়েই করবো না।

মেজদা-টার পড়াশুনো বেশী এগোয়নি, বিয়াল্লিশে বন্দেমাতরম্ করে জেলে গিয়েছিলো, এখন ছোট্ট একটা চীনেমাটির কারখানা চালায়। মেজদা হেসে বললে, গান্ধীর সে ছবি তোরা দেখেছিস? তোরা তো ভাবিস গান্ধী বলে কেউ ছিলোই না।

আমি বললাম, পাগল হয়েছো মেজদা, সে ছবি কোথায় দেখবে? ও নির্ঘাত কোনো বইয়ে...

কুমকুম কিন্তু আবার ড্রয়িং রুমেই ফিরে গেল।—তোমরা বুঝবে না। নাকের ডগা থেকে চিবুক অবধি এমন একটা ঘেন্না ঝরিয়ে দিলো কুমকুম যে, আমরা হেসে ফেললাম। ও আরো চটে গেল, চোখ কান্না-কান্না।—জানো, কলেজের সবাই আমাকে আন্‌সোস্যাল বলে। কারও বাড়ি যাই না। কাউকে আসতে বলি না। শুধু সুধা নন্দিতা, ওরা তো ছোট থেকে দেখছে।

মেজ বউদি বুঝতে পারেননি, পান চিবোতে চিবোতে বললেন, গেলেই পারো তাদের বাড়ি, কার শাসনই বা তুমি মানো।

কুমকুম হাসলো।—বসবে কোথায় তারা, এলে? এই ঘরে কাউকে আনা যায়?

টুটু ভারিক্কি চালে বলে উঠলো, ঠিক বলেছিস দিদি। স্কুলের বাস থেকে একদিন উমাশঙ্কর প্যাটেল নামতে চাইলো। আমার এত লজ্জা করছিলো—

রাগে আমার কান ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠলো। ছেলেটার পাকামি দেখলে, ওর এই আট বছরে আটচল্লিশের ভান দেখলে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ইস্কুলগুলোর ওপর রাগে আমার সারা শরীর জ্বলে যায়। ওঃ, কি লাটসাহেব রে, বসার ঘর নেই বলে ওঁর লজ্জা। ড্রয়িং রুমওলা বাড়ি ভাড়া নিলে যে তোকে কর্পোরেশন ইস্কুলে পড়তে হবে, তা জানিস? একটা ধমক দিতে যাচ্ছিলাম তাই।

কুমকুম তার আগেই হেসে উঠেছে।—আমি বাবা কারও জন্মদিনে যাই না সেজন্যে।

বাড়িটার দিকে তাকালে আমার নিজেরও গা রি-রি করে, কুমকুমকে দোষ দেবো কি! ঘর তো নয়, এক-একখানা গোডাউন। কাঠের বেঞ্চির ওপর সারি সারি তোরঙ্গ একটার ওপর একটা, ওপাশে লেপ তোশক স্তূপীকৃত করা আছে, খাট-আলমারি, খাটের নীচে থেকে

বিয়ের সময় পাওয়া গামলা কলসী হাঁড়ি ইত্যাদি উঁকি দিচ্ছে, ওপাশে আলনা—যেটুকু দেয়াল দেখা যাবার কথা, তাও সতেরোটা ক্যালেণ্ডারে চালচিত্তির হয়ে আছে।

যাচ্ছেতাই, যাচ্ছেতাই।

বাবা এখন অবশ্য রিটায়ার করেছেন, কিন্তু সেই অসুখের সময় বাবার আপিসের হালদার সাহেব দেখা করতে এলেন, বাবা তো 'এখানেই নিয়ে আয়' বলে খালাস, আমার যে কি অস্বস্তি হচ্ছিলো! মা আবার শাড়ির পাড় জুড়ে জুড়ে ট্রাংকের ঢাকা বানিয়েছে। এত সেকেলে লাগে!

এমন একটা আতঙ্ক নিয়ে বাস করা যায়!

ভেবেছিলাম, অলক হয়তো ভুলে গেছে, আর আসবে না। অবনীবাবু মুখে যা-ই বলুন, সত্যি কি কেউ যেচে নিজে নিজে আসতে পারে।

কিন্তু সেদিন অলক হঠাৎ আপিসে এসে হাজির।

হেসে বললে, কি রে, গেলি না তো?

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, আপিসের খবর পেলি কোত্থেকে?

—বাঃ, সেদিন তো বললি, টেলিফোন ডিরেক্টরি দেখে...

তারপর একটু থেমে বললে, বউয়ের কাছে প্রেস্টিজ আর রইলো না, এত গল্প করেছি এত দিন, তারপর সেদিন বললাম, দেখা হয়েছে, আসবে বলেছে...

বললাম, সময় পাই না, যাবো, যাবো।

—আর গিয়েছিস! উমা প্রত্যেক রবিবারে বলে, কই গো, তোমার সেই বন্ধু তো এলো না। অলকের মুখ দেখে মনে হলো, ও ভেবেছে আমি ওকে ভুলে গেছি, কিংবা ওকে তাচ্ছিল্য

আমি চা আনিয়ে হাসতে হাসতে বললাম, ঠিক আছে, এই সপ্তাহেই যাবো।

মনে মনে প্রতিজ্ঞাও করে ফেললাম। অলক, অলকই তো, সেই ছোটবেলায় কত বন্ধু ছিলো! একটা দিন দেখা না হলে মন খারাপ হতো, রাত্রে ঘুম হতো না, যার যত সমস্যা একজন আরেকজনকে না বলে শান্তি ছিলো না। আর সেই প্রেমপত্র লেখা?

মনে পড়তেই হেসে ফেললাম।—স্বর্ণর খবর কি রে?

অলক লজ্জা পেলো। বললে, কি জানি, ওর তো সেই আসানসোলে বিয়ে হয়েছিলো, তারপর...

ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি তখন দুজনে, স্বর্ণর সঙ্গে ভালোবাসাবাসি হয়েছিলো অলকের। কিন্তু বেচারা বাংলায় ভীষণ কাঁচা ছিলো, আর কি বিশ্রী হাতের লেখা। ফলে অলকের নাম দিয়ে আমাকেই প্রেমপত্র লিখে দিতে হতো। কত শলাপরামর্শ করে সুন্দর সুন্দর চিঠি দিতাম, আর উত্তর পেলেই এসে হাজির হতো অলক। আমি বলতাম, স্বর্ণ দেখিস শেষে আমারই প্রেমে পড়ে যাবে, যদি জানে আমার লেখা...। কোনো দিন বলতাম, স্বর্ণকে একটা চুমু খেতে দিবি বল, তা নইলে যাও বাবা, নিজে লিখবে যাও। ওর তখন হাতের লেখা বদলানোর উপায় নেই, অথচ আমার কথা শুনে ওর খুব খারাপ লাগতো। যেন আমি সত্যি সত্যি চুমু খেতে চাইছি। তখন তো জানতাম না, যাকে ভালোবাসা যায়, মানুষ তাকে ভিতরে ভিতরে শ্রদ্ধাও করে।

সেসব কথা মনে পড়তেই বললাম, তোর বউকে কিন্তু সব বলে দেবো।

অলক হা-হা করে হেসে উঠলো।—আরে, আমিই তো সব বলেছি, তুই চিঠি লিখে দিতিস, তা-ও। তাই তো বলে, তোকে একদিন...

আমি কথা দিলাম, অলক বিশ্বাস করে চলে গেল।

কিন্তু আমার ভীষণ খারাপ লাগলো। রেখাও সব শুনে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো।—যেতে হয় তুমি একা যাও। আর ভালোমানুষ সেজে তাদের আসতে বোলো না যেন।

আচ্ছা, কারও বাড়ি গিয়ে তাকে আসতে না বললে চলে!

আর ইচ্ছেও তো হয়। এত যে একা-একা লাগে, সন্ধ্যের পর কোথায় যাবো খুঁজে পাই না, ছুটির দিনগুলো এত বিস্বাদ হয়ে ওঠে, কোথাও গিয়ে গল্পগুজব করে মশগুল হয়ে যেতে সাধ হয়...নাঃ, শুধু একটা বসবার ঘরের অভাবে ক্রমশ যেন নিজেদের গুটিয়ে ফেলছি;

সকলকে দূরে সরিয়ে দিয়ে খোলসের মধ্যে ঢুকে পড়তে চাইছি।

মনে-প্রাণে যেটা ইচ্ছে হয় সেটাই একটা আতঙ্ক।

মনে হয় যাদের বেশ একটা সুন্দর সাজানো-গোছানো বসবার ঘর আছে তাদের মতো সুখী আর কেউ নেই।

অনেক আগে একবার বিজ্ঞাপন দেখে ট্যুইশনির জন্যে দরখাস্ত করেছিলাম, পরাশর রোডের সেই বাড়িটা যেন চোখে লেগে আছে। জানালায় কি সুন্দর পর্দা, দেয়ালে হালকা সবুজ রঙ, আর বসবার ঘরখানা! থালার মতো বড় একটা ঘষা কাঁচের শেড, আলোটা ঠিক সাদা মেঘ-ঢাকা জ্যোৎস্নার মতো। মেঝেতে কি নরম কার্পেট, জুতো পরে ঢুকবো, না খুলে রেখে, ভেবে পাইনি। আর সোফা সেট! কি নরম গদি, কি চমৎকার ফিকে রঙের ঢাকনি।

বহু দিন অবধি অমনি একটা ড্রয়িং রুম আমার স্বপ্ন ছিলো। ভাবতাম, মাইনেটা যদি বাড়ে, ভাড়া নিয়ে একখানা বসবার ঘর সাজাবো মনের মতো করে। তখন আর বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন কাউকে ভয় পাবো না।

ভয় পাবো না বললেই তো ভয় দূরে সরে থাকবে না।

রবিবার বিকেলে ঘুম থেকে উঠে সবে চায়ের কাপে চুমুক দিয়েছি, ইস্, চায়ের কাপটাও কি বাজে, দোকানের শো-কেসে সেদিন কি সুন্দর সুন্দর ডিজাইন দেখলাম,—কুমকুম এসে বললে, ছোটদা, কে এসেছে তোমার কাছে, সঙ্গে মেয়েছেলে...

চা-টা নিমেষে আরো বিস্বাদ লাগলো।

কে এলো? অবনীবাবু? অলক? রেখাদের সম্পর্কের কেউ?

তাড়াতাড়ি না গিয়েও উপায় নেই, নিশ্চয়ই দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। টুটু, হিমু পড়তে বসেছে, মাস্টার এসেছে তাদের, সেখানেও যে বসতে বলবো তার উপায় নেই। রেখাই বা গেল কোথায়?

গিয়ে দেখি অলক। সঙ্গে বউ।

অলক বললে, বলেছিলাম না, না গেলে নিজেই আসবো। বলে হাসলো ও। পরিচয় করালো, এই উমা।

বাঃ, বেশ ছিপছিপে চেহারা, মিষ্টি-মিষ্টি মুখ, রঙটা একটু চাপা, চাপা বলেই ভালো লাগছে।

উমা হাসি-হাসি মুখে বললে, পর্বত যখন মহম্মদের কাছে যাবে না...

ভিতরে ভিতরে তখন অস্বস্তি বোধ করছি, আমার হাসিটাও কেমন নকল-নকল ঠেকলো নিজের কাছেই। মন খুলে কথা বলতেও পারছি না। কিন্তু এভাবে আর দাঁড় করিয়ে রাখা যায় না। বললাম, চলুন। চল্, ভিতরে চল্।

ঘরের ভিতরে নিয়ে এসে ভাঙা চেয়ারটা টেনে দিলাম অলককে, উমা খাটের পাশে বসলো।

রেখা এলো, কুমকুম এলো।

অলক দেখে বললে, কুমকুম? এত বড় হয়ে গেছে? বাগেরহাটে থাকতে, মনে আছে? ওকে রথ দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম কোলে করে?

কুমকুম হাসলো। বোকার মতো। ও তো চিনতে পারছে না! আর আমি ভাবলাম, বাগেরহাটের সেই বাড়ি, সেই বাগান—অলক আর উমা এই ঘরখানা দেখে কি ভাবছে কে জানে।

অস্বস্তি কিংবা ঘরদোরের লজ্জায় রেখাও ওদের সঙ্গে ভালো করে আলাপ করতে পারলো না।

বাবাকে প্রণাম করে মেজদার সঙ্গে মেজ বউদির সঙ্গে গল্প করে অলক চলে গেল। বার-বার বলে গেল, যাস কিন্তু একদিন।

ওরা চলে যাওয়ার পর কি স্বস্তি। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। ওরা কি ভাবলো কি জানি! একসময় তাই অনুশোচনায় মুষড়ে পড়লাম। এসেই যখন পড়লো, তখন এত সঙ্কোচের কি ছিলো, মন খুলে গল্প করে আবার তো ছোটবেলার সেই জীবনে কিছুক্ষণের জন্যে ফিরে যেতে পারতাম। তা নয়, শুধু 'হুঁ' আর 'না'। রেখাও তো দু-চারটে কথা বলতে পারতো। অলক এত অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলো আমার, এত আপন, অথচ মনে হলো যেন শিঙাড়া আর চা খেতে এসেছিলো।

নিজের ওপর রাগ হলো, রেখার ওপর, সমস্ত বাড়িটার ওপর। এক-একসময় রাগে সব তছনছ করে দিতে ইচ্ছে করে, ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে, কিংবা মেজদা, মেজ বউদি, হিমু, কুমকুম সকলকে ছেড়ে একটা ছোট্ট সুন্দর স্বার্থপরতার ফ্ল্যাটে পালাতে ইচ্ছে করে। তখন আর এত অস্বস্তি থাকবে না, সংকোচের খাঁচার মধ্যে লুকিয়ে থাকতে ইচ্ছে হবে না।

—কি ভাবলো বলো তো আমাদের? রেখাকে বললাম।

রেখা মুখ কাঁচুমাচু করে বললে, সেবার ছোট জামাইবাবু এসেছিলো, ফিরে গিয়ে বলেছে আমরা নাকি কথা বলি না, মিশতে জানি না...

আমি হাসলাম।—কেন তা তো জানে না।

রেখা হঠাৎ হেসে উঠলো, বললে, যা হবার তা তো হয়েই গেছে, চলো একদিন অলকদের বাড়ি যাই।

সত্যি তো, এখন তো আর ভয় নেই। গেলেই হয়। বরং অলক খুশী হবে, উমা খুশী হবে, আমাদের সম্পর্কে ভুল ধারণা হবে না।

ঠিকানা খুঁজে খুঁজে একদিন গিয়ে হাজির হলাম রেখাকে সঙ্গে নিয়ে।

গলিটায় ট্যাক্সি ঢুকতে চাইলো না, তাই ভাড়া মিটিয়ে বাড়ির নম্বর দেখে হাঁটছি, একটি বাচ্চা মেয়ে জিগ্যেস করলো, কাদের বাড়ি খুঁজছেন?

অলকের নাম বলতেই বললে, উমাদিদের বাড়ি? ঐ তো, দরজায় কড়া নাড়ুন।

ও মা, এই বাড়ি! মান্ধাতা আমলের জীর্ণ বাড়ি, দেয়ালে গঙ্গাজলের ট্যাঙ্ক থেকে জল গড়িয়ে গড়িয়ে শ্যাওলা ধরেছে। গলিটায় কেমন একটা ভ্যাপসা দুর্গন্ধ।

কড়া নাড়তেই কে এসে দরজা খুলে দিলো। কে আবার? অলক। তারপর আমাদের দেখে অলকের সমস্ত মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো! চিৎকার করে ডাকলো, উমা, এই উমা, আরে দেখবে এসো কারা এসেছে। কি ভাগ্য রে, তোরা সত্যি সত্যি...আসুন বউদি, আসুন।

উমাও ছুটে এলো। একগাছ ফুলের মতো মুখ নিয়ে। আনন্দে বিস্ময়ে রেখার আর আমার দুখানা হাত ধরে ফেললো দু হাতে। —আসুন, আসুন। এই মণ্টু, মণ্টু, তোর সেই নতুন কাকীমা এসেছে রে...

মণ্টু তো এসে ঢিপ করে প্রণাম করলো আমাদের।

উঁচুনিচু ভিজে ইঁটের উঠন ডিঙিয়ে একেবারে শোবার ঘরে নিয়ে গেল উমা। কিংবা ঐ একটাই ঘর হয়তো। একটা তক্তপোশ, কমদামী একটা রেডিও, কেরোসিন কাঠের একটা খাবারের আলমারি, দেয়ালের পেরেকে একটা তালপাতার পাখা।

অলক ভাঁজ খুলে ক্যানভাসের চেয়ারটা পেতে দিলো, নিজে একটা মোড়া টেনে নিলো। আর উমা রেখার হাত ধরে হাসতে হাসতে তাকে তক্তপোশের ধারে বসালো।

তারপর বললে, এক মিনিট ভাই, চায়ের জলটা বসিয়ে আসি।

আমি বললাম, আহা, এত তাড়া কিসের?

—আপনাদের নামে আমারও এক কাপ হয়ে যাবে যে, স্বার্থ আছে বইকি। বলেই চলে গেল উমা।

দু মিনিট পরেই ফিরে এসে বসলো রেখার পাশে। বললো, ওঁরা এত বন্ধু, আমরাও দুজনে খুব বন্ধু হয়ে যাবো, কি মশাই, রাজী তো? বলে রেখার হাতে হাত রাখলো।

একটু পরেই রেখাকে বললে, চলো ভাই। তুমি বললাম বলে রাগ করলে না তো?

রেখাকে দেখে মনে হলো ও অনেক দিন পরে যেন হাসতে শিখেছে। খুশী-খুশী।

উমা আমাকে বললে, গল্প করুন। বলেই রেখাকে বললে, চলো, চলো, আমরা দুজনে মিলে চা-টা করে নিই।

বাঃ রে, উমা নয়, রেখা এসে চা দিয়ে গেল। আমার ভীষণ ভালো লাগলো। খুব আপন-আপন। যেন নিজেরই বাড়ি।

একটু পরেই উমা চিৎকার করলো।—ও স্যার, আপনারা এখানে আসুন না ; এক সঙ্গে গল্প করি।

অলক হেসে বললে, চল্, তোকে ডাকছে।

রান্নাঘরের সামনে এসে দাঁড়াতেই দুটো পিঁড়ি এগিয়ে দিলো উমা।—বসুন এখানে। একা-একা দুজনে স্বর্ণলতার গল্প করবেন, ওসব হবে না।

—স্বর্ণলতা কে? রেখা চোখ কপালে তুললো।

—ও মা, জানো না? বলে রসিয়ে রসিয়ে আমার প্রেমপত্র লিখে দেওয়ার গল্পও বললো উমা, বলতে বলতে হেসে গড়িয়ে পড়লো।

আমি ততক্ষণে লক্ষ করেছি, আটা মেখে লুচি ভাজার ব্যবস্থা করছে উমা, আর রেখা লুচি বেলে দিচ্ছে।

হঠাৎ তাই বলে বসলো, কি মশাই, বউকে খাটিয়ে নিচ্ছি বলে চটে যাচ্ছেন না তো!

আমরা সবাই হেসে উঠলাম।

লুচি ভাজতে ভাজতে উমা হঠাৎ সহাস্যে বলে উঠলো, সত্যি বলুন তো, স্বর্ণলতা খুব সুন্দর ছিলো? আমার চেয়ে?

ছেলেবেলার গল্পের মধ্যে ডুবে গিয়ে কিভাবে যে সময় কেটে গেল টেরই পাইনি। উমা প্রথমে আবদার ধরেছিলো রাত্রেও খেয়ে যেতে হবে। আরেক দিন এসে খেয়ে যাবো কথা দিলাম।

যখন বিদায় নিলাম, বাস-স্টপ অবধি ওরা দুজনেই এলো।

বাস ছেড়ে দেওয়ার পরও ফিরে দেখলাম ওরা তখনো আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

রেখা ওর হাতে-বাঁধা ছোট্ট ঘড়িটা দেখে বললে, পেঁছতে পেঁছতে রাত দশটা বেজে যাবে।

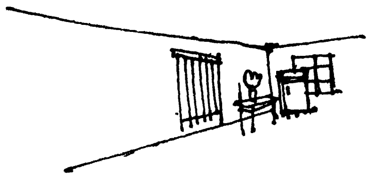
বললাম, হুঁ।

তারপর স্বগতোক্তির মতো যেন নিজেই নিজেকে বললাম, খুব মিশুকে কিন্তু ওরা, কেমন আপন-আপন।

রেখা কি ভাবছিলো।

—ওদেরও কিন্তু...কি বলতে গিয়ে চুপ করে গেল রেখা। শুধু বললে, হ্যাঁ, খুব মিশুকে।

[১৩৭৪



আলমারিটা

'চাই না, চাই না, আমি তোমাদের কাছে হিরো হতে চাই না।' আমি মনের মধ্যে সমস্ত বিরক্তি চেপে রাখার চেষ্টা করেও পারলাম না।

মনে মনে বললাম, ঐ গোঁয়ার বখাটে ছোকরা, ও কিনা তোমাদের কাছে...

রাস্তা পার হওয়ার আগে সকলেই যেমন একবারটি থমকে দাঁড়ায়, চল্লিশের কোঠায় পেঁছে তেমনিভাবে থেমে পড়ে কার ভাবতে ভালো লাগে, ভুল পথে এসেছি! ভুল পথ? জানি না, জানি না। আজকাল এক-একসময় মনে হয় কাঁটা, জঙ্গাল, বোলতা, বিছুটি যেন আমার আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। একটু নড়াচড়া করতে গেলেই যেন কুটকুট করে ওঠে। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে কিছু একটা করে ফেলতে ইচ্ছে করে। আবার এক-একসময় মনে হয় ছুঁই-ছুঁই বাতিকওয়ালা বুড়ীর মতো পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলতে

পারলেই বুঝি শান্তি।

—মিস্টার জামাইবাবু, আপনার মতো লোক একালে অচল, বুঝলেন? ভদ্রতা-টদ্রতা এখন শিকেয় তুলে রাখুন।

আমাদের ছোট্ট ফ্ল্যাটের ছোট্ট বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে ছুটির দিনের বিকেলের চায়ে সবে চুমুক দিতে যাবো, রাস্তা থেকে সজোরে ব্রেক-কষা একটা গাড়ি ক্যাঁ—ও—চ্ করে শব্দ করলো। তারপরই চিৎকার হই-হট্টগোল।

আমরা ছুটে গেলাম। আমি, অমিতা, ঋণা।

মণ্টু নয় তো?

না, পাড়ার অন্য একটি ছেলে। রাস্তা পার হতে গিয়ে এখনই চাপা পড়তো। এখন বোকার মতো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে থরথর করে কাঁপছে।

কিন্তু তার দিকে তাকানোর তখন আর সময় নেই। সমর—পাড়ার সেই গোঁয়ার বখাটে ছোকরা—গাড়ির ড্রাইভারকে টেনে নামিয়েছে।

পাশের বাড়ি থেকে কে যেন জিগ্যেস করলেন, কি হয়েছে সমর?

—বাচ্চাটাকে চাপা দিচ্ছিলো মোসাই, এখন আবার রোয়াব দেখাচ্ছে, বলে কিনা চাপা দিলে বলতেন।

ঘাড় ফিরিয়ে কথা বলছিলো বটে, কিন্তু ড্রাইভারের জামার কলারটা তখনো ছাড়েনি। কথা শেষ করেই তাকে এক চড় মারলো বখাটে ছেলেটা।

আমি ঋণা আর অমিতাকে বললাম, চলে এসো, চলে এসো।

স্বগতভাবে যেন নিজেই নিজেকে বললাম, ও কি ইচ্ছে করে চাপা দিচ্ছিলো?

—আহা, তা বলে দেখে চালাবে না? অমিতা বললো, মেরেছে ঠিক করেছে, এত জোরে গাড়ি চালায় কেন? ঐটুকুন একটা বাচ্চা, যদি চাপা পড়তো—ভাবুন তো?

—সত্যি, ভাবতেও গা শিউরে উঠছে। ঋণার চোখে-মুখেও আতঙ্ক ফুটে উঠলো। বারান্দা থেকেই ডাকলো, এই মণ্টু, তুই চলে আয়।

আমরা আবার ফিরে এসে বসলাম বেতের চেয়ারে, বারান্দায়। কিন্তু ততক্ষণে চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, মন বিস্বাদ। ড্রাইভারটার দোষ হয়তো আছে, কিন্তু গোঁয়ারগোবিন্দ ঐ সমরকে জজসাহেব হবার—তা কেন, একাধারে দারোগা-জজ-জেলার হবার অধিকার কে দিলো!

অমিতা হেসে উঠলো।—ও বাব্বা, কথায় কথায় লজিকের বই খুলে বসতে হবে নাকি?

আমার মনের মধ্যে তখনো উত্তেজনার ঘোর কাটেনি, অথচ ঋণা আর অমিতা এর মধ্যেই কত সহজ হয়ে গেছে। দিব্যি রসিকতা করছে।

ঋণার মাসতুতো বোন অমিতা, সম্পর্কটা মধুর। ও আরো মধু মিশিয়ে হাসলো। তবু আমার মনের গ্লানি দূর হলো না।

বললাম, অমু, তুমি না কলেজে-পড়া মেয়ে? তোমার এসব মারামারি ঝগড়াঝাঁটি ভালো লাগে?

অমিতা আবার হাসলো।—ভালো লাগা-টাগা জানি না, তবে আপনার মতো ইস্ত্রি-করা কথা বলে, ড্রাইংক্লিনিং-ফেরত ব্যবহার, এমন লোকের হাতে যেন না পড়ি। তা হলে সারা জীবন কপালে ভোগান্তি লেখা থাকবে, না রে সেজদি?

ঋণা হেসে উঠে বললো, যা বলেছিস।

বারান্দার এক পাশে রাখা আলমারিটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো, ঐ যে। ভদ্রলোক হওয়ার ভোগান্তি। ওঁর তো সব বিষয়ে এটা করতে লজ্জা, ওটা করতে লজ্জা।

আলমারিটার দিকে তাকিয়ে আমারও অবশ্য মনের ভিতরটা কেমন খিচখিচ করে উঠলো।

আগে ঘরের মধ্যেই ছিলো, এখন বারান্দায়। এই তো ছোট্ট এক ফালি বারান্দা, তার আধখানা জুড়ে আছে আলমারিটা। তাও সব সময় কেমন একটা সঙ্কোচ হয়, সব সময় ভয়-ভয়। কবে ছোট মামা এসে পড়ে। আর আত্মীয়স্বজনদের তো বিশ্বাস নেই, খুঁত ধরতে পারলে কেউ ছাড়ে না।

এর মধ্যেই তো বড় পিসীমা একদিন এসেছিলো, বলে গেল, তোর আপন মামা, রেখে গেল এমন বনেদী জিনিসটা, তোদের দু-দুখানা ঘর থাকতে...এটা কিন্তু অন্যায় করেছিস

অবুণ।

কথা তো নয় বড় পিসীমার, যেন শিরদাঁড়ার ওপর বিছুটি ঘষে দেন।

অথচ আলমারিটা নিয়ে কি কম যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে।

ছোট মামা রিটায়ার করে যখন কোলকাতার বাসা তুলে দিলেন, তখন দিব্যি হাসি-হাসি মুখ করে বলে গেলেন, আলমারিটা তোর এখানে দিন কয়েক রেখে দে, ভেতরে দামী জিনিসপত্র দলিল-টলিল আছে, পরে নিয়ে যাবো।

ব্যস, তারপর আর নিয়ে যাওয়ার নাম করেননি।

ছোট মামার জিনিস, তাই যত্ন করে ঘরের মধ্যেই রেখেছিলাম তখন। কিন্তু ওটার যেমন দৈত্যের মতো প্রকাণ্ড চেহারা, তেমনি শ্রীছাঁদও নেই এতটুকু। সেকেলে ধরনের নকশা করা, নকশার ফাঁকে ফাঁকে ময়লা জমে আছে। আঙুল ঢোকে না সেখানে, পরিষ্কারও করা যায় না। কেনার পর হয়তো পালিশও হয়নি কোনো দিন। ঘরের আর সব আসবাবের সঙ্গে একটুও মানাতো না। একে ঘর দুখানাই বেশ ছোট ছোট, তার ওপর কৃপার উটকে জায়গা দিয়ে ঘরখানা এখন আমার প্রতিই কৃপণ। ওটার দিকে তাকালেই ছোট মামার ওপর রাগ হতো। অসুবিধের কথা মুখ ফুটে বলতে পারিনি বলেই কি এই বেখাপ্পা, বেঢপ, বেমানান জিনিসটা ঘর জুড়ে থাকবে!

অমিতা হেসে উঠে বললো, না রে সেজদি, বনেদী জিনিস তো, জামাইবাবু হয়তো আশায় আশায় আছেন, কৃষ্ণকান্তের উইল আবার যখন ছবি হবে তখন কোনো সিনেমা ডিরেক্টারকে মোটা টাকায় ভাড়া দেবেন।

বলে ও নিজের রসিকতায় নিজেই কুলকুল করে হেসে উঠলো।

ঋণাও হেসে ফেললো। তারপর বিরক্তির স্বরে বললো, তাও যদি চাবিবন্ধ করে না যেতেন, দু-চারটে জিনিস রাখতে পেলেও কাজ হতো।

আমারও অবশ্য সে কথা মাঝে মাঝে মনে হতো। আবার ভাবতাম, ছি ছি, একটা জিনিস নয় রেখেই গেছেন, সেটার ওপর আবার লোভ জাগছে কেন। ব্যবহার করতে পেলেই তো তখন আত্মসাৎ করতে চাইবো।

ঋণা চটে গিয়ে প্রায়ই বলতো, দরকার নেই বাপু ব্যবহার করে, যা দৈত্যের মতো চেহারা। তুমি বরং কড়া করে একটা চিঠি লিখে দাও।

—লিখবো, লিখবো। আমি হেসে ওর রাগ কমাবার চেষ্টা করতাম, অথচ নিজে মনে মনে চটে উঠতাম আলমারিটার ওপর, ছোট মামার ওপর। মনে হতো ঐ আলমারিটাই যেন সমস্ত শান্তি নষ্ট করে দিচ্ছে।

ছোট মামাকে কড়া করে চিঠি লিখবো? এক-একসময় আমি নিজেই আশ্চর্য হয়ে যেতাম, স্পষ্ট কথা বলতে আমার সঙ্কোচ হয় কেন? আমি কি সত্যিই সজ্জন ভদ্রলোক? নাকি সকলের মুখে ও কথাটা শুনে শুনে আমি সব সময়ে তটস্থ থাকি পাছে লোকে আমাকে অভদ্র বলে।

—আপনি অরুণদা রেগে গিয়ে কাউকে একদিন যদি 'শালা' বলতে পারেন, আপনাকে একটা কাটলেট খাওয়াবো। আপিসের জয়ন্ত একদিন বলেছিলো।

শুনে আমার কিন্তু খুব ভালো লেগেছিলো। মনে হয়েছিলো, জয়ন্ত—যে সব্বাইকে তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দেয়, সেও আমাকে সমীহ করে।

আমি অবশ্য হেসে বলেছিলাম, আমি ভাই গ্যাস্ট্রিকের পেশেণ্ট, ইহজীবনে তোমার কাটলেট ছুঁতে পারবো না।

—বাঃ রে, তারা তো শুনেছি খুব খিটখিটে হয়, হঠাৎ রেগে যায়। আপনার ভদ্রতার কাছে দেখছি গ্যাস্ট্রিকও হার মেনেছে।

বলে প্রচুর হেসেছিলো জয়ন্ত।

আমি মনে মনে বলেছিলাম, ভেতরটা তো দেখতে পাও না, বিষফোড়া হয়ে আছে, জ্বলছে, বাইরেই শুধু সৌজন্যবোধের মলম লাগানো থাকে। তা ছাড়া ভাবি মেজাজ রুক্ষ করেই কি শান্তি পেতাম? তাতে অশান্তি আরো বাড়তো।

তবে মাঝে মাঝে মনে হয় ভদ্রতার এই আদ্দির পাঞ্জাবিটা দু হাতে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো

করে দিই।

—কি গো, এমন গোমড়া মুখ কেন? সেদিন বাজার থেকে ফিরতেই থলিটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে ঋণা প্রশ্ন করলো।

তখনই তখনই কিছু বলতে পারলাম না। কিছুক্ষণ পরে বললাম, তোমার জন্যেই।

—আমার জন্যে? ঋণা চোখে প্রশ্ন তুললো।—আমি কি করলাম?

খুকীর মা যতদিন ছিলো কোনো ঝামেলা ছিলো না। তারপর থেকেই ঋণার অভিযোগ। —মাছ কত আনো বলো তো! খুকীর মা মাছ আনতো, দিব্যি এক বেলা কুলিয়ে যেতো।

—সমস্ত লোক এত অভদ্র হয়ে উঠেছে। লাঞ্ছনার ছাপটা মুছে ফেলার চেষ্টা করে বললাম, লোকটা কি বললো জানো? বললো, মাছ তো নেন দেড় শো, তার আবার দুবার করে ওজন করতে হবে!

পেট্রলের গায়ে যেন জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠিটা ফেলে দিয়েছি।

দপ করে এক ঝলক আগুন হয়ে গেল ঋণার মুখ।—তবু, তবু তুমি মাছ নিলে? মাছের টুকরোটা তার মুখের ওপর ছুঁড়ে মারতে পারলে না?

বিষণ্নতার মধ্যেও হাসবার চেষ্টা করলাম।—কি দরকার ঝগড়াঝাঁটি করে, কাল থেকে অন্য দোকানে নেবো।

অন্য দোকানে, অন্য জায়গায়, অন্য লোকের কাছে। এক-একসময় সন্দেহ হয়, আমি ভদ্রতার ছদ্মবেশে কাপুরুষতা ঢেকে রাখছি না তো?

অমিতা কলেজে-পড়া শিক্ষিত আধুনিক মেয়ে, সেও মাঝে মাঝে বেড়াতে এসে আমার ভদ্রতাবোধকে শুধু ঠাট্টাই করে যায়। ঋণা কথায় কথায় বিরক্ত বিস্ময়ে বলে, তুমি কি!

আর মণ্টু, আমার বারো বছরের ছেলে মণ্টু—

—মা, আজ নীরুকে বেশ শুনিয়ে দিয়েছি!

—কি শুনিয়েছিস! ঋণার হাসিতে আমি দিব্যি একটা প্রশ্রয় দেখতে পেলাম।

মণ্টু বললে, বাস থেকে নামবো, তখনো টিকিট কাটা হয়নি...আচ্ছা, বাবা, কণ্ডাক্টরকে ডেকে ভাড়া দেওয়াই তো উচিত?

—নিশ্চয়। আমি সায় দিলাম। আমি খুশী হয়ে উঠলাম।

ভদ্রতার সঙ্গে সততার কোথাও একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তো নিশ্চয়ই আছে। তা না হলে সৌজন্যবোধ শুধুই একটা হিপোক্রিসি হয়ে দাঁড়ায়। মণ্টু সৎ, মণ্টু আমার বারো বছরের ছেলে। আমি গর্ব বোধ করলাম।

—ভিড়ের মধ্যে কণ্ডাক্টর শুনতে পাচ্ছিলো না, তাই চিৎকার করে বললাম, নেমে যাবো, ভাড়া নিয়ে যান। মণ্টুর গলার স্বর উত্তেজিত হয়ে উঠলো। —নীরু ছিলো সঙ্গে, ও কি বললো জানো? বললো, দশ পয়সা ভাড়া তো, তাই খুব সাধু সাজছিস, দশ টাকা ভাড়া হলে কত ডেকে ডেকে টিকিট কাটতিস দেখতাম।

আমি চমকে উঠলাম। যেন অসতর্কভাবে প্লাগপয়েণ্টে হাত দিয়েছি। কি আশ্চর্য, বারো-তেরো বছরের একটা ছেলেও আজকাল এমন কথা বলে? এমন কথা ভাবে?

মণ্টু হাসলো। বললো, মুখের ওপর শুনিয়ে দিয়েছি।

—কি বলেছিস? ঋণা হাসি-হাসি মুখে প্রশ্ন করলো।

—বললাম, চোর যদি হতেই হয় বড় চোর হবো, তোর মতো ছিঁচকে চোর হবো না।

আমি বোধ হয় কিছু একটা বলতে চাইলাম, এ কথা না বললেই পারতে, কিংবা এ কথা বলা অন্যায়, এমনি কিছু। কিন্তু ঋণার দিকে তাকিয়ে দেখলাম ওর চোখ হাসছে, ও যেন মণ্টুকে তারিফ করছে।

আমি গুটিয়ে নিলাম নিজেকে। প্রতিবাদ করলাম না।

কিন্তু সারা জীবন ধরে আমি কি শুধুই গুটিয়ে আসবো, সরে আসবো, পালিয়ে আসবো?

ড্রাইংক্লিনিং থেকে কাপড়গুলো নিয়ে আসার পর বিছানার ওপরই পড়ে ছিলো। কয়েক-বারই ঋণাকে বলেছি তুলে রাখার জন্যে। বাইরে পড়ে পড়ে নোংরা হবে। ইস্ত্রি নষ্ট হবে সে খেয়াল নেই, ঋণা একটার পর একটা কাজ করছে। বললাম, তুলে রাখো, ধুলো পড়ছে যে।

—যা নোংরা-নোংরা বাতিক ভদ্দরলোকটির, বাইরে বেরুলেই গায়ে ময়লা লাগে, ওঁকেও

আলমারিতে চাবি দিয়ে রাখলে পারিস! অমিতা হেসে উঠলো। ঋণা রসিকতায় যোগ দিলো না। বিরক্ত মুখে কাপড়গুলো নিয়ে পাশের ঘরের ওয়ার্ডরোবে রাখতে যেতে যেতে নিজের মনেই বললো, ও ব্রহ্মদৈত্যটাও বিদেয় হবে না, একটা আলমারিও কেনা হবে না। জায়গা আছে আর যে রাখবো?

একটু একটু করে সংসার বাড়ছে, এ ঘরের জন্যে একটা আলমারির প্রয়োজনও হচ্ছে। একদিন গিয়ে ছোট একটা স্টীলের আলমারি পছন্দ করেও এসেছিলাম।

তবু ফিরে এসে বললাম, কিনলেই তো হলো না, রাখবে কোথায়?

ঋণা গম্ভীর মুখ করলো।—তোমার শুধু ভদ্রভাটুকু থাকলেই হলো, আর তো কিছু রাখার দরকার নেই!

ছোট মামার ঐ প্রকাণ্ড আলমারিটাই হয়েছে চক্ষুশূল।

শুধু জায়গা জুড়ে থাকবে, অথচ কাজে লাগানো যাবে না। তা ছাড়া, তা ছাড়া আশ-পাশের অন্য জিনিসগুলো—সেগুলো যে সবই আধুনিক ধরনের, এ-কালের। তার মধ্যে...

—বাঃ, বাঃ, একেবারে মিউজিয়াম করে রেখেছেন অরুণদা। জয়ন্ত একদিন বেড়াতে এসে হেসে উঠেছিলো ওটার দিকে তাকিয়ে।—কতয় কিনলেন?

হেসে ফেলে বলেছিলো, নকশার বাহার আছে কিন্তু। চার দিকে চারটে সাপ প্যাঁচ মেরে মেরে ফণা তুলেছে, কি ইমাজিনেশন। আর তিনটে ফণা থাকলেই সপ্তশির, দিব্যি শ্রীবিষ্ণু হয়ে শুয়ে পড়তে পারতেন ওর ওপর।

ভীষণ অপ্রস্তুত লেগেছিলো সেদিন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, ওটাকে যেমন করে হোক তাড়াবোই।

কিন্তু চিঠি লিখলেই তো ছোট মামার কাছ থেকে দুটো কড়া কথা শুনতে হবে। যা ঠোঁট-কাটা লোক।

—কি রে সেজদি, আমার জেন্টলম্যান জামাইবাবুর খবর কি? কলেজ ফেরার পথে অমিতা এসে হাজির হলো।

পরিহাসের স্বরে বললাম, খবর আর কি, সমরের মতো গোঁয়ার-গোবিন্দ একটি পাত্র খুঁজছি।

—ওঃ, লাভ্‌লি! চোখমুখের এমন ভাব করলো অমিতা, যেন এইমাত্র আচারে জিভ ঠেকিয়েছে। জিভে ঝোল টেনে হেসে বললো, মেরুদণ্ডওলা ছেলে আমার অ্যাত্তো ভালো লাগে...আপনার মতো মিনমিনে ভদ্রলোক স্যার কোনো মেয়েই পছন্দ করে না। নেহাত সেজ-দির হাতে পড়েছেন তাই...

ঋণা হেসে উঠে বললো, না রে, বুড়ো হচ্ছে কিনা, তাই আজকাল একটু খিটখিটে হচ্ছে। সেদিন যা কাণ্ড করেছে!

—কাণ্ড করেছে!

আপিসের জয়ন্ত, সেও সব শুনে হো-হো করে হেসে উঠেছিলো। অথচ আমি ভেবে-ছিলাম, ও অন্তত বাহবা দেবে। তা হলে হয়তো জ্বালা জুড়োতো।

সেদিনের কথা ভাবলে এখনো সমস্ত শরীর রাগে থরথর করে কেঁপে ওঠে। উত্তেজিত হয়ে উঠি।

দশটা পয়সা কণ্ডাক্টরকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, না, না, ভুল করেছেন, আমি এই স্টপেই উঠেছি।

বাস কণ্ডাক্টর, ভাবলেও এখন দাঁতে দাঁত চেপে রাগ সামলাতে হয় আমাকে, আমাকে বিশ্বাস করলো না। যেন আমার কথার কোনো দাম নেই। যেন আমি ভদ্রলোক নই। যেন সামান্য পাঁচটা পয়সা আমি ফাঁকি দিতে চাইছি।

—আপনি তো শিয়ালদা থেকে আসছেন দাদু, আমি উঠতে দেখেছি আপনাকে।

আমি লাঞ্ছিত বোধ করলাম। তবু ক্রোধ চেপে ধীরে ধীরে বললাম, না, ভুল করছেন। আমি এখানেই উঠেছি।

লোকটি এবার রূঢ় স্বরে বললো, আরো পাঁচ পয়সা দিন, আমি দেখেছি আপনি অনেক আগে থেকে উঠেছেন।

বাস-সুদ্ধ লোক আমার দিকে তাকিয়ে আছে, বেশ বুঝতে পারছি। তারা কৌতুক বোধ করছে। তাদের কৌতুকের চোখ, উপহাসের চোখ, ঘৃণার চোখ আমার সমস্ত শরীরকে বিদ্ধ করছে।

আমি এবার দৃঢ় স্বরে বললাম, আমি এখানেই উঠেছি।

আর সেই মুহূর্তে যাত্রীদের মধ্যে থেকে একজন বললো, কেন তর্ক করছেন, আমিও দেখেছি আপনি শিয়ালদা থেকে আসছেন। যাত্রীটি যেন ধমক দিলো আমাকে।

মুহূর্তের জন্যে আমার সমস্ত শরীর এক রাশ ক্রোধের স্ফুলিঙ্গ হয়ে গেল। আমি পকেট হাতড়ালাম। দুখানা এক টাকার নোট বেরিয়ে এলো। আমি সে দুটো তুলে ধরলাম সেই কন্ডাক্টরের সামনে।

আমি তখন উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছি। আমি বললাম, এই দু টাকার মধ্যে অনেক—অনেকগুলো পাঁচ পয়সা আছে।

আমার চোখে কি ছিলো জানি না, কন্ডাক্টর ভয় পেলো। বলে উঠলো, কি মশাই, মারবেন নাকি?

আমি কোনো উত্তর দিলাম না। শুধু সেই এক টাকার নোট দুখানা তার চোখের সামনে ছিঁড়লাম, টুকরো করলাম, আবার ছিঁড়লাম, টুকরো করলাম, তারপর হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে নেমে পড়লাম।

নেমে পড়েই আমি একটা অদ্ভুত আনন্দ পেলাম, একটা গর্বের অহঙ্কারের বিশুদ্ধ আনন্দ। বুকের মধ্যে যে জায়গাটায় সে এক ঝলক কালি ছিটিয়ে দিয়েছিলো সেই জায়গাটা যেন ছুরি দিয়ে কেটে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। ঠিক যেমনভাবে ঋণা একদিন আমাকে না জানিয়ে বিতিকিচ্ছিরি চক্ষুশূল আলমারিটাকে বারান্দায় বের করে দিয়েছিলো।

—তোমার ওসব গরমের পোশাক-টোশাক কোথায় রাখবে রেখো। আর নয়তো রাস্তায় ফেলে দিয়ো। ঋণা ঠকাস করে চায়ের কাপটা নামিয়ে দিয়ে বললো।

বুঝলাম রাগটা ছোট মামার ঐ আলমারিটার ওপর। যেটা জায়গা জুড়ে আছে, অথচ কাজে লাগে না। যেটার জন্যে ছোট একখানা স্টীলের আলমারি কেনা যাচ্ছে না।

ওটাকে আজকাল বড় নোংরা লাগে। এক রাশ জঞ্জালের মতো।

—কি ছিরি আলমারির। যা-ই বলুন জামাইবাবু, আপনার ছোট মামার কি করে যে ও জিনিস পছন্দ হয়েছিলো!

বলে হেসে উঠলো অমিতা।

আমি বললাম, তখনকার দিনে তো ঐরকমই ফ্যাশন ছিলো। তা ছাড়া ওরকম মেহগনি কাঠই কি আজকাল পাওয়া যায় নাকি!

অমিতা নাক সিঁটকে বললো, যখন ছিলো তখন ছিলো, এখন বেমানান, চেলিয়ে কাঠ করে উনুন ধরিয়ে দে রে সেজদি। সব সমস্যা মিটে যাবে।

আমি আহত বোধ করলাম। হাজার হোক আমারই ছোট মামা। তাঁর রুচিকে ঠাট্টা করলে গায়ে লাগবারই কথা।

অমিতা বিনুনিতে আঙুল খেলাতে খেলাতে বললো, আহা, রাগ করতে হবে না, এমন কিছু বলিনি। তারপর হেসে উঠে বললো, যখনকার যা। সত্যি বলুন, আজকাল ওটাকে বেমানান লাগে না?

যখনকার যা। অমিতা চলে যাওয়ার পর কথাটা আমাকে বারবার ভাবালো। তাই তো! চারপাশের আসবাবগুলো এখন অন্য ধরনের, ফ্ল্যাটের ছাদ নিচু হয়ে গেছে, তার সঙ্গে ওটা মানাচ্ছে না।

—ভদ্রতা আজকাল আর কোথাও নেই জয়ন্ত, ঠিকই বলেছো।

জয়ন্ত সব শুনে হো-হো করে সশব্দে হেসে উঠলো।

—সে কি অরুণদা, এই সামান্য কারণে বাসের মধ্যে আপনি একটা সীন ক্রিয়েট করলেন?

—সীন ক্রিয়েট করলাম? আমি কেমন বোকার মতো তাকালাম জয়ন্তর মুখের দিকে। বাস কন্ডাক্টরের গালে, সেই যাত্রী ভদ্রলোকের গালে কি এর চেয়ে জোরে থাপ্পড় বসানো যেতো?

জয়ন্ত হেসে উঠে বললে, ব্লাড প্রেসারটা দেখান অরুণদা। কি লাভ হলো? লোকগুলো হেসেছে শুধু, ভেবেছে বদ্ধ উন্মাদ।

জয়ন্ত আমার সব গর্ব, সমস্ত অহংকার কেড়ে নিলো। আমি মুষড়ে পড়লাম।

তা হলে কি অভদ্রতাকে অভদ্রতা দিয়েই লড়তে হবে?

—আপনি অরুণদা, যদি রেগে গিয়ে কাউকে 'শালা' বলতে পারেন, একটা কাটলেট খাওয়াবো। জয়ন্তর সেই কথাটা মনে পড়লো।

—ওর সব অজুহাত রে অমু, ওর সব অজুহাত। ঐ তো আলমারিটা এখন বারান্দায় সরিয়ে দিয়েছি, এখন তো একটা ছোট স্টীলের আলমারি নিয়ে আসতে পারে। ঋণা আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললো।

ভদ্রতা জিনিসটাকে আমিও এখন বারান্দায় সরিয়ে দিয়েছি। কোন্ দিন হয়তো সেখান থেকে রাস্তায় বের করে দেবো।

বললাম, না, না, শুধু ভাবছি, ছোট মামা যদি রাগারাগি করেন...শেষে ওটাকে আবার যদি ঘরের ভেতরে নিয়ে আসতে হয়......

অমিতা সশব্দে হেসে উঠলো।—নাইস! এ না হলে আমার জামাইবাবু। আলমারিটা নয় স্যার, আপনাকেই মিউজিয়মে রেখে দেওয়া উচিত! অমিতা আমাকে চটাবার জন্যে দুষ্টু হাসি হাসলো।

আমি একটু উষ্মার স্বরে বললাম, তোমরা বুঝবে না, তোমরা বুঝবে না।

ঋণা বললো, কেন তর্ক করছিস অমু। আসলে ওর রুচিও ঐ বিতিকিচ্ছিরি আল-মারিটার মতোই।

আমি চুপ করে গেলাম। আমি চিঠি লিখলাম ছোট মামাকে সেদিনই।

লিখলাম, যত তাড়াতাড়ি পারেন ওটা নিয়ে যাবেন।

আর প্রভিডেণ্ট ফান্ড থেকে টাকা তুলে এক সপ্তাহের মধ্যেই একটা ছোট সাইজের, এই ঘরে, এইসব সুন্দর আসবাবের সঙ্গে মানায়, এমন একটা স্টীলের আলমারি কিনে আনলাম।

চমৎকার, চমৎকার।

ঋণা খুব খুশী হয়েছে, ওর মুখ দেখেই বোঝা গেল।

অনেক ভেবে-চিন্তে, ঘরের মধ্যে নতুন আলমারিটা বসানোর পর সমস্ত ঘরখানার দিকে তাকিয়ে এত ভালো লাগলো। ঋণা যেদিন আমাকে না জানিয়ে ওটা বারান্দায় বের করে দিয়ে-ছিলো, সেদিন যেমন ভালো লেগেছিলো, ঠিক তেমনি।

অমিতা দেখে বললো, বাঃ রে, রঙটা বেশ সুদিং তো। কি যে বলিস সেজদি, বেশ রুচি আছে স্যার আপনার, আমার বিয়ের সময় আপনাকে বাজার সরকার করে দেবো।

কোনো নকশা নেই, আতিশয্য নেই। একেবারে সিম্পল্ চাঁচাছোলা। ঘরের খাট, চেয়ার, টেবিল, ড্রেসিং টেবিলের মতোই।

এখন ছোট মামার আলমারিটার দিকে তাকিয়ে আরো যেন খারাপ লাগে। আরো অসহ্য।

তাই দিন কয়েক যেতে না-যেতে আরো কড়া করে একটা চিঠি লিখলাম ছোট মামাকে।

—জয়ন্ত, আমি আরো কুৎসিত হতে পারি। চিঠি লিখতে লিখতে মনে মনে আমি বলে-ছিলাম।

সকলেই হয়তো বলতে চাইছে আমি এ পৃথিবীর যোগ্য নই। অথচ আমি যে ভিতরে ভিতরে এ সমাজের, এ কালের উপযুক্ত হয়ে উঠতে চাইছিলাম।

এমনি সময়ে, সেই দুর্ঘটনাটা ঘটে গেল।

মণ্টু বাস থেকে পড়ে গিয়ে গুরুতর জখম হলো। তিনটে দিন কিভাবে কেটে গেল জানতেও পারিনি। খবরের কাগজে, পাড়ায়, বাড়ির মধ্যে কোথায় কি ঘটে গেল, কত কি ঘটে গেল জানতেও পারিনি। স্মৃতিভ্রংশ মানুষের মতো।

শুধু একটি আশংকা। মৃত্যু। শুধু একটি প্রার্থনা। মণ্টুকে বাঁচাতে হবে।

হাসপাতালের নিঃশব্দ করিডরে শুভ্র বেশে নার্সদের ত্রস্ত পদের আনাগোনা। ডাক্তারের চিন্তিত ধীর পদক্ষেপ। ভয়, ভয়, প্রচণ্ড ভয়। আর ক্ষীণ একটা আশা।

ডাক্তারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কিছু জিগ্যেস করতেও ভয়।

গত কাল বিকেলে অমিতা এসেছিলো। বীভৎস স্থির রক্তহীন মুখ সকলের। অমিতার, ঋণার, হয়তো বা আমার নিজেরও। একটি অবশ্যম্ভাবী শোকের জন্যে তিল তিল যন্ত্রণায় দগ্ধ হচ্ছি।

—বাহাত্তর ঘণ্টা, বাহাত্তর ঘণ্টা পার না হলে কিছুই বলা যাবে না। ডাক্তারের কথাটা বড় নির্দয় মনে হয়েছিলো।

কিন্তু শেষ অবধি মণ্টুর জ্ঞান ফিরে এলো। ডাক্তারের মুখে হাসি। ঋণার দিকে তাকিয়ে বললেন, ভয়ের কি আছে, আমরা তো যথাসাধ্য করছি।

একটিমাত্র ভরসার কথা। কৃতজ্ঞতায় আমার চোখে জল এলো। ঋণার মুখে বিষণ্ণ হাসি।

সেই প্রথম দিন আমরা একটুখানি আশা নিয়ে হাসপাতাল থেকে ফিরছিলাম। ঋণার মুখ প্রথম বর্ষার জল পাওয়া চারাগাছের মতো দেখাচ্ছিলো।

ঋণা হাসতে চাইছিলো। তবু সংশয়ের কণ্ঠস্বরে প্রশ্ন করলে, ভালো হয়ে যাবে তো!

আমি ট্যাক্সিটাকে একটু গঙ্গার ধার দিয়ে ঘুরে যেতে বললাম। আমি ঋণার মুখে একটু ভরসার বাতাস বুলিয়ে দিতে চাইলাম। ও পরম নির্ভরতায় আমার কাঁধে মাথা রাখলো।

ট্যাক্সি ড্রাইভার হয়তো ঋণার চোখের জল দেখেছিলো, সে হয়তো আমাদের কথাবার্তা শুনছিলো। ডাক্তারের সান্ত্বনার কথা।

সে হঠাৎ স্তোকের মতো গলায় বললো, ভাববেন না মা, ছেলে আপনার ঠিক ভালো হয়ে উঠবে।

খুব ধীরে ধীরে ট্যাক্সিটা চলছিলো। আঃ, ঠাণ্ডা বাতাসে সমস্ত দুশ্চিন্তার ভার যেন দূরে সরে যাচ্ছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে অত্যন্ত গর্হিত মন্তব্যের একটা তীর এসে বিঁধলো।

আমি চমকে উঠলাম। ঋণার ভারহীন মুক্তস্বাদ শরীর চমকে উঠলো সেই নোংরা বিদ্রূপে। আমার কাঁধ থেকে মাথাটা সরিয়ে নিলো।

আমি তাকিয়ে দেখলাম রাস্তার মোড়ে গলাগলি হয়ে দাঁড়ানো ছোকরাগুলো তখনো হাসছে।

একজন আবার কি যেন বললো।

আমার কান ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠলো। অশালীন কথাটা ঋণার আশাদীপ্ত ক্ষণিক আনন্দের মুহূর্তটুকু ভেঙে চুরমার করে দিলো। এমন একটা কথা ঋণার কানে পৌঁছেছে ভেবে আমার মাথায় ফিনকি দিয়ে রক্ত উঠলো।

আমি ট্যাক্সি থামাতে বললাম। আমি তখন অন্ধ উন্মত্ত। আমি নেমে এসে বাঁ হাত বাড়িয়ে ছেলেটির শার্টের বুকটা বাঘের থাবার মতো মুঠিতে কামড়ে ধরলাম।

সজোরে একটা চড় মারলাম তার গালে।

আর সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো মুদ্রণের অযোগ্য সেই কুৎসিত অভব্য শব্দটি।

আমার মনে হলো জীবনে এই প্রথম আমি ভদ্রলোক হয়ে উঠলাম।

সমস্ত পথ ঋণা আর একটিও কথা বলেনি।

আমার ভীষণ অনুতাপ হলো। সারা মন বিস্বাদ।

ফিরে এসে চিরাচরিত অভ্যাসে লেটার-বক্সে উঁকি দিলাম। উঁকি দিয়ে একটা চিঠি দেখতে পেলাম।

সুইচ টিপে আলো জেনলে চিঠিটা পড়তে পড়তে বললাম, দেখেছো কাণ্ড।

—কি হলো? ঋণার গলার স্বর ম্লান।

বললাম, ছোট মামার চিঠি।

ঋণা তখনো হয়তো ছেলের কথা ভাবছে। কিংবা আজকের বিশ্রী ঘটনাটার কথা।

বললাম, এখন কি করি বলো তো।

নিজেকে বড় অসহায় লাগলো আমার।

ঋণা এমনভাবে 'কি লিখেছেন' জিগ্যেস করলো, যেন উত্তর শোনার জন্যে ওর কোনো আগ্রহই নেই।

আমার গলা ভারি হয়ে এলো। চোখে জল এলো। বললাম, লিখেছেন, ওটা তোকে দিয়ে দেবোই ভেবেছিলাম। লিখেছেন, সোমবার গিয়ে দলিলগুলো নিয়ে আসবো। আলমারিটা তুই নিয়ে নিস, রাখিস যত্ন করে। মেহগনি কাঠের তৈরী, অনেক খরচ হয়েছিলো।

ঋণা কোনো কথা বললো না। ও তখনো ভাবছে মন্টুর কথা কিংবা আজকের বিশ্রী ঘটনার কথা।

আর, দৈত্যের মতো ঐ বিরাট বেমানান আলমারিটা—উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া ভদ্রতা-বোধের মতো—তখন আমার বুকের ওপর চেপে বসছে।

—ওটাকে নিয়ে এখন কি করি বলো তো? আমি অসহায়ের মতো বলে উঠলাম।

[১৩৭৪



আমরা সবাই একসঙ্গে

চমকে উঠলাম।—আমি?

চিৎকার করে উঠলাম, না, না, আমি পারবো না, আমি পারবো না।

ওরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো।

তারপর জয়ন্ত স্থির চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ঠাণ্ডা গলায় বললো, তুই। তুই ছাড়া আর কেউ পারবে না।

ববির মুখে কোনো ভাবান্তর হলো না। ও মাথা নামিয়ে খুব আস্তে আস্তে বললো, সোম, তোকে পারতেই হবে।

আমি অসহায়ের মতো ওদের মুখের দিকে তাকালাম। আমার মনে হলো জয়ন্ত আর ববির মতো নির্দয় আর নির্মম আর কেউ নয়। কেউ নেই।

কিন্তু আমি এতখানি নিষ্ঠুর হবো কি করে।

শুভার চেহারাটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। তার হাসি-হাসি মুখ। মুখ? না, শুভার সমস্ত শরীর হাসে। সমস্ত শরীর। ঐ হাসি, কাঁপা-কাঁপা শরীরের ছন্দ ওকে সাজিয়ে রাখে। আর কিচ্ছু না, কিচ্ছু দরকার হয় না শুভার।

—টেরিফিক গরম রে অনিমেষ। চল্ না, প্রিন্সেপের দিক থেকে ঘুরে আসি। আমি বললাম শুভার মুখের দিকে তাকিয়ে। অর্থাৎ শুভা রাজী হলে তবেই অনিমেষ রাজী হবে।

প্যাণ্ট-পরা ববি চেয়ারে বসে ছিলো পা দুটোকে কাঠের ক্রাচের মতো এগিয়ে দিয়ে। ওর মুখের আয়েশী ছাপ বলতে চাইলো, আবার কেন।

কিন্তু শুভা তার আগেই আধ পাক ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, আইডিয়া।

ব্যস্ কিচ্ছু না, আলমারির পাল্লায় লাগানো আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে কপালের ওপর-টুকুতে দুবার চিরুনি বুলিয়ে নিলো, কপালের টিপটা ঠিক আছে কি না। তারপরই বললো, চলুন।

একটু একটু ভাঁজ পড়া শাড়িটা যেমনভাবে ওর শরীরকে জড়িয়ে ছিলো ঠিক তেমনি রইলো। চটিতে পা গলিয়ে যখন রাস্তায় বেরিয়ে এলো, তখন শুধু লম্বা রুপোর চেনে চাবির গোছাটা একটা আঙুল থেকে ঝুলছে। এক-একবার ঝাঁকানি দিয়ে সেটাকে মুঠোর মধ্যে আনছে, আবার ছেড়ে দিচ্ছে। ঐটুকুই অলঙ্কার।

গঙ্গার ধারের আলোয় কালোয়, ম্যাজেণ্টা শাড়ির শরীর, ফ্লুরোসেণ্ট আলোর মতো ফর্সা রঙ, পিঠের ওপর ঢেউ-খেলানো চুল, নিখুঁত নিখুঁত চোখের ভুরু, মুখের শ্রী—সব মিলিয়ে গিয়ে মনে হলো শুধু একটা খুশির শরীর এক নৌকো হাসি হয়ে ভাসতে ভাসতে চলেছে।

—কি মশাই, চোখে লাগছে কাউকে? ববির দিকে ফিরে হঠাৎ প্রশ্ন করলো শুভা। আমার দিকে ফিরে একটি দীর্ঘাঙ্গী মেয়েকে দেখিয়ে বললো, দিব্যি ফিগার, তাই না? তারপর ঝট করে অনিমেষের দিকে ফিরে বললো, এই, তুমি তাকাবে না কিন্তু। বলে হেসে উঠলো।

আমরাও হেসে উঠলাম।

অনিমেষ বললো, সোমের জন্যে একটা কিছু ব্যবস্থা করে দাও না তুমি। তোমার সেই অদিতি, ইস্কুলে চাকরি করে—

আমি বললাম, রাবিশ। তাকে আমি দেখেছি।

শুভা আস্তে আস্তে বললো, খারাপটা কি শুনি? তারপর ববির দিকে ফিরে হেসে উঠে বললো, বিয়ের পর আপনি নাকি জিগ্যেস করেছিলেন আমার আর বোন আছে কি না? বলে আত্মতৃপ্তিতে মৃদু মৃদু হাসলো।

ববি বোধ হয় একটু লজ্জা পেলো। হেসে ফেলে বললো, অনিমেষের কাণ্ড! বলেছে বুঝি আপনাকে?

শুভা বললো, বা রে, আমাকে বলবে না এমন কোনো কথা আছে নাকি?

বলে এমনভাবে হেসে উঠলো যেন আমরা সবাই নির্বোধ, বিয়ে-টিয়ে করিনি বা হয়নি বলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা কিছু বুঝি না, বুঝি না দাম্পত্য প্রেম কাকে বলে।

আসলে ওদের তো ভাব-ভালোবাসার বিয়ে! যখন জানাজানি হলো, শুভার মা একটুও আপত্তি করলেন না, ওর বাবা মত বদলালেন। কারণ অনিমেষ সত্যি জুয়েল, সব দিক থেকে।

তখন আমাদের খুব বোরিং লাগলো। অর্থাৎ ওদের দুজনকেই আলাদা আলাদা করে ভীষণ ভালো লাগলো, কিন্তু ওরা দুজন যখন একসঙ্গে, আমাদের মনে হতো আমরা কেন ঘুরছি, বসছি, কথা বলছি, হাসছি!

বোধ হয় ঘুমোনো হিংসে। তাই হবে, কারণ বিয়ের পরই শুভাকে ভীষণ ভালো লাগতে শুরু করলো। আসলে মনের মধ্যে তো অনেক আক্ষেপ, অনেক ক্ষোভ, কিন্তু শুভার কাছে গেলেই সব জুড়িয়ে যেতো। মনে হতো শুভা যেন একপুকুর তৃপ্তি।

—ওরা তো এখন দম্পতি, মোস্ট আন-ইন্টারেস্টিং। বিয়ের পর একদিন ওদের বাড়ি যাবো বলাতে জয়ন্ত উত্তর দিলো।

—দম্পতি! ববি হেসে উঠলো। বললো, আমি পতির কথা বলছি না। দম্ কি দোষ করলো?

শুভা সে কথা শুনে একেবারে হেসে হট্টগোল। কি সুন্দর চটপটে হাতে কফি বানিয়ে এনেছিলো, আর বেসনে ভাজা ফুলকপি, গরম গরম।

আমি কফি খাই না বলেছিলাম, শুভা হেসে উঠে বললো, ঘুম হবে না? তারপর চামড়া দিয়ে মোড়া মোড়াটা কাছে টেনে নিয়ে বসে বললো, অভ্যেস করে রাখুন স্যার, পরে রাত জাগতে অসুবিধে হবে না।

আমি বললাম, না, না, আমার ভীষণ মাথা ধরেছে।

ব্যস্, চট্ করে কোত্থেকে এক ডিবে ভিক্স্ নিয়ে এসে এগিয়ে দিলো। হাসতে হাসতে বললো, কি, লাগিয়ে দেবো নাকি?

আমি হাসলাম, কিন্তু ভাবিনি ও সত্যি সত্যি আঙুলের ডগায় ভিক্স্ নিয়ে কপালে লাগিয়ে দেবে।

অনিমেষ তা দেখে বললো, এই, আমার জেলাসি হচ্ছে কিন্তু।

শুভা শরীর কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে হেসে উঠলো। তারপর হাত ধুয়ে এসে আবার মোড়াটায় বসলো।

সেই হাসির শরীর, সেই কপালের উপর একটি আঙুলের ছোঁয়া আমি যেন আবার অনুভব করলাম। একটি সুখের দিঘিতে স্নান করলাম।

তারপর আমি বলে উঠলাম, না, না জয়ন্ত, আমি পারবো না, আমি পারবো না।

ববির মুখ এবার একটু কঠিন হলো। ও বললো, তোকে পারতেই হবে।

আমার হঠাৎ মনে হয়েছিলো, আমার খুব খিদে পেয়েছে। পেটের মধ্যে চিনচিন চিনচিন করছিলো, মাথা ঘুরছিলো। সেই সকাল থেকে সমস্ত দিন...কি প্রচণ্ড গরম, স্নান দূরের কথা, কলের জলে একবার মুখ ধোয়ারও সময় পাইনি। একবার বোধ হয় গিয়ে পর পর দু কাপ চা খেয়ে এসেছিলাম। শরীর-মন ভেঙে পড়ছিলো।

আমি বললাম, ববি, আমাকে ক্ষমা কর। আমি পারবো না।

ববি একটা নিষ্ঠুর দস্যুর মতো আমার দিকে তাকালো। জয়ন্ত বোধ হয় রেগে গিয়ে দাঁতে দাঁত চাপলো।

আমি চায়ের দোকানের ময়লা টেবিলটার দিকে তাকালাম।

তিনটে খালি কাপে উড়ে উড়ে মাছি বসছিলো। টেবিলের ওপরে টাকার ব্যাগটা পড়ে ছিলো। একটা শেফার্স কলম, রিঙে গাঁথা একটা চাবি, আর হাতঘড়িটা।

আমি প্রথমে পার্সটা দেখলাম, তারপর আমার চোখ ফাউণ্টেন পেন, চাবির রিং, হাতঘড়ি দেখলো। আমি ভীষণ ভয় পেলাম, আমার চোখ ঠেলে জল এলো। আমি ববির হাতখানা ধরে ফেলে বললাম, বিশ্বাস কর, আমি পারবো না।

জয়ন্তর চোখ দেখে আমার মনে হলো ওর হাত যেন স্প্রিং টিপে ছুরির ফলাটা এগিয়ে ধরছে। নিজেকে আমার ভীষণ অসহায় লাগলো।

আমার অবস্থাটা এরা যেন কেউ বুঝতে পারছে না। বুঝতে চাইছে না।

আমি বললাম, জয়ন্ত, তুই পারবি। আমি, আমি সঙ্গে থাকবো বরং।

—সঙ্গে থাকবো। জয়ন্ত আর ববি যেন ভেংচে উঠলো। বললো, দায়িত্ব কি শুধু তোর একার ওপর দিচ্ছি? সঙ্গে তো আমরাও থাকবো!

একদিন শুভা আর অনিমেষ ডায়মণ্ড হারবার বেড়াতে গিয়েছিলো। সঙ্গে আমরাও ছিলাম!

ওর জামাইবাবুর পুরোনো গাড়িটা যোগাড় করেছিলো ববি, ও-ই চালাচ্ছিলো! জামাইবাবুকে ও তীর্থদা বলে।

শুভার চুল উড়ছিলো। ওর নরম ঢেউ-খেলানো চুল দেখলে সব সময়েই মনে হতো ও যেন শ্যাম্পু করে এসেছে। না, ওর চুলই ঐরকম। আর ওর ফর্সা, দারুণ ফর্সা মুখ সব সময়েই কেমন ঘুমভাঙা-ঘুমভাঙা কুয়াশা-জড়ানো। ওর আঙুলগুলো খুব সুন্দর, দেখলেই মনে হয় নাচের মুদ্রার জন্যে গড়া।

ও আর অনিমেষ পিছনের সীটে বসে ছিলো। সামনে ববির পাশে আমি।

শুভা হাসছিলো, কথা বলছিলো, কথা বলার সময় হাওয়ায়-ভাসা ওর চুলের মতো ওর কথাগুলো হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছিলো। আমরা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম না।

কিংবা রুপোর বাসনের আওয়াজের মতো ওর গলার স্নিগ্ধ স্বর ভাঙা গাড়িটার ঘর্ঘর আওয়াজে চাপা পড়ে যাচ্ছিলো।

শুভা হঠাৎ মুখ এগিয়ে নিয়ে এলো, আমার কাঁধের একটু পাশে সীটের ওপর হাত রাখলো। আমি আড়চোখে ওর সেই ফর্সা লম্বা লম্বা আঙুলগুলো দেখতে লাগলাম। যে আঙুলগুলো একদিন আমার কপাল ছুঁয়েছিলো।

শুভা বললো, অদিতিকে আনলে ভালো হতো। বললেই আসতো। এখন দেখছেন তো, আপনাদের ভালো লাগছে না।

আমাদের ভালো লাগা বা না-লাগা কোনো কথা নয়। আমরা চেয়েছিলাম বিয়ের পর ওদের পরস্পরকে আর একটু বেশী ভালো লাগুক। কিন্তু কথায় কথায় শুভা এমন ভাব করলো যেন আমরা কিছু নই, চেষ্টা করলেও কারও ভালোবাসা পেতে পারি না, অনিমেষ

এ পৃথিবীতে একাই যেন জন্মেল।

চায়ের দোকানে আমরা যখন গরম কচুরি আর ডাল নিয়ে বসেছিলাম, শুভা খুব হাসছিলো, দোকানের এবং চারপাশের লোক মাঝে মাঝে ওর দিকে তাকাচ্ছিলো, তখন আমি ইচ্ছে করে রাগ দেখাচ্ছিলাম। খুব চুপচাপ বসে ছিলাম, কথা বলছিলাম না।

—ভালো লাগছে না কিন্তু। হঠাৎ চেয়ার সরিয়ে উঠে দাঁড়ালো শুভা। বললো, গম্ভীর থমথমে মুখ নিয়ে বসে থাকলে কারও ভালো লাগে না।

ববি হেসে বললো, বসুন, বসুন। চটছেন কেন?

কিন্তু বসার তখন উপায় ছিলো না, শুভার শরীর তখন হাসি হয়ে দুলছে। চেয়ার সরিয়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে ও তখন জলের গ্লাস উলটে সীন ক্রিয়েট করেছে।

ও হেসে উঠলো, আমরাও হেসে উঠলাম।

ফেরার পথে রাত হয়ে গিয়েছিলো। অনিমেষ ডায়মণ্ড হারবার থেকে একটা ইলিশ মাছ কিনেছিলো।

মাঝপথে এসে গাড়িটা খারাপ হলো। খুটখাট করেও সারাতে পারলো না ববি। পিছনে একটা বাস আসছে দেখে বললাম, আপনারা বাসে চলে যান, যা অনিমেষ।

ববি বললো, হ্যাঁ, আমরা যা হোক ব্যবস্থা করবো।

শুভার মৃদু হাসি কৌতুক হয়ে উঠলো। বললো, পাগল নাকি। কক্ষনো না।

আমি বললাম, ইলিশ মাছটার ওপর অন্তত নির্দয় হোস না অনিমেষ।

শুভা বললো, গাড়ি যদি ঠিক না হয়, আমরা চারজনে এই গাড়িতে বসে থাকবো সারা রাত। দারুণ অ্যাডভেঞ্চার, তাই না?

ববি ক্রমাগতই কার্বোরেটর আর ডিস্ট্রিবিউটার দেখতে দেখতে বিরক্ত হচ্ছিলো, সেও হেসে ফেললো।

বললো, কাছেই টিনের ছাউনি দোকান আছে। এই ইলিশ মাছের ঝোল আর ভাত।

শুভা বললো, দারুণ।

গাড়ি অবশ্য শেষ অবধি ঠিক হয়েছিলো। একটা ট্রাক ড্রাইভার দয়া করে এসে ঠিক করে দিয়েছিলো।

বেশ খানিকটা এসে শুভা একসময় বললো, লোকটার কি ক্ষতি করেছিলাম কে জানে।

—কার? অনিমেষ আশ্চর্য হয়ে জিগ্যেস করলো।

শুভা হেসে উঠে বললো, ট্রাক ড্রাইভারটার। গাড়ি ঠিক না হলে, ভাবো তো, কি চমৎকার হানিমুন হতো। দু-দুজন বীরপুরুষ আমাদের গার্ড দিতো, আমি দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোতাম।

ববি ঠাট্টা করে বললো, অনিমেষ কিন্তু ঘুমোতো না।

আমরা সকলেই হেসে উঠলাম।

আমি শুভার সেই হাসির মুখ, হাসির শরীরটা দেখতে পেলাম আবার। সেই ভরা-জোয়ার তৃপ্তির মুখ। আমি চায়ের টেবিলের ওপর রাখা মনি-ব্যাগটা দেখলাম, শেফার্স কলমটা দেখলাম, রিঙে লাগানো একটা চাবি, আর হাতঘড়িটা।

ববি বিরক্ত হয়ে বললো, মিথ্যে সময় নষ্ট করিস না সোম।

জয়ন্ত বললো, এটা ছেলেখেলা নয়।

আমি বলে উঠলাম, পারবো না, পারবো না আমি।

তবু শেষ অবধি আমাকে রাজী হতে হলো। যেন অনেকখানি সাহস সঞ্চয় করে আমি এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, ঠিক আছে।

চায়ের টেবিলের ওপরে রাখা মনি-ব্যাগটার দিকে আমি হাত বাড়ালাম। আমার হাত কেঁপে গেল কি না আমি জানি না।

আমি একে একে মনি-ব্যাগটা, শেফার্স কলমটা, একানে চাবির রিংটা, হাতঘড়িটা তুলে নিলাম।

জয়ন্ত আর ববি আমার সঙ্গে সঙ্গে এলো।

তখন রোদ্দুর পড়ে আসছে, কিন্তু ভ্যাপসা গরমে সারা শরীরে ঘাম। সারা দিনের ছোটা-

ছুটিতে জামাকাপড় নোংরা, মন নিস্তেজ, অসহায়।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আমরা বাস পেলাম। আমি, জয়ন্ত, ববি। আমি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছিলাম না, আমার মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করছিলো। চারপাশ থেকে ভিড়ের চাপ আমাকে সোজা করে রেখেছিলো, তা না হলে আমি যে-কোনো মুহূর্তে টলে পড়তাম।

বাস থেকে নেমে আমরা তিনজনে হাঁটতে শুরু করলাম। সেই বাড়িটার দিকে এগিয়ে গেলাম, যেখানে আমাদের নিত্য আনাগোনা ছিলো, বিয়ের কিছু দিন পরেই শুভা আর অনিমেষ যেখানে উঠে এসেছিলো।

আমার কেবলই মনে হচ্ছিলো, এক্ষুনি, একটি সুন্দর কবিতার মাঝখানে হঠাৎ দাঁড়ি টেনে দিতে হবে।

আমার ভীষণ ভয় করছিলো।

বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে আমি মনের জোর সঞ্চয় করার জন্য একটা সিগারেট ধরালাম।

ববি বললো, আর দেরি করিস না।

আমি দু চোখ বুজে এগিয়ে গিয়ে দরজার পাশের ডোর-বেল টিপলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়লো ববি আর জয়ন্ত আমার সঙ্গে নেই। ওরা কখন ছিটকে দূরে সরে গেছে।

আমার নিজেকে আরো অসহায় লাগলো।

সেই বাচ্চা চাকরটা দীনু দরজা খুলে দিয়ে আমাকে দেখেই বললো, দাদাবাবু বাড়ি নেই।

আমরা জানতাম। সেটা নতুন খবর নয়।

আমি পকেটে হাত দিয়ে কি যেন অনুভব করলাম। তারপর ধীরে ধীরে বললাম, তোর বউদিমণিকে খবর দে।

দীনুকে অনিমেষের মা যোগাড় করে দিয়েছিলেন। তা ছাড়া দীনুর মুখে 'মা' ডাকটা শুভা একদম পছন্দ করতো না। ও নিজেই শিখিয়েছিলো বউদিমণি বলে ডাকতে।

দীনু ভিতরে চলে গেল, আমি দাঁড়িয়ে রইলাম।

একটু পরেই শুভা ভিতরের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকলো, আমাকে দেখে ওর মুখ প্রথমটা খুব হাসি-হাসি ছিলো। তারপর আমার সমস্ত শরীরের ওপর, পোশাকের ওপর চোখ বুলিয়ে ওর চোখের দৃষ্টি প্রশ্ন হয়ে গেল।

শুভা আমার দিকে তাকিয়ে নিশ্চুপ হয়ে গেল, ওর শরীর পাথর?

আমি শুভার দিকে তাকিয়ে কোনো কথা বলতে পারলাম না, আমার শরীর একটা খুঁটির মতো।

আমি ধীরে ধীরে পকেট থেকে মনি-ব্যাগটা বের করলাম, ছোট্ট টেবিলটার ওপর রাখলাম। আমি শেফার্স কলমটা বের করলাম, টেবিলটার ওপর রাখলাম। তারপর সেই একানে চাবির রিং আর হাতঘড়িটা বের করে টেবিলের ওপর রাখলাম।

ছোট্ট টেবিলটার ওপর মনি-ব্যাগ, কলম, চাবির রিং আর হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে মনে হলো যেন অ্যাকসিডেন্টের পরে একটা মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চারপাশে ছিটকে পড়ে আছে।

আমি শুভার মুখের দিকে তাকাতে পারছিলাম না, তবু অনুভবে মনে হলো শুভা যেন একদৃষ্টে ঐ মনি-ব্যাগ, কলম, চাবির রিং, হাতঘড়িটা স্থির হয়ে দেখছে। ওগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে।

কতক্ষণ জানি না, কয়েক সেকেন্ডই হয়তো, হঠাৎ শুভার গলা শুনলাম, বসুন।

বলেই আমার দিকে তাকিয়ে কি বুঝলো কে জানে, ভিতরে চলে গেল।

আমি পিছন থেকে ডাকলাম, শুভা, শোনো।

আমি শুভাকে কোনো দিন 'তুমি' বলিনি। আমরা সবাই 'আপনি' বলতাম, কিন্তু কোনো দিন মনে হয়নি কোনো দূরত্ব আছে। তবু হঠাৎ কেন আমি 'শুভা, শোনো' বলে ডেকে উঠলাম, আমি নিজেই জানি না।

শুভা অনেকক্ষণ এলো না। আমি তখনো দাঁড়িয়ে আছি। আমার মনে হলো শুভা হয়তো বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়েছে, কাঁদছে। আমার মনে হলো শুভা হয়তো নিজে আসবে না, আমাকেই গিয়ে সান্ত্বনা দিতে হবে, আসল খবরটা জানাতে হবে, ও হয়তো ভুল বুঝেছে।

আমি জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম!

একটু দূরেই জয়ন্ত আর ববিকে দেখতে পেলাম আমি। ওরা পায়চারি করতে করতে জানালা দিয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছিলো। বোধ হয় ইশারায় আমি কেন দেরি করছি জানতে চাইলো।

আমি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ভিতরের দরজার দিকে তাকালাম। শুভা কখন এসে পড়ে। শুভাকে এখন আর বলা যায় না জয়ন্ত আর ববি দাঁড়িয়ে আছে। শুভাকে এখনো আসল কথাটাই বলা হয়নি।

শুভা অনেকক্ষণ পরে ফিরে এলো। মনে হলো মুখে-চোখে জল দিয়ে এসেছে। হয়তো চোখের জল লুকোবার জন্যে। কিন্তু কিছু বলার আগেই দেখি শুভার হাতে একটি কাচের প্লেটে কিছু খাবার।

আমি চমকে উঠলাম। আমার কেমন বেখাপ্পা লাগলো, অস্বস্তি বোধ করলাম।

আমি বলে উঠলাম, না, না, এ কি!

—আপনার খাওয়া হয়নি। শুভা স্পষ্ট দৃঢ় গলায় বললো।

প্লেট নামিয়ে রেখেই ও চলে গেল।

আমি বোকার মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম, তারপর বসলাম। আমি আবার জানালা দিয়ে ববি আর জয়ন্তর দিকে তাকালাম। তারপর চোখ ফিরিয়ে নিলাম।

শুভা চা নিয়ে এসে বললো, খেয়ে নিন।

আমার মনে হলো শিঙাড়াটা আমার গলায় আটকে যাবে। আমার গলা দিয়ে কিছুই নামছিলো না। আমি কি যেন বলতে যাচ্ছিলাম, শুভা নিজের ঠোঁটে তর্জনী রেখে চুপ করতে বললো। —খেয়ে নিন, তার আগে আমি কিছু শুনবো না।

আমি কোনোরকমে চাটুকুও শেষ করে উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, ডাক্তার বলেছে ভয়ের কিছু নেই।

—সত্যি যা তা বলুন। আমার মতো শক্ত মেয়ে খুব কম আছে। শুভা বললো।

আমি বললাম, আর জি কর-এ। বেঁচে আছে। ডাক্তার বলেছে...

ডাক্তার আসলে বলেছিলেন, কিছু বলা যায় না।

একুশ দিন ধরে আশা আর দুরাশার মধ্যে দুলতে দুলতে অনিমেষ শেষ পর্যন্ত মারা গেল।

শুভা তার আগে একদিন শুধু বলেছিলো, আমি বারবার বারণ করেছিলাম স্কুটার কিনতে।

আমরা তিনজনই আশ্চর্য না হয়ে পারলাম না। আমার মনে কেমন একটা ক্ষীণ সন্দেহও হতো।

ববি তো বলেই ফেললো, মেয়েদের চেনাই যায় না, চেনাই যায় না।

সেদিন আমাদের সঙ্গেই হাসপাতালে চলে এসেছিলো শুভা। তারপর একুশ দিন ধরে সে কি জীবনমৃত্যুর টানাপোড়েন। আমরা জানতাম বাঁচবে না। তবু আমাদের কখনো কখনো আশা হতো। আবার কখনো ভিতরে ভিতরে বুঝতে পারতাম সব মিথ্যে।

শুভা বাড়ি আর হাসপাতাল, হাসপাতাল আর বাড়ি করছে, কিন্তু দিব্যি হাসিখুশী। হাসপাতালের গেটে দেখা হয়ে গেলে উৎফুল্ল মুখে বলে উঠতো, জানেন, আজ আর জ্বরটা নেই। অনিমেষের বাবা খুঁটিনাটি জিগ্যেস করেছিলেন একদিন, শুভা আমাদের সামনেই হেসে বললো, বাবা, আপনার কেবল ভয়। ছেলে আপনার সেরেই গেছে। শুভা একদিন তার মাকে বললো, কিচ্ছু ভাবনা নেই এখন আর।

ও হেসে হেসে কথা বলতো। আমাদের ভয়-ভয় করতো।

জয়ন্ত বলেছিলো, ভীষণ শক্ পাবে।

ববি বলেছিলো, ওকে তো বলাও যায় না।

আমি ভেবেছিলাম, একদিন বলেই দেবো, অতখানি আশা করার কিছু নেই।

বলিনি। কারণ, শুভাকে আমি ঠিক বুঝতে পারতাম না। জয়ন্ত তো একদিন সে কথা আলোচনাও করেছিলো। বলেছিলো, ও এক অদ্ভুত টাইপ, বুঝলি। স্বামী মারা গেছে

কিংবা অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে কিছু একটা নিশ্চয় মনে হয়েছিলো তো, তবু তোকে জিগ্যেস না করে খাবার আর চা এনে দিলো। ববি বলেছিলো, কেউ কে'দে ভেঙে পড়ে, কেউ পাথর হয়ে যায়। শুভার ভাবটা এই যেন কোথাও কিছু ঘটেনি, সব ঠিক আছে। কেমন সুখী-সুখী ভাব।

অনিমেষের শ্রাদ্ধের দিনে আমরা আরো আশ্চর্য হলাম।

অনিমেষের বড় ছবিটা মালা দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা ছিলো, কিন্তু শুভার যে চেহারা আমরা আশা করেছিলাম তা থেকে ও সম্পূর্ণ পৃথক। সেই ম্যাজেণ্টা রঙের শাড়িটা ও পরেছিলো, ঢেউ-খেলানো এলো চুল এলোমেলো হয়ে উড়ছিলো, দ্রুত পায়ে ঘোরাঘুরি করছিলো, কাজ করছিলো বলে কপালে তখন বিন্দু-বিন্দু ঘাম।

আমাদের দেখেই মুখ হেসে উঠলো।

—আসুন। চেয়ার টেনে নিজেই বসতে বললো।

চলে আসার আগে দরজা অবধি এগিয়ে দিতে এসে বললো, আসবেন কিন্তু মাঝে মাঝে।

যেতাম, আমরা তিনজনই যেতাম। শুভা বাপের বাড়ি চলে যাওয়ার পরেও গিয়েছি। কখনো একা, কখনো তিনজনেই। আমি, ববি, জয়ন্ত।

শুধু একটা খটকা লাগতো। আমাদের দেখে ওর তো বিষণ্ণ হওয়ার কথা। অনিমেষের কথা মনে পড়ার কথা। কিন্তু শুভা সেই আগের মতোই রঙিন শাড়ি পরতো, হাসতো, কখনো তাসের প্যাকেট বের করে বলতো, আসুন বরং তাস খেলা যাক।

আমি একদিন একা গিয়েছিলাম। শুভা শতরঞ্জি বিছোনো মেঝেতে বসে রেকর্ড বাজাতে শুরু করলো। বললো, চুপচাপ বসে একটু গান শুনুন।

শুভাদের আত্মীয়স্বজনরা কেউ কখনো এসে পড়তো, আমাদের দেখে তাদের মুখচোখ এমন হতো যে, আমার অস্বস্তি লাগতো। ভাবতাম, আর আসবো না।

আমাদের জন্যে শুভাকে অপবাদ কুড়োতে হবে, ওর দুর্নাম হবে, ভাবতেও খারাপ লাগতো।

শুভার মা-বাবা কোনো দিন কিছু বলতেন না, বরং কখনো কখনো গল্প করতেন। হয়তো ভাবতেন, মেয়েটা ওদের সঙ্গে গল্প করে যদি নিজের দুঃখ ভুলে থাকতে পারে মন্দ কি।

একদিন চলে আসছি সি'ড়ি বেয়ে, সেদিন শুভার একটু জবর-জবর হয়েছিলো, ও আর নেমে এলো না, শুভার মা হঠাৎ সি'ড়ির ধার থেকে এগিয়ে এসে বললেন, শোনো।

আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম।

উনি একটু ইতস্তত করলেন, তারপর বললেন, তোমাদের......কিছু মনে কোরো না, পাড়ায় থাকা যে মুশকিল হয়ে পড়ছে।

অপমানে লজ্জায় আমি কিছু বলতে পারলাম না। ঠিক এমনি কিছু হবে আমি যেন অনেক দিন আগে থেকেই আশঙ্কা করছিলাম। আমার মনে হলো শুভার মা কোনো অন্যায় করেননি। শুভার কাছে আমরা এখনো কেন যাই? কই, কোনো উপকার করার জন্যে তো নয়, কোনো সাহায্য করার জন্যে তো নয়। তবে? শুধু ওর সঙ্গ ভালো লাগে বলে।

আমি ববিকে বললাম, আর যাবো না।

জয়ন্তকে বললাম, শুভার মা বারণ করেছেন।

নিজেকে বললাম, সঙ্গ ভালো লাগে বলে।

সঙ্গ ভালো লাগে! শুভা যদি অত সুন্দরী না হতো, যদি ওর মুখে অমনি সহজ হাসি না থাকতো, যদি ওর শরীর...

আমরা আর যাইনি, অনেক দিন যাইনি। অথচ আমার ভীষণ যেতে ইচ্ছে হতো, ববি আর জয়ন্তকে লুকিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে হতো। আমি নিজের মনে মনে একটা যুক্তি খাড়া করেছিলাম, শুভার এই সুন্দর শরীর, এই বয়স কেন মিথ্যে মিথ্যে ফুরিয়ে যাবে। আমার সন্দেহ হতো, শুভা নিশ্চয়ই অনিমেষকে ভুলে গেছে, কিংবা অনিমেষকে কোনো দিনই গভীর করে ভালোবাসেনি।

ববিও একদিন বলেছিলো, হয়তো ভালোই বাসতো না। তা না হলে তুই যেদিন অ্যাকসি-ডেণ্টের কথা বলতে গেলি, অন্য কেউ হলে ছুটে বেরিয়ে আসতো।

জয়ন্ত বলেছিলো, স্বামী মারা যাচ্ছে, তখনো মুখে হাসি।

আমি বলেছিলাম, শ্রাদ্ধের দিন তো সবাই শক্‌ড্‌ হয়েছিলো।

বাইশ বছরের একটি উজ্জ্বল শরীর আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে শুরু করলো, আমার সাতাশ বছরের মন কানে কানে বললো, তোমাকে দেখেই শুভার মুখ এত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে কেন? তোমার সঙ্গ তার এত ভালো লাগে কেন?

ঠিক সেই সময়েই শুভার কাছ থেকে একটা চিঠি পেলাম। 'কি মশাই, ভুলে গেলেন নাকি?'

আমি ববি আর জয়ন্তকে কিছু বললাম না। আমি ঠিক করলাম শুভার সঙ্গে আবার দেখা করবো।

আমি কিছু একটা করে ফেলবো। যা বলার ইচ্ছে মুখ ফুটে বলবো।

শুভার মা-বাবা, শুভার সুনাম-দুর্নাম সব আমার কাছে তুচ্ছ হয়ে গেল।

দরজা খুলে দাঁড়ালো শুভা নিজেই। আমাকে দেখেই ওর সমস্ত শরীর হেসে উঠলো। ওর পিছনে পিছনে ওর ঘরে ঢুকলাম।

শুভার শরীর যেন আরো সুন্দর হয়েছে এই এক মাসে। আমার ওকে ছুঁতে ইচ্ছে হলো।

আমি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম। তার আগেই শুভা ব্যথার সুরে বললো, কত দিন আসেন না, এত খারাপ লাগে একা-একা।

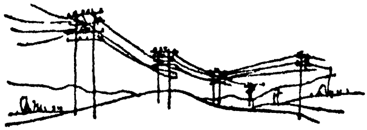
এত খারাপ লাগে একা-একা। কথাটা কানে ক'বার রেকর্ডের গানের মতো বাজলো। আমার সমস্ত শরীর উত্তেজনায় থরথর করে কেঁপে উঠলো, আমার তখনই ইচ্ছে হলো, ইচ্ছে হলো শুভাকে, শুভার আশ্চর্য শরীর বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরি।

কিন্তু তার আগেই শুভা হেসে উঠলো। ধীরে ধীরে বললো, আপনি এলে, আপনারা এলে কি ভালো লাগে বুঝবেন না। যতক্ষণ থাকেন, মনে হয় আপনাদের বন্ধুটিও যেন সঙ্গে রয়েছে।

আমার সমস্ত শরীর সেই মুহূর্তে ভেঙে পড়লো। আমি মাথা নিচু করলাম।

সেই প্রথম মনে পড়লো, অনিমেষ আমাদের সঙ্গে নেই।

[১৩৭৪



ভারতবর্ষ

ফৌজী সংকেতে নাম ছিলো বি এফ থ্রি থার্টি টু। BF332। সেটা আদপে কোনো স্টেশনই ছিলো না, না প্ল্যাটফর্ম, না টিকিটঘর। শুধু একদিন দেখা গেল ঝকঝকে নতুন কাঁটাতার দিয়ে রেল-লাইনের ধারটুকু ঘিরে দেওয়া হয়েছে। ব্যস্‌, ঐটুকুই। সারা দিনে আপ-ডাউনের একটা ট্রেনও থামতো না। থামতো শুধু একটি বিশেষ ট্রেন। হঠাৎ এক-একদিন সকালবেলায় এসে থামতো। কবে কখন সেটা থামবে, তা শুধু আমরাই আগে থেকে জানতে পেতাম, বেহারী কুক ভগোতীলালকে নিয়ে আমরা পাঁচজন।

স্টেশন ছিলো না, ট্রেন থামতো না, তবু রেলের লোকদের মুখে মুখে একটা নতুন নাম চালু হয়ে গিয়েছিলো। তা থেকে আমরাও বলতাম 'আণ্ডা হল্ট'।

আণ্ডা মানে ডিম। আণ্ডা হল্টের কাছ ঘেঁষে দুটো বেঁটেখাটো পাহাড়ী টিলার পায়ের

নীচে একটা মাহাতোদের গ্রাম ছিলো, গ্রামে-ঘরে মুর্গি চরে বেড়াতো। দূরে, অনেক দূরে ভুরকুণ্ডার শনিচারী হাটে সেই মুর্গি কিংবা মুর্গির ডিম বেচতেও যেতো মাহাতোরা। কখনো সাধের মোরগ বগলে চেপে মোরগ-লড়াই খেলতে যেতো। কিন্তু সেজন্য বি এফ থ্রি থার্টি টুর নাম আণ্ডা হল্ট হয়ে যায়নি।

আসলে মাহাতো-গাঁয়ের ডিমের ওপর আমাদের কোনো লোভই ছিলো না।

আমাদের ঠিকাদারের সঙ্গে রেলওয়ের ব্যবস্থা ছিলো, একটা ঠেলা-ট্রলিও ছিলো তার, লাল শালু উড়িয়ে সেটা রেলের ওপর দিয়ে গড়গড়িয়ে এসে মালপত্র নামিয়ে দিয়ে যেতো। নামিয়ে দিয়ে যেতো রাশি রাশি ডিম। বেহারী কুক ভগোতীলাল আগের রাত্রে সেগুলো সেদ্ধ করে রাখতো।

কিন্তু সেজন্যেও নাম আণ্ডা হল্ট হয়নি। হয়েছিলো ফুল-বয়েল্ড্ ডিমের খোসা কাঁটা-তারের ওপারে ক্রমশ স্তূপীকৃত হয়ে জমছিলো বলে। ডিমের খোসা দিনে দিনে পাহাড় হচ্ছিলো বলে।

ফৌজী ভাষার বি এফ থ্রি থার্টি টুর প্রথমেই যে দুটো অ্যাল্ফাবেট, আমাদের ধারণা ছিলো তা কোনো সংকেত নয়, ব্রেকফাস্ট কথাটার সংক্ষিপ্ত রূপ।

রামগড়ে তখন পি ও ডবলু ক্যাম্প, ইটালীয়ান যুদ্ধবন্দীরা সেখানে বেয়নেটে আর কাঁটা-তারে ঘেরা। তাদেরই মাঝে মাঝে একটা ট্রেনে বোঝাই করে এ পথ দিয়ে কোথায় যেন চালান করে দিতো। কেন এবং কোথায়, আমরা কেউ জানতাম না।

শুধু আমরা খবর পেতাম ভোরবেলায় একটা ট্রেন এসে থামবে।

ঠিকাদারের চিঠি পড়ে আগের দিন ডিমের ঝুড়িগুলো দেখিয়ে কুক ভগোতীলালকে বলতাম, তিন শো তিশ ব্রেকফাস্ট।

ভগোতীলাল গুনে গুনে ছ' শো ষাট আর গোটা পঁচিশ ফাউ বের করে নিতো। যদি পচা বের হয়। তারপর সেগুলো জলে ফুটিয়ে শক্ত ইঁট হয়ে গেলে তিনটে সার্ভার কুলির সঙ্গে হাত মিলিয়ে খোসা ছাড়াতো।

কাঁটাতারের ওপারে সেগুলোই দিনে দিনে স্তূপীকৃত হতো।

সক্কালবেলায় ট্রেন এসে থামতো, আর সঙ্গে সঙ্গে কামরা থেকে ট্রেনের দু পাশে ঝুপঝাপ নেমে পড়তো মিলিটারী গার্ড। সঙিগন উঁচু করা রাইফেল নিয়ে তারা যুদ্ধবন্দীদের পাহারা দিতো।

ডোরা-কাটা পোশাকের বিদেশী বন্দীরা একে একে কামরা থেকে নেমে আসতো বড়সড় মগ আর এনামেলের থালা হাতে।

দুটো বড় বড় ড্রাম উলটে রেখে সে দুটোকেই টেবিল বানিয়ে সার্ভার কুলি তিনজন দাঁড়াতো। আর ওরা লাইন দিয়ে একে একে এগিয়ে এসে ব্রেকফাস্ট নিতো। একজন কফি ঢেলে দিতো মগে, একজন দু পিস করে পাঁউরুটি দিতো, আরেকজন দিতো দুটো করে ডিম। ব্যস্, তারপর ওরা গিয়ে গাড়িতে উঠতো। কাঁধে আই ই, খাকী বুশ-শার্ট পরা গার্ড হুইস্ল্ দিতো, ফ্ল্যাগ নাড়তো, ট্রেন চলে যেতো।

মাহাতোরা কেউ কাছে আসতো না, দূরে দূরে ক্ষেতিতে জনারের বীজ রুইতে রুইতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে দেখতো।

ট্রেন চলে যাওয়ার পরে ভগোতীলালের জিম্মায় টেণ্ট রেখে আমরা কোনো কোনো দিন মাহাতোদের গ্রামের দিকে চলে যেতাম সবজির খোঁজে। পাহাড়ের ঢালুতে পাথুরে জমিতে ওরা সর্ষে বুনতো, বেগুন আর ঝিঙেও।

আণ্ডা হল্ট একদিন হল্ট-স্টেশন হয়ে গেল রাতারাতি। মোরম ফেলে লাইনের ধারে কাঁটা-তারে ঘেরা জায়গাটুকু উঁচু করা হলো প্ল্যাটফর্মের মতো।

তখন আর শুধু পি ও ডবলু নয়, মাঝে মাঝে মিলিটারী স্পেশালও এসে দাঁড়াতো। গ্যাবার্ডিনের প্যাণ্ট পরা হিপ পকেটে টাকার ব্যাগ গোঁজা আমেরিকান সৈনিকদের স্পেশাল। মিলিটারী পুলিস ট্রেন থেকে নেমে পায়চারি করতো, দু-একটা ঠাট্টাও ছুঁড়তো, আর সৈনিকের দল তেমনি সারি দিয়ে মগ আর থালা হাতে একে একে এসে রুটি নিতো, ডিম নিতো, মগ-ভরতি কফি। তারপর যে যার কামরায় গিয়ে আবার উঠতো, খাকী বুশ-শার্টের গার্ড হুইস্ল্

বাজিয়ে ফ্ল্যাগ নাড়তো, আমি ছুটে গিয়ে সাপ্লাই ফর্মে মেজরকে দিয়ে ও. কে. করাতাম।

ট্রেন চলে যেতো, কোথায় কোন্ দিকে আমরা কেউ জানতে পারতাম না।

সেদিনও এমনি আমেরিকান সোল্জারদের ট্রেন এসে দাঁড়ালো। সার্ভার কুলি তিনটে ডিম রুটি কফি সার্ভ করছিলো। ভগোতীলাল নজর রাখছিলো কেউ ডিম পচা কিংবা রুটি স্লাইস-এন্ড বলে ছুঁড়ে দেয় কি না।

ঠিক সেই সময় আমার হঠাৎ চোখ গেল কাঁটাতারের বেড়ার ওধারে।

কাঁটাতার থেকে আরো খানিক দূরে মাহাতোদের একটা নেংটি-পরা ছেলে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে দেখছে। কোমরের ঘুনসিতে লোহার টুকরো বাঁধা ছেলেটাকে একটা বাচ্চা মোষের পিঠে বসে যেতে দেখেছি একদিন।

ছেলেটা অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছিলো ট্রেনটা। কিংবা রাঙা-মুখ আমেরিকান সৈনিকদের দেখছিলো।

একজন সৈনিক তাকে দেখতে পেয়ে হঠাৎ 'হে-ই' বলে চিৎকার করলো, আর সঙ্গে সঙ্গে নেংটি-পরা ছেলেটা পাঁইপাঁই করে ছুটে পালালো মাহাতোদের গাঁয়ের দিকে। কয়েকটা আমেরিকান সৈনিক তখন হা-হা করে হাসছে।

ভেবেছিলাম ছেলেটা আর কোনো দিন আসবে না।

মাহাতোরা কেউ আসতো না, কেউ না। ক্ষেতিতে কাজ করতে করতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ওরা শুধু অবাক-অবাক চোখ মেলে দূর থেকে দেখতো।

কিন্তু তারপর আবার যেদিন ট্রেন এলো, ট্রেন থামলো, সেদিন আবার দেখি কোমরের ঘুনসিতে লোহা বাঁধা ছেলেটা কাঁটাতারের ধারে এসে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গে আরেকটা ছেলে, তার চেয়ে আরেকটু বেশী বয়েস। গলায় লাল সুতোয় ঝুলোনো দস্তার তাবিজ, ভুরকুন্ডার হাটে একদিন গিয়েছিলাম, রাশি রাশি বিক্রি হয় মাটিতে ঢেলে, রাশি রাশি সিঁদুর, তাবিজ, তামার পিতলের দস্তার, বাঁশে ঝোলানো থাকে রঙিন সুতলি, পুঁতির মালা। একটা ফেরি-ওলাকে দেখেছি কখনো কখনো এক হাঁটু ধুলো নিয়ে, কাঁধে অগুন্তি পুঁতির ছড়, দূর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মাহাতোদের গাঁয়ের দিকে যায়।

ছেলে দুটো অবাক-অবাক চোখ মেলে কাঁটাতারের ওপারে দাঁড়িয়ে আমেরিকান সৈনিক-দের দেখছিলো। প্রথম দিনের বাচ্চাটার চোখে একটু ভয়, হাঁটু তৈরী, কেউ চোখে একটু ধমক মাখালেই সে চট করে হরিণ হয়ে যাবে।

আমি হাতে ফর্ম নিয়ে ঘোরাঘুরি করছিলাম, সুযোগ পেলে হেসে হেসে মেজরকে তোয়াজ করছিলাম। একজন সৈনিক তার কামরার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কফির মগে চুমুক দিতে দিতে ছেলে দুটোকে দেখে পাশের জি আই-কে বললে, অফুল!

আমার এত দিন মনে হয়নি। ওরা তো দিব্যি ক্ষেতে-খামারে কাজ করে, গুল্তি নয়তো তীরধনুক নিয়ে খাটাশ মারে, নাটুয়া গান শোনে, হাঁড়িয়া খায়, ধনুকের ছিলার মতো কখনো টান-টান হয়ে রুখে দাঁড়ায়। নেংটি-পরা সরু শরীর, কালো, রুক্ষ। কিন্তু ব্যাটা জি আই-এর 'অফুল' কথাটা যেন আমাকে খোঁচা দিলো। ছেলে দুটোর ওপর আমার খুব রাগ হলো।

সৈনিকদের কে একজন গলা ছেড়ে এক কলি গান গাইলো, দু-একজন হা-হা করে হাস-ছিলো, একজন চটপট কফির মগে চুমুক দিয়ে সার্ভার কুলিটাকে চোখ মেরে আবার ভরতি করে দিতে বললে। গার্ড এগিয়ে দেখতে এলো আর কত দেরি। পাঞ্জাবী গার্ড কিন্তু দিব্যি চন্দ্রবিন্দু লাগিয়ে কথা বললে মেজরের সঙ্গে।

তারপর হুইস্ল্ বাজলো, ফ্ল্যাগ নড়লো, সবাই চটপট উঠে পড়লো ট্রেনে, হাতে চওড়া লাল ফিতে বাঁধা মিলিটারী পুলিসরাও।

ট্রেন চলে গেলে আবার সেই শূন্যতা, ধু-ধু বালির মধ্যে ফণিমনসার গাছের মতো শুধু সেই কাঁটাতারের বেড়া।

দিন কয়েক পরেই আবার একটা ট্রেন এলো। এবার পি ও ডবলু গাড়ি, ইটালীয়ান যুদ্ধ-বন্দীরা রামগড় থেকে আবার কোথাও চালান হচ্ছে। কোথায় আমরা জানতাম না, জানতে চাইতাম না।

ওদের পরনে স্ট্রাইপ-দেওয়া অন্য পোশাক, মুখে হাসি নেই, রাইফেল উঁচিয়ে সারাক্ষণ

ওদের ট্রেনটা চারিদিক থেকে গার্ড দেওয়া হতো। আমাদেরও একটু ভয়-ভয় করতো। ভুরকুণ্ডায় গল্প শুনে এসেছিলাম, একজন নাকি ধুতিপাঞ্জাবি পরে পালাবার চেষ্টা করেছিলো, পারেনি। বাঙালী বলেই আমার আরো ভয়-ভয় করতো।

ট্রেনটা চলে যাওয়ার পর লক্ষ করলাম, কাঁটাতারের ওপারে শুধু সেই বাচ্চা ছেলে দুটো নয়, খাটো কাপড়ের একটা বছর পনেরোর মেয়ে, দুটো পুরুষ ক্ষেতের কাজ ছেড়ে এসে দাঁড়িয়েছিলো। ট্রেন চলে যাওয়ার পর ওরা নিজেদের মধ্যে কি সব বলাবলি করলো, হাসলো, কলকল করতে করতে ঝরনার জলের মতো মাহাতোদের গাঁয়ের দিকে চলে গেল।

একজন, দুজন, পাঁচজন—সেদিন দেখি জন দশেক মাহাতো-গাঁয়ের লোক ট্রেন আসতে দেখেই মাঠ থেকে দৌড়তে শুরু করেছে। ট্রেনের জানালায় জানালায় খাকী রঙ দেখেই বোধ হয় ওরা বুঝতে পারতো। দিনে দুখানা প্যাসেঞ্জার মেল ট্রেনের মতো হুস্ করে বেরিয়ে যেতো, দু-একখানা গুড্‌স্ ট্রেন ঠ্যংঠ্যং করতে করতে। তখন তো কই থামবে ভেবে মাহাতো-গাঁয়ের লোক আসতো না ভিড় করে!

একদিন গিয়ে বলেছিলাম মাহাতো বুড়োকে, লোক পাঠিয়ে আমাদের আণ্ডা হল্টের তাঁবুতে বেচে আসতে সবজি আর চিংড়ি, সরপুঁটি, মৌরলা।

বুড়ো হেসে বলেছিলো—ক্ষেতির কাজ ছেড়ে যাবো নাই।

তাই অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলাম। কালো কালো নেংটি-পরা লোকগুলোকে, খাটো শাড়ির মেয়েগুলোকে। শুধু খালি-গা মাহাতো বুড়োর পায়ে একটা টাঙি-জুতো, গেঁয়ো মুধার কাছে বানানো টাঙি-জুতো, এসে সারি দিয়ে ওরা কাঁটাতারের বেড়ার ওধারে দাঁড়ালো।

ট্রেন ততক্ষণে এসে গেছে। ঝুপঝাপ নেমে পড়ে আমেরিকান সৈনিকের দল সারি দিয়ে চলেছে মগ আর থালি হাতে।

দু শো আঠারো ব্রেকফাস্ট তখন রেডি বি এফ থ্রি থার্টি টুতে। বি এফ থ্রি থার্টি টু মানে আণ্ডা হল্ট।

তখন একটু শীত-শীত পড়তে শুরু করেছে। দূরের পাহাড়ে কুয়াশার মাফলার জড়ানো। গাছগাছালি শিশির-ধোয়া সবুজ।

একজন সৈনিক ইয়াঙ্কি গলায় মুগ্ধতা প্রকাশ করলো।

আরেকজন কামরার সামনে দাঁড়িয়ে কাঁটাতারের ওপারের রিক্ততার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলো। হঠাৎ কফির মগটা ট্রেনের পা-দানিতে রেখে সে হিপ পকেটে হাত দিলো। ব্যাগ থেকে একটা চকচকে আধুলি বের করে ছুঁড়ে দিলো মাহাতোদের দিকে।

ওরা অবাক হয়ে সৈনিকটার দিকে তাকালো, কাঁটাতারের ভিতরে মোরমের ওপর পড়ে থাকা চকচকে আধুলিটার দিকে তাকালো, নিজেরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো, তারপর অবাক হয়ে শুধু তাকিয়েই রইলো।

ট্রেনটা চলে যাবার পর ওরা নিঃশব্দে ফিরে চলে যাচ্ছিলো দেখে আমি বললাম, সাহেব বখশিশ দিয়েছে, বখশিশ, তুলে নে।

সবাই সকলের মুখের দিকে তাকালো, কেউ এগিয়ে এলো না।

আমি আধুলিটা তুলে মাহাতো বুড়োর হাতে দিলাম। সে বোকার মতো আমার দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপর সবাই নিঃশব্দে চলে গেল। কারও মুখে কোনো কথা নেই।

আমার এই ঠিকাদারের তাঁবেদারি একটুও ভালো লাগতো না। জনমনুষ্য নেই, একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন দাঁড়ায় না, তাঁবুতে ভগোতীলাল আর তিনটে কুলি। নির্জন, নির্জন। মাটি রুক্ষ, দুপুরের আকাশ রুক্ষ, আমার মন।

মাহাতো-গাঁয়ের লোকরাও কাছে ঘেঁষতো না। মাঝে মাঝে গিয়ে সবজি কিংবা চুনো মাছ কিনে আনতাম। ওরা বেচতে আসতো না, কিন্তু ভুরকুণ্ডার হাটে যেতো তিন ক্রোশ পথ হেঁটে।

দিন কয়েক কোনো ট্রেনের খবর ছিলো না। চুপচাপ, চুপচাপ।

হঠাৎ সেই কোমরের ঘুনসিতে লোহা বাঁধা ছেলেটা একদিন এসে জিগ্যেস করলো, টিরেন আসবে না বাবু?

হেসে ফেলে বললাম, আসবে, আসবে।

ছেলেটার আর দোষ কি, বে'টে বে'টে পাহাড়, রুক্ষ জমি, একটা দেহাতী ভিড়ের বাস দেখতে হলেও দু ক্রোশ হে'টে যেতে হয় খয়েরগাছের ঝোপের মধ্যে দিয়ে। সকালে একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন একটুও স্পীড না কমিয়ে হুস্ করে বেরিয়ে যেতো, বিকেলের ডাউন ট্রেনটাও থামতো না, তবু কয়েক মুহূর্ত জানালায় জানালায় ঝাপসা মুখ দেখার জন্যে আমরা তাঁবুর ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসতাম। মানুষ না দেখে আমরা হাঁপিয়ে উঠতাম।

তাই আমেরিকান সৈনিকদের স্পেশাল ট্রেন আসছে শুনলে যেমন বিব্রত বোধ করতাম তেমনি আবার স্বস্তিও ছিলো।

দিন কয়েক পরেই প্রথমে এলো খবর, তার পরদিন মিলিটারী স্পেশাল। ঝুপঝাপ করে জি. আই-রা নামলো, সারি দিয়ে সব ডিম রুটি মগ-ভরতি কফি নিলো।

হঠাৎ তাকিয়ে দেখি কাঁটাতারের বেড়ার ওধারে মাহাতো-গাঁয়ের ভিড় ভেঙে পড়েছে। বিশ হতে পারে, তিরিশ হতে পারে, হাঁটু-সমান বাচ্চাগুলোকে নিয়ে কত কে জানে। খাটো শাড়ির মেয়েগুলোও বোকা-বোকা চোখ মেলে তাকিয়ে ছিলো। ওদের দেখে আমার কেমন ভয়-ভয় করলো। ভগোতীলাল কিংবা সার্ভার কুলি তিনটে মাহাতো-গাঁয়ের দিকে যেতে চাইলে আমার বড় ভয়-ভয় করতো।

প্ল্যাটফর্ম তো ছিলো না, শুধু উঠতে নামতে সুবিধের জন্যে লাইনের ধারটুকু মোরম ফেলে উ'চু করা হয়েছিলো। আমেরিকান সৈনিকরা কফির মগে চুমুক দিতে দিতে পায়চারি করছিলো। দু-একজন স্থির দৃষ্টিতে মাহাতো-গাঁয়ের কালো কালো মানুষগুলোকে দেখ-ছিলো।

হঠাৎ একজন ভগোতীলালের দিকে এগিয়ে গিয়ে হিপ পকেট থেকে ব্যাগ বের করলো, ব্যাগ থেকে একখানা দু টাকার নোট, তারপর জিগ্যেস করলে, কয়েন্স্ আছে? নোট-ভাঙানো খুচরো সৈনিকরা কেউ রাখতেই চাইতো না, পয়সা ফেরত না নিয়ে দোকানী কিংবা ফেরিওয়ালা কিংবা ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বলতো, ঠিক আছে, ঠিক আছে। রাঁচিতে গিয়ে কয়েক-বার দেখেছি।

এক-আনি, দু-আনি আর সিকি মিলিয়ে ভগোতীলাল ভাঙিয়ে দিচ্ছিলো, হঠাৎ দেখি কাঁটাতারের বেড়ার ওধারে ভিড়ের ভিতর থেকে কোমরের ঘুনসিতে লোহার টুকরো বাঁধা সেই ছেলেটা হাসতে হাসতে হাত বাড়িয়ে কি চাইছে।

সঙ্গে সঙ্গে ভগোতীলালের কাছ থেকে সেই খুচরো আনি দু-আনিগুলো মুঠোর মধ্যে নিয়ে সেই আমেরিকান সৈনিক মাহাতোদের দিকে ছুঁড়ে দিলো।

আমার তখন সাপ্লাই ফর্ম ও. কে. করানো হয়ে গেছে, গার্ড হুইস্‌ল্ দিয়েছে।

ট্রেন চলতে শুরু করেছে, অমনি মাহাতোদের দিকে ফিরে তাকালাম।

ওরা তখন চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলো, তাকিয়ে ছিলো। তারপর হঠাৎ, লাল মোরমের ওপর, ছড়ানো পয়সাগুলোর ওপর কাঁটাতারের ফাঁক দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো কোমরের ঘুনসিতে লোহা বাঁধা ছেলেটা, আর গলায় লাল সুতলিতে দস্তার তাবিজ বাঁধা ছেলেটা।

সেই মুহূর্তে টাঙি-জুতো পরা মাহাতো বুড়ো ধমক দিয়ে বলে উঠলো, খবরদার! এমন জোরে চিৎকার করলো যে আমি নিজেও চমকে উঠেছিলাম।

কিন্তু বাচ্চা দুটো ওর কথা শুনলো না। তারা দুজনে তখন যে যত পেরেছে আনি দু-আনি কুড়িয়ে নিয়েছে। মুখ খোসা-ছাড়ানো কচি ভুট্টার মতো হাসছে। মেয়েপুরুষের সমস্ত ভিড় হাসছে।

টাঙি-জুতো পরা মাহাতো বুড়ো রেগে গিয়ে তাদের ভাষায় অনর্গল কি সব বলে গেল। মেয়েপুরুষের ভিড় হাসলো।

মাহাতো বুড়ো রাগে গজগজ করতে করতে গাঁয়ের দিকে চলে গেল একাই। মাহাতো-গাঁয়ের লোকগুলোও চলে গেল কলকল কথা বলতে বলতে, খলখল হাসতে হাসতে।

ওরা চলে যেতেই আড্ডা হল্ট আবার নির্জন নিস্তব্ধ শূন্যতা। আমার এক-একসময় ভীষণ মন খারাপ হয়ে যেতো। দূরে দূরে পাহাড়, মহুয়ার বন, খয়েরের ঝোপ পার হয়ে একটা ছোট্ট জল-চোঁয়ানো ঝরনা, মাহাতো-গাঁয়ের সবুজ ক্ষেত। চোখ জুড়িয়ে যায়, চোখ জুড়িয়ে যায়। তার মধ্যে কালো কালো নেংটি-পরা মানুষ।

এদিকে মাঝে মাঝেই আমেরিকান সোল্‌জারদের ট্রেন আসে, থামে, ডিম রুটি মগ-ভরতি কফি খেয়ে চলে যায়। মাহাতো-গাঁয়ের লোক ভিড় করে আসে, কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে সারি দিয়ে দাঁড়ায়।

—সাব বখশিশ, সাব বখশিশ!

একসঙ্গে অনেকগুলো দেহাতী গলা চিৎকার করে উঠলো।

মেজরের কাছে ফর্ম ও. কে. করাতে গিয়ে আমি চমকে ফিরে তাকালুম।

দেখলাম, শুধু বাচ্চা ছেলে দুটো নয়, কয়েকটা জোয়ান পুরুষও হাত বাড়িয়েছে। খাটো শাড়ির একটা তুখোড় শরীরের মেয়েও।

একদিন সবজি কিনতে গিয়েছিলাম, ঐ মেয়েটা হেসে হেসে জিগ্যেস করেছিলো, টিরেন কবে আসবে।

এক-একদিন অকারণেই ওরা দল বেঁধে এসে দাঁড়িয়ে থাকতো, অপেক্ষা করে করে চলে যেতো।

কাঁধে-স্ট্রাইপ তিন-চারটে আমেরিকান ততক্ষণে হিপ পকেট থেকে মুঠো মুঠো আনি দু-আনি বের করে ওদের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে। ট্রেন ছাড়ার অপেক্ষা করেনি, ওরা হুমড়ি খেয়ে পড়লো পয়সাগুলোর ওপর। হুড়োহুড়িতে কাঁটাতারের ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়ে হাত-পা ছড়ে গেল কারও, কারও বা নেংটির কাপড় ফেঁসে গেল।

ট্রেন চলে যাওয়ার পর ভালো করে লক্ষ করে দেখলাম ওদের। মনে হলো মাহাতো-গাঁয়ের আধখানাই এসে জড় হয়েছে। সবারই মুখে ফুর্তির হাসি, সবাই কিছু-না-কিছু পেয়েছে। কিন্তু তন্নতন্ন করে খুঁজেও সেই টাঙি-জুতোর মাহাতো বুড়োকে দেখতে পেলাম না। মাহাতো বুড়ো আসেনি। সেদিন ওর আপত্তি, ওর ধমক শুনেও পয়সাগুলো ফেলে দেয়নি ছেলে দুটো। তাই বোধ হয় রেগে গিয়ে আর আসেনি।

আমার ভাবতে ভালো লাগলো বুড়োটা ক্ষেতে দাঁড়িয়ে একা-একা মাটি কোপাচ্ছে।

আমাদের দিন, কুক ভগোতীলালকে নিয়ে আমাদের পাঁচজনের দিন আণ্ডা হল্টের তাঁবুর মধ্যে কোনোরকমে কেটে যাচ্ছিলো। মাঝে মাঝে এক-একদিন সৈনিক-বোঝাই ট্রেন আসছিলো, থামছিলো, চলে যাচ্ছিলো। মাহাতো-গাঁয়ের লোক ভিড় করে এসে কাঁটাতারের ধারে সারি দিয়ে দাঁড়াতো, হাত বাড়িয়ে সবাই 'সাব বখশিশ, সাব বখশিশ' চেঁচাতো।

হঠাৎ এক-একদিন মাহাতো বুড়োকে দেখতে পেতাম। কোনো দিন ক্ষেতের কাজ ফেলে দু হাতের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে হনহন করে এগিয়ে আসতো, রেগে গিয়ে ধমক দিতো সকলকে। ওর কথা শুনছে না বলে কখনো বা অসহায় প্রতিবাদের চোখে গাঁয়ের লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতো।

কিন্তু ওর দিকে কেউ ফিরেও তাকাতো না। সৈনিকরা হিপ পকেটে হাত দিয়ে হা-হা করে হাসতে হাসতে মুঠো-ভরতি পয়সা ছুঁড়ে দিতো। মাহাতো-গাঁয়ের লোক হুমড়ি খেয়ে পড়তো সেই পয়সাগুলোর ওপর, নিজেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে ঝগড়া বাধাতো। তা দেখে সৈনিকরা হা-হা করে হাসতো।

শেষে পর পর কয়েক দিনই লক্ষ করলাম টাঙি-জুতো পরা মাহাতো বুড়ো আর আসে না। মাহাতো বুড়ো ওদের দেখে রেগে যেতো বলে, মাহাতো বুড়ো আর আসতো না বলে আমার এক ধরনের গর্ব হতো। কারণ, এক-একসময় ঐ লোকগুলোর ব্যবহারে আমরা—আমি আর ভগোতীলাল খুব বিরক্তি বোধ করতাম। ভিতরে ভিতরে লজ্জা পেতাম। ওদের কালো-কুলো দীন-দরিদ্র বেশ দেখে সৈনিকের দল নিশ্চয় ওদের ভিখিরী ভাবতো। ভাবতো বলেই আমার খুব খারাপ লাগতো।

সেদিন কাঁটাতারের ওপার থেকে ওরা বখশিশ বখশিশ বলে চিৎকার করছে, কাঁধে আই ই খাকী বুশ-শার্টের গার্ড জানকীনাথের সঙ্গে আমি গল্প করছি, আমাদের পাশ দিয়ে একজন অফিসার মচমচ করে যেতে যেতে চিৎকার শুনে থুতু ফেলার মতো গলায় বলে উঠলো, ব্লাডি বেগার্স।

আমি আর জানকীনাথ পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। আমাদের মুখ অপমানে কালো হয়ে গেল। মাথা তুলে তাকাতে পারলাম না। শুধু অক্ষম রাগে ভিতরে ভিতরে জ্বলে

উঠলাম।

ব্লাডি বেগার্স, ব্লাডি বেগার্স।

সমস্ত রাগ গিয়ে পড়লো মাহাতোদের ওপর। ট্রেন চলে যেতেই আমি ভগোতীলালকে সঙ্গে নিয়ে ওদের তাড়া করে গেলাম। ওরা কুড়োনো পয়সা ট্যাঁকে গুঁজে হাসতে হাসতে পালালো।

তবু ওদের জন্যে সমস্ত লজ্জা আমি একটা অহঙ্কারের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলাম। পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে সেই অহঙ্কারটা আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতো মাহাতো বুড়োর চেহারা নিয়ে।

কিন্তু সেদিন আমার বুকের মধ্যের সমস্ত জ্বালা জুড়িয়ে গেল।

ভুরকুন্ডায় ঠিকাদারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েই খবর পেয়েছিলাম।

সার্ভার দুজন কুলি তখন টেবিল বানানো ড্রাম দুটোকে পায়ে ঠেলে ঠেলে আন্ডা হল্টের কাঁটাতারের ওপারে সরিয়ে দিচ্ছিলো। তাঁবুর দড়ি খুলছিলো আরেকজন। ভগোতীলাল ড্রামটার গায়ে একটা জোর লাথি মেরে বললে, খেল খতম, খেল খতম।

হঠাৎ হইহল্লা শুনে চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখি মাহাতো-গাঁয়ের লোক ছুটতে ছুটতে আসছে।

আমরা অবাক হয়ে তাকালাম তাদের দিকে। ভগোতীলাল কি জানি কেন হেসে উঠলো।

ততক্ষণে কাঁটাতারের ওপারে ভিড় করে দাঁড়িয়ে গেছে ওরা।

সঙ্গে সঙ্গে একটা হুইস্‌ল্ শুনতে পেলাম, ট্রেনের শব্দ কানে এলো।

ফিরে তাকিয়ে দেখি ট্রেনটা বাঁক নিয়ে আন্ডা হল্টের দিকেই আসছে, জানালায় জানালায় খাকী পোশাক।

আমরা বিব্রত বোধ করলাম, আমরা অবাক হলাম। তা হলে কি খবর পাঠাতেই ভুলে গেছে ভুরকুন্ডার আপিস? না, যে খবর শুনে এসেছি সেটাই ভুল?

ট্রেনটা যত এগিয়ে আসছে ততই একটা অদ্ভুত গমগম আওয়াজ আসছে। আওয়াজ নয়, গান। একটু কাছে আসতেই বোঝা গেল সমস্ত ট্রেন, ট্রেন-ভরতি সৈনিকের দল পরস্পরের সঙ্গে গলা মিলিয়ে, গলা ছেড়ে গান গাইছে।

বিভ্রান্তের মতো আমি একবার ট্রেনটার দিকে তাকালাম, একবার কাঁটাতারের ভিড়ের দিকে। আর সেই মুহূর্তে চোখ পড়লো সেই মাহাতো বুড়োর দিকে। সমস্ত ভিড়ের সঙ্গে মিশে গিয়ে মাহাতো বুড়োও হাত বাড়িয়ে চিৎকার করছে, সাব বখশিশ, সাব বখশিশ!

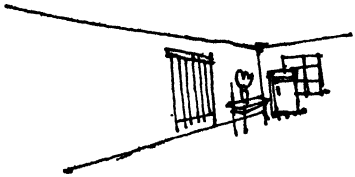
উন্মাদের মতো, ভিক্ষুকের মতো তারা চিৎকার করছে। তারা এবং সেই মাহাতো বুড়ো।

কিন্তু আমেরিকান সৈনিকদের সেই ট্রেনটা অন্য দিনের মতো এবারে আর আন্ডা হল্টে এসে থামলো না। প্যাসেঞ্জার ট্রেনগুলোর মতোই আন্ডা হল্টকে উপেক্ষা করে হুস্ করে চলে গেল।

আমরা জানতাম ট্রেন আর থামবে না।

ট্রেনটা চলে গেল। কিন্তু মাহাতো-গাঁয়ের সবাই ভিখিরী হয়ে গেল। ক্ষেতিতে চাষ করা মানুষগুলো সব—সব ভিখিরী হয়ে গেল।

[১৩৭৫



ফ্রীজ

—বাবা, তুমি একটা ফ্রীজ কেনো না গো। কুটকুট বললে। আমার পাঁচ বছর বয়সের ছেলে কুটকুট সাদা হাফপ্যাণ্টের দু পকেটে দুটো খুদে খুদে হাত ঢুকিয়ে বললে। আমি চমকে উঠলাম। নীলিমা চমকে উঠলো। আমি আর নীলিমা চোখাচোখি হতেই হেসে ফেললাম।

কুটকুট কে নাম রেখেছিলো? টিনকুমাসী না? ঠিক। তখন থেকেই ওই কুটকুট করে কথা। ফ্রীজ। ওর মুখে, কুটকুটের মুখে, ফ্রীজ কথাটা শুনে অবাক লাগলো, বেশ লাগলো, মজা লাগলো।

সেই খুব ছোট ছিলো যখন, মুখে আধো-আধো বুলি ফুটেছে, তখন হাত নেড়ে নেড়ে টা-টা করলে যেমন মজা লাগতো, তেমনি।

মেজ্ জ্যাঠা সেবার যাবার সময় সবে সিঁড়িতে পা দিয়েছেন, কুটকুট কেমন হাত নেড়ে নেড়ে সুর টেনে টেনে টা-টা বললো. আর মেজ্ জ্যাঠাও তেমনি রসিক মানুষ, কুটকুটের দিকে হাত নেড়ে বললেন, না, টা-টা নয়, বিড়লা-বিড়লা।

আমরা তো হেসে লুটোপুটি!

ওর মুখে 'ফ্রীজ' শুনে তেমনি হাসি পেলো। ভালোও লাগলো। আমরা তো সাহেব হতে পারলাম না। না ছিলো সঙ্গতি, না বাসনা। কি ছাই স্বাধীনতা, স্বদেশিয়ানা, ঐতিহ্য... বাজে বুলি সব! বিশ্বাস করে পস্তাতে হলো! কায়দা করে ইংরেজী বুকনি কিছুটা যদি শিখতাম, গ্যাবার্ডিনের স্যুট অবশ্য পরি, কিন্তু হাঁটাচলার কায়দা? যে যা-ই বলুক, কুটকুটকে মিশনারী ইস্কুলে দিয়ে ভালোই করেছি। জীবনে উন্নতি করতে পারবে। দিশী ইস্কুলগুলো...

—ইস্কুল আবার কি, বলো স্কুল।

—বেশ বাবা, বেশ। তোর অত মাস্টারি সহ্য হয় না। নীলিমা হাসতে হাসতে বলেছিলো। জানি, মুখে যা-ই বলুক, ওটুকু শুনতে ওর ভালোই লাগে।

—ফ্রীজটাও বুঝি ইস্কুলে শিখেছিস? আমি জিগ্যেস করলাম।

—পাগল হয়েছো? হাসলো নীলিমা।—এই, বল্ সত্যি করে, মিঠুপিসীদের কাছে শুনে এসেছিস, না?

—বাঃ রে। শুনবো কেন, মিঠুপিসীদের বাড়িতে তো আছে।

মিঠুপিসী আর মিঠুপিসী। গড়িয়াহাটের মোড়ে এই চারতলার ফ্ল্যাটে থেকেও শান্তি নেই।

ফ্ল্যাটটা অবশ্য ভালোই। দুখানা ঘর, ভাড়া দু শো টাকা। তা হোক। মাটি অনেক দূরে বটে, কিন্তু আকাশ অনেক কাছে। কলকাতায় ক'জন আর আকাশ পায়!

কিন্তু দোতলার ওই মিঠুপিসীরা এক সমস্যা। শুধু কুটকুটকে দোষ দিয়ে কি হবে, নীলিমাও। জানো, মিঠুরা নাকি সুন্দর এক জোড়া ইংলিশ খাট কিনেছে। খাট তো কাঠেরই হয়, তার আবার ইংলিশ আর বেংগলি আছে নাকি। হয় হয়তো। শুধু হয় বললেই তো হবে না, তক্তপোশ বিদেয় দিয়ে আনতেও হয়েছে। বাঃ, এ পাড়ায় থাকতে হলে...সেই যে বলে না, ডু অ্যাজ দি রোমান্স্, রোমানরা যা করে।

হেসে বলেছিলাম, রোমান্সও করে।

—করবো।

আবার কখনো : মিঠুদের একটা রেডিওগ্রাম এসেছে, কি মিষ্টি আওয়াজ, না শুনলে বিশ্বাস করবে না।

কুটকুট সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়েছে, হ্যাঁ বাবা, সত্যি।

অতএব পুরোনো রেডিওটা খারাপ হওয়ার পর আর মেরামত করতে দিইনি। বছর খানেকের চেষ্টায় শেষ অবধি একটা রেডিওগ্রামও এনেছিলাম। তারপর বেশ কিছু দিন শান্তিতে ছিলাম।

এখন আবার ফ্রীজ। নীলিমা অসুখে পড়েছিলো, মিঠুদের ফ্ল্যাটে যেতে পারেনি। তাই খবরটা তার কাছেও নতুন।

আমার মুখ দিয়ে বড় জোর রেফ্রিজারেটর কথাটাই বের হতে পারে, কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেছি। 'ফ্রীজ' শুনেছি বইকি, কিন্তু উচ্চারণ করতে কেমন অস্বস্তি।

আর কুটকুট: বাবা, তুমি একটা ফ্রীজ কেনো না গো।

নীলিমা হাসলো কুটকুট আবার ওই কথা বলতেই। তারপর শাসন করলো।—আবার গো বলছিস?

বললাম, ফ্রীজ মানে রেফ্রিজারেটর কিনতে হলে—গো নয় গন, গেছি।

—তোমার তো সব তাতেই ওই এক কথা।

—তোমার অসুখে...

—অত অসুখ-অসুখ শুনিও না, এবারই নয় হয়েছে। তার আবার উঠতে বসতে কথা শোনাচ্ছো। ডাক্তার না ডাকলেই পারতে।

—ডাকলে যে ওরা যেতে চায় না তা কি করে জানবো। চেহারাটা তোমার খারাপ হলে হয়তো...

নীলিমা চোখ পাকালো! তারপর হাসলো।—শরীরটা আমার অনেক ভালো হয়েছে এখন, তাই না?

—একটু।

—তোমার সব তাতেই ওই। ভারি খুঁতখুঁতে তুমি। আমি নিজে বুঝতে পারছি...

হাসলাম। বললাম, তোমার অসুখ হয়ে এক দিক থেকে ভালোই হয়েছে। মেজদি আর আসেনি।

নীলিমা গম্ভীর হলো।—আসবে কেন, সাহায্য হতো যে। ওদের যত ভাব-ভালোবাসা তো টাকার।

চুপ করতে হলো। নীলিমার মুখে কথাগুলো শুনতে ভালো লাগে না। যখন আসে, চায়, দিতে পারি না, কিংবা কষ্টেসৃষ্টে কিছু দিই, তখন ভিতরে ভিতরে মেজদির ওপর রাগ হয়। কেন রে বাবা, আরো তো তিনটে ভাই আছে, তোমার শ্বশুরবাড়ি আছে...

তবু বললাম, বিধবা মানুষ, দু-দুটো ছেলের পড়ার খরচ!

—ওঃ! কত দরদ, অসুখে একবার খবর নিতে এলো?

—তোমার মাসীমাই বা কেমন, এমন একটা অসুখের খরচ, তবু বুলির বিয়েতে কমদামী শাড়ি দিয়েছি বলে...

—মাসীর দোষ কি বলো, পাঁচজনের সামনে তো বলতে হয়েছে, নীলুর বর এই দিয়েছে।

তা ঠিক।

নীলিমা হাসলো।—ফ্রীজ কিন্তু একটা কিনতে হবে, থাকলে কত সুবিধে।

সুবিধে? হয়তো হবে। চারতলার ওপর থাকা মানে পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ না-থাকা। একটা ফেরিওলা ওঠে না, একটা ছুঁচ কিনতে সিঁড়ি ভেঙে নামো। তখন মনে হয়েছিলো অনেকখানি আকাশ পাওয়া যাবে। পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যেবেলায় থালার মতো হলদে চাঁদটা মনে হয় জানালায় আটকে আছে। কিন্তু তার জন্যে সারা মাস ঝামেলা। শুধু খবরের কাগজ-ওয়ালাটা কেমন তাক করে ছুঁড়ে দেয়, ঠিক জানালা গলে ভিতরে এসে পড়ে। সিঁড়ি ভাঙতে হবে ভাবলে বাজার যেতে ইচ্ছে হয় না। দু-একটা জিনিস রোজই ভুলে যাই। আপিস থেকে ফিরে একবার এখানে এসে পৌঁছলে আর নামতে মন চায় না। এর চেয়ে একতলার সেই গলি অনেক ভালো ছিলো।

—একটা ফ্রীজ থাকলে কিন্তু...

বলেছিলাম, একটি হাজার টাকা। তা জানো?

—মাসে মাসে কিস্তিতে নাকি পাওয়া যায়?

কি উত্তর দেবো, মনে মনে ভাবলাম, মেয়েরা কি অবুঝ। এর চেয়ে সেকালের বউরা অনেক ভালো ছিলো। অতশত খবর রাখতো না। হায়ার পারচেজ! কিস্তির টাকাটা যেন টাকা নয়। মাসের শেষে এমনিতেই তো টানাটানি। নেই বললেই তোমাদের দায় খালাস। কিস্তি শোধ দেবো কোত্থেকে শুনি।

—সেকালের বউরা ভালো ছিলো? ঠোঁট ওলটালো নীলিমা। বললে, এক-গা গয়না ছিলো না তাদের? আমার কি আছে?

—সে তো তারা বাপের বাড়ি থেকে আনতো। তুমিও আনলেই পারতে।

ব্যস্। সে কি চাউনি! পারলে ভস্ম করে দেয়।

অতএব দুজনেই স্পীক্টিনট। কুটকুট ব্যাপার বুঝে কখন কেটে পড়েছে। হয়তো মিঠু-পিসীদের ফ্ল্যাটে। আরো নতুন কি এসেছে তার খোঁজ নিতে।

আর আমার হঠাৎ মেজদির কথা মনে পড়লো। এক-গা গয়না তার ছিলো। তারপর রেলের অ্যাকসিডেণ্টে...ওঃ, ভাবতেও সারা শরীর শিউরে ওঠে। মেজদির কতই বা বয়েস তখন, তেইশ-চব্বিশ...সাদা ধবধবে থান পরা মুখখানা প্রথম যেদিন দেখলাম, এখনো মনে পড়লে বুকটা টনটন করে ওঠে।

ফ্রীজ কিন্তু শেষ অবধি একটা কিনতেই হলো। উইণ্ড্ফল। আপিসে বোনাস নিয়ে যুদ্ধ চলছিলো, মিটে গেল হঠাৎ। নগদ ন' শো টাকা, ভাবতেও পারিনি, হঠাৎ এভাবে পেয়ে যাবো। টাকাটা পাওয়ার খবর পেয়ে মনে মনে একটা বাজেট কষে ফেলেছিলাম। ন' শো টাকা। অনেক কিছু করা যাবে। দু শো টাকা ভাড়া গুনতেই মাইনের টাকা প্রায় অর্ধেক। শ' চারেক থাকে, কুটকুটের ইস্কুল, ইলেকট্রিক, ঝি, ডাক্তার ওষুধ, অমুকের বিয়ে। বাড়তি টাকাটা পেলে ভাবলাম, কুটকুটের পড়ার টেবিলটা করে ফেলবো। নীলিমা অনেক দিন থেকে বলছে, কাঁসার থালাগুলো ফেটে গেছে, স্টেনলেস স্টীলের এক সেট বাসন...আর, মেজদির জন্যে সত্যি কষ্ট হয়, নীতার বিয়ে যদি ঠিক হয়...অন্তত শ' পাঁচেক টাকা মেজদিকে দিতেই হবে। টাকাটা হাতে পেয়ে সব হিসেব ঠিক করে রেখেছিলাম। বাড়ি ফিরতেই কিন্তু সব নস্যাৎ হয়ে গেল।

—আমি জানি, ফ্রীজ কেনা হবেই। বোনাসের টাকা পেয়েছি শুনেই নীলিমা একমুখ খুশি নিয়ে বলে উঠলো।

ফ্রীজ! আমি এ ক'মাসে ভুলেই গিয়েছিলাম। সেই কবে কুটকুট এসে বলেছিলো, তার-পর একবারই বোধ হয় নীলিমা মনে পড়িয়েছিলো।

—সে অনেক সুবিধে, তুমি ভাবতেই পারবে না। মিঠু তো বলছিলো। মাছ, মাংস, ডিম, ফল-টল...

আপত্তির স্বরে বললাম, মাছ-মাংস তো টাটকাই পাওয়া যায়।

—ধরো একদিন বাজারে যেতে পারলে না। তারপর কমলালেবুগুলো তো আনতে না-আনতে পচে যায়।

যুক্তির অভাব নেই।—কত কম সময়ে বরফ করা যায় জানো? ওই যে অসুখের সময় তোমাকে রাত্রে ছুটতে হতো...

সত্যি, এতগুলো সমস্যা সৃষ্টি করে তার সমাধান করে দিয়েছে যে লোকটি...কে আবিষ্কার করেছিলো?

নাঃ, জিনিসটা সত্যি বড় সুন্দর। বাড়িতে ফ্রীজটা পৌঁছে দিয়ে চালু করে দিতেই মনটা ফুর্তি-ফুর্তি লাগলো। বেশ সুন্দর দেখতে কিন্তু। সাদা ধবধবে। ঘরটাও সুন্দর হয়ে উঠলো। বাঃ, বেশ দেখাচ্ছে তো। এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করছি, কাগজ পড়ছি, কথা বলছি, আর ফিরে ফিরে তাকাচ্ছি ওটার দিকে। কুটকুট যেমন পড়তে পড়তে জন্মদিনে পাওয়া খেলনাটার দিকে তাকাতো, তেমনি। আমরা দুজনেই যেন কুটকুট হয়ে গেছি। নীলিমার মনটাও খুশী। মুখে হাসি লেগেই আছে। একটু ভিতরে ভিতরে গর্বও হচ্ছে। দরকার ছিলো না, এক ডজন ডিম আর আপেল-টাপেল কিনে এনে ফ্রীজের ভেতর রেখেছে নীলিমা।

পুডিং বানিয়ে ফেললো একদিন। অত কি হবে? বাঃ, ফ্রীজ তো রয়েছে, রেখে দেবো। যদি হঠাৎ কেউ আসে, সন্দেশ তো নেই, দেওয়া যাবে।

যদি হঠাৎ কেউ আসে। যদি আসে না, এলো। মেজদি। ধুতিপাড় সাদা ধবধবে শাড়ি পরে, শুকনো মুখে। কেমন আছিস-টাছিস বলার পর ফ্রীজটা দেখলো আড়চোখে। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, সুখে আছিস দেখছি, সুখে থাকলেই ভালো। আমার যে কিভাবে দিন যাচ্ছে...

মুখ কাঁচুমাচু করে বললাম, কি যে বলো, টানাটানির শেষ নেই। সত্যি, টানাটানির শেষ নেই। পড়ার টেবিল আর স্টীলের বাসনে দেখতে না-দেখতে তিন শো টাকা উড়ে গেল। ছ' শো টাকা জমা দিয়ে এখন মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকার কিস্তি। শোধ দাও এক বছর ধরে। এদিকে ফ্রীজটা আসার পর থেকে ইলেকট্রিকের বিল যত না বেড়েছে, ফ্রীজের ভেতর কিছু না রাখলে খারাপ দেখায় বলে বাজারখরচ ডবল।

সে কথা তো মেজদিকে বলা যায় না।

মেজদি কিন্তু খোঁটা দিতে ছাড়লো না।—ঠান্ডা কল কিনেছিস, তোদের আবার টানাটানি!

মাথাটা গরম হয়ে উঠলো। মেজদির ওপর নয়, ফ্রীজটার ওপরই রেগে গেলাম।

যাবার সময় কুড়িটা টাকা চাইলো মেজদি, কিন্তু কি করে দেবো! বললাম, তুমি বুঝতে পারছো না...

—সব বুঝি রে, সব বুঝি। গরিব মেজদিটার জন্যেই টাকা নেই, এদিকে গাড়ি কর, বাড়ি কর...তোরা সুখে থাকলেই হলো।

বেশ চিবিয়ে চিবিয়ে বললো মেজদি। আর কোনো কথার জুতসই উত্তর দিতে না পেরে ভিতরে ভিতরে গজরালাম।

চলে যাবার পর বললাম, দেখলে তো। ফ্রীজ চাই! প্রায় ভেংচি কাটলাম।—কেনো এবার।

আত্মীয়স্বজন কেউ আসছিলো না, ফ্রীজটা দেখাতে না পেরে নীলিমার তৃপ্তি ছিলো না। যদি বা মেজদি এলো, কোথায় খুলে সব খুঁটিনাটি দেখাবে, খুশী-খুশী মুখে মেজদি তারিফ করবে, ছোটদাদের বাড়িতে গিয়ে গল্প করবে—তা নয়, ফ্রীজটার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলোই না।

চলে যেতেই বললাম, ফ্রীজ চাই। কেনো এবার।

নীলিমা সঙ্গে সঙ্গে ফেটে পড়লো।—সব জানা আছে, অপরের ভালো কেই বা দেখতে পারে। ওরা তো পারবেই না। শুধু টাকার সম্পর্ক।

তারপর বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর দুজনেই হেসে উঠে আলোচনা।—আচ্ছা, বিনুদের বাড়িতেও তো খবর পেঁাছে যাবে? কি বলবে বলো তো ওরা? হিংসে ঠিকই হবে। শুনুক না। সেবার একটা টেপ রেকর্ডার কিনে ওদের কি অহঙ্কার।

নীলিমা হেসে উঠলো।—আর দিদি-জামাইবাবু এসে যদি দেখে...একটা ভাঙা ঝরঝরে গাড়ি কিনেছে তাতে কি দম্ভ। নীলিমা মুখ বেঁকিয়ে ভেংচি কাটলো।—গাড়ি পাঠিয়ে দেবো, যাস একদিন! কেন, ট্রাম-বাস নেই, ট্যাক্সি নেই!

ওর মুখ ভ্যাংচানি দেখে হেসে ফেললাম। ভালোও লাগলো। তা ঠিক, ফ্রীজটা কিনে ভালোই হয়েছে।

কে কখন কোথায় কি গর্ব করেছে, কতখানি অহঙ্কার দেখিয়েছে, সব একে একে মনে পড়তে লাগলো। আর ইচ্ছে হলো তাদের সকলের চোখের সামনে ফ্রীজটা তুলে ধরি। ওটা দেখে কার মনে কতখানি হিংসে হবে ভাবলাম, দুজনে আলোচনা করলাম, হাসলাম।

শুধু থেকে থেকে মেজদির কথাটা খোঁচা দিলো। যেখানেই যায়, সকলেই মুখ বাঁকায়। নীতার বিয়েটা যদি সত্যি ঠিক হয়ে যায়, কি যে করবে ভেবে পেলাম না। আমিই বা কি করি।—আমার সব ভাই ক'টা যদি দু-পাঁচ শো করে দেয়...মেজদি বলেছিলো। দিই কি করে?

ফ্রীজটা দেখে মেজদি তো খুশী হলোই না। কিন্তু, কিন্তু ওটা দেখে কে খুশী হবে খুঁজে পেলাম না।

নীলিমা শুধু বললে, মা কিন্তু খুশী হবে।

কুটকুট ঘুমোয়নি। ইস্, ছেলেটা চুপ করে ঘুমের ভান করে পড়ে পড়ে সব শুনেছে। হঠাৎ তাই বলে উঠলো, আমি কিন্তু মিঠুপিসীকে শুনিয়ে দিয়েছি।

—ঘুমো! ধমক দিয়ে উঠলো নীলিমা।

গল্প করতে করতে আমি নিজেও কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তারপর রাত্রে হঠাৎ কেন জানি না ঘুম ভেঙে গেল। অন্ধকার, চতুর্দিক অন্ধকার। আলো নিবিয়ে দিয়ে নীলিমাও কখন ঘুমিয়েছে।

ওদিকে চাঁদটা কখন জানালার পাশ থেকে সরে গেছে। চোখ ফেরাতেই হঠাৎ শিউরে উঠলাম। মেজদি না? মেজদি? ধুতিপাড় সাদা ধবধবে শাড়ি পরা মেজদির মতো মনে হলো, অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

তাড়াতাড়ি বেডসুইচটা টিপে আলো জ্বালালাম। তরতর করে ভয়টা নেমে গেল।

না, সাদা ফ্রীজটা! তেরছাভাবে এক ফালি চাঁদের আলো পড়েছে।

নিশ্চিন্তে এতক্ষণে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম আমি।

১৩৭৫



বয়স

নিভার সঙ্গে একটি কি দুটি কথা। ব্যস্, আর তো কিছুই আমি চাইনি। তখন মনে হতো শুধু আলাপ করতে পেলেই ধন্য হয়ে যাবো। তখন মনে হতো শুধু মুখোমুখি দু-চারটি কথা বলতে পেলে আর কিছুই চাই না।

নিভাকে আসলে আমি একদিন আবিষ্কার করেছিলাম। পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাসে পড়ি তখন, গলির মোড় থেকে বের হয়ে বাস-স্টপের দিকে যেতে হলে দু-দুটো ব্যাফল ওয়ালের আড়াল। জাপানী বোমা পড়ার আতঙ্ক চলে গেছে, কিন্তু ব্যাফল ওয়ালগুলো তখনো বাড়ির দরজায় দরজায়, যেখানেই দু-এক ফালি ঘাস ছিলো, স্লিট ট্রেঞ্চের দাপটে খানাখন্দ হয়ে দুর্গন্ধ জমিয়ে রেখেছে। আর বিশাল বিশাল মিলিটারি ট্রাক ছুটছে রাস্তা কাঁপিয়ে, থেকে থেকেই, কিন্তু তা তখন সকলের গা-সওয়া হয়ে গেছে। মিলিটারি ট্রাকের আওয়াজ, দৈত্যের মতো চেহারা আমেরিকান নিগ্রোদের অশ্লীল হাসি কিংবা শিস, সাদা আমেরিকানদের এক হাত স্টিয়ারিঙ-এ, অন্য হাতে মেয়ে নিয়ে লোফালুফি।

প্রেম তখন ব্যাফল ওয়ালের আড়ালে চলে গেছে। প্রেম আছে তা আমরা জানতাম না, কিংবা ভুলতে বসেছিলাম।

সুকুমার বলেছিলো, পাঁচ টাকায় কাল একটা দিব্যি সুন্দর মেয়ে পেয়েছিলাম আমরা, তুই ছিলি না।

সব জিনিসের দাম তখন বাড়ছে হু-হু করে, চাল চিনি কেরোসিন উধাও, শুধু একটা জিনিস শুনতাম খুব সস্তা, খুব সস্তা।

যুদ্ধ আমাদের দেশটার সর্বনাশ করে দিলো বলে আমরা সব ক'জন বন্ধু হা-হুতাশ করতাম, দুঃখ পেতাম, তর্ক করতাম রাজনীতি নিয়ে। আবার অজিত কিংবা সুকুমার সন্ধ্যে-বেলায় লেকের ঘাসে বসে আধা-অশ্লীল রসিকতার ফাঁকে ফাঁকে খবর বিনিময় করতো। ভট্চাযকে ধরে চল্ না একদিন, বাড়িটা দেখে এসেছি, কাশীবাবুর মাসীর বাড়িতে।

অজিত বলেছিলো, দারুণ। ভট্চায নিয়ে এসেছিলো। তুই ছিলি না।

সত্যি বলতে কি, ঐ একটা দিন ওদের আড্ডায় না যাওয়ার জন্যে আমার অনুশোচনা হয়েছিলো। জীবনের, আমার একুশ বছরের জীবনের প্রচণ্ড একটা অভিজ্ঞতা থেকে আমি যেন বঞ্চিত হয়েছি।

সুকুমার বলেছিলো, অম্লান, ভাবিস না আবার একদিন...

আমি হয়তো ভিতরে ভিতরে সেই দিনটার অপেক্ষায় ছিলাম। প্রেম কি তা আমি জানতাম না। শুধু জানতাম, নারীর শরীরের মতো রহস্য আর কিছুই নেই, কোথাও নেই। শুধু জানতাম, এই যুদ্ধের বাজারে একটা জিনিসই খুব সস্তা, খুব সস্তা।

সুকুমার, অজিত আর আমি, আমি অম্লান বসু, তখন পোস্ট গ্র্যাজুয়েটের ছাত্র। কলকাতার মানুষগুলোকে তখন আমরা দু ভাগ করে নিয়েছি। এক দিকে আমরা, যারা চাল চিনি কেরোসিনের জন্য এতটুকু চিন্তিত নই। আপিস থেকে যাদের থলি-ভরতি সস্তার র্যাশন আসে। কিংবা ব্ল্যাকের দামে তা যোগাড় হয়ে যায়। আরেক দল—যাদের র্যাশন আসে কি না-আসে আমরা জানতাম না।

—অম্লান, আমরা আসলে কিন্তু ডক্টর জেকিল আর মিস্টার হাইড। সুকুমার বলেছিলো।

—আমরা যখন একা তখন আমরা ভালো, আমরা যখন ঐ আমেরিকান সৈনিকগুলোর মতো একজোট হই আমরা তখন অন্য মানুষ। অজিত বলেছিলো।

আমরা যখন একা তখন আমরা ভালো।

নিভাকে প্রথম যেদিন আবিষ্কার করলাম সেদিনও আমি একা। কলেজ যাবার মুখে ব্যাফল ওয়াল পার হয়ে বাস-স্টপের দিকে যাবো হঠাৎ সমস্ত শরীরে-মনে কি যেন ঘটে গেল। আমি তাকে দেখলাম। আমি তাকে আবিষ্কার করলাম।

তখন নিভার নাম জানতাম না।

কাছেই একটা মেয়েদের মর্নিং কলেজ ছিলো। তাদের তখন ছুটি হয়েছে। ঠিক এই সময়েই তাদের ছুটি হতো। কিন্তু কোনো দিন নিভাকে দেখিনি।

সেই প্রথম দেখলাম। ওর সঙ্গে আরেকটি মেয়ে ছিলো। দুজনে হেসে হেসে হেলে-দুলে হাঁটছিলো। একবার বুঝি চোখাচোখি হলো।

—সুকুমার, আমার আজ আর কিছু ভালো লাগছে না। চোখ বুজলেই কেবল সেই মুখ, সেই হাসি মনে পড়ছে।

—অজিত, বিশ্বাস করো, মেয়েটা আমার দিকে যখন তাকালো একবার, একবারই চোখা-চোখি হয়েছে, কিন্তু আমার বুকের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে কি যেন বিঁধে গেল।

মনে হলো, আমি যেন এত দিন ধুলোচাপা একটা গ্রামোফোনের রেকর্ড ছিলাম। কে যেন এসে সেটা চালিয়ে দিয়েছে, আমি গান হয়ে গেছি।

পরের দিন, ঠিক পরের দিন। আমি বারবার ঘড়ি দেখলাম। ঠিক একই সময়ে গিয়ে দাঁড়াতে হবে, তা না হলে দেখা পাবো না। শুধু একবার চোখের দেখার নেশায় আমাকে পেয়ে বসলো।

ছিপছিপে সুন্দর শরীর, কিন্তু তার চেয়েও সুন্দর মুখ। টিকলো নাকে, চোখের তারায়, ফর্সা মুখে একটা অসাধারণ লাজুক-লাজুক ভাব। তার হাঁটার ভঙ্গিটি সপ্রতিভ, কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে যেন লাজুকতা ঝরে পড়ছে।

কোনো দিন দেখা হতো, কোনো দিন হতো না। যেদিন ও চোখ চেয়ে একবার অন্তত আমার দিকে তাকাতো না, সেদিন আর কিছুই ভালো লাগতো না।

আমার কেবলই মনে হতো হঠাৎ ওর সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে কিছু একটা কথা বলি। আমি কেবলই সুযোগ খুঁজতাম কোন্ দিন ও একা হবে। কোন্ দিন ওর সঙ্গের বন্ধুটি থাকবে না।

আমি যে ওকে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেছি তা ওর চোখ এড়ায়নি। একদিন আমার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে পাশের মেয়েটিকে কি যেন বললো। সে ফিরে তাকিয়ে আমাকে দেখালো, হাসলো। আমি ভিতরে ভিতরে সেদিন বোধ হয় ওর ওপর খুব রেগে গিয়েছিলাম, কিংবা লজ্জা পেয়েছিলাম।

—অম্লান, তুই একটা বোকা, বোকা। ডেকে কথা বললেই তো পারিস। অজিত বলে-

ছিলো।

আমি বড় ভীতু ছিলাম, কথা বলতে সাহস পেতাম না।

ঠিক এমনি সময়ে আমাদের গলিতে একটা বাড়ি খালি হলো। আর দিন কয়েক পরেই দেখি খাট-আলমারি-আসবাবে ঠাসা একটা লরী এসে দাঁড়িয়েছে সেই বাড়িটার সামনে। ও বয়সে পাড়ায় কোনো নতুন ভাড়াটে এলেই মনের মধ্যে একটা জিজ্ঞাসাই উঁকি দেয়। একটাই প্রশ্ন।

ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠেই বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছি, সেই নতুন ভাড়াটেদের দরজাটা খুট করে খুলে গেল। আমাদের ডিক্‌শনারিতে দুটো শব্দ ছিলো, 'ভোর' আর 'সকাল'। কিন্তু ছাপা অভিধানে আরেকটা শব্দ দেখতাম—'ঊষা'। 'ঊষা' বলতে ঠিক কি বোঝায় আমি জানতাম না। সে কি, শুধুই আঁধার-কাটানো রূপের ঝলক?

নতুন ভাড়াটেদের রাস্তার দিকের একতলার দরজা খুট করে খুলে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে আমার মন বললো, ঊষা, ঊষা।

সমস্ত শরীরে একটা খুশির বিদ্যুৎ বয়ে গেল, একটা আনন্দের চমক। আরে, এ যে সেই মেয়েটি!

সেও তখন অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়েছে। তার এলোমেলো সুন্দর চুল, ঘুম-জাগা চোখ, শাড়ির ভাঁজে নরম ঘুম-জড়ানো আটপৌরে সজীবতা।

অবাক হয়ে সে আমার দিকে তাকালো, পরক্ষণে সলজ্জ চোখ মাটির দিকে নামিয়ে সহজ হলো, কিন্তু তার ঠোঁটের কোণে একটা মৃদু হাসি এক পলকের জন্য কাশফুলের মতো দুলে উঠলো।

তারপর সে আবার দরজার আড়ালে চলে গেল। কপাট বন্ধ হলো। আর খুট করে আবার শব্দ হলো খিল তুলে দেওয়ার।

প্রেম বোধ হয় একটা নেশা। তা না হলে একটা ঘোরের মধ্যে আমার দিনগুলো কেটে যাবে কেন। ভোরবেলায় ওঠা আমার একটা নেশা হয়ে দাঁড়ালো, কারণ প্রতি দিন ভোরে একবার ও দরজা খুলে দাঁড়াতো। যেন আমার নির্বাক পুষ্পার্ঘ্য নেবার জন্য এই সময়টিতে দেখা দিতো। তারপর একসময় দেখতাম বইখাতা হাতে নিয়ে ও কলেজে চলেছে।

আমার যখন কলেজ, ওর তখন কলেজ ছুটি। ঠিক সময়টাতে ওরা দু বন্ধু গম্ভীর মুখ করে আমাকে দেখতে না পাওয়ার ভান করে, পায়ের নখ দেখতে দেখতে পার হয়ে যেতো।

একদিন দেখি ফুটপাথের দোকান থেকে ও কি যেন কিনছে। আর সঙ্গের বন্ধুটি আমাকে দেখতে পেয়েই বললো, এই নিভা, তাড়াতাড়ি আয়!

নিভা। বাঃ, সুন্দর ছোট্ট নাম তো। নিভা নামটা আমি মনে মনে বারবার উচ্চারণ করলাম। আর নিভা তখন দোকান থেকে বেরিয়ে এসেই আমাকে দেখে হেসে ফেলে বন্ধুটিকে কানে কানে কি যেন বললো।

আমি বাস-স্টপে দাঁড়িয়ে আরেকবার ফিরে তাকালাম। আর ঠিক সেই মুহূর্তে নিভাও ফিরে তাকালো।

সুকুমার শুনে বললো, ডেকে কথা বললেই তো পারিস।

অজিত বললো, আমি একজনকে চিঠি ছুঁড়ে দিয়েছিলাম, সে কুড়িয়ে নিয়েছিলো।

আমি ভেবে পেতাম না তার বন্ধুর সামনে কি করে ডেকে কথা বলবো। আমি বুঝতে পারতাম না, কথা বলতে গেলে নিভা রেগে যাবে কি না। তাই রাত জেগে আমি অনেক কাগজ নষ্ট করে একটার পর একটা চিঠি লিখলাম। পরের দিন ভোরবেলায় দরজা খুলে নিভা এসে দাঁড়াতেই চিঠিটা গুলি পাকিয়ে ছুঁড়ে দিলাম তার দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে নিভার মুখে কেমন একটা কঠিন রূঢ়তার ছাপ পড়লো। ও দরজা বন্ধ করে ভিতরে ঢুকে গেল। আর চিঠিটা একটু পরেই হোস-পাইপের জলে কাগজের নৌকা হয়ে ভেসে ভেসে গিয়ে একসময় টুপ করে ডুবে গেল।

আমার বুকের মধ্যে তখন একটা বিষাদের কান্না।

আমি অজিতের উপর খুব চটে গিয়েছিলাম। আমি নিজের ওপর আরো বেশী ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, একটি সুন্দর স্বপ্নকে আমি নিজেই ভেঙে টুকরো টুকরো করে

দিয়েছি।

কিন্তু সন্ধ্যেবেলায় কলেজ থেকে ফিরে দেখলাম ওর পড়ার টেবিলের সামনের জানালা প্রতি দিনের মতোই খোলা। টেবিল ল্যাম্পের কড়া আলোয় ওর ফর্সা মুখ তেমনি উজ্জ্বল। প্রতি দিনের মতোই বইয়ের পাতা খুলে ও বারবার আমার দিকে ফিরে ফিরে তাকালো।

আমি আবার যেন নতুন করে আশা দেখতে পেলাম।

কিন্তু, আমি ভীতু, আমি ভীতু। কোনো দিনই আর সাহস করে আমি এগিয়ে যেতে পারলাম না। কোনো দিনই এগিয়ে গিয়ে দু-একটি কথা বলতে পারলাম না।

—প্যারাডাইস লস্ট, প্যারাডাইস লস্ট।

ওরা দুজনে হেলে-দুলে কলেজ থেকে ফিরছিলো। বন্ধুটি হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলে বললো, প্যারাডাইস লস্ট, প্যারাডাইস লস্ট।

দোতলা বাসের সামনের সীটে বসে আছি, হু-হু হাওয়ায় চুল উড়ছে। আমি রহস্যের চাবি খুঁজছি। কেন বললো ও ঐ কথা দুটি? নিছক মিলটনের কোনো কলেজ-পাঠ্য কাব্যের নাম? নাকি গূঢ় কোনো অর্থ বোঝাতে চাইলো বন্ধুটি? তবে কি ওকে সেদিনের সেই চিঠি ছুঁড়ে দেওয়ার কথা বলেছে নিভা? আমার মন কেবলই বলতে চাইলো...কি বলতে চাইলো আমি জানি না, শুধু জানি, আমার সমস্ত শরীরের মধ্যে তখন একটা শিহরন খেলে যাচ্ছিলো।

পরের দিন কানে এলো নিভা তার বন্ধুকে বলছে, প্যারাডাইস লস্টের পর কি রে?

—প্যারাডাইস্ রিগেন্ড্। বন্ধুটি বললো।

সুকুমার শুনে বললো, বেশ আছিস তুই, আমার কিন্তু ওসব বাল্যপ্রেম ভালো লাগে না।

অজিত বললো, ইস্কুলে পড়ে নাকি রে?

আমি রেগে গেলাম। প্রতিজ্ঞা করলাম, আমার গোপন দুঃখ, গোপন আনন্দ আমি শুধু আমার নিজের মধ্যেই লুকিয়ে রাখবো।

আমার ভাবতে ইচ্ছে করলো, নিভা সেদিন সেই চিঠিটা কুড়িয়ে নেয়নি, কিংবা তার তাৎক্ষণিক রাগ আসলে একটা অভ্যাসের সঙ্কোচ। ও হয়তো তার জন্যে অনুশোচনা বোধ করছে, হয়তো মনে মনে চাইছে আমি এগিয়ে গিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলি।

কিন্তু আমি নিজেই যে তখন সঙ্কুচিত। এত দিন সে দূরে দূরে ছিলো, কথা বলতে গেলে সে যদি কোনো অপমান ছুঁড়ে দিতো তা হলেও লজ্জা ছিলো না। কিন্তু এখন সে আমাদের পাড়ায় উঠে এসেছে। একদিন রীতার সঙ্গে দু-চারটে কথা বলতেও দেখেছি। রীতা আমার ছোট ভাগনী। রীতার কাছে, বাড়ির সকলের কাছে সেই অপমানের কথা যদি পেঁছে যায়...

না, তার চেয়ে আমি আমার মনের গভীরে ভালোবেসে যাবো। কোনো দিন নিভাকে চিঠি লিখে জানাতে যাবো না, কথা বলতে চাইবো না। তবু কেবলই ইচ্ছে হতো নিভার সঙ্গে একটি কি দুটি কথা বলি।

কি বোকা আমি, কি বোকা আমি। হঠাৎ একদিন রাস্তায় নিভার সেই বন্ধুটির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে হাসলো, যেন বহু দিনের পরিচিত কোনো লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে এমনিভাবে। আমি হেসে ফেললাম। তারপর কি হলো কে জানে, আমি এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ তাকে বললাম, আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিলো।

মেয়েটি চোখ কপালে তুললো, শ্রাগ করার মতো করে উন্নাসিক হেসে বললো, আমার সঙ্গে?

কথা বলতে গিয়ে আমার গলার স্বর গাঢ় হয়ে গেল। আমি বললাম, আমি শুধু নিভার সঙ্গে একদিন দেখা করতে চাই।

মেয়েটির চোখে একটু সহানুভূতি নামলো।

তারপর ধীরে ধীরে বললো, দেখবো, বলে দেখবো।

পরের দিন আমি আর নিভার মুখোমুখি হতে পারলাম না। অদ্ভুত একটা ভয় আমাকে তার কাছে যেতে দিলো না। আমি অপেক্ষা করলাম, অপেক্ষা করলাম। নিভা গলির মোড়ে বাঁক নিলো, আর তার বন্ধু সীতা ধীরে ধীরে একা-একাই হেঁটে আসছে দেখতে পেলাম। আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে ছুটে গেলাম।

সীতার গলার স্বরে সমবেদনা ঝরে পড়লো।—ও একটা...জানেন, ওর মতো দাম্ভিক

আমি খুব কম দেখেছি। আপনি দুঃখ পাবেন না। সীতা আমাকে সান্ত্বনা দেবার মতো করে বললো।

সমস্ত শরীর তখন লজ্জায় দুঃখে থরথর করে কাঁপছে। মাথা ঘুরছে আমার। মনে হলো আমি তক্ষুনি টলে পড়ে যাবো।

সীতা ধীরে ধীরে বললো, ও শুনে আমার ওপরই রেগে গেল। রেগে যাবার কি আছে আমি জানি না। সে তো দেখা করে বললেও পারতো কিছু। আমি হলে বরং দেখা করে সান্ত্বনা দিতাম।

সীতার একটা কথাও তখন আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে না। সীতার কাছেই যেন আমার সবচেয়ে বেশী লজ্জা।

তারপরও মাঝে মাঝে সীতার সঙ্গে দেখা হতো। দু-একটা কথা সে নিজেই বলতো, আমি সাড়া দিতাম।

এমনিভাবে চলতে চলতেই কি করে জানি না একদিন সীতার সঙ্গে দেখা করার, কথা বলার নেশায় পেলো আমাকে। আমি হয়তো সীতাকে ভালোবেসে ফেললাম। সীতাকে?

আমি জানি না। তাই যদি হবে তা হলে হঠাৎ যেদিন দেখলাম নিভাদের বাড়ির ছাদে প্যান্ডেল বাঁধা হচ্ছে, যেদিন শুনলাম নিভার বিয়ে, সেদিন আমি আবার নতুন করে লজ্জা পেলাম কেন! কেন আমি সানাইয়ের শব্দ শুনে সারাটা দিন ঘরের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখলাম।

জানি না, জানি না।

হয়তো প্রতিশোধ নেবার জন্যেই সীতাকে একদিন বিয়ে করে বসলাম। নিভা তখন অনেক দূরে চলে গেছে, সীতার সঙ্গে তার আর কোনো যোগাযোগও নেই। নিভার কথা সে কোনো দিন আর তোলেনি। সে হয়তো ভেবেছিলো আমিও নিভার কথা একেবারেই ভুলে গেছি।

ভুলেই গিয়েছিলাম।

আজ এত দিন বাদে আবার সব মনে পড়ে গেল।

এত দিন বাদে? হ্যাঁ, তখন আমার কতই বা বয়স ছিলো, একুশ-বাইশ।

দেশপ্রিয় পার্কের মোড়ে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। দুটি বড় বড় মেয়ে আর একটি বছর পনরোর ছেলে ট্রাম-লাইন পার হচ্ছিলো, সঙ্গে বেশ বয়স্কা একজন মহিলা। মহিলাটির দিকে তাকিয়ে আমি চমকে উঠলাম। নিভা, নিভা। কানের পাশের চুল সাদা হয়ে গেছে, শরীরে বয়সের মেদ, কিন্তু মুখটি আজও সৌন্দর্যের স্মৃতি হয়ে আছে। শুধু চোখের দৃষ্টিতে সেই লাজুকতা নেই।

নিভা চোখ তুলে তাকালো, আমার মুখের ওপর দিয়ে তার দৃষ্টি একবার পিছলে গিয়েই আবার ফিরে এলো। আর সঙ্গে একমুখ হাসি নিয়ে যেন বহুকালের পরিচিতের মতো এগিয়ে এলো নিভা।—অম্লানদা, আপনি? কি আশ্চর্য, কেমন আছেন?

আমার সমস্ত শরীর তখন থরথর করে কাঁপছে। আনন্দে, বিস্ময়ে।

—তোমার কথা বলো। কেমন আছো?

অনর্গল কথা বলে গেল নিভা। ছেলেমেয়েদের কাছে পরিচয় দিলো।—অম্লানদা, প্রণাম করো।

তারপর হঠাৎ বললো, চলুন, চলুন, এখানেই আমার বাড়ি।

আমার অনিচ্ছার যেন কোনো দামই নেই। জোর করেই যেন টেনে নিয়ে গেল নিভা। জানি না, জানি না। হয়তো ভিতরে ভিতরে ওর সুন্দর বাড়ির সুন্দর ঘরগুলো আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিলো।

অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ আমরা বসে বসে গল্প করলাম। বাইরে তখন ভীষণ বৃষ্টি। অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়ছে।

মাঝে মাঝে নিভা উঠে গিয়ে সংসারের কাজ করছিলো। ছেলেমেয়েদের শাসন করছিলো। বৃষ্টি থামতেই আমি উঠে দাঁড়ালাম।

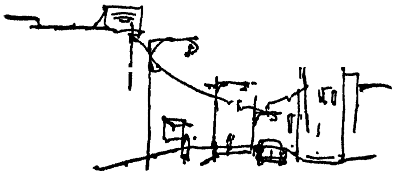
সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো নিভা। পাশে পাশে। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ও আমার চোখের দিকে তাকালো। হঠাৎ হাসলো। তারপর বললো, আমরা কেউই ভুল করিনি,

না অম্লানদা!

আমি কি জবাব দিয়েছিলাম, জবাব দিয়েছিলাম কি না জানি না।

আমার সমস্ত জীবনের বঞ্চনার ঘর যেন হঠাৎ ভরে উঠেছিলো। কিন্তু নিভার সঙ্গে দেখা হয়েছে, নিভা আমার সঙ্গে কথা বলেছে, সীতাকে একবারও তা বলতে পারলাম না।

[১৩৭৫



শেষ বৃষ্টি

খসখস করে প্যাডের কাগজে বার কয়েক নিজের নাম লিখলো জয়ন্তী। তারপর বার দুই পিঠে হেলান দিয়ে চেয়ারটাকে দোলনার মতো দোলালো। মন আজ ওর বেশ ফুর্তি-ফুর্তি। নিজের টেবিলে ফাইল-টাইল আজ অনেক আগেই গুটিয়ে ফেলেছে। না, আসলে আজ ওর মন ফাইলপত্তর খোলেইনি।

জয়ন্তী। জয়ন্তী আবার একটা নাম নাকি। কোনো দিনই ওর কাছে বেশ পছন্দসই মনে হয়নি, প্যাডের কাগজে লেখা নামটার দিকে তাকিয়ে এখন, আজ, আরো খারাপ লাগছে।

মা তো তখন বেঁচে ছিলো, ও ইস্কুলে, ক্লাস নাইনে বোধ হয়, একদিন হাসতে হাসতে বলেছিলো, ক্লাসের সবারই কত সুন্দর সুন্দর নাম, আমার কিনা জয়ন্তী। বলে বোধ হয় ঠোঁট উলটেছিলো ও। তখন ও সব ব্যাপারেই ঠোঁট ওলটাতো।

ছোটদা কাছেই ছিলো, বলেছিলো, কেন রে, জয়ন্তী তো বেশ ভালো নাম।

মা বলেছিলো, আমাকে বলছিস কেন, তোর সেজমাসীর কাণ্ড, কোন্ একটা উপন্যাস ঘেঁটে বের করেছিলো।

ছোটদার কথাটা এখন মনে পড়তেই ভাবলো, না, জয়ন্তী নামটা খারাপ হবে কেন। কিন্তু ছোটদা কি সেল্ফিশ। বিয়ে করে বউ নিয়ে রাউরকেলায় চলে গেল, এখন আর খবরও নেয় না চিঠি লিখে, আর মা কিনা ভেবেছিলো কেউ না দেখে, ছোটদা দেখবে আমাকে, বিয়ের ব্যবস্থা করবে।

মা মারা গেছে অনেক দিন, তবু আজকাল হঠাৎ এক-একসময় মা-র ওপর খুব রাগ হয় ওর। মা অত খুঁতখুঁতে, অত সাবধানী ছিলো বলেই তো ও এমন জবুথবু হয়ে গেছে। ছেলেদের সঙ্গে বেপরোয়া হয়ে মিশতে ভয় পায়। তা না হলে কলেজে পড়ার সময় সেই যে ছেলেটা, মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে থাকতো ...জয়ন্তী একবার অতীশের দিকে তাকালো। দূরের একটা টেবিলে মাথা গুঁজে টেবিল-জোড়া পে-শীটের পাতায় টিক দিয়ে যাচ্ছে অতীশ।

জয়ন্তীর বাঁ দিকে আরো তিনখানা ছোট ছোট টেবিল, তারপর একটা বিশাল জানলা। বাড়িটা অনেক কালের পুরোনো তো, তাই জানলা-দরজা বেশ বড় বড়। কিন্তু তার ওপাশেই একটা ম্যাচবক্স প্যাটার্নের নতুন বাড়ি উঠে জানলার প্রায় সবটুকুই ঢেকে দিয়েছে। তার ছাদের ওপর থেকে মাত্র এক ফুট বাই চার ফুট চৌকো আকাশ দেখা যায়। আকাশের দিকে জয়ন্তী একবার তাকিয়ে দেখলো। আজ বারবার দেখছে।

দুপুর থেকেই টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। টিপটিপ বৃষ্টিকে ওর অবশ্য ভয় নেই। টেবিলের ওপর রাখা ফোল্ডিং ছাতাটার দিকে তাকিয়ে ভরসা পেলো। বেগুনী রঙের ছোপ-

ছোপ নকশার ফোল্ডিং ছাতাটা অনেক কষ্টে কিনেছিলো। তেত্রিশ টাকা বলেছিলো নিউ মার্কেটে, দরদস্তুর করে শেষ অবধি উনত্রিশ টাকায় পেয়েছিলো। আপিসের তৃপ্তিদি দাম জিগ্যেস করেছিলো, ও বলেছে সাঁইত্রিশ। উনত্রিশ আসল দাম হলেও সে মাসে ওর খুব টানাটানি গিয়েছিলো।

ছাতাটা একবার হাত দিয়ে ছোঁবার ইচ্ছে হলো বলেই হয়তো সেটাকে বাঁ দিক থেকে এনে ডান দিকে রাখলো। ছাতাই এখন ওর একমাত্র ভরসা। মারাঠী না কারা যেন স্বামীকে ছত্রধর বলে! না, ছাতা-টাতা এখন আর হবে না, একটা সঙ্গী, মানে বন্ধু...ঠিক কি যে চায় ও, জয়ন্তী নিজেই জানে না। শুধু এইটুকু বুঝতে পারছে ও এখন বিয়ে করতে চায়। তার একটা সম্ভাবনা আবার এসেছে বলেই মনটা আজ বেশ খুশী-খুশী।

দিদি-জামাইবাবু একটা সম্বন্ধ এনেছে, আজ সন্ধ্যে সাতটায় দিদির বাড়িতে আসবেন ভদ্রলোক। জয়ন্তীকে দেখতে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কিছু জিগ্যেস করেছিলো ও, জামাইবাবুর সব কথাই তো রহস্য, ভদ্রলোকের চেহারাটা ওর কাছে কিন্তু একটুও স্পষ্ট হয়নি। তবে নামটা খুব ভালো লেগেছে—আলোক। তার নামটা ভালো লেগেছে বলেই নিজের নামটা পুরোনো মনে হচ্ছিলো।

খবরটা ও কাউকেই জানায়নি, জানায় না। তৃপ্তিদিকেও না।

তৃপ্তিদি জানে না বলেই জিগ্যেস করেছিলো, কি রে জয়েন, এমন উড়ু-উড়ু কেন আজ, অতীশের সঙ্গে কিছু এগিয়েছে নাকি?

তৃপ্তিদি ঠিক ধরেছেন, আজ ওর মন সত্যি উড়ু-উড়ু। হালকা এক পোঁচ পাউডার মুখে লেগে থাকার মতো একটু হাসি লেগে আছে। চোখ দুটো এক ফাঁকে দূরে বসা অতীশকে ছুঁয়ে হাতলাট্টুর মতো ফিরে আসতেই ওর হাসি পেলো। অতীশের কালো টুথব্রাশের মতো গোঁফ অবশ্য এখন আর তেমন খারাপ লাগে না। দেখে দেখে সহ্য হয়ে গেছে।

আচ্ছা, অতীশ ওকে সেদিন কি বলতে চেয়েছিলো? বলে ফেললেই তো পারতো। জয়ন্তী অবশ্য রাজী হতো না। কেরানীকে বিয়ে করার কথা ও ভাবতেই পারে না। তবু, শুনতে ভালোই লাগতো।

একবার টিপটিপ বৃষ্টির ঘষা-কাঁচ আকাশের দিকে তাকিয়ে অলকার দিকে তাকালো ও। কেন যে অলকাকে সকলে সুন্দরী বলে ও বুঝতেই পারে না। আসলে বয়স তো কম, অত রঙচঙে শাড়ি পরে, তাই। স্মার্ট! স্মার্ট না ছাই, আসলে চালু খুব, অতীশের সঙ্গে কেমন ন্যাকা-ন্যাকা কথা বলে। আর অতীশেরই বা ওর সঙ্গে অত কথা বলার কি দরকার! বলুক গে, অতীশ সম্পর্কে ওর তো আর বিশেষ কোনো দুর্বলতা নেই।

—আচ্ছা তৃপ্তিদি, ছেলেদের নাম আপনার কিরকম পছন্দ বলুন তো।

দুপুরে মাদ্রাজী রেস্টুরেন্টে কফি খেতে যায় ওরা সব ক'টা মেয়ে। সেখানে গল্প করতে করতে জয়ন্তী হঠাৎ জিগ্যেস করেছিলো।

তৃপ্তিদি হেসে বলেছিলেন, অতীশ নামটা তো গ্র্যান্ড।

অতীশকে নিয়ে সকলে এত ঠাট্টা করতো বলেই নিজের অজান্তে দু-চার দিন অতীশ সম্পর্কে ও ভাবতে শুরু করেছিলো। অথচ অতীশ ওর দিকে তাকালে, কিংবা কারও সঙ্গে ওকে নিয়ে কিছু আলোচনা করেছে শুনলে ও ভিতরে ভিতরে ভীষণ রেগে যেতো। আবার তৃপ্তিদির কাছে সে কথা শুনতেও ভালো লাগতো।

কিন্তু আজ আর ওসব কিছু ভাবতে ইচ্ছে করছে না। আজ ওর সমস্ত মন পড়ে আছে দিদির বাড়িতে, ঘড়ির কাঁটায়। সন্ধ্যে সাতটায় আলোক আসবে। আলোকের চেহারাটা ও একটু ভেবে নিতে চেষ্টা করলো। আচ্ছা, ভদ্রলোকের বয়স তো বত্রিশ, জামাইবাবু বলেছিলেন, কিন্তু বয়স শুনে চেহারা কেমন হবে ভাবা যায় নাকি। মা-র তো সবেতেই আপত্তি ছিলো, জামাইবাবুকে আর সকলের মতো সঞ্জয়দা বলাতেও আপত্তি। মা মারা যাওয়ার পর একদিন বলেওছিলো, এই জামাইবাবু, এবার থেকে আপনাকে সঞ্জয়দা বলবো। ব্যস্, দিদি কপাল কুঁচকে এমনভাবে তাকিয়েছিলো! জামাইবাবুর সঙ্গে রসিকতা দিদি একদম পছন্দ করে না। তাই রসিকতা করেও যে জিগ্যেস করবে আলোক নামের লোকটি কালো না ফর্সা তারও উপায় ছিলো না। কালোয় অবশ্য জয়ন্তীর এখন আর তেমন আপত্তি নেই। ছেলেবেলায় সকলেই

তো বোকা থাকে, তা না হলে মামাবাবু যখন একবার সম্বন্ধ এনেছিলেন, কালো শুনেই ও বেঁকে দাঁড়িয়েছিলো। কি ভুলই না করেছে।

—মিস দাস, আমার সেই ফ্রেন্ডের দরখাস্তটা চেপে বসে রইলেন, দিন না আজ সাহেবের কাছে পাঠিয়ে। দীননাথ এসে দাঁড়ালো জয়ন্তীর টেবিলের সামনে।

জয়ন্তী হেসে বললো, আজ না, কাল নিশ্চয় দেবো। নিজে গিয়ে সই করিয়ে আনবো।

আসলে ফাইলপত্তর ছুঁতেই ভালো লাগছে না জয়ন্তীর। সমস্ত শরীর-মন জুড়ে ওর এখন শুধুই একটা উৎকণ্ঠা। জানে শেষ অবধি কিছুই হবে না, তবু কেমন নার্ভাস-নার্ভাস লাগছে। জয়ন্তী আবার একবার আকাশের দিকে তাকালো, বোধ হয় বৃষ্টির শব্দ শুনে। আরে, এর মধ্যে টিপটিপ বৃষ্টি বেশ চেপে এসেছে, বড় বড় ফোঁটা পড়ছে। সেদিকে তাকিয়ে ওর কেমন ভয়-ভয় করলো। আরো জোরে আসবে না তো। ভয়-ভয় করলো, হাতের ঘড়িটার দিকে তাকালো, বৃষ্টি দেখলো ঠায় তাকিয়ে থেকে, আর বৃষ্টি দেখতে দেখতে গুনগুন করে উঠতে ইচ্ছে হলো। কিন্তু আপিসে বসে গুনগুন করলে আর রক্ষে আছে নাকি।

বাবার অসুখের সময় পিসীমা এসে মাকে বলেছিলো, জয়ন্তীর আর বিয়ে-টিয়ে দেবে না নাকি। কিন্তু জয়ন্তীর সমস্ত শরীর চিড়বিড় করে উঠেছিলো সেদিন। বিয়ের কথা কেউ বললেই ও রেগে যেতো। যাবে না কেন, ওর নিজেরই তো তখন বিয়ে করতে খুব ইচ্ছে হতো। অথচ বাড়িতে কেউ কোনো আলোচনাই করতো না। কিংবা ওকে এড়িয়ে বাবা-মা চেষ্টা করতো। কিন্তু পিসীমা এমনভাবে কথাটা বলেছিলো যেন জয়ন্তীর দোষ।

সেসব দিনে কেউ বিয়ের কথা বললে ওর কান্না পেতো। হ্যাঁ, একবার কারা যেন দেখতে এসেছিলো, সেটা বোধ হয় তৃতীয়বার, ছেলেটার মুখ দেখেই বুঝেছিলো ও, ওর সেদিন রাত্রে কান্না পেয়েছিলো। তারপর মা মারা গেল, বাবার অসুখ, চাকরিটা না পেলে কি যে হতো জয়ন্তী ভেবেই পায় না।

—বেশ বর্ষার দিন, আজ দল বেঁধে একটা সিনেমা দেখতে যাই চল জয়েন। দুপুরে একবার তৃপ্তিদি বলেছিলেন।

জয়ন্তী এড়িয়ে গেছে। বলেছে, বাবাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে তৃপ্তিদি। আরেকদিন যাবো...

আসলে কিছু একটা অজুহাত তো দিতেই হতো, ও তো বলতে পারতো না, আমাকে আজ দেখতে আসবে।

অতীশকে নিয়ে ঠাট্টা শুরু হওয়ার পর থেকে আজকাল ওর কেবলই ইচ্ছে হয় আপিসসুদ্ধ লোককে ও হঠাৎ একদিন অবাক করে দেয়। আচ্ছা, এমন হয় না? নিজের মনকেই যেন প্রশ্ন করলো। আলোক নাম তো বেশ সুন্দর, ভদ্রলোক দেখতেও যদি খুব সুন্দর হন, যদি...এখন তো পাঁচ-ছ' শো টাকা পায়, জামাইবাবু বলেছিলেন, কিন্তু বিয়ের আগেই হঠাৎ খুব বড় অফিসার হয়ে গেলেন...বিয়ের দিন তা হলে সব ক'টা মুখ কালো হয়ে যাবে। তৃপ্তিদি, অলকা —অলকা খুব জব্দ হবে। আর অতীশ বুঝবে কার দিকে ও হাত বাড়াতে গিয়েছিলো।

দূর ছাই, কিছু হোক আর না-ই হোক, আজ জয়ন্তীর ভীষণ ভালো লাগছে। আগে কেউ দেখতে এসে পছন্দ না হওয়ার মতো মুখ করে যখন চলে যেতো, কিংবা বলতো পরে জানাবো, তখন ওর খুব খারাপ লাগতো, বাড়িতে সবাইকে শাসাতো এর পর কেউ এলে, দেখো, ঠিক বেরোবো না। খুব রাগারাগি করতো। কিন্তু এখন...জয়ন্তীর এখন আর মনেই পড়ে না কত দিন ওকে কেউ দেখতে আসেনি। সে কথা ভেবে ওর বুকের ভেতরটা এক-একদিন খাঁ-খাঁ করে উঠতো। এক-একদিন মনে হতো আর বুঝি কেউ কোনো দিন ওকে দেখতে আসবে না।

কিন্তু আকাশের দিকে তাকিয়ে, ঝরঝর বৃষ্টির ফোঁটাগুলোর দিকে তাকিয়ে ওর মনের ভিতরটা বিরক্তিতে ভরে উঠছে। আজকের দিনটা বৃষ্টি না হলেই কি চলতো না! কত দূর থেকে আসবেন ভদ্রলোক—ভদ্রলোক কি, আলোক, আলোক—বেচারী বৃষ্টিতে ভিজে যাবে না তো! না, ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে স্বস্তি পেলো ও। এখনো পাঁচটা বাজতে অনেক দেরি, তার আগে নিশ্চয়ই বৃষ্টি থেমে যাবে। তা ছাড়া জয়ন্তী বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতেই নয় যাবে, ওর ফোল্ডিং ছাতাখানা কতটুকুই বা বৃষ্টি বাঁচাবে। কিন্তু আলোক তো আসবে সেই সন্ধ্যে সাতটায়। আচ্ছা, আলোকের সঙ্গে কি কেউ আসবে? কোনো বন্ধু-টন্ধু কিংবা দাদা-

ভগিনীপতি—তার বউদি-টউদি কেউ আসবে না তো! মেয়েরা কেউ এলেই বড় অস্বস্তি লাগে, বড্ড খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে, নানান কথা জিগ্যেস করে, কত সাবধান হয়ে উত্তর দিতে হয়, কোন্ কথার কি মানে বের করবে কে জানে!

হঠাৎ এক দমকা বাতাস ঢুকে ঘরের কাগজপত্তর ধুলোবালি সব উড়িয়ে দিলো সেই মুহূর্তে, আর আপিসসুদ্ধ সবাই উল্লাসে চিৎকার করে উঠলো। বাতাসটা ঝড়ো, ঠান্ডা। জয়ন্তী তাকালো জানলার দিকে, জানলার ছোট্ট আকাশের দিকে। আকাশে কালো কালো মেঘ, জয়ন্তীর মুখেও নামলো। কি আশ্চর্য, আজকের দিনটায় এমন বৃষ্টি না নামলে কি চলতো না! ভীষণ জোরে যদি বৃষ্টি আসে, রাস্তায় জল জমে যদি জ্যাম হয়ে যায়—না, জয়ন্তীকে যেমন করে হোক সাতটার আগে পেঁছিতেই হবে। ও ওর হাতঘড়িটার দিকে আবার তাকালো।

আলোক দেখতে যেমনই হোক, যত সাধারণ চাকরিই করুক, যদি জয়ন্তীকে পছন্দ করে, ও রাজী হয়ে যাবে। মনে মনে ভাবলো জয়ন্তী। সুনন্দা ওর পাড়ার বন্ধু, সুনন্দার মা একবার একটি ছেলের কথা বলেছিলেন, হাতে পাত্র আছে একটি, বয়স একটু...এমন কি বেশী, বলো তো দেখে যেতে বলি। ব্যস্, জয়ন্তী কি স্পষ্ট করে বলবে নাকি, কিন্তু সুনন্দার মা আর কোনো কথা বলেননি। অনেক দিন পরে বলেছিলেন, তোমাকে তো বলেছিলাম, তুমি সাড়া দিলে না। কি যে ভাবে সকলে, জয়ন্তী কি মুখ ফুটে সকলকে বলবে নাকি!

জামাইবাবু একদিন ঠাট্টা করে বলেছিলেন, আমার তো ধারণা ছিলো নিজেই ঠিক করে রেখেছো।

নিজেই তো ঠিক করে রেখেছো! যখন বয়স কম ছিলো, তখন যদি মা একটু ঠেলে দিতো তা হলে যেন পারতো না জয়ন্তী। ছোটদাও একদিন ওকে শুনিয়ে শুনিয়ে বউদির সঙ্গে গল্প করতে করতে বলেছিলো, নিজে বিয়ে করাই ভালো! শুনে সমস্ত শরীর জ্বলে উঠেছিলো ওর।

আজ কিন্তু কারও ওপর ওর কোনো রাগ নেই। আজ কেমন যেন একটু একটু আশা পাচ্ছে। এখন, হ্যাঁ, এখন তো ওর বয়স আটাশ, মধুপুরে যেবার বেড়াতে গিয়েছিলো, সেই সদানন্দ না কি নাম, হাত দেখার ছল করে বারবার ওর হাত ধরতো...সে কথা মনে পড়তেই ফিক্ করে নিজের মনেই হেসে ফেললো ও। সদানন্দ বলেছিলো, আটাশ বছর বয়সে আপনার জীবনের মোড় ঘুরে যাবে। বিয়ের কথা জিগ্যেস করতে পারেনি। তখন তো ও মাত্র বাইশ, জীবনের মোড় ঘোরানোর জন্যে ও তখন ব্যস্ত ছিলো না। এখন মনে হচ্ছে ওটাই বোধ হয় বিয়ে।

নিশ্চয় ওর জন্যে একটা কিছু, সুন্দর কিছু অপেক্ষা করে আছে। তা না হলে এত বছর বাদে হঠাৎ একটা সম্বন্ধ আসবে কেন।

—মিস দাস, বাড়ি যাবেন না নাকি! অনন্তবাবু হাঁক দিলেন, হাতে ছাতা নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে জয়ন্তী উঠে দাঁড়ালো। এখনো আধ ঘণ্টা বাকী পাঁচটা বাজতে। তবু বৃষ্টির জন্যে সকলেই যখন উঠে পড়েছে...জয়ন্তীর তো আজ আপিসে আসারই ইচ্ছে ছিলো না।

এ ক'দিন খুব অস্বস্তিতে কেটেছে ওর। কেবল ভয় হয়েছে, আপিসের কারও যদি আত্মীয় হয় ঐ আলোক। যদি কোনোরকমে এরা কেউ জানতে পারে! এখন ভয় হচ্ছে, যদি আলোকের ওকে পছন্দ না হয়, আর তারপর এরা কেউ জানতে পারে! জামাইবাবু ওর আপিসের নাম বলেনি, কিন্তু আজ দেখতে এসে আলোক যদি জিগ্যেস করে!

সকলের পিছনে পিছনে জয়ন্তীও নেমে এলো। ফোল্ডিং ছাতাটা খুলে কাদা বাঁচিয়ে কোনোরকমে বাস-স্টপে এসে দাঁড়িয়েছে, দেখলো অতীশ ওকে দূর থেকে লক্ষ করছে।

একদিন এই বাস-স্টপেই অতীশ এসে হাজির হয়েছিলো, হঠাৎ কাছে এসে বলেছিলো, আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

তখন কে কোথায় তৃপ্তিদি অলকা ওরা দেখে ফেলে, জয়ন্তী ভয়ে কাঠ, বলেছিলো, আজ আমি ভীষণ ব্যস্ত। বলেই বাসে উঠে পড়েছিলো।

অতীশ কি বলতে চেয়েছিলো ওর শোনা হয়নি। তার জন্যে ওর বুকের মধ্যে এক-একদিন কেমন-কেমন করে। এক-একদিন ইচ্ছে হয় ডেকে জিগ্যেস করে। কিন্তু আজ সেসব কোনো ইচ্ছেই নেই। আজ আলোক ওর সমস্ত মন জুড়ে বসে আছে। শুধু আলোক নামটা। ও কল্পনার মধ্যে যার চেহারা আনতে পারছে না। আচ্ছা, ভদ্রলোকের কথাবার্তা কেমন? খুব সপ্রতিভ! নাকি লাজুক-লাজুক!

বাস-স্টপে দাঁড়িয়ে থাকতেই ঝড়ো বৃষ্টি এলো। আরেকটু হলেই হাতের ছাতাটা উড়ে যেতো। ঐ ছোট্ট ছাতায় বৃষ্টি আটকাতে পারছে না ও। জলের ঝাপটায় সর্বাঙ্গ ভিজে যাচ্ছে। কি বৃষ্টি, কি বৃষ্টি!

জয়ন্তী ভেবেছিলো আগে বাড়ি যাবে, তারপর বৃষ্টি থামলে সেজেগুজে দিদির বাড়িতে আসবে। কিন্তু বাসে উঠতে এত দেরি হবে, সমস্ত রাস্তা জ্যাম হয়ে এতখানি সময় পার করে দেবে ও ভাবতেই পারেনি।

দিদির বাড়িটা পার হয়ে যেতেই ও ঘড়ির দিকে তাকালো। দেখলো ছ'টা বেজে গেছে। নাঃ, আর বাড়ি যাওয়া হবে না। বৃষ্টি বোধ হয় থামবে না। তাই পরের স্টপে ও নেমে পড়লো। কাদাজলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে ফিরে আসতে আসতে চটিটা ছিঁড়ে গেল। বিরক্তিতে সমস্ত মন ভরে উঠলো জয়ন্তীর।

না, নেমে পড়ে ও ভালোই করেছে। বাড়ি হয়ে দিদির বাড়ি আসতে পারতো কি না তার ঠিক নেই। হয়তো দেরি হয়ে যেতো। সাতটা, সন্ধ্যে সাতটায় আলোক আসবে কথা আছে।

—ছোটমাসী, তোমার নাকি আজ ইণ্টারভিউ? দিদির মেয়ে সুমি এখন ক্লাস এইটে পড়ে। সে জয়ন্তীকে দেখতে পেয়েই হেসে উঠে বললো।

তার মা ধমক দিলো। জয়ন্তী অপ্রতিভ ভাবটা হেসে ঢাকা দিলো। বললো, আসবো না ভেবেছিলাম, জামাইবাবুর প্রেস্টিজ রাখার জন্যে আসতে হলো।

জামাইবাবু কাছেই ছিলেন, হতাশভাবে বললেন, এই বৃষ্টিতে কি আজ আর আসবে তারা!

জয়ন্তীর হাসিটা দপ্ করে নিবে যাচ্ছিলো, ও চেষ্টা করে হেসে উঠলো। বললো, জানি, তবু আসতে হলো। ভদ্রলোকরা যদি এসে ফিরে যান, তখন তো আমাকে আপনিই গালাগালি দিতেন।

কিন্তু জয়ন্তীর মন বললো, ওরা যেন আসে, ওরা যেন আসে।

তারপর সমস্ত ব্যাপারটাকে হালকা করে দিয়ে ও দিদিকে বললো, চল, চল, চা করি আগে, জলে ভিজে একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছি।

দিদি বললো, আগে কাপড়টা ছেড়ে ফেল।

একখানা আটপৌরে শাড়ি আলনা থেকে নিয়ে কলঘরে চলে গেল ও। একবার ইচ্ছে হলো দিদিকে বলে, তোর আলমারির চাবিটা দে, ভালো শাড়ি একখানা বের করে রাখি।

ফিরে এসে ও রান্নাঘরে চা করতে বসলো, কিন্তু মন কেবল বলতে লাগলো, ওরা আসবে, ওরা আসবে।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে উঠে এলো জয়ন্তী, এ-ঘর ও-ঘর ঘুরলো, আজেবাজে কথা বললো, কিন্তু ওর চোখ বরাবর ড্রেসিং টেবিলটার ওপর দিয়ে ঘুরলো। মনে মনে ভাবলো, দিদির ভায়োলেট শাড়িখানা পরবো, ভায়োলেট টিপ আছে কি না জিগ্যেস করতে লজ্জা হলো বলে ড্রেসিং টেবিলের ওপরে টুকিটাকি সব তন্নতন্ন করে দেখলো। তারপর হাতের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে টেবিলের টাইমপিসটার সঙ্গে মিলিয়ে নিলো।

জামাইবাবু রেডিওটা খুলে দিয়ে বললেন, কনে তো এসে হাজির, এখন...

জয়ন্তী হেসে বললো, আমি তো বৃষ্টি দেখে আসবো না ভেবেছিলাম, শুধু আপনার কথা ভেবে হঠাৎ নেমে পড়লাম।

জয়ন্তী একসময় দেখলো ঘড়ির কাঁটা সাতটার ঘরে। কাঁটায় কাঁটায়। ওর বুকের মধ্যে তখন যেন কি একটা তোলপাড় হচ্ছিলো।

একটা ট্যাক্সি দাঁড়ানোর শব্দ হলো, মিটারের ফ্ল্যাগ তোলার ক্রিং ক্রিং শব্দ। ওর বুকের মধ্যে আনন্দ-উত্তেজনার ঝড় বয়ে গেল।

ও অনেকক্ষণ চুপচাপ অপেক্ষা করলো। না, জামাইবাবু ফিরলেন না। তবে কি ওদের দেখে জামাইবাবু রাস্তা অবধি এগিয়ে গেছেন!

জয়ন্তী বললো, দিদি, তোর ভায়োলেট শাড়িটা দিস।

দিদি বললো, ওরা আসে কি না দেখ।

জামাইবাবু ফিরে এসে বললেন, না, পাশের বাড়ির। তারপর নিজেই বললেন, এলেও এত তাড়াতাড়ি আসতে পারবে না।

জয়ন্তী তখন একটা পত্রিকার পাতায় ডুবে গেছে, ভান করলো এমন যেন জামাইবাবুর কথা কানেই যায়নি। কিন্তু কান সজাগ, রাস্তায় একটা হর্ন কিংবা রিকশার ঠুনঠুনও একবার আশা দিয়ে মিলিয়ে গেল।

আটটা, সাড়ে আটটা বেজে গেল। বারান্দা থেকে দেখলো বৃষ্টি থেমে গেছে, কিন্তু চারদিকের অন্ধকার জলে ভিজে যেন আরো অন্ধকার হয়ে গেছে।

দিদি বললো, আর রাত করিসনে জয়েন, বাবা ভাববেন।

জয়ন্তী বললো, হ্যাঁ, এইবার যাবো। কিন্তু যাওয়ার কোনো ইচ্ছেই হলো না। এতক্ষণই যখন অপেক্ষা করেছে, আরেকটু অপেক্ষা করাই তো ভালো। যদি আলোক—না, এখন আর আলোক নয়—ভদ্রলোকরা যদি এসে পড়েন। আলোক নামের ওপর এই ক'দিন ধরে তিল তিল করে ও একটা সত্যিকারের মানুষকে গড়ে তুলেছিলো। প্রায় চোখে দেখতে পাওয়ার মতো, হাত বাড়িয়ে ছুঁতে পাওয়ার মতো। এখন সে আবার নিছক একটি লোক—আলোক নয়।

ন'টার সময় জয়ন্তী বললো, চলি রে দিদি। কাল শাড়িটা পাঠিয়ে দেবো।

অন্ধকারে রাস্তায় নেমে ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করলো ও। একবার থমকে দাঁড়ালো হেডলাইট-জ্বলা একটা গাড়ি আসতে দেখে। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে পড়ে চেয়ে রইলো দিদির বাড়ির সামনে গাড়িটা দাঁড়ায় কি না। না, গাড়িটা যেমন স্পীডে আসছিলো তেমনি স্পীডে বেরিয়ে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দ্রুত হাঁটতে শুরু করলো সামনের বাস-স্টপের দিকে। সমস্ত মন ভেঙে পড়েছে।

ওর হঠাৎ অতীশের কথা মনে পড়লো। অতীশ নিশ্চয় আবার একদিন ওর কাছে এসে বলবে, আমার কথাটা শোনার সময় হবে না আপনার!

আরে দূর। এসব কি ভাবছে ও। বাবা নিশ্চয় বসে আছে, অপেক্ষা করে আছে, কি খবর নিয়ে যায় ও তা জানবার জন্যে। বাসটা আসছে দেখে হাত তুললো, কিন্তু বাড়ি ফিরতে ওর একটুও ইচ্ছে নেই।

ফিরে গিয়ে বাবাকে কি বলবে ও। আলোকরা আসেনি, সেই কথা? বাবা শুনে নিশ্চয় ভীষণ কষ্ট পাবেন। বাবার জন্যে জয়ন্তীর ভীষণ কষ্ট হলো। ওর মনে হলো বাবার সামনে গিয়ে ও দাঁড়াতে পারবে না।

ওর মনে হলো ও তো কিছুই চায় না, চাইবার বয়েস পার হতে চলেছে। ও শুধু সকলের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে চেয়েছিলো।

[১৩৭৫



চাবি

আমার যেন কোথায় যাওয়ার কথা ছিলো। আমার হঠাৎ মনে হলো কোথাও যেন যেতে হবে। কোথায়, আমার মনে পড়লো না। আসলে আমি জেগে রয়েছি, না তন্দ্রাচ্ছন্ন, আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। এরকম আমার মাঝে মাঝেই হয়। হয়তো সকলেরই হয়। ঘুমের মধ্যে আমরা কখনো কখনো জেগে থাকি। জেগে থেকেও কখনো মনে হয়...হ্যাঁ, সন্দেহ হয় জেগে আছি কি না।

আমার তো মনে হলো আমি জেগেই আছি। শুধু চারপাশের পরিবেশ আমাকে ঘুমের মতো শীতের চাদর হয়ে জড়িয়ে আছে। আর অস্পষ্টভাবে আমার মনে হলো, আমার যেন কোথায় যাওয়ার কথা আছে। কোথায়? কোথায়? আমার কিছুতেই মনে পড়লো না। তবু আমার ভিতরটা সেখানে যাবার জন্যে ছটফটিয়ে উঠলো। আমি অন্ধকারের মধ্যে চোখ মেলে তাকিয়ে কিছু খুঁজে পাবার চেষ্টা করলাম। হাত বাড়ালেই বেড সুইচটা জ্বালা যায়, কিন্তু যা খুঁজে বের করতে চাই সে তো অন্ধকারেই আছে। অন্ধকারেই তার থাকবার কথা।

বালিশের ওপর থেকে মাথাটা তুলে কনুইয়ে ভর দিয়ে আমি ছোট্ট টেবিলটার দিকে তাকালাম। ওষুধের শিশি, বইপত্তর, অ্যাশ-ট্রে ইত্যাদির কিছুই দেখা গেল না। সব অন্ধকারে মিশে আছে। তবু আমি বেশ বুঝতে পারলাম ওগুলো আছে, কারণ ওগুলো ওখানেই ছিলো। দেয়ালে, ঐ টেবিলের বিঘতখানেক ওপরে তিনটি সাদা-সাদা রেখা দেখতে পেলাম। সেগুলো চোখের সামনে বড় হতে হতে একসময় হাসপাতালের পাশাপাশি তিনটে সাদা চাদরের বেড হয়ে গিয়ে আবার ছোট হয়ে গেল। বুঝতে পারলাম, আসলে জানালার খড়খড়ির ভিতর দিয়ে আলো কিংবা জ্যোৎস্না এসে পড়েছে। এতক্ষণে টাইমপিসটার ঝিকঝিক আওয়াজ কানে এলো, রেডিয়াম ডায়ালের সংখ্যাগুলো জ্বলছে দেখা গেল। কিন্তু আমার ঘড়ির দিকে তাকানোর একটুও ইচ্ছে হলো না। কারণ, সেই মুহূর্তে আমি চাবির গোছাটা দেখতে পেলাম, দেখে চিনতে পারলাম।

একটা গোল রিং, আর নানা আকারের পাঁচ-সাতটা চাবি তাকে ঘিরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে টেবিলের ওপর। অন্ধকার মেখে কালো কালো রঙ হয়ে গেছে তাদের। আলো-নেবানো রাস্তায় হট্টগোলের রাতে একদিন একটা ডাস্টবিনের পাশে ছ'-সাতটা লোক বন্দুকের গুলিতে এমনি ছড়ানো-ছিটানো শবদেহ হয়ে পড়ে ছিলো।

চাবির গোছাটা দেখেই আমার হঠাৎ মনে হলো, আমি বোধ হয় সেটা খুঁজে পেয়েছি। অথচ আমি কি খুঁজছিলাম কিছুতেই মনে পড়লো না।

তবু আমি ধড়মড় করে উঠে পড়লাম। দ্রুত হাত বাড়িয়ে, হাতটা ব্যগ্রতায় তখন থাবার মতো, চাবির গোছাটা চেপে ধরলাম। আর সংগে সংগে আমার মনে হলো আমি ভীষণ একা।

কয়েক মুহূর্ত আমি নিঃশব্দে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম অন্ধকারের মধ্যে।

ঘরের মধ্যে আমি একা, সমস্ত বাড়িটাই প্রাণহীন। একা। আমার মনে পড়লো, কারা যেন ছিলো। খুব আপনার জন কে কে। তারা বোধ হয় কোথাও গেছে, কোথায় মনে পড়ছে না। মনে হলো আমার কোথায় যেন যাওয়ার কথা। কোথায় যেন পৌঁছতে হবে।

চাবির গোছাটা হাতের মধ্যে ঝনঝন শব্দ করলো। সেই শব্দের মধ্যে চাবির গোছাটা কি যেন বলতে চাইলো। হয়তো মনে পড়াতে চাইলো কোথায় যেতে হবে।

কিন্তু তার আগে আমাকে কি যেন খুঁজে পেতে হবে। কি যেন খুঁজছি, অন্ধকারে। কারণ, যা খুঁজে বের করতে হয় তা তো অন্ধকারেই থাকে। আলোর মধ্যে কিছু খুঁজে বের করার কোনো মানে হয় না।

কেন জানি না, আমি চাবির গোছাটা নিয়ে গডরেজের আলমারিটার কাছে গেলাম। সেটা

খুলতে গিয়ে একটা বিচ্ছিরি শব্দ হলো। আমার মনে হলো কার ঘুম ভেঙে যেতে পারে। অথচ, আমি জানি, আমি এখন একা। সমস্ত বাড়িটা খাঁ-খাঁ করছে, কেউ কোথাও নেই।

আলমারির ডালাটা খুলতেই রাশি-রাশি পোশাক দেখতে পেলাম। রাশি-রাশি শাড়ি, ফ্রক, চাদর, রুমাল...সব, সব, অথচ আমি অন্ধকারে সত্যি সত্যি কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না।

অন্ধকারের মধ্যেই আমার ধুতি পাঞ্জাবি ইত্যাদি ছুঁয়ে আমি চিনতে পারলাম। মনে হলো অনেক দিন ধরে আমাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে এরা আমার হয়ে গেছে। মানে 'আমি' হয়ে গেছে।

আমি তাড়াতাড়ি আলমারিটা বন্ধ করলাম। তারপর টেবিলের দেরাজ খুললাম। একটার পর একটা দেরাজ। আর অন্ধকারে খসখস শব্দ...কাগজ, কাগজের স্তূপ, জমিয়ে রাখা অসংখ্য কাগজ। সেগুলো সাবধানে নাড়াচাড়া করলাম, কারণ মনে হলো সেগুলো সবই জমিয়ে রাখার মতো ভীষণ দরকারী।

দেরাজ বন্ধ করে আমি কাঠের আলমারিটার কাছে গেলাম। পাল্লায় আঁটা বিরাট আয়না একটা, আমি কিন্তু সেটার দিকে একবারও তাকালাম না। এবার চাবি লাগিয়ে আলমারি খুললাম। আলমারির মধ্যে আবার দুটো দেরাজ। একটা দেরাজ খুলতেই দেখি তার মধ্যে অসংখ্য চাবির গোছা। এক রাশ চাবির রিং, রিঙে লাগানো চাবি, চাবি, চাবি। এত চাবি কিসের। কেন, তা বুঝতে পারলাম না।

কিছুক্ষণ আমি সেই চাবির দেরাজের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

আমার মনে হলো এগুলো সব অকেজো চাবি। হয়তো তালা হারিয়ে গেছে। তালা নষ্ট হয়ে গেছে। কিংবা এ চাবি দিয়ে হয়তো কিছু খোলা যায়—ট্রাঙ্ক, স্যুটকেস, কিংবা কোনো দরজা। কিন্তু আমি তো কিছু খুলতে চাই না, আমি বোধ হয় কিছু খুঁজছি।

কি খুঁজছি আমার অস্পষ্টভাবে মনে পড়লো। বোধ হয় খুঁজছি, কোথায় যেতে হবে। কোথায়? কোথায়?

আমার হঠাৎ মনে হলো দেরি হয়ে যাবে। দেরি হয়ে যাবে।

তাড়াতাড়ি আমি জামাকাপড় বদলে নিলাম। টাকার ব্যাগটা পকেটে নিয়ে আমি খাটের তলা থেকে স্যুটকেসটা বের করলাম। খান কয়েক ধুতি-পাঞ্জাবি ভরে নিলাম স্যুটকেসে। তারপর দ্রুত আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। কেবলই মনে হতে লাগলো দেরি হয়ে যাবে।

আমি স্টেশনে এসে পেঁছিলাম। কি করে স্টেশনে এসে পেঁছিলাম আমি জানি না। আমার মনে পড়লো না।

স্যুটকেসটা হাতে নিয়ে ছুটতে ছুটতে প্ল্যাটফর্মে ঢুকলাম। মাইকের ভেতর দিয়ে একটা ঘংঘং কণ্ঠস্বর কি যেন বারবার বলছিলো। শোনবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কিছু বুঝতে পারলাম না। কোথায় যেতে হবে সে কণ্ঠস্বর তা বলছিলো না। কোন্ ট্রেন কোথায় যাবে তাও বলছিলো না। কোন্ প্ল্যাটফর্মে এসে কোন্ ট্রেন দাঁড়াবে, কোন্ প্ল্যাটফর্ম থেকে ট্রেন ছাড়বে শুধু সে কথাই বলছিলো। আমি তো কারও আসার অপেক্ষায় এখানে আসিনি। আমি তো এ জায়গা ছেড়ে চলে যেতে আসিনি। আমি কোথাও যেতে চাই, কোথাও পেঁছতে হবে আমাকে। কোথায়? আমার মনে পড়লো না।

আমি শুধু দেখলাম অসংখ্য লোক ছুটে বেড়াচ্ছে। দেখলাম কারও যেন সময় নেই। মনে হলো সবারই যেন দেরি হয়ে গেছে। এক-এক দল এক-এক দিকে ছুটছে।

আমি কিছুই ঠাহর করতে না পেরে একটা দলের পিছনে পিছনে ছুটে গেলাম।

তারা টিকিটের জানালার সামনে এসে দাঁড়ালো। আমিও দাঁড়িয়ে পড়লাম।

একে একে সকলেই টিকিট কিনলো। এক-একজন এক-একটা নাম বলছিলো।

আমার কোনো নাম মনে পড়লো না।

আমার সামনে তখন আর দুজন মাত্র। একজন বললে, আসানসোল। পরের জন বললে, বর্ধমান।

আমি বোকার মতো টিকিটবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, ঐ—ঐ।

সে জিগ্যেস করলো, আসানসোল, না বর্ধমান?

কিন্তু ও দুটো, আমার কেমন মনে হলো, শুধুই স্টেশনের নাম। কোনো গন্তব্য নয়। যেখানে পেঁছতে চাই তার নাম আছে কি না জানি না, থাকলেও আমার মনে পড়লো না।

তবু একখানা টিকিট আমার হাতের কাছে এসে গেল।

আমি দেখলাম সকলেই দৌড়চ্ছে। আমিও স্যুটকেস হাতে দৌড়তে শুরু করলাম।

ব্যাণ্ডেল, বর্ধমান, আসানসোল—আমি নানারকম স্টেশনের নাম শুনতে পাচ্ছিলাম তখনো। কোনোটা যাত্রীদের মুখে, কোনোটা সেই মাইকের ঘংঘং কণ্ঠস্বরে। কিন্তু ওগুলো তো শুধু স্টেশনের নাম, যেখানে ট্রেন কিছুক্ষণের জন্য থামবে। আমি তো থামতে চাই না, আমি কোথাও পেঁাছতে চাই। কোথায় যেন যাওয়ার কথা ছিলো।

আমি প্ল্যাটফর্মের চারপাশে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, আমার জন্যে কোনো ট্রেন আছে কি না। কোন্ ট্রেনটা আমার, আমি নিঃসন্দেহ হতে পারলাম না।

লটবহর নিয়ে জনকয়েক লোক দ্রুত হেঁটে চলেছিলো। আমিও তাদের পিছনে পিছনে দ্রুত হাঁটতে শুরু করলাম। তাদের সঙ্গে সঙ্গেই আমি একটা কামরায় উঠে পড়লাম।

কামরাটা তখন একটু ফাঁকা-ফাঁকা। আমি জানালার পাশে কোণের আসনটায় বসবার জন্যে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, ততক্ষণে অন্য একজন সেইখানে ধপাস করে বসে পড়লো।

আমার যে কোথাও যাওয়া দরকার, কোথাও পেঁাছতে হবে, সে কথা মুহূর্তের মধ্যে ভুলে গেলাম। ঐ কোণের জানালা-ঘেঁষা আসনটা না পেয়ে, কেউ একজন সেখানে আগেই বসে পড়েছে দেখে আমার সমস্ত মন বিষাক্ত হয়ে গেল। আমার মনে হলো যেন ঐ কোণের আসনটা পাবার জন্যেই আমি এসেছি।

আমি বিরস মুখে সেই লোকটার পাশে বসলাম। আমার পাশে অন্য কে কে এসে বসলো। আমি তাকিয়ে তাদের মুখও দেখলাম না। কারণ ততক্ষণে আমার চোখ সামনের দিকে, যেখানে আরো চারজন যাত্রী উঠেছে। তাদের মধ্যে একজনকে ভোরের আলোর মতো মনে হলো। সে কেমন লাজুক স্নিগ্ধ একটা বাতাস তার মুখে বারবার মেখে নিচ্ছিলো।

আমার ইচ্ছে হলো মেয়েটি আমার সামনের আসনে এসে বসুক। কিন্তু তখনই আমার মনে পড়লো, কাঠের আলমারিটায় বড় একটা আয়না সাঁটা আছে। কিন্তু আমি সে আয়নায় নিজেকে দেখিনি।

আমার ইচ্ছে হলো আয়নায় আমি একবার নিজেকে দেখে নিই। তাই আমি বারবার সেই স্নিগ্ধ মেয়েটির চোখের দিকে তাকিয়ে নিজেকে দেখতে চাইছিলাম।

আমার পাশের লোকটিকে কে যেন জিগ্যেস করলো, কোথায় যাবেন?

লোকটি উত্তর দিলো, ব্যাণ্ডেল। ওখানেই আমার বাড়ি।

আমি বোকার মতো তার দিকে তাকিয়ে রইলাম, তার কথার কোনো অর্থ বুঝতে পারলাম না। 'ওখানেই আমার বাড়ি!' কিন্তু সেখানে তো যাওয়া যায় না। বাড়ি! বাড়িতে তো আমরা বারবার শুধু ফিরে আসি। বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমরা সকলেই কোথাও যেতে চাই। সেই যাওয়ার জায়গা খুঁজে পাই না, তাই ক্লান্ত হয়ে শেষ অবধি আবার ফিরে আসি। অথচ লোকটাকে প্রশ্ন করা হলো, কোথায় যাবেন, আর লোকটা অক্লেশে বললো, ব্যাণ্ডেল। ওখানেই আমার বাড়ি।

আমি একবার স্যুটকেসটা খুলে সেদিনের খবরের কাগজটা এনেছি কি না দেখলাম। জামাকাপড়ের নীচে হাত ঢুকিয়ে খুঁজলাম, পেলাম না। তখন সেটা আবার বন্ধ করলাম।

মেয়েটির পায়ে বোধ হয় সেটা লাগছিলো, সে বললে, শুনুন!

আমি মুগ্ধ হয়ে তার দিকে তাকালাম। সে আমার সঙ্গে কথা বলেছে। সে আমাকে ডেকেছে!

সে আবার বললে, ওটা এর নীচে রেখে দিন।

আমি স্যুটকেসটা বেঞ্চের তলায় রেখে দিলাম। তারপর আমি জানালার ফাঁক দিয়ে আখের ক্ষেত, পানের বরজ, সবুজ ঘাস, শঙ্খচিল দেখতে লাগলাম।

ভোরের হাওয়া আমার খুব সুন্দর লাগছিলো। আমি ভুলে যাচ্ছিলাম, আমাকে কোথাও যেতে হবে, কোথাও পেঁাছতে হবে।

—আপনার কাছে দেশলাই আছে? আমার পাশের লোকটিকে একজন জিগ্যেস করলো। আর পাশের লোকটি নির্বিকারভাবে পকেট থেকে দেশলাই বের করে তাকে দিলো।

আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। লোকটা তো জানতে চেয়েছে দেশলাই

আছে কি না। কোনো জিনিস আমার থাকলেই কি সেটা বের করে দিতে হবে। আমি খ‌ুঁজে বের করার চেষ্টা করলাম, আমার কি আছে, আমার মধ্যে কি আছে। অথচ যেখানে যাওয়ার কথা সেখানে পে'ছিতে না পারলে আমি জানতেই পারছি না আমার কি আছে।

মেয়েটি কি একটি পত্রিকা পড়ছিলো, আর মাঝে মাঝে অন্যমনস্কভাবে আমার দিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছিলো। আমি এতক্ষণ মাঝে মাঝে ওর পায়ের নীচে বেঞ্চির তলায় রাখা স্যুটকেসটা দেখছিলাম। আমার কেবলই ভয় হচ্ছিলো, ওটা চোখের আড়াল হলেই হয়তো হাতছাড়া হয়ে যাবে।

কিন্তু আমার হঠাৎ মনে হলো, আমি অনেকক্ষণ স্যুটকেসটার দিকে তাকাইনি, মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

আমি নিজেকে নাড়া দিয়ে বললাম, না, না, আমাকে যেতে হবে, আমাকে কোথায় যেন পে'ছিতে হবে। কোথায় পে'ছিনোর কথা সেটা খ‌ুঁজে বের করতে হবে।

ট্রেনটা মাঝে মাঝে এক-এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ছিলো। হঠাৎ এক জায়গায় সেটা আবার দাঁড়িয়ে পড়লো। আর এক রাশ লোক, কয়েকটি বাচ্চা কলরব করতে করতে কামরায় উঠলো। দেখলাম, তারা ওঠায় সকলেই বিরক্ত হয়েছে। আমি নিজেও বিরক্ত হলাম।

জানালা-ঘে'ষা কোণের আসনে যে লোকটা বসে ছিলো, সে হঠাৎ একজনের নাম ধরে ডাকলো, অবিনাশ!

যারা নতুন উঠেছিলো তাদের মধ্যে থেকে একজন সাড়া দিলো।

কোণের আসন বললে, আয়, এখানে বোস, আমি নামবো।

বলে সে লোকটা উঠে দাঁড়ালো, অবিনাশকে বসতে দিয়ে সে নেমে গেল।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। ঐ জানালা-ঘে'ষা কোণের আসনটা তো আমারই। কারণ, আমি মনে মনে প্রথম থেকেই ওটাকে ইচ্ছা করেছিলাম।

লোকটা নেমে গেলে ওটা আমিই পাবো ভেবেছিলাম। আমার আশেপাশে আরো যারা ছিলো, তারাও ঠিক সেইরকমই ভেবেছিলো। ওরা জানতো, কোণের আসন যদি শ‌ূন্য হয় তা হলে সেখানে আমিই সরে গিয়ে বসবো। এবং তারা তখন নিশ্চয়ই কেউ আপত্তি করতো না। কিন্তু কোণের আসনের লোকটি অবিনাশ নামের লোকটিকে ডেকে বসতে দেওয়ায় কেউই অবাক হলো না। তাদের মনে হলো ঐ জানালার পাশট‌ুকুতে অবিনাশেরও অধিকার আছে। কারণ, যিনি উঠে গেলেন অবিনাশকে তিনি বসতে বলে গেছেন। যেন দেশলাই আছে কি না জিগ্যেস না করে তাঁকে যদি জিগ্যেস করা হতো আপনার কি কি আছে, তা হলে উনি বলতেন —কি কি বলতেন জানি না, কিন্তু সবশেষে নিশ্চয়ই বলতেন, 'আর এই কোণের আসনটা।'

জানালার বাইরে টেলিগ্রাফ-পোস্টগ‌ুলো দ্র‌ুত পিছিয়ে যাচ্ছে তখনো। একটা বাচ্চা ছেলে কাঁদছে, একটা ঘোমটা-টানা বউয়ের চোখ ছলছল, একজন ব‌ৃদ্ধ কাশছে, সামনে বসা স্নিগ্ধ মেয়েটি কার সঙ্গে অনর্গল কথা বলছে।

আমি শ‌ুনছিলাম, দেখছিলাম, হাসছিলাম তাদের কথার পিঠে। সব ভ‌ুলে গিয়ে আমার মনে হচ্ছিলো আমি থেমে আছি, আমি থেমে গেছি। এই চলন্ত ট্রেন যেন একটা দ‌ৃঢ় ভিত-ওয়ালা বাড়ি, নড়ছে না, নড়বে না ঝড় এলেও। কিন্তু আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আমায় যে কোথায় যেতে হবে! কোথাও পে'ছিতে হবে। কোথায় তা আমার মনে পড়লো না। আর তখনই আমি ব‌ুঝতে পারলাম আমি একটা চলন্ত ট্রেনের মধ্যে রয়েছি।

ঝং-ঝমা-ঝং ক্যাঁওচ ক্যাঁচ শব্দ তুলে ট্রেনটা হঠাৎ মাঝপথে থেমে গেল। সবাই কৌত‌ূহলে জানালার বাইরে তাকালো। কি ব্যাপার! স্টেশন নয়, মাঝপথেই হঠাৎ থেমেছে ট্রেনটা। কিসের একটা গোলমাল ভেসে আসছে।

হ‌ুড়ম‌ুড় করে অনেকে উঠে পড়লো, দরজা খ‌ুলে বাইরে কি হচ্ছে, ট্রেন কেন থেমেছে দেখার জন্যে কেউ কেউ নেমে পড়লো।

—ট্রেন চলবে না, ট্রেন চলবে না। কেউ একজন চিৎকার করে বললো বাইরে থেকে।

যাত্রীদের মধ্যেই কারও কারও ম‌ুখ দেখে মনে হলো, তারা বেশ মজা পেয়েছে, কারও ম‌ুখে উৎকণ্ঠা, কেউ বিরক্ত।

কিন্তু আমাকে যে যেতেই হবে, পে'ছিতে হবে।

আর সকলকে নেমে যেতে দেখে আমিও নেমে যাচ্ছিলাম। সামনে বসা মেয়েটি বললে, আপনার স্যুটকেস। বলে পা দুটি গুটিয়ে ওপরে তুললো। আমি স্যুটকেস হাতে নিয়ে নেমে পড়লাম।

বাইরে এসে দেখি প্রচণ্ড ভিড়, গোল হয়ে জমায়েত কিছু লোক, তার ভিতরে কেউ একজন কিছু বলছে, কেউ কিছু শুনতে পাচ্ছে না, তবু ভিড় করে আছে।

আমি সেই ভিড়ের মধ্যে বারবার উঁকি দেবার চেষ্টা করলাম।

—গাড়ি চলবে না, চলবে না। কেউ একজন আবার বললো। কিন্তু আমাকে যে যেতেই হবে। আমার যে যাওয়ার কথা আছে।

কোথায় যেতে হবে, কেন যেতে হবে আমার মনে পড়ছিলো না। সেই মুহূর্তে আমি কেন জানি না অস্ফুটে বলে উঠলাম, চাবিটা? আমার মনে পড়লো, এবার আমার স্পষ্ট মনে পড়ে গেল, আমি নিজে না যেতে পারলেও আমাকে...হ্যাঁ, আমার যাওয়া না হলেও আমাকে যেমন করে হোক চাবিটা—চাবির গোছাটা পেঁছে দিতে হবে।

আমি তাড়াতাড়ি স্যুটকেস খুললাম। কাপড়চোপড়, টাকা, কাগজ-পত্তর ঘাঁটাঘাঁটি করে ...কোথায়? কোথায়? আমি পাগলের মতো চাবিটা খুঁজলাম। পেলাম না। তবে কি? হ্যাঁ, একবার বোধ হয় খুলেছিলাম কামরার মধ্যে। তখনই হয়তো পড়ে গেছে। নাকি, আমি আনতেই ভুলে গেছি চাবিটা! টেবিলের ওপরই ঠিক তেমনি পড়ে আছে, ছায়া মেখে, অন্ধকারে, রাস্তার ডাস্টবিনের পাশে ছড়ানো-ছিটানো পাঁচ-সাতটা শবদেহের মতো। ঠিক আমার মতোই যারা পেঁছতে পারেনি, পেঁছে দিতে পারেনি তাদের মতোই।

আমি তাড়াতাড়ি সেই শূন্য কামরায় ফিরে এলাম। যেখানে বসে ছিলাম নিজে, কিংবা যেখানে স্যুটকেস রেখেছিলাম—চারপাশ আমি তন্নতন্ন করে খুঁজলাম। কোথাও চাবিটা পড়ে গেছে কি না, এখনো আছে কি না।

না, চাবির গোছাটা নেই। কোথাও নেই। কিন্তু তখনই একটা হুইস্‌ল্ শুনলাম, ঘণ্টি বেজে উঠলো হঠাৎ, আর এক রাশ লোক হুড়মুড় করে উঠে পড়লো।

সেই ট্রেন চলতে শুরু করলো আবার। আর আমার মনে হলো এখন ট্রেনে বসে থাকার কোনো মানেই হয় না। কারণ, এখন যদি আমার মনেও পড়ে, কোথাও যেতে হবে, যদি সত্যি সত্যিই সেখানে পেঁছে যাই, তা হলেও লাভ নেই। কারণ, যে চাবির গোছাটা পেঁছে দেওয়ার কথা, সেই চাবির গোছাটাই আমার সঙ্গে নেই। হারিয়ে গেছে কিংবা ফেলে এসেছি।

এখন আর সেখানে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। কোথাও পেঁছনো এখন অর্থহীন। চলন্ত ট্রেনে বসেও আমার ভিতরটা ছটফটিয়ে উঠলো ফেরার জন্যে। টেবিলের উপর সেটা এখনো আছে কি না, ফিরে এসে দেখার জন্যে। আমি জানি ট্রেনটা যতই দুরন্ত বেগে ছুটতে থাকবে, আমি—আমার ভিতরটা ফেলে-আসা চাবির গোছাটার দিকে হাত বাড়িয়ে ততই দ্রুত পিছন পানে ছুটতে চাইবে।

[১৩৭৫



ডাইনিং টেব্‌ল

মনি-অর্ডার পিওনের কাছে নামটা শুনে আমি বললাম, বুড়ি, তোর মা বোধ হয় টাকা পাঠিয়েছে।

বাইরের লোকদের সামনে ডাকনামে ডাকলে, বিশেষ করে সেই ডাকনামটা তেমন মনের মতো না হলে, আমাদের সময়ে সবাই অস্বস্তি বোধ করতো। ইস্কুলের গন্ডি পার হওয়ার পর আমাকে বাইরের কেউ আর 'খোকা' বলে ডাকেনি। কলেজের বন্ধুদের কাছ থেকে ওটা লুকিয়ে রাখতে কি কম বেগ পেতে হয়েছে! কিন্তু একালের ছেলেমেয়েদের দেখি সব অন্য নিয়ম। বুড়িদের কলেজের দুটো মেয়ে একদিন বেড়াতে এসেছিলো, আমি তাদের সামনে ওকে বুড়ি না বলে 'অমিতা' বলে ডাকলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে ওদের তিনজনের কি হাসি। কারণটা বুঝলাম যেদিন ওর সহপাঠী একটি ছেলে এসে জিগ্যেস করলো, বুড়ি আছে? 'ওসব পোশাকী নাম, ছোট মামা, আজকাল ঐ কলেজের খাতাতেই থাকে। আমরা হাসু সান্যাল, টুকু বোস, ঝুমা নন্দী...সেদিন আমার খোঁজ করতে এসেছিলো, সে ছেলেটার নাম হাবু দাশগুপ্ত।'

আমি আফ্‌টার অল বুড়ির ছোট মামা। কিন্তু ওসব গুরুজনী গার্জেনি অরুণার চরিত্রে নেই। সেদিন একটা ছেলে বুড়ির খোঁজ করতে এসেছে শুনে অরুণা যেভাবে আমার সঙ্গে চোখাচোখি করে ঠোঁট টিপে হেসেছিলো, হাবু দাশগুপ্তের নামটা শুনেও ঠিক তেমনিভাবে চোখে হেসেছে। বলে বসেছে, দেখো বাপু, শেষে ঐ হাবু দাশগুপ্তই যেন কাবু না করে তোমাকে। 'ইস্‌' বলে সেদিন নাকের ডগা থেকে এমন ঘেন্না ঝরিয়ে দিয়েছিলো বুড়ি যে, আমরা নিশ্চিন্ত না হয়ে পারিনি।

আসলে ওর সম্পর্কে আমার একটু দুশ্চিন্তা ছিলোই। বীণা, আমার পিসতুতো বোন, সিউড়িতে তার সংসার বদলি করার সময় বলেছিলো, উনি হঠাৎ ট্র্যান্সফার হলেন, বুড়ির এম. এ. পরীক্ষা তো আর ক'টা মাস, ওকে তোমার কাছে রেখে যাবো খোকাদা?

আমি তার বছরখানেক আগে এই দু ঘরের ফ্ল্যাট নিয়ে আলাদা বাসা করেছি। পৈতৃক বাড়িটার পার্টিশন নিয়ে আমাদের চার ভাইয়ের মধ্যে অশান্তি লেগেই ছিলো। চার জায়ের মধ্যে ঠান্ডা লড়াই কখনো কখনো রীতিমতো উত্তপ্ত হয়ে উঠতো। যদিও ঝগড়াটা হতো তুচ্ছ বিষয় নিয়ে। আমি আমার অংশ বেচে দিয়ে ভেবেছিলাম এই দু ঘরেই অনেক শান্তি।

এমনিতেই জায়গা নেই, তার ওপর আবার বুড়িকে এনে রাখার ইচ্ছে অরুণার ছিলো না। তবু কম বয়সে বীণা আমার শুধু বোন নয়, বন্ধুও ছিলো। আমি যখন একটা মেয়ের প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছি, তখন ওর কাছেই সব কথা বলতে পারতাম, আর ও আমাকে দাবার চাল দেওয়ার চালে ভালো ভালো অ্যাডভাইস দিতো। তাই ওর সম্পর্কে আমার একটা সফ্‌ট্‌ কর্নার আছে। আছে বলেই ওর কথা ফেলতে পারিনি।

সে যা-ই হোক, বুড়ির নামে মনি-অর্ডার শুনে একটুও বিস্মিত হইনি। কারণ, বীণা মাঝে মাঝেই ওর মেয়েকে টাকা পাঠাতো।

বুড়ি কিন্তু ফিরে এলো লাফাতে লাফাতে। হাতে তিন-তিনখানা দশ টাকার নোট।

বললাম, কি ব্যাপার, একেবারে হাসির হোসপাইপ হয়ে গেলি যে।

কথাটা আমার নয়, বুড়িই একদিন বলেছিলো। পোস্ট গ্র্যাজুয়েটের বন্ধুদের কাছে শুনে এসে ও খুব মজার মজার কথা বলতো।

বুড়ি উত্তর দিলো না। হাসতে হাসতে এম. ও. কুপনটা আমার দিকে এগিয়ে দিলো। সেটা হাতে নিয়ে টাইপ-করা লাইন দুটো পড়েই আমার চক্ষু চড়কগাছ।—সে কি রে!

জয় আমার আট বছরের ছেলে, সে দু হাতের মার্বেল হাফপ্যাণ্টের দু পকেটে ভরে দিয়ে জিগ্যেস করলো, কি হয়েছে বাবা?

অরুণাও ততক্ষণে হইচই শুনে রান্নাঘর থেকে এসে হাজির।—এত ফুর্তি সক্কলের, কি হয়েছে কি?

সুমির বয়স তিন। ও অনেক বেশী রিয়ালিস্ট, প্রশ্ন-ট্রশ্নর ধার ধারে না। ও সটান গিয়ে বুড়ির হাঁটু জড়িয়ে ধরেছে তখন। কারও হাতে টাকাপয়সা দেখলেই ওর লজেন্সের কথা মনে পড়ে যায়।

বুড়ি তা দেখে আরো এক দমকা হেসে উঠে বললে, হবে, হবে। লজেন্স না, গোটা একটা ক্যাডবেরি কিনে দেবো। বলেই সুমিকে টুপ করে তুলে নিয়ে একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরলো। আর সুমির তখন চাপের ঠেলায় ত্রাহি ত্রাহি চিৎকার।

—জীবনে প্রথম রোজগার, কি আনন্দ তুমি বুঝবে না মামীমা।

বলার অবশ্য দরকার ছিলো না, বুড়ির সারা শরীর তখন আনন্দ হয়ে গেছে।

মাস দুই আগে বুড়ির লেখা কি একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছিলো একটা পত্রিকায়। ওর একটু সাহিত্য-বাতিক আছে, তবে ছাপা হয়েছিলো ঐ একটাই। সেদিনও আমরা খুব খুশী হয়েছিলাম। কিন্তু তার জন্যে ও যে আবার তিরিশটা টাকা পাবে আমরা কেউই ভাবিনি।

সেই প্রবন্ধটা পড়ে ওর মামীমা পিঠ চাপড়ানির মতো হেসে বলেছিলো, মন্দ হয়নি। তার জন্যে তিরিশটা টাকা পেয়েছে শুনে সেও একমুখ হাসি হয়ে গেল। বললে, লেখাটা কিন্তু সত্যি ভালো হয়েছিলো।

বুড়ির তখন লেখা-টেখা নিয়ে একটুও শিরঃপীড়া নেই। খাটের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে পা দোলাতে দোলাতে বললে, টাকাটা দিয়ে কি করা যায় বলো তো ছোট মামা?

বললাম, তোর মাকে একটা শাড়ি কিনে দে।

—আহা রে! স্লেটের ওপর ভিজে ন্যাকড়া বুলিয়ে দিলো।—শাড়ি বুঝি কম আছে মায়ের। একটাও পরতে দেয় না, তা জানো, সব জমিয়ে জমিয়ে রাখে।

তারপরই অরুণার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসি-হাসি মুখে বললে, এই টাকা দিয়ে মামীমার পরীক্ষা নেবো, বুঝলে ছোট মামা, এই রোববার গ্র্যাণ্ড ফিস্ট।

অরুণা বললে, পাগল নাকি। বরং নিজের জন্যেই কিছু কেনো। আমার পরীক্ষা না-হয় মামার টাকাতেই নিয়ো।

কিন্তু বুড়ি কারও কথা শোনার মেয়েই নয়।

আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম, রবিবার সকালেই বুড়ি বলে বসলো, মামীমা, তুমি ফিশ ফ্রাই করতে জানো?

ওর মামীমা উত্তর না দিয়ে চোখের ইশারায় নিষেধ করলো আমাকে। সুতরাং আমাকে বলতেই হলো, তোর টাকা নিয়ে আমি বাজার যাবোই না।

—তোমাকে দিচ্ছে কে! বুড়ি বলে বসলো, আমি নিজে বাজারে যাবো। মেয়েরা আজকাল বাজার যায় না নাকি!

অদ্ভুত জেদ মেয়েটার। কিছুতেই ছাড়লো না, জয়কে সঙ্গে নিয়ে নিজেই চলে গেল প্লাস্টিকের বাস্কেটটা হাতে ঝুলিয়ে।

ঘণ্টা দেড়েক পরে ফিরে এলো, প্লাস্টিকের ঝোলায় একটা গোটা ইলিশ। আরো কি কি সব। কিন্তু মুখে তখন আর হাসি নেই, বেশ নার্ভাস-নার্ভাস দেখাচ্ছে। ফর্সা মুখটা লালচে, ঘাম চকচক করছে।

হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, আরিব্বাস, বাজার করা খুব ডিফিকাল্ট ছোট মামা।

জয় হেসে উঠে বললে, জানো বাবা, বুড়িদি না বাজারে গিয়ে শুধু ঘুরছে আর ঘুরছে, কি কিনবে ঠিকই করতে পারছে না।

তারপর হঠাৎ বুড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, গোটা ইলিশ কিনেছি দেখে লোকগুলো কেমন তাকাচ্ছিলো।

জয়ের কথা শুনে আমরা সবাই হেসে উঠলাম। হাসলো না শুধু অরুণা। বাজার করার চেয়ে রান্না করা যে কত ডিফিকাল্ট তা আন্দাজ করে নিয়ে আমি আর অরুণার দিকে তাকাতে

সাহস পেলাম না।

খেতে বসে কিন্তু দেখা গেল সত্যি সত্যিই ফিস্ট। বুড়ি তার মামীমার সঙ্গে সেই যে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলো, তারপর ওদের হাসি চিৎকার ব্যস্ততায় বেশ বোঝা যাচ্ছিলো অরুণা তখন আর একটুও বিরক্ত নয়। এই ছোট ফ্ল্যাটের খুদে কিচেন যেন রীতিমতো বিয়েবাড়ি। মাঝে মাঝে নানারকমের সুস্বাদু গন্ধ ভেসে আসছিলো, আর তার সঙ্গে ওদের হই-হল্লা, রসিকতা।

বারোটা না একটা, ঘড়ি তো দেখিনি, তাড়া খেয়ে তাড়াতাড়ি স্নান সেরে এসে দেখি মেঝেতে সব ক'টা আসন পেতে জলের গ্লাস সাজিয়ে বুড়ি পরিবেশন করার জন্যে রেডি। জয়, সুমি, এমন কি ওর মামীমাকেও জোর করে বসিয়ে দিয়ে বললে, ভয় নেই, সব একসঙ্গে খাবো আজ, আমিও বসবো।

থালার দিকে, থালার চারপাশে বাটি প্লেট ইত্যাদির দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, সব টাকা শেষ করে এলি নাকি!

বুড়ি হেসে বললে, ভারি তো তিরিশটা টাকা, একটা গোটা ইলিশের দাম কত জানো!

নিজেদের জন্যে এত খরচপত্তর কিংবা এত রান্নাবান্নার ঝামেলা দেখা তো অভ্যাস নেই। কাউকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াতে হলে তবেই এসব ভাবা যায়। তাই বললাম, আপিসের অতুলবাবুদের বাড়ি সেবার খেয়ে এসেছিলাম, তাকে নেমন্তন্ন করলে হতো। বললাম, বুড়ি, তুইও তো তোর বন্ধু ঝুমাকে বললে পারতিস।

বুড়ির থালা থেকে অরুণা কি একটা তুলে নিতেই সে হাঁইহাঁই করে উঠলো, আর জয় তার মায়ের থালা থেকে কি যেন তুলে নিলো। আমি ওদের রকমসকম দেখে দু হাত মেলে জয়, সুমি, এমন কি ওর মামীমাকেও জোর করে বসিয়ে দিয়ে বললে, ভয় নেই, সব একসঙ্গে খেতে বসলেই প্রতি দিন হয়।

আর গল্প—গল্প। বুড়ি বলে, পরচর্চা ক্লাস।

তবু এত সব শুধু নিজেদের জন্যে! বললাম, এতই যখন হলো ওদের নেমন্তন্ন করলেই হতো।

তা শুনে বুড়ি আর তার মামীমা পরস্পর চোখাচোখি করে হাসলো। বোঝা গেল দুজনে এর আগেই এ সম্পর্কে আলোচনা করেছে।

ওরা হয়তো চেপে যেতো, জয় অতশত বোঝে না, ওদের কথাবার্তা শুনেছে বলেই ব্যাপারটা প্রকাশ করে ফেললো। বললে, ওদের তো খাবারটা টেবিলে আছে, অতুলকাকাদের!

খাবার টেবিল মানে ডাইনিং টেব্‌ল। খোঁচাটা আবার নতুন করে এসে লাগলো। হঠাৎ সব কিছু যেন বিস্বাদ ঠেকলো। মনে হলো এই ছোট্ট ফ্ল্যাটের একটা অভাব, আমার এই একটা ক্ষুদ্র অক্ষমতাকেই অরুণা যেন বারবার মনে পড়িয়ে দিতে চায়।

আমাদের চার ভাইয়ের মধ্যে পার্টিশন হবার আগে আমরা যখন ঐ পুরোনো পৈতৃক বাড়িটায় থাকতাম, তখনো একবার ডাইনিং টেব্‌লের কথা উঠেছিলো। বড়দা মেজদা এমনিতেই এসব পছন্দ করতো না, তার ওপর জ্যাঠামশাই এসে হয়তো বলবেন, কি রে, সাহেব হয়ে গেলি যে সব, জ্যাঠাইমা ছোঁয়া বাঁচিয়ে বলবেন, ছি ছি, টেবিল সর্কাড় করছিস, জাতজন্ম ..এইসব ভয়েই ও পথে যাইনি। এখানে তো আমি নিজেই রাজা, কে কার পরোয়া করে, আর একটা ডাইনিং টেব্‌ল, কিই বা তার দাম। সংসার যতই টানাটানির মধ্যে চলুক, একটা ডাইনিং টেব্‌ল কি আর চেষ্টা করলে কিনতে পারতাম না!

খাবার টেবিল নিয়ে জল্পনাকল্পনা অবশ্য এ বাসায় উঠে আসার পর থেকেই চলছিলো। খুকির মা আমাদের বাসন মাজার ঠিকে ঝি, মাসের মধ্যে বিনা নোটিসে তিন-চার দিন কামাই তার লেগেই আছে। আর সে সময় অরুণার মেজাজ একেবারে তিরিক্ষি হয়ে থাকে। বাজার থেকে কলাপাতা আনতে ভুলে গেলে আর রক্ষে নেই।

—খুকির মা ফিরেছে আজ, মামীমার মেজাজও নরম, দেখেছো ছোট মামা! রাত্রে খেতে বসে বুড়ি একদিন রসিকতা করে বলেছিলো।

কথাটা সত্যি। সত্যি বলেই অরুণা রেগে গুম হয়ে গিয়েছিলো। আর বুড়ি তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যেই বলেছিলো, যা-ই বলো, একটা ডাইনিং টেব্‌ল কিনে ফেলো ছোট মামা। কত সুবিধে বলো তো। কাঁচের প্লেটে খাবে, ভিম দিয়ে ধুয়ে নেবে, ব্যস্‌। কারও তোয়াক্কা করতে হবে না।

অরুণা ততক্ষণে হেসে ফেলেছে। —ওঠবোস করতে করতে কোমরে ব্যথা হয়ে যায়, সে আর ও কি বুঝবে। মেঝেতে ন্যাতা বুলোতে হতো দুবার করে, তখন বুঝতো।

আমি কোনো জবাবই দিইনি। জয় যখন তার মা-র কাছে শোনা কথাটা শোনালো : বাবা, তুমি কিন্তু খুব কিপটে, তখনো না। আসলে একটা খাবার টেবিল কেনা প্রায় ঠিকঠাক করেই ফেলেছিলাম মনে মনে। দিন কয়েক দোকানেও ঘুরে কাঠের টেবিল কিনবো, না স্টীলের, তা ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ একদিন অতুলবাবু তাঁর বিবাহবার্ষিকীতে নেমন্তন্ন করে বসলেন। আমরা ওসব জানতামও না, ক' বছর বিয়ে হয়েছে জিগ্যেস করলে হিসেব করেও বের করতে পারি না। তবু অতুলবাবু আর তাঁর স্ত্রী নেমন্তন্ন করে গেলেন বলেই যেতে হয়েছিলো। আর সেই যাওয়াই কাল হলো।

অরুণা আর জয় ফেরার পথে ট্যাক্সিতেই আলোচনা শুরু করে দিয়েছিলো। ফ্রায়েড রাইস কিংবা মুর্গির ঠ্যাঙের প্রশংসা নয়, ডাইনিং টেব্‌লটার প্রশংসা। —কিরকম চকচকে কালো মার্বেল দেখেছো, মুখ দেখা যায় খাবার সময়।

জয় বললে, কিনতে হলে ঐরকমই কিনো বাবা। গ্র্যান্ড।

যেন সমস্যাটা শুধু টাকার। যেন সমস্যাটা শুধু ইচ্ছের। আমার দুখানা ঘর আর এক ফালি বারান্দায় এমনিতেই তো পা ফেলার জায়গা নেই। খাট, আলমারি, জয়ের পড়ার টেবিল, অরুণার ড্রেসিং টেব্‌ল, আলনা, লেপ বালিশ তুলে রাখার চৌকি...এর ওপর আবার একটা খাবার টেবিল এনে কোথায় ঢোকাবো আমি ভেবেই পেতাম না। অরুণার এক কথা!—তুমি কিনেই ফেলো না, আমি সরিয়ে-টরিয়ে ঠিক জায়গা করে নেবো।

মাঝে মাঝে তাই মনে হয়েছে কিনেই ফেলি। এই তো অতুলবাবুরা কত দূরে দূরে ছিলেন, একটা দিনে গল্পগুজব করে কত কাছের লোক হয়ে গেলেন।

—সত্যি দেখো, যাওয়া-আসা নেই বলে সবাই কত পর-পর হয়ে যাচ্ছে। বিয়েবাড়িতে কোথাও দেখা হলে ফিরতে ইচ্ছে হয় না। অরুণা একবার বলেছিলো।

অথচ একটা ডাইনিং টেব্‌ল থাকলে দিব্যি মাঝে মাঝে একে-ওকে নেমন্তন্ন করা যেতো। যারা দূরে সরে যাচ্ছে তাদের আবার কাছে আনা যেতো।

লোভটা তাই মনের মধ্যে রয়েই গিয়েছিলো। মুখেই শুধু আপত্তি জানাতাম। কিন্তু হঠাৎ সুযোগ ঘটে গেল। আপিসে এক বছর ইন্‌ক্রিমেন্টের টাকাটা কি এক উপধারায় আটকে পড়ে ছিলো। এরিয়ার্সের সবটুকু একসঙ্গে হাতে পেতেই অরুণা বলে বসলো, আর কোনো কথা শুনছি না, ডাইনিং টেব্‌ল!

জয় কোথায় ছিলো, হেসে উঠে বললে, টেবিল হলে সুমি তো হাতই পাবে না, না বাবা? ও টেবিলের ওপর বসবে।

বুড়ি ধমক দিলো।—তুই থাম, তুই নিজেও নাগাল পাবি নাকি? তারপর হেসে বললে, একটু বড় দেখে কিনো মামীমা, দু-চারজন বাইরের লোকও তো আসবে মাঝে মাঝে। ঝুমা-দের টেবিলটাও খুব সুন্দর, ওরকম হলেও...

শেষ অবধি অরুণা আর বুড়িকে সঙ্গে নিয়ে দু-পাঁচটা দোকান ঘুরে একটা টেবিল করিয়েই ফেললাম। চকচকে কালো মার্বেল নয়, কাঠেরই, তবে ডিজাইনটা খুব সুন্দর। প্লাস্টিকের বেত-বোনা চেয়ারগুলো আরো সুন্দর।

ঘরে তো এমনিতেই জায়গা ছিলো না, বারান্দা থেকে জুতোর র‍্যাক, আলনা, ড্রেসিং টেব্‌ল সরিয়ে সেগুলোকে ঘরে ঢোকানো হলো। আর বারান্দা জুড়ে বসলো ডাইনিং টেব্‌ল।

তবু বেশ লাগলো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে।

বুড়ি রসিকতা করে বললে, এত দিনে তুমি কাল্‌চার্ড হলে মামীমা।

সুমির বয়েস তিন, সে কোনোরকমে টেবিলের পাশে একটা নতুন চেয়ারে উঠে বসেছে, নামবার নাম নেই।

আর জয় দুম করে বলে উঠলো, বাড়িটা একদম রেস্টুরেণ্ট হয়ে গেছে, না বাবা?

আমরা সবাই হেসে উঠলাম।

টেবিলটা শেষ অবধি কিনতে পেরেছি বলে সকলের যত আনন্দ, রাত্রে খেতে বসে কিন্তু ততই অস্বস্তি। যত অস্বস্তি তত হাসাহাসি।

অরুণাই সবচেয়ে বেশী হাসলো সুক্তোর বাটি উলটে ফেলে। বললে, অনভ্যাসের ফোঁটায় কপাল চড়চড় করছে।

কিন্তু সীন ক্রিয়েট করলেন জ্যাঠামশাই। দিন কয়েক পরেই একদিন বেড়াতে এলেন। আমরা জোর করে তাঁকে রাত্রে খেয়ে যেতে বললাম।

জ্যাঠামশাই আসনপিঁড়ি হয়ে বসলেন একটা চেয়ারে। কিন্তু সেভাবে টেবিলে ভর দিয়ে খেতে গিয়ে আরেকটু হলেই হুমড়ি খেয়ে পড়তেন আর কি। নিজে পড়ে গিয়ে হাত-পা ভাঙলেন না, ভাঙলেন কাঁচের গ্লাসটা। হেসে উঠে তাই বললেন, টেবিলে খাবার সময় সাহেবরা কনুই দুটো কোথায় রেখে আসে বল্ তো?

আসলে ওঁর কনুই দুটো ঠকাঠক টেবিলের ধারে লাগছিলো। খাওয়াও হলো না ওঁর। বললেন, আরে, মেঝেয় বসে খাওয়ার মতো বনেদিয়ানা আর আছে নাকি। আমার শাশুড়ী, ফুল পাতা কত সব নকশা-কাটা নিজের হাতে বোনা উলের পুরু আসন পেতে দিতো, সে কি নরম আসন, রুপোর থালায় জুঁইফুলের মতো ভাত, চারপাশে গোল হয়ে এক সারি রুপোর বাটি...

আমরা সব্বাই হেসে উঠলাম। বুড়ি তো সম্পর্কে নাতনী, ও ঠাট্টা করে বললে, আর দরজার আড়ালে ঘোমটা-টানা দিদিমার কথা বললেন না?

আমরা আবার হেসে উঠলাম।

তারপর একটু একটু করে কিভাবে যেন সব হাসি চলে গেল। বুড়ির পরীক্ষা হয়ে যেতেই ও একদিন পেন্নাম-টেন্নাম করে সিউড়ি চলে গেল। আর হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলাম বাইরের লোক কাছে আসা তো দূরের কথা, আমরাই পরস্পর থেকে দূরে সরে গেছি। খাবার টেবিলের এক প্রান্তে আমি, আরেক প্রান্তে অরুণা। জয় কোনো দিন জেগে থাকে, কোনো দিন ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু আমরা কেউ কোনো কথা বলি না। চুপচাপ দুজনে খাচ্ছি তো খাচ্ছিই। খাওয়া যেন শুধুই খাওয়া। হাতা আর চামচের ঠুংঠাং কিংবা জলের গ্লাস নামানোর ঠক্ শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দও হয় না।

তখন ভাবতাম, টেবিল নেই এই লজ্জায় লোকদের নেমন্তন্ন করতে পারি না। একদিন অতুলবাবুদের খেতে বলেই মাসের শেষে সে কি টানাটানি। সুমি কেন, তখন আমরাও যেন আর ডাইনিং টেব্‌লটার নাগাল পাচ্ছি না।

ধুৎ। এর চেয়ে মেঝেয় বসে খাওয়াই ভালো ছিলো। ডাইনিং টেব্‌লটা কোনো উপরি আনন্দ তো দিলোই না, ঘরগুলোও এখন আসবাবে ঠাসা। খাট, আলমারি, বাক্স-বিছানা, ড্রেসিং টেবিল, পড়ার টেবিল...দুখানা তো ছোট ছোট ঘর...নড়াচড়ার উপায় নেই। ঘর যেন আমাদের জন্যে নয়, আমাদের আসবাবপত্র দেখানোর শো-কেস শুধু।

—এত যখন অসুবিধে, আরেকটা বড় ফ্ল্যাট নিলেই হয়। অরুণা একদিন রেগে গিয়ে বললো।

এর আর কি উত্তর দেবো। আরো বড় ফ্ল্যাট, আরো জায়গা। কিন্তু কতটুকু জায়গাই বা লাগে মানুষের। টলস্টয়ের গল্পটা মনে পড়লো। কবর হলে সাড়ে তিন হাত, আমাদের তো তাও লাগে না। সাত টাকার কাঠ আর তিন ঘণ্টা চিতার ওপর বিশ্রাম।

—বাঃ রে, তা বলে একটু হাত-পা ছড়াবার জায়গা থাকবে না। অরুণা বললো।

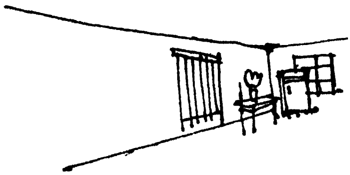
সত্যি, আরেকটু জায়গা দরকার। একটু হাত-পা ছড়াতে চাই। সুতরাং ঘরগুলো ক্রমশই বড় হতে লাগলো, ঘরের সংখ্যা বাড়তে লাগলো, সামনে সবুজ ঘাসের লন বাড়তে বাড়তে সামর্থ্য ছাড়িয়ে কল্পনা হয়ে গেল। তারপর কল্পনাতেই সেই জায়গাগুলোয় প্রয়োজনের আসবাব ঠাসতে ঠাসতে সেটা আবার ছোট হয়ে গেল।

হয়তো একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম, তাড়াতাড়ি আপিস বেরোতে গিয়ে জোর একটা হোঁচট খেলাম ড্রেসিং টেবিলটায়। সঙ্গে সঙ্গে আয়নাটা উলটে পড়ে ঝনঝন করে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়লো মেঝের ওপর।

যন্ত্রণায় পায়ের বুড়ো আঙুলটা টিপে বসে পড়লুম আমি। রাগে বলে উঠলাম, আসলে ফ্ল্যাটটা যেন ওরাই ভাড়া নিয়েছে, আমরা শালা সব উদ্বাস্তু।

আমার মুখে 'শালা' শুনে কি না জানি না, জয় হিহি করে হেসে উঠলো। হেসে উঠে বললো, ডাইনিং টেব্‌লটাই সব জায়গা খেয়ে নিয়েছে, না বাবা?

[১৩৭৬



ড্রেসিং টেব্‌ল

অঙ্কের দিদিমণি বললেন, বেলা, তুমি কাল থেকে শাড়ি পরে আসবে।

শুনে আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। ক্লাসের অন্য সব মেয়ের দিকে তাকাতে আমার খুব লজ্জা করছিলো। তা হলে কি আমি বড় হয়ে গেছি! মা আমাকে কিছুতেই শাড়ি পরতে দিতো না। এক-একসময় আমার খুব রাগ হতো। দিদি ও জামাইবাবুরা এসে যেবার আমাদের সক্কলকে সিনেমা দেখাতে নিয়ে গেল সেইবার শুধু দিদি আমাকে তার একটা ভালো শাড়ি দিয়ে বলেছিলো, কি রে, শাড়ি পরতে ইচ্ছে হচ্ছে খুব, তাই না? সেদিন খুব সেজেছিলাম আমি। সাজতে আমার এত ভালো লাগে। আর মা সাজগোজ একদম পছন্দ করতো না। মা বোধ হয় ভয় পেতো, সাজগোজ করলেই রাস্তাঘাটে কোনো ছেলের যদি আমাকে ভালো লেগে যায়, শাড়ি পরলে কেউ যদি মনে করে আমি বড় হয়েছি। আর যদি বড়দের দিকে ছেলেরা যেমন করে তাকায় তেমনিভাবে আমাকেও দেখে। এ নিয়ে ইস্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে আমরা খুব হাসাহাসি করতাম।

বাড়ি ফেরার সময় আমার কিন্তু ভয় কেটে গিয়েছিলো। ভাবছিলাম, মা বেশ জব্দ হবে, এখন আর কিছু বলতেও পারবে না। কিন্তু রানীর কথা ভেবে মনটা একটু খারাপ হয়েছিলো। আমরা প্রোমোশন পাবার পর মাত্র দিন কয়েক ইস্কুলে আসছি, অঙ্কের দিদিমণি রানীকে ঠিক এমনিভাবে হঠাৎ একদিন বললেন, রানী, কাল থেকে তুমি শাড়ি পরে আসবে। তার মাস কয়েক পরেই রানীর বিয়ে হয়ে গেল। আমারও যদি তেমনি হয়! না বাবা, এর মধ্যে ওসব কিছুতেই না, আমি পড়বো। পাস করবো, গ্র্যাজুয়েট হবো। মীনাপিসী গ্র্যাজুয়েট। গ্র্যাজুয়েট কাকে বলে আমি অবশ্য ঠিক জানতাম না।

দিদি-জামাইবাবুর সঙ্গে যেদিন সিনেমা গিয়েছিলাম সেদিন সবাই বলেছিলো, আমাকে নাকি খুব মানিয়েছে শাড়িটা, খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। আমার কেবলই নিজেকে দেখতে ইচ্ছে করছিলো। কিন্তু কি করেই বা দেখবো। আমাদের বাড়িটা বিচ্ছিরি, বিচ্ছিরি। বাবা যে এত গরিব কেন...দূর, গরিব না ছাই, বাবার কাছে সবই শুধু শৌখিনতা। যেন শৌখিন হওয়াটা খারাপ। তাই, একটা বড় আয়নাও ছিলো না বাড়িতে। কি আর করি, দেয়ালে টাঙানো কাঠের ফ্রেমের ছোট্ট আয়নাতেই মুখ দেখে শখ মেটাতে হয়েছিলো।

রানীর বিয়েতে গিয়ে আমি প্রথম ড্রেসিং টেব্‌ল দেখলাম। তার আগে শুধু সিনেমার ছবিতে দেখেছি। মীনাপিসীদের অবশ্য আলমারির কবাটে বেশ বড় একটা আয়না ছিলো। কিন্তু সত্যি সত্যি ড্রেসিং টেব্‌ল দেখলাম রানীর বিয়েতে। রানীর বাবা রানীকে বিয়েতে কত কি যে দিয়েছিলো। এক-গা জড়োয়া গয়না, খাট আলমারি ড্রেসিং টেব্‌ল। আমি সেদিনও খুব সেজেছিলাম, রানী ঠাট্টা করে বলেছিলো, দেখিস ভাই, আমার বরটা যেন কেড়ে নিস না, যা দারুণ দেখাচ্ছে না তোকে! ইস্কুলের সব বন্ধুগুলো হেসে উঠেছিলো। সব্বাই সায় দিয়েছিলো। আর আমি বারবার ড্রেসিং টেব্‌লের সামনে দিয়ে ঘুরে আসছিলাম, আড়-চোখে আড়চোখে নিজেকে দেখছিলাম। ঠিক মীনাপিসীদের বাড়িতে গেলে যেভাবে আলমারির আয়নায় নিজেকে দেখতাম তেমনিভাবে।

ড্রেসিং টেব্‌লের শখ আমার তখন থেকে।

তারপর তো কত কি হয়ে গেল, বাবা বদলি হলো কলকাতায়, আমরা একবালপুরের বাসায় এসে উঠলাম। আমি পাস করে কলেজে ঢুকলাম। আর কলেজের বন্ধুরা কেউ জানতো না, মাঝে মাঝেই আমি ইণ্টারভিউ দিতাম। হঠাৎ একদিন শুনি কি, আমার বিয়ে।

কোনো দিন দাদা-বউদির সঙ্গে, কোনো দিন দিদি-জামাইবাবুর সঙ্গে তখন বিয়ের বাজার করে বেড়াচ্ছি। বিয়ের চেয়ে বিয়ে-বিয়ে ভাবটাই ভালো। তখন সবাই আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে, আমার কোন্ শাড়িটা পছন্দ, নেকলেসের কোন্ ডিজাইনটা আমার চাই, কি কি সাধ আছে। বর পছন্দর কথাটা অবশ্য কেউ জিগ্যেস করেনি, না করুক, ঠকিনি। ওকে আমার সত্যি খুব মনে লেগেছিলো। তা, সব যখন কেনাকাটা হচ্ছে, আমি বাবাকে বললাম, আর কিছু দাও না-দাও, একটা ড্রেসিং টেব্‌ল আমাকে দিতেই হবে। শুনে বাবা এমন অসহায়ের মতো আমার মুখের দিকে তাকালো আমার কান্না পেয়ে গেল। বাঃ রে, একটাই তো শখ, তা-ও দিতে পারবে না বাবা।

মা সেদিন রাত্তিরে ফিসফিস করে বললো, হ্যাঁ রে বেলা, তুই নাকি ড্রেসিং টেব্‌ল চেয়েছিস বাবার কাছে?

আমার তখন এত দিনের সাধটা মিটবে না বলে বিয়ে সম্বন্ধেই আর কোনো উৎসাহ নেই। আমার মনে হলো রানীর বিয়ের কাছে আমার বিয়েটা যেন বিয়েই নয়। অথচ রানীর তুলনায় আমি তো সত্যি সুন্দরী। ততদিনে আমি তো তা বুঝতেও শিখেছি।

আমার ভীষণ রাগ হলো, আমি মা-র কথার উত্তরই দিলাম না।

মা আমার পিঠে হাত দিয়ে ধীরে ধীরে বললো, শোন বেলা, ওসব বলিস না। তোর বাবা কষ্ট পাবে। এমনিতেই দেড় হাজার টাকা বেশী খরচ হয়ে গেছে। তা ছাড়া, ওরা গডরেজ চেয়েছে, রেডিও চেয়েছে...

কিন্তু আমি তো ওসব কিছুই চাইনি। আমি সেই কোন্ ছোটবেলা থেকে ভেবে রেখেছি, বিয়ের সময় একটা ড্রেসিং টেব্‌ল দিতে বলবো বাবাকে। আমার কত দিনের ইচ্ছে অমনি গদি-মোড়া টুলে বসে আয়নার সামনে সাজবো, টিপ, লিপস্টিক, স্নো, ক্রীম সব টুকিটাকি সাজানো থাকবে সেখানে, ঘরময় খুঁজে বেড়াতে হবে না। আর বেশ আরামে চুলে চিরুনি দেবো, চুল বাঁধবো...চুলের জন্যে আমার কিন্তু বেশ গর্ব ছিলো।

ও তো একদিন বলেছিলো।

আমি নিজেই একদিন জিগ্যেস করেছিলাম, এই, আমাকে দেখে তোমার এত পছন্দ হয়ে গেল কেন বলো তো? আমি তো একটুও দেখতে ভালো নই।

মিথ্যে করে বলেছিলাম অবশ্য। আমার চেয়ে যেন আরো কত সুন্দর মেয়ে ও পেতো; পেলে আমাকে বিয়ে করতে যাবে কেন, শুনি।

ও শুনে কিন্তু মিটমিট করে হাসলো। ওর হাসিটা এত সুন্দর, আর কি সরল! বললো কি, তোমার চোখ দেখেই...তুমি চটাস করে একবার চোখ তুলে আমার দিকে তাকালে, যেদিন দেখতে গিয়েছিলাম, ব্যস্, এক্কেবারে কাত, আর যখন চলে গেলে তোমার পিঠের দিকে তাকিয়ে ...অমন সুন্দর চুল, একেবারে ফ্ল্যাট হয়ে গেলাম।

আমার সেদিন ভালোবাসায় একেবারে গলে যেতে ইচ্ছে হয়েছিলো। তবু ইচ্ছে করেই ভুল বোঝার ভান করেছিলাম, জানি, জানি, দেখতে যে ভালো নই সে আমি জানি। ওভাবে ঘুরিয়ে

না বললেও চলতো।

মিথ্যে মিথ্যে অভিমান দেখিয়ে ওর মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনতে কি মজা যে লাগতো!

আমি তো তখন খাটের ওপর বসে গল্প করছিলাম। আর ও শুয়ে ছিলো। এমন পাজী না, হঠাৎ হেসে ফেলে বললো, 'তাই বুঝি', আর তারপর আমাকে দু হাতে টেনে নিয়ে আমার মুখ বন্ধ করে দিলো। আর রাগ থাকে!

ও আদর করতে করতে বললো, সুন্দর কি না ঠিকই জানো, শুধু আমার মুখ থেকে শুনতে চাও।

আমি হেসে উঠে বললাম, বাঃ, আমি কি করে জানবো, আমি কি নিজেকে দেখতে পাই?

আচ্ছা, নতুন বিয়ের পর 'এটা চাই, ওটা চাই' স্পষ্ট করে বলা যায়? কি জানি বাবা, আমার কিছু চাইতে লজ্জা করতো। তা ছাড়া ও তো বলতে পারতো, 'কেন, আয়নায় দেখো না নিজেকে?' ব্যস্, তা হলেই ড্রেসিং টেব্‌লের কথাটা বলতে পারতাম।

ওদের বাড়িতেও ড্রেসিং টেব্‌ল ছিলো না। মানে, বেশ ভালো ডিজাইনের বেশ বড় আয়না দেওয়া টেবিল না হলে তো আর ড্রেসিং টেব্‌ল বলে না। ওদের যেটা ছিলো সেটাকে কি যে বলবো ভেবে পাই না। একটা চারকোনা উঁচু টেবিলের ওপর একটা মাঝারি সাইজের আয়না বসানো। আর সে আয়নার পিছনের পারা উঠে উঠে কালো কালো দাগ দেখা যেতো। চিকেন পক্স সেরে যাওয়ার পর অমন ফর্সা মিঠলুকে যেমন লাগতো ঠিক তেমনি। মিঠলু আমার ভাশুরের মেয়ে। মিঠলুর অত্যাচারে আমি একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম। আমার পাউ-ডারের কৌটো ঢেলে ছড়িয়ে রাখবে, চন্দন সাবান এনে দিতো ও, দু দিনেই শেষ, সোপ-কেসে এক রাশ জল, সাবানটা যে গলে যাবে সে জ্ঞানও নেই, আর ঘুরছে-ফিরছে আমার লিপস্টিকটা ঠোঁটে ঘষছে।

আমি একদিন খুব বকে দিয়েছিলাম মিঠলুকে।

আমার জা প্রথম প্রথম সত্যি আমাকে খুব ভালোবাসতো। ও মাঝে মাঝে একটু রাত, মানে এই সাড়ে ন'টা দশটায় ফিরতো, আর তা দেখে জা বলতো, হ্যাঁ রে ছোটকি, ঠাকুরপোকে একটু কড়কে দিতে পারিস না।

আমি হাসতাম।

এক-একদিন জোর করে সিনেমা দেখতেও পাঠাতো আমার জা। ওকে বলতো, অত লজ্জা-লজ্জা ভালো নয় ভাই, শেষে বউটাই হাতছাড়া হয়ে যাবে।

তখন জা-কে আমার খুব ভালো লাগতো। তারপর ভাশুরের যখন আপিসে প্রোমোশন হলো, মাইনে বাড়লো, তখন থেকেই একটু একটু করে কেমন যেন বদলে গেল। একটু একটু করে সমস্ত সংসারের কাজ আমার ওপর চাপিয়ে দিলো। ও বেচারীও তাড়াহুড়ো করে আপিস যাবে, ক্লান্ত হয়ে ফিরবে, বাজার যাওয়া থেকে কলের মিস্ত্রী ডেকে আনা অবধি সব কাজ যেন ওর। আমার খুব রাগ হতো। আসলে আমার তখন দিনরাত ওর কাছে কাছে থাকতে ইচ্ছে করতো, গল্প করতে ইচ্ছে করতো, কিন্তু সংসারের কাজ করতে গেলে তো তার সুযোগ মিলতো না। ওকে বলতাম, সব কাজ তোমাকেই বা করতে হবে কেন! ও হেসে বলতো, বাঃ রে, এতকাল করে এসেছি, এখন কি বলবো, বউকে ছেড়ে যেতে পারবো না? আমার কিন্তু অপমান-অপমান লাগতো। মনে হতো, ও তো ভাশুরের মতো বড় চাকরি করে না, মাইনে পায় কম, তাই অমন হেনস্থা।

এদিকে কাজ করে করে, তখন মন্টু হবে, আমার শরীর ভেঙে পড়ছিলো। মাথা ঘুরতো সব সময়, ক্লান্ত লাগতো। অথচ আমার যে একটু বিশ্রাম দরকার, একটু ভালো খাওয়া-দাওয়া দরকার এসব বলবো কি করে। খবরটা আমাদের দুজনের মধ্যেই গোপন রেখেছিলাম। আর কেউ জেনে যাবে, সে ভীষণ লজ্জা। আমি তো মাকে বউদিকেও প্রথম প্রথম জানাইনি।

ও একদিন লুকিয়ে লুকিয়ে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে গেল আমাকে। ওর সবেতেই লজ্জা। সবেতেই ভয়। বউদি কি মনে করবে। ও তো পুরুষমানুষ, ওর এত লজ্জা কিসের, ওর এত ভয় কেন!

ডাক্তার পরীক্ষা করে বললো, রক্ত কম শরীরে, ভালো করে খাওয়া-দাওয়া করুন। দুধ, মাখন, দুটো করে মুর্গির ডিম...

বলা তো সোজা, খাই কি করে। ভাশুরের ছেলেমেয়েরা রয়েছে, শ্বশুর-শাশুড়ী রয়েছে, তার ওপর মিঠলু তো একটা বিচ্ছু, আমাদের মধ্যে যে কথাই হোক ঠিক আড়ি পেতে শুনে নিয়ে সাতকাহন করে লাগাবে। লুকিয়ে লুকিয়ে মুর্গির ডিম খাচ্ছি দেখলে কি বলে বসবে কে জানে। আমার নিজেরও নিজেকে বড় স্বার্থপর লাগছিলো। তা ছাড়া ও মানুষটাও তো খেটেখুটে আসে, ওরও তো দরকার।

ও বললো, এক কাজ কোরো, বাজার থেকে একটা করে মুর্গির ডিম আনবো, তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে সেদ্ধ করে নিয়ো।

আমি বললাম, তুমি না খেলে আমিই বা খাবো কেন!

ও হেসে ফেললো। বললে, রোজ দুটো করে ডিম? আমি ফতুর হয়ে যাবো।

আমি প্রথমে রাজী হইনি। কিন্তু ও একদিন রেগে গিয়ে বললো, নিজে তো মরবেই, ওটাকেও মারতে চাও? সেদিন আমার চোখে জল এসে গিয়েছিলো। যে আসছে তার কথা ভেবেই নয়, আমার মনে হলো, দেখেছো, ও আমাকে কত ভালোবাসে।

ওর কথা রাখতে আমি সত্যিই লুকিয়ে লুকিয়ে একটা করে মুর্গির ডিম সেদ্ধ করে খেতে শুরু করলাম। উঃ, সে কি অস্বস্তি। সারাক্ষণ ভয়, কে কোত্থেকে দেখে ফেলে। এক-একদিন এমন হয়েছে মুর্গির ডিমটা সেদ্ধ করার সময়ই পাইনি, এক-একদিন ডিম সেদ্ধ করে খাটের তলায় লুকিয়ে রেখেছি, খেতে পারিনি।

শেষে একদিন ধরাই পড়ে গেলাম, মিঠলু দেখে ফেললো।

আমি জানতাম, আমার জা একদিন-না-একদিন কথা শোনাবেই। হয়তো সকলের সামনে ঠাট্টা করবে, হয়তো বলবে, তোর কি ছোঁয়াছুঁয়ির বিচার নেই? ঘরের মধ্যে মুর্গির ডিম খাচ্ছিস? কিন্তু জা-কে আমি এত ছোট ভাবিনি।

টাকাপয়সা নিয়ে কথা হতে হতে ওর সঙ্গে জায়ের কথা কাটাকাটি হলো একদিন, আর জা দুম্ করে বলে বসলো, যা দাও তা তো মুর্গির ডিম কিনেই উশুল করে নাও।

সেদিন আমার মরে যেতে ইচ্ছে হয়েছিলো। ছি ছি, আমার জন্যেই তো ওকে এ কথা শুনতে হলো। মুর্গির ডিম তো ও নিজেই পয়সা দিয়ে কিনে আনতো, আর জা ভাবলো কিনা বাজারের পয়সা যা দিতো সে, তার ভেতর থেকেই ডিম কেনা হয়।

আমি তারপর থেকে ডিম খাওয়া বন্ধ করে দিলাম। জায়ের ওপর রাগ থেকে আমার ইচ্ছে হতো কিচ্ছু খাবো না, আরো দুর্বল হবো, কষ্ট পেতে পেতে আমি হঠাৎ একদিন মরে যাবো। এমনিভাবে সকলের ওপর প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছে হতো। তার বদলে হঠাৎ একদিন মাকে চিঠি দিলাম আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে। আর দাদা আমাকে নিতে এসে বললো, এ কি চেহারা হয়েছে রে তোর!

এত সুন্দর স্বাস্থ্য ছিলো আমার, এত সুন্দর ছিলাম, তা হলে কি সত্যি দেখতে খুব বিচ্ছিরি হয়ে গেছি নাকি। টেবিলে বসানো আয়নাটা ছিলো জায়ের ঘরে, ভাশুর না থাকলে যেতাম আগে, কিন্তু ঝগড়াঝাঁটি হতে হতে আবহাওয়া যখন গরম হতে শুরু করলো তখন থেকে আর যেতাম না। দাদার কথা শুনে সেদিন আমি ওর দাড়ি কামানোর আয়নাটাতেই মুখ দেখলাম ভালো করে। সত্যি তো, মুখটা এত রোগা, চোয়ালের হাড় দেখা যাচ্ছে...

মণ্টু হওয়ার পর আমি যখন বাপের বাড়ি থেকে ফিরে এলাম ও একদিন ফিসফিস করে বললো।

ফিসফিস ছাড়া কথা বলার উপায়ই ছিলো না। আড়ি পেতে কথা শোনা ওদের সব্বারই অভ্যাস হয়ে গিয়েছিলো।

ও বললো, এই শোনো, আমি ভাবছি এবার এখান থেকে উঠে গিয়ে আলাদা বাসা করবো।

শুনে আমার এত ভালো লাগলো। বাব্বা, বাঁচা যাবে এই নরকযন্ত্রণা থেকে। মুক্তি পাবো। খাই না-খাই, নিজের ইচ্ছেয় চলে-ফিরে বেড়াতে পারবো।

ও মাঝে মাঝে বাসা খুঁজতে যেতো বিজ্ঞাপন দেখে দেখে, এসে বলতো কি কি সুবিধে, কি অসুবিধে।

ও কত কি কল্পনা করতো, কিভাবে ঘর সাজাবে, এই অল্প মাইনেতেও কি করে সুন্দর একটা সংসার চলে যাবে সেসব কথা শুনতে শুনতে আমি মুগ্ধ হয়ে যেতাম।

ও একদিন এসে বললো, একটা বাসা প্রায় ঠিক করে এসেছি, দাদাকে কালই বলে ফেলবো। এমনভাবে বললো যেন দাদাকে বলতে ওর খুব ভয়।

আমি কিন্তু সেসব কথা চিন্তার মধ্যেই আনলাম না। আমি দুম করে বলে বসলাম, এই, নতুন বাসাতে গিয়ে তুমি একটা জিনিস আমাকে কিনে দেবে?

ও হেসে বললো, কি?

—একটা ড্রেসিং টেব্‌ল। আমি হেসে ফেলে বললাম, আমার না এত সাজতে ইচ্ছে করে, একটা ড্রেসিং টেব্‌ল নেই বলে...

দোজবরে বর তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে যেন সান্ত্বনা দিচ্ছে এমনিভাবে ও আমাকে বললো, হবে, হবে। একটু গুছিয়ে বসতে দাও আগে।

গুছিয়ে বসা যে এত কঠিন আমরা জানতাম না। আলাদা বাসা করা, আলাদা সংসার চালানো এত শক্ত!

মাসের প্রথম মাইনে পেয়ে ন'খানা দশ টাকার নোট—কড়কড়ে নব্বইটা টাকা বাড়িওয়ালার হাতে তুলে দিতে কি যে কষ্ট তা আর বলে বোঝানো যায় না। কেবলই মনে হতো বাকী মাসটা চলবে কি করে। হিসেব নিয়ে প্রায়ই কথা কাটাকাটি হতো। সব সময়েই টাকার অভাব আর টাকার অভাব। টাকার কথা শুনলেই ও এক-একদিন তেলেবেগুনে জ্বলে উঠতো। অথচ আমিই বা কি করে চালাই। মণ্টু তখন কোলে, তার দুধ, ফলের রস, আমাদের র‍্যাশন বাজার, একটা পয়সাও তো বাজে খরচ করি না। অথচ ও এমন ভাব করতো যেন আমি শুধু আমার শাড়ি আর গয়না কিনছি।

ও এই সময়ে একটু ট্যুইশনি নিলো। বললো, যা তিরিশ-চল্লিশ টাকা পাওয়া যায়।

ওর শরীরও ভেঙে পড়ছিলো। চোয়ালের হাড় দেখা যায়। ওর জন্যে আমার মায়া হতো, কিন্তু ট্যুইশনিটা না করলে চলবেই বা কি করে।

ও বললো, ক্লাস টেনের একটি মেয়েকে পড়াতে হবে, দেবে তিরিশ টাকা।

—ছাত্রী? আমি বললাম, দেখতে কেমন?

ও হেসে বললো, খুব সুন্দরী, আর বুদ্ধিমতীও খুব।

ও ঠাট্টা করেই বললো। আমিও ঠাট্টা করলাম। কিন্তু ওর ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস ছিলো। তবু রোজ ফিরে এসে, কিংবা যখন-তখন ও ওর ছাত্রীর কথা বলতো। সে কি বলেছে, কি গল্প করেছে।

মনে মনে আমি কি ওকে সন্দেহ করতে শুরু করেছিলাম? জানি না। কিন্তু একদিন খেতে বসে ও যেই ওর ছাত্রীর কথা বললো, আমি রেগে গিয়ে বললাম, তুমি তাকে পড়াও কখন, রোজ যদি এত গল্প করো।

ও গুম হয়ে রইলো, উত্তর দিলো না।

আমি ভাবলাম, তবে কি আমার ওপর ওর আর কোনো টান নেই। আমাকে ও আর ভালো-বাসে না? ঐ ছাত্রীটাকেই ও ভালোবাসতে শুরু করেনি তো!

মাঝে মাঝে আমি বিকেলে স্নান করে একটু সাজগোজ করতে শুরু করলাম। ভাবলাম, এইভাবেই হয়তো ওর মন পাবো। ওর দাড়ি-কামানো আয়নার সামনে মেঝেয় বসে খোঁপা বাঁধতাম, ঘাড়ে ভিজে গামছা ঘষে মুখ মুছে কত যত্ন করে সিঁথেয় সিঁদুর দিতাম। কিন্তু নতুন শাড়ি পরে আমার সমস্ত শরীরটা কেমন দেখাচ্ছে, পিছনে গোড়ালি দিয়ে পাড়টা চেপে ধরে ঠিক ঠিক হলো কি না বুঝতে পারতাম না। তবু আমার চেষ্টার ত্রুটি ছিলো না। একদিন রাস্তা দিয়ে একজন বেলফুলের মালা বেচতে যাচ্ছিলো, আমি একটা মালা কিনে খোঁপায় জড়ালাম। ও দেখলোই না। আমি লক্ষ করছিলাম, ও আজকাল আর আমার দিকে ভালো করে তাকায় না।

এই সময়ে আমি মাসে মাসে পাঁচ-দশ টাকা করে ওকে না জানিয়ে জমাতে শুরু করে-ছিলাম। কত কষ্টে যে জমাতাম আমিই জানি। আমার তখনো ইচ্ছে হতো একটা ড্রেসিং টেব্‌ল কিনি। আমি একদিন পাশের বাড়ির রুমির মাকে জিগ্যেসও করেছিলাম। রুমিদের বাড়িতে একটা সাদামাটা ড্রেসিং টেব্‌ল ছিলো। রুমির মা বললো, দেড় শো টাকা।

আমার তাই একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ালো ঐ দেড় শো টাকা জমানো। ঐ দেড় শো টাকা

জমিয়ে কিনবো। আমার সেই ইস্কুলে পড়ার দিন থেকে, সেই রানীর বিয়ের দিন দেখে আসার পর থেকে সারা জীবন ধরে যে সাধটুকু লুকিয়ে রেখেছি সেটা মিটিয়ে ফেলবো। সাতাশ বছর বয়সেও যদি সেটুকু মেটাতে না পারি তবে আর কবে মেটাবো।

হ্যাঁ, সাধটা মনের মধ্যে পুরে রেখে সাধ্য যোগাড় করতে করতে কতবার অসুখ-বিসুখে কিংবা টানাটানিতে খরচ হয়ে গেছে। আবার নতুন করে জমাতে শুরু করেছি।

যে মাসে সত্যি সত্যি দেড় শো টাকা হলো সেদিন আমার কি আনন্দ। ঠিক করে ফেললাম, ও ফিরলেই ওকে বলবো।

আঃ, একটা ড্রেসিং টেব্‌ল এত দিনে কিনতে পারবো। সুন্দর একটা ড্রেসিং টেব্‌ল, বড় একটা আয়না থাকবে, স্নো ক্রীম পাউডার টিপ লিপস্টিক সব—সব কিনবো, সাজিয়ে রাখবো তার ড্রয়ারে। গদি-আঁটা টুলটায় বসে সাজবো, শাড়ি বদলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ করে দেখতে পাবো...

ওর কত ছাত্র কত ছাত্রী এই ক' বছরে বদলে বদলে গেল, কিন্তু আমাদের অবস্থা একটুও বদলালো না। ও তখন দু-দুটো ট্যুইশানি সেরে রাত করে ফিরতো। মন্টুর পড়াশুনো ও একটুও দেখতো না। কখন দেখবে বেচারী!

আমি মন্টুকে বললাম, এই ঘরে একটা ড্রেসিং টেব্‌ল হলে কেমন মানাবে বল তো!

মন্টু তো এ গল্প কতবার শুনেছে, তবু খুশী হয়ে বলে উঠলো, সত্যি কিনবে মা?

ওর বাবাকে সেদিনই একসময় বললাম, এই, আমি অনেক টাকা জমিয়েছি, আমাকে সেই জিনিসটা কিনে দেবে?

ও বিরক্তির সঙ্গে তাকালো আমার দিকে।—জমিয়েছো? টাকা?

বললাম, হ্যাঁ। কিন্তু কিনে দেবে কি না বলো।

ও জিগ্যেস করলে, কি?

আমি হাসতে হাসতে বললাম, একটা ড্রেসিং টেব্‌ল।

আর সঙ্গে সঙ্গে, আমি ভাবতেও পারিনি, ও বলে উঠলো, যা চেহারা হয়েছে, আর ড্রেসিং টেব্‌ল কেনে না।

আমি লজ্জায় অপমানে চোখ বন্ধ করলাম। আমি একটাও কথা না বলে রান্নাঘরে চলে এলাম। পিঁড়িতে বসে কড়াইয়ে খুন্তি নাড়তে নাড়তে আমি নিজের মনেই কাঁদলাম।

আর ও বেরিয়ে যেতেই আমি ছুটে এসে ওর দাড়ি-কামানো আয়নাটায় নিজের মুখ দেখলাম। আরে, আরে, আমি এত বিচ্ছিরি দেখতে হয়ে গেছি! এত রোগা, রুগ্ন! আর আমার সেই কোমর পর্যন্ত লুটিয়ে পড়া চুল কোথায়! সিঁথির দু পাশের চুল ফিকে হয়ে হয়ে...

আমি আর নিজেকে দেখতে পারলাম না। বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়ে আমি ছোট ছেলের মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম।

। ১৩৭৬



নোনা জল

অচেনা পাড়ার এই নতুন ফ্ল্যাটে উঠে এসে অনীশের তখনো কেমন চোর-চোর ভাব। তার মতো মিশুকে মানুষটারও।

দুখানা খুদে সাইজের ঘর, আর তার সামনে দু ফুট ঝুলবারান্দা, বারান্দা থেকে থুতু ফেললে রাস্তার লোকের মাথায় পড়ে। ঋণা একদিন অভ্যাসবশে বারান্দায় দাঁড়িয়ে গামছা নিঙড়ে কি লজ্জায় যে পড়েছিলো! ছুটে পালিয়ে এসেছিলো ঘরের মধ্যে। রাস্তার লোকটা উপরের দিকে চোখ তুলে কি গালাগাল দিয়েছিলো কে জানে।

কিন্তু পাড়াপড়শীর সঙ্গে ঋণার দু-দিনেই বেশ আলাপ হয়ে গেছে। অনীশ এখনো মাথা নিচু করে রাস্তা হাঁটে, আপিস-ফেরতা কারও কারও সঙ্গে চোখাচোখি হলে চোখ নামিয়ে নেয়। পাড়ার দু-একজন যেচে আলাপ করতে এলেও অনীশ দুটো কথা বেশী বলার চেষ্টা করেনি।

দরকার হয়নি। টুয়া একাই এক শো। চার-পাঁচটা দাঁত বেরিয়ে গেছে। দু-একটা শক্ত শক্ত কথাও হঠাৎ হঠাৎ বলে ফেলে। আর অনীশ-ঋণা দুজনেই চমকানো খুশিতে হেসে ওঠে। —ওমা, কি বললি রে টুয়া? বল, আবার বল।

অনীশ হাতঘড়িটায় দম দেওয়া হয়েছে কি না জিগ্যেস করবে বলে ডাকলো, ঋণা!

অমনি টুয়া টলমল টলমল পায়ে ছুটে গেল চৌকাঠের দিকে, তারপর দরজার ফাঁকে মুখ বাড়িয়ে বলে উঠলো, ইনা, ডাকছে!

'ডাকছে' কথাটাও তো স্পষ্ট বের হয় না, 'ডাচ্ছে' হয়ে সেটা বেরিয়ে এলো ওপর পাটির দুটো আর নীচের পাটির দুটো দাঁতের ফাঁক দিয়ে।

আরেক দিন ঋণা হাঁক দিলো বাচ্চা চাকরটাকে, আনন্দ, কাপটা দিয়ে যা তাড়াতাড়ি।

সঙ্গে সঙ্গে টুয়া বলে উঠলো, আন্দ, তাতাড়ি।

অনীশ আর ঋণা তো হেসে লুটোপুটি। টুয়াকে জড়িয়ে ধরে, বুকে চেপে, গালে গাল ঘষে আদরে আদরে ডুবিয়ে দিলো।

অনীশ আপিস থেকে ফিরলেই একটা-না-একটা খবর তার জন্যে অপেক্ষা করে।—এই, জানো আজ কি করেছে? ঐ মোড়াটা নিয়ে দু হাতে তুলে এ-ঘর থেকে ও-ঘর অবধি গিয়েছে।

অনীশ হেসে বলেছে, গামা পালোয়ান। কিরকম হাঁটে দেখো না।

—আজ কি হয়েছে জানো, তৃপ্তিদি এসেছিলেন...

অনীশ আবার একটা নতুন চমকের অপেক্ষায় চোখ তুলেছিলো, হঠাৎ ভোল্টেজ বেড়ে গেলে বাল্‌বের যেমন হয়, চোখে ঔৎসুক্য ফুটে উঠলো—তৃপ্তিদিটি আবার কে!

ঋণা হাসলো।—বাঃ রে, রঙিন ছাতা মাথায় দিয়ে ছেলেকে স্কুলে নিয়ে যান। বাঁ দিকের শেষ ফ্ল্যাটে থাকেন...

অনীশ নিরুৎসাহ গলায় বললো, এসেছিলেন বুঝি?

—রোজই বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথা হয়। আজ ডাকলাম।

ঋণা আরো কি বলতে যাচ্ছিলো, টুয়া খেলা করতে করতে বলে উঠলো, মাসী কই।

ব্যস্, ঐ এক কথা, মাসী কই।

ঋণা হেসে বললো, খুব আদর করেছেন তো ওকে, বললাম, টুয়া, তোমার মাসী হয়, মাসী। সেই থেকে মাঝে মাঝেই 'মাসী কই'।

বলে হেসে উঠলো ঋণা, অনীশও। টুয়াকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করতে করতে খাটে গড়িয়ে পড়লো অনীশ, বুকের ওপর টুয়াকে দাঁড় করালো।

টুয়া অমনি বলে উঠলো, পয়ে যাচ্ছে।

অর্থাৎ পড়ে যাচ্ছি।

সেদিনও এমনি আপিস থেকে ফিরে টুয়াকে কাঁধে বসিয়ে ড্রেসিং টেবিলের লম্বা আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছে অনীশ, একটা ফুটফুটে বাচ্চা ছেলে পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকলো।

—আরে বাবুল! বলেই তার দিকে ছুটে গেল ঋণা, বললো, একা এসেছো?

পর্দার ওপার থেকে প্রথমে চটির শব্দ, তারপর গলা।—ইস্, মাকে ছেড়ে আসার ছেলে কিনা!

পর্দা সরিয়ে তৃপ্তিদিকে দেখে একটু অপ্রতিভ হয়েই সারা মুখ হাসিতে উছলে উঠলো ঋণার। বললো, আসুন, আসুন।

তৃপ্তির মুখ। অনীশ দেখলো, সঙ্কোচ কাটিয়ে হাসলো।

—নমস্কার। আপনার সঙ্গে তো আলাপই হয় না। তৃপ্তি হাসলো মিষ্টি করে।

তারপর ঋণার দিকে তাকিয়ে বললো, ভাবলাম বিনা নোটিসে এসে পড়ে একটু সিনেমা-টিনেমা দেখে ফেলবো...

ঋণা হেসে উঠলো।—সিনেমা-থিয়েটার আপনাদের, সেদিন রিকশায় যাচ্ছিলেন কর্তার সঙ্গে...

—তোমাদের তো সব সময় গ্রীনরুম, ওঁকে তো রাস্তায় দেখি পায়ের দিকে তাকিয়ে হাঁটেন। আরে বাবা, আমরাও এমন কিছু কুচ্ছিত না।

ঋণা আর অনীশ দুজনেই শব্দ করে হেসে উঠলো।

ঋণা বললো, ইস্, আপনি তো রীতিমতো সুন্দরী।

তৃপ্তি ঠোঁট ওলটালো।—ছাই! এত দিন তবু একটা গর্ব ছিলো, কিন্তু এই যে যেচে আলাপ করতে এলাম, সুন্দরী হলে তো ওঁরই এতক্ষণ যেচে কথা বলার কথা।

ঋণা হেসে বললো, আমি রয়েছি যে।

তৃপ্তি ততক্ষণে টুয়াকে কোলে তুলে নিয়েছে, আর ঋণা যত হাত বাড়িয়ে বলছে, টুয়া এসো, ততই সে ঘাড় নাড়ছে জোরে জোরে।—নান্না, নান্না।

তৃপ্তি চলে যাওয়ার সময় সে কি কান্না টুয়ার!

রাত্রে খেতে বসে অনীশ বললো, ভদ্রমহিলা বেশ। খুব মিশুকে।

ঋণা হেসে উঠে বললো, বেশী মেলামেশা কোরো না বাপু! যা মুখফস্কা কথাবার্তা ওঁর!

অনীশ বললো, ছেলেটাও বেশ শান্তশিষ্ট, কি নাম যেন?

বাবুলের নামটা ঠিকই মনে ছিলো, তবু অকারণেই ও ভুলে যাওয়ার ভান করলো।

ঋণা ঠোঁট টিপে হেসে বললো, ভদ্রমহিলার নামটা ভুলে যাওনি তো!

প্রথম প্রথম বেশ ভালোই লাগতো। এমন সাদা মন, তার ওপর ফুর্তির তুবড়ি যেন। কিছুক্ষণ কাছে থাকলে ঋণার মনটা খুশী হয়ে ওঠে। টুয়াকে সত্যি সত্যি খুব ভালোবেসে ফেলেছেন তৃপ্তিদি। কিন্তু অনীশের সঙ্গে এত ঠাট্টা-ইয়ার্কির কি দরকার।

অবশ্য ঋণাই বা বলতে ছাড়বে কেন। অনীশকে ওর সন্দেহ হয়নি, তবু যে লোকটা ট্রাম-বাসের ভিড়ের দোহাই পেড়ে সাতটার আগে ফিরতো না, সে হঠাৎ সাড়ে পাঁচটায় এসে হাজির হলো যে। আর এলোই যদি তো সিনেমার টিকিট কেটে আনলেও বুঝতো।

অনীশ তখনো জুতোর ফিতে খুলছে, ঋণা হেসে বললো, কি ব্যাপার?

অনীশ বুঝলো, তবু হেসে বললো, মুশকিল হলো দেখছি, তাড়াতাড়ি ছুটি পেলেও এখন আর বাড়ি ফেরা যাবে না। শরীর খারাপ হলেও...

—তাই বলেছি! ঋণার মুখে উৎকণ্ঠার প্রলেপ পড়লো।—সত্যি, শরীর খারাপ?

—ও কিছু না। কথাটা গ্রাহ্য করলো না অনীশ। শুধু ক্ষণিকের জন্যে মনে পড়লো বিয়ের পর কত দিন ঋণা ওর জুতোর ফিতে খুলে দিয়েছে জোর করে, শরীর খারাপ বললেই কপালে হাত ছুঁইয়েছে।

ও তাই ইচ্ছে করেই একটু শরীর খারাপের ভান করলো। কিন্তু মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠলো ঋণার ওপর। ওকে এত খারাপ ভাবছে কেন ঋণা! তৃপ্তি এলে সমস্ত ঘরখানা চঞ্চল খুশিতে ভরে ওঠে, মন রজনীগন্ধা হয়ে ওঠে—এইটুকুই। আর কিছু নয়।

তৃপ্তিদি, তৃপ্তিদি, তৃপ্তিদি!, চেনে বাঁধা চাবির রিং ঘোরাতে ঘোরাতে রাস্তার মাঝেই থমকে থেমে পড়বে: আরে অশোক যে! আজকাল নাকি খুব এমব্রয়ডারি-করা রুমাল নিয়ে ঘুরছো? কিংবা পাড়ার বাচ্চা ছেলে তমালকে: মর্নিং সেকশন ছুটি হবার সময় হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি যাও, মেয়েরা বেরিয়ে পড়েছে।

সুন্দর শরীর জুড়ে উচ্ছলতা। এক-একসময় তৃপ্তিদির এই গায়ে-পড়া স্বভাব ভীষণ খারাপ লাগে ঋণার, এক-একসময় হিংসে হয়। ও নিজে কেন এমন উচ্ছল হতে পারে না?

এদিকে অনীশের তখন চোখ পড়েছে দেয়ালে ঠেসানো জিনিসটার দিকে।—ওটা আবার কি রেখেছো?

—আজ্ঞে আমি না। ঋণা জবাব দিলো।—আপনার ফ্রেন্ড রেখে গেছেন।

একটু থেমে অনীশের অপ্রতিভ মুখটার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললো।—ক্যারাম বোর্ড। তৃপ্তিদি রেখে গেছেন।

বলতে না-বলতে এসে হাজির। হাতে ফ্রেঞ্চ চকের টিন।

ক্যারাম খেলার আড্ডা বসলো। সন্ধ্যেবেলায় এসে হাজির হবে প্রতি দিন। বেচারা ঋণার কাজ হয় না, টুয়াকে খাওয়াতে দেরি হয়ে যায়, অনীশ উঠতে চায় না।

—ভদ্রলোক সেল্‌স্‌ম্যানের চাকরি করেন, অর্ধেক দিন কলকাতার বাইরে। ঋণা একদিন বলেছিলো।

অনীশ তাই বলেছিলো, বেচারা তৃপ্তিদির দোষ নেই, সময়ই বা কাটাবে কি করে।

—সময় কাটাবার জন্যে কি তুমি ছাড়া লোক নেই?

শুনে কখনো রাগে চুপ করে থাকে অনীশ, কখনো হেসে ওঠে।

কিন্তু ঋণার কাছে ক্রমশই যেন অসহ্য হয়ে ওঠে ব্যাপারটা। সিনেমা দেখতে যাওয়ার কথা হচ্ছিলো ক'দিন ধরে, হঠাৎ তৃপ্তিদির সামনে অনীশ ফস করে বলে বসলো, আপনিও চলুন না।

—বেশ তো, নিয়ে গেলে আর যাবো না কেন।

সমস্ত শরীর চিড়বিড় করে উঠলো ঋণার, ক্রুদ্ধ চোখে একবার তাকালো অনীশের মুখের দিকে, তারপর বলে উঠলো, বাঃ রে, উনি গেলে কি করে হবে!

চমৎকার অভিনয়ে হেসে উঠলো ঋণা। টুয়াকে তো ওঁর কাছেই রেখে যাবো ভেবেছিলাম। উনি তো বলেছিলেন...

তৃপ্তিও ততক্ষণে হেসে উঠেছে।—ওমা, আমিও তো বাবুলের কথা একদম ভাবিনি।

কিন্তু কতটুকুই বা বাধা দেবে ঋণা, কতবার? মাঝে মাঝে একটা বাটি হাতে এসে হাজির হতো তৃপ্তি, বলতো, আজ কচুর শাক রান্না করেছি ঋণা, নিয়ে এলাম তোমার জন্যে।

ইস্, 'তোমার জন্যে'! মুখে হাসি মাখিয়ে সমস্ত শরীর তার ভিতরে ভিতরে বিষের তীর হয়ে উঠতো।

কিন্তু যেদিন অনীশের খাবার সময়ে এক বাটি মাংস নিয়ে এলো তৃপ্তি, অনীশের সামনে বাটিটা রেখে বসে রইলো, খান মশাই, খান, আপনার জন্যে স্পেশাল রান্না, সেদিন ঋণা দম আটকে ভাবলো, এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচে। তৃপ্তিদির কাছ থেকে।

—কোথায় কাপড় শুকোতে দিই বলো তো? বারান্দা নামেই, বর্ষাকালে এ বাড়িতে থাকা যায় না। ঋণা মাঝে মাঝে অনুযোগ করে।

শুধু কি বারান্দায় রোদ আসে না? অনীশ বুঝতে পারে এ পাড়ার এ বাড়ির কিছুই যেন পছন্দ নয় ঋণার। হয়তো অনীশকেও।

অনীশ বেশ বুঝতে পারে ঋণা অসুখী হয়ে উঠছে। সন্দেহ ঢুকেছে ওর মনের মধ্যে, তাই দিনে দিনে শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে।

—শীতকালে এ বাড়িতে থাকতে হলে দেখো, আমি ঠিক মরে যাবো, টি. বি. হবে আমার। ঋণা বলে।

অনীশ কপাল কুঁচকে বলে, কি আজেবাজে বলছো! বেশ, পছন্দ না হয়, বাড়ি খুঁজে দেখি।

—তুমি যাবে এ বাড়ি ছেড়ে? ম্লান হাসি দিয়ে অনীশকে বিন্ধ করতে চাইলো ঋণা।

ঋণাকে সত্যিই মাঝে মাঝে বড় বিষণ্ণ দেখায়। মনে হয়, ওর মাথার মধ্যে কি যেন ঘুরছে, কি যেন ঘুরছে। অসহ্য একটা যন্ত্রণা। বিষাক্ত একটা ভিমরুল।

সেদিন আপিস থেকে ফিরে চুপচাপ বসে রইলো অনীশ। কান সজাগ হয়ে রইলো, কখন বাবুলের আধো-আধো কথা শোনা যাবে, কিংবা তৃপ্তিদির চটির আওয়াজ। একবার ইচ্ছে হলো ক্যারাম বোর্ডটা পেতে ঋণাকেই ডাকে, তা হলে ঋণা অন্তত বুঝবে নেশাটা খেলার। কিন্তু একটুও ইচ্ছে হলো না।

কিন্তু কই, আটটা তো বেজে গেল, তৃপ্তি তো এলো না। তবে কি সেল্‌স্‌ম্যান স্বামী তার ফিরে এসেছে?

—আজ তৃপ্তিদিকে খুব শুনিয়ে দিয়েছি। খাবার টেবিলে বসে কথাটা না বলে পারলো না ঋণা।

অনীশ চমকে চোখ তুললো।

ঋণা চোখ না তুলেই থালার ওপর মাছের কাঁটা বাছতে বাছতে বললো, পাড়ায় যা বদনাম তৃপ্তিদির, শেষকালে আমারও হয়তো...

অনীশের মাথা ঝিমঝিম করে উঠলো। চোখ বুজে রাগ চাপার চেষ্টা করলো। তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে ছুরির ফলার মতো ধারালো কণ্ঠস্বরে বললো, না বললেও পারতে।

ঋণা চুপ করে রইলো।

অনীশ হঠাৎ বললো, দুর্গাপুরে ট্রান্সফার নিচ্ছি, প্রায় ঠিক হয়ে গেছে, তোমাকে বলিনি।

মুহূর্তে ঋণার সমস্ত মুখ খুশিতে ভরে উঠলো, দু চোখ ঝিকমিক করে উঠলো।—সত্যি? দুর্গাপুর? উঃ, চমৎকার, মামীমা আছেন সেখানে, ব্যারেজের ধারে রোজ বেড়াতে যাবো!

অনীশ হাসি-হাসি মুখে তাকালো ঋণার দিকে।

তারপর বললো, বাড়িটা সত্যি—এখানে আলো নেই, হাওয়া নেই। মুখার্জিসাহেবকে বললাম, তোমার শরীর খুব খারাপ হচ্ছে.

—সত্যি? আমার, আমার জন্যে? ঋণার দু চোখের ঝকঝকে হাসি দু ফোঁটা জল হয়ে গেল।

কিন্তু এ কি হলো? এমন তো চায়নি ঋণা!

গর্বে ওর বুক ভরে গিয়েছিলো সেদিন। নিজের ওপর নিজেরই রাগ হয়েছিলো। অনীশ অবশ্য এমনিই একটু চাপা স্বভাবের। তাই মুখে কিছু বলেনি, অথচ ঋণার কথা বিশ্বাস করে ট্রান্সফারের চেষ্টা করেছে। ট্রান্সফার নিয়েছে।

দুর্গাপুরে এসে সেই মানুষটাই কি করে এমন বদলে গেল, ঋণা বুঝতে পারে না।

—তোমার কি হয়েছে বলো তো? আপিসে কিছু? নির্বোধের মতো একদিন প্রশ্ন করেছিলো।

—কি আবার হবে! এমন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলো অনীশ, এমন মুখভঙ্গি করেছিলো যে, সেদিন আর কোনো কথাই বলেনি ঋণা। অপমানে চোখ ঠেলে জল এসেছিলো।

তবু মনকে স্তোক দিয়েছিলো ঋণা, ভেবেছিলো, হয়তো আপিসের কাজের চাপেই এমন বিরক্ত হয়ে থাকে অনীশ। কিন্তু দিনের পর দিন লোকটা এত দূরে সরে যাচ্ছে কেন! টুবাকে বুকের ওপর দাঁড় করিয়ে আর তো কই আদর করে না। ঋণাকেও কেমন এড়িয়ে এড়িয়ে চলে। যেচে দু-একটা কথা বলতে গিয়েছে ও, আর অনীশ 'হুঁ' 'হ্যাঁ' করে দু-এক কথায় উত্তর দিয়েছে। আপিসের পর আপিসের বন্ধুদের নিয়ে সেই যে বেরিয়ে যায়, রাত দশটা অবধি একবারও যেন ঋণার কথা মনে পড়ে না।

টুয়ার জন্যে একটা নতুন সোয়েটার বুনতে বুনতে নিজের মনে মনেই ঋণা বললো অনীশকে শুনিয়ে শুনিয়ে, তখন ভেবেছিলাম রোজ ব্যারেজের দিকে বেড়াতে যাবো!

—গেলেই পারো।

যেন একটা অচেনা অজানা মানুষের প্রশ্নের জবাব দিলো অনীশ।

অভিমানে অপমানে মুখ সাদা হয়ে গেল ঋণার। ও কি একা বেড়াতে যাওয়ার কথা বলেছে? ও কি শুধু নিজের কথাই ভাবে? অনীশের মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলার জন্যে কি এক মাস কম চেষ্টা করেছে ও! তবু বোঝে না কেন অনীশ।

দমবন্ধ-হওয়া কষ্ট লুকিয়ে ঋণা বললো, কান্না-কান্না গলায় বললো, কি হয়েছে তোমার বলবে তো? কেন তুমি আজকাল এত খিটখিটে হয়ে উঠছো?

উত্তেজিত হয়ে উঠলো ঋণা।—কত দিন তোমাকে হাসতে দেখিনি বলো তো?

অনীশ গম্ভীর আক্রোশের গলায় চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, সে কি! আমায় হাসতে দেখলেই তো তুমি হিংসেয় জ্বলে যাও।

বলেই উঠে চলে গেল অনীশ। আর সঙ্গে সঙ্গে ঋণার চোখের সামনে থেকে একটা পর্দা সরে গেল। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে অনীশের চলে যাওয়ার দিকে, সংসারকে লাথি মারা ভঙ্গিতে ফেলা তার পায়ের দিকে তাকিয়ে রইলো ঋণা।

কি আশ্চর্য! এত দিন এই সত্যটুকু ওর চোখে ধরা পড়েনি?

সমস্ত রাত বিছানায় ছটফট করলো ঋণা। অসহ্য এক কষ্টে। ভুল, ভুল। ভুল করেছে ও। নোংরা ঈর্ষায় জ্বলেছে ও তখন, অথচ বুঝতে পারেনি তৃপ্তিদি ওদের সংসারে এক ঝলক আনন্দ এনে দিয়েছিলেন। আর অকারণ সন্দেহে নিজেকে কষ্ট দিয়েছে ঋণা, অনীশকে কষ্ট দিয়েছে।

তৃপ্তিদি কি অনীশকে ভালোবেসে ফেলেছিলো? কই, চলে আসার দিনে তো মুখ দেখে মনে হয়নি। অনীশও বিচ্ছেদ-ব্যথা পেয়েছে বলে মনে হয়নি। আর তাই যদি সত্যি হতো তা হলে কি অনীশ নিজেই চেষ্টা করে ট্রান্সফার নিতো!

তৃপ্তিদির মধ্যে কি এক জাদু আছে, এক-একজনের মধ্যে থাকে, তাই তার সংস্পর্শে এসে ঋণা নিজেও তো প্রথম প্রথম সুখী হয়ে উঠেছিলো। অথচ অনীশ খুশী হয়ে উঠলে কেন সন্দেহে জ্বলেছে ও?

'আমায় হাসতে দেখলেই তো তুমি হিংসেয় জ্বলে যাও।' কথাটা ক'দিন ধরেই ঋণার মাথার মধ্যে ভিমরুল হয়ে ঘুরলো। সত্যি। অনীশের ওপর সত্যি অবিচার করেছে ও। কিন্তু কি লাভ হয়েছে ঋণার? তৃপ্তিদি ছিলো, তবু সুখ ছিলো, আনন্দ ছিলো ওদের দুজনের জীবনেই। সেখান থেকে সরিয়ে এনে যেটুকু সম্বল ছিলো তা-ও হারিয়ে ফেলেছে।

তার চেয়ে আগের জীবনে ফিরে যেতে পেলে বেঁচে যাবে ঋণা। সেই একটু সন্দেহ, একটু ভয়, কিন্তু অসীম আনন্দ। খাটে শুয়ে রবিবার দুপুরে হয়তো অনীশ আবার আগের মতোই ওর চুল এলোমেলো করে দেবে। টুয়া কখন কি নতুন কথা বললো তা নিয়ে দুজনে মিলে চমকে উঠতে পারবে, হাসতে পারবে প্রাণ খুলে। অনীশ আবার টুয়ার জন্যে তাড়াতাড়ি আপিস থেকে ফিরবে।

আঃ, কি যন্ত্রণা! কি করে সে কথা মুখ ফুটে বলবে ও! কি করে ফেলে-আসা জীবনে, ছেড়ে-আসা ফ্ল্যাটে ফিরে যেতে পারবে।

—শুনছো! হাত বাড়িয়ে অনীশের তন্দ্রাঘোরের শরীরটা ছুঁলো ঋণা।

অনীশ বুঝতে পারলো, তবু উত্তর দিলো না।

—এই, এই, শোনো না। বলেই কেঁদে ফেললো ঋণা, অনীশের বুকের ওপর মাথা রাখলো।

অনীশ ঘুম-ভাঙা হাতখানা তুলে ঋণার মাথায় রাখতে গেল বুকের ওপর ভিজে-ভিজে ঠেকতেই। কিন্তু হাতটা নামিয়ে নিলো, সান্ত্বনা দিতে ইচ্ছে হলো না।

ঋণা তবু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললো, আমি—আমি এখানে থাকলে মরে যাবো, শুনছো, তুমি আমাকে কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে চলো।

—কলকাতায়? অনীশ বিস্ময়ের দুটি চোখে অন্ধকার ঠেলে সিলিঙের দিকে তাকালো।

ঋণা ওর বুকের ওপর মুখ ঘষতে ঘষতে বললো, আমাদের সেই ফ্ল্যাটে।

সেই ফ্ল্যাটে নয়। চিঠি লিখে দু মাস অপেক্ষা করে সেই পাড়াতেই আরেকটা ফ্ল্যাট যোগাড় হলো। ট্রান্সফার নিলো অনীশ অনেক চেষ্টা করে।

আর ঋণা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো, আর হিংসেয় জ্বলবে না ও, সন্দেহের আগুনে নিজেকে পোড়াবে না।

—কি মশাই, কি অত ভাবছেন?

ঋণা ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় দাঁড়িয়ে চুল বাঁধছিলো। অনীশ একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছিলো তাকে? না কি অন্য কিছু ভাবছিলো?

চুলের কালো ফিতেটা দাঁতে চেপে, ঋণার ফর্সা গালে সেটা চেপে বসেছে, ঋণা চুল বাঁধছিলো। তৃপ্তিদির গলা শুনে ফিরে তাকালো।

দেখো কান্ড! কপাল কুঁচকে উঠলো ঋণার।

তৃপ্তিদি পিছন থেকে এসে অনীশের চুল এলোমেলো করে দিলেন।—কি, সেই ফিরে আসতে হলো তো আমার টানে! জানি আসতে হবে।

বলেই খিলখিল করে হেসে উঠলেন দু কাঁধ ঝাঁকিয়ে।

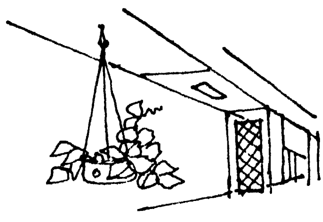
ঋণা তাকালো অনীশের দিকে, দেখলো অনীশের সারা মুখ হাসিতে উচ্ছল হয়ে উঠেছে। অসহ্য কষ্টে দাঁতে ঠোঁট কামড়ে রইলো ঋণা।

কপাল আরো কুঁচকে উঠলো।

ঋণা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলো, আর বাধা দেবে না, হিংসেয় জ্বলবে না, সন্দেহে পুড়বে না। তা হলেই ওর নিজের জীবন সুখে সহজ হয়ে যাবে।

কিন্তু পারলো না। ধীরে ধীরে তীক্ষ্ন কর্কশ গলায় বিষাক্ত তীরের মতো কথাটা ছুঁড়ে দিলো।—না। আপনার ভয়েই পালিয়েছিলো ও, আপনার ভয়ে!

| ১৩৭৬



দিনকাল

আমাদের বড় মেয়েকে নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তা ছিলো না। সে একটু ঠান্ডা প্রকৃতির, ছেলেবেলা থেকেই একটু বেশী লাজুক, এবং আমাদের দুজনেরই খুব বাধ্য ছিলো। তার বি. এস-সি. পরীক্ষার ফল বের হওয়ার আগেই হঠাৎ একটু ভালো যোগাযোগ হয়ে গেল, অরুণা বললে ছেলেটি চমৎকার, তার বাড়ির পরিবেশটিও আমার পছন্দ হয়েছিলো, আমি অরুণার সামনেই একদিন রুবিকে ডেকে জিগ্যেস করলাম, এ বিয়েতে তোর মত আছে তো রুবি? রুবি বিষম লজ্জিত মুখ করে আমার সামনে থেকে পালিয়ে গেল। পরে অরুণার কাছে শুনলাম সে নাকি বলেছে, আমার আবার মত কি, মেয়ের কিসে ভালো, বাবা-মা ছাড়া আর কেউ বোঝে নাকি! শুনে আমার সত্যি খুব ভালো লেগেছিলো। সৌভাগ্য আমাদের, ওরা সুখী হয়েছে।

আমার একমাত্র ছেলে অন্তুর বয়স এখন একুশ। অন্তুর ভালো নাম নিরুপম। ও যখন স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকলো তখন ওকে দেখে নিতান্তই বালক মনে হতো। অন্তু কখনো কখনো আমাদের লুকিয়ে চুল কাটার সেলুনে দাড়ি কামিয়ে আসতো, আমরা বুঝতে পারতাম, এবং ওর বড় হওয়ার চেষ্টা দেখে আমি ও অরুণা চোখাচোখিভাবে নিঃশব্দে হাসতাম। ঐ বয়স তো একদিন আমারও ছিলো, তখন কি করে নিজেকে পূর্ণবয়স্ক যুবক বলে ভাবতাম জানি না। আমার যত দূর মনে পড়ে যায় ঐ বয়সেই আমি প্রথম প্রেমে পড়ি। এবং সেটাই আমার জীবনের প্রথম ও শেষ প্রেম। সেসব দিনের কথা অরুণা কিছুই জানে না, জানলেও ও খুব একটা বিচলিত হতো বলে মনে হয় না। তবু আমার সেই কলেজ-জীবনের পরিচ্ছন্ন প্রেমটুকুকে বিশুদ্ধ রাখার জন্যেই অরুণার কাছে তার কোনো আভাস কোনো দিনই দিইনি। এমন কি আমার কখনো কখনো মনে হয়েছে, সেই পরম বঞ্চনা ও চরম আঘাতের কথা কাউকে বলতে গেলে এই বাহান্ন বছর বয়সেও হয়তো আমার চোখের পাতা ভিজে যেতে পারে।

অন্তুকে নিয়ে সেজন্যেই আমার দুর্ভাবনার শেষ ছিলো না। যৌবনের সেই হঠকারিতার পর থেকে প্রেম আমার কাছে একটি বিভীষিকা। তিরিশ-বত্রিশ বছর কেটে গেছে, সমস্ত স্মৃতি এখন ঝাপসা, কিন্তু প্রেমের মধ্যে, বিশেষ করে ব্যর্থ প্রেমের মধ্যে কি অসহনীয় কষ্ট, কি দুরন্ত জ্বালা, তা আমার আজও মনে আছে। আছে বলেই অন্তুকে নিয়ে আমার এত ভাবনা।

রুবি অন্তুর চেয়ে দু বছরের বড়। তার ফলে রুবির সঙ্গে কলেজে যে মেয়েরা পড়তো তাদের দু-একজন আমাদের বাড়ি আসতো। তারা কিন্তু কেউই অন্তুকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনতো না। আমাদের কাছে অবশ্য সেটুকুই সান্ত্বনা। আমি হাসতে হাসতে অরুণাকে একদিন বলে-ছিলাম, ভাগ্যি রুবি ওর ছোট বোন নয়! শুনে অরুণা অবাক হয়ে হেসে ফেলেছিলো।—কি যে বলো, প্রেম কি এত সস্তা নাকি!

আমি বলতে পারতাম না যে, প্রেম খুব সুলভ নয় বলেই আমার এত ভয়।

আসলে অন্তুকে আমরা দুজনেই যে খুব ভালোবাসি, দুজনেই যে তার জন্যে খুব গর্বিত, এটাই শেষ কথা নয়। আমরা তাকে রুবির মতোই সুখী দেখতে চেয়েছিলাম। এবং প্রেম সম্পর্কে আমার নিজের আতংক আমি নিশ্চয়ই অন্তুর উপর চাপিয়ে দিতে চাইনি। আমি মনে মনে এমন একটা উদার চিন্তাকেও লালন করেছি যে, অন্তু যদি কোনো মেয়েকে ভালোবাসে, তাকে বিয়ে করতে চায়, তা হলে আমি সম্মতি দেবো তো নিশ্চয়ই, এমন কি অরুণার মনে কোনো দ্বিধা থাকলেও আমি তা দূর করে দেবো। প্রকৃতপক্ষে প্রেমে আমার কোনো ভয় ছিলো না, ভয় ছিলো ব্যর্থ প্রেমে।

আমার সমবয়স্ক সহকর্মীদের কয়েকজনকে আমার রীতিমতো বৃদ্ধ মনে হতো। অথচ আমি নিজে কিছুতেই আমার নিজের বয়েসকে অনুভব করতে পারতাম না। সেজন্য সম-বয়স্কদের সঙ্গে আমার তেমন মেলামেশা ছিলো না। তাদের আলোচনায় আমি কোনো আকর্ষণ বোধ করতাম না, তাদের সুখদুঃখ আমাকে স্পর্শ করতো না। কারণ, চিন্তা-ভাবনায় বা মানসিকতায় আমি এখন যুবক। বাহান্ন বছরের যুবক, চাকরি থেকে অবসর নিতে আর ক' বছর বাকী আছে, সে হিসেব একদিন অন্যের মুখে শুনে আমি বিষণ্ণ বোধ করেছিলাম। তবে আমার সেই সহকর্মীর মতো বিব্রত বোধ করিনি। কারণ, লেখাপড়ায় অন্তু খুব উজ্জ্বল না হলেও তার পরীক্ষার ফল কখনো তার বুদ্ধিদীপ্ত মুখখানিকে আমার চোখে নিষ্প্রভ করে দেয়নি। অন্তু চিরকালই অত্যন্ত উৎফুল্ল চরিত্রের ছেলে। এবং অত্যন্ত কোমল স্বভাবের। তার ভবিষ্যৎ নিয়ে বিব্রত হবার কারণ ছিলো না।

পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে অন্তু স্বাভাবিক ব্যবহার করতো। সমবয়সী মেয়েদের সঙ্গে কখনো কখনো সে রাস্তায় যখন কথা বলতো বা কোনো বিষয় নিয়ে হাসাহাসি করতো তখন তার মধ্যে কোনো জড়তা থাকতো না। অল্প বয়স থেকেই সেই মেয়ে ক'টির সঙ্গে সে বড় হয়েছে, রাস্তায় ক্রিকেট খেলেছে, একদল হয়ে সরস্বতী পুজো করেছে। সুতরাং তাদের মধ্যে কারও সম্পর্কে অন্তুর কোনো দুর্বলতা আছে কি না আমি অকারণেই কখনো কখনো খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি। কখনো মনে হয়েছে তেমন কোনো সম্পর্ক আবিষ্কার করতে পারলে আমি খুশীই হবো, অরুণার সঙ্গে ভাগাভাগি করে মজাটুকু উপভোগ করবো।

অন্তু যেবার পোস্ট গ্র্যাজুয়েটে ভরতি হলো সেই বছরই আমি প্রথম নিজেকে একটু বয়স্ক মনে করতে পারলাম। রুবির বিয়ের সময় এই অনুভূতিটা আসেনি, বরং মনে হয়েছিলো রুবির বিয়েটা আমাকে জোর করে বয়স্কদের দিকে ঠেলে দিতে চাইছে। কিন্তু ছেলে বড় হলে নিজেরই বুড়ো হতে ইচ্ছে করে।

একবার অরুণার সঙ্গে পুজোর বাজার করতে বেরিয়েছিলাম, সঙ্গে অন্তু কিছুতেই যেতে চায়নি, তবু অরুণা তাকে জোর করে নিয়ে গিয়েছিলো একালের জামাইদের পছন্দ জানতে এবং রুবির জন্য শাড়ি বাছার কাজে সাহায্য পাবে বলে। সেখানে ভিড়ের মধ্যে লাজুকভাবে ও যে দুটি মেয়ের দিকে এক পলক তাকিয়ে দেখেছিলো আমি সে দুটি মেয়েকে লক্ষ করে-ছিলাম। এবং অন্তুর রুচি ও পছন্দ দেখে খুশী হয়েছিলাম।

তাই প্রথম যেদিন ওর কাছে একটি টেলিফোন এলো আমি ভয় পাইনি। ভীষণ মজা পেয়েছিলাম।

টেলিফোন তুলে 'হ্যালো' বলতেই একটি মধুর মেয়েলী কণ্ঠ জিগ্যেস করলো, নিরুপম আছে?

আমি বললাম, না, সে একটু বাইরে গেছে, এক্ষুনি ফিরবে।

আমি প্রথমটা বেশ আশ্চর্য হয়েছিলাম। আমাদের সময়ে কোনো মেয়ে এভাবে টেলিফোন করেনি। মেয়েদের গলা শোনবার জন্যে অন্যের বাড়ি থেকে আমরা তিনটি বন্ধু একবার টেলি-ফোন এক্সচেঞ্জে সময় জানতে চেয়ে ফোন করেছিলাম, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান অপারেটর মিষ্টি গলায় জবাব দিয়েছিলো এটুকুই মনে আছে। সেকালে অটোমেটিক টেলিফোন ছিলো না, অপারেটর বেশির ভাগই ছিলো অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান।

যে মেয়েটি নিরুপমের খোঁজ করছিলো তার নাম জিগ্যেস করতে আমার সংকোচ হলো, তা ছাড়া আমি একটু বেশী বেশী নরম গলায় উত্তর দিলাম। কারণ, আমি শুনেছিলাম আজ-কাল ঐ বয়সের ছেলেদের অনেক মেয়ে-বন্ধু থাকে, আমি বিস্মিত হয়েছি বা অপছন্দ করছি কোনোক্রমে জানতে পারলে মেয়েটি নিশ্চয় কলেজে তা রাষ্ট্র করে নিরুপমকে লজ্জায় ফেলবে।

তাই আমি মেয়েটিকে জিগ্যেস করলাম, নিরুপম ফিরে এলে তাকে কি কিছু বলতে হবে?

মেয়েটি এক নিমেষের জন্যে কি যেন ভাবলো, তারপর বললে, না, আমিই আবার ফোন করবো।

মেয়েটি নাম বললো না বলেই আমার মনে ঈষৎ খটকা লাগলো।

কিছুক্ষণ পরেই নিরুপম এলো। আমি সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করে বললাম, তোর ফোন এসেছিলো, এখনি আবার রিং করবে বলেছে।

আমার মনে হলো নিরুপম একটু অস্বস্তি বোধ করলো।

মিনিট পনরো বাদে টেলিফোন বেজে উঠলো আবার। নিরুপম রিসিভার তুললো। আমি সে ঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলাম, যাতে নিরুপম না মনে করে আমি তার দিকে কান পেতে আছি।

মেয়েটির এই ফোন করার ঘটনাটা আমার বাহান্ন বছরের মনে তোলপাড় আনলো, শুধু কৌতুকই নয়, রোমাঞ্চের স্পর্শও ছিলো ঘটনাটিতে। আমি অরুণাকে একসময়ে সে কথা বললাম, যদিও আমার মনে দ্বিধা ও ভয় ছিলো যে অরুণা হয়তো ঘটনাটিকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারবে না। অরুণা কিন্তু অবাক হয়ে সশব্দে হেসে উঠলো, হাসি থামলে ওর মুখের ওপর একটা মুগ্ধ ভাব ফুটে উঠলো। আমার মনে হলো ছেলের জন্য অরুণার কোনো দুশ্চিন্তা নেই, ও যেন একটু গর্বই বোধ করছে। এবং ঠিক তখনই আমার নিজেরও মনে হলো আমিও একটু গর্বিত বোধ করছি।

মেয়েটি টেলিফোনে অন্তুকে কি বলেছিলো আমার জানার কথা নয়। তার নাম হয়তো অন্তুকে জিগ্যেস করলেই জানতে পারতাম। কিন্তু আমি কিছুই জানতে চেষ্টা করিনি, যদিও আমার সে বিষয়ে যথেষ্ট কৌতূহল ছিলো। ফলে, কল্পনায় তিন-চারটি একালের সুন্দর সুন্দর নাম নিয়ে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করেছিলাম, এবং ভেবে নিয়েছিলাম মেয়েটি নিশ্চয়ই অন্তুর সঙ্গে কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় দেখা করার কথা বলেছে। কারণ, আমার মনে আছে, তখন অন্তুর কলেজে পর পর তিন দিন ছুটি ছিলো।

একটি মেয়ে আমার একুশ বছরের ছেলেকে বাড়িতে টেলিফোন করেছে—এই ছোট্ট ঘটনাটি আমার মনে এমনি চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলো যে আপিসের দু-একজন সহকর্মী বন্ধুকে না বলে পারিনি। তারা কেউ এ ঘটনার কথা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করেছে, কেউ একটি প্রেমোপাখ্যান শোনার মতো মুখভাব করে তা উপভোগ করেছে এবং তাদের নিজেদের যৌবনকাল কিভাবে বঞ্চিত হয়েছে তা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে। বলা অপ্রয়োজন যে, আমিও সেই কপট দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সুর মিলিয়েছি।

এর পর অন্তুর কাছে আরো কয়েকবার আরো ঘন ঘন মেয়েলী গলার টেলিফোন এসেছে। সেসব সময়ে কখনো আমি নিজেই রিসিভার তুলেছি, কখনো অরুণা। তখন আর আমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা 'মজা' নয়, বরং কখনো কখনো মনে হয়েছে অন্তু আমাদের যেন উপেক্ষা করছে, কিংবা যথেষ্ট শ্রদ্ধা করছে না। তা না হলে সে নিশ্চয় তার বান্ধবীদের বাড়িতে ফোন করতে নিষেধ করে দিতো। অন্তু যে লুকিয়ে লুকিয়ে অনেক দিন আগে থেকেই সিগারেট খাওয়া ধরেছে আমি জানতাম, তার পকেটে একখানা চিঠি পোস্ট করার জন্যে রাখতে গিয়ে দেশলাই দেখেছিলাম একদিন। আরেক দিন ও বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসার পরই আমি ঢুকতে গিয়ে এক রাশ ধোঁয়া এবং সিগারেটের গন্ধ পেয়েছিলাম। এই বয়সে সিগারেট খাওয়াকে আমি খুব দোষের মনে করতাম না, কিন্তু সেজন্যে আমার চোখের সামনে টেবিলে সিগারেটের প্যাকেট রাখলেও সহ্য করতে হবে এতখানি উদার আমি হতে পারিনি। ও অবশ্য তা করেওনি কোনো দিন এবং সম্ভবত ঐ বয়সে পুরো প্যাকেট সিগারেট কেনায় ওরা অভ্যস্তও হয় না। আমি নিজে ঐ বয়সে খুচরো একটি সিগারেট কিনে দোকানের দড়িতে ধরিয়ে নিতাম। সে যা-ই হোক, ঘন ঘন টেলিফোন আসা আমার কাছে প্রায় চোখের সামনে সিগারেট ধরানোর শামিল মনে হতো।

প্রথম দিকে ব্যাপারটা উপভোগ করলেও অরুণার কাছেও এটা আর কৌতুক রইলো না। দেখতাম, অরুণাও বিরক্ত হতো, এবং আমি জানতাম বিরক্তিটা আসলে ওর রাগ। 'জানি না', বা 'বলতে পারি না' গোছের উত্তর দিয়ে ও কোনো কোনো দিন রিসিভার নামিয়েও দিয়েছে।

আমি ঘরে বসে থাকলে অন্তু টেলিফোনে কাটা-কাটা কথা বলতো, অস্পষ্টভাবে উত্তর দিতো, এবং আমার তা শুনে বেশ মজা লাগতো।

—মেয়েটা কে রে? বেশ বিরক্তির সঙ্গেই একদিন অরুণা ওকে জিগ্যেস করেছিলো। আমি তখন অন্তুর চোখের দিকে তাকাতে পারিনি।

কলেজের দু-একটি মেয়ের নাম অরুণার কাছ থেকে জানতে পেরেছিলাম, কারণ তাদের কথা অন্তু সেদিনই হাসতে হাসতে বলেছিলো। তাদের কথা বলার সময়ে অন্তু এমন ভাব করলো যেন তারা নিতান্তই নাবালিকা এবং নির্বোধ, বোকার মতো কথা বলে এবং অন্তু যেন তাদের গ্রাহ্যই করে না।

অরুণা একদিন হাসতে হাসতে আমাকে বললো, টুকটুক মেয়েটাই তো ওকে বেশী ফোন করে, জিগ্যেস করলাম কেমন দেখতে, অন্তু নাক সিঁটকে যা বর্ণনা দিলো, কোনো ভয়ই নেই।

টুকটুক নামটা আমি আগেও একদিন শুনেছিলাম। তার ভালো নাম যে ঋতা তা-ও অরুণা বলেছিলো। আর আমি অবাক হয়ে ভেবেছিলাম, কলেজের মেয়েদের ডাকনামে পরিচিত হওয়া এ আবার কোন্ ধরনের আধুনিকতা। তাতে রুবি সেদিন এসেছিলো, বললে, তুমি বাবা এক্কেবারে সেকেলে। আমাদের সময়েও সব ছিলো মিনি দত্ত, টুলি মিত্র, ফুচু সান্যাল।

কিন্তু অন্তু টুকটুকের রূপের যে বর্ণনা দিক না কেন, একদিন আপিস থেকে ফিরতেই অরুণা চায়ের কাপ রেখে হাসতে হাসতে বললে, ছেলের তোমার কপালে অনেক দুঃখ আছে।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, কেন?

অরুণা হাসলো, বললে, সেই টুকটুক! সে আজ এসেছিলো।

তারপর একটু থেমে বললে, কি মিষ্টি চেহারা তুমি ভাবতে পারবে না, আর কি ভালো যে মেয়েটা! অন্তু কিনা ওকে দেখেও নাক সিঁটকোয়। ও ছেলের তা হলে কোনো মেয়েই পছন্দ হবে না।

আমি বললাম, ছেলের বউ করার জন্যে তাকে বুঝি তোমার খুব পছন্দ হয়েছে?

অরুণা হেসে ফেলে বললে, তা বলছি না, কিন্তু সেদিন যে অন্তু বললে, টুকটুক দেখতে

তেমন ভালো না! এর চেয়েও সুন্দর মেয়ে কি ওর কপালে জুটবে নাকি!

আমার মনে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে খটকা লাগলো। আমার মনে হলো টুকটুক সম্বন্ধে আমাদের যাতে কোনো সন্দেহ না হয়, সেজন্যেই ঐ মিষ্টি চেহারার মেয়েটাকে অন্তু খাটো করে দেখাবার চেষ্টা করছে। টুকটুককে দেখার জন্যে আমার তখন খুবই আগ্রহ; আমি ফিরে আসার আগেই ওরা দুটিতে চলে গেছে শুনে আমার খারাপ লাগলো। ভাবলাম, আরেকটু আগে কেন আসিনি।

এর দিন কয়েক পরেই দুপুরের দিকে আপিস থেকে বেরিয়েছি ইন্সিওরেন্সের প্রিমিয়াম জমা দিয়ে আসতে, হঠাৎ মেট্রোর নীচে অন্তুকে দেখলাম, সঙ্গে রীতিমতো সুশ্রী একটি মেয়ে। স্লিম চেহারা, একমাথা শ্যাম্পু-করা হালকা চুল। চোখ দুটি...সত্যি কথা বলতে কি, মেয়েটিকে এক নজরে দেখে নিয়েই আমি উলটো দিকে হাঁটতে শুরু করে দিয়েছিলাম, পাছে অন্তু আমাকে দেখে ফেলে। অর্থাৎ লজ্জা যেন আমারই।

আমি অরুণাকে এসে ফিসফিস করে বর্ণনা দিলাম মেয়েটির, আর অরুণা বললো, বা রে, ঐ তো টুকটুক।

টুকটুককে ভালো করে দেখার, কাছে বসে তার সঙ্গে কথা বলার আমার ভীষণ ইচ্ছে হতো। এবং আমার সবচেয়ে বড় কৌতূহল ছিলো তাকে দেখে বা তার সঙ্গে কথা বলে মেয়েটিকে যাচাই করে নেবার। আমার ধারণা ছিলো, তার সঙ্গে কথা বলে আমি তার ভিতরের চরিত্রটি আবিষ্কার করতে পারবো এবং সেই সঙ্গে ধারণা করে নিতে পারবো সে সত্যিই অন্তুকে ভালোবাসে কি না। কারণ, টুকটুক যথেষ্ট সুশ্রী বলেই আমার সেই পুরোনো ভয়টা মাঝে মাঝেই বুকের মধ্যে উঁকি দিতো। আমার কেবলই আশঙ্কা হতো, শেষ অবধি অন্তু না সেই চরম আঘাতটা পেয়ে বসে।

পুত্রসন্তান যুবক হয়ে উঠলে বাহান্ন বছর বয়সের বাপকেই সব সময়ে তটস্থ থাকতে হয়। আমি মাঝে মাঝে আপিসের ছুটির পর সহকর্মী বন্ধুদের সঙ্গে চৌরঙ্গীর দু-একটি রেস্টুরেন্টে গিয়ে চা খেতে খেতে আড্ডা দিতাম, কোনো দিন বা শ্রান্ত ক্লান্ত বোধ হলে তাদের সঙ্গে আউটরাম ঘাটের দিকে বা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে বায়ুসেবনের জন্যে বেড়াতে যেতাম। অস্বীকার করবো না, বাহান্ন বছর বয়সেও আমার বুকের ভেতরটা যুবক রয়ে গেছে বলেই আমি ঐসব সুদৃশ্য জায়গায় বেড়াতে গিয়ে কখনো কখনো সুদৃশ্য রমণীর দিকেও কয়েক পলক তাকিয়ে দেখেছি। কিন্তু ঐসব স্থানগুলি প্রেমের তীর্থস্থান জানতাম বলেই আমার বেড়ানোর জায়গাও সংকীর্ণ হয়ে গেল। কারণ, তখন একটাই আতংক, কোথাও না ওদের দুটিকে অর্থাৎ অন্তু ও টুকটুককে দেখে ফেলি। ওদের কোনো দিন যদি লজ্জায় ফেলি, আমাকে দেখতে পেয়ে ওদের সুন্দর সন্ধ্যা যদি নষ্ট হয়, তা হলে আমার অনুশোচনার যেন শেষ থাকবে না।

এই সময়েই অন্তুদের কলেজে পুজোর ছুটি হলো। অরুণার কাছে শুনলাম, টুকটুক তার বাবা-মার সঙ্গে দিল্লী বেড়াতে যাচ্ছে। টুকটুক নিজেই নাকি তাকে বলে গেছে।

অরুণা বললে, ছেলেটা একেবারে অমানুষ। আমার সামনেই টুকটুক বললে, নিরুপম, চিঠি দেবো, উত্তর না দিলে দেখবে মজা। অন্তু কি বললে জানো? বললে, রিপ্লাই কার্ড দিও, আর নয়তো এখনই খাম-পোস্টকার্ডের পয়সা দিয়ে যাও। সত্যি সত্যি ওর কাছ থেকে দুটো টাকা নিলো, আমার বকুনিতে কানই দিলো না।

টুকটুক যে দিল্লী চলে গেছে তা কয়েক দিন পরেই টের পেলাম। কারণ, অন্তুর নামে যে চিঠিখানি এলো, তার ঠিকানা দেখেই বোঝা গেল সেটি কোনো মেয়ের লেখা। আমি সে চিঠি নিজেই রেখে দিলাম, নিজেই অন্তুর হাতে তুলে দিলাম, অরুণাকে জানতেও দিলাম না। কারণ, আমার ভয় ছিলো, অরুণা সে চিঠি খুলে পড়তে পারে বা পড়ার পর ছিঁড়ে ফেলে দিতে পারে। ফলে ওদের মধ্যে একটা ভুল-বোঝাবুঝি ঘটতে পারে। এবং মা বা বাবা সে চিঠি পড়েছে বা নষ্ট করেছে জানতে পারলে অন্তু তখন নিশ্চয় আমাদের ঘৃণা করতে শুরু করবে।

কিছু দিন পরেই অরুণার কাছে শুনলাম টুকটুক ফিরে এসেছে। ফিরে এসেই সে নাকি অরুণাকে ফোন করেছিলো। অরুণা বললে, যা-ই বলো, টুকটুক আমাদের খুব ভালোবাসে,

চিঠি পায়নি ক'দিন অন্তুর কাছ থেকে, খুব ভাবনা হয়েছিলো তার, বাড়ি ফিরে ফোন ক'রে জিগ্যেস করলো আমরা কেমন আছি।

সত্যি সত্যিই টুকটুককে একদিন দেখলাম। দেখলাম মানে তাকে আমিই ডেকে আনলাম।

আমাদের ফ্ল্যাটখানা তিনতলায়, সামনে একটুখানি ব্যালকনি আছে। সেদিন শরীরটা বিশেষ ভালো ছিলো না, বছর শেষ হয়ে আসছে অথচ ক্যাজুয়েল লিভ পাওনা অনেক। ইচ্ছে করেই আপিস যাইনি। বিকেলে হঠাৎ শুনলাম, নীচে রাস্তা থেকে কোনো একটি মেয়ে চিৎকার করে কাকে ডাকছে। দুবার শোনার পর মনে হলো মেয়েটি অন্তুকে ডাকছে। আমি ব্যাল-কনিতে বেরিয়ে দেখি নীচে রাস্তায় টুকটুক চিৎকার করে ডাকছে, অন্তু, অন্তু! ও তখন তিনতলার দিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছিলো, আমাকে দেখেই লজ্জা পেলো। ও হয়তো সুট্ ক'রে সরে পড়তো, মাথা নামিয়ে নিয়েছিলো সঙ্গে সঙ্গে, তাই আমি ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে বললাম, তুমি ওপরে এসো, এসো না!

মেয়েটি সিঁড়ির দিকে গেল। বেশ কিছুক্ষণ পরে মুখে হাসি ছড়িয়ে উঠে এলো, আমি তখন সিঁড়ির মাথায়। আমি বললাম, তুমি টুকটুক, না?

টুকটুক ঘাড় কাত করলো। আর আমি বললাম, অন্তু না থাকলে ওপরে বুঝি আসা যায় না?

অরুণাও ততক্ষণে এসে পড়েছে, হেসে বললে, সে কথা বোলো না, আমার সঙ্গে তো ও কত দিন এসে গল্প করে গেছে।

আমি টুকটুককে সামনে বসিয়ে নানান গল্প শুরু করে দিলাম। আমি প্রায় তার সম-বয়স্ক হবার চেষ্টা করলাম। হাসলাম এবং হাসালাম। আমি নিজেকে যথেষ্ট মডার্ন প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করলাম।

টুকটুক চলে যাবার পর আমি অরুণাকে বললাম, যদি সত্যি সত্যি তেমন কিছু হয় ভালোই হয়, কি বলো?

অরুণা মৃদু হেসে বললে, মেয়েটা ভীষণ ভালো, তাই না?

আমরা রাত্রে অন্ধকারে শুয়ে শুয়েও অন্তু এবং টুকটুককে নিয়ে কোনো কোনো দিন চাপা গলায় আলোচনা করেছি, আমাদের চোখকে ফাঁকি দেবার যখনই ওরা চেষ্টা করেছে আমরা হেসেছি, কখনো কখনো আবার স্বপ্নও দেখেছি।

এর পর ক্রমে ক্রমে সমস্ত ব্যাপারটা কেমন সহজ এবং স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিলো। টুক-টুক ফোন করলে আমি যদি রিসিভার তুলতাম তা হলে ও আগে আমার খবরাখবর নিতো, অরুণার, আর তারপর আমি নিজেই বলতাম, ধরো, অন্তুকে ডেকে দিচ্ছি, কিংবা অন্তু তো এখনো ফেরেনি, কলেজে যাওনি তুমি? টুকটুক যখন বাড়িতে আসতো, আমি থাকলেও কখনো সটান অন্তুর ঘরে চলে যেতো, কখনো রান্নাঘরে অরুণার কাছে, আবার অন্তুর ঘরে যাবার আগে এক মিনিট দাঁড়িয়ে কোনো কোনো দিন আমার সঙ্গে কথাও বলতো।

মাঝখানে হঠাৎ কি যে হয়েছিলো আমি জানি না, বেশ কিছু দিন টুকটুক আসতোও না ফোনও করতো না। সেই সময়ে আমি খুব বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম। অরুণাকে জিগ্যেস করেছিলাম, টুকটুকের কি খবর বলো তো? অরুণা বললে, ঝগড়া করেছে, আবার কি। এত বলি, একদিন আসতে বলিস, কেবল এড়িয়ে যায়।

শুনে আমার মনটা দমে গেল। আমার বিশ্বাস হলো না। আমি মনে মনে ভয় পেলাম। আমি ভাবলাম, যে আতঙ্কটা আমার মনের মধ্যে বরাবর উঁকি দিয়েছে, সেটাই বোধ হয় সত্যি হলো। আমার কেবল ইচ্ছে করতো, আগের মতোই অন্তুর ঘর থেকে ওদের দুজনের সশব্দ হাসি বা হট্টগোল বা তুচ্ছ ঝগড়াঝাঁটি ভেসে আসুক। একটা কাঠের বাজনা শুনেছিলাম ছেলেবেলায়, ওদের কথা-কাটাকাটি ঠিক তেমনি মিষ্টি লাগতো।

আমি সে সময় অন্তুর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতাম। ও মাঝে মাঝেই কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যেতো, একটু খিটখিটেও হয়েছিলো। খাবার টেবিলে বসে আমি লক্ষ করতাম, ওর খিদে ঠিক আগের মতো নেই। আমি কি করবো ঠিক করতে পারতাম না, আমি শুধু মনে মনে চাইতাম, ও যেন আঘাত না পায়, কষ্ট না পায়।

তখন গরমকাল, অন্তু বললো, বাবা, চলো না এবার দার্জিলিং যাই।

আমি ভাবলাম, কলকাতা ওর কাছে এখন একটা যন্ত্রণা। ও এখান থেকে পালাতে চাইছে। পালাতে।

আমি অরুণাকে বললাম, তাই চলো, অন্তু যখন বলছে...

আমি অরুণাকে বললাম, দোষ তোমারই। তুমি প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে বাড়িয়ে দিলে, অথচ শেষরক্ষার কথা ভাবলে না।

অন্তুর জন্যে আমার ভীষণ কষ্ট হতো, অনেক রাত অবধি আমার ঘুম আসতো না। অরুণাও তার ব্যথা, তার কষ্ট চেপে রেখেছিলো. হঠাৎ একদিন রাত্রে কেঁদে ফেলে বললো. আমার কিচ্ছু ভালো লাগছে না। একটু থেমে হঠাৎ বললে. আচ্ছা. আমি যদি টুকটুকদের বাড়ি যাই? আমি নিষেধ করলাম। বললাম. ওঁদের কাউকে তো আমরা চিনি না। কি জানি কি মনে করে বসবেন ওঁরা. তা ছাড়া অন্তু জানলে রেগে যাবে. ওর হয়তো সম্মানে লাগবে।

শেষ অবধি তাই দার্জিলিঙেই আমরা গেলাম। ক্যাপিটল সিনেমার কাছেই হোটেল কুন্ডুতে গিয়ে উঠলাম। সেদিনই বিকেলে বেড়াতে গেলাম ম্যালে।

আমরা কেউই দেখতে পাইনি. টুকটুক ছুটে এলো একমুখ হাসি নিয়ে।—অন্তু, তুমি? গ্র্যান্ড হয়েছে, কাকাবাবু আপনারাও এসেছেন। বলে তার বাবা-মা ভাই-বোনেদের দিকে ফিরে তাকালো। আমাদের ডেকে নিয়ে গেল।

আলাপ হলো সকলের সঙ্গে। বোঝা গেল অন্তুকে ওঁরা খুব ভালো করেই চেনেন. অন্তু ওঁদের বাড়ি অনেকবার গেছে।

টুকটুকের বাবা খুব সজ্জন, মা বেশ মিশুকে।

প্রতি দিন সকাল-বিকেল আমাদের দেখা হতো. কখনো ম্যালে বেড়াতে এসে. কখনো দোকানে-বাজারে. কখনো দল বেঁধে আমরা এখানে-ওখানে যেতাম। কিন্তু অন্তু আর টুক-টুক সব সময়ে আলাদা। হয় ওরা আমাদের সকলের পিছনে পিছিয়ে যেতো. কিংবা তড়বড় করে অনেক আগে আগে চলে যেতো। আবার এক-একদিন ওরা দুজনে একেবারেই দলছাড়া হয়ে কোথায় যেতো কে জানে।

আমি অরুণাকে বললাম. যাক বাবা. ঝগড়া মিটে গেছে!

অরুণা বললে. ঝগড়া না ছাই।

—তার মানে? আমি বুঝতে পারলাম না অরুণা কি বলতে চায়।

অরুণা হাসলো।—সব প্ল্যান, সব প্ল্যান করে এসেছে. বুঝতে পারছো না। তা না হলে হঠাৎ দার্জিলিং আসতে চাইবে কেন অন্তু।

ওদের দুজনকে দেখে আমরা আবার হাসাহাসি করলাম। আর অরুণা বললে. দুটিতে বেশ মানায় কিন্তু।

একদিন আমরা অতটা ওপরে উঠতে পারিনি, মাঝখানেই থেমে গিয়েছিলাম. আর অন্তু-টুকটুক অনেকখানি ওপরে উঠে গিয়ে একটা বিশাল পাথরের ওপর বসেছিলো। ওদের দু-জনের বসার ভঙ্গিটা ছিলো ছবির মতো। ওরা খুব হাসছিলো আর গল্প করছিলো।

সেদিকে তাকিয়ে আমি ফিসফিস করে অরুণাকে বললাম. দেখো. দেখো. ঠিক যেন মেড ফর ঈচ আদার!

অরুণা হেসে উঠে বললে. সত্যি!

দার্জিলিং থেকে ফিরে এলাম খুব একটা খুশী মন নিয়ে। সমস্ত বুকের ভেতরটা যেন ভরাট। মনে হলো জীবনে এত খুশী আমি কখনো হইনি। অন্তুও ট্রেনে আসবার সময় উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিলো. ওয়ান্ডারফুল, দার্জিলিং এত সুন্দর ভাবতেই পারিনি। আমি আর অরুণা চোখ-চাওয়াচাওয়ি করে হাসি চেপেছিলাম।

কলকাতায় ফিরে এসে আবার সেই অসহ্য গরম. অন্য দিকে মন দেবার জো-টি ছিলো না। তবু এরই মাঝে আমি সহকর্মী বন্ধুদের কাছে দার্জিলিঙের ঘটনা সবিস্তারে বলেছি. বলে আনন্দ পেয়েছি. আর কপট আক্ষেপের গলায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছি. আরে মশাই. কি নির্লজ্জ. কি সাহস মেয়েটারও. আমরা যেন বাপ-মা নই. স্রেফ অচেনা পাবলিক।

বন্ধুরা মজা পেয়েছে. সান্ত্বনা দিয়ে বলেছে. এখনকার হালচালই ওরকম, কি আর করবো. আমরাও সহ্য করে যাচ্ছি। তাদের মধ্যে দু-একজন আবার গোঁড়া, বাহান্নতেই বৃদ্ধ, তারা

দোষ দিয়েছে আমাকে, আশকারা দিয়ে দিয়ে আপনারাই তো ছেলেমেয়েদের মাথা খাচ্ছেন।

আমি মনে মনে হেসেছি। এবং আমি মনে মনে স্বপ্ন দেখেছি। তারা তাদের ছেলেদের জন্যে অনেক কিছু চাইতো, ভালো রেজাল্ট, ভালো চাকরি, উন্নতি, আরো কত কি। আমার চাওয়া শুধু একটিই। অন্তু যেন সুখী হয়, অন্তুর এই একুশ বছরের স্বপ্নমাখা নরম বুকে যেন কেউ আঘাত না দেয়। এই বয়সেই সে যেন আমার মতো ভেঙে না পড়ে। আমার একুশ বছরের মতো।

অরুণার কাছে শুনেছিলাম, টুকটুক আবার এসেছিলো একদিন, সারা দুপুর অন্তুর ঘরে বসে গল্প করেছে, অরুণা আচার রোদে দিয়েছিলো, চেয়ে নিয়ে চেটে চেটে খেয়েছে।

সারা দুপুর ঘরের মধ্যে বসে গল্প করার কথায় আমার একটু ভয় হতো, একটু অস্বস্তি। ঐ বয়েসটাকে বিশ্বাস করতে পারতাম না আমি, ভাবতাম শেষে কিছু একটা...পরমুহূর্তে মনে হতো ওরা এত খারাপ হবে না, আমাদের মনটাই খারাপ।

রুবি একদিন এসে বললে, জানো মা, তোমার জামাই বলছিলো অন্তুর নাকি আজকাল খুব পাখা গজিয়েছে।

অরুণা হেসে বললে, তা আর কি করা যাবে, দিনকালই যে বদলে গেছে।

রুবি বললে, আমার বেলায় তো খুব কড়া শাসন ছিলো তোমার।

সত্যি কথা বলতে কি, রুবিকে আমরা একটু আগলে আগলেই রাখতাম। কিন্তু রুবি তো সুখী হয়েছে।

পরে শুনলাম, রুবি বলেছে অরুণাকে, তোমার জামাই দেখেছে, একটা ছিপছিপে মেয়েকে নিয়ে কি একটা হোটেল থেকে বেরুচ্ছে।

অরুণা বললে, তোমাকে বলিনি, ভেবেছিলাম চোখের ভুল, সেদিন দুপুরে...

অরুণা হঠাৎ অন্তুর ওপর রেগে গেল। আমাকে বললে, এভাবে বেশী দিন ভালো নয়, বিয়ে-টিয়েই যদি করতে চায় করুক না।

কিছু একটা ঘটে যেতে পারে এই ভয় তারপর থেকে আমাকে পেয়ে বসলো। যদি কিছু ঘটে, আমি ভাবতম, তা হলে আমাদের প্রশ্রয়ই তার জন্যে দায়ী। আবার ভাবতাম, অত ভয়ের কি আছে, ওরা বিয়ে করতে চাইলে টুকটুকের বাবা নিশ্চয় আপত্তি করবেন না। তিনি তো আরো মডার্ন।

তবু ভয় হতো বলেই অরুণাকে বলেছিলাম অন্তুকে স্পষ্ট করে জিগ্যেস করতে। তবে পাস করার আগে, কোনো চাকরি না পেয়ে ওর বিয়ে করার কথা আমি ভাবতাম না।

ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ টুকটুক একদিন এসে হাজির।—নিরুপম আছে কাকাবাবু?

আমি ওকে দেখে বেশ খুশী হয়ে উঠেছিলাম। বললাম, না।

টুকটুক সংগে সংগে চলে যাচ্ছিলো, আমি বললাম, নিরুপম ছাড়া কি আর কারও সংগে কথা বলতে তোমার ভালো লাগে না? আমরা বুড়ো হয়েছি বলে কি তোমাদের সংগে কথা বলতেও পারি না!

টুকটুক মাথা নীচু করে লাজুক হাসলো।

আমি বললাম, বোসো এখানে।

ও চুপটি করে সামনের চেয়ারে বসলো। বড় লম্বা ব্যাগটা কোলের ওপর রেখে।

আমি বললাম, কি খবর-টবর বলো তোমার। অন্তু এখুনি ফিরবে, ওকে ওষুধ কিনতে পাঠিয়েছি।

টুকটুক মাথা নীচু করেই বললে, খবর একটা আছে কাকাবাবু। মৃদু সলজ্জ হেসে বললো, আমার বিয়ে।

বিয়ে? আমার বুকের মধ্যে কেউ যেন দুম করে একটা কিল বসিয়ে দিলো। মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠলো।—কবে? কোথায়? কি করে ছেলেটি?

আমি ঠিক কি প্রশ্ন করেছিলাম, আমার নিজেরই মনে নেই।

টুকটুক ব্যাগ থেকে একখানা চিঠি বের করে দিলো, আমি পড়লাম, কিন্তু কিছুই মাথার মধ্যে ঢুকলো না। সব অক্ষরগুলো ঝাপসা লাগলো। আমার বুকের মধ্যে একটা অসহ্য ব্যথা মোচড় দিয়ে উঠলো। আমার ভিতরটা কেবল বলতে লাগলো, এ কি হলো, এ কি হলো।

কোনোরকমে মুখে হাসি এনে বললাম, ভালো, ভালো।

আর টুকটুক উঠে বললো, আমি এক্ষুনি ঘুরে আসছি। নিরুপমকে একটু থাকতে বলবেন কাকাবাবু।

টুকটুক চলে গেল, আর তখনই অরুণা এসে বললে, টুকটুকের গলা শুনছিলাম না?

আমি অরুণাকে সব বললাম, অরুণা আমার সামনে এসে বসলো, আমরা পরস্পরের সঙ্গে একবার চোখাচোখি হওয়ার পর নিঃশব্দে চোখ নামিয়ে বসে রইলাম। ফিসফিস করে বললাম, এই বয়সে, বেচারী, প্রথম থেকেই আমার এই এক ভয় ছিলো।

অরুণা বললে, এইটুকু ছেলে, ও সহ্য করবে কি করে।

আমার সত্যি কান্না পাচ্ছিলো। আমার নিজের একুশ বছর বয়সের সেই আঘাতটার কথা মনে পড়ছিলো। অন্তু ফিরে এসে ওষুধটা দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল, আমি ওকে কিছুই বলতে পারলাম না। এমন কি, টুকটুক এসেছিলো বা থাকতে বলেছে সে কথাও বলতে পারলাম না।

মিনিট কয়েক পরেই টুকটুক ফিরে এলো, আমি ওকে অন্তুর ঘর দেখিয়ে দিলাম ইশারায়, শুধু বললাম, আছে।

আমি আর অরুণা অন্তুর ঘরের দিকে তাকাতে পারলাম না। শুধু চুপ করে বসে রইলাম আতঙ্কে অপেক্ষায়। যেন এখনই একটা ভূমিকম্প হয়ে যাবে অন্তুর বুকের মধ্যে, এখনই একটা ভূমিকম্প হবে!

হঠাৎ একটা হট্টগোল ভেসে এলো ওর ঘর থেকে। চিৎকার, উল্লাস, হইহই। 'তুমি একটা ইডিয়েট', অন্তুর গলা। 'নিরুপম, ভালো হবে না বলছি, তুমি না হলে...'

আমি অরুণার চোখের দিকে তাকালাম। অরুণা আমার চোখের দিকে তাকালো।

একটু পরেই অন্তু আর টুকটুক বেরিয়ে এলো।

অন্তু চিৎকার করছে, আচ্ছা বাবা, মা, তুমি বলো, স্টুপিড বলবো না ওকে? ওর পরশু বিয়ে, একটা বন্ধুকে এখনো নেমন্তন্ন করেনি।

টুকটুক সাক্ষী মানলো অরুণাকে।—আচ্ছা কাকীমা, আমি কাল পরশু দু-দুবার ফোন করিনি? নিরুপম, তুমি বাড়িতে থাকো নাকি কোনো সময়ে?

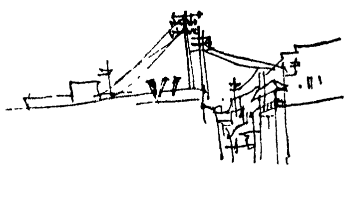
ওরা দুজনে বেরিয়ে গেল বন্ধুদের নেমন্তন্ন করতে।

আমরা চুপ করে বসে রইলাম। পরস্পরের দিকে তাকালাম একটু অবাক হয়ে।

অরুণা হঠাৎ বললে, তুমি এবার নিশ্চিন্ত হলে তো!

বললাম, জানি না, বুঝতে পারছি না।

[১৩৭৭



অপেক্ষায় আছি

আরে ভাই, সে এক অভিজ্ঞতা। এমন অদ্ভুত ঘটনা যে ঘটতে পারে ভাবিনি কোনো দিন। আমার নিজের কাছেই মনে হচ্ছে দুঃস্বপ্ন, স্রেফ দুঃস্বপ্ন। একটি মেয়ের পাল্লায় পড়েছিলাম সেদিন রাত্তিরে, রাত বারোটায়। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হবে না তোর। হয়তো ভাববি বানিয়ে বানিয়ে বলছি। একে মেয়ে, তার ওপর রাত বারোটায়?

না, না, দুঃস্বপ্ন ঠিকই, কিন্তু স্বপ্ন নয়। একেবারে রিয়েল ঘটনা।

তুই তো জানিস, আমার বিছানার পাশেই টেলিফোনটা থাকে। রাত্রেও আমাদের কখনো কখনো আর্জেন্ট কল আসে, তেমন ঘটলে ট্রাংক কলও। সেইজন্যেই টেলিফোনটা মাথার কাছে থাকে একটা টুলের ওপর, যাতে ঘুম-ভাঙা চোখের পাতা না মেলেই হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা কানের কাছে আনতে পারি।

হয়েছে কি, সেদিন সারা দিন খুব খাটুনি গেছে, শরীর ক্লান্ত। খাওয়া-দাওয়ার পর শুতে না-শুতে ঘুম, গাঢ় ঘুম। রাত কত তারও হিসেব ছিলো না, জানলার ফাঁক দিয়ে রাস্তার মোড়ে যে লাইট-পোস্টটা দেখা যায়, লাইট-পোস্টের আলো, সেটাও পাহারা দিতে দিতে যেন লাঠিতে ভর দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। সমস্ত বাড়ি নিঝুম, সমস্ত পাড়া। শুধু দূরে কোথাও একটা লরি সারাচ্ছিলো কেউ, বারবার স্টার্ট বন্ধ হচ্ছিলো, আর মিস্ত্রীদের ঠুকঠাক আওয়াজ আসছিলো।

আসলে এসবের কিচ্ছু আমি শুনতে পাইনি, কিচ্ছু দেখতে পাইনি। কারণ আমি তো তখন ঘুমে অচেতন।

হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠলো।

ঘুম ভেঙে যেতেই আমি হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলে নিলাম।

—হ্যালো।

অপর প্রান্তে মিষ্টি মেয়েলী কণ্ঠ। গলার স্বরে তার অল্প বয়সের আমেজ।

মেয়েলী গলা আমার নাম বললো।—আছেন?

আমি একসঙ্গে অনেক কথা ভাবলাম। কে হতে পারে? এই গভীর মধ্যরাতে কে ফোন করতে পারে!

বললাম, হ্যাঁ, আমিই। আপনি কোত্থেকে বলছেন?

মেয়েটির গলার স্বরের সঙ্গে ঈষৎ হাসি মিশলো।—বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে।

বিশ্বাস কর, একটুও বানিয়ে বলছি না। আমার মাথা তখন বোঁ-বোঁ করে ঘুরছে। কারণ আমি তখন বেড-সুইচ টিপে আলো জেলেছি, উঠে বসেছি। ভাবছি, নিশ্চয়ই চেনাজানা কেউ, নিশ্চয়ই কোনো সাংঘাতিক বিপদে পড়েছে। মানে, চোখ তখন দেয়ালে গিয়ে পড়েছে, দেয়াল-ঘড়িটায়। ছোট কাঁটা বড় কাঁটা দুই-ই তখন বারোর ঘরে।

তুই জাস্ট একটু ভেবে দেখ অনন্ত। এরকম কেস যদি তোর হতো!

রাত বারোটা, কাঁটায় কাঁটায় বারোটা। চারপাশ নিঝুম, বাড়িতে সবাই ঘুমোচ্ছে। হঠাৎ টেলিফোন এলো। মেয়ের গলা। বুক তো এমনিতেই ধড়াস ধড়াস করে উঠবে।

—আপনি কে বলছেন? আমি গলার স্বরটাকে চেনাজানা কারও কণ্ঠস্বরের সঙ্গে মেলাতে না পেরে জিগ্যেস করলাম।

মেয়েটি বললো, আমি গৌরী।

গৌরী? গৌরী নাম তো বাংলা দেশের ঘরে ঘরে, অন্তত সতেরোজন, তোকে এক্ষুনি বলতে পারি অনন্ত, যাদের নাম গৌরী।

আমি ভাবলাম, কোন্ গৌরী?

তার আগেই মেয়েটি বলে উঠলো, খুব আশ্চর্য হচ্ছেন তো?

ততক্ষণে বুঝে গেছি, সাংঘাতিক কিছু হয়নি, সাংঘাতিক কিছু হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

গৌরীর গলা হেসে উঠলো। বললো, দেখুন...আচ্ছা, আপনি কি খুব বিরক্ত হচ্ছেন?

অনন্ত, তুই বল, রাত বারোটায় ঘুম ভাঙিয়ে কেউ যদি অকারণ ফোন করে, বিরক্ত হবার কথা নয়? কিন্তু বিশ্বাস কর, আমার ভয় হলো, যদি বলি, তা তো একটু হচ্ছি দিদি, তা হলেই তো টুক করে লাইন কেটে দেবে। ব্যস্, তারপর সারা জীবন বুকের মধ্যে একটা রহস্য পুষে রাখো।

আমি তাই তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, না, না, বিরক্ত হবো কেন!

গৌরী বললো, তা হলে ব্যাপারটা বলি আপনাকে। আমার না একটুও ঘুম আসছিলো না।

—বাঃ, আপনার ঘুম আসছিলো না বলে আমার ঘুম কেড়ে নিলেন? আমি বললাম।

আমিও তো কম যাই না, কিরকম কথাটা বললাম বল তুই? ঘুম ভাঙিয়ে দিলেন না-বলে বললাম ঘুম কেড়ে নিলেন।

গৌরী নামের মেয়েটি অন্য প্রান্তে হাসলো।—না, মানে হয়েছে কি জানেন, ঘুম আসছিলো না তো, তাই টেলিফোন ডিরেক্টরি দেখে পাতা ওলটাতে ওলটাতে আপনার নাম পেলাম...

—আর অমনি ফোন করে বসলেন? আমি বললাম।

নারীকণ্ঠ আহত ভাব দেখালো।—আপনি রাগ করছেন!

—আরে না, না। ভালোই লাগছে। তবে কিনা রাত বারোটায়!

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে বললো, বাঃ, থ্রিল। চিনি না, জানি না, হঠাৎ রাত বারোটার সময় একজনের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করছি, আমার তো ভীষণ মজা লাগছে। আপনার বুঝি ভালো লাগছে না?

আরে শোন্, শোন্ অনন্ত, ভালো লাগছে না আবার। কিন্তু বাড়িসুদ্ধ লোক, পাশের ঘরে মা, রাত্রে ঘুম হয় না, নিশ্চয়ই আমার কথাগুলো শুনছে। আর এত রসিয়ে রসিয়ে উত্তর দিচ্ছি, বুঝতেই পারছিস, কি অবস্থা। ছাড়তেও পারছি না, মন খুলে যে একটু রসিকতা করবো তারও উপায় নেই।

কিন্তু একটা অশরীরী কণ্ঠস্বরের সঙ্গে তো বেশীক্ষণ কথা বলা যায় না। কৌতূহল চেপে রাখবো কি করে।

বললাম, নাম কি বললেন না তো আপনার!

—আমার নাম? আমার নাম অঞ্জনা।

নাম যে এর আগে বলেছে তা-ও বোধ হয় ভুলে গিয়েছিলো। তা না হলে আবার একটা নতুন নাম বলবে কেন। অথচ আমি তখন আসল নামটা জানতে চাইছি। জানতে চাই বলেই তো আবার জিগ্যেস করলাম। যেন আসল নামটা জানলেই আর হারানো চাবি হাতড়ে বেড়াতে হবে না। কি বোকামি দেখ। আমরা না, অনেক জিনিস জানতে চাই, জেনে কোনো লাভ হবে না তবুও।

অঞ্জনা বললো, নাম জেনে কি লাভ হলো বলুন।

আমি বললাম, এবার ঠিকানা বললেই জানা যাবে লাভ হয়েছে কি না।

—ঠিকানা? মানে কোত্থেকে ফোন করছি? গোল পার্ক থেকে।

আমি হাসলাম।—বাঃ, বালিগঞ্জ স্টেশনের গৌরী এবার হলো গোল পার্কের অঞ্জনা।

মেয়েটি হেসে ফেললো।—আচ্ছা, আপনি কেমন লোক তাই জানি না, আপনাকে বিশ্বাস করতে পারি কি না বুঝতে পারছি না, আর সত্যি সত্যি নাম-ঠিকানা দিয়ে দেবো?

আমি বললাম, তা যদি না দেন, শুধু শুধু ফোন করেই বা কি লাভ। নাম-ঠিকানা দেবেন, দেখাসাক্ষাৎ হবে...

—উঁহু, দেখা হলেই তো সব শেষ। এই যে ফোন করছি, চেনা নেই, জানা নেই, মাঝরাত্তিরে...

আমি জিগ্যেস করলাম, আচ্ছা, আপনার কোনো বয় ফ্রেন্ড নেই? তাদের ফোন করলেই তো...

—নেই? কত। ভাবী বরই রয়েছে। বলে হাসলো।

আমি বললাম, তাকে ফোন করলেই তো পারতেন।

—উরিব্বাস্, তা হলে তো রেগে গিয়ে একেবারে নট্। রাত বারোটায় ঘুম ভাঙিয়ে তাকে?

আমি হেসে ফেললাম।—তার ওপর এত দয়া, অথচ আমার ওপর নির্দয় হতে বাধলো না?

মেয়েটি খিলখিল করে হেসে উঠলো।

তারপরই কট্ করে লাইনটা কেটে গেল।

আমি তখন, তোর কাছে লুকিয়ে কি লাভ বল অনন্ত, আমি তখন একটা ভাঙা মাস্তুল। আমাদের দেখ, এমনিতেই জীবনে কোনো মজা নেই। কারও সঙ্গে আলাপও হয় না। একজন যেচে আলাপ করছে। নিজেকে বেশ একটু রোমান্টিক রোমান্টিক লাগছিলো, তার মধ্যে একেবারে ভাবী বর এসে নিরাশ করে দিয়েছিলো। তবু প্রাণপণে মেয়েটিকে ধরে রাখতে চেষ্টা করেছিলাম, কট্ করে লাইনটাই কেটে গেল। কেটে দিলো।

যাক, ঝামেলা চুকেছে ভেবে শুয়ে পড়তে যাচ্ছি, আবার ক্রিং ক্রিং। হাত উদ্বাহু ছিলোই, রিসিভার ধরলাম।

—আবার কি হলো? মুখে বললাম। মনে কি বললাম, তুই তো বুঝতেই পারছিস অনন্ত।

অঞ্জনা হাসলো।—কেটে দিয়েছিলাম। একটা ক্রস কানেক্‌শন হলো, অমনি টুক করে কেটে দিলাম। আফ্‌টার অল. রাত বারোটার সময় কথা বলছি, আর আমার একটা প্রেস্টিজ আছে তো...

আমার তখন মনে হচ্ছে কি জানিস? সমস্ত কথাগুলো বানানো। আসলে কয়েক বন্ধু মিলে এসব করছে. কেউ ইয়ার্কি করে কেটে দিয়েছিলো।

বললাম, আমার তো মনে হচ্ছে আপনার পাশে যিনি রয়েছেন তিনি কেটে দিয়েছিলেন।

মেয়েটির গলা সিরিয়স হয়ে উঠলো, আপনি আমাকে বিশ্বাস করছেন না? আমি একা, সত্যি একা, কেউ নেই এ ঘরে।

—ফোন কি আপনার ঘরেই থাকে? জিগ্যেস করলাম।

—না, মানে রাত্রে এনে রাখি। সব ঘরেই কানেক্‌শন আছে। বাবা-মা তো ঘুমোচ্ছে, অন্য ঘরে। আমার পাশের ঘরে আমার বোন।

বললাম, যদি শুনতে পায়. কিছু বলবে না?

মেয়েটি হাসলো।—শুনতেই পাবে না, তা ছাড়া বোনও তো মাঝে মাঝে করে। হঠাৎ ডিরেক্টরিতে কারও নাম দেখে ইচ্ছে হলো...জানেন, এভাবে আমার অনেক বন্ধু হয়ে গেছে।

অনন্ত, আমি তখন ভিতরে ভিতরে মরিয়া হয়ে উঠেছি মেয়েটির নাম-ঠিকানা জানার জন্যে, মানে সত্যি নাম-ঠিকানা। কিচ্ছু লাভ নেই জেনেও, আবার হয়তো একটা মিথ্যে নাম-ঠিকানাই বলবে, তবু ইচ্ছে হলো জানতে।

বললাম, হাওয়ার সঙ্গে কথা বলে কি লাভ বলুন, দেখা না হলে...

মেয়েটি হঠাৎ গলার স্বর গাঢ় করলো। বললো, বাঃ, কথা বলতে বলতে একদিন দেখা করতে ইচ্ছেও তো হতে পারে। জানেন, আমি যখন পার্ট ওয়ান পরীক্ষা দিচ্ছি, সিক্সটি ফোরে...

বললাম, সিক্সটি ফোরে পার্ট ওয়ান? বলে চুপ করে রইলাম।

—কি ভাবছেন? অন্য প্রান্ত প্রশ্ন করলো।

—ভাবিনি, হিসেব করছি।. মানে এখন বয়স কত,...

অঞ্জনা হেসে উঠলো।—হিসেব করার কি আছে. জিগ্যেস করলেই তো বলে দিতাম। উনিশ পার হয়ে এখন কুড়ি চলছে...

আবার কট্‌। বুঝলি অনন্ত, কুড়ি বছর বয়েস যখন গল্পটার মধ্যে বেশ সাস্‌পেন্স ক্রিয়েট করেছে, তখনি আবার লাইন কেটে দিলো। কিন্তু একবার যখন লাইন কেটে দিয়ে আবার রিং করেছে, তখন এবারেও নিশ্চয় করবে। আশায় আশায় বসেই রইলাম। কিন্তু লাইন কেটে দিচ্ছে কেন? নিশ্চয়ই কাছে কেউ আছে, খুব হাসাহাসি করছে।

অতএব, সমস্ত ব্যাপারটাই স্রেফ ফান্‌। কোথাও এগোবে না, গল্প হয়ে উঠবে না। মিছিমিছি ঘুম নষ্ট।

বেশ কিছু সময় কেটে গেল, টেলিফোন বাজলো না। আমার তখন কি খারাপ যে লাগছিলো কি বলবো তোকে অনন্ত। ভাব তুই। ঘুম নষ্ট হয়েছে, এদিকে মনের মধ্যে কৌতূহল। রোমাঞ্চও বলতে পারিস। চেষ্টা করলেও তখন আর ঘুম আসবে না। কি করি, একটা সিগারেট ধরালাম। আর সঙ্গে সঙ্গে ক্রিং ক্রিং ক্রিং।

—কি, শুয়ে পড়েছিলেন নাকি? আবার সেই রহস্যের গলা।

আমি হেসে বললাম, আজ আর ঘুম আসবে না। আর কোনো দিনই হয়তো ঘুম আসবে না।

একটু বোধ হয় বঁড়শির সুতো ছাড়তে চাইলাম।

—চমৎকার। আমারও তো ঘুম আসছে না।

বললাম, একটা স্লিপিং পিল্‌ খেয়ে নিন।

অঞ্জনা চটে গেল যেন।—ঘুম আসছে না বলে ফোন করছি? কক্ষনো না, আমি শুয়ে

পড়লেই ঘুম আসবে। আপনি কি ভাবছেন, আমার ইনসমূনিয়া আছে? ইচ্ছে হলো, ফোন করলাম। ভালো লাগছে, কথা বলছি। আপনি বিরক্ত হচ্ছেন, তাই না?

বললাম, একটুও না। মাঝরাত্তিরে কুড়ি বছরের একটি তরুণী, সুন্দরী নিশ্চয়ই...

খিলখিল হাসি।—সুন্দরী না ছাই, আমার ছোট বোন আমার চেয়ে ঢের বেশী সুন্দরী।

—আচ্ছা, দাঁড়ান, আপনার চেহারাটা ভেবে নিই। আমি বললাম।

প্রশ্ন এলো একটু পরে।—ভাবলেন? কিরকম দেখতে, বলুন?

বললাম, খুব সুন্দর চুল। ঠিক বব্ নয়, কাঁধ অবধি কোঁকড়ানো...

—একদম না। ইস্, আমার সুন্দর চুল, আমি কেটে ছোট করবো! বেশ, আমি ফর্সা না কালো, বলুন তো দেখি?

হাসলাম। অনন্ত, তুই হলে কি বলতিস? দেখ, ফর্সা বলতেই ইচ্ছে হচ্ছিলো, কিন্তু ভয় হলো, যদি ফর্সা না হয়। কালোর মধ্যেও তো অনেক মেয়েকে খুব সুন্দরী মনে হয়। আমি যদি ফর্সা বলি, অঞ্জনা কি ভাববে? ওর ধারণা হবে আমি ফর্সা মেয়েদের পছন্দ করি। ও তখন টুক করে লাইনটা কেটে দেবে।

বললাম, কালো, কিন্তু খুব সুন্দরী।

—ইস্, কালো আমি একদম দেখতে পারি না।

আমার অবস্থা তুই বুঝতেই পারছিস। আমি বললাম, সে কি, আমি কিন্তু বেজায় কালো।

অঞ্জনা অল্পক্ষণ চুপ করে রইলো। বেচারী, মনে হলো বেশ ধাক্কা খেয়েছে।

বললাম, আমি কিরকম কালো জানেন?

—কার মতো? জিগ্যেস করলো।

আমি বললাম, এক বন্ধুর দাদার সঙ্গে কফি হাউসে দেখা করার কথা, তিনি চিনতেন না। বললাম, দেখবেন বেজায় কালো একটা ছেলে বসে আছে...চিনতে অসুবিধে হবে না। তারপর কফি হাউসে বসে দেখছি এক ভদ্রলোক একটু-আধটু কালো কাউকে দেখলেই তাকে কি জিগ্যেস করছেন। না পেয়ে চলে যাচ্ছেন দেখে নিজেই গিয়ে বললাম, আপনি কি...তিনি কি বলে উঠলেন জানেন? বললেন, তুমি? আমি তো তোমাকে দেখেছি, ভাবিনি এত কালো।

অঞ্জনা শুনে শব্দ করে হেসে উঠলো। বললে, আপনি না, আমার মনে হচ্ছে, ভীষণ ভালো লোক।

বললাম, তাতে কি লাভ। আপনি তো নাম-ঠিকানাই দিলেন না, দেখা করা দূরের কথা।

—আপনার সত্যি খুব...

কট্। লাইন আবার কেটে গেল। আর কি বলবো তোকে, অনন্ত, সঙ্গে সঙ্গে একটা পুরুষ-গলা শুনলাম।

ভদ্রলোক বললেন, ম্যানিয়াক মশাই, ম্যানিয়াক। রাত বারোটা থেকে তিনটে অবধি সকলকে জ্বালিয়ে মারে।

আমি অবশ্য তার আগেই আঁচ করে নিয়েছি।

বেশ বুঝতে পারছি, মেয়েটির নেশা ডিরেক্টরি দেখে নাম খুঁজে খুঁজে ফোন করা। তা করুক না, আমার তো বেশ মজাই লাগছিলো।

ভাবলাম, টেলিফোন অফিসে নিশ্চয় অনেকে কমপ্লেন করেছে। তাই মেয়েটি কোত্থেকে ফোন করে ধরবার চেষ্টা করছে। জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল ব্যাপারটা। আসলে কেউ হয়তো ট্যাপ করছে নম্বর খুঁজে বের করার জন্যে। আর ট্যাপ করলেই তো টক করে একটা শব্দ হয়, ভয়েস ভালো শোনা যায় না, তাই বারবার লাইন কেটে দিচ্ছিলো অঞ্জনা। আর বলছিলো, ক্রস কানেক্শন হয়েছিলো।

যাক, আর নিশ্চয় ফোন করবে না। ও হয়তো জানেও যে, টেলিফোন অফিস থেকে এভাবে সাবধান করে দেয়। কিংবা, পুরুষ-গলার কথাগুলো হয়তো শুনতে পেয়েছে।

নিশ্চিন্ত হয়ে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়তে যাচ্ছি, আবার ক্রিং ক্রিং ক্রিং। রিসিভার তুলে নিলাম।

ও প্রান্ত থেকে অঞ্জনা বললো, কি হলো বলুন তো?

আমি যেন কিছুই জানি না, কিছুই শুনিনি। বললাম, কেটে দিলেন তো আপনি।

—না, না, আমি কাটিনি। কেটে গেল।

—ও।

অঞ্জনা জিগ্যেস করলো, শুয়ে পড়েছিলেন?

বললাম, না। রিসিভারটার দিকে তাকিয়ে বসে ছিলাম, যদি আবার রিং করেন।

অঞ্জনা হেসে উঠলো।

বললাম, নাম-ঠিকানা দিলেন না তো?

—আচ্ছা, আপনি কাউকে গল্প করে বলবেন না বলুন।

আমি গলায় সিন্সিয়ারিটি ঢাললাম।—কথা দিচ্ছি।

অঞ্জনা বললো, না, বলবেন তো নিশ্চয়ই। এরকম একটা অদ্ভুত ব্যাপার, রাত বারোটায় একটি মেয়ে ফোন করছে, কিন্তু বলবেন, একটি মেয়ে...সত্যি নাম-ঠিকানা আপনাকে বিশ্বাস করে দেওয়া যায়, কাউকে বলবেন না কিন্তু। মানে, আমার তো একটা...বিশেষ করে বাবাকে বহু লোক চেনে...

বললাম, কথা দিচ্ছি।

—আমার নাম রীতা। আমার বোনের নাম সীতা।

—ঠিকানা?

অঞ্জনা ঠিকানাও বললো।

অনন্ত, তুই কিছু মনে করিস না। আমি যাকে যা কথা দিই, রাখি। তুই তো জানিস। তোর কথা আমি কোনো দিন বুবুনকে বলেছি? অতএব বুঝতেই পারছিস, রীতা সীতা নাম নয়, ঠিকানাটাও ভাই বলতে পারবো না।

আমি বললাম, প্রথমে ছিলেন গৌরী, বালিগঞ্জ স্টেশন। তারপর হলেন অঞ্জনা, গোল পার্ক। এবার দেখছি...

—বিশ্বাস করছেন না? প্রমাণ চাই?

বললাম, কি প্রমাণ আর দেবেন। দেখা করে অবশ্য...

রীতা বললো, বেশ। ফোন নম্বর দিচ্ছি।

ফোন নম্বর দিলো ও, আমি লিখে রাখলাম।

তারপর রীতা বললো, কাল সকালে এই নম্বরে ফোন করবেন, আমি ধরবো। না থাকলে, যে ধরবে আমার নাম বলবেন, ডেকে দেবে।

আমি বললাম, আমার কিন্তু সত্যি ঘুম পাচ্ছে।

—গুড নাইট। খুব মিষ্টি একটা স্বপ্ন দেখবেন। বলেই হাসলো, বললো, আমি কিন্তু আপনাকে একটু ঠকিয়েছি।

ব্যস্। লাইন কেটে গেল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি রাত তিনটে।

রাত্রে তো ঘুম হলোই না, পরের দিন সকালে শরীর খারাপ। সারা রাত ঘুম হয়নি, তার ওপর এমন বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

সকালে ভাই বিশ্বাস কর, কেবল ইচ্ছে হচ্ছিলো ফোন করি। মানে যোগাযোগ রাখি, সত্যি নাম-ঠিকানা কি না প্রমাণ নিই।

টেলিফোন অফিসে নম্বর জানিয়ে খোঁজ নিতেই ঠিকানা মিলে গেল, পদবীটাও মিলে গেল। তবু ভাবলাম, সত্যি না-ও হতে পারে তো। হয়তো কোনো বন্ধুর নাম-ঠিকানা দিয়ে দিয়েছে। ফোন করলেই সে আকাশ থেকে পড়বে। অবশ্য তা হলেও ফোন করে দেখা যেতো। কিন্তু ভয় হলো, ফোন করলেই যদি রোজ রাত্তিরে বারোটার সময় টেলিফোন বাজতে শুরু করে!

'ম্যানিয়াক মশাই, ম্যানিয়াক, রাত বারোটা থেকে তিনটে অবধি জ্বালিয়ে খায়।' পুরুষ-গলার কথাগুলো মনে পড়ছিলো বলেই সকালে ফোন করতে সাহস হলো না। আবার এক-একবার কি মনে হচ্ছিলো জানিস, 'আমি কিন্তু আপনাকে একটু ঠকিয়েছি' এ কথা বললো কেন? তার মানে কাছে কোনো পুরুষ ছিলো, সেই রিসিভার কেড়ে নিয়ে বলেছিলো, টেলি-ফোন অফিস থেকে নয়?

রহস্য শেষ অবধি রহস্যই রয়ে গেল, ফোন করে যাচাই করতে পারলাম না।

কিন্তু আমার কেবল ভয় হচ্ছিলো আবার রাত বারোটায় ফোন আসবে, টেলিফোন বাজবে।

পরের দিন সত্যি বলছি, বারোটা অবধি ঘুমোতে পারলাম না। সে এক আতঙ্ক।

ঘড়ির কাঁটা একটু একটু করে বারোটার ঘরের দিকে এগোচ্ছে, আর আমার বুক দুরদুর করছে। ভয় কেন, বুঝতে পারছিস না? এরকম অবস্থায় না পড়লে বুঝতে পারবি না।

আসলে মা নিশ্চয় শুনতে পেয়েছিলো, সারা রাত মিষ্টি মিষ্টি কথা বলেছি, বারবার ফোন বেজেছে, শুনতে তো পাবেই।

মা সেদিন বলে বসলো, তোর ঘরে শোবো মেঝেতে, ও ঘরে হাওয়া নেই।

বোঝ ব্যাপার।

ঘড়ির কাঁটা এগোচ্ছে। এক মিনিট এক মিনিট করে এগোচ্ছে, আর আমি তন্ময় হয়ে বই পড়ার ভান করে বসে আছি। এই বুঝি বেজে উঠলো, এই বুঝি বেজে উঠলো। আরে, রিসিভার তুলে পাশে নামিয়ে রাখলেও শান্তি আছে নাকি? একটু পরেই কিরকম ঘর্ঘর আওয়াজ হয়। সারা বাড়ির লোক ছুটে আসবে তখন।

বারোটা যখন বাজলো, তখন বুকে থ্রম্বসিস।

তারপর প্রায় পনরো মিনিট কেটে গেল। নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়বো ভেবেছিলাম। ভাবলাম, আজকের রাতটা কেটে গেল।

কেটেই গেল, কিন্তু ঘুম এলো না। নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না।

মনে মনে ভাবলাম, প্রতি দিনই কি আর ফোন করবে। আজ করেনি, হয়তো কাল করবে।

কাল, কাল, কাল। প্রতি দিনই রাত বারোটা অবধি ঘুম আসে না। বসে থাকি। আতঙ্ক চেপে ঘড়ির দিকে তাকাই। রিসিভারটার দিকে তাকাই।

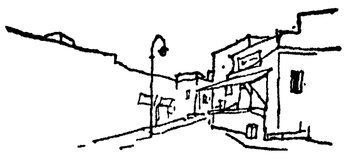
সে কি ভয়!

না রে অনন্ত, মিথ্যে কথা।

প্রথম প্রথম খুব ভয় হতো। মা শুনতে পাবে, কিছু ভাববে। ভয় হতো, রাত্রে ঘুম না হলে সকালে শরীর খারাপ লাগবে। আরো কত কি। হয়তো চেনা-জানা কেউ স্রেফ নাচাতে চাইছে।

কিন্তু একটু একটু করে ভয় চলে গেল। বিশ্বাস কর অনন্ত, এখন মনে হয় বোকামি করেছি। পরের দিন একটা ফোন করলেই হতো। সত্যি বলছি অনন্ত, এখন মনে হয়, আহা, মেয়েটা আরেকবার ফোন করুক না।

। ১৩৭৭



জাল

দোকানদার লোকটি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। একটু যেন উপহাস, একটু বিরক্তি। তারপর আমার দশ টাকার নোটখানা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, এটা জাল নোট।

আমি সত্যি সত্যি চমকে উঠলাম।—জাল?

ভদ্রলোক কোনো কথাই বললেন না। ততক্ষণে তিনি অন্য খদ্দেরের দিকে মন দিয়েছেন। আর আমার সমস্ত ব্যক্তিত্ব সেই মুহূর্তে মাটিতে মিশে গেছে। পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেলে ঠিক এমনই মনে হয় কি না জানি না। আমার নিজের কাছে নিজেকে ভীষণ হতাশ

লাগলো। দোকানদার ভদ্রলোক কি ভিতরে ভিতরে হাসছেন? খুব একটা খুশী-খুশী মুখ করে অন্য খদ্দেরের সঙ্গে তিনি তখন কথা বলতে শুরু করেছেন। একজন জেনেশুনে একটা জাল নোট চালাতে এসেছিলো, ঠিক ধরে ফেলেছেন, তাই একটা যুদ্ধজয়ের আনন্দ তাঁর মুখে। আমার নিজেকে ভীষণ ছোট লাগলো। কেনা প্যাকেটটা ফেলে রেখে আমি বেরিয়ে এলাম। আনন্দ আর টুকুকে টানতে টানতে।

দোকান থেকে বেরিয়ে আসতেই লজ্জায় মুখ লুকোনো ব্যক্তিত্বটা প্রচণ্ড রাগ হয়ে উঠলো। রাগটা ছিলোই, যতক্ষণ দোকানের মধ্যে ছিলাম ততক্ষণও। চাপা ছিলো. এখন উপহাসের কিংবা ঘৃণার চোখ দুটোর কাছ থেকে পালিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে রাগটা ভূমিকম্প হয়ে উঠতে চাইলো। এইমাত্র যে দোকানে এক শো টাকার নোট দিয়ে জিনিসের দাম মিটিয়েছি রাগটা তারই বিরুদ্ধে।

আমার পকেটে এখনো কয়েকটা এক শো টাকার নোট রয়েছে। দশ টাকার নোটও গোটা কয়েক। তবু জাল নোটের বদলে আবার একটা নতুন নোট দেওয়ার কথা মনেই হলো না। আসলে ঐ বাকী পাঁচখানা দশ টাকার নোটকে বোধ হয় সাক্ষী রাখতে চাইলাম। সত্যি কি তাই? না, দোকানদার ভদ্রলোকের কাছে প্রমাণ করতে চাইলাম যে, আমি সৎ, আমি অনেস্ট। অর্থাৎ আমার কাছে আর টাকা নেই। জেনেশুনে কেউ কি একটা জাল নোট নিয়ে জিনিস কিনতে আসে!

জানি না, এতশত কথা ভাবিনি, ভাবার মতো মনের অবস্থা ছিলো না। এমনিতেই বিরক্তির শেষ নেই। পুজোর বাজার করতে বেরিয়েছি, সঙ্গে আমার ছেলে আনন্দ আর মেয়ে টুকু। ওদের চোখের সামনে এতখানি ছোট হতে হলো বলে আরেক লজ্জা।

ফুটপাথ ধরে আমি তখন হনহন করে চলেছি। সেই আগের জুতোর দোকানটার দিকে। ওদের হাতে দু-তিনটে করে প্যাকেট। আমার হাতেও।

আমার রাগটা বোধ হয় আসলে অহংকার, আমি জ্ঞানত কাউকে ঠকাই না। ট্রামের টিকিট কাটা না হলে নামবার আগে কন্‌ডাক্টরকে ডেকে পয়সা দিই। ইচ্ছে থাকলে ঘুষ না হোক, দু-চারটে প্রেজেণ্টেশন পেতে পারতাম। নিই না। অন্যায় সহ্য করতে পারি না, প্রতিবাদ করে বসি। আর সেই আমাকে কিনা অপদস্থ হতে হলো?

টুকু বয়সে ছোট। ও আমার সঙ্গে তাল দিয়ে হাঁটতে পারছিলো না। এক-একবার পিছিয়ে পড়ছিলো, এক-একবার ছুটে এসে আমাকে ধরে ফেলছিলো।

ও হঠাৎ বললে, জাল নোট কি বাবা?

আমি কোনো উত্তর দিলাম না। তখনো আমার মধ্যে প্রচণ্ড রাগটা দাউদাউ করে জ্বলছে।

আনন্দই ওর কথার উত্তর দিলো। বললে, জাল মানে জানিস না? নকল, নকল। মানে মিথ্যে আর কি।

টুকু তখনো ব্যাপারটা বুঝতে পারলো না। বললে, নোট আবার মিথ্যে হয় নাকি?

আমার তখন ওসব কথার দিকে কান নেই। মন নেই বোঝাবার।

এইমাত্র জুতোর দোকান থেকে জুতো কিনেছি দুজনের। কি ভিড়, কি ভিড়। ডাকা-ডাকি চেঁচামেচি করে সেল্‌স্‌ম্যানকে আমাদের দিকে আকৃষ্ট করতেই পনরো মিনিট লেগেছে। তারপর আরো পনরো মিনিট। জুতোর প্যাকেট দুটো বগলদাবা করে ক্যাশে এক শো টাকার নোট দিয়েছি। তখন আমার কাছে আর একটাও দশ টাকার নোট ছিলো না। বেশ স্পষ্ট মনে আছে। ক্যাশিয়ার এক শো টাকার নোটখানা নিয়ে ছ'খানা দশ টাকার নোট আর কিছু দু টাকা এক টাকা ফেরত দিয়েছিলো। কিন্তু এত বড় দোকান, তারা কেন জাল নোট দেবে? নেবার সময় তো দিব্যি দেখেশুনে নিচ্ছে।

আমি গটগট করে সেই জুতোর দোকানে ফিরে এলাম। জাল নোটখানা এগিয়ে দিয়ে বললাম, নোটটা বদলে দিন, এটা নিতে চাইছে না।

ক্যাশিয়ার আমার মুখের দিকে তাকালেন। আমি বোঝাবার জন্যে বললাম, এক্ষুনি নিয়ে গেছি এক শো টাকার নোট ভাঙিয়ে, এই দেখুন বাকী পাঁচখানা...পকেট থেকে পাঁচখানা দশ টাকার নোট বের করে দেখালাম।

ক্যাশিয়ার নিজের কাজ করতে করতে বললেন, তখনই দেখে নেওয়া উচিত ছিলো।

দেখে নেওয়া যে উচিত ছিলো সেটা আমিও জানি। জানি বলেই তো ভিতরে ভিতরে এত রাগ। রাগটা বোধ হয় নিজের ওপরই। তবু তখনো একেবারে নিরাশ হইনি বলেই রাগটা চেপে রাখার চেষ্টা করলাম। একটু হাসবার চেষ্টা করে বললাম, দেখে নিলে তো তখনই ফেরত দিতাম।

আমি আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম আশায় আশায়। আনন্দ আর টুকু আমার মুখের দিকে তাকালো একবার। ওদের কাছে তো বাবার চেয়ে বড় কেউ নেই। বাবা কোনো মিথ্যে কথা বলে না। তা হলে লোকটা টাকা বদলে দিচ্ছে না কেন? আর বাবাই বা এমন মুখ কাঁচুমাচু করে বলছে কেন!

কিন্তু ক্যাশিয়ার যেন আমার কথা ভুলেই গেছেন। দিব্যি ক্যাশ মেমো মিলিয়ে টাকা নিচ্ছেন, মেশিনে টকটক করে অঙ্ক টিপে ঘটাং করছেন, বাকী খুচরো ফেরত দিচ্ছেন। আমি লোকটা যেন ফালতু, জোচ্চুরি করতে এসেছি। মিথ্যে কথা বলছি। আমাকে বিশ্বাস করা যায় না।

আমি আবার বললাম, শুনছেন, আমার এই নোটটা .

নোটটা যে জাল সে কথা কিন্তু আমি বলতে চাইলাম না। আমার কেমন ভয় হচ্ছিলো, নোটটা জাল এ কথা শুনলে কিছুতেই বদলে দেবে না। তাই বললাম, কেউ নিচ্ছে না এটা।

ক্যাশিয়ার এক ফাঁকে তাকিয়ে শুধু টাঙানো নোটিসটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। ওটা দেখার দরকার ছিলো না, সব দোকানেই টাঙানো থাকে। কিন্তু ভিড়ের মধ্যে তাড়া-হুড়োয় কেই বা এত ভালো করে নোটগুলো দেখে নেয়।

আমার তখন নিজের বোকামির জন্যে নিজের ওপরই রাগ হচ্ছে। আর ঠিক তখনই টুকু বললে, বাবা, চলো না, বড্ড গরম।

আনন্দ বললে, ঘেমে যাচ্ছি।

আমি আরো অধৈর্য হয়ে রাগে ফেটে পড়তে চাইলাম। তবু বিনয়ে গলে যাবার মতো করে বললাম, নোটিস তো চিরকালই আছে, দেখে নিইনি বলেই তো এখন আপনার কৃপাপ্রার্থী। কথাটায় নিঃসন্দেহে একটু ঠাট্টাও ছিলো।

ক্যাশিয়ার বললেন, বললাম তো হবে না। তখনই দেখে নিলে পারতেন।

আর এবার সত্যি সত্যি আমি রাগে ফেটে পড়লাম। বললাম, তখন দেখে নিলে শুধু ফেরত দিতাম না। জাল নোট চালাতে চাইছেন বলে কষে একটা থাপ্পড় বসিয়ে দিতাম।

ক্যাশিয়ার চমকে চোখ তুলে তাকালেন, তারপর আবার মাথা নীচু করে কাজ শুরু করলেন। যেন কিছুই হয়নি।

দু-একজন খদ্দের আমাকে উপদেশ দিলেন, কি আর করবেন, ওটা গেছে মনে করুন। কিন্তু তাঁরাই নোটগুলো ফেরত নেবার সময় দু-তিনবার করে আলোর সামনে ধরে পরীক্ষা করে নিলেন। একজন তো আমার নোটটা দেখে বললেন, কেন খারাপ বলুন তো? চিনে রাখি বরং।

আমি রেগে গিয়ে বললাম, জানি না।

—তা হলে দেবেন না বদলে? আমি চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে বললাম। ইচ্ছে হলো নোটটা ক্যাশিয়ারের সামনেই ছিঁড়ে কুচিকুচি করে তার মুখের ওপর ছুঁড়ে মারি। কিন্তু পারলাম না।

তখন কেমন একটা ক্ষীণ আশা রয়েছে দশ টাকার নোটখানা জাল না-ও হতে পারে। কিংবা জাল হলেও কোথাও হয়তো চালিয়ে দিতে পারবো।

আসলে দশটা টাকা এমন কিছু বড় কথা নয়। বিশেষ করে এই পুজোর মুখে। সদ্য সদ্য মোটা টাকা বোনাস পেয়েছি। এখনো পকেটে কয়েকখানা এক শো টাকার নোট রয়েছে। এক-খানা দশ টাকা লোকসান হলে এমন কিছু ভিখিরী হয়ে যাবো না। কিন্তু এমন বোকা বানিয়ে দিলো আমাকে এটাই রাগের আসল কারণ। আরেকটা রাগ, আমাকে লোকটা বিশ্বাস করলো না। অথচ আমি বিশ্বাসী, এটাই তো আমার একমাত্র অহঙ্কার। বাজারে মাছ কিনতে গিয়ে একদিন পুরো একটা টাকা বেশী ফেরত দিয়েছিলো, আমি বেশ কিছুটা চলে এসে সেটা আবিষ্কার করে আবার ফিরে গিয়ে ফেরত দিয়ে এসেছিলাম।

—তা হলে দেবেন না বদলে? আমি চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে বলে এক মুহূর্ত অপেক্ষা

করলাম, তারপর 'ঠিক আছে' বলেই বেরিয়ে চলে এলাম দোকান থেকে। আনন্দ আর টুকুকে টানতে টানতে।

কেন যে বললাম 'ঠিক আছে' তাও জানি না। কারণ, কিছুই তো করার নেই।

এতক্ষণ ওঁর দয়ার ভিখিরী ছিলাম, পেলে খুব ধন্যবাদ-টন্যবাদ দিতাম। ভিক্ষে না পেয়ে এক-একটা ভিখিরী যেমন রেগে গিয়ে যা-তা বলে যায় আমিও ঠিক তাই করলাম। শাসিয়ে এলাম, যদিও জানি আমার মতো অসহায় এখন আর কেউ নেই। আমি তো ওর কিছুই করতে পারবো না।

বাইরে বেরিয়ে এসেই এক দমকা ঠাণ্ডা হাওয়া মেখে রাগটা পড়ে গেল। তখন শুধুই দশটা টাকার দুঃখ। এইমাত্র যা বলে এসেছি সে কথা ভেবে নিজের মনেই হেসে ফেললাম। আর সঙ্গে সঙ্গে অনুর কথা মনে পড়লো।

অনু মানে আমার স্ত্রী, যে আমাকে সারা জীবন প্র্যাকটিক্যাল করার চেষ্টা করে ইদানীং হাল ছেড়ে দিয়েছে। তার তো এমনিতেই ধারণা আমার মতো বোকা আর একটিও নেই। আমাকে সকলেই ঠকায়, তার উপদেশ না মেনেই সেবার ফরাক্কায় পকেটমার হয়েছিলো।

এই জাল নোট তার হাতে আরেকটা উপকরণ এনে দেবে এই আশঙ্কায় আমি নিজের মনেই হেসে ফেললাম। তারপর আনন্দ আর টুকুকে বললাম, এই, মাকে গিয়ে যেন তোরা কিছু বলবি না। কেমন?

—কি বলবো না বাবা? টুকু জিগ্যেস করলো সরল নিষ্পাপ গলায়।

আমার পকেটে তখন একটা পাপ। সেটা লুকোবার চেষ্টায় আমি তখন আত্মমগ্ন।

বললাম, কিছু না।

কিন্তু লিস্ট মিলিয়ে বাকী জিনিস ক'টা কেনার দিকে আমার তখন আর মনই নেই। তখন একটাই লক্ষ্য, দশ টাকার জাল নোটখানা চালাতে হবে। ওটা চালাতে পারলেই সব অপরাধ মাফ হয়ে যাবে, সব বোকামি চাপা পড়ে যাবে।

নিজে হেরে গেছি, নিজেকেই এবার জিততে হবে।

ইস্কুলে পড়ার সময় 'পিণ্টু' বলে আমার এক বন্ধু ছিলো, একবার একটা অচল সিকি চালাতে গিয়ে কি হালই না হয়েছিলো তার। দোকানদার একটা জাঁতি দিয়ে সীসের সিকিটা কেটে দিয়ে ফেরত দিয়েছিলো। পিণ্টুর মুখ তখন সীসের মতোই ফ্যাকাশে। দেখে তখন আমারও দুঃখ হয়েছিলো। কিন্তু মনে মনে বলেছিলাম, পিণ্টুরই তো দোষ, জেনেশুনে একটা অচল সিকি ও চালাতে গেল কেন।

এতকাল পরে পিণ্টুর কথা মনে পড়লো, পিণ্টুকে নির্দোষ মনে হলো। অর্থাৎ সেই ক্লাস সিক্সের ছেলেটিকে কবর থেকে খুঁড়ে এনে মুকুট পরানোর মানে একেবারে সাদা। নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা। কারণ, এখন আমার যে একটাই কাজ, জাল নোটখানা চালানো।

ফুটপাথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে চলেছি, আর প্রত্যেকটি দোকান দেখছি। দোকানদারদের মুখগুলো। কোন্ লোকটাকে বেশ বোকাসোকা মনে হয়।

আনন্দ বললে, বাবা, ঐ জিনিসগুলো নেবে না?

অর্থাৎ নোটটা জাল আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে যে জিনিসগুলো নেওয়া হয়নি। তখন আমরা সেই দোকানটার পাশ দিয়েই চলেছি কিনা, তাই আনন্দ মনে পড়ালো।

বললাম, নেবো, নেবো। ঐ দোকানে নয়।

অর্থাৎ অন্য দোকানে নিলে নোটখানা চালাবার সুযোগ পাওয়া যাবে।

টুকুর জন্যে দুটো রেডিমেড ফ্রক কিনতে হবে। ভাবলাম সেখানেই আগে চেষ্টা করে দেখি। এইসব পুজোর বাজার-টাজার আমার একেবারে বরদাস্ত হয় না। ওসব প্রতিবার অনুই করে। ওর কাছে তো দোকানে যাওয়া কোনো পরিশ্রম নয়। আসলে ওর কাছে এ এক ধরনের ফুর্তি। ঘুরে ঘুরে জিনিস কেনায় কি যে মজা আমি ঠিক বুঝতে পারি না। এবার ও হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে, ডাক্তার হাঁটাহাঁটি করতে বারণ করেছে তাই আমার ওপর সব ভার।

অনু অবশ্য বলেছিলো, ডাক্তাররা অমন বারণ করেই থাকে, কিচ্ছু হবে না, আমিই যাই।

কিন্তু আমি রাজী হতে পারিনি।

এখন যদি শোনে দশটা টাকা...

একটা দোকানে ঢুকে পড়লাম। ফ্রক-ট্রক দেখলাম, পছন্দ হলো না। যদিও পছন্দ-অপছন্দ তখন বড় কথা নয়। জাল নোট চালানোই আসল উদ্দেশ্য। একটা বাজে জিনিস কিনে চালাতে পারলেও যেন বেঁচে যাই। বেশ, ফ্রক না হোক, শার্ট আছে কি না আনন্দের দেখার জন্যে কাউণ্টার বদলালাম। আর রেডিমেড শার্টের স্তূপ দেখতে দেখতে এক-একবার ক্যাশ কাউণ্টারের লোকটিকে তাকিয়ে দেখলাম। সে কতখানি ব্যস্ত, চালাক-চতুর মনে হচ্ছে কি না।

আনন্দকে একটা শার্ট পরিয়ে দেখলাম। বেশ ভালোই লাগলো, খুব একটা ভালো ফিট না করলেও নোটখানা চালানোর আশায় বললাম, দিয়ে দিন।

সেল্‌স্‌ম্যান জামাটা প্যাক করে দিলো, আর একজন ক্যাশ মেমো কেটে টাকা চাইলো। সেই ঘুরে ঘুরে ক্যাশে টাকা জমা দিচ্ছিলো। কেন জানি না সেই মুহূর্তে আমার নার্ভ ফেল করলো। কিছুতেই জাল নোটখানা দিতে পারলাম না। ভালো নোটই বের করে দিলাম।

জামাটা নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে মনটা নিজের ওপরই বিষিয়ে গেল। নিজেকে ভীতু মনে হলো। এই তো একটু আগে দিব্যি নোটখানা দিতে পেরেছিলাম, তখন জানতামই না ওটা জাল। এবারেও তো সেইভাবেই এগিয়ে দিতে পারতাম। না-হয় ফেরতই দিতো।

হতাশ মুখে দোকান থেকে বেরিয়ে এসে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ভাবছি এবার কি করা যায়, টুকু সেই মুহূর্তে বললে, বাবা, আমার ফ্রক কিনবে না?

—কিনবো, কিনবো। দাঁড়া না। আমি প্রায় ধমক দিয়েই ওকে চুপ করিয়ে দিলাম। মুখ শুকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

আমি একটা সিগারেট ধরালাম। একটু নিশ্বাস নিতে চাই, একটু ভাবতে চাই। কিভাবে নোটখানা চালানো যায়।

তারপর হঠাৎ একটা বড় ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর্সের কথা মনে পড়লো। ঠিক, ঠিক, ঐরকম ভিড়ের দোকানেই নোটখানা চালানো সম্ভব।

কথাটা মনে আসতেই বেশ ফুর্তি-ফুর্তি লাগলো। সিগারেটে দুটো টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে আনন্দ আর টুকুকে বললাম, দোকানে গিয়ে যখন টাকা দেবো, তখন কিন্তু কোনো কথা বলবি না তোরা।

আনন্দ বুঝলো। বললো, না, না, কিচ্ছু বলবো না। ছোট বোনকে সে-ই সাবধান করে দিলো।

টুকু কিছু বুঝলো কি না জানি না। সেও ঘাড় নেড়ে বললে, না, না।

ওরা তখন নোটখানার কথা ভাবছেই না! আনন্দর তখনো শার্ট প্যাণ্ট, টুকু ভাবছে তার ফ্রকের কথা।

কিন্তু দোকানটায় কি ভিড়, আর কি গরম। সকলেই তাড়াহুড়ো করে জিনিসপত্তর কিনে নিয়ে পালাতে পারলে বাঁচে।

একজন কে যেন বললে, এরা এয়ারকণ্ডিশন করে না কেন!

অসহ্য গরম, অসহ্য গরম।

ঘুরতে ঘুরতে বেশ কিছু জিনিসের মেমো করিয়ে ফেললাম। কস্‌মেটিক্‌স্‌, বিছানার চাদর, ওদের দুজনের ফ্রক আর শার্টও পছন্দ হয়ে গেল।

মেমোগুলো নিয়ে এবার ক্যাশে টাকা দিতে হবে। তারপর প্যাকেটগুলো পাওয়া যাবে ডেলিভারি কাউণ্টারে।

ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম। লাইন দিয়ে খদ্দেরের দল টাকা দিচ্ছে।

আমি এবার জাল নোটখানা দশ টাকার নোটগুলোর মাঝখানে রেখে অপেক্ষা করছি। যেভাবে দ্রুত টাকা-পয়সা নিচ্ছে ক্যাশিয়ার, মনে আশা উঁকি দিচ্ছে, হয়তো চালাতে পারবো! তবু বুক দুরদুর করছে এক-একবার।

একটু একটু করে এগিয়ে আসছি, এগিয়ে আসছি। যত এগোচ্ছি ততই ভয় বাড়ছে।

তখন সকলেই তাড়া দিচ্ছে, ধমক দিচ্ছে ক্যাশিয়ারকে।—তাড়াতাড়ি করুন না মশাই।

একটা ছোকরা ঠাট্টা করে বললো, স্লো মোশনের ছবি মাইরি।

যে যা ইচ্ছে টিপ্পনী কাটছে, আর এক পা এক পা এগিয়ে আসছে।

একজন বললে, দোকান তো নয়, ফার্নেস।

আর একজন, তারপরই আমি। আমি চরম ভালোমানুষের মতো মুখ করে লোকটিকে বললাম, আমরা তো তবু আধ ঘণ্টার জন্যে এসেছি মশাই। ওঁর কথা ভাবুন তো, সারা দিন খাটছেন, এই গরমে।

ক্যাশিয়ার হঠাৎ সহানুভূতি পেয়ে চোখ তুলে তাকালেন আমার দিকে। খুব খুশী-খুশী মুখে। কাজ করতে করতেই বললেন, সারা দিন তো শুধু গালাগালি খাচ্ছি, আপনি তবু সত্যি কথাটা বললেন।

আমি হাসলাম। বিনয়ের কণ্ঠে বললাম, মুশকিল কি জানেন, সবাই নিজের দিকটাই ভাবে। আমি তো যতবার এসেছি, দেখেছি আপনি নিশ্বাস ফেলার সময় পান না।

একজন পিছন থেকে বললে, এয়ারকণ্ডিশন করলেই তো পারেন।

আমি হেসে বললাম, ওঁদের বলে কি লাভ, আসল জায়গায় গিয়ে বলুন, তা হলে ওঁরাও বেঁচে যাবেন।

ক্যাশিয়ার ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললেন। খুব খুশী হয়েছেন মনে হলো। ততক্ষণে আমার টার্ন এসে গেছে। হাত বাড়িয়ে নোটগুলো এগিয়ে দিলাম, মেমোগুলোও। হাসি-হাসি মুখ করে বললাম, আপনি তো তবু মাথা ঠিক রেখে চটপট নিয়ে নিচ্ছেন, এক-এক জায়গায় এত দেরি করে!

ক্যাশিয়ার নোটগুলো গুনে নিয়ে কল টিপলেন, ঘটাং করলেন, বোধ হয় আমাকে খুশী করার জন্যে একটু তাড়াতাড়িই করলেন। তারপর খুচরো আর মেমোগুলো ফেরত দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলাম ডেলিভারি কাউণ্টারে। এখন ধরা পড়লেও আমি বলবো, তখন দেখে নেননি কেন? বলবো, ও টাকা আমি দিয়েছি তার প্রমাণ কি।

তাড়াতাড়ি প্যাকেটগুলো ডেলিভারি নিয়ে আনন্দ আর টুকুকে টানতে টানতে রাস্তায় এসে হাজির হলাম। আর কি ভাগ্য, সঙ্গে সঙ্গে একটা ট্যাক্সি, যা কখনো পাওয়া যায় না।

সে কি আনন্দ! কি আনন্দ! সারাক্ষণ মনে হলো যেন আমি মুক্ত। আমার সব বোকামি এখন ধুয়ে-মুছে গেছে। সব অপরাধ চাপা পড়ে গেছে। আমি জিতে গেছি।

ট্যাক্সিতে গা এলিয়ে দিয়ে আমি একটা সিগারেট ধরাতেই আনন্দ বলে ফেললো, নোটটা চালিয়ে দিয়েছো, না বাবা?

আমি শুধু ঘাড় নাড়লাম।

বাড়ি ফিরে আসতেই আনন্দ তার মা-র কাছে বর্ণনা শুরু করলো, কিভাবে জাল নোট নিয়ে ফেলেছিলাম, কিভাবে জুতোর দোকানে ঝগড়া করেছি সেটা বদলে দিতে বলে।

আর আমি যুদ্ধজয়ের ভঙ্গিতে হাসতে হাসতে বলে গেলাম, কিভাবে আরেকটা দোকানে ক্যাশিয়ারকে মিষ্টি মিষ্টি কথায় খুশী করে শেষ অবধি চালিয়ে দিয়েছি নোটখানা।

অনু শুনছিলো আর হাসছিলো। সব শুনে খুশিতে বলে উঠলো, তুমি একেবারে পাক্কা জালিয়াত।

আমরা সবাই হেসে উঠলাম। আনন্দও।

[১৩৭৮



অটোগ্রাফ

আমার একটা অটোগ্রাফের খাতা ছিলো। বাবা ওটা দিদিকেই কিনে দিয়েছিলো। তখন দিদি আমাকে খাতাটা ছুঁতেই দিতো না। বিয়ের পর দিদি যখন শ্বশুরবাড়ি চলে যাচ্ছে, ওর দেরাজের কাগজপত্তর ঘাঁটতে ঘাঁটতে অটোগ্রাফের খাতাটা বেরিয়ে পড়লো। আমি ঠাট্টা করে বললাম, কি রে দিদি, তোর মহামূল্য সম্পত্তিটা নিয়ে যাবি না? দিদি তখন শাড়ি-গয়না গোছগাছ করতেই ব্যস্ত। তবু আমার কথা শুনে তাকালো, উঠে এসে খাতাটা হাতে নিলো, তারপর মলাটের ওপর মায়ার মতো করে হাত বুলিয়ে কয়েকটা পাতা উলটে উলটে দেখে বললো, মলি, এটা তোকেই দিয়ে দিলাম।

খাতাটার অনেকগুলো পাতা তখনো সাদা।

ওটা পেয়ে আমার খুব আনন্দ হয়েছিলো।

আমি তখন ক্লাস টেন-এ পড়ি, বাবাকে বললে হয়তো ওর চেয়ে আরো ভালো একটা অটোগ্রাফ খাতা আমাকে কিনেও দিতো, কিন্তু প্রথম দিকের এসব লোকের সই কি আমি যোগাড় করতে পারতাম নাকি! দিদি আমার মতো এতটা লাজুক ছিলো না, অনেক জায়গায় যেতো, মিটিং-টিটিং-এ কিংবা খেলার মাঠে দিব্যি এগিয়ে গিয়ে অটোগ্রাফ যোগাড় করে আনতো। আমি ওসব একটুও পারতাম না।

ঐ খাতাটার প্রথম পাতায় ছিলো দিদিদের ইস্কুলের বড় দিদিমণির আশীর্বাণী গোছের কয়েক লাইন লেখা। ঐটুকুর জন্যেই যা কিছু খুঁতখুঁতুনি। তারপর পতৌদি, চুনী, গিন্‌স্‌বার্গ—আরো অনেক। প্রথম দিন পাতা উলটে উলটে শেষ অটোগ্রাফটায় এসে চোখ আটকে গিয়েছিলো। দু লাইনের একটি কবিতা। ওঁর কবিতার সংগে সেই আমার প্রথম পরিচয়। কবিতা না ছড়া, আমি অতশত তখন বুঝতাম না। কিন্তু ও দু লাইন পড়েই মনে হয়েছিলো ওর ফাঁকে ফাঁকে যেন কয়েকটা লাইন লুকিয়ে আছে। প্রথমবার পড়ে আমার খুব মজা লেগেছিলো, হেসেও ফেলেছিলাম। আর আড়চোখে একবার বোধ হয় দিদির মুখের দিকেও তাকিয়েছিলাম।

দিদি চলে যাওয়ার পর আমার ভীষণ ফাঁকা-ফাঁকা লাগতো। মা-বাবাও কেমন চুপ-চুপ হয়ে গিয়েছিলো। কথা বলতো কম, আর যেটুকু বা বলতো শুধু দিদি সম্পর্কে। বাবা একদিন মাকে বলেছিলো, 'মলিটা একদম মনমরা হয়ে গেছে।' শুনতে পেয়ে আমার কষ্ট হয়েছিলো। চোখে জল এসে গিয়েছিলো। সত্যি, দিদি চলে যাওয়ায় আমার একটুও ভালো লাগতো না। আমরা দু বোনে কত আনন্দেই না ছিলাম।

দিদির কথা ভাবতে গেলেই ঐ অটোগ্রাফ খাতাটার কথা আমার মনে পড়ে যেতো আর খাতাটার কথা মনে পড়লেই সেই দু লাইন কবিতার কথাও।

আমার হঠাৎ একদিন মনে হয়েছিলো, আচ্ছা, ঐ কবিতার পর দিদি আর কোনো অটোগ্রাফ যোগাড় করেনি কেন? ওর অটোগ্রাফের নেশা কেটে গেল কেন?

এখন তো খাতাটা আমিও হারিয়ে ফেলেছি, পর পর বেশ কয়েকটি সই-টই যোগাড় করার পর আমারও নেশা তো হঠাৎ কেটে গিয়েছিলো। তা হোক, সেই দু লাইন কবিতা আমি এখনো মনে করে রেখেছি।

অথচ আমার তো মনে করে রাখার কথা নয়। যদি সত্যি সত্যি ও দু লাইনের ফাঁকে আরো কয়েক লাইন থেকে থাকে তা হলে দিদিরই মনে রাখার কথা।

দিদি একবার দিন পনরোর জন্যে দুর্গাপুর থেকে এসে আমাদের কাছে ছিলো। সে সময় ওর মুখে সর্বদাই 'তোর সুশান্তদা', 'তোর সুশান্তদা'। 'তোর সুশান্তদা কি ভীতু রে, একদিন যা করেছে না...' বলতে গিয়ে আসল কথাটা বলবে কি, হাসি থামাতেই পারেনি।

আমি কিন্তু দিদির মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন খুঁজে বের করতে চাইতাম।

আচ্ছা, দিদি কিভাবে ওঁর কাছে অটোগ্রাফ নিতে গিয়েছিলো? একা, না আরো কেউ ছিলো? দিদি কি এসে অটোগ্রাফটা বাবাকে দেখিয়েছিলো, মাকে? কই, আমার কাছে তো গল্প করে একদিনও বলেনি।

দিদি বসে বসে সেদিন সুশান্তদাকে চিঠি লিখছিলো, আমি ইচ্ছে করে কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই দিদি হেসে আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিলো।

আমি বললাম, তোর বরের চিঠি দেখতে বয়ে গেছে আমার, দেখছিলাম কোন্ রঙের কালিতে লিখছিস।

বলেই আমি টেনে টেনে আবৃত্তি করলাম :

রঙিন কালির কলম এনো
এই কালি তো ফিকে
এই কালিতে সুখ নেই কো
মনের কথা লিখে।

তাকিয়ে দেখলাম দিদির মুখে কোনো ভাবান্তরই হলো না। ও তখন মন দিয়ে চিঠিই লিখছে।

আমাকে কেউ যদি এমন একটা অটোগ্রাফ দিতো তা হলে আমি নিশ্চয় খুব লজ্জা পেতাম। অথচ কেন জানি না আমার কেমন ভাবতে ভালো লাগতো ও দুটি লাইন যেন আমাকে উদ্দেশ্য করেই লেখা। তখন অবধি আমি ওঁর নামই শুনেছি, ওঁর কবিতা-টবিতা তখনো পড়িনি। ওঁর সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই ছিলো না। তবু একদিন শুয়ে শুয়ে কল্পনা করতে ভালো লেগেছিলো, যেন আমি নিজেই অটোগ্রাফের খাতাটা নিয়ে ওঁর সামনে ভয়ে জড়সড় হয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, আর উনি আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন, চোখে চোখ পড়লো, আমার বুকের ভেতরটা থরথর করে কেঁপে উঠে আনন্দ উপচে দিলো, আর ঠিক তখনই আমার কাছ থেকে কলম চেয়ে নিয়ে অটোগ্রাফের ঐ দুটি লাইন উনি লিখে দিলেন।

মনে মনে তাই বললাম, দিদি, তুই খুব লাকি রে। সবাই বলে, তুই খুব সুন্দর। সবাই বলে, তুই খুব স্মার্ট। আর সেজন্যেই উনি বোধ হয় তোকে এমন সুন্দর একটা অটোগ্রাফ দিয়েছিলেন। অথচ ঐ খাতাটা নিয়ে আমি যাঁর কাছেই গিয়েছি তিনি হয় শুধুই সই দিয়েছেন, আর নয়তো বড় বড় কথা, যেসব কথা ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না।

আচ্ছা, আমি কি তখন আমার মনের ভেতরের কোনো শূন্যতাকে ভরিয়ে তুলতে চাইছিলাম? তা না হলে সামান্য একটা অটোগ্রাফ নিয়ে কেই বা এত কথা ভাবে। হয়তো তাই। ঠিক ঠিক, এখন মনে পড়ছে, কলেজে ভরতি হওয়ার মাস কয়েক বাদেই খাতাটা হারিয়ে গেল। কারণ, অনেক দিন আমি আর ঐ খাতাটার খোঁজই রাখিনি। আমার তখন অনেক বন্ধু, বাড়ির ছোট্ট গোল বারান্দার বাইরে তখন আমার অঢেল উঠন—কলেজের কমন রুম, সিনেমা-হল, রেস্টুরেণ্ট। আমি, রুমা, জয়ন্তী, অলকা—সব জায়গায় আমরা একসঙ্গে। জয়ন্তী তখন লুকিয়ে লুকিয়ে সুপ্রকাশের সঙ্গে দেখা করতো, একদিন ধরা পড়ে গেল আমাদের কাছে, তারপর আমাদের কাছে আর কিছুই লুকিয়ে রাখলো না, বরং পোস্ট আপিস থেকে যখন সুপ্রকাশকে ফোন করতো তখন আমাদের ডেকে নিয়ে যেতো। আমরা ওর কথা শুনতাম, হাসাহাসি করতাম, আর সুপ্রকাশকে টেলিফোনে কত মিথ্যে অজুহাতই না দিতো জয়ন্তী। একদিন আমাকেও রিসিভার ধরে মিথ্যে সাক্ষী দিতে হয়েছিলো।

জয়ন্তী শেষ অবধি সুপ্রকাশের সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দিয়েছিলো। আর সুপ্রকাশের কাছেই আমি ওঁর নাম শুনেছিলাম।

একটা কবিতা আবৃত্তি করে একদিন সুপ্রকাশ বললো, কার লেখা জানো?

অলকা বললো, তোমার মতো অত কবিতার খোঁজ রাখার আমাদের এখনো প্রয়োজন হয়নি।

রুমা হেসে বললো, কবিতা-টবিতা আমি পড়িই না।

আমি বললাম, শুনে তো মনে হচ্ছে তোমারই লেখা।

সুপ্রকাশ হো-হো করে হেসে উঠলো। বললো, তা হলে তো জীবন ধন্য হয়ে যেতো।

এমন কবিতা একজনই লিখতে পারেন।

বলে তাঁর নামটা স্পষ্ট করে টেনে টেনে উচ্চারণ করলো। আর সঙ্গে সঙ্গে আমি বেশ গর্বের গলায় বলে উঠলাম, জানো সুপ্রকাশ, আমি কিন্তু ওঁকে চিনি। আমার কাছে ওঁর অটোগ্রাফ আছে।

আমি অবশ্য একটা ছোট্ট মিথ্যে কথা বলে বোঝাতে চেয়েছিলাম যে, আমি ওঁকে দেখেছি, আলাপ হয়েছে, অটোগ্রাফ নিয়েছি নিজেই। কিন্তু খুব মিথ্যে কথা কি বলেছিলাম? আমার কাছে তো সত্যিই ওঁর অটোগ্রাফ ছিলো। আর ঐ দুটি লাইনের মধ্যে দিয়ে ওঁকে সত্যিই আমার খুব চেনা মনে হলো।

সুপ্রকাশ তখন ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র। ও যখন আমাদের সঙ্গে আড্ডা দিতো তখন মুখে আগল রাখতো না। আমরাই কি কম ইয়ার্কি ফাজলামি করতাম! আমরা যে সবাই সুপ্রকাশকে 'তুমি' বলতে শুরু করেছিলাম আর সুপ্রকাশও যে আমাদের 'তুমি' বলতো সে ঐ ইয়ার্কির ছলেই। কিন্তু সুপ্রকাশের মুখে ওঁর প্রশংসা শুনে আমার যেমন ভালো লেগেছিলো তেমনি খারাপ লেগেছিলো ও আমার কথাটাকে কোনো আমল দিলো না বলে। যেন অটোগ্রাফটার কোনো দাম নেই, গর্ব করার মতো কোনো বিষয় নয়।

আমি তাই অস্বস্তি চাপা দেবার জন্যে সুপ্রকাশকে বললাম, তোমার কাছে ওঁর কোনো কবিতার বই আছে?

জয়ন্তী বললো, আছে, আমার কাছে। দেবো এখন।

প্রথম বইটা জয়ন্তীর কাছ থেকে নিয়েই পড়েছিলাম। তারপর একে একে তার সব বই। সব কবিতা।

বই পড়ার নেশা হয়ে গিয়েছিলো আমার ইস্কুল থেকেই—সবরকমের বই। কবিতার নেশা কলেজে এসে। কিন্তু ওঁর কবিতা আমি খুঁজে খুঁজে পড়তাম। যে-কোনো কাগজে ওঁর একটা কবিতা ছাপা হলেই সেটা আমার কাছে একটা বড় খবর হয়ে আসতো। আর নির্জনে একা-একা যখনই ওঁর কবিতা পড়তাম, মনে হতো উনি যেন নির্জনে একা-একা আমার সঙ্গে কথা বলছেন, আমার মনের গভীরে পৌঁছে গিয়ে আমার বুকের ভিতরের শূন্যতা, আমার চাপা কষ্ট, আমার অতলান্ত দুঃখকে স্নেহের হাত দিয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছেন। ওঁর কবিতার সর্বাঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস জড়িয়ে থাকতো, একটা তীব্র দুঃখ—যেটা আমারও। তাই কখনো সেই অ-দেখা কবির জন্য আমার মায়া হতো, কখনো মনে হতো, তিনি আমাকে না দেখেও কি করে আমার মনের কথাগুলো এমনভাবে কানে কানে শুনিয়ে যান।

ওঁর যে-কোনো একটা নতুন কবিতা আবিষ্কার করতে পারলেই আমি জয়ন্তী কিংবা রুমাকে ডেকে পড়ে শোনাতাম। আবার কখনো ইচ্ছে হতো ওঁকেই সরাসরি একটা চিঠি লিখে বসি।

দু-এক দিন লিখেছি। কিন্তু সে চিঠি ঠিক মনের মতো হয়ে ওঠেনি। ভয় হয়েছে, এ চিঠি পড়ে তিনি হয়তো হাসবেন, হয়তো ছিঁড়ে ফেলবেন। অনুরাগীদের এমন চিঠি তো তিনি কতই পান। একটি তুচ্ছ মেয়ের উপচে-পড়া প্রশস্তির কিই বা দাম আছে তাঁর কাছে।

তবু শেষ অবধি একটা চিঠি লিখেই ফেললাম। কারণ, তাঁর একখানা বই নিয়ে অনেক রাত অবধি নাড়াচাড়া করতে করতে, বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করতে করতে হঠাৎ ভূমিকার পাতাটায় চোখ পড়লো, ভূমিকার নীচে তাঁর বাড়ির ঠিকানা, আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো উনি যেন আমার এই চিঠিটার জন্যে অপেক্ষা করে আছেন—আমার, কিংবা আমার মতোই অন্য কারও। তা না হলে ঠিকানাটা উনি দিয়েছেন কেন।

আমি বড় আলোটা জেলে তখনই চিঠি লিখতে বসে গেলাম।

আলো জ্বলছে টের পেয়ে মা পাশের ঘর থেকে বললো, শুয়ে পড় মলি, শুয়ে পড়। বেশী রাত জাগলে তোর শরীর খারাপ হয়।

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, তোমরা ঘুমোও তো, আমার কথা ভাবতে হবে না।

আসলে মা আমাকে সব সময়ই সন্দেহ করতো। কিংবা আমারই দোষ, আমার মনে হতো মা আমাকে সব সময়ই সন্দেহ করছে। যেন আমি জয়ন্তীর মতো কোনো ছেলে বন্ধু জুটিয়েছি, যেন রাত জেগে প্রেমপত্র লিখছি।

আমি ভেবেছিলাম চিঠিটা রুমা কিংবা জয়ন্তীকে দেখাবো। কিন্তু শেষ অবধি দেখাতে ইচ্ছে হলো না। আমার মনে হলো, তাঁর কবিতা আমার ভালো লাগা, আমার চিঠি লিখতে ইচ্ছে হওয়া সবই আমার নিজস্ব। আমার একার।

আমি নিজে গিয়ে চিঠিটা ডাকবাক্সে ফেলে এলাম। আর তার পর থেকে অধৈর্য হয়ে কেবলই অপেক্ষা করা। যদি উত্তর আসে। বারবার চিঠির বাক্সটা হাতড়ে দেখি প্রতি দিন। এক-একদিন ভাবি আজ নিশ্চয়ই উত্তর আসবে। তারপর হতাশায় আমার যেন চোখ ঠেলে জল আসতে চায়। নিজেকে ভীষণ তুচ্ছ মনে হয়, যেন কারও কাছে কোনো দাম নেই আমার।

কিন্তু হঠাৎ একদিন উত্তর এলো। সে কি আনন্দ আমার! সেই দ্বিতীয়বার ওঁর হাতের লেখা দেখলাম। কি সুন্দর হাতের লেখা, আর কি আন্তরিক সরল ভাষায় উত্তর দিয়েছেন। প্রত্যেকটি শব্দ যেন আমাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেল।

আমি অধীর আনন্দে তখনই রুমাদের বাড়িতে ছুটে চলে গেলাম। ট্রাম থেকে নেমে হাঁটছি, তখনো আমার বুকের মধ্যে কি যেন হয়ে চলেছে।

—রুমা, তোদের আমি বলিনি। এই দেখ।

আমি চিঠিটা এগিয়ে দিলাম। রুমা তরতর করে পড়ে শেষ করে মুগ্ধ চোখ তুলে বললো, চিঠি দিয়েছিলি? তুই কি লাকি রে!

জয়ন্তী ভীষণ খুশী হলো। বললো, দেখিস, তুই যেন ভদ্রলোকের প্রেমে পড়ে যাস না।

আমি হেসে উঠলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্তীর কথাটা আমার খারাপ লাগলো। মনে হলো ওঁকে শ্রদ্ধার আসন থেকে ও যেন টেনে নামিয়ে দিচ্ছে।

জয়ন্তী বললো, দেখা করতে যাবি? চল না, আমরাও যাবো।

কিন্তু আমি মনে মনে জানতাম, আমি ওদের একজনকেও সঙ্গে নিয়ে যাবো না। অথচ একা যেতেও আমার ভীষণ ভয়। কি কথা বলবো! কিই বা বলার আছে। যা বলতে চেয়েছি তা তো চিঠিতেই লেখা হয়ে গেছে।

আমি সেদিন বারবার কল্পনায় তাঁর ছবি আঁকতে চাইলাম। তাঁর ভাবভঙ্গী, কথা বলা। চোখ বুজে স্বপ্ন গড়লাম, আমি গিয়ে দাঁড়িয়েছি তাঁর সামনে, দু হাত তুলে নমস্কার করলাম। তিনি মুগ্ধভাবে তাকালেন আমার দিকে, বললেন, আমার প্রকৃত সৌন্দর্য তুমিই ধরতে পেরেছো ...তুমি...

উনি অবশ্য আমাকে দেখা করার কথা কিছুই লেখেননি। তবু চিঠিটা পড়ে বেশ বুঝতে পারছিলাম, দেখা করতে গেলে উনি বিরক্ত হবেন না। তা হলে কি আর এমন আন্তরিক চিঠি লিখতেন। আমার কেবলই মনে হচ্ছিলো, এই চিঠির ভাষায় কোথায় একটা অলিখিত আমন্ত্রণ রয়েছে।

আমি ভেবে ঠিক করতে পারছিলাম না, আবার একটা চিঠি লিখবো, না টেলিফোন করবো। ওঁর চিঠির কাগজে ফোন নম্বর তো ছাপাই আছে। কিন্তু ফোনে কথা বলতে গিয়ে আমি নার্ভাস হয়ে যাবো না তো!

ওঁকে চিঠি লিখতেই যেখানে এত ভয়, টেলিফোনে কথা বলবো কি করে। এক-একসময় মনে হচ্ছিলো, দূর, মিথ্যে কল্পনা সব, ওঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই পারবো না।

তার চেয়ে চিঠি লেখাই ভালো। সঙ্গে সঙ্গে সেই হারিয়ে-যাওয়া অটোগ্রাফ খাতার লাইনটা মনে পড়ে গেল : এই কালিতে সুখ নেই কো মনের কথা লিখে। আচ্ছা, সবুজ কিংবা লাল কিংবা ভায়োলেট কালিতে লিখলে কেমন হয়। কি জানি, উনি নিশ্চয় ছেলেমানুষ ভাববেন।

আসলে আমি কি একটা সম্ভাবনার কথা কিছু ভাবছিলাম?

কিন্তু কি সে সম্ভাবনা? কিসের এত ভয়? আমি তো তাঁর কাছে কিছুরই প্রার্থী নই। তবে?

প্রথম দিকে আমার তো শুধুই একটা কৌতূহল ছিলো, আর কিছুই নয়। ক্রমে ক্রমে সেটা কিভাবে জানি না, কৃতজ্ঞতা হয়ে গিয়েছিলো। কিংবা তার চেয়েও বেশী, তাঁকে আমি মনে মনে একান্ত আপন করে তুলেছিলাম। যখনই রুমা কিংবা জয়ন্তীদের সঙ্গে গল্প করতাম, কোনো কিছু নিয়ে আলোচনা করতাম, ওঁর কথা কোনো-না-কোনোভাবে এসে যেতো।

সেদিন মাসীমার বাড়ি গিয়েছি, দুপুরে ওখানেই খাওয়া-দাওয়া করে বিকেলে ফিরবো,

মাসীমা নীচের তলায় কি কাজে যেন ব্যস্ত. টেবিলের ওপর রাখা টেলিফোনের দিকে চোখ যেতেই আমার ভীষণ লোভ হলো। আমি দু-দুবার রিসিভারের ওপর হাত রাখলাম, দু-দুবারই হাত সরিয়ে নিলাম। আসলে আমি বোধ হয় একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম। অথচ রুমা জয়ন্তী ওরা একটুও নার্ভাস হয় না। ওরা একদিন পর পর কয়েকজন আধ-অচেনা লোককে দিব্যি ফোন করলো, মজার মজার কথা বললো পরিচয় না জানিয়ে।

রিসিভারে অকারণেই হাত রেখেছিলাম, ফোন নম্বরটা তখন আর মনে নেই। তাই ফোন গাইডটা খুলে বসলাম, ওঁর নাম খুঁজে বের করলাম। ডায়াল করে বসলাম হঠাৎ। আর যখন রিং হচ্ছে তখন আমার বুকের ভেতরটা থরথর করে কাঁপছে, উত্তেজনায় ভয়ে।

—হ্যালো। রিসিভার তুলে মেয়েলী গলায় কে একজন 'হ্যালো' বললো।

আমি ভেবেছিলাম রিসিভার উনিই তুলবেন। কেন ভেবেছিলাম তাও জানি না। তাই হঠাৎ মেয়েলী গলা শুনে কি বলবো ঠিক করতে পারলাম না। কয়েক সেকেন্ড আমি চুপ করে রইলাম। তারপর অনেক সাহস সঞ্চয় করে জিগ্যেস করলাম উনি আছেন কি না।

—তুমি কে বলছো? প্রশ্ন এলো এবার, সঙ্গে সঙ্গে উত্তরও, দাঁড়াও, দিচ্ছি, কে বলছো?

আমি কিছু উত্তর দিয়েছিলাম কি না মনে পড়ছে না। কিন্তু ততক্ষণে উনি এসে ফোন ধরেছেন।

আর কি সহজভাবে উনি কথা বললেন, আমার সব ভয় কেটে গেল।

আমি অনেকক্ষণ ধরে ওঁর সঙ্গে কথা বললাম। তারপর বললাম, একদিন দেখা করতে যাবো, বিরক্ত হবেন না তো?

—না, না, বিরক্ত হবো কেন, এসো একদিন। উনি বললেন।

রিসিভার নামিয়ে রাখার সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত মন এক-আকাশ নানা রঙের বেলুন হয়ে উড়তে লাগলো।

সেদিন আমার খুব সাজতে ইচ্ছে হচ্ছিলো। আবার ক্ষণে ক্ষণেই কেমন নার্ভাস হয়ে পড়ছিলাম। একবার ভাবলাম, সাজগোজ করে নিজেকে সুন্দর করে নিয়ে গিয়ে দাঁড়াবো। একবার ভাবলাম, উনি তো মানুষের ভিতর অবধি দেখতে পান, বাইরের চেহারার কোনো দামই তো নেই ওঁর কাছে।

আমি ভেবে নিয়েছিলাম, উনি যা কিছু জানতে চাইবেন, কিছুই লুকোবো না। উনিই তো আমার সবচেয়ে আপন, ওঁর কাছে স-ব বলা যায়। রুমা-জয়ন্তীদের কাছে যা বলা যায় না, দীপঙ্করকেও যা বলতে পারিনি, সব—সব।

দীপঙ্কর সেই ছোট্ট বয়সে, আমার সতেরো বছর বয়সে যে শূন্যতা দিয়ে গিয়েছিলো, ওঁর কবিতার সঙ্গী হতে না পারলে আর কি নিয়েই বা আমি বাঁচতাম!

ওঁর বাড়িটা যত কাছে এগিয়ে আসছিলো ততই আমার পায়ে পা জড়িয়ে যাচ্ছিলো। আমার কেবলই মনে হচ্ছিলো, ফিরে যাই। ফিরে যাই। অথচ অদ্ভুত একটা আকর্ষণ আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলো। তিনি যা কিছু জানতে চাইবেন, আমার যা কিছু গোপন, জীবনের ঢাকনা খুলে দিয়ে সব প্রকাশ না করে দিয়ে যেন শান্তি নেই।

ওঁর জন্যে যখন অপেক্ষা করছি তখনো কি উত্তেজনা।

একটু পরেই যিনি এলেন তাঁকে বললাম, ওঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

উনি বললেন, আমিই। বোসো, বোসো।

আমি ওঁকে প্রণাম করে চেয়ারটায় কোনোরকমে জড়সড় হয়ে বসলাম।

উনি নাম জিগ্যেস করায় উত্তর দিলাম, শ্যামলী, শ্যামলী দত্ত।

কোথায় পড়ো, কোথায় থাকো, খুব বই পড়ো বুঝি, মেয়েরা তো কবিতা পড়ে না।

আমি হাসবার চেষ্টা করে বললাম, আপনাকে টেলিফোন করেছিলাম একদিন।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওঃ, তুমিই? বলে হাসলেন। জিগ্যেস করলেন, তুমি নিজেও বুঝি কবিতা-টবিতা লেখো?

আমি বলে উঠলাম, না, না। আমি একজন পাঠিকা শুধু।

ওঁর আড়ষ্ট ভাব এবার যেন একটু স্বস্তি পেলো।

আমি বললাম, আপনার কবিতা আমার ভীষণ ভালো লাগে। বললাম, আপনাকে এর আগে একটা চিঠি লিখেছিলাম।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমিই তো, মনে আছে। উনি হাসলেন।

আমি পর পর ওঁকে অনেক প্রশ্ন করলাম, কখন লেখেন, কিভাবে লেখেন।

তারপর হঠাৎ বললাম, আপনার একটা অটোগ্রাফ আছে আমার কাছে।

ছিলো না, তখন সেই অটোগ্রাফের খাতাটা হারিয়ে গেছে, তবু বললাম।

অটোগ্রাফের লাইন দুটো তো আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিলো। আমি আবৃত্তি করে শোনালাম। বললাম, আপনার লেখা।

উনি মৃদু হেসে ভাববার চেষ্টা করলেন। বললেন, আমার? হবে হয়তো।

ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে, নাকি মনে পড়িয়ে দেওয়ার জন্যে জানি না, বললাম, আমার দিদিকে দিয়েছিলেন অটোগ্রাফ।

এবারও উনি হাসলেন শুধু, কোনো প্রশ্ন করলেন না। দিদির নামটা কিংবা কোথায় দিয়েছিলেন অটোগ্রাফটা সে কথাও জিগ্যেস করলেন না। আর আমার মনে হলো এত দিন ধরে বানিয়ে রাখা আমার সব প্রশ্ন শেষ হয়ে গেছে. সব কথা ফুরিয়ে গেছে।

একটুখানি চুপচাপ কাটলো, আমার কেমন অস্বস্তি লাগছিলো, তাই বললাম, আপনাকে বোধ হয় বিরক্ত করলাম।

—না, না, বিরক্ত কেন হবো। ভদ্রতার মতো শোনালো কথাটা।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। আমি হঠাৎ আবার বললাম, আচ্ছা, কখন লেখেন আপনি?

উনি হাসলেন, জবাব দিলেন না। পরিবর্তে বললেন, বোসো, বোসো, একটু চা বলি তোমার জন্যে।

একটুক্ষণ পরেই চায়ের কাপ হাতে যিনি ঢুকলেন তিনি যে ওঁর স্ত্রী বুঝতে অসুবিধে হলো না।

তিনি মৃদু হাসলেন, দু-একটি কথা বললেন। তারপর উঠে পড়ে বললেন, তোমরা গল্প করো, আমার এখন অনেক কাজ।

কিন্তু কি কথা বলবো? সব কথা যে তখন আমার ফুরিয়ে গেছে। সব প্রশ্ন যে তখন অবান্তর মনে হচ্ছে।

—তোমার নাম কি বললে যেন, শ্যামলী, না?

আমি ছেলেমানুষির গলায় বললাম, হ্যাঁ, কিন্তু সবাই মলি বলে ডাকে।

উনি শুধু মাথাটা দুবার দোলালেন। কোনো কথা বললেন না।

আমি হঠাৎ উঠে পড়লাম অস্বস্তি কাটাবার জন্যে। বললাম, এবার যাই।

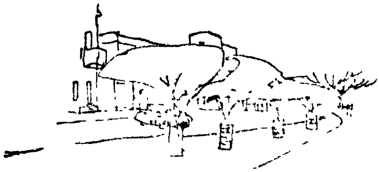
উনিও উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আবার এসো।

আমি জানতাম আর কোনো দিনই আমি আসবো না। ওঁর কাছে আর কোনো দিনই আমি ফিরে আসতে পারবো না।

একটা অসীম শূন্যতার মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে আমার চোখ ঠেলে জল আসবার উপক্রম হলো। মনে হলো আমার কি যেন হারিয়ে গেছে, এই মাত্র আমি হারিয়ে ফেলেছি। ট্রামের ঘণ্টিটা যেন দমকলের ঘণ্টি হয়ে বাজছে আমার চারপাশে। যাঁকে এত দিন আমার পাশে পাশে অনুভব করেছি, আপন মনে হয়েছে, আজ কাছে গিয়ে তাঁকে দূরের মানুষ করে দিলাম। তাঁর সম্পর্কে আমার আর কোনো কৌতূহল নেই।

কারণ, আমার সম্পর্কে তাঁর কোনো কৌতূহলই নেই।

[১৩৭৮



গর্ব

রেডিওটা হঠাৎ বন্ধ করে দিলো অরুণা। আমি চমকে ফিরে তাকিয়ে বললাম, আরে, আরে, কি করলে, ভালো গান হচ্ছিলো।

অরুণা বারান্দার দিকে আঙুল দেখালো, ইশারায় বললে, শোনো।

ততক্ষণে আমিও শুনতে পেয়েছি। ঐ গানটাই আরো ভরাট, আরো মিষ্টি হয়ে বাতাসে ভেসে আসছে। এতক্ষণ যা ছিলো শুধু ভালো লাগা, সেটা মুহূর্তের মধ্যে মুগ্ধতা হয়ে গেল। সমস্ত শরীর যেন জুড়িয়ে আসছিলো।

আর তখনই অরুণা বললো, রত্নাদের ওটা রেডিওগ্রাম। খুব দামী রেডিওগ্রাম কিন্তু ওদের।

যেন বলার কোনো প্রয়োজন ছিলো। ঐ ভরাট মিষ্টি আওয়াজটাই তো বলে দেয় ওটা কিনতে কত দাম লেগেছে। এই তো দিন কয়েক আগে একদিন আপিস থেকে ফেরার সময় বাড়ির কাছাকাছি আসতেই শুনতে পেয়েছিলাম। ঘরে এসে আমাদের রেডিওটা বন্ধ করে দিয়েছিলাম আমি নিজেই। জোরে চালিয়ে দেওয়া ওদের রেডিওগ্রামের গলায় গানটা শুনতে ভালো লেগেছিলো। মনে একটা ক্ষীণ ইচ্ছেও জেগেছিলো। কখনো যদি হাতে কিছু বাড়তি টাকা এসে যায়, ঐরকম একটা দামী রেডিওগ্রাম কিনবো।

কিন্তু অরুণার কথাটা শুনে সমস্ত মন বিস্বাদ হয়ে গেল। সমস্ত মুগ্ধতা এক নিমেষে অন্তর্হিত হলো। আজকাল অরুণার এই ধরনের কথাগুলো আমার একটুও ভালো লাগে না। 'খুব দামী রেডওগ্রাম কিন্তু ওদের।' ঐ কথাটার ফাঁকে ফাঁকে অরুণা যেন বলতে চাইলো, তুমি কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। ঐরকম একটা রেডিওগ্রামও কিনতে পারো না।

আমি কোনো কথা বললাম না, মনের মধ্যে শুধু একটা চাপা অভিমান রাগ হয়ে যাবার সুযোগ খুঁজলো।

আমার কেমন মনে হলো অরুণা যেন ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে। কিংবা আমাকে একটা অপদার্থ ভাবছে। কারণ, এ ধরনের কথা এর আগেও ও বলেছে। এই তো মাস কয়েক আগে একটা বিয়েবাড়ি থেকে ফেরার পথে বলেছিলো, রানীমাসীমার ছেলের বউকে দেখলে? ডিজাইনটা আমার মতোই, কিন্তু ওরটায় মুক্তো অনেক বেশী।

আমি সেদিন হেসে ফেলেছিলাম, কারণ 'নেকলেস' কথাটাই ও উহ্য রেখেছিলো। কিন্তু বিরক্তি একটা নিশ্চয়ই ভিতরে ভিতরে ছিলো, সেটাই আজ রেডিওগ্রামে ধাক্কা খেয়ে অভিমান হয়ে গেল।

অথচ প্রথম দিকে অরুণা ঠিক এমনটা ছিলো না। নাকি আমি নিজেই তখন প্রেমে মশগুল হয়ে এসব কথায় কান দিতাম না?

বিয়ের আগের একটা দিনের কথা আমার তো বেশ স্পষ্ট মনে পড়ছে।

সেদিন আমি নিজেই নিজেকে চিৎকার করে বলতে চাইছিলাম, হিরণ্ময়, তুই আজ রাজা।

প্ল্যানেটোরিয়ামের কাছে চলন্ত ডবল-ডেকার বাস থেকে নেমেছিলাম আমি, ট্রাউজার্স পরা আমার দুখানা লম্বা লম্বা পা এমনভাবে নালা ডিঙিয়ে ঝোপ-ঝোপ ঘাস মাড়িয়ে হাঁটু-সমান-উঁচু লোহার-সিক-বাঁকানো ফেন্সিং লাফ দিয়ে পার হয়েছিলো, এমন হাসি-হাসি মুখে অরুণার সামনে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম, যেন একটা হার্ডল্‌স্ রেসে ফার্স্ট হয়েছি।

—আরে, আরে, কি ব্যাপার, তুমি যে একেবারে খুশিতে ডগমগ। কিছু খবর আছে মনে হচ্ছে? আমার মুখে কি ছিলো কে জানে, অরুণার মুখচোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলো।

আসলে অরুণা আমাকে ঐরকমটাই দেখতে চাইতো। আমার গোমড়া মুখ ও একদম

সহ্য করতে পারতো না।

অরুণার প্রশ্নের জবাবে আমার সেদিন চিৎকার করে বলে উঠতে ইচ্ছে হয়েছিলো, হিরণ্ময়, তুই আজ রাজা। তার বদলে সিগারেট-ধরা বাঁ হাতেই একটা তুড়ি দিয়ে বলেছিলাম, বেজায় সুখবর, চাকরি পেয়েছি।

অনেকক্ষণ এ-ও-তা কথা বলার পর অরুণা বলেছিলো, মাইনে কত বললে না তো?

—দু শো তিরিশ টাকা। (কিন্তু তার মধ্যে যে আশি টাকাই ডি এ সে কথা আর বললাম না।) আমার মন তখন ফুরুর ফুরুর করে উড়ছে।

এসব হলো সেই বিয়ের আগেকার কথা। যখন আমরা শুধু স্বপ্ন দেখছি। যখন চোখ চোখের তৃষ্ণা মেটাচ্ছে, যখন কথা রঙিন রঙিন ঘুড়ি ওড়াচ্ছে।

'খুব দামী রেডিওগ্রাম কিন্তু ওদের।' কথাটা মনে পড়তেই মন বিস্বাদে ভরে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো আমার মাইনের অঙ্কটা জেনে সেদিন অরুণা অনেকক্ষণ এ-ও-তা কথা বলার পর হঠাৎ বিমর্ষভাবে বলেছিলো, আচ্ছা, ও আপিসে মাইনে এত কম কেন।

আজ বুঝতে পারছি অরুণা আমাকে একটুও বুঝতে পারেনি। মাইনে-টাইনের কথা আমি তখন ভেবেছি নাকি। বাবার কথা শুনে সান্যালকাকার সঙ্গে একবারটি দেখা করলে তাঁর আপিসেই একটা ভালো চাকরি হয়ে যেতো। বাবা নিজেও তো কত লোককে চাকরিতে ঢুকিয়েছিলো।

আমি তাই হেসে উঠে বলেছিলাম, এ তো ব্যাংকিং-এর চাকরি নয়। দেড় শো ক্যান্ডিডেট পরীক্ষা দিয়েছিলো, মাত্র ন'জনকে নিয়েছে, আমি একজন।

অর্থাৎ আমি বলতে চেয়েছিলাম, অরুণা, আমাকে তুমি কারও সঙ্গে তুলনা কোরো না। কারণ, আমি নিজেই নিজের ভবিষ্যৎ রচনা করতে চাই, আমি নিজের কাছে খাঁটি থাকতে চাই। অরুণা, নিজের কাছে খাঁটি থাকার যে অহংকার, তার চেয়ে বেশী আনন্দ আর কিছুতেই নেই।

না, এসব কিছুই আমি ওকে বলিনি, কারণ আমার সব সময়েই মনে হতো, আশপাশের লোক আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, এই লোকটা খাঁটি, একে টাকা দিয়ে কেনা যায় না, লোভ দেখিয়ে নোয়ানো যায় না। অথচ অরুণা আমার কোনো দাম দেবে না আমি কোনো দিন ভাবিইনি।

বিয়ের পর আমরা যখন একতলায় দেড়খানা ঘরে সংসার পাতলাম তখন কিন্তু অরুণার মুখে-চোখে আমি একটা উজ্জ্বল অহংকার দেখতে পেতাম। আমার মনে হয়েছিলো ও এতেই খুশী। আমি যে এত অভাব-অনটনেও বাবার কাছে হাত পাতিনি, বাবা এ বিয়েতে মত দেয়নি বলে, তার জন্যে ও আমাকে বরং একটু বেশী বেশী দাম দিতো। অন্তত আমার তাই মনে হয়েছে। আশ্চর্য ব্যাপার, এখন তো আমার ধাপে ধাপে অনেক উন্নতি হয়েছে, সংসারে সচ্ছলতা এসেছে, ভালো ফ্ল্যাট, এখন ওর এত অভিযোগ কেন।

এই তো সেদিন বাবার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, বাবা নিজেই বললো, তুই আমাদের আপিসে না ঢুকে ভালোই করেছিলি। আমাদের আপিসে কোনো ফিউচার প্রসপেক্ট ছিলো না। তা ছাড়া, ধরাধরি করে চাকরি, চিরকাল মাথা নুইয়ে থাকতে হয়। বাইরে না হোক, মনের মধ্যে।

অরুণাও তো সঙ্গে গিয়েছিলো, শুনে ও খুব খুশী হয়েছিলো। ফেরার পথে বলেছিলো, খুব যে বাবার সার্টিফিকেট পেয়ে গেলে!

আমি হেসেছিলাম।

আসলে অরুণার কোনো সাধ আমার অপূর্ণ রাখার ইচ্ছে হতো না। ও সেই কথাটা কেন যে মাঝে মাঝে ভুলে যেতো আমি বুঝতে পারতাম না। সব ভালো জিনিসগুলোর ওপর ওর খুব একটা লোভ আছে তাও তো মনে হতো না। আমরা যখন নিজেদের মধ্যে আমাদের তিনটি ছেলেমেয়ে সম্পর্কে আলোচনা করতাম, তখন তাদের খুব সাধারণভাবে মানুষ করার কথায় একমত হতাম।

অরুণা নিজেই বলতো, তা না হলে ওরা ভবিষ্যতে হয়তো কষ্ট পাবে।

অথচ পুজোর বাজার করতে গিয়ে ও একটা বোহিসেবী কাজ করে বসলো। মিনু আর মুন্নার জন্যে সত্তর-আশি টাকা করে এক-একটা ফ্রক অর্ডার দিয়ে এলো।

আমি এমনিতেই হিমসিম খাচ্ছিলাম। পুজোর সময় এমনিতেই টানাটানি, সরকারী অাপিস, আমাদের তো বোনাসের টাকা নয়।

বললাম, এ কি কাণ্ড করলে।

অরুণা মুখ কাঁচুমাচু করে দোষ স্বীকার করলে আমার এত রাগ হতো না। কিন্তু অরুণার একটা অদ্ভুত স্বভাব, ও যখনই নিজের দোষ বুঝতে পারে তখনই আমার ওপর রেগে যায়। তাই ঝাঁঝালো গলায় বলে বসলো, এ পাড়ায় থাকার দরকারটা কি, বস্তিতে গিয়ে থাকলেই হয়। রুনু আর নীপা ঐরকম সব দামী দামী ফ্রক পরে ঘুরে বেড়াবে, আর মিনু-মুন্না কি ভেসে এসেছে নাকি?

আমার নিজেকে ভীষণ অসহায় লাগলো। এইসব সময়ে বুকের মধ্যে থেকে একটা চাপা কান্না ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। আমি কি তা হলে এত দিন ধরে ভুল করে আসছি? আমার কি তা হলে আরো আরো টাকা রোজগারের দিকে মন দেওয়া উচিত ছিলো?

আমি দুর্বল গলায় বললাম, কি করে পারবো আমি? এখনো তো সবই কেনাকাটা বাকী।

অরুণা কোনো যুক্তির ধার ধারলো না। ও বলে বসলো, ওরা কি করে পারে? রুনু আর নীপার বাবা?

ওরা কি করে পারে! অরুণা মুখ ফুটে বলুক আর না-ই বলুক, এই একটা কথাই আমি বারবার শুনে আসছি। আর ততই নিজের অক্ষমতায় আমার রাগ বেড়ে যাচ্ছে।

একদিন রেগে গিয়ে বলেছিলাম, আমার প্রত্যেকটি পাই-পয়সা নিজের পরিশ্রমের দাম।

অরুণা গম্ভীরভাবে বলেছিলো, ওদের নয় ব্যাবসা, ব্ল্যাকের টাকা। রত্নাদের তো চাকরি।

অরুণাকে আর কি বলবো, যখনই অসহায় লাগতো নিজের মনকে বোঝাতাম, ঘুষ না পেলে লোকটা এত খরচখরচা করে কি করে, কারও বেলা ভাবতাম, কিছু একটা রহস্য নিশ্চয়ই আছে।

একদিন সিনেমা দেখে ফিরছি, সঙ্গে অরুণা রয়েছে, হঠাৎ কে পিছন থেকে ডাকলো, হিরণ্ময়দা, এদিকে, এদিকে।

ফিরে দেখলাম, আমাদের জীবন, পুরোনো পাড়ার জীবন। বললো, চলে আসুন, নামিয়ে দেবো আপনাদের।

নামিয়ে দিয়ে গেল। আর ওরা চলে যেতেই অরুণা বললো, আমি ভাবতেই পারিনি সেই জীবন, সে আবার গাড়ি করেছে!

আমি নিজেও কম অবাক হইনি। এই তো সেদিনের একটা বাচ্চা ছেলে, সেও কিনা এর মধ্যে গাড়ি কিনলো।

ওর গাড়িতে আমি উঠেছিলাম ঠিকই, কিন্তু প্রচণ্ড অস্বস্তিতে সহজভাবে বসতেও পারিনি। জিগ্যেস করিনি ও কি করে।

তাই অরুণার কথার আমি কোনো জবাব দিইনি। মনে মনে জীবনের ওপরেই রেগে গিয়েছিলাম।

ঐ রাগটাই বোধ হয় মনের মধ্যে পোষা ছিলো। তাই অরুণা হঠাৎ একদিন গল্প করতে করতে যখন বললো, 'জানো, ঐ গুপ্তবাবুদের মেজ ভাই, ও খুব বড় চাকরি করে, আপিস থেকে গাড়ি পেয়েছে', আমার সমস্ত শরীর চিড়বিড় করে উঠলো। আমি মনে মনে বললাম, অরুণা, আমাকে একজন সমকক্ষের সঙ্গে লড়তে দাও। আমাকে শুধু একজনের সঙ্গে প্রতি-যোগিতা করতে দাও। রত্নাদের রেডিওগ্রাম, রুনু-নীপাদের বিলাসিতা, জীবনের গাড়ি, রানী-মাসীমার ছেলের বউয়ের নেকলেস...তুমি সমস্ত কিছু পাল্লার এক দিকে চাপিয়ে অন্য দিকে আমাকে ওজন করতে চেয়ো না। আমি বড় জোর ওদের যে-কোনো একজনের মতো হবার চেষ্টা করতে পারি।

আমি জানি ওদের একজনের মতোও আমি হতে পারবো না। জানি বলেই অরুণার কথায় নিজেকে এত অসহায় বোধ করি। একটা অক্ষম রাগে জ্বলে উঠতে ইচ্ছে করে। রাগটা আসলে নিজেরই ওপর। এক-একসময় তাই সন্দেহ হয়, আমি হয়তো একটা মিথ্যে অহং-কারের ওপর ভিত গেঁথেছি। চারপাশের সকলকে যে-কোনো দামে সব কিছু পেতে দেখছে ও, তাই অরুণা হয়তো ভাবছে, আমি একটা অপদার্থ। একটা মিথ্যে অহংকারের জন্যে আমি

কিছুই পেতে শিখিনি।

আমার এক-একদিন তাই মনে হতো আমি হঠাৎ দুম্ করে এমন কিছু একটা করে ফেলবো, অরুণাও চমকে যাবে। আমি জানতাম, ওকে চমকে দেবার মতো সুযোগ আমার হাতে আছে। তখন ওর অনেক সাধ আমি মিটিয়ে দিতে পারবো। কিন্তু তখন আর আমি নিজের কাছে খাঁটি থাকতে পারবো না। আমি জানি, অরুণার কাছেও আমার তখন আর কোনো দাম থাকবে না।

মনের অবস্থা যখন একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের দোরগোড়ায়, তখনই ব্যাপারটা ঘটে গেল। এমন তুচ্ছ কারণে, এমন আকস্মিকভাবে ঘটে যাবে, আমি ভাবতেও পারিনি।

অাপিসে টি. এ. বিল-এর কিছু টাকা অনেক দিন থেকে আটকে ছিলো। সেদিন হঠাৎ পেয়ে গেলাম। আর সংগে সংগে অরুণার কথা মনে পড়লো। আমার আট বছরের ছেলে বিজুর কথা, মিনু-মুন্নার কথা মনে পড়ে গেল। আমার হঠাৎ মনে হলো, আহা, অরুণার সত্যি কোনো দোষ নেই। আমি ঘুরে ঘুরে নিউ মার্কেট থেকে ওর জন্যে ভালো একটা শাড়ি কিনলাম। বিজু মিনু মুন্না ওরা খুব চীনে খাবার খেতে ভালোবাসে। একটা চীনে রেস্টু-রেণ্ট থেকে দু-তিন রকমের খাবার কিনলাম।

মনটা খুব খুশী-খুশী ছিলো। একটা ট্যাক্সি করে একেবারে বাড়ির দরজা পর্যন্ত চলে এলাম। এর আগে একদিন শরীর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলো হঠাৎ, সেদিনও ট্যাক্সি করে ফিরে-ছিলাম, কিন্তু ট্রাম-রাস্তা অবধি এসেই নেমে পড়েছিলাম। কুড়িটা কি তিরিশটা পয়সা কম লেগেছিলো।

ট্যাক্সি থেকে নেমে ওদের সকলকে কেমন অবাক করে দেবো সে কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ি ঢুকলাম।

আর সংগে সংগে অরুণা বললো, এই জানো, আজ খোকনের মা এসেছিলো।

—কে খোকনের মা? আমি বুঝতে না পেরে জিগ্যেস করলাম।

বিজু মিনু মুন্না কলরব করে এলো। শাড়িটা আর খাবারের প্যাকেটগুলো কেড়ে নিয়ে খুলে দেখতে গেল। অরুণা কিন্তু ওগুলো সম্পর্কে কোনো আগ্রহই দেখালো না। শুধু বললো, বাঃ, এর মধ্যেই ভুলে গেলে? সেই যে, খোকনের মা।

মনে পড়তেই বললাম, ও।

আমার শার্টটা খুলে দিতেই অরুণা হাত বাড়িয়ে নিয়ে আলনায় রাখতে রাখতে বললো, কত সব গল্প করলো। কতকাল পরে এলো, সেই রানীমাসীর বাড়িতে দেখা হয়েছিলো।

—ও। এ ছাড়া আর কিই বা বলবো।

অরুণা প্রায় অনুযোগের স্বরেই বললো, আমরা বাড়ি-টাড়ি করছি কি না জিগ্যেস কর-ছিলো। বললে, একটা বাড়ি করে ফেল অরুণা, ভাড়াটে বাড়িতে আর কদ্দিন থাকবি।

সংগে সংগে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে গেল। কারণ, অরুণার কথায় খোকনদের বাড়িটা চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

আমি রুক্ষ গলায় চিৎকার করে উঠলাম।—চুপ করো, দোহাই তোমার, চুপ করো। তুমি থামাবে কি না এইসব কথা। আমি জানি, তুমি আমাকে দিনে দিনে ঘৃণা করতে শুরু করেছো। তোমার কথা শুনে শুনে আমি আজকাল নিজেকেই নিজে ঘৃণা করছি।

আমার প্রচণ্ড রাগটা শেষের দিকে নিজের কানেই কান্নার মতো শোনালো। তবু আমার রাগ আমি চেপে রাখতে পারলাম না। চিৎকার করে বলে উঠলাম, ওদের সংগে আমার তুলনা কোরো না। বাপের ব্যাবসা, বাপ বাড়ি করে দিয়ে গেছে। আমি নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছি।

অরুণা অবাক হয়ে গিয়েছিলো। ও কখনো আমাকে এতখানি রাগতে দেখেনি। আমার রুক্ষ গলার চিৎকার শুনে ও বোধ হয় বিরক্ত হলো। আমাকে আরো রাগিয়ে দেবার জন্যেই হয়তো বলে বসলো, নিজের পায়ে দাঁড়িয়েও অনেকে বাড়ি করে। সুশান্তদা...

আমার আর কাণ্ডজ্ঞান রইলো না। সেই পুরোনো কথার ভিমরুলটা আমার কানের চারপাশে ঘুরে বেড়ালো। তুমি অপদার্থ, তুমি অক্ষম।

আমি ভগ্নস্তূপের মতো চেয়ারের ওপর বসে পড়লাম। কিন্তু রাগটা তখনো যেন ফুলে ফুলে উঠছে। আমি চিৎকার করে বললাম, সমস্ত জীবন ধরে তুমি আমাকে শুধু অন্যের

সংগে তুলনা করে এসেছো। পদে পদে বলেছো, আমার কি নেই, আমার কি নেই, আমি কি দিতে পারিনি।

একটু থেমেই আমি আবার ক্রুদ্ধ স্বরে বলে উঠলাম, কিন্তু তোমারই বা কি আছে? নিজেকে ওদের সংগে তুলনা করে দেখেছো কোনো দিন?

কথাটা বলে ফেলেই আমি অনুশোচনায় মুষড়ে পড়লাম। এ কথাটা আমি কোনো দিন ওকে বলতে চাইনি। ওর এই দুর্বল জায়গাটায় আমি কোনো দিন আঘাত দিতে চাইনি। কারণ, আমার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব যে যা-ই বলুক, আমার ভালোবাসার চোখ কোনো দিন ওর কালো রূপকে অসুন্দর দেখেনি।

আমি তাই কথাটা বলে ফেলে ওর দিকে তাকাতে পারছিলাম না।

কিন্তু হঠাৎ ওর হাসির শব্দ শুনে আমাকে তাকাতেই হলো। কি আশ্চর্য, আমি ভেবেছিলাম, ও রেগে যাবে। আমি ভেবেছিলাম, সব ভেঙে যাবে।

তার বদলে ও হাসি-হাসি চোখে তাকালো, এগিয়ে এলো আমার দিকে। আমি চোখ নামালাম।

অরুণা কাছে এসে আমার চুলে আঙুল ডুবিয়ে শান্ত গলায় বললো, আমার? আমার কি আছে জিগ্যেস করছো? আমার যা আছে তা আর কারও নেই।

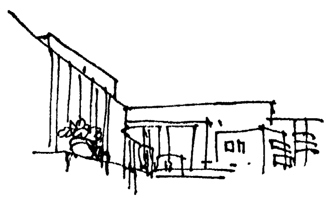
ওর আঙুলের স্পর্শে, ওর গলার স্বরে কি ছিলো কে জানে, আমার নিজেকে আবার অসহায় লাগলো। আমি ওর হাতটা মুঠোর মধ্যে ধরে হাসবার চেষ্টা করে বললাম, কি আছে শুনিই না। ঠাট্টার গলায় বললাম, রূপ, গুণ, না ঐশ্বর্য?

অরুণা মিষ্টি করে হাসলো। বললো, আমার যা আছে, তা কারও নেই।

আমি চোখ তুলে তাকালাম।—কি আছে বলেই ফেলো না।

অরুণা দু হাত ছড়িয়ে হাসি-হাসি মুখে বললো, এই এত্তো বড় একটা গর্ব।...তোমার জন্যে।

[১৩৭৯



বড়বাজার

কেউ বোধ হয় আমার পিঠে হাত দিয়ে আমার নাম ধরে ডেকেছিলো।

আমি ভয় পেয়ে কিংবা অবাক হয়ে ধড়মড় করে বিছানার ওপর উঠে বসলাম। ছায়ার মতো লোকটি তখন টেবিলের ওপর পটপট শব্দ করে তিনটি টাকা টিপে টিপে রেখে দিলো, দিয়ে জানালার গরাদের ফাঁক দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বাইরে তখন অঝোরে বৃষ্টি নেমেছে, আলকাতরার মতো বৃষ্টি, কারণ বাইরে একটুও আলো ছিলো না। এবং ঘরের মধ্যেও অন্ধকার ঘন হয়ে আছে। তাই টেবিলের ওপর রাখা টাকা তিনটি দেখা গেল না। শুধু মনে হলো অন্ধকারের মধ্যে আরো অন্ধকার তিনটি কালো কালো বৃত্তাকার চাকতি পড়ে রয়েছে টেবিলের ওপর। সেগুলির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে হলো টাকা তিনটি যেন পিছলে যাওয়ার গতিতে অনেক দূর সরে গিয়ে আলো নিবে যাওয়া রাস্তার বিকল ট্রাফিক সিগন্যালের তিনটি চোখ উপড়ে নেওয়া অন্ধকার গহ্বর

হয়ে গেল।

টাকা তিনটি তখনো সত্যি আছে কি না দেখার জন্যে আমি কৌতূহলী হয়ে টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। বাইরে থেকে তখন বৃষ্টির ঝমঝম আওয়াজ আসছিলো।

আমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা দুর্বোধ্য মনে হলো। আমি তাই রেগে গিয়ে টাকা তিনটি মুঠোর মধ্যে নিয়ে বারান্দায় ছুটে গেলাম। এবং টাকা তিনটি সজোরে দূরের বৃষ্টি-ঝরা অন্ধকার রাস্তায় ছুঁড়ে দিয়ে বললাম, আমি এসব কিছুই চাই না, আমি অন্য কি যেন চাই। কি চাই আমার তা মনে পড়লো না।

টাকা তিনটি রাস্তায় ছিটকে গিয়ে গড়াতে গড়াতে তিনটি অন্ধকারের শূন্য হয়ে গেল। আর তখনই বৃষ্টি থেমে গেল।

আমি সেই তিনটি অন্ধকারের শূন্যের দিকে তাকিয়ে রইলাম, আর আমার চোখের সামনেই সেগুলি একটু একটু করে বড় হতে লাগলো। এবং তখন আমি অবাক হয়ে দেখলাম, সেই কালো কালো বৃত্ত তিনটি বড় হতে হতে হঠাৎ একসময় নড়ে উঠে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসলো দূরে দূরে এবং পর পর। তখন মনে হলো যেন অন্ধকার রাস্তার মাঝখানে এক লাইনে পরস্পর থেকে বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে তিনটি কালো কালো রাস্তার কুকুর কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে রয়েছে। সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে এমন অলৌকিক আভাস ছিলো যে, আমার গা ছমছম করে উঠলো। কিন্তু কৌতূহলে তখনো আমি সেদিকেই তাকিয়ে রইলাম। তাকিয়ে থাকতে থাকতে শেষ অবধি বুঝতে পারলাম, না, না, তা নয়, কালো কালো টাকা তিনটি অন্ধকার রাস্তাটার মাঝখানে স্থির হয়ে গিয়ে পর পর তিনটি ম্যানহোল হয়ে গেছে। যেন একটু আগের আলকাতরার বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পর কেউ ম্যানহোলের ঢাকনিগুলো খুলে দিয়ে গেছে। এখন বৃষ্টি নেই, রাস্তায় জল নেই, শুধুই অন্ধকার এবং দূরে দূরে ঢাকনি-খোলা তিনটি ম্যানহোলের গর্ত।

আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম, আমি এসব কিছুই চাই না। আমি অন্য কিছু চাই। আর তখনই আমার কানের কাছে কে ফিসফিস করে বললো, তুমি তা হলে এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ো, খুঁজে নিয়ে এসো তুমি যা চাও। দেখছো না, সকলেই বেরিয়ে পড়েছে।

আমার মনে হলো, ঠিক, ঠিক। আমি ঠিকই দেখেছিলাম। বিকল হয়ে যাওয়া ট্রাফিক সিগন্যালের তিনটি চোখ উপড়ে নেওয়া গহ্বর বলছিলো, লাল কিংবা কমলা রঙ কিংবা সবুজের সংকেত আর জ্বলবে না। দেখছো না, যে যেদিকে খুশি ছুটছে। সব নিয়ম এখন এলোমেলো হয়ে গেছে। তোমার যেদিকে খুশি তুমি যেতে পারো।

আমি তাই দ্রুত বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। বাইরে তখন গভীর অন্ধকার। আমি অন্ধকারের মধ্যে ছুটতে লাগলাম। প্রথম প্রথম আমার একটু ভয়-ভয় করছিলো, কারণ অন্ধকারে তখন কিছুই দেখা যাচ্ছিলো না, আমি তাই সাবধান হবার চেষ্টা করছিলাম, ছুটতে ছুটতে আমি শেষ অবধি না ঐ ঢাকনি-খোলা কোনো একটা ম্যানহোলের মধ্যে পড়ে যাই।

আমি তখন প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলেছি। আমার তখন দিগ্বিদিক জ্ঞান ছিলো না। আমার চাই, আমার চাই। কি যেন আমায় পেতে হবে। কি পেতে হবে আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠলো না। কিন্তু কিছু পাওয়ার জন্যেই যেন আমি উৎসুক হয়েছিলাম। আমি দুরন্ত বেগে ছুটে চললাম সেই অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে। আমি রাস্তা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আমি রাস্তা চিনতে পারছিলাম না। আমি দৌড়াচ্ছি, দৌড়াচ্ছি, কিন্তু সেটা রাস্তা কি না আমি জানতাম না। আমি শুধু দেখতে পাচ্ছিলাম আমার পায়ের তলা থেকে একটা অসীম অনন্ত তমসার হ্রদ চলে গেছে অনেক দূর অবধি, চোখের নাগালের বাইরে এবং তারপর সেই হ্রদের অন্ধকার যেন হঠাৎ উপচে পড়ে শূন্যে মিলিয়ে গেছে আকাশ হয়ে। সেই আকাশের বাগানে কয়েকটা জুঁইফুল ফুটেছিলো। কিন্তু সেদিকে তাকানোর আমার সময় ছিলো না, সেদিকে তাকাতে গেলে আমাকে থেমে পড়তে হতো, আর তখন পিছনের লোকগুলো আমাকে মাড়িয়ে চলে যেতো। সেই অন্ধকারের মধ্যে যদিও কাউকে দেখা যাচ্ছিলো না, কারো মুখ চেনার উপায় ছিলো না, তবু আমি বুঝতে পারছিলাম অসংখ্য লোক এদিক-ওদিক ছুটে চলেছে, আমার পিছনে পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম, তারা আমাকে ধাওয়া করেছিলো, কিংবা আমাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে চাইছিলো। আমি দৌড়তে দৌড়তে সামনের দিকে তাকিয়ে

দেখতে চাইছিলাম আমারও আগে আগে কেউ ছুটে চলেছে কি না। কিন্তু অন্ধকারে আমি কিছুই ঠাওর করতে পারছিলাম না।

আমার পাশ দিয়ে ছায়ার মতো একটা মানুষ চলে যাচ্ছিলো অন্য দিকে, আমি তাকে ডেকে বললাম, ও মশাই, শুনছেন, এইটেই কি সেই রাস্তা? এই রাস্তাই তো?

লোকটা থামলো না। অদ্ভুতরকম হেসে উঠে ফিরে তাকিয়ে বললে, রাস্তা তো অসংখ্য। রাস্তা কখনো একটাই হয় নাকি!

কিন্তু তখনই কোত্থেকে আরেকজন বলে উঠলো, না, না, আপনি ঘাবড়াবেন না, সবাই তো ঐ রাস্তা ধরেই যায়। ঐ তো সবাই এই রাস্তা ধরেই আসছে।

আমি আগের লোকটাকে পাগল ভাবলাম, কারণ সে হেঁয়ালি করে কথা বললো। আমি পরের লোকটিকে বিশ্বাস করলাম, কারণ সে মনোমত জবাব দিলো। আমি মনে মনে চাইছিলাম এইটেই যেন সেই রাস্তা হয়। কারণ এখন যদি কেউ বলে বসতো, না, না, এটা ভুল রাস্তা, তা হলে আমাকে আবার এতখানি ফিরে যেতে হতো, এবং তারপর ঠিক রাস্তাটা খুঁজে বের করতে করতে আমার সময় এবং বয়স পার হয়ে যেতো। আমার তাই মনে হলো, ঠিক রাস্তার জন্যে ফিরে যাওয়ার চেয়ে ভুল রাস্তা ধরে এগিয়ে যাওয়াই ভালো।

আমি রুদ্ধশ্বাসে ছুটে চললাম অন্ধকার এবং মানুষের ভিড় ঠেলে ঠেলে এবং যেখানে পুঞ্জ পুঞ্জ কালো কালো ধোঁয়া জমে গিয়ে ঝুলের মতো ঝুলছে সেদিকে মুখ তুলে আমি নিশ্বাস নেবার চেষ্টা করলাম। আমি বুঝতে পারছিলাম আমার শ্বাস ফুরিয়ে আসছে, কিন্তু আমার ভয় হচ্ছিলো আমি পেঁছবার আগেই হয়তো সব ফুরিয়ে যাবে, আমি যে জিনিসটা চাই সেটা আর পাওয়া হয়ে উঠবে না।

তখনই আমি চিন্তা করতে শুরু করলাম, আমি কি চাই। আমি নিজেকেই প্রশ্ন করলাম, তুমি তো একটা দুরন্ত ঘোড়ার মতো ছুটে চলেছো হে, কিন্তু কি তোমার চাই ভেবে দেখেছো কখনো?

সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়লো ভেবে দেখার মতো সময় ছিলো না। আমি শুধু বুঝতে পারছিলাম আমার চাই। আমার মন বলছিলো, তাড়াতাড়ি না পেঁছতে পারলে কিছুই পাওয়া যাবে না।

তুমি তো একটা দুরন্ত ঘোড়ার মতো ছুটে চলেছো হে, আমি নিজেকে বললাম। সঙ্গে সঙ্গে আমি বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতখানা খুলে উলটে দিয়ে নিজের পিঠ নিজেই চাপড়ালাম। বললাম, ঠিক বলেছো। দুরন্ত ঘোড়ার মতোই তো, কারণ আমি তখন অনুভব করতে পারছিলাম কে যেন আমার পিঠের ওপর চেপে বসে আছে, কি একটা ভার যেন আমাকে বয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে, কেউ একজন আমার লাগাম টেনে ধরছে এবং একটা সুপুষ্ট বেণী দিয়ে সপাং সপাং করে আমার গায়ে আদরের চাবুক মারছে।

আমি তাই প্রাণপণে ছুটতে লাগলাম। আমি জানতাম, সেখানে পেঁছতে পারলে আমি ভেবে দেখার সময় পাবো আমার কি চাই। এখন আমার মনে পড়ছে না, কিন্তু সেখানে পেঁছলে তো অনেক কিছু দেখতে পাবো, মানুষ যা কিছু চায়, এবং তখন সেই জিনিসটা দেখতে পেলেই আমার মনে পড়ে যাবে আমার কি চাই।

দৌড়তে দৌড়তে দৌড়তে দৌড়তে আমি যেন একটা বাঁক নিলাম, অমনি আমার চোখ ঝলসে গেল। আমি দেখলাম সমস্ত আলোয় আলো হয়ে আছে, কোথাও কোনো অন্ধকার নেই। আমি দেখলাম হাজার হাজার আলোয় সমস্ত জায়গাটা এমন উজ্জ্বল হয়ে গেছে যে, কিছুই দেখা যাচ্ছে না, কারণ আমার চোখ ঝলসে গেছে। আমি অন্ধকারে এতক্ষণ কিছুই দেখতে পাইনি, কারণ সেখানে একটুও আলো ছিলো না, এখন আমি আলোয় অন্ধ হয়ে গেলাম, কারণ সেখানে একটুও অন্ধকার ছিলো না।

আমি ছুটে যাচ্ছিলাম কিচ্ছু দেখতে না পেয়েও, কেননা এতক্ষণ কিচ্ছু দেখতে পাইনি, তবু তো আমি ছুটতে ছুটতে এসে পেঁছেছি। হ্যাঁ, আমার মনে হলো আমি পেঁছে গেছি, পেঁছে গেছি।

আমার সমস্ত শরীর থেকে তখন ঘাম ঝরছে, আমার চোখ দুটো ঠিকরে বের হয়ে আসতে চাইছে, আমার গলা শুকিয়ে গেছে, আমার শরীর তখন ক্লান্ত অবসন্ন, তবু পেঁছে যাওয়ার

আনন্দে আমার প্রতিটি রোমকূপে একটা উল্লাস জেগে উঠলো। আমি প্রচণ্ড বেগে সেখানে ঢুকতে গেলাম, কারণ ততক্ষণে আমি থরে থরে ভিতরে সাজানো সুদৃশ্য জিনিসগুলো দেখতে পেয়েছি। সেই জিনিসগুলো আমি স্পষ্ট চিনতে পারলাম না, কিন্তু আমার মনে হলো ওর মধ্যেই হয়তো আমার চাওয়ার জিনিসটি আছে।

আমি দ্রুত পায়ে সেখানে ঢুকতে গেলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে ঝনঝন ঝনঝন একটা বিকট শব্দ হলো। চতুর্দিকে কাচের টুকরো ছড়িয়ে পড়লো।

কেউ একজন বললে, লোকটা পাগল, শো-কেসের কাচ ভেঙে ঢুকতে গেছে।

আর সমবেদনায় একটি নারীকণ্ঠ আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলো, রক্ত, রক্ত।

আমি তাকিয়ে দেখলাম আমার সর্বাঙ্গ কেটে গেছে, রক্ত ঝরছে।

আমি শুনতে পেলাম, কেউ যেন বলছে, দরজা তো ওদিকে। এদিক দিয়ে কেউ আসে নাকি?

আমি বোকার মতো তার দিকে তাকালাম। তারপর ক্ষমাপ্রার্থীর ভঙ্গিতে বললাম, কিন্তু দরজায় কিরকম ভিড় দেখেছেন। ওরা যে আমাকে ঢুকতে দিতো না। অথচ আমাকে তো ঢুকতে হবেই, আমার যে কি যেন চাই।

অমনি সেই বিরাট ঘরখানার মধ্যে যত লোক ছিলো তারা আমার কথা শুনে অট্টহাস করে উঠলো। সকলে মিলে একসঙ্গে বলতে চাইলো, চাই! এ আবার কি ভাষা আপনার? আমাদের ভাষায় তো 'চাই' বলে কোনো কথা নেই। এখানে কিছুই চাওয়া যায় না, আপনি তা-ও জানেন না?

তা হলে! তা হলে আমি কি ভুল জায়গায় এলাম। আমার চোখ ঠেলে জল বেরিয়ে আসছিলো। আমার সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। কিন্তু তার জন্যে আমার একটুও কষ্ট হচ্ছিলো না। হতাশায় আমি বোকার মতো তাদের দিকে চেয়ে রইলাম। আমার তখন অন্য কষ্ট। আমি বললাম, কিন্তু আমি যে আশা করে এত দূর থেকে ছুটে এসেছি। আমার চাই, চাই।

ফিটফাট পোশাক পরা ম্যানেজার গোছের একটা লোক এগিয়ে এলো। সে হাসতে হাসতে বললে, এখানে আশা করার কিছু নেই। সুপারমার্কেটে আপনি কি এই প্রথম এলেন? দেখতে পাচ্ছেন না, এটা একটা বিরাট ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর্স। একটা জায়াণ্ট শপ, একটা অতিকায় দোকান। এখানে সব কিছুই আমরা বিক্রি করি। আপনার যা খুশি আপনি কিনতে পারেন। এখানে কিছু চাওয়া যায় না, এখানে সকলকেই শুধু কিনতে হয়।

আমি এতক্ষণে চোখ মেলে ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম। একটা লম্বা ঝকঝকে কাউণ্টার চলে গেছে এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত। তার শেষ দেখা যাচ্ছে না। আর সেই কাউণ্টারের ওপারে থাকে থাকে কত কি সাজানো রয়েছে। কোনোটা রঙিন ফিতে বাঁধা সুন্দর মোড়কে, কোনোটা রাংতা-জড়ানো কার্ড বোর্ডের বাক্সে, কোনোটা কি দিয়ে মোড়া আমি বুঝতে পারলাম না।

সেই সময় আমার হঠাৎ মনে হলো আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে। আমি এক পাশে দেখলাম থরে থরে নানান খাবার সাজানো রয়েছে। আমি দ্রুত সেই কাউণ্টারের লোকটির কাছে গিয়ে বললাম, শুনছেন, আমাকে রুটি দিন, রুটি। আমার খুব খিদে পেয়েছে।

লোকটা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালো। বললে, ডান হাতটা দিন। ঐ হাতখানা এর দাম। বলে কাউণ্টারের ওপর একখানা পাউরুটি রেখে দিলো।

আমি এদিক-ওদিক তাকালাম। আমি জানতাম না, আমাকে কেউ কোনো দিন বলে দেয়নি যে, এখানে সব কিছুই কিনতে হয়, সব কিছুর দাম দিতে হয়। আমি কোনো উপায় দেখতে না পেয়ে আমার ডান হাতখানা খুলে লোকটিকে দিলাম।

কিন্তু রুটিখানা বাঁ হাতে তুলে নিয়েই আমি অভিযোগের স্বরে বললাম, বাঃ, বাঃ, বেশ তো নিয়ম। আমি এখন ভালো করে খেতেও পারছি না, তোমরা দেখছো তো? ডান হাতখানা দিয়ে দিলে খাবো কি করে?

পাশ দিয়ে একজন যাচ্ছিলো, সে হেসে বললে, কেন, আরেকটা হাত তো রয়েছে আপনার। হাসতে হাসতে বললে, এটাই তো নিয়ম, রুটি কিনতে হলে তার দাম দিতে হবে না? দেখছেন না, রুটির মোড়কে দাম লেখা রয়েছে। মাত্র ডান হাতখানা।

আমি রেগে গিয়ে বললাম, বেশ, তাই, তাই খাবো আমি বাঁ হাত দিয়েই। আপনাদের এখানে যত সব উদ্ভট নিয়ম। ঠিক আছে, আপনারা যতক্ষণ কাউণ্টারের ওপারে, আপনাদের নিয়মই মেনে নিচ্ছি। কিন্তু, শুকনো রুটি কি চিবিয়ে খাওয়া যায় নাকি? একটা কিছু তো সঙ্গে দেবেন?

পাশের কাউণ্টার থেকে একজন সেল্‌স্‌ম্যান শব্দ করে হেসে উঠলো। আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে আরেকজনকে বললে, 'দেবেন' কথাটার মানে কি রে বাবা। শুনলেনই তো এখানে শুধু বিক্রি হয়। আপনি রুটির সঙ্গে খাবার জন্যে যা খুশি কিনতে পারেন আমার কাছে, আপনি দাম দিয়ে কিনবেন, তারপর আপনিই আমাকে ধন্যবাদ দেবেন। আপনি ধন্যবাদ না দিলেও আমি কিছু বলবো না, কারণ ঐ দেওয়া জিনিসটা আমাদের ভাষায় নেই। আপনার মতো অনেকেই দিয়ে যান দেখেছি, এই পর্যন্ত।

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, ঠিক আছে, ঠিক আছে, কত দাম বলুন। কি আছে আপনার কাছে?

লোকটা বললে, এ কাউণ্টারের সব কিছুর দাম আপনার বাঁ হাতখানা। বলে এক টুকরো মাংস আর কি কি যেন কাউণ্টারের টেবিলে রাখলো।

আমি নিরুপায় হয়ে বাঁ হাতখানা এগিয়ে দিলাম। সে সেটা খুলে নিলো।

আর তখন আমি অবাক হয়ে বললাম, বাঃ, বাঃ, আমি তা হলে খাবো কি করে? দুটো হাতই তো আপনারা নিয়ে নিলেন!

তখনই সেই ম্যানেজার গোছের লোকটা, যে ফিটফাট পোশাকে ঘুরে ঘুরে তদারকি করছিলো, সে হাসিমুখে এগিয়ে এলো। বললে, হাতের জন্যে এত আফসোস কেন আপনার, আপনি তো মুখ দিয়ে খাবেন!

মুখ দিয়ে খাবো! কি কথা! রাগে অপমানে আমার চোখ ঠেলে জল বেরিয়ে এলো। আমি কি কুকুর নাকি! কিন্তু তখন প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। আমি কুকুরের মতো মুখ দিয়ে খেতে লাগলাম।

সেই সময় একটা খুব সুন্দর নরম স্বভাবের মেয়ে, যে এর আগেও একবার করুণ চোখে আমার দিকে তাকিয়েছিলো, যে 'রক্ত' 'রক্ত' বলে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠেছিলো, সে আমাকে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল এনে খাইয়ে দিলো। আমার মনে পড়লো, আমার সর্বাঙ্গ যখন ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিলো, এই মেয়েটি দূর থেকে আমার দিকে সমবেদনার দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলো।

আমার সমস্ত ক্ষোভ অন্তর্হিত হলো। আমার সমস্ত বিক্ষুব্ধ মন জুড়িয়ে গেল। কিন্তু আমার কেবলই মনে হচ্ছিলো লোকগুলো আমাকে কুকুর মনে করছে। কারণ, আমি কুকুরের মতো মুখ দিয়ে খেতে পাওয়ার লোভে আমার দু হাতের পরিশ্রম ওদের দিয়ে দিয়েছি। আর তখনই, কেন জানি না, আমার মনে পড়লো, বৃষ্টি-ভেজা অন্ধকার রাস্তায় সেই কালো কালো টাকা তিনটিকে ছুঁড়ে ফেলে দেবার পর সেগুলোর দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছিলো অন্ধকারে তিনটি কালো কালো কুকুর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে।

আমি নিজের পোশাকের দিকে তাকালাম। নোংরা শতছিন্ন পোশাক দেখে দোকানের লোকগুলো নিশ্চয় আমাকে কোনো মর্যাদা দিচ্ছে না। ওরা যে সকলেই খুব ফিটফাট ভালো পোশাক পরেছে। যে মেয়েটি আমাকে জল দিয়ে গেল তার দিকে তাকিয়ে আমার নিজেকে সুন্দর আর পরিচ্ছন্ন করে তুলতে ইচ্ছে হলো।

আমি পোশাকের কাউণ্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। সঙ্গে সঙ্গে কাউণ্টারের লোকটি দামী দামী পোশাক নামিয়ে দিলো। বললে, যা খুশি পছন্দ করুন, তার দাম আপনার মগজের আধখানা।

আমার তখন চিন্তা করার সময় নেই। বললাম, এই পোশাকটা। এই ট্রাউজার্স, এই কোট আর এই নেকটাইখানা। মাথাটা বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, নিয়ে নিন।

সে একটা ছেনি আর হাতুড়ি দিয়ে মাথায় একটা ফুটো করে সিরিঞ্জ দিয়ে মগজ বের করে নিলো আধখানা। মগজ বের করে নিলে এত যন্ত্রণা হয় আমি জানতাম না। রেগে গিয়ে আমার একটা ঘুষি মারতে ইচ্ছে হলো ঐ ম্যানেজার লোকটাকে, কিন্তু আমার তো হাত নেই, শুধু কাঁধের কাছে একটা ঘুষি পাকানোর মতো অনুভূতি হলো। তা বুঝতে পেরে কাউণ্টারের

লোকটা হাসলো। বললে, পোশাকটা পরেই দেখুন না, আপনাকে খুব সুন্দর দেখাবে।

আরে সত্যি, পোশাক বদলে আমি একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেলাম। আমাকে আর চেনাই যাচ্ছিলো না, মনে হচ্ছিলো ঐ বিরাট ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর্সের ভিড়ের সঙ্গে আমি মিশে গেছি। আমাকে দেখে আর কেউ হেসে উঠবে না। চাওয়ার কথা, দেওয়ার কথা আমি আর উচ্চারণ করবো না। তা হলেই আমি ওদের মতোই ভদ্রলোক হয়ে যাবো।

আমি দিব্যি লম্বা লম্বা পা ফেলে কাউণ্টারগুলো দেখে বেড়াচ্ছিলাম। আর মাঝে মাঝে সেই সুন্দর করুণাঘন মেয়েটির চোখ পড়ছিলো আমার দিকে। সে করুণ অথচ মুগ্ধ চোখে মৃদু মৃদু হাসছিলো, চোখ সরিয়ে নিচ্ছিলো। আর তখন আমার নিজেকে খুব মূল্যবান মনে হচ্ছিলো।

আমি প্রচণ্ড বেগে রাতের অন্ধকারে এতখানি ছুটে এসেছি, আমার দেহমন তখন ক্লান্ত। আমি দাঁড়াতে পারছি না, শরীর ভেঙে পড়ছে, আমি ঘুরে ঘুরে কাউণ্টারগুলো দেখতে পারছিলাম না। আমার কেবলই একটু বসতে ইচ্ছে করছিলো, একটু বিশ্রাম নিতে, আমি সেজন্যে আসবাবের কাউণ্টারে গিয়ে দাঁড়ালাম। সেখানে নানারকমের চেয়ার সাজানো ছিলো, কোনোটা শুধুই কাঠের, কোনোটা বেতের, কোনোটা চমৎকার গদি আঁটা, ভিতরে বোধ হয় ডানলোপিলো দেওয়া। আমার ইচ্ছে করছিলো তখন-তখনই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়তে।

আমি বললাম, আমি একটা চেয়ার কিনবো।

কাউণ্টারের লোকটা প্রথমে আমার কথা শুনতেই পায়নি, কারণ তার কাউণ্টারে অনেক লোক ছিলো, সকলেই সমস্বরে বলছিলো, আমি একটা চেয়ার কিনবো, একটা চেয়ার কিনবো।

কাউণ্টারের লোকটা বললে, একটা চেয়ার কিনলে এখানে অনেক কিছু ফাউ পাবেন। একটা চেয়ারের সঙ্গে আপনি একখানা খাট, একখানা আলমারিও পাবেন। আপনি চেয়ারটা নিয়ে গিয়ে আপনার আপিসে রাখবেন, খাট আলমারি আপনার বাড়িতে। দাম কিন্তু খুব সস্তা, আপনার পা দুখানা।

আমি বললাম, বেশ, বেশ, তাই। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না, আমি ঐ গদি-আঁটা চেয়ার একখানা কিনবো, সঙ্গে কোন্ খাটটা বলুন, কোন্ আলমারি।

লোকটা গদি-আঁটা চেয়ারটা কাউণ্টারের এপারে দিয়ে দিলো। বললে, খাট আলমারি আসছে। আপনি বসুন, আপনার পা দুখানা খুলে নিই।

চেয়ারে বসে কি আরাম। আমি পা দুটো বাড়িয়ে দিলাম, লোকটা দুখানা পা খুলে নিলো। তারপর পাশের লোকটাকে হাসতে হাসতে ফিসফিস করে বললে, ব্যস্, লোকটা আর রেগে গিয়ে চেয়ারটাকে কোনো দিন লাথি মারতে পারবে না। ব্যাটা আহাম্মক।

আমার ভীষণ মর্যাদায় লাগলো। আত্মসম্মানে। কিন্তু তখন আর আমার কিছু করার নেই। আমি নিরুপায়। আমার হাত দুখানা দিয়ে দিয়েছি, ঘুষি মারতে পারি না। আমার পা দুখানা দিয়ে দিলাম, সত্যিই কোনো দিন আর লাথি মেরে চেয়ারটা উলটে দিতে পারবো না।

তবু আমি আমার মনকে স্তোক দিলাম। এবার তো আমি খাটের ওপর নরম বিছানায় শুয়ে ঘুমোতে পারবো। কত দিন আমি ঘুমোইনি, বিশ্রাম পাইনি, সেই যে অন্ধকারের লোকটা আমার পিঠে হাত দিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছিলো, বলেছিলো, তিনটে টাকা রইলো, যা আমি ঘৃণার সঙ্গে দূরে ছুঁড়ে দিতেই অন্ধকার রাস্তায় পড়ে প্রথমে তিনটে কুণ্ডলী-পাকানো কুকুর হয়ে গিয়েছিলো, তারপর ঢাকনি-খোলা তিনটে ম্যানহোল। আমি কিন্তু খুব সাবধান ছিলাম, দৌড়বার সময় না কোনো একটা গর্তে পড়ে যাই।

আমি চিন্তা করতে চাইলাম, আমি এখানে কেন এসেছি ছুটতে ছুটতে, এত সময় আর বয়স পার হয়ে। কিন্তু আমার মনে পড়লো না, কারণ আমি যে আগেই আমার আধখানা মগজ দিয়ে দিয়েছি। এখন আর সব কথা মনে পড়ে না, এখন আর পর পর যুক্তি সাজাতে পারি না। আমি চারপাশে তাকিয়ে সেই মেয়েটিকে খুঁজতে লাগলাম, কারণ আমি তাকে অনেকক্ষণ দেখিনি। তাকে দেখার আমার ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছিলো।

আমার মন বলছিলো, সেই মেয়েটি আবার আসবে, নিজেকে তার জন্যে প্রস্তুত করো। আমি তাই আমার চোখে তাকে আরো সুন্দর করে সাজাতে চাইলাম, এবং নিজেকে তার চোখে।

আমি কি কি যেন কিনলাম, তার জন্যে কিংবা যে আসবে তার জন্যে। আমার নিজের জন্যেও। পরিবর্তে আমি আমার বুকের পাঁজরা খুলে দিলাম, আমার সাহস। আমি আমার কণ্ঠ জিহ্বা কণ্ঠস্বর দিয়ে দিলাম। এখন আর আমার আর্তনাদ কেউ শুনতে পাবে না, আমি আর কোনো কিছুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারবো না।

আমি তাকিয়ে দেখলাম, দূরে একটা কাউণ্টারে বড় বড় করে 'লেডিজ' লেখা রয়েছে। আমি ভেবেছিলাম, ওটা মেয়েদের কাউণ্টার। কাউণ্টারের লোকটা হেসে উঠে বললে, ভুল করছেন, এগিয়ে যান, দেখুন, লেডিজ লেখা রয়েছে বটে বড় বড় করে, কিন্তু তার নিচে খুব খুদে অক্ষরে 'ফর সেল' লেখা রয়েছে দেখছেন না। আপনি এগিয়ে যান।

আমি বললাম, রসিকতা করছেন, আমি এগোবো কি করে?

লোকটি বললে, চেয়ারে চাকা লাগানো আছে, আপনি এগোতে পারবেন, শুধু পিছোতে পারবেন না।

এগিয়ে গিয়ে তাকিয়ে দেখলাম। বললাম, মেয়েটিকে চাই, একটি মেয়ে। সে কোন্‌টা?

লোকটা হাসলো। বললে, এই তো টাঙানো রয়েছে। আপনি কিনে নিয়ে জুড়ে নিন না। তা হলেই একটি মেয়েকে পেয়ে যাবেন। কোন্ মেয়েটি তা আমরা কি করে বলবো।

আমি দেখলাম, সত্যি তো, মাংসের দোকানে যেমন একটা আঁকশিতে পিছনের রাঙ ঝোলে, একটাতে সামনের রাঙ, কোনোটায় পাঁজরা, ফুসফুস, তেমনি এই কাউণ্টারেও। আমি সুন্দর সুন্দর জঙ্ঘা দেখলাম এক জায়গায়, নিতম্ব বাহু ঝুলছে অন্যত্র, আরেক জায়গায় সুন্দর মুখ একখানা, ঊরু, রেশমের মতো মাথার চুল, সুগঠিত স্তন। আমার হাত দুটি তো আমি আগেই দিয়ে দিয়েছি, আমি মুগ্ধের মতো পরম আদরে তাই কল্পনায় একটি মুখের ঠোঁট দুটিতে আঙুল বুলিয়ে দেখলাম, একটি বাহু স্পর্শ করলাম, দুটি কোমল স্তনের ওপর কল্পনার হাত রেখে বললাম, বলুন এবার আমাকে কি দাম দিতে হবে। আমার তো আর কিছুই নেই।

লোকটি হাসলো। বললে, কি যে বলেন, আপনার আধখানা মগজ এখনো আছে। সে-জন্যেই তো আপনার এত আত্মমর্যাদা, এত কষ্ট। আপনি যে এখনো কিছু কিছু চিন্তা করে ফেলেন, এখনো ভাববার চেষ্টা করেন, আপনার যখন পোশাক ছিলো না, আপনার যখন খিদে ছিলো, তখনকার কথা। ঐ যে শতছিন্ন পোশাকে বুভুক্ষুর মতো একটা লোক তখন ঢুকলো, আপনি তো তাকে সাবধান করতে যাচ্ছিলেন। অথচ আপনি বুঝতেই পারছেন, পোশাক বদলানোর পর, চেয়ার কেনার পর আপনি একটু একটু করে আমাদের লোক হয়ে যাচ্ছেন। আপনি চেষ্টা করলে একদিন কাউণ্টারের এপারেও চলে আসতে পারেন।

আমার মনে পড়লো, আমি সেই শতছিন্ন পোশাকের লোকটিকে দেখেছিলাম, কিন্তু সাবধান করতে যাওয়ার কোনো উপায় ছিলো না, কারণ আমার পা নেই এবং চেয়ারটা পিছনে ফেরানো যাবে না। আর আমি সত্যি সাবধান করতে চেয়েছিলাম কি না আমার মনে পড়লো না।

আমি চিৎকার করে উঠলাম, ওসব কথা বলবেন না, আমার মনে পড়লে কষ্ট হয়। আমি যে ওর মতো ছিলাম, আমি তা ভুলে যেতে চাইছি। নিন, আপনি বাকী মগজটাও নিয়ে নিন। আমি ঐ টুকরোগুলো কিনবো, জুড়ে নেবো।

আমি সুন্দর সুন্দর জঙ্ঘা, মুখ, আজানু কেশ, স্তন, বাহু, নাভিদেশ এবং ঊরু পেয়ে উল্লসিত হয়ে উঠলাম, আমার মনে হলো, আমি একটি নারীকে পেয়ে গেছি। কিন্তু সে-গুলিকে আমি ঠিক পর পর সাজাতে পারলাম না, জোড়া দিতে পারলাম না। কারণ, তখন আমার সবই তো প্রায় দেওয়া হয়ে গেছে, আমার পুরো মগজটাই। কি করে আমি তাকে গড়ে তুলবো আমি বুঝতে পারলাম না। কল্পনা এবং যুক্তি তখন আমি হারিয়ে ফেলেছি।

উল্লুকের মতো কদাকার একটা লোক হেসে উঠলো, আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, হাঃ, হাঃ, লোকটা মগজ বেচে দিয়েছে! সঙ্গে সঙ্গে তার পাশের লোকটা ঐ উল্লুকের হাসিটা থামিয়ে দিলো ধমক দিয়ে। বললে, ব্যাটা উল্লুক, তুইও তো বেচে দিয়েছিস, কিংবা তোর ছিলোই না। যাদের আছে তারা সবাই বেচে দেয়। এখানে, কিংবা অন্য কোথাও।

তবু আমি কোনো সান্ত্বনা পেলাম না।

আমার মনের মধ্যে দারুণ একটা যাতনা দানা বাঁধছিলো। আমার বুকের মধ্যে ব্যথা-ব্যথা করছিলো। আমার কেবলই মনে হচ্ছিলো, এ তো সেই মেয়েটি নয়। তা হলে সেই মেয়েটি গেল কোথায়। সে আমাকে তৃষ্ণায় জল পান করিয়েছিলো, সে আমার দিকে করুণ চোখে তাকিয়েছিলো। সে মৃদু মৃদু হেসেছিলো এবং লজ্জা পেয়েছিলো আমার দিকে তাকিয়ে।

কিন্তু ততক্ষণে সেই মাংসের টুকরোগুলো, সেই জঙ্ঘা, বাহু, স্তন সব জুড়ে গিয়ে একটা কিম্ভূত নারী হয়ে গেছে, সে তখন কথা বলতে শুরু করেছে। আর আমার মনে হলো, এর মধ্যেই হয়তো সেই মেয়েটিকে খুঁজে পাওয়া যাবে। অতএব আমি একে তার মতো করে সাজিয়ে তুলি, এবং নিজেকে এই মেয়েটির চোখে সুন্দর করে।

আমি এই মেয়েটির জন্যে বিলাস এবং নিজের জন্যে অহঙ্কার কিনতে গিয়ে আমার চোখ দুটি দিয়ে দিলাম। এখন থেকে আমি আর সত্যকে দেখেও দেখবো না। আমি আমার কান দুটি দিয়ে দিলাম, আমি আর এখন থেকে কাউণ্টারের ওপারের কোনো ফিসফিস শুনেও শুনবো না।

হঠাৎ তখনই দেখলাম, সমস্ত লোক শব্দ করে অট্টহাসি করে উঠলো, আরে দেখো, দেখো। মানুষটার কিচ্ছু বাকী নেই, ও এখন শুধু একটা হৃৎপিণ্ড। ও শুধু কষ্ট পেতে পারবে। কিন্তু ওকে আর এখন কেউ চিনতেই পারবে না।

তাদের সেই হাসির শব্দ প্রতিধ্বনি তুললো দেয়ালে দেয়ালে, আমি লজ্জায় মরে গেলাম। আমি তখন শুধুই একটা হৃৎপিণ্ড হয়ে গেছি। আমি তখন চিন্তা করতে পারছি না। আমি শুধু অনুভব করছি, আমি কি যেন চেয়েছিলাম।

হয়তো সেই সুন্দর মেয়েটিকে যে আমাকে তৃষ্ণায় জল দিয়েছিলো। আমি তাকে চতুর্দিকে খুঁজতে লাগলাম। কোথায় সে, কোথায় গেল। আমি অতৃপ্ত, আমি অতৃপ্ত, আমি কি যেন চেয়েছিলাম। আমার কি যেন চাই মনে হয়েছিলো বলেই তো সময় এবং বয়স পার হয়ে আমি এতখানি ছুটে এসেছিলাম।

আমি হঠাৎ অনুভব করলাম, এই ভিড় থেকে দূরে সরে গিয়ে নির্জনে এক কোণে সে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখে অভিমান, তার মুখে ব্যথার ছাপ, সে একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

তখনই সেই ম্যানেজার গোছের লোকটা এসে আমার হৃৎপিণ্ডটা চেয়ার থেকে ফেলে দিলো। বললে, এই চেয়ারটা চিরকালের জন্যে নয়। কাকে যেন বললে, মানুষটা এখন অকেজো হয়ে গেছে, এখন এ শুধু একটা হৃৎপিণ্ড, একে আর মানুষ বলা যায় না।

আর তখন সেই বিরাট ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর্সের অসংখ্য সেল্‌স্‌ম্যান একসঙ্গে হেসে উঠলো। আর সেই ম্যানেজার গোছের লোকটাও হাসলো। বললে, মজা দেখো, মজা দেখো। তোমরা তো সব নিজেদের সেল্‌স্‌ম্যান ভাবো, তোমরা ভেবেছো তোমরা বিক্রি করছো, কিন্তু আসলে দেখো এই মানুষটাই ক্রমে ক্রমে নিজেকে সম্পূর্ণ বিক্রি করে দিয়েছে আমাদের কাছে। এই লোকটাই তো আসল সেল্‌স্‌ম্যান।

আমার তখন আর আত্মমর্যাদায় লাগলো না, আমার তখন আর অপমানবোধ নেই। আমি গড়াতে গড়াতে গড়াতে গড়াতে সেই নির্জনে এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকা সেই মেয়েটির দিকে এগিয়ে গেলাম।

তখন সব লোক বলাবলি করছে, হাসছে, দেখুন, দেখুন, একটা হৃৎপিণ্ড ঘুরে বেড়াচ্ছে, কারণ ওটা কেউ কিনতে চায় না।

আমার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে থেকে একটা কান্না ঠেলে বের হতে চাইলো। সে গড়িয়ে গিয়ে সেই মেয়েটির পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসলো। তারপর আমার হৃৎপিণ্ডটা হঠাৎ বলে উঠলো, আমি তো আমার সব কিছু বিক্রি করে দিয়ে এখন শুধুই একটা হৃৎপিণ্ড হয়ে গেছি, এখন আর কেউ আমাকে নিতে চাইছে না, তুমি আমাকে তুলে নাও।

মেয়েটির চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়লো। ও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। বললে, তুমি আমাকে চাইছো কেন? তুমি তো অন্য কিছু চেয়েছিলে। কি চাই তোমার সেটা জানার জন্যেই তো তুমি অন্ধকারে এত সময় আর বয়স পার করে ছুটে এসেছিলে। তুমি তো এসব কিছুই চাওনি, তা হলে তুমি নিজেকে বিক্রি করলে কেন?

বলে সে আমাকে, আমার হৃৎপিণ্ডকে পরম আদরে হাতের তালুতে তুলে নিলো। আর সঙ্গে সঙ্গে তার দু চোখ থেকে দু ফোঁটা অশ্রু হৃৎপিণ্ডের ওপর ঝরে পড়তেই সেটা একটা রক্তগোলাপ হয়ে ফুটে উঠলো।

আমি তখন চিৎকার করে বলে উঠতে চাইলাম, আমার কি চাই, আমি কিসের খোঁজে এসেছিলাম, এখন আমার মনে পড়ছে না। কিন্তু আমি তো ঠিক জায়গাতেই এসে পৌঁছেছিলাম। আর তখন তো আমি একটা সম্পূর্ণ মানুষ ছিলাম, আমার সব কিছুই ছিলো, দুটি সবল হাত, আর আমার মগজটাও তখন স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারতো.. তখন, তখন এই ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর্স, এই সুপারমার্কেটটা আমি কেন দু হাতে ভেঙে চুরমার ক'রে দিলাম না। তা হলে, তা হলে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ নিজেকে বিক্রি করার জন্যে এখানে ছুটে আসতো না।

১৩৮০



ছোট পৃথিবীর গল্প

যমুনা শব্দ করে হেসে উঠেছিলো। নিশীথের অভিমানে থমথম মুখখানার দিকে তাকিয়ে বলেছিলো, কি পাগল ছেলে দেখো, আমি কি মরে যাচ্ছি নাকি, আমার তো শুধু বিয়ে হচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে নিশীথের চোখে যমুনার চেহারাখানা একেবারে পালটে গিয়েছিলো। হয়তো ওদের ভালোবাসার চেহারাও।

নিশীথের বুকের মধ্যে তখন একটা চাপা কষ্ট। বাস থেকে নেমে বাড়ি পর্যন্ত হেঁটে এসে হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেছে কি একটা ফেলে এসেছি। নিজের বোকামির জন্যে তখন যেমন নিজেকেই ক্ষমা করতে ইচ্ছে হয় না।

ওর ঐ হাসি আর কথায় কি নিশীথের অহঙ্কারে আঘাত লেগেছিলো! যমুনা হাসবে কেন, বরং আসন্ন বিচ্ছেদের কথা বলতে গিয়ে তো ওর গলার স্বর গাঢ় হয়ে ওঠার কথা।

আসলে যমুনার কি দোষ। সব মেয়েরই এ বয়সে যেমন হয়, ওরও বিয়ের কথাবার্তা চলছিলো। দু-একজন দেখেও গেছে। সেসব কথা কি নিশীথকে প্রথম আলাপেই বলা যায় নাকি। কিন্তু এত দ্রুত যে ওরা ঘনিষ্ঠ হয়ে যাবে যমুনা নিজেও ভাবতে পারেনি। তার চেয়েও অভাবনীয়, যে মেয়েকে সাধারণ দু-একজন দিশী পাত্র অপছন্দ করেছে তাকে হঠাৎ বিদেশ থেকে একজন এসে একেবারে প্রাচীন পন্থায় পছন্দ করে বিয়ে করতে চেয়েছে, ভাববার সময়টুকুও দিতে রাজী হয়নি।

যমুনা চেষ্টা করলে হয়তো বেঁকে দাঁড়াতে পারতো। কিন্তু নিশীথের ওপরই বা ওর অত বিশ্বাস কোথায়। ওর সঙ্গে তো আলাপ মাত্র কয়েক মাস আগে। ওরা অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিলো অতি দ্রুত, নিজেকে নিশীথের হাতে ছেড়ে দেবার সময় যমুনা বাধা দিতেও পারেনি। যমুনাও তো একটা একুশ বছরের মেয়ে।

নিশীথের বয়েস তখন পঁচিশ। সবে চাকরিতে ঢুকেছে।

খবরটা ভাঙতেই তো যমুনার লজ্জা করছিলো। কিন্তু না বলেও উপায় ছিলো না।

—নিশীথ, তুমি আমার কথাটা ভাবছো না। যমুনার গলায় কান্নার আভাস একটুও বানানো বলে মনে হয়নি। যমুনা বলেছিলো, আমি কি জানতাম এরকম হয়ে যাবে।

নিশীথ বেশ রাগের গলায় বলেছিলো, তুমি সবই জানতে।

যমুনার শরীর ঘিরে থাকা ওর প্রগল্‌ভ হাতের স্পর্শ আপনা থেকেই তখন শিথিল হয়ে গেছে। হাত কোনো কথা বলতে চাইছে না।

যমুনা ধীরে ধীরে বলেছিলো, আমার কষ্টটা তুমি দেখতে পাচ্ছো না। এই বিয়ের দিনটায় সবারই কত আনন্দ, অথচ আমি একটা যন্ত্রের মতো এগিয়ে চলেছি। এখন আর কোনো উপায় নেই।

আসলে নিশীথের সঙ্গে এই ব্যাপারটাকে ছেলেমানুষি ভাবতে ভাবতে কখন সম্পর্কটা গভীর হয়ে গেছে ও নিজেও টের পায়নি। অথচ বাবার কাছে মা-র কাছে নিজেই মত দিয়ে ফেলেছিলো। তখন ভেবেছিলো এটা কিচ্ছু না, আঙুলের টুসকি দিয়ে সরিয়ে দিতে পারবে।

কিন্তু নিশীথের থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে যমুনার আরো কষ্ট হয়েছিলো। বেচারী। ও হয়তো ভাববে আমি ওকে ঠকিয়েছি। যমুনা ভেবে দেখেছিলো, সত্যি ঠকিয়েছে কি না, নিশীথকে ঐ বিদেশে চাকরি করা মানুষটির সঙ্গে তুলনা করেছে কি না। না, যমুনা ওসব কিছুই ভাবেনি। আসলে ওর নিজেকে ভীষণ অসহায় লাগছিলো। ওর বিয়ের কথাবার্তাও বড় দ্রুত এগিয়ে গেছে। এখন ও ফিরে দাঁড়িয়ে বাধা দিতে পারে না। বাবা-মা-র অসম্মান হবে। তা ছাড়া নিশীথকেই কি ও এইটুকু সময়ের মধ্যে ভালো করে বুঝেছে, চিনেছে!

তাই নিশীথের মুখের দিকে তাকিয়ে গাঢ় গলায় বলেছিলো, এই শোনো, আজকাল পৃথিবীটা অনেক ছোট হয়ে গেছে।

নিশীথের দুখানা আঙুল নিজের আঙুলে জড়িয়ে যমুনা সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে বলেছিলো, মাঝে মাঝেই তো আসবো।

নিশীথ কিন্তু কোনো সান্ত্বনা পায়নি।

তখন যমুনা একুশ, নিশীথের পঁচিশ।

যমুনার কথা ওর মাঝে মাঝে মনে পড়তো। এক-একসময় দেখা করার প্রচণ্ড ইচ্ছে হতো। প্রথম প্রথম দু-একখানা চিঠির উত্তরও দিয়েছিলো। তারপর ক্রমশ ওটা স্মৃতি হয়ে গিয়েছিলো। যাকে কাছে পাওয়া যায় না তার জন্যে হা-হুতাশ করা নিশীথের স্বভাবে নেই। তা ছাড়া যমুনাকে ও শেষ অবধি বিয়ে করতো কি না সে সম্পর্কে ওর নিজেরই সন্দেহ ছিলো। কিন্তু যমুনার ঐ সুন্দর শরীরটাকে ও ভালোবেসে ফেলেছিলো।

নিশীথ ভেবে দেখলো তার পর সাত-সাতটা বছর পার হয়ে গেছে। ও ইতিমধ্যে বিয়েও করে ফেলেছে। এখন চার বছরের বুবুনকে নিয়ে ঘোর সংসারী।

ও তাই প্রথমটা একেবারেই বুঝতে পারেনি। কি করেই বা বুঝবে। যমুনা তো ওর মন থেকে মুছে গিয়েছিলো। কারণ, ও জানে, যমুনার মন থেকেও ও মুছে গেছে। তা না হলে বছর পাঁচেক আগে যমুনা যখন মাস খানেকের জন্যে এসেছিলো, সকলের সঙ্গে দেখা করলো, নিশীথকে খবরটুকুও দিলো না কেন।

সেবার নিশীথ খবর পেয়েছিলো যমুনা ফিরে চলে যাওয়ার পর। অবনীশ, হ্যাঁ, অবনীশ নাম লোকটার। যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, কানের দু পাশের চুল সাদা। তার সঙ্গে এত কি বন্ধুত্ব। লোকটাকে আগেও পছন্দ করতো না নিশীথ, একটু সন্দেহ-সন্দেহ হতো। অবশ্য সত্যি সত্যি প্রেমে পড়ে গেলে প্রেমিকার কাছেপিঠে কোনো পুরুষ দেখলেই সন্দেহ হয়। ঈর্ষায় বুকের ভেতরটা জ্বলে ওঠে, আর একটু অবহেলা কিংবা তাচ্ছিল্য দেখলেই মনে হয় মেয়েটা খারাপ, খারাপ! অথচ এই যে নিশীথের সঙ্গে সম্পর্কটা এর জন্যে যমুনাকে কোনো দিন খারাপ মনে হয়নি।

যমুনা বলেছিলো, এই শোনো, আজকাল পৃথিবীটা অনেক ছোট হয়ে গেছে।

সত্যিই তাই। আজকাল দূরকে দূর মনে হয় না।

তবু লং ডিস্‌ট্যান্স কথাটা শুনলেই বুকের ভেতর কেমন দুরদুর করে ওঠে, টেলিফোন যন্ত্রের এই অস্বাভাবিক জনপ্রিয়তার পরেও। নিশীথ ভাবলো, শুধু আমারই, না সকলেরই?

ইরান নামটা শুনে নিশীথ প্রথমে ভাবলো, কিছু ভুল করেনি তো? কিন্তু না, নিশীথের

নামটাই তো স্পষ্ট শোনা গেল অপারেটরের গলায়।

জায়গাটা মানচিত্রে কোথায় ঠিক মনে পড়লো না। রিসিভার কানে লাগিয়ে নিশীথ তখন অপেক্ষা করছে, আর কম্পিউটরের মতো দ্রুত এবং ভূগোল-মাস্টারের মতো অব্যর্থভাবে ম্যাপ-পয়েন্টারের ডগাকে পৃথিবীর মানচিত্রের ওপর চিহ্নিত বড় বড় শহরগুলোতে ঠেকিয়ে চলেছে। শহরের নামের বদলে এক-একটা মানুষের নাম আউড়ে যাচ্ছে।

মধ্যবিত্ত মানুষদের প্রথমেই যা হয়, একটা টেলিগ্রাম এলে বুক ধড়ফড় করে ওঠে, আশঙ্কা হয় কারো মৃত্যু-সংবাদ কিংবা সিরিয়স্লি ইল্, কাম শার্প। দূরপাল্লার টেলিফোন হলেও তাই। পাওয়ার মতো সুখবর আজকাল তো কিছুই ঘটে না। বরং জীবনের একঘেয়েমি দূর করে দেয় দু-চারটে দুঃসংবাদ। কিন্তু একেবারে বিদেশ থেকে একটা কল্ আছে শুনেই নিশীথের বুকটা দুরদুর করে উঠলো। ভেবে পেলো না, ইরান থেকে কেই বা হতে পারে।

পৃথিবী আজকাল অবশ্য খুবই ছোট হয়ে গেছে। লন্ডন, লন্ডনে মেসোমশাইয়ের ছোট জামাই আছে, এফ আর সি এস করছে, নিশীথের মনে পড়লো। ওর খুড়তুতো দাদা শিকাগোয়। কুয়েতে ছোটমামার শালা চাকরি করে, ও লন্ডন থেকে ইন্কর্পোরেটেড অ্যাকাউন্টেন্স পাস করেছিলো। নিশীথের মনে পড়লো, ওর পিসতুতো বোন বেলা বিয়ের পর এখন স্বামীর সঙ্গে ওয়াশিংটনে। কানাডায় থাকে এক মামাতো ভাই। এরা কেউ কি হতে পারে? কিন্তু ইরানে কেন?

তখনো বুক দুরদুর করছে, দু-একজন বন্ধুর কথা মনে পড়লো। বুকের মধ্যে একটা উৎকণ্ঠা, কে হতে পারে! এমনিতেই অনেক সময় টেলিফোনে সব কথা স্পষ্ট শোনা যায় না, দিল্লী-বোম্বে হলে তো কথাই নেই। এ আবার একেবারে বৈদেশিক আক্রমণ।

ওর এক সহপাঠিনীর কথা মনে পড়ে গেল, সে এখন নিউ ইয়র্কে। তার ওপর নিশীথের একটু দুর্বলতা ছিলো, একদিন চিড়িয়াখানা বেড়াতে গিয়ে একটু একলা হতে পেরেছিলো, তারপর থেকে মেয়েটা বোধ হয় নিজেকে সামলে নিলো। কিন্তু বন্ধুত্ব ছাড়লো না। আর বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার সময় দিব্যি হাসতে হাসতে বললে, নিশীথের কিন্তু আমার ওপর একটু উইক্নেস হয়েছিলো, একদিন চিড়িয়াখানায় বেড়াতে গিয়ে...সে কি খিলখিল হাসি, নিশীথের তখন কি অবস্থা, বুকের ভেতর আতঙ্ক, এই বুঝি সব কথাই বলে ফেলে...না, কোথায় থামতে হয় মেয়েগুলো জানে।

যমুনার কথা কিন্তু ওর একবারও মনে হয়নি।

—হ্যা-লো। ওদিক থেকে খুব মিষ্টি রসিকতার গলা শোনা গেল।

সঙ্গে সঙ্গে ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড খুঁজে বেড়ালো, কে, কে, কে।

তারপরই ঈষৎ হাসির সঙ্গে একটা রসিকতা, আমি কে বলছি? হাসির শব্দটাও শোনা গেল।

পৃথিবীটা আজকাল সত্যি খুব ছোট হয়ে গেছে। তেমন টাকা-পয়সা থাকলে তো কথাই নেই। দলে দলে সব বাইরে পড়তে যাচ্ছে। তার চেয়েও বেশী চাকরি করছে। ডলার-টলার শুনে শুনে নিশীথের কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। নিজেরও এক-একসময় ইচ্ছে হয়, কিন্তু উৎসাহ কম।

—আমি কে বলছি?

টেলিফোনে যে সব সময় গলা চেনা যায় না, কণ্ঠস্বর কারো কারো একেবারে পালটে যায় এই জ্ঞানটুকুও অনেকের নেই। তা ছাড়া এই রসিকতার তো মিটার উঠছে, নিশীথের স্পষ্ট ধারণা না থাকলেও ও জানে এই সময়টুকুর জন্যে অনেক টাকা লাগে।

আসলে রাগ, গলাটা চিনতে পারছিলো না বলেই। যদি ভুল হয় সেই ভয়ে যে নামটা সন্দেহ হচ্ছিলো সেটাও উচ্চারণ করতে পারলো না।

রসিকতার গলা শুনে ওর বুক-দুরদুর ভাবটা তখন কেটে গেছে। পর পর তিন-চারটে নামও মনে পড়লো।

একজন নন্দিতা। সে নিজেই পড়াশুনো করতে গিয়েছিলো।

আলোক একদিন ঠাট্টা করে বলেছিলো, কি রে, নন্দিতার সঙ্গে খুব স্টেডি নাকি? শুনে নিশীথের খুব খারাপ লেগেছিলো। আজকাল মেয়েদের কারো কারো যেমন অত

ছুঁই-ছুঁই বাতিক নেই, নিশীথদেরও তেমনি। তা বলে নিশীথের কি কোনো পছন্দ-অপছন্দ নেই? শেষে নন্দিতা? ও বেশ স্মার্ট কথাবার্তা বলতো, আড্ডা দিতো চমৎকার, কফি হাউস জমিয়ে রাখতো। তা বলে ওর সঙ্গে প্রেম!

নিশীথ হেসে উঠে বলেছিলো, তুই পাগল হয়েছিস?

আর আলোক কিনা বলে উঠেছিলো, বুঝেছি, পাত্তা দিচ্ছে না তোকে।

এইসব কথাগুলোই কখনো কখনো নিশীথকে খারাপ হতে বলেছে।

সেই নন্দিতাও একটা কি স্কলারশিপ জুটিয়ে নিয়ে হঠাৎ একদিন এসে হাসতে হাসতে বললে, আমেরিকা যাচ্ছি।

ও প্রান্ত থেকে তখন হাসির আওয়াজ আসছে।—আমি যমুনা বলছি। কি মশাই, যমুনা নামটা মনে আছে, না তা-ও ভুলে গেছো?

সঙ্গে সঙ্গে নিশীথের সারা শরীরে একটা শিহরন খেলে গেল।

—যমুনা, তুমি!

ওর ইচ্ছে হলো তক্ষুনি তক্ষুনি যমুনার হাতটা হাত বাড়িয়ে ছুঁতে। সাত-সাতটা বছরের এপার হতে।

—নিশীথ, আমি ফিরছি। এই সোমবারই পৌঁছে যাবো। এয়ারপোর্টে নেমেই তোমাকে একটা ফোন করবো। উঃ, কত দিন তোমাকে দেখিনি বলো। একেবারে ফেড্ আপ্, বুঝলে। এই ক'টা দিনও মনে হচ্ছে কত দেরি।

নিশীথের সব অভিমান এক মুহূর্তে ধুয়ে-মুছে গেল।

যমুনা তখনো অনর্গল কথা বলে চলেছে। যেন রাশি রাশি কথা জমা হয়ে আছে এই সাত বছর ধরে। আর নিশীথ যেন কোনো কথাই খুঁজে পাচ্ছে না। ওর মনের মধ্যে তখন একটাই প্রশ্ন, কিংবা অভিমান। তুমি আরো একবার এসেছিলে, কিন্তু তখন খবরটাও দাওনি।

যমুনা হঠাৎ ছেলেমানুষির সুরে বলে উঠলো, নিশীথ, নিশীথ, নিশীথ, আমি যাচ্ছি।

রিসিভার নামিয়ে রেখে নিশীথের মনে হলো ওর সমস্ত শরীরের ওপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেছে।

মনে মনে নিজের বয়েসটা হিসেব করলো। পঁচিশের সঙ্গে আরো সাত। কানের পাশে পাশে রুপোলী জরির কাজ। বুবুন কে জি স্কুলে। মাধবীর গলায় সন্ধ্যা-মাখানো দু-চার কলি গান। নিশীথ ভেবেছিলো ওর পুরোনো জীবন, পুরোনো স্মৃতি সব মুছে গেছে।

যমুনার একটা টেলিফোন, হাজার হাজার মাইল দূর থেকে এসে ওর সমস্ত জীবনটা তোলপাড় করে দেবে নিশীথ ভাবতে পারেনি।

আজকাল পৃথিবীটা সত্যি খুব ছোট হয়ে গেছে।

এক-একসময় বিদেশে ছড়ানো-ছিটানো এইসব আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের কথা ভেবে ওর একটু গর্বও হয়। মনে হয়, মধ্যবিত্ত সমাজটা ক্রমশ বদলে যাচ্ছে। কত ওপরে উঠে যাচ্ছে তরতর করে। এই যমুনাই। ওর বাবার চোখে ঘুম ছিলো না। কিংবা ওর স্বামী সুনন্দ, এত দিন তো এখানে নিতান্তই নিশীথ হয়ে ছিলো।

নিশীথের মনে হলো, অফিসের শশাঙ্কবাবু একবারও এ কথাটা বুঝতে চাননি। উনি বেঁকে না দাঁড়ালে আজ ওঁর ছোট মেয়ে সুধাও হয়তো শিকাগোয়। কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে ওঁরা যোগাযোগ করেছিলেন। যত শিক্ষিতই হোক, আমেরিকায় লণ্ডনে যে যেখানেই চাকরি করুক, শেষ অবধি সেই পাত্রপাত্রীর বিজ্ঞাপন। কিংবা আত্মীয়স্বজনের মাধ্যমে পাত্রী খোঁজা। ব্যাপারটা নিশীথের কাছে খুব হাস্যকর লাগে। ওর খুড়তুতো দাদার কথা মনে পড়ে। ইয়াঙ্কি ধরনের উচ্চারণে বাংলা বলতো, বাংলার চেয়ে ইংরেজী বেশী। ও-দেশের কত গুণকীর্তন। কিন্তু বিয়ে করার সময় রীতিমতো কনে দেখা। ভালো মেয়ে পাওয়াই দায়, নিশীথ নিজেও দু-এক জায়গায় গিয়েছিলো তার সঙ্গে মেয়ে দেখতে। আর তখনই জানতে পেরেছিলো, ছেলে আমেরিকায় চাকরি করলে সবাই গর্ব করে বলে, কিন্তু বিদেশে মেয়ের বিয়ে দিতে চায় না।

অফিসের শশাঙ্কবাবু বলেছিলেন, চাকরিটাই কি বড় নাকি! তা ছাড়া অত দূর। না, ওখানে আমি মেয়ের বিয়ে দেবো না।

শেষে একটা সাধারণ ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে সুধার, এবং বাবা-মাকে দেখে মনে হয়েছে বেশ খুশী। অবশ্য অতীন ছেলেটা ভালোই।

যমুনার কথা মনে পড়লো নিশীথের। যমুনাকে ও খুব একটা দামী কিছু মনে করেনি। কিন্তু ভালোবেসে ফেলেছিলো।

আসলে শশাঙ্কবাবু কেন, অনেকেই জানে না, পৃথিবীটা কত ছোট হয়ে গেছে।

যমুনা বলেছিলো, আমাদের ব্যাপারটা কেমন যেন হয়ে গেল। বিয়ের চিঠি নিয়ে এক-জনকে নেমন্তন্ন করতে এলাম, আর তার সঙ্গেই ভালোবাসা হয়ে গেল।

বলে খুব শব্দ করে হেসেছিলো।

নিশীথ তখন একটুও হাসতে পারছে না। যমুনার ওপর রাগ হয়েছিলো, তোমার বিয়ের চেষ্টা চলছে সে কথা কোনো দিন বলোনি কেন। হঠাৎ এভাবে খবরটা আচমকা না শুনলে হয়তো এতখানি আহত বোধ করতো না।

শশাঙ্কবাবু বলেছিলেন, নিশীথের মনে পড়লো, অত দূরে আমি মেয়ের বিয়ে দেবো না।

আর এই টেলিফোনটা পাওয়ার পর নিশীথের মনে হলো আজকাল পৃথিবীটা সত্যি খুব ছোট হয়ে গেছে। এই তো এক্ষুনি ও রিসিভার নামিয়ে রেখেছে, বুকের ভেতরটা কেমন খুশি-খুশি রোমাঞ্চ, যেন সেই আগের দিনের মতোই যমুনা কার্জন পার্কের ট্রাম-গুমটির টেলিফোন বুথ থেকে ফোন করছে, এই, মেট্রোর নীচে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি, তুমি শিগগির চলে এসো। আর সঙ্গে সঙ্গে নিশীথ মুখ কাঁচুমাচু করে গিয়ে দাসসাহেবকে বলছে, স্যার, ডাক্তারের কাছে একবার যেতে হবে, বাবার খুব অসুখ।

—নিশীথ, আমি ফিরছি, এই সোমবারই পৌঁছে যাবো।

নিশীথের হঠাৎ মনে হলো, ফিরছি কথাটার মধ্যে কতরকম অর্থ আছে। নিশীথের কাছে, সেই পুরোনো প্রেমে? নাকি ওর স্বামী সুনন্দ চাকরি ছেড়ে চলে আসছে? যমুনাই ফিরে চলে আসছে না তো?

নিশীথের নিজেকে ভীষণ অধৈর্য লাগছিলো। মনে মনে ভাবলো, সোমবার। আঙুলে গুনলো। পার্চেজের বনোয়ারী সোনা-বাঁধানো দাঁতে হেসে হেসে কি বলছিলো, ও অন্য দিনের মতো চটলো না। লোকটার সঙ্গে দিব্যি ভালো ব্যবহার করলো। কারণ, যমুনা কি মিষ্টি গলায় বললো, নিশীথ, নিশীথ, নিশীথ, আমি যাচ্ছি।

যমুনা এখন ইরানে। ফোন রেখে দিয়ে এখন কি করছে? নিশীথের কথাই ভাবছে? কিন্তু এত দিন ভাবেনি কেন!

বিয়ের খবরটা ভাঙার পরই যমুনা বলেছিলো, ও কিন্তু আমেরিকায় চাকরি করে, বিয়ের পরই চলে যেতে হবে।

তার আগে যমুনাকে ওর খুব একটা দামী কিছু মনে হয়নি, কিন্তু ঐ একটা কথায় যমুনা যেন ঝট করে অনেক ওপরে উঠে গেল। যেন দোতলার বারান্দা থেকে কথা বলছে, আর নিশীথ দাঁড়িয়ে আছে ফুটপাথে।

মেয়েদের এই এক সুবিধে। রাতারাতি মানুষটার দাম বেড়ে যায়, কেমন যেন নাগালের বাইরে চলে যায়। ছেলেদের বেলাও অবশ্য ঠিক তাই। ওদের অফিসের সুধাংশু ইলেক-ট্রনিক্‌স্‌ পাস করে সাত শো টাকায় পড়ে ছিলো, আমেরিকা থেকে দু মাসের ছুটিতে এসে মিস্টার নায়ারের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলছিলো, নায়ারের মুখ এইটুকুন। শালা নিজেকে বড্ড বড় ভাবতো।

—এ একটা নতুন ক্লাস হয়ে যাচ্ছে, বুঝলে নিশীথ। বিদেশে চাকরি এখন একটা স্ট্যাটাস সিম্বল। অথচ এখানে ফ্যা-ফ্যা করতো। মেজকাকু একদিন বলেছিলো।

নিশীথ জানে, ওটা জেলাসি, বোধ হয় মেজকাকীমার। কারণ, বড়কাকুর ছেলে রথীন এখন শিকাগোয়। যেবার এলো সে কি নেমন্তন্ন খাওয়ার ধুম। যে যেখানে ছিলো, রথীনদা ঠিকানা যোগাড় করে করে সবারই সঙ্গে দেখা করতে যায়, আর সবাই নেমন্তন্ন করে করে খাওয়ায়। রথীনদার পেটের অসুখ হয়ে গিয়েছিলো।

—বাইরে থাকলে জানিস নিশীথ, নিজের লোকদের ভীষণ নিজের মনে হয়। রথীনদা বলেছিলো, আর ভাব দেখাতে চাইছিলো, ও একটুও বদলায়নি।

তার আগে কিন্তু আত্মীয়দের কাছে রথীনদার কোনো প্রেস্টিজ ছিলো না।

নিশীথের নিজেরও এক-একবার যেতে ইচ্ছে হয়েছে, যদি কোনো একটা চাকরি পাওয়া যায়। কিন্তু ওর কোনো ড্যাশ নেই। আর সেজন্যেই একটা রাগ। মেজকাকুর কথায় সায় দিয়ে বলেছিলো, গাভ্‌মেণ্টের উচিত এসব বন্ধ করে দেওয়া। ব্রেন ড্রেন কথাটাও বলেছিলো, আমাদের টাকায় পড়াশুনো করে বাইরে গিয়ে সার্ভিস দেবে কেন।

মেজকাকু হেসে বলেছিলো, কারা যায় দেখতেই তো পাচ্ছিস, ওসব ব্রেন বাইরে যাওয়াই ভালো।

নিশীথ জানে, ওটা জেলাসি। ওর নিজের রাগটাও।

তখন নিশীথের বয়েস পঁচিশ, তার সঙ্গে সাত যোগ করে কানের পাশে রুপোলী জরির কাজ। যমুনার কি এখনো ওকে ঠিক তেমনি ভালো লাগবে! ওর চিঠির উত্তর দেয়নি, সেই রাগেই কি গতবার এসে দেখা করলো না? খবরটা পেতে হলো বুড়ো অবনীশদার কাছ থেকে। এবং ঐ অবনীশদা লোকটা মোটেই ভালো নয়। কারণ, নিশীথের ওকে ভালো লাগে না।

যমুনা সোমবার আসবে। আঃ, সোমবার অনেক দেরি।

কিন্তু নিশীথের মনে হচ্ছিলো, যমুনা এসে গেছে। কারণ, বুবুনকে নিয়ে রাস্তার দোকানে ক্যাডবেরি কিনে দিতে গিয়েও যমুনার সঙ্গে কথা বলছিলো। তোমার প্রথম চিঠিতে এত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলে, তুমি কত সুখে আছো সেটাই জানাতে চাও। আমার কথা তোমার মাঝে মাঝে মনে পড়ে কি না, মন একটু বিষণ্ণ হয় কি না তুমি লেখোনি।

মাধবীর পাশে বসে নিশীথ সিনেমা দেখতে দেখতে যমুনার সঙ্গে কথা বলেছিলো। তুমি একবার একটা চিঠিতে আমাদের সেইসব পুরোনো দিনের কথা লিখেছিলে। একেবারে অকপট প্রেমপত্র। কিন্তু তখন আমি সদ্য বিয়ে করেছি, মাধবীকে আমার সত্যি খুব ভালো লাগে। আমরা সুখী, তাই জটিলতা বাড়াতে চাইনি।

—নিশীথ, নিশীথ, নিশীথ, আমি যাচ্ছি।

কথাটা যেন ও কানের পাশে শুনতে পেলো। আর একটা দিন, মাত্র একটা দিন। যমুনা বলেছিলো, সোমবার এয়ারপোর্টে নেমেই তোমাকে ফোন করবো। কিন্তু নিশীথের হঠাৎ কেমন ভয়-ভয় করলো।

আগের বার এসে ও দেখা করেনি। সাত-সাতটা বছর পরে, এখন যমুনা আঠাশ, চেহারাটা নিশ্চয় আরো অনেক সুন্দর হয়েছে, কিন্তু এমন পাগলের মতো কাণ্ড করছে কেন। এর মধ্যে কিছু একটা হয়ে যায়নি তো, কোনো মনোমালিন্য, কিংবা ছাড়াছাড়ি। 'ফিরছি' কথাটা, এবং তা থেকে ডিভোর্সের কথা মনে হতেই নিশীথের বুকের মধ্যে আতঙ্ক চেপে বসলো।

নিশীথ ভাবলো, আমি এখন মাধবীকে নিয়ে, বুবুনকে নিয়ে দিব্যি সুখী। যমুনার জন্যে কোনো হা-হুতাশ কিংবা দুঃখ ছিলো না। মানুষের জীবনে কত কি তো ঘটে, মুছে যায়। আমি এখন আর কেন ওসবের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে যাবো।

কিন্তু টেলিফোনে যমুনার গলা, তার উচ্ছ্বাস শুনে মনে হয়নি কোনো দিক থেকে সে অসুখী।

সেই দিনটার কথা মনে পড়লো, কি পাগল ছেলে দেখো, আমি কি মরে যাচ্ছি নাকি, আমার তো শুধু বিয়ে হচ্ছে।

নিশীথ টেলিফোনের কাছে চুপচাপ বসে ছিলো। এক্ষুনি আসবে যমুনার ফোন। এয়ার-পোর্টে পেঁছেই ও ফোন করবে বলেছে। এ এক অসহ্য যন্ত্রণা। ভালোবাসার মতোই। প্রতিটা মিনিট, প্রতিটা সেকেণ্ড যেন এক-একটা ঘণ্টা। বারবার হাতের ঘড়িটা দেখছে। প্লেন কখন আসবে ও কিন্তু ঠিক জানতে পারেনি।

নিশীথের মুখের দিকে তাকিয়ে যমুনা গাঢ় গলায় বলছে, এই শোনো, আজকাল পৃথিবীটা অনেক ছোট হয়ে গেছে।

সত্যি তাই। ফোন এলো, সেই বিকেলের দিকে, কিন্তু দু-চারটে কথার পরই যমুনা বললে, এখন ভীষণ ব্যস্ত, কাল সন্ধ্যের সময়, কোথায় বলো? আঃ, কতকাল পরে তোমার সঙ্গে কথা বলছি।

নিশীথের সমস্ত হৃদয়-মন যেন জুড়িয়ে যাচ্ছে।

সেবার এসে যমুনা দেখা করেনি। ও ভেবেছিলো, সব মেয়ের মতোই যমুনাও পালটে গেছে। বিয়ের পর মেয়েরা আগের জীবনটাকে ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে স্লেট মোছার মতো করে মুছে দেয়। ওসব তখন ছেলেমানুষি মনে হয়।

নিশীথ ভাবলো, ডিভোর্স নয় তো!

কিন্তু কেন? ওর স্বামী তো সত্যি ভালোমানুষ, লম্বা-চওড়া স্বাস্থ্যবান চেহারা। চমৎকার ব্যবহার। বিয়ের দিনে ও গিয়েছিলো, এক ফাঁকে আলাপও করিয়ে দিয়েছিলো যমুনা। দেখে বদমেজাজী মনেই হয়নি। তার পরই মনে পড়লো, ঐসব ডিভোর্স ছাড়াছাড়ির মামলায় দুটো পার্টি থাকে ঠিকই, উকিল কিন্তু ঐ একজনই। তার নাম সিগমুণ্ড ফ্রয়েড, তিনি যেদিকে থাকেন সেই পক্ষেরই জিত হয়। কথাটা ওর এক অ্যাডভোকেট বন্ধুর কিংবা সেই বন্ধু কোনো বইয়ে পড়েছে।

নিশীথের হৃৎপিণ্ড তখন ঘোড়ার মতো ছুটছে। যমুনা, যমুনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে।

—এখন ভীষণ ব্যস্ত, কাল সন্ধ্যের সময়, কোথায় বলো?

নিশীথ সেই পঁচিশ বছরে আবার ফিরে গেছে। যমুনাও সেই একুশে। ঠিক এমনি টেলিফোন আসতো, ছুটির পর গিয়ে ওরা একটু নির্জনতা খুঁজে নিতো। এত দ্রুত ওরা পরস্পরের কাছে ধরা দেবে ভাবতেও পারেনি। বড় বেশী তাড়াতাড়ি ওরা অন্ধকার হয়ে গিয়েছিলো।

নিশীথ হাতের ঘড়িটা দেখেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লো। রুদ্ধশ্বাসে ছুটলো বাস ধরবার জন্যে। কিন্তু এখন আর এই আগ্রহ কিংবা ইচ্ছেকে ঠিক ভালোবাসা মনে হচ্ছে না। ওর সমস্ত শরীর এখন শুধুমাত্র শরীর হয়ে গেছে। কিন্তু তার মধ্যে যেন কোথায় একটা ঈর্ষা কিংবা রাগ কিংবা প্রতিবাদ রয়েছে। কিসের বিরুদ্ধে, ও ঠিক বুঝতে পারলো না।

মনে মনে ও কি মেজকাকা হয়ে গেছে? নিশীথ কি কোনো প্রতিশোধ নিতে চাইছে? ওর এই সামান্য মাইনের চাকরিটার জন্যে? ওরই মতো সাধারণ মানুষগুলোই ছোট পৃথিবীর সুযোগ নিয়ে অসাধারণ হয়ে উঠছে বলে? কিন্তু এটা তো নিতান্তই জেলাসি, কিংবা রাগ। কারো বিরুদ্ধে নয়, কিংবা নিজেরই বিরুদ্ধে।

আর তখনই হঠাৎ মনে হলো, যমুনার মনের মধ্যে কি এমনি একটা ঈর্ষা কিংবা রাগ কিংবা প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছে আছে?

বিয়ের দিন কয়েক পরেও মিনিট কয়েকের জন্যে ও দেখা করতে এসেছিলো। তখন ওকে খুব ম্লান আর বিষণ্ণ লাগছিলো।

—জানো নিশীথ, সবাই বলছে, তোর কি ভাগ্য রে! তুমি অন্তত সে কথা বোলো না।

নিশীথ ব্যাপারটা বুঝতেই পারেনি।

আর যমুনা কেমন কান্না-কান্না গলায় বলেছিলো, আমি নিজে সুখী হলেই কি সব হয়ে গেল। জানো, কি সব হাজার হাজার ডলারের গল্প শুনছি, কত স্পীডে গাড়ি চলে...

একটু থেমে বলেছিলো, ওরা বুঝতে পারছে না, আমার মনটা তো এখানেই পড়ে থাকবে। বাবার অসুখে বড় ডাক্তার ডাকার সামর্থ্য নেই, দাদা সামান্য একটা কেরানীর চাকরি করে, কলেজে একসঙ্গে পড়তাম, তুমি তো অমলকে চেনো, তার একটা চাকরি না পেলেই নয়, বেচারা শুক্লা, ওর হয়তো বিয়েই হবে না, তুমি বলো, সুখী হওয়া যায়?

কথাগুলো মনে পড়তেই নিশীথের ভীষণ কষ্ট হলো। আর যমুনাকে ভীষণ ভালো মনে হলো। পরস্ত্রী নয়, যেন একটা পবিত্র শিশু। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো, যমুনা নামটা খুব মডার্ন নয়, ওর দিদির নাম গঙ্গা।

কিন্তু যমুনা কেন আসছে? ও তো না-ও আসতে পারতো। অর্থাৎ নিশীথের কাছে। সাতটা বছর ও তো একেবারে ভুলেই ছিলো। কিংবা মানিয়ে নিতে চেষ্টা করেছিলো। তা হলে কি ওর মধ্যেও একটা ঈর্ষা, কিংবা প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছে?

দূর থেকে দেখতে পেয়েই যমুনার সমস্ত মুখ হাসির বিদ্যুৎ হয়ে গেল। হয়তো নিশীথেরও।

দুজনই এগিয়ে গেল।

—কতকাল, কতকাল পরে! যমুনা বললো।

নিশীথ বললে, সাত বছর।

নিশীথ দেখলো, যমুনা আরো সুন্দর হয়েছে, আরো সুন্দর। কিন্তু ওর সেই চোখ দুটো খুঁজে পেলো না। ওর সাজপোশাক প্রসাধন এখন অন্যরকম। কিন্তু যমুনা একটুও বদলায়নি।

ও অনর্গল কথা বলে চললো।

তারপর এক ফাঁকে, এই, বলো, কোথায় যাবে? বলে হাসলো।

নিশীথ হাসতে হাসতে বললে, সেই পুরোনো জায়গায়।

আর যমুনা বললে, দেখো, আমার মনে হচ্ছে, যেন আমরা আগের মতোই আছি, এই গতকাল যেন দেখা হয়েছিলো। তুমি কিন্তু একটুও পালটাওনি।

—তোমার কথা বলো, কেমন আছো!

—ভালো, ভীষণ ভালো। ও কিন্তু এত ভালো তুমি ভাবতে পারবে না।

তারপর একটু থেমেই হাসতে হাসতে বললে, আমি কিন্তু এবার একা, একেবারে একা।

নিশীথ অভিমানের গলায় বললে, সেবার তুমি দেখা করোনি।

আর যমুনা অভিযোগ করলে, তুমি চিঠির উত্তর দাওনি। তা ছাড়া সেবার তো আমি একবারও একা হতে পারিনি।

একটু থেমে বললে, তোমাকে আমি একটুও বুঝতে পারি না, জানো নিশীথ। এই তো দেখা হলো, মনে হচ্ছে সব তেমনি আছে। তুমি একটুও পালটাওনি, কিন্তু ওখানে ভাবতাম...

কি ভাবতো বললো না। আলো ছাড়িয়ে গাছ-গাছ অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে ওরা হেঁটে যাচ্ছিলো।

—ভাবার দরকার তো নেই, ওখানে তো অনেক সুখে আছো।

যমুনার গলা কেমন বিষণ্ণ শোনালো।—চাকরি বাড়ি, চাকরি বাড়ি, উইক-এন্ডে স্পীডে গাড়ি চালিয়ে কোথাও যাও, আবার ফিরে এসে সেই এক। বোর্‌ড্, জানো, আমার ভীষণ বোর্‌ড্ লাগে।

নিশীথ বললে, আমাদের এখানে তা-ও নেই।

আর যমুনা হাসতে হাসতে বললে, একই একই, প্রকৃতির নিয়ম, ওখানে যখন অন্ধকার, এখানে তখন আলো, এখানে যখন আলো, ওখানে তখন অন্ধকার।

নিশীথ জিগ্যেস করতে চাইলো না, যমুনা এখন কোথায়। জেনেভা, ওয়াশিংটন, বা ইরান। ওর শুধু মনে হলো যমুনা এখন ওর নাগালের মধ্যে।

ওরা গিয়ে সেই পুরোনো গাছটার তলায় বসলো। জলের ওপর দূরের টিউব লাইটের আলো পড়ে ডুরে-শাড়ির মতো লাগছে। কালোর ওপর সাদা ডুরে। এখানটা অন্ধকার।

—এখন কি তুমি ইরানী? নিশীথ এতক্ষণে কৌতুকের স্বরে জিগ্যেস করলো।

আর যমুনাকে হাত বাড়িয়ে কাছে টানলো, সেই আগের দিনের মতোই।

যমুনা হাসতে হাসতে বললে, না, শুধু রানী। তারপর কপট ভর্ৎসনার গলায় বললে, তুমি একটুও বদলাওনি। বলে নিশীথের বুকের কাছে ঢলে পড়লো।

আর নিশীথ ওকে আরো কাছে টেনে নিয়ে বললে, তুমিও বদলাওনি, একটুও না।

তারপর ওরা কেউ কথা বললো না।

হঠাৎ একসময় বললে নিশীথ, ভাবতেই পারছি না, এই সেদিন ইরানে ছিলে...

চারপাশ একেবারে যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। গাছ, গাছ, অন্ধকার, কাছে কাছে বসা ছেলে-মেয়েদের জুড়ি।

নিশীথ হঠাৎ বললে, তুমি ঠিকই বলেছিলে, আজকাল পৃথিবীটা অনেক ছোট হয়ে গেছে।...

যমুনা ঝট্ করে উঠে বসলো। দু হাঁটুর ওপর চিবুক রাখলো, আর সামনের ঘন অন্ধকারের কালো কালো জলের ওপর যেখানে টিউব লাইটের আলো পড়ছে, সেদিকে তাকিয়ে কেমন আহত গলায় ধীরে ধীরে বললে, নিশীথ, আমরাও কিন্তু ছোট হয়ে যাচ্ছি।



আপ ট্রেন

আমি স্টেশনের রাস্তা চিনতাম না। এই ছোট্ট শহরটার রাস্তাগুলো সবই আঁকাবাঁকা। অলিগলি ঘুরে এই অন্ধকারে পথ খুঁজে খুঁজে স্টেশনে পেঁছিতে পারবো কি না আমার ভয় ছিলো।

ভদ্রলোক বললেন, বসো, বসো, তুমি তো ইয়াং ম্যান হে, রাত করে বাড়ি ফিরলেও তোমাকে তো আর জবাবদিহি দিতে হবে না।

আমি অস্বস্তির হাসি হেসে বললাম, না, সেজন্যে নয়। আসলে এ ট্রেনটাও যদি ফেল করি...

আমার বুকের মধ্যে তখনো ভয়-ভয় করছে। কারণ, আমি অনেকগুলো ট্রেন ফেল করেছি, এ ট্রেন আমাকে ধরতে হবেই, এবং আমি একটু একটু আশা পেয়েছি বলেই আমার আরো ভয় করছিলো।

আমি প্রায় তোষামোদের ঢঙে ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিলাম। ওঁকে বেশ খুশী-খুশী লাগছিলো। আমার ব্যবহার, আমার আচার-আচরণ, আমার কথাবার্তা যাতে একটুও বেফাঁস হয়ে না যায় সেজন্যে আমি ভিতরে ভিতরে সেগুলোকে দুমড়ে মুচড়ে ঢালাই এবং পালিশ করে খুব সচেতন যত্নে তাঁর সামনে একে একে মেলে ধরছিলাম।

উনি আরো খুশী হয়ে উঠছিলেন।

আমি উসখুস করছি দেখে উনি বললেন, আরে বসো, বসো, আমি তোমাকে মোড় পর্যন্ত পেঁছে দেবো, তারপর রিকশা নিয়ে ঠুংঠুং করে চলে যাবে, লাস্ট ট্রেন এখনো অনেক দেরি, তোমার এখন কতই বা বয়েস।

আমি বলতে পারলাম না, আমি এখন রোজ দাড়ি কামাই, এক দিন না কামালেই আয়নায় দুটো গাল যেন দুখানা কাটা-ধানের মাঠ হয়ে যায়। আমার এই যুবক বয়সটার মতোই।

উনি গল্পে মশগুল হয়ে গিয়েছিলেন। ওঁর ছেলেবেলার কথা, ওঁর গুণপনার কথা, ওঁর সাফল্যের কথা। আমি ভান করছিলাম, যেন কত আগ্রহ নিয়ে শুনছি। কিন্তু ওঁর অতীত সম্পর্কে আমার কৌতূহলই ছিলো না। আমি শুনতে চাইছিলাম শুধু আমার ভবিষ্যতের কথা, অর্থাৎ যে ভবিষ্যৎ আমার বর্তমান গড়ে দেবে।

আমি তাই অধৈর্য হয়ে বললাম, চিঠিটা লিখে দেবেন বললেন।

উনি উদার হাস্য করে বললেন, দেবো, দেবো। তুমি এত অধৈর্য হচ্ছো কেন। আরে বাপু, মুখার্জি আমার কথা ফেলতে পারবে না, ও যে আবার আমার কাছে বাঁধা আছে।

এইসব বাঁধাবাঁধি আছে বলেই তো এই পৃথিবীটা আমার একটুও পছন্দ নয়। আর সেজন্যেই তো একটার পর একটা ট্রেন চলে গেছে, আমি ধরতে পারিনি। আর তখন রাগে জ্বলতে জ্বলতে আমি ভেবেছি মেরুদণ্ড সোজা করে আমি দাঁড়াবো, আর একটার পর একটা ঐসব বাঁধাবাঁধির যত কূটগ্রন্থি খুলে ফেলবো, ছিঁড়ে ফেলবো। কিন্তু তারপর কেমনভাবে যেন এই ভদ্রলোকের কাছে এসে পেঁছেছি, আর একটুও লজ্জা করছে না এখন আমার মেরু-দণ্ড বিনয়ে কিংবা তোষামোদে এতখানি বেঁকে গেছে বলে। উনি আমাকে চেয়ারে বসতে দিয়েছেন, এবং ওঁর অমূল্য জীবনের কথা শোনার আগ্রহ দেখাতে গিয়ে আমি কেমন ঝুঁকে পড়েছি। খেয়ালই নেই যে, মেরুদণ্ডটা বেঁকে গেছে।

—আরে, ওসব ভাবলে চলে না। একজন বিজ্ঞ মানুষ উপদেশ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, সেই হোমো স্যাপিয়েন প্রথম মানুষটার কথা ভাবো। সে তো দু পায়ে ভর দিয়ে মেরুদণ্ড সোজা করেই দাঁড়িয়েছিলো সাফল্যকে গাছ থেকে পেড়ে নেবে বলে, পারেনি। আমরা তো সভ্য মানুষ, তাই কুড়িয়ে নিই।

ওসব বড় বড় কথা আমার একটুও ভালো লাগে না। আমি কুড়িয়ে নিতে পারলেও

এখন ধন্য হয়ে যাই।

আমি তাই হাসি-হাসি মুখ করে বললাম, চিঠিটা লিখতে আপনার তো সময় লাগবে।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে, দিচ্ছি লিখে। তিনি হাসতে হাসতে উঠলেন। কাগজ আর কলম নিয়ে এলেন, তারপর মৃদু হেসেই বললেন, ইয়াং মানেই ইম্‌পেশেণ্ট, তোমাদের একটুও ধৈর্য নেই। কিন্তু সাক্‌সেসের গোড়ার কথাই জানবে পেশেন্স।

খসখস করে উনি চিঠিটা লিখে দিলেন। ভাঁজ করে একটা খাম এনে তার ভেতর চিঠিটা পুরে ঠিকানা লিখে দিলেন।

আর চিঠিটা হাতে পেয়েই আমি বললাম, এখন না উঠলে আমি হয়তো আর ট্রেন পাবো না।

ভদ্রলোক বললেন, চলো, চলো, তোমাকে মোড় পর্যন্ত পেঁছে দেবো। ওখানে একটা রিকশা নেবে, তা হলেই...

আমি বাধা দিয়ে বললাম, না, না, আপনাকে যেতে হবে না।

বলেই আমি খুব ভক্তিভরে ওঁকে একটা প্রণাম করলাম। যদিও তার মধ্যে সত্যি সত্যি কোনো শ্রদ্ধা ছিলো না।

—দেখো, নিজেই যেতে পারবে তো? উনি আবার জিগ্যেস করলেন।

আমি ঘাড় নেড়ে জানালাম, পারবো। তারপর ওঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওঁর বাড়ির দরজা পার হয়ে গলিটায় নেমে পড়লাম। একেবারে অন্ধকারের মধ্যে। আর তখনই বুঝতে পারলাম রাত অনেক হয়ে গেছে। চতুর্দিকে ঝিমোনো অন্ধকার, অনেক দূরে দূরে ধুলো-ঢাকা কম পাওয়ারের বাল্‌বের হলদে আলোয় অন্ধকারটা আরো কুৎসিত লাগছিলো।

আমি একা-একা হেঁটে এলাম। পিছনে কার পায়ের শব্দ ফিরে দেখতে ইচ্ছে কিংবা সাহস হলো না। আমি খুব দ্রুত পায়ে হাঁটছিলাম, কারণ আমাকে লাস্ট ট্রেন যে-কোনো উপায়ে ধরতে হবেই।

গলির মোড়ে পেঁছে এক সারি রিকশা পরস্পরের ঘাড়ে মাথা রেখে ঘুমে ঢুলছে দেখতে পেলাম। তখন আমার কেবলই মনে হচ্ছে দেরি হয়ে যাচ্ছে, দেরি হয়ে যাচ্ছে। তাই প্রথম রিকশাটাতেই উঠে বসে রিকশাওয়ালাকে ঠেলে তুললাম। বললাম, স্টেশন!

রিকশাওয়ালাটা কিন্তু ধীরে-সুস্থে উঠে দাঁড়ালো, আমার ব্যস্ততায় একটুও বিচলিত হলো না। সে বেশ মেরুদণ্ড সোজা করে উঠে দাঁড়ালো, তারপর রিকশার হাতল দুটো তুলে নিয়ে ছুটতে শুরু করলো।

রাস্তায় দু-একটা লোক চলছিলো, কিন্তু তাদের দেখে মনে হলো না তারা কেউ ট্রেনের খোঁজ রাখে। তাই শেষ অবধি ছুটন্ত রিকশাওয়ালাকেই জিগ্যেস করলাম, লাস্ট ট্রেন কি চলে গেছে?

লোকটা নিঃশব্দের মধ্যে ঠুংঠুং ঠুংঠুং শব্দ করে দৌড়তে দৌড়তেই কি যেন বললে। বোধ হয় বললে, কেয়া জানে। অর্থাৎ জানে না।

আমার পা দুটো তখন ভয়ে ভাবনায় কিংবা উৎকণ্ঠায় রিকশার চেয়েও দ্রুত ছুটে চলেছে, মনে মনে রিকশাওয়ালাকে গালাগাল দিচ্ছি। কিন্তু মুখে বেশ মোলায়েম করে বললাম, জেরা জলদি. একবার বোধ হয় সম্বোধন কিংবা অব্যয় হিসেবে 'ভাই' শব্দটাও উচ্চারণ করলাম।

ঠুংঠুং ঠুংঠুং করে রিকশাটা দৌড়চ্ছে, হঠাৎ-হঠাৎ বাঁক নিচ্ছে বাঁয়ে কিংবা ডানে, দ্রুত ছুটে চলেছে আঁকাবাঁকা গলি পার হয়ে, অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে সুড়ঙ্গ কেটে কেটে, তারপর একসময় মনে হলো রাস্তাটা অনেকখানি চওড়া হয়ে গেছে, এবং সব গলিপথ পার হয়ে সটান এবং সোজা একেবারে স্টেশনের দিকে চলে গেছে, কারণ আমি দূর থেকে এবং এখনো অন্ধকারের মধ্যে বসে স্টেশনের কাছটায় ঝলমলে আলো দেখতে পেলাম, যেন অন্ধকারের আকাশ থেকে কেউ একটা বিশাল আলোকপুঞ্জ অন্ধকারের পৃথিবীতে সুতো ঝুলিয়ে নামিয়ে দিয়েছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুটে বলে উঠলাম, ঐ তো স্টেশন। আসলে আমি হয়তো বলতে চাইলাম, ঐ তো আলো দেখতে পাচ্ছি।

রাস্তার দু পাশে জমাট কালো কালির গাছগাছালি, যেন তুলিতে করে কেউ অন্ধকারের পটে ঐ গাছগুলোতে আরো এক পোঁচ করে কালি বুলিয়েছে। এবং দেখতে দেখতে চালাঘরের

দোকানগুলো লণ্ঠন হাতে ছুটে এগিয়ে আসতে লাগলো, আর দূরে সেই স্টেশনের গা ঘেঁষে দাঁড়ানো গির্জাটা সিল্যুট ছবির মতো একটা মেরুদণ্ড সোজা করা মানুষ হয়ে আকাশের দিকে তর্জনী তুলে কি যেন দেখাচ্ছে। আমি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করলাম না, আমার এখন আকাশের দিকে তাকানোর সময় নেই, এবং গির্জার চূড়াটা তর্জনী দেখিয়ে কি দেখাতে চাইছে আমার জানার আগ্রহ নেই।

আমি এসে পড়েছি, চতুর্দিক থেকে এবং আমার পিছন থেকে আরো কয়েকটা রিকশা, পায়ে-হাঁটা মানুষ, এবং একখানা লোক-বোঝাই বাস হর্ন দিতে দিতে আমাকে পার হয়ে গেল।

'রোখকে, রোখকে' বলে আমি নেমে পড়লাম। বাকী এটুকু পথ আমি হয়তো রিকশার চেয়েও দ্রুত যেতে পারবো।

রিকশাওয়ালাকে পয়সা দিতে দিতে আমি এপাশে-ওপাশে অকারণেই তাকালাম।

আর তখনই গির্জাটার দিকে আমার চোখ পড়লো। বাঃ, এদিক থেকে তো গির্জাটা বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, স্টেশনের আলো পড়ে তার অগুন্তি বড় বড় কাঁচের জানালাগুলোও। এমন কি, বড় ঘড়িটাও।

আর তখনই চোখ পড়লো আমার কাছ থেকে একটু দূরেই দাঁড়ানো সেই সাদাসিধে পোশাকের নরম আর স্নিগ্ধ চেহারার মেয়েটির দিকে। বড় বড় চোখ মেলে সে গির্জাটার দিকে তাকিয়ে ছিলো, আমার মনে হলো সেই ঘড়িটার দিকে।

ও অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে আছে দেখে, এবং মেয়েটিকে একটু গ্রাম্য মনে হচ্ছিলো বলে আমি ভাবলাম ঐ বড় ঘড়িটার ডায়ালে সংখ্যাগুলো রোমান সংখ্যায় আছে বলে মেয়েটি মনে মনে হিসেব করছে, কিন্তু ক'টা বেজেছে বুঝতে পারছে না।

আমার পকেটে এখন চিঠিটা রয়েছে, তাই আমার কেমন আত্মবিশ্বাস ফিরে আসছিলো। আমি একটু কৃপা দেখানোর জন্যে কিংবা কৌতুক করে তার কাছ ঘেঁষে যাবার সময় বললাম, সাড়ে ন'টা বেজে গেছে।

মেয়েটি বোধ হয় আমার কথা বুঝতে পারলো না এমনই তন্ময় হয়ে ছিলো। চমকে ফিরে তাকিয়ে শুধু বললে, কি সুন্দর! কি সুন্দর!

আমি অবাক হয়ে তাকালাম তার দিকে। তা হলে কি ও ঘড়ি দেখছে না?

ওর চোখ লক্ষ করে আমি গির্জার দিকে ফিরে তাকালাম, স্টেশনের আলোয় যেটুকু দেখা যাচ্ছিলো সেদিকে।

মেয়েটি বলে উঠলো, যীশু। তাই না?

আমি বুঝতে পারলাম ট্রেন ধরার ব্যস্ততায় আমি শুধু ঘড়িটা দেখেছি, যীশুর মূর্তিটা আমার চোখেই পড়েনি। মেয়েটির কোনো ব্যস্ততা নেই, ও তাই ক্রুসবিদ্ধ যীশুর দিকে তাকিয়ে আছে।

আমার খুব হাসি পেলো। ওকে ছেড়ে আমি দৌড়তে দৌড়তে স্টেশনের দিকে চলে এলাম। আমাকে ট্রেন ধরতে হবে, আমি অনেকগুলো ট্রেন ফেল করেছি। এই ট্রেনটা আমাকে ধরতেই হবে।

ট্রেন ধরার জন্যে সবাই তখন দৌড়চ্ছে, তাদের পিছনে পিছনে, কখনো একে-ওকে কনুইয়ের ধাক্কা দিয়ে আমি সিঁড়িগুলো দু-তিন ধাপ লাফিয়ে লাফিয়ে প্ল্যাটফর্মে ঢুকলাম। ছুটতে ছুটতে খাঁচাটার সামনে এগিয়ে গেলাম। হাঁপাতে হাঁপাতে জিগ্যেস করলাম, লাস্ট ট্রেন কি চলে গেছে?

সরু সরু পিতলের গরাদ দেওয়া ছোট্ট খাঁচাটার ওপাশে একজন বসে আছে। আমার মনে হচ্ছিলো ঐ লোকটাই খাঁচার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে। আবার লোকটা হয়তো ভাবছিলো সে মুক্ত এবং স্বাধীন। আমরাই খাঁচার মধ্যে আটকে আছি, পালাবার জন্যে পাখা ঝটপট করছি। ওর ওপাশ থেকে দেখলে তাই তো মনে হবার কথা। অন্তত আমাদের ব্যস্ততা দেখলে।

আমি একেবারে খাঁচাটার সামনে এগিয়ে গেলাম। একজন কে যেন একটা বিচ্ছিরি কটূক্তি অনুচ্চারিত রাখলো। একজন আমাকে একটা ধাক্কা দিলো। আমি ভ্রূক্ষেপ করলাম না।

আমার বাঁ দিক থেকে আর ডান দিক থেকে অনবরত একটা হাত খাঁচার দরজায় এগিয়ে যাচ্ছিলো। ওপাশের লোকটির বাঁ হাত একবার আর ডান হাত একবার নির্দিষ্ট ছন্দে ওপরে

উঠছিলো আর নীচে নেমে আসছিলো। যেন একটা শিউলিগাছ থেকে বাঁ হাত বাড়িয়ে একবার বাঁ দিক থেকে, আর ডান হাত বাড়িয়ে একবার ডান দিক থেকে ফুল পেড়ে আনছে লোকটা।

আমি আবার বললাম, লাস্ট ট্রেন কি চলে গেছে?

আমার বাঁ পাঁজর ঘেঁষে এগিয়ে যাওয়া হাতের মানুষটা ভাবলো আমি তাকেই প্রশ্ন করেছি। সে মুঠোয়-ধরা পয়সাগুলো খাঁচার মুখে নামিয়ে রেখে বললে, টিকিটবাবুকেই জিগ্যেস করুন না।

টিকিটবাবু বোধ হয় তার কথাটা শুনতে পেলেন, কিন্তু মাথা তুললেন না। নিঃশব্দে পয়সাগুলো খাঁচার মুখ থেকে টেনে নিয়ে শব্দ করে দেরাজে ফেললেন, তারপর তাঁর ডান হাতটা শিউলিগাছের শাখার দিকে তুলে দিলেন। এবং বেশ বিজ্ঞের মতো বললেন, আমার এপাশে লাস্ট ট্রেন বলে কিছু নেই।

আমি মনে মনে বললাম, কিন্তু আমার আছে।

শেষ বিকেলের আলোয় আমি আর ঝুমঝুমি একদিন মুখোমুখি হয়ে অনির্জন মাঠের নির্জনতম ঘাসের প্রান্তটিতে বসে ছিলাম, আর তখন ঝুমঝুমি হঠাৎ বলে উঠেছিলো, আরে দেখি, দেখি, একটা পাকা চুল। বলে দুটো সরু নরম আঙুলে আমার চুলটা তুলে দেখিয়েছিলো আর কৌতুকে খিলখিল করে হেসে উঠেছিলো। আর আমিও হেসেছিলাম তার সঙ্গে, কিন্তু আমার ভিতরটা কেমন যেন করে উঠেছিলো।

আমি তাই টিকিটবাবুর দার্শনিকতায় রেগে গিয়ে টাকা এগিয়ে দিলাম। বললাম, দিন, আমাকেও একখানা দিন।

আর সেখানা হাতে পেয়েই আমি যখন ভিড় ঠেলে চলে আসছি, তখন কে যেন ভিড় ঠেলে এগিয়ে গিয়েছিলাম বলে কটুকাটব্য করলো। আমি কান দিলাম না, কারণ এর আগে আমি অনেকবার লাইনের পিছনে দাঁড়িয়েছি, মনে মনে ভেবেছি আমার পালাও আসবে। কিন্তু আসেনি।

সবাই তখন ছুটছে। তাই টিকিট পেয়েই আমিও লম্বা প্ল্যাটফর্ম ধরে ছুটতে লাগলাম। যেখানে ট্রেন এসে দাঁড়াবে সেই দিকে।

আর তখনই ঘণ্টি বাজতে শুরু হলো। পাগলাঘণ্টির মতো আওয়াজ। স্টেশনের সেই খালাসীটা ঝুলন্ত এবং পুরুষ্টু লোহার টুকরোয় হাতুড়ি ঠুকছিলো, কিন্তু পাগলাঘণ্টি বেজে উঠলো আমার বুকের মধ্যে।

ঐ তো ট্রেন আসছে, আমি দেখতে পেলাম। সবুজ আলোটা জ্বলে উঠেছে এবং নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে। ট্রেন আসছে, ট্রেন আসছে। কিন্তু প্ল্যাটফর্মে এত লোক, আমি জায়গা পাবো তো। উদ্বেগে উৎকণ্ঠায় আমার বুক দুরুদুরু করে উঠলো।

আমি তো জানি, ট্রেন এসে দাঁড়াবার পর কেউ ধীরে-সুস্থে উঠতে চায় না। কেউ কেউ চলন্ত ট্রেনেই লাফিয়ে উঠে পড়ে, তারপর ট্রেন যখন দাঁড়ায় সে কি কুৎসিত ঠেলাঠেলি, কি অভব্য আচরণ। আমাকেও তো ঐভাবেই ট্রেন ধরতে হবে।

ট্রেন এখনো থামেনি, খুব ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে, আমার সামনে কোন্ কম্পার্টমেণ্ট পড়বে আমি জানি না, কিন্তু তখনই প্ল্যাটফর্মে সে কি হুড়োহুড়ি, চিৎকার, হট্টগোল। সবাই দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ছোটাছুটি করছে, কারণ যে ট্রেনখানা এলো সেটা এমনিতেই প্রায় ভরতি।

এরই মধ্যে একটা চাষাভুষো টাইপের মানুষ, খালি পা, কাঁধের লাঠির ডগায় গোল করে পাকানো একটা নিঃস্ব বস্তা দড়ি দিয়ে বাঁধা, সে এদিক-ওদিক ছুটছে আর উদ্‌ভ্রান্তের মতো বলছে, আমাকেও যেতে হবে, হুঁশ নাই? হুঁশ নাই?

সে বারবার ধাক্কা খেতে খেতে ঐ একটা কথাই আউড়ে যাচ্ছিলো, হুঁশ নাই? হুঁশ নাই?

ঐ ভিড়ের মধ্যেই দু-একজন তার কাণ্ড দেখে হেসে ফেললো। এবং আমিও হেসে ফেলে ধাক্কাধাক্কি করে ট্রেনে উঠে পড়লাম, আর তখন ভাবতে চেষ্টা করলাম, লোকটা ঐ প্রশ্ন কাকে করেছিলো? নিজেকে, না এই ভিড়ের মানুষগুলোকে, নাকি সেই গির্জাটা তর্জনী তুলে যাকে দেখাচ্ছিলো তাকেই?

কিন্তু এসব ভাবনার তখন আর অবকাশ নেই। যারা উঠেছে তাদের মধ্যে মাত্র দু-চার-

জন ঝটপট গিয়ে খালি সীটগুলোয় বসে পড়েছে। লোকাল ট্রেনের কম্পার্টমেণ্ট, মাঝখানের প্যাসেজটায় আমাদের মাথার ওপর সারি সারি ফাঁস ঝুলছে। ফাঁসির দড়ির মতোই। আমরা

[illegible] তার ওপর এই প্রচণ্ড গরম, ভ্যাপসানি, ঘামের গন্ধ, চাল-চালানীদের নোংরা জামাকাপড়, বস্তা, গা দুলুনি, সব মিলে-মিশে সে এক অসহ্য অবস্থা।

ভিড়ের মধ্যে একজন বেশ শীর্ণ কিন্তু দীর্ঘ চেহারার বুড়ো দাঁড়িয়ে ছিলো। দু-চারটে ভুরু সাদা, চোখে নিকেলের চশমা। তার মুখে কেমন নীতিবাদের কাঠিন্য, কাঁধে পরিপাটি চাদর। প্রায় আমারই বয়সী পাশের ছেলেটি বুড়োর গায়ে আচমকা ঢলে পড়তেই বুড়ো রূঢ় স্বরে বললে, এইটুকুর জন্যে দাঁড়াতেও তোমার কষ্ট হে, আর এই বয়সে আমি কত মাইল হাঁটি জানো?

কে একজন আড়াল থেকে ঠাট্টা করলো, হেঁটে হেঁটে কোথায় গেছেন দাদু? কোথাও গিয়ে পেঁৗছেছেন তো? নাকি শুধু পার্কের চারপাশে চক্কর দিয়েছেন?

বুড়ো রেগে গিয়ে বললে, হাঁটাটাই বড় কথা, পেঁৗছনো নয়।

এইভাবে সারাটা পথ যেতে হবে ভাবতেও আমার খারাপ লাগছিলো. মনে হচ্ছিলো আমার দুখানা পা আমার শরীরের ভার এতক্ষণ ধরে বয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। এই দুর্গন্ধ আর পচা গরমে আমি ভিতরে ভিতরে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছিলাম।

আমি একজনের পা মাড়িয়ে দিলাম, সে রেগে উঠতেই বললাম, আরে মশাই, এই ভিড়ের মধ্যে এরকম হয়েই থাকে।

আরেকজন আমার পা মাড়িয়ে দিলো, আমি তাকে একটা ক্রুদ্ধ ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলাম। একজনের কনুই আমার নাকে লাগছিলো, আমার কনুই আরেকজনের নাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা পরস্পরের শত্রু হয়ে গেলাম। আমরা প্রত্যেকে প্রাপ্যের চেয়ে একটু বেশী জায়গা নেবার চেষ্টা করছিলাম।

একজন বৃদ্ধ অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে ছিলো, আমরা পরস্পরের সঙ্গে যখনই ঝগড়া শুরু করছিলাম তখনই তিনি সান্ত্বনা দেবার জন্যে বলছিলেন, এইটুকু তো পথ, পরের স্টেশনেই দেখবেন অনেকে নেমে যাবে।

কিন্তু এখন আমি যুবক, আমার মনে হচ্ছিলো পথ অনেক দীর্ঘ। ওঁর কথা আলাদা, উনি তো সব পথই প্রায় পার হয়ে চলে এসেছেন।

পরের স্টেশনে সত্যি সত্যি অনেকে নেমে গেল, আর উঠলো মাত্র দু-চারজন। একজন মসলামুড়ি, একজন কমলালেবু। এবার আমরা একটু হাত-পা ছড়িয়ে দাঁড়াতে পেয়েছি। এখন আর অতখানি অসহ্য লাগছে না। আমি একটু একটু করে সীটগুলোর দিকে এগিয়ে গেলাম। যদি হঠাৎ কেউ উঠে পড়ে, পরের স্টেশনে নেমে যায়, তা হলে সুড়ুৎ করে আমি যাতে বসে পড়তে পারি সেজন্যে আমার হাত এবং পা আমি এমন কৌশলে স্থাপন করলাম যাতে এই ব্যূহ ভেদ করে আশেপাশের কেউ সেটা দখল করে নিতে না পারে।

যে লোকগুলো দিব্যি বসে ছিলো তাদের ওপর আমার ভীষণ রাগ হচ্ছিলো। যেন ওদের এমন আরাম করে বসার কোনো অধিকারই নেই, কারণ আমরা অনেকে দাঁড়িয়ে আছি। অনেকে? আমি অনেকের কথা ভাবছিলাম না, আমি আমার কথা ভাবছিলাম।

আমি একজনকে বললাম, ও দাদা, একটু সরে বসুন না।

লোকটা একটু সরে বসার ভান করলো, আর আমি সেখানেই কোনোরকমে বসার চেষ্টা করলাম। এমন কি, যে লোকটা আমাকে দয়া করে কিংবা ভদ্রতা দেখিয়ে ইঞ্চি তিনেক ছেড়ে দিলো সেই লোকটাকেই আমি ক্রমাগত নির্বিকার মুখে চাপ দিতে লাগলাম। যাতে সে আমাকে আরো জায়গা করে দেয়, তার নিজের জায়গাটাকেই সংক্ষিপ্ত করে, কিংবা তার পাশের লোকটাকে চাপ দিয়ে। কিন্তু সেই লোকটিই এবার বেশ হাসি-হাসি মুখে একটা গোপন চাপ সৃষ্টি করে আমাকে আসনচ্যুত করার চেষ্টা করতে লাগলো।

তখনই একটা স্টেশনে এসে ট্রেনটা দাঁড়ালো। কেউ কেউ উঠলো, আর আমাদের বেঞ্চেরই সীট ছেড়ে একজন। সঙ্গে সঙ্গে আমি বেশ হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করে বসলাম। আরামের

চেয়ে দৃষ্টি ছিলো অন্য দিকে। অর্থাৎ একটু জায়গা আছে দেখে কেউ যেন আবার আমার পাশে বসতে না চায়।

আঃ, ট্রেন ধরতে পেরেছি, এখন বসতেও পেয়েছি। বসতে পাওয়ার যে কি আনন্দ! আমি কৃতজ্ঞ বোধ করলাম সেই ভদ্রলোকের প্রতি, যাঁর চিঠিখানা আমার পকেটে। এবং হয়তো আমার পাশের সীটে বসা লোকটির প্রতি, যে আমাকে একটু বসার জায়গা দিয়েছিলো। সে আমাকে সীট থেকে ঠেলে সরিয়ে দিতে পারেনি বলে তার প্রতি একটু করুণাও হলো, এবং নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস।

আমি এবার বেশ সৌজন্য দেখিয়ে পাশের লোকটিকে জিগ্যেস করলাম, কোথায় যাবেন? লোকটা কেমন উদাসীনভাবে উত্তর দিলো, কোথাও একটা পেঁছিতে তো হবেই।

বসে থাকতে থাকতে আমি এবার পাখাটার দিকে তাকালাম। পাখাটা অন্য দিকে ঘোরানো আছে। এদিকে একটুও হাওয়া আসছে না। জানালা দিয়ে আসা হাওয়া-বাতাস এখান পর্যন্ত এসে পেঁছিচ্ছে না। অথচ কি প্রচণ্ড গরম, সারা শরীর ঘামে জ্যাবজ্যাব করছে। এতক্ষণ আমি শুধু একটু বসতে চেয়েছিলাম, একটা শুধু আসন, একটা সীট। এখন আমার পাখার হাওয়া চাই। তাই সামনের বেঞ্চের লোকটার ওপর, যার দিকে পাখাটা ঘোরানো ছিলো তার ওপর ঈর্ষা হলো। এবং মনে মনে বলছিলাম, ঐ সীটখানা আমার চাই। ওখানে আনন্দ অনেক বেশী, এবং আরাম। এবং সচ্ছলতা। এবং গর্ব।

এর মধ্যে এলো ফেরিওয়ালার অত্যাচার। একটার পর একটা আসছেই। এবার এলো পায়ে মাড়ানো কলম। ফাউন্টেন পেন তো জানি লেখার জন্যে, পায়ে মাড়ালেও ভাঙবে না সেও আবার কৃতিত্ব নাকি? আমি হেসে সামনের লোকটিকে জিগ্যেস করলাম।

লোকটি হেসে বললে, আরে মশাই, মানুষের বেলাও তাই। বাড়তি কিছু থাকলে ইমেজ বাড়ে। এমন কি, সেই বাড়তি গুণটাও বেশী কদর পায়।

আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। ভাবলাম জিগ্যেস করি।

কিন্তু তখনই দাঁড়িয়ে-থাকা লোকদের মধ্যে থেকে একজন আমার সামনের লোকটিকে উদ্দেশ করে বললে, চড়চড় করে উঠছো যে মিত্তির, সব খবর পাচ্ছি। ওঠো ভাই, নাগরদোলায় ওঠো, আমরা ঘানি ঘুরিয়েই কাটালাম।

আমার মনে হলো কথাটার মধ্যে যেন একটা খোঁচা ছিলো। কথাটা আমার একটুও ভালো লাগলো না।

কারণ সেই বিজ্ঞ লোকটি একদিন বলেছিলেন, নাগরদোলায় উঠলেই দেখবে তরতর করে ওপরে উঠে যাবে, কিন্তু দুঃখ কি জানো, সেখানেই থেমে থাকে না, তরতর করে নেমেও আসে।

আমি তাঁর কথা একটুও বিশ্বাস করিনি।

কিন্তু তখনই আমার ঝুমঝুমির কথা মনে পড়ে গেল। যে আমাকে ওপরে ওঠার কথা বলেছিলো। ঝুমঝুমির সেই সুন্দর শরীরের কথা। ওর সেই লাজুক-লাজুক ঠোঁট টিপে হাসা। ওর অভিমান। আমি তো ঝুমঝুমির কাছেই চিরকাল হীরো হবার চেষ্টা করেছি। কারণ, আমার ধারণা ছিলো ওর কাছে হীরো হতে পারলেই খুব সহজে সমুদ্রতটের ঢেউকে দুটি নরম এবং উষ্ণ কবুতরের মতো পোষ মানাতে পারবো। এবং ওর উচ্ছল শরীরকে।

একদিন ঝুমঝুমির সঙ্গে আমি একটা রোমাঞ্চময় সন্ধ্যার পার্কে ভেসে বেড়াচ্ছিলাম। ঝুমঝুমির চোখেও ছিলো মুগ্ধতা। আর সেই পার্কের এক দিকে ফুটবল খেলতো ছেলেরা, তাই দু পাশে দুটো গোল-পোস্ট ছিলো। আমরা হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে, কিংবা স্বপ্নে এবং আনন্দে একটা গোল-পোস্টের দিকে এগিয়ে গেলাম। আর তখনই ঝুমঝুমি হাসতে হাসতে গোল-পোস্টের মাথার দিকের কাঠটা তর্জনী তুলে দেখিয়ে বললো, ওটা ছুঁতে পারো? আমি ওর কাছে হীরো হবার জন্যে বললাম, পারি। এবং দ্রুত এগিয়ে গিয়ে হাত তুলে ওপরের কাঠটা ছুঁয়ে দেখালাম। বললাম, দেখো। অবশ্য তার জন্যে আমাকে অনেকখানি গোড়ালি তুলে দাঁড়াতে হয়েছিলো। কিন্তু সেটা ছুঁতে পেরেছিলাম বলে আমার বুকের মধ্যে তখন প্রচণ্ড আনন্দ আর প্রচণ্ড গর্ব। আমি যেন মুহূর্তের জন্যে ওর কাছে হীরো হয়ে গিয়েছিলাম। আমি হাসছিলাম, ঝুমঝুমিও হাসছিলো, কারণ ও অনেকবার চেষ্টা করেও ওটা ছুঁতে পারলো না। যদিও ওকে এমনি দেখে বেশ দীর্ঘাঙ্গী মনে হয়।

ঝুমঝুমি কৌতুকে হেসে উঠে বললে, ওপরের ওটা ছুঁতে পারাটা কি এমন বাহাদুরি, ওপরে ওঠাটাই বড়। তারপরই হঠাৎ কেমন গাঢ় গলায় বলেছিলো, এই, তুমি ওপরে উঠতে পারবে তো।

ঝুমঝুমির সেই কথাটা কেন জানি না আমার মনে পড়ে গেল। আর তখনই মনে হলো সামনের লোকটার জায়গায় আমাকে যেভাবেই হোক বসতে হবে, কারণ ওখানে পাখার হাওয়া আছে। ওখানে আরো আরাম করে হাত-পা ছড়িয়ে বসা যায়। তা ছাড়া আমার আশেপাশে সকলেই ঐ সীটখানার দিকে ঈর্ষার চোখে তাকিয়ে আছে। আমি তাই একটু ঈর্ষা অর্জন করতে চাই।

এদিকে ট্রেন তখন পরের স্টেশনে এসে থেমেছে। এটা তো লোকাল ট্রেন, প্রায় প্রত্যেক স্টেশনেই এর দাঁড়াবার কথা। দু-চারজন লোক, নতুন লোক, এই স্টেশন থেকে উঠলো। ওপাশ থেকে কয়েকজন বুঝি নেমে গেল। আর যে সীটের দিকে আমি ঈর্ষান্বিত হয়ে তাকিয়ে ছিলাম তার পাশের লোকটা হঠাৎ উঠে পড়ে হুড়মুড় করে নেমে গেল। সে বোধ হয় জানতো না, কিংবা সচেতন ছিলো না যে, তাকে নামতে হবে।

আমি তাড়াতাড়ি উঠে গেলাম, কিন্তু সেই শূন্য আসনে না বসে বেশ রাশভারি গলায় সেই লোকটিকেই বললাম, একটু সরে বসুন তো, ঐদিকে। বলে পাশের খালি সীটটা তর্জনী তুলে দেখিয়ে দিলাম। ঐ ভদ্রলোক, যিনি পাখার হাওয়া খেতে খেতে এসেছেন, তিনি বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক ছিলেন, কিংবা মানুষটা বোধ হয় নির্বিবাদী, তাই সরে গেলেন, নিজের আসন ছেড়ে দিয়ে। আর আমি সেখানে বসে পড়লাম।

আমি ভাবলাম, এইবার আমি বেশ মেরুদণ্ড সোজা করে বসবো। এখন আমি একটা ভালো সীট পেয়েছি, পাখার বাতাস, এবং হঠাৎ লক্ষ করলাম ওদিকের বেঞ্চে বেশ জড়সড় হয়ে একটি পরিবার কখন কোন্ স্টেশনে উঠে বসে আছে। এবং বৃদ্ধ খোঁচা-খোঁচা দাড়ির মলিন পোশাকের বাপটির এবং অভাবের ছাপ ও দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠছে যে মহিলার কপালে তাঁদের মাঝখানে সঙ্কুচিত অসহায় একটি স্নিগ্ধ মুখ আমার দিকেই তাকিয়ে আছে নির্নিমেষ চোখে। ওদের বেঞ্চিতে চারজনের আসনে সাড়ে পাঁচজন কোনোরকমে বসে আছে, ঐ বিশ্রী গরমের মধ্যে। এবং সেজন্যেই হয়তো মেয়েটি কেমন লোভের চোখে কিংবা মুগ্ধ হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি তাই মেরুদণ্ড সোজা করে মুখের ওপর আত্মবিশ্বাস টেনে এনে গর্বিত বোধ করলাম। আমি আঙুলের টোকা দিয়ে আমার ঝকমকে বুশ শার্টের এবং দুর্মূল্য ট্রাউজার্সের ধুলো কিংবা সিগারেটের ছাই ঝাড়লাম। তারপর ট্রাউজার্সের পা দুখানা টান-টান করে সামনের দিকে এগিয়ে দিলাম। সামনের লোকটার কোনো অসুবিধে হচ্ছে কি না, কিংবা কোনো অভব্যতা প্রকাশ করছি কি না তা ভাবতে চাইলাম না।

আমি ঘন ঘন মেয়েটির দিকে তাকাচ্ছিলাম, আর সেজন্যেই সে হয়তো অস্বস্তি বোধ করে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রইলো। কিন্তু আমি ভাবলাম, ও বোধ হয় অন্য কারো দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। তাই তার চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করে মনে হলো একেবারে জানালার ধার ঘেঁষে বসা লোকটির দিকেই ও তাকিয়ে আছে। আর সঙ্গে সঙ্গে আমি ভাবলাম, আরে, ঐ সীটটাই তো সবচেয়ে ভালো। একেবারে জানালার ধার ঘেঁষে বসেছে বলেই কেমন ফুরফুরে হাওয়ায় লোকটার শ্যাম্পু-করা চুল উড়ছে, পতপত করছে তার গলার টাই। লোকটা দিব্যি মৌজ করে বসে আছে বাইরের দিকে তাকিয়ে। ও নিশ্চয় জানালা দিয়ে অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছে, অনেক কিছু উপভোগ করছে, এবং এই ভ্যাপসা গরমে দুরন্ত ঠাণ্ডা বাতাস।

আমার মনে হলো ঐখানে বসতে পেলেই আমার জীবন ধন্য হয়ে যাবে। আমি আর কিছু চাই না। শুধু ঐখানে পৌঁছতে চাই, ঐ জানালার ধারটিতে। আমাদের এই কামরার শ্রেষ্ঠ আসনটিতে।

আমি তো সেই অনেক কাল আগে ছুটতে ছুটতে এসে ট্রেন ধরেছিলাম। তখন আমার কতই বা বয়েস ছিলো। ঝুমঝুমি অবশ্য একদিন আমার একটা পাকা চুল তুলে দেখিয়ে কৌতুকে হেসে উঠেছিলো। আর এখন আমার মাথার অনেক চুলই সাদা। আমি এখন প্রৌঢ় হয়ে গেছি। কিন্তু মেরুদণ্ড সোজা করে আমি এখন বসে আছি, কারণ আমার বুকের মধ্যে

একটা গর্ব লুকোনো আছে। আমি যে একদিন সেই ভদ্রলোকের কাছে সামান্য একটা চিঠির জন্যে কপট বিনয়ে এবং তোষামোদের ঢঙে ঝুঁকে প'ড়েছিলাম সে কথা এখন আর মনে পড়ে না। আমি যে একদিন ভিড় ঠেলে কনুইয়ের ধাক্কা দিয়ে টিকিট-ঘরের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলাম এবং ট্রেনে উঠেও ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমার মেরুদণ্ডটা বেঁকে যাচ্ছিলো, আমার এখন আর মনেই পড়ে না।

—আমরা মশাই কেউই হোমো স্যাপিয়ন নই, যতই খাড়া হয়ে দাঁড়ান, মাথা উঁচু করুন। সেই বিজ্ঞ লোকটি একদিন বলেছিলেন, ভিতরে ভিতরে আমরা তো প্রতি মুহূর্তে চতুষ্পদ হয়ে যাই, কখনো কখনো সরীসৃপ।

মিথ্যে কথা। আমি তাঁর কথা বিশ্বাস করি না। আমি ঐ জানালার পাশের সীটটা পেলে দেখিয়ে দিতে পারি আমার স্পাইনাল কর্ড এখনো লাঠির মতো সোজা। তখন আর আমি কাউকে কনুইয়ের গুঁতো দেবো না, ভারি জুতো দিয়ে কারো পা মাড়িয়ে দেবো না, ভিড়ের মধ্যে নিজের জন্যে একটু বেশী জায়গা করে নিতে চাইবো না।

ঝুমঝুমি, তুমি বলেছিলে, ওপরের ঐ গোল-পোস্টটা ছুঁতে পারাই বড় নয়, ওপরে ওঠাটাই বড়। তোমাকে স্তোক ও প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমি তোমার চুল, চোখ, তোমার ঠোঁট, কণ্ঠের তটতলে জানালার পর্দা টেনে উঁকি দেওয়া দুটি দুধেল শিশুর মুখ, তোমার শুভ্র কাঁধ এবং অনাবৃত নাভিদেশের প্রশস্ত পূর্ণিমা এবং পালের নৌকোর মতো স্বতঃস্ফূর্ত হেঁটে যাওয়ার সঙ্গী হতে চেয়েছিলুম। তুমি ভেবেছিলে আমার প্রতিশ্রুতি মিথ্যে। কিন্তু দেখো, দেখো, তুমি আজ কোথায়, জানালার পাশের সীটে বসা লোকটা উঠে দাঁড়িয়েছে, স্যুটকেসটা হাতে ঝুলিয়ে, ও হয়তো এবার নেমে যাবে, আর আমি কেমন কায়দা করে এগিয়ে এসেছি, একখানা হাত পাশের লোকটির ঘাড়ের কাছে সুকৌশলে স্থাপন করে, যাতে সে ঐ সীটে গিয়ে বসতে না পারে।

আমি প্রায় অধৈর্য হয়ে উঠেছিলাম, যে ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন তাঁর প্রতি আমার একটুও সৌজন্য দেখাবার সুযোগ কিংবা ইচ্ছে ছিলো না। আমি দ্রুত এগিয়ে গিয়ে জানালার পাশটিতে বসে পড়লাম। সাফল্য এখন আমার হাতের মুঠোয়। ঝুমঝুমি, তুমি দেখে যাও আমি এখন কেমন মেরুদণ্ড সোজা করে বসে আছি। ভিতরে ভিতরে আমি যদি ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়ে থাকি, যদি বুকের মধ্যে চতুষ্পদ কিংবা সরীসৃপ, সে শুধু আমি নিজেই দেখতে পাচ্ছি, পাবো, কিন্তু তুমি দেখে যাও আমি কত ওপরে উঠেছি, কত ওপরে।

এবার আমি পৃথিবীর দিকে তাকাবো, কারণ এখন আর মাথা নীচু করে হাঁটি না।

পরম নিশ্চিন্তিতে আমি জানালার বাইরে তাকালাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমি মুষড়ে পড়লাম এবং বিষণ্ণ। তাকিয়ে দেখলাম কোথাও কিছু দেখার নেই, চতুর্দিকে শুধু অন্ধকার, এবং অন্ধকার, এবং সেই অন্ধকারের মধ্যে আমি একা। এবং শূন্য। কারণ, এখন আর আমার সঙ্গী নেই। আমি এই জানালার পাশটিতে পেঁছিতে গিয়ে কামরার প্রত্যেকটি মানুষকে হারিয়ে ফেলেছি। এখন আর আমার জন্যে কারো সহানুভূতি নেই, সমবেদনা নেই।

আমার সমস্ত বুক খাঁ-খাঁ করে উঠলো। আমার কান্না পেলো, মনে হলো একটু একটু করে এইখানে পেঁছিতে গিয়ে আমি সবাইকে হারিয়ে ফেলেছি। সামনের বেঞ্চের সেই সুশ্রী মেয়েটিও একটু আগে কখন নেমে গেছে। ঝুমঝুমি, তুমি আজ কোথায়?

আমার বুক নিঙড়ে একটা অসীম শূন্যতার দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো, কারণ আমি কখন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। আর কখন কোন্ কোন্ স্টেশনে যেন ট্রেনটা থেমেছিলো, আর সমস্ত লোক একে একে কখন যেন নেমে গেছে। আমার জীবন থেকে। আমি একা, একা।

ঝাড়ুদারটা হেসে বললে, নেমে পড়ুন বাবু, এবার তো নামবেন।

আমি চমকে তাকিয়ে দেখলাম ট্রেন পেঁছি গেছে, চতুর্দিকে কুয়াশা-কুয়াশা আলো. প্ল্যাট-ফর্মে কেউ কোথাও নেই।

আমি তাড়াতাড়ি নেমে পড়লাম। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলাম, কোথাও কোনো জন-মানব নেই। নিঃশব্দ নির্জন। আর তখনই প্ল্যাটফর্মের বড় ঘড়িটার দিকে চোখ গেল। আর আমার সেই গির্জাটার কথা মনে পড়ে গেল।

আমি ধোঁয়াটে আলোর প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে হঠাৎ আবিষ্কার

করলাম, আমি সোজা হয়ে হাঁটতে পারছি না। সমস্ত শরীরটা যেন দু পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারছে না। আমি কেমন সামনে ঝুঁকে পড়ে নুয়ে-পড়া একটা ভারি মেরুদন্ড বয়ে নিয়ে চলেছি, একা এবং সম্পূর্ণ একা।

আমার মাথার মধ্যে তখনো সেই গির্জাটা, গির্জার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকা সেই গ্রাম্য মেয়েটি। যীশুর মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে যে বলে উঠেছিলো, কি সুন্দর, কি সুন্দর। আমি তখন শুধুই ঘড়িটার দিকে তাকিয়েছিলাম।

এখন আমি সেই মেয়েটির অভাব বোধ করছি। ট্রেনের কামরার সেই সুশ্রী মেয়েটির নয়। ঝুমঝুমির নয়। গির্জার সেই মেয়েটির জন্যে আমার বুকের ভেতরটা কেঁদে উঠছে।

আমি ধীরে ধীরে স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে এলুম। বেরিয়ে এসেই আমি অন্ধকার আকাশের দিকে তাকালাম। আকাশের দিকে তাকিয়ে তন্নতন্ন করে খুঁজলাম, গির্জার চূড়োটা তর্জনী তুলে যেখানটা দেখাচ্ছিলো, দেখাতে চেয়েছিলো। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না।

আর আমার কেমন নিঃসঙ্গ লাগলো, আমি নিঃশব্দ অন্ধকারের মধ্যে ডুকরে কেঁদে উঠলাম।

আর আমার মাথাটা কিরকম যেন টলে গেল। আমার মনে হলো, গির্জার চূড়োটা যেন আমি দেখতে পাচ্ছি, ওটাও নুয়ে পড়ে কেমন যেন টলছে। আর টলতে টলতে চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে প্রতিটি মানুষের দিকে তর্জনী দেখিয়ে বলছে, এবং তুমিও, এবং তুমিও, এবং তুমিও।

১৩৮৪



শেষ সংলাপ

একটা পাহাড় আছে। দূরে থেকে পাহাড়টা দেখতে সুন্দর। পাহাড়ের ওপর নানারকমের গাছ আছে। গাছের সবুজ খুব সুন্দর। তাকিয়ে দেখলে চোখ বেশ আরাম পায়। পাহাড়ের গায়ে ঢালু বেয়ে চৌকো চৌকো ক্ষেত আছে। কোথাও সবুজ শস্য শিশুমুখ নিয়ে হাওয়ায় দুলছে, কবে সোনালী হবে স্বপ্ন নিয়ে। কোথাও সরষের ক্ষেত, কিংবা অন্য কিছু, ক্ষেত জুড়ে যার হলুদ ফুল। হলুদ-হলুদ। আর মাঝে মাঝে ওগুলো ক্ষেত নয়। কিন্তু দেখে মনে হয়, কোনারক যেতে অতুল সেই যে পিপলিতে নানা রঙের তালি-মারা কাপড়ের থলি, জামা-কাপড় দেখেছিলো, অনেকটা সেইরকম। এক-এক খাবলা জমিতে কোথাও কালো-কালো বুনো ধান, কোথাও সিঁদুরে ডোবানো কাঁটাঝোপ, কোথাও হলুদ। ঢালা সবুজের মধ্যে ঐ ছিট-ছিট রঙের দোল তাকিয়ে দেখতে বড় সুন্দর লাগে।

কিন্তু অতুল ঐসব দেখে না। ও শুধু তাকিয়ে থাকে আর অপেক্ষা করে।

সেই মেয়েটির জন্যে।

অতুল মনে মনে তার নাম দিয়েছে গুণবতী, হয়তো ওটাই ওর নাম, ও নিজেও জানে না।

মেয়েটা খিলখিল করে হেসে উঠে প্রথম দিনে বলেছিলো, মুঝা নাম গুণৌতী। বাপে বুলান গুণৌতী, মাতি বুলান গুণোতী। হাসতে হাসতে বলেছিলো, তুঝা বোলন কোন্ নাম পসন্দ্?

অতুল কিছু বলতে পারেনি ওর কোন্ নাম পছন্দ, মেয়েটিকে কি নামে ডাকতে চায়।

কিন্তু মনে মনে নাম দিয়েছে গুণবতী। ওর মনে হয়েছে গুণৌতী নামটা আসলে গুণবতী থেকেই ভেঙেচুরে তৈরী হয়েছে।

ফেরার পথে মেয়েটা হাসতে হাসতে বলে গিয়েছিলো, নাম পায়ছুন্ ? এক মুহূর্ত পায়ের গতি থামিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে হেসেছিলো। রসিকতার ঢঙে বলেছিলো, আর কুছন পুছবিন, অ বাবু ? বলে হাসতে হাসতে ছোট্ট বালিচর নদীটার দিকে তরতর করে ছুটে গিয়েছিলো, অনেকখানি গিয়ে নৌকোয় উঠে পড়েছিলো। তারপর নৌকোটা ছেড়ে দিতেই হাত নেড়েছিলো হেসে গড়িয়ে পড়তে পড়তে, মুখে কিছু চিৎকার করে বলেছিলো কি না অতুল শুনতে পায়নি। কারণ ঘাটে দেহাতী মানুষজনের ভিড়, চিৎকার চেঁচামেচি ঝগড়া চলছিলো। সেই শব্দ বোধ হয় ওর গলার আওয়াজ ডুবিয়ে দিয়েছিলো। কিংবা গুণৌতী কোনো কথাই বলেনি, শুধু হেসে হাত নেড়েছিলো।

একটা পাহাড় আছে। দূর থেকে পাহাড়টা দেখতে বড় সুন্দর। পাহাড়টা বিছিয়ে আছে যেন একটা সুঠাম নারীর শরীরের ওপর চাদর টানা। চাদরটা পাতা-সবুজ, তার ওপর চোকো চোকো রঙের ছোপ কোথাও কোথাও, সিঁদুর, হলুদ, আর ঘন কালো। কিংবা একটা শাড়ি পরে কেউ যেন দোল খেলেছিলো, এখন ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। অতুলের মনের মধ্যে গুণৌতীর সমস্ত শরীর-মন আঁকা হয়ে আছে। চোখে লেগে আছে মেয়েটা। ও যেন ভুলতে পারছে না।

পাহাড় আছে, পাহাড়ের ওপর দিয়ে একটা রাস্তা আছে। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে রাস্তাটা নেমে এসেছে এই নদীর কাছ বরাবর। একটা নদী আছে, বেশ চওড়া নদী। বর্ষায় দু কূল ভাসিয়ে দেয়। তখন সে গুণৌতীর মতো ভরা যৌবনে খিলখিল হাসে, শরীর দোলায়, বুকের মধ্যে ক্ষত রেখে যায়। এখন শুকিয়ে খটখটে, বালির চর, বালি ডিঙিয়ে গিয়ে মাঝিঘাট। একটা ফেরি নৌকো আসে যায়। লোক পারাপার করে দেয়। দেহাতী লোকের ভিড়। কেউ হাটে যায়, দূরের বাঁশপাতিয়ার হাটে, হাট থেকে ফেরে। আর গুণৌতী কোথায় যায় অতুল জানে না। পাহাড়ের দিকে তাকাবার মন নেই অতুলের, নদীর দিকে তাকাবার মন নেই। ও অপেক্ষায় থাকে কখন গুণৌতী আসবে। আসে। খিলখিল করে হাসে, দুম করে বলে, কুছন কহবা নি ? অ বাবু।

অতুল হাসে, কথার জবাব দিতে পারে না। ওদের ভাষা ও জানে না। কত কি বলতে ইচ্ছে হয়, বলতে পারে না।

অতুল পাহাড় দেখে না, নদী দেখে না। কারণ ও একটি মেয়েকে দেখছে। গুণৌতীকে। তার চেয়ে সুন্দর আর কেউ আছে নাকি ?

প্রথম দিন দেখে ও অবাক হয়ে গিয়েছিলো। মাঝিঘাট থেকে নেমে বালির ওপর দিয়ে মেয়েটা আসছিলো, হেলে-দুলে, মাথায় একটা মাটির হাঁড়ি। শালপাতা দিয়ে ঢাকা। অতুলকে দেখে হেসে উঠে একটু দূর দিয়েই চলে গিয়েছিলো। কিন্তু ঐ দূর থেকে অতুল রসিকতার সুরেই ওর নাম জিগ্যেস করেছিলো। দূর থেকেই উত্তর দিয়ে মেয়েটা চলে গিয়েছিলো।

শরীরটা চোখে লেগে আছে, হাসিটাও।

কুচকুচে কালো শরীর। এমন কালো অতুল কখনো দেখেনি। সেই কালোর ওপর যেন প্রতিমার গায়ের ঘাম-তেল দিয়ে মাজা, এমন চকচকে কালো, যেন তেল চুঁইয়ে পড়ছে।

কিন্তু লম্বা একহারা গড়ন। সরু কোমরের নাভির কাছে এক বিঘত খোলা, পুঁতি-বসানো চোলি উঁকি দিচ্ছে, খাটো শাড়ির আঁচলটা কোনোরকমে বাঁ দিক থেকে ডান দিকের কাঁধে পৌঁছেছে। আর ঐ কোমরের থেকে শরীরটা ডমরুর মতো হঠাৎ যেন ফেঁপে উঠেছে। কোমর থেকে নীচের দিকটাও। যখন হেঁটে যায় সমস্ত শরীর যেন ডমরুর মতো বেজে ওঠে।

অতুল ক্যাম্পে ফিরে এসে ওর চাপরাসী গোবর্ধনকে বলেছিলো, এত সুন্দর চেহারা আমি কখনো দেখিনি রে। শালা বুকের মধ্যে কনকন কনকন।

গোবর্ধন ওর চাপরাসী, আবার বন্ধু। কারণ এই পাহাড়ে জঙ্গলে একমাত্র গোবর্ধনই বাঙালী।

গোবর্ধন ভয়ে ভয়ে বলেছে, একটু সাবধানে চলবেন স্যার, ওসব মেয়েরা বড় সাংঘাতিক।

কিন্তু এই সময়টা এই নদীর পাড়ে না এসে পারে না অতুল।

টানা-টানা চোখ, টিকোলো নাক, কি সুন্দর মুখশ্রী। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরী এই মেয়েটা। এত সুন্দরী হয়তো ওর ঐ ঘন কালো কুচকুচে রঙের জন্যেই।

কালো পাথরে তৈরী একটা নিখুঁত মূর্তির মতো সুন্দর।

—এই গুণৌতী, দাঁড়া, দাঁড়া। তোর সঙ্গে আমার কথা আছে।

মেয়েটা দাঁড়িয়ে পড়লো, হাসলো খিলখিল করে।

তারপর অতুলের দিকে তাকিয়ে যেন ভয় পেলো।

অতুল বললে, কাছে আয় না। আয়!

দপদপ করে পা ফেলে ও এবার একটু কাছে এগিয়ে এলো, ভয়ে ভয়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে অতুল তাড়ির গন্ধ পেলো।

গুণৌতী কাছে এসে দাঁড়ালো, কুছন কহবি?

অতুল কথা বলবে কি, ওর শরীরের দিকে তাকিয়ে আছে। মুগ্ধের মতো।

মেয়েটা জানে ওর শরীরে কি আছে। ইচ্ছে করেই যেন একটা কাঁপুনি দিলো। হেসে উঠে বললে, তু রতান দেখানি কবহু?

এরা মেয়েমানুষকে বলে রতান। এইটুকু বুঝলো অতুল। তাই কেমন লজ্জা পেয়ে গেল। ভাবলো, কথাটার মধ্যে একটা চাপা ভর্ৎসনা আছে। ও সঙ্কোচে চোখ নামালো।

তারপর বললো, তাড়ি নিয়ে যাচ্ছিস? তোকে চালান করে দেবো। বলে হাসলো।

মেয়েটা কেমন একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে ঠোঁট আর নাক বেঁকিয়ে বলে উঠলো, এঁঃ, গুণৌতী তুঝন ডরতাইন না। ঝট্ করে তাড়ির হাঁড়িটা মাথা থেকে নামিয়ে সামনে রাখলো মেয়েটা, দুটো হাত বুকের ওপর সাহসীর মতো আড়াআড়ি করে রেখে বেশ ধমকের ভঙ্গিতে বলে উঠলো, ভেজাউন তু, ফাটক ভেজাউন। অর্থাৎ চালান করে দে আমাকে, দেখি তোর সাহস।

অতুল হেসে ফেললো, হেসে উঠে নরম হতে চাইলো।

বোঝাতে চাইলো, ওর কাজ চোলাই কিংবা তাড়ি চালান বন্ধ করার নয়। ও শুধু মাপ-জোকের কাজে এসেছে। ক্যাম্পে থাকে। ও কখনো বাংলা কখনো হিন্দী কখনো কিছুটা সাঁওতালী ভাষা মিলিয়ে যতটা পারে বোঝাতে চাইলো। বুঝলো কি না কে জানে।

গুণৌতীর এই ভাষা ও কখনো শোনেনি। ওর এই রূপ কখনো দেখেনি।

—তুই কি সাঁওতালী জানিস?

মেয়েটা বললে, আম্না। অর্থাৎ, না।

—হিন্দী জানিস?

মেয়েটি বললে, কুছন কুছন।

—বাংলা বুঝিস না?

মেয়েটা হেসে উঠে বললে, আম্না।

অতুল বললো, তা তোরা কি?

মেয়েটা চুপ করে থেকে বললে, মিৎলানি।

অতুল জীবনে এরকম কোনো নাম শোনেনি। কি ভাষা বুঝতেও পারলো না।

হাটে, বাঁশপাতিয়ার হাটে মাঝে মাঝে এরকম ভাষায় কথা বলতে শুনেছে দু-চারজনকে। অস্পষ্টভাবে মানেগুলো বোঝা যায়। কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যায় না।

অতুলের বড় কষ্ট হচ্ছিলো ওকে মনের কথা বলতে পারছিলো না বলে।

মেয়েটা অতুলকে চুপ করে থাকতে দেখে কেমন যেন বিদ্রূপের হাসি হাসলো, তারপর ঝট্ করে হাঁড়িটা মাথায় বিঁড়ের ওপর বসিয়ে বললে, তু কি কহবান, শোচন রা।

ভাবতে থাক কি বলবি।

তারপর হাঁড়ি সমেত মাথাটা ঘুরিয়ে হাসতে হাসতে বললে, মুঝন লৌটবো কাল শুনাউবি।

অর্থাৎ ফেরার সময় আমাকে শোনাবি।

অতুলের মনে হলো এত সুন্দর মিষ্টি ভাষা ও কখনো শোনেনি। কিন্তু এমনি মিষ্টি ভাষায় কথা বলতে না পারলে কি ওকে মনের কথা বলা যায়?

সারা দিন ধরে অতুল ভাবলো কি বলবে ওকে, কিভাবে বলবে।

ক্যাম্পে এসে কাগজের ওপর কম্পাস লাগিয়ে নকশা কাটতে কাটতে চাপরাসী গোবর্ধনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ওর কেবলই মনে হচ্ছিলো কখন বিকেল হবে, কখন আবার গুণৌতীর সঙ্গে দেখা হবে।

ওর মনের মধ্যে একটা আশা জেগেছে।

এই ছত্রিশ বছরের শুকনো বুকে হঠাৎ যেন এই প্রথম এমন একটা ভালোবাসা জেগেছে, যা ব্যর্থ হবার নয়। যা একটুখানি ডাক দিলেই হাত বাড়াবে।

অতুলের মনে হলো ওর জীবন যেন সার্থক হতে চলেছে। যেন এর জন্যেই ও এতকাল অপেক্ষা করে ছিলো।

একটা কথাই ওর মাথার মধ্যে ঘুরছিলো, তু রতান দেখানি কবহু?

না, ও সত্যি কখনো মেয়ে দেখেনি। তেমনভাবে দেখেনি। ওর ভেতরটা সেজন্যেই মরু-ভূমির মতো হু-হু করে।

অতুলের প্রথমেই মনে হয়েছিলো কথাগুলোয় কেমন মৈথিলী টান আছে। কিন্তু মৈথিলী নয়। ও তো কত জায়গায় ঘুরলো, ক্যাম্পে ক্যাম্পে, তা ছাড়া মৈথিলীরা তো উজ্জ্বল ফর্সা, এমন কুচকুচে কালো কেউই নয়।

অতুল মনে মনে ভাবলো, রতান মানে কি রত্ন? রত্নই তো। এমন দুর্মূল্য রত্ন ও কখনো দেখেনি।

বিকেলে ঠিক ঐ জায়গায় এসে ও দাঁড়ালো।

অপেক্ষা করলো।

এমন সুন্দর পাহাড়, ওর দেখার চোখ নেই। এমন সুন্দর নদী, ওর দেখার ইচ্ছে নেই। পাহাড়ের গায়ে এত রঙ, কিন্তু ওর বুকের ভেতরেই এত অজস্র রঙ, ও ওসব দিকে তাকাবে কেন। অতুল দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ দেখলে মেয়েটা অনেক দূর দিয়ে চলে যাচ্ছে, এপাশ দিয়ে আসছেই না।

ওর বুকের ভেতরটা খাঁ-খাঁ করে উঠলো।

গুণৌতী কি ওকে এড়িয়ে যাচ্ছে? ও তো বলেছিলো, কি কথা বলতে চায় ভেবে রাখতে।

ভেবে রেখেছে অতুল।

কিন্তু মেয়েটা ওপাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে কেন? একটা ছবির মতো দেখাচ্ছে ওকে। একটা আঁকা ছবির মতো।

হাঁটু অবধি ঢেকেছে খাটো শাড়ি, দুখানি নগ্ন পা যেন নাচের ছন্দে এগিয়ে চলেছে। অতুলের মনে হলো ও দুটি পায়ে নূপুর পরিয়ে দিলে ওর মন ভরতো। দুখানা হাত দুলতে দুলতে চলেছে, সারা শরীরে যেন একটা ছন্দ বাজছে।

অতুল চিৎকার করে ডাকলো, গুণৌতী, গুণৌতী।

মেয়েটা বোধ হয় ফিরে তাকালো, কিন্তু এলো না।

বালির ওপর দিয়ে ও এবার হেঁটে যাচ্ছে। আর একটু পরেই হয়তো মাঝিঘাটে পৌঁছে যাবে, নৌকোয় উঠে ওপারে চলে যাবে। আর অতুলের বুকের ভিতরটা খাঁ-খাঁ করে উঠবে। অতুল তাই ভেবেছিলো।

কিন্তু বালির ওপর দিয়ে গিয়ে ঘুরে এসে ও এদিকেই বাঁক নিলো। তরতর করে এগিয়ে এসে অনেকখানি দূরে হাঁড়িটা নামিয়ে বালির ওপর বসে পড়লো।

আর সেখান থেকেই হাতছানি দিয়ে অতুলকে ডাকলো।

সঙ্গে সঙ্গে হেসে লুটিয়ে পড়ছে মেয়েটা, আর হাতছানি দিচ্ছে। এটা ঠাট্টা কি না অতুল বুঝতে পারলো না। ও তো এখন ওর কেনা গোলাম হয়ে গেছে। ঐ কুচকুচে কালো অপূর্ব সুন্দর মেয়েটা এখন যেন ওকে আঙুলের ডগায় নাচাতে পারে, কিংবা সকালের মতোই শাড়ি থেকে গুবরে পোকা ঝেড়ে ফেলার মতো আঙুলের টোকা দিয়ে ঝেড়ে ফেলতে পারে।

অতুল আর এখন একটা শিক্ষিত দাম্ভিক মানুষ নয়। চাপরাসী গোবর্ধনের স্যার নয়, তিন শো সত্তর টাকা মাইনে আর গড় আশি টাকা টি এ বিল করার আনন্দে আপ্লুত একজন চাকুরে মানুষ নয়।

অতুল ছুটতে ছুটতে গুণৌতীর কাছে পেঁাছে গেল।

একেবারে কাছে। আর তখন গুণৌতী তার কালো শরীরের ভাঁজে ভাঁজে লোভ নাচিয়ে লুটিয়ে লুটিয়ে হাসছে।

বলছে, রতান দেখানি তু? এত্তন বড়হ বাবু আদমি, রতান দেখানি?

হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালো ও। বললে, তু কি কহবান? সুহাগালি?

অতুল বললে, হাঁ। সুহাগ। তোকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি।

মেয়েটা হাসি-হাসি মুখে দু কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ালো।

যেন বলছে, রতান দেখানি তু? তা হলে দেখ আমাকে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ।

অতুল দেখলো। হাত-তাঁতের খাটো শাড়িটা কেমন কোমরের নীচে পাক দিয়ে ডান দিকের কাঁধে উঠেছে। আর বুকে একটা রঙিন গামছার মতো পুঁতি-বসানো চোলি মাঝখানে গিঁট দিয়ে বাঁধা।

অতুল কি বলবে কি করবে কিছু বুঝতে পারছে না। ও কেমন বোকার মতো হাসছে।

আর তখনই হাঁড়িটা মাথায় তুলে নিয়ে গুণৌতী হেসে উঠে পারের গাছগাছালির ভিড়ের দিকে আঙুল দেখালে। বললে, চলবানি, উধরিন সুহাগালি মিলবানি।

বলে হেসে উঠলো।

কোনো সঙ্কোচ নেই। কোনো লজ্জা নেই।

হাসতে হাসতে জঙ্গলটার দিকে এগিয়ে চললো মেয়েটা, আর পাশে পাশে অতুল।

এই একটাই নেশা অতুলের।

একটা পাহাড় আছে। দূর থেকে পাহাড়টা দেখতে সুন্দর। পাহাড়ের সুন্দর সবুজ। সবুজের ফাঁকে ফাঁকে কালো-কালো বুনো ধান, সিঁদুর রঙের বুনো কাঁটার ঝোপ, সরষের ক্ষেত হলুদ-হলুদ। অতুল ওসব দেখে না। একটা নদী আছে। এ সময় বালিচর হয়ে আছে, একটুখানি শুধু জল, একটা নৌকো সারা দিন আসে আর যায়। মাঝিঘাটে দেহাতী লোক ওঠে, সাঁওতালরা, হিন্দুস্থানী চাষী, বাঁশপাতিয়া হাটে যায়, রাখিয়ার ছোট্ট শহরে যায়, ফিরে আসে। বালি আর জল আর নৌকো। বড় সুন্দর। অতুলের প্রথম দিন মনে হয়েছিলো খুব সুন্দর, এই পাহাড়, এই নদী, এই জঙ্গল, এই সবুজ, এইসব দেহাতী মানুষ।

এখন আর ওর কোনো কিছু দেখার চোখ নেই।

ও শুধু অপেক্ষা করে।

কখন তাড়ির হাঁড়ি মাথায় নিয়ে গুণৌতী আসবে।

তাকিয়ে থাকে।

ঐ তো মাঝিঘাটের নৌকো থেকে নেমে সব দেহাতীদের ভিড় ওদিকের রাস্তা দিয়ে চলে গেল। গুণৌতী একা এ রাস্তা ধরে আসে।

একা। ওর কোনো বন্ধুও নেই হয়তো। সেই প্রথম দিন থেকে দেখে আসছে।

মেয়েটা এখন বোধ হয় অতুলকে ভালোবেসে ফেলেছে। ঠিক অতুলের মতোই।

হাটে যাবার সময় কিংবা ঐ ছোট শহর রাখিয়ায় যাবার সময় হাসতে হাসতে এসে দাঁড়ায়, কথা বলে, হাসে।

তারপর চলে যায়।

একদিন থমথমে মুখে বললে, তু কবহু চলবানি? দেশ যাবানি কবহু?

মেয়েটা জেনে গেছে অতুল এখানে সারা জীবন থাকবে না। চলে যাবে, কাজ শেষ হলেই চলে যাবে।

কি করে জানলো?

চলে যেতে হবে ও জানে, তবু অতুল এই সময়টার জন্যে অপেক্ষা করে।

ঐ সকালে যখন যায়, আর সন্ধেবেলায় যখন ফেরে।

জঙ্গলের ধারে একটা শালপাতার ছাউনি আছে। মাপজোকের কাজ হয়ে গেলে অতুল ওখানেই এসে বসতো আগে।

গুণোতী ফেরার পথে এসে গল্প করে, হাসে, কখনো কখনো অভিমান দেখায়। তারপর নিজেই ঐ ছাউনিটার দিকে এগিয়ে যায়। অতুলের বুক ভরে যায় এই একটা কালো কুচকুচে মেয়ের চোখে এই ভালোবাসা দেখে। একটা মেয়ে নিজেকে এভাবে বিলিয়ে দিতে পারে অতুল কোনো দিন ভাবতেও পারেনি। কিন্তু চাপরাসী গোবর্ধন অতুলের কাছে গল্প শোনে আর বলে, স্যার, একটু সাবধান। এদের কিছু বিশ্বাস নেই।

গোবর্ধন তো মেয়েটাকে দেখেনি। কোনো দিন মুখ ফুটে বলতেও পারেনি। অতুল তো ওর স্যার। তা ছাড়া গোবর্ধনের তখন নানান কাজ থাকে, স্যারের জন্যে নিজের জন্যে রান্না। তা ছাড়া কাজ হয়ে গেলে গোবর্ধন নিজেও এদিক-ওদিক ঘোরে। আর অতুলের গল্প শুনতে শুনতে সাবধান করে, আপনি স্যার শেষে এই পাহাড়ে জঙ্গলে...

হ্যা হ্যা করে হাসে গোবর্ধন।

অতুল বললে, চল গোবর্ধন, তুই বড্ড বাজে-বাজে কথা বলিস।

—কোথায় স্যার?

—মেয়েটাকে দেখবি। কুচকুচে কালো হয়েও যে এত সুন্দরী হয় আমি কখনো জানতাম না। কি ভালো যে মেয়েটা, দেখলেই বুঝবি।

সকালবেলায় সেইখানটিতে এসে দাঁড়ালো অতুল।

মাটির ওপর বসে পড়লো চাপরাসী গোবর্ধন। বাবুদের কত কাণ্ডই তো দেখতে হয়। ওকেও ঘাড় নেড়ে বলতে হবে, হ্যাঁ স্যার, খুব সুন্দরী।

দেখতে দেখতে মাঝিঘাটে নৌকো এসে থামলো। গুণোতী নামলো নৌকো থেকে। তেমনি হেলে-দুলে হেঁটে এগিয়ে আসছে, মাথায় তাড়ির হাঁড়ি নিয়ে।

অতুলের বুকের মধ্যে গর্ব। একটি মেয়ে তাকে ভালোবাসে। অতুল ওকে যতখানি ভালোবাসে তার চেয়ে বেশী।

ওর ভালোবাসা পাওয়ার পর অতুল যেন নিজেকে অন্যভাবে দেখছে। দেখতে শুরু করেছে।

কিন্তু গোবর্ধন হাসছে কেন?

—এই, চুপ কর। তুই হাসলে ও আসবে না।

মেয়েটা তরতর করে এগিয়ে আসছে। ও বোধ হয় দেখতে পায়নি, একটু দূরে গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে চাপরাসী গোবর্ধন বসে আছে। মেয়েটা ওর সুন্দর শরীর থেকে যৌবন ঝরিয়ে ঝরিয়ে তরতর করে এগিয়ে আসছে। কাছে এসে গেছে।

আর চাপরাসী গোবর্ধন হো হো করে হেসে উঠলো, স্যার, স্যার, এটা খারাপ মেয়ে, *খারাপ মেয়ে। ও তো বাঁশপাতিয়া হাটে বসে। ওর কাছে কে যায় না স্যার,* কিছু মনে করবেন না, আমিও একদিন...

অতুল প্রচণ্ডভাবে রেগে গেল চাপরাসী গোবর্ধনের ওপর। চিৎকার করে উঠলো, চুপ কর হারামজাদা, মিথ্যে কথা বলিস না।

আর তখন গোবর্ধন বলছে, ওকেই জিগ্যেস করুন স্যার।

কিন্তু ততক্ষণে গোবর্ধনকে দেখে ফেলেছে মেয়েটা। দেখেই তরতর করে অন্য পথ ধরে চলে গেছে।

এদিকে আসেইনি। দাঁড়ায়নি।

—দেখুন স্যার, দেখুন। চিনতে পেরেছে আমাকে। আপনাকে অ্যাদ্দিন ঠকিয়েছে।

অতুল তখন আর ডাকতেও পারছে না। গুণোতী নামটা ওর মুখে আসছে না।

ধীরে ধীরে অতুল মাটির ওপর ধপ করে বসে পড়লো। বুকের ভিতরটা একেবারে শূন্য হয়ে গেছে।

অতুল ভাবলো, আমার কাছে এই সুন্দর পাহাড় ছিলো না, এই সুন্দর বালিচরের নদী ছিলো না, এই সবুজের বন্যা ছিলো না, ঐ কালো-কালো বুনো ধানের ক্ষেত, হলুদ সরষের

ক্ষেত, বুনো কাঁটাঝোপের সিঁদুর, কিছুই ছিলো না। একটা সুন্দর অপেক্ষা ছিলো। একটা সুন্দর ভালোবাসা। এখন আর কিছুই নেই।

চাপরাসী গোবর্ধন তখনো বলছে, শালী সবারই কাছে পয়সা নেয় স্যার। আপনার কাছে কিছু নিতো না? আপনি বুঝতে পারেননি?

অতুল বললে, না রে গোবর্ধন, ও আমাকে ভালোইবাসে। কখনো কিছু চায়নি। কিন্তু আমাদের ভালোবাসা তুই এমনি করে ভেঙে দিলি!

গোবর্ধন তখনো হাসতে হাসতে বলছে, স্যার, ভালোবাসা হলে ভাঙবে কেন?

আর অতুল বুঝতে পারছে না, ওর সুন্দর জীবনটা হঠাৎ এভাবে শেষ হয়ে গেল কেন। ও তো ভালোইবাসতো, কিন্তু ভালোবাসা হলে ভাঙবে কেন!

অতুল উত্তরটা কিছুতেই খুঁজে পায় না। কিন্তু ও বেশ বুঝতে পারে ওর মধ্যে এখন শুধু শরীরটাই রয়ে গেছে, ভালোবাসাটা একেবারে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেছে। হয়তো গুণোতীর ভালোবাসাও। কারণ ঐ হারামজাদা গোবর্ধন যেন একটা পাথরের টুকরো ছুঁড়ে ওর মাথার হাঁড়িটা টুকরো টুকরো করে ভেঙে দিয়েছে।

| ১৩৮৫

আরো কয়েকটি



এক খিলি মিঠে পান

বাবুলালের সংগে আমার প্রথম আলাপ আজ থেকে পনরো বছর আগে। আমার বয়সের অংকটা তখন ঠিক কৈশোরের শেষ ধাপে। কিংবা সেটাকে যৌবনের প্রথম ধাপও বলতে পারো।

একটা রেলের কলোনিতে ছিলাম আমি। আমি আর বাবুলাল দুজনেই। একটা মিঠাইয়ের দোকান ছিলো ওর, আর সেই সূত্রেই ওর সংগে আলাপ গড়ে উঠেছিলো।

অনেক নগর নদী অতিক্রম করে পনরো বছর পরে হঠাৎ নিজেকে আবিষ্কার করলাম শহর কলকাতায়। আর বাবুলালকে আবিষ্কার করলাম এক নামজাদা সড়কের মোড়ে একটি পানের দোকানে। মিঠাই থেকে ঠাঁই বদলে বাবুলালও নাকি ঘুরেছে অনেক জায়গায়। সারা যুদ্ধটা কাটিয়ে এসেছে কাপড়ের কলে, তেলের আড়তে, চালের গুদামে। বেশ কিছু টাকা জমিয়ে জাঁকিয়ে বসেছে একটা পানের দোকান।

আমার আবাস থেকে ওর দোকানটা যে অনেক কাছে, শুধু সেই কারণেই নয়, আমার সান্ধ্য-আড্ডায় যাবার পথেই ওর দোকানটা। তাই নিত্যদিনের মতো এক খিলি মিঠে পানের নেশায় ওর দোকানের উদ্দেশে চলেছিলাম। হাতে ছিলো একটা না-ধরানো সিগারেট। পকেটে একটি ডবল পয়সা—এক খিলি মিঠে পানের দাম। বাবুলালের দোকান থেকে একটি মিঠে পান কিনে মুখে পুরে তারপর তারই দোকানের দড়িতে সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে সান্ধ্য-আড্ডার দিকে পা চালাবো এই ছিলো ইচ্ছে।

চেনা-অচেনা বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে সত্যিকারের মানুষ দেখেছি খুব অল্প। বাবু-লালের মতো হয়তো একজনকেও না।

পনরো বছর আগেকার একটা ঘটনা আমার আজও মনে আছে, এবং থাকবেও হয়তো বাকী জীবনটা।

ইস্কুলের ছাত্র আমি তখন, অতএব সংসারের একমাত্র বেয়ারা। কি যেন একটা পুজোর দিন। আমাকে আসতে হলো বাবুলালের দোকানে। পাঁচ সিকের সন্দেশ কিনে নিয়ে যাবার জন্যে।

সন্দেশের ঠোঙাটা হাতে করে বাবুলালের দোকান ছেড়ে ঠিক পথের ওপর এসে দাঁড়িয়েছি আর সংগে সংগে একটা চিল এসে মারলে ছোঁ।

পথের ধুলোয় গড়াগড়ি খেলো সন্দেশের ঠোঙাটা।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে ছিলাম অনেকক্ষণ। ঠিক যেন বুঝতেই পারিনি কি হয়ে গেল।

সংসারের অনেক কিছু করেও নিষ্কর্মার প্রতীক হতে হয় যে বয়সে, আমার তখন সেই বয়স। অতএব বুঝতেই পারো, এর প্রতিফল কল্পনা করে আমার চোখে জল এসেছিলো কি না।

এমন সময় দেখলাম বাবুলাল তার দোকান থেকে হাসি-মুখে এগিয়ে আসছে।

—কি হলো খোকাবাবু?

জবাব দিতে পারলাম না।

বাবুলাল বললে, এসো খোকাবাবু, আবার মিঠাই লিয়ে যাও হামার দোকান থেকে।

বললাম, টাকা তো নেই আর।

উত্তর এলো, ও কি তুমার দোষে নষ্ট হয়েছে? লিয়ে যাও তুমি। পয়সা লাগবে না।

এবং তারপর সত্যিই এক ঠোঙা সন্দেশ বিনা পয়সায় দিয়েছিলো বাবুলাল।

সেই বাবুলাল আজ পনরো বছর পরে শহর কলকাতায় এক নামজাদা সড়কের মোড়ে পানের দোকান দিয়েছে।

একমাত্র সম্বল ডবল পয়সাটা বাবুলালের হাতে দিয়ে বললাম, এক খিলি মিঠে পান।

সযত্নে পানটা সেজে একটু সুগন্ধি সংযোগ করে আমার হাতে দিতে গেল বাবুলাল। পাশা-পাশি লোকের ভিড়ে হাতটা নড়ে যেতেই পানটা নিচে পড়ে গেল।

পানটা হাত থেকে পড়ে যাওয়ার জন্যে দায়ী কে, ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমার নিজেরও

দোষ হতে পারে। হতে পারে বাবুলালের।

আমি মুখ তুলে বাবুলালের দিকে তাকালাম।

বাবুলালও তাকালো মাটিতে-পড়া পানটার দিকে।

তারপর যথারীতি পান সেজে অন্যান্য খদ্দেরদের দিকে মনোযোগ দিলে।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম আমি। না, বাবুলালের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই এদিকে।

অকারণে একবার পকেট হাতড়ালাম। তারপর ধীরে ধীরে আড্ডার পথ ধরলাম। একটা মিঠে পানের অভাবে মনটা বিতৃষ্ণায় ভরে গেল।

না, মনে হলো না, বাবুলাল মানুষ বদ্‌লে গেছে। শুধু বুঝতে পারলাম, একটা সত্যিকারের যুদ্ধ অতিক্রম করে এসেছি আমরা। টাকার মর্ম বুঝতে শিখেছি। আর। আর প্লাবনের পরে পলিমাটিই জমে না, পাঁকও জমতে পারে।

[১৩৫৫

ত্রিকোণমিতি

হরকিষণলাল ড্যাডাংডোরিয়া এখনো আসেননি। কাজের মানুষ, এখন তো আবার কাজ বেড়েছে। তাই টাইম্‌লি এসে পৌঁছনো তাঁর পক্ষে সম্ভবও নয়।

মিস্টার মীটার ওরফে মিত্তর সাহাব ঘন ঘন ঘড়ি দেখছেন—হাতঘড়ি, আর অধৈর্য হয়ে সিগারেট টানতে টানতে পায়চারি করছেন। মাঝপথে ভাঙা জীপটা খারাপ হয়ে গিয়েছিলো বলে বেশ খানিকটা হেঁটে আসতে হয়েছে। ট্যাক্সির জন্যে অপেক্ষা করতে পারেননি, করলেও পেতেন না, জানেন তিনি। তবু তাঁর পক্ষে ট্যাক্সির জন্যে অপেক্ষা করাই রীতি, এবং অপেক্ষা তিনি করতেনও। পারেননি, বিলেত বেড়িয়ে আসার গুরুভার কাজের ফাঁকে সুইজারল্যাণ্ড থেকে সস্তায় কিনে আনা দামী হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে। অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে।

মীটিং শুরু হতে আর মাত্র তিন মিনিট দেরি তখন, তাই একরকম ছুটতে ছুটতে, টেরিলিনের শার্টের নীচে ঘামতে ঘামতে এসেছেন। ভেবেছিলেন, হরকিষণলাল ড্যাডাংডোরিয়া ঠিক সময়মতো এসে অপেক্ষা করবেন, দেরি দেখে হয়তো একটু বাঁকাভাবে বলে বসবেন, না, এখন আর টাইম ইজ মানি বলবেন না; হয়তো শুধুই বলবেন, টাইমের দাম এখন বহুত মিত্তর সাহাব, লড়াইয়ের টাইম এটা।

কিন্তু আশ্চর্য, এসে দেখলেন, হরকিষণলালের মুনশী মগনরাম চেয়ার-টেবিল ঝাড়ছে, আর এক পাশে গুটিসুটি হয়ে বসে আছে রন্তু মিস্ত্রী। দেখে বুঝলেন, সে বেশ কিছুক্ষণ আগেই এসেছে।

লোকটার দিকে তাকিয়ে মিস্টার মীটারের একটু যে হাসি না পেলো তা নয়। অনভ্যস্ত পায়ে নতুন জুতো, মাথায় ট্যারা টেরি, বুকপকেটে উঁকি দিয়ে আছে লাল রুমাল। অন্য সময় হলে অপ্রয়োজনে একটা কথাও তার সঙ্গে বলতেন না তিনি। এখন শুধু দৃশ্য নয়, অঙ্ক বদল হয়েছে। তাই নিঃশব্দে এক টুকরো পরিচয়ের হাসি নিবেদন করে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন।

রন্তু মিস্ত্রী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলো তাঁকে দেখতে পেয়েই, এবার দুখানা হাত বাড়িয়ে মিত্তর সাহাবের একখানা হাত চেপে ধরলো।

মিত্তর সাহাব তাকে বসতে বললেন, রন্তু মিস্ত্রী বসলো। মিস্টার মীটার কিন্তু বসলেন না। বসেননি। তখন থেকেই একটার পর একটা সিগারেট শেষ করেছেন, আর অধৈর্য হয়ে পায়চারি করেছেন।

হাতঘড়িটা চোখের সামনে তুলে দেখতে যাচ্ছেন আবার, এমন সময়ে বাইরে সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি বাজিয়ে গাড়ির হর্ন বাজলো।

রন্তু মিস্ত্রী ঘাড় বেঁকিয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে আবার ঘাড় সোজা করলো। বসে রইলো যেমন বসে ছিলো, তেমনি।

কিন্তু মিস্টার মীটার ছুটে গেলেন বারান্দার দিকে। বিরাট আকারের দামী নতুন ঝকঝকে গাড়ি-খানা এসে থামলো। গাড়ির ডান দিকে পাঁচ হাত লম্বা চকচকে সরু এরিয়াল স্টিক, ট্র্যানসিস্টার রেডিওর। গাড়িটা থামতেই সেটা বারকয়েক নড়ে উঠলো রাগী হেডমাস্টারের হাতের সরু লিকলিকে একটা বেতের মতো।

মুনশী মগনরাম তোয়ালে কাঁধে ফেলে ছুটে এলো, ড্রাইভার স্টীয়ারিং ছেড়ে বেরিয়ে এলো, তারপর গাড়ির দরজা খুলে দুজনে ধরাধরি করে হরকিষণলাল ড্যাডাংডেরিয়াকে নামতে সাহায্য করলো।

বিরাট বপু এবং বিরাটতর ভুঁড়ি নিয়ে হাঁসফাঁস করতে করতে নামলো হরকিষণলাল। তারপর পাতিহাঁসের মতো পা ফেলে ফেলে তিন ধাপ সিঁড়ি পার হয়ে ঘরের এক পাশে রাখা তোশক-বিছানো চৌকিটায় বসলো। হাতপাখা নাড়লে। তারপর নিজের মনেই বললে, শালা নুভেম্বর মাহিনা চলছে, যেন মারচ্-আপ্রেলের গরম।

অন্য সময় হলে রন্তু মিস্ত্রী অস্ফুটে বলতো, রুপেয়ার। আজ আর কিছু বললে না।

এদিকে হাতপাখা নামিয়ে রেখে হরকিষণলাল যেন হঠাৎ এই প্রথম মিস্টার মীটারকে দেখতে পেলো এমন স্বরে বলে উঠলো, আরে মিত্তর সাহাব, বসেন, বসেন। আরে এ মগনরাম...

মগনরামকে আসতে হলো না, মিস্টার মীটার নিজেই চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলেন। এত দেরিতে আসার জন্যে হরকিষণলালের কোনো লজ্জা বা দুঃখ নেই, এতটুকু ক্ষমাভিক্ষার ভঙ্গিও নেই দেখে চটছিলেন মনে মনে, সে রাগটা চেপে রেখেই বসলেন।

আর সঙ্গে সঙ্গে রাগে কেঁপে কেঁপে উঠলো হরকিষণলাল, প্রায় চিৎকার করে বললে, রন্তু বাবু, মিত্তর সাহাব, আমাদের এতো দিন বহুত ঝগড়া ছিলো, কিন্তু আজ হামরা এক হয়ে শালা দুশমনকে হটাবো—এই একটা বাত আছে। হামাদের এই গঙ্গা মাঈকি দেশ—এ দেশ রন্তুবাবুর আছে, মিত্তর সাহাবের আছে, হামার ভী আছে।

রন্তু মিস্ত্রী চুপচাপ ঘাড় নাড়লে। আর মিস্টার মীটারের বুকের ভার সরে গেল। ভাবলেন, উত্তেজনায় এবং শত্রুর বিরুদ্ধে রাগে মনে মনে গজরাচ্ছিলেন বলেই হরকিষণলাল স্বাভাবিক ভদ্রতা-বোধটুকুও ভুলে গেছেন। তা না হলে যিনি একটা সামান্য চিঠি রেকমেন্ড করে দিল্লীতে পাঠিয়ে দেবার জন্যে মিস্টার মীটারকে এত তোষামোদ করতেন তিনি কি স্বেচ্ছায় এতখানি অভদ্র হতে পারেন যে, কতক্ষণ থেকে এসে অপেক্ষা করছেন সে প্রশ্নটুকুও করলেন না!

হরকিষণলালের বিরাট বপু আবার কেঁপে কেঁপে উঠলো। বললে, দেখুন রন্তুবাবু, হামরা যদি শান্তিসে কাজ করতে পারি, প্রোডাকশান ডাবল কি ট্রাবল করতে পারি, তো ও দুশমন...

কথা শেষ করতে না দিয়ে রন্তুবাবু বললে, ঠিক কথা, কি করতে হবে বলুন।

হরকিষণলাল এবার মৃদু হেসে বললে, দেখেন রন্তুবাবু, আপনি ভী জানেন, মিত্তর সাহাব ভী জানেন কি ফেক্‌ট্রি হামার নামেই আছে, আসল বাত উ ফেক্‌ট্রি আপনার আর মিত্তর সাহাবের। এখোন, ই লড়াইয়ের সময় আপনার সো পাওয়ার আছে কি একদিনে বার্কারদের হুকুম দিয়ে...

রন্তু মিস্ত্রী ধীরে ধীরে বললে, ভয় নেই শেঠজী, ওয়ার্কারদের এখন স্ট্রাইক করতে বললেও তারা করবে না, সে পাওয়ার আমারও নেই।

শেঠজী হেসে উঠলো—এ কি বলছেন রন্তুবাবু, আপনার পাওয়ার নেই? এ তো মিত্তর সাহাব ভী বিশোয়াস করবেন না।

রন্তু মিস্ত্রী চুপ করে রইলো কয়েক সেকেন্ড, তারপর বললে, ওয়ার্কাররা আমাকে বলতে বলেছে, লড়াইয়ের জন্যে তারা ডবল খাটবে, একটা পয়সাও বেশী মাইনে চাইবে না, বোনাস চাইবে না— যতদিন না লড়াই শেষ হয়।

হরকিষণলাল প্রথমটা যেন বিশ্বাস করতেই পারলো না, তারপর হঠাৎ আবেগের ধাক্কায় উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলো।

চোখ দিয়ে প্রায় আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ার যোগাড় হলো হরকিষণলালের। হাতলঅলা বড় চেয়ারটায় শরীর এলিয়ে দিয়ে আবেগ চাপতে চেষ্টা করলো হরকিষণলাল, তারপর বললে, হামি ভী কথা দিচ্ছি, লিখে লিন, লিখে লিন মিত্তর সাহাব, কি হামার ফেক্‌ট্রিতে লাখ লাখ রুপেয়া ভী যদি লোকসান হোয় তব ভী একটা লেবারকেও হামি ছাঁটাই করবো না, একটা নয়া পয়সা ভী বার্কারদের কম দিবো না।

একটু থেমে বললে, ফেক্‌ট্রি তো রন্তুবাবুর আর আপনার, মিত্তর সাহাব। গোরমেণ্ট টেক্স লিবে, আর লেবারকে ওয়েজ দিবো—হামার তো শ্রেফ...মগজে আঙুল ঠুকে হরকিষণলাল বললে, শ্রেফ এটা গরম হোবে। শালা দুশমন হামার গঙ্গা মাঈকি দেশের সত্যনাশ করবার জন্যে...লিখে লিন, লিখে লিন মিত্তর সাহাব—

মিস্টার মীটার আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, ঠিক আছে, কথা তো হয়ে গেল, ড্রাফট রে টাইপ করিয়ে পরে সই করিয়ে নিলেই হবে।

সঙ্গে সঙ্গে হরকিষণলালের চর্বি-থলথলে হাত দুখানা হতাশায় চেয়ারের হাতলের ওপর থপ রে পড়ে গেল। বললে, আপনি ভী স্রেফ গোরমেণ্ট হয়ে গেলেন—টাইপ-উইপ কুছ কাজের বাত নাই মত্তর সাহাব। উ দেখুন চু য়ান লাই তো সব মেকমোহন একমোহন মানে লিয়ে তব ভী বললো কি ব তো ঠিক আছে লেকিন একটা বাত আছে...বাস্‌্ এখোন বলে মেকমোহন ভী মানি না।... আরে না, না, রন্তুবাবু তো চু য়ান লাই নয়, লেকিন হামি তো কাল বিগড়ে যেতে পারি...বলে ফ্যাক-ফ্যাক করে হেসে উঠলো হরকিষণলাল। শুধু মুখটা নয়, মেদবহুল সারা শরীরটাই তার হেসে উঠলো হাসির গমকে গমকে।

সুতরাং মিত্তর সাহাবকে ফোলিও ব্যাগ থেকে কাগজ-কলম বের করে একটা খসড়া বানাতে লো, এবং তিনজনেই তার পায়ে সই দিলো।

সই হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মগনরাম দু গ্লাস শরবত আর দু প্লেট লাড্ডু এনে রাখলো।

মিত্তর সাহাব দুটোই সরিয়ে দিলেন, এই ঠাণ্ডায় সরবত? হাসলেন তিনি।

আর রন্তুবাবু শরবতটা চোঁ করে খেয়ে নিলো।

হরকিষণলাল হাসতে হাসতে বললে, লড়াই যখোন হোবে তখোন আমরা সব এককাট্টা, বুঝলেন মিত্তর সাহাব। নাফা হলে রুপেয়া ভী গোরমেণ্টকে দিব, লুকসান হচ্ছে বলে ছাঁটাই ভী করবো না। উ বিজলী যে বাত্তি জ্বালায়, উ একটা নেগেটিভ আউর একটা পাজিটিভ, ঠিক না রন্তুবাবু?

রন্তু মিস্ত্রী বললে, হ্যাঁ, তা তো ঠিকই শেঠজী। তা হলে আমরা নেগেটিভ, আর আপনি পজিটিভ—দুজনে মিলে দুশমনকে হটিয়ে দেবো...কি বলেন?

হরকিষণলাল সজোরে মাথা নাড়লো।—এ দেখুন, ফির ভুল করছেন রন্তুবাবু, একটা আর্থ লাগে না কারিণ্টে? আর্থ না থাকলে তো সব লেকট্রোকিট হয়ে যাবে—মিত্তর সাহাবের গোরমেণ্ট ওই আর্থ আছে, বুঝলেন না।

রন্তু মিস্ত্রী আর মিস্টার মীটারের মুখে এবার হাসি দেখা দিলো।

মিস্টার মীটার বললেন, আপনি বিজনেস করলে কি হবে মিস্টার ড্যাডাংডেরিয়া, আপনি দেখছি পোয়েট—পোয়েট হরকিষণলাল!

হরকিষণলাল খুশিতে হাসলো।

আর রন্তু মিস্ত্রী বললে, তা হলে শেঠজী, আমরা ওয়ার্কাররা নেগেটিভ, আর আপনি পজিটিভ মলে—মানে মিত্তর সাহেবের আর্থ লাগিয়ে এখন শুধু বিজলী বানাবো দুশমনকে দেশ থেকে হটাবার জন্যে। কি বলেন?

—জরুর!

—ঠিক আছে। বলে উঠে দাঁড়ালো রন্তু মিস্ত্রী। তারপর বললে, নমস্তে।

হরকিষণলালও 'নমস্তে' বলে উঠে দাঁড়ালো।

রন্তু মিস্ত্রী দু পা গিয়েই ফিরে দাঁড়ালো। বললে, সারা দেশ এতদিন নেগেটিভ ছিলো শেঠজী, কন্তু এখন পজিটিভ হয়ে যাচ্ছে, এই বড় তাজ্জব!

বলেই দ্রুত পায়ে রন্তু মিস্ত্রী বেরিয়ে গেল।

আর হরকিষণলাল তার কথাটা বুঝতে না পেরে একবার মিস্টার মীটার একবার মগনরামের খের দিকে তাকিয়ে শেষে বলে উঠলো, চলুন মিত্তর সাহাব, হামার গাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যাবো পনাকে।

বলে থপথপ করে বিরাট ঝকঝকে গাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল, পিছনে পিছনে মিস্টার মীটার।

গাড়ি স্টার্ট দিলো। ট্র্যানসিস্টার রেডিওর চকচকে সরু এরিয়াল স্টিকটা বেতের মতো সপাং পাং করে নড়ে উঠলো।

আর নরম গদিতে গা এলিয়ে হরকিষণলাল বলে উঠলো, বুদ্ধু!

কার উদ্দেশে কথাটা বললে বোঝা গেল না।

মিস্টার মীটার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, বড় ভয় ছিলো শেঠজী!

—জরুর। হামি তো ভেবেছিলাম কি দেশের লিয়ে, হামার গঙ্গা মাঈকি দেশের লিয়ে ওরা ছ সেক্রিফাইস করবে না...বলবে এতো পার্সেণ্ট ওয়েজ বাড়াও, বোনাস দাও...

মিস্টার মীটার হেসে বললেন, না, তা নয়। আমি ভেবেছিলাম হয়তো বলে বসবে, ওয়েজ বাড়াতে বে না, কিন্তু আপনাকে বলবে সিক্সটি ওয়ান-সিক্সটি টু-র ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন যা দিয়েছেন তার পর যা লাভ হবে সব ডিফেন্স ফাণ্ডে দিতে হবে।

হরকিষণলাল বোকার মতো চেয়ে রইলো মিস্টার মীটারের মুখের দিকে। যেন দুর্বোধ্য হাস্যকর

একটা কথা বলেছেন তিনি।

তারপর ধীরে ধীরে বললে, এ কি একটা বাত হলো মিত্তর সাহাব, এতোটা বুদ্ধু নয় বার্কারেরা। লড়াইয়ের জন্যে প্রোডাকশন বাড়াতে হবে, তো প্রোডাকশনের জন্যে—ওই যে ইনসেণ্টি বলেন আপনারা, উ ইনসেণ্টিভ তো হামাদের দিতে হোবে।

মিস্টার মীটার আরো কি বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই ঘ্যাঁচ করে হরকিষণলালের গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেল। সামনে একটা ট্যাক্সি থেমে পড়েছে।

গাড়ির ভিড়ে এদিক-ওদিকে কোথাও বেরিয়ে পড়ার রাস্তা না পেয়ে ড্রাইভার হর্ন দিলো।

আর পিছন থেকে হরকিষণলাল চিৎকার করে উঠলো, আরে এ উল্লু কি টেক্সি, হট যাও, হট যাও।

ট্যাক্সিটা ভয়ে ভয়ে সরে গিয়ে পথ করে দিলো। সোঁ করে বেরিয়ে এসে হরকিষণলালের চেহারার মতোই তার বিরাটবপু গাড়িখানা দাঁড়ালো মিস্টার মীটারের আপিসের সামনে।

মিত্তর সাহাবকে নামিয়ে দিতে দিতে হরকিষণলাল বললে, শালা এ যে টেক্সি হয়েছে না মিত্তর সাহাব, সব সত্যনাশ করে দিলো। লড়াই কে করবে বলুন; সব তো টেক্সি চড়বে!

বলতে বলতেই হরকিষণলাল দু হাত জোড় করে বললে, নমস্তে।

মিস্টার মীটারও দু হাত তুলে 'নমস্তে' বলে আপিসের দিকে চলে গেলেন।

গাড়িটা আবার চলতে শুরু করতেই হরকিষণলাল নিজের মনেই আরেকবার বলে উঠলো, বুদ্ধু!

কথাটায় সায় দিয়েই হয়তো নড়ে উঠলো এরিয়াল স্টিকটা। হেডমাস্টারের হাতের বেতের মতো।

[১৩৭২



বুকের মধ্যে ভূমিকম্প

বয়স তখন উনিশ। দক্ষিণের ও তল্লাটে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আমরা প্রেসিডেন্সি কলেজের তিন-চারটি বন্ধু কাছাকাছি থাকতাম, লেকের ধারে আড্ডা দিতাম। আর হঠাৎ কখনো সুন্দর চেহারার মেয়ে দেখলে, তার চোখে চোখ পড়লে বুকের ভেতরটা কেমন কেমন করে উঠতো।

তখন পুজোর সময় এত ভিড় ছিলো না, দিব্যি এ-প্যাণ্ডেল থেকে ও-প্যাণ্ডেলে বেড়াতে বেড়াতে যাওয়া যেতো। সেদিনও প্রতিমা কিংবা সুন্দর মুখ দেখতে বেরিয়েছি তিন-চারজনে। সাদা কথা, প্রতিমা আমরা দেখতাম না, প্রতিমার মতো মেয়েদের দেখতাম। গল্প করছি, হাঁটছি, কিংবা জোর তর্ক চলেছে নিজেদের মধ্যে। কিন্তু চোখ দুটো গোয়েন্দাগিরিতে ব্যোমকেশ, হাজার ভিড়ের মধ্যে উৎকৃষ্ট সুন্দরী কোনো তরুণীকে এক লহমায় খুঁজে বের করে ফেলে। আর সেই সুতনুকা মেয়েটি যদি বাই-চান্স ফিরে তাকায়, চোখাচোখি হয়ে যায় কোনোক্রমে তা হলে নির্ঘাত হৃদয়কম্প, বুক থরথর করে ওঠে। সাত দিন তার স্বাদ লেগে থাকে বুকের মধ্যে। একজনের কথা তো বছরখানেক মনে ছিলো। আরেকজনের কথাই বলছি, তার কথা আজও ভুলিনি।

একটা পুজো-প্যাণ্ডেলে বেশ ভিড়। স্মৃতির কৌটোয় কালেকশন বেশ ভালোই হবে মনে করে তিন-চার বন্ধুই এগিয়ে গেলাম। আর এক পলকের মধ্যেই আমার চোখ পৃথিবীর এইট্থ্ ওয়ান্ডার আবিষ্কার করে ফেললো। কাছাকাছি কোনো গ্রাম-ট্রাম থেকে একটা দল এসেছে, বুড়ী-বুড়ো, মাঝ-বয়েসী, বউ। স্টকিং আর ফিতে-বাঁধা জুতো পায়ে এক গেঁয়ো বাবুও আছেন। কিন্তু তার মধ্যে একটি অসাধারণ সুন্দরী কিশোরী মেয়ে। না-খুব-সাদাসিধে একখানা ডুরে শাড়ি, কপালে লাল টিপ, কিন্তু সমস্ত শরীর বেয়ে যেন লাবণ্য ঝরছে। মুখের ওপর বর্ষার সবুজ ঘাসের, শান্ত দিঘির, নির্জন শালিকের ছায়া। আমার উনিশ বছরের চোখ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো। আর ঠিক সেই মুহূর্তে পিছন ফিরে তাকালো মেয়েটি। চোখাচোখি হতেই আমার বুক কেঁপে উঠলো। মনে হলো এমন সজল স্নিগ্ধ রূপ আমি কখনো দেখিনি। পরমুহূর্তেই মেয়েটি আবার ফিরে তাকালো, আবার চোখাচোখি হলো। সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকের মধ্যে ভূমিকম্প হলো।

কারণ, দ্বিতীয়বার তাকানোর পরই শহরভীরু মেয়েটি দু কানের লতিতে দু হাত ঠেকিয়ে

কানের মাকড়ি সামলালো।

কোনো মেয়েই বোধ হয় কোনো ছেলেকে এর চেয়ে বেশী অপমান করতে পারে না। বুকের মধ্যে ভূমিকম্প সেজন্যেই।

তারপর থেকে আমি আর কোনো মেয়ের দিকে ভালো লাগার চোখ নিয়ে তাকাতে যাইনি। আমি জানি, যে-কোনো ছেলে যখন আজও ভালো লাগার বা ভালোবাসার চোখ নিয়ে কোনো মেয়ের দিকে তাকায়, তখন মেয়েটি দু হাতে তার সোনার মাকড়ি দুটি সামলাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

[১৩৭৭

ফিরে তাকাই

আমি, অজিত আর হানু। খুব ফর্সা সব-চুল-পাকা বাবাটা, মোটাসোটা মা, রাগী আর ঝগড়াটে একটা দাদা, দুটো বোন, একটা ওর পিঠোপিঠি, একটা পুচকে। একটা কাবলিওয়ালা, একজন মাঝ-বয়সী ভদ্রলোক, তার মাঝবয়সী গিন্নী। দুজন খাকী পোশাকের মাদ্রাজী, আধা-মিলিটারি কোনো কাজ করে। আরো কে কে যেন ছিলো। সবাই অবান্তর। আসলে ঐ পিঠোপিঠি দু বোনের মধ্যে যাকে চুন্নী বলে ডাকলো দাদাটা সেই আসল।

বললে, স্যুটকেসটা বাঙ্কে তুলে দে চুন্নী।

মা কালো, তাই মেয়েটা বাপের রঙ পায়নি। কিন্তু শ্যামলা রঙের ওপর একটা হলুদ-হলুদ আভা পড়ে ওকে খুব সুন্দর লাগছিলো। চোখে কেমন একটা জাদু-জাদু।

কামরায় তেমন একটা ভিড় ছিলো না। কলকাতা ফেরার সময় তেমন বাড়তি ভিড় থাকে না।

আমি, অজিত আর হানু গল্প করছিলাম। অথচ বেশ বুঝতে পারছিলাম নিজেদের কথায় নিজেদেরই মন ছিলো না। অজিত আর হানুও নিশ্চয় ওদের কথাই শুনছিলো। চুন্নীকে দেখছিলো।

ছটফটে অস্থির প্রকৃতির মেয়েটা অকারণে হাসছিলো, জায়গা বদল করছিলো, পিঠোপিঠি বোনটার সঙ্গে মুখ নামিয়ে ফিসফিস করে কি বলাবলি করে হাসছিলো। অকারণেই সরু করিডর দিয়ে দরজা অবধি গিয়ে দরজার জানালায় মুখ বাড়িয়ে বাইরের ছুটন্ত মাঠ-গাছ দেখছিলো, ফিরে এসে বলছিলো, এই দাদা, ওঠ না, আমি ওখানে বসবো। অর্থাৎ জানালার পাশে।

চুন্নী জানালা পাচ্ছিলো না। আমি পেয়েছিলাম। ঠিক ওর দাদার সামনের সীট। আর সেজন্যেই বোধ হয় ওর দাদা জানালা দিচ্ছিলো না।

আমার একবার ইচ্ছে হলো জানালাটা দিয়ে দিই।

অজিত বললে, খবরদার।

হানু বললে, ভালো হবে না কিন্তু।

চাপা গলায় বললে আমাকে। কারণ মেয়েটা, মানে চুন্নী ওর দাদাকে জানালা ছাড়তে বললেও তাকালো কিন্তু আমার দিকে।

মানে মাঝে মাঝেই তাকাচ্ছিলো। অবশ্য প্রতিদানে।

ওরা যখন উঠলো, তখন ওদের মালপত্র তোলায় আমরা তিনজনই একটু সাহায্য করেছিলাম।

মাঝখানে কোনো একটা স্টেশনে ওরা চা খেলো। চায়ের একটা ভাঁড় আমি এগিয়ে দিয়েছিলাম চুন্নীকে। আঙুলে আঙুলে লেগেছিলো।

চুন্নী থ্যাঙ্কিউ বলেছিলো, মজা করে। একবার দাদাটাকে জিগ্যেস করা আমার কোনো একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলো চুন্নী।

তারপর যেমন হয়ে থাকে ট্রেনে, চোখে চোখে কি যেন হয়ে গিয়েছিলো। আমার বুকের ভেতরটা রিনরিন করছিলো, মিষ্টি ব্যথার মতো।

ও হঠাৎ আবার উঠলো, বাঙ্ক ধরে ধরে দরজার দিকে যাবার সময় আড়চোখে একবার তাকালো। আমার বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠলো। মনে হলো ও যেন কিছু ইশারা করলো।

আমি উঠলাম।

অজিত বললে, কোথায় যাবি?

হানু বললে, বস না চুপ করে।

আমি বললাম, পায়ে ঝিনঝিনিয়া ধরে গেছে।

অনেক কাল আগের কথা বলছি তো, তখন ঝিনঝিনিয়া বলে একটা রোগের কথা শোনা যেতো।

ওদের উপেক্ষা করেই আমিও দরজার দিকেই চলে এলাম। ওর পাশ দিয়ে যাবার সময় আস্তে করে বললাম, এই, শোনো।

বলে ওর বিপরীত দিকের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম। ওখানে দাঁড়ালে কেউ দেখতে পাবে না।

চুন্নী গলা বাড়িয়ে মাঠ দেখলো। তারপর আড়চোখে একবার ওদের দিকে তাকিয়ে নিয়েই হঠাৎ এগিয়ে এলো, হাসতে হাসতে চাপা গলায় বললে, কি হচ্ছে কি, ওরা বুঝতে পারবে।

বলেই ফিরে গিয়ে নিজের সীটটিতে বসলো। সুতরাং আমিও গিয়ে জানালার ধারটিতে আবার বসলাম।

আমার মুখ খুশিতে হাসছিলো বোধ হয়। চুন্নী ওর দু ঠোঁটের ওপর আড়াআড়ি করে তর্জনী রাখলো, সবাইকে লুকিয়ে। অর্থাৎ হাসতে বারণ করলো।

আমার নিজেকে ভীষণ সুখী লাগছিলো। সারা পথ।

তারপর ব্যাণ্ডেল স্টেশন এলো, ওরা হুড়মুড় করে নেমে গেল।

আমি তাকিয়ে রইলাম। মালপত্র নিয়ে ওরা তখন খুব ব্যস্ত।

কুলির মাথায় মোটঘাট তুলে দিয়ে ওরা সাবওয়ের দিকে হেঁটে যাচ্ছিলো, আমি তাকিয়ে রইলাম, আমার বুকের মধ্যে তখন তোলপাড় চলছে, চুন্নী নিশ্চয় এবার ফিরে তাকাবে, সাবওয়ের সিঁড়িতে পা দিয়ে অদৃশ্য হবার আগে একবার ফিরে তাকাবে।

আমাদের ট্রেন হুইস্‌ল্‌ দিয়ে চলতে শুরু করেছে তখন।

চুন্নী, একবার, একবার ফিরে তাকাও, শুধু একবার।

আশ্চর্য, ও একবারও ফিরে তাকালো না, নির্বিকার নীচে নেমে গেল। আর তারপর থেকে আমি প্রায়ই ফিরে তাকাই। সেই দিনটির দিকে।



বিনু, পালা

আমার পকেটে তখন একটা চকচকে রুপোর টাকা। তখন কাগজের টাকার চল হয়নি। তখন টাকায় সত্যি সত্যি রুপো থাকতো।

কাশী থেকে সেবার আমার দাদামশাই এসেছিলেন। যাবার সময় তাঁর কালো কোটের পকেট থেকে একটা টাকা বের করে আমাকে দিলেন। বললেন, মিষ্টি খাবে।

আমি লাজুক-লাজুক মুখ করে মাথা নাড়লাম। নিতে চাইলাম না।

মা হেসে বললে, নে বিনু, নে, অত লজ্জা করতে হবে না।

আমি নিলাম। পকেটে রাখলাম। তখন তো আমি রাজা। একটা টাকা দিয়ে কি কিনবো ভাবতে হলো না। কারণ সেটা মনে মনে ঠিক করেই রেখেছিলাম। কিন্তু তার আগে ভেবে নিতে ভালো লাগছিলো কি কি কেনা যায়। মনে হচ্ছিলো একটা টাকা দিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কিনে ফেলা যায়।

হাবুল ছিলো আমার খুব বন্ধু। বাড়ির কাছেই থাকতো। তাকে দেখালাম টাকাটা, গর্ব করে বললাম, দাদামশাই দিয়ে গেছে।

হাবুল কি কি যেন কিনে ফেলতে বললে। আমি বললাম, দূর, ওসব কি হবে। আমি একটা কলম কিনবো, ফাউণ্টেন পেন।

তখন সত্যি এক টাকায় একটা ব্ল্যাকবার্ড কলম কেনা যেতো। দরকার হয় চার আনা আট আনা

মা-র কাছে চেয়ে নেবো।

সত্যি চেয়ে নিয়েছিলাম। নিয়ে হাবুলকে একদিন বললাম, চ' হাবুল, একটা কলম কিনবো। প্যাটেলের দোকানে শো-কেসে অনেক কলম সাজানো থাকতো দেখেছিলাম।

হাবুলকে সঙ্গে নিয়ে প্যাটেলের দোকানে হাজির হলাম। বললাম যতরকম কলম দেখাতে।

কতরকমের কলম। কোনোটা দামী, কোনোটা সস্তা।

আমি দেখছি, হাবুল দেখছে। লোভ হচ্ছে সব ক'টাই কিনে ফেলার।

শেষ অবধি একটা ব্ল্যাকবার্ডই পছন্দ হলো।

সেটা হাতে নিয়ে দেখছি, টাকাটা দেবো-দেবো, হাবুল বললে, কালি নিবি না এক শিশি?

বলেই কালি দেখাতে বললে। লোকটা মই বেয়ে উঠলো, হাফ-সিলিং থেকে কালির শিশি নামাবার জন্যে।

আর তখনই হাবুল আমার পিঠে হাত দিয়ে একটু ঠেলা দিয়ে বলে উঠলো, বিনু, পালা!

বলেই ছুটতে আরম্ভ করলো।

আর কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমিও ওর পিছন পিছন ছুটছি। কেন তা-ও জানি না।

অনেকখানি ছুটে এসে হাবুল বললে, চেনে না তো?

আমি বোকার মতোই বললাম, চেনেই তো, বাবাকেও চেনে।

তখন আমাকে বোধ হয় খুব উদ্‌ভ্রান্তের মতো লাগছিলো। এখন বুঝতে পারি, তখন আমি কি ভাবছিলাম। ভয়ে লজ্জায় কেন আমার চোখ ঠেলে জল এসেছিলো।

আসলে ও লোকটা আমাকে চেনে বলে আমার কোনো দুর্ভাবনা ছিলো না। আমি শুধু ভাবছিলাম, আমি তো নিজেকেই চিনতাম না। দু মিনিট আগেও ভাবতে পারতাম না আমি ছুটে পালাচ্ছি।

তারপর থেকে আমার আর নিজের সম্পর্কে কোনো গর্ব নেই, অহঙ্কার নেই।

সব সময়ে আমার শুধু একটাই ভয়।

এক্ষুনি হয়তো পিঠের ওপর একটা হাতের স্পর্শ পাবো। এক্ষুনি হয়তো কেউ পিঠে হাত দিয়ে ঝট করে বলে উঠবে, বিনু, পালা।

অমনি সঙ্গে সঙ্গে আমি হয়তো ছুটতে শুরু করবো।

তুমি যতই নিজেকে চেনো না কেন, তুমি জানো না কে কখন তোমার পিঠে হাত দিয়ে বলে উঠবে, বিনু, পালা। আর তখন তুমি আমার মতোই ছুটতে শুরু করবে। সাবধান, সাবধান।

লীলাময়ী

মা বললে, সে কি রে, ওকে চিনতে পারলি না? ও মজুমদারদের মেয়ে লীলা।

আমি শুনে অবাক হয়ে গেলাম। আমার কিছুতেই যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছিলো না! একটা মেয়ে ক'দিনের মধ্যে এতখানি পালটে যেতে পারে ভাবতে পারছিলাম না। রোগা টিঙটিঙে সেই মেয়েটা রাতারাতি এমন রূপসী হয়ে উঠলো কি করে! এমন ছিমছাম-রুচি পোশাক হলো কখন, হাঁটা-চলার এমন ছন্দ পেলো কোথায়!

আমি সত্যি ওকে একটুও চিনতে পারিনি।

আমার কিন্তু হাসি পেলো মা-র কথা বলার ভঙ্গি দেখে। যেন আমি এখনো সেই ছোট্টটি। যেন খোকা ডাকটা আমাকে চিরকালই খোকা করে রাখবে, মা-র কাছে কোনো দিন আর বড় হবো না।

মা বললে, খোকা, তোর বোধ হয় গাঁয়ের কথা কিছুই মনে থাকে না। কলকাতায় গিয়ে তুই আমাদেরও ভুলে যাস না তো!

আমি হেসে ফেললাম। উবু হয়ে বসলাম মা-র কাছে। রান্নাঘরের দাওয়ার ওপর। গাঁয়ের

বাড়িতে আমাদের তখন সবই মাটির ঘর, খড়ের চালা, তখনো গারার গাঁথনি দিয়ে দালান ওঠেনি, পেটা ছাদ হয়নি। আর সেজন্যেই রান্নাঘরটা ছিলো গোবরছড়া-দেওয়া উঠন পার হয়ে এসে এক কোণে। মাটির মেঝেতে উবু হয়ে বসে, শালের খুঁটিটায় ঠেস দিয়ে আমি মা-র রান্না দেখছিলাম। টুকরিতে নটের শাক বেছে বেছে রাখছিলো মা, গরম কড়াইয়ে সেগুলো ঢেলে দিতেই ছাঁইছাঁই আওয়াজ উঠলো। মা ঘটির জলে হাত ধুয়ে শিলের ওপর আদা বাটতে বাটতে কথা বলছিলো শিলনোড়ার দিকে চোখ রেখে। মাকে দেখতে খুব ভালো লাগছিলো, মা-র রান্না দেখতে। আর আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম, আমি এসেছি বলে মা খুব খুশী। মা-র খুব আনন্দ হচ্ছে।

মা বললে, হ্যাঁ রে, ওখানে ওরা তোকে ভালো করে খেতে দেয় তো! পেট ভরে খাস তো, তুই যা ছেলে, কখনো কিছু চেয়ে নিবি না!

মা এমনভাবে কথা বলছিলো যেন আমি সেই ছোট্টটি আছি। তা না হলে, ঐ লীলা সম্পর্কে মা এমনভাবে কথা বলতো না।

আমি তো ঘরে ছিলাম, ওদিকে। মা-র কাছে এসে গল্প করবো ভেবে পা বাড়াতে গিয়ে দেখলাম নীল শাড়ি পরা একটা সুন্দরী গোছের মেয়ে হেসে হেসে মা-র সঙ্গে কথা বলছে খুঁটিতে হাত রেখে। এক পলক দেখেই আমার মেয়েটিকে খুব ভালো লেগে গেল। সুন্দর নাক-মুখ-চোখ, ফর্সা রঙ, পুরুষ্টু শরীর, আর নীল শাড়িতে দিব্যি মানিয়েছিলো ওকে, বেশ বড়-সড় লাগছিলো। কিন্তু আমি তো তখন বড় হয়ে গেছি, তাই কেমন লজ্জা-লজ্জা করলো। যেন ওর দিকে তাকানো অন্যায়, ওর কথা জিজ্ঞেস করলে মা হয়তো ভাববে মেয়েটা রয়েছে বলেই খোকা ইচ্ছে করে এলো। আমি তাই মা-র কাছে আসতে গিয়েও এলাম না। ফিরে গেলাম ঘরের মধ্যে।

আসলে তখন আমার নিজেকে নিয়ে ভীষণ লজ্জা হতো মা-র সামনে, গুরুজনদের সামনে। ওরা না বুঝে ফেলে আমি বড় হয়েছি।

এর আগে একবার যখন ছুটিতে বাড়ি এসেছিলাম, আমার মেজ পিসী, বিধবা মানুষ, আমাদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে শুধু হাসতো, সেই মেজ পিসী বলে উঠেছিলো, দেখো দেখো ছোট বউদি, খোকার গলার স্বর কেমন পালটে গেছে। বেশ ছেলে-ছেলে গলার স্বর হয়ে গেছে।

তারপর থেকে আমি নিজেও টের পেতাম। সত্যি তো, বড় হয়ে গেলে যে গলার স্বরও পালটে যায় তার আগে জানতাম না।

আমি তাই ওদের কাছ থেকে নিজের বড় হয়ে যাওয়াটা লুকিয়ে রাখতে চাইতাম। আমি ভাব করতাম যেন আমি সেই ছেলেমানুষটি আছি। মেয়েরা, লীলার মতো যারা হঠাৎ বড় হয়ে গেছে, সেইসব মেয়েদের সম্পর্কে কথা বলতে গেলে এমন ভাব করতাম যেন ওরা শুধুই এক-একটা নাম। নামের বাইরে যেন তাদের আর কোনো ব্যঞ্জনা নেই অথবা আমি এতই সরল কিংবা শিশু যে সেই ব্যঞ্জনা সম্পর্কে আমি একটুও সচেতন নই। তাদের সম্পর্কে আমার কোনো আগ্রহও থাকবার কথা নয়। অথচ আমি যে ধূর্ত ছিলাম বলেই ওরকম করতাম তাও নয়। আসলে ঐ বয়সে ওটা একটা লজ্জার পোশাক, নিজেকে নিয়ে লজ্জা।

কিন্তু নিজেকে ছোট সাজিয়ে রাখার এত সাধ্য-সাধনা করতাম, তখন মা কিংবা মেজ পিসী যদি আবার আমার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলতো যেন আমি সেই ছোট্টটি আছি, তা হলে মনে মনে হাসতাম। খুব মজা লাগতো। এক-একসময় রাগও হতো।

বাঃ রে, আমি কি কখনো বড় হবো না নাকি!

বেশ কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে ঘুরঘুর করার পর শুনতে পেলাম সেই মেয়েটিকে উদ্দেশ করে মা চেঁচিয়ে কি বললো। মা-র গলার স্বর শোনা গেল। মেয়েটার কোনো কথা শোনা গেল না, কোনো শব্দও না, কিন্তু বেশ বুঝতে পারলাম, মেয়েটি চলে গেছে। অর্থাৎ তার চলে যাবার সময় মা তাকে কিছু বললো। এই বলার মধ্যে গলার স্বরের এমন একটা রেশ বেজে ওঠে এবং পর্দার মধ্যে কি একটা তারতম্য ঘটে যায়, যার ফলে যাকে উদ্দেশ করে কথাটা বলা হয় তার ছবিটা চোখের সামনে ফুটে ওঠে।

মা যেন বললে, মধুকে বলিস দুটো ডিম দিয়ে যেতে। কিন্তু এই কথাটা লঘু পর্দায় শুরু হয়ে কেঁপে গিয়ে উঁচু পর্দায় চড়ে যাওয়া মানেই মেয়েটি কাছে ছিলো, দূরে সরে গেছে।

আমি তখন একটু নিশ্চিন্ত বোধ করলাম। আমার অস্বস্তি কেটে গেল। কিন্তু এক পলক ঐ যে ওকে দেখতে পেয়েছিলাম, তার জন্যে আমার মনে মনে একটা ঔৎসুক্য গড়ে উঠেছে তখন। জানতে ইচ্ছে করছে মেয়েটি কে। পাড়াগাঁয়ের এই পরিবেশের সঙ্গে মেয়েটিকে কেন যেন ঠিক মিলিয়ে নেওয়া যাচ্ছে না। আমার তখন ধারণা ছিলো পাড়াগাঁয়ে কোনো সুন্দর মেয়ে থাকে না, যদি বা থাকে, তাদের পোশাক-আশাক, হাঁটা-চলা, কথাবার্তা সব কিছু তাদের কুৎসিত বানিয়ে